চিত্র জগৎ

রূপদর্শন

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী

সরস্বতী

বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য

শ্রীসুনীতিকুমার চটোপাধ্যায়

বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে দুই চারিটী কথা নিবেদন করিতে চাহি।

"বাঙ্গালী জাতি" বলিলে, যে জনসমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা রূপে বা ঘরোয়া ভাষা রূপে ব্যবহার করে, সেই জনসমষ্টিকে বুঝি। বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাব-ধারায় পুষ্ট হইয়া গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই "বাঙ্গালী সংস্কৃতি"। এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টিকাল হইতে বাঙ্গালাভাষায় রচিত যে সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই "বাঙ্গালা সাহিত্য"।

* * *

এখন প্রায় পাঁচ কোটি লোক বাঙ্গালা ভাষা বলে। সংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালী জাতি নগণ্য নহে। বহু সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন দেশের লোক-সংখ্যা এত নহে। গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী,—ইহাদের প্রত্যেকের অধিবাসিগণের চেয়ে বাঙ্গালী অর্থাৎ বাঙ্গালাভাষী জনগণের সংখ্যা অধিক। আমি এই বিষয়ে আমার দেশবাসিগণের ও অন্য লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি যে, ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তি মাতৃভাষা হিসাবে বাঙ্গালা বলে। হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দু) ভাষার স্থান অবশ্য ভারতবর্ষে বাঙ্গালার উপরে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই ; হিন্দুস্থানী বাঙ্গালার তিন গুণের কাছাকাছি লোকের মধ্যে প্রচলিত, এবং আরও অনেকে ইহা বলিতে পারে ; কিন্তু হিন্দুস্থানী উত্তর-ভারতের অর্থাৎ আর্য্যভাষী ভারতের চৌদ্দ কোটি লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও ইহা (অর্থাৎ হিন্দী-উর্দু সমেত পশ্চিমা-হিন্দী উপ-ভাষাগুলি) মাত্র সাড়ে চার কোটি লোকের মাতৃভাষা—বাকী সাড়ে নয় বা দশ কোটি লোক ঘরে লহন্দী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, মালবী, গাড়ওয়ালী, কুমাউনী, অবধী, ছত্রিশগড়ী, ভোজ-পুরিয়া, মগহী, মৈথিলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে ; এই সব ভাষা হিন্দুস্থানী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র ;—এই সব ভাষা যাহারা ঘরে বলে, তাহাদের কাহাকেও হিন্দুস্থানী (হিন্দী বা উর্দু) শিখিতে হইলে দস্তুর মত চেষ্টা করিয়া অনেকটা বিদেশী ভাষা শিক্ষার মত করিয়াই শিখিতে হয়। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগুলির মধ্যে বাঙ্গালার স্থান সপ্তম। বাঙ্গালার অগ্রে এই কয়টী ভাষার নাম করিতে হয়—উত্তর-চীনা, ইংরেজী, রুষ, জার্ম্মান, স্পানিশ, জাপানী ; পরে বাঙ্গালা। কিছুকাল হইল, Benn's Six-penny Library নামক সুপরিচিত এবং প্রামাণিক গ্রন্থমালা মধ্যে, Firth নামক একজন ইংরেজ ভাষা-তত্ত্ববিৎ, ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন ; এই পুস্তকে তিনি সংখ্যার দিক্ বিচার করিয়া এবং অন্য বিষয়ে লক্ষণীয়ত্ব বিচার করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা দিয়াছেন। অবশ্য, কেবল অন্যতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভাষা হওয়ায় বাঙ্গালার বা আর কোনও ভাষার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কিছু নাই ; কিন্তু সংখ্যাধিক্য উপেক্ষণীয় বস্তু নহে ; এবং সংখ্যাধিক্য ভিন্ন, বাঙ্গালার সাহিত্য-গৌরবও অন্য পাঁচটি ভাষার মধ্যে বাঙ্গালার একটী প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে।

* * *

এই যে পাঁচ কোটি বাঙ্গালীভাষী, যাহারা সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া এবং বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশ জুড়িয়া বাস করিতেছে, এবং কিছু কিছু বাঙ্গালার বাহিরে অ-বাঙ্গালীদের দেশে গিয়া যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই পরস্পরের মধ্যে ভাষা-গত স্বাজাত্য অনুভব করে। বিদেশে অন্যভাষা-ভাষীদের মধ্যে গেলে, এই স্বাজাত্য-বোধটুকু আমাদের কাছে বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হয়। আজকাল জাতীয়তা বা স্বাজাত্যের প্রধান আধার হইতেছে ভাষা।

যেখানে বিভিন্ন ভাষা, সেখানে ধর্ম্ম, মানসিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থান এক হইলেও, সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়া কঠিন,— সম্পূর্ণাঙ্গ স্বাজাত্য-বোধ আসা এক রকম অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে এমন একাধিক জনসমষ্টিকে, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কারণে, এক-রাজ্যপাশে বদ্ধ করা যায়; কিন্তু দেখা যায়, ভাষাগত বৈষম্য থাকিলে ওতপ্রোতভাবে মিল হয় না। রাষ্ট্রীয় বন্ধনে সঙ্ঘ-বদ্ধ বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী একাধিক জনসমষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা-স্বরূপ গ্রহণ করিলে, একতার সূত্র একটা অধিক হয় বটে, কিন্তু প্রান্তিক সত্তা বর্জ্জন করিয়া সকলে মিলিত হইতে চাহে না বা পারে না। সম্পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে, দেশে মাত্র একটী ভাষাকে রাখিতে হয়, — অন্যগুলিকে হয় একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হয়, নতুবা নির্জ্জীব ও ক্ষয়িষ্ণু করিয়া রাখিতে হয়। এই রূপটী করিয়া তবে গ্রেট-ব্রিটেনে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ঘটিয়াছে—স্কটলাণ্ডের গেলিক ও ওয়েল্‌স্-এর ওয়েল্‌শ্-ভাষাকে বিলোপের পথে আগাইয়া দিয়া ইংরেজীর প্রতিষ্ঠা, ও সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করিয়া ব্রিটিশ একতা। ফ্রান্সেও এইরূপে দক্ষিণ-ফ্রান্সের প্রভাঁসাল ভাষাকে নির্জ্জীব ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রেতঁ ভাষাকে মৃতকল্প ও ক্ষয়িষ্ণু করিয়া, ফরাসী ভাষার অবিসংবাদিত ও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার আসনেই ফ্রান্সের রাষ্ট্রগত একতা স্থাপিত হইয়াছে। বহু ভাষাময় রুষ সাম্রাজ্যেও এই প্রকার প্রান্তিক ভাষাগুলিকে পিষ্ট ও বিনষ্ট করিয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়,—এক সময়ে পোলীয় ভাষা, লিথ্-আনীয়, লেট্, এস্তোনীয়, ফিন্, আর্ম্মানী প্রভৃতি ভাষার, রাজ-ভাষা রুষের চাপে প্রাণসংশয় হইয়াছিল; কিন্তু রুষ সাম্রাজ্যের পতন ও উক্ত সাম্রাজ্যের খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ভাষা যাহারা বলে তাহারা মাথা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, নিজ নিজ ভাষাকে অবলম্বন করিয়া ইহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ঐক্যের প্রধান অন্তরায় মনে করিয়া কেহ কেহ হয়তো ইহাদের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ও ইহাদের স্থানে একমাত্র হিন্দীর অবস্থান কামনা করিবেন; কিন্তু কার্য্যতঃ [illegible] করা অসম্ভব; এক কোটি, দুই কোটি, পাঁচ কোটি লোকের ভাষাকে এভাবে মারা যায় না। বিশেষতঃ প্রান্তিক জনগণ যেখানে প্রান্তিক সত্তা সম্বন্ধে সাত্মাভিমান হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে এরূপ কল্পনাও করা যায় না।

এই প্রান্তিক সত্তার প্রাণই হইতেছে প্রান্তিক ভাষা। এই জন্য বিভিন্ন প্রান্তিক ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা মানিয়া লইয়া, সম্পূর্ণরূপে একীভূত রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের গঠনকেই আদর্শ ধরিতে হয়। সোভিয়েট শাসিত রুষদেশে এইরূপ হইয়াছে—রুষ সাম্রাজ্যের তাবৎ ভাষা এখন নিজ নিজ গৃহে স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত,—অবশ্য রুষ ভাষাকেই সাধারণ রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া সমগ্র দেশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষেও দাঁড়াইতেছে তাহাই। **The United States of India**—অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংযুক্ত রাষ্ট্র—ইহাই হইতেছে ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। কংগ্রেস ভারতকে বঙ্গদেশ, আসাম, উৎকল, বিহার, হিন্দুস্থান বা সংযুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব, হিন্দুস্থানী মধ্য-প্রদেশ, মহাকোশল, মারাঠী মধ্য-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু, গুজরাট, অন্ধ্র, তামিল-নাড়ু, কেরল, কর্ণাট প্রভৃতি ভাষাগত প্রদেশে বিভাগ করিয়াছেন। এক-একটী প্রদেশে এক একটী ভাষা, এক একটী ভাষা অবলম্বন করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র জাতি; সকলেই বৃহত্তর বৃত্তস্বরূপ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সকলেরই প্রাদেশিক বা প্রান্তিক সত্তা বা সভ্যতা প্রাচীন ভারতের সার্ব্বভৌম ভারতীয় সত্তা বা সভ্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সকলকেই হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া গিয়াছে; সকলেরই অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য্য ও অনপনেয় সম্মিলনে আধুনিক কালের এক অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা।

* * *

বাঙ্গালী জাতির বা বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে হইলে ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে সেই সব বিষয়ে বাঙ্গালীদের সমতা আছে। বিশেষের উপরে ঝোঁক দিয়া সাধারণকে

ভুলিলে চলিবে না,—সাধারণটাই যখন প্রধান। ভারতের সমস্ত-প্রদেশ-সুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাঙ্গালাও তাহার অংশীদার। অন্য দেশের সমক্ষে ভারতের সমস্ত প্রদেশে বিদ্যমান এই ভারতীয়ত্বটুকু ঈষৎ পরিবর্তিত প্রাদেশিক রূপে তত্তৎ প্রদেশের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যায়েই পড়ে। একটা বাহ্য ও সহজ ব্যাপারেই এইটী দেখা যায়। আমাদের চেহারায় একটা সাধারণ অনন্যদেশ-লভ্য ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, অন্যদেশের মানুষের তুলনায় আমাদের দেশের যে কোনও প্রদেশের মানুষের মধ্যে এই জিনিসটী পাওয়া যায়। গায়ের গৌরবর্ণে কিংবা শ্যামবর্ণে, মুখচোখের সমাবেশে, চাহনিতে, চলনে-বলনে, এমন একটা লক্ষণীয় জিনিস আছে, যাহা কেবল ভারতবর্ষেরই পরিচায়ক। অত্যন্ত গৌরবর্ণ পারসী বা কাশ্মিরী, অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি পাঞ্জাবী, খুব খাটো চেহারা এবং খুব কালো রঙ্গের সাঁওতাল, প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় জনসঙ্ঘের মধ্যে কতকগুলি extreme type—অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রতীক বাদ দিলে, যে-কোনও প্রদেশ হইতে হউক না কেন, সাধারণ ভারতবাসী জনকতককে ধরিয়া, তাহাদের দেহ হইতে কানের মাকড়ী, লম্বা চুল, গালপাট্টা, উড়ে খোঁপা, লম্বা টিকি, ফোঁটা বা বিভূতির ঘটা, মুসলমানী কায়দায় ছাঁটা গোঁফ, প্রভৃতি প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক লাঞ্ছন দূর করিয়া দিয়া, এক রকমের কাপড়-চোপড় পরাইয়া দিলে, তাহারা কোন্ প্রদেশের লোক তাহা বলা কঠিন হইবে। ইউরোপে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এ জিনিস দেখিয়াছি, আমার মত অনেকেও দেখিয়াছেন; এদেশেও লোকে দেখিয়াছে। ইংরেজী-পোষাক-পরা সাধারণ ভারতীয় লোককে, যদি বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার বাহিরে, রেলে বা অন্যত্র দেখি, তাহা হইলে জোর করিয়া বলা কঠিন—লোকটী কোন প্রদেশের; লোকটী বাঙ্গালী হইতেও পারে, এ বোধও আমাদের আসে। আকারে যেমন, প্রকৃতিতেও তেমনি, বাঙ্গালী ভারতীয়ই বটে। তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে সে হয় তো চার আনা ইউরোপীয়,—তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে,—এবং আট আনা ভারতীয়; বাকী চার আনায় সে বাঙ্গালী, এবং এই চার আনার মধ্যে আবার কতকটা ভারতীয়ত্বের বাঙ্গালা বিকার,—বাকীটুকু খাঁটি বাঙ্গালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙ্গালী। বাঙ্গালী জাতির এক অংশে আবার ইসলামের প্রভাব আছে—কতটা প্রভাব আছে, তাহার নির্ণয় বাঙ্গালী মুসলমান ঐতিহাসিকরাই করিবেন; তবে তাহা খুব বেশী নহে; এ বিষয় লইয়া পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

* * *

এতটা কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী জাতির কথা, বাঙ্গালার সংস্কৃতির কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, এই সব জিনিসের ভারতীয় আধার বা পটভূমিকার কথা বাদ দিলে চলিবে না। অন্যান্য প্রদেশের অর্থনৈতিক আক্রমণের চাপে আমরা মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছি; ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় ঘরের মুসলমানের চাপও আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালার হিন্দুদের উপরে অনুচিত ও অন্যায় ভাবে এখন আসিয়া পড়িতেছে—ইংরেজানুগৃহীত মুসলমানের এখনকার এই দাপট হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই হানিকর হইবে; কতকটা দিশাহারা হইয়া আমাদের এক দল উপদেশ দিতেছেন—"সামাল, সামাল, এটা আপদের সময়, কমঠ-বৃত্ত বা কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীয়ানার খোলার ভিতরে হাত পা গুটাইয়া লইয়া ব'সো, বাঁচিয়া যাইবে; 'ভারত' 'ভারত' বলিয়া চেঁচাইও না। বলো, 'বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয়ের মা বঙ্গমাতার জয়'; Sinn Fein অর্থাৎ We ourselves এই মন্ত্র জপ করিয়া, প্রকাশ্যভাবে বঙ্গ-বহির্ভূত ভারতের অর্থনৈতিক উপদ্রব ও শোষণ হইতে বাঁচ; এবং সম্ভব হইলে, এই মন্ত্র আওড়াইয়া আরব তথা উর্দ্দুওয়ালা পশ্চিমা মুসলমানদের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক আক্রমণ হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদের বাঁচাও,—তাহারা খাঁটি বাঙ্গালী থাকিলে, বাঙ্গালী হিন্দু, তুমিও বাঁচিয়া যাইবে।"

কথাটা খুবই সমীচীন, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিবার। Confusion of issues অর্থাৎ বিষয়-বিভ্রম যাহাতে না ঘটে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙ্গালার বুকের ভিতরে যে বৃহত্তর মারওয়াড়, বৃহত্তর উৎকল, বৃহত্তর সংযুক্ত-প্রদেশ, বৃহত্তর পাঞ্জাব, বৃহত্তর ভাটিয়াভূমি, বৃহত্তর নেপাল, বৃহত্তর অন্ধ্র, বৃহত্তর কেরল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রাণপণে সে সকলের অর্থনৈতিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকে, এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আমাদের যে আধ্যাত্মিক যোগ-

আছে তাহাকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। যত প্রকার শক্তি আছে তাহার প্রয়োগ করিয়া, অর্থনৈতিক দিকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া আমাদের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে. ভারতীয় জাতীয়তার দোহাই পাড়িয়া যাহারা আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদের বাড়া ভাতে ভাগ বসাইতেছে, মুখের গ্রাসটী কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের বাধা দিতে হইবে। কিন্তু সেই কারণে বাঙ্গালার বাহিরের ভারতের, নিখিল ভারতের সভ্যতাই যে বাঙ্গালার সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, তাহা ভুলিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক শোষণ রোধ করিব, —কিন্তু সাংস্কৃতিক যোগ ভুলিব না; নূতন সাংস্কৃতিক যোগের সম্ভাবনাকে বর্জ্জন করিব না; এবং আমাদের অতীতের কথা আলোচনা কালে, আমাদের জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য বিচারের কালে, বাঙ্গালার পটভূমিকা নিখিল ভারতবর্ষ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইব না। বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুয়া মদিনা ও কমলার চরিত্র লইয়া আমরা গর্ব্ব করিবই,—এই অপূর্ব্ব নারীচরিত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীজীবনের সৃষ্টি; কিন্তু উমা সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌরব করিব না; কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা সীতা-সাবিত্রী বাঙ্গালার বিশেষকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক হইয়া বিরাজ করিতেছেন;—আদি আর্য্যভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা ভাষাই থাকে না, তেমনি সীতা-সাবিত্রীকে, অর্থাৎ আদি আর্য্য যুগের বা সংস্কৃত যুগের ঐতিহ্য ও আদর্শকে বাদ দিলে, বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়া আমরা কোনও জিনিসের কল্পনা করিতে পারি না। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সীতা-সাবিত্রীকে "ঘাঘরা-পরা বিদেশিনী" এই আখ্যা দান করিয়া, বাঙ্গালার হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন, বা হৃদয় সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন; তাঁহাদের স্থানে নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালা-পল্লী-গাথাবলীর নায়িকা মলুয়া মদিনা ও কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতা-সাবিত্রীর সত্যকার পোষাক যাহাই থাকুক (তবে প্রাচীন আর্য্য যুগে মেয়েরা ঘাঘরা পরিত না, এবিষয়ে সন্দেহ নাই,) বাঙ্গালার মাটিতে তাঁহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্য মুহূর্ত্তে পাদক্ষেপ করা মাত্রই আমরা তাঁহাদের বাঙ্গালী ধরণের সাড়ী পরাইয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। রায় বাহাদুরের এই চেষ্টার বিশ্লেষণ এখন করিব না; কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটী শব্দ দ্বারা এই চেষ্টার বর্ণনা করা যায়—সে শব্দটী হইতেছে "আদিখ্যেতা" —অর্থাৎ, বিশেষ এক প্রকারের ভাববিলাসের আতিশয্য; এবং এই চেষ্টার মূলে, অন্যান্য মনোভাব ও চিন্তা ব্যতীত এই জিনিসটী দেখিতে পাই—আমাদের বাঙ্গালার জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা বা আধার-ভূমি কি কি বিষয় লইয়া, তৎসম্বন্ধে অবহিত না হইয়া, নূতন ও অনপেক্ষিত কথা (তাহা যুক্তিসহ হউক বা না হউক) বলিয়া Sensationalism বা চমক প্রদতার সৃষ্টি করা। বঙ্গদেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত না হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যই গড়িয়া উঠিত না --ইহা এই রূপই sensational এবং যুক্তিহীন কথা।

* * *

ভাষা না হইলে জাতি বা nation হয় না; এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেত না হইলে, জাতীয়তা-বোধও হয় না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি লইয়া অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। যে-সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির কথা পুনরুদ্ধার করা যায়, সেগুলি হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে বাঙ্গালা ভাষা এখন হইতে মাত্র হাজার বৎসর পূর্ব্বে নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা সৃজ্যমান, তখন বঙ্গদেশের ভাষা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ গঙ্গার দান; গঙ্গার পলিমাটিতেই বাঙ্গালার উদ্ভব। বাঙ্গালা দেশের ভাষাও তেমনি উত্তর-ভারতে উদ্ভূত প্রাকৃত হইতেই উৎপন্ন। গঙ্গার মত আর্য্যভাষার নদী বাঙ্গালা দেশেও বহিল, এই নদীর স্রোতে দেশের প্রাচীন অনার্য্য ভাষা ভাসিয়া গেল—আর্য্য ভাষা প্রাকৃত, এই বাঙ্গালায় আসিয়া ক্রমে বাঙ্গালা রূপ ধারণ করিল; প্রাকৃতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধাত্রী-রূপে সংস্কৃতও আসিল।

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি-পর্ব্ব একটু সংক্ষেপে শেষ করিয়া, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিব।

* * *

প্রাগৈতিহাসিক কালে বাঙ্গালার অধিবাসীরা কি প্রকারের মানুষ ছিল, তাহা ঠিক-মত জানা অসম্ভব; তবে এইটুকু

অনুমান হয় যে, যে যুগের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষেরাই বাস করিয়া আসিতেছে। উত্তর-ভারতের লোকেরা বিহার ও আরও পশ্চিম হইতে বরাবরই বাঙ্গালা দেশে কিছু কিছু করিয়া আসিয়াছে; এখনও যেমন আসিতেছে। কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালাদেশের লোকেদের প্রকৃতি বা আকৃতি বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না জানা যায় না। নৃতত্ত্ব-বিদ্যা বাঙ্গালা-দেশের অধিবাসীদের কুলজী বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও স্পষ্ট কিছু বুঝা যাইতেছে না। এ বিষয়ে আমি যাহা বলিব, তাহা মুখ্যতই ভাষার দিক হইতে অনুমান করিয়াই বলিব। ভাষাতত্ত্ব হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে আর্য্য ভাষা আসিবার পূর্ব্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষা, এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত। মনে হয়, পাঁচটী জাতির বা পাঁচটী বিভিন্ন প্রকারের ভাষা বলিত এমন লোকেদের মিশ্রণে উত্তর-ভারতের নানা জনগণের উদ্ভব হইয়াছে; সেই পাঁচটি জাতি হইতেছে, [১] Negrito নেগ্রিটো, [২] Austric অস্ট্রিক, [৩] দ্রাবিড়, [৪] আর্য্য, [৫] Tibeto-Chinese ভোট-চীন। অনুমান হয়, আদিম যুগে, যখন মানুষ আদিকালের বা প্রথম কালের অমসৃণ প্রস্তরের অস্ত্র ব্যবহার করিত, তখন ভারতের অনাদি অরণ্য সমূহে, বিশেষ করিয়া ভারতের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে, ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, উর্ণাবৎ কেশযুক্ত নেগ্রিটো বা 'নিগ্রোবটু' জাতির মানুষ বাস করিত। ইহা এখন হইতে কম করিয়া ধরিলেও পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্ব্বেকার কথা। শিকারলব্ধ মাংস ও বন্য কন্দমূল এবং মৎস্য ইহাদের আহার ছিল, কৃষিকার্য্য ইহারা জানিত না, এবং ইহাদের সভ্যতার কোনও বালাই ছিল না। ইতিমধ্যে Indo-China ইন্দোচীন হইতে অস্ট্রিক জাতির লোকেরা আসামের উপত্যকা-ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে। অস্ট্রিক জাতীয় মূল ভাষা ও মূল অস্ট্রিক জাতি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় উত্তর-ইন্দোচীনের কোনও স্থানে, এইরূপ অনুমিত হয়। অস্ট্রিক জাতি একটি লক্ষণীয় সভ্যতার পত্তন করে। অস্ট্রিক জাতির আকৃতি কি প্রকার ছিল তাহা বলা যায় না; ফরাসী ভাষাতত্ত্ববিৎ Przyluski প্শিলুস্কি অনুমান করিয়াছেন, তাহারা পীতাভ-বর্ণ ছিল, তাহারা কতকটা মোঙ্গোল জাতির মত দেখিতে ছিল। ইহাদের বিভিন্ন শাখা দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রসৃত হয়; দক্ষিণের দেশে গিয়া ইহারা সেখানকার আদিম জাতিদের সহিত মিলিত হয়, ও সেখানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহারা মালয় বা Indonesian ইন্দোনেসীয় জাতিতে, এবং পরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়া Melanesian মেলানেসীয় ও Polynesian পলিনেসীয় জাতিতে রূপান্তরিত হয়। ইহাদের কতকগুলি দল ইন্দোচীনেই রহিয়া যায়; তাহাদের উত্তর পুরুষ হইতেছে দক্ষিণ বর্ম্মা ও শ্যামের Mon মোন্ বা Talaing তালৈং জাতি এবং কম্বোজের Khmer খ্মের, এবং বর্ম্মা, শ্যাম ও ফরাসী ইন্দোচীনের কতকগুলি অর্দ্ধ-বর্ব্বর জাতি। ইহাদের একটি শাখা নিকোবার দ্বীপে উপনিবিষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষে খুব সম্ভবতঃ ইহারা অল্পবিস্তর আদিম নিগ্রোবটুদের সহিত মিলিত হয়, নিগ্রোবটু ও অস্ট্রিকের রক্তে মিশ্রণ ঘটে; এই সংমিশ্রণের ফলে Kol কোল বা Munda মুণ্ডা জাতির উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। আবার কোথাও এই মিশ্রণ পায় হয়ই নাই, যেমন খাসিয়াদের মধ্যে।

বহুস্থলে নিগ্রোবটুদের বিলোপ ঘটিয়াছিল। আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে, দক্ষিণ ভারতের দুই একটী বন্য জাতির মধ্যে, এবং দক্ষিণ বেলুচিস্থানে এই নিগ্রোবটুর অস্তিত্বের নিদর্শন এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান। অস্ট্রিকদের আগমনে নিগ্রোবটুদের জীবনের অবসান ঘটিল। তাহাদের ভাষারও কোনও নিদর্শন এখন আর নাই। উত্তর-ভারতে ও বাঙ্গালা দেশে বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু আর রহিল না। উত্তর-ভারত ও বাঙ্গালার লোকেদের মধ্যে কচিৎ কখন নিগ্রোবটু চেহারার লোক বা নিগ্রোবটু চেহারার আমেজ নিম্নতম শ্রেণী বা জাতিতে দেখা যায়; তাহা হইতে এই জাতির সহিত পরবর্ত্তী অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের মিলনই সূচিত হয়।

অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা ভারতে প্রথম কৃষিকার্য্য ও তদবলম্বনে সঙ্ঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা ধান, পান, কলা ও নারিকেলের চাষ করিত; পাহাড়ের গা কাটিয়া ধানের ক্ষেত প্রস্তুত করিত, সমতল জমীতেও চাষ করিত।

প্রথমটা উহাদের চাষ ছিল জুমিয়াদের মত। লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্ণ-মুখ কাষ্ঠ-দণ্ড ব্যবহার করিত। ধনুর্ব্বাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। একখণ্ড গুঁড়ি-কাঠে তৈয়ারী ডোঙ্গায় এবং কতকগুলি গুঁড়িকাঠ বাঁধিয়া তৈয়ারী ভেলার আকারের বড় বড় নৌকায় করিয়া উহারা বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও পার হইত। ইহারা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করিত—মানুষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা গাছে, পাহাড়ে, অন্য জীবজন্তুর ভিতরে প্রবেশ করিত, এইরূপ ধারণা ইহাদের ছিল। এই ধারণাই, পরবর্ত্তী কালে ইহাদের লইয়া হিন্দুজাতির সৃষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের মধ্যে উদ্ভূত পুনর্জ্জন্মবাদে পরিণত হয়। শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতি—মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহার্য্য দান—ইহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়া মনে হয়। মৃতকে ইহারা হয় বৃক্ষ-সমাধি দিত, অর্থাৎ কাপড় বা বল্কলে জড়াইয়া বৃক্ষস্কন্ধে মৃতদেহ রাখিয়া দিত; অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া সমাধির উপরে দীর্ঘাকার প্রস্তর-খণ্ড খাড়া করিয়া পুঁতিয়া দিত।

এই অস্ট্রিক জাতির ভাষার নিদর্শন ভারতবর্ষে আমরা কোল-ভাষাগুলিতে ও খাসিয়াতে পাই। এই ভাষার প্রভাব পাঞ্জাবের ভাষায়, উত্তর-কাশ্মীরের হুন্‌জা-নাগিরের Burushaski বুরুশাস্কি ভাষায়, এবং নেপালের নবাগত কতকগুলি ভোট-চীনা ভাষায়ও আছে; এবং মধ্য-ভারতে, দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর কেরলেও ইহাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; ভারতবর্ষের পশ্চিমে ইরানেও ইহাদের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকা অসম্ভব নহে। ভারতে অস্ট্রিকদের সঙ্গে যে নিগ্রোবটুদের মিশ্রণ হওয়া খুবই সম্ভব ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উত্তর-ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমতঃ এই অস্ট্রিক জাতির লোকেরাই বাস করে; সেখানে ইহারা কৃষিমূলক একটা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। "গঙ্গা" এই নামটী অস্ট্রিক ভাষার শব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি। উত্তর-ভারতের সভ্য কৃষিজীবী অস্ট্রিকেরাই (সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণে নেগ্রিটোদের সহিত মিশ্রিত) পরে কিছু পরিমাণ দ্রাবিড় ও অতি অল্প-স্বল্প আর্য্যদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া, হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়। উত্তর-ভারত তথা বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদের জড় বা মূল হইতেছে, দ্রাবিড় তথা আর্য্যদ্বারা রক্তে ও সভ্যতায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত (সম্ভবতঃ নেগ্রিটোদের সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত) অস্ট্রিক জাতি। অস্ট্রিক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়—ইহারা সরল, নিরীহ, শান্তপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণ-যুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, দায়িত্বহীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন, এবং সংহতিশক্তিতে হীন ছিল; কিন্তু লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি ছিল, এই প্রাণশক্তি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই।

ভারতে আগত শুদ্ধ বা মিশ্রিত অস্ট্রিক জাতির সমস্ত শাখাই কৃষিজীবী বা সুসভ্য ছিল না; কতকগুলি শাখা বনে জঙ্গলে, অনেকটা নেগ্রিটোদের মতই শিকার করিয়া বেড়াইত। এই অরণ্যবাসী নিম্নস্তরের অস্ট্রিকগণই "নিষাদ" ও "ভিল্ল-কোল্ল" বলিয়া প্রাচীন ভারতে খ্যাত ছিল; এবং ইহাদেরই বংশধর হইতেছে আধুনিক কোল জাতির নানা শাখা সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, কুরকু, ভূমিজ, শবর, গদব, ভীল প্রভৃতি। ইহা বেশ দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে ভারতের ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে, ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির স্থান অস্ট্রিক প্রভাবেরই ফল। অস্ট্রিকরা গোপালন করিত না, কিন্তু বোধ হয় তুলার কাপড় ইহারাই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ইহারা ধাতুর ব্যবহার জানিত না, পরে ভারতে আসিয়া তামার ব্যবহার শিখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

* * *

অস্ট্রিকদের আগমন হয় উত্তর-পূর্ব্ব হইতে; দ্রাবিড়েরা আসে উত্তর-পশ্চিম হইতে। দ্রাবিড়েরা সম্ভবতঃ অস্ট্রিকদের ভারতে আগমনের পরে আসিয়াছিল; তবে এ সম্বন্ধে কিছুই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। এমনও হইতে পারে যে, একই সময়ে ভারতবর্ষে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের আগমন হয়। দ্রাবিড়দের সম্পৃক্ত জাতিরাই ইরান, ইরাক, এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি পশ্চিম-এশিয়ার দেশে বাস করিত, এইরূপ অনুমান হয়। আবার অস্ট্রিকদেরও প্রসার ভারতের পশ্চিমে ঘটিয়া থাকিতে পারে। দ্রাবিড়েরা

অস্ট্রিকদের অপেক্ষা সভ্য ও সঙ্ঘশক্তিতে পূর্ণ ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহাদের সভ্যতা ছিল নগরকে অবলম্বন করিয়া, অস্ট্রিকদের মত কেবল আদিম বা গ্রামীণ সভ্যতা নহে। মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার বিরাট নগরগুলি আদিম দ্রাবিড়দেরই কীর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। দ্রাবিড়েরা চাষ করিত,—বোধ হয় যব ও গম ইহারাই বাহির হইতে ভারতে আনে; এবং ইহারা গোপালনও করিত। শিব ও উমা, বিষ্ণু ও শ্রী, প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দেরই দেবতা বলিয়া অনুমিতি হয়; যোগসাধন পদ্ধতি ইহাদেরই আধ্যাত্মিক সাধনার পথ ছিল। অস্ট্রিকেরা সংখ্যাবহুল অথবা প্রবল ছিল উত্তর-পূর্ব্বে ও কতকটা গঙ্গার উপত্যকায়; দ্রাবিড়েরা বোধ হয় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেই বেশী করিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আদিম দ্রাবিড় জাতির চরিত্র কি প্রকারের ছিল, তাহা পরবর্ত্তী যুগের দ্রাবিড় সাহিত্য ও দ্রাবিড় জাতি হইতে কতকটা অনুমান করা যায়। ইহারা কর্ম্মঠ ও কৃতকর্ম্মা অথচ ভাবপ্রবণ, mystic বা রহস্যবাদী, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস-যুক্ত, শিল্পী, ও সঙ্ঘশক্তিযুক্ত জাতি ছিল। ভারতের সর্ব্বত্রই দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের মধ্যে অল্পবিস্তর মিশ্রণ হইয়াছিল। এখন যেমন ছোট-নাগপুরে দ্রাবিড় জাতীয় ওরাঁও ও অস্ট্রিক-জাতীয় মুণ্ডাদের পাশাপাশি অবস্থান করিতে দেখা যায়, বোধহয় প্রাচীন কালে উত্তর-ভারতে ও বাঙ্গালায় বহু অংশেই সেইরূপ ছিল। দ্রাবিড়ীয় লোকেরা ও অস্ট্রিক লোকেরা পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। মনে হয়, গঙ্গার উপত্যকায় এই দুই জাতির ও সভ্যতার বিশেষ মিশ্রণ হয়। তবে পশ্চিম-ভারতে ও দক্ষিণাপথে এবং তামিল দেশে দ্রাবিড়েরা বহুকাল ধরিয়া নিজেদের সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত অবিকৃত রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক নামে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক কথার সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতের আর্য্যভাষায় —কি সংস্কৃতে, কি প্রাকৃতে, কি আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিতে— একটি লক্ষণীয় দ্রাবিড়ী ও অস্ট্রিক উপাদান বিদ্যমান; আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিতে দ্রাবিড়ী ও অস্ট্রিক ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট। বাঙ্গালায় ও অন্য আর্য্যভাষায় এমন সব রীতি আছে যাহা বৈদিক ও অন্য আর্য্য ভাষায় মিলে না—অথচ সেরূপ রীতি দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষায় আছে। এই সমস্ত বিষয় অল্প বিস্তর অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। এগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আর্য্যভাষা উত্তর-ভারতে ও বাঙ্গালায় প্রসৃত হইবার বা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, দেশে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষায় প্রচলন ছিল; অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরা নিজ নিজ ভাষার কথা দিয়াই দেশের নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত ও গ্রামের নামকরণ করিয়াছিল, সেই সকল নামকে কোথাও ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া উত্তর কালে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা সেই সকল নাম বিকৃত হইয়া অর্থহীন নামরূপে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। (যথা—অনার্য্য ভোট-ব্রহ্ম ভাষায় 'দিস্তাং' হইতে 'তিস্তা' ও 'ত্রিস্রোতাঃ', কোলভাষার 'কবদাক্' হইতে 'কপোতাক্ষ', 'দামুদাক্' হইতে 'দামোদর'; বিকৃত অনার্য্য নাম—যথা প্রাচীন বাঙ্গলার 'আউহাগড্ডি', 'দিজমক্কাজোলী', 'বহড' বা 'বখট', 'বাল্লহিট্টা','মোডালন্দী' ইত্যাদি—আধুনিক বাঙ্গালায় 'বালুটে, মুড়ুন্দী, বগুড়া, চুঁচুড়া, পাবনা, বগুড়া', ইত্যাদি।) এখন হইতে আড়াই হাজার বছর আগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরাই বাঙ্গালা দেশে বাস করিত, সারা বাঙ্গালা দেশ জুড়িয়া তাহারা ছিল; দেশে তখন আর্য্য ভাষা স্থাপিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

* * *

নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়; ইহাদের পরে আসিল আর্য্য, এবং তৎপরে ভোট-চীন। ভোট-চীন জাতির শাখা—ভোট-ব্রহ্ম, শ্যাম-চীন, ও অন্যান্য। ইহাদের আদি পিতৃভূমি ছিল Yang-tszo-kiang য়াং-ৎসে-কিয়ং নদীর উৎপত্তি-স্থলে; ইহারা খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি ভারতের দিকে আসে, এবং হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভোট বা তিব্বত হইতে ইহাদের কতকগুলি দল ভারতে প্রবেশ করে; আবার ইহাদের অন্য কতকগুলি দল (বড় বা মেচ শাখা) আসাম ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা দিয়া উত্তর- ও পূর্ব্ব-বঙ্গে উপনিবিষ্ট হয়। কোন্ সময়ে ইহাদের বঙ্গদেশে আগমন হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে খ্রীষ্টীয় নবম শতকে যে ইহাদের 'কম্বোজ' (অর্থাৎ 'কোঁচ') নামক একটী শাখা উত্তর-বঙ্গে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। মনে হয়, ইহারা

বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমানায় এখন হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। তখন বাঙ্গালা দেশের মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা উত্তর-ভারতের আর্য্য ভাষা ও আর্য্য বা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ ভোট-চীন জাতির যে লোকেরা ভারতে আসিয়াছিল, তাহারা, অনুমান হয়, প্রকৃতিতে প্রফুল্লচিত্ত, কর্ম্মঠ, শ্রমী, ও কল্পনাবিহীন ছিল; তাহাদের কোনও বড় সংস্কৃতি ভারতে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা বাঙ্গালা দেশের অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য্য সভ্যতা মানিয়া লইয়া, উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বাঙ্গালী জনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে—এবং এখনও হইতেছে। সংস্কৃতির দিক হইতে, বাঙ্গালী সংস্কৃতির গঠনে ভোট-চীন জাতির দান নগণ্য বলিয়াই মনে হয়।

* * *

উত্তর-ভারতে নেগ্রিটো অবলুপ্ত; অস্ট্রিক, মিশ্র অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো, দ্রাবিড়, মিশ্র দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক, মিশ্র নেগ্রিটো ও দ্রাবিড় এবং মিশ্র অস্ট্রিক-নেগ্রিটো-দ্রাবিড় বিভিন্ন জাতি যখন উত্তর-ভারতের অনার্য্য জাতিরূপে নিজ মিশ্র ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি লইয়া বাস করিতেছে, যখন দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, এবং দেশে কোনও ঐক্য-বিধায়িনী কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিও ছিল না;—এমন সময়ে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্ম্মী, অপূর্ব্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলা-সম্পন্ন, সুদৃঢ়রূপে সঙ্ঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত, বাস্তব সভ্যতায় কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ অথচ নূতন বস্তু উপযোগী হইলে গ্রহণ করিতে সদা-চেষ্টিত, এমন আর্য্য জাতি ভারতে দেখা দিল। আর্য্যেরা আসিয়া, খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক-ধর্ম্ম-রাজ্য পাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল। আর্য্যদের আগমন কখন ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। একটা মত এই যে, ইউরোপের কোনও স্থানে আর্য্যদের আদি পিতৃভূমি ছিল; সেখান হইতে তাহারা (হয় মাসিডন ও থ্রেসিয়া এবং কৃষ্ণ-সাগরের দক্ষিণে এশিয়া-মাইনরের উত্তর ভাগ হইয়া, না-হয় কৃষ্ণ-সাগরের উত্তরে দক্ষিণ-রুষ হইয়া, ককেসস্ পর্ব্বত পার হইয়া) প্রথমটায় মেসোপোতামিয়ায় আসে। সেখানে বাবিল ও আসিরীয় জাতি ও অন্যান্য সুসভ্য জাতির সহিত সংস্পর্শে আসে; পরে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০র দিকে ইহাদের কতক গুলি দল পূর্ব্বে পারস্য দেশে ও ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়। ভারতবর্ষের তাহারা বৈদিক ধর্ম্ম ও দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র বা সূক্ত লইয়া আসিল; তাহারা আনিল তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি; সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আসিরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্য সভ্য জাতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

* * *

ভারতবর্ষের সুসভ্য অর্দ্ধসভ্য ও অসভ্য সব রকমের অনার্য্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্য্যদের প্রথম সংস্পর্শ হয়তো বিরোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু অনার্য্য-ভারতে আর্য্যদের উপনিবেশ হইবার পর হইতেই উভয় শ্রেণীর মানুষ—অনার্য্য ও আর্য্য—পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িতে থাকে। আর্য্যেরা বিদেশ হইতে আগত এবং পার্থিব সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চে ছিল না। আর্য্যদের ভাষা আসিয়া দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া দিল; উত্তর-ভারতের কোল ও দ্রাবিড় অনার্য্যদের মধ্যে ঐক্য-বিধায়ক ভাষার অভাব ছিল, আর্য্যজাতির বিজেতৃ-মর্য্যাদা লইয়া আর্য্যভাষা সে অভাব পূর্ণ করিল। ক্রমে ক্রমে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত এক হাজার বৎসরের মধ্যে গান্ধার হইতে বিদেহ ও চম্পা অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারতে আর্য্য ভাষার জয়জয়কার হইল; আর্য্য ও অনার্য্য—দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক—মিশিয়া, উত্তর-ভারতের (অর্থাৎ পাঞ্জাবের ও বিহার পর্য্যন্ত গাঙ্গ উপত্যকার) হিন্দুজাতিতে পরিণত হইল। আর্য্যের ভাষা ও আর্য্যের ধর্ম্ম—বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—অনার্য্যেরা শিরোধার্য্য করিয়া লইল, অনার্য্যেরা আর্য্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মানিল। কিন্তু অনার্য্যের ধর্ম্ম মরিল না, অনার্য্যের ইতিহাস পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্য্যের ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে, পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগ-চর্য্যায়, তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে, আর্য্যদের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য্য ও অনার্য্য, এই টানা ও পড়িয়ান মিলাইয়া হিন্দু সভ্যতার বস্ত্র বয়ন করা হইল।

* * *

উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরের আর্য্যসভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতায় আর্য্য অপেক্ষা অনার্য্যের দানই

অনেক বেশী—কেবল আর্য্যদের ভাষা ইহার বাহন হইল। আর্য্য ও অনার্য্যের রক্তের মিশ্রণ পাঞ্জাবে আর্য্যদের আগমনের সময় হইতেই হইতেছিল; গঙ্গাতীরে ইহা আরও অধিক পরিমাণে হইল। কোথাও বা জাতিকে-জাতি দ্বিজত্বের অর্থাৎ আর্য্যত্বের দাবী করিয়া বসিল, এবং বহুস্থলে ক্রমে ক্রমে সে দাবী স্বীকৃতও হইল। বাঙ্গালা দেশে আর্য্যভাষা লইয়া যখন উত্তর-ভারতের—বিহার ও হিন্দুস্থানের—লোকেরা দেখা দিল, যখন উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য জাতির সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ বাঙ্গালা দেশে আসিল, তখন উত্তর-ভারতে মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও এক জাতি হইয়া গিয়াছে। রক্তের বিশুদ্ধি বোধ হয় তখন আর কোনও আর্য্যবংশীয়ের ছিল না।

মৌর্য্যরাজগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে আর্য্যভাষার ও আনুষঙ্গিক উত্তর-ভারতের গাঙ্গ উপত্যকার সভ্যতার বিস্তার ঘটে নাই বলিয়া অনুমান হয়। মৌর্য্য-বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া গুপ্ত রাজবংশের রাজত্ব পর্য্যন্ত—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ৫০০ পর্য্যন্ত, এই আটশত বৎসর ধরিয়া, ভাষায় বাঙ্গালা দেশের আর্য্যীকরণ চলিতেছিল; এই আট শ' বছর ধরিয়া বাঙ্গালার অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী জনগণ নিজ অনার্য্য ভাষাসমূহ ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে আর্য্যভাষা—মগধের প্রাকৃত—গ্রহণ করে; উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সভ্যতা ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য—অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত উত্তর ভারতের আর্য্য ও অনার্য্যের ইতিহাস ও পুরাণ – বঙ্গদেশের অধিবাসীরাও গ্রহণ করিল; বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসিল, তাহাও বাঙ্গালায় গৃহীত হইল।

এইরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র-আর্য্য – এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল। উত্তর-ভারতের গাঙ্গ সভ্যতাই যেন এই নব-সৃষ্ট আর্য্যভাষী বাঙ্গালী জাতির জন্ম-নীড় হইল। রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী মুখ্যতঃ অনার্য্য ছিল। যেটুক আর্য্য রক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আসিয়াছিল, সেটুক আবার উত্তর-ভারতেই অনার্য্য-মিশ্র হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আর্য্য ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয় পরিপাটী, যাহাকে ইংরাজীতে discipline বলে, তাহা পাইল; বাঙ্গালীর অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য্য মনের ছাপ পড়িল। ইহা তাহার পক্ষে মঙ্গলের কারণই হইল। আর্য্যমনের—ব্রাহ্মণ্যের—এই ছাপটুকু আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।

* * *

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে যখন চীনা পরিব্রাজক Hiuen Tsang হিউএন্ ৎসাঙ বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় যে তখন সমস্ত বাঙ্গালা দেশ আর্য্যভাষী হইয়া গিয়াছিল। তারপরে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বরেন্দ্রভূমিতে পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, নব-সৃষ্ট বাঙ্গালী জাতি নবীন এক গৌরবময় জীবনে প্রবেশলাভ করিল। প্রথমটায় বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতেরই চর্চায় তৎপর হইলেন। তারপরে তাঁহারা দেশভাষার দিকে দৃষ্টি দিলেন। পালরাজগণের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দুই শতকের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষা, মাগধী-প্রাকৃত ও বঙ্গদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে একটু বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, একটী স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগ হইতে বৌদ্ধ গুরুদের হাতে এই স্বতন্ত্র ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন-বাঙ্গালায়, সাহিত্য-সৃষ্টি—গান রচনা—হইতে লাগিল।

* * *

আমাদের বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসের কাঠামো বা মূলকথা এইরূপ বলিয়াই আমার ধারণা। আর্য্যভাষী বাঙ্গালী জাতির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যখন বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়, তখন কেহ বাঙ্গালীর নিজস্ব অনার্য্য-সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই; তখন যে ছাঁচে বাঙ্গালীর মন বাঙ্গালীর সমাজ বাঙ্গালীর ঐতিহ্য রীতিনীতি শিল্প সাহিত্য সবই ঢালা হইয়াছিল, তাহা ছিল উত্তর-ভারতের বা নিখিল-ভারতের সর্ব্বজয়ী হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন) মন, ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন সমাজ, ঐতিহ্য, রীতিনীতি শিল্প ও সাহিত্য। যে ছাঁচে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতিকে ঢালা হইল, মোটের উপর সেই ছাঁচ এখনও বাঙ্গালী সমাজে বিদ্যমান। উপস্থিত কালে অর্থনৈতিক ও মানসিক নানা বিপর্য্যয় ও যুগান্তরের আগমনে আমরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আবার এক নূতন ছাঁচে ঢালিতে যাইতেছি।

পালযুগে নূতন-সৃষ্ট বাঙ্গালী জাতির মনের সুর, তাহার আর্য্যভাষার তারকে অবলম্বন করিয়া, উত্তর-ভারতের মনের সঙ্গে যে ভাবে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, মোটের উপরে সে সুরটী এখনও প্রবল ভাবে বিদ্যমান। এই একই সুরে নানান ঝঙ্কার শুনা গিয়াছে; কখন বৌদ্ধ, কখন ব্রাহ্মণ্য; ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে কখনও বৈদিক, (বৈদিকের ঝঙ্কার বাঙ্গালা দেশের সুরে চিরকালই অতি ক্ষীণ ভাবেই শুনা গিয়াছে), কখনও শৈব, কখনও শাক্ত, কখনও বৈষ্ণব; এবং কখনও মুসলমান সূফী। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তন্ত্রও এই ঝঙ্কারের অন্যতম।

* * *

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল। তারপর তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়ের ঝড় বহিয়া গেল, মনে হইল, বুঝি সে ঝড়ের মুখে বঙ্গ-বীণার বাঁধা তার ছিঁড়িয়া যাইবে,—প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী জাতীয়তার সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তখন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রান্তিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তার বোধ হয় নাই—তখনকার দিনের বাঙ্গালীর সাহিত্যিক গৌরব ছিল না, বাঙ্গালী নিজেকে এক অখণ্ড ভারতেরই প্রদেশবাসী বলিয়া মনে করিত। যে ঝড় কাবুল হইতে বিহার পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্থানে বহিয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালী তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। তাহাকে বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। কিন্তু এই বৈতসী বৃত্তির মধ্যেই তার জীবনী শক্তি অটুট রহিল। মুষ্টিমেয় তুর্কী বিজেতা ও তাহাদের পারসীক, পাঠান ও পাঞ্জাবী-মুসলমান অনুচর যাহারা বাঙ্গালায় রহিয়া গেল, তাহারা বাঙ্গালার হিন্দুর সাহায্যেই বাঙ্গালায় দিল্লী হইতে স্বাধীন এক মুসলমান-শাসিত রাজ্য স্থাপন করিল। তুর্কী বিজেতৃগণ দুই চারি পুরুষের মধ্যেই বাঙ্গালী বনিয়া গেল। তখনও উর্দু ভাষার উদ্ভব হয় নাই। উত্তর ভারতের সঙ্গে তুর্কী-বিজয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালার যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সে যোগ তুর্কী-বিজয়ের পরে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী মুসলমানদের বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত, তাহাদের সন্তানেরা ভাষায় বাঙ্গালীই হইত।

প্রথম সঙ্ঘাতের পরে, বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট মুসলমান ও বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে একটী সংস্কৃতি-বিষয়ক সহযোগিতা আরম্ভ হইল। মুসলমান সূফী দরবেশ ফকীর ও গাজী ধর্ম্ম প্রচারের জন্য উত্তর-ভারত হইতে এবং ক্বচিৎ ভারতের বাহির হইতেও বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্ম্মোন্মত্ততার ফলে হিন্দুদের বল-পূর্ব্বক কিছু কিছু মুসলমান করিয়া দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে; তবে পীর ফকীর দরবেশ আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্যের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালা দেশে যে মতের ইস্‌লাম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটী শরিয়তী অর্থাৎ কোরানানুসারী ইসলাম নহে; শরীয়তী মত অন্য কোনও ধর্ম্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে। বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সূফী মতই বেশী প্রসার লাভ করে। সূফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ হয় নাই। সূফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল; মধ্য-যুগে তুর্কী-বিজয়ের পর হইতে, যে ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ-গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত মুসলমান ধর্ম্ম বাস্তবিকই "মজমূ'আ অল্-বহ্‌রৈন্" অর্থাৎ দুইটী সাগরের সম্মিলন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার ছাত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত মোহম্মদ এনামুল্‌হক্ বাঙ্গালায় সূফী মতবাদের প্রচার বিষয়ক যে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির একটা প্রধান দিকের ইতিহাসের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত দেখিতে পাইব।

* * *

তুর্কী-বিজয়ের পরে যেমন একদিকে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার চলিতে লাগিল, তেমন অন্যদিকে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ-নেতৃগণ ঘর সামলাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। দেশে যখন ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ মতাবলম্বী হিন্দু রাজা ছিলেন, ভারতের বাহিরের দেশের বা ধর্ম্ম গুরুর প্রতি তাকাইয়া থাকে এমন বিদেশীয় ধর্ম্ম যখন দেশে ছিল না, তখন দেশের জনসাধারণের প্রতি শিক্ষিত বা অভিজাত সমাজের দৃষ্টি ততটা আকর্ষিত হয় নাই। অশিক্ষিত জনসাধারণ চিরাচরিত রীতি অনুসারে গ্রাম্য ধর্ম্ম পালন করিত, উচ্চবর্ণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নানা পূজা যজ্ঞ

অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিত; তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-পিপাসা জাগাইবার জন্য যোগী, সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু ছিল; তাহারা নিজেরাও পর্ব্বদিবস পালন করিত, সমাজের মন্থর গতির সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া তাহারাও মোটামুটী ভাবে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটী ধারণা করিত। কিন্তু মুসলমান প্রচারক আসিলেন, তাঁহার পিছনে মুসলমান রাজার প্রচণ্ড শক্তি; মুসলমানের ধর্ম্ম সহজ-বোধ্য, তাহাতে হিন্দু অর্থাৎ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মত intellectualism বা আধিমানসিকতা নাই বলিয়াই তাহা সাধারণ মানবের পক্ষে আপাত-গ্রহণীয় ছিল। অবস্থা দেখিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দু সজাগ হইলেন। তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানের যুগ, বৌদ্ধধর্ম্ম তখন তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জমান। তুর্কীদের আগমন ও মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, এবং ভারতে বিশেষ করিয়া বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাণ-লাভ—এই দুইটী কাকতালীয় ন্যায়ে হইয়াছিল; জীবনীশক্তিতে হীন বৌদ্ধ ধর্ম্ম, নব শক্তিতে জাগ্রত পুরাণ ও তন্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিকট পরাভূত হইতেছিল;—ব্রাহ্মণ ও তাঁহার অনুগামীর দল নব উৎসাহে তখন বেদ উপনিষদ পুরাণ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট নব হিন্দু ধর্ম্মকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। সমাজে তখন ব্রাহ্মণই প্রধানতম চিন্তানেতা; বৈদ্য ও কায়স্থও এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া। বাঙ্গালার ক্ষাত্রশক্তি তখন কায়স্থের মধ্যে, বৈদ্য এখনকার মত তখনও বিদ্যাবৃত্ত। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসর্ব্বস্ব, এবং বিদ্যার বলে ও বুদ্ধির বলে রাজসেবা কার্য্যেও নিযুক্ত। দেশের মধ্যে বাঙ্গালা প্রভৃতি লোকভাষা তখন সাহিত্যের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। অবস্থা বুঝিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দু শাস্ত্রকে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তুর্কী-বিজয়ের পরে কেরামত জাহির করেন এমন পীর ও আউলিয়াদের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারের ফলে উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র লোক-ভাষায় হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারের একটা সাড়া পড়িয়া গেল। হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে নিবদ্ধ আমাদের সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণা এই খানেই—রাজশক্তিতে শক্তিশালী, সহজ-বোধ্যতায় প্রবল মুসলমান ধর্ম্মের সমক্ষে, জনসাধারণের নিকটে হিন্দু-সাহিত্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও ইতিহাস, তথা গভীর অধ্যাত্ম-চর্য্যার অনুভূতি, এবং প্রাচীন উপাখ্যানাবলীর অন্তর্নিহিত রোমান্স ও গভীরতা—এগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া দিবার ইচ্ছাতেই; কৌতুহলী মুসলমান রাজাদের কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য এই সাহিত্যের সৃষ্টি বা আরম্ভ হয় নাই।

*   *   *

এইরূপে ভাষায় প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের ফলে বাঙ্গালা দেশে যাহা ঘটিল, তাহা বাঙ্গালী জাতির উত্তরকালের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিস্ফুট। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংস্কৃতে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ, শারদাতিলক তন্ত্র প্রভৃতি পড়িতেন—চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেকার কালে বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা এই-সব সংস্কৃত বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় সংগৃহীত হইয়া আছে। এই প্রকারের ইতিহাস ও পুরাণ-গ্রন্থ ভাষায় অনূদিত হইতে লাগিল। জন-সাধারণে ইহার স্বাদ পাইল। কথকতা—ভারত-পুরাণ পাঠ—সংস্কৃতি-প্রচার বিষয়ে দেশের এক প্রাচীন পদ্ধতি ছিল। বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় পুরাণ কথা, যেগুলি সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া ভারতের অন্যত্র সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইতে পারে নাই, সেগুলিও নবীন 'মঙ্গল-কাব্য' আকারে বহুল প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সব স্থানীয় পুরাণ মধ্যে বৌদ্ধ পুরাণও বাদ পড়িল না; এই ভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শিবায়ন ও অন্য পুরাণের আখ্যায়িকার পাশে, লখিন্দর-বেহুলা কালকেতু-ফুল্লরা ধনপতি-খুল্লনার কথা এবং লাউসেন ও গোপীচাঁদের কথাও পুনঃ-প্রচারিত হইল। প্রাচীন কথা ও লোক-গাথা মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে সাহিত্যিক রূপ পাইল। সমাজের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সংরক্ষক ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার নূতন করিয়া জ্ঞানবল সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হইল। স্বদেশে সংস্কৃত বিদ্যা মৃত-প্রায়; সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা হয় নালন্দার বিহারের মত অন্যান্য বিহারের ধ্বংসের কালে তুর্কীর ভল্ল ও তরবারীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন, না-হয় পুঁথি-পত্র লইয়া তাঁহারা নেপালে পালাইয়া গিয়া প্রাণ ও বিদ্যা উভয় রক্ষা করিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গে তুর্কীর আগমনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পলায়ন করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গে নদ নদী খাল বিলের দ্বারা সুরক্ষিত জনপদে আত্মরক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের বিদ্যা আর দেশের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া কার্য্যকর হইল না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবটু বিদেশ হইতে সংস্কৃত জ্ঞানকে আবাহন করিয়া আনিবার জন্য বাহির হইলেন। মিথিলা তখন কেমন করিয়া তুর্কের অধীন হয় নাই। হিন্দুরাজা ছিল বলিয়া, তুর্কী-বিজয়ের পরে ধ্বংসের

শতকেও মিথিলার সংস্কৃত বিদ্যার কেন্দ্রগুলি জীবিত ছিল—বাঙ্গালীর ছেলেরা সেখানে বিশেষ করিয়া ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতি পড়িতে যাইত। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথ শিরোমণি ও পক্ষধর মিশ্রের কথা আমরা সকলেই জানি। মিথিলায় যে সব ছেলে পড়িতে যাইত, তাহারা কেবল যে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িত তাহা নহে। মিথিলার দেশভাষা মৈথিলে ঐ প্রদেশের পণ্ডিতেরা সুন্দর সুন্দর গান বাঁধিতেন। কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর (ইঁহার জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ) মৈথিল কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ বাঙ্গালী ছাত্রদের দ্বারা বাঙ্গালা দেশে আনীত হয়, এবং সেই সকল পদের অপূর্ব্ব কবিত্বে মোহিত হইয়া বাঙ্গালা দেশে সেগুলির বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনুকরণও আরম্ভ হয়। বিদ্যাপতির পদের মৈথিল ভাষা বাঙ্গালীর মুখে অবিকৃত থাকিতে পারিল না; এবং বাঙ্গালীর হাতে বিদ্যাপতির পদের নকলে, মৈথিল ভাষাও ঠিক থাকিল না। বিদ্যাপতির পদের ভাষা বিকৃত হইল, আবার বাঙ্গালা ও মৈথিল এই দুই ভাষা মিলিয়া মৈথিলের নকলে এক কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষার সৃষ্টি করিল, যাহার নাম হইল "ব্রজবুলি"। বাঙ্গালা গীতিসাহিত্যের অনেকখানি অংশ এই ব্রজবুলীকে লইয়া।

* * *

এই ভাবে বাঙ্গালার পণ্ডিতদের হাতে দুই দিকে কাজ চলিল; বাঙ্গালার সংস্কৃতির দুইটী দিক্ ইঁহারা পুষ্ট করিতে লাগিলেন—সংস্কৃত বিদ্যা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালার মস্তিষ্ক খেলিতে লাগিল; এবং বাঙ্গালা কাব্য ও কবিতা, যাহাতে বাঙ্গালার হৃদয়ের প্রকাশ হইল। এই দুই দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবই ছিল মূল প্রেরণা; বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনে যে ডাক ও খনার বচন ছিল, বাঙ্গালার ব্রত-কথায় যে কবিতা ও আখ্যায়িকা ছিল, তাহা প্রাচীন মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি মাত্র। যখন সমস্ত উত্তর-ভারতময় তুর্কী-বিজয়ের দেড়শত দুইশত বৎসর মধ্যে মুসলমান ভাব-জগতের প্রতাপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের জীবনে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন সহজবোধ্য ভক্তিমার্গ পুনরায় প্রকটিত হইল, "নাম-ধর্ম্ম" প্রসারলাভ করিল। নামধর্ম্মের নানা সাধক দেখা দিলেন; রামানন্দ, কবীর প্রমুখ উত্তর-ভারতের সন্ত-মার্গী সাধুগণ; বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্যদেব; এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তৎশিষ্য ও অনুশিষ্য শিখগুরুগণ।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনেকটা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যকেই আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নূতন ধারা সৃষ্ট বা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যার মর্য্যাদা তাঁহার হাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই; বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ, এবং শ্রীচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের গুরুপরম্পরা সংস্কৃত ভাষায় যে দার্শনিক বিচার প্রকট করিলেন, যে রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, যে মূল গ্রন্থ, টীকা ও কাব্যাদি রচনা করিলেন, তাহা বিদ্যা ও বুদ্ধির দিক হইতে বাঙ্গালী সংস্কৃতির অপূর্ব্ব সৃষ্টি; বাঙ্গালী বুদ্ধির প্রকাশ যেমন নব্য ন্যায়ের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের এবং কুল্লুকভট্ট মধুসূদন সরস্বতী আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ টীকাকার ও সংকলয়িতাদের মেধায় দেখা যায়, তেমনি ইহা শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্য্যদের পাণ্ডিত্যেও দেখা যায়। আবার বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙ্গালীর হৃদয়ের, তাহার রসানুভূতির যে পরিচয় পাই, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই অনুপ্রাণনার ফল। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার জন-সঙ্গীত, কীর্ত্তন গানে যে মহনীয় এবং অতি বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিল, বাঙ্গালার সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ সেই কীর্ত্তন গানও সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদ। ঘরমুখো বাঙ্গালী ঘর ছাড়িয়া নূতন উদ্যমে পুরী গয়া কাশী বৃন্দাবনে গেল, জয়পুরে গেল, ও আরও পশ্চিমে গেল—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল;—এখানেও চৈতন্যদেবের জীবনীর প্রভাব দেখি।

* * *

বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করিয়া পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালাদেশ বোধ হয় আদিম অস্ট্রিক জাতি হইতে প্রাপ্ত রিক্‌থকেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রাম এবং নগর উভয়কেই আশ্রয় করিয়া সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল; গ্রামের দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্ম্মপ্রাণ সভ্যতা। ইউরোপে সভ্যতা অর্থে Civilisation—যাহা cives বা নগরকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, নাগরিকতার ভাব; ইউরোপের polis বা নগর হইতে Politics এর উৎপত্তি। আরবদের মধ্যেও 'মদীনা'

বা নগরের জীবন যাত্রাই 'তমদ্দুন' বা সভ্যতা। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কখনও নগরের প্রাধান্য ছিল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিল্প-সম্ভারপূর্ণ, বিরাট মন্দির ও অন্য গৃহে পূর্ণ, বড় বড় নগর প্রাচীনকাল হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়; যেমন প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা; প্রাচীন-কালের মথুরা, কাশী, পাটলিপুত্র, তক্ষশিলা, সাকেত, গোনন্দ, উজ্জয়িনী, প্রতিষ্ঠান, ধান্যকটক (অমরাবতী), মহাবলিপুর, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি, যে সব নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাই; মধ্যযুগের দিল্লী, আগরা, লাহোর, মদুরা, পুণা, মাণ্ডু প্রভৃতি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নগরাদির ধ্বংসাবশেষ যেরূপ পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সেরূপ পাওয়া যায় নাই; কাশী, মদুরা, পুণা, উজ্জয়িনী, লাহোর প্রভৃতির সহিত এক সঙ্গে নাম করা যায় এমন নগর বাঙ্গালা দেশে বেশী গড়িয়া উঠে নাই—বাঙ্গালা দেশের নাগরিক জীবন মুখ্যতঃ গ্রামীণ জীবনেরই একটী বিস্তৃত সংস্করণ ছিল। বাঙ্গালার নগরের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি দুই একটী মাত্র নাম করা যায়। বাঙ্গালাদেশ ভারতের জীবনের স্রোতের এক পাশে একটু যেন বিচ্ছিন্ন ভাবেই বরাবর ছিল। শিল্পনগরী-রূপে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পশ্চিম বঙ্গে বিষ্ণুপুর বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের হঠাৎ বড় হইয়া উঠার দুইটী কারণ: (১) উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্ব কূলের সহিত উত্তর-ভারতের যোগ-বিধায়ক পথের উপরেই বিষ্ণুপুর অবস্থিত ছিল; সেই জন্য উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে তীর্থযাত্রা ও অন্য উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা যাতায়াত করিত, তাহাদের মারফৎ বাহিরের জগতের সহিত বিষ্ণুপুরের সংযোগ সহজ হইয়াছিল; (২) বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালাদেশের মস্তিষ্ক ও হৃদয় স্থানীয় নবদ্বীপ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ষোড়শ শতকের শেষভাগে এবং সমগ্র সপ্তদশ শতক ধরিয়া কতকগুলি বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কর্ম্মী বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়া-ছিলেন, বাঙ্গালার বাহিরেও কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার কারণ যেমন একদিকে ছিল শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষা, অন্য দিকে ছিল বাঙ্গালাদেশ স্বাধীন মুসলমান নরপতির হাত হইতে মুক্ত হইয়া মোগল সম্রাটের অধীনস্থ হওয়া। স্বাধীন মুসলমান রাজাদের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের এক কোণে পড়িয়া ছিল, এবং রুদ্ধবারি জলাশয়ের মত অবস্থায় ছিল; বাহিরের জগতের সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগ ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বাঙ্গালার পক্ষে আংশিক ভাবে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভব হইল। দিল্লী-আগরার কেন্দ্রীভূত শাসন বাঙ্গালার পক্ষে হিতকর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা বাঙ্গালার বাহিরে আদর পাইল—বাঙ্গালার বিদ্যাধর পণ্ডিত জয়পুর নগর স্থাপন কালে সাহায্য করিলেন (১৭২৮ খৃষ্টাব্দ), বাঙ্গালার পণ্ডিত ও গোস্বামীরা উত্তর ভারতের ধর্ম্মজীবনে অংশগ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালার মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করাচার্য্যের মতকে ভারতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিলেন, দিল্লী-আগরা জয়পুর-চিতোর হইতে পারস্য তুরুষ্ক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র রাজদরবারে বাঙ্গালার ঢাকাই মলমলের চাহিদা বাড়িয়া গেল, বাঙ্গালার বাঁশে তৈয়ারী কুঁড়ে ঘরের বাঁকা খাঁচা, 'বেঙ্গলী' নামে রাজপুত-মোগল বাস্তুবিদ্যায় স্থান পাইল। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, হিন্দুযুগের অবসানের পরে, বাঙ্গালী প্রথম গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডী কাটাইয়া নিখিল ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড় সুযোগ পাইল। সপ্তদশ শতকে উত্তর-ভারতের লোক ভাষা ('হিন্দী') হইতে বাঙ্গালায় দুইখানি বই অনূদিত হইল—নাভাজী দাসের 'ভক্তমাল' এবং মালক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবত'।

দিল্লী-আগরা এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে যে যোগ নূতন করিয়া মোগল-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল, সে যোগ আর বিলুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এই যোগকে একটা বড় স্থান দিতে হয়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—জনৈক "অর্থনীতির ছাত্র"

[বর্ত্তমান সংখ্যায় আমাদের মূল বক্তব্য যে "বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম" সম্বন্ধীয় আলোচনা লইয়া আরম্ভ হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বসংখ্যায় বলিয়াছি।

পূর্ব্ব দুই সংখ্যায় আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে প্রধান বিষয়গুলির নাম—

১। যাবতীয় সমস্যা পূরণের নিয়ম,
২। কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায়।

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা কি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে সমস্যাপূরণের সঠিক উপায় স্থির করা সম্ভব নহে। কাযেই,"ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা কি" তাহার নিরূপণ করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। সমস্ত দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায় কি তাহা স্থির করিয়া না লইলে, "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা কি" তাহা যথাযথ ভাবে নিদ্ধারিত হয় না। এইজন্য আমরা কি করিয়া সমস্ত দেশের সমস্ত জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিতে হয় তাহার আলোচনা করিতেছি।

কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায় সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, "জাতি কাহাকে বলে" এবং "তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি" এবং "দেশ কাহাকে বলে" এবং "তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি" এবং "জাতি সংগঠনের প্রয়োজন ও উপায় কি" তাহা স্থির করিবার প্রয়োজন হয়।

"জাতি বলিতে কি বুঝায়" এবং "তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি" এবং "দেশ বলিতে কি বুঝায়" তাহার আলোচনা আমরা আগে করিয়াছি।

"দেশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি" তাহার আলোচনা এখনও আমাদের করা হয় নাই।

"দেশ বলিতে কি বুঝায়" তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, দেশ বলিতে জমি, জীব ও জলহাওয়ার সমষ্টি বুঝায়। কাযেই, দেশ কি তাহা বিশদরূপে বুঝিতে হইলে, জমি কি, জীব কি ও জলহাওয়া কি, তাহার বিস্তৃত জ্ঞান প্রয়োজন এবং দেশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি, তাহা বুঝিতে হইলে, জমি, জীব ও জলহাওয়ার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কি, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

জমি কি এবং জীব কি তাহা বলিতে বলিতে মানুষ কি, আমরা তাহাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। মানুষের কথায় নীরস ও জটিল দর্শনের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ কি তাহার আলোচনা করিতে বসিয়া আমরা সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত কথাগুলি এতাবৎ বলিয়াছি :—

১। মানুষ বলিতে কি বুঝায়,
২। মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ ও তাহার রূপ,
৩। মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য,
৪। মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা।

মানুষ কখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সে সর্ব্বদাই কোন না কোন কার্য্য করিতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে মানুষের কার্য্যকে মানুষের "খেলা" নাম দিয়াছি। মানুষের খেলার যন্ত্র চারিটি, যথা—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা। মানুষ বলিতে বুঝায় এই চারিটি যন্ত্রের সমষ্টিগত জীব। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কি কি কার্য্য তাহা আমরা "মানুষ বলিতে কি বুঝায়" এই প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এই চারিটি যন্ত্রের বিভিন্ন কার্য্য সঠিক জানা থাকিলে মানুষের কার্য্য (অথবা খেলা) বিশ্লেষণ করিতে পারা যায় এবং তখন কোন্ যন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য অথবা অপকর্ষের জন্য বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কার্য্যে তারতম্য হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের কার্য্যের তারতম্য কেন হয় তাহা আমরা "মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ ও তাহার রূপ" এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

মানুষের কার্য্যগুলিকে কিরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারা যায় তাহার আলোচনা হইয়াছে "মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণী-বিভাগ" প্রসঙ্গে।

মানুষগুলির কার্য্যানুসারে মানুষগুলিকে কিরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারা যায় তাহার আলোচনা হইয়াছে "বিভিন্ন কার্য্যানুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ" প্রসঙ্গে।

"মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ", "মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ", "বিভিন্ন কার্য্যানুসারে মানুষের শ্রেণী-বিভাগ"—এই তিনটি প্রসঙ্গের মূল কেন্দ্র, মানুষের কার্য্যের যন্ত্র (যথা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা) এবং মানুষের কার্য্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের সহিত সূত্র বজায় রাখিবার জন্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমরা আমাদের মূল বক্তব্যের অনুসরণ করিতেছি।]

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম

আমরা আগেই দেখাইয়াছি মানুষের শ্রেণীবিভাগ হয় মানুষের কার্য্যের রকম অনুসারে এবং মানুষের কার্য্যের বিভিন্ন রকম হয় তাহার কার্য্যের বিভিন্ন যন্ত্রানুসারে। মানুষের কার্য্যের যন্ত্রগুলির নাম ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা। বিভিন্ন যন্ত্রগুলি বিভিন্ন রকমের কার্য্য করে।

মানুষ তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই তিনটী যন্ত্রের ব্যবহার করে। এইখানে আমাদের পাঠকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মানুষ যে তাহার প্রত্যেক কার্য্যে তিনটি যন্ত্রের ব্যবহার করে তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ, আমাদের পাঠকগণের স্ব স্ব অনুভূতি। আমরা তাঁহাদিগকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্য কি তাহা বুঝিতে বলি এবং তাঁহাদের দৈনন্দিন প্রতি কার্য্যের কোন্ কার্য্যে কোন্ যন্ত্রের ব্যবহার করিতেছেন তাহা অনুভব করিতে বলি। তাহা হইলে মানুষ যে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যে তিনটী যন্ত্রের ব্যবহার করে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

মানুষের প্রত্যেক কার্য্যেই তিনটী যন্ত্রের ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু কোন কার্য্যেই তিনটী যন্ত্রের সমান ব্যবহার হয় না। কোন কার্য্যের পরিচালক হয়—ইন্দ্রিয়, আবার কোন কার্য্যের পরিচালক হয়—মন, অথবা বুদ্ধি, অথবা আত্মা। যে কার্য্যের পরিচালক ইন্দ্রিয়, তাহার নাম "ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্য"; যে কার্য্যের পরিচালক মন, তাহার নাম "মনঃপ্রধান কার্য্য।" যে মানুষের জীবনে ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্য বেশী, তাহার নাম "ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ", যাহার জীবনে মনঃপ্রধান কার্য্য বেশী, তাহার নাম "মনঃপ্রবণ মানুষ", এবং যাহার জীবনে বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য বেশী, তাহার নাম "বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ"।

আত্মা-যন্ত্রটী যে কার্য্যের পরিচালক, সে কার্য্যের সংখ্যা বড় বিরল। আত্মার পরিচালিত কার্য্যের ফলে জগতের প্রত্যেক বস্তুর মূল নিদান এবং নিদানের নিদান সম্বন্ধীয় তত্ত্ব জানা যায়। সে জানা শুধু কথার কাল্পনিক জানা অথবা কবির সুরের ঝঙ্কার নহে। আত্মা-যন্ত্রের পরিচালনায় সক্ষম মানুষ দুনিয়ায় একজন থাকিলে মানুষে মানুষে ভেদ, বিভিন্নতা ও মারামারি এত উৎকট হয় না; যৌবন এত ক্ষণস্থায়ী এবং জীবনের দৈর্ঘ্য এত অল্প হয় না। বর্ত্তমান জগতের বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বলিতে হয়, আত্মা-যন্ত্রের পরিচালনার সক্ষমতার কথা যেন ভারতীয় ঋষিগণের কল্পনা মাত্র। কাযেই, আমরা আত্মার কার্য্যকে এবং আত্মার কার্য্যে সক্ষম মানুষকে কোন শ্রেণীবদ্ধ করি নাই।

কিন্তু আমাদের একজন চিন্তাশীল পাঠক আমাদের বক্তব্যের অঙ্গহানি হইতেছে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন এবং আমরাও আত্মার কার্য্যের ও আত্মার কার্য্যে সক্ষম মানুষের নামকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি।

যে কার্য্যের পরিচালক আত্মা তাহার নাম "আধ্যাত্মিক" কার্য্য এবং যে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক কার্য্য বেশী, তাহার নাম "আধ্যাত্মিক" মানুষ বলা হইবে।

এই সমস্তই মানুষের কার্য্যের কথা এবং তাহার কার্য্যের যন্ত্রের কথা। এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা আমাদের আগেকার দুই সংখ্যায় করা হইয়াছে।

এখন বলিতে হইবে, "বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণামের কথা।"

মানুষকে যখন তাহার কার্য্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে, তখন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পরিণামের কথা আর তাহার বিভিন্ন কার্য্যের পরিণামের কথা একই জিনিষ।

কার্য্যের কথা বলিতে হইলে, "কার্য্য" ব্যাপারটি কি এবং তাহাতে কি কি লাগে এবং তাহার পরিণতি কোথায় তাহা আগে বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কার্য্যের কথা ধরা যাউক। যথা—

[১] আমি লিখিতেছি—

লেখা আমার "কার্য্য"; হাত, কলম, কাগজ আমার "যন্ত্র"; "মন অথবা বুদ্ধি" আমার যন্ত্রের "পরিচালক", মন অথবা বুদ্ধিতে যাহা আছে তাহার প্রকাশ লেখা-কার্য্যের "বিষয়"; লেখা-কার্য্যের "ফল"—মন এবং বুদ্ধিতে যাহা আছে তাহা প্রকাশিত হইয়া প্রবন্ধের সৃষ্টি এবং মন ও বুদ্ধির শক্তিবৃদ্ধি।

[২] (ইন্দ্রিয়প্রবণ) আমি ছবি দেখিতেছি—

দেখা আমার "কার্য্য", "চক্ষু" আমার কার্য্যের "পরিচালক"; ছবি দেখা-কার্য্যের বিষয়; দেখা-কার্য্যের "ফল"—ছবিতে যাহার মূর্ত্তি, তাহাকে সুন্দর অথবা কুৎসিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া এবং তাহাকে উপভোগ করিবার অথবা বিদ্বেষকর মনে করিবার ইচ্ছা ও চক্ষুর দেখিবার শক্তি অথবা বিশ্লেষণ করিবার শক্তি কমিয়া গিয়া উপভোগ করিবার ইচ্ছার প্রাবল্য।

[৩] সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমি ছবি দেখিতেছি—

দেখা আমার "কার্য্য"; চক্ষু এবং ছবি আমার দেখা কার্য্যের "যন্ত্র"; মন এবং বুদ্ধি আমার যন্ত্রের "পরিচালক"; সৌন্দর্য্য আমার দেখা-কার্য্যের "বিষয়"; দেখা-কার্য্যের ফল—ছবিখানি সুন্দর অথবা কুৎসিত তাহা নির্ণয় করা এবং সৌন্দর্য্যনির্ণয়ে মন, বুদ্ধি ও চক্ষুর শক্তিবৃদ্ধি।

উপরোক্ত তিনটি উদাহরণে দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক কার্য্যে একটি পরিচালক অথবা কর্ত্তা, এবং একটি বিষয় থাকে। পরিচালক তাহার কার্য্যের জন্য কোন যন্ত্রের আশ্রয় লইতে পারে, নাও লইতে পারে। কার্য্যের ফলে বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হয় এবং কার্য্যের পরিচালকের শক্তির তারতম্য ঘটে। কোন কোন কার্য্যের ফলে পরিচালকের শক্তি বাড়িয়া যায় আবার কোন কোন কার্য্যের ফলে শক্তি কমিয়া যায়।

কার্য্যের ফল সর্ব্বদা দ্বিবিধ। যথা—

(১) বিষয় সম্বন্ধীয়,

(২) কর্ত্তা সম্বন্ধীয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম কি কি হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষ কখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমস্ত সময়েই সে কোন না কোন কার্য্য করিতেছে। তাহার কার্য্যের বিরতি কল্পনা মাত্র। মানুষের কার্য্যের যন্ত্রের ব্যবহারানুসারে, মানুষের কার্য্যের রকমের তারতম্য হয় এবং মানুষের কার্য্যের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন রকম বিষয়ের সৃষ্টি এবং মানুষের শক্তির তারতম্য হয়। কার্য্যের ফলে বিষয়ের পরিবর্ত্তন এবং মানুষের শক্তির তারতম্য।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান বুদ্ধির কার্য্যের ফল এবং মানুষের একটি শক্তি।

বিষয়ের পরিবর্ত্তন এবং শক্তির তারতম্যানুসারে মানুষের অবস্থার তারতম্য নির্ণীত হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যের ফলে বিষয়ের পরিবর্ত্তন ও শক্তির তারতম্য ঘটে, তখন কার্য্য ও কার্য্যের ফল পরীক্ষা করিয়া মানুষের অবস্থা নির্ণয় করা শৃঙ্খলাসঙ্গত; অন্যথা শৃঙ্খলাবিরুদ্ধ।

উদাহরণ স্বরূপ একটি বলবান্ মানুষের কথা ধরা যাউক। মানুষ বুদ্ধির বলে বলীয়ান্ হইতে পারে, মনের বলে বলীয়ান্ হইতে পারে এবং ইন্দ্রিয়ের বলেও বলীয়ান্ হইতে পারে। ইন্দ্রিয় আবার দশটি। কেহ দেখার কার্য্যে বলীয়ান্ হইতে পারে, কেহ শোনার কার্য্যে বলীয়ান্ হইতে পারে, ইত্যাদি। কাজেই, শুধু বলবান্ মানুষ বলিলে হয় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা—এই চারিটি যন্ত্রের প্রত্যেক যন্ত্রের কার্য্যে বলবান্, এইরূপ বুঝিতে হয় এবং ঐ মানুষের প্রত্যেক যন্ত্র বলবান্ কিনা, তাহা তাহার প্রত্যেক যন্ত্রের কার্য্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিতে হয়; নতুবা অনুসন্ধান করিতে হয়, মানুষটি তাহার কোন্ যন্ত্রের কার্য্যে বলবান—ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে, না মনের কার্য্যে, না বুদ্ধির কার্য্যে, না আত্মার কার্য্যে এবং সে যে যন্ত্রের কার্য্যে বলবান্

তাহার সেই যন্ত্রের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া সে বলবান্ কিনা তাহা নিরূপণ করিতে হয়। সমগ্রদীভূত কোন কার্য্য পরীক্ষা না করিয়া মানুষকে কোন বিশেষ অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণে আখ্যাত করা শৃঙ্খলাসঙ্গত নহে।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে, কার্য্যের রকমভেদে মানুষের কার্য্যের ফল এবং কার্য্যের ফলানুসারে মানুষের অবস্থা সংঘটিত হয়। আমাদের এই বিচারানুসারে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" এই প্রচলিত বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

কার্য্যের রকম অথবা কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন কারণে মানুষের অবস্থার তারতম্য হইতে পারে ইহা সত্য হইলে, কোন্ শ্রেণীর মানুষের কি পরিণাম হইবে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কাযেই, মানুষের বিভিন্ন অবস্থা তাহার কার্য্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় কিনা তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আমাদের কোন্ অবস্থা কোন্ কারণে হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কর্ম্ম ছাড়া আর যে কারণের আরোপ করা যায়, যদি দেখা যায়, তাহার আরোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মানুষের অবস্থার তারতম্য একমাত্র কার্য্যের রকমের তারতম্যের জন্যই হইয়া থাকে।

কর্ম্ম ছাড়া, অ দৃ ষ্ট বশতঃ আমাদের অবস্থার তারতম্য হয় ইহা আমাদের বদ্ধমূল সংস্কার। এই সংস্কারবশতঃ আমরা আমাদিগকে 'পুতুলবাজির পুতুল' বলিয়া থাকি। এই সংস্কারই "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র, ন বিদ্যা, ন চ পৌরুষম্" এই উক্তি বিশ্বাস করিতে উদ্বুদ্ধ করে।

বাস্তব জগতে মানুষের জীবনে এমন বহু ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহার জন্য আপাতদৃষ্টিতে মানুষের কার্য্য দায়ী নহে এবং সেই সমস্ত ঘটনা অদৃষ্টবশতঃ ঘটিতেছে ইহাই মানুষের সাধারণ সংস্কার। এ জাতীয় কয়েকটী ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক—

[১] শিশুর মৃত্যু :

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর কোন রকম কার্য্য করিবার আগেই মরিয়া যাইতেছে। এ জাতীয় মৃত্যুর জন্য শিশুর কোন কার্য্যকে আপাতদৃষ্টিতে দায়ী করা যায় না। কিন্তু জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে শিশুর জন্ম হইবার আগেও একটা জীবন ছিল এবং সেই জীবনে নানা রকমের কার্য্য সে করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। শিশুর অতীত জীবনের নিজ কার্য্যফলে অসম্পূর্ণ শক্তি লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, এ জাতীয় ব্যাখ্যায় কোনরূপ অযৌক্তিকতা দেখা যায় না। পূর্ব্বজন্মের কার্য্যফল দ্বারা শিশুর মৃত্যুর কারণ নির্ণীত হইতে পারে।

[২] কোন অল্প বয়সের বালকের তুলনায় কোন অধিকবয়স্ক মানুষের অপেক্ষাকৃত কম কার্য্যশক্তি অথবা অল্প জ্ঞান এবং দুরবস্থা :

ইহাও পূর্ব্বজন্মের কার্য্যফলে অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্যশক্তি লইয়া জন্ম-পরিগ্রহের কথার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

[৩] অল্পশিক্ষিত লোকের তুলনায় অধিকশিক্ষিত লোকের পরমুখাপেক্ষী হওয়া ও অপেক্ষাকৃত কম উপার্জ্জনক্ষম হইয়া ক্ষণ-যৌবন ও অল্পায়ুসম্পন্ন হওয়া :

ইহার দুই কারণ হইতে পারে—

(ক) প্রকৃত শিক্ষিত না হইয়া নিজেকে শিক্ষিত মনে করা,

(খ) রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মানুষের কার্য্যে কি কি পরীক্ষা করিয়া মানুষকে শিক্ষিত বলিয়া আখ্যাত করিতে হয় তদ্বিষয়ে জ্ঞানের অভাব ও উপেক্ষা এবং প্রত্যেক মানুষের যাহাতে শিক্ষার তারতম্যানুসারে উপার্জ্জনের তারতম্য হয় তদ্বিষয়ে অনবধানতা।

উপরোক্ত তিন ঘটনাতেই আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে, মানুষের নিজের অবস্থা তাহার নিজের কার্য্যসম্ভূত নহে। পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের ফলে শিশুর অসম্পূর্ণ শক্তি লইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করায় এবং ফলে তাহার মৃত্যুর কারণ বর্ত্তমান জন্মের কোন কার্য্য না হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-জন্মের কার্য্য হইলেও তাহারই কার্য্যের ফল বলিতে হইবে।

পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের জন্য যদি কেহ অপেক্ষাকৃত কম কার্য্যশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার ফলে তাহার জীবনে কর্ম্মশক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় লাগে, তাহা হইলে তাহারই পূর্ব্বজন্মের কার্য্য অল্পতর জ্ঞানের অথবা কর্ম্মশক্তির কারণ বলিয়া কথিত হয়।

প্রকৃত শিক্ষিত না হইয়া নিজেকে শিক্ষিত মনে করিলে এবং প্রকৃত শিক্ষিত হইবার চেষ্টা না করার ফলে যদি মানুষের দুরবস্থা হয়, তাহা হইলে মানুষের কার্য্যই তাহার দুরবস্থার কারণ।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দোষযুক্ত হইলে মানুষ যদি দুরবস্থা ভোগ করে, মানুষের কার্য্যই তাহার দুরবস্থার হেতু। কারণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থাও মানুষের গঠিত—মানুষেরই ব্যবস্থা।

এই জাতীয় ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মানুষের অবস্থার তারতম্যের কারণ তিনটি হইতে পারে, যথা—

[১] তাহার বর্ত্তমান জন্মের কার্য্য,

[২] তাহার পূর্ব্বজন্মের কার্য্য,

[৩] রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অপর মানুষের কার্য্য।

ইহাও বলা যাইতে পারে যে, মানুষের কার্য্যানুসারে অবস্থার তারতম্য হয় বটে, কিন্তু মানুষ তাহার বর্ত্তমান জীবনের কার্য্য দ্বারা তাহার নিজ অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, কারণ—পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কার্য্যের পরিচালনা তাহার স্বীয় ক্ষমতার বহির্ভূত।

কিন্তু ইহাও ঠিক নহে।

মানুষের পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের জন্য কোনও শক্তির যদি অভাব তাহার থাকে, তাহা যে কোন সময়ে সে পূরণ করিতে পারে। এই অভাব পূরণ করিতে হইলে তাহার তিনটি বিষয় জানা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, নিজ কার্য্য দ্বারা নিজ সামর্থ্যের অভাব পূরণ হয়—এই বিশ্বাস; দ্বিতীয়তঃ, আত্মশক্তি পরীক্ষা করিবার উপায় জানা; ও তৃতীয়তঃ, আত্মশক্তির অভাব কি করিয়া পূরণ করিতে হয় তদ্বিষয়ক জ্ঞান।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংশোধন করাও মানুষের হাত। তাহার যদি জানা থাকে যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কোথায় দোষ, তাহা হইলে তাহাও দূর করিয়া মানুষ নিজ দুরবস্থার হাত এড়াইতে পারে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের অবস্থার তারতম্যের ব্যাখ্যা করিবার জন্য অদৃষ্টের আরোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

কার্য্যের রকমভেদে মানুষের কার্য্যের ফল এবং কার্য্যের ফলানুসারে মানুষের অবস্থা নিয়ন্ত্রিত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষের কর্ত্তৃত্ব অথবা কর্ম্ম সৃষ্টি করেন নাই এবং তিনি মানুষের রক্ষা ও অরক্ষার বিধাতা নহেন। মানুষ নিজেই তাহার কর্ত্তৃত্ব ও ও কর্ম্ম সৃষ্টি করে এবং নিজেই রক্ষা ও বিনাশের বিধান করে।

মানুষের গঠন এবং চলন একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ ভগবানের তৈয়ারী একটি যন্ত্র। মানুষের তৈয়ারী যন্ত্রে যেরূপ শৃঙ্খলা আছে, মানুষের গঠনে এবং চলনেও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ শৃঙ্খলা আছে। কিরূপ বেগে চালাইলে, কোন্ পদার্থ যন্ত্রের ভিতর কিরূপ ভাবে দিলে, কখন কোন্ নূতন পদার্থ প্রস্তুত হইবে এবং যন্ত্রের শক্তির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা যেরূপ নিখুঁত ভাবে হিসাব করিয়া বলা যায়, মানুষও কিরূপ ভাবে কোন্ বিষয় লইয়া চলিলে কোন্ নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হইবে এবং মানুষের শক্তির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা নিখুঁত ভাবে হিসাব করিয়া বলা অসম্ভব মনে করিবার কোন কারণ নাই। যন্ত্রের বেলা যেরূপ অঙ্কশাস্ত্রের ব্যবহার চলে, মানুষের বেলা যে তাহা চলে না, তাহার কারণ মানুষ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের অভাব বা অসম্পূর্ণতা।

আমাদের কথায়-কথায় যে অদৃষ্টের দোহাই দিতে হয়, তাহার কারণ জগতের ও জীবের পূর্ণ শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব।

যদি ভগবানের ভগবত্তার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে যে, তাঁহার রাজ্য এবং সৃষ্টি শৃঙ্খলাময়; বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা কোথাও নাই। যেখানে আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা, সেই খানেই আমাদের জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। মানুষের কার্য্যের বিষয় এবং রকম অনুসারে নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ পরিবর্ত্তিত শক্তিসম্পন্ন হয়। যেখানে মানুষের শক্তির অভাব সেইখানেই বুঝিতে হইবে, মানুষের কার্য্যের বিষয়ে এবং রকমে মানুষ কোন না কোন ভুল করিয়াছে। মানুষকে সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, সে তাহার কার্য্যের বিষয় ও রকম বাছিয়া লইতে শিখিলে নিজেকে অসীম শক্তি সম্পন্ন করিতে পারে। কোথায় তাহার শক্তির অভাব, তাহার কার্য্যের পরিণতি দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। চেষ্টা করিলে নিজের শক্তি বাড়াইতে পারা যায়, এই হিসাবে

আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে, কিন্তু কখনও যেন কোথায় শক্তির অভাব তদ্বিষয়ে মানুষ অন্ধ না হইয়া পড়ে।

অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া আর অজ্ঞতা স্বীকার করা একই কথা, তাহা সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে এবং যাহাতে আমরা আমাদের কার্য্যের বিষয়গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। আমরা শৃঙ্খলাময় যন্ত্র এই হিসাবে আমরা ভগবানের নির্ম্মিত পুতুল তাহা সত্য, কিন্তু আমাদের কার্য্যের রকম ও বিষয় বাছিয়া লইবার কর্ত্তা আমরাই, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাদেরই, তাহাতে ভগবানের কোন হাত নাই। তিনি আমাদিগকে কার্য্যের রকম ও বিষয় বাছিয়া লইবার যন্ত্র দিয়াছেন বটে, কিন্তু বাছিয়া লইবার কার্য্যে তিনি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না।

জগতের জাতীয় জীবন এবং স্ব স্ব জীবন পরীক্ষা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, মানুষ যখন আত্মশক্তি অর্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে শৃঙ্খলার উপর বিশ্বাস হারাইয়া অদৃষ্টের দোহাই দিতে আরম্ভ করে তখনই তাহার পতন সূচিত হয়। এবং যে জাতি অথবা মানুষ ভগবানের সৃষ্টির শৃঙ্খলার কথা স্মরণ করিয়া যত কম অদৃষ্টের দোহাই দেয় তাহারই তত উন্নতি হইতে থাকে।

অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া আত্মপ্রত্যয়ের অভাবেরই নামান্তর। [ক্রমশঃ]

সরস্বতী

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন দে

উষার আলোর তলে অন্ধকার হ'ল অবসান
কঠিন পাষাণদ্বার ভেদি',
বীণাতন্ত্রে ঝঙ্কারিয়া বিজয়ের সঙ্গীত মহান
দীপ্তকণ্ঠে উচ্চারিল বেদী।
আলোর প্রপাততলে পূজার্চ্চনা-হোমবহ্নিশিখা
উদ্ভাসিয়া উঠিল আকাশে,
ছিন্ন করি' জীবনের ব্যর্থতার বিপর্য্যয়-লিখা
বিচ্ছুরিল বাতাসে বাতাসে।
বিশীর্ণ প্রাণের তটে সে আলো আনিল আমন্ত্রণ
সে আলো আনিল প্রাণ-গতি,
মৃত্যু-প্রহেলিকা মাঝে অকস্মাৎ জাগায়ে নর্ত্তন
অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী।

মহাসমুদ্রের তলে যে বাণী ফিরিছে ব্যর্থ হ'য়ে
যে বাণী ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
যে বাণী অন্তরতলে প্রকম্পিত প্রকাশের ভয়ে
আজ তুমি তা'রে দাও ভাষ।
জীবনের মধ্যপথে ধ্রুবতারা খ'সে গেল যা'র
যে ফিরিছে আর্ত্তনাদ ক'রে,
কঠিন প্রাচীরতলে নিষ্পেষিত করে হাহাকার
অন্ধকার শ্মশানের 'পরে।
নিয়ে এসো বীণা তব তা'র তরে উঠাও ঝঙ্কার
বিদ্যুতের বাণী যাক্ ছুটি'
মুখ'রয়া চতুর্দ্দিক—মুক্ত করো পাষাণের ভার
বাধাবন্ধ সব যাক্ টুটি'।

রুদ্ধদ্বার কারাগারে অসহায় কাতর-ক্রন্দন
ব্যর্থতার বিষবাষ্পরাশি—
ভগ্নপ্রাণ মূক প্রাণী ;—কে করিবে চরণ-বন্দন ?
অমানিশা ফেলিতেছে গ্রাসি'।
উন্মথিয়া, আলোড়িয়া, উচ্চকিয়া, উদ্দীপিয়া দিক
ব্যর্থ ধ্বনি বাজে শুধু কানে,
শুধু গ্লানি, শুধু ব্যথা, শুধু মিথ্যা মোহ-মরীচিকা
বিরাজিছে শ্মশানে শ্মশানে।
নাহি প্রাণ, নাহি গতি, কোথা আজ প্রেমের লিপিকা
শুষ্ক আজ জীবন-প্রবাহ,
পত্র-পুষ্প-অর্ঘ্য দিয়ে কে জ্বালাবে বোধন-দীপিকা
কে জাগাবে নবীন উৎসাহ ?

নেমে এসো এ শ্মশানে মুখর করিয়া দাও মূকে
আলোকিত ক'রে দাও মন,
উচ্ছল যৌবন হ'তে অনুভূতি জাগাও এ বুকে
বীণাতন্ত্রে জীবন-স্পন্দন।
মুক্ত কর রুদ্ধ বন্দী মর্ম্মরিয়া উঠুক এ বাণী
দেবি, তব বীণার ঝঙ্কারে !
মূর্ত্ত হোক্, পূত হোক্, উদ্ঘোষিত হোক্ তব গীতি
দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে।
ভেঙ্গে ফেল লৌহদ্বার চূর্ণ কর যাহা ইচ্ছা তব
দারিদ্র্যেরে করো আজি জয়ী,
এ প্রাণে স্পন্দন দাও, আলো দাও প্রাণে অভিনব
ভাষা দাও, হে মহিমাময়ি !

ভূমিকম্প

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তিন দিকে পরিত্যক্ত তেতলা হোষ্টেল-বাড়ী, এই দিন চারেক আগে পর্য্যন্ত ছিল আশ্রয়, এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে আতঙ্ক। মাঝখানে প্রশস্ত লনের উপর টেনিসের পর্দ্দা জুড়িয়া তাঁবু খাটান, কলেজের ছেলেরা তাহারই মধ্যে জড় হইয়াছে। মাঘের কনকনে শীত, তায় পাটনা জায়গা—ও-তাঁবুতে কিছুই আটকায় না। মাথার উপর কিছু একটা আছে এই সান্ত্বনায় যতটা কাজ হয়। গেঞ্জি থেকে ওভার-কোট পর্য্যন্ত সবই গায়ে,—মাঝে মাঝে চা-ও আছে। বঙ্কিমের ইহাতেও কুলাইতেছে না, সে চৌকির নীচে বিছানা করিয়া এবং চৌকির চারিদিকে কম্বল ঝুলাইয়া ভিতরে শুইয়া আছে।

খোকা বলিল—"কেমন বোধ হচ্ছে হে বন্ধু? কবর কি বলে?"

কবরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল—"বড্ড মিষ্টি বাহুপাশ হে, বলছে—দেখ বঁধু; কেমন উষ্ণ আলিঙ্গন আমার, তবু আমায় বলে হিমশীতল, দেখ অবিচারটা!"

মৃগেনের চা করা শেষ হইয়াছে, খোকার হাতে একটা পেয়ালা দিয়া বলিল—"ধর।...সত্যি, তেতলার কথা ছেড়ে দাও, কোঠাবাড়ী মাত্রেই যেন একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ইষ্টিশানের সামনের সেই দোতলা বাড়ীটার ইতিহাস তো শুনেইছ; সিটিতে আজ একটা ছোট একতলার অবস্থা দেখলাম! মনে হয় সৃষ্টি মুছে ফেলবার নেশায় মেতে উঠে, সবাইকে বুকের মধ্যে পিষে ফেলে নিজে আছড়ে মরেছে; কবর এতটা দাগাবাজি করতে পারত না।"

চৌকির ভিতরটা বিচলিত হইয়া উঠিল। "কে বলে এ কথা?" বলিয়া বঙ্কিম চৌকির পর্দ্দা ঠেলিয়া নিজের ব্যালাক্লাভা-আঁটা মুখটা হঠাৎ বাহির করিল। কালো আবেষ্টনীর মধ্যে চোখ দুটো জলজ্বল করিতেছে, এই লোকই যে একটু আগে নিজের শয্যা লইয়া লঘু আলাপ করিতেছিল, বোঝা শক্ত। বলিল—"গঙ্গার এপারে আছ তাই ও কথা বলছ, একবার ওপারে যাও—মজঃফরপুর, মোতিহারী, দারভাঙ্গায়, দেখবে সারবন্দী হয়ে কবরের দল মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। পাতালের যত গ্লানি, যত ভীষণতা সঙ্গে করে এক এক জায়গায় আগুনের নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে উঠেছে, এক এক জায়গায় প্লাবনের খরস্রোত বইয়েছে। বালির চাপে কচি শস্যের টুঁটি চেপে মেরেছে..."

মৃগেন বলিল—"তুমি ভাই মুখটা ভেতরে টেনে নাও, অথবা সমস্ত শরীরটা বাইরে বের করে নিয়ে এসে যা বলতে হয় বল, তোমার ব্যালাক্লাভা-গ্রস্ত মুখমণ্ডল দেখে বড্ড অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, মনে হচ্ছে কবরই যেন আচমকা মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে..."

বঙ্কিম বাধা পাইয়া একটু অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করিয়াছিল। বলিল—"আর যা করেছে তা আরও গর্হিত, বিপন্ন মতিভ্রান্ত অসহায় মানুষের সঙ্গে নীচ প্রবঞ্চনা ক'রে তার প্রাণ নিয়েছে কবরে!...খোকা, তুমি সামনের পর্দ্দাটি একটু টেনে দাও, ভেন্টিলেশন না হ'লে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় কোন রকম ক'রে বাঁচব, কিন্তু এই অবস্থায় যদি নিউমোনিয়া—"

"ওপারে এত ব্যাপার অথচ এখন পর্য্যন্ত বলনি যে! ভয়ঙ্কর কাণ্ড হ'য়েছে নাকি; শুনছি নাকি—"

বঙ্কিম বলিল—"বলিনি—বেঁচে ছিল ব'লে। গেছে এবার নিজের চোখেই সব দেখবে, আমি মাঝখান থেকে একটা অত বড় দুঃসংবাদ দিতে যাই কেন?"

সকলেই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চকিত ভাবে বঙ্কিমের দিকে চাহিল—এক জোটেই প্রশ্ন করিল—"সত্যি নাকি?"

বঙ্কিম মুখটা বিষাদে একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"বড্ড স্যাড, বড্ড করুণ!—"

তাহার পর আস্তে আস্তে শরীরটা নানা প্রকারে আকুঞ্চন প্রসারণ করিয়া চৌকির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং ব্যালাক্লাভাটাকে গুটাইয়া মাথায় জড় করিয়া, জামা র‍্যাপার বেশ ভাল করিয়া সামলাইয়া লইয়া বলিল—"তা হ'লে মৃগেন আর এক কাপ করে—"

খোকা অসহিষ্ণুতার সহিত বলিল—"সে হচ্ছে, জল তো চড়ানই র'য়েছে, কিন্তু তুমি যে চিরকেলে অভ্যাসমত এফেক্টের জন্যে আমাদের চা হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখবে সে হচ্ছে না;

পাগ্‌গির বল ব্যাপারটা কি,—ঘোঁতনদের বাড়ীর একজনও ক বেঁচে নেই ?"

বঙ্কিম রহস্যের ভাবটা বজায় রাখিয়া বলিল—"একজন বেঁচে নেই !···ঘোঁতন যে গেছে এটা ঠিক তো ? বড্ড স্যাড ব্যাপার হে।"

সে একটু মাথা নীচু করিয়া বসিল ; খোকা এবং পরেশ পুনরায় তাগাদা দিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ মাথা তুলিয়া আবার আরম্ভ করিল—

"ঠিক দশটার সময় আমি কুড়হান্নি ষ্টেশনে পৌছলাম। গাড়ি ঐ পর্য্যন্ত যাচ্ছে আজকাল, ওর ওদিকে লাইন ধ্বসে গেছে। কুড়হান্নিটা মজঃফরপুর থেকে দু'ষ্টেশন আগে, রাস্তা দিয়ে গেলে ন'ক্রোশ,—আঠার মাইল—"

খোকা বলিল—"তুমি আঠার মাইল দূর থেকে গল্প আরম্ভ ক'র না বন্ধু, দোহাই। আঠার মাইল পথ আর ভাষা বেয়ে আসতে তোমার একই রকম সময় লাগবে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘোঁতনের বাড়ির খবর ব'লে একটা উৎকণ্ঠাও লাগিয়ে দিয়েছ ; নাও, নেলা আর্ট ফলিও না।"

বঙ্কিম এসব অনুরোধ-উপরোধ কানে না তুলিয়া বলিতে লাগিল—"রাস্তার দু'ধারে সে এক বীভৎস কাণ্ড। খাদ-গুলোতে জল থৈ থৈ ক'রছে, জায়গায় জায়গায় জল উপরে উঠে এমন শ' দু'শ বিঘে জমি ডুবিয়ে দিয়েছে। যেখানটা জেগে আছে, ছোট বড় বালির চাকতিতে ভরা। চাকতির মাঝখানে একটা ক'রে গর্ত্ত, ঐ বেয়ে পাতালের জল বেরিয়ে এসেছিল ; মাঝে মাঝে তখন পর্য্যন্ত অনেকগুলো জীয়ন্ত র'য়েছে, ঘোলাটে জলের ধারা তখন পর্য্যন্ত উদ্গার ক'রে চ'লেছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও !

"প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে এইগুলো সব মাটি ফুঁড়ে বিকট আওয়াজের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, আমাদের এই শ্যামা ধরিত্রী একেবারে সহস্র-মুখ দানব হ'য়ে উঠেছিল।

"খাদ জলে ভরুক, সওয়া যায়, কিন্তু যখন দেখা গেল বালির রাশিতে খাদ, ডোবা, নালা, ইঁদারা ভরাট ক'রে দিয়ে উঁচু রাস্তার সঙ্গে মাথামাথি হ'য়ে ঠেলে উঠেছে, আর কচিৎ কোথাও এক-আধটা গাছের ডগা তা'র মধ্যে নিঝুম হয়ে নেতিয়ে র'য়েছে, তখন সত্যিই কেমন একটা অস্বস্তি জেগে ওঠে মনে ;—অন্ততঃ আমার তো মনে হ'ল যে, এই যে আমাদের এত বিশ্বাসের পৃথিবী এর ভিতরে একটা মস্ত বড় প্রবঞ্চনা লুকান আছে, ওটা তারই নমুনা। উপরটা সবুজ কোমলতার মোহ—আমাদের ভুলিয়ে রাখবার যাদু, নীচেয় আছে এর এক অনন্ত, অপ্রমেয় শাহারা। একদিন নিতান্ত খেয়ালের মাথায়ই যদি বুভুক্ষু, তৃষ্ণাতুর মত্ত দানবকে ভিতর থেকে লেলিয়ে দিয়ে এক মুহূর্ত্তে উপরের সমস্ত সরসতাটুকু··"

মৃগেন একটা কাপে চা ঢালিয়া আগাইয়া দিয়া বলিল—"থাক, আপাততঃ তোমার মরুদানবটিকে ঠাণ্ডা কর, বড় তেতে উঠেছে।"

চায়ের কাপটি বঙ্কিম খালি করিয়া একপাশে রাখিয়া দিল, রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া ব্যালাক্লাভাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া বলিল—"মজঃফরপুরে পৌছলাম।"

খোকা বলিল—"বাঁচালে ; চা-পথে খুব তাড়াতাড়ি হ'ল তো !"

পরেশের আগ্রহটা সবচেয়ে বেশী ছিল ; প্রশ্ন করিল—"আর সব কি কি দেখলে রাস্তায় ? এ যাবৎ যা বললে তা থেকে তোমার সাহিত্য বাদ দিলে তো খানিকটা জল আর খানিকটা বালি পড়ে থাকে—যার কথা অপেক্ষাকৃত মৃদু ভাষায় রোজ খবরের কাগজে পড়া যাচ্ছে।"

বঙ্কিম বলিল—"কয়েক জায়গায় নামতে হয়েছিল এক্কা থেকে, রাস্তার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ফাটল চলে গেছে, যতটুকু রাস্তা ঠিক ততটুকু মাটি দিয়ে ভরিয়ে দিলেও, এক একটা এত চওড়া যে, গাড়ীশুদ্ধ পার হতে তখন সাহসে কুলোয় না, বিশেষ ক'রে রাস্তার দু'পাশে ফাটলের আসল স্বরূপ দেখলে। এক জায়গায় একটা বেশ চওড়া লোহার পুল, —আক্রোশে দু'হাতের চেটোর মধ্যে ধরে কে যেন দুমড়ে দিয়েছে,—ইংরেজী এস্ অক্ষরটাকে নুইয়ে দিলে যেমন হয় সেখানে সব শর্ম্মাকেই নামতে হয়েছিল।

"এক এক জায়গায় রাস্তার দুধারেই ধ্বসে কুঁচকে গেছে। তোমার দু'পাশে লম্বালম্বি ফাটল—চলেছে তো চলছেই ;—এক্কায় যেতে যেতে মনে হয় যেন ও'দুটো শুধু অটল দূরবিস্তৃত বিদারণ মাত্রই নয় ; দুটো করাল, শিরা-পেশীবহুল চার হাত, তোমার পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে, যে-কোন মুহূর্ত্তেই তার

এই শিরা-পেশীগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, তখন একবার হাত তুলে এই পৃথিবীর নিকট থেকে একটা আর্ত্ত বিদায় নিতেও তোমার সময় থাকবে না। · একজন বললে—'বাবু, যেদিন হয় কাণ্ডটা, ওই ফাটলের মুখে একটা ছোট ছেলে'…"

মচ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, বাক্স, ট্রাঙ্ক, ষ্টোভের উপরকার কেটলি সবগুলি একটু কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে হোষ্টেলের বাকী সমস্ত ক্যাম্প থেকে, সহরের চারিদিক থেকে একটা ত্রস্তধ্বনি রাত্রির আকাশ মথিত করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুণ্ঠিতভাবে বসিতে বসিতে বলিল—"নাও আর একটা কাঁপন হয়ে গেল, সেকেণ্ড দু'এক ছিল বোধ হয়। তেতলা বাড়িটা ঘাড়ে না ফেলে নিস্কৃতি দেবে না দেখছি।"

বঙ্কিম বলিতে লাগিল—"দেড়টার সময় মজঃফরপুরে এক্কা থেকে নামলাম। ধোঁতনদের বাড়ী পর্য্যন্ত আগে এক্কা যেত, ভূমিকম্পের পর থেকে যাচ্ছে না। ইঁট, কাঠ, রাবিশ, এমন কি মানুষের…"

পরেশ মুখটা বাড়াইয়া চোখ দু'টি বড় বড় করিয়া প্রশ্ন করিল—"কোঠাবাড়ী বুঝি একটিও দাঁড়িয়ে নেই, রাস্তা বুঝি দু'ধারেই—"

বঙ্কিম পূর্ব্বের আক্রোশ মিটাইয়া একবারটি আড়ে চাহিয়া বলিল—"সব তো খবরের কাগজেই পড়েছ।"

আর সে সহরের বর্ণনার দিক দিয়াও গেল না। পরেশের উন্মুখ কৌতূহলকে খানিকটা অতৃপ্ত রাখিয়াই বলিতে লাগিল,—"ধোঁতনদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।—তার মানে মজঃফরপুরে যে জায়গাটা গিয়ে দাঁড়ালে ধোঁতনদের বাড়ী পৌঁছেছি বলা চলত, সেখানে গিয়ে রাশিকৃত ইঁটের স্তূপের মধ্যে তেরছাভাবে আটকান একটা কড়িকাঠের উপর দাঁড়ালাম। রাস্তার ধারের উপরের ঘর দুটো পড়ে গেছে, দুটো ঘরের যত ইঁট নীচের তলার ছাদ ধ্বসিয়ে দিয়ে, গলির দিকের দেওয়াল ঠেলে বেরিয়ে প্রায় সমস্ত গলিটাই বুজিয়ে দিয়েছে। খুনে ইঁটের গাদা!—উপরতলা নিশ্চিহ্ন ক'রে স্রোতের মত নীচের লোকেদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে খুনের নেশায় রাস্তা পর্য্যন্ত ছুটে এসেছে। মাঝখানে শান-বাঁধান উঠোন, ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। এক কোণে একটা টিউবওয়েল ছিল, প্রায় চার পাঁচ হাত ভিতর থেকে ঠেলে তুলে দিয়েছে—পাম্পের হাতলটা মুখে ক'রে নলটা ধনুকের মত বেঁকে উঠোনের মাঝামাঝি এসে পড়েছে। একটা কাক তার উপর বসে ছিল, আমি আসায় উড়ে যেতেই মাথাভারী নলটা উপর-নীচেয় দুলতে লাগল। সেটা গৃহস্বামীর অতিথিকে অভ্যর্থনা করার ব্যঙ্গ-অভিনয়ের মত এমন অদ্ভুত দেখতে লাগল যে, আমি থাকতে পারলাম না একটু না হেসে। উঠোনের ওদিকে দু'খানা ঘর, একটা বড় ঘর কোঠার, একটা খোলার চালের। চালটি ভেঙে, চারপাশের দেওয়াল কাৎ ক'রে নীচে পড়েছে আর থেকে থেকে বালি উঠে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে সেটাকে আঁকড়ে ধরেছে। ওদিকটায় খুব বালি উঠেছে, টিউবওয়েলের গোড়া পর্য্যন্ত তার স্রোত নেমে এসেছে।

"আশ্চর্য্যের বিষয় কোঠা-ঘরটার কিছু হয় নি, কিন্তু আমার তরফে আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—সেই অক্ষত ঘরটাকে দেখে বেশ প্রীত হতে পারলাম না। কেন তা ঠিক খুলে বলতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছিল ওর সৌভাগ্য বড় বেমানান। ওটাকে কেউ একটা ভীষণতর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য হাতে রেখেছে, আমি টের পেয়েছি বটে, যাবও না কাছে, কিন্তু এক সময় না এক সময় কাল-নিয়ন্ত্রিত যে অজ্ঞাত লোকটি মোহাকৃষ্ট হয়ে ওর মধ্যে জীবন দেবে তার জন্য আমার মনটা বিষাদে ভ'রে উঠল।

"সব দেখে শুনে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম; হঠাৎ হুঁস হ'ল—কাউকে ডাকা দরকার তো, কতক্ষণই বা এরকম হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব, আর থেকেই বা করব কি? ডাকতে গিয়ে কিন্তু সমস্যা উদয় হল, কার নাম ধ'রে ডাকি?—এই তো বাড়ীর অবস্থা, এতে একজনও কি বাকী থাকতে পারে, যে আমার ডাকের উত্তর দেবে? ধোঁতনদের সবাইকেই আমি জানি, পাতান সম্বন্ধ ধ'রে, কিম্বা ছোটদের নাম ধরে ডাকতে পারতাম, কিন্তু ডাকা হয়ে উঠছিল না, যার কথাই ভাবি কেবলই তার মুখটা মনে হচ্ছিল, আর ভয় হচ্ছিল উত্তর পাব না! আর, উত্তর পাচ্ছি না অথচ ডেকে যাচ্ছি—একরকম বাতুলতার সম্ভাবনায় নিজের কাছে কুণ্ঠাও বোধ হচ্ছিল। শেষকালে মনে পড়ল ধোঁতনদের কাকা নিশ্চয় জীবিত আছেন,

তাঁর চাকরি যে আফিসে সেটা ভাঙে-চোরে নি, আর ও সময়টা তিনি সেখানেই ছিলেন। ডাকলাম—'অবিনাশ বাবু?'

"উত্তর পেলাম না, স্বরটা বিকৃত হয়ে কেঁপে যাওয়ায় তক্ষুণি আবার ডাকতেও পারলাম না। চারিদিক নিস্তব্ধ, জনমানব নেই, শুধু গলির শেষ দিকটায় একটি বেহারী ভদ্রলোক দু'জন কুলি নিয়ে একটা বাড়ী পরিষ্কার করছিল, তিনজনেই কাজ ছেড়ে আমার দিকে একটু চেয়ে রইল।

"একটু চেঁচিয়ে বললাম—'ইস্ মাকানমে অবিনাশ বাবু নামকা…'

"সমস্ত শরীরটা ইলেক্‌ট্রিক্ শক্ পেয়ে যেন শিউরে উঠল। ঠিক পিছনেই ভারী আওয়াজ শুনলাম—'অবিনাশ বাবুকে খুঁজছেন?—তিনি তো নেই।'

"ফিরে দেখি একটি বাইশ তেইশ বৎসরের যুবা, খালি া, গায়ে একটা ছেঁড়া মটকার চাদর জড়ান, ক্ষৌরের অভাবে মুখটা অল্প অল্প দাড়িতে ভরে গিয়েছে, তেলের অভাবে কোঁকড়া-কোঁকড়া দীর্ঘ চুলগুলো ফুলে উঠে বয়সের অনুপাতে তাকে একটু যেন অতিরিক্ত ঢেঙা ক'রে দিয়েছে।

"আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বললাম—'নেই?—তিনি কোথায় বলতে পারেন?'

"যুবা তার ফাঁপা চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বেশ জোরেই হেসে উঠল। সে এক উৎকট হাসি, আওয়াজে যতটা না হোক, চোখের চাউনিতে তো বটেই; মনে হ'ল তার চোখের ভিতর দিয়ে একটা পাগল হঠাৎ উঁকি মেরে যেন পরমুহূর্ত্তেই মিলিয়ে গেল। বললে—'বেশ জিগ্যেস করেছেন।…আপনি অবিনাশ বাবুর কেউ হন্ না কি?'

"বললাম—'না।'

'মিথ্যা কথা থেকে বাঁচালেন, কেউ হলে নিশ্চয় বলতে হ'ত, কেন না সত্যি কথা শুনিয়ে কয়েক জনের যা অবস্থা করেছি তাতে সত্যির উপর আর টান নেই ততটা।'

"যুবক একটু কাষ্ঠহাসি হেসে মাটির পানে চেয়ে মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—'কোথায় গেছেন জিগ্যেস করছেন? হাঁ, আমার জানা উচিত ছিল বটে, কেননা আমার বাড়ী থেকে চার চার জন ওই পথে আগেই গেছে, কিন্তু কেউ তো আর…'

"গলার স্বরটা বদলে গেল। একটু থেমে, রুদ্ধ গলা ঠেলেই বললে—'মশাই, ছোট মেয়েটা পাঁচদিন আগে একবার হারিয়ে গিয়েছিল—গলির শেষে হিন্দুস্থানীদের বাড়ীতে চলে গিয়েছিল। বলেছিলাম—'এবার যখন কোথাও যাবে বাসু, বলে যেও মা।'…এসে শুনলাম, ইঁটের গাদার মধ্যে থেকে অনেকবার বাবা বাবা ব'লে ডেকেছিল, জল খাবে ব'লে…'

"আমার প্রশ্নটা যে এমন ব্যথায় আঘাত দেবে মোটেই আশঙ্কা করিনি। বললাম—শান্ত হন, ভগবানের জিনিস ভগবান নিয়েছেন।

"ছোকরা আমার দিকে একটু চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললে—'ভগবান? হুঁ, ভগবান—ভগবান…'

"যেন তার অজ্ঞাতসারেই তার চোখ দুটো একবার চারি দিকের প্রলয়-শ্মশানের উপর দিয়ে ঘুরে এল। অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলাম।"

বঙ্কিম ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাইয়া তিন চারটা টান দিল। দেরী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পরেশ বলিল—"সেখানে যতটা চুপ ক'রে ছিলে এখানে ঠিক ততটা না করলেও বুঝে ন'ব। তারপর?'

"সেই ছোকরাই আমায় অবিনাশ বাবুর কথা বললে। খানিক দূরে একটা ইঁটের গাদার চারিদিকে কতকগুলা কাক বেজায় চেঁচামেচি করছিল, ছোকরা বললে—'একটা মাড়োয়াড়ীর বাড়ী ছিল ওটা। পরশু মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা চারজনকে টেনে তুললে। লোকটাকে যতই জিগ্যেস করে—আর কেউ আছে? সে শুধু কচি ছেলের মত হাত ঘুরোয়।…আমার বিশ্বাস কাকেরা একটার সন্ধান পেয়েছে।'

"আমি বললাম চলুন, এখান থেকে স'রে যাই। ছোকরা আবার একবার তার সেই পাগলাটে অদ্ভুত হাসি হেসে ব'ললে, 'সরে আর মজঃফরপুর কোথায় যাবেন? বরং চলুন ঐ কাঠটার উপর, অবিনাশ বাবুর গল্পটা বলি—দেখেছেন আপনি অবিনাশ বাবুকে?'

"আমি মিথ্যা ক'রে বললাম—'না দেখিনি।'

"বললে—'একহারা চেহারা; কপালে শির ওঠা; অল্প কিছুতেই বড্ড বেসামাল হয়ে যেত, আর কপালের শিরগুলো

জেগে উঠত, বেজায় নার্ভাস প্রকৃতির লোক আর কি।… ভূমিকম্পটা হ'ল ঠিক দুটো যোলয়; নিজে বাঁচতে বাড়ীর ভাবনা এসে জুটল। এই ব্যাপার তো সেখানেও হয়েছে! আফিসে কাগজপত্র ফেলে পাগলের মত ছুটলাম। পৃথিবীর কাঁপন তখন আকাশে গিয়ে পৌঁছেছে, সমস্ত সহরের হাহাকারে মনে হয় আকাশটা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে। ষ্টেশন-রোড দিয়ে মানুষের স্রোত সহরের দিকে ছুটে চলেছে, দু'পাশে বাড়ী-ঘরদোরের ভাঙনের বিকট দৃশ্য, এক একটা দেওয়াল কি ছাদের কোণ তখনও ভেঙে ভেঙে পড়ছে, চারিধারে ধুলোয় ধুলো।…ষ্টেশনের রাস্তা দিয়ে বোধ হয় আপনি আসছেন, না?…ষ্টেশন থেকে খানিকটা এসেই একটা চৌমাথা পড়ে, মাঝখানে টেলিগ্রাফের চারটে পোষ্ট, তলাটা বাঁধান। খানিকটা এগিয়ে এসেছি এমন সময় কে ডাকলে, 'যদু!' ফিরে দেখি সেই শান-বাঁধান চত্বরটিতে অবিনাশ বাবু বসে! গা-ময় শুরকির ধুলো, জামার একটা পকেট পেঁৎলে ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। ছুটে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কি খবর অবিনাশ দা? আমাদের বাড়ীর, আপনাদের বাড়ীর, আর সবার…'

'অবিনাশদার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কপালের শির ফুলে উঠেছে, একটা ঢোঁক গিলে খস্‌খসে আওয়াজে বললে—'যেতে পারছি না—কি হ'ল যদু—কি হবে?'

'জিগ্যেস করলাম—পায়ে লেগেছে।

'বললে—'না, বেঁচে গেছি, কিন্তু পা উঠছে না। এতটা তো এলাম কোন রকমে কিন্তু…'

'ওঁর সেই নার্ভাসনেস, অনিশ্চিতের সামনে এগুতে পারছেন না। হাতটা ধ'রে একটা টান দিয়ে ব'ললাম—'উঠুন শীগগীর, এ কি করছেন, আচ্ছা দুর্ব্বলচিত্ত লোকতো!'

'তুলতে পারলাম না, উঠলেও না, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চারিদিকের ভাঙা বাড়ীগুলোর দিকে চেয়ে ব'ললে—'কি দেখব ব'ল তো যদু গিয়ে? এই সময় সব উপর ঘরে শোয়; কি হ'ল—কি হবে?'

'আমাদেরও উপরে একখানা চালাঘর। আর দাঁড়াতে না পেরে একবার খাতিরের বলা ব'ললাম—'চলুন না ছাই'—তারপর পা বাড়ালাম।

'অবিনাশদা বললে—'উঠতে পারছি না যে। পা কাঁপছে, ঠিক যে কাঁপছে তা' নয়, কেমন অবশ হ'য়ে গেছে।'

'আমি একটু এগিয়ে গেলে ভাঙা গলায় খুব জোর দিয়ে ডাকলে—'যদু!'

'ফিরে দাঁড়ালাম—'কি?'

'আমায় ব'লে যেও, এইখানেই রইলাম।'

'সামনের চুলগুলো মুঠোর মধ্যে ধ'রে মাথাটা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিলে—এখনও অবিনাশদাকে যে দেখতে পাচ্ছি সে অবস্থায়।'

'আগেই অবিনাশদার বাড়ী পড়ে, আমার বাড়ীটা গলি শেষ ক'রে বাঁদিকে ঘুরতেই। এসে দেখলাম এই অবস্থা। ইঁট ভেঙে, দরজা, জানালা, কড়িকাঠ ডিঙিয়ে, নর্দ্দমায় প'ড়ে বাড়ীর দিকে ছুটলাম। যা দেখলাম তা ব'লেইছি আপনাকে।'

"ছোকরা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল—সেই অদ্ভুত দৃষ্টি, যেন আমার মুখের উপর সেই পুরান দৃশ্যটার ছায়া পড়েছে। পরে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে জিগ্যেস ক'রলে—'বিড়ি রাখেন?'

"আমি কেস থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে দিতে ছোকরার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—যেন কি জিনিস পেয়েছে! লোকে একমুঠো খেতেই পাচ্ছে না, তা… সিগারেটটা ধরান পর্য্যন্ত কিন্তু আনন্দটা বজায় রাখতে পারলে না, চোখ দুটো জলে ছাপাছাপি হ'য়ে উঠল। কিছু না বলে মটকার চাদরটা দিয়ে মুছে নিয়ে, ফোঁস ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিগারেটটা টানতে লাগল। বুঝলাম—ও যে আজ ভিখিরী, অল্পেই বর্ত্তে গেল, এইটে ওকে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়েছে; ওর আনন্দের আসল রূপটা চিনতে পেরে ওর এই চোখভরা জল। আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে টানতে সুরু ক'রে দিলাম। সান্ত্বনা দিতে গেলে আরও জিনিসটা ফুটিয়ে তোলা হ'ত।

"নখের কোণে যখন আর শেষটুকু ধ'রে রাখতে পারলে না, তখন ফেলে দিলে সিগারেটটা। গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বেশ সহজ ভাবে বললে—'বাড়ীর হিসেব যখন সেরে ফেললাম, বেশ সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে; হঠাৎ কর্ত্তব্যজ্ঞান চাগিয়ে উঠল—অবিনাশদা' ব'সে আছে যে আমার পথ চেয়ে! সে

বেঁচে গেছে দুর্ভাগ্যক্রমে, তাকে তো সব স'য়ে বেঁচে থাকতে হবে?—লোকটাকে নিয়ে তো আমি অন্ততঃ।...গোয়াল-ঘরটায় সবাই গোছগাছ ক'রে নিয়েছে—নতুন গৃহপ্রবেশ! পিসীমাকে ব'ললাম—আমি এক্ষুণি আসছি।

'বাইরে পা দিতেই কিন্তু গাটি ছম্ ছম্ ক'রে উঠল। নিস্তব্ধ!—লোক নেই, রাস্তা নেই, শব্দ নেই; সব,—যেন শব্দ পর্য্যন্ত কবরের মাটিতে চাপা পড়েছে। কিন্তু কর্ত্তব্য আমায় ভূতের মত টানতে লাগল। পকেটে একটা টর্চ্চ ছিল, সেই দিন সকালেই কিনি—ইচ্ছে হ'ল, ইনট্যুইশন বলতে পারেন—অজ্ঞাতের নির্দ্দেশ—সেইটে হাতে ক'রে, আলোয়ায় মত আলো জ্বালতে জ্বালতে এগুলাম। ঐখানটায় এসে দেখি কে একজন একখানা করে ইঁট তুলে গলির উপর ফেলছে, টর্চ্চ ফেলে দেখি—অবিনাশদা'।

'তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ডাক দিলাম। মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, বললে—'বড্ড দেরী হয়ে গেছে যদু, তাই তাড়াতাড়ি ইঁটগুলো সরাচ্ছি।...কি হল বলতো, কি হবে?—সত্যিই বড্ড দেরী হয়ে গেছে কি?'

'আমি বলে ফেললাম—'সবাই ভাল আছে যে', বোধ হয় সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই বললাম কথাটা, কিম্বা এখন মনে হচ্ছে যেন গোলমালের মধ্যে কার মুখে শুনেছিলাম কথাটা; অথচ মনে আবছা দাগ রেখে মুছে গিয়েছিল। যা হক, কথাটা বলেই কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলাম, কেননা কোথা থেকে বললাম নিজেই ধরতে পারলাম না। অবিনাশদা একখানা ইঁট হাতে তুলে, আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে জিগ্যেস করলে—'কোথায় আছে?'

'আমি একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—'চলুন তো, উঠোনের দিকে যাই একবার।'

'অবিনাশদা'—'চল' ব'লে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে, হোঁচট খেয়ে, আবার উঠে চলল। দু'জনে অনেকটা তফাৎ হ'য়ে গেছি, হঠাৎ 'কে!'—ব'লে অবিনাশদা চেঁচিয়ে উঠল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, আমার দিকে চেয়ে বললে—'দেখতো কে যদু!'

'সত্যই একটা লম্বা ছায়া দাঁড়িয়ে উঠানের মাঝখানে! দু'পা এগিয়ে টর্চ্চটা সামনে ফেললাম,—ঐ কলটা লম্বা, বক্রাকার হয়ে শুঁড় নামিয়ে রয়েছে। এ সন্দেহটা তক্ষুণি কেটে গেল বটে, কিন্তু এই উপলক্ষ্যতেই সমস্ত বাড়ীটার উপর যেন অবিশ্বাসে মনটা ভরে গেল। অবিনাশদা এই কাঠটায় একটু কান লাগিয়ে রইল; যেন কারুর বুকে যদি সেটা স্পর্শ করে থাকে তো এই কড়িকাঠ চেয়ে তার ধুক্‌ধুকুনি শুনতে পাবে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে আর কি।

'একবার চেঁচিয়ে উঠল—'বাড়ীতে আছ কি! কোথায় আছ সাড়া দাও।'

'সাড়া না পেয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে। ক্রমে ক্রমে মুখেচোখে যেন একটু বুদ্ধির ভাব ফুটে উঠল, চোখ দুটো বড় বড় ক'রে বললে—'ঘুমিয়েও তো পড়তে পারে যদু, ঠিক নয় কি? ঠিক বলছি না!'

'টর্চ্চ ঘোরাতে ঘোরাতে আমার তখন ইঁটের গাদার আড়ালে ঐ ঘরটা নজর পড়েছে। বললাম—'হতেও পারে, চলুন তো, ঐ ঘরটা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে বোধ হচ্ছে।

'অবিনাশদা আমার হাত থেকে টর্চ্চটা ছিনিয়ে নিলে—হাতটা তার থর থর ক'রে কাঁপছে। চঞ্চল আলোটা ঘরের কোণটাতে ফেললে—তখন ঘরের সামনে কতকগুলো ইঁট, দরজা জানালা পড়ে ছিল ব'লে সমস্ত দেখা যাচ্ছিল না। এই উঠোনটা দু'টো লাফে পেরিয়ে, টিউবওয়েলের হাতলের একটা চোট খেয়ে ঐ ঘরের সামনে গিয়ে উঠল। পিছনে পিছনে আমি। সেই নার্ভাস্ অবিনাশদা—এর গায়ে হঠাৎ এত শক্তি এল কোথা থেকে—অমন চোটটাকেও গ্রাহ্য করলে না!

'গিয়ে দেখি ঘরটা ঠিক আছে; কিন্তু দোরটা ভিতর থেকে বন্ধ! অবিনাশদা জোরে তিন চারটে উপরোউপরি ঘুসি মেরে বললে—'ওগো শীগ্‌গির দোর খোল, আমরা...রাজু, অনাথ!'

'খুলবে কি, দুটো দরজার মুখ যা আধ-ইঞ্চিটাক ফাঁক ছিল, ভিতর থেকে দোর চেপে কে যেন নিশ্চিহ্ন ক'রে সে-টুকুও বুজিয়ে দিলে। কট্ কট্ কট্ ক'রে আওয়াজ হ'ল আর আমার টর্চ্চের যে আলোটুকু ভিতরে প্রবেশ করেছিল, কার তাড়া খেয়ে যেন বন্ধ দোরের উপর এসে জমে রইল। দু'জনে কিম্ভুতকিমাকার হ'য়ে দু'জনের মুখের দিকে চাইলাম! আলো ঠিকরে অবিনাশদার কপালে পড়েছে, শিরগুলো যেন এই ছিঁড়ে বেড়িয়ে পড়ে ব'লে।

'আওয়াজ বসে গেছে ; বললে—'কে ঠেলে দিলে ভিতর থেকে !'

'আমারও প্রশ্ন তাই, কিন্তু ওকে জিগ্যেস ক'রে আর কি করব ? ঘরটার সামনের দিকে জানালা নেই, ওপাশটা স্তূপাকার ইঁট এসে দেওয়ালে চেপে পড়েছে। ডানদিকটা ঘুরে গেলাম ; একটা ছোট জানালা আছে, খোলাও, তাড়াতাড়ি টর্চ্চ ফেলতে আলোটা হাতখানেকের মধ্যেই একটা তক্তার উপর গিয়ে পড়ল। অবিনাশদা হতাশভাবে বললে—সেই আলমারিটা, ও নড়ান যাবে না ! তারপর জানালার কাছে মুখ দিয়ে চাপা আওয়াজটাকে সাধ্যমত তুলে ডাকলে—'শুনছ ?—আমি ডাকছি—এই কি ঘুমোবার সময় ?'

'আমার দিকে চেয়ে ব'ললে—'হয়তো ঘুমোচ্ছে না—কিন্তু দোর এঁটে দিলে কেন ?—কে ?'

'অবিনাশদার চোখ দুটো হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম বড় হয়ে টর্চ্চের আলোয় জলজল ক'রে জলতে লাগল। ডানহাতে আমার হাতটা চেপে বললে—'যদু, তুমি ওসব কথায় বিশ্বাস কর ?'

'আমি শুধু অবাক হয়ে লোকটার ভয়ঙ্কর আকৃতির দিকে চেয়ে রইলাম। অবিনাশদা' বললে—'মেরে ফেলবে !—আজ দু' মিনিটে একেবারে অতর্কিত যারা শেষ হ'য়েছে তারা আক্রোশে কাউকে বাঁচতে দেবে না ! দেখলে না ?—দোরে ঘা পড়তেই চেপে এঁটে দিলে ?'

'আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবলে—এক মুহূর্ত্তটাক, তারপর উঠে পড়ে ইঁটগুলোর উপর হামাগুড়ি দিয়ে দোরের সামনে হাজির হ'ল। আমি একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম, সেই চাপা, ঠেলে-বের-করা আওয়াজে ডাকলে—'শীগ্‌গির এস যদু,—ওগো, ঘুমিও পরে, এ আমরা—'

'গিয়ে দেখি একটু দোরের দু'খানা তক্তার জোড়ের মুখে, পেন্সিল গলার মত যে সামান্য একটু ফাঁক আছে, অবিনাশদা তাতে মাথার এক পাশটা চেপে সমস্ত মনটা যেন ঘরের ভিতর সাঁদ করিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—দোরের সঙ্গে যেন একেবারে মিশে যেতে চায় !

'বললাম—'কি' ?

'খানিকক্ষণ কিছু বললে না, শুধু রগ, কান আর গালটাকে দোরের উপর আরও চেপে ধরলে, তারপর হঠাৎ সরে এসে বললে—'যদু শোন ত—বেঁচে আছে—বেঁচে আছে !'

'কাঠ চিরতে চিরতে করাতটা শক্ত গাঁটে ঠেকলে হঠাৎ আওয়াজ যেমন কড়া হয়ে ওঠে, অবিনাশদার শেষের কথাগুলো সেইরকম বিকট হয়ে উঠল। আমি গিয়ে সেই জোড়ের মুখে কান দিলাম।

'নিশ্বাসের শব্দ !—সি—সি—সি ক'রে স্পষ্ট নিঃশ্বাসের শব্দ ; এক আধটা নয়, অনেকগুলি নাক থেকে, তার সঙ্গে বেশ একটা অদ্ভুত শব্দ—ঘির্‌-র্—ঘির্‌-র্—ঘির্‌-র্—এক একবার ক্ষীণ হয়ে পড়ে, এক একবার ভারী—নাক ডাকার শব্দও হতে পারে—মনে হয় যেন গলার ঘড়-ঘড়ানি !

'অবিনাশদার পানে চাইলাম। চিনতে পারা যায় না যেন—কপালের শিরাগুলো দপদপ করছে—সমস্ত শরীরের রক্ত গিয়ে মাথায় ঠেলে উঠেছে। ব'ললে—'দেখলে তো ?—দেবে না বাঁচতে—দোর চেপে ধরছে—উত্তরও দিতে দেবে না—গলা চেপে ধরেছে।'

'হঠাৎ বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সমস্ত শরীর কাঁপছে—একবার একটা ইঁটের চাই আঁকড়ে ধরলে, একবার একটা ভাঙা কড়িকাঠ, তারপর ঘুরে, সমস্ত শরীরের জোর দিয়ে দোরটার উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ; আমায় হুকুম করলে—'ঠেল যদু, দেখছ কি হাঁ ক'রে। ভেঙে ফেল, বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

'একটু হাত লাগালাম, কিন্তু অসম্ভব, যত এদিক থেকে জোর দিই, ততই যেন ভিতর থেকে কারা ঠেলে ধরে ; তাদের ক্ষমতার সামনে আমাদের শক্তির তুচ্ছতা যেন প্রতি-মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

'আমি ছেড়ে দিয়ে ব'ললাম।—'দাঁড়াও অবিনাশদা', এ' ক'রে হবে না। দেখি অন্য কোনখান দিয়ে ভিতরে যাওয়া যায় কি না—যদি ছাদটাও একটু ভেঙে থাকে—'

'অবিনাশদা গেল না, ঐ কাঠটার উপর পা ঠেলে চাড়া দিতে লাগল. আমি ডানদিকটা ঘুরে ওদিককার ইঁটের গাদার উপর উঠলাম। ছাদে ওঠা যায় না। নেমে পিছন দিকটায় গেলাম। একটা ভাঙা কড়িকাঠ বেয়ে উপরে উঠতে যাব, এমন সময় দোরের ওদিক থেকে, করাত দিয়ে বোধ হয়

পাথর কাটলে যেমন আওয়াজ হয়, সেই রকম একটা উৎকট আওয়াজ হ'ল—'হ-য়ে-ছে, হু - ম—'

'ইঁট-কাঠ দোর-জানালা ডিঙিয়ে ফিরতে মিনিটখানেক কি দেড়-মিনিট দেরী হয়েছিল। এসে দেখি অবিনাশদা দোরের চৌকাঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে, হাত দুটো আর মাথাটা দোরে লাগান রয়েছে—তার অমানুষিক শেষ-শক্তিতে দরজাটার নীচের পুরান কব্জাটা আলাদা হয়ে, চৌকাঠের কাছে দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল।

'গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম—'অবিনাশদা'! শরীরটা গড়িয়ে পড়ল।'

"ছোকরা আমার দিকে খানিকটা সেই রকম আবিষ্টভাবে চেয়ে রইল, তারপর বললে—'সিগারেট দিন আর একটা। চলুন, আর দাঁড়িয়ে কি হবে এখানে!"

"আসতে আসতে বলতে লাগল—'একলা আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি কোন গতিকে ফিরে গেলাম। জন আষ্টেক লোক যোগাড় হল, আর দুটো শাবল। অবিনাশদার শরীরটাকে সরিয়ে রেখে, দোর দু'খানা ঠেলিয়ে ভাঙা হল।

'কোথায় কে? ভিতরে শুধু গাদাপ্রমাণ বালি। ঘরের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ঠেলে উঠে, আসবাবপত্র ডুবিয়ে দোর চেপে ধরেছে! ভিজে বালি শুধু, তিন চারটে মুখ দিয়ে তখনও ঘোলাটে জলের সঙ্গে আরও বালি বেরুচ্ছে। একটা টানা আওয়াজ—সি—সি—সি। জলের স্রোত ঘরের দু'তিনটা ফাটল বেয়ে চাপা কুল-কুল আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই শব্দসমষ্টিকে ভুল করেই অবিনাশদা প্রাণ দিলে। পরের দিন খোঁজ পাওয়া গেল বাড়ীর সব ছেলে-মেয়েরা কোন রকমে

এমন সময় টেনিসের পর্দ্দা নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে খোকন অর্দ্ধেক শরীর প্রবেশ করাইয়া প্রশ্ন করিল "তোরা জেগে এখনও?...ফিরে এলাম; ষ্টীমারে উঠতে যাব, দেখি কাকা নামছেন! আজ সকালে মজঃফরপুর থেকে বেরিয়েছেন, এখন পৌছুলেন।...হ্যাঁ, খবর ভাল, বাড়ীটাত বেঁচে গেছে একরকম...খোকা একটু চা চড়াও ভাই...কাকা, আসুন ভিতরে।"

খোকা, পরেশ, মৃগেন পরস্পরের প্রতি চাহিয়া, একসঙ্গে বঙ্কিমের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলিল—"আমারও এক কাপ হ'লে ভাল হয়।"

মৃগেন ধীরে ধীরে বলিল—"সে-লোকটা তা হ'লে বোধ হয় বাইরের লোক ছিল, কিম্বা বদ্ধ পাগল..."

খোকা ষ্টোভ জ্বালিতেছিল, রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে বঙ্কিমের দিকে কটাক্ষ হানিয়া বলিল—"সে লোকটা ছিলই না মোটে...লোকের প্রাণ যায় আর উনি খবরের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে উপন্যাস রচনা ক'রছেন..."

প্রদর্শনী

[বর্ত্তমানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য তিনজন শিল্পীর শিল্প-পরিচয় আমরা এখানে উপস্থিত করিলাম। এই তিনজনকে বাঙ্গালার বর্ত্তমান শিল্প-প্রতিভার ত্রি-মুখ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালী শিল্পজগতে সঙ্কীর্ণ নীড় রচনায় ব্যস্ত ছিল---আজ বাঙ্গালীর শিল্প-প্রতিভা সেই সঙ্কীর্ণ নীড়ের বাহিরে আসিয়াছে। এই চিত্রগুলি সেই বহিরাভিযানের পদচিহ্নস্বরূপ।]

হেডটাডি (প্রস্তরমূর্ত্তি)

আনি বেসান্ট (প্রস্তরমূর্ত্তি) [ভাস্কর---শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
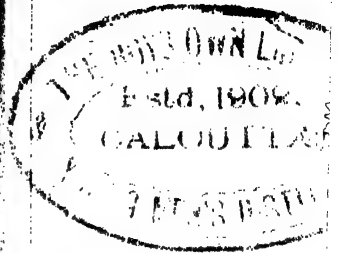
একখানি পোর্ট্রেট [শিল্পী শ্রীঅতুল বসু

সহধর্ম্মিণী। [শিল্পী শ্রীঅতুল বসু

সতীর্থ। [শিল্পী—শ্রীঅতুল বসু
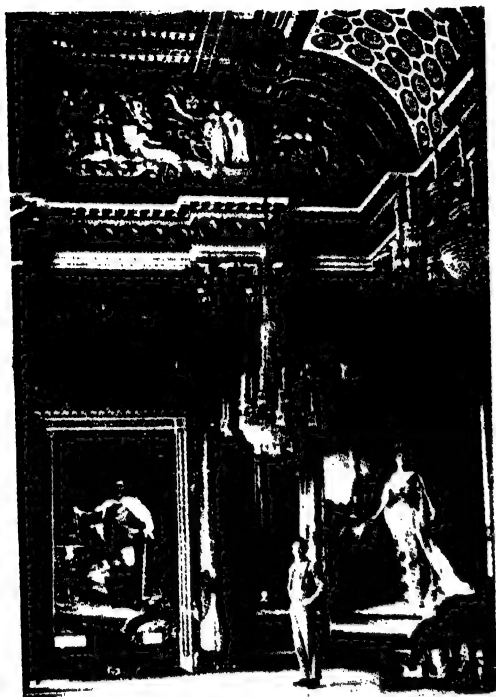
বাকিংহাম প্যালেসে সম্রাট এডওয়ার্ড ও সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার পোর্ট্রেট অঙ্কনে নিযুক্ত শিল্পী অতুল বসু।

শিল্পী—শ্রীঅতুল বসু।

একখানি পোর্ট্রেট।　　　　[শিল্পী—শ্রীঅতুল বসু

বার্দ্ধক্য।　　　　[শিল্পী—শ্রীঅতুল বসু

স্বপ্নশেষ।　　　　[শিল্পী—শ্রীঅতুল বসু
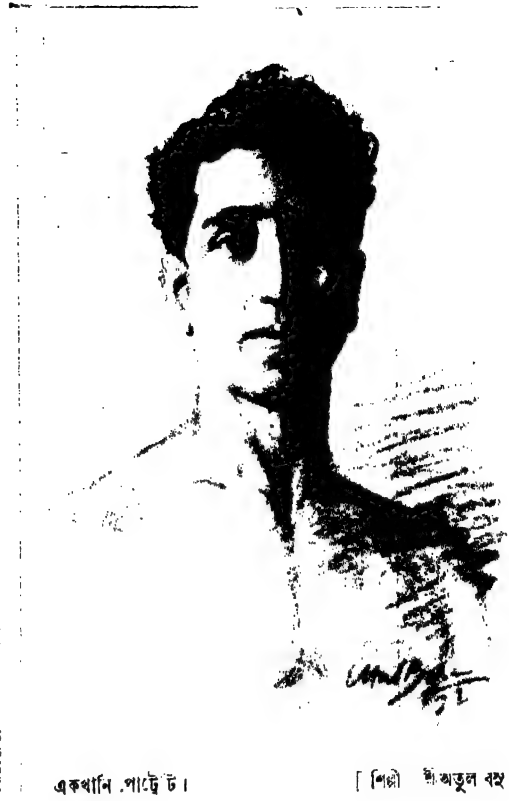
একখানি মুখ। [শিল্পী—শ্রীললিত সেন

চীনা শ্রমণদের ভারতদর্শন

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

আমরা বাল্যকালে স্কুলের ইতিহাসে চৈনিক পরিব্রাজক-দের ভারতদর্শন সম্বন্ধে অল্প যাহা পড়ি তাহার বেশী এ বিষয় আর বিশেষ কিছু খোঁজ করি না; অথচ ভারতের ইতিহাস রচনার অনেক মশলা সংগৃহীত হইয়াছে এই চীনা বিবরণগুলি হইতে।

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে ফা সিয়েন, হিউয়েন-ৎসিয়াং এবং ই-ৎসিং এই তিন জন মাত্র চীনদেশীয় লোক প্রাচীন ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে চীনদেশের সঙ্গে প্রাচীনকালে ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অনুমান ৬৫ খৃষ্টাব্দে মগধের দুইজন পণ্ডিত কাশ্যপ-মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ চীনে গিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কুশান-বংশের রাজা দ্বিতীয় কাডফিসেস্ চীনদেশের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন (৯০ খৃষ্টাব্দে)। সম্রাট কনিষ্ক চীনদেশের কিছু অংশ জয় করিয়াছিলেন এবং সেই প্রদেশের চীনরাজপুত্রদের ভারতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন (অনুমান ১২৫ খৃষ্টাব্দ)। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে প্রায় দশজন ভারতীয় পণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে কুমারজীব ও আরও বার জন পণ্ডিত চীনে গিয়া সে দেশে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ফা-সিয়েন কুমারজীবের ছাত্র ছিলেন।

ফা-সিয়েন ছয় বৎসর ভারতে বাস করিয়াছিলেন (খৃঃ ৪০৫—৪১১)। সে সময়ে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য উত্তর ভারতের সম্রাট। ফা-সিয়েন বৌদ্ধ "বিনয়" (ভিক্ষুদের আচার) সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ভারতে আসিয়া-ছিলেন। তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ, নিজের অধ্যয়ন, তীর্থদর্শন ও ধর্ম্মচর্চ্চাতেই মগ্ন ছিলেন; তাঁহার সময়ের ভারতের অত প্রসিদ্ধ সম্রাটের নাম তিনি তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ একবারও করেন নাই তবুও ভারতের সাধারণ লোকের জীবন, রাজ্যের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ তিনি দিয়া গিয়াছেন। ফা-সিয়েন পাটলিপুত্রে ও নালন্দার মহাবিহারে সংস্কৃত বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফা-সিয়েনের সঙ্গে বুদ্ধভদ্র নামক গৌতমবুদ্ধের বংশজাত একজন শ্রমণ ভারত হইতে চীনে গিয়া শাস্ত্রানুবাদে ফা-সিয়েনকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

৫৩৯ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট উ-টি, বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ ও অনু-বাদের জন্য একদল চীনা পণ্ডিতকে মগধে পাঠাইয়াছিলেন এবং মগধের রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, একজন ভারতীয় পণ্ডিতকে যেন ইঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এই সময় প্রথম জীবিতগুপ্ত অথবা কুমারগুপ্ত মগধের রাজা ছিলেন; তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত পরমার্থকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়া বিদেশী রাজবন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই চীনা পণ্ডিতেরা কিছুদিন ভারতে বাস করিয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিবার সময় পণ্ডিত পরমার্থকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পরমার্থ সঙ্গে অনেক গ্রন্থ লইয়া ৫৪৬ খৃঃ কাণ্টন নগরে পৌছিয়াছিলেন। ৫৪৮ খৃঃ তাঁহাকে চীন সম্রাটের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। পরমার্থ বহু বৎসর চীনে বাস করিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ৫৬৯ খৃঃ সেই দেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রায় ষোলজন ভারতীয় পণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন।

চীনা পণ্ডিতরা আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে (৫১৮ খৃঃ) চীনের সম্রাজ্ঞী, সুং ইয়ান ও ভিক্ষু হোই-সাংকে গ্রন্থসংগ্রহের জন্য ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহারা ১৭০ খানি মহাযান গ্রন্থ ভারত হইতে চীনে লইয়া গিয়াছিলেন।

সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) যখন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন হিউয়েন-ৎসিয়াং বার বৎসর (৬৩৯—৬৪১) ভারতে ছিলেন এবং ফিরিবার সময় প্রায় এক সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। হিউয়েন দেশে ফিরিবার পর মধ্যভারতের "মহাবোধি বিহার" হইতে একদল ভারতীয় পণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন। চীন সম্রাটের আদেশে হিউয়েন ভারত সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন তাহা ভারত-ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিয়াছে।

খৃঃ ৬৪১ অব্দে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন একজন ব্রাহ্মণ দূতকে চীন সম্রাটের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। দূত ফিরিবার সময় তাঁহার সঙ্গে একদল চীন-সম্রাট-দূত ভারতে আসিয়া দুই বৎসর ছিলেন। খৃঃ ৬৪৬ অব্দে পূর্ব্বদলের ওয়াং-হিউয়েন-ৎসির সঙ্গে আবার একদল চীনদূত ভারতে আসিলেন, কিন্তু মগধে তাঁহারা যখন পৌছিলেন (৬৪৮ খৃঃ) তখন হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু

হইয়াছে এবং সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা চলিতেছে। সেই সুযোগ হর্ষের মন্ত্রী অর্জ্জুন (বা অরুণাশ্ব) মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন; তিনি চীন-দূতদের বধ, ও সম্পত্তি লুট করিলেন; শুধু ওয়াং ও আর একজন নেপালে পলাইয়া গিয়া রক্ষা পাইলেন। সেই সময়কার তিব্বতের রাজা একজন চীনরাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার, নেপাল রাজের, ও কামরূপরাজ ভাস্কর বর্ম্মণের সহায়তায় ওয়াং অর্জ্জুনকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া চীনে লইয়া গিয়াছিলেন। খৃঃ ৬৫৭ অব্দে ওয়াং আবার তৃতীয়বার সম্রাটের আদেশে ভারতে আসিয়া, বুদ্ধগয়া, বৈশালী প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থে পূজা দিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত-প্রদেশের রাজ্যগুলির রাজারা চীন সাম্রাজ্যের সহায়তায় আরব ও তিব্বতীদের আক্রমণ রোধ করিয়াছিলেন। এই রাজারা (ইঁহাদের মধ্যে কাশ্মীররাজ চন্দ্রাপীড় ও মুক্তা-পীড়-ললিতাদিত্যও ছিলেন) চীনসম্রাটের কাছে "রাজা" উপাধি লাভ করেন (৭২০—৭৩৩ খৃঃ)।

খৃঃ ৬৭১ অব্দে ই-ৎসিং ভারত ভ্রমণ আরম্ভ করেন এবং ৬৭৫—৬৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নালন্দায় বাস করেন পরে খৃঃ ৬৯৫ অব্দে দেশে ফিরিয়া যান। তিনি ভারতের যে বৃত্তান্ত লেখেন তাহাতে ভিক্ষুদের আচার, নিয়ম সম্বন্ধীয় বিষয় ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি ভারত হইতে প্রায় ৪০০ গ্রন্থ লইয়া গিয়া তাহার অনেকগুলি অনুবাদ করিয়াছিলেন। ই-ৎসিং বলিয়াছেন যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ভারত হইতে বৌদ্ধগ্রন্থ চীনে নীত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহা হইতে চীনের লোক বুদ্ধের নাম ও তাঁহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলির পরিচয় পাইয়া তীর্থদর্শন অভিপ্রায়ে ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। শ্রীগুপ্ত নামক একজন রাজা চীন যাত্রীদের জন্ত বুদ্ধগয়ায় "চীনমন্দির" নামক একটি মন্দির বানাইয়া দিয়াছিলেন। হিউয়েন-ৎসিয়াংএর পর এবং ই-ৎসিংএর পূর্ব্বে ভারতে আগত ৫৬ জন চীনা-যাত্রীর ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে ই-ৎসিং একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হিউয়েন ও ই-ৎসিংএর পর কয়েকশত বৎসর ধরিয়া ভারতের পণ্ডিতেরা ও চীনে ধর্ম্ম প্রচারের জন্ত গিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে যে বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে নূতন জ্ঞান ও সত্য লাভ করিয়া চীনদেশের লোক বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতকে পবিত্র-ক্ষেত্র মনে করিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। চীনা পরিব্রাজকদের ভক্তিশ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিলে দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বাড়ে, কারণ চীনারা অসভ্য ছিলেন না, তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যে শক্তি, জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব ছিল না। চীনা পণ্ডিত হিউয়েন-ৎসিয়াংকে ভারতের রাজারা, পণ্ডিতেরা ও জনসাধারণ যে মহাসম্মান দেখাইয়াছিলেন তাহাতে প্রাচীন ভারতের লোকের মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। চীনা শ্রমণরা নিজেদের "শাক্য-পুত্র" বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় ভারতের যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

সে যুগে চীন হইতে ভারতে আসিবার দুইটি পথ ছিল; প্রথম, চীনের পশ্চিম হইতে মধ্য-এশিয়া ভেদ করিয়া, তারপর দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া, স্থলপথে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মধ্য দিয়া স্থলপথে পাঞ্জাবে প্রবেশ, এবং দ্বিতীয়, সমুদ্রপথে চীন হইতে যাত্রা করিয়া বোর্নিও দ্বীপের পশ্চিম হইয়া, সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মধ্য দিয়া, সিংহল বা তাম্রলিপ্তিতে পৌছান। ফা-সিয়েন স্থলপথে আসিয়া সমুদ্র পথে ফিরিয়াছিলেন; হিউয়েন আসা যাওয়া দুইই স্থলপথে এবং ই-ৎসিং দুইই সমুদ্র পথে করিয়াছিলেন।

এই বিবরণ ফা-সিয়েন প্রণীত ফো-কিউ-কি (অর্থাৎ "বুদ্ধভূমির বিবরণ"), হিউয়েন-ৎসিয়াং প্রণীত সি-ইয়ু-কি ("পশ্চিম জগতে বিবরণ"), ই-ৎসিং প্রণীত কাউ-ফা-কাঙ-সাং-চুয়েন ("বিখ্যাত চীনা শ্রমণদের ভারতভ্রমণ") এবং হিউয়েনের ছাত্র হুই-লি ও ইয়েন-ৎসং প্রণীত "হিউয়েনের জীবনী" অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। হিউয়েনের মহৎ চরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণকেই বিবরণের সূত্র করিয়াছি।

ইউয়েন-ৎসিয়াংএর পিতা পণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রাণ ও নিরহঙ্কার ছিলেন। হিউয়েনরা চার ভাই ছিলেন, তাহাদের মধ্যে হিউয়েনই কনিষ্ঠ। ছেলেবেলা হইতেই হিউয়েন মেধাবী ও গম্ভীর-প্রকৃতি ছিলেন; তিনি আট বৎসর বয়স হইতে লেখাপড়া আরম্ভ করেন; উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ ছাড়া অন্ত বই হিউয়েন ছুঁইতেন না. যাহারা ধর্ম্মপথে না চলিত তাহাদের সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্ক রাখিতেন না এবং সমবয়সীদের সঙ্গে প্রায় মিশিতেন না ও তাহাদের আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেন

না। হিউয়েনের মেজদাদা আগেই ভিক্ষু হইয়াছিলেন ও পূর্ব্ব প্রদেশের রাজধানী লয়াংএর সিং-তু নামক বিহারে বাস করিতেন। ছোট ভাইকে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে মনোযোগী দেখিয়া মেজদাদা তাঁহাকে নিজের মঠে লইয়া গিয়া শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়াইতে আরম্ভ করেন। এই সময় হঠাৎ রাজার আদেশ হইল যে লয়াং হইতে চৌদ্দজন ভিক্ষুকে নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হইবে। এই নির্ব্বাচনের জন্য কয়েক শত প্রার্থী ছিল; বয়স কম বলিয়া হিউয়েন প্রার্থী হন নাই কিন্তু তবুও তিনি সভাগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। যে রাজপুরুষের উপর নির্ব্বাচনের ভার ছিল তিনি হিউয়েনের আকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেন ও বয়স কম হইলেও হিউয়েনকে নির্ব্বাচন করিলেন। হিউয়েন তাঁহার মেজদাদার মঠে প্রবেশ করিয়া সেখানকার পণ্ডিত-ভিক্ষুদের কাছে শাস্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। অতি দুরূহ গ্রন্থও তিনি একবার পড়িয়া বুঝিতে পারিতেন ও দুইবার পড়িলেই তাহা তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত আর দেখিতে হইত না। তের বৎসর বয়সের সময় ভিক্ষুদের অনুরোধে হিউয়েন একবার শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে শ্রোতারা মোহিত হন।

রাজ্যে বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হওয়ায় হিউয়েন ও তাঁহার মেজদাদাকে কয়েক বৎসর ধরিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। এই সময় পণ্ডিত-ভিক্ষুদের সন্ধান পাইলেই হিউয়েন তাঁহাদের কাছে গিয়া বৌদ্ধ-শাস্ত্রের নানা গ্রন্থ পাঠ করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রচারও করিতেন ও ইহাতে তাঁহার খ্যাতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ও বহু গুরুর কাছে শিক্ষা লাভের পর হিউয়েন দেখিলেন যে সকলেই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মত প্রচার করে, যে সব গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া মানা হয় তাহাদের মধ্যেও অনেক মতভেদ দেখা যায়, কাজেই সত্য শাস্ত্র কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য হিউয়েন স্থির করিলেন যে তিনি ভারতে আসিয়া সত্য শাস্ত্রের পরিচয় লাভ করিবেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য সে সময় দেশ ছাড়িয়া বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কোন বাধায় দমিবেন না মনস্থ করিয়া হিউয়েন ভারত যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন; এই সময় তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

পথে হিউয়েন কয়েকস্থানে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন বণিক ছিল, তাহারা তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া বড় প্রীত হইল ও তাহাদের যাত্রাপথে সর্ব্বত্র হিউয়েনের আগমন-সংবাদ প্রচার করিয়া দিয়া গেল। শ্রোতারা হিউয়েনকে অনেক ধনরত্ন উপহার দিল, তিনি অর্দ্ধেকমাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাতে বিহারে বিহারে দীপ জ্বালাইলেন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করিলেন। লিয়াং-চাউ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বড় কড়া লোক ছিলেন; তিনি হিউয়েনের বিদেশ যাত্রার অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং রাজার আদেশ স্মরণ করাইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। এইখানে হুই-ওয়াই নামে একজন মহাপণ্ডিত ভিক্ষু ছিলেন, তিনি হিউয়েনের শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং হিউয়েন সত্যধর্ম্মের অন্বেষণে যাইবেন শুনিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দুইজন শিষ্যকে গোপনে হিউয়েনকে ভারতে যাইবার পথে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য পাঠাইলেন। এই সময় হইতে হিউয়েন লোকের সামনে বাহির হইতে সাহস করিতেন না, দিনে লুকাইয়া থাকিতেন, রাত্রে পথ চলিতেন। ভারতের পথ যে কত দুর্গম তাহার কথা শুনিয়া অনেক সময় তাঁহার মন দমিয়া যাইত। শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে ধরিবার জন্য গুপ্তচর লাগাইয়াছিলেন; একবার তিনি ধরা পড়িলেন কিন্তু রাজ-কর্ম্মচারী শত্রু-বেশী মিত্র ছিলেন, তিনি হিউয়েনের সত্য-বাদিতায় প্রীত হইয়া শাসনকর্ত্তার পরোয়ানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া হিউয়েনকে শীঘ্র পলাইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। এই ঘটনার পর হইতে হিউয়েন সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। তাঁহার সঙ্গে দুইজন শ্রমণের (বালক ভিক্ষু) ছিল, একজন এই সময়ে দেশে ফিরিয়া গেল ও অন্যটিকেও তিনি ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। হিউয়েন যে বিহারে ছিলেন সেখানকার একজন ভিক্ষু তাঁহার যাত্রার সফলতার সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিয়া হিউয়েনকে জানাইলে হিউয়েন "স্বপ্নের কোন অর্থ বা মূল্য নাই" বলিয়া তাহাতে কান দিলেন না। তিনি মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমার পাদমূলে তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এই সময় একজন বিদেশী লোক হিউয়েনের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রকাশ

করায় হিউয়েন তাহাকে তাঁহার উদ্দেশ্যের কথা জানাইলেন এবং তাহার সহায়তায় একজন পথ-প্রদর্শক সংগ্রহ করিলেন। কিছু বস্ত্রের বিনিময়ে ঘোড়া কিনিয়া হিউয়েন ও পথপ্রদর্শক রওনা হইলেন। লোকটি তাঁহাকে পথের বিপদের কথা বার বার বলিতে লাগিল কিন্তু তিনি নিবৃত্ত হইলেন না। এই লোকটির ঘোড়াটি লাল রংএর ও রোগা ছিল, সে হিউয়েনকে তাহার ঘোড়া দিয়া নিজে হিউয়েনর ঘোড়াটা চাহিল, কারণ সে বলিল তাহার ঘোড়াটা বলবান এবং অনেকবার ঐ পথে গিয়াছে। ঘোড়া বদল করিবার পর হিউয়েনের মনে পড়িল যে কিছুদিন আগে একজন গণককে তিনি তাঁহার ভারত গমন সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় গণক বলিয়াছিল যে সে দেখিতেছে হিউয়েন একটি লাল রোগা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন, তাহার জিন বার্ণিশ করা ও সামনে লোহা লাগান; হিউয়েন লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে এই ঘোড়ারও জিন বার্নিশ করা ও সামনে লোহা লাগান এবং ইহাতে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি সূচিত হইতেছে ভাবিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। লোকটির আসল উদ্দেশ্য বোধ হয় ভাল ছিল না; এক রাত্রে পথে ঘুমাইবার সময় সে ছুরি হাতে হিউয়েনের দিকে আসিয়া আবার ফিরিয়া গেল, হিউয়েন তাহার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিলেন ও শাস্ত্রপাঠ এবং অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের কাছে প্রার্থনা করিলেন। যাহা হউক, শেষে এ লোকটিও ফিরিয়া গেল।

এইবার হিউয়েন একাকী বালুময় মরুর মধ্য দিয়া কেবলমাত্র অস্থিস্তূপ ও ঘোড়ার বিষ্ঠায় পথ চিনিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি অনেক রকম মরীচিকা দেখিয়াছিলেন ও তাহাকে ভূতপ্রেতের খেলা মনে করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি শুনিতেন সেই জনশূন্য স্থানে কে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে "ভয় নাই, ভয় নাই"। এই ভাবে যাইতে যাইতে তিনি সীমান্তে পৌছিলেন। এখানে পর পর পাঁচটি পাহারার ঘাঁটি ছিল এবং প্রথম ঘাঁটির কিছু দূরে জলাশয় ছিল। হিউয়েন দিনের বেলায় বালির গর্ত্তের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া রাত্রে জলের কাছে গিয়া জলপান করিলেন এবং হাতমুখ ধুইয়া জলপাত্র ভরিতেছেন এমন সময় একটি তীর এবং পর মুহূর্ত্তেই আর একটি তীর শাঁ করিয়া আসিয়া তাঁহার হাঁটুর কাছে পড়িল; তাঁহাকে পাহারাওয়ালারা দেখিতে পাইয়াছে বুঝিয়া হিউয়েন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি একজন ভিক্ষু, রাজধানী হইতে আসিতেছি; আমাকে হত্যা করিও না।" এই বলিয়া তিনি ঘোড়া লইয়া ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং পাহারাওয়ালারা বাহির হইয়া ঘাঁটির দরজা খুলিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইল ও তিনি সত্যই ভিক্ষু দেখিয়া সর্দ্দারকে খবর দিল। সর্দ্দার আসিলে হিউয়েন তাহাকে নিজের পরিচয় দিলেন এবং প্রমাণস্বরূপ ঘোড়ার নানাস্থানে নিজের নাম লেখা দেখাইলেন। সর্দ্দার তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে ও নিজ পরিচিত একজন পণ্ডিত-ভিক্ষুর কাছে শিক্ষালাভ করিতে পরামর্শ দিল; হিউয়েন নিজ পাণ্ডিত্য গৌরব ও যশের কথা এবং তাঁহার ভারত-যাত্রার উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া বলিলেন, তিনি বরং মৃত্যুবরণ করিবেন তবু যাত্রায় নিরস্ত হইবেন না। তাঁহার দৃঢ়তায় সর্দ্দারের শ্রদ্ধা হইল, সে তাঁহাকে পথের বিবরণ বলিয়া ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া তাহার আত্মীয় চতুর্থ ঘাঁটির সর্দ্দারের কাছে পাঠাইয়া দিল।

আবার পথ চলিয়া হিউয়েন চতুর্থ ঘাঁটিতে পৌছিলেন। এখানেও রাত্রে জল আনিতে গিয়া তিনি প্রায় তীরবিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সর্দ্দারের কাছে উপস্থাপিত হইয়া নিজ পরিচয় দিলেন। সর্দ্দার তাঁহাকে ফিরিতে পরামর্শ দিল কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার সহায়তা করিল। সর্দ্দার বলিল "পঞ্চম ঘাঁটির লোক বড় হিংস্র ও ভীষণ, আপনি বিপন্ন হইতে পারেন, সেখানে যাইবেন না"; সর্দ্দার তাঁহাকে জল পাইবার অন্য স্থান বলিয়া দিল।

এখান হইতে রওনা হইয়া হিউয়েন মো-কিয়া-য়েন মরুভূমিতে প্রবেশ করিলেন। এই মরুভূমির বিস্তার প্রায় ৩০০ মাইল এবং ইহার মধ্যে পশুপক্ষী, গাছপালা বা জল একেবারেই নাই। এখানে হিউয়েনের একমাত্র সম্বল ছিল অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের নাম ও "প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়-সূত্র" পাঠ। দেশে থাকিতে একবার হিউয়েন একটি ছিন্ন মলিন বেশ ও সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত লোককে তাঁহার বিহারে আনিয়া সেবা করিয়াছিলেন ও লোকটি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে এই "প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়-সূত্র"টি দিয়াছিল। বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সামনে পিছনে অনেক মরীচিকা দেখিয়া হিউয়েন তাহাকে ভূতপ্রেত ভাবিয়া অবলোকিতেশ্বর বোধি-

সত্ত্বের নাম উচ্চারণ করিতেন কিন্তু তাহাতেও যদি ফল না হইত তবে এই "সূত্র" পাঠ করিলে নাকি ভূতপ্রেতরা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্ধান করিত।

মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রায় ১০০লি (৩ লিতে এক মাইল হয়) যাইবার পর হিউয়েন পথ হারাইলেন এবং সর্দ্দার যে জলের কথা বলিয়া দিয়াছিল তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। নিজের জলপাত্রের নলে মুখ দিয়া জলপান করিতে গিয়া ভারী ছিল বলিয়া হঠাৎ পাত্রটি তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল এবং এক মুহূর্ত্তে প্রায় ৪০০ মাইলের উপযোগী জল নষ্ট হইয়া গেল। হিউয়েন কোনদিকে পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি স্থির করিলেন যে চতুর্থ ঘাঁটিতে ফিরিয়া যাইবেন কিন্তু মাইল চারেক গিয়াই তাঁহার স্মরণ হইল যে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ভারতে পৌছিতে না পারিলে তিনি দেশের দিকে এক পাও ফিরিবেন না। তিনি অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের নাম স্মরণ করিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার চারিদিকে সীমাহীন, দিগন্তবিস্তারী মরু; মানুষ বা জীবজন্তুর বিন্দুমাত্র চিহ্নও কোথাও নাই; রাত্রে চারিদিকে যেন অসংখ্য ভৌতিক আলোক জ্বলিত ও দিনে বৃষ্টির মত বালুর ঝড় বহিত। হিউয়েন নির্ভীকচিত্ত; চার রাত্রি পাঁচ দিন বিন্দুমাত্র জল না পাইয়া তাঁহার তালুকা শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, জঠরে যেন অগ্নি জ্বলিতেছিল, তিনি আর চলিতে পারিলেন না, অবসন্ন হইয়া বালুর উপর শায়িত হইয়া বোধিসত্ত্বের কাছে কামনা-সিদ্ধির মিনতি জানাইতে লাগিলেন। পঞ্চম রাত্রে হঠাৎ শীতল বায়ু বহিল; হিউয়েনের মনে হইল যেন হিমজলে স্নান করিতেছেন, তাঁহার চক্ষুতে দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, এবং ঘোড়াটিও উঠিয়া দাঁড়াইবার বল লাভ করিল। শরীর স্নিগ্ধ বোধ হওয়ায় তিনি চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলেন এবং অল্পক্ষণ নিদ্রা গেলেন। নিদ্রিত অবস্থায় হিউয়েন স্বপ্ন দেখিলেন যে একজন দীর্ঘাকৃতি দৈবপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন "পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর না হইয়া এখনও ঘুমাইতেছ কেন?"

হিউয়েন নিদ্রাত্যাগ করিয়া দশ লি চলিবার পর তাঁহার ঘোড়া হঠাৎ আর এক দিকে ছুটিতে লাগিল এবং কিছুতেই তাহাকে সামলান গেল না। কয়েক লি এইভাবে যাইবার পর অনেকটা জায়গার উপর সবুজ ঘাস দেখা গেল, হিউয়েন ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাকে চরিতে দিলেন; ঘাস ছাড়িয়া তিনি আবার যাত্রারম্ভ করিবেন এমন সময় দশ পা দূরে একটি সুমিষ্ট ও স্বচ্ছ জলের কুণ্ড দেখিতে পাইলেন। ইচ্ছামত জলপান করিয়া হিউয়েন শরীরে নব বল লাভ করিলেন, অশ্বও পরিতৃপ্ত হইল। জলকুণ্ডের কাছে একদিন থাকিয়া হিউয়েন আবার যাত্রা করিলেন ও দুইদিন পরে মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ই-গু নামক স্থানে পৌছিলেন। পথে তাঁহার কত কষ্ট ও বিপদ হইয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ই-গুতে তিনি একটি বিহারে আশ্রয় লইলেন। নিকটবর্ত্তী স্থানের ভিক্ষুরা মহানন্দে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। রাজা তাঁহাকে পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন।

কাউ-চাং নামক স্থানের রাজা, ই-গুর রাজার কাছে দূত পাঠাইয়া হিউয়েনকে নিজ-রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। হিউয়েনকে লইবার জন্য তিনি দুই রাজ্যের মধ্যে ঘোড়ার ডাক বসাইয়াছিলেন এবং হিউয়েন মধ্যরাত্রে কাউ-চাংএর রাজধানীতে পৌছিলে রাজা মশালধারী অনুচরগণসহ অগ্রগমন করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রাসাদে উপনীত হইয়া চন্দ্রাতপের নীচে আসন গ্রহণ করিলে পরিচারিকাবৃন্দদ্বারা পরিবৃত হইয়া রাণী আসিয়া হিউয়েনকে অভিবাদন করিলেন। হিউয়েনের আবাস ও পরিচর্য্যার জন্য মহা সমাদরে সুব্যবস্থা করা হইল। রাজা হিউয়েনের সঙ্গে কয়েকজন ভিক্ষুর থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের শিখাইয়া দিলেন যে তাঁহারা যেন হিউয়েনকে সেই দেশেই থাকিয়া যাইতে রাজি করান। হিউয়েন কিন্তু রাজি না হইয়া দিন দশেক পরে যাত্রার অনুমতি চাহিলে রাজা বলিলেন তিনি অনেক ভিক্ষু দেখিয়াছেন কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হয় নাই, হিউয়েনের নাম শুনা অবধি কিন্তু তাঁহার চিত্তে মহা আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে; রাজা আরও বলিলেন যে সে রাজ্যের সব লোককে তিনি হিউয়েনের শিষ্যত্ব স্বীকার করাইবেন, হিউয়েন সেখানেই থাকুন। হিউয়েন তাঁহার ভারত-গমনের উদ্দেশ্যের কথা রাজাকে স্মরণ করাইয়া বলিলেন যে তিনি দরিদ্র সহায়হীন ভিক্ষু, রাজা যেন বন্ধুত্বের আতিশয্য দেখাইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে বাধা না দেন। রাজা তাঁহার আন্তরিকতা জানাইয়া বলিলেন যে সে দেশের অজ্ঞ লোকদের শিক্ষার জন্য হিউয়েন সেখানে বাস করুন; হিউয়েন

আবার তাঁহার অক্ষমতা জানাইলেন, অবশেষে রাজা চটিয়া গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন যে হিউয়েন যদি জেদ করেন তবে তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে রোধ করিয়া দেশে ফিরাইয়া পাঠাইবেন। হিউয়েন ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেন এবং বলিলেন মাত্র তাঁহার শরীরের উপর রাজার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা বা চিত্তকে রাজা স্পর্শ করিতে পারিবেন না। দুঃখে হিউনের ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতে লাগিল ও বাক্‌রোধ হইল কিন্তু রাজা অবিচলিত রহিলেন। হিউয়েনের জন্য রাজভাণ্ডার হইতে আহার্য্য আসিতে লাগিল কিন্তু হিউয়েন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি প্রায়োপবেশন করিবেন। তিন দিন তিনি অন্নজল স্পর্শ না করিয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকিলেন; চতুর্থ দিনে তিনি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া রাজার লজ্জা ও দুঃখ হইল, তিনি হিউ-য়েনের কাছে আসিয়া তাঁহাকে যাইবার অনুমতি দিলেন ও কিছু আহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। হিউয়েন রাজার আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিলে রাজা হিউ-য়েনকে বুদ্ধমূর্ত্তির কাছে লইয়া গিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, সঙ্গে রাজার মাতা ও পত্নীও ছিলেন। ইহার পর রাজার সঙ্গে হিউয়েনের ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইল। হিউয়েন সেখানে এক মাস থাকিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিলেন; এজন্য বিশেষ মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং রাজা প্রত্যহ হিউয়েনকে মহাসম্মানের সহিত আসনে বসাইয়া সপরিবারে ব্যাখ্যা শুনিতেন। এই অবসরে রাজা, হিউয়েনের পথে ব্যবহারের জন্য বহু বস্ত্র, পোষাক, আচ্ছাদন প্রভৃতি ত্রিশটি ঘোড়ার পিঠে চব্বিশ জন চাকরের সঙ্গে দিলেন। অনেক ধনরত্নও এ সঙ্গে ছিল এবং যাত্রাপথের রাজ্যগুলির রাজাদের কাছে উপঢৌকন-সহ পত্রও পাঠান হইয়াছিল। হিউয়েন এ সব বন্দোবস্ত দেখিয়া একটি দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইলেন। যাত্রার সময় রাজধানীর সব লোক ও রাজপরিবার হিউয়নকে বিদায় দিতে আসিয়া ক্রন্দনের রোল তুলিল; সপরিষৎ রাজা অনেকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন।

পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া তার পর হিউয়েন ও-কি-নি (বর্ত্তমান কারশর নামক স্থান) রাজ্যে পৌছিলেন। এখান-কার রাজা তাঁহাকে বহু সমাদর দেখাইলেন। তার পর কিউ-চি রাজ্যে আসিয়া তিনি কিছুদিন থাকিলেন। এখানে মোক্ষগুপ্ত নামক একজন পণ্ডিত-ভিক্ষু তাঁহার সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়াছিলেন। মোক্ষগুপ্ত হীনযানী ছিলেন; হিউয়েন মহাযানী এবং মহাযানের "যোগশাস্ত্র"গ্রন্থ অধ্যয়নে উৎসুক শুনিয়া মোক্ষগুপ্ত বিরক্ত হইয়া তর্ক আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিউ-চি রাজ্যের রাজা হিউয়েন বিদায় লইবার সময় তাঁহার সঙ্গে উট, ঘোড়া ও লোক দিয়াছিলেন। এখান হইতে ৬০০ লি দূরে একটি ছোট মরুভূমি পার হইয়া তিনি "বালুকা" নামক রাজ্যে আসিলেন; এখান হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে ৩০০ লি যাইবার পর দুর্গম ও তুষারাবৃত লিং পর্ব্বত পথে পড়িল। এই পর্ব্বত পার হইতে সাত দিন লাগিল ও বার-চৌদ্দজন লোক এবং অনেক ভারবাহী পশু শীতে বা অনাহারে মারা পড়িল। লিং পর্ব্বত পার হইবার পর হিউয়েন উত্তর পশ্চিমে ৫০০ লি চলিয়া সু-য়ে নগরে আসিলেন। এখানে তুর্কিরাজা য়ে-হুর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। খান্ য়ে-হু হিউয়েনকে সমাদর করিয়া নিজের তাঁবুতে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহারের সময় খান ও তাঁহার দলের লোক মাতামাতি করিয়া মাংস, মদ্য প্রভৃতি খাইলেন, কিন্তু আহারান্তে উপদেশের সময় হিউয়েন তাহাদের কাছে বুদ্ধের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলে খান তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। খান ভারতের নিন্দা করিয়া হিউয়েনকে যাত্রায় নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বিফল হইয়া হিউনের যাত্রার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং নিজ সৈন্যদলের একজন চীনা ভাষা ও অন্য বিদেশী ভাষায় অভিজ্ঞ লোককে তাঁহার সঙ্গে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
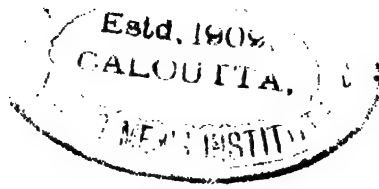
—শ্রীসুকুমার সেন

[৫৮]

হরিচরণদাস নামে অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দের এক শিষ্য অদ্বৈতপ্রভুর একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থটির নাম অ দ্বৈ ত ম ঙ্গ ল।[১] শ্রীঅচ্যুতানন্দের ও অন্যান্য ভক্তের আদেশে হরিচরণ দাস এই জীবনিকাব্যটি রচনা করেন।

আমি ক্ষুদ্র জীব হইয়া কি বর্ণিতে পারি ইহা
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আজ্ঞা মানি।
প্রভুর পুত্র জব শিষ্য আদি জত সব
তাহে আমি ক্ষুদ্র অভিমানি॥

কাব্যটি পাঁচ 'অবস্থা'য় এবং 'তেইশ সংখ্যা'য় বিভক্ত। প্রথম অবস্থায় চারি সংখ্যা, দ্বিতীয় অবস্থায় দুই সংখ্যা, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় চারি চারি সংখ্যা, আর পঞ্চম অবস্থায় নয় সংখ্যা। 'অবস্থা' ও 'সংখ্যা' এই বিভাগ নূতন বটে। পাঁচ অবস্থায় যথাক্রমে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য কালের লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

হরিচরণদাস বিজয়পুরীর নিকট অদ্বৈত প্রভুর বাল্যচরিত অবগত হন। কবি অদ্বৈতপ্রভুকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভাবনা হইল যে আচার্য্যপ্রভুর বাল্যচরিত না জানিয়া কি করিয়া তিনি জীবনি রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই সমস্যার সমাধান কি করিয়া ঘটিল তাহা কবি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

জন্মলীলা দেখিবে কেবা শুনিব কার স্থানে।
মনেতে ভাবনা করি প্রভুপদ ধ্যানে॥
পুত্রভৃত্য লইয়া প্রভু আছেন সভা করি।
ইতিমধ্যে আইলা তথা বিজয় নাম পুরী॥
বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সেহি মুখে কৃষ্ণ নাম।
কাঞ্চন শরীর হয় দিব্য তেজধাম॥
গোসাঞি দেখিয়া প্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
সম্ভাষা করিয়া তথা চরণে পড়িয়া॥[২]
সভার অগ্রেতে পুরী কহিতে লাগিলা।
প্রভুর ইঙ্গিত জানি বস্তুত কহিলা॥
ছিলট্ট দেশেতে হয় নবগ্রাম নাম।
বিমল নির্ম্মল হয় আত্মারাম ধাম॥
* * * *
সেহি গ্রামবাসী আমি ছিলাম পূর্ব্বাশ্রমে।
মহানন্দের পুরোহিত পিতাতুল্য মানে॥
নাভা দেবী ডাকি মোরে বোলে সর্ব্বকাল।
আমিহ ভগিনীপ্রায় করিএ তাহার॥
সেহি সম্বন্ধে মামা কহে প্রভু যে আচার্য্য
আমি পূর্ব্বাপর জানি সব ইহার কার্য্য॥
একান্ত করিয়া শুন সবে মন দিয়া।
অদ্বৈতজন্ম এবে কহি বিবরিয়া॥[৩]

এখানে 'প্রভু' শব্দে আচার্য্যপ্রভুকে বুঝাইতেছে। সুতরাং হরিচরণদাস আচার্য্য প্রভুর বর্ত্তমানকালেই কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। ইহার সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে এক কবিকর্ণপূরের গ্রন্থ ছাড়া হরিচরণ দাস আর কোন চৈতন্যজীবনি গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই।

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন। অদ্বৈত চরিত্র কিছু করিব বর্ণন।
শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবি কর্ণপুর। তাহে নিত্যানন্দলীলা রসের প্রচুর॥
অদ্বৈতপ্রভুর আদি অন্ত্যলীলা কিছু। বর্ণন করিব সর্ব্বে করি আগু পিছু॥[৪]

অ দ্বৈ ত ম ঙ্গ লে র মধ্যে গ্রন্থকারের আর কিছু পরিচয় মিলে না। তবে অদ্বৈতপ্রভুর বাল্যলীলা বিষয়ে কিছু কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি। অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠ চারি জন ভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চারিপুত্র সন্ন্যাস করি গেলা তীর্থপর্য্যটনে।
পুন না আইলা তারা কুবের ভুবনে॥

১। এই জীবনি কাব্যটি অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অ দ্বৈ ত ম ঙ্গ লে র একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। এই পুঁথি অবলম্বনে বর্ত্তমান আলোচনা করা যাইতেছে। পুঁথিটি ১৭১৩ শকে অনুলিখিত হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে অনুলিখিত ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ একখানি পুঁথি লইয়া প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনায় কতকটা গলতি থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা ছাড়া উপায়ান্তরও নাই। গ্রন্থটি অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়।

২। পত্রাঙ্ক ৬ এই সকল উদ্ধৃত অংশে সুপরিচিত শব্দের প্রচলিত রূপই দেওয়া গিয়াছে। ৩। পত্রাঙ্ক ১৩-১৪। ৪। পত্রাঙ্ক ৪।

[৫৯]

— তিন প্রভুতে মিলিয়া শান্তিপুরে দানলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। এই কাহিনীটিই হরিচরণদাসের গ্রন্থে বর্ণিত শেষ লীলা। তাহার পরেই গ্রন্থের "অনুবাদ" অর্থাৎ contents দিয়া অ দ্বৈ ত ম ঙ্গ লে র পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। মহাপ্রভু শান্তিপুরে দানলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যত্র কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য একদা দানলীলার অভিনয়ে রাধিকার ভূমিকা লইয়া নামিয়াছিলেন। কিন্তু অভিনয় কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই প্রেমাবেশের মত্ততায় তাঁহার মনে রুক্মিণীর ভাব আসিয়া পড়ে, সুতরাং দানলীলার অভিনয় আর সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। এই অভিনয়ের ব্যাপার চৈ ত ন্য ভা গ ব ত, চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত, চৈ ত ন্য চ ন্দ্রো দ য় প্রভৃতি প্রায় সকল চৈতন্যজীবনীগ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে। নবদ্বীপের অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অদ্বৈত প্রভু এবং বড়াই-এর ভূমিকায় নিত্যানন্দপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আর শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রাধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিচরণদাসের বর্ণিত অভিনয়েও ঠিক তাহাই।

এই দানলীলার বর্ণনাটি খাঁটি দানলীলা নহে, ইহাকে দানলীলাযুক্ত নৌকাবিলাসলীলা বলা যাইতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামীর দা ন কে লি কৌ মু দী উল্লিখিত দানলীলার সহিত ইহার বিশেষ কিছু সঙ্গতি নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত অন্যতম দানলীলা কাহিনী হিসাবে হরিচরণদাসের বর্ণনার কিছু মূল্য আছে। অ দ্বৈ ত ম ঙ্গ ল গ্রন্থ এযাবত অপ্রকাশিত বলিয়া এই দানলীলা অংশটি দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যে পুঁথি অবলম্বনে এই আলোচনা করা যাইতেছে তাহা স্পষ্টতই একটি সুপ্রাচীন পুঁথির অর্ব্বাচীন অনুলিপি মাত্র; লিপিকার অনেকস্থলেই মূল পুঁথির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে এত বাদ পড়িয়াছে যে তাহাতে মনে হয় মূল পুঁথিটি কীটদষ্ট অথবা অন্যরূপে অসম্পূর্ণ ছিল। নিম্নে উদ্ধৃত ত্রিপদী অংশটি বড়ই অঙ্গহীন। বলা বাহুল্য যে তৎসম ও সুপ্রচলিত তদ্ভব শব্দের বানান শুদ্ধ করিয়া দিয়াছি। বন্ধনীস্থিত পাঠ আনুমানিক, ছন্দঃপূরণের জন্যই দেওয়া হইয়াছে।

একদিন শান্তিপুরে[১] তিন প্রভু বসি। পূর্ব্ব ভাবিয়া দানলীলা জে প্রকাশি॥
শান্তিপুরের শোভা দেখিয়া তিন প্রভু। গোকুল নগর জ্ঞান বোলে মহাপ্রভু॥
অদ্বৈত প্রভু হইলা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। মহাপ্রভু হইলা রাধিকার রূপ॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে করিলা বড়াই বুড়ী। শ্রীবাস আদি সখী এ হইলা বড়ি॥
সখা হইলা কমলাকান্ত আর কত জন। গৌরীদাস নরহরি সুবল মধুমঙ্গল॥
এহি সব সখা হইয়া নটবর বেশ। গাবী লইয়া চরাও গোচারণ দেশ॥
সখী সঙ্গে রাধিকা বেশ ভূষণ পরিয়া। পসার সাজাইয়া লইলা সখীমাথে দিয়া॥
ললিতা বিশাখা তাহে হৈল অগ্রগণ্য। আর সব সখী বেষ্টিত পশ্চাৎ অরণ্য॥
শত শত ২ সঙ্গে রহে সেহি সব লোক। দেখিয়া বিস্মিত হইল গেল সব শোক॥
শান্তিপুরের শোভা কহন না জায়। গঙ্গা যমুনা রহে মহাশোভা হয়॥
সেহি গঙ্গা তীরে এক বৃদ্ধ নৌকা আনি। সিন্দুর চন্দন দিয়া পূজে নৌকাখানি॥
তাহার তীরেতে হয় কদম্ববৃক্ষ এক। বৃক্ষের তলাতে কৈল বেদী ৩ জে পৃথক্॥
সিন্দুরচন্দনে পট বেদীর উপর। মালা বেষ্টিত কৈল তাহার চৌতর॥
সখা সব লইয়া কৃষ্ণ গেলা সেই থানে। সিঙ্গা বেণু মুরলীর ধ্বনি[শু]না কাণে॥
গাবী সব চরিতে গেলা গঙ্গাতীর বনে। কদম্বতলাতে কৃষ্ণ সব সখাগণে॥
লগুড়ে লগুড়ে খেলা কৈল কতক্ষণ। হেনকালে দেখে দূরে রাধিকারগণ।
খেলা ছাড়ি কদম্বতলাতে দাঁড়াইল। রাধিকার মাঝে আগে বড়াই সাজাইল॥
সখি সঙ্গে রাই আইসে পসার সাজাইয়া। বিজুরি চমকে জৈছে নবঘন দেখিয়া॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পুরে কদম্বতলাএ। সখা সঙ্গে আসপাস মন্দ বেণু বায়ে॥
হেন কালে বড়াই আইলা রাধিকা সমাজে। পথ আগরিয়া জাএ যত সখা রাজে॥
কথাকার এহি তোমরা হও কেবা। কহ নিশ্চয় করি পসারে আছে জেবা॥
বড়াই কহে গোপী আমরা মথুরার সাজ। দধি দুগ্ধ ছানা ক্ষীর বিকির সমাজ॥
সুবল কহে এহি ঘাটে কেনে তুমি আইলা। এ ঘাটে নুতন রাজা দান লাগাইলা[৪]॥
তাহাতে তোমার সঙ্গে যুবতি অনেক। ইহার যেমত দান পৃথক লাগিবেক॥
ঘাটের সরদার এহোঁ নবঘন শ্যাম। আমরা হইএ ইহার অঙ্গ অনুপাম।
ঘাটি চুকাইয়া চল পার করি দিব। নহেত পসার আজি লুটিয়া খাইব॥
সখার বচন শুনি হাসিতে হাসিতে। বসিলা বড়াই বুড়ি কাসিতে কাসিতে॥
তবে কৃষ্ণ সম্মুখে আইলা মুরলি বেত্র হাতে। রাধিকার পানে চাহি কহে সখী সাতে॥
শুনহ যুবতী তোমরা আমার বচন। এথা দান দিয়া চল নৌকার সদন[৫]॥
তোমাসভাকার দান লাগিবেক ভারি। প্রচুর লইব দান তবে পার করি॥
ললিতা সম্মুখে আসি [তবেত] কহিলা। কি দান লইব এবে কহ নন্দবালা॥
নিতি নিতি আসি জাই আমরা বিকিতে। কভু নাহি জানি আমরা এমত চরিতে॥
সব অধিকার ছাড়ি হইলা ঘাটিআল। ইহাতে পালিবা লোক করিয়া সমান॥
চারি চারি কড়া কড়ি পাইবা প্রতি জনে। পসারে আট কৌড়ি অনেক যতনে॥
ইহাতে অপযশ কর রাজপুত্র হইয়া। বিলম্ব না কর দেও পার করিয়া॥

১। 'শান্তিপুর' পুঁথি।

২। 'সদসত' পুঁথি। ৩। 'দেবী' পুঁথি। ৪। 'লাগাইল' পুঁথি।
৫। 'দশন' পুঁথি।

এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ সাটোপ করিয়া। রাধিকারে কহে বলি সমুখে জাইয়া॥
সহজ ঘাটের দান শুন গোআলিনী। চারি চারি মনুষ্যে লাগে রজত মুদ্রা জানি॥
দুই পসারে দান মুদ্রা এক হয়। দ্বিগুণ চাহিয়ে এবে শুন সখীচয়॥
তাহাতে যুবতি তোমরা পুষ্ট নিতম্বিনী। কুচ যুগ ভারি বড় এহি গোয়ালিনী॥
দুই কাহন কৌড়ি দান এক এক যুবতি। পুষ্টনিতম্বিনী দান দ্বিগুণ বসতি।
উচ্চ কুচ তার বড় অনেক কৌড়ি চাহি। মুখ দেখাইতে কৌড়ি বাড়াইতে নাহি॥
জীর্ণ নৌকাখানি মোর যমুনা তরঙ্গ। এক এক করি পার করিব এহি গঙ্গ॥
তত কাল দেও দান বিলম্ব না কর। নহে মৃগনয়নী থুইয়া তুমরা চল॥
ইহার অলঙ্কার জত শরীরে ত হয়। ভারেতে ইহার বুঝি নৌকা ডুবায়॥
দেখ দেখ এহি হার বোঝা বড় হয়। ছল করি ভঙ্গি করি কৌতুক বাড়ায়॥
তবে রাধা হাতে * * ১। বড়াই বুড়ির আগে তর্জ্জন আচারী॥

যথা রাগ॥

আগ বড়াই ঠেকিল বিষম দানীর হাতে॥

কেনে আনিল আমাকে কি জানি আমার কথা
এহিদানী হও২ বড় দুষ্ট।
আমরা অবলা নারী করে নানা চাতুরী
হাসি হাসি কহে বাত মিষ্ট॥ ১॥
অগ বড়াই এ পথে বসিল দানী করে॥
এ মত জানহ যদি ঘরে বসি বেচিত দধি
মথুরাতে আছে কিবা কাজ৩
দধি কটু হইয়া জায় দুগ্ধ নষ্ট বড় দায়
বিলম্বে নাহি এবে কাজ॥ ২॥
বিষম [দানীর হাথে] ঠেকাইলা তুমি সাথে
উচ্চকুচ মাগে বহু দান।
নিতম্ব দেখিয়া বড় তেরছা নয়ান দড়
দ্বিগুণ৪ করে তার মান॥ ৩॥
তেরছা নয়ানে চাহে চঞ্চল নয়ানে কহে
কিবা আছে ইহার মনে জানি।
দানী হইয়া ঘরে (?) রহে এত কভু দানী নএ
আসিয়া আঁচল ধরি টানী॥ ৪॥
চারি কৌড়ী পায় জায় দশ পণ চাহে তায়
পসারে কহে দ্বিগুণী৫।
অবিচার যত করে সঙ্গী তার হাসি মরে
এই বড় মনে ভয় আপনি৬॥ ৫॥

ভাঙ্গা নৌকা ঘাটে দেখি ... ...৭ লিখি
[এক] বারে পার নহে সভারে।
একে একে পার করে বিচার সবে করে
সঙ্গী তার হাসি হাসি মরে॥ ৬॥
শুন গ বড়াই তুমি পরে জাইব আমি
তোমারে সঁপি৮ দানীর হাতে।
জেমন আনিলা তুমি তোমার যোগ্য হয় জানি
এহি মোর হএ মনোরথে॥ ৭॥
বড়াই হাসিয়া বোলে ভয় কর কেনে মনে
আমি আছে তোমার সহায়।
নন্দের নন্দন এহি নতুন দানী হএ সেহি
তোমারে দেখিতে করে ডর॥ ৮॥
তোমারে আগেত ধরি পিছে জাবে সহচরী
তার পরে পসার উঠিবে।
লগুড় হাতেত করি আমি সব পাছে হেরি
চিন্তা না করিয় কিছু এবে॥ ৯॥
এ বড় শঙ্কট পসার নহিএ বট
দান কই৯ মাগে অধিকই।
তুমি যদি ফিরি চাহ দণ্ড তবে নাহি দেও
ভাবিয়া দেখ না মনে জাই॥ ১০॥
শুন প্রিয়া ললিতা সখী হাসিয়া কহে না দেখি
বড়াই কহিল পরমাণে।
হরিচরণ দাসে কহে বড়াইর মন গহি নএ
কানাই করে সেই অনুমানে॥ ১১॥

বড়াইর বচন শুনি নন্দের কুমার। আসি নমস্কার করে পরম আদর॥
বড়াইর আজ্ঞা লজ্য শঙ্কট হইবে। পসার লুটা যাবে আর বস্ত্র হরিবে॥
শুনগ বড়াই তুমি যাও সখী লৈয়া। পার করিয়া দিয়ে এক করিয়া॥
এহি যুবতী হও১০ মৃগনয়ানী। নিতম্ব পুষ্ট বড় কুচের বলনি১১॥
ইহার ভারে ডুবিবেক নৌকার সব নারী। ইহারে রাখিয়া জাও১২ দানে বন্ধ১৩ ধরি।
আমি [রহিব] ইহার পহরী হইয়া। চিন্তা না করিয় কিছু মনেতে ভাবিয়া॥
এতেক বচনে শুনি সখী সঙ্গে রাই। ঘুরে চল সবে জাই ওপার না জাই॥
তবে সখা লৈয়া কৃষ্ণ চৌদিগ বেড়িলা। কিসের১৪ পসার দেখি পসার ধরিলা॥
পসার ধরিয়া নৌকাএ চড়াইলা। নৌকাএ যুবতী সভারে বসাইলা॥
জানু জলে জাই নৌকা ডুবিতে লাগিল। দধি দুগ্ধ সব খাএ পসার লুটিল॥
তবে জলে জল বেহার করিলা অনেক। সখাসখী একত্র হইয়া এক॥

১। 'নবা বন বুঝ' পুঁথি। ২। —হয়। ৩। 'রাজ'? ৪। 'দুই গুণ'? ৫। 'দুইগুণী'? ৬। 'এই বড় দানি হইয়া কহে দড় যুনি মনে ভয় আপনি' পুঁথি।

৭। 'গীরিনরঙ্গিন' পুঁথি। ৮। 'সপী' পুঁথি। ৯। —করি? ১০। 'হয়'? ১১। 'বোলনি' পুঁথি। ১২। 'জায়' পুঁথি। ১৩। 'বন্ধো' পুঁথি। ১৪। 'কিশির' পুঁথি।

তিন প্রভু এক হইয়া প্রেম উথলিল। প্রেমে অচৈতন্য হইয়া জলেতে পড়িল॥
ভক্তবৃন্দ সব তিন প্রভু উঠাইয়া লৈয়া। তীরে বসিলা সবে স্নান ও করিয়া॥
শ্রীনিবাস নরহরি আর শ্যামদাস। মুরারি মুকুন্দ আর বৈদ্য কৃষ্ণদাস॥
সবে কীর্ত্তন করে গোকুলের দান। দান ছলে প্রেম হইল নহে অসমান।
কতক্ষণে তিনের অন্তর্বাহ্য দশা। গলাগলি ধরি কান্দে মুখে নাহি ভাষা॥
চল দাদা জাই মোরা সেই বৃন্দাবনে। পরস্পরে তিনজনে করএ রোদনে॥
ভক্ত সবে প্রভুর বাক্য শুনি হইল বিমন। প্রকট করিবা প্রভু লএ সভার মন॥
ভক্তের জীবন তিনের বাহ্যদশা হইল। হুঙ্কার বলিয়া অদ্বৈত গর্জ্জিয়া উঠিল॥
মহাপ্রভু নৃত্য করিলা নিত্যানন্দ সাত। হরি হরি বোলে অদ্বৈত মাথে দিয়া হাত॥
অনেক নৃত্য হইল শ্রম হইল বড়। শ্রম দেখি শ্যামদাস চরণে পড়িল॥
নৃত্য সম্বরণ করি সবে চলি আইলা। অনেক শুশ্রূষা করি শ্রম দূর করিলা॥
এহি জে লিখন প্রভুর শান্তিপুর লীলা। মধুরা বিরহ হৈল অন্তর বিভোলা॥
প্রভুর অনেক লীলা তার এক কণ। প্রভুর নন্দনের আজ্ঞাএ লিখন যতন॥২

[৬০]

অদ্বৈত প্রভুর ভার্য্যা সীতাদেবী জীবনিবিষয়ে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন লোকনাথদাস। ইনি অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য লোকনাথ চক্রবর্ত্তী কিনা তাহা বলা সুকঠিন। তবে গ্রন্থকার যে অদ্বৈতপ্রভুর অথবা সীতাদেবীর পরিবার ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। গ্রন্থটির নাম শ্রী সী তা-চ রি ত্র। ইহা ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া শ্রীমধুসূদনদাস অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

এই নিতান্ত স্বল্পকায় গ্রন্থটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় বড় কিছুই নাই। শচীদেবীর পরিচারক ঈশানের বিষয়ে কিছু নূতন জ্ঞাতব্য কথা আছে, আর আছে সীতাদেবীর দুই শিষ্য বা শিষ্যা নন্দিনী ও জঙ্গলীর ইতিহাস ও মাহাত্ম্য বর্ণন। শ্রী সী-তা চ রি ত্রে বৃন্দাবনদাস ও তাঁহার গ্রন্থের একাধিকবার উল্লেখ আছে।[৩] গ্রন্থারম্ভ শ্লোকটি শ্রী শ্রী চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত হইতে গৃহীত। এই শ্লোকটির অনুবাদ দিয়াই মূল গ্রন্থের সূচনা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও কবিরাজ গোস্বামীর এবং চৈ ত ন্য চ রি তা মৃ ত গ্রন্থের উল্লেখও এক স্থানে পাওয়া যাইতেছে।[৪] সুতরাং গ্রন্থটির রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টম দশকের পূর্ব্বে নহে, সম্ভবতঃ দুই, তিন বা ততোধিক দশক পরেই হইবে। গ্রন্থের শেষে আছে—

ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হৈল সমাধিত।
শ্রীসীতার চরিত্র লিখিল লোকনাথ॥

অথচ ইহাতে কোন অধ্যায়াদি বিভাগ পাওয়া যায় না। কবির ভণিতায় এক একটি অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে মনে করিলেও প্রকাশিত পুস্তকটিতে দশ এগারোটির বেশী 'অধ্যায়' মিলিতেছে না। প্রকাশিত পুস্তকটি অসম্পূর্ণ মনে করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সী তা চ রি ত্রে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহা গ্রন্থকারের রচনা হওয়াই সম্ভব। ত্রিপদী অংশগুলি পদের মত; এ-গুলি "যথা রাগ" এই নির্দ্দেশ দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। একটি ত্রিপদীর ভণিতাংশে আছে—

কহে লোকনাথ দাস শ্রীচৈতন্য পদে আশ
কৃপা করি দেহ ব্রজে বাস॥ [পৃঃ ১৩]॥

ইহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে যে সী তা-চ রি ত্রে র গ্রন্থকার বৃন্দাবনস্থিত সুপ্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী নহেন। সী তা চ রি ত্রে র মত পুস্তক লোকনাথ গোস্বামীর লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না ইহা গ্রন্থটির দুই চারি পাতা পড়িলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তথাপি কেন যে সম্পাদক মহাশয় লোকনাথ গোস্বামীকেই সীতাচরিত্রের রচয়িতা বলিয়া ধরিয়াছেন তাহা অনুধাবন করা গেল না। গ্রন্থটির ভণিতা সর্ব্বত্র এক রকম নহে। যথা—

অদ্বৈত পদারবিন্দ সদা করি আশ।
সীতাচরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥
অদ্বৈত চৈতন্য পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥
কহে লোকনাথ দাস সীতার চরণে আশ
মিলিবে চৈতন্য ব্রজপুরে।
কহে লোকনাথ দাস শ্রীচৈতন্যপদে আশ
কৃপা করি দেহ ব্রজে বাস॥
অদ্বৈত সীতার পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥

১। —অপ্রকট। ২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি সংখ্যা ২২৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯৪-৯৮।

৩। এই ত প্রস্তাব আছে অনেক প্রকার।
লিখিয়াছেন বৃন্দাবন ব্যাস অবতার॥ [পৃঃ ৮]॥
এই মতে চৈতন্যের চরিত্র বিস্তার।
লিখিয়াছে বৃন্দাবন ব্যাস অবতার॥ [পৃঃ ১১]॥
এই মত প্রস্তাব আছে অনেক প্রকার।
লিখিয়াছেন বৃন্দাবন ব্যাস অবতার॥ [পৃঃ ১৬]॥

৪। ইহার অশেষ মত কবিরাজ ঠাকুর।
চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছে প্রচুর॥ [পৃঃ ১০]॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে যার আশ।
শ্রীসীতাচরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥

জঙ্গলী দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা অংশ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পাণ্ডুয়া মোকাম হইতে আইলা ফকীর।
শুনিয়া জঙ্গলী দেবীর এরূপ জাহির॥
দেওয়ান আইলা তথা ব্যাঘ্রোপরে চড়ি।
অনেক ফকির সঙ্গে ধরি রাঙ্গা ছড়ি॥
এখানে জঙ্গলী দেবী জানিলেন মনে।
হাসিয়া কহেন দেবী হরিপ্রিয়া স্থানে॥
শুন হরিপ্রিয়া বাছা পাণ্ডুয়া হইতে।
মন দৃঢ়াইতে দেওয়ান আসিবে ত্বরিতে॥
হরিপ্রিয়া বলে কিছু নাহিক বিচার।
সীতার চরণ তবে আছয়ে আমার॥
আচম্বিতে বৈকালে আইল দেওয়ান।
খাদিম বলেন নারী আনহ বিহান১॥
দেওয়ানের সঙ্গে আছে ফকির বিস্তর।
ভাণ্ডারের চেষ্টা গিয়া করহ সত্বর॥
তবে ত জঙ্গলী প্রিয়া মায়া বিস্তারিল।
আচম্বিতে পরিষদ বিছানা আনিল॥
যথেষ্ট বিছানা দিল কি কহিব তার।
জনমিয়া হেন দ্রব্য নাহি দেখি আর॥
তবেত দেওয়ান কহে জঙ্গলীর স্থানে।
ধর সওয়ারির ব্যাঘ্র বসিব আসনে॥
জঙ্গলী কহেন বাছা শুন হরিপ্রিয়া।
রাখহ ব্যাঘ্রেরে তুমি কর্ণেতে ধরিয়া॥
নাম্বিল দেওয়ান ব্যাঘ্র হরিপ্রিয়া ধরি।
মারেন দ্বাদশ পাক অতি উচ্চ করি॥
বিস্মিত হইল দেওয়ান ভাবে মনে মন।
হিন্দু মাঝে বুঝি আছ তুমি একজন॥
যোড় হস্ত করি বলে আজ্ঞা দেহ মোরে।
জানিলাম যাই তবে পাণ্ডুয়া নগরে২॥

নন্দিনী ও জঙ্গলী পুরুষ ছিলেন। পরে সাধনার জোরে ইঁহাদের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ঘটে অথবা সাধনার জন্যই ইঁহারা স্ত্রী-বেশে থাকিতেন। ইহা প্রতিপন্ন করা সী তা চ রি ত্র-রচয়িতার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

১। 'বিহান'? ২। পৃঃ ২২-২৩।

[৬১]

পুরাতন বাঙ্গালায় কৃষ্ণায়ণ কাব্য স্থূলতঃ তিন শ্রেণীতে পড়ে। (১) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য, (২) পদাবলী বা গীতি কাব্য, (৩) তত্ত্ব বা পুরাণ কাব্য। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' জাতীয় কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পাইতেছি মালাধর বসু—গুণরাজ খানের শ্রী কৃ ষ্ণ বি জ য়ে বা (নামান্তর) গো বি ন্দ-ম ঙ্গ লে। এই কাব্যটির সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি [বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য তাহার পরই নাম করিতে হয় রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্যের শ্রী কৃ ষ্ণ প্রে ম ত র ঙ্গি ণী র।৩ শ্রী কৃ ষ্ণ বি জ য়ে র মত এই কাব্যখানিও শ্রী ম দ্ভা গ ব তে র অনুবাদ বটে, তবে গুণরাজের কাব্যের মত শুধু শেষ তিন স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র নহে, সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদ। শ্রী কৃ ষ্ণ বি জ য়ে র মত কৃ ষ্ণ প্রে ম ত র ঙ্গি ণী র শেষ তিন স্কন্ধ মর্ম্মানুবাদ নহে, আক্ষরিক অনুবাদ। প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ মর্ম্মানুবাদ বটে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধে মূলের অধ্যায় সংখ্যা যথাযথ রাখা হইয়াছে, কিন্তু অপর স্কন্ধ-গুলির অধ্যায় সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা, প্রথম স্কন্ধে মূলে উনিশ অধ্যায়ের স্থলে কৃ ষ্ণ প্রে ম-ত র ঙ্গি ণী তে পাই তিনটি মাত্র অধ্যায়; এইরূপে দ্বিতীয় স্কন্ধে দশটি অধ্যায়ের স্থলে দুইটি অধ্যায়, তৃতীয় স্কন্ধে তেত্রিশটি অধ্যায়ের স্থলে আটটি অধ্যায়, চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিশটি অধ্যায়ের স্থলে আটটি অধ্যায়, পঞ্চম স্কন্ধে ছাব্বিশটি অধ্যায়ের স্থলে আটটি অধ্যায়, ষষ্ঠ স্কন্ধে উনিশটি অধ্যায়ের স্থলে তিনটি অধ্যায়, সপ্তম স্কন্ধে পনেরটি অধ্যায়ের স্থলে পাঁচটি অধ্যায়, অষ্টম স্কন্ধে চব্বিশটি অধ্যায়ের স্থলে পাঁচটি অধ্যায়, এবং নবম স্কন্ধে চব্বিশটি অধ্যায়ের স্থলে চারটি অধ্যায়। কিন্তু দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে অধ্যায় সংখ্যা যথাক্রমে নব্বুই, একত্রিশ এবং তের।

কবি কর্ণপূরের গৌ র গ ণো দ্দে শ দী পি কা য় [শ্লোক সংখ্যা ২০৩] কৃ ষ্ণ প্রে ম ত র ঙ্গি ণী র উল্লেখ আছে।

৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৩১২ সালে প্রকাশিত হয়, এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া হইয়া বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। বঙ্গবাসী সংস্করণটিই [illegible] বলিয়া এই আলোচনায় অবলম্বিত হইয়াছে।

নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী।
শ্রীমদ্‌ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ॥

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৯৮ শকে অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী খ্রীষ্টীয় ১৫৭৬ সালের অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কবি রঘুনাথ পণ্ডিতের নিবাস ছিল বরাহনগর। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহার অশেষ অধিকার ছিল। গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে মহাপ্রভু বরাহনগরে রঘুনাথের গৃহে রাত্রিবাস করেন। রঘুনাথের ভাগবত পাঠে শ্রীচৈতন্য মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নাম ভাগবতাচার্য্য রাখেন।[১] ভাগবতাচার্য্য গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[২] ইঁহাকে গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্তই ধরিয়াছেন। কবিও নিজে বলিয়াছেন—

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুত[৩] গদাধর নামে। যাহার মহিমা ঘোষে এতিন ভুবনে।
ক্ষিতিতলে কৃপায়ে কেবল অবতার। অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার॥
বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণ চৈতন্য-মূরতি। তাঁহার অভিন্নদেহ সহজ[৪] শকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুইচরণ। দেহ মন বাক্যে মোর সেই সে শরণ॥
তাহার চরণে রহু সতত প্রণতি। কৃষ্ণ গুণ ভাষাতে বর্ণিব যথামতি॥[৫]

ভণিতার মধ্যেও অনেক স্থলে কবি গুরুর নাম করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কবির আর কিছু পরিচয় কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী হইতে পাওয়া যায় না।

[৬২]

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী গান করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল, ইহা যে শুধু রাগ-রাগিণীর উল্লেখ হইতেই অনুমান করা যায় তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের অনেক পুঁথিতে ভাগবতাচার্য্যের ভণিতা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলি গায়কের পুঁথি, তাহারা একাধিক কাব্য হইতে গান সংগ্রহ করিয়া পালা বাঁধিতেন। সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী গীত হইত বলিয়া মনে হয় না, কারণ ইহার রচনা গম্ভীর, ইহার মধ্যে লঘু রচনা প্রক্ষেপ করিয়া জনসাধারণের চিত্ত রঞ্জিত করিবার কোন প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় না।

১। শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়। ২। আদি লীলা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। ৩। 'শ্রীযুত' মূল। ৪। 'সহজে' মূল। ৫। প্রথম স্কন্ধ, প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীতে এই রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ আছে। মল্লার, সিন্ধুড়া, কেদার, নট, সু(হ)ই, বেলোয়ার, বরাড়ী, শ্রী, ভাটিয়ালী, বসন্ত, ললিত, ললিতবসন্ত, তোড়ি (তুড়ি), দেশাগ, গৌড় মল্লার, মালব গৌড়, পঠমঞ্জরী, কানাড়া, মারাটি, গোণ্ডকিরী (গণ্ডরী), কামোদ, মালশ্রী, ভৈরবী, ধানশী, পাহাড়ী, গয়ড়া, সাম, সারঙ্গ, পাহিড়া, গৌরী, গান্ধার, রামকিরী, আহীর, ভূপালী, সিন্ধু, বিভাস।

সাধারণ 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের মত কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী লঘু রচনা নহে। ইহাতে সাধারণ শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট হইবার মত বিশেষ কিছু নাই। শ্রীমদ্ভাগবত শুধু ভক্তিকে জাগরিত করে না, বুদ্ধিকেও উদ্বুদ্ধ করে; ইহা তাহারই অনুবাদ। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীর রচনা গম্ভীর ও ওজস্বী না হইয়া পারে না। সত্যই তাহাই। ভাগবতাচার্য্যের ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল, তাহা না হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের মত কঠিন গ্রন্থের এমন সুললিত অনুবাদ করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীতে ভাগবতাচার্য্য কোনরূপ মৌলিক কবিত্বক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। প্রাচীন অনেক 'মৌলিক' কবি ভাগবতাচার্য্যের মত ভাষাজ্ঞান ও সূক্ষ্ম ছন্দোবোধ পাইলে বর্ত্তাইয়া যাইতেন। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী সুবৃহৎ কাব্য হইলেও ইহার পয়ারের মধ্যে অক্ষরাধিক্য অথবা অক্ষররাহিত্যের দরুণ ছন্দঃপতন কুত্রাপি হয় নাই। ইহা খুব কম কাব্যের পক্ষেই বলা যায়।

মধ্যে মধ্যে পদলালিত্য বেশ সুন্দর। যেমন,—

পাপিনী পূতনা সে যে নানা মায়া জানে। মায়ায় যুবতী বেশ ধরিলা আপনে॥
কেশ পাশ বিনিহিত ফুল্ল মল্লিমালা। পৃথুশ্রোণী কুচভর গমন মন্থরা॥
ক্ষীণ কটিতট পট্টবাস পরিধানা। কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ড মুদিতবচনা॥
ভুরুভঙ্গ বিলসিত মুনি মনোহরা। বিলোল অলকাবলী কুঞ্চিত কুন্তলা॥
অলস বিলস গতি কমল ঢুলায়। চকিত চপল দিঠী নন্দ ঘরে যায়॥[৬]

ভাগবতাচার্য্যের অনুবাদ দক্ষতার কিছু পরিচয় দিতেছি।

তোমার চরিত্র কথা অমৃতের ধারা। এ ঘোর সংসার দুঃখ সন্তাপ নিবারা॥
পুরাণ পুরুষগণে গায় নিরন্তর। শুনিলে দুরিত হরে শ্রবণমঙ্গল॥
মহাজন জনে কৈল জগতে বিস্তার[৭]। কেবল চরিতকথা কহিলে নিস্তার॥

৬। দশম স্কন্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়। ৭। 'বিস্তর' মূল।

হেন পুণ্য গুণকথা কহে যে বা জনে। সর্ব্বদান পুণ্যফল লভে সেই ক্ষণে॥
অমৃতমধুর ভাষা মন্দমধু হাস। কুটিল কটাক্ষপাত লীলা পরিহাস॥
ললিত চঞ্চল লীলাচলন চপল। এ সব তোমার লীলা স্মরণমঙ্গল॥
আমি সব মুগ্ধ হৈলুঁ দেখি এই লীলা। দরশন দিয়া প্রাণ রাখ নন্দবালা॥
* * *
দিবসে বেড়াহ যদি কানন-অটনে। এক ক্রটি যুগসম হেন লয় মনে॥
না দেখিলে কত কত বাড়য়ে বিষাদ। চান্দমুখ দেখি যদি সে বড় প্রমাদ॥
নয়ন ভরিয়া যদি দেখিব আনন। তাথে বিধি জড়মতি কৈল বিড়ম্বন॥
আঁখির নিমিষ দিল আর লোমাবলি। মনের সন্তোষে মুখ চাহিতে না পারি॥১

ইহার সহিত মূল তুলনা করিবার জন্ম উদ্ধৃত করা গেল।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবিগৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥
* * *
অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্॥২

দশম স্কন্ধের প্রারম্ভের এই অবতার বন্দনাটি অনুবাদ নহে, কবির নিজস্ব। জয়দেবের একটি গীতের ভাব ইহার মধ্যে কিছু আছে।

জয় জয় নন্দসুত ব্রজকুলপতি। জয় জয় যদুনাথ ত্রিভুবনগতি॥
জয় জয় জগতনিবাস হৃষীকেশ। জয় জয় ভক্তকুল নলিনীদিনেশ॥
জয় জয় ব্রহ্মাদি বন্দিত পাদপদ্ম। জয় জয় দিব্য অবতার নবসদ্ম॥
জয় জয় কমলালালিতপদদ্বন্দ্ব। জয় জয় মুনীন্দ্রমানসসুখানন্দ॥
জয় জয় গুণনিধি জয় দয়াময়। জয় জয় ভকতবৎসল রসময়॥
জয় জয় যদুকুল কমলভাস্কর। জয় জয় ব্রজবধূকঞ্জ শশধর॥
জয় জয় মহাভয়দুরিতভঞ্জন। জয় জয় পরচণ্ড পাষণ্ডখণ্ডন॥
জয় জয় অসুরকুঞ্জরমহাসিংহ। জয় জয় ব্রজবধূমুখপদ্মভৃঙ্গ॥
জয় জয় যোগেন্দ্রমানস পরহংস। জয় ভক্তভবপথপরিশ্রমধ্বংস॥
জয় জয় জগতমঙ্গল গুণধাম। শ্রুতিবাণী অগোচর গুণগণশম॥
জয় জয় জগৎনিবাস লক্ষ্মীকান্ত। জয় জয় নিজ জনবৎসল মহান্ত॥
জয় জয় মহামৎস্য আদি অবতার। জয় কূর্ম্মরূপ ক্ষীরজলধিবিহার॥
জয় যজ্ঞ-অবতার বরাহমুরতি। জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশকতি॥
জয় দিব্যপরাক্রম অদ্ভুতবামন। জয় ভৃগুপতি ক্ষত্রিকুলবিনাশন।
জয় জয় রঘুপতি রাম অবতার। জয় হলধর রাম বিপক্ষবিদার॥
জয় বুদ্ধ-অবতার অসুরমোহন। জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছকুলবিনাশন॥
জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্রবিহার। জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্যমূরতি। প্রেমভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি॥

১। দশম স্কন্ধ, একত্রিংশ অধ্যায়। ২। শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, একত্রিংশ অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা ৯, ১০, ১৫।

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে প্রায়শই এই ভণিতাটি প্রযুক্ত হইয়াছে—

ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান। ভাগবত-আচার্য্যের মধুরস গান॥

অন্যবিধ ভণিতার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

ভক্তিরস গুরু শ্রীগদাধর জান। ভাগবত আচার্য্যের মধুরস-গান॥
চৈতন্য পদারবিন্দমকরন্দরসে। প্রেমতরঙ্গিণী কহি মুদিতমানসে॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরসবাণী। ভাগবত কথা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥
ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভারতী। চৈতন্য পদারবিন্দ গদাধরগতি॥

ইত্যাদি।

[৬৩]

মাধব আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর প্রায় সমসাময়িক রচনা। তবে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ তিন স্কন্ধের ঠিক অনুবাদ বলা চলে না। ইহাতে ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণচরিতের গল্পাংশ বর্ণিত হইয়াছে, এই মাত্র বলা চলে। কবি প্রয়োজন মত অন্য পুরাণাদিরও সাহায্য লইয়াছেন। সে কথা কবি স্বীকারও করিয়াছেন।

রাজরাজ-অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ মতে॥৪
পারিজাতহরণ ঈষৎ ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব বিষ্ণুপুরাণের মতে॥৫

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের লীলা কোন পুরাণেই উল্লিখিত হয় নাই। তাহাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রাধা, চন্দ্রাবলী এবং বড়াইয়ের উল্লেখও ইহাতে আছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ললিতাদি সখীর ব্যক্তিগত উল্লেখ নাই। শঙ্খচূড় বধের প্রসঙ্গে কতকগুলি গোপীর উল্লেখ আছে[৬] তাহার মধ্যেও ললিতা এবং বিশাখার নাম নাই। ললিতা ও বিশাখার উল্লেখ একেবারে না থাকা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা বটে।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে কবি মাধবের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র জানা যায় যে তিনি মহাপ্রভুর কোন পারিষদের শিষ্য ছিলেন।

৩। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৩৩ সাল) অবলম্বনে। ৪। পৃঃ ১৭৪। ৫। পৃঃ ২১২। ৬। পৃঃ ১১৮-১২০। এই গোপীদের উল্লেখ আছে—রাই (রাধা), চন্দ্রাবলী, শশিকলা, লীলা, সানন্দা, লীলাবতী, শুচি, প্রেমবতী, বিলাসিনী, স্বর্ণপ্রভা, হরিপ্রিয়া।

সব অবতার শেষ কলি পরবেশ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র গুপ্তপ্রবেশ।
প্রেম ভকতি রস করেন প্রকাশ। কহে দ্বিজ মাধব তার দাসের দাস ॥১

কলিযুগে চৈতন্য প্রকাশ।
দ্বিজমাধব কহে তার দাসের দাস ॥২ ইত্যাদি।

"ছাআলের বোলে ভাই না করিহ হেলা" [পৃঃ ২] এই উক্তি হইতে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কবির অল্প বয়সের রচনা।

মহাপ্রভুর এক ভক্ত যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল লিখিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ আছে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায়—

মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এবং চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনে এক মাধবাচার্য্যের উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় যে মাধবাচার্য্যের উল্লেখ আছে, তিনি স্পষ্টতঃই নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা মাধব-আচার্য্য। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণবাভিধানে এক মাধবাচার্য্যের এবং এক মাধবানন্দাচার্য্যের উল্লেখ আছে। ইঁহাদের একতম সম্ভবতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা হইবেন।

প্রেমবিলাসের মতে কবি মাধব-আচার্য্য বা মাধব মিশ্র হইতেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। মাধবের পিতার নাম কালীদাস এবং মাতার নাম বিধুমুখী। মাধব শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়া তাহা শ্রীচৈতন্যের পদে সমর্পণ করেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা মতে মাধব অদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ। গীতি বর্ণনাতে তিঁহ করি নানা ছন্দ ॥
রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীচৈতন্য পদে তাহা সমর্পণ কৈল ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে।
মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিল কহিতে ॥৩

বেশী বয়সে মাধব বৃন্দাবনে গমন করেন।

শ্রীরূপের পদে গিয়া আত্ম সমর্পিল। ভজনের তত্ত্ব যত সকল জানিল ॥
সন্ন্যাস করিয়া তিঁহ রহি বৃন্দাবন। ব্রজের মধুর ভাব করয়ে ভজন ॥৪

খেতরীর উৎসবে মাধব শ্রীঅচ্যুতের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। পরে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন।

১। পৃঃ ১…। ২। পৃঃ ১১। ৩। প্রেমবিলাস, দ্বিতীয় বহরমপুর সংস্করণ (১৩১৮ সাল), পৃঃ ৩১৬। ৪। ঐ, পৃঃ ৩১৭।

প্রেমবিলাসে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, নরোত্তম ঠাকুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রত্যহ গীত হইত।

প্রথমে করয়ে গান চৈতন্য মঙ্গল।
তারপর হয় গান শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ॥৫

প্রেমবিলাসের কথা অনেকে উড়াইয়া দিয়া থাকেন। যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবিশ্বাসের কোন হেতু অথবা প্রেমবিলাসের উক্তির কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রেমবিলাসের উক্তির উপর কতকটা নির্ভর না করিয়া থাকা যায় না।

আবার অনেকে বলেন,[৬] যে মাধব "ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত"-এ অর্থাৎ ১৫০১ শকে বা ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে শারদাচরিত বা দুর্গামাহাত্ম্য বা চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন সেই সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীনিবাসী দ্বিজবর পরাশরের পুত্র মাধবই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা, কালিদাসাত্মজ মাধব কোন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন নাই। কিন্তু একাধিক মাধব যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যেই একাধিক মাধবের রচনা আছে। ইহার মধ্যেই ভাগবতাচার্য্য[৭] এবং পূর্ণানন্দের[৮] রচনাও অল্প যে কিছু ঢুকিয়া গিয়াছে তাহা গায়কের সংগৃহীত পালার অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তবে গ্রন্থটির অধিকাংশই যে প্রাচীনতর মাধবের রচনা ইহা বলিবার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। প্রথম যুক্তি এই, কাব্যরচনার কালে শ্রীচৈতন্য বর্ত্তমান ছিলেন ইহা কবির উক্তি হইতে অনুমান হয়। যেমন,

সুরধুনী তীরে বিশেষ নবদ্বীপ।
যথায় চৈতন্যচন্দ্র অদ্বৈত সমীপ ॥৯

এখানে অদ্বৈতপ্রভুর উল্লেখ অনুধাবন যোগ্য।

কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার।
দ্বিজ মাধব কহে কিঙ্কর তাহার ॥১০

চৈতন্য চরণ ধূলি শিরে ধরি কুতুহলী
দ্বিজ মাধব রস ভাষে ॥১১

৫। ঐ, পৃঃ ৩১৮। ৬। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ভূমিকা, পৃঃ ২০১। ৭। পৃঃ ৪২, ৪৯, ৫১। ৮। পৃঃ ১৩৩, ১৭১। ৯। পৃঃ ২। ১০। পৃঃ ১৫। ১১। পৃঃ ২৬০।

চৈতন্য চরণ শিরে করিয়া আনন্দে।
দ্বিজ মাধব কহে এ কথা গোবিন্দে ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু সন্ন্যাসী বিহরে।
যাহার প্রসাদে লোক তরয়ে সংসারে ॥
শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥১

দ্বিতীয় যুক্তি এই, ইহাতে ললিতা ও বিশাখার উল্লেখ নাই। অপর মাধবের রচনায় আছে। তৃতীয় যুক্তি এই, দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী মাধবের ভাষা প্রথম মাধবের ভাষা অপেক্ষা অর্ব্বাচীনতর। ইহার উদাহরণ পরে মিলিবে।

দুই মাধবের ভণিতাপ্রণালী বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথম বা প্রাচীনতর মাধবের বিশিষ্ট ভণিতা হইতেছে :—

শুন শুন অরে২ ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

আর দ্বিতীয় মাধবের বিশিষ্ট ভণিতা হইতেছে—

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণ কমল।
দ্বিজমাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ॥

এই দ্বিতীয় ভণিতা 'দ্বিজ মাধব' বিরচিত গ ঙ্গা ম ঙ্গ লে৩ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে—

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণ কমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল ॥

'চৈতন্যচন্দ্রচরণ কমল'-এর সুবহুবার উল্লেখ থাকিলেও গ ঙ্গা ম ঙ্গ লে র কুত্রাপি কবি আপনাকে 'চৈতন্যকিঙ্কর' অথবা 'তাঁহার দাসের দাস' ইত্যাকার কিছু বলেন নাই। কাব্যের শেষ ভাগে এরূপ উক্তি কিছু ছিল কিনা বলিতে পারি না।

উপরে উল্লিখিত ভণিতা দুইটি দুই কবির বিশিষ্টতার চিহ্ন-স্বরূপ গ্রহণ করিলে কবিদ্বয়ের কাব্যের যৎকিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। নিম্নে 'যদুবংশের ব্রহ্মশাপ' অংশটি দুই কবির রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া দুই কবির স্বাতন্ত্র্য দেখান যাইতেছে।

স্বধামে যেরূপে হরি করিলা গমন। সংক্ষেপে রচিব তাহা শুন ভক্ত গণ ॥
একদিন নির্জ্জনে বসিয়া নারায়ণ। অনুমান করিয়া ভাবেন মনে মন ॥
বিনাশ করিলুঁ আমি দুষ্ট রাজগণ। তথাপি হইল নাহি ভূভার হরণ ॥
*　　*　　*
নিজ বংশ বধ করা স্বয়ং অনুচিত। ছলক্রমে মায়া করি করিব বিহিত ॥
এইরূপে ভগবান ভাবিয়া নিশ্চয়। ব্রহ্মশাপ ছলে কৈল যদুকুলক্ষয় ॥
একদিন মুনিগণ কৃষ্ণের আহ্বানে। দ্বারকা আইল কোন যজ্ঞের কারণে ॥
*　　*　　*　　*　　*
উপহাস করি যত যাদব নন্দনে। প্রণাম করিয়া কহে সেই মুনিগণে ॥
স্ত্রীবেশে করায়্যা শাম্বে জাম্বুবতীসুতে। অবিলম্বে বালকেরা জিজ্ঞাসে বিনীতে ॥
গর্ভবতী এই নারী শুন মুনিগণ। জিজ্ঞাসিতে নাহি পারে লাজের কারণ ॥

১। পৃঃ ২৮২। ২। 'আরে' পাঠান্তর।

৩। গঙ্গামঙ্গল শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল পুঁথি খণ্ডিত বলিয়া পুস্তকটি অসম্পূর্ণ।

কি সন্ততি প্রসবিবে বল কৃপা করি। কপট বিনয়ে কহে ভয় পরিহরি ॥
শুনিয়া এতেক বাক্য মুনি ধ্যান কৈল। তত্ত্বজ্ঞান মুনিগণে কোপ উপজিল ॥
ক্রুদ্ধ হয়্যা বলে সভে শুনহ বচন। এখনি প্রসব হবে অরিষ্ট লক্ষণ ॥
জন্মিব মুষল এক সকলে দেখিব। সে মুষল হৈতে যদুকুল ধ্বংস হব ॥
এতেক বলিতে খসি পড়িল মুষল। দেখিয়া কম্পিত হইল কুমার সকল ॥
*　　*　　*　　*
মহা ভয়ে উগ্রসেন বলে সভাকারে। মুষল করিয়া হাতে যাহ প্রভাসেরে ॥
ঘসিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে। শেষ হৈলে তাহা ফেল সমুদ্রভিতরে ॥
রাজার বচন শুনি যত শিশুগণ। মুষল লইয়া তথা করিল গমন ॥
ক্ষয় কৈল মুষলেরে পাষাণ উপরে। অল্প মাত্র শেষ ফেলে সমুদ্রভিতরে ॥
মুষল ঘর্ষণ চূর্ণ পড়িল যথায়। নলখাগড়ার বন জন্মিল তথায় ॥
সমুদ্রের জলে যাহা করিল ক্ষেপন। সেই লোহা এক মৎস্য করিল ভক্ষণ ॥
মৎস্যবর ধরি জেল্যা নগরে আনিল। মৎস্যেরে কাটিতে লৌহ উদরে পাইল ॥
দেখিয়া লুব্ধক লৌহ মাগিয়া লইল। শরের আগেতে তাহা ফলা করি দিল ॥
জরা ব্যাধ সেই বাণ করিয়া যতন। তূণের ভিতরে রাখে মৃগের কারণ ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজমাধব রচিত ॥৪
ওথা স্বর্গে ব্রহ্মা তবে মনেতে চিন্তিল। ভারাবতরণে হরি পৃথিবীতে গেল।
মারিয়া ত দুষ্ট দৈত্য দেবকার্য্য করি। আপনা পাসরি ক্ষিতি রহিলা শ্রীহরি ॥
অনুমান করি ব্রহ্মা সর্ব্ব দেব লৈয়া। গেলা ত দ্বারকাপুরী রথেতে চড়িয়া ॥
*　　*　　*
হাসিয়া সম্মুখ হয়্যা বলেন নারায়ণ। বসিতে আসন দিলা কমললোচন ॥
যত সব কহিলে আমি করিয়াছি মনে। নিকট বৈকুণ্ঠপুরী করিব গমনে ॥
দর্পেতে মারিয়া দৈত্য যত কিছু কৈল। সেহ কিছু নহে অধিক ভূমিভার হৈল ॥
আমার এবংশেতে জন্মিল যত বীর। তেঞি কম্পমান ক্ষিতি কেমনে হবে স্থির ॥
*　　*　　*
পাঠাইয়া দেবগণে চিন্তে নারায়ণ। ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি বংশের নিধন ॥
হেনকালে মুনিগণ স্বচ্ছন্দ গমনে। দ্বারকা আছেন কৃষ্ণ করি দরশনে ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ সকল জানিল। বাহির হইতে নিজ অভ্যন্তরে গেল ॥
*　　*　　*
অভ্যন্তরে গিয়া না দেখিল গোবিন্দাই। মায়া স্ত্রী বেশ ধরি আইলা তথাই ॥
শাম্ব নামে কুমারের স্ত্রীবেশ করি। লহুপাত্র উদরে দিয়া গর্ভ হেন ধরি ॥
মিনতি বচন বলি মুনিপাশে গিয়া। বড় দুঃখ পায় নারী গর্ভ ধরিয়া ॥
কি বালক প্রসব হৈব বল সত্য করি। মধুর ভাষায় বলে শঙ্কা পরিহরি ॥
শুনিয়া এতেক বাণী মুনি ধ্যান কৈল। তত্ত্ব জানিয়া মুনি ক্রোধ বাড়াইল।
জানিল সকল তত্ত্ব শুনিল৫ পুত্রগণ। এখনি প্রসব হৈল অরিষ্টলক্ষণ ॥
জন্মিবে উত্তম বংশ সভাই দেখিবে। সেই বংশ হৈতে তোমার বংশক্ষয় হবে ॥
এতেক বলিতে খসি পড়িল মুষল। দেখিয়া কম্পিত হৈল কুমার সকল ॥
*　　*　　*
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ বলে সর্ব্বজনে। মুষলহাথে প্রভাসেরে যাহ পুত্রগণে ॥
ঘসিয়া ত কর ক্ষয় পাষাণ-উপরে। শেষ হইলে ফেলিহ প্রভাসের জলে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি যত যদুগণ। মুষল লয়্যা প্রভাসেরে গেল সর্ব্বজন ॥
ঘসিয়া ত ক্ষয় করে পাষাণ উপরে। অল্পমাত্র শেষ ফেলে সমুদ্র ভিতর ॥
গোসাঞির মায়া কিছু বুঝন ন যায়। লহু স্কন্ধে খাগড়াবন জন্মিল তথায় ॥
সেই শেষ লহু মাত্র সমুদ্রে ফেলিল। বিষম বোদালি তাহা পাইয়া ভক্ষিল ॥
মারিয়া ত মৎস্যজীবী বেচিতে লাগিল। মৎস্য কিনি ব্যাধপত্নী ঘরেতে আনিল
কুটিতে পাইল লহু মৎস্যের উদরে। ফলি গড়াইয়া দিল কাণ্ডের উপরে।
ঘরে নিয়া থুইল তাহা মৃগ মারিবারে। নিত্য মৃগ মারি বুলে অরণ্য ভিতরে ॥
*　　*　　*
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্রচরণ কমল। দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ॥৬

(ক্রমশঃ)

৪। পৃঃ ৩১৬-৩১৭ (পরিশিষ্ট)। ৫। 'শুন'? ৬। পৃঃ ৩২৭-৩২৯।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক গ্রীস

'গ্রীস' কথাটা উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক গৌরব-সমৃদ্ধ দিনের কথা মনে পড়ে। গ্রীস বলতে আমরা বুঝি হোমার, প্লেটো, আরিষ্টটল; গ্রীস বলতে আমরা বুঝি ফিডিয়াস, সফোক্লিস, সাফো। কিন্তু আধুনিক কালের গ্রীসের বিষয়ে আমরা কিছুই খোঁজ রাখি না। এখন সেখানে আর দেবতারা বাস করেন না, আমাদের মত নর-জীবকুলই বাস করে থাকে, তা হলেও বর্ত্তমান গ্রীস পৃথিবীর মধ্যে অতি সুন্দর দেশ।

সুপরিচিত বন্ধু। কিন্তু যখন তিনি ২৫ বছর আগে গ্রীস দেখতে গিয়েছিলেন, তখন জেউস, আফ্রোদিতে, হারমিস্ এপোলো বন্য বৈদেশিকে পরিণত হয়েছেন—এই হিসেবে যে, তাঁদের বাসস্থান ওলিম্পাস পর্ব্বত তখন গ্রীসের সীমার বাইরে।

প্রাচীন গ্রীসের লোকসংখ্যা অপেক্ষা বর্ত্তমান হেলেনিক্ রিপাবলিকের লোক সংখ্যা অনেক বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রীস আর প্রাচীন কালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেই। আমার পিতার গ্রীস-ভ্রমণের পরে এথেন্সের আকাশ পর্য্যন্ত
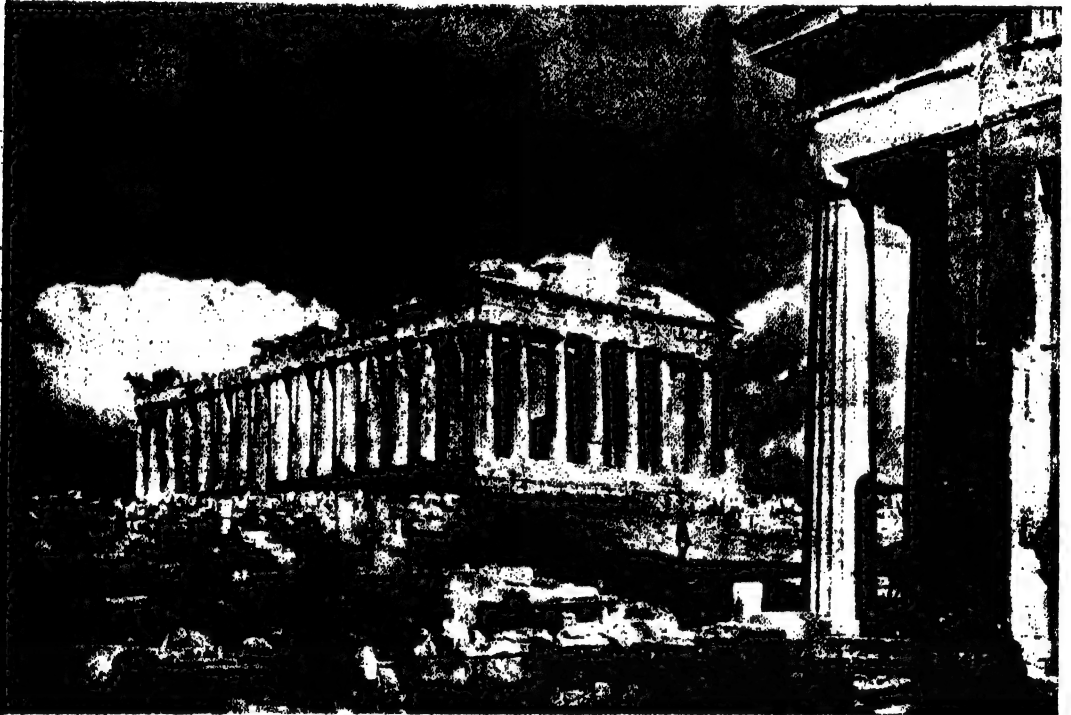
পার্থেনন — ২৪৩ বৎসর পরে পুনঃ সংস্কৃত

বিখ্যাত পর্য্যটক মেনার্ড উইলিয়ামসের গ্রীস সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করা গেল :—

আমার পিতার কাছে প্রাচীন গ্রীসের মত দেশ ছিল না জগতে। গ্রীসের অতীত-গৌরবের কাহিনী তাঁর ভোজ-টেবিলের খোসগল্প ছিল, ওলিম্পাস পর্ব্বতের দেবতারা ছিলেন তাঁর

বদলে গিয়েচে। যে নির্ম্মল নীল আকাশের তলায় জহুরীরা প্রোপাইলিয়া ও পার্থেননের মূল্যবান পাথর বসিয়েছিল—সে আকাশ এখন কলকারখানার ধোঁয়ায় মলিন।

কিন্তু গ্রীস-দেশের সাধারণ কৃষকশ্রেণীর লোকেও তার স্বপ্ন ভেঙে দেবে না, যদি অতীতের স্বপ্ন-মাখানো চোখে

কোনো ভ্রমণকারী আধুনিক গ্রীসে বেড়াতে এসে আক্রোপোলিসের ধ্বংসস্তূপে 'অশ্বারোহী চতুষ্টয়'এর অনুসন্ধান করে—বরং যা সে খুঁজতে এসেছিল, তার চেয়ে ভাল কোনো জিনিস সে দেখবে এদের মধ্যে।

তুরস্কের অধীনতাপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার একশত বছরের মধ্যে গ্রীস সকল বিষয়ে অসাধারণ উন্নতি করেছে। নবীন গ্রীস অত্যন্ত উন্নতিশীল, পুরাতনের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো যোগ নেই—নবীন গ্রীসের আদর্শ মার্কিন যুক্তরাজ্য। ছাত্রেরা এখান থেকে পড়তে যায় আমেরিকায়। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ—আমেরিকা গ্রীসের তামাক, ফল ও কার্পেট কেনে—গ্রীস আমেরিকার নিকট প্রতি বৎসর ২৫ কোটি ডলারের মাল কেনে।

আমরা আকাশ-পথে প্রথম গ্রীস ভ্রমণে যাই। ব্রিন্দিসিতে যে স্তম্ভটি প্রাচীন যুগের রোমান পথ 'এপিয়ান ওয়ে'র শেষ সীমা জ্ঞাপন করছে, আমাদের ভ্রমণ সুরু হয়েছিল সেখান থেকে—উর্ব্বর অথচ ম্যালেরিয়াসঙ্কুল ইটালির জলাভূমির ওপর দিয়ে আমরা গেলাম ওট্রান্টো পর্য্যন্ত, পার হয়ে গেলাম কর্ফুতে, পর্ব্বতময় কর্ফুর পশ্চিমতীর প্রদক্ষিণ করে এবং 'ইউলিসিসের জাহাজ' নামে অতি সুন্দর ছোট দ্বীপটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে আমরা কর্ফু সহরের প্রাচীন দুর্গের অনতিদূরে মাটীতে নামলাম।

জলপাই-বাগানে ও সাইপ্রেস-কুঞ্জে সুসজ্জিত এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্যে পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ। অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এখানে অবসর সময় অতিবাহিত করতেন, ট্রয়যুদ্ধের সুন্দরতম বীরপুরুষ একিলিসের নামে এই আবাসস্থানের নাম রেখেছিলেন একিলিয়ন্। সমুদ্র-তীরের বাগান যেখানে ঢালু হয়ে জলের দিকে নেমে গিয়েছে—সেখানে জার্ম্মান কবি হাইনের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল—এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে কাইজার বাড়ীটা কিনে নিয়ে সর্ব্বপ্রথমেই এই মূর্ত্তিটা অপসারিত করেন। তখনকার দিনে জার্ম্মান-সম্রাটের প্রমোদতরী প্রায়ই কর্ফুদ্বীপে আসত।

ওপরে একটা ঘরে এই ভূতপূর্ব্ব সম্রাট টেবিলে বসে লেখাপড়া করতেন। একিলিয়ন প্রাসাদ-ঘরে যুদ্ধের হাসপাতাল হয়েছিল, যুদ্ধের অবসান দিনকতক অনাথাশ্রমও হয়েছিল—এখন তার যেমন অবস্থা বোধ হয় শীঘ্র জুয়ার আড্ডায় পরিণত হবে।

কর্ফু ওডিসিউসের জাহাজ

কর্ফু থেকে আমরা উড়ে গেলাম ইথাকাতে। আমাদের বাঁ দিকে দিগন্তবিস্তৃত ম্যালেরিয়াসঙ্কুল জলাভূমি। দক্ষিণে আর্তা উপসাগরের বালুময় তীরে অক্টেভিয়ানের স্থাপিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ। একস্থানে নেমে আমরা ফোটো তুলবার যোগাড় করছি, একজন সামরিক কর্ম্মচারী এসে নিষেধ করলে।

আমরা বল্লাম—কেন?

—নিষিদ্ধ স্থান।

—কেন?

—সামরিক অঞ্চল।

—ও, ওখানে একৃটিয়ামের যুদ্ধ হয়েছিল বটে।

—সে কবে?

—খৃঃ পূঃ ৩১ সালে।

বহুকাল আগে এণ্টনির নৌবাহিনী অক্টেভিয়ানের হাতে পরাজিত হয়েছিল—এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা এখান থেকে পালাবার পরে আত্মহত্যা করেন।

আর্কাডি বাজার

অক্সিয়া দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের তরঙ্গরাজি এখনও অতীতদিনের যশোবাহিনীর প্রতিধ্বনি করে, ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত খ্রীষ্টান ও মুসলমান নৌবাহিনী লেপান্টোর জলযুদ্ধে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করে।

লেপান্টোর যুদ্ধে নূতন ও পুরানো-কালের যুদ্ধাস্ত্ররাজির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হয়েছিল, একজন তরুণ স্পেনীয় সৈন্যের এই যুদ্ধে বাঁ হাত নষ্ট হয়ে যায়, যদি এই যুবক যুদ্ধে নিহত হ'ত তবে আমরা ডন কুইক্সোট ও সাঙ্কো পাঞ্জার দর্শন পেতাম না—কারণ এই যুবকই ডন মিগুয়েল ডি সার্ভেন্টিস—অমর কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক।

একটুদূরে আর-একস্থান আর-এক প্রতিভাবান কবির স্পর্শে পবিত্র হয়েছিল—স্থানটা মিজোলঙ্গি, কবি বায়রন যেখানে জ্বরে মারা পড়েন—স্বাধীনতার যুদ্ধে গ্রীসকে দু হাজার ডলার দান করেছিলেন তিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব উজাড় করে। বায়রনের মত অত বড় হৃদয়বান কবি ক'জন দেখা যাবে?

নিকটেই পাত্রাস বন্দর—বছরে একবার করে আমেরিকা-গামী বড় জাহাজ এখানে দাঁড়ায়। গ্রীক্ কিউরাণ্ট ফল এখান থেকে রপ্তানী হয় বলেই পাত্রাস বন্দরের প্রাধান্য। কিন্তু আজকাল অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফোর্নিয়ার কিউরাণ্ট গ্রীসের ফলের ব্যবসা নষ্ট করেছে।

পিলোপোনেসাসের উপকূলভাগ ধরে আমাদের প্লেন চলেছে, কোরিন্থ উপসাগরের ওপারে আমাদের ডাইনের দিকে পার্ণেসাস্, চেলমস ও কাইলিন পর্ব্বত মেঘের ওপর তাদের ৭৭০০ ফুট উচ্চ শিখরদেশ সগর্ব্বে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নীচের সমতলভূমি কোথাও শুষ্ক, কোথাও বেগবতী পার্ব্বত্য নদীর জলে উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল।

একটু দূরে স্যালামিসের নৌযুদ্ধের স্থান। থেমিষ্টোক্লিসের বীরত্বে ও কৌশলে পারসিক নৌবাহিনী যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছিল—এথেন্সের গৌরবের দিনের সুরু স্যালামিসের যুদ্ধ বিজয়ের পর থেকেই। এখানে উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডলে ঝড় বইছে, আমাদের প্লেন অগ্রসর হতে না পেরে ফালেরনের সমতল-ভূমিতে অবতরণ করতে বাধ্য হল। এখান থেকে থোরিকো পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে বড় বড় কৃষিক্ষেত্র। গ্রীস

করিন্থ অ্যাপোলো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

দেশের উৎকৃষ্ট সিগারেটের তামাক এখানেই উৎপন্ন হয়। উত্তরে অনেক দূরে সাদা মেঘের মধ্যে তুষারাবৃত একটা পর্ব্বত-শৃঙ্গ যেন হাওয়ায় ভাস্‌ছিল।

তার পরে আমরা মেপারাতে পৌঁছে গেলাম। এখানে মেয়েরা সেকালের পোষাকে সজ্জিত হয়ে উটের পিঠের মত আকৃতির একটা ছোট পাহাড়ের ওপর জল নিয়ে যাচ্ছে; সেখানে স্থানীয় একটি মেলা বসেছে, নিজেদের বাড়ীর সাম্‌নে বড় বড় উনুনে খরিদ্দারদের জন্ম রুটী সেঁক্‌ছে। সহরের একটু দূরেই মাঠের মধ্যে ঈষ্টারের সময়ে এই মেলা বসে প্রতিবৎসর। মাঠের মধ্যে ছোট ছোট তাঁবু খাটানো হয়েছে তার মধ্যে চায়ের দোকান, কফির দোকান। তাঁবুর সাম্‌নে মাঠে বসে লোকে কফি ও পিঠে খাচ্ছে, বিচিত্র পোষাকপরা নর্ত্তকীর দল দাঁড়িয়ে ভিড় করছে।

এক সময়ে এই পথে অত্যন্ত দস্যুর ভয় ছিল। এখন গবর্ণমেণ্টের কড়া ব্যবস্থায় দস্যুর উৎপাত থেমেছে। এখনও পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্য-পথে সন্ধ্যার পরে মোটর আরোহীরা যেতে ভরসা করে না।

সকালে আমরা মোটরে পাত্রাসে ফিরলাম। সেখান থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এলিস্ সহরে পৌঁছলাম। জগদ্বিখ্যাত ওলিম্পিক্ ক্রীড়ার জন্মে এই স্থানটি প্রসিদ্ধ। ক্রোনোস্ পাহাড়ের পাদদেশে এখানে অনেক প্রাচীন মন্দির, দুর্গ, ধনভাণ্ডারের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রথম আমলের একটা গির্জ্জার ইঁট পাথর এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

টিরিন্স — সাইক্লোপিয়ান গ্যালারি

তুচ্ছ একটা জলপাইয়ের শাখা ছিল পুরস্কার, কিন্তু কত দেশবিদেশ থেকে লোকে সেই সামান্ত জয়চিহ্নকে লাভ করবার আগ্রহে ছুটে আসতো। গ্রীসের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগীদল কত বিভিন্ন দেশ থেকে আসতো—এসিয়া মাইনর, ইজিপ্ট থ্রেস্, ইটালি। দুজন রোমানসম্রাট ওলিম্পিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলেন, তার মধ্যে একজন বেহালাবাদক হিসেবে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন, অন্ততঃ অপযশের দিক দিয়ে—তিনি হচ্ছেন নীরো। ১১৭০ বছর ধরে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েও এই মল্লক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রতিবৎসরই অনুষ্ঠিত হয়েছে: অবশেষে বাইজান্টাইন্ সম্রাট থিওডোসিয়াসের হুকুমে ওলিম্পিক্ মেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়, নির্বীর্য এথেন্সের দিকে তখন দুর্দ্ধর্ষ পথ-আক্রমণকারীরা এগিয়ে আসছে।
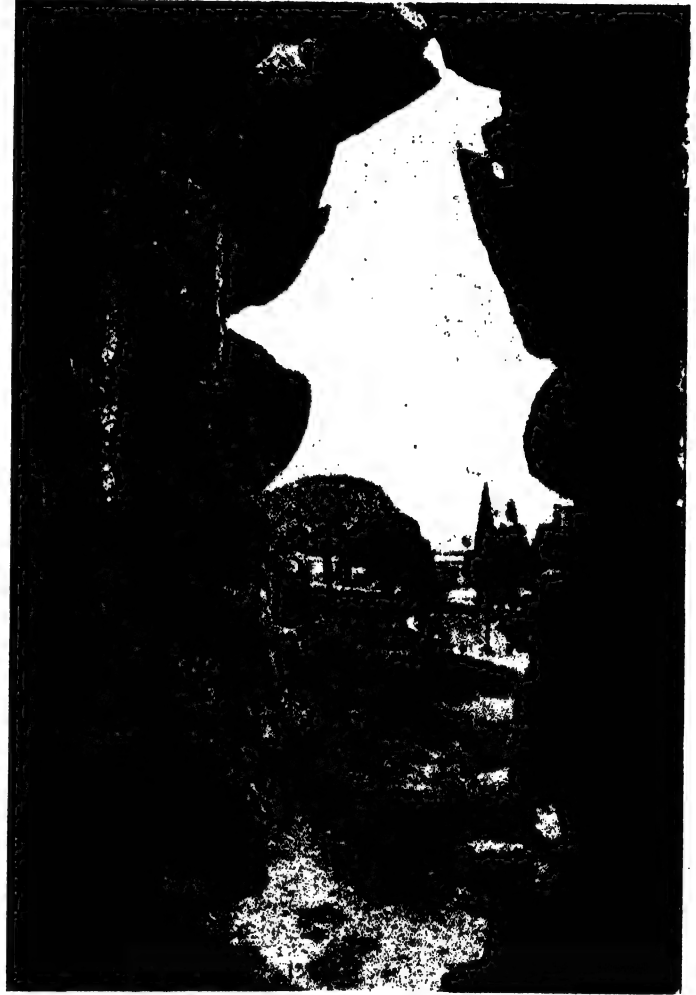
গ্রীসের পল্লীপ্রান্তে সর্ব্বত্র দেখেছি লোকের বাড়ীর সামনে বড় বড় উনুন বসানো আছে—বাড়ীসুদ্ধ লোকের রুটী তৈরী হয় এই একটা উনুনেই। উনুনগুলি প্রায়ই কাদায় গড়া, নীচের দিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো শুক্‌নো কাঠকুটো, লতা-পাতার জাল দেওয়া হয়, বড় বড় কাঠের বারকোসে রুটীর ময়দা মাখা হয়, পাতলা টিনের পাতে কাঁচা রুটী বসিয়ে উনুনের মধ্যে বসিয়ে দেয়। ম্যাসিডোনিয়ার পথে মোটরে যেতে যেতে কত গ্রামের মধ্যে গাছতলায় গাড়ী থামিয়ে কৃষকদের এই রুটী গড়ানো ও সেঁকা কৌতুহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। এরা আবার ক্যামেরাকে বড় ভয় করে, কি জানি কেন ক্যামেরা বার করলেই সকলে গিয়ে ঘরের মধ্যে ওঠে।

ফিলিফ ও আলেকজাণ্ডারের রাজ্য পার হয়ে আমরা আলবানিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত গেলাম। এখানে অনেক বড় বড় হ্রদ আছে। যদি এই সব হ্রদের জল কৃষিক্ষেত্রে সেচন করবার কোনো ব্যবস্থা করা হয় তবে এই হ্রদমালা হেলাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন বর্দ্ধন করছে, তার কৃষিসম্পদও তেমন বর্দ্ধন করবে। আটিকার রৌদ্রদগ্ধ দৃশ্যের পরে কাষ্টোরিয়া সহরের প্রায় চারিপাশ ঘিরে যে অপূর্ব্ব নীলহ্রদ বর্ত্তমান, যার উত্তর ধারে অসংখ্য বাইজান্টাইন ভজন-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমান সেইটিই রূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আয়তনেও বটে।

ফ্লোরিনাতে ছোট ছোট গ্রাম্য দোকানে নানা রংয়ের কম্বল রেখেছে বিক্রির জন্যে সাজিয়ে। পথে একটা ঘোলাজল নদীর তীরে ছোট ছোট গর্ত্ত খুঁড়ে গ্রাম্য মেয়েরা পরিষ্কার জল সংগ্রহ করছে। সম্রাট গ্যালেরিয়াসের নির্ম্মিত খিলানযুক্ত তোরণদ্বার যখন পার হয়ে আসছি তখন নিকটেই একটা ছোট পুকুরে কৃষকরমণীরা কাপড় কাচছে—আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও এই জলাশয়টা আলেকজাণ্ডারের স্নানের স্থান বলে অভিহিত। এতকাল পরেও নিজের দেশের বীরকে এরা ভুলে যায় নি।

ডেল্‌ফির প্রাচীন থিয়েটার — এস্কাইলাসের "সাপ্লায়াণ্টস্‌" নাটকের অভিনয় অনুসরণে

এথেন্স্‌ ক্রমশঃ আধুনিক সহরে পরিণত হয়ে উঠছে। ওমোনিয়াতে বড় হোটেল নির্ম্মিত হয়েছে, প্যারিসের হোটেলের তুলনায় তা নিকৃষ্ট নয়। পূর্ব্বে সহরে জলকষ্ট

ছিল এখন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারদের চেষ্টায় ও যত্নে সেখানে পানীয় জলের সুব্যবস্থা হয়েছে। মারাথনের খুব কাছে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়েছে পার্ব্বত্য নদীর জলস্রোত মার্ব্বেল পাথরের বাঁধ দিয়ে আট্‌কে—এই পেণ্টেলিক মার্ব্বেল দিয়েই এক সময়ে এক্রোপোলিস্ গঠিত হয়েছিল।

প্রাচীন দিনের যে আম্ফিথিয়েটারে বসে হাজার হাজার দর্শক সফোক্লিসের নাটকের অভিনয় ও মল্লক্রীড়া দেখবার জন্যে জড়ো হত—অনেক দিন সেটা ভগ্নাবস্থায় বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল —কিন্তু গ্রীসে বদান্য ধনী ব্যক্তির অভাব নেই, তাদের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে এই প্রাচীন দিনের ক্রীড়াভূমি নতুন করে গড়া হয়েছে ও মার্ব্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। লোকের উৎসাহের অভাব নেই। ১৯০৬ সালে লুয়োস্ ব'লে একজন থেসালির কৃষক যখন মারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে, মেয়েরা তখন নিজেদের গায়ের গহনা খুলে তাকে পুরস্কৃত করেছিল, একজন গরীব বুট-পালিশওয়ালা বলেছিল যাবজ্জীবন বিনাপয়সায় লুয়োসের বুটজুতা পালিশ করে দেবে।

যে সব গ্রীক্ গত মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকা থেকে ফিরে দেশে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই আর আমেরিকায় ফিরে যায় নি—তাদের এখানকার জীবন অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমেরিকার জন্য তাদের প্রাণ তৃষিত হয়ে আছে, কিন্তু সেখানে ফেরবার আর উপায় নেই। পয়সাকড়ি হাতে যা ছিল, খরচ হয়ে গিয়েছে।

তারা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করতো—তুমি আমেরিকান?

—হাঁ।

—বাঃ বেশ। কোথায় তোমার নিবাস?

—ওয়াশিংটন।

—ওয়াশিংটন ষ্টেট না ওয়াশিংটন ডি-সি?

—ওয়াশিংটন ডি-সি।

—বাঃ চমৎকার! ওয়াশিংটন ডি-সি চমৎকার সহর—তুমি ভাগ্যবান লোক। আমি বোকার মত কাজ করেছি তোমাদের দেশ থেকে চলে এসে।

যুক্তরাজ্যের বড় সহরের কর্ম্মব্যস্ত, জটিল জীবনযাত্রার পরে গ্রীসের ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রামের অলস জীবন এদের আর ভাল লাগে না।

চিলির লোকেরা এখন আণ্ডিজ পর্ব্বতমালাকে অগ্রাহ্য করিয়া উঃ আমেরিকা ও ইউরোপের সহিত কথা কহিতে সক্ষম।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ টেলিফোন লাইন

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে চিলি এখন প্যারিসের সঙ্গে কথা বলে, হিমময় দুরারোহ আণ্ডিজ পর্ব্বতের ওপর দিয়ে নক্সন

টেলিফোন লাইন পাতা হয়েছে তারই সাহায্যে। পৃথিবীর মধ্যে এইটিই সর্ব্বোচ্চ আন্তর্জ্জাতিক টেলিফোন লাইন। বিপদ, শীত, তুষারপাত ইত্যাদি অগ্রাহ্য ক'রে উত্তর আমেরিকা ও চিলির ইঞ্জিনিয়ারেরা অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সঙ্গে ভারী টেলিফোনের তার আণ্ডিজের তুষারাবৃত, ঝটিকাময়, দুর্গম শিখর ও গিরিবর্ত্ম পার করে নিয়ে গিয়েছে। বছরের মধ্যে এই সব জায়গা অন্ততঃ ছ'মাস বরফে ঢাকা থাকে। ঘন তুষারপাতের

উচ্চতম আণ্ডিজের এই সব গিরিবর্ত্ম অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল, কিন্তু মানুষ বহুকাল ধ'রে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে এইপথে চলাচল ক'রে আসছে। পায়ে হেঁটে লামাদের পিঠে বোঝাই দিয়ে প্রাচীন যুগের ইণ্ডিয়ানরা বক্রতোয়া আকন্‌-কাগুয়া নদীর ধারে ধারে গিয়ে আণ্ডিজ্ পর্ব্বতে উঠতে সুরু করত, উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়ালের কাছ দিয়ে ক্রমশঃ ওপরে উঠত, বড় বড় শিখরদেশ টপকে যেত, নদীখাদ পার হত,

নূতন জগতের ছাদের উপর যীশুখৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি (চিলি ও আর্জেণ্টিনার প্রত্যন্ত সীমায়)
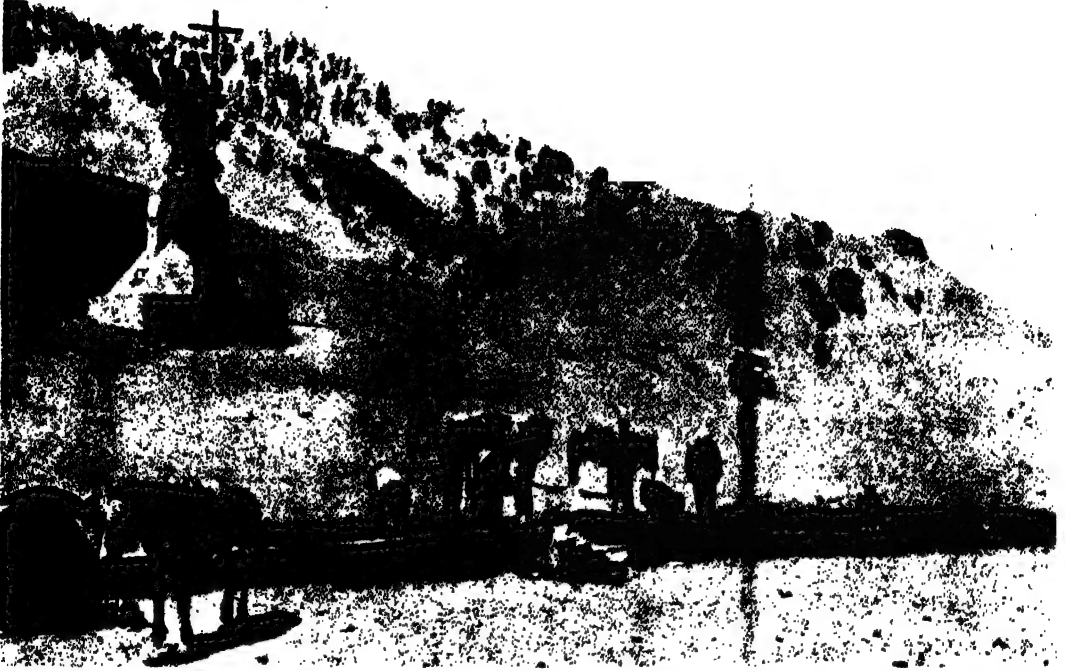
জন্যে পর্ব্বতে প্রায়ই ধ্বস্ নামে—এ অবস্থায় খুব মজবুত ও ভারী টেলিফোনের খুঁটিও ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত কোথায় উড়ে যাবে—সুতরাং টেলিফোন লাইন বাঁচাবার জন্যে পাহাড়ের ওপর গভীর পরিখা খুঁড়ে তা'র মধ্যে তার বসানো হয়েছে।

আণ্ডিজপর্ব্বতের পাদমূলে আর্জ্জেণ্টিনার দিকে, লাস্ কুয়েভাস্ বলে যে ছোট গ্রামখানা আছে সেখানে এই লাইনের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ থেকে ১২,৩০০ ফীট। আবার সমুদ্রগর্ভে ২১,০০০ ফীট জলের তলা দিয়ে চিলি থেকে সামুদ্রিক কেব্‌ল্ ইউরোপে ও মার্কিন যুক্তরাজ্যে গিয়েছে।

তুষার-বর্ষণকে অগ্রাহ্য করে আণ্ডিজের ওপারে যথাস্থানে পণ্যদ্রব্য পৌঁছে দিত।

দক্ষিণ আমেরিকা যখন স্পেনের রাজপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হত, তখন আণ্ডিজ পর্ব্বতের এইসব দুর্গম গিরিবর্ত্ম দিয়ে যুদ্ধের রসদবাহী-পশুর দল ও সৈন্যবাহিনী চিলির সান্তিয়াগো সহর থেকে টকুমান ও কুয়ো-ইণ্ডিয়ানদের দেশে যেত। আবার এক বৎসর পূর্ব্বে যখন চিলি ও আর্জ্জেণ্টিনা স্পেনের শাসনশৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্যে যুদ্ধ করেছিল, তখন সান মার্টিনের বিখ্যাত "আণ্ডিজ বাহিনীর

জয়োল্লাসে এই জনবিরল হিমবর্ত্তী গিরিপথ কতবার মুখরিত হয়েছে।

আণ্ডিজের এই টেলিফোন-লাইন অনেকদূর পর্য্যন্ত আণ্ডিজের বিখ্যাত 'র‍্যাক্' রেললাইনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে গিয়েছে। এই রেলপথও জগতের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য জিনিস—অনেক বৎসর ধরে অনেক বড় বড় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের পরিশ্রমে এই পার্ব্বত্য রেলপথ নির্ম্মিত হয়।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। তখন এমন একটা কিছু দেখা যায়, জীবনে যা আর কখনো দেখা হয় নি। এর কারণ জুন বা জুলাই মাস দক্ষিণ আমেরিকার শীতকাল, আণ্ডিজের উচ্চতর অঞ্চলের তুষার ঝটিকা, বরফ পাত, কুয়াসাবৃত শিখর-রাজির রূপ এই সময়ে যা দেখা যায় এবং যত আরামের সঙ্গে গদী-আঁটা আসনে বসে দেখা যায়—পৃথিবীর কোন উচ্চ পর্ব্বতমালায় এ শীতের রূপ তত আরামে দেখা যায় না।

আণ্ডিজের হিমশীতল গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া কেব্‌ল্ লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

আর্জ্জেন্টিনা দেশের দিকে আণ্ডিজের পাদমূলে মেণ্ডোজা সহরে আরোহীরা বড় রেলপথ ছেড়ে মরুপার্ব্বত্য রেল-লাইনের গাড়ীতে চড়ে। কয়েক ঘণ্টা ধরে গাড়ী যায় আণ্ডিজের নীচের অংশ দিয়ে—যত ওপরে উঠতে থাকে, তত ইঞ্জিনের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়, রেলের লাইন সেখানে খাঁজ-কাটা, রেলপথের খাড়াই সেখানে ক্রমশঃ বাড়ে, টানেল দীর্ঘতর হয় এবং সংখ্যাতেও বৃদ্ধি পায়, উদ্ভিদরাজি অদৃশ্য হয়।

জুন বা জুলাই মাসে এই রেলপথে ভ্রমণ করলে আণ্ডিজ্ পর্ব্বতের পরিপূর্ণ মহিমা ও তুষারাবৃত রুক্ষরূপের সঙ্গে

অনেক সময় তুষাররাশি সরিয়ে ফেলবার কল এঞ্জিনের আগে আগে যায়। ১৯৩০ সালে রেলপথের ওপর ২৫ ফীট পুরু হয়ে তুষার পড়েছিল, দুদিকের ট্রেন আরোহীসমেত কয়েকদিন ধরে মাঝপথে আটকে গিয়েছিল।

ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠতে উঠতে রেলপথ মাউণ্ট টুপুন্ গাতোর (২১, ৫৫০ ফীট) পাদদেশ দিয়ে চিলির দিকে গিয়েছে—নিকটেই একটা অদ্ভুত-গঠনের পর্ব্বতশৃঙ্গ, দেখতে ঠিক যেন ধূসর বর্ণের আলখেল্লা পরা খৃষ্টান সন্ন্যাসী। মাউণ্ট টুপুন্ গাতোর ঘন ছায়া ছাড়িয়ে আবার সূর্য্যালোকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার কিছু পরেই ট্রেন 'পুয়েন্টো ডেল ইন্কা' ব'লে একটা

প্রকৃতির নির্ম্মিত পাথরের সেতু পার হয়,—দিন পরিষ্কার থাকলে এই সেতু পার হবার সময়ে আরোহারা দক্ষিণ দিকে চেয়ে বিশাল অ্যাকন্‌কাওয়া পর্ব্বতের মহিমময় দৃশ্য দেখতে পাবে—সমগ্র আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে অ্যাকন্‌কাওয়া সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত তার চিরতুষারাবৃত শিখর সমুদ্রবক্ষ থেকে ২৩,০৮০ ফীট উর্দ্ধে আকাশকে স্পর্শ করেছে।

পশ্চিমমুখী ট্রেন লাস্ কুয়েভাসে চিলির সীমান্তে পৌছে যায়। এখান থেকে ওপর দিকে চেয়ে দেখলে পাহাড়ের ওপর দিকে টেলিফোন লাইন দেখা যাবে—এবং যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে লাস্ কুয়েভাস্ ষ্টেশনে পৌছবার ঠিক আগে, যেমন দু মাইল দীর্ঘ টানেল পার হয়ে ট্রেন রৌদ্রালোকিত চিলি স্পর্শ করবে, ঠিক সেই সময় পাহাড়ের ওপরের দিকে চাইলে টেলিফোন লাইনেরও অনেক ওপরে চিলি ও আর্জ্জেন্টিনা এ দুই দেশের আন্তর্জ্জাতিক শান্তির প্রতীক-স্বরূপ স্থাপিত জগৎবিখ্যাত শান্তি-স্তম্ভ 'ক্রাইষ্ট অফ দি আণ্ডিজ' চিলি আর্জ্জেন্টিনা-সীমান্তে সমুদ্রবক্ষ থেকে ১২০০০ ফীট উচু একটা পর্ব্বতের ওপর দেখা যাবে।

অনেক নীচে দেখা যাবে পর্ব্বতশৃঙ্গবেষ্টিত হ্রস্বাহ্রদ—সেও সমুদ্রবক্ষ থেকে ৯০০০ফীট উচ্চে। এখান থেকে ট্রেন—বড় বড় টানেলের মধ্য দিয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে, দুধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল, তাদের সৌন্দর্য্য ও মহিমা অবর্ণনীয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিরাপদ, ষ্টীম দ্বারা উত্তপ্ত ট্রেনের কামরায় বসে আরোহীরা তাসের টেবিল থেকে মুখ তুলে দেখতে পারে যীশুখৃষ্টের শান্তমূর্ত্তি তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালার পটভূমিতে তখনও অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। উচ্চতর গিরিপথের স্বর তাদের কানে যাবে—তুষার পাতের শব্দ, পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে ঝড়ের গর্জ্জন ধ্বস্-নামার গুরুগম্ভীর রব। তাস খেলতে খেলতে একজন প্রথমশ্রেণীর সেলুনের যাত্রী বাইরের দিকে চেয়ে বল্লেন, অনেক উচু দিয়ে ওটা কি চলে গিয়েছে সাদা দড়ির মত?

কেউ উত্তর দিলে না।

তাদের মধ্যে অনেকেই জানে না ওটা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ টেলিফোন লাইন, সান্তিয়াগোর হোটেলে বসে তুষারাচ্ছন্ন আণ্ডিজ, সুন্দর পাম্পাস্ প্রান্তর, সমুদ্র, অরণ্যানীর ব্যবধান এড়িয়ে যে কেউ স্বচ্ছন্দে ইউরোপ বা যুক্ত রাজ্যের কোনো বন্ধুর সঙ্গে খোসগল্প করতে পারে যে কোনো সময়। প্রাচীন দিনের ইঙ্কা-বীর তুপাক্ উপাঙ্কি যেদিন তাঁর বিজয়ী সৈন্য-বাহিনী আণ্ডিজের বিপদসঙ্কুল গিরিপথের ওপর দিয়ে আর্জ্জেন্টাইনের দিকে পরিচালিত করেছিলেন—কত দূরের হয়ে গিয়েছে সে সব দিন।

আজ শান্তিয়াগোতে বসে প্রণয়ী প্যারিসের প্রণয়িণীকে বলছে—কেমন আছ বন্ধু? প্রণয়িণী হেসে বলছে—ভাল আছি, প্রিয়তম।

গভীর পাহাড়ের খড়ের এ পারে দাঁড়িয়ে জেনারেল সান্ মার্টিন, ওপারে বৃদ্ধ ইঙ্কাবীর তুপাক্ উপাঙ্কি দুজনে কি কথা-বার্ত্তা কইছেন উচ্চৈঃস্বরে, তুষার ঝটিকার গর্জ্জনে কেউ কারোর কথা শুনতে পাচ্ছেন না।

ফোটোগ্রাফির কথা

—শ্রীপরিমল গোস্বামী

অনেকের ধারণা ক্যামেরা যত বেশি দামের হইবে ছবি তত ভাল হইবে। এই ধারণা যে ঠিক নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার আনুষঙ্গিক আরো কতগুলি ভুল ধারণা আছে তাহাও দূর করা আবশ্যক। যাঁহাদের ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই তাঁহাদের অনেকের কাছে শুনিয়াছি যে কম-দামের ক্যামেরার ছবি ভাল হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না। ইহার কারণ-স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে কম-দামের ক্যামেরায় কম-দামের মশলা ব্যবহৃত হয়। এরূপ ধারণার মূলে কোনো সত্য নাই। ক্যামেরা ভাল বা মন্দ যে-ভাবে বলা হয়, সে ভাবে উহা ভাল বা মন্দ নহে। কোনো ক্যামেরা দেখিতে ভাল হইতে পারে, ব্যবহারে অধিকতর সুবিধাজনক হইতে পারে, বহন করিবার পক্ষে আরামদায়ক হইতে পারে, অথবা অন্য কোনো প্রকারে ভাল হইতে পারে। ভাল ছবি উঠে বলিয়া ক্যামেরা ভাল ইহার কোনো অর্থ হয় না, সকল ক্যামেরাতেই ভাল ছবি উঠে, সকল ক্যামেরাতেই একই মূল্যের মশলা ব্যবহৃত হয়।

তবে কম-দামের ক্যামেরা হইতে বেশি দামের ক্যামেরার পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য আছে। শতপ্রকার পার্থক্য আছে। প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষে সব রকম জানিবার দরকার নাই। জানিলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, একই ক্যামেরায় সব জাতীয় ছবি তুলিতে হইলে জটিল ক্যামেরা প্রয়োজন হয় এবং সেরূপ ক্যামেরার ব্যবহার শিখিতে বহু সময় লাগে। প্রথম-শিক্ষার্থী, ছবি তোলা শিখিতেই উৎসাহী হয়। ক্যামেরা পাইলেই সম্মুখে যাহা পায় তাহারই ছবি তোলে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া আনিয়া ক্যামেরার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেয়। যাহার ছবি তুলিতেছে ফোটোতে তাহাকে স্পষ্ট চিনিতে পারিলেই সে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করে। প্রকৃতপক্ষে এই স্পষ্ট ছবি তোলা শিক্ষা করাই প্রথম শিক্ষার্থীর প্রথম কর্ত্তব্য। সুতরাং মাত্র এইটুকু শিক্ষা করিবার জন্য তাহার পক্ষে জটিল ক্যামেরার প্রয়োজন নাই। জানিয়া রাখা উচিত যে ক্যামেরার জাতিভেদ আছে। এবং এই জাতিভেদের জন্যই ক্যামেরার মূল্য নানারূপ হইয়া থাকে। বিভিন্ন ক্যামেরার পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অল্পদামের ক্যামেরায় কি কি ছবি তোলা যাইতে পারে এবং এই জাতীয় ক্যামেরার ক্ষমতা কতটুকু তাহাই আলোচিত হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শুদ্ধমাত্র বই পড়িয়া ক্যামেরার ব্যবহার শেখা সাধারণের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ক্যামেরায় ফিল্ম বা প্লেট পরাইবার রীতি, শাটারের ব্যবহার, ষ্টপ বা ডায়াফ্রামের উদ্দেশ্য, এক্সপোজার প্রভৃতি বিষয়ে প্রথম প্রথম হাতে-কলমে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে শিক্ষা করা আবশ্যক। ইহা শিখিতে একদিনের বেশি লাগে না। অথচ প্রথম হইতেই বই পড়িয়া এ সমস্ত শিখিতে গেলে যে পরিমাণ ধৈর্য্য, অর্থব্যয়, এবং সময়ের দরকার হয় তাহাতে ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে উৎসাহ দূরে থাক, পরম বিরক্তি ছাড়া আর কোনো ফললাভ হয় না। সুতরাং বাজারে যে বইই বিক্রয় হউক প্রথম শিক্ষার্থীর সেরূপ একখানা বই আছে মনে করিয়া আমাদের সান্ত্বনা লাভ হইতেছে না।

কোনো কোনো দোকান হইতে এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে যে তাহাদের ক্যামেরার সহিত যে ফোটোগ্রাফি শিক্ষা করিবার বই কেমিক্যাল প্রভৃতি দেওয়া হয় তাহা দ্বারা যে-কোনো ব্যক্তি অনায়াসে ঘরে বসিয়া ফোটোগ্রাফি শিখিতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতা যে অসাধু এরূপ বলিতেছি না, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতা অজ্ঞ। সে হয়ত ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানে না। পুস্তকের দোকানদার বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পুস্তকসমূহ যেমন আদৌ পাঠ না করিয়াও তাহা বিক্রয় করিতে পারে, ফোটোগ্রাফিবিষয়ক দোকানদারও তেমনি ফোটোগ্রাফি না জানিয়া ফোটো-সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে পারে। দোকানে মাহিনা করা লোক থাকে, তাহারা ডার্করুমের কাজ করে—অবশ্য তাহাদেরও ডার্করুমের কাজ ছাড়া আর কিছু জানিবার জরুরি দরকার হয় না।

সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতেছি, যাঁহারা ক্যামেরা কিনিয়াছেন তাঁহারা উহার ব্যবহার কোনো অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছেন, এবং যাঁহারা কিনিবেন তাঁহারা জানিয়া লইবেন। ইহা একদিন চেষ্টা করিলেই

জানা যাইবে, এবং ব্যবহার শিখিবার পর বই পড়িলে তখন তাঁহারা সমস্তই বুঝিতে পারিবেন।

ব্রাউনি ক্যামেরায় তোলা ছবি

প্রথমেই জানিয়া রাখা ভাল যে ব্যবসায়ী-ফোটোগ্রাফার হইতে হইলে বহুদিনের শিক্ষা প্রয়োজন হয়। সুতরাং দুই চারি দিন কাজ শিখিয়া ব্যবসা করিবার মতলব করিলে শিক্ষাও হইবে না, ব্যবসাও হইবে না, প্রথম শিক্ষার্থী ব্যবসার কথা ভুলিয়া শুধু শিক্ষাতেই মনোনিবেশ করিবেন। দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন হইল এই কারণে যে আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত ফোটোগ্রাফি শিক্ষা বিষয়ে কোনোদিন কোনো আলোচনা হয় নাই। যদি কিছু হইয়া থাকে তাহা ধারাবাহিক নহে, এবং যিনি লিখিয়াছেন তিনিও হয়ত অভিজ্ঞ আলোক-চিত্রশিল্পী নহেন। এই কারণে তাহার কোনো মূল্য নাই। ফোটোগ্রাফি সম্পূর্ণরূপে হাতেকলমে শিক্ষা করিবার বিষয়, কারণ ইহা একটি শিল্প। সুতরাং ইহা শিখিবার পূর্ব্বেও কিছু জ্ঞাতব্য আছে, এবং তাহা জানা উচিত। যে বিষয়গুলি জানা উচিত তাহা শিক্ষা-অভিলাষী কেহই জানেন না, জানাইয়া দিবার কোনো লোকও এদেশে নাই; কাজেই তাহারা অন্ধভাবে ক্যামেরা কিনিতেছে এবং ঠকিতেছে।

প্রথম-শিক্ষার্থী সত্য করিয়া কি চায়, সেটা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। সে চায়, যাহা দেখিতেছি হুবহু তাহার প্রতিকৃতি ছবিতে উঠুক—এবং তাহা স্পষ্ট ভাবে উঠুক।

তাহার এরূপ প্রয়োজন প্রথমেই থাকিতে পারে না যে, সে, দিনের আলোয় চলন্ত জিনিসের ছবি না তুলিয়া তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারে তুলিবে; নিকটের দৃশ্য না তুলিয়া সুদূরে অবস্থিত পর্ব্বতমালার দৃশ্য তুলিবে, কিংবা মন্দগামী বা স্থির জিনিস ফেলিয়া নক্ষত্রবেগে ধাবিত কোনো জিনিসের ছবিই তুলিবে। এই সব দুঃসাধ্য জিনিসের ছবি তুলিতেই জটিল ক্যামেরা চাই। দুঃসাধ্য জিনিস আরো শতপ্রকার আছে, উপরে মাত্র দুই-তিনটির উল্লেখ করিলাম। অভিজ্ঞ ফোটোগ্রাফারের কাছে অবশ্য এগুলির কোনটাই দুঃসাধ্য নহে। অতএব আমরা প্রথম-শিক্ষার্থী আপাতত এদিকে দৃষ্টি না দিয়া নিজেদের বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসি। ব্রাউনি-জাতীয় বক্স-ক্যামেরায় দিনের আলোয় সাধারণ অবস্থার লোকজন, পথ ঘাট, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সবই তোলা যায়। ফোটোগ্রাফিতে পোর্ট্রেট বলিতে যাহা বুঝায়, ব্রাউনিতে ঠিক তাহা হয় না। পোর্ট্রেট তুলিবার বন্দোবস্ত আছে বটে কিন্তু তাহাতে ইচ্ছামত সব রকম

ব্রাউনি ক্যামেরায় তোলা ছবি

পোর্ট্রেট হয় না। মনে রাখিতে হইবে প্রথম-শিক্ষার্থী পোর্ট্রেট তুলিবার ক্যামেরা পাইলেও পোর্ট্রেট তুলিতে

পারিবে না, সুতরাং ব্রাউনি ক্যামেরায় যতটুকু হয় তাহাই প্রথম শিক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। শর্টফোকাস্ লেন্সের ক্যামেরায় জিনিসের অতি নিকটে লইয়া তাহার ছবি তোলা যায় না। মানুষের ছবি তুলিবার সময় তাহার মুখের অতি নিকটে যাইয়া শুদ্ধমাত্র মাথাটি তোলা যায় না, কিন্তু পাঁচ ছয় হাত দূর হইতে মাথা এবং কোমর পর্য্যন্ত দেহ তোলা যায়। পোর্ট্রেট-অ্যাটাচমেন্ট লাগাইয়া তিন হাত দূর হইতে মাথা ও বুক তোলা যায় বটে কিন্তু তাহা ভাল হয় না। ইহার দরকার কি? আট নয় টাকা মূল্যের ক্যামেরায় অতি নিকট হইতে কাহারো ছবি তোলা যায় না বলিয়া দুঃখ করিবার কিছুই নাই। বরঞ্চ সম্পূর্ণ-মানুষের প্রতিকৃতি আট দশ হাত দূর হইতে খুব চমৎকার তোলা যায় বলিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আর একটি অসুবিধা এই, অল্প-আলোতে, ছায়াতে বা বিদ্যুতের আলোতে এই ক্যামেরার সাহায্যে 'স্ন্যাপ' লওয়া চলে না। ইহাও প্রথম-শিক্ষার্থীর সমস্যা নহে। রৌদ্রালোকে স্ন্যাপ লইলেই চলিবে। রৌদ্রালোকে ব্রাউনির স্ন্যাপ অর্থাৎ "দ্রুত-এক্সপোজারের" ছবি অতি চমৎকার হয়। সন্ধ্যায় স্ন্যাপ লইতেই হইবে এরূপ কোনো কথা নাই। যদি থাকে, তখন স্মরণ করিতে হইবে, ক্যামেরার মূল্য মাত্র আট-দশ টাকা, ইহার ক্ষমতার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট ক্যামেরার মূল্য ন্যূনপক্ষে চারিশত টাকা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাদ্বারা প্রথমেই শিক্ষা আরম্ভ করিলে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হইবে—শিখিতে বহু অর্থ এবং সময়-ব্যয় হইবে, তথাপি মনোমত ছবি উঠিবে না। ব্রাউনি ক্যামেরায় ফোকাস্ করিতে হয় না, সামনে ধরিয়া শাটার টিপিলেই ছবি। আরম্ভটা সরল এবং আরামদায়ক হইলে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, নিজের উপর একটা বিশ্বাস আসে। অপর পক্ষে গুরুতর জটিল যন্ত্রে হাতেখড়ি দিলে প্রথমেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে হয় এবং এরূপ অবস্থায় উন্মাদ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে।

ব্রাউনি ক্যামেরায় যে ছবি উঠে তাহা দেখিতে কোন অংশে দামী ক্যামেরার ছবি হইতে নিকৃষ্ট নহে। তবে এই ছবি হইতে সাধারণত খুব বড় এনলার্জমেন্ট ভাল হয় না। খুব বড় এনলার্জমেন্ট করিতেই হইবে এরূপ কোনো নিয়ম নাই। ব্রাউনি ক্যামেরায় সব রকম আলোতে স্ন্যাপ না লওয়া গেলেও সব রকম আলোতেই ছবি তোলা যায়। আলোর জোর না থাকিলে এক্সপোজার বেশি লাগে এই যা অসুবিধা। এ অবস্থায় অনেক সময় মানুষের ছবি তোলা শক্ত হয়। প্রথমে ক্যামেরা কিনিয়া উজ্জ্বল দিবালোকে ছবি তুলিলেই চলিবে, তাহা হইলে আর মানুষের ছবি তোলা মোটেই কঠিন হইবে না।

অর্থাৎ ব্রাউনি ক্যামেরায় ছবি তুলিতে হইলে বেশির ভাগ ছবি রৌদ্রে তুলিতে হইবে। সূর্য্য যদি পাতলা সাদা মেঘে ঢাকা পড়ে তাহা হইলেও অসুবিধা হইবে না। ছায়ায় ছবি তুলিতে হইলে এক্সপোজার বেশি লাগিবে, ইহাতেও ছবি তোলায় কোনো অসুবিধা নাই। একটি মূর্ত্তির চেয়ে একাধিক মূর্ত্তির 'গ্রুপ', বা জনতা, রাস্তাঘাটের ছবি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার উঠিবে। মৃদুগামী গাড়ী ঘোড়া প্রায়-সামনের দিক হইতে তুলিলে চমৎকার উঠিবে। চাঁদের আলোয় ছবি তোলা যাইবে। বিভিন্ন ছবি তোলার সময় প্রতিবার ফোকাস্ বদলাইতে হইবে না। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। —আগামী সংখ্যায় ব্রাউনি ক্যামেরায় তোলা ছবির এবং ক্যামেরার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া যাইবে।

বিজ্ঞান জগৎ

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
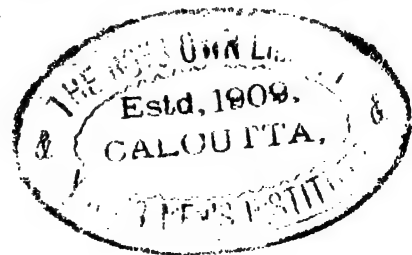
মৃতদেহে হৃৎস্পন্দন ফিরাইয়া আনিবার অভিনব প্রচেষ্টা

জলে ডুবিয়া, আছাড় খাইয়া ব' অন্য কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা
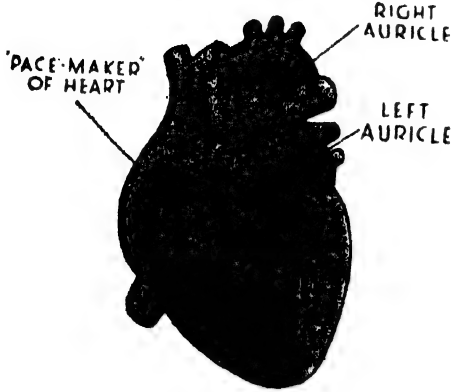
হৃৎপিণ্ড

দরকার তাহা স্থির করিতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। কারণ, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বেশীক্ষণ বন্ধ হইয়া থাকিলে তাহার আর পুনরুজ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ক্লোরোফরম প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ প্রয়োগের সময় চিকিৎসকদিগকে অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। সময় সময় নানা কারণে ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর হৃৎপিণ্ড নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে; তখন সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রতীকারের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে হৃৎস্পন্দন ফিরিয়া আসিবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তেজক ঔষধ 'ইনজেকশন' করিয়া দেওয়া ব্যতীত চিকিৎসকেরা এপর্য্যন্ত আর কোন কার্য্যকরী পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। কিন্তু উত্তেজক ঔষধপ্রয়োগে হৃৎপিণ্ড সাময়িক ভাবে সাড়া দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামলাইতে না পারিয়া চিরতরে নিস্পন্দ হইয়া পড়ে।

নিউ ইয়র্কের Beth David Hospitalএর হৃৎপিণ্ড-চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ হাইম্যান (Dr. Albert S. Hyman) এবং তড়িৎ-বিজ্ঞান গবেষক হেনরি হাইম্যান (C. Henry Hyman) উভয়ে মিলিয়া এইরূপ নিস্পন্দ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াশক্তি পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। হাইম্যান-আবিষ্কৃত যন্ত্র বিশেষ কিছুই নয়। তড়িৎপ্রবাহ পরিচালনসক্ষম একটী 'ইনজেক্টিং নীড্‌ল্' মাত্র। একটী ফাঁপা লম্বা লৌহ সূচিকার ভিতর দিয়া তড়িৎ-অপরিচালক পদার্থে আবৃত একটী সূক্ষ্ম তার চলিয়া গিয়া সূচীর মুখ হইতে খানিকটা বাহির হইয়া আছে। এই তারের অপর প্রান্ত এবং ফাঁপা লৌহসূচী-সংলগ্ন তারের প্রান্ত একটী ক্ষুদ্রকায়, হাল্কা তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রটী একটী স্প্রিংএর সাহায্যে পরিচালিত হয়। এই তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে একটী কম্পন-যন্ত্র সংযুক্ত আছে। উৎপাদিত তড়িৎ-প্রবাহকে এই কম্পন-যন্ত্র সহযোগে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতবার ইচ্ছা বন্ধ ও পরিচালিত করিতে পারা যায়। বয়স অনুসারে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-সংখ্যার তারতম্য হইয়া থাকে। এই কম্পন-যন্ত্র দ্বারা বিভিন্ন বয়সের লোকের হৃৎস্পন্দনের তারতম্যানুযায়ী তড়িৎ-প্রবাহের বিরাম ও পরিচালন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে রোগীর স্বাভাবিক অবস্থায় যতবার বক্ষ স্পন্দিত হইত, এই যন্ত্র সাহায্যে ঠিক ততবার তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ ও চালিত করা যাইতে পারে। বুকের পাঁজরের নীচে দুই দিকে, ডান auricle এবং বাম auricle—হৃৎপিণ্ডের এই দুইটী কুঠুরী আছে। তাড়িতিক উত্তেজনা এখান হইতে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট পথে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীসমূহের মধ্যে পরিচালিত হয়। হৃৎপিণ্ডের এই বিশিষ্ট গঠন-প্রণালীকে 'Pace maker' বলা হয়।

হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ কোন রোগী উপস্থিত হইলেই চিকিৎসক তাহার বুকের পাঁজরের প্রথম ও দ্বিতীয় হাড় দুইটীর মধ্যস্থলে ওই সূচী-যন্ত্রটীকে ফুটাইয়া ডান auricleএর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন অতঃপর রোগীর বয়সের অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র হইতে তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনা করা হয়, তড়িৎ প্রবাহ নির্দ্দিষ্ট কম্পনের তালে প্রবাহিত হইয়া হৃৎপিণ্ডের Pace makerকে তালে তালে ধাক্কা দিয়া উত্তেজিত করিতে থাকে। কিছুক্ষণ এরূপ করিবার পরই হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন পুনরায় নিয়মিতভাবে চলিতে সুরু করে।

ইনজেক্‌সন্ করিবার সূঁচ

এই ব্যাপারটীকে মোটরের self-starter এর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া গেলে যেমন self-starterএর মোটর ঘুরিয়া 'সিলিণ্ডারের' মধ্যে পুনরায় বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ইঞ্জিন চালাইতে সুরু করে, এই 'ইনজেক্টিং নীড্ল্'টীও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। এই যন্ত্রটীর নাম দেওয়া হইয়াছে—'হাইম্যান অটর' Hyman Otor। এই যন্ত্রসাহায্যে অনেক রোগী অপমৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।

মৃত ব্যক্তির হৃৎস্পন্দন ফিরাইয়া আনিবার জন্য "হাইমেন-অটর" ফুটাইয়া দেওয়া হইতেছে

নারিকেলের খোলের নূতন ব্যবহার

চার্লস এলডার নামে এক ভদ্রলোক নারিকেলের খোল দিয়া অতি চমৎকার একটী সিগারেটের ছাই ফেলিবার পাত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছবি হইতেই শিল্পীর নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। একখানি পাতলা কাঠকে মনুষ্য-দেহের মত কাটিয়া, তাহার উপর নারিকেলের খোলটী বসাইয়া মস্তক তৈয়ারী করা হইয়াছে। খোলের উপর অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিয়া চোক মুখ আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। মানুষটি যেন পা-দানসংলগ্ন মাছটিকে বড়শীতে গাঁথিয়া জল হইতে টানিয়া তুলিতেছে। অতি সামান্য জিনিষ হইতে নির্ম্মিত হইলেও শিল্পীর দক্ষতায় ইহা যেমনই সুদৃশ্য তেমনই কার্য্যকরী হইয়াছে।

নারিকেলের খোল নির্ম্মিত সিগারেটের ছাই ফেলিবার পাত্র

পাখীরা কেমন করিয়া উপরে ওঠে

কিরূপ ভাবে ডানা নাড়িয়া পাখীরা নীচ হইতে উপরে উঠিয়া যায়—মাসাচুসেটস্ টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটএর ইঞ্জিনিয়ারেরা এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিতেছিলেন। সম্প্রতি বিদ্যুৎ-গতি-সম্পন্ন এক প্রকার ক্যামেরার সাহায্যে পাখীর উড্ডয়ন-সময়ের বিভিন্ন অবস্থার ছবি তুলিয়া এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। এক সেকেণ্ডের ৫০,০০০ ভাগের এক ভাগ সময়ে এই দ্রুতগতি-সম্পন্ন ক্যামেরার সাহায্যে উড়ন্ত পায়রার বিভিন্ন অবস্থার অনেক ছবি তোলা হইয়াছে। ছবিতে দেখা যায় উপরে উঠিবার সময় যখন ডানাটীকে নীচের দিকে ধাক্কা দেয় তখন ডানার বড় বড় পালকগুলির সঙ্গে ছোট ছোট পালকগুলিও মুড়িয়া গিয়া ডানার ভিতর দিয়া বায়ু চলাচলের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু উপরের দিকে ডানা উঠাইবার সময় ডানার ফাঁকের ভিতর দিয়া বাতাস সহজেই চলাচল করিতে পারে। বিশেষতঃ ডানার বাঁক নীচের দিকে থাকায় উপরে উঠাইবার সময় ইহাতে বাতাসের বাধা অনেক কম লাগে

পাখীরা কেমন করিয়া উপরে ওঠে

এবং নীচের দিকে নামাইবার সময় বাতাস সম্পূর্ণভাবে ডানার নীচে আটকা পড়ে; কাজেই অতি অনায়াসেই দ্রুতগতিতে উপরে উঠিয়া যায়।

উড়ন্ত সর্প

নিউ ইয়র্কের ষ্টাটেন দ্বীপে 'ব্যারেট-জু' নামক একটি বিখ্যাত চিড়িয়াখানা আছে। সম্প্রতি মালয় উপদ্বীপ হইতে একটি অদ্ভুত সর্প সংগৃহীত

উড়ন্ত সর্প

ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করিবার বায়ু-চক্র

হইয়া এই চিড়িয়াখানায় আনীত হইয়াছে। সাপটী একস্থান হইতে লাফাইয়া বাতাসে ভর করিয়া বহুদূর ভাসিয়া যাইতে পারে। শূন্যপথে চলিবার সময় সাপটী শরীরকে ফিতার মত চেপ্টা করিয়া দুইধার নীচের দিকে বাঁকাইয়া রাখে, কাজেই লাফাইবার সময় জোর পাইয়া বাতাসের মধ্য দিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। এই জাতীয় উড়ন্ত সর্প অত্যন্ত বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। মালয়

ধাত্রী-ব্যাং

উপদ্বীপেই ইহাদিগকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় খুব অল্প দিন হইল এইরূপ একটি উড়ন্ত সর্প আমদানী করা হইয়াছে। আমেরিকায় উড়ন্ত সর্প এই প্রথম।

অদ্ভুত ব্যাং

কাঙ্গারু, অপোসাম, বানর-প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর জানোয়ারদের মধ্যে স্ত্রী-জাতীয়েরা যেমন সন্তানদিগকে বিভিন্ন উপায়ে বহন করিয়া বেড়ায়, নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও সেইরূপ ডিম বা বাচ্চা বহন করিবার রীতি বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতের মাকড়সা, কাঁকড়াবিছা, বিভিন্ন শ্রেণীর জলপোকা ডিম ও বাচ্চাদিগকে সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত পিঠে করিয়া বহন করিয়া থাকে। এক প্রকার অদ্ভুতাকৃতি ব্যাং তাহার পৃষ্ঠদেশের বিভিন্ন থলির মধ্যে কাঙ্গারুর মত তাহার বাচ্চাদের বহন করিয়া থাকে। সুরিনাম টোড নামে এক জাতীয় ব্যাং তাহাদের ডিম পৃষ্ঠে বহন করিয়া বেড়ায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সকল রকম জানোয়ার ও ক্ষুদ্রকায় প্রাণীদের মধ্যেই স্ত্রী জাতিরা তাহাদের ডিম বা বাচ্চা বহন করিয়া থাকে; কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার Natual History Museumএর জন্য চারিটী জীবন্ত ব্যাং আনয়ন করা হইয়াছে। ইহাদের স্ত্রী-ব্যাঙেরা ডিম পাড়িয়াই খালাস। পুরুষেরা ডিম পাড়িবার সময় স্ত্রীদের সাহায্য করে এবং সেই ডিম না ফোটা পর্য্যন্ত প্রায় ২১।২২ দিন পৃষ্ঠে বহন করিয়া বেড়ায়। এই কারণে এই জাতীয় পুরুষ-ব্যাংদের নাম দেওয়া হইয়াছে—Midwife toad বা ধাত্রী-ব্যাং।

'উইণ্ড-মিল' বা বায়ু-চক্র সাহায্যে ক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা

ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য চীন দেশে অনেক স্থলে 'উইণ্ড-মিল' বা বায়ু-চক্র ব্যবহৃত হয়। আজকাল আমাদের দেশেও কোন কোন স্থলে, জল উত্তোলনের

জন্য বিভিন্ন ধরণের বায়ু-চক্র ব্যবহৃত হইতেছে। সম্প্রতি কালিফোর্নিয়ার এক কৃষক তাহার ক্ষেত্রে জলসেচন করিবার জন্য চীনাদের অনুকরণে অতি সুন্দর একটী কার্য্যকরী বায়ু-চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। এস্থলে উহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। যে কোন দিক হইতে বাতাস প্রবাহিত হইলে পিছনে লেজের মত হালের সাহায্যে চক্রটী সেই মুখী হইয়াই ঘুরিতে পারে। বায়ু-চক্রের কেন্দ্র-দণ্ডের সঙ্গে জলের মধ্যে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় কুণ্ডলী-আকৃতিবিশিষ্ট একটি টিনের নল, 'বেল্‌টিং' বা দড়ি দিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টিনের নল কুণ্ডলীটীর ভিতরের মুখ কেন্দ্রীয়-ঘূর্ণনদণ্ডের মধ্যস্থলে রহিয়াছে। বায়ু-চক্র ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'বেল্‌টিং'এর সাহায্যে নলের কুণ্ডলীটী ঘুরিতে থাকে এবং নলের বাহিরের মুখ প্রত্যেক বার জলের নীচে ডুবিয়া আসিবার সময় জলপূর্ণ হইয়া আসে এবং কেন্দ্রদণ্ডের মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া বিভিন্ন পথে ক্ষেত্রের নানা স্থানে পরিচালিত হয়।

অব্যবহার্য্য টিনের পাত্র সাহায্যে বিশুদ্ধ তাম্র সংগ্রহ

অব্যবহার্য্য টিনের পাত্রের প্রয়োজনীয়তা

অব্যবহার্য্য টিনের কৌটা, কেনেস্তারা প্রভৃতিকে আমরা বিরক্তিকর আবর্জ্জনার সামিল মনে করি। প্রকৃত প্রস্তাবে এসব আবর্জ্জনা দ্বারা বিশেষ কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না; কিন্তু এই অব্যবহার্য্য টিনের পাত্রের একটা গুরুতর প্রয়োজনীয়তার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীতে যত তাম্র ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই এই অব্যবহার্য্য টিনের কৌটা, কেনেস্তারা প্রভৃতির সাহায্যে উৎপাদিত হইয়া থাকে। খনির মধ্যে সঞ্চিত জলে প্রচুর পরিমাণে তাম্র ও অন্যান্য খনিজ-পদার্থ মিশ্রিত থাকে, টিনের পাত্রগুলির সাহায্যে বিনা পরিশ্রমে এই অপরিষ্কৃত জল হইতে বিশুদ্ধ তাম্র সংগৃহীত হয়। অপরিষ্কৃত খনিজ জল বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম জলাধারে 'পাম্প' করিয়া হাজার হাজার অব্যবহার্য্য টিনের পাত্র তাহাতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। স্বাভাবিক তড়িৎ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে টিনের পাত্রগুলি গলিয়া যায় এবং সে স্থলে কর্দ্দমের মত বিশুদ্ধ তাম্র জমিয়া থাকে। শোনা যায়, Butte, Montএর কোন এক খনির কাছে একজন লোকের বাড়ীর পিছন দিক দিয়া খনির অপরিষ্কৃত জল নিষ্কাশিত হইত। দৈবাৎ সে একদিন কয়েকটী পুরাতন টিনের পাত্র সেই জলে ফেলিয়া দেয়। পরে দেখিতে পায় সে গুলি গলিয়া বিশুদ্ধ তাম্রে পরিণত হইয়াছে, এই ব্যাপার দেখিয়া সে এক বছরের জন্য সেই জলের বন্দোবস্ত লয় এবং চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এইরূপে পরিষ্কৃত তাম্র সংগ্রহ করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ হয়।

বিভিন্ন আলোর সঙ্গে বৃক্ষ-দেহের বৃদ্ধির সম্বন্ধ

পার্দ্দু (Purdue)র পরীক্ষামূলক কৃষি-গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রকারের আলোক-প্রয়োগে বৃক্ষদেহের বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় দিবালোকের সঙ্গে বিদ্যুতালোক পাইলে গাছের বৃদ্ধি অনেক বেশী হইয়া থাকে। এ স্থলে তাহার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত প্রদান করা হইল। চিত্রে ক্যালেণ্ডুলা নামক গুল্মজাতীয় বৃক্ষের বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের ফোটো দেওয়া হইয়াছে। সকল গাছগুলি একই সময়ে রোপিত হইয়াছিল এবং সকল গুলিই সূর্য্যালোক পাইয়াছে। কিন্তু বাম দিকের গাছ দুটী সূর্য্যালোক পাওয়া সত্ত্বেও রাত্রি ৯টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বিদ্যুতালোক পাইয়াছে। আর ডান দিকের গাছ দুটীতে ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বিদ্যুতালোকে রাখা হইয়াছিল। গাছগুলির উপর বিভিন্ন প্রকারের আলোর প্রতিক্রিয়া ছবিতেই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরেও এই ধরণের বহু গবেষণা হইয়াছে। ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

বৃক্ষদেহের বৃদ্ধির উপর বিভিন্ন আলোর প্রভাব

মাকড়সার জাল তৈয়ারী করিবার যন্ত্র

অনেক সময় চলচ্চিত্রের ষ্টুডিওতে বিশেষ বিশেষ দৃশ্যের জন্য মাকড়সার

জালের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম জিনিষ কৃত্রিম-উপায়ে তৈয়ারী করিয়া কোন নিখুঁৎ দৃশ্য প্রদর্শন করা সহজ ব্যাপার নহে।

মাকড়সার জাল তৈয়ারী করিবার যন্ত্র

কিন্তু সম্প্রতি কৃত্রিম উপায়ে মাকড়সার জাল তৈয়ারী করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। যন্ত্রটি বিশেষ কিছুই নহে—একটি বৈদ্যুতিক পাখার কেন্দ্রীয় দণ্ডের সঙ্গে একটি ধাতুনির্ম্মিত ফুঁদিল সরু-মুখের দিকে সংলগ্ন আছে। ফুঁদিলটির চওড়া মুখ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ঢাকনা দ্বারা আবৃত। ফুঁদিলটির মধ্যে তরল রবার রাখা হয়। পাখাটি দ্রুতবেগে ঘুরিতে থাকিলেই মধ্য-স্থলে বায়ুর চাপ অসম্ভবরূপে কমিয়া যায়, তখন ফুঁদিলের ভিতরের তরল রবার ঢাকনির গায়ের ছিদ্রপথে সূক্ষ্ম সূত্রাকারে বাহির হইতে থাকে। বিশেষ কায়দা করিয়া যন্ত্রটিকে নাড়াচাড়া করাইতে পারিলে যে-কোন নমুনার রকমারি মাকড়-সার জাল নির্ম্মিত হইতে পারে।

অভিনব মোটর বোট

সাধারণ মোটর বোটের ইঞ্জিনের শক্তি না বাড়াইয়াও কিরূপে গতিবেগ অসম্ভব রূপে বাড়াইয়া তোলা যায়, সম্প্রতি ফিলে-ডেলফিয়ার 'ওয়েষ্টিং হাউসের' রিসার্চ্চ ইঞ্জিনিয়ার Dr. Oskar G. Tietjens তাহার এক চমৎকার পরীক্ষা দেখাই-য়াছেন। এই মোটর বোটের নির্ম্মাণ-কৌশলের বিশেষত্ব এই যে, ইহার তলদেশে চিত্রানুযায়ী একখানি চওড়া লোহার পাত ধনুকের আকারে সংলগ্ন করা হইয়াছে। আধুনিক কোন কোন এরোপ্লেন যেমন চওড়া 'ব্লেডের' সাহায্যে বাতাস কাটিয়া উপরে ওঠে, এই চওড়া পাত থাকিবার ফলে পূর্ণবেগে চলিবার সময় এই বোটখানি সেরূপ জল হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া খালি লৌহ-পাতের উপর ভর করিয়া ছুটিতে থাকে। কাজেই সাধারণ বোটের মত ইহার জলের বাধা না থাকায় বেগ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়।

অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন মোটর বোট

অপূর্ব্ব যন্ত্র

ছবিতে প্রদর্শিত এই বিরাট জটিলতাপূর্ণ যন্ত্রটির কাছে একটি লাইনোটাইপ মেশীন বা মোটর-মেশীনের নির্ম্মাণ কৌশল কত সরল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র ইহার কাছে খেলনা মাত্র। এই যন্ত্রটির মধ্যে ৮৪, ৩১২ খানি বিভিন্ন ধাতব অংশ আছে, কলটির নিকট কাজ পাইতে হইলে ইহার প্রত্যেকটি অংশকে ঠিক মত চলিতে হইবে। একটু ভুলচুক বা সামান্য গলদ থাকিলেও কল অচল হইবে। এই কল স্বয়ংক্রিয় ভাবে গলিত-কাচ এক স্থান হইতে তুলিয়া লয় এবং তাহাকে দিনে লক্ষ লক্ষ বোতলে পরিবর্ত্তিত করে।

লখ্‌নেস্‌ দানব সন্ধানে জলতলে অভিযান

সমুদ্রতলের কৌতূহলোদ্দীপক জানোয়ারসমূহ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট বিবরণ জানিবার জন্য জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এক বিরাট অভিযানের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। বিশেষতঃ লখ্‌নেস্‌ দানব সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা অপসারণের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকেরা যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,
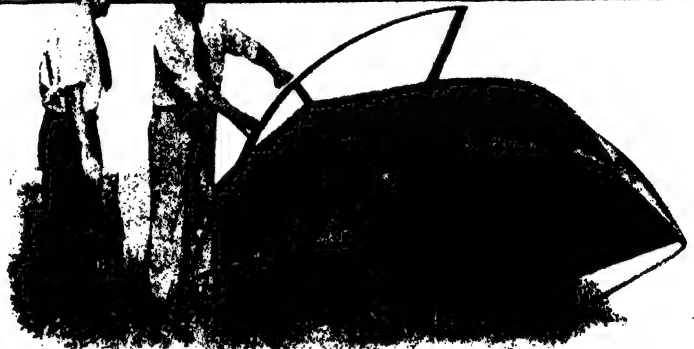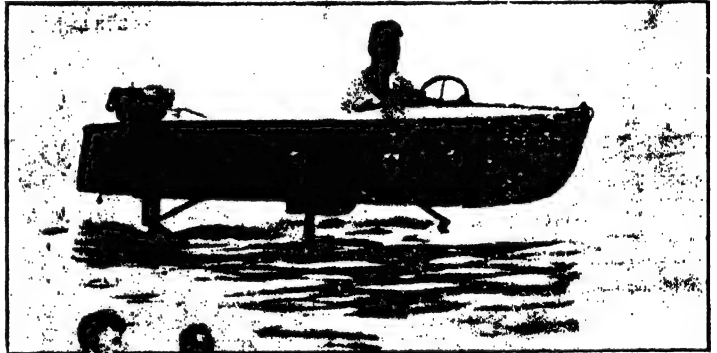
অনেকে আজও তাহাতে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ সম্পূর্ণ বিপরীত মতও পোষণ করিতেছেন। এই সংশয় দূর করিবার জন্য সমুদ্রতলের সুদক্ষ আলোকচিত্রশিল্পী জে, ই, উইলিয়ামসন স্বীয় পরিকল্পিত জল-নিমজ্জিত বিরাট নলের সাহায্যে লখ্‌নেস দানবের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। উইলিয়ামসনের বিশ্বাস, লখ্‌নেস দানব একটি বিরাট কাট্‌ল্‌-মৎস্য জাতীয় জন্তু; বাল্যাবস্থায় কোনক্রমে হয়ত ইহা হ্রদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল,—এক্ষণে ইহা বৃহদাকৃতি জানোয়ারে পরিণত হইয়াছে। একখানা ছোট ষ্টীমারের ডেকের নীচ হইতে যাহাতে জলের তলায় বহুদূর পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে এই জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমবায়ে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড একটি ইস্পাতের নল আছে। নলের প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড একটি লৌহগোলক সংলগ্ন করা হইয়াছে। এই গোলকের মধ্যে বসিয়াই তাহার কোয়ার্ট্‌জ্‌ নির্ম্মিত জানালার মধ্য দিয়া পর্য্যবেক্ষণ বা আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে। উইলিয়ামসনের বিশ্বাস তিনি ইহার সাহায্যে লখ্‌নেস্‌ দানবের খুব নিকট হইতে তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন এবং নির্ভুল ফোটোগ্রাফ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।
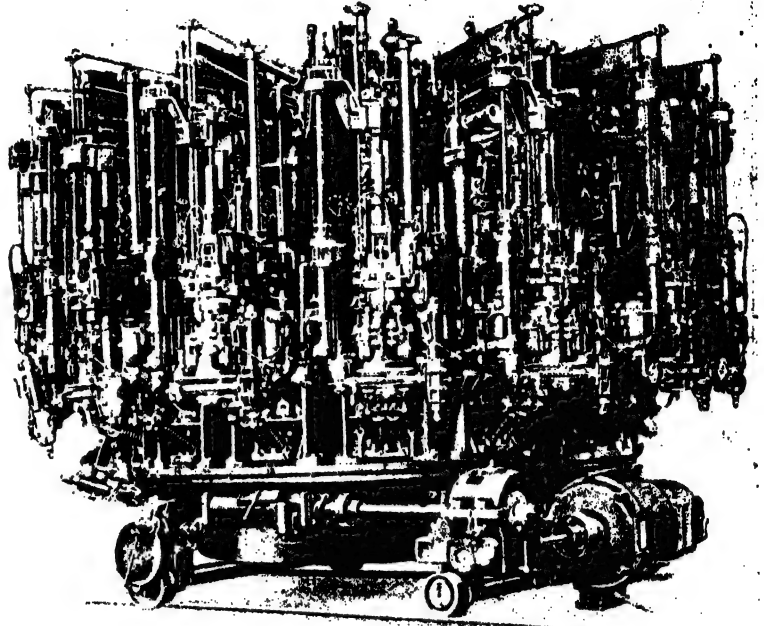
কাচের বোতল তৈরী করার যন্ত্র

জাহাজ হইতে জলতলে অবতরণ করিবার বিরাট নল

ইতিমধ্যে ডঃ উইলিয়াম বীব (Dr. William Beebe) নামক প্রসিদ্ধ অভিযানকারী সমুদ্রতলবাসী কৌতূহলোদ্দীপক জীবজন্তু সম্বন্ধে সঠিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য অভিনব ব্যবস্থা করিতে ব্যাপৃত হইয়াছেন, ডাঃ বীব সমুদ্র-তলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশীদূর নামিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে লৌহ গোলকের মধ্যে অবস্থান করিয়া সমুদ্রতলে ২৫০০ ফীট নিম্নে অবতরণ করিয়াছিলেন সেই গোলকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতেছেন। সমুদ্রতলে স্রোতের বেগে ইহাকে যে-কোনদিকে না লইয়া যাইতে পারে এই জন্য গোলকের উপরে সামনে ও পিছনে ডানা বা হাল সংযোগ করিয়া দিয়াছেন এবং সমুদ্রতলে ইচ্ছানুরূপ

ঘোরাফেরা করিবার জন্য 'চেইন হুইল'এর ব্যবস্থা করিবেন, সমুদ্রতলে কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগিলে যাহাতে জানালার কোয়ার্টজ্ ভাঙ্গিয়া গোলকের
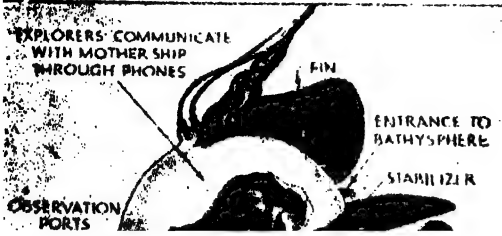
সমুদ্রতলে লৌহ-গোলক সাহায্যে চলাফেরা করিতেছে

ভিতরে জল ঢুকিয়া আরোহীদের প্রাণান্ত না হয় তাহার জন্য কাঠের ফ্রেমের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য উপরের বাতাসের সহিত যোগাযোগ রাখিবার ও কথাবার্ত্তা বলিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তাঁহারা আশা করেন পুনর্গঠিত এই ধাতব গোলক যোগে সমুদ্র-তলের অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবেন।

এরোপ্লেন-ক্যামেরার কৃতিত্ব

শক্তিশালী এরোপ্লেন-ক্যামেরার সাহায্যে এমন কতগুলি অদ্ভুত জিনিষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো কোনরূপ ধারণা ছিল না। পৃথিবীর বুকের উপর বিচরণ করিয়া যে সকল বৃহৎ জিনিষ একসঙ্গে দেখিতে না পারিয়া আমরা তাহাদের সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা করিতে পারি না, আকাশের অতি উচ্চস্থান হইতে তাহার একটা পরিপূর্ণ চিত্র সমগ্রভাবে লোকের চক্ষে প্রতিভাত হয়, ইহার ফলেই ক্যামেরার সাহায্যে অতি অদ্ভুত জিনিষসমূহ লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছে।

ব্রুকভিলের গল্‌ফ্ খেলার মাঠের উপর হইতে ফোটো লওয়া হইলে দেখা গেল সেই গল্‌ফ্ কোর্সের মধ্যে দুইটী পরিষ্কার সমান্তরাল রেখায় ঘোড়-দৌড়ের রাস্তার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে অথচ সেখানে ওরূপ কোন রাস্তার চিহ্ন মাত্র নাই। প্রথমতঃ সন্দেহ হইল—ফিল্মের একই স্থানে দুইবার এক্সপোজার হইয়াছে। কিন্তু পরে আবার দেখা গেল তাহা নয়। এক্সপোজার ঠিকই আছে। তবে এই চিহ্ন কোথা হইতে আসিল? অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, তখন 'গল্‌ফ্ কোর্সে'র ইঞ্জিনিয়ারের একটা কথা মনে পড়িল—শুষ্ক ঋতুতে ওই মাঠের চতুর্দ্দিকের ঘাস সবুজ থাকা সত্ত্বেও ডিম্বাকৃতি ভাবে রাস্তার মত খানিকটা স্থান জুড়িয়া ঘাসগুলি আগেই হলদে হইয়া পড়িত। কেহই ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। ফোটোগ্রাফের সঙ্গে সেই ব্যাপারের কিছু একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া বুঝা গেল। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল—বহুদিন পূর্ব্বে এই জমির এক মালিক ঘোড়াদের দৌড় শিখাইবার জন্য একটি শক্ত রাস্তা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। এখন তাহা কয়েক ইঞ্চি মাটীর নীচে ডুবিয়া গিয়াছে, উপর হইতে তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। এই ব্যাপার জানিবার পর নীচের শক্তমাটী তুলিয়া ফেলিয়া মাঠটীতে সর্ব্বত্র সমানভাবে সবুজ ঘাস জন্মাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছিল।

এইরূপে ইংল্যাণ্ডের 'রয়েল এয়ার ফোর্সে'র ফোটোগ্রাফার বহু শতাব্দী যাবৎ নরলোকের ভূগর্ভে লুক্কায়িত প্রাচীন এক রোমান সহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই সহরটী একটী বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের নীচে লুক্কায়িত ছিল। যেখানে সেখানে দালান কোঠা, দেওয়াল বা রাস্তাঘাট ছিল সেই স্থানের ঠিক উপরে যে সব গাছ জন্মাইত সেগুলি অন্যান্য গাছপালা অপেক্ষা কম পরিপুষ্ট হইত, কাজেই তাহাদের রং অনেকটা ফ্যাকাসে হইয়া পড়িত। নীচ হইতে এ দৃশ্য বিশ্লিষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহাতে কিছুই বুঝা যাইত না। ঘটনাক্রমে এরোপ্লেন হইতে এসব স্থানের ফোটোগ্রাফ তোলা হয়, ফিল্ম ডেভেলপ করিবার পর নরলোকের এই শস্যক্ষেত্রের এক অপূর্ব্ব ছবি ফুটিয়া উঠে। সমগ্র ক্ষেত্র জুড়িয়া আলপনার চিত্রের মত একটি সহরের নক্সা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন অনুসন্ধানের ফলে এই লুপ্ত সহরের পুনরুদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। আজকাল প্রায়শঃই নূতন নূতন অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কারের খবর পাওয়া যাইতেছে। 'ফেয়ারচাইল্ড এরিয়েল সার্ভের' ক্যাপ্টেন স্মিথ

এরোপ্লেন-ক্যামেরা

এরোপ্লেন হইতে উত্তর, দক্ষিণ কেরোলিনার সীমান্তস্থানসমূহের ফোটোগ্রাফ লইতেছিলেন। ক্যামেরার দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; নীচে কিছুই

লক্ষ্য করেন নাই। ফিল্ম ডেভেলপ করিয়া দেখা গেল একটা বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া অসংখ্য ডিম্বাকৃতি রাস্তার মত কতগুলি গভীর দাগ রহিয়াছে। মনে হয় যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমস্ত জানোয়ার ওই স্থলে মিলিত হইয়াছিল। ইহাদের কাহারও দৈর্ঘ্য ৫০ ফীটের কম নহে আবার কতগুলির দৈর্ঘ্য দুই মাইলেরও উর্দ্ধে। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন সুদূর অতীতে পৃথিবীর সঙ্গে কতগুলি উল্কাপিণ্ড ও ধুমকেতুর ধাক্কা লাগিয়া এই সব গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভিন্ন মত পোষণ করেন, এক স্থানে এরূপ ১৫০০ গর্ত্তের উৎপত্তির সঠিক কারণ আজও জানা যায় নাই।

১৯৩২ সালে শিপি জনসন (Shippee-Johnson) অভিযাত্রীদল পেরুর অজানা অঞ্চলের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় আণ্ডিজ পর্ব্বতের তুষাররাশি ও আগ্নেয়গিরিসমূহের নিকটবর্ত্তী অজ্ঞাত স্থানসমূহের ফোটোগ্রাফ লইয়াছিলেন, সেই ফোটোগ্রাফের সাহায্যে চীনের মহাপ্রাচীরের মত এক বিরাট প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই বিরাট প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষও ৫০ মাইল লম্বা হইবে। কোন অজ্ঞাত অধুনালুপ্ত মানবজাতি কর্ত্তৃকই এই প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে লম্বা পর্ব্বতশ্রেণীর মত একটি অদ্ভুত জিনিষ ফিল্মের গায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেটা যে কি বস্তু প্রথমে কিছু বুঝিতে পারা যায় নাই, অবশেষে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ছবি তোলার পর দেখা গেল সেইগুলি পর্ব্বত নহে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পাশাপাশি ১২টি করিয়া বিশাল গর্ত্ত, পর্ব্বত খোদাই করিয়া মাইলের পর মাইল এইরূপ গর্ত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। এগুলি কি এবং কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল কেহই বলিতে পারে না। এতদিন তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। অনেকে অনুমান করেন - এগুলি 'মমির' কবর। আবার কেহ কেহ বলেন দেশরক্ষার জন্য বেড়ার খুঁটির গর্ত্ত।

ব্রিটিশ এয়ার ফোর্সের ক্যাপ্টেন কাল্ (Capt. J. T. Cull) মিশরের উপকূলভাগের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় ভূমধ্যসাগরের জলের নীচে অশ্বক্ষুরাকৃতি একটা বিরাট কালো চিহ্ন দেখিতে পাইয়া মিশরের স্থাপত্য বিভাগে জানান। তাহারা ডুবুরী নামাইয়া জলের নীচে এক বিরাট সহরের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করেন। এখনও সেখানে অনেক ভগ্ন অট্টালিকা-স্তম্ভ ও রাজপথের অস্তিত্ব রহিয়াছে। সেখান হইতে আলেকজাণ্ডারের মর্ম্মরমূর্ত্তির মস্তক উত্তোলন করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন, রোম যখন মিশরের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিল এই লুপ্ত সহরটী সেই সময়ে ক্যানোপাস নামে বিখ্যাত ছিল।

এরোপ্লেন-ক্যামেরার সাহায্যে গৃহীত মেসা মরুভূমির বিরাট মনুষ্য ও জন্তু চিত্র।

দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ায় মেক্সিকোর সীমান্ত প্রদেশে মেসা নামক মরুভূমির উপর উড়িবার সময় একখানি এরোপ্লেন হইতে সে স্থলের ছবি তোলা হয়। তাহাতে কতগুলি বিরাট মনুষ্য ও অন্যান্য জানোয়ারের আকৃতি পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হয়। পরে অনুসন্ধানে দেখা যায়, সে স্থলে সর্ব্বত্রই এরূপ অনেক মনুষ্য ও জানোয়ারের মূর্ত্তি মাটী খুঁড়িয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মনুষ্যমূর্ত্তিটি ১৬৭ ফীট লম্বা; সর্ব্বাপেক্ষা ছোটটী ৯৫ ফীট। অনেকে অনুমান করেন প্রাচীন আমলের কোন জাতি বোধ হয় আকাশস্থ দেবতাদের কৃপাপ্রার্থনার জন্য এই মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এতদিন ইহারা সম্পূর্ণরূপে লোকলোচনের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল। এরোপ্লেন ক্যামেরার সাহায্যে সম্প্রতি ইহারা লোকের নজরে আসিয়াছে মাত্র।
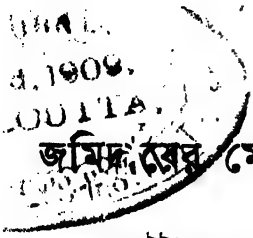
জমিদারের মেয়ে

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা আটটা তখনও বাজে নাই। সাত-আনীর বাঁড়ুজ্জে-দের কাছারী-বাড়ী দক্ষিণ-দুয়ারী প্রকাণ্ড খড়ের বাংলাটার বারান্দায় তক্তাপোষের উপর নায়েব, সিংহমহাশয়, সেরেস্তা বিছাইয়া বসিয়াছিলেন। চাকর সতীশ ঢেঁরা ঘুরাইয়া শনের দড়ি পাকাইতেছিল। চাপরাশী কেষ্ট সিং ঘরের মধ্যে মাথার পাগড়ীটা ঠিক করিয়া লইতেছিল।

বাংলাটার সহিত সমকোণ করিয়া পূর্ব্বদিকে আর একখানা ছোট খড়ো বাংলা। ওই ঘরগুলিতে চাকর-চাপরাশী থাকে। এই ঘরটার বারান্দার চাল-কাঠামোয় বাঁধা দুইখানা পাল্কী ঝুলিতেছে। পাল্কী দু'খানার নাম আছে—একখানা 'কর্ত্তাসওয়ারী' অপরখানা 'গিন্নীসওয়ারী' অর্থাৎ একখানা বাড়ীর কর্ত্তার জন্য অপরখানি বাড়ীর গিন্নীর জন্য নির্দ্দিষ্ট। গিন্নীসওয়ারীটার সাজসজ্জা জাঁকজমক বেশী; ভিতরটা লাল কিংখাব দিয়া মোড়া, ছাদে চাঁদোয়ার পাশে পাশে ঝুটা-মতির ঝালর। সম্মুখেই কাঠা-দুয়েক জায়গা ঘেরিয়া ফুলের বাগান। একদিকে একসারি নারিকেল গাছ; মধ্যে বেলা, যুঁই, করবী, জবা, কামিনী, স্থলপদ্ম প্রভৃতি গাছের কেয়ারী। ঠিক মধ্যস্থলে একটি পাকা বেদী। বাগানের পরই বিঘা-দেড়েক স্থান প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে তক্ তক্ করিতেছে। একদিকে এক সারিতে গোটা তিনেক ধানের হামার। বাগানের পাশেই খামার-বাড়ী যেখানে আরম্ভ হইয়াছে সেইখানেই একটি ফটক। ফটকের দুই পাশ দিয়া থামের গায়ে দুইটি লতা—একটি মালতী ও একটি মধুমালতী উপরে উঠিয়া জড়াইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। এ বাড়ীটার পূর্ব্ব-গায়েই বাঁড়ুজ্জেবাবুদের সখের পুকুর, শ্রীপুকুরের দক্ষিণ পাড়ে আর একটা বাড়ী; বাবুদের গোশালা ও চাষবাড়ী।

বাঁড়ুজ্জে-বাড়ীর পিসীমা আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিছনে নিত্য-ঝি। নায়েব সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে একবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া পিসীমা প্রশ্ন করিলেন—কেষ্ট সিং কোথা গেল?

পাগড়ীটা জড়াইতে জড়াইতে কেষ্ট সিং তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে!

পিসীমা প্রশ্ন করিলেন—শম্ভু কোথা? গরু-বাছুরকে সব খেতে দেওয়া হয়েছে?

পুরু চশমাটা নাকের ডগায় টানিয়া দিয়া ভ্রূ ও চশমার ফাঁক দিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া সিংহ মহাশয় হাঁকিলেন—শম্ভু—শম্ভু।

কেষ্ট সিং তৎক্ষণে দ্রুতপদে শম্ভুর খোঁজে চলিয়া গিয়াছে।

পিসীমা বলিলেন—এ খোঁজটা সকালেই নিতে হয় সিং মশায়। গো-সেবায় অপরাধ হলে হিন্দুর সংসারে অভিশম্পাত হয়।

নায়েব মাথা চুলকাইয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই পিসীমা বলিলেন—সতীশ, কাছারী-ঘরটা খোল ত।

সাত বৎসর পূর্ব্বে এ বাড়ীর মালিকের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর হইতে কাছারী-কক্ষখানি বন্ধই থাকে। নাবালক ছেলে সাবালক হইলে এ ঘর আবার নিয়মিত খোলা হইবে—ব্যবহৃত হইবে। সতীশ তাড়াতাড়ি চাবী খুলিয়া দিল। পিসীমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘরখানি পূর্ব্বের মতই সাজান রহিয়াছে। প্রকাণ্ড লম্বা ঘরখানার ঠিক মধ্যস্থলে একখানা আবলুস কাঠের টেবিল, তাহার পিছনে একখানা ভারী-কাঠের সে-কালের চেয়ার, টেবিলের দুইপাশে দুইখানা প্রকাণ্ড তক্তাপোষ ঘরের দুই প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তক্তাপোষের উপর ফরাস বিছানোই আছে, ফরাসের উপর সারি সারি তাকিয়া, ঘরের দেওয়ালে বড় বড় দেবদেবীর ছবি—ঠিক দুয়ারের মাথায় সে-আমলের মন্দিরের আকারের একটা ক্লক টক্ টক্ করিয়া চলিতেছিল। রূপার আলবোলাটি পর্য্যন্ত একটা তেপায়ার উপর পূর্ব্বের মতই রক্ষিত ছিল—নলটি টেবিলের উপর পড়িয়া আছে, যেন মালিক কোথায় কার্য্যান্তরে উঠিয়া গিয়াছেন।

একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া পিসীমা বলিলেন—জানালাগুলো খুলে দে—ঘরে রোদ আসুক।

সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে বলিলেন—বগতোড়ের মহেন্দ্র গণকের কাছে একটা লোক পাঠাতে হবে। খোকার কুষ্ঠী দেখে একটা শান্তি, আর—

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পিসীমা বলিলেন—তাকে আপনি আসতে লিখে দিন।

তারপর আবার বলিলেন—মহালে মহালে পাইক পাঠান হয়েছে ?

নায়েব বলিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, পরশু লোক চলে গিয়েছে সব।

পিসীমা আর দাঁড়াইলেন না—কাছারীবাড়ীর সংলগ্ন শ্রীপুকুরের বাঁধাঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাঝারী আকারের সমচতুষ্কোণ পুকুরটির চারিপাশে তালতরুশ্রেণী সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক বিপরীত দিকে একদল ভদ্রলোক কি যেন করিতেছিল। তাহাদের সঙ্গে একটা টেবিলের মত কি রহিয়াছে—আর একটা মজুর শিকলের মত কি একটা টানিতে টানিতে লইয়া চলিয়াছে।

পিসীমা বেশ উচ্চ কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন—কারা ওখানে ?

কেহ উত্তর দিল না। পিসীমা কাছারীর দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন—সিং মশায় !

নায়েব সিং মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিসীমা পদশব্দে তাঁহার আগমন অনুমান করিয়া বলিলেন—দেখে আসুন ত কি হচ্ছে ওখানে আমার সীমানার মধ্যে !

কথাটা তিনি তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠেই বলিলেন। এবার ও দিক হইতে উত্তর আসিল—সাহা-পুকুরের সীমানা জরীপ হচ্ছে।

শ্রীপুকুরের ওপাশেই সাহা-পুকুর, পুকুরের সরিকদের মধ্যে পাড়-বাঁটোয়ারা লইয়া একটা মামলা চলিতেছিল। কথাটা সকলেই জানিত।

পিসীমা বলিলেন—তা আমার সীমানার মধ্যে শেকল পড়ল কেন? শেকল তুলে নাও ওখান থেকে।

ও পাড়ার বৃদ্ধ শশী রায় বলিলেন—আমরা ত তোমাদের সীমানা খেয়ে ফেলি নাই, তুলেও নিয়ে যাই নাই—

বাধা দিয়া পিসীমা বলিলেন, তুলে নিন শেকল আমার সীমানা থেকে।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে ও আদেশের দৃঢ় ভঙ্গিমায় সকলেই একটু চকিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ শশী রায় গাঁজাখোর, তিনি ক্ষিপ্তের মত বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা হারামজাদা মেয়ে যা হোক !

কঠিন কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে এ দিক হইতে উচ্চারিত হইল, কেষ্ট সিং, ওই জানোয়ারটাকে ঘাড় ধরে আমার সীমানা থেকে বের করে দিয়ে এস।

পিসীমার উচ্চ কঠিন কণ্ঠস্বর শুনিয়া কেষ্ট সিং প্রায় নায়েবের সঙ্গেই আসিয়া লাঠি হাতে খাড়া দাঁড়াইয়াছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে সে ও-পাড়ের দিকে চলিয়া গেল। পিসীমা বলিলেন নায়েবকে, আপনি যান, সরকারী লোক যিনি জরীপ করতে এসেছেন তাঁকে বলুন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বলিয়াই তিনি কাছারীবাড়ীতে ঢুকিয়া সতীশকে বলিলেন, সতীশ, কাছারী ঘর খুলে দে, আর পাশের খোকার পড়ার ঘরের মধ্যের দরজা খুলে দিয়ে পর্দ্দাটা ফেলে দে। খোকা কোথায় ডেকে দে।

সরকারী কানুন-গো আসিয়া কাছারীঘরে বসিলেন। চৌদ্দ পনের বৎসরের শ্যামবর্ণ একটি ছেলে উভয় ঘরের মধ্যের পর্দ্দাটা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভিতরের ঘর হইতে আদেশ হইল, নমস্কার কর, শিবনাথ।

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শিবনাথ নমস্কার করিয়াছিল, সে বলিল, করেছি পিসীমা।

কানুন-গো-বাবু বলিলেন, আমাকে কিছু বলবেন ?

পিসীমা ভিতর হইতে বলিলেন, হ্যাঁ। আমার সীমানার মধ্যে শেকল আনবার পূর্ব্বে আমাকে কি জানাবারও দরকার নাই ? আমি স্ত্রীলোক, আইনের কথা ভাল জানি না, আইন কি আপনাদের তাই ?

কানুনগো একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ, ম্যাপ অনুযায়ী জরীপ করলে—জানাবার ঠিক দরকার হয় না।

প্রশ্ন হইল—ম্যাপ অনুসারেই কি জরীপ করছেন ?

কানুনগো জবাব দিলেন—না ওঁদের কহত-মতই আমি জরীপ করছিলাম। আর ওঁরা ঠিক আপনার সীমানা জরীপ করাচ্ছিলেন না, তালগাছের বেড়ার জন্যে ওপাশে যেতে অসুবিধে হচ্ছিল তাইতে আপনার সীমানার –

এবার বাধা দিয়া পিসীমা বলিলেন—সীমানা আমার নয়, নাবালকের ; এই ছেলেটির অভিভাবক সরকারী তরফ হতে জজ সাহেব—আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

কানুনগো-ভদ্রলোক অভিভূত হইয়া পড়িতেছিলেন—স্ত্রীলোকের নিকট তিনি এমন প্রশ্নোত্তর প্রত্যাশা করেন

নাই। তিনি বলিলেন আমারই দোষ, আপনাদের অনুমতি নেওয়া সত্যিই আমার উচিত ছিল, তার জন্যে—

আবার বাধা দিয়া পিসীমা বলিলেন—আপনি সরকারের কর্ম্মচারী আমাদের মান্যের ব্যক্তি। আপনাকে জবাবদিহি করতে আমি ডাকি নাই—আমি শুধু এটুকু জানতে চেয়েছিলাম।

কানুনগো বলিলেন—না-না, ওই বুড়ো ভদ্রলোকটির কথায় আমার লজ্জার সীমা নাই, আপনি যদি এর প্রতিকার চান—

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া উত্তর আসিল—উনি গাঁজাখোর, তা ছাড়া ওপর দিকে থুথু ছুঁড়ে ত লাভ হয় না, সে নিজের গায়েই এসে পড়ে। আর আমার বাপ কি ছিলেন সে ত এ চাকলার লোকের অজানা নয়। মামলা করে টাকার ডিক্রী দেওয়া চলে, সম্মানের ডিক্রী নিতে যাওয়া ভুল।

কানুনগো চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—তা হলে আমি উঠি ?

এবার শিবনাথ একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—একটু চা খেয়ে যান।

কানুনগো হাসিয়া বলিলেন—না-না খোকা, সে দরকার হবে না।

ভিতর হইতে অনুরোধ হইল- আমাদের হিন্দুর ঘর, তার ওপর আমরা জমীদার—আপনি অতিথি, সরকারী কর্ম্মচারী, আপনি না খেলে বুঝব আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন আমাদের ওপরে।

কানুনগো একথার জবাব দিতে পারিলেন না।

শিবনাথ বলিল চা দেওয়া হয়েছে আপনার।

কানুনগো মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন ছোট একটি টেবিলের উপর রূপার রেকাবীতে মিষ্টান্ন এবং ধূমায়িত চায়ের কাপ শোভা পাইতেছে। দুয়ারের পাশে হাতে গাড়ু, কাঁধে গামছা লইয়া চাকর দাঁড়াইয়া আছে।

* * *

কানুনগো চলিয়া গেলে পিসীমা বাহির হইয়া আসিলেন। বারান্দায় একজন দীর্ঘাকৃতি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন—তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—ভাল আছেন ?

পিসীমা বলিলেন—এস ভাই:এস, কি ভাগ্যি আমার, লক্ষ্মীর বরপুত্রের পায়ের ধুলো আজ সকালেই আমার ঘরে পড়ল! কবে এলে তুমি—ভাল ছিলে ?

ভদ্রলোকটি এই পাড়ারই রামকিঙ্করবাবু, লক্ষপতি ব্যবসায়ী, কলিকাতায় থাকেন।

রামকিঙ্করবাবু বলিলেন—পরশু এসেছি। আজ সকালেই বৈঠকখানার দোরে দাঁড়িয়ে এই হাঙ্গামাটা শুনলাম, শুনে তাড়াতাড়ি এলাম যদি কোন দরকারে লাগতে পারি।

পিসীমা স্মিতমুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—বেঁচে থাক ভাই, ধনেপুত্রে বাড়বাড়ন্ত হোক তোমার। তোমাদের পাঁচজনেরই ত ভরসা করি।

রামকিঙ্কর হাসিয়া বলিলেন—ভরসা আপনাকে কারও করতে হবে না, ঠাকরুণ দিদি। লোকে আপনাকে আড়ালে ঠাট্টা করে বলে ফৌজদারীর উকীল, তা দেখলাম উকীলের চেয়েও বড় আপনি—আপনি ব্যারিষ্টার।

পিসীমা হাসিলেন—বলিলেন—আমায় এবার কলকাতা থেকে গাউন আর টুপী এনে দিয়ো—মামলা থাকলে খবর দিয়ো।

রামকিঙ্করবাবু বলিলেন—মামলা একটা নিয়েই এসেছি, ঠাকরুণ দিদি। তবে এ মামলায় আপনি জজসাহেব, একেবারে হাইকোর্ট, এর আর আপীল নাই।

পিসীমা বলিলেন—তাই ত বলি, ব্যবসাদার কি বিনা গরজে কোথাও পা বাড়ায়! বেণেতীবুদ্ধি পেটে পেটে হয় তাদের। কি—বল শুনি।

রামকিঙ্কর বাবু বলিলেন—আমার মা-মরা ভাগ্নীটিকে আপনাকে নিতে হবে। শিবনাথের আপনি বিয়ে দিচ্ছেন শুনলাম।

পিসীমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন - এখন এ কথার জবাব দিতে পারলাম না ভাই, কাল জবাব দেব।

রামকিঙ্করবাবু এ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি ঈষৎ উষ্ণভাবে বলিলেন—কেন আপনাদের জমীদারের ঘরের উপযুক্ত হবে না আমার ভাগ্নী ?

পিসীমার মুখচোখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন—ঠিক উল্টো ভাবছি ভাই—ভাবছি,

হাতীর খোরাক জোগাতে কি আমার শিবনাথ পারবে! লক্ষপতির ঘরের মেয়ে আমাদের মত ছোট-জমিদারের ঘরে খাপ খাবে? তা ছাড়া তার মা আছে, তারও একটা মত চাই।

রামকিঙ্করবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিলেন—তিনি বলিলেন—না-না, আপনার দাদার, আমাদের ঠাকুর্দ্দার প্রতাপে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেয়েছে; তার ছেলে শিবনাথ, সে বাঘিনী হলেও বশ মানাবে। ওই দেখুন না।

সম্মুখেই প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে তখন শিবনাথ একটা ঘোড়াকে শাসন করিতেছিল। কাহার একটা ছোট ঘোড়া—কিন্তু দুরান্তপনায় সে খাটো নয়—ক্রমাগত পিছনের পা দুইটা ছুঁড়িয়া সওয়ার শিবনাথকে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

শিবনাথ হুকুম করিতেছিল শম্ভু রাখালকে—দে ত রে, একটা খেজুরের ডাল ভেঙে কাঁটাসুদ্ধ।

রামকিঙ্করবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—শুনচেন?

পিসীমার মুখও আনন্দোজ্জল হইয়া উঠিল, তিনি ডাকিলেন—শিবু, অ-শিবু, নেমে আয়।

শিবু বলিল - দাঁড়াও না, বেটার পা ছোঁড়াটা একবার বের করে দিই।

পিসীমা বলিলেন—কার ঘোড়ায় চেপেছিস—মা শুনলে রাগ করবে!

সম্মুখেই এক প্রৌঢ় আধভদ্র মুসলমান দাঁড়াইয়াছিল, সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল—আমারই ঘোড়া মা, আমি আপনাদের প্রজা, মা। আপনার মহল দোগাছির মোড়ল আমি।

পিসীমার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল—তিনি বলিলেন—তুমিই সবজান সেখ?

প্রৌঢ় বলিল—আপনার গোলাম তাঁবেদার আমি মা।

পিসীমা রামবাবুকে বলিলেন—তুমি কাল সকালে একবার এস ভাই রাম, নাস্তির কুষ্ঠীটাও নিয়ে এস। আর আজ দেরী হয়ে গেল, কাল সকালে জলখাবার নেমন্তন্ন রইল।

রামকিঙ্কর হাসিয়া বলিলেন—তাই আসব। কিন্তু সে মিষ্টি ত আমার ঘটকালীর পাওনা। আজকের—

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন—বেশ ত, দুথালা খাবে।

রামকিঙ্কর হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। পিসীমার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, মুখখানা কঠোর হইয়া উঠিল; তিনি ডাকিলেন—শিবনাথ, নেমে এস।

শিবু, শিবনাথ সম্বোধন এবং সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষায় আদেশ শুনিয়া বুঝিয়াছিল, এ আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সে ঘোড়া হইতে লাফ দিয়া নামিয়া কাছারীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সবজান হাসিয়া বলিল—প্রথমেই হুজুরের সঙ্গে দেখা, হুজুরকে সেলাম করতেই হুজুর বল্লেন, ওই পিসীমা রয়েছেন, রোখো যাও, আমি তোমার ঘোড়াটা দেখি।

বলিয়া সে এইবার শিবনাথের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে প্রসারিত একখানি লাল রেশমী রুমালের উপর পাঁচটি টাকা নজর হাজির করিল।

শিবনাথ চাহিয়াছিল পিসীমার মুখের দিকে, সেখানে কখন কি ইঙ্গিত সে পাইল সেই জানে, সে টাকা-পাঁচটি স্পর্শ করিয়া বলিল—নায়েব বাবুর সেরেস্তায় দাও।

সবজান করযোড়ে বলিল—আমাকে রক্ষা করতে হবে হুজুর। আমার খাজনা নিতে হুকুম দিতে হবে।

শিবনাথ পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। পিসীমার মুখ গভীর গাম্ভীর্য্যে থম্ থম্ করিতেছিল।

সবজান বলিল—হুজুর!

শিবনাথ একবার সবজানের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চোখের কোণে কোণে অশ্রু জমা হইয়া উঠিতেছে। সে বলিয়া উঠিল—বেশ ত, খাজনা দাওনা তুমি।

বলিয়াই সে বলিল—পিসীমা!

পিসীমার অনুমতির প্রার্থনায় সবজানও একান্ত অনুনয়-পূর্ণ কণ্ঠে বলিল—মা!

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন—মালিকের হুকুম হয়ে গিয়েছে সবজান, সে ত আর না হয় না।

সবজান বারবার সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিসীমা বলিলেন—দুফোঁটা চোখের জলে তুমি আমার কাছে রেহাই পেতে না, সবজান। আরও একটু শিক্ষা তোমায় আমি দিতাম। যাক্, কিন্তু স্বীকার করে যাও, জমিদারের লোককে বিনা কারণে অপমান আর কখনও—

সবজান বলিয়া উঠিল—আমরাও ত আপনার ছেলে মা।

পিসীমা'র ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, কথার ওপর কথা বলতে নাই, সবজান। ছেলে ত তোমরা নিশ্চয়ই, কিন্তু অবাধ্যতার জন্যে তোমাদের ওই মালিক শিবনাথের পিঠেও মারের দাগ দেখতে পাবে। এস শিবনাথ।

শিবনাথের হাত ধরিয়া পিসীমা চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর সতীশ চাকর মাটীর বাসনে করিয়া জলখাবার আনিয়া বলিল—সেখ-জী, আপনার জলখাবার।

নায়েবের সম্মুখে ছোট একটা কাগজের টিপ ফেলিয়া দিয়া সতীশ নায়েবকে বলিল—সেখজীর বিদায়।

নায়েব পড়িল, চিরকুটে লেখা রহিয়াছে—দোগাছির মণ্ডল সবজান সেখের বিদায়ের জন্য একজোড়া কাপড় ও চাদর আনিয়া দিতে হইবে। সহি, করিয়াছেন শিবনাথের মাতা, আর একপাশে একটা ঢেঁরা সহি ওইটুকু পিসীমার হুকুম; পিসীমা অল্প পড়িতে জানেন কিন্তু লিখিতে জানেন না।

দুই

সন্ধ্যায় নীচের তলার দরদালানে বসিয়া ননদ ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে কথা হইতেছিল। একখানি গালিচার উপর বসিয়া পিসীমা পায়ে তেল লইতেছিলেন। পাশে একখানি ডালায় গোটা সুপারী ও জাঁতি রহিয়াছে। এপাশে শিবনাথের মা হারিকেনের আলোর সম্মুখে বসিয়া মঞ্জুরী-সহিযুক্ত টিপের সহিত জমাখরচের খাতা মিলাইয়া দেখিতেছিলেন। অনুজ্জ্বল আলোকেও তাঁহার দেহবর্ণ মোমের মত শুভ্র মনে হইতেছিল। খাতাখানি বন্ধ করিয়া তিনি বলিলেন—ঠিক আছে ঠাকুরঝি!

পিসীমা বলিলেন—বেশ। সতীশকে দিয়ে দাও।

সতীশ দাঁড়াইয়াই ছিল, সে খাতাপত্র লইয়া চলিয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন—কিছুদিন থেকেই ভাবছি বৌ, মনের আমার বড় সাধ—বলি বলি করেও তোমায় বলিনি।

অন্তরাল হইতে শুনিলে এখনকার এই পিসীমাকে প্রাতঃকালের সেই পিসীমা বলিয়া চেনা যায় না—ভাষায় ভঙ্গীমায় কোনখানে মেলে না। এখনকার ভাষায় ভঙ্গীমায় কেমন একটি সকরুণ দীনতার আবেদন সুস্পষ্ট, সংশয় করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত হয় না।

শিবনাথের মা বলিলেন—শিবনাথের বিয়ের কথা বলছ, ঠাকুরঝি?

চমকিয়া উঠিয়া পিসীমা বলিলেন—শুনেছ তুমি বৌ—কে বল্লে তোমাকে?

শিবনাথের মা একটু হাসিলেন। বলিলেন—সকলের কাছেই শুনছি, তুমি আমাকেই বলনি। নইলে বলেছ ত পাড়ার সকলকেই।

পিসীমা বলিলেন—আমি ত কাউকে বলিনি বৌ!

শিবনাথের মা আবার হাসিলেন। হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—ইচ্ছে করে হয়ত বলনি। কিন্তু তোমার সাধের কথা কখন যে বেরিয়ে গেছে সে তুমি জানতে পারনি ভাই।

পিসীমা বলিলেন—বড়সাধ আমার বৌ, ছোট্ট একটি বৌ এনে ঘর করি। বাড়ীর মেয়ের মত ঘুর ঘুর করে বেড়াবে। শিবুকে দেখে ঘোমটা দেবে না, তার সঙ্গে ঝগড়া করবে। দাদারও আমার তাই সাধ ছিল—দুই ভাই বোনে কত পরামর্শ করেছি।

শিবনাথের মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া পিসীমা বলিলেন, বৌ!

নতমুখে শিবনাথের মা বলিলেন, ভাবছি ভাই।

পিসীমা বলিলেন, এই জন্যেই তোমায় আমি বলিনি বৌ। ছেলে ত তোমার। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

শিবনাথের মা বলিলেন, না শিবনাথ তোমার—

যেন শিহরিয়া উঠিয়া পিসীমা বলিলেন, না-না বৌ—তোমার, শিবু তোমার। আমার, এ কথা বল না, আমার হলে থাকবে না। থাকল না ত ভাই, একদিনে স্বামী-পুত্র গেল, ভাইকে আশ্রয় করলাম—তারপর সেও আমারই অদৃষ্টে গেল। আমার মনে হয় কি জান বৌ, মনে হয় তোমার বৈধব্যের জন্যে আমি দায়ী।

ঝর ঝর করিয়া চোখের জলে তাঁহার বুকের বস্ত্রাঞ্চল ভাসিয়া গেল।

শিবনাথের মা বলিলেন, কেঁদ না ভাই ঠাকুরঝি, এক্ষুণি হয় ত শিবু এসে পড়বে, তারপর সেও উপদ্রব করবে। তোমার কান্না দেখলে তার উপদ্রব বাড়ে যেন তোমার ওপর।

সচকিত হইয়া পিসীমা বলিলেন, কই, শিবু ত এখনও ফেরে নি!

বাহিরে দুয়ারের গোড়ায় সতীশ দাঁড়াইয়া ছিল—সে বলিল, কই, বাবু ত এখনও ফেরেন নি, মাষ্টার মশায় বসে আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পিসীমা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—রাত্রি কটা হল সতীশ? কেষ্ট সিংকে বল, আলো নিয়ে—।

মা বাধা দিয়া বলিলেন, রাত্রি বেশী হয় নি। কিন্তু শিবনাথকে শাসন করা দরকার হয়েছে, ঠাকুরঝি।

পিসীমা বলিলেন, খুব শাসন কর তুমি আজ, কিছু বলব না আমি ভাই, আমি ওপরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকব। সেই জন্যেই ত সকাল সকাল বিয়ে দিতে চাই আমি, জান ত আমার বাপেদের গুষ্ঠী। হয় ত বয়ে যাবে কখন।

মা বলিলেন—সে কথার-কথা ঠাকুরঝি, ছেলেকে শাসনে রাখলে বেগড়ায় তার সাধ্যি কি? আমার যে ভাই অনেক সাধ শিবনাথের ওপর, আমি যে বড় বিখ্যাত লোকের মা হতে চাই!

পিসীমা বলিলেন, বিয়ে হলে কি তা হয় না বৌ? সে ত ভাগ্যের ফল।

মা বলিলেন, ভাগ্যই হয় ত হবে। বাবাকে আমার চিঠি লিখেছিলাম আমি—তিনিও তাই লিখেছেন। লিখেছেন, শৈলজা-মায়ের সাধে বাধা দিও না, সে তোমার অধর্ম্ম হবে।

হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে ব্যগ্রতাভরে পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, তাই লিখেছেন তিনি বৌ—তাই লিখেছেন? এত বিবেচনা না হলে মানুষ বড় হবে কেন? তা ছাড়া আর একটা কথা কি জান বৌ, আমার ত এই অদৃষ্ট—তোমার অদৃষ্টও ত ভাল বলতে পারব না, নইলে এমন রাজার মত স্বামীকে এই বয়সে হারাবে কেন? তাই ভাবি একটি ভাগ্যমানী মেয়ের ভাগ্যের সঙ্গে শিবুকে বেঁধে দিই।

বাহিরে শিবনাথের আস্ফালন শোনা গেল—বন্দুক থাকলে, জান কেষ্ট, ঠিক ওটাকে মেরে আনতাম।

মা বলিলেন—তুমি ওপরে যাও ঠাকুরঝি।

শৈলজা উঠিলেন, কিন্তু যাইতে যাইতে বলিলেন—বেশ করে কান মলে দিয়ো—যেখানে সেখানে চড়টড় মেরো না যেন।

শিবনাথ ঘরে ঢুকিল। হাতে একটা উইকেট-ষ্টিক, বগলে একটা পশুশাবক। শাবকটাকে উঠানে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, বল দেখি রতন-দি, কিসের বাচ্চা এটা?

রতন দিদি এ বাড়ীর পুরাতন পাচিকা। রতন ইসারা করিয়া দেখাইয়া দিল মাকে। কিন্তু শিবনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না। সে বলিল—ওকি হাত দিয়ে কি দেখান হচ্ছে? দেখ না একটা হেঁড়োলের বাচ্চা ধরে এনেছি। হেঁড়োল—ইংরিজীতে বলে হায়েনা। ডু ইউ নো? ইউ ডোণ্ট নো। আবার হাত নাড়ে! শোন না—উদোসীর পারে একটা গর্ত্ত থেকে ধাড়ীটা বেরিয়ে গেল—আর আমরা গর্ত্তটা উইকেট দিয়ে খুঁড়ে—।

মা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকলেন—শিবনাথ।

শিবনাথ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত ম্লানস্বরে বলিল—নেকড়ের বাচ্চা ধরে এনেছি মা। হাতটা কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে কিন্তু, এই দেখ।

রক্তাক্ত হাতটা সে মায়ের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিল। মা তাহার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন না—তিনি একদৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শিবু বলিয়া উঠিল—পিসীমা কোথায় রতনদি? তারপরই আরম্ভ করিল, পিসীমা হেঁড়োলের বাচ্চা ধরে এনেছি—দেখবে এস। আমার হাতটা কামড়ে কি করে দিয়েছে দেখে যাও। উঃ—

মা তাহার কান টানিয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু হাসিয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—বড় সয়তান হয়েছিস শিবু, নেকড়ের বাচ্চা যদি পিসীমা নাই দেখে, তবে হাতে যে কামড়ে দিয়েছে সেটা দেখে যাক।

উপরের বারান্দায় তখন পিসীমার পদধ্বনি ধ্বনিত হইতেছিল।

মা বলিলেন—রতন উনোনে জল গরম করতে দাও দেখি, কেষ্ট, ডাক্তারখানা থেকে একশিশি আইডিন নিয়ে এস চট করে: ওদের লালায় বিষ থাকে।

তারপর ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—তোমার ওপর বড় অসন্তুষ্ট হয়েছি শিবু, যদি ধাড়ীটা তোমায় ধরত তবে কি হত বল ত?

পিসীমা বলিলেন—ডাক্তারকে ডেকে আন, কেষ্ট। তিনি ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

শিবু বলিল—এই দেখ পিসীমা।

—তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না শিবু।

মা বলিলেন—কালই এটাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

শিবুর মুখ শুকাইয়া গেল, সে বলিল ছেড়ে দিয়ে আসব?

—হ্যাঁ, নেকড়ের বাচ্চা পুষে কি হবে, ওরা হিংস্র পশু। আর পাখী-পশু পাশা এ তিন কর্ম্মনাশা। তোমার এখন পড়ার সময়। বুঝলে? তা ছাড়া হিংসা করা আমি পছন্দ করি না।

শিবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে বলিল—বেশ।

রতন বলিল—একটা বেরিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু যদি জোড়া থাকত—

শিবু বলিল—ইউ নো নাথিং, বাচ্চা হয় যখন, তখন মা-টাই থাকে শুধু, মদ্দা গুলো যে বাচ্চা খেয়ে দেয়। মা ছেলে নিয়ে লুকিয়ে থাকে।

মা বলিলেন—বাচ্চাটাকে একটু দুধ দাও দেখি।

হিংস্র পশুশাবক এক কোণে দাঁড়াইয়া হিংস্র ভাবে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করিতেছিল।

পিসীমা এতক্ষণে বলিলেন—আমি কাল কাশী যাব বৌ। আমায় তুমি রেহাই দাও ভাই।

শিবনাথ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ আরম্ভ করিল, হাতটা যে বড় জ্বালা করছে, রতনদি! উঃ, মা বলছিল বিস আছে ওদের।

পিসীমা ও বারান্দায় বসিয়াছিলেন, তিনি উঠিলেন।

মা হাসিয়া বলিলেন—কিছু হয় নি, বস তুমি। ভারী সয়তান ছেটা।

* * *

রাত্রে কোলের কাছে শোয়াইয়া পিসীমা শিবনাথের সহিত কথা কহিতেছিলেন। শিবনাথ এখনও পিসীমার কাছেই শোয়, শিবনাথকে কোলের কাছে না পাইলে পিসীমার ঘুম হয় না। শিবনাথের মাতামহ থাকেন বেহারে, সেখানে সরকারী চাকরী করেন তাঁহার ছেলেরা সকলেই কৃতবিদ্য। শিবনাথের মা ছেলেকে শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং এই বংশের ধারা জমিদারসুলভ দর্প, জেদ, উচ্ছৃঙ্খলতা, কঠোরতা ও বিলাসপরায়ণতা হইতে ছেলেকে রক্ষা করিবার জন্য বহুবার সেখানে পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পিসীমা মুখে কিছু বলিতেন না, কিন্তু কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে বসিতেন। শিবনাথের মা অগত্যা নিরস্ত হইয়াছিলেন।

প্রতিবেশিনী অন্তরঙ্গ কেহ কেহ বলিতেন—তা তোমাকে একটু সহ্য করতে হবে বৈকি, এই জমিদারী-সম্পত্তি, তুমি বৌ-মানুষ চালাবে কেমন করে!

শিবনাথের মা হাসিতেন, অধিকাংশ সময়েই এ কথার উত্তর দিতেন না, একবার কাহাকে বলিয়াছিলেন—সম্পত্তির ভাগ্যে যাই থাক, ঠাকুরঝি যে সেখানে পাগল হয়ে যাবে, ওর যে ভরত-রাজার দশা হয়েছে—মমতায় যে অন্ধ হয়ে পড়েছে।

সে কথা পিসীমার কানে উঠিতে বিলম্ব হয় নাই, তারপর সে তুমুল কাণ্ড। পিসীমা কাশী যাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন; এ বাড়ীর অন্ন-জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। শিবনাথের মা, সম্বন্ধে বড় হইয়াও একরূপ পায়ে ধরিয়া তবে নিরস্ত করেন।

পিসীমা বলিয়াছিলেন—কিসের মায়া, কার মায়া! যার এক বিছানায় স্বামী-পুত্র মরে, রাজার মত ভাই মরে যায়, সে আবার মায়া করবে কার? তবে আছি শুধু তোমার জন্যে, তুমি আমার দাদার স্ত্রী, শিবুর মা, তোমার লাঞ্ছনা হবে, পাঁচজনে বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বিদেয় করে দেবে সেই জন্যে পড়ে আছি।

শিবনাথের মা সে কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

আজ শৈলজা ঠাকুরাণী বলিলেন—এমন করত আমি কাশী চলে যাব, শিবু। কোন্ দিন তুমি খুন হয়ে বসে থাকবে, সে আমি দেখতে পারব না।

শিবু বলিয়া উঠিল—ইউ আর এ কাউয়ার্ড।

বিরক্তি ভরে পিসীমা বলিলেন—যা বলবি বাংলা করে বল্ বাপু—আমার বাবা কখনও ইংরিজী জানত না।

শিবু বলিল, তুমি—একটি—কাপুরুষ! বন্দুকটা দাও না—হেঁড়োলটাকেই মেরে আনব।

পিসীমা বলিলেন—মা তোর আজ দুঃখ করছিল—কেঁদে ফেল্লে বেচারী।

শিবু চকিত হইয়া বলিল—কেন?

পিসীমা বলিলেন—বলছিল, আমি যা চাই, তা শিবু হল না—

শিবু বলিল—কেন—প্রথম বৎসর মা আমার হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিল, তিরিশে আশ্বিন—আমি সেই হতে ত বিলিতী জিনিষ খাই না, পরি না। পড়াও ত করি, এবারও থার্ড হয়েছি। আচ্ছা আর জীব-হিংসে করব না।

পিসীমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—আর একটি কথা বলি শোন্—চারিদিক থেকে তোর বিয়ের সম্বন্ধ আসছে—

শিবনাথের মনে রং ধরিয়া গেল—সে বলিল—বিয়ে হবে নাকি আমার?

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন—এই মাঘ মাসেই বিয়ে হবে। তা কোথা বিয়ে করবি বল দেখি? হৃদয়বাবু, পুলিসসাহেব ধরেছে তার নাতনীর জন্যে—নবীনবাবু উকীল ত ধরেই আছে। আজ আবার রামকিঙ্করবাবু এসেছিল ওর ভাগী নাতিনর জন্যে—

শিবনাথ বলিয়া উঠিল—ধু—র—ওর পোটা পড়ে নাকে।

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন—ছোট বেলায় সে সবারই নাকে পড়ে রে। তোরও ত পড়ত। অন্য মেয়েরও পড়ে। বড় হলে কি পড়বে!

শিবনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ভারী বকে ওটা পিসীমা।

সে দিন আমাকে গাল দিয়েছিল—মুখপোড়া বলে।

হাসিয়া পিসীমা বলিলেন—ছেলেমানুষ রে! ওর কি জ্ঞান আছে? সে দিন যে আমাদের বাড়ীতেই তোর পিঠে চেপে বলছিল—ঠাকুরদাদা গালে কাদা—বাগবাজারে দই—ঠাকুরদাদার সঙ্গে দুটো মনের কথা কই। সে কেমন মিষ্টি করে বলেছিল বল দেখি?

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল।

পিসীমা বলিলেন—গণকদের কাছে শুনেছি আমি মেয়ের ভাগ্য নাকি খুব ভাল—অবৈধব্য যোগ আছে। আর ধনস্থান, পুত্রস্থান খুব ভাল, সহজে এমন মেলে না। মেয়ে দেখতেও ভাল—রং ফর্সা—নাকটিই একটু খাঁদা।

শিবনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—যা মন হয় তোমাদের তাই কর বাপু,—বিয়ে একটা হলেই হল। আমি কিন্তু তিনটে প্রীতি-উপহার লিখব, ছাপাতে হবে সে গুলো।

(তিন)

পরদিন প্রাতঃকালে রামকিঙ্করবাবু শিবনাথের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতেই শুনিতে পাইলেন—শৈলজা-ঠাকুরাণী বলিতেছেন গাছ একটা সামান্য জিনিসই বটে বৌ—কিন্তু এ মান অপমানের কথা, ইজ্জতের কথা, এখানে তুমি কথা কয়ো না।

কণ্ঠস্বরে সুকঠোর দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতেছিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া আবার তিনি বলিলেন এ আমার বাপের বংশের অপমান। দাদা আমাকে বলতেন, শৈল, না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত,—না দিব চরণে হাত এ আমাদের পিতৃ-পুরুষের শিক্ষা। মাথা নীচু করে জবরদস্তি ত কারও সইতে পারব না। রামকিঙ্করবাবু ডাকিলেন ঠাকুরুণ দিদি রয়েছেন না কি?

ভিতর হইতে আহ্বান আসিল—এস ভাই, এস।

নায়েব সিংহ মহাশয় বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছিলেন। রামবাবু ভিতরে গিয়া দেখিলেন চাপরাশী কেষ্ট সিং এবং আরও কয়েকজন পাইক কোন কাজের জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পিসীমা একখানা গালিচার আসনের উপর বসিয়াছিলেন; আর একখানা বিস্তৃত আসন দেখাইয়া দিয়া তিনি রামবাবুকে বলিলেন—এস ভাই।

তারপর বলিলেন—কেষ্ট সিং, গাছ আটক করতে পারবে তোমরা?

কেষ্ট সিং বলিল—না জখম হলে ত ফিরব না মা!

রামবাবু বলিলেন—কি হল ঠাকুরুণ দিদি?

পিসীমা বলিলেন ও পাড়ার শশী রায় কালকের সে অপমান ভুলতে পারে নাই, ভাই। আজ ওদের পুকুরে আমাদের বহুকালের দখলী একটা গাছ আছে, সেটা কাটতে লাগিয়েছে।

রামবাবু বলিলেন—মকদ্দমা হলে যে আপনারা ঠকবেন, যার জায়গা—গাছ তারই হয়।

পিসীমা বলিলেন—গাছ যখন আমার দখলে আছে, তখন তার তলার মাটীও তাহলে আমার। সবই ত দখলের প্রমাণের ওপর ভাই। কিন্তু সে ত পরের কথা। আজ

যে শিবনাথের মাথা হেঁট হবে, তার কি? বিষয় বাপের নয়—বিষয় দাপের।

রামবাবু বলিলেন—চাপরাশী দরকার হয় ত আমার চাপরাশী—

বাধা দিয়া পিসীমা বলিলেন—থাক ভাই, এখন নয়। শিবুর বিয়ে যদি ভগবান তোমার ঘরেই লিখে থাকেন, তখন যত পার করবে।

তারপর আবার হাসিয়া বলিলেন—তখন দরকার হলে বেয়াইকেও বলব, তোমাকেও লাঠি ধরতে হবে বেয়াই।

নায়েব বলিল—তা হলে ওরা চলে যাক।

একটু চিন্তা করিয়া পিসীমা বলিলেন—না, জখম হয়ে ফিরে এলে ত আমার মান রক্ষা হবে না। তার চেয়ে কাটুক ওরা গাছ। তুমি আমার এখানকার মহলের সমস্ত পাইক আর লাঠিয়ালকে ডাক দাও। পঞ্চাশখানা গাড়ী যোগাড় করে রাখ। কাটা গাছ ঘরে তুলে আন, একটি পাতা যেন ওরা না নিয়ে যেতে পারে।

কেষ্ট সিং ও পাইকরা চলিয়া গেল।

পিসীমা নায়েবকে বলিলেন—একবার মুখুজ্জে ভাগ্নেদের ওখানে যাও দেখি, থাজনা ওরা আপোষে দেবে কিনা জিজ্ঞাসা করে এস। আর গণকের যদি পূজো শেষ না হয়ে থাকে তবে ধীরে সুস্থেই করতে বলো, তাড়াতাড়ি নাই।

নায়েব চলিয়া গেল।

রামবাবু হাসিয়া বলিলেন—নাস্তি কাল কি বলেছে জানেন? বড্ড পান খায় নাস্তি, তাই মা বল্লেন—জানিস, শিবনাথের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, তার পিসীমাকে ত জানিস, দেশের লোকে ভয় করে—সে তোকে পান খাওয়াবে এমনি করে! নাস্তি বেটী ভারী দুষ্টু ত, সে বল্লে, না, দেবে না! না দিলেই হল আর কি, পেটে কিল মেরে পান আদায় করব!

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন—মিলবে ভাল তা হলে, যেমন শিবু, তেমনি নাস্তি।

ঘরের মধ্য হইতে শিবনাথের মা মৃদুস্বরে বলিলেন—আমার কিন্তু একটি সর্ত্ত আছে ঠাকুরঝি। বিয়ের পর বৌ কিন্তু আমার এখানে থাকবে। কারণ যা শুনছি তাতে মেয়ের শিক্ষার প্রয়োজন।

বাহির হইয়া আসিয়া তিনি জলখাবার লইয়া রামকিঙ্কর বাবুর সম্মুখে নামাইয়া দিলেন।

রামকিঙ্করবাবু বলিলেন—নাস্তির মা নেই। আপনাদের শুধু শাশুড়ী হিসেবে পাবে না, মাও হবেন আপনারা। আপনাদের কাছেই থাকবে সে।

জলখাওয়া শেষ করিয়া রামবাবু বলিলেন—তা হলে গণককে একবার—

পিসীমা বলিলেন—তুমি কোষ্ঠীটা রেখে যাও ভাই, আমি দেখিয়ে রাখব।

রামবাবু হাসিয়া কোষ্ঠীটি রাখিয়া দিয়া বলিলেন—আগে থেকেই যদি গণককে টাকা খাইয়ে হাত করে থাকি, ঠাকরুণ দিদি!

পিসীমা বলিলেন—তবে সে ভবিতব্য, আর এই দুই বিধবার মন্দ অদৃষ্টের ফল। তাছাড়া আর কি বলব!

রামবাবু চলিয়া গেলেন।

পিসীমা নিত্যকালী-ঝিকে ডাকিয়া বাসনের হিসাব লইতে বসিলেন।

নিত্য বলিল—খাগড়াই বাটীটা শুধু পাওয়া যায় নি, সেটা সকাল বেলাই দাদাবাবু নিয়ে গিয়েছেন সেই হেঁড়োলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে।

পিসীমা বলিলেন—বৌ শিবু ত জল খেতে এল না। নিত্য, দেখে আয় ত শিবুকে। মতির মা কোথায় গেল, আমার তেল গামছা নিয়ে আয়। নিত্য বাটিটা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, পড়া সেরে দাদাবাবু সেই হেঁড়োলের বাচ্চা ফিরিয়ে দিতে গিয়েছেন।

পিসীমা চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন—একা?

—না শম্ভুও সঙ্গে গিয়েছে। নায়েববাবু বারণ করেছিলেন তা শোনেন নি, বলেছেন মায়ের হুকুম, এটাকে নিজে ছেড়ে দিয়ে এসে তবে জল খাব। নায়েব পাইক দিতে চেয়েছিল। তাকে ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

পিসীমা বলিলেন ভ্রাতৃজায়াকে, কি যে তোমার শিক্ষার ধারা বৌ, তুমিই বোঝ ভাই।

শিবনাথের মা হাসিয়া বলিলেন—দিনের বেলা, শম্ভু সঙ্গে আছে, ভয় কি?

পিসীমা বলিলেন—বাঘ ভালুকের ভয়ের কথা বলছি না ভাই, শাক্ত জমিদারের ঘরের ছেলেকে তুমি মালা জপাতে চাও নাকি? থাকতই বা হেঁড়োলের বাচ্চাটা! দাদার আমার জানোয়ার ছিল কত!

অপরাহ্ণে বাড়ীর সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া গণক বসিয়া কোষ্ঠী বিচার করিল। হৃদয়বাবু পুলিস সাহেবের নাতনীর কোষ্ঠীও ভাল—কিন্তু অবশেষে জয় হইল ওই নান্তির। নান্তির অবৈধব্য যোগ আছে—আঠারো হইতে বিশ বৎসরের মধ্যে শিবনাথের মৃত্যু-তুল্য ফাঁড়া। নান্তির সহিতই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

* * *

বাঁড়ুজ্জেরা ক্ষুদ্র জমিদার—সাত আনায় শিবনাথের আয় হাজার চারেক টাকা। তবে পাকা বন্দোবস্ত অনেক আছে, পাল্কী বহনের বেহারা চাকরান জমি ভোগ করে, মহলে পাইকদের জমি দেওয়া আছে, সদরে কাজ করিবার জন্যও চারজন পাইকের কায়েমী বন্দোবস্ত; বৃত্তিভোগী নাপিত, পুরোহিত দেবোত্তরের পূজক—এমন কি গয়া, শ্রীক্ষেত্র, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থলের পাণ্ডারা পর্যান্ত জমি ভোগ করেন। গৃহদেবতার ফুল জোগাইবার ভারও একজনকে দেওয়া আছে, চাকরানভোগী বাদ্যকরকে নিত্য সকাল সন্ধ্যায় 'টেকরা' বাজাইতে হয়, সে জন্য মালিককে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।

যাক্—জমিদার ক্ষুদ্র হইলেও শিবনাথের বিবাহটা হইল বিপুল সমারোহে। শিবনাথের বাপের বিবাহের ফর্দ্দ বাহির করিয়া পিসীমা ফর্দ্দ করিতে বসিলেন।

নায়েব বলিয়াছিল অভয় দেন ত একটা কথা বলি মা।

পিসীমা বলিলেন—খরচের কথা বলবেন আপনি?

—হাঁা মা, সে আমল আর এ আমল- তার ওপর এই যুদ্ধের বাজার—জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য—আদায়পত্রের এই অবস্থা—হয় ত ঋণ করতে—।

নায়েব কোন সায় না পাইয়া কথা অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়াই নীরব হইয়া গেল। শিবনাথের মাও পাশে বসিয়াছিলেন—তিনি বলিলেন—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন সিং মশায়, বারুদের কারখানা—কি খেমটা নাচ- এই রকমে কতকগুলো খরচ, সে অপব্যয়।

স্থানীয় মহলের বহু পুরাতন গোমস্তা প্রতাপ মুখুজ্জে বসিয়াছিলেন—তিনি বলিলেন—সে কথা ঠিক বৌমা, ও-গুলো অপব্যয় বৈ কি!

পিসীমা বলিলেন—মতির মা, আমার তেল গামছা বের কর ত—বেলা অনেক হয়ে গেল।

নায়েব বলিলেন—তা হলে, ফর্দ্দটর্দ্দ কি রকম কি হবে?

পিসীমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—তোমরা ঠিক কর সব। কই রে মতির মা, কোথায় গেলি?···অ-মতির মা! হারামজাদী গেল কোথায়?

কে—কারা ওখানে দাঁড়িয়ে?

কেষ্ট সিং আসিয়া বলিল—আজ্ঞে, ২১৯ নম্বরের মুচী আর বাগ্দী প্রজারা।

—কি, বলে কি সব?

প্রাণকৃষ্ণ বায়েন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া যোড়হাতে বলিল—আজ্ঞে মা, আমরা বাবুর বিয়ের বাজনার বায়না নিতে এসেছি। বাগ্দীরা এসেছে রায়বেঁশের জন্যে।

পিসীমা তাহাদের কোনো কথা কহিলেন না—ডাকিলেন নিত্যকে—নিত্য দেখ ত, মতির মা গেল কোথায়?

প্রাণকৃষ্ণ বলিল আমাদের রসুনচৌকী আর ঢোলের বাজনা আর কেউ নেয় না—কিন্তু আমাদের বাবুর বিয়েতে আমরা যেন বাদ না পড়ি।

কৃষ্ণবর্ণ বিশালকায় প্রৌঢ় রামভল্লা যোড়হাতে পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে শুধু বলিল—আমরাও মা—আমরা রায়বেঁশে!

মতির মা এতক্ষণে তেলগামছা আনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

পিসীমা বলিলেন—তোকে জবাব দিলাম আমি, মতির মা। তোর কাজে বড় অবহেলা হয়েছে।

তাহার হাত হইতে গামছাটা টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া ক্রুদ্ধই তিনি স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর আর ফর্দ্দ হওয়া সম্ভব নয়; নায়েব, গোমস্তা উঠিয়া গেলেন, শিবনাথের মা শুধু একটু হাসিলেন। প্রজারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের তিনি বলিলেন—তোমাদের বায়না হবে বৈকি বাবা, তোমাদের বাবুর বিয়েতে কি তোমাদের বাদ দেওয়া যায়!

তাহারা কৃতার্থ হইয়া প্রণাম করিল, অপ্রতিভের মত হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন—রতন, এদের সব জলখাবার দাও ত।

কেষ্ট সিং বলিল—আয় সব, উঠোনে সারি দিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়া।

* * *

অবশেষে শৈলজাঠাকুরাণীর সম্পন্নতই আয়োজন, অনুষ্ঠান, সমারোহ করিয়াই বিবাহ হইল। রায়বেঁশে, ঢুলীর, বাজনা ব্যাণ্ড ব্যাগপাইপ, নাচ, তরজা, আলো, চতুর্দ্দোল, শোভাযাত্রা কিছুই বাদ পড়িল না। ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইতর জাতি সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল। কিছু আয়োজন অনুষ্ঠানে ঋণ করা ভিন্ন উপায় ছিল না। সমস্ত এষ্টেটের আয়ের অৰ্দ্ধেক টাকাতেও এ কুলাইবার কথা নয়। কিন্তু কৌশলপরায়ণা এই জমিদার-কন্যা এমন করিয়া ব্যবস্থা করিলেন যে নায়েব গোমস্তা পর্য্যন্ত বিস্মিত না হইয়া পারিল না। উদ্যোগের প্রারম্ভেই এষ্টেটের উকীলদিগকে লোক পাঠাইয়া আনিয়া যে সব মকদ্দমা চলিতে-ছিল তাহারই উপর অগ্রিম কিছু কিছু টাকা লইয়া বারশত টাকার সংস্থান করিলেন।

নায়েবকে বলিলেন—এটাকার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ কি? এ ত বকেয়া পাওনা টাকা, এ হল তাহলে এষ্টেটের মজুত তহবিল। মামলা খরচের টাকা, আমি নিলাম না—সে তোমার মজুতই রইল উকীলের কাছে।

হাজার টাকা ঋণ করিতে হইল।

পাকস্পর্শের দিন শিবনাথকে ও নববধূকে তিনি কাছারী ঘরের বারান্দায় বসাইয়া দিয়া মহলের সমস্ত প্রজাকে বৌ দেখাইলেন। পাশে নিজে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ওপাশে নায়েব ও যাবতীয় গোমস্তা হাজির ছিল। বধূর পিছনে নিত্য-ঝি দাঁড়াইয়াছিল। প্রকাণ্ড একখানা কাঁসার পরাত বর-বধূর পায়ের নিকট একটা তে-পায়ার উপর রক্ষিত ছিল, দেখিতে দেখিতে টাকায় সেটা ভরিয়া গেল। রাত্রি নয়টার সময় শেষ প্রজাটি চলিয়া গেল। তখন নয় বৎসরের নব বধূটি চেয়ারের হাতলের উপর ঘুমাইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে!

পিসীমা বলিলেন - পরাত তোল, কেষ্ট সিং।

বাড়ীর মধ্যে শিবনাথের মা টাকা গণিয়া থাক থাক করিয়া সাজাইয়া তুলিলেন। গণনা করিয়া দেখা গেল, সাত শত উনপঞ্চাশ টাকা উঠিয়াছে।

আত্মীয়-কুটুম্বেরা কলরব করিতেছিল—একজন প্রৌঢ়া বলিলেন—ওগো পিসীমা, তোমারা একবার হিসেব-নিকেশ শেষ কর বাপু। ফুলশয্যে আর কখন হবে? বৌ ত তোমার ঘুমিয়ে কাদার মত পড়ে আছে।

পিসীমা বলিলেন—একটু দাঁড়াও মা। সিং মশায় আয়রন-চেষ্ট খুলুন।

লক্ষীর ঘরের মধ্যে সে আমলের সিন্দুকের ধরণের ভারী আয়রন চেষ্ট-নায়েব ও অপর একজন গোমস্তা দুই জনে মিলিয়া ডালাটা টানিয়া তুলিল। পিসীমা বলিলেন—এই সিন্দুক দাদা আমার একা একটানে টেনে তুলতেন।

সিন্দুকে, ঘরে তালা চাবী বন্ধ করিয়া পিসীমা সোরগোল বাধাইয়া তুলিলেন বাজনা বন্ধ কেন? কেষ্ট সিং, রসুন-চৌকী বাজাতে বল। কই গো, বৌমারা সব কোথায় গেলে?

দেখিতে দেখিতে রোসুনচৌকীর বাজনা বাজিয়া উঠিল।

পিসীমা বলিলেন—নায়েববাবু, সন্দেশের ঘরের ভাঁড়ারীকে বলুন, লুচি মিষ্টি ফুলশয্যার ঘরে পাঠিয়ে দিক, মেয়েরা খাবে সব। পাঁচথুপীর বৌমা, তোমার ওপর ভার রইল, যাঁরা না খাবেন তাঁদের ছাঁদা দিয়ো তুমি।

উপর হইতে পাঁচথুপীর বৌ ডাকিল, একবার তুমি এস পিসীমা, দেখে যাও।

পিসীমা উত্তর দিলেন না, মুক্ত অঙ্গনে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। রতন আসিয়া বলিল—একবার চলুন পিসীমা। মজা দেখবেন চলুন, বৌ কিছুতেই উঠছিল না, শিবনাথ কষে কান মলে দিয়েছে।

সে হাসিয়া উৎসব ক্লান্ত বাড়ীখানাকে মুখরিত করিয়া তুলিল। পিসীমা বলিলেন—বৌ কোথায়?

রতন বলিল শুয়েছেন তিনি, কিছুতেই উঠলেন না। বোধ হয়—সে চুপ করিয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন—সে কাঁদছে? আজ দাদাকে মনে পড়ছে যে! আরও কি বলিতে গিয়া তিনি বলিতে পারিলেন না, পরমুহূর্ত্তেই দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গিয়া শয়ন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

শিবনাথ তখন ঘরের মধ্যে ভ্রাতৃবধূদের অনুরোধ মাত্রেই সোৎসাহে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আবার কিছুক্ষণ পর পিসীমার দরজা খোলার শব্দ হইল, পিসীমা ক্লান্ত রুদ্ধ স্বরে ডাকিলেন—

* * *

কে আছে নীচে?

কে উত্তর দিল—আজ্ঞে আমি মা, শ্রীপতি, বেলেড়া মৌজার গোমস্তা।

হুকুম হইল—কেষ্ট সিংকে বলে দাও ফুলশয্যার ঘরের দোরে পাহারা থাকতে। (ক্রমশঃ)

স্থানীয় চিত্রশালা গঠনের অন্তরায়

—শ্রীরমেশ বসু

বিগত আশ্বিন মাসে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বঙ্গদেশের বিশিষ্ট জনপদগুলিতে প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্প-সম্পদের যে সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায় ও পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে সেগুলি নানা ভাবে স্থানান্তরিত হওয়ায় স্থানীয় ইতিহাস আলোচনার পক্ষে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই সব উপকরণের মধ্যে যে গুলি এদেশীয় চিত্রশালায় বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্থান পায়, সে গুলিরও প্রাপ্তিস্থান অনেক সময় না জানায় ইতিহাসের বিপর্যায় ঘটে। এই বিপর্য্যয় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বিক্রমপুর জনপদে একটি স্থানীয় চিত্রশালা গঠনে উদ্যোগীদের পথে যে সব অন্তরায় উপস্থিত হইতেছে তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

এইবার আমরা বঙ্গের আরেকটি সুবিখ্যাত ও প্রাচীন জনপদে অনুরূপ প্রচেষ্টা ও তাহার নানারূপ বাধাবিঘ্নের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট সুন্দরবনের অন্তর্গত প্রাচীন খাড়ীমণ্ডলের নাম সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে এই অঞ্চল হইতে বহু তাম্রশাসন, মূর্ত্তি, মুদ্রা প্রভৃতি যথেচ্ছভাবে সংগৃহীত হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে; বর্ত্তমানে তাহাদের কতকগুলির সন্ধান মিলে, কিন্তু অধিকাংশেরই মিলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ২২নং লাট বকুলতলা হইতে প্রাপ্ত লক্ষ্মণ-সেনদেবের তাম্রশাসন যাহা পরে প্রাপ্তিস্থানের নামে পরিচিত না হইয়া মজিলপুরে প্রাপ্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহার কোনও সন্ধান মিলিতেছে না এবং সুপ্রসিদ্ধ জটার দেউলের নিকটবর্ত্তী একটি স্থান খনন করিতে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ৺দুর্গা-প্রসাদ চৌধুরীকর্ত্তৃক প্রাপ্ত জয়ন্তচন্দ্র রাজার তাম্রশাসনখানা সরকারী বিবরণীতে উল্লিখিত হইলেও বর্ত্তমানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। প্রথমখানার আংশিক বিবরণ শুধু পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়খানার পাঠ ও তারিখ লইয়া অনাবশ্যক অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি আরও একখানি তাম্রশাসন সুন্দরবনের ঐ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সেই তাম্রশাসনখানি আলোচিত হইলেও তাহা কোথায় রক্ষিত হইয়াছে তাহা উক্ত হয় নাই। অনেক-গুলি মূর্ত্তি যে অপসারিত হইয়াছে তাহা নানারূপে জানা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় নানা প্রবন্ধে সুন্দরবনের মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ২৭নং লাটের শ্রীকলতলী নামক স্থানে ৬ ফুট উচ্চ যে বিষ্ণু মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছিল তাহা উক্ত লাটের জমিদার মহাশয়ের কলিকাতা-ভবানীপুরস্থ বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। খাড়ীর উত্তরে বাইশহাটায় প্রস্তর নির্ম্মিত চৌকাঠের অংশ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছিল। সরিষাদহ হইতে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একটি নৃসিংহ মূর্ত্তি কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। ১০ ফুট লম্বা একটি প্রস্তরস্তম্ভ সরিষাদহেই একটি বটতলায় পড়িয়া আছে।

নলগোড়া মঠবাড়ীর স্তূপ

কাজীডাঙ্গায় একটি সুন্দর বিষ্ণুধ্বজের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন জটা, নলগোড়া, কঙ্কণ-দীঘি, রামদীঘি,
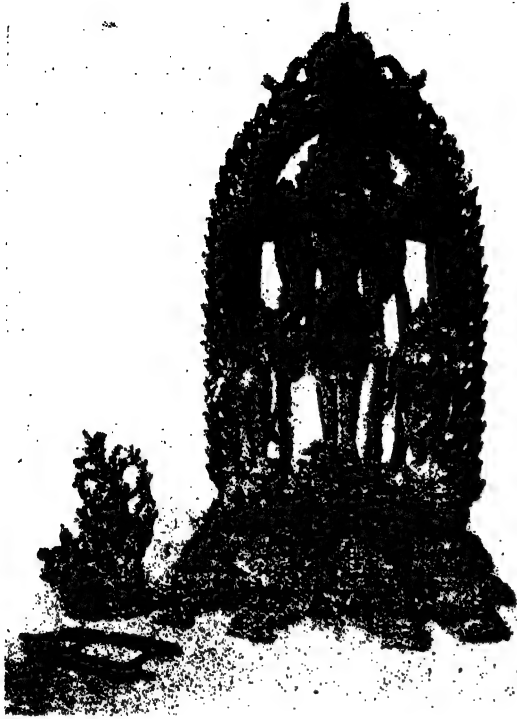
নলগোড়ায় প্রাপ্ত ধাতু নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি

বাড়ীভাঙ্গা, রাধাকান্তপুর, বকুলতলা, খাড়ী, মাদপুর, কাশীনগর, লালুয়া, ছত্রভোগ, জলঘাটা, কৃষ্ণচন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামে নানা উপকরণ প্রাপ্ত ও স্থানান্তরিত হওয়ার কথা জানা যায়। এত প্রচুর উপকরণ যদি একস্থানে সংগৃহীত হইতে পারিত তবে খাড়ীমণ্ডলের প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্পসম্পদ ভাল ভাবেই আলোচিত হইতে পারিত।

এই অঞ্চলের জটার দেউল ও খাড়ীগ্রামের নিকট নলগোড়া নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। এই গ্রামে তিনটি ধ্বংসস্তূপের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তূপগুলি স্থানীয় ভাষায় মঠবাড়ী নামে পরিচিত। আমরা এই সঙ্গে নলগোড়া মঠবাড়ীর প্রধান স্তূপটির একটি ফোটো দিলাম। এই গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী মনির টাটের ভিতর ২ ক্রোশ ব্যাপী একটি সুবৃহৎ 'গড়' বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গ্রাম হইতে ২টি বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে এই মূর্ত্তি দুইটি কোথায় ও কাহার নিকট আছে তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে স্থানটি প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধযুগেও ইহা এই অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

১৩৪০ সালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়িয়ল গ্রামের পল্লীমণ্ডল এইস্থানে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন; ইহা "নলগোড়া শিক্ষাসত্র" নামে পরিচিত। এই শিক্ষাসত্র প্রথমতঃ গ্রন্থাগার ও সেবা সমিতির কাজে হাত দেন। আড়িয়ল নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী সত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হিসাবে সত্রটি চালাইতে থাকেন। কিছুদিন পরে আড়িয়ল পল্লীমণ্ডল হইতে শ্রীযুক্ত জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এস্, সি সত্রটি পরিদর্শন করিতে আসেন। তখন সত্রের কার্য্যসম্পর্কে স্থানীয় সভাদের লইয়া একটি সভা আহূত হয়। এই সভায় স্থানীয় জমিদারের নায়েব মহাশয়, ফরেষ্ট অফিসের কর্ম্মচারী-

নলগোড়ায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি · নলগোড়ায় প্রাপ্ত মাতৃমূর্ত্তি · নলগোড়ায় প্রাপ্ত উমা-মহেশ্বর
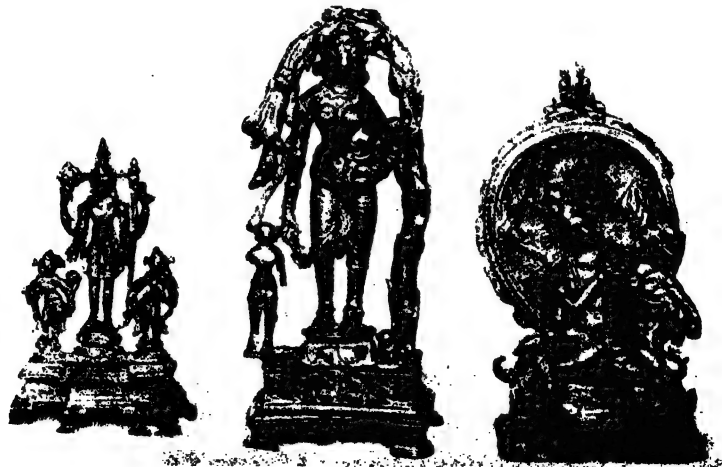
বৃন্দ ও তালুকদারগণ যোগদান করেন। এই সভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হালদার বলেন যে, আড়িয়লের অনুরূপ প্রত্ননিদর্শন সমূহ এখানেও আবিষ্কৃত হইতেছে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইগুলি রক্ষিত হইবার কোনও ব্যবস্থা নাই। তিনি সত্রকে ইহার ভার লইতে অনুরোধ করেন। উপস্থিত সভ্যগণের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য তিনি সভাস্থলে ৩টি প্রাচীন লেখযুক্ত মৃণ্ময় সীল প্রদর্শন করেন ও এগুলি সত্রের প্রস্তাবিত সংগ্রহাগারে দান করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সীতানাথ প্রামাণিক ও সতীশ হালদার মহাশয়গণও অনুরূপ ৪টি সীল প্রদান করেন। বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে, ঠাকুরুণ নদীর পাড়ে একসঙ্গে প্রায় ৪২টি সীল আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং নানা ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐগুলি নানা স্থানে নীত হইয়াছে। স্থানীয় জমিদারের নায়েব শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐগুলি সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হইবেন বলিয়া স্বীকৃত হন। অতঃপর করেষ্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের প্রস্তাবে একটি সংগ্রহাগার স্থাপিত হইয়াছে। পরদিন উৎসাহী সভ্যগণকে লইয়া নলগোড়ার মঠবাড়ী অঞ্চলে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়। ইহাতে দুইটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগ্রহাগারের জন্য গৃহীত হয়। জনৈক সভ্য এই অনুসন্ধানের সময় জানান যে, পূর্ব্বে তাঁহার জ্ঞাতসারে ১০টি মূর্ত্তি (ইহার মধ্যে ৬টি ধাতুনির্ম্মিত) পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলির ফোটোও করান হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিল্পরসিক চোর ঘরে সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করিয়া কোনও ধনরত্নের দিকে দৃষ্টি না দিয়া শুধু এই মূর্ত্তিগুলিই অপহরণ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে পূর্ব্বে গৃহীত ফোটোগুলি ছাড়া ঐ সব মূর্ত্তির আর কোনও চিহ্ন নলগোড়ায় নাই। এই ফোটোগুলি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হালদারের অনুগ্রহে সংগ্রহাগারের জন্য পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই ফোটোগুলি এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। ইহার মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরের হংসটি কলারসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ধাতুনির্ম্মিত একটি মাতৃমূর্ত্তি (ষষ্ঠী ?) বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। অন্যগুলি প্রচলিত বিষ্ণুমূর্ত্তি ও একটি উমা-মহেশ্বরের আলিঙ্গন-মূর্ত্তি। মোটামুটি এই মূর্ত্তিগুলি পাল ও সেন রাজত্বের সময়কার শিল্প-নিদর্শন বলিয়া অনুমিত হয়।

নলগোড়াতেই এই সংগ্রহাগারের কার্য্য সীমাবদ্ধ নহে। সম্প্রতি কঙ্কণদীঘি হইতে কতকগুলি **punch marked** মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। মৃণ্ময় সীলের লেখসমূহের পাঠোদ্ধার করা হইতেছে। শীঘ্রই এগুলি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বিক্রমপুর আড়িয়ল চিত্রশালা হইতে প্রকাশিত হইবে।
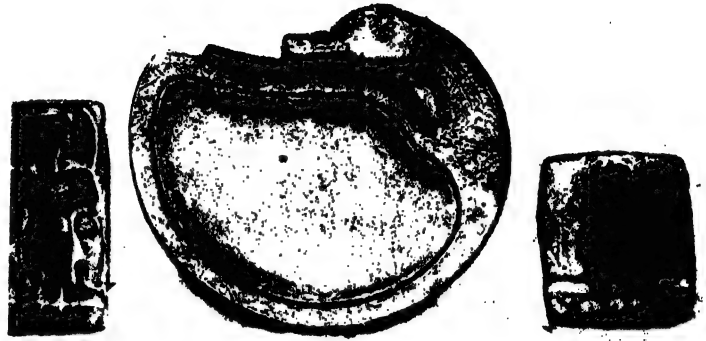
নলগোড়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি প্রস্তর-মূর্ত্তি (মাঝেরটি শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত)

আমরা উপরে যেটুকু উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতেই প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রাচীন স্থানের প্রত্নবস্তুসমূহ কিরূপ নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠিত হইতেছে। ইহা নিবারিত না হইলে স্থানীয় ইতিহাস ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং স্থানীয় লোকেরা তাহাদের নিজেদের অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যাইবে। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা ভাবিতেন যে, সুন্দরবন অঞ্চল বিশেষ প্রাচীন নহে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে যে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সে ধারণা কত ভ্রমাত্মক। ক্রমে যত গবেষণা ও উদ্ধার-কার্য্য চলিতে থাকিবে ততই আমরা এ স্থানের ইতিহাস ভাল করিয়া জানিতে পারিব। এই উদ্ধার-কার্য্যে স্থানীয় সংগ্রহাগারগুলির প্রচেষ্টা বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।

চতুষ্পাঠী

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জীবনী-সংগ্রহ

(১) লাওৎসে

লাওৎসে এবং কন্‌ফুসিয়াস্ হলেন চীনা জাতির ধর্ম্মগুরু।

এক দরিদ্রের পর্ণকুটীরে লাওৎসে জন্মগ্রহণ করেন। আজীবন অধ্যয়নের ফলে তিনি অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। কিন্তু সে সংবাদ কেউ জানত না।

একদা সম্রাট তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে, তাঁর বিরাট গ্রন্থশালার অধ্যক্ষরূপে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। রাজপ্রাসাদের মধ্যে গ্রন্থের অরণ্যেই তাঁর দিন অতিবাহিত হত। কি যে তাঁর মন চাইত, কেউ তা জানত না।

বৃদ্ধ বয়সে সমস্ত পুঁথির পাতা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তাঁর মনে ধারণা হল, সকল বিদ্যার সর্ব্বশেষ পরিণতি হল, শান্তি। এই জীর্ণ পুঁথির শুকনো পাতার অরণ্যে কোথায় শান্তি?

নিশীথ রাত্রি। রাজপুরীতে সবাই ঘুমে অচেতন। ঘুম নেই শুধু লাওৎসের চোখে। একদিকে মন তাঁর বলে, কেন এই গ্রন্থশালায় বই-এর আড়ালে লুকিয়ে আছ? বাইরের জগতে মানুষের ঘরে ঘরে রয়েছে অজ্ঞতার অন্ধকার। তোমার জ্ঞান দিয়ে, সেই অজ্ঞতাকে দূর কর।

আর একদিকে বলে, যদি তোমার মনের মধ্যে সত্যি-কারের জ্ঞানের উদয় হয়ে থাকে, তা হলে পরম নিশ্চিন্ত থাক, সে বীজ একদিন বৃক্ষে পরিণত হবেই! তুমি কি সত্যিই সেই মহাজ্ঞান পেয়েছ?

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। রাজপুরীর প্রহরীর ক্লান্ত হাতে আর বর্শা-ফলক আটকে থাকে না। এমন সময় প্রহরী দেখে, সেই আধ-অন্ধকারে জ্ঞান বৃদ্ধ লাওৎসে একবস্ত্রে বাইরে চলে আসছেন।

দরজার সম্মুখে উপস্থিত হলে, ভক্ত প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, রাত্রি এখনও শেষ হয় নি। ঋষি লাওৎসে একবস্ত্রে কোথায় চলেছেন?

লাওৎসে জানালেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি চিরকালের মত সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে চান। গ্রন্থশালায় জ্ঞান নেই— তিনি তাই এই শুভক্ষণে বেরিয়েছেন সেই জ্ঞান-মহামণির সন্ধানে!

প্রহরী লাওৎসের দিব্যজ্ঞানের কথা শুনেছিল। বহু দিন তার মনে সাধ ছিল, সে এই মহাপুরুষের কাছ থেকে দিব্যজ্ঞানের কথা শুনবে। আজ হঠাৎ এই দিবস-নিশার সন্ধিক্ষণে যে সেই শুভ-লগ্ন আসবে, তা সে কল্পনাও করতে পারে নি।

তাই সে বলে উঠল, ঋষি লাওৎসের কাছে ভক্তের এক নিবেদন আছে। এতদিন ধরে আপনি যে জ্ঞান অর্জ্জন করলেন, তার নিদর্শন আপনাকে রেখে যেতে হবে। আমাকে একখানি পুঁথি লিখে দিয়ে যান।

সে-রাত্রে লাওৎসের আর সংসার ত্যাগ করা হল না। আবার তিনি গ্রন্থাগারে ফিরে এলেন।

এতদিন ধরে তাঁর মনে যে সব কথা জমা হয়ে ছিল, সংক্ষেপে সেইগুলি দিয়ে একটি ছোট পুঁথি লিখলেন। পুঁথি সমাপ্ত হলে, সেখানি সেই প্রহরীকে দান করলেন। তারপর একদিন নিদ্রিত রাজপুরী ত্যাগ করে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কোথায় যে গেলেন, ইতিহাসে আর তাঁর কোন খবর পাওয়া যায় না।

প্রহরীর হাতে দেওয়া সেই ছোট্ট পুঁথি থেকে এক অভিনব ধর্ম্ম চীনে প্রচারিত হল।

একটা নগর গড়ার ইতিহাস

মাত্র কিছু দিন আগে স্যর ক্রিষ্টফার রেনের (Christopher Wren) ত্রিশততম বার্ষিক জন্মতিথি-স্মৃতি মহাসমারোহে ইংলণ্ডে সম্পন্ন হয়ে গেল। এই স্যর ক্রিষ্টফার রেন কে? এক কথায় তাঁর পরিচয় দিতে হলে বলতে হয় তিনি হলেন, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী লণ্ডন সহরের নব-জন্মদাতা— ইংলণ্ডের সব চেয়ে বড় সৌধশিল্পী। তাঁর অপূর্ব্ব কল্পনাশক্তি, এঞ্জিনীয়ারীং ক্ষমতা এবং সৌন্দর্য্যবোধের ফলে আজ ইংলণ্ড তার সৌধ-শিল্পের গর্ব্ব করতে পারে।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। সেখানে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। সেখানে স্যর ক্রিষ্টফার রেনের কবরের গায়ে একটি ছোট্ট কথা লেখা আছে,—স্যর ক্রিষ্টফার রেনের স্মৃতিচিহ্ন যদি দেখতে চাও তোমার চারদিকে চেয়ে দেখ! কারণ, চারদিকেই ইঁটে আর পাথরে তাঁর অক্ষয় প্রতিভার স্মৃতি তিনি নিজেই তৈরী করে রেখে গিয়েছেন। ইংলণ্ডের যেসব বড় বড় সৌধ, শিল্পকলার গৌরবস্বরূপ বিরাজ করছে, তার অধিকাংশই স্যর ক্রিষ্টফার রেনের প্রতিভার সৃষ্টি।

আমাদের দেশে দিল্লী, আগ্রা এবং উত্তর-ভারতের বহু প্রাচীন নগরে বিরাট বিরাট সব সৌধ আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে, কি বিচিত্র তাদের গঠন, কি অপূর্ব্ব তাদের কারুকার্য্য, কি সুন্দর তাদের দৃশ্য! জগতের কত কবি, কত সাহিত্যিক, কত পর্য্যটক, তাজমহলের সৌন্দর্য্য দেখে কত কথাই না লিখলেন কিন্তু যে-লোকটির মগজ থেকে এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির নক্সা বেরিয়েছিল, যারা তিল তিল করে মেপে এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের মর্ম্মরস্মৃতি গড়েছিল,—সাজাহান আর মমতাজের প্রেমকাহিনীর আড়ালে তাদের পরিচয় ডুবে গেল। আমাদের দেশে কারুরই নাম শিল্পকলার ইতিহাসের পাতায় বেঁচে নেই। আমাদের দেশে বড় বড় মন্দির আছে, ভাল ভাল মূর্ত্তি আছে, জগতের বিস্ময়কর সব সৌধ আছে—যা দেখবার জন্যে দেশ-দেশান্তর থেকে লোক নিয়তই আসছে। কিন্তু যে-সব প্রতিভা সেই সব অমর-কীর্ত্তি গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের নাম পর্য্যন্ত আমরা জানি না—আজ হয় ত জানবারও আর উপায় নেই। ইংলণ্ডের সৌভাগ্য যে, যে-লোক ইংলণ্ডকে সুন্দর করে গড়ে রেখে যেতে পেরেছিলেন, তাঁর স্মৃতিকথাকে এই রকম ভাবে সম্মান দেখাতে পারে।

কিন্তু এখানে একটা কথা হয় ত মনে উঠতে পারে, স্যর ক্রিষ্টফার রেনের স্মৃতিকে সম্মান করবার এই যে আয়োজন, এই যে উৎসব, এর সঙ্গে আমাদের কি যোগ! তিনি সুন্দর সুন্দর গির্জ্জা তৈরী করে, বিরাট সব সৌধ তৈয়া করে, লণ্ডনকে সুন্দর করে গিয়েছেন—তাতে আমাদের কি?

একজন বড় দার্শনিক একবার বলেছিলেন, প্রতিভা হল আমাদের ষড়ঋতুর মত। কোন ঋতুতে সে নিয়ে আসে দক্ষিণ সমীরণ ফুটিয়ে তোলে, বকুল, ভুঁইচাঁপা, কোন ঋতুতে সে নিয়ে আসে শ্রাবণের ধারা, ফুটিয়ে তোলে বেল, যুঁই, মালতী; কোন ঋতুতে সে নিয়ে আসে শরতের স্বচ্ছ লঘুনীল মেঘ, হেসে ওঠে নবীন ধানের মঞ্জরী, দুলে ওঠে কাশের গুচ্ছ; কোন ঋতুতে সে নিয়ে আসে হিমেল উত্তরী বায়ু—মানুষের ঘরে ঘরে জমা হয় হিমপুষ্ট শস্য। তেমনি প্রতিভা কোন ঋতুতে দান করছে, নিউটন, কোন সময় দান করছে কালিদাস, কোন সময় দান করছে তাজমহল, কোন সময় দান করছে মাইকেল এঞ্জেলো। এক জনের প্রতিভা পাথরে ফুটে উঠেছে আর একজনের প্রতিভা কাব্যে ফুটে উঠল! তারা সকলেই মানুষের সম্মানের পাত্র। তবে যে শিল্প মানুষের মনের সঙ্গে যত সহজে কথা কইতে পারে, সাধারণ মানুষ তাকে আদর করে। এইখানে আর একটা কথা বলা দরকার, সেক্স্‌পীয়ার ইংরেজী ভাষায় য়ুরোপের লোকদের নিয়ে নাটক লিখেছেন বলে তিনি যেমন শুধু ইংলণ্ডের বা য়ুরোপের নন্—তেমনি স্যর ক্রিষ্টফার রেন তিনি শিল্পসৌধ দ্বারা ইংলণ্ডকে অলঙ্কৃত করে গিয়েছেন বলেই তিনি শুধু ইংলণ্ডের নন্। অবিনাশী প্রতিভাকে সম্মান করবার অধিকারের মধ্যে যে আনন্দ আছে তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে সেই চাইবে, যে দুমুঠো খাওয়ার চেয়ে জীবনের উদ্দেশ্য বৃহত্তর মনে করে না।

স্যর ক্রিষ্টফার রেনের জীবনী আলোচনা করার আর একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। আজকাল য়ুরোপে Town-planning (নগর-গড়ন) বলে একটা বিদ্যা বিশেষ প্রসার লাভ করেছে। Town-planningকে আমরা সোজা কথায় বলতে পারি নগর গড়ে তোলার বিদ্যা। এই নগর গড়ে তোলার ব্যাপার বর্ত্তমান সভ্যতার একটা বিশেষ অঙ্গ এবং এই সম্বন্ধে প্রত্যেক নাগরিকের বিশেষ উৎসাহ এবং আগ্রহ থাকা কর্ত্তব্য। এই নতুন বিজ্ঞান বা বিদ্যার লক্ষ্য হল—কি করে বাড়ী, রাস্তা, নর্দ্দমা, পথ-ঘাট (অর্থাৎ যা নিয়ে শহর) কি করে তাদের এমন ভাবে গড়ে তোলা যায় যাতে নাগরিকদের স্বাস্থ্যহানি হবে না, অথচ বাইরে থেকে দেখতেও খুব সুন্দর হবে। এলোমেলো ভাবে বাড়ী বসানো, নোংরা পথ ঘাট, সরু সরু গলি, কোন বাড়ীর গড়নের সামঞ্জস্য নেই, ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ী, যেখানে সেখানে ময়লা, খোলা নর্দ্দমা, দুর্গন্ধ, অসুখ আর মড়কের লীলাভূমি—আমাদের দেশের অধিকাংশ ছোট-

খাটো শহরের হলো এই বর্ণনা। এই জঘন্য লজ্জাকর অবস্থাকে দূর করবার জন্যেই Town planning-এর উদ্ভব হয়েছে। বিলাসিতা অন্যায় কিন্তু সুন্দর ও সুস্থ হওয়া অন্যায় নয়—বরঞ্চ না হওয়াই ত্রুটী। মানুষের পক্ষেও ত্রুটী শহরের পক্ষেও ত্রুটী। যা সুন্দর, যা পরিচ্ছন্ন, তাই লক্ষ্মীর কৃপা-দৃষ্টি পায়। তার ওপর সব চেয়ে বড় কথা নগরকে সুন্দর করে গড়ার মানে, নগরবাসীদের স্বাস্থ্য ভাল রাখা। এই কথা এখানে উত্থাপন করতে হলো, কেন না, স্যর ক্রিষ্টফার রেনের জীবনের সঙ্গে আধুনিক নগর-গড়নবিদ্যার ইতিহাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়ানো। আজ যে নগরী জগতে অদ্বিতীয়, তিনশো বছর আগে একদিন, সেই নগরী আমাদের টালা, টালীগঞ্জ অঞ্চলের চেয়েও জঘন্য শহর ছিল। নোংরা সরু-সরু গলি, বড় রাস্তা একটাও ছিলনা, রাস্তার ধারে ধারে নর্দ্দমা, গর্ত্ত, সেখান থেকে অনবরত দুর্গন্ধ উঠছে; ঘেঁষাঘেষি বাড়ী, হাওয়া ভাল করে খেলতে পায় না। এই ছিল তিন চারশো বছর আগেকার লণ্ডন শহর। সেই সময় লণ্ডন এত অস্বাস্থ্যকর ছিল যে সত্তর বছরের মধ্যে তিনবার লণ্ডন, শহর প্লেগের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাবার মত হয়েছিল এবং তৃতীয় বার যখন প্লেগ দেখা দিল তখন এক লণ্ডন শহরে এক লক্ষ লোক মরে গিয়েছিল। এই ভয়াবহ প্লেগ ইংলণ্ডের ইতিহাসে Great Plague নামে অভিহিত এবং সেটা ঘটে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে। লণ্ডন সহর তখন এক বিরাট শ্মশান। এই শ্মশান থেকে জন্মগ্রহণ করল—নতুন লণ্ডন, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। একা মানুষ হয়ত সেই জঞ্জালের স্তূপ থেকে একটা মহানগরী গড়ে তুলতে পারত না। তাই দেবতা এই কাজে মানুষকে সাহায্য করল। দেবতা পাঠিয়ে দিল—আগুন, মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করল—ক্রিষ্টফার রেন।

প্লেগের পরের বছর প্রায় সমস্ত লণ্ডন শহরে আগুন লেগে গেল। এত বড় বিরাট অগ্নিকাণ্ড ইতিহাসে আর ঘটেনি। ক্ষতির মধ্যে দিয়ে এত বড় কল্যাণ বোধ হয় আর খুব কমই সংঘটিত হয়েছে। লণ্ডন ব্রিজের কাছে পুডিং লেনের একটা ছোট্ট কাঠের বাড়ীতে প্রথম আগুন লাগে। তারপর সেখান থেকে চারিদিকে সেই অগ্নি লক্ষ লক্ষ জিহ্বা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ে। দুমাইল লম্বা, একমাইল চওড়া জায়গা নিয়ে এই বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল। সতেরো হাজার বাড়ী, পুরানো সেণ্টপলের গির্জ্জার সঙ্গে অন্য ছিয়াশীটি গির্জ্জা, চারশো রাস্তা, বড় বড় আফিস, গুদাম, সব ধ্বংস হয়ে গেল। সেই সময় জন ঈভলিন বলে একজন ইংরেজ তাঁর ডাইরিতে এই বিরাট অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা লিখে রাখেন। সেই বর্ণনার শেষ পাতায় তিনি লিখেছিলেন, London was, but is no more—একদা লণ্ডন বলে কোন শহর ছিল আজ আর তা নাই। কিন্তু এই তেরো হাজার বাড়ী, গির্জ্জে, পথঘাট ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে আগুন, আর একটা বড় কাজ করল—নগরভরা সেই সব জঞ্জাল, যার জন্য হতো প্লেগ,—সেই অস্বাস্থ্যকর সব রাস্তা আর বাড়ী সে-সবও ধ্বংস হয়ে গেল। সেই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একজন যুবক নিত্য এক স্বপ্নপুরীর চিত্র দেখত। চওড়া চওড়া তার রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে সুন্দর ঘরবাড়ী, চূড়াগুলো মাথা তুলে উঠেছে মেঘের দিকে, বাড়ীর ভিতরে প্রশস্ত সব ঘর। ক্রিষ্টফার যেন সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে মনে মনে তাঁর কল্পনার লণ্ডন শহরের চিত্র গড়তে লাগলেন। তখন তাঁর মাত্র পঁচিশ বছর বয়স। তিনি তখন জ্যোতির্ব্বিদ্যার অধ্যাপক। অঙ্ক, জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানে সেই অল্প বয়সেই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল।

বহু দিন, বহু রাত্রির সাধনার এবং স্বপ্নের ফলে রেন তাঁর স্বপ্নপুরীর বাস্তব প্লান নিয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তখন সবাই ব্যস্ত, সবাই চঞ্চল, সবাই নিজের নিজের দুর্ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত। রাজা, রাজসভাসদ তখন কারুরই একটু এগিয়ে ভাববার শক্তি নেই। ভবিষ্যতে ভাল হবে বলে, আজকে সকলে মিলে কিছু কিছু ত্যাগ করা, কিছু কিছু সহ্য করার মনোবৃত্তি তখন কারুরই নেই। যার যেখানে জায়গা ছিল, সে ঠিক সেইখানেই তার নিজের মত করে আবার পাঁচিল তুলতে লাগল। পাঁচিলে পাঁচিলে লাগলো আবার রেষারেষি। রেনের স্বপ্ন-নগরী তাঁর খাতায় আঁকা হয়ে পড়ে রইল। নগর তৈরী করবার প্লান তাঁর নেওয়া হল না বটে কিন্তু যে সব বড় বড় গির্জ্জে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেই সব আবার গড়ে তোলবার ভার রেনের ওপর পড়লো। তাঁর সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত কল্পনা, এবং শক্তি দ্বারা রেন, তাঁর সেই স্বপ্ননগরীর সৌধগুলিকে রূপ দিতে লাগলেন। কোনও

অর্থের প্রলোভন সেখানে ছিল না, তাঁর মাইনে ছিল মাত্র ৪ পাউণ্ড, তাও দ্বিতীয় চার্লসের দুর্বুদ্ধির ফলে সময় মত পাওয়া যেত না। তিনি এই বিরাট দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন শুধু নিজের অন্তরের প্রেরণায়। তাঁর কাজকে তিনি মনে করতেন, জাতির কাজ। এমন সৃষ্টি তিনি করবেন, যার মধ্যে এমন একটা আদর্শ থেকে যাবে যাতে ইংলণ্ডের লোক ইঁট আর পাথর দিয়ে কুৎসিত কিছু গড়তে লজ্জিত হবে। সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রাল, ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবী, টেম্‌পল বার, গ্রীনিচ অবসারভেটরী, অক্‌সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজের বহু স্বনামখ্যাত অট্টালিকা—সমস্তই স্যর ক্রিষ্টফারের কীর্ত্তি। যখন বিখ্যাত St. Paul's Cathedral নতুন করে গড়ে তোলবার ভার তিনি পেলেন, তখন একদিন, অগ্নি-বিধ্বস্ত সেই নগরীর পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একটা বাড়ীর ভাঙা পাথরে পা ঠেকে যেতে সেটা তুলে নিয়ে দেখেন, তাতে ল্যাটিন ভাষায় লেখা রয়েছে, I shall rise again—আমি আবার জাগব! রেন তক্ষুনি সেই পাথরটি সঙ্গে তুলে নিলেন—এবং সেণ্ট পল ক্যাথিড্রেলের গায়ে সেই পাথরটিকেই প্রথমে বসানো হলো! আমি আবার জাগব! ৩৫ বছর পরে, সেই বিরাট গির্জ্জের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হল! সেই গির্জ্জের ভিতর এবং বাহিরের গঠনের মধ্যে আগুনে পোড়া সমস্ত জাতির অন্তরের নবশক্তি উদ্দীপনাকে রেন মূর্ত্তি দিলেন! একান্ত বৃদ্ধ অবস্থাতে তিনি ক্যাথিড্রালের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে আসতেন। একটা ঝুড়ি করে তাঁকে সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় তোলা হতো—সেইখানে বসে তিনি দেখতেন, কোথায় কি গলদ্ হচ্ছে।

তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে, লণ্ডন শহরকে গোড়ে তোলবার যে প্ল্যান তিনি তৈরী করেছিলেন, তা আবার খুঁজে বার করা হয় এবং তাঁর প্ল্যানকেই ভিত্তি করে জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী আবার নতুন করে গড়ে উঠল।

বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

-নিখিলনাথ রায়

কলিকাতার প্রতিষ্ঠা

ইংরেজ বণিকেরা এ দেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা করেন ও ভারতবর্ষের রাজা হইয়া উঠেন, সেকথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিরূপে তাহাদের সে সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহা তোমাদিগকে জানাইতেছি। শাহসুজার নিকট হইতে ইংরেজেরা বিনা শুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করার আদেশ প্রাপ্ত হন এবং হুগলীতে কুঠী স্থাপন করেন। তাহা মাদ্রাজ হইতে স্বতন্ত্র হয় ও উইলিয়ম হেজেস তাহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে সকল কথা তোমরা শুনিয়াছ। ইংরেজেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পাইলেও কোন কোন সুবেদার তাঁহাদিগকে শুল্ক দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে তাহা বিশেষ ভাবেই আরম্ভ হয়। অধ্যক্ষ হেজেস বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ লাভের জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফললাভ করিতে পারেন নাই। হেজেসের পর বাঙ্গালা আবার মাদ্রাজের অধীন হয়। ক্রমে মোগলদিগের সহিত ইংরেজদিগের বিপদ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে জোব চার্ণক ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি যখন কাশীমবাজার কুঠীতে ছিলেন সেই সময় হইতেই মোগলদিগের সহিত বিপদের সূচনা হয়। তাহার পর তিনি হুগলীর অধ্যক্ষ হইলে সে বিবাদ বাড়িয়া উঠে। বিলাতে ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ ইংলণ্ডের রাজার অনুমতি লইয়া মোগলদিগের সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা এখানকার ইংরেজদিগের সাহায্যের জন্য অ্যাডমিরাল নিকেলসনের অধীনে বাঙ্গালায় জাহাজ ও সৈন্য পাঠাইয়া দেন।

এই সময়ে তিনজন ইংরেজ সৈন্য হুগলীর বাজারে উপস্থিত হইলে মোগল সৈন্যের সহিত তাহাদের বিবাদ বাধিয়া যায়। মোগল সৈন্যেরা ইংরেজ সৈন্য তিনটিকে ধরিয়া লইয়া হুগলীর ফৌজদারের নিকট গমন করে। তখন ইংরেজ সেনাপতি একদল সৈন্য লইয়া সেদিকে অগ্রসর হইলে মোগল

সৈন্যেরা তাহাদিগকে বাধা দেয়। মোগল সৈন্যেরা কামান ছাড়িতেও আরম্ভ করে। তাহাদের গোলাগুলি ইংরেজদিগের জাহাজের উপর গিয়াও পড়ে। ইংরেজদিগের কুঠিতেও আগুন লাগিয়া যায়। পরে অন্যান্য ইংরেজ সৈন্য আসিয়া মোগলদিগকে হারাইয়া দেয়। ফৌজদার ইংরেজদিগের সহিত মিটমাট করিয়া লন।

নবাব সায়েস্তা খাঁ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি ইংরেজদিগের কাশীমবাজার প্রভৃতি অন্যান্য কুঠী অধিকারের আদেশ দিয়া অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য হুগলীতে পাঠাইয়া দেন। নবাব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব মনে করিয়া অধ্যক্ষ চার্ণক হুগলী পরিত্যাগ করেন ও গঙ্গার অপর পারে সুতানটী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সুতানটী এবং তাহার নিকটস্থ কলিকাতা ও গোবিন্দপুর লইয়া ইংরেজদিগের কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। অধ্যক্ষ চার্ণক সুতানটীতে একটি দুর্গ ও টাঁকশাল নির্ম্মাণ এবং বিনা শুল্কে বাণিজ্যের জন্য আবার নবাবের নিকট আবেদন করেন। নবাব তাঁহাদিগকে হুগলীতে ফিরিয়া আসিতে বলেন। কিন্তু চার্ণক সুতানটীতেই থাকিতে ইচ্ছা করেন। মোগলদিগের সহিত ক্রমে বিবাদ চলিতেছে দেখিয়া কোম্পানীর বিলাতের অধ্যক্ষগণ কাপ্তেন হীথকে সৈন্য ও জাহাজসহ আবার বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। সেনাপতি হীথ সুতানটী হইতে ইংরেজদিগকে লইয়া প্রথমে চট্টগ্রামে পরে মাদ্রাজে চলিয়া যান।

সায়েস্তা খাঁর পর নবাব দ্বিতীয় ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার হইয়া আসেন। ইংরেজদিগের উপর বাদশাহের ক্রোধ শান্ত হইলে ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদিগকে মাদ্রাজ হইতে আবার বাঙ্গালায় আসিতে বলেন। ইংরেজেরা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাঁহাকে বাদশাহের নিকট জানাইতে বলিলে নবাব তাহাতে অসম্মত হন। ইংরেজরা তখন মাদ্রাজ হইতে আবার সুতানটীতে ফিরিয়া আসেন। ইব্রাহিম খাঁ বার্ষিক তিন হাজার টাকা কর দিয়া বাঙ্গালায় ইংরেজেরা বাণিজ্য করিতে পারিবেন বলিয়া বাদশাহের নিকট হইতে আদেশপত্র আনাইয়া দেন। সুতানটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর লইয়া তাঁহারা যে কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন, সে কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। ইংরেজেরা কলিকাতায় বাস করিলে দেশীয় শেঠ বসাক ও বিদেশীয় আর্ম্মেনীয়গণ তথায় আসিয়া দিন দিন তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজদিগের পূর্ব্বে আর্ম্মেনীয় প্রভৃতি সদাগরগণ কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সভাসিংহের বিদ্রোহ নামে বাঙ্গলায় যে ভয়ানক বিপ্লব ঘটিয়াছিল, ইংরেজেরা সেই সময়ে সুতানটীতে প্রাচীর, পরিখা ও বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া দুর্গগঠনের সূচনা করেন। মাদ্রাজ হইতে কামান আনাইয়া তাঁহারা সুতানটী রক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তাহার পর শাজাদা আজিম ও শ্বানের সুবেদারী সময় তাঁহারা জমীদারদের নিকট হইতে সুতানটী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর ক্রয় করিবার আদেশ লাভ করেন। ইংরেজেরা আজিম ও শ্বানের নিকট হইতে বাঙ্গলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করারও আদেশ লইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা কলিকাতা রক্ষার জন্য প্রাচীর, পরিখা ও বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়া যে দুর্গের সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমে সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত হয় এবং তখনকার ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে তাহার ফোর্ট উইলিয়ম নাম করা হইয়াছিল। বাঙ্গালা আবার মাদ্রাজ হইতে স্বতন্ত্র হয়। মিঃ আয়ার বাঙ্গালার প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা প্রধান অধ্যক্ষের পদলাভ করেন। সুতানটী কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সহিত আরও কোন কোন গ্রাম লইয়া ইংরেজেরা ক্রমে কলিকাতার জমিদারী পত্তন করিয়াছিলেন। এই কলিকাতা জমীদারী ক্রমে বাড়িয়া ২৪টী পরগণা লইয়া গঠিত হয়। বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলা তাহা হইতেই হইয়াছে।

কলিকাতা জমীদারীর পত্তন ও কলিকাতার দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া ইংরেজেরা ক্রমে ক্রমে যারপরনাই ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ পাওয়ায় তাঁহাদের অনেক প্রকার সুবিধাও ঘটে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের রাজ্যলাভের ইচ্ছা হইলে ইংরেজেরা সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া তাহার রাজা হইয়া উঠেন। কলিকাতাই ভারতের রাজধানী হয়। যাহা এককালে সামান্য গ্রামমাত্র ছিল ও দরিদ্রের কুটীরে আবৃত থাকিত, পরে তাহা ভারতের রাজধানী রূপে বিচিত্র অট্টালিকায়, সুদৃঢ় দুর্গে ও উজ্জ্বল আলোকমালায় ভূষিত হইয়া অমরাবতীর শোভাকেও পরাজিত করিয়াছিল। তাই কবির কথায় তোমাদিগকে বলিতেছি।

"ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথী তীরে।
কলিকাতা, ভারতের ভাবী রাজধানী,
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র কুটীরে,
শোভিবে অমরাবতী রূপে করি গ্লানি,
রাজহর্ম্ম্যে দৃঢ় দুর্গে, আলোক মালায়।

সভাসিংহের বিদ্রোহ

এইবার তোমাদিগকে সেই ভয়াবহ বিপ্লব সভাসিংহের বিপ্লবের কথা বলিতেছি ; নবাব ইব্রাহিম খাঁ শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি পূর্ব্ববঙ্গে থাকায় পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার শাসন কতকটা শিথিল হইয়া পড়ে। বৰ্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত চেতোয়া ও বর্দ্দার জমীদার সভাসিংহের বিবাদ ছিল। সভাসিংহ উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বৰ্দ্ধমান আক্রমণ ও রাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করে। কৃষ্ণরামের এক পুত্র জগৎরাম বৰ্দ্ধমান হইতে পলাইয়া ঢাকায় যায়। রাজার ধন-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়। এইরূপে সাহসী হইয়া সভাসিংহ ও রহিম খাঁ অন্যান্য স্থানেও উপদ্রব আরম্ভ করে। ক্রমে তাহারা স্বাধীন হইয়া উঠে। তাহাদের অত্যাচার দিন দিন বাড়িতে থাকিলে নবাব ইব্রাহিম খাঁ যশোরের ফৌজদার নুরউল্লা খাঁকে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে আদেশ দেন।

নুরউল্লা খাঁ যুদ্ধকার্য্যে সেরূপ অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁহার দেওয়ান বঙ্গজ কায়স্থবংশীয় রামভদ্র রায়ের সুবন্দোবস্তে তিনি অনেক ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া নির্ব্বিবাদে সময় কাটাইতেন। নবাবের আদেশ পাইয়া অবশ্য নুরউল্লা খাঁ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। বিদ্রোহীরা সে সময়ে অত্যাচার ও লুণ্ঠনাদি করিতে করিতে হুগলীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। নুরউল্লা খাঁ হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলে তাহারা দুর্গ আক্রমণ করে। নুরউল্লা খাঁ তাঁহাদের আক্রমণে ভীত হইয়া দুর্গ হইতে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া নৌকাযোগে পলায়ন করেন। বিদ্রোহীরা তখন হুগলী বন্দর অধিকার করিয়া চারিদিকে লুঠপাট করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের অত্যাচারে লোক সকল উৎপীড়িত হইয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের নিকট আশ্রয় লয়। ওলন্দাজেরা হুগলীতে দুইখানি জাহাজ পাঠাইয়া দিলে তাহার গোলাগুলিতে আহত হইয়া বিদ্রোহীরা হুগলী ছাড়িয়া সপ্তগ্রামে পলাইয়া যায়। সেখান হইতে সভাসিংহ রহিম খাঁকে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের দিকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে বৰ্দ্ধমানে উপস্থিত হয়।

বৰ্দ্ধমান-রাজের পরিবারবর্গ তাহাদের হাতে পড়িয়াছিলেন, সে কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। রাজপরিবার-বর্গের মধ্যে সত্যবতী নামে এক সুন্দরী রাজকুমারী ছিলেন। সভাসিংহ তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে গেলে সত্যবতী তাহাকে ছুরিকাঘাতে নিহত করেন। সভাসিংহের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ তাহার সৈন্যগণের পরিচালক হয়। বিদ্রোহীরা কিন্তু রহিম খাঁকে তাহাদের নেতা মনোনীত করিয়াছিল। রহিম খাঁ রহিম শা উপাধি ধারণ করিয়া বৰ্দ্ধমান হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত আপনার ক্ষমতা বিস্তার করে। মুর্শিদাবাদের কয়েকজন জমিদার তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণ এবং বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা দুর্জ্জন সিংহ ও তাহার পুত্র রঘুনাথ সিংহ তাহাদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের জায়গীরদার নিয়ামৎ খাঁকে নিহত করিয়া তাহারা ঐ প্রদেশে যারপরনাই অত্যাচার করে। বিদ্রোহীদের একদল কলিকাতার দিকেও অগ্রসর হয়। ইংরেজেরা ও অন্যান্য জমিদারেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন।

ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহীদের অত্যাচার যখন বাড়িতে লাগিল তখন নবাব ইব্রাহিম খাঁ আরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বাদশাহ ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বিদ্রোহীদের দমনের জন্য আদেশ দেন ও আপনার পৌত্র শাজাদা আজিম ওশ্বানকেও সসৈন্যে পাঠাইয়া দেন। আজিম ওশ্বানের প্রতি বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাবী ভারও প্রদান করা হয়। জবরদস্ত খাঁ অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া বিদ্রোহী-দিগকে আক্রমণ করেন। । রহিম খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বৰ্দ্ধমানের দিকে পলাইয়া যায়। জবরদস্ত খাঁও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৰ্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হন। আজিম ওশ্বান জবরদস্ত খাঁকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। জবরদস্ত তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হন। পরে আজিম ওশ্বান বৰ্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে জবরদস্ত খাঁ তাঁহার হস্তে সমস্ত সৈন্য-সামন্তের ভার দিয়া ক্ষুণ্ণমনে দাক্ষিণাত্যের দিকে চলিয়া যান। জবরদস্ত খাঁ চলিয়া গেলে বিদ্রোহীরা আবার নদীয়া ও হুগলী প্রদেশে লুঠপাট আরম্ভ করে। শাজাদা আজিম ওশ্বান তাহাদিগকে

বিদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য শাজাদার প্রধান মন্ত্রী খোজা আনোয়ার তাহাদের নিকট গমন করিলে বিদ্রোহীরা তাঁহাকে নিহত করে। এখনও বৰ্দ্ধমানে খোজা আনোয়ারের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্রোহীরা পরে শাজাদার প্রতিও ধাবিত হয়। উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শাজাদার সেনাপতি হামিদ খাঁ রহিম খাঁকে নিহত করেন। বিদ্রোহীরা তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। ক্রমে তাহাদিগকে দমন করা হয়। বৰ্দ্ধমান হইতে আজিম ওশ্বান ঢাকায় গমন করেন ও শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন।

সহর মুর্শিদাবাদ

সেকালে সহর বলিতে মুর্শিদাবাদকেই বুঝাইত। মুর্শিদাবাদ কোথায় তাহা বোধ হয় তোমরা জান। ঢাকার পর যখন মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী হইয়া উঠে, তখন হইতে তাহা সহর নামে পরিচিত হয়। কিরূপে সহর মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা হইল সে কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমরা শুনিয়াছ যে শাজাদা আজিম ওশ্বান বাঙ্গলা বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। এই সুবেদারকে নবাব নাজিমও বলিত। নাজিম শাসনকার্য্যেরই ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু রাজস্ব বন্দোবস্ত ও ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যে কৰ্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন তাঁহাকে দেওয়ান বলিত। দেওয়ানের অধীনে কাননগোগণ জমীর পরিমাণের ও রাজস্বের হিসাবপত্র রাখিতেন। দেওয়ান নাজিমেরই অধীন ছিলেন। কিন্তু বাদসাহ আরঙ্গজেব তাহাতে কার্য্যের অসুবিধা ঘটে দেখিয়া দেওয়ানদের স্বাধীন করিয়া দেন। নাজিম ও দেওয়ান দুইজন পৃথক ভাবেই কার্য্য করিতে থাকেন। আজিম ওশ্বানের সময় যিনি দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া আসেন, তাঁহার নাম কারতলব খাঁ। ইঁহার প্রকৃত নাম মহম্মদ হাদী। কারতলব খাঁ তাঁহার উপাধি ছিল। পরে তিনি মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ হাদী ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। একজন পারসিক ব্যবসায়ী তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ও মহম্মদ হাদী নাম প্রদান করেন। মহম্মদ হাজী কার্য্যদক্ষ হওয়ায় বাদসাহ আরঙ্গজেব তাঁহাকে কারতলব খাঁ উপাধি দিয়া বাঙ্গলার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তাহার পর তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ উপাধি প্রদান করেন।

নাজিম ও দেওয়ানের কার্য্যভার স্বতন্ত্র হওয়ায় দেওয়ানের হস্তে রাজস্ব আদায় ও ব্যয় নির্ব্বাহের ভার থাকায় নিজের প্রয়োজনমত অর্থ না পাওয়ায় নাজিম শাজাদা আজিম ওশ্বানের সহিত দেওয়ান কারতলব খাঁর বিবাদ উপস্থিত হয়। এমন কি আজিম ওশ্বান বেতন না পাওয়ার জন্য কতকগুলি সৈন্যকে উত্তেজিত করিয়া দেওয়ানকে হত্যা করাইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। দেওয়ান তাহাদিগের বেতন মিটাইয়া দিয়া বাদশাহকে সমস্ত কথা জানাইয়া ঢাকা হইতে দেওয়ান কৰ্ম্মচারীদিগকে লইয়া মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসেন। তখন মুর্শিদাবাদের নাম ছিল মুকসুদাবাদ। পরে দেওয়ান যখন মুর্শিদকুলী খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন, তখন হইতে নিজের নামানুসারে ইহার মুর্শিদাবাদ নাম প্রদান করেন। দেওয়ান মুর্শিদকুলী পরে নবাব নাজিমের পদও পাইয়াছিলেন। তখন মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী হইয়া উঠে ও সহর মুর্শিদাবাদ নামে খ্যাত হয়। এমন কি সেকালে কেবল সহর বলিলে মুর্শিদাবাদকেই বুঝাইত।

মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা ও তাহাকে রাজধানীতে পরিণত করিয়া মুর্শিদকুলীখাঁ ইহাতে অনেক অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করেন। পরবর্ত্তী নবাবগণও তাঁহার অনুকরণ করিয়াছিলেন। সম্রান্ত জনগণের জমীদার, ব্যবসায়ী, মহাজনদিগের ভবনেও মুর্শিদাবাদ শোভাশালী হইয়া উঠে। চক্ বাজার, মসজীদ, ভজনালয়, তোপখানা, অস্ত্রাগার প্রভৃতিতেও ইহার গৌরব বাড়াইয়া তুলে। চকবাজারের জন্য মুর্শিদাবাদ সহরকে এখনও লোকে চক বলিয়া থাকে। তোপখানার চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত আছে। সেখানে জাহানকোষা বা জয়ধ্বনী নামে এক সুবৃহৎ তোপ একটি অশ্বত্থবৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মুর্শিদকুলীখাঁর সমাধি বিরাটকায় কাটরার মসজীদ এককালে সকলের বিস্ময় জন্মাইত। এখন তাহা ভগ্নস্তূপে পরিণত। ভাগীরথীর উভয় তীরে পাঁচ ছয় ক্রোশ ব্যাপিয়া সহর মুর্শিদাবাদ অবস্থিত ছিল। ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধের পর সহর মুর্শিদাবাদের কথা বিলাতে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে মুর্শিদাবাদ সহরে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের ন্যায় বিস্তৃত, জনপূর্ণ ও ধনরত্নে গৌরববান। তবে

মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা লণ্ডনবাসীদের অপেক্ষা অসীম সম্পদশালী।

যাহাতে মুর্শিদাবাদের লোকেরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে নবাব মুর্শিদকুলী ও পরবর্ত্তী নবাবগণ তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে সময়ে সহর মুর্শিদাবাদে টাকায় ৪।৫ মণ চাউল বিক্রয় হইত। কেহ কেহ ৫।৬ মণের কথাও বলিয়া থাকেন। মফঃস্বলে অবশ্য তাহা অপেক্ষা অধিকই পাওয়া যাইত। ঢাকার দেওয়ান যশোবন্ত রায় এই সময়ে ঢাকায় আট মণেরও অধিক চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে কথা তোমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছ। অন্যান্য দ্রব্যও ঐরূপ সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইত। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সে সময়ে মাসে একটাকা আয় হইলে একজন লোক দু'বেলা উদর পূরিয়া কালিয়া-পোলাও খাইতে পারিত। সে সময়ে দরিদ্র ভিখারীরাও আনন্দে কাল কাটাইত। নবাবের আদেশে বিদেশে শস্য যাইতে পারিত না। মহাজনেরাও গোলাগঞ্জে শস্য রাখিতে পারিতেন না। মুর্শিদাবাদে ধুমধামের সহিত দুইটি পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইত, একটি ব্যারা ও আর একটি মহরম। ঢাকাতেও ব্যারা উৎসব হওয়ার কথা শুনা যায়। ব্যারা উৎসবে কলা গাছের খোলায় নানাপ্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা আলোক মালায় সাজাইয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইত। সে সময়ে অনেক বাজী পুড়িত ও বাজনা বাজিত। ভাদ্র মাসের শেষ, বৃহস্পতিবারে ইহার অনুষ্ঠান হইত। এক্ষণে নামমাত্র ব্যারা পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মহরমও খুব ধুমধামে হইত। এখন তাহারও ধুম কমিয়া গিয়াছে। নগরের সুব্যবস্থায় দেশে চুরি ডাকাতিরও নিবৃত্তি হইয়াছিল। বিচারকার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। এখনকার মুর্শিদাবাদকে সেই সহর মুর্শিদাবাদ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। মুর্শিদাবাদ এখন ভগ্নস্তূপের সমষ্টি

> "দিল্লী মুর্শিদাবাদ হইতে এখন,
> মুসলমান-গৌরবের সমাধি ভবন।"

গজদন্তের দ্রব্য ও রেশমী বস্ত্র

মুর্শিদাবাদে সে সময়ে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত তাহার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের গজদন্ত বা হাতীর দাঁতের দ্রব্য চিরবিখ্যাত। হাতীর দাঁত কাটিয়া তাহা হইতে নানারূপ দ্রব্য তৈয়ার করা হইত। দেব-দেবীর মূর্ত্তি, গাছপালা, বাড়ীঘর, কেল্লা, মন্দির, মসজীদ, মানুষের ও পশুপক্ষীর মূর্ত্তি লাঠির মাথা এমন কি সম্পূর্ণ লাঠি ও শয়ন করার পাটী পর্য্যন্তও নির্ম্মিত হইত। এবং এখনও কতক কতক হইয়া থাকে। এই সকল দ্রব্য দেশ-বিদেশে বিক্রয়ের জন্য যাইত এবং এখনও যায়। বহু মূল্যেই তাহাদের বিক্রয় হয়। বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও এই হাতীর দাঁতের কাজ হইয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদের রেশমী বস্ত্রও সকলের নিকট আদরের বস্ত্র। বালুচরের চেলি এককালে বারাণসী কাপড়কেও হারাইয়া দিত। তাহাতে সুকৌশলে অনেক জিনিস খচিত হইত।

> "বালুচরে চেলি যেথা সঙ্কলন হয়,
> খচিত কৌশলে তার সেনা করা, হয়।"

এক্ষণে মির্জাপুরের গরদের ন্যায় রেশমী বস্ত্রের তুলনা পাওয়া যায় না। চেলী, গরদ, মটকা প্রভৃতি রেশমী বস্ত্র দেশ-বিদেশে এমন কি ইউরোপে পর্য্যন্ত আদর লাভ করিয়াছে। এখনও মুর্শিদাবাদে রেশমী বস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে রেশমের সূতা করিয়া লইতে হইত। পলু নামে এক প্রকার গুটী পোকাকে তুতপাতা খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। তাহাদের লালা হইতে তাহারা একটি কোষ তৈয়ার করিয়া তাহার মধ্যে থাকে। সেই কোষ হইতে সূক্ষ্ম রেশমের সূতা বাহির করিতে হয়। সেই সূতায় রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের রেশমী বস্ত্রের গুণ এই যে তাহা যেমন চিক্কণ সেইরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ইউরোপীয় ও দেশীয়গণ রেশমের ব্যবসায় করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়-দিগের রেশমের কুঠী ছিল। মুর্শিদাবাদের খাগড়ার কাঁসার বাসনেরও যথেষ্ট আদর আছে। মুর্শিদাবাদের গাত্রবস্ত্র বালাপোষ এত কোমল যে অন্য কোথাও সেরূপ কোমল বালাপোষ পাওয়া যায় না। নবাব ও সম্ভ্রান্ত জনগণ বালা-পোষের বড়ই আদর করিতেন। ভাল বালাপোষ মসলিনে প্রস্তুত হইত। ভাল বালাপোষের মূল্য অধিক ছিল। এখন আর সেরূপ ভাল বালাপোষ প্রস্তুত হয় না। [ক্রমশঃ]

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

"আমি আর এখানে আসবো না, ইন্দু।"

"কেন ?"

"না।"

কলিকাতার উপকণ্ঠে, এক বৃহৎ অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যান-পার্শ্বস্থিত লতামণ্ডপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি যুবক ও একটি তরুণীতে উক্তরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। অপরাহ্ণ অবসানপ্রায়, সন্ধ্যা আসন্ন। উদ্যান সজ্জাকরগণ আশে-পাশে কাজ করিতেছে, কেহ বা বৃক্ষলতামূলে জল-সেচন করিতেছে, কেহ মাটীর কেয়ারী করিতেছে, কেহ পুষ্পস্তবক রচনায় ব্যাপৃত। যুবক যুবতী যেখানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে, সেখানে কেহ নাই। তরুণী গৃহস্বামীর কন্যা, যুবক সকলের পরিচিত এবং সর্ব্বজন আদৃত। তরুণীর নাম, ইন্দুপ্রভা; যুবক—সুবিমল।

ইন্দু কিয়ৎক্ষণ অবনতমুখে, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আসবে না কেন ?

সুবিমল বলিল, আমার ভাল লাগে না।

ইন্দু একটিবার মাত্র বিমলের মুখের পানে চাহিয়া চক্ষু নমিত করিয়া লইল। দিনের আলো যদি অস্পষ্ট না হইত এবং বিমল ইন্দুর মুখের প্রতি দৃষ্টি ফেলিত, তাহা হইলে, তাহার কথাগুলি ইন্দুর প্রাণে বাজিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিত। বিমল নিজের ঝোঁকে বলিতে লাগিল, একটা কাজের চেষ্টা করতে কসুর করি-নি ইন্দু, কিন্তু কোথাও কোন সুবিধে কর্ত্তে পারছি না।

ইন্দু গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল, কিন্তু আমাদের বাড়ী আসবে না কেন ?

বিমল বলিল, কি করতে আসব ? ভাল কাজকর্ম্ম না জুটলে তোমায় পাব না; কাজকর্ম্ম কবে জুটবে, জুটবে কিনা তা' জানি-নে। মিথ্যে মিথ্যে এসে কি ক'রব বল ?

ইন্দু এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, তুমি এলে আমি ভাল থাকি, আমার শরীর ও মন ভাল থাকে, তা তুমি জান।

জানি।

তবে ?

বিমল বলিতে লাগিল, দেখ, শীগগির যদি কিছু হবার সম্ভাবনা থাকৃত, তা হ'লে আসতে আমার কোন বাধা ছিল না; কিন্তু সে আশা খুব কম।

ইন্দু কহিল, কিন্তু কোন-না-কোনদিন হবে ত! সকলকার কাজ হয়, তোমারই বা না হবে কেন ?

বিমল কথা বলিল না।

ইন্দু বলিল, সময় পালাচ্ছে না; আমিও পালাচ্ছি না। দেরী হয়, হোক্ না, তাতে ক্ষতি কি!

বিমল বলিল, কিন্তু তোমার বাপ-মা কি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে চুপ ক'রে ব'সে থাকৃবেন ?

না থেকে কি করবেন ?

বিমল জবাব দিল না।

ইন্দু দৃঢ়স্বরে আবার বলিল, না থেকে কি করবেন ? আমার অমতে আমার বিয়ে দিতে ত পারবেন না।

বিমল গভীর কণ্ঠে কহিল, তুমিই বা কতদিন হতভাগার আশায় বসে থাকৃবে ইন্দু ?

ইন্দু হাসিল; বলিল, ব'সেই যে ঠিক থাকব, তা, নয়; যেমন আছি তেমনই থাকব। কখন ব'সব, কখন দাঁড়াব, কখনও বা শোব, এই রকম আর কি!

কিন্তু, কতকাল ?

তা কেমন ক'রে বলব ? হয় ত জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত।

অন্ধকার ধরিত্রীকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। বিমল ইন্দুর মুখখানি দেখিবার চেষ্টা করিল। মুখ দেখিতে পাইল কিন্তু মুখের রেখা পাঠ করিতে পারিল না।

এইমাত্র ইন্দু যে কথাগুলি কহিল, সে গুলি নূতন কথা নহে। এরূপ কথা আগেও হইয়াছে, আগেও সে বলিয়াছে, এ দেহে, এ জীবনে তোমাকেই ভালবাসিয়াছি, তোমাকেই ভালবাসিব! তোমার আশাতেই এ জীবন রাখিব। তবু, আজ একটু বিভিন্নতা আছে। আগে যাহাকে এ কথাগুলি সে বলিত, শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত, পাগল হইয়া

উঠিত ; আজ তাহাকেই এই কথা সে বলিল বটে, কিন্তু তাহার কোনরূপ ভাব-প্রবণতা দেখা গেল না। যেন অতি সহজ, অতি সাধারণ, বিশেষত্ববর্জ্জিত কথা। এই তারতম্য তরুণী লক্ষ্য করিল এবং তাহার ভিতরটা যেন ফুঁপাইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, তুমি উপরে যাবে ত ?

"না।"

"সে কি ? মা'র সঙ্গে দেখা করবে না ?"

"না।"

ইন্দু বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে অন্ধকারে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মা কিন্তু কি মনে করবেন ?

বিমল দুঃখের সহিত বলিল, নিত্য যা মনে করেন, তাই মনে করবেন।—একটু থামিয়া, একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পূর্ব্বের মতই হতাশাম্লানকণ্ঠে কহিল, অপদার্থ লোককে যা মনে করা যায়, তাই মনে করবেন।

ইন্দুর মনটিও হতাশায় ভরিয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু দেখা না করলে মা কি সব ভাববেন। বসতে না পার, না-ই বসলে, একটিবার দেখা ক'রে যাবে চল !

বিমল বলিল, বলছ চল ; কিন্তু তাঁর সামনে গেলেই আমি যে কত বড় অপদার্থ তা এত বেশী ক'রে মনে পড়ে যে যেতে ইচ্ছে হয় না।

"তবে থাক্। কিন্তু বল, পরে, মাঝে মাঝে আসবে ?"

"তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে সাহস হবে না, তা সত্ত্বেও তোমাদের এখানে আসা কি উচিত হবে ?"

ইন্দু নীরব।

"আমার মনে হয়, না আসাই ঠিক।"

ইন্দু নীরব।

"কি বল, তাই ঠিক নয় কি ?"

এবার ইন্দু কথা কহিল ; বলিল, তাই ঠিক।

বলিতে বলিতেই তাহার গলা ধরিয়া আসিল। বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ফেলিতেছিল। অতি কষ্টে আবার বলিল, তা'হ'লে তোমায় আর দেখতে পাব না ? —অন্ধকার তাই দেখা গেল না, নহিলে বড় বড় মুক্তাসম অশ্রুবিন্দুগুলি বিমল দেখিতে পাইত।

বিমল বলিল, আপাততঃ তাই। কিন্তু আর নয়, আমি যাই।

ইন্দু মুখ তুলিল ; প্রিয়তমকে দেখিতে চাহিল ; দেখিল। অন্ধকারে যতখানি দেখা যায় তাহা দেখিল, মন দিয়া আরও অনেকখানি দেখিয়া লইল। তারপর, মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল ; পা দু'টিতে হাত দিয়া সেই হাত মাথায়, বুকে ঠেকাইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, একটি কথা রাখবে ?

বিমল স্নেহস্নিগ্ধস্বরে বলিল, নিশ্চয় রাখব, বল।

ইন্দু বলিল, আমাদের বাড়ীতে আসবে না বলছ, আমিও আসতে বলব না ; কিন্তু এই পথ দিয়ে একবার ক'রে যেতে পারবে কি ?

বিমল চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ইন্দু বলিতেছিল, বিকেলের দিকে, যখন সময় পাবে, একবার ক'রে সামনের রাস্তাটা দিয়ে যেও।

বিমল খুব জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিল।

ইন্দু মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল, বল।

আসব।

আমি ঐ বারান্দায় ব'সে থাকব। একবার ক'রে দেখতে ত পাব। আমার পক্ষে সেই কি কম লাভ !

তা'হ'লে যাই ?

এস।

বিমল 'যাই' বলিয়াও দাঁড়াইল। একটু যেন ভাবিল, তারপর বলিল, না।

ইন্দু সাগ্রহে জিজ্ঞাসিল, 'না' কি ?

বিমল কহিল, শুনে কাজ নেই, ইন্দু।

ইন্দু আর আগ্রহ দেখাইল না, যদিও কথাটা জানিবার জন্য তাহার দেহ অধীর আগ্রহে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। হায়, এই বিদায়ের করুণক্ষণে সেই অব্যক্ত কথাটি জানিবার আগ্রহ কি কম ? কে জানে, এই বিদায়—কত দিনের জন্য, কত কালের জন্য বিদায়! কে জানে, ইহাই চিরবিদায় কি-না! কথাটা কি, আজ জানা না হইলে, আর কোনও দিন জানিবার অবসর হইবে ত ?

বিমল ম্লানকণ্ঠে বলিল, যাই ইন্দু।

ইন্দু নতমুখে বলিল, এসো।

বিমল চলিয়া গেল। যাইবার আগে, ইন্দুর ডান হাত-খানি ধরিয়া বিদায় লইবার জন্য তাহার দেহ ও মন দুইই কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। প্রবল ইচ্ছা প্রবল সংযমের বলে দমন

করিয়া লতামণ্ডপের পাশ দিয়া যে সরু পথটি ফটকের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইটি ধরিয়া অগ্রসর হইল। ইন্দু সেই-খানেই দাঁড়াইয়া ছিল। ফটকের সম্মুখীন হইতে যখন আর দেরী নাই, এক মিনিট পরে যখন আর তাহাকে দেখাও যাইবে না, তখন ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ডাকিল, শোন।

বিমল দাঁড়াইল।

ইন্দু কাছে আসিয়া তাহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল; নতমুখে বলিল, আবার কবে দেখা হবে, কথা হবে, জানি না; যাবার সময়– কথাটা তাহার ঠোঁটে আসিয়া বাধিয়া গেল।

বিমল বুঝিল কিম্বা বুঝিল না জানি না; নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দুর অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল। হায়, মানুষ কথা বুঝিতে পারে না কেন?

দরোয়ান, চাকর, মালী ফটকের আশে-পাশে অনেকেই আনাগোনা ও অবস্থিতি করিতেছে, এখানে এভাবে দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদও নয়, উচিতও নয়—বিমল মনে মনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, এদিক-ওদিক চাহিতেছিল।

ইন্দুরও সংযম কম নয়। ভাবপ্রবণতা দূর করিয়া, স্মিতমুখে বলিল, একটি কথা ব'লে যাও – তুমি আমার?

বিমলের অজ্ঞাতসারে তাহার বুকের ভিতর হইতে দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বলিল, আমি তোমার!

ইন্দু একটি প্রশ্নের প্রত্যাশা করিতেছিল, কিন্তু বৃথা আশা; সে প্রশ্ন আসিল না। তখন সে নিজেই বলিল, আমি তোমারই।—বলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

দ্বিতলের হল-ঘরে ইন্দুর মাতা বসিয়া ইন্দুর ছোট বোন ক্ষণপ্রভাকে পিক্টোগ্রাফ শিখাইতেছিলেন। হলের মধ্য দিয়াই ইন্দু নিজের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মা ত অবাক্। মেয়েটির মেজাজের অন্ত তিনি কোনও দিনই পাইতেন না বটে; কিন্তু আজ আবার নূতন করিয়া কি হইল ভাবিয়া সারা হইতে লাগিলেন।

ক্ষণপ্রভা নিতান্ত ছেলেমানুষটি নয়; আট পার হইয়া ন'এ পড়িয়াছে; বোধশক্তিও জন্মিয়াছে। সুবিমলকে আসিতে এবং বাগানে দিদির সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়াছিল। ঐ দুইয়ের সহিত কোন-না-কোন সম্পর্ক আছে স্থির করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, বিমলদা' এসেছিলেন।

মা'র মুখ গম্ভীর হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার যে অংশের সঙ্গে সর্ব্বজীবে সমদয়াসম্পন্ন ভগবানের আলো এবং বাতাসের বিশেষ বিরোধ, সেই অংশে পাশাপাশি দুইটি বাড়ীর পরিজনদিগের মধ্যে এক সময়ে অন্তরঙ্গতা এতই গভীর ও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, বহিরঙ্গ ব্যক্তিরা দুই পরিবারকে একান্নভুক্ত বলিয়া মনে করিতেও দ্বিধা করিত না। উভয়েই কায়স্থ; মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। দুই বাড়ীর ছেলে মেয়েরা এক সঙ্গে এ বাড়ীতে একদিন, ওবাড়ীতে একদিন খাইত, এক সঙ্গে খেলিত; এক সঙ্গে বিদেশে হাওয়া খাইতেও যাইত।

হেরম্ববাবু শেয়ার-মার্কেটে দালালী করেন। তাঁহার পুত্র কন্যা অনেকগুলি ছিল। যমরাজা একটির পর একটি সরা-ইয়া মাত্র কন্যা দুটিকে রাখিয়াছেন—ইন্দুপ্রভা ও ক্ষণপ্রভা।

নিশানাথ দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার। তাঁহার একমাত্র পুত্র, সুবিমল। নিশানাথ যা রোজগার করিতেন, খরচ করিতেন তার চেয়ে অনেক বেশী। বেশী রোজগারের অনেক পথ—বিশেষ করিয়া আদালতে—মুক্ত থাকিলেও অধিক রোজগারের দিকে তাঁহার মন বা দৃষ্টি ছিল না; কিন্তু বেশী খরচের যত রকম পথ আছে, সে সকলে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

উভয়ে বন্ধু। সাংসারিক ব্যাপারে উভয়ে উভয়ের মত-অমতে শ্রদ্ধাশীল। দু'জনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে। ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা পায়ই, মেয়েরাও যাহাতে বঞ্চিত না হয়, তাহা করিতে হইবে। বাড়ীর গৃহিণীদের অমত কর্ত্তাদের মতের স্রোতের বেগে ভাসিয়া গেল।

নিশানাথের পুত্র সুবিমল যখন হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হইয়া পাস করিয়া প্রেসিডেন্সীতে ভর্ত্তি হইল, হেরম্ব-দুহিতা ইন্দুপ্রভা সেই সময়ে বেণীতে লাল ফিতা ঝুলাইয়া ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাওয়া সুরু করিল।

অপরাহ্নে একজন আসিয়া কলেজের গল্প, প্রোফেসারদের গল্প, সহপাঠিদের গল্প বলিত, অপর স্কুলের কথা, লেডীস পার্কের খেলনাসমূহের কথা, দিদিমণিদের কথা বলিয়া আসর জমাইত। তারপর এমন সময় আসিল যখন ঐ দুই ব্যক্তির নিকট কলেজ স্কুলের কথা, প্রোফেসার দিদিমণিদের কথা অরুচিকর হইয়া পড়িল। তখন তাহারা অধীত পুস্তকের গল্পে, দৃষ্ট ও শ্রুত সিনেমা-বায়স্কোপের গল্পে মন দিয়াছিল। তারও পরে চন্দ্রশেখরের প্রতাপ ও শৈবলিনীর কথা, রোমিও জুলিয়েটের কথা, হ্যাম্‌লেটের ওফেলিয়ার কথায় আনন্দ পাইতে লাগিল।

হেরম্ববাবু, নিশানাথ ও পাড়ার আরও কয়েকজন ভদ্রলোককে লইয়া পাশা খেলিতে বসিয়াছেন, হেরম্ববাবুর বাড়ীর দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া বিমল হ্যামলেটের গল্প শেষ করিয়া রাজা ও রাণীর গল্প সুরু করিয়াছে। ইন্দুর মার হাতে কোন কাজকর্ম্ম না থাকায় পাশের ঘরটায় বসিয়া তিনি কি একটা বই, বোধ হয় রামায়ণ, পড়িতেছিলেন, মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হইয়া ইহাদের গল্পও শুনিতেছিলেন। বিমল সংক্ষেপে রাজা ও রাণীর গল্প শেষ করিল। ইলার দুঃখের কথায় ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। সুমিত্রা কুমার সেনের ছিন্ন মুণ্ড আনিতেছে শুনিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিমল তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। ইন্দু বলিল, মাগো ইলার কি দুঃখ!

সেই রাত্রে হেরম্বজায়া হেরম্বকে জানাইলেন, যা হইয়াছে তা হইয়াছে, আর লেখাপড়া করিবার দরকার তাঁহার কন্যার নাই।

হেরম্ব হাসিয়া বলিলেন, তা কি হয়? আমি কথা দিয়েছি।

ভারি ত কথা, তা'র আবার দেওয়া!

কথাই সব। যা'র কথার ঠিক নেই সে মানুষ নয়

গৃহিণী বলিলেন, কিন্তু মেয়ে ত বড় হচ্ছে, সকলের সঙ্গে মেশা কি ভাল?

হেরম্ব চট্ করিয়া কহিলেন, সেটা অবশ্য ভাল নয়। কার সঙ্গে মেশে? বন্ধ ক'রে দিলেই ত পার।

তা কি পারি। তোমার বন্ধুর ছেলে যে! তারপর তুমি যদি বলে বস, আমি কথা দিয়েছি, তখন আমার মুখটি কোথায় থাকবে?

ওঃ, বিমল! হ্যাঁ! বিমল কি সকলকার মধ্যে নাকি! হ্যাঁ!

কিন্তু বিমল পুরুষ, আর তোমার মেয়ে, মেয়ে।

হেরম্ব দৃঢ়স্বরে বলিলেন, নিশ্চয়ই। তা'তে সন্দেহ কি! —বলিয়া নিজের মনে হাসিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, ছেলেমেয়ের বয়স হ'লে বাপ মাকে সাবধান হতে হয়!

হেরম্ব পূর্ব্ববৎ বলিলেন, নিশ্চয়; তাতে সন্দেহ আছে!

তাহ'লে বিমলকে একটু সাবধান করে দিও, বুঝলে?

আরে রামঃ, সে যে বিমল! বড় ভাল ছেলে, তা'কে সাবধান ক'রে দিতে হবে না।

কেন, এও তোমার কথা দেওয়া আছে না কি?

দেওয়া নেই বটে, দিলে মন্দ হয় না।

গৃহিণী নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আদালতের পেস্কার তাঁহার বেয়াই হইবে ইহা কল্পনা করিতেও লজ্জা হয়।

বিমলকে সাবধান করা হইল না। তাহার ফল ফলিতে সুরু করিল। সে কথা পরে বলিতেছি।

শেয়ারের বাজারে গোটাকত বড় দাও মারিয়া হেরম্ব লক্ষপতি হইলেন। ভাড়াটে বাড়ী ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরে নতুন পাড়ায় প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত করিলেন ও সপরিবারে তথায় উঠিয়া গেলেন। নিশানাথ ভাড়া-বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন। রবিবারে রবিবারে বন্ধুর বাড়ীতে পাশা খেলিতে যান। তিনি সপ্তাহান্তে একটিবার যান বটে, তাঁহার পুত্রটি নিত্য নিয়মিত যাওয়া আসা করে।

গত বৎসর ইন্দু ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। বিমল পড়াগুলা যেন জলে গুলিয়া তাহাকে গিলাইয়া খাওয়াইয়া দিয়াছে। দিন রাত তাহার পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। ইন্দু প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার শ্রম সার্থক করিয়াছে, মুখ রাখিয়াছে। পাশের খবর বাহির হইবার কয়েকদিন পরেই ইন্দুর বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে আরম্ভ করিল। পাত্রপক্ষ দেখিতে আসিবার দিন ধার্য্য করিয়া খবর দিতেই ইন্দু মা'কে বলিল, সে বিবাহ করিবে না।

অনেক বাদানুবাদের পরও মেয়ের যে গোঁ বজায় রহিল, তাহা এই যে, মনে মনে সে বিমলকে বিবাহ করিয়াছে। বিবাহ যখন একবারই হয়, তখন সেই বিবাহই প্রথম ও শেষ বিবাহ।

কথাটা সালঙ্কারে হেরম্বর কানে উঠিল। ইহা যে তাঁহারই অবিমৃষ্যকারিতার ফল, তাহাও পুনঃ পুনঃ শুনিতে হইল। কিন্তু এই অদ্ভুত লোকটি বলিলেন, তা মন্দ কি!

গৃহিণী অনর্থ করিতে লাগিলেন। মেয়ে ও মেয়ের পিতা নীরব।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন গৃহিণী নিজের হাতে সকল ভার তুলিয়া লইলেন। বিমলকে অপরিসীম স্নেহ বিজ্ঞাপিত করিয়া যত আশীর্ব্বাদ করিলেন, তত বক্তৃতা দিলেন। মোদ্দা কথা এই দাঁড়াইয়া রহিল, সে যদি ন্যূন পক্ষে দুই তিন শত টাকা বেতনের একটি চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারে, ইন্দু-লাভ তাহার পক্ষে সুলভ হইতে পারে।

তাহার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দুই তিন শত টাকার চাকরী ত দূরের কথা, বিমল একটা চল্লিশ টাকার চাকরীও জোগাড় করিতে পারে নাই।

আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ এইখানে।

চাকরীর বাজারের কথা বলিয়া আমরা পাঠকপাঠিকার ধৈর্য্যের পরীক্ষা লইতে বসিব না। আর তাহার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না। বাঙ্গালার কোন্ গৃহস্থের ঘর বেকারভারে ভারী নয়? অন্ন-সমস্যা জটিল নয় কোন্ গৃহস্থের সংসারে?

সুবিমলের পিতা আশা করিয়াছিলেন, জজ সাহেবদের ধরিয়া করিয়া ছেলেটিকে আদালতের কোন দপ্তরে ঢুকাইয়া লইবেন। কিন্তু পুত্রটি, বৃত্তির পর বৃত্তি পাইয়া, একরকম বিনা খরচেই যখন উচ্চ হইতে উচ্চতর পরীক্ষা-বৈতরণী পার হইয়া যাইতে লাগিল তখন আর তাহাকে আদালতের ওঁচা কাজে ঢুকাইতে মন সরিল না। বন্ধু বান্ধবও নিষেধ করিয়াছিলেন। সকলেই বলিয়াছিলেন, বিমলের জন্য ভাবিতে হইবে না; বিশ্ববিদ্যালয়ই উহার জন্য ভাবিতেছেন। তিনিই উহার উপায় করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তাশক্তির কোন সংবাদ আমরা জানি না; বিমলের জন্য তিনি চিন্তা করিয়াছেন কিনা তাহাও আমাদের জানা নাই, তবে উপায় যে কিছু করেন নাই তাহা ত প্রত্যক্ষই করিতেছি। বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগণের নিষেধ সত্ত্বেও বৃদ্ধ নিশানাথকে পুত্রের জন্য যথেষ্ট চিন্তা করিতে হইল এবং হঠাৎ একদিন পরলোকের আহ্বানে চিন্তাসূত্রটি ছিন্ন হইয়া গেল।

শ্রাদ্ধের দিনে পিতৃবন্ধু হেরম্বনাথ মুণ্ডিতমস্তক বিমলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিয়াছিলেন, কিছু ভয় নেই বাবা, আমি আছি।

তিনি ছিলেন এবং আছেন ইহা সত্য; ভগবান করুন, তিনি সুদীর্ঘকাল থাকুন। কিন্তু তিনি যে আছেন, বিমলের জীবনে এই অনুভূতির কোন সুযোগ তিনি আজও দেন নাই। শেয়ার-মার্কেট, পাশার আড্ডা, গার্ডেন পার্টি, যাত্রার আসর, এই সকল বন্ধনের দৈবাৎ কোনও ফাঁকে যদি কোন দিন সুবিমলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিত, মামুলী প্রশ্ন ছাড়া কোন কথাই উঠিত না। প্রশ্ন এতই মামুলী, উত্তরও এত পুরাতন যে তাহার উল্লেখ করিতেও ইচ্ছা হয় না।

বিমল যখন শুষ্কমুখে বলে, কোথায়ও কোন সুবিধা হয় নাই, তখন সৌজন্যতোষিক শুষ্ক মুখে একটি 'তাইত' বলিয়া গভীর চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িতে হেরম্বনাথের যেমন বাধে না, পাঁচ মিনিট পরে 'কচে বারো'র রবে বৈঠকখানা বিদীর্ণ করিতেও দ্বিধা জাগে না। তাঁহার নিকট কোনরূপ আশা করা সুবিমল সযত্নে পরিহার করিয়াছে। আশা যে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা নহে। একটি বিষয়ে তিনি ইহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, পরেও করিবেন এরূপ ভরসা করা যায়।

গৃহিণীর মাস্তুতো বোন্ বেড়াইতে আসিয়া ইন্দুকে দেখিয়া চোখ কপালে তুলিলেন। তাঁহার একটি অল্পবয়সে-বিপত্নীক হাকিম দেবরের হাতে অবিলম্বে কন্যাদান করিয়া মোক্ষলাভের সহজ ও সরল পন্থা বাৎলাইয়া দিয়া গেলেন।

সে রাত্রি হেরম্বনাথের বিনিদ্র কাটিল। হেরম্বনাথ কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না, তাঁহার সেই এক কথা, "আহা, কথা দেওয়া হইয়া গিয়াছে যে!" কাহাকে কথা দেওয়া হইয়াছে, কি কথা, কে দিয়াছে কোন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে তিনি অক্ষম হইলেও কথা যে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

ভোরের দিকে গৃহিণী বলিলেন, তোমার 'কথা'র নিকুচি করেছে, আমি কালই আবুদির হাকিম-দেবরকে দেখে, আশীর্ব্বাদ ক'রে আসবো, তবে ছাড়বো।

হেরম্বনাথ মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিত রহিলেন। তাঁহার ক্ষ্যাপা, অবুঝ, পাগল মেয়েটার জন্যই ভয়! মেয়েটা কি কম পাগল? সুবিমল জামাই হইবে কিন্তু একটি রৌপ্যমুদ্রা পর্য্যন্ত যৌতুক দিতে পারা যাইবে না, এই অঙ্গীকার ইন্দু করাইয়া লইয়াছে। পাগলামী ছাড়া আর কি! পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ঐ দু'টি কন্যা, দুই জামাতাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া তিনি ত তাহাদিগকে দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে চিরমুক্তি দিতে পারিতেন কিন্তু মেয়ের ধনুর্ভঙ্গ পণ! তাঁহারও মুস্কিল, কথা যখন দেওয়া হইয়া গিয়াছে, তখন আর কি হইবে।

কিন্তু দোষটা কাহার? গৃহিণী যদি ইন্দুকে শুনাইয়া শুনাইয়া সুবিমলের অর্থহীনতা ও অক্ষমতার কথা রূঢ়ভাষায় প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে ইন্দুরও এত জেদ বাড়িত না, তাঁহাকেও এমন একটা সত্য পণে আবদ্ধ হইতে হইত না। এম-এ পাশ করিয়াছে, একদিন না একদিন তাহার পুরস্কার পাইবেই—লেখাপড়া কি আর বিফলে যায়? গৃহিণী ত তাহা বুঝিলেন না, বলিয়া বসিলেন, একটি পয়সা রোজগারের যার মুরোদ নেই, বিয়ে করবার আস্পর্দ্ধা তার হয় কেন? ইন্দু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বিমল যতদিন উপার্জ্জনক্ষম না হইবে, তাহাদের বিবাহ স্থগিত থাকিবে। যদি এ জীবনে সে শুভদিন না'ও আসে, ইন্দু পরজীবন পর্য্যন্ত তাহারই প্রতীক্ষায় থাকিবে।

গৃহিণীর গন্তব্য স্থান ও সময়ের কথা সকালেই বিঘোষিত হইল; গমনের উদ্দেশ্যও অপ্রকাশ রহিল না। শুনিয়া নিজের ঘরে ইন্দু, বাহিরের ঘরে ইন্দুর পিতা প্রমাদ গণিলেন।

ইন্দু বাহিরের ঘরে আসিতেই পিতা সস্নেহে বলিলেন, কিছু ভয় নেই মা, আমি আছি।

আমি আছি-তে ইন্দুর আস্থা কমিয়া গিয়াছিল। বলিল, মা'কে যদি তুমি না থামাও বাবা, আমি আত্মহত্যা করে বাঁচবো।

হেরম্বনাথ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, সেই এক কথা ব'ললেন, আমি আছি মা, আমি আছি।

কন্যা অশ্রুপূরিত নেত্রে চলিয়া গেল। হেরম্বনাথ অন্তঃপুরে আসিয়া ভৃত্যকে বিদেশযাত্রার আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। এক মুহূর্ত্তে জানাজানি হইয়া গেল, কর্ত্তা আজই অপরাহ্ণের গাড়ীতে বিদেশ যাইতেছেন, সঙ্গে ইন্দু ও দুইজন ভৃত্য যাইবে।

গৃহিণী রন্ধনশালায় ঠাকুরকে দৈনিক কার্য্য বিষয়ে উপদেশাদি দিতেছিলেন, হুড়িতে পুড়িতে আসিয়া বলিলেন, আমি মলেই তুমি বাঁচ, না?

হেরম্বনাথ বলিলেন, এই বুড় বয়সে?

গৃহিণী বলিলেন, সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করলে, মেয়েটার গলায় দুঃখের বোঝা চাপিয়ে না দিলে হচ্ছে না, না? একটা অখদ্যে, অবদ্যে, হা-ভাতে ছোঁড়ার হাতে অমন সোনার প্রতিমা তুলে দিতে তুমি ছাড়া কোনও বাপ পারবে না। না, কোন বাপ না, কোন বাপ না, কোন বাপ না, আমি এই তিন সত্যি করে বলছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ আক্কেল বুদ্ধির মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছ? বেশ ত, নিজে তাস পাশা পাঁচালী নিয়ে ব্যোমভোলা হয়ে বসে আছ, থাক, চুপ করে থাক, আমি ত মা, আমার ওপরই না হয় ভারটা দাও, দেখ আমি কি করতে পারি! তা নয়, বাপ বেটীতে সল্লা করে—হেরম্বনাথ প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন, গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, থাম থাম, আর নাক নেড়ে কথা বলতে হবে না। আমি যেন কিছু বুঝি নে, কচি খুকী আর কি! বাপ বেটীতে সল্লা করে আমার উপর জেদ করে বিদেশ যাওয়া হচ্ছে! যাও-না-যাও, আমারও যেদিকে চক্ষু যায়, আমিও চলে যাই।

স্বর অনুনাসিক হইয়া আসিতেই হেরম্ব প্রমাদ গণিলেন। একেবারে গলিয়া গিয়া গৃহিণীর একখানা হাত ধরিয়া ফেলিলেন ও আদর করিয়া বলিলেন, ঐ তোমার কেমন দোষ, লাবু! একটুতেই বাড়াবাড়ি করে বস।

শেষ পর্য্যন্ত হেরম্বনাথের সেই মিনতিপূর্ণ স্বর—আমি যে কথা দিয়েছি।

কাকে কথা দিয়েছ শুনি?

ইন্দুর নামটা হেরম্বনাথ সহসা বলিতে পারিলেন না। বলিলেও ফল যে বিপরীত ঘটিবে তাহা তিনি জানিতেন।

গৃহিণী বলিলেন, আমি জানি তুমি কাউকে কথা দাও নি। তোমার কিছু করতে হবে না, তুমি চুপ করে বসে থাক, যা করবার আমি সব করছি।

দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকের যা স্বভাব, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল—হেরম্বনাথ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন সুবিমল যথানিয়মে আসিলে গৃহিণী পরুষ কণ্ঠে কহিলেন, কাজকর্ম্ম একটা জোটাতে পারলে?

সুবিমলের মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল না; অভ্যাসমত মাথাটি নড়িল। গৃহিণী বলিলেন, পারবেও না কোনদিন।

ধরিত্রী যদি কথা শুনিতেন, আর সে যদি ডাকের মত ডাকিতে পারিত তাহা হইলে সুবিমল এই মুহূর্ত্তে মাটীতে মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

গৃহিণী আর একটি শব্দও উচ্চারণ করিলেন না। তাহার প্রয়োজনও ছিল না। আগের বলা সেই সামান্য কথা কয়টাই বেড়া আগুনের মত সুবিমলকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। গৃহিণী নিজের মনে রেশমের গলাবন্ধ বুনিতে লাগিলেন, আর সামনে বসিয়া ধিক্কারের আগুনে সুবিমল বিদগ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎ পরে, ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া সুবিমল চলিয়া গেল।

এ জীবনে আর কোনদিন এ গৃহের ছায়া মাড়াইতে সাহস তাহার হইবে না ইহাই সে জানিত; কিন্তু রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া একখানি স্নিগ্ধ মুখ, ততোধিক স্নিগ্ধ দুইটি নয়নের কাতর আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। কাল তাহার নিকট বিদায় লওয়া হয় নাই, সেই নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, প্রেমে পবিত্র, স্নেহে সমৃদ্ধ হৃদয়রাণীর নিকট বিদায়—চিরবিদায় লইবার জন্যই আজ আবার সেই ভয়াবহ গৃহের চৌকাঠ মাড়াইয়াছিল। তাহার পর কি ঘটিয়াছে, পাঠক পাঠিকা তাহা দেখিয়াছেন।

[ক্রমশঃ]

বঙ্কিমচন্দ্র

—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বাঙ্গালীরে তুমি দিলে ইতিহাস,
দিলে অভিনব স্বদেশ-প্রীতি;
ভাষা দিলে তারে দীপ্তমধুর,
নবভাব দিলে নবীন রীতি।
ওহে বরণীয় বঙ্গজ্যোতি,
বাঙ্গালী তোমারে জানায় নতি।
বাঙ্গালী নারীর মুখে দিলে ভাষা,
অবলারে দিলে শকতি ভরি';
আছিল ধর্ম্মে যে মোহ-জড়তা
জ্ঞানতেজে দিলে ভস্ম করি'।
ওহে নির্ভীক! সত্যপ্রিয়,
বাঙ্গালীর প্রীতি নিও হে নিও।
যে বাঙ্গালী শুধু নুয়ে যায় আর,
শুয়ে যায় যেন বেদন-ভারে,
তারি মাঝে তুমি দাঁড়ালে দৃপ্ত
ঋজু পৌরুষে সৌম্যাকারে।
পোষিলে নিয়ত ন্যায়ের নীতি;
আজি গাহি তব শক্তি-গীতি।

বিষাদ-মলিন বাঙ্গালীর মুখে
তুমি ফুটাইলে অমল হাসি;
তব গুণে সাতকোটির চিত্তে
দেশমাতা জাগে শঙ্কা নাশি'।
হাসি-শক্তির মন্ত্রদাতা,
লহ লহ এই কীর্ত্তিগাথা।
তপন তুমি যে তব জ্যোতি দিয়ে
হরিলে ভবের কলুষ যত;
হে পাবক! তব পুণ্য দাহনে
ছাই হ'য়ে গেল মিথ্যা শত।
হে পাপদলন! শক্তিমান,
লহ বঙ্গের অর্ঘ্যদান।
বঙ্গপ্রেমিক, বঙ্গগঠক,
বঙ্গনায়ক, বঙ্গভাতি,
তব তেজপ্রেম—গরিমার গুণে
কাটে বাংলার আঁধার রাতি।
তোমা' পেয়ে ভুলি দুঃখ ভয়,
জয় বঙ্কিম, তোমারই জয়॥ *

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিম-স্মৃতিসভায় পঠিত।

অভিযান

-শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

গিরিশ্রেণীর পার্শ্বে অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মিতে নদীর তট অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। সোমনাথ এক মনে নদীর তীরে সেই স্বভাবের শোভা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে দূরে তরুণ-তরুণীর হাস্য-কলরব প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সোমনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

তিনি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, এক সুন্দরী তরুণী, পরিধানে নীল শাড়ী, পদযুগল সেই রংএরই স্যাণ্ডালে শোভিত, খোঁপাটি ঈষৎ ঢিলাভাবে বদ্ধ, তিনজন তরুণের সহিত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

এই তরুণ-তরুণী সোমনাথের বিশেষ পরিচিত হইলেও তিনি প্রকৃতির শোভা আরো কিছুক্ষণ উপভোগ করিবার মানসে একটু দূরে গিয়া একটা শিলাখণ্ডের উপরে বসিলেন।

তরুণ-তরুণী নদীর ধারে এক সুন্দর বোটে গিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সহিত দু'টি মাল্লা রোলক-দাঁড় ইত্যাদি লইয়া আসিল। আর একজন পশ্চিমে-চাকর একটি ডালসেটিনা ও খাবারের বাসকেট লইয়া উপস্থিত হইল। বোট মৃদু-মন্দ বায়ে ভাসিয়া চলিল। যেখানে সোমনাথ বসিয়া ছিলেন, সেই খান দিয়া বোট যাইতেই ইন্দ্র "হ্যালো, সোমনাথ দা" বলিয়া ডাকিল—মালা তপনও ডাকিল। সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন, "বেড়াতে বেরিয়েছ? বড় দেরী ক'রে ফেলেছ।" ইন্দ্র বলিল, "আসুন না, ওপারে যাবেন!" সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন, "ইন্দ্র, ওপারে যাবার সময় এগিয়ে এসেছে বটে, পঞ্চাশ পেরিয়েছি—তবে ঠিক ওপারে যেতে রাজী নই।" ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সোমনাথ দা যে কি বলেন তার ঠিক নেই। যদিও তপু, মালা, কিরণ তরুণ-তরুণী বটে; আমাকে ঠিক তরুণ বলা চলে না। আমিও চল্লিশের কোঠা ছাড়িয়েছি—আসুন, আসুন।"

সোমনাথ বলিলেন, "আজকে তোমরা যাও—আমার বিশেষ কাজ আছে—জরুরী সভা।"

বোট মৃদু-মন্দ গতিতে ওপারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বোট যখন প্রায় নদীর মাঝামাঝি আসিয়াছে, কিরণ বলিল, "মালা, সেই গানটা গাও ত।" মেঘমালা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গান?" কিরণ সোৎসাহে বলিল, "সেই বিখ্যাত গান—'কা'র নিকুঞ্জে' ...... সত্যি মালা—তুমি এমন দরদের সঙ্গে ঐ গানটা গাও—এমন সুন্দর—আমার ইচ্ছা করে এই গান সকলকে শোনাই।" মেঘমালা হাসিয়া বলিল, "ও গান ত এম-এ পড়বার সময় মেয়েদের অনুরোধে অনেকবার গেয়েছি।" কিরণ বলিল, "মেয়েদের মধ্যে শুধু গাইলে কি হবে—বড় সভায় গাইলে একটা কাণ্ড হ'ত।" তপন বাধা দিয়া বলিল, "থাম ভাই, কি কাণ্ড হ'ত আর না হ'ত তা' না হয় পরেই বল। নদীর মাঝখানে এমন ক্যানভ্যাসের মধ্যে গানটা খাপ খাবে ভাল।"

মেঘমালা ডালসেটিনা লইয়া গান আরম্ভ করিল। দাঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে গানের ছন্দও যেন পা ফেলিয়া চলিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোট অপর পারে আসিয়া পৌঁছিল।

কিরণ কলিকাতায় থাকে, পশ্চিমের এই নদী ও পাহাড়ের অপূর্ব্ব শোভা তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তপন বাংলাদেশে থাকিলেও ইন্দ্রের ন্যায় পশ্চিমে ওকালতী করে। মেঘমালাও দীর্ঘকাল পশ্চিমে আছে।

বোট হইতে সকলে নামিল। ইন্দ্র বলিল, "তপন, চল ঐ পাহাড়ের দিকে যাই। তপন সম্মতি জানাইল। কিরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"কত দূর হবে?" ইন্দ্র বলিল, "যেতে আসতে প্রায় দু' মাইল হবে।" কিরণ বলিল, "দু মাইল? আমি পারব না।" তপন বলিল, "তা হ'লে কি করা যায়?"

কিরণ বলিল, "আমি আর মালা নদীর তীরে বালুর চরে ঘুরে বেড়াই—কি বল?" ইন্দ্র বলিল, "তাই ভাল, চল হে তপু।" ইন্দ্র ও তপন চলিয়া গেল।

কিরণের সঙ্গে মেঘমালা নদীর ধার দিয়া এঁকা-বেঁকা রাস্তায় ভ্রমণে রত হইল।

কিরণ ডাক্তার, তরুণ, অবিবাহিত, ধনী, পিতৃমাতৃহীন। মেঘমালা বিদুষী, অবিবাহিতা, পিতা নাই, বৃদ্ধা মাতা

আছেন। তিনখানা ছোট ছোট বাড়ী আছে। বাড়ী-ভাড়াতেই তাহাদের চলিয়া যায়। মেঘমালা বৃদ্ধার একমাত্র কন্যা, আর কোন সন্তান নাই।

কিরণের সঙ্গে মালার পঠদ্দশায় পরিচয় হয়।

মেঘমালা ও কিরণ অনেকটা পথ অগ্রসর হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। কিরণ বলিল, "মালা, এখানে ব'সে একটু প্রকৃতির শোভা দেখা যাক।"

তখন পাহাড়ের মধ্য হইতে চন্দ্র উঠিয়াছে। জ্যোৎস্নার প্লাবনে পর্ব্বত, নদীতট সব ভাসিয়া গিয়াছে। দূরে নদীতটে ধীবরের নৌকা বিশ্রামের জন্য ব্যগ্র। দুই একটি নৌকাতে ছোট ছোট চুল্লীর আগুনও দৃশ্যমান। এই প্রকৃতির শোভার মধ্যে কিরণ মালার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "মালা, আর কত দিন!" মালা হাসিয়া বলিল, "এই ত বেশ কিরণ—বিয়ে ও ত রেজেষ্ট্রি-করা দাসখৎ।"—কিরণ বলিল, "এ ভাল হ'তে পারে মালা, কিন্তু বিয়ে—"; মালা বাধা দিয়া বলিল, "ঐ পুরুষের আদিম যুগের ব্যাপার—পুরুষ এখনও নারীকে তার সম্পত্তি বিবেচনা করতে চায়, তাকে হাজার বাঁধনে বাঁধতে চায়—এই নয় কি?" কিরণ হাসিয়া বলিল, "প্রেমের বাঁধনে যখন আমাদের বেঁধেছে তখন আপত্তি কি?" মালা বলিল, "আচ্ছা, সে কথা আর একদিন হবে; এখন ওঠ।" কিরণ মালার হাত ধরিয়া উঠাইল।

কিরণ মেঘমালার কাছে দুই একদিন থাকিবে এইরূপ অভিপ্রায় লইয়াই কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য, তাহার অবস্থিতি ক্রমশঃ সুদীর্ঘ হইয়া উঠিল। সে সোমনাথ ও ইন্দ্রের কাছে প্রায়ই যায়। মেঘমালার বৃদ্ধা মাতা কিরণের উপস্থিতি দীর্ঘতর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এক চাঁদিনী রাত্রে কিরণ সোমনাথের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে বাগানের মধ্যে সারিবদ্ধ ঝাউগাছের তলে সে মেঘমালাকে দেখিল। তাহার সুন্দর মুখে চাঁদের আলো পড়িয়াছে।

কিন্তু মেঘমালা আজ এই জ্যোৎস্নারাত্রে কিরণকে ছাড়িয়া কেন এত চাঁদের শোভা দেখিয়া পাগল হইয়াছে? কেন সে শূন্যদৃষ্টিতে অসীমের পানে চাহিয়া আছে? কাহাকে সে খুঁজিতেছে? সে কি নিখিলেশের কথা ভাবিতেছে? বন্ধুভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যে মালাকে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে—তাহারই কথা? নিখিলেশ এখনও যৌবন উত্তীর্ণ হয় নাই। রূপও আছে। তাহাদের বাড়ী কোন পল্লীগ্রামে। কলিকাতায় ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া আছে। তাহার পিতা অল্প বয়সে মারা যান—দুই ভ্রাতাকে সে পড়াইয়াছে—এক ভগ্নীর বিবাহ দিয়াছে। সে এখনও বিবাহ করে নাই। সে সওদাগরী আফিসে দুই শত টাকা মাহিনার এক চাকুরী করে, আর টিউশনি করিয়াও আরও একশত টাকা উপায় করিয়া থাকে।

মেঘমালার মা একদিন মাত্র জানাইয়াছিলেন যে, নিখিলেশকে তাঁহার পারিশ্রমিক দিবার ক্ষমতা নাই। নিখিলেশ বন্ধুভাবেই বিনা পারিশ্রমিকে মালাকে পড়াইত। অথচ নিখিলেশের মাতা যখন মালার মা'র নিকটে মালাকে বধূরূপে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন মালার মাতা সুকৌশলে সে কথা চাপা দেন।

মালা আজ ভাবিতেছে যে, কত দিন, কত মাস সে নিখিলেশকে শুদ্ধ ধোপ-দোরস্ত কাপড় ও সাজ-সজ্জার অভাবের জন্য কতই তাকে তাচ্ছিল্য করিয়াছে—অথচ সে জীবনে নিখিলেশের কাছে বিশেষ রূপে ঋণী।

এই সব চিন্তা যখন তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিরণ ধীরে ধীরে আসিয়া মেঘমালার হাত ধরিল। মালা যেন সাড়া দিতে অক্ষম—কিরণ ব্যথিত হইয়া বলিল, "কি মালা, শরীর ভাল নেই?"

মালা বলিল, "মাথা বড় ধরেছে—আজ একটা চিঠি পেয়েছি।" কিরণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার?"—মেঘমালা বলিল, "নিখিলেশ দার।"—কিরণ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "সেই লোফারটার? কি লিখেছে?"

মালা বলিল, "ছিঃ ছিঃ কিরণ, টাকা না থাকাটাই কি এত দোষের, আর তিনি লোফারই বা কিসের? নিজে দু'শ টাকা মাহিনা পান—টিউশনি ক'রে আর একশ টাকা রোজগার করেন। লোফার কিসের?" কিরণ হাসিয়া কহিল, "মাষ্টার মহাশয়ের উপর টানটা বড়ই বেশী দেখছি।"—

মালার মুখে রাগ প্রকাশ হইলেও সে কোন কথা বলিল না। খানিকপরে সে নিখিলেশের চিঠিখানি কিরণের হাতে দিল। কিরণ একটু উন্নতস্বরেই বলিল, "আমার এ চিঠি দেখবার প্রয়োজন নেই।" মেঘমালা বলিল, "কষ্ট ক'রে পড়ই না—প্রেমপত্র নয়।" কিরণ অগত্যা পত্রখানি পাঠ করিল। পত্রে লেখা ছিল—

পরম কল্যাণীয়া,

স্নেহের মালা! অনেকদিন তোমার কোন সংবাদ পাই-নি। আশা করি, তুমি ভালই আছ। তোমার মা'র অসুখের কথা লিখেছিলে—কেমন আছেন জানাবে।

আমার ছোট ভাই সীতেশ ভাল ক'রেই এম-এ পাশ করেছে। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ—সে ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার হয়েছে—আমাদের আফিসের বড় সাহেবের বিশেষ চেষ্টায়। তা'র বিয়ে শীগ্‌গির হবে। তোমাকে আসতে বল্‌তে পারি? মা, রমেশ, সীতেশ, মীনা সকলেরই ইচ্ছা যে, তুমি এসে এই শুভকাজে তোমার গানে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন কর।

জীবনে অনেক কষ্ট করে ভাইদের মানুষ করেছি। মার কথা কি বলব—মার অগাধ স্নেহ, সহ্য করবার অসীম ক্ষমতা আমাকে সংসারপথে অগ্রসর করেছে। আজ তাঁর জীবন-সন্ধ্যায় একটু আনন্দ যদি দয়া করে এসে থাকে তো তুমি সে আনন্দকে তোমার গানেতে হাসিতে মূর্ত্ত জাগ্রত কর এই আমার অনুরোধ।

জীবনে যারা সুখের ঐশ্বর্য্যের তটে মানুষ হয়, তারাই শুধু জগতে এক মাত্র মানুষ নয় মালা। যদি একটু ভেবে দেখ তা হ'লেই বুঝতে পারবে। সত্যিকারের মানুষ গড়ে ওঠে দুঃখেদারিদ্র্যে, কষ্টের মধ্যে।

আশা করি তুমি নিশ্চয়ই আসবে। তোমার মা'ও মত দেবেন। আমার ভালবাসা নিও—মাকে প্রণাম দিও।　　　　ইতি—

নিত্য আশীর্ব্বাদক
তোমার নিখিলেশ দা'

পত্র দেখিয়া কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "জীবনে যারা" ইত্যাদি কথাগুলো কে নীল পেন্সিলে দাগ দিয়েছে?"

মালা বলিল, "আমিই দিয়েছি, খুব ভাল লেগেছে।"

কিরণ চিঠিটা মালার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া হতাশ ভাবে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মালা কিরণের নিকটে আসিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কিরণ, রাগ করেছ?"

কিরণ বলিল, "একটা কথা আজ বল্‌বে কি।"

মালা বলিল, "কি?"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি কি মালা তুমি আমায় ভালবাস?"

মালা উত্তর দিল না।

কিরণ আবার আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "বল, বল মালা—ভালবাস কি না?"

এই সময়ে মালার মাতা কিরণ ও মালাকে আহারের জন্য ডাকিলেন।

আহারের পর শরীরটা ভাল নাই বলিয়া মালা বিদায় লইল।

মালার হৃদয়কে আজ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে নিখিলেশ। কিরণ তাহাকে যে আজ "লোফার" বলিয়াছে—তাহা শত চেষ্টা করিয়াও যেন সে বিস্মৃত হইতে পারিতেছে না।

মালা নিখিলেশের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সক্ষম কি না তাহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু কিরণের এক "লোফার" কথাটাই তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিল—সে এই বিবাহে যাইবে—যদি কিরণ বিরক্ত হয়, নিরুপায়—তাহাকে যাইতেই হইবে—নিখিলেশের আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারে না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে এই সব চিন্তায় অবসন্ন হইয়া নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এদিকে কিরণ সে রাত্রে পাদচারণা করিতে করিতে প্রায় এক টিন সিগারেট নিঃশেষ করিল।

সে বুঝিয়াছে যে নিখিলেশকে "লোফার" বলিয়া ভাল করে নাই। কিন্তু তবুও সে নানা যুক্তির অবতারণা করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। আমাদের কত দুর্ব্বলতাকেই আমরা যুক্তির সাহায্যে সমর্থন করিতে চেষ্টা করি। এবং সে দুর্ব্বলতাকে নিজের ক্ষেত্রে যুক্তির সাহায্যে গুণে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিলে কত আনন্দ পাই। অন্যের ক্ষেত্রে সেই

দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া কত রাগ করি, কত বিদ্রূপ করি। এই সব মনুষ্য-চরিত্রের জটিলতার কথা কয় জনই বা আলোচনা করেন বা চিন্তা করেন।

কিরণ ভাবিল যে, সত্যই যদি সে নিখিলেশকে "লোফার" ভাবিয়া থাকে তবে সে কথা বলায় কি অন্যায় হইয়াছে—আর নিখিলেশ যে বাস্তবিকই "লোফার" সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তবে কি এমন দোষের কথা হইয়াছে?

মালার ব্যবহারে সে একটা রহস্য দেখিতেছে। মালা তাহার নিকটে আসিয়াও তাহাকে ধরা দেয় না। তাহাকে ভাল বাসে কি না তাহারও সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না।

এরূপ ব্যবহারের কি অর্থ? মালা কি তবে তাহাকে লইয়া কেবল অবসরের চিত্ত বিনোদন করিতেছে, না তাহার মাতার কথায় তাহাকে হাতছাড়া করিতেছে না?

এই সব চিন্তায় তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল।

* * *

পরদিন প্রভাতে চায়ের টেবিলে মালা ও কিরণ চা খাইতেছিল, সেই সময়ে মালার বাড়ীর সম্মুখে একটি মোটর-গাড়ী হর্ণ দিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মালা ও মালার মাতা উভয়ে ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই মালার বিশেষ বন্ধু যতীন স-বন্ধু ও বান্ধবী উপরে আসিল। মালার মাতা যতীনকে লইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যতীন এখানে অনেক দিন ছিল। তাহার পিতা জজীয়তী হইতে অবসর লইয়া এই স্থানে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। সেই সময়েই মালার সহিত যতীনের খুব সৌহৃদ্য হয়। যখন এম-এ পাশ করিয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাঠে রত সেই সময়ে যতীনের পিতৃবিয়োগ ঘটে। মালাকে সে বিলাত হইতে পত্রাদি লিখিত।

আজও সে বিবাহ করে নাই। অল্প দিন ব্যারিষ্টারী করিলেও সে বেশ নাম করিয়াছে। সম্প্রতি একটি বড় নূতন মোটরগাড়ী কিনিয়াছে। এই গাড়ীতে সে মালাকে লইয়া ছুটীর মধ্যে কাশ্মীর-ভ্রমণে যাইবে—এইরূপ জল্পনা চলিতেছে। তাহার দুই ব্যারিষ্টার বন্ধুর এক জনকে গয়া আর একজনকে হাজারীবাগে রাখিয়া যাইবে।

বান্ধবী তৃষ্ণা যতীনের বিশেষ পরিচিতা। এক ডাক্তারের পত্নী, পুত্রকন্যা কিছু নাই, তরুণী। একবার বি-এ ফেল করার পর সাহিত্য লইয়া ব্যস্ত হইয়াছে। দুই বৎসর হইল তাহার স্বামী বিলাতে গিয়াছেন।

তৃষ্ণা সুন্দরী হইলেও যৌবনের সীমা প্রায় অতিক্রম করিয়াছে। তৃষ্ণার সহিত যতীন, মালা ও মালার মার পরিচয় করিয়া দিল; কিরণ নিজেই আলাপ করিল।

তৃষ্ণা আসিয়াই সোমনাথ দা আছেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। যখন শুনিল যে তিনি আছেন তখন নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইল।

তাহারা সকলেই চা খাইতে ব্যস্ত, এই সময়ে সোমনাথ প্রশান্ত ভাবে সিগার টানিতে টানিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

যতীন সোমনাথকে দেখিয়া কহিল—'আসুন আসুন, কেমন আছেন?' বলিয়া পদধূলি লইল। সোমনাথ যতীনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন "ভালই আছি—গাড়ীটা বেশ সুন্দর – এটা কি তোমার?" যতীন লজ্জিত হইয়া উত্তর দিল "আজ্ঞে হ্যাঁ।" এই সময়ে তৃষ্ণার দিকে চোখ পড়িতেই সোমনাথ বলিয়া উঠিল, 'Hail holy light! কি তৃষ্ণারাণী যে! অয়ি প্রোষিতভর্তৃকে, অভিবাদন করছি, এলে একটা খবরও দাওনি।"—তৃষ্ণা উত্তর দিল, "হঠাৎ তা ঠিক হল কিনা"। সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আজকাল হঠাতের যুগ, কি বল তৃষ্ণারাণী? হঠাৎ বিয়ে, হঠাৎ কলহ, হঠাৎ পলায়ন, হঠাৎই সব, কি বল—সবুজ সাহিত্য, সবুজের প্রগতি, সবই "হঠাৎ"-এর উপর চলেছে।" মালা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গে এঁর পরিচয় আছে?"

সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন "বিশেষ পরিচয় আছে—ওঁর Sex Psychology, Sociology বুঝিয়ে নেবার আগ্রহে আমায় ক'লকাতা হ'তে চলে আসতে হয়েছে। পরিচয় নেই?" এই সময়ে যতীন হাসিয়া বলিল, "আমি এদের একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। সোমনাথদার সঙ্গে তৃষ্ণার তো দেখা হয়েই গেল।"

তাহারা স-বন্ধু চলিয়া গেল। তৃষ্ণা বলিল, "আপনার কাছে তো সেই জন্যই এসেছি। আপনার কাছে যা Sex সম্বন্ধে পড়েছি তাই নিয়েই সাহিত্যে যা একটু নাম করেছি—

আর খানিক পাঠ ক'রে বঙ্গসাহিত্যে একেবারে হুলস্থূল করব।"

সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন, "একেবারে হুলস্থূল? তা হুলস্থূল করতে পার তৃষ্ণা। কিন্তু এই হুলস্থূল এই দেশের আঁধির মত—কেবল ধুলোবালি রেখে যায়—যদিও তখন মনে হয় যে, কি প্রবল একটা ঝড় সব ওলট-পালট করে দিয়ে যাবে, কিন্তু যেমন শীঘ্র আসে তেমনি শীঘ্র চলে যায়—লাভ মোটের উপর ধুলা আর বালি।" তৃষ্ণা বলিল, "আপনাকে আবার কিছুদিন জ্বালাতন করব।"

সোমনাথ বলিলেন, "জ্বালাতন করবে কর—কিন্তু তোমার সোমনাথ দা'র আর Sex নিয়ে আলোচনা করবার প্রবৃত্তি নেই। এখন দেখবে সোমনাথদার ঘরে গিয়ে কেবল গীতার বিভিন্ন ভাষ্য। তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, ইত্যাদি।...এসেছ, কিছু গীতা পড়ে যাও।"

তৃষ্ণা হাসিয়া বলিল,"গীতা?"—সোমনাথ বলিলেন,"হাসির কথা ঠিক এটা নয় তৃষ্ণা, জগতের সাহিত্যের আসরে স্থায়ী স্থান এখন পর্য্যন্ত যে সব বই অর্জ্জন করেছে, তার মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থই বেশী দেখতে পাবে। তার মধ্যে মনে হয় গীতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ এর মধ্যে সৌন্দর্য্যের দিক থেকে, আর্ট-এর দিক থেকে তিনটা গুণই বর্ত্তমান, aesthetic, intellectual ও moral, বুঝেছ?" তৃষ্ণা বলিল, "দোহাই সোমনাথ দা, গীতার হাত থেকে রক্ষা করুন, তা ওর মধ্যে যত সৌন্দর্য্যই থাক"। সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন, "মাভৈঃ, জোর করে তোমাকে গীতা পড়াব না. চল তবে।"

তৃষ্ণা সোমনাথের সহিত চলিয়া গেল, যাইবার সময় একবার কিরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কখন আসছেন?"

কিরণ বলিল, "খানিক পরেই যাচ্ছি"।

সোমনাথ বলিলেন, "মালা, আজ রাত্রে তোমাদের সকলের আমার বাড়ীতেই নিমন্ত্রণ—ভয় নেই, ভজহরি রাঁধে ভাল আর বিশেষতঃ ঘি-ভাত বা পোলাও।" মালা বলিল, "বেশ, বেশ—তাহ'লে ঘি-ভাতই।" "উত্তম" বলিয়া সোমনাথ তৃষ্ণাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিরণ এরই মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে যে, মালা যতীনের সহিত বিশেষ পরিচিতা। সে জিজ্ঞাসা করিল, "যতীন বাবুর সঙ্গে আলাপ হল কবে?" মালা বলিল. "অনেক দিনের আলাপ।" কিরণের মুখের চেহারা বিশেষ ভাল বোধ হইল না। সে শীঘ্রই তৃষ্ণার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাহির হইয়া পড়িল।

সোমনাথ পরিপাটী করিয়াই খাওয়াইলেন। কিরণ সেখানে শুনিল যে, মালা যতীনের সহিত কাশ্মীর যাইবে। কিরণ বাড়ী আসিয়া তার পরের দিনই চলিয়া যাইবে বলিল, কিন্তু মালার অনুরোধে শুধু সেই দিনটা থাকিতে স্বীকার করিল।

পরের দিন যতীন স-বন্ধু মালাকে লইয়া হাজারীবাগের দিকে যাত্রা করিল। তাহাদের যাত্রার পর যখন মালার মা কিরণের গাড়ীর খাবার তৈরী করিবার জন্য ট্রেণের সময় জানিতে চাহিলেন, তখন কিরণ জানাইল যে, সে দুই তিন দিন আরো থাকিবে, মালার মা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেও আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৪

তৃষ্ণা সোমনাথের নিকটেই রহিয়া গেল। তাহার লেখার মাল-মসলা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

সোমনাথদার নিকটে কিছু "logy" বুঝিয়া আবার সে সাহিত্য-সমরে আগুয়ান হইবে স্থির করিয়াছে। কিরণকে তাহার খুব ভাল লাগিয়াছে।

কিরণও তৃষ্ণার কথায় একটা আধুনিক শিক্ষার ছাপ বেশ ঝল্‌মল্ করিতেছে দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ। ইহা সে মালার (প্রথম বিভাগে এম্-এ পাশ করা সত্ত্বেও) মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করে নাই।

এখন বেশীর ভাগ সময় কিরণ সোমনাথের বাড়ীত কাটায়। একদিন সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন, "কিরণ, আর কষ্ট করে মালাদের ওখানে খেতে গিয়ে তার বুড়ী মাকে কষ্ট দেওয়া কেন? এখানেই থাক না!" কিরণ সানন্দে সম্মতি জানাইল। কিরণের সহিত মালার মার যতীনকে লইয়া কিঞ্চিৎ কলহও হইয়া গিয়াছে।

কিরণের স্বভাব উত্তেজনা ব্যতীত সাড়া দেয় না—তৃষ্ণার স্বভাবও কেবল উত্তেজনায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি পায়। সেই কারণে দুই জনের মধ্যে একটি মিলনের সূত্র গ্রথিত হইয়াছে।

কিরণ এই সময়ের মধ্যেই তৃষ্ণার লেখার বিশেষ অনুরাগী হইয়াছে—ভক্ত বলিলেও চলে।

তৃষ্ণার লেখার অনেক ভক্ত আছে সত্য। কিন্তু কোন ভক্তের বিশেষ সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ তাহার হয় নাই।

একদিন সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীতটে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া তৃষ্ণা ও কিরণ, তৃষ্ণারই অতি-আধুনিক বিখ্যাত গল্প "প্রেমের তটে আবার লুকোচুরী কেন?" সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। কিরণ বলিল "দেখুন মিসেস মৈত্র, আপনার লেখার মধ্যে এই রকম dash, কিছু লুকোনো নাই, সব জলন্ত realism, এই তো চাই।" তৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "আমিও তো তাই বলি।"

কিরণ বলিল, "আপনার লেখার মধ্যে উদ্দেশ্যের কোন বালাই নেই—Art for Art's sake—এইটে যে দেখতে চায় তাকে আপনার লেখা পড়তে অনুরোধ করি।" তৃষ্ণা আনন্দের অতিশয্যে কিরণের পিঠ চাপড়াইয়া দিল। অতি অল্প দিনের পরিচয়ে এই রকম ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা, তৃষ্ণার প্রাণখোলা কথা সবই কিরণকে মুগ্ধ করিয়াছে। সে যেন একটা hypnosis-এর মধ্যে দিন কাটাইতেছে, এতই সে তৃষ্ণার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মালা যে তাহাকে ছাড়িয়া যতীনের সহিত কাশ্মীর গিয়াছে, সে জন্য রাগ অভিমানও যেন অদৃশ্য হইয়াছে—এতই মোহনীয় আকর্ষণ তৃষ্ণার।

কিরণ আসাতে সোমনাথ Sexology পড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আনন্দেই আছেন। তাঁহার একটি বড় কুকুর আছে, সেটি কুকুর নয়, বাঘ বিশেষ, তাহাকে লইয়া তাঁহার অনেক সময় কাটে। বাড়ীতে কেহ অভ্যাগত অতিথি, অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের জন্যও আসিলে তাহাকে অন্ততঃ তিনবার শুনিতে হইবে যে, ঐ বিরাট কুকুর কি রকম ভাবে তাঁহাকে বাঘের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

যখন তৃষ্ণা আর কিরণ ফিরিয়া আসিল, তখন সোমনাথ এক মনে একটি গোল কাঁচ লইয়া by suggestion এক সাঁওতালের মাথা ধরা সারাইতেছিলেন।

সোমনাথ তাহাদের দেখিয়া বলিলেন, "তৃষ্ণা ভজহরিকে বল খাবার দিতে, আমি যাচ্ছি।" তৃষ্ণা "আচ্ছা" বলিয়া কিরণের সহিত ভোজনের ব্যবস্থা দেখিতে গেল।

তৃষ্ণা একটু বিস্ময়ের চোখেই এই বৃদ্ধ নিঃসন্তান বিপত্নীক সোমনাথকে দেখিত। সোমনাথ বিলাতে ছিলেন সাত বৎসর, দর্শন শাস্ত্রের নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন—মাসে প্রায় দেড় হাজার টাকা মাহিনা পাইতেন। টাকাকড়ির বিশেষ দরকার নাই বলিয়া ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এখন সাঁওতালদের শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া আছেন। চেহারা বা বেশভূষা দেখিলে মনে হয় না যে, কখনও ইনি বিলাতে ছিলেন বা কখনও এই গ্রামের বাহিরে গিয়াছেন। একটি পুরানো কোট, তারও হাতের কাছে একটি প্রকাণ্ড ফুটো বর্ত্তমান। সেই কোট দেখাইয়া যখন তিনি বলিতেন যে, বিলাতে এই পরিধানে তিনি অক্সফোর্ডে টেনিস খেলিতে বাহির হইতেন তখন শ্রোতৃবর্গের হাস্য সম্বরণ করা দস্তুর মত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত।

তৃষ্ণাকে তিনি কন্যার ন্যায় দেখিতেন। আগে তাহাকে অনেক "logy" পড়াইয়াছেন। এখন তাঁহার "logy" পড়ানো বড়ই বিরক্তিকর মনে হইত। কিন্তু তৃষ্ণার আগ্রহকে তিনি সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেন।

আহারাদি পর তৃষ্ণা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"সোমনাথদা by suggestion সাঁওতালের মাথা ধরা সারল?" সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন "Suggestionএ জগৎ চলছে তৃষ্ণারাণী, মাথা ধরা সারবে না? তোমার এই Sexology পড়বার, ও তাই গল্পে চালাবার ভূতটাকে তাড়াবার জন্য suggestion এর সাহায্য নেওয়ার দরকার হবে বোধ হয় কি বল?"

তৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "সেখানে suggestion কি খাটবে সোমনাথ দা—?" সোমনাথ বলিলেন, "চেষ্টা করিনি তো—সময়ও কম।" এই সময়ে কিরণ বলিল, "এই দেখ তৃষ্ণা, তুমি যা লিখেছ তা মিসেস্ বারট্রাণ্ড রাসেলের Hypaliaতে রয়েছে—।" সোমনাথ মৃদু হাসিয়া চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তাই নাকি?"

৫

যতীন মালাকে লইয়া কাশ্মীর হইতে ফিরিয়াছে। ওদিকে সর্ব্বত্র মালার গানের খুবই প্রশংসা হইয়াছিল। রাত্রে যতীন কলিকাতায় যাইবে, মালাকে সে বলিল, "যাইকর মালা, বিয়ে ক'রে ফেল—এ বিষয়ে তোমার বা তোমার মার আর চুপ ক'রে বসে থাকা উচিত নয়। আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ যে অসম্ভব তা বোধ হয় তোমার মা বুঝতে পেরেছেন। যাকে এক দিন ছোট বোনের মত ঘাড়ে পিঠে

ক'রে পাহাড়ের মধ্যে খেলা ক'রে বেড়িয়েছি-তাকে বোনেরই মত যেন বিনা সঙ্কোচে পবিত্র হৃদয় নিয়ে ভালবাসি এই আমি চাই। তোমাকে সত্যিই ভাল বসি তাই ব'লছি।" এই বলিয়া যতীন বিদায় গ্রহণ করিল।

মালা ভাবিতেছিল যে ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? সে পাঠ্যাবস্থায় বিখ্যাত রুষ গল্পলেখক ডষ্টয়ভেস্কির লেখার মধ্যে এইরূপ পাঠ করিয়াছিল। তখন ভাবিয়াছিল যে তাহা নিছক কল্পনা। ইহা সম্ভব নয়।

একজন বাল্য-বন্ধু কি এক সুন্দরী তরুণীকে সত্যই ভগ্নীর ন্যায় ভাল বাসিতে পারে? এ কি কখনও সম্ভব। সে যে পাঠ্যাবস্থায় তার নিখিলেশ-দাকে গোপন করিয়া নিভৃতে এলিস-এর বিরাট গ্রন্থ ও তাহার এপেনডিক্স, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব পাঠ করিয়াছিল তাহা কি তবে নির্ভুল নহে? জগতে তাহা হইলে আদর্শ চরিত্রও ঘোর বাস্তব হইতে পারে?

তাহার মনে অনেক সন্দেহের দোলা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে ভাবিয়াছিল, হয়ত যে বেশী কথা কহে না, কবিত্বপূর্ণ ভাষায় হৃদয়ের প্রেম জ্ঞাপন করে না, দূর হইতে নারীর লজ্জাসম্ভ্রমকে সম্মান করে, সে হয় তো অন্তরে গভীর ভাবে ভাল বাসিতে পারে।

বৃদ্ধা মাতার জন্য মালার কষ্ট হইয়াছে। তাঁহার বড় ইচ্ছা যে, মালার খুব বড়লোকের সহিত বিবাহ হয়। কিরণ ও যতীন উভয়েই ধনী। কিন্তু দুই জনেই এরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার হাত হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া তিনি বিষণ্ণ হইবেনই। মালা ভাবিল যে, কিরণ নিশ্চয়ই ভাবিয়াছে যতীন মালাকে বিবাহ করিবে। সে কিরণের বিশেষ দোষ দিতে পারিল না, কারণ তার মনেও যে এ সন্দেহ ছিল না তাহা সে জোর করিয়া বলিতে পারে না।

যখন এই সব চিন্তায় সে মগ্ন তখন নিখিলেশের পত্র লইয়া পিয়ন উপস্থিত হইল।

নিখিলেশ লিখিতেছে—

পরম কল্যাণীয়া,

স্নেহের মালা, সীতেশের বিয়ের আর চার দিন মাত্র দেরী আছে, তুমি নেহাৎ কুটুম্বের মত সেই দিন না এসে মা'র মত নিয়ে পত্রপাঠ চলে আসবে।

তুমি কাশ্মীর থেকে যে পত্র লিখেছিলে তা পাঠ করে বড় তৃপ্তি পেয়েছি। দেখা হলে সব কথা হবে। মাকে প্রণাম দিও—আমার ভালবাসা নিও।

ইতি

নিত্য-আশীর্বাদক

তোমার নিখিলেশ দা

পত্রখানি পাঠ করিয়া মালার মানস-মন্দিরে ছায়া-ছবির তিনটি চরিত্র আসিয়া উঠিল। এক দিকে কিরণ, এক দিকে নিখিলেশ, আর এক দিকে যতীন। এই সব নানা চিন্তা লইয়া মালা নিখিলেশের বাড়ী যাত্রা করিল। ট্রেণে তাহার মনে হইল যে, মানুষ সত্যকারের কি চায় বা কাহাকে চায় সে নিজেই অনেক সময়ে জানে না।

(আগামী বারে সমাপ্য)

মায়ার বাঁধন

—শ্রীমনোজ গুপ্ত

সৌদামিনী মেয়েটি একটু অদ্ভুত। সারাদিন তাঁ'র কাজেরও যেমন বিরাম ছিল না; তেমনি ঘুমেরও না। কোথায় রাত ১২টায় কোন্ লোক বাইরে থেকে এল তা'র খাবার যোগাড় করতে হবে সৌদামিনীকে; কোন্ ছেলে 'থিয়েটার' দেখতে গিয়েছে, তার জন্যে খাবার নিয়ে ব'সে থাকবে আর কে? ঝাড়া হাত-পা লোক, করবে নাই-বা কেন? সংসারের কাজ আর কে না করে? কিন্তু কাজ নেওয়াও ছিল মহাবিপদ। তিনি না থাকলে যে এতবড় সংসারটা একদিনও চলে না, এ বিশ্বাস তাঁর একটু বেশী মাত্রাতেই ছিল; আর তাই নিয়ে কারও সঙ্গে গোল বাঁধাতে সময় লাগত না। কেউ যদি বললে, "বেশ ত বাপু, কাজ কর ভালই ত কর, তা নিয়ে বাড়ী মাথায় করবার কি আছে?" ব্যস্! আর তাঁকে ধ'রে রাখে কে? এমন নীচু সুরে কথা সুরু করবেন যে, রাস্তায় লোক না দাঁড় করিয়ে ছাড়বেন না। শেষে কাঁদতে সুরু করবেন, "ওগো, তুমি কোথায় গেলে গো! কেন আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে না গো! আমি এ কষ্ট কেমন ক'রে সহ্য করব গো"...এর পরই তিনি থাকবেন,সকলেই জানে তাই চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু ক'দিন চুপ ক'রে থাকা যায়? কেউ এসেছে বললে তিনি শোনেন না, থামেনও না। ভদ্রতা রাখা দায়। জায়েরা যদি কোন কথা বললে তাহ'লে আবার কান্না সুরু হ'ল! আজ তাঁর এই অবস্থা, তাই না! একদিন তিনিও কত লোককে পুষেছেন ইত্যাদি। মাঝে মাঝে তাঁর কোন এক হাকিম দাদার কথা বলতেন—তাঁর কাছে গেলে তিনি নাকি মাথায় ক'রে রাখেন, কেবল তিনিই যা মায়া কাটিয়ে যেতে পারেন না।

লোকে বলাবলি করত, সে দাদার সন্ধান ভূভারতে আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়-নি।

যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে, জায়েরা কেউ তাঁকে গ্রাহ্য করত না; কিন্তু তাতে তাঁর কিছু অভিমান বোধ হ'ত না। সব জায়গায় তাঁর কাজ চাই এবং সব বিষয়ে কথা বলা চাই-ই—তা সে বিষয়ে কিছু জানা থাক বা না থাক। কারও কোন কথা লুকিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কত অনর্থই না এই জন্যে বাধিয়েছেন। এ বাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত কত কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে এই জন্য; কিন্তু স্বভাব তাঁর একটুও বদলায়-নি। আবোল-তাবোল ব'লে চলেছেন নিজের মনে, কেউ শুনছে না—তা' তাঁর খেয়ালও নেই। থামতে বলাও বিপদ। সেই একই কথা—যা এই ত্রিশ বছর ধ'রে ব'লে চলেছেন, তা' শুনতে আর কার ভাল লাগে? পৃথিবীর সম্বন্ধে নতুন কিছু তিনি জানেন না, তাঁর কথা যে আর একজনের কাছে কত খারাপ লাগতে পারে সে ধারণা তাঁর নেই—থাকা সম্ভবও নয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছেও তাঁ'র গল্প পুরাতন হ'য়ে গেছে।

বাড়ীর মধ্যে একটি লোককে তিনি স্নেহ করতেন—সে বড় জায়ের নাতি অজয়। বাড়ীর মধ্যে প্রথম নাতি—সকলেই তাকে স্নেহ করে, তার মধ্যে সৌদামিনীর স্নেহের কোন বিশেষ দাম নেই। তিনি চান ছোট্ট ছেলেটিকে নিজের কাছে কাছে রাখতে, যত্ন করতে কিন্তু সুবিধে পান না। ছেলেটা তাঁকে মোটেই দেখতে পারে না; তা ছাড়া তা'র মা-ও ওঁর কাছে ছেলেকে রাখতে চায় না। একটা না একটা ছল ক'রে ছেলেকে যে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যায় একথা তিনি বুঝতে পারেন কিন্তু বলেন না—এই এক জায়গায় কেমন চুপ ক'রে যান।

* * *

সেদিন সকাল থেকে উঠে পর্য্যন্ত সৌদামিনীর কাজের আর বিরাম নেই। এক ভাসুরের ছেলে বাইরে কি বড় কাজ করে, পূজার ছুটীতে বাড়ী এসেছে। বড় কাজ করে, বেশ পয়সাও খরচ করে—কাজেই তার খাতির আলাদা। তা'র সুখ-সুবিধের দিকে সকলের কড়া নজর, কিন্তু কাজ করতে হয় একা সৌদামিনীকে। সারাদিন নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আগের দিনটা যে একাদশী ছিল একথা তাঁর মনেই ছিল না—মনে ক'রে দেওয়া কেউ দরকারও মনে করে-নি।

সৌদামিনী যখন পুজোয় বসলেন, বেলা তখন বোধ হয় তিনটা। পূজা শেষ হ'লে নিজে রেঁধে খাওয়া—তা আবার সন্ধ্যার আগে খেতে হবে। খাওয়ার হাঙ্গাম যদি না থাকত!

পূজার সময় সৌদামিনী আর একজন লোক। কোন কিছুতেই তাঁকে আসন থেকে ওঠাতে পারত না। বড়

সংসার, ছোট ছেলে মেয়ের অভাব নেই, আর ঠিক তাঁ'র পূজার সময়ই তারা এসে তাঁর কাছে ভিড় করে। পূজা হয়ে গেলে রোজই তিনি বাড়ীর সবাইকে জানিয়ে দিতেন যে, তিনি তাদের চালাকি খুবই বোঝেন - তারা যে ইচ্ছে ক'রে ঠিক এই সময়ে ছেলেদের পাঠিয়ে দেয়, তা তিনি জানেন। এ সব কথায় কেউ কোনদিন কান দেয় না। পূজা করতে করতে তিনি যে পূজার মন্ত্র ভুলে যান, ছেলেদের ভয়ে তা' হাজার বার বলেও কোন ফল হয় না। কে জানে, চোখ বুঁজে ধ্যানে বসলে কোন্ ছেলেটা কি নিয়ে পালাবে! তাঁ'র গোপালকে গোপাল নিয়েই ত একদিন দৌড়ে গিয়েছিল।

সেদিন ঠিক চোখ বুঁজেছেন আর পিছনে এসে একটা ছেলে বললে, দাদা পান চাইছে। চোখ বোঁজা থাকলেও কান ত আর বন্ধ ছিল না, তাই বুঝতে তাঁ'র কিছুমাত্র দেরী হয়-নি যে কি চেয়েছে। দাদাটি সেই নবাগত বড় চাকুরে! পূজায় বসবার আগে তাকে সব কিছু দিয়ে এসেছেন এরই মধ্যে আবার পান চাই! কিন্তু এখন ত উঠা চলে না। রাগারাগি করবে—তার মা এসেও দু'কথা ব'লে যাবে। যাক্‌গে, তা ব'লে ত ধ্যান ছেড়ে উঠা যায় না। ছেলেটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পানের তাগাদা জানালে শেষে কোন জবাব না পেয়ে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ীতে বেশ একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল—তাঁর কানে সব কথা আসছিল না; যেটুকু আসছিল তার মর্ম্ম এই যে—ছেলেটা বছরে একবার বাড়ী আসে, তাও কারও প্রাণে সয় না; সময়মত দুটো পান চাইলেও সে পায় না, ইত্যাদি।

সেদিন সৌদামিনীর পূজা শেষ হ'তে অসম্ভব রকম দেরী হয়ে গেল। শেষে যখন সত্যিই পূজা শেষ হ'ল তখন বেলা বড় বেশী বাকী নাই। কোন রকমে ঠাকুর তুলে রেখে রান্না চড়াতে যাচ্ছিলেন, বড় জায়ের একটা কথা কানে গেল, "ঠাকুরুণের পূজা শেষ হয়েছে নাকি?" আর পায় কে! সৌদামিনীর চোখের জল এবং মুখের কথা দুই-ই একভাবে ছুটতে সুরু করল। এই যে কাল একাদশী ক'রে আজ এত বেলা পর্য্যন্ত একফোঁটা জলও খাওয়া হয়-নি, তা' কি কেউ একবার খোঁজও করেছে? নিজেরা ত সব দিব্যি খেয়ে-দেয়ে আরাম করছে। আর একটা লোকের খাওয়া হক আর নাই হক কাজ পেলেই হ'ল। কেন? কিসের জন্যে সারা দিন খাটবে? বাড়ীর ঝি-চাকরকে পর্য্যন্ত ছুটী দিতে হয় কিন্তু বিনা-মাইনের ঝিকে তাও দিতে নারাজ! দালানে ব'সে ব'সেই ব'কে চললেন, সম্ভবতঃ দরজা-জানালাগুলোকে উদ্দেশ ক'রে, কারণ আর কেউ শুনবার মত কাছা-কাছি ছিল না। রান্না আর সেদিন চড়ল না। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, আবার রাত্রের রান্নার যোগাড় ক'রে দিতে হবে। উড়ে-বামুনটা এসে দাঁড়িয়ে আছে, তা'কে সব বুঝে বা'র ক'রে দিতে হবে—পাজীটা যে চোর! চোখের আড়াল করলেই হ'ল।—

সন্ধ্যে হ'লেই ছেলেরা খাবার জন্যে উৎপাত সুরু করে। তাড়াতাড়ি খেতে না দিলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। দিনের মধ্যে এই সময়টা সৌদামিনীর সবচেয়ে ভাল কাটে। এই সময় অজয়কে কাছে পান, তার মা এখন আসতে পারে না। আর অজয়ও এ সময় কেমন যেন তাঁর বাধ্য হয়ে যায়।

ছেলেরা সবাই খেতে বসেছে একসঙ্গে। যারা বাইরে থেকে এসেছে তারাও। সৌদামিনী অজয়কে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। কেউ বড় তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখে না, ছেলেরা সবাই খায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। রমেশ নতুন এসেছে। সব দিকে তার লক্ষ্য একটু বেশী। সে হঠাৎ আবিষ্কার করলে, অজয়ের ভাগে একটা আস্ত মাছ। সেও চাইলে; সৌদামিনী বললেন, "আর আস্ত মাছ নাই।"

"বা—রে! অজয়ের বেলায় আছে, আর আমার বেলায় নাই?"

"না—নাই। তোর বাবাকে বলিস কিনে আনতে—তাহ'লে দেব।"

"ওর বাবা কিনে এনেছে?"

"জ্যাঠামো করিস-নি, খেয়ে নে।"

"বয়ে গেছে আমার খেতে। আস্ত মাছ দেবে ত দাও, তা-না হ'লে রইল ভাত পড়ে।"

"না খেলে আমার ত ভারি ক্ষতি! মাছ পাবি না।" রমেশ ভাত ফেলে উঠে গেল। সে যখন তার ঠাকুরমাকে নিয়ে ফিরল, তখন অজয়ের খাওয়া হয়ে গেছে। অজয়কে জিজ্ঞাসা করতে সে নির্ব্বিবাদে ব'লে গেল রোজই সে একটা ক'রে আস্ত মাছ খায়। রমেশের ঠাকুরমা সকাল থেকে পান

না দেওয়া নিয়ে চ'টেই ছিলেন, বললেন, "শত্রুতা কি এই রকম ক'রেই করতে হয়? ওর বাপ-মাকে ত দুটী চক্ষের বিষ দেখ। ও কচি বাচ্ছা, ওর সঙ্গেও এই ব্যাপার! ওকে একটা আস্ত মাছ দিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত—শুনি?"

"মাছ পাব কোথা?"

"অজয়ের বেলা পেলে কোথা?"

"যেখান থেকেই পাই না—তাতে তোমার কি?"

"বটে? আমার কি? আমি বুঝি খরচ দিই না সংসারে! না? পরের জিনিস নিয়ে অমন বড়-মানুষী সবাই করতে পারে। নিজের থাকত, সেই দিয়ে সোহাগ দেখাতে পারতে, তাহ'লে বুঝতাম। লজ্জাও করে না! তবু যদি এর মা ফিরেও কথা কইত!"

"কোথা থেকে কইবে? তোমাদের দেখেই ত শিখছে, তা-না হ'লে ওর সাধ্য কি আমায় ওরকম করে?"

"আমরা ত মন্দ লোক হবই! লোকে কথায় বলে না— 'কালো মাথা যার, ভাল কর' না তার'। তুমি ব্যাভার পাও তোমার রীতিতে—ও কি কাউকে শেখাতে হয়!"

কথাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত বলা যায় না, বাইরে থেকে রমেশের বাবা ডাক দিলেন, "মা, শোন।" মা বাইরে আসতে বেশ সকলকে শুনিয়েই বললেন।

"বছরে একবার বাড়ী আসি পূজার সময়, তাও দেখছি বন্ধ করতে হবে…"

"বাটৃ! এই ক'টা দিনের দিকে আমি সারাবছর চেয়ে থাকি বাবা…"

"এসে সুখ ত কত! একগাদা টাকা খরচ ক'রে আসা, ক'দিন একটু আমোদ-আহ্লাদ করব ব'লে। তা হয়েছে বেশ! দুটো পান চেয়ে পাওয়া যায় না—ছেলেটা একটা মাছ খেতে চেয়ে পায় না। এ সবও না হয় কোন রকমে সহ্য ক'রে নিতে পারা যায়, কিন্তু দিন-রাত এই রকম চেঁচামেচি আমার ভাল লাগে না।"

"ভাল কারই বা লাগে বাবা! কিন্তু উপায় নেই। আপনার লোক ফেলতে ত পারি না। আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে—তোমাদের ত এ সব সহ্য করতে হয় না।"

"ওর যদি সব বিষয়ে এতই অসুবিধে, যে দিন-রাত বিরক্ত হয়ে থাকেন, তাহ'লে অন্য কোথাও গেলেই ত পারেন। উনি যা কাজ করেন, তার জন্য কি একটা লোক রাখলে চলে না? বেশ ত সংসার থেকে খরচ না উঠে, আমি-ই না হয় খরচ দেব!"

"ভারি ত কাজ, তার জন্যে আবার আলাদা একটা লোক! আর যেখানেই থাকুক, কাজ না করলে কে ওঁকে মাথায় ক'রে নাচবে?"

সৌদামিনী রান্না-ঘরে বসে ছিলেন দাঁতে দাঁত চেপে। কোথায় যাবেন? যাবার যায়গা তাঁর পৃথিবীতে যদি থাকত, তা হ'লে কি কেউ এরকম ক'রে অপমান করতে সাহস করে? সেদিন রাত্রে সব কাজ মিটলে সৌদামিনী যখন শুতে গেলেন, তখন বাড়ীতে বোধ হয় কেউ জেগে ছিল না। আস্তে আস্তে পুরাতন টিনের ট্রাঙ্কটা খুলে কি একটা বার করলেন। আলোর কাছে ধ'রে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। এ তার পঁচিশ বছর আগের একটা স্মৃতি। স্বামীর ছবি নয়, উপহার নয়—একখানা চিঠি। প্রথম চিঠি—শেষ চিঠিও বটে।

শুতে গিয়ে মনে পড়ল সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি— আর তার আগের দিন ছিল একাদশী। বাকগে! উপোস তাঁর গা-সওয়া হয়ে গেছে—একদিন না হয়ে না হয়, দুদিনই একাদশী হল।

* * *

দু'দিন বাড়ীটা যেন ঘুমিয়ে আছে। সৌদামিনী সেদিন রাত্রে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কার কথায় থাকবেন না। কি দরকার তাঁর। কাজ করবার কথা, কাজ ক'রে যাবেন। সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। এরকম প্রতিজ্ঞা মাসে প্রায় পঁচিশবার তাঁকে করতে দেখা যায়। তাঁকে অন্য কোথাও পাঠাবার জন্যে কারও বেশী মাথাব্যথা আর ছিল না এবং কোন লোক রাখবারও চেষ্টা হ'ল না। দিন যেমন আগেও চলছিল, এখনও তেমনি চলল—কেবল সৌদামিনী একেবারে চুপ।

বাড়ীর বৌদের মধ্যে কেহই তাঁকে বড় সহ্য করতে পারত না। কা'রও লোকের সামনে মাথার কাপড় খুলে যায়, কা'রও হাসি পাড়ার লোক শুনতে পায়, কা'রও সৌখীনতা বেশী, এ সব সকলের আগে তাঁরই নজরে পড়ত, আর তা নিয়ে বিদ্রূপ করতেও তিনি ছাড়তেন না। এতে তা'রা সন্তুষ্ট হয় কি ক'রে?

তার উপর যদি কেউ বউদের সঙ্গে দেখা করতে এল, যে কোন একটা কারণে তাঁর একবার সে ঘরে যাওয়া চাই। যারা বাইরে থেকে এসেছে, তাদের সঙ্গে ঠিক এ রকম করেন-নি বটে ; তবে তাদের উপরও সমান নজর ছিল।

রমেশের মা বাইরে থাকে, পশ্চিম দেশ,- সকলের সামনে তা'কে বা'র হ'তে হয়—বড় একটা কাউকে দেখে সে লজ্জায় জড়-সড় হয় না। জুতা তাকে পায়ে দিতে হয়। তার সামনে কিছু বলবার সাহস সৌদামিনীর হয় না, কিন্তু সে চ'লে গেলেই বাড়ীর অন্য বউদের জন্যে ভাবনায় তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়।

অনেক রাত্রে রমেশের মা ফিরল ভাইএর সঙ্গে বেড়িয়ে। ভাই এখানথেকে খেয়ে যাবে—তার জন্যে সৌদামিনী ব'সে ছিলেন। যেতে যেতে ভাইএর খাবার দেবার কথা রমেশের মা ব'লে গেলেন – কাউকে উদ্দেশ ক'রে নয়। সৌদামিনী ছাড়া আর কেউ যে ব'সে থাকবে না, তা তিনিও জানতেন। অনেকক্ষণ ব'সে থেকে থেকে সৌদামিনীর ঘুম পেয়েছিল—কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। খাবার দেবার কথা ব'লে গিয়ে ভাই-বোনে গল্প সুরু ক'রে দিয়েছিলেন। খাবার যে এ'ল না, সে খেয়াল ছিল না ; খেয়াল যখন হ'ল, তখন রাত অনেক হয়েছে। তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরে গিয়ে রমেশের মা যা দেখলেন, তাতে সন্তুষ্ট হওয়া তার পক্ষে সে সময় সম্ভব ছিল না। চেঁচিয়ে ডাকতেই সৌদামিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সামনে রমেশের মাকে দেখে প্রথম তিনি কিছু বুঝে উঠতে পারেন-নি, কিন্তু তার চোখের দিকে চেয়েই বেশ বুঝলেন, একটা ভয়ানক কিছু হয়েছে। কিছু জিজ্ঞাসা করবার মত সাহস তাঁ'র ছিল না। রমেশের মা ত কোন কথা না ব'লে বরাবর গিয়ে স্বামীকে ডেকে নিয়ে এলেন। বেচারা বিশেষ কিছু বুঝে উঠতে পারে নি—এক খাবার দেওয়া হয়নি ছাড়া—তাই বললেন, "ব্যাপার কি ?"

"বিশেষ কিছু না—ঘণ্টাকতক আগে ব'লে গিয়েছি দাদার খাবার দেবার কথা, খাবার তো দেওয়া হয়-নি বটেই, এসে দেখলাম নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।"

এতক্ষণে সৌদামিনী ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। অবশ্য তিনি জানতেন এ সময় কেউ তাঁর কথা শুনবে না, শুনলেও বিশ্বাস করবে না, তবুও চুপ ক'রে মেনে নিতে পারলেন না—বললেন, "কখন তুমি খাবার দেবার কথা বললে বৌমা ?"

"কি ? কখন বললাম ! স্বীকার করবে না তা জানি। একটা অন্যায় ঢাকতে দশটা মিথ্যে ব'লে, আর কানটা শুধু নষ্ট ক'র না..."

"দামিনী অমন তোমাদের মত মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত নয়—"

"যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ! আমায় বলে কি না মিথ্যেবাদী ! যাকে যা ইচ্ছে তাই ব'লে সাহস বেড়ে গিয়েছে, না ? তোমরা যদি আজই ওঁকে এখান থেকে না তাড়াও ত বাধ্য হয়ে আমাদের বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে।" শেষের কথা-গুলো বাড়ীর লোকের উদ্দেশে। ইতিমধ্যে সকলেই এসে হাজির হয়েছিলেন। বৌ-এর দাদা বললেন, "এত হাঙ্গাম তোমরা সহ্য কর কি ক'রে বুঝতে পারি না। আমাদের বাড়ী হ'লে ও পাপ অনেক আগেই বিদায় করতাম।" এ কথায় সৌদামিনীরও আত্মসম্মান আহত হ'ল। যার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, সে যা বলে তা না হয় সহ্য করা যায় ; কিন্তু ও কে ? ও অপমান করবে কি জন্যে ! একটিও কথা না ব'লে সৌদামিনী ঘর থেকে বা'র হয়ে গেলেন। বাইরের দরজা খোলা ছিল, সামনেই রাস্তা—জীবনে এই প্রথম সৌদামিনী একা রাস্তায় নামলেন। রাত তখন এগারটা।

ঝোঁকের মাথায় রাস্তায় নেমে এসে খেয়াল হ'ল, রাত অনেক হয়েছে, আর যাবার জায়গা তাঁর নাই। রাস্তায় লোক নাই, তবু চলতে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল—এ তো আর দেশ নয়, এ যে কলকাতা সহর। কোথায় যাওয়া যায় ? হঠাৎ মনে হ'ল ললিতার কথা। ছোটবেলাকার বন্ধু। সেদিন গঙ্গার ঘাটে দেখা হ'তে ঠিক চিনতে পেরেছিল। কত ক'রে যেতে বললে। আচ্ছা, এখন ত তার বাড়ী যাওয়া যাক, তারপর রেঙ্গুনে না রঙ্গোলে দাদা থাকেন, দাদাকে চিঠি লিখলেই হবে। নিয়ে যদি না-ই যান, কাশী যাবার খরচটা নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু ললিতার বাড়ীর ঠিকানা ত জানা নাই। কালীঘাটের মন্দিরের কাছেই বাড়ী, আর তারা ব্রাহ্মণ ; এই পর্য্যন্ত জানা আছে। না না, তার বড় ছেলের নাম ত তিনিই রেখেছিলেন। তারা বড়লোক ! সুনীল-

দের বাড়ী বললে নিশ্চয় লোকে ব'লে দিতে পারবে। কিন্তু কালীঘাট কোথায় ?—কতদূর ?

ছুটি ছেলে তাড়াতাড়ি আসছিল। সম্ভবতঃ "সিনেমা" দেখে। হোষ্টেলের ছাত্র, রাত হবে ব'লে ছুটী নিয়ে এসেছে ; কিন্তু ফেরবার সময়ও হয়ে এসেছে। সামনে একজন স্ত্রীলোক দেখে পাশ দিয়ে চলে যাবে ভাবছিল, হঠাৎ স্ত্রীলোকটী দাঁড়িয়ে যেতে তারাও থমকে দাঁড়াল। ছেলেমানুষ দেখে সৌদামিনী সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবারা, কালীঘাট যাব কোন্‌দিকে ?"

"কালীঘাট ? সে যে অনেক দূরে !"

"অনেক দূরে ? হেঁটে যেতে পারব না ?"

"তিনক্রোশ পথ হেঁটে যাবেন এখন, কেন 'বাসে' যান না কেন ?"

সৌদামিনী শুনেছিলেন কালীঘাট 'বাসে' যাওয়া যায়। মাঝে মাঝে, পাশ দিয়ে হুস হুস ক'রে বড় মটর-গাড়ী চ'লে যাচ্ছিল—ঐ কি কালীঘাট যায় না কি ? কিন্তু ওরা ত পয়সা নেয়, তাঁ'র কাছে পয়সা কৈ ? ছেলেদের মধ্যে একজন বুঝতে পেরেছিল। সে বললে, "আসুন, 'বাসে' তুলে দিচ্ছি।" বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কি মনে হ'ল, জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বাড়ী চেনেন ?"

"না, ঠিক চিনি না—"

"তবে ?"

"রাত্রে মন্দিরে থাকব, সকালে কাউকে দেখিয়ে দিতে বলব।"

ছেলেটী তার সঙ্গীকে বললে, "তুই হোষ্টেলে যা, আর সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বলিস্ ফিরতে আমার রাত হবে।" 'বাস' আসতে সে সৌদামিনীকে নিয়ে উঠল। কালীঘাটের কাছাকাছি এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিকানা কি বলুন ত ?"

"আমি ত ঠিকানা জানি না বাবা ! মন্দিরের কাছেই বাড়ী—সুনীলদের বাড়ী, তারা খুব বড়লোক।"

"আগে কখনও এসেছেন ?"

"না !"

"কি বিপদ !"

এই রাত্রে সুনীলদের বাড়ী ব'লে বাড়ী ঠিক করাও ত দায়। আচ্ছা, সে যদি না আসত, একা কি করতেন ?

কালীঘাটের মোড়ে এসে 'বাস' থামল, কাজেই সৌদামিনীকে নিয়ে ছেলেটীর নামতে হ'ল, কিন্তু কি যে করবে তা ঠিক ক'রে উঠতে পারেনি। রাত্রও অনেক হয়েছে, তা-না হ'লে না হয় পাণ্ডাদের কাছে খোঁজ নেওয়া যেত। মন্দিরের কাছেই থাকে—তারা বড়লোক—চেনা সম্ভব বৈ কি। মন্দিরের দিকেই চলল। ক'জন লোক একসঙ্গে ব'সে গল্প করছিল। অত রাত্রে ওদের দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিল। ছেলেটী কাছে এসে বললে, "বলতে পারেন সুনীলবাবুদের বাড়ী কোন্‌টা ?"

"তারা কি ? পদবী কি ?"—

"তারা ব্রাহ্মণ, পদবী ঠিক জানি না। খুব বড়লোক।"

"ঠিকানা জানা নেই ?" ছেলেটী মনে মনে বললে, তাহ'লে আর তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে যাব কেন ? কিন্তু তাদের চটাতে সাহস হ'ল না, বললে, "ঠিকানা ত জানা নাই, তবে মন্দিরের কাছেই থাকেন, শুনেছি।"

"বাড়ী চেনা নয় অথচ এত রাত্রে স্ত্রীলোক নিয়ে এসেছ ?" আর একজন তাকে বাধা দিয়ে বললে, "উকীলবাবুকে খুঁজছে না ত ? আচ্ছা, চলত, দেখা যাক্।"

সৌদামিনী এতক্ষণ কোন রকমে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকে চলে যেতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মন্দিরের কাছেই একটা বাড়ীতে এসে সেই লোকটী ডাকাডাকি সুরু ক'রে দিল। ছেলেটী ভাবছিল, সুনীলবাবু যদি চিনতে না পারেন কিংবা যদি বাড়ী ভুল হয়ে থাকে, তা'হ'লে সে কি করবে ! অনেক সম্ভব-অসম্ভব ভাবনা তার মাথায় এসে ভিড় করছিল। তার যত চেনা লোক কলকাতায় আছে সকলের কথা একবার ভেবে দেখলে। কেউ কি দু'এক দিন থাকতে দেবে না ? তার মধ্যে না হয় খুঁজে সুনীল বাবুদের বাড়ী ঠিক করা যাবে।

একটা চাকর এসে দরজা খুলে দিয়ে বললে, "বাবু উপরে চলে গিয়েছেন, কি দরকার বলুন।"

"বিশেষ দরকার, বাবুকে নীচে আসতে বল"।

চাকরটা কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কিছু বলবার আগেই যে ভদ্রলোকটী নীচে এলেন, তিনিই সুনীলবাবু। এত রাত্রে একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে দু'জন হাজির হয়েছে

দেখে তিনি খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। ছেলেটি জিগ্যেস করলে, আপনি সুনীলবাবু?”

“হাঁ, কেন বলুন ত?”

“ইনি আপনার বাড়ী খুঁজছিলেন” ব’লে সৌদামিনীর দিকে ফিরে চাইল।

“আমার বাড়ী? কি দরকার বলতে পারেন?”

তা ত বলতে পারি না—উনি কালীঘাট চিনতেন না, তাই সঙ্গে ক’রে নিয়ে এসেছি। সৌদামিনী ছেলেটীকে চুপি-চুপি বললেন, “ওকে জিগ্যেস কর, ওর দামিনী মাসীকে মনে আছে কি-না।” ছেলেটী জিগ্যেস করল, কিন্তু সুনীল বাবু অনেক ভেবেও কোন দামিনী মাসীর কথা মনে করতে পারলেন না। বললেন, “আপনাদের নিশ্চয় ভুল হয়েছে, এ বাড়ী নয়।” ছেলেটীর এখনকার অবস্থা ঠিক ব’লে বুঝান যায় না। কিন্তু সে এখানেই বেঁচে গেল। চাকর এসে বললে, “বাবু, মা বললেন, ওকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যান।” সৌদামিনী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর নিশ্চয় মনে হচ্ছিল সুনীল তাঁকে ভুলে গেছে। তারই বা অপরাধ কি? কতদিন দেখে-নি! কিন্তু ললিতা ত ঠিক সেদিন গঙ্গার ঘাটে চিনতে পেরেছিল। ও নিশ্চয় ভিতর থেকে সব শুনেছে। ছেলেটীকে বললেন, কি বলব বাবা, তুমি আজ আমার যা উপকার করলে, আপনার লোকও এত করে না। বেঁচে থাক বাবা, বাপ-মার মুখ উজ্জ্বল কর।

* * *

সৌদামিনীকে যে বাড়ীর ভিতর ডেকে পাঠিয়েছিল সে ললিতা নয়—সুনীলের স্ত্রী। ললিতার সঙ্গে দেখা হবে জেনে সৌদামিনী যতটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, একে দেখে ঠিক ততটা হতাশ হলেন। ভরসা ক’রে ত এসেছেন—তাঁর বরাতে কি ললিতাও এ সময় কলিকাতায় নেই? বাড়ী যে ভুল হলেও হ’তে পারে এ কথা তাঁর একবারও মনে হ’ল না। ছেলের নাম সুনীল, বড়লোক, মন্দিরের কাছে বাড়ী, এতে কি ক’রেই বা তাঁর সন্দেহ হয়? সৌদামিনী বৌটিকে জিগ্যেস করলেন, “মা, তোমার শাশুড়ী কৈ?”

“শাশুড়ী? ও, তিনি ত এখানে নাই। আপনার কি আসবার ঠিক ছিল?”

“না মা,—আর কোথাও যাবার জায়গা নাই, তাই তোমাদের কাছে এলাম। ভাগ্যি সেদিন তার সঙ্গে গঙ্গায় দেখা হয়েছিল। তুমি ত মা আমায় কখন দেখ-নি, চিনবে কি ক’রে? সুনীল দেখেনি কত দিন!”

“আচ্ছা, আপনি এত রাত্রে আসছেন কোথা থেকে?”

“যমের বাড়ী থেকে মা, যমের বাড়ী থেকে—” কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ’ল, “বালাই ষাট, সেখানে যে অজু আছে।”

বৌটি দেখল, কথাটা ব’লে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল; আর কিছু এখনি জিগ্যেস করবে কিনা ঠিক ক’রে উঠতে পারল না। সৌদামিনী বললেন, “তোমাদের বাড়ী যখন এসেছি মা, ক’টাদিন এখানেই মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। কালই দাদাকে একটা চিঠি লিখে দিতে বলব। আচ্ছা, মা রেঙ্গুণ থেকে চিঠির জবাব আসতে কদিন লাগে?”

রেঙ্গুণে আপনার দাদা থাকেন? এখানে আপনি কার কাছে ছিলেন? শ্বশুরবাড়ীর কারও কাছে বুঝি?”

“জগৎ শত্তুর মা আর কি! ঝি-কে কি, বামনী-কে বামনী হয়েও মা মন পাই-নি। গতরকে গতর বলি-নি মা, ভোরথেকে সেই রাত তিনফোর অবধি খেটেছি তবুও গাল খেয়েছি! কেন? এত কি? সত্যি কি আর একটা মানুষের খরচা ক’টা টাকা দাদা দেবেনা। শ্বশুরকুলের অপমান তাই মা যাই নি—” সুনীলকে ভেতরে আসতে দেখে তিনি চুপ করলেন। সে কি বলতে যাচ্ছিল, বৌটি ইসারায় তাকে বারণ ক’রে উঠে গেল।

সুনীল বললে, “ব্যাপার কি লতা? চেনা নেই শুনো নেই বাড়ীতে ডেকে পাঠালে যে?”

“মেয়েমানুষ ত! না-ই বা হ’ল চেনা—আর বয়েসও হয়েছে।”

“তারপর, এতক্ষণে কিছু জানতে পারলে? হঠাৎ এত রাত্রে আমার বাড়ী কেন?”

“নাম ভুল হয় নি, কিন্তু বাড়ী ভুল হয়েছে। যা বুঝলাম তাতে মনে হয়—যা হয়ে থাকে তাই। বিধবালোক, কেউ নাই, জ্ঞাতির বাড়ী বিনা-মাইনের চাকরী করতেন—বেশী কিছু বলেছে তাই বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছেন।”

“তা বেশ করেছেন, কিন্তু কি করা যাবে?”

“করা আবার কি যাবে? একটা বিধবা মানুষ বৈ ত নয়! যতদিন থাকেন থাকুনই না কেন?”

“তা কি হয়? অনেক বিপদ আছে ওতে। এমন কি তারা ‘কেস’ করতে পারে।”

ঐ ত! ওকালতি বিদ্যে সুরু করলে! বাড়ী থেকে তাড়িয়ে বেঁচেছে—‘কেস’ করবার জন্যে ত তাদের ঘুম হচ্ছে না। হ্যাঁ, দেখ, উনি তোমাকে ওর সেই চেনালোকটি ব’লেই ভেবেছেন—তোমাকে সেই ভাবেই থাকতে হবে। মা’র খোঁজ করছিলেন—বলেছি এখানে নাই।”

“তুমি দেখছি একটা হাঙ্গাম বাঁধাবে।”

“বাঁধে বাঁধুক, তা ব’লে ত আর এই রাত্রে তাড়িয়ে দিতে পারি না।”

“আমি যেন তাই বলেছি!”

বেশ, তবে শুতে যাও, আমি ওঁর থাকবার একটা যোগাড় ক’রে দিই গে।

* * *

সৌদামিনীর যখন ঘুম ভাঙল তখনও বাড়ীর আর কেউ ওঠেনি। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খেয়াল হ'ল। বারান্দায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। লতা এখনও উঠেনি। সৌদামিনীর খুব অদ্ভুত লাগছিল। করবার মত কিছু নাই, সব কিছু অচেনা। স্নান করতে যাবারও উপায় নাই। একখানা কাপড়ও সম্বল নাই যে। এ ক'দিন কাটবে কি ক'রে? এই ত সংসার! কি-ই বা তা'র কাজ, তারও আবার ঝি-চাকর আছে। ললিতা কোথায় গেছে, কবে আসবে কিছুই ত জানা হয় নি।...

লতা এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কতক্ষণ উঠেছেন?"

"এই একটু আগে।"

"রাত্রে ঘুম হয়েছিল ত? অচেনা যায়গা!"

"আমার আবার চেনা-অচেনা—থাকবারই যা'র স্থান নেই—"

"এ সব কেন ভাবছেন! এ আপনারই ঘর-বাড়ী মনে করুন না।"

"তোমার নাম কি মা?"

"লতা—বনলতা, লোকে লতা বলে—"

"ও মা, সে কি? লতা, লতা ক'রে ডাকা যায় না-কি? তার চেয়ে আমি বৌমা-ই বলব, কি বল?"

"তাই বলবেন, চলুন স্নান ক'রে আসবেন।"

"তা যাচ্ছি! হাঁ মা, তোমার ছেলে-মেয়েরা কৈ?"

লতা মাথা নীচু ক'রে আছে দেখে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "হয় নি?"

লতা মাথা নেড়ে জানালে, "হাঁ, হয়েছিল"।

"কবে?" বলেই বুঝতে পারলেন। সৌদামিনীর চোখেও জল! লতা বললে, "চলুন বেলা হয়ে গেল।"

* * *

সৌদামিনীকে লতার বেশ লাগছিল। কেমন লোক! অচেনা ব'লে মনেই হয় না। একটু বেশী কথা বলেন, তা হ'ক! কথা বলার লোকের অভাবে ত সে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল। লতা ঠিক করেছিল কিছুদিন বাদে যখন সৌদামিনীর বেশ মায়া পড়ে যাবে, তখন ওর ভুলটা না হয় ভেঙে দিবে। একদিন তা করতেই হবে; ললিতাকে সে খুঁজে পাবে কোথায়? পাড়ায় খোঁজ করার কোন ফল হয় নি, রেঙ্গুণের চিঠিরও জবাব আসেনি। রজৌলেও চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তারও জবাব নাই। চিঠি হয় ত যায়ই নি—ভাল ক'রে ঠিকানাই জানা নাই। যাদের বাড়ী ছিলেন তারা কিন্তু খুব লোক! সত্যিই খোঁজ করলে না।

* * *

প্রথম ক'দিন সৌদামিনীর বেশ কাটল, তারপর আর দিন কাটতে চায় না। কাজ থাকলেও বা যা হ'ক হ'ত; কিন্তু সারাদিন কাজ না থাকায় কেবল মনে আসে ক'দিন আগেকার কথা, আর সবচেয়ে বেশী ক'রে সেই মুখটা—যার মা তাকে কার চেয়ে কম অপমান করেনি। লতা ক'দিনই লক্ষ্য করছিল সৌদামিনীর পরিবর্ত্তন, জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার মন কেমন করছে—না? তা ত করবারই কথা। এতদিন একসঙ্গে ছিলেন।"

"আর কা'র জন্যে নয় মা, ঐ ছেলেটার জন্যে।"—এ ক'দিনে সে বাড়ীর কা'র পরিচয় পেতে লতার বাকী ছিল না।

আরও ক'দিন কাটল, কিন্তু সৌদামিনীর ক্রমশঃই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। শেষে একদিন বললেন, "বৌমা, আমায় একবার সেখানে পাঠিয়ে দাও, ছেলেটাকে অনেকদিন দেখিনি। একটিবার দেখেই চলে আসব।"

"যেতে চান অবশ্য তার যোগাড় ক'রে দিচ্ছি কিন্তু—"

একটিবার যাব মা—ছেলেটাকে দেখেই চলে আসব। সেখানে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না মা।" ছেলেটা বড্ড আজেরে, বুঝলে না বৌমা। আমার সামনে না বসলে তার খাওয়াই হয় না। না হোক্ গে, আমি ভাবি কেন! তবে কি জান, একবার দেখতে ইচ্ছে হয় বৈকি!

লতা হেসে বল্লে, তা আবার হয় না?

* * * *

সৌদামিনীকে দেখে বড়-বৌ বললেন, "কি গো সখ মিটল! বেড়িয়ে এলে? জায়গা সকলেই এমন দেয়। শেষ পর্য্যন্ত এই দোরেই।—"

"আমি আজকে দেখতে এসেছি।"

"তাই নাকি? দোরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে তো?"—গাড়ী সত্যিই দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু সৌদামিনীর যাওয়া হ'ল না; অজয়ের জ্বর হয়েছে, কি ক'রে যাবেন। গাড়ী ফেরৎ গেল।

লতা শুনে একটু হাসল।

* * * *

সৌদামিনী আগের মতই রোজ সকালে উঠেই রান্নাঘরে যান, আর রাত একটায় ছুটী পান।
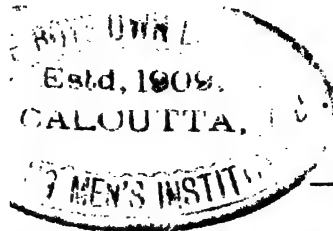
সহযাত্রিণী

—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

সেবার কালীপূজার ছুটীর সঙ্গে আরো তিন দিন জড়িয়ে একবারে পাঁচ দিনের ছুটী পাওয়া গেল। দেওঘরে কয়েকজন আত্মীয় ছিলেন, ভাবলাম ছুটীর কটা দিন সেখানে বেড়িয়ে আসি। তখনও পূজা-কনসেশনের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে, থার্ডক্লাসে গেলে খুব কম পয়সাতেই দেওঘর বেড়ানো হয়ে যাবে। মনে করলাম পূজার হুজুগ তো কেটে গেছে, এখন আর গাড়ীতে তেমন ভিড় হবে না। আর সঙ্গে স্ত্রী পরিবার কি চেনাশোনা লোক থাকলে থার্ডক্লাসে উঠতে দ্বিধা হতে পারে, কিন্তু একা একা থার্ড ক্লাসেই ভাল, কেই বা দেখতে যাচ্ছে। সাত পাঁচ ভেবে বিকেলের বেনারস এক্সপ্রেসে যাওয়া সাব্যস্ত করে থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে ফেললাম। হাওড়ার প্ল্যাটফরমে গিয়ে দেখি গাড়ীতে বেজায় ভিড়, অত বড় গাড়ীখানাতে কোথাও একটু জায়গা খালি নেই। অধিকাংশই কাশীর যাত্রী, এ সময় যে অন্নকোট দেখতে যাবার ভিড় হয় সে কথা আগে মনে হয় নি। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে একখানি গাড়ীতে দেখলাম অধিকাংশই বাঙ্গালী ভদ্রলোক, পশ্চিমদেশবাসী যাত্রী নেই বলিলেই হয়, সঙ্গে কাচ্চা বাচ্চা এবং দুচারটি স্ত্রীলোকও আছে। পশ্চিমা লোকের ভিড়ের মধ্যে ঠেসাঠেসি করার চেয়ে বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের মধ্যে নিষ্পেষিত হওয়া ঢের ভাল বিবেচনা করে সেই গাড়ীতেই উঠে পড়লাম। প্যান্ট-কোটধারী দুটি যুবক দরজার কাছে বাধা দিয়ে হাঁ হাঁ করে উঠলেন—"মশাই দাঁড়াবারও জায়গা নেই।" সে কথায় কর্ণপাত না করে ভিতরে ঢুকে বলিলাম—"মশাইরা অনুগ্রহ করলে দাঁড়াবার কেন বসবারও জায়গা হবে, আবার গাড়ী ছাড়লে দেখবেন শোবারও জায়গা হয়ে যাবে।"

বসবার একটু জায়গা করতে পারি কিনা ভেবে এদিক-ওদিক চাইতেই দেখলাম ওপাশের দরজার কাছে বসে একটি মেয়ে আমার দিকে চেয়ে ভারী খুসী হয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। বুঝলাম আমার কথা শুনে খুব কৌতুক অনুভব করেছে। কিন্তু মেয়েটি দেখেই আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। নিতান্ত সাধারণ মেয়ে তো নয়, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত চেহারা! দেখলেই মনে হয় ভাল ঘরের মেয়ে, মুখের ভাবে বেশ কমনীয়তা আছে, দৃষ্টিতে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, মোটামুটি বিচারে সুন্দরীও বলা যায়; বেশভূষাও বেশ সভ্যভব্য। ভদ্রনারীর অঙ্গের মধ্যে দেখা যায় কেবল মুখ আর হাত, তাই দেখেই দ্রষ্টার মনে মনে সুন্দর অসুন্দরের বিচার হয়। আর এক কথা সব মুখে হাসি মানায় না, বিশেষতঃ অপরিচিত মুখে অযথা হাসি প্রায়ই বেমানান লাগে। কিন্তু এই মেয়েটির সস্মিত সপ্রতিভ ভাব মুখের সঙ্গে বেশ মানিয়েছিল—প্রথম দৃষ্টিতেই আমার মন বিমুখ হয় নি, সুন্দরী বলতে আমি এই কথাটাই বুঝাতে চেয়েছি।

তার না জানি আদি না জানি অন্ত, ট্রেণের মধ্যে বসে কয়েকঘণ্টা ধরে একটা ছবি দেখলাম। গল্প করবার মত জিনিষ হতে পারে, কিন্তু গল্প বানাবার মত কিছুই এতে নেই। বিধাতার প্রেক্ষাগৃহে হঠাৎ এই ছবিখানা নজরে পড়ে গেল, কোন্ তুলিতে আঁকা, কোন্ ফ্রেমে বাঁধা দেখতে দেখতে—সে সব কথা আর মনে হ'ল না। চেহারাটা ছিল দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত, অথচ এসে পড়েছিল এক থার্ডক্লাসের আবেষ্টনের মধ্যে, তাই প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমে দেখলাম যুবতী এবং সুন্দরী, এবং দর্শনযোগ্যা। পরে খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে আমার দৃষ্টি খুলে যেতে লাগল, প্রথমে যে ছবি দেখেছিলাম এ সে ছবি নয়, দেখলাম এ আর এক ছবি। বয়স প্রথমে দেখলাম কম, পরে জানা গেল অনেক বেশী। ভিতরেও দেখলাম অনেক জিনিষ। ভাল একখানি ছবি দেখলে মানুষের এই রকমই হয়। প্রথমে মনে হয় চমৎকার, তারপর দেখতে দেখতে যখন তার সত্তাটা ধীরে ধীরে ফু'টে ওঠে তখন মনে হয় আর এক রকমের চমৎকার। প্রথমে মনে হয় সাধারণ, তারপর মনে হয় অনন্যসাধারণ। অনেক সাধারণের মধ্যেই অনন্যসাধারণ আছে, প্রথমে চমক লাগাতে পারে না বলে আমাদের দেখবার সে দৃষ্টি খোলে না। সম্মুখের বেঞ্চিটাতে এক ভদ্রলোক পা মুড়ে একটু আরাম করে বসেছিলেন, তাঁকে পা নামিয়ে বসতে বলে একটু জায়গা করে সেইখানেই বসে পড়লাম।

বসবার জায়গা করে নিলাম দেখে মেয়েটি আবার হাসছে।

লাগলেন, অর্থাৎ যা বলেছি তাই তো করলাম! সব বিষয়েই তিনি দেখি হাসছেন, কৌতুকের অন্ত নেই। গাড়ীতে যতই ভিড় বাড়ছে, লোকে স্থান করে নেবার জন্ম রকমারি বচসা করছে, ততই তাঁর আমোদ বেড়ে যাচ্ছে। সর্ব্বদাই যেন চঞ্চল এবং কৌতুহলী, সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি আছে, সকলের কথাই শুনছেন এবং উপভোগ করছেন। গাড়ীতে যে ভিড় বেড়ে যাচ্ছে তাতে তিনি বিরক্ত বোধ করছেন না, কত লোক তাঁর গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে তাতেও যেন তাঁর মজা লাগছে। এ রকম অবস্থায় কোনো ভদ্রমহিলাই বোধ হয় বিরক্ত না হয়ে পারেন না, কিন্তু তাই যেন এঁর ভাল লাগছে।

কাশীযাত্রী একদল বিধবা গাড়ীতে এসে উঠল। প্যাণ্টধারী ভদ্রলোকরাও তাদের ঠেকাতে পারলেন না, কিন্তু গাড়ীতে আর তিলধারণের স্থান রইল না। তাঁরা বেছে বেছে এঁরই পায়ের কাছে পুঁটুলি পোঁট্‌লা রক্ষা করলেন, এবং তারই উপর চেপে বসলেন। যাতায়াতের পথ তো বন্ধই হল কিন্তু তাতেও কুলোয় না, একটি বর্ষীয়সী বিধবা নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঐ মেয়েটি বেঞ্চির শেষপ্রান্তে যথা সম্ভব সরে এসে দরজার দিকে ঘুরে বসলেন, বর্ষীয়সীকে বললেন, "এইখানেই কোনো রকমে বসে পড়ুন।" পাশের বেঞ্চির ধারের গোড়ায় একটি যুবক বসেছিল, পরে জানলাম সে ওঁর ভাসুর-পো, ওঁর দিকে সে ঘুরে বসল, দুজনে মুখোমুখি বসে আলাপ করতে লাগলেন। আমারও ধীরে সুস্থে পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ হলো।

মেয়েটির বয়স হয়েছে। কত বয়স তা ধরা যায় না, কারণ বেশী বয়সের কোনো ছায়া পড়ে-নি, মনেও না, শরীরেও না, পরিচ্ছদেও না। যুবতীসুলভ লাস্য নেই, কিন্তু যৌবনোচিত চাঞ্চল্য আছে; অঙ্গভঙ্গীতে অতিরিক্ততা নেই কিন্তু দৃষ্টিতে নবীনতা আছে; জোয়ার নেই কিন্তু ভাঁটাও পড়ে নি। মুখখানি এখনও পেকে যায়-নি, বয়সের শিথিলতার কোন দাগ ধরে নি, কচি কচি ছেলেমানুষীর মত ভাব এখনও দেখা যায়। হাত দুখানি নিটোল গোল, চুড়িগুলি তাতে বেশ মানিয়েছে, ঢল ঢল করছে না। চোখে আছে রিম্‌লেস সোনার চশমা আর কপালে আছে সিঁদুরের টিপ, অজান্তে ঘষে গিয়ে সিঁদুরটা এদিক-ওদিক একটু মাখামাখি হয়ে গেছে; সিঁদুরে আর সোনার চশমায় মুখের অনতি-গৌরবর্ণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পরণে ফুলপাড় সাদা সাড়ী, সোজাসুজি ঘুরিয়ে পরা, আধুনিক কুঁচি-দেওয়া ঘাঘরা ষ্টাইল নয়; মাথায় আধঘোমটা কাপড় দেওয়া কিন্তু সেফ্‌টিপিন্ দিয়ে আঁটা নয়। পায়ে জরির কাজ-করা লাল মখমলের নাগরা। কোলের উপর একখানি আস্‌মানি রংয়ের শাল পাট করে পাতা, তার উপর একটি পানের বড় কৌটা, আর একটি জরদার ছোট কৌটা এক হাত দিয়ে ধরা আছে। কথা বলছেন আর মধ্যে মধ্যে দুটি করে পান এক সঙ্গে মুখে পুরছেন, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা জরদা। বয়স কত বলা বড় কঠিন।

সুখী মেয়ে। কথাবার্ত্তা শুনলেই তা বোঝা যায়। অনেক মেয়ে আছে বড় বাজে বকে, শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু সংসারের সুখে যারা তন্ময় তারা যখন সংসারের খুঁটিনাটি কথা আস্বাদ দিয়ে দিয়ে বলতে থাকে এবং বলতে বলতে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে, তখন সে সব সত্য কথা শুনতে ভারী মিষ্ট লাগে। হয়তো তাতে তাদের অনেক সঙ্কীর্ণতা বা স্বার্থপরতা বেরিয়ে পড়ে কিন্তু তাই যেন আরো ভাল লাগে। যদি কেউ মনে করেন যে চেহারা দেখে তাঁর কথায় আমার মোহ লেগেছে তা হলে ভুল করা হবে। সুখের একটা কোন আকর্ষণ আছে, সুখীলোকের কথা শুনতে সকলেই ভালবাসে। আমি না হয় পর, কিন্তু যে যুবকটি তাঁকে কাকীমা সম্বোধন করছে এবং যাকে তিনি "তুই" সম্বোধনে কথা বলছেন, সে অতি নিকট আত্মীয় হয়েও এই সব বাজে কথা ও জানা কথা আগ্রহসহকারেই শুনছে, একটুও বিরক্ত হচ্ছে না। তিনি বেশীর ভাগ বক্তা এবং যুবকটি তাঁর শ্রোতা। আজকালকার যুবক নিজের কাকীর কাছে বসে বসে সংসারের সব তুচ্ছ কথা অম্লানবদনে শুনে যেতে থাকে এবং তাতে যোগদান করতে থাকে, এ কি কেউ খুব বেশী দেখেছে? কথাবার্ত্তায় পাশের বিধবাটিও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন। হতেই হবে, একে মেয়েমানুষ কৌতুহলী, তাতে এমন লোভনীয় আকর্ষণ। কতক্ষণ চুপ করে থাকবে?

"ও ছেলেটি তোমার কে বাছা?"

"ও মা আমার ভাসুরপো হয়।"

"তোমার নিজের ছেলেপুলে কি বাছা?" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, মেয়েটির পার্থিব জ্ঞাতব্য পরিচয় যা কিছু থাকা সম্ভব একে একে এই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা সমস্তই আবিষ্কার হয়ে গেল। আমি উৎকর্ণ হয়ে সমস্তই শুনলাম, সুতরাং আমারও কৌতূহল নিবৃত্ত হ'ল। এঁর দুই ছেলে আর দুই মেয়ে। এক ছেলে কলেজে আর এক ছেলে স্কুলে পড়ে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে, ছোট মেয়েটি এখন দিদির কাছেই আছে। স্বামী থাকেন পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে, কোন এক ব্যবসাদার কোম্পানীর বড় এজেন্টের কাজ করেন। শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী, সকলেই ঐ কোম্পানীতে ভিন্ন ভিন্ন চাকরীতে নিযুক্ত। যৌথ পরিবার, ভবানীপুরে বাড়ী, জাতি কায়স্থ। শ্বশুর এখন পেন্সন নিয়ে কয়েকমাস থেকে মধুপুরে আছেন, ভাসুরও পূজার সময় থেকে সস্ত্রীক সেখানে গেছেন। বড় ছেলেটিও ছুটীতে সেখানে গেছে, ছোট ছেলে আছে বাপের কাছে। কলিকাতার সংসার দেখাশোনার জন্য ইনি পূজার সময় বিক্রমপুর থেকে এসেছেন। ভাসুরপো কয়েক দিনের ছুটি পেয়ে মধুপুর যাচ্ছে, ইনিও তার সঙ্গে যাচ্ছেন শ্বশুরের কাছে। পাশের মেয়েটিকে শেষে ভরসা দিলেন যে, মধুপুরে নেমে গেলেই তাঁর ভাল করে বসবার জায়গা হবে।

"মধুপুরে তোমার শ্বশুর থাকেন, তাঁর নামটি কি বলতো?"

"সে কি মা, শ্বশুরের নাম করব কি করে? আপনি হিন্দু হয়ে এমন কথা বলেন?"

"তা নয় মা, আমরা মধুপুরে অনেক দিন ছিলাম কি না, নাম করলে হয়তো চিনতে পারতাম। তোমার পায়ে জুতো-টুতো রয়েছে কি না, নামটাম করতে আজকাল তো আর বাধে না!"

ইতিমধ্যে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। পরিচয়াদি শেষ করে তিনি আবার ঘুরে বসেছেন, ভাসুরপোর সঙ্গে নানারকমের গল্প জুড়ে দিয়েছেন। কথার আর বিরাম নেই। গাড়ী দ্রুতবেগে চলেছে, হাওয়া লেগে মাথার কাপড়খানা বার বার খুলে পড়ে যাচ্ছে, বার বার সেটাকে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে থাকছেন, আবার অন্যমনস্কে ছেড়ে দিচ্ছেন, আবার সেটা উড়ে যাচ্ছে কখনো সেটা হাত দিয়ে চেপে ধরছেন, কখনো ঘাড় কাৎ করে চিবুক দিয়ে চেপে ধরছেন, কখনো ব্লাউজের মধ্যে গুঁজে দিচ্ছেন, আর কখনো বা চাবির রিং বাঁধা আঁচলের প্রান্তটা গলা বেড়ে জড়িয়ে দিচ্ছেন, চুলগুলো উড়ে উড়ে চোখের উপর এসে পড়ছে—আঙুল দিয়ে সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছেন। আমি এই সব লক্ষ্য করে দেখছি; বেশ দেখতে পাচ্ছি, যা কিছু করছেন সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে, মনটা কথার মধ্যেই নিবিষ্ট হয়ে আছে। কথায় তিনি এমনি বিভোর হয়ে আছেন যে, আমি যে তাঁকে লক্ষ্য করছি তা তিনি জানেন না। পাশের বিধবাটি কিন্তু সব শুনছেন আর আমি যে তা লক্ষ্য করছি তাও দেখছেন।

অধিকক্ষণ চাইতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল। এমনি ভাবে চেয়ে থাকা ভাল দেখায় না, কে কি ভাববে! 'পত্রিকা' খানা খুলে মধ্যে মধ্যে পড়ি, আবার মধ্যে মধ্যে জানলার বাইরে চেয়ে ধানক্ষেত নিরীক্ষণ করি, আর উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম তাঁর যত কথা, কাহিনী ও মন্তব্য। ভাসুরপোটি মধ্যে মধ্যে জবাব দিচ্ছিল, কিন্তু আমি সে সব মন দিয়ে শুনছিলাম না, শুনছিলাম কেবল তারই উক্তি।

"বাঁচলাম বাবা, এতক্ষণে গাড়ীখানা ছাড়ল। যা হোক করে মধুপুরটা তো পৌঁছে যাব,—এত ভিড় নিয়ে গাড়ী যে আর চলবে তা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এত লোকও পুণ্যি করতে যায়!···ই-বি-আর-এর গাড়ীতে বেঞ্চিগুলো বেশ ফাঁক ফাঁক, মাঝে তবু খানিকটা জায়গা থাকে, এ লাইনের গাড়ীগুলো যেন কি রকম! শ্রীরামপুরের কাছে আমাদের যখন মামার বাড়ী ছিল, সেই সময় ওএকবার এদিককার গাড়ীতে চড়েছি, তার পর থেকে হাওড়ায় এসে কখনো গাড়ী চড়িনি। কেবলই সেই শেয়ালদা আর শেয়ালদা।···ওরে কানু, সন্দেশগুলো বুঝি ঐ পুঁটলির মধ্যে বেঁধেছিস? সর্ব্বনাশ, মধুপুরে নেমেই খুলে ওটা হাতে করে নিবি। নইলে দিদি ও কাউকে খেতে দেবে না। বলবে তোর কাকীমা ম্লেচ্ছপনা করে পাঁচজাতের ছোঁয়াছুঁয়ি করে এনেছে। সব সময় সাবধান হতে পারি না বলেই তো তোর মা আমার উপর রেগে যায়।···এই কয়েক দিনের মত এক রকম তো সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে এলাম, কি সব করবে কে জানে! ছেলেগুলোর তো ছুটী, সময়ে খেতে পাবে কিনা জানি না। সেজদির কাল দ্বাদশীর পারণের জন্যে ফল মিষ্টি কিনে রেখে এলাম, কিছু পয়সাও তাঁর হাতে দিয়ে এসেছি, সব জিনিষ তাঁর জুগিয়ে দিলেও নগদ পয়সা রোজ তাঁর চাই, নইলেই

অনর্থ করবেন। দিদি এই অভ্যাসটি করেছেন। বিধবা মানুষের এত পয়সার কি দরকার জানি না বাপু। ...শরৎ বেচারার তো রীতিমত থাইসিস্ হয়েছে। শুনলাম নিউমোথোরাক্স না কি করা হচ্ছে। এমন করে তার কয়েকটা দিন বেঁচে থেকে কেবল কষ্ট পাওয়া বই তো নয়। বাবা, কি কাণ্ড করেই বিয়েটা করলে দেখলি তো? পাশ-করা মেয়ে না হলে কিছুতে বিয়ে করবে না। খুঁজে খুঁজে শেষকালে ঐ অলক্ষণে মেয়েটা ঘরে আনলে। আই-এ পাশ করলে কি হবে, আচার-ব্যবহার কি রকম দেখেছিস তো? চেহারারও শ্রীছাঁদ নেই, কাজেরও কোন শ্রীছাঁদ নেই। লেখাপড়া শিখলে কি মানুষ ঐ রকম হয়ে যায়? ছেলেটা মরতে বসেছে তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই, নিজের চালেই আছে। বেশী বয়সে বিয়ে হলে বোধ হয় ঐ রকম অদ্ভুত ধরণের হয়।...

...আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন কিছুই জ্ঞান হয় নি। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে থেকে যে শিক্ষা পেলাম সেটা সেই সংসারকেই চালাবার শিক্ষা। ওদের তো আর তা নয়! বেশী বয়স পর্য্যন্ত কেবল লেখাপড়াই শিখেছে, সংসার শেখে নি। দেখছি তো কতই সব, লেখাপড়া শেখাও দরকার নিশ্চয়, কিন্তু ঐ ম্যাট্রিক্ পর্য্যন্তই ভাল, গেরস্ত-ঘরের মেয়েকে তার বেশী পড়তে দিতে নেই। বিলেতের দেখেই তো আমরা শিখেছি, কিন্তু তারা তো কৈ আমাদের মত আগে কতকগুলো পাশ করে নিয়ে তারপর বিয়ে করে না! অনেক ভাল ভাল সাহেবের মেমদের জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, তারা কেউ বেশী কিছু পাশ করে নি, সকলেই কাজ চলাবার মত খানিকটা পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখে নেয়। ... ... হাঁরে কানু, টিফিন-কেরিয়ারটা রাখলি কোথা বল তো? ওমা, ঐ পায়ের তলায় গুঁজে রেখেছিস, এখনি কার পা লেগে উল্টে পড়ে যাবে, তুলে রাখ বাবা, তুলে রাখ।"

কানু দাঁড়িয়ে উঠে বাক্সের উপর কোনো রকমে সেটা সেখানে তুলে রাখলে, তারপর চলল বাথরুমের দিকে। যাবার কোনো পথ নেই, মেয়েরা সারি সারি পুঁটুলি পেতে বসে আছে। কোনোরকমে তাদের গায়ের উপর দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছিল।

"ওরে সাবধানে যা, লোকের শাপমন্নি কুড়োস্ নে বাবা। ওঁরা সব বিধবা মানুষ, একাদশীর দিন উপোস করে রয়েছেন, কারও গায়ে যেন পা-টা লাগেনা বাবা।"

"আহা যেতে দাও না বাছা, ওতো ছেলের মত, ওকে কি কেউ শাপমন্নি দেয়?"

"যাও, বাবা যাও।"

গাড়ী শ্রীরামপুর এসে দাঁড়াল। এখানেও ভিড় কম নয়। প্ল্যাটফরমে অনেক যাত্রী ছুটোছুটি করছে, কোনো গাড়ীতে ঢুকতে পারছে না। আমাদের গাড়ীর কাছে এক একটা দল ভিড় করে আসছে, গাড়ীর অবস্থা দেখছে আর তাড়া খেয়ে সরে পড়ছে। একটি ছেলে এক বুড়োর হাত ধরে দরজার কাছে এসে হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করতে লাগল—"আমার এই বুড়ো বাপটিকে দয়া করে একটু জায়গা দিন, নইলে ওঁর আজ আর যাওয়া হবে না। আমি অন্য গাড়ীতে যাচ্ছি, কেবল এঁকে একটু উঠতে দিন।"

মেয়েটি তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে দরজা ছেড়ে দিচ্ছিল, ভাসুর-পো ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলে। বেচারা অগত্যা অন্যদিকে চলে গেল। মেয়েটি জানলা দিয়ে ঝুঁকে অনেকক্ষণ উঁকি মেরে দেখতে লাগল ওরা উঠতে পারে কিনা। কিছুক্ষণ পরে ফিরে বসে খুসী হয়ে বললে,—"যাক্, লোকটি উঠে পড়েছে।" ভাসুরপো বললে—"তোমার যেমন কাণ্ড, সকলকেই দয়া করে জায়গা ছেড়ে দিই আর নিজেরা গাড়ী থেকে নেমে যাই আর কি!"

গাড়ী ছাড়তে না ছাড়তেই আবার শেওড়াফুলি। সেখানে তেমন ভিড় নেই, কিন্তু কি জানি কেন গাড়ী সেখানে একটু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটি বাইরে চেয়ে চেয়ে দেখছে আর কথা বলছে।

"এদিককার প্ল্যাটফর্ম্মগুলো কত নীচু! চার পাঁচটা ধাপ নামলে তবে জমি পাওয়া যায়। এই রকম ষ্টেশনে নামতে হলেই তো একেবারে হয়েছে। হনুমানের মত লম্ফ দেওয়া প্র্যাক্‌টিস্ করতে হয়! (মেয়েটি যে ক'টি ইংরেজী কথা ব্যবহার করেছে তার একটিরও উচ্চারণ বিকৃত নয়। 'ষ্টেশন' কথাটাকেও 'ইষ্টিশান' বলে নি।) ... ... ওরে কানু, দেখ দেখ গার্ড সাহেবের বপুটি একবার দেখ। যত বড় গাড়ী তার তত বড় গার্ড হওয়া চাই তো! বেছে বেছে এমন মোটা গার্ডগুলো পায় কোথা?"

চন্দননগর এল। এখানে এক কাণ্ড ঘটল। একটি ভদ্রলোক কিছু অস্বাভাবিক রকমের দেখা গেল। এক একজন লোক থাকে, যেখানে কিছু বাধা দেখে সেখানেই তাদের জিদ্ চেপে যায়, এ লোকটি সেই ধরণের। যেমনি দেখলে এক দিকে স্ত্রীলোক আর একদিকে এক বলিষ্ঠ যুবক দরজা আগ্‌লে আছে, দরজা খোলা যাবে না,—তখনি সে বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা না করে একেবারে জানালা দিয়ে পা গলিয়ে ঢুকে পড়ল। এমনি জোর জবরদস্তি করাতে অসাবধানে মেয়েটির গায়ে বেশ ধাক্কা লাগল। ভাসুরপোটি লাফিয়ে উঠে তার ঘাড় ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে—'আপনি কি রকম ভদ্রলোক মশাই?' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু লোকটির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজে ঢুকে পড়েছে, এবার সঙ্গের স্ত্রীলোকটিকে ঢোকাতে হবে। নির্য্যাতিত হতে হতেই সে দরজা খুলে সঙ্গের মেয়েটিকে ঢুকিয়ে নিলে। তারপরে লেগে গেল ঝগড়া। ভাসুরপো বললে "আপনি স্ত্রীলোকের গায়ে ধাক্কা দেন?" আর সে পাল্টা জবাব দেয়—"আপনাদের দরজা আট্‌কাবার কি অধিকার আছে?" মেয়েটি কেবল ডাকছে, "ওরে কানু, ওরে কানু, তুই বস তো বাবা!" উত্তেজিত হয়ে ডাকছেন বটে, কিন্তু আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখলাম একটুও ভয় পান নি, বিব্রতও হন নি। নারীজনসুলভ চিত্তবিভ্রম কিছুমাত্র দেখা যায় নি। ব্যাপারটা বরং আমোদেরই হয়েছে, যাকে বলে স্পোর্টস্‌ম্যান স্পিরিট, হাসিমুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কানু অবশ্য কথাটা কানেই নিচ্ছে না, ঝগড়াতেই রত। কিছুক্ষণ পরে তার খুড়ীমা জামাটা ধরে টেনে জোর করে বসিয়ে দিলেন।

কানু তখনো রাগে ফুলছে। "ভদ্রলোক হয়েও এমন ছোটলোক হয়?"

"আচ্ছা আচ্ছা তুই চুপ করে বস্। তোর নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠবার কি দরকার? চুপ করে বসে থাক্ না, যে আসে আসুক তোর জায়গা তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না! চিরকাল তো বাস করবি না, কিছুক্ষণ বাদেই নেমে যেতে হবে, কয়েক ঘণ্টার জন্যে এত মারামারি কেন বাপু? হঠাৎ তুই এমন রেগে উঠলি কেন বলতো? আমি জানতুম কানুর শরীরে রাগ নেই, আজ দেখছি ও-বাবা, তুইও অমনি বদ্‌রাগী! বংশের ধারা তো!"

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গাড়ীতে মিট্‌মিট্ করে আলো জ্বলে উঠল। মানুষের মুখ আবছায়া দেখা যায়। ম্লান অন্ধকারের মধ্য দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। এক একটা ষ্টেশন পার হয় আর মেয়েটি কথা অসমাপ্ত রেখে ষ্টেশনের নামটা পড়বার চেষ্টা করে। তারপর আগেকার কথাটা ভুলে যায়, আবার অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করে।

গল্প করতে করতে হঠাৎ বাঙ্কের উপর থেকে একটা ছোট পুঁট্‌লি গাড়ীর ঝাঁকানিতে মেয়েটির ঘাড়ের উপর পড়ল। একবার চম্‌কে উঠে তখনি মেয়েটি বেশ সাম্‌লে নিলে আর হাসতে লাগল। সকলেই একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল। পাশের মেয়েটি বললে—"আহা বড্ড লাগল বুঝি? দেখ দেখি কাণ্ড! আমার না হয় একটু লেগেছে, কিন্তু আর কারো মাথায় যেন কিছু না পড়ে। ঐ ভারী বোঝাগুলো যদি আপনাদের কারো মাথায় পড়ে তা হলে কি বাঁচবেন?"

ট্রেন বৰ্দ্ধমানের কাছাকাছি এসে পড়ল।

"এইবার বুঝি বৰ্দ্ধমান? ওরে কানু, একটু চা না খেলে তো বাঁচব না বাবা। কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এইবার চা না খেলে মাথা ধরে যাবে। ষ্টেশনে নেমে একটা কাপ বেশ করে ধুইয়ে চা নিবি।"

পাশের বিধবাটি হাঁ ক'রে চেয়ে চেয়ে বললেন, "হাঁ গা বাছা, ষ্টিশানে যারা চা বেচে তারা হিঁদু কি মোছলমান তার ঠিক নেই, যার তার হাতে চা খাবে?"

"আমার অত হিঁদু মুসলমান বিচার নেই মা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলেই হল। বিক্রমপুরের বাড়ীতে আমাদের মুসলমানেই চা তৈরী করে, রোজই তার হাতে খাই। স্বামী পুত্তুর নিয়ে যাদের বিদেশে বিদেশে ঘুরতে হয় তাদের কি অত জাত-টাত মানলে চলে মা?"

বৰ্দ্ধমানে গাড়ী থামল। আমারও তো চা খেতে হবে! চা-ওয়ালা উপস্থিত হওয়া মাত্র তাকে বললাম কাপের বদলে মাটির গেলাসে চা তৈরী করতে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি মেয়েটির সঙ্গে কোনো কথা কই নি। এইবার তাঁকে বললাম "দেখুন, চাওয়ালাদের ঐ কাপ যে একবার একটু ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায় তা মনে করবেন না। ওতে খাওয়ার চেয়ে এই মাটির গেলাসে খাওয়াই ভাল! পাত্রটাও পরিষ্কার হয়, আর চাটাও ক্ষীরের মতো খাওয়া যায়।"

"কারো এঁটো গ্লাস্ যদি নিয়ে এসে থাকে ?"

"তা হতে পারে না, কারণ চা খেয়েই লোকে গেলাসটা ফেলে দেয়।"

চা তৈরী হতেই গেলাসটা তাড়াতাড়ি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। কোনো দ্বিধা না করে সেটা খুসী হয়েই তিনি খেতে লাগলেন। কানু খাবার কিনতে নেমে গিয়েছিল, এক ঠোঙা মিহিদানা এনে বললে—"খুড়ী মা এটা ধর তো, আমি পান নিয়ে আসি।"

দেখলাম এক হাতে চায়ের গেলাস, এক হাতে ঠোঙা নিয়ে তিনি একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন, চা খাওয়াটার সুবিধা হচ্ছে না। আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এক হাতে চা খেতে খেতে অন্য হাতে তাঁর কাছ থেকে ঠোঙাটা নিয়ে বললাম—"আমি ধরছি, আপনি খেয়ে নিন।"

তিনি তাতে কিছু আপত্তি করলেন না। কিন্তু বললেন,—"দাঁড়িয়ে থেকো না বাবা, বসে পড়। হঠাৎ যদি গাড়ী ছেড়ে দেয় তো এখনি পড়ে যাবে। এমনি করেই আমার ভাসুর একবার পা ভেঙেছেন।"

অগত্যা বসেই পড়লাম। কানু ফিরে এসে খাবারটা খেয়ে নিলে। হাত ধুয়েই সে মণিব্যাগ বের করলে। বুঝলাম খুড়ীমার চায়ের দামটা আমাকে দিতে চায়। কিন্তু পয়সা বের করবার আগেই তিনি চোখ টিপে দিলেন। কানু নিরস্ত হল, একটু অপ্রস্তুতও হল। এইটুকু দেখে তিনি পানের কৌটা কানুর হাতে দিয়ে আমাকে পান দিতে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু পান তো আমি খাই না, সেই কথা তাঁকে বললাম।

ব্যাপারটা বুঝলাম। বুঝতে পেরে ভারী মনে আনন্দ হল। আগ্রহ করে আমি চা দিয়েছি, তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন। দাম দিলে সেটা ফেরৎ দেওয়া হয়। আমি তাঁকে মান্য করলাম, তিনি অপমান করবেন কেন ? ভাসুর-পো ভুল করতে যাচ্ছিল সেটা সংশোধন করবার জন্যও বটে, আর আমি যে অযাচিত আত্মীয়তা দেখিয়েছি সেটা সমর্থন করবার জন্যও বটে, পান খেতে দেওয়া ছাড়া আর কি করবেন ? চারটে পয়সা খরচ করে যে কি আনন্দই পেলাম !

গাড়ী চলল বর্দ্ধমান ছেড়ে। বাইরে আর কিছুই দেখা যায় না। গাড়ীর মধ্যে কলরব প্রায় থেমে গেছে, কেবল খুড়ীমা, ভাসুরপোর আলাপ এখনো থামে নি। আমারও ঢুল আসছিল। একঘেয়ে মেয়েলি সুখ দুঃখের কথা কতক্ষণ বা শোনা যায় ! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মেয়েটিরও কথা ফুরোয় না, ভাসুরপোরও কি ক্লান্তি নেই ? হাওড়া থেকে মধুপুর অনেকক্ষণের পথ, এতটা সময় মানুষ কেমন করে বকতে পারে ? অথচ বরাবর সেই হাসিমুখ, সে মুখে কথারও বিরাম দেখলাম না, পান-দোক্তারও বিরাম দেখলাম না ! এত প্রাণের স্ফূর্ত্তি, এত উদ্বৃত্ত আনন্দ আসে কোথা থেকে যা খরচ করলেও ফুরোতে চায় না ? আর সেই আজকালকার যুবক, তার বা এত ধৈর্য্য থাকে কি করে ?

কয়েকটা ষ্টেশনের পর এল আসানসোল। গাড়ী এখানে অনেকক্ষণ থামে। হাত পায়ের জড়তা কাটিয়ে নেবার জন্যে প্লাটফর্ম্মে নেমে খানিকটা পায়চারি করে নিলাম। ফিরে এসে দেখি মেয়েটি পানওয়ালার কাছ থেকে পান নিয়ে কৌটাটি আবার পূর্ণ করছেন। আমি সেটা লক্ষ্য করছি দেখে আমার দিকে চেয়ে একটু সলজ্জ হাসি হাসলেন।

এইবার একেবারে মধুপুর, লম্বা পাড়ি, আর কোথাও গাড়ী থামবে না। গন্তব্য স্থানে এইবার পৌছুতে হবে এই প্রত্যাশায় কথাবার্ত্তা একটু বিরল হয়ে এল। তবু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না, কিছুক্ষণ থেমে থেমে এক একটা প্রসঙ্গ তোলে। মধুপুরে পৌছে কাকে কি বলা হবে, কে কি রকম খুসী হবে, কার জন্যে কোন জিনিষটা নেওয়া হয়েছে, ষ্টেশন থেকে নেমে বাড়ী পর্য্যন্ত কি করে যেতে হবে, কে কে ষ্টেশনে আসবে, কে জেগে আছে, কে ঘুমিয়েছে, ইত্যাদি কথাই এখন চলছে। একবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মেয়েটি হেসে বলে উঠল—"ওরে জানিস, মধুপুর বোধ হয় পার হয়ে গেছে। গার্ড মিন্সে অন্ধকারে ষ্টেশনের নাম পড়তে পারে নি, একেবারে হাজারিবাগে টাজারিবাগে গিয়ে গাড়ী থামাবে।"

কানু হো হো করে হেসে উঠল। "বেশ বলেছ খুড়ীমা। এটা হচ্ছে মেন্ লাইন, আর হাজারিবাগ হচ্ছে গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন। চেষ্টা করলেও তো এ গাড়ী হাজারিবাগ যেতে পারবে না !"

"কে জানে বাপু অত কথা ! তা বলে মধুপুর কি এতদূর না কি ?"

মধুপুরে যখন গাড়ী এল তখন রাত্রি প্রায় দশটা। একটি লম্বা চওড়া চেহারার বলিষ্ঠ যুবক হাসতে হাসতে গাড়ীর কাছে ছুটে এসে দাঁড়াল। মেয়েটিও দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়ে হাসছিলেন, কিন্তু আমার মনে হল এ হাসিটা যেন ভিন্ন জাতের। তাঁকে অনেকক্ষণ থেকেই তো হাসতে দেখছি কিন্তু সে ঠিক এরকমটি নয়। বুঝলাম ইনি কেউ খুব নিকট আত্মীয়। কানুর কাছে গিয়ে বললে—"কানুদা মালপত্র কোথায়?" "এই যে ভাই। খুড়ীমা তুমি এখন বসে থাক। আগে জিনিষগুলো নামিয়ে নিই, তারপর তুমি নামবে।"

ছেলেটি বিস্মিত মুখে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—"কিন্তু একি কাণ্ড কানু দা? থার্ড ক্লাশে ভিড়ের মধ্যে পিষে আসবার বুদ্ধি কে দিলে! দাদু ত চিঠি পেয়ে পর্য্যন্ত বকাবকি করছেন!"

কানু কি বলতে যাচ্ছিল, মেয়েটি তাকে থামিয়ে দিয়ে, আদরভরা গলায় বললেন, "ওরে পাগল, থার্ড ক্লাশে এলে জাত যায় না, পিষেও যেতে হয় না, দেখ না আমরা যেমনটি উঠেছি, তেমনি নেমেছি।"

ছেলেটি বললে, "না, না, একি বিশ্রী ব্যাপার! বাবা জানতে পারলে···ছুটির সময় হাইকোর্টের কত ব্যারিষ্টার এ্যাডভোকেট ট্রেনে ট্রাভেল করছে, আর জজ সাহেবের স্ত্রী কি থার্ড—"

"নে, পাগলামো করিস নে। দেশসুদ্ধ লোক যে থার্ড ক্লাশে গাড়ীতে চড়ে, সেই গাড়ীতে চড়লে নাকি আবার অপমান হয়! ওরে পাগল, দেশকে চিনবি, দেশের লোককে চিনবি ত তাদের সঙ্গে বোস, মেশ। কিন্তু আর দেরী করিস নে তোরা, গাড়ী পনেরো মিনিট বই থামবে না।"

ছেলেটি এইবার আর কিছু না বলে, দুজন কুলীর সাহায্যে মোট নামাতে ব্যস্ত হল। পাশের বিধবাটি জিজ্ঞাসা করলে—"কৈ, তোমার ছেলে কোথায় গো?"

"ঐ তো আমার ছেলে, কানুর সঙ্গে মোট নামাচ্ছে!"

"ওমা ঐ তোমার ছেলে? ওকি তোমার আপন ছেলে?"

মেয়েটি হেসে উঠল। "আপন নয় তো আর কি হবে? আমার তো আর সতীন নেই মা! ও ছেলে দেখতেই অমনি বাড়ন্ত, কিন্তু বয়স খুব কম। এখনও ওর বিয়ে হয় নি। কানুর চেয়েও ও ছোট।"

এই মায়ের ঐ ছেলে? অত বড় ছেলের এইটুকু মা? প্রথমটায় আমার মন যেন সায় দিতে পারছিল না। তারপর মনে পড়ে গেল শেওড়াফুলির কলাগাছের কথা। এই মাত্র তো দেখে এলাম ছোট ছোট কলাগাছে কত বড় বড় কাঁদি ফলেছে! বাংলাদেশের মাটিতেই দেখা যায় বড় বড় কাঁদির ভার বয় ছোট ছোট কলাগাছ, আর এই দেশেই থাকে কত বড় বড় পুত্র-প্রসবিণী ছোট ছোট মা। মনে হ'ল কলাগাছের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের বেশ তুলনা করা যায়, আর তাই থেকেই বোধ হয় আমাদের দেশে কলা বৌয়ের পরিকল্পনা। এঁদের তেমনি নরম মাটিতেই জন্ম, মনে প্রাণে তেমনি সরস, আর ভিতরে ভিতরে এঁরা তেমনি ফলবতী। উপর থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু একখান শাড়ী জড়িয়ে দিলেই এঁরা 'কলাবৌ' হয়ে যান।

ততক্ষণে মেয়েটি প্লাটফর্ম্মে নেমে পড়েছে। কুলীরা মালপত্র মাথায় তুলে নিলে। যাত্রার আগে মেয়েটি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। "চলি তাহ'লে? আপনার কথা অনেক দিন মনে থাকবে।"

প্রথম আলাপে বলেছিলেন 'তুমি' এখন বললেন 'আপনি'। সেটা কি বলেছিলেন চিরাভ্যস্ত স্নেহের বশে, আর অবশেষে এটা কি হ'ল আমার চায়ের শোধ? এঁদের এই একটা মস্ত দোষ যে আচরণের কোন ঠিক থাকে না। হঠাৎ এগিয়ে এসে স্নেহ করেন আবার তফাতে গিয়ে কর্তৃত্ব দেখান, যখন যা খেয়াল। কি করি, প্রতিনমস্কারটা করতে হল।

চলে যেতে যেতে ষ্টেশনের উজ্জ্বল আলোকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা গেল তাঁর দোলায়মান একখানি সুডোল হাত। অনেক দূর থেকে কি জন্যে একবার পিছু ফিরে চাইলেন, দেখলাম হাসিটা লেগেই আছে, যেন কিছু উজ্জ্বল।

এই হাসি, এই আনন্দ, এই স্বাস্থ্য, কি করে এঁর অক্ষুণ্ণ রইল! ভেবে দেখলাম এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ফুলের মধ্যেও এ রকম বৈচিত্র্য অনেক দেখা যায়। জলপদ্ম ফুটে উঠলে অল্পকালেই ঝরে যায় আর স্থলপদ্ম ফুটে উঠে অনেকদিন পর্য্যন্ত অম্লান থাকে। জলপদ্ম জলে জলেই ভাসে আর স্থলপদ্ম পায় মাটির রস। মাটিতে যারা যত বেশী শিকড় গাড়ে, মাটি থেকে যারা যত বেশী রস পায়, তারাই হয় তত জীবন্ত।

মেয়েটি চক্ষের অন্তরালে চলে গেল, তারপর ধীরে ধীরে আমার মনে ফুটে উঠল তাঁর অপরূপ মাতৃমূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝি এই মাকেই মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন, চিরযৌবনা, হাস্যময়ী, কোটীপুত্রবতী। অতীতে কি ছিল জানি না, ভবিষ্যতে কি হবে ভাবতে পারি না, কিন্তু বর্ত্তমানে যা দেখি এই আমাদের আধুনিক বাংলার জীবন্ত মাতৃমূর্ত্তি। কতক জ্ঞানে কতক অজ্ঞানে, কতক স্বার্থে কতক নিঃস্বার্থে, কতক হিন্দুতায় কতক অহিন্দুতায়, কতক সংস্কারে কতক বিচারে, কতক অসভ্যতায়, সবদিক জড়িয়ে স্নেহের গণ্ডী রচনা করে তারই মধ্যে বাস করে এই হাস্যময়ী মা। সামাজিক অবস্থা আর মানসিক প্রবণতা দুই মিলিয়ে অপরূপ ভাবে এই মায়ের গড়ন হয়। মন পদার্থটা এদের নষ্ট হয়েও হয় না, নানা অসঙ্গতির মধ্যে একটা সঙ্গতি করে নেয়। এরা নিজেকেও রসাতলে দেয় না, সকল দিক রক্ষা করেই চলে। ব্যবহারে কোন যুক্তি আছে কিনা কিম্বা আদর্শের সঙ্গে মিল আছে কিনা, এসব বিচারে এদের প্রয়োজন নেই। নিজের

গণ্ডীটুকু যাতে বজায় থাকে, তার মধ্যে কোন অমঙ্গল না ঘটে সেইটাই এক মাত্র কাম্য। এ নিয়ে কোন তর্ক চলে না। জীবনকে উপভোগ করাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় তা হলে যিনি আপন ঘরের গৃহের ছোট গণ্ডীর মধ্যে জীবনের আস্বাদ লাভ করেন তিনি বেশী সৌভাগ্যবান কি যিনি তার অতিরিক্ত গিয়ে গণ্ডীটাকেই বিস্তৃত করছেন তিনি বেশী সৌভাগ্যবান, এ কথার মীমাংসা করা কঠিন।

কিন্তু তর্কের কথা ছেড়ে দিয়ে যা আমরা দেখতে পাই তা অতি অনুপম—বাঙালী মেয়ের এই নিজস্ব মূর্ত্তি। এই রমণী, জননী, গৃহিণীকে আমরা নিত্য দেখি ঘরে ঘরে। কিন্তু গৃহাবেষ্টন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমনি স্বতন্ত্রভাবে আমাদের চোখের সম্মুখে এসে না দাঁড়ালে আমরা তাঁকে ভাল করে দেখতে পাই না। যেমন কল্‌কাতার আকাশেও মেঘের খেলা হয়, কিন্তু নানা বাহুল্যের মধ্যে সেটা চোখে পড়ে না, বাইরে যেমন সেই আকাশ নূতন করে দেখতে পাই,—তেমনি।

আর ঐ স্নেহস্নিগ্ধ হাসি,—দেখলেই চেনা যায় এ বাঙ্গালী মেয়ের হাসি। এতে একটা মাতৃস্নেহের গন্ধ আছে। এ বিশেষত্বটুকু আর কোথাও আছে কিনা জানি না। এতে কেবল একটিমাত্র ভাব প্রকাশ পায় না, পাঁচরকম ভাব মিশিয়ে এতে এক অপরূপ রস পাওয়া যায়। কিছু স্নেহ, কিছু কৌতুক, কিছু বিহ্বলতা, কিছু স্থূল চেতনা, কিছু সূক্ষ্ম অবচেতনা এবং আরো কিছু রহস্য আছে, যা প্রকাশ করা যায় না। তবে দেখলেই চেনা যায়। বাংলার মেয়ের মুখে এই হাসিটুকু লেগে থাক্। হয় তো তার আর কোনো সম্বল নেই কিন্তু এইটুকুই তার লোভনীয় সম্পদ। এই তো দুঃখ-প্রধান দেশ, এখানে এক মমতা ছাড়া সুখের জিনিষ আর কয়টা আছে? কেবল নিজের কথা, যাদের ঘরের ভিতর হাসির আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই, তাদের এটুকুও যদি লোপ পায় তো কোথায় আর সান্ত্বনা থাকবে?

পরিবর্ত্তনের দিন হয় তো আসছে, আরো দুঃখ হয় তো দেখতে হবে। আমাদের যা চরিত্রবৈশিষ্ট্য তাও হয় তো লোপ করবার প্রয়োজন হবে। পরিবর্ত্তন যা হবার হোক, চরিত্রও নতুন করে গড়ে উঠুক, কিন্তু বাংলার এই হাসি যেন কখনো স্বাদহীন, প্রাণহীন, অর্থহীন না হয়।

যাত্রীরা যে যার চলে গেল, গাড়ী চলবার হুইস্‌ল্ উঠল বেজে। যে মেয়েটি পাশে স্থান পেয়েছিল সে এতক্ষণে নড়ে চড়ে বসল। "বাবা, এতক্ষণে একটু ভাল করে বসতে ঠাঁই পেলাম।" তারপর মেয়েদের মধ্যে চলতে লাগল ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য আর তার আচরণ-বৈষম্য সম্বন্ধে নানারূপ বিচার। অনেকে অনেক রকম দোষ দেখালে। একটি মেয়ে কিন্তু বেশ কথা বললে—"যাই বল বাপু, এই ভাল। যারা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করে তাদের কি অত আচার বিচার চলে, না তাদের অত লজ্জা সরম পোষায়? যেমন করেই হোক সুখে তো আছে! কথায় বলে—

'যার নেই উত্তর পূব
তার মনে সদাই সুখ।'

ওর মনে অত শত নেই বলেই ও সুখী হতে পেরেছে।"

দেখা গেল, এর ওপর আর কেউ কোনো কথা কইলে না।

গাড়ী নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সকলেই ঢুলছে। যে যে দিকে পেরেছে পা ছড়িয়ে দিয়েছে, নানা রকমের ভঙ্গীতে সকলের ঘাড় লুটিয়ে পড়েছে। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম সেই মেয়েটির কথা। ধীরে ধীরে তার কি মূর্ত্তিই ফুটে উঠল! এই কয়েক ঘণ্টার সমস্ত ঘটনাগুলো স্মরণ করে মনে হ'ল মেয়েটিকে আমি চিনেছি, তার অনেকখানি চরিত্রই বোধ হয় উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। তারপর মনে হ'ল তা নয়, আরো অনেকখানি বাকী আছে, যা আমি কিছুই জানলাম না।

একটা প্রশ্ন হঠাৎ মনে হ'ল, স্বামীটি এঁর কেমন—হাইকোর্টের জজ্ তা শুনেছি কিন্তু লোক কেমন? এঁর সঙ্গে মিল আছে কি না? বোঝা গেল স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং আধুনিক ভাবাপন্ন। পরাধীনতার চাপ কম পড়েছে বলেই হয় তো এঁর চরিত্রটা ফুটে উঠতে পেরেছে। কিন্তু সে দিক দিয়ে আমার চিন্তা করবার কি প্রয়োজন? যেটুকু আমি দেখেছি তাই কি আমার যথেষ্ট নয়?

গিরিডি ষ্টেশন এসে পড়ল। মনের মধ্যে এই কথাই তোলপাড় করতে করতে গাড়ী থেকে নাবলাম। সহযাত্রিণী বলেছিলেন আমার কথা মনে থাকবে। কিন্তু আমার সঙ্গে তো ক্ষণিক পরিচয়, স্নেহের নীড়ে গিয়ে পথের যাত্রীর কথা তিনি এতক্ষণ ভুলেই গেছেন। কিন্তু আমি তাঁতে দেখেছি বাংলার মেয়ের একটা অনির্ব্বচনীয় দিক, আমার চিরদিন মনে থাকবে।

সম্পাদকীয়

মিঃ চেম্বারলেনের অর্থনীতি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ

গত ২২শে ডিসেম্বর (৬ই পৌষ) কমন্স সভায় বিলাতের চ্যান্সেলার অব একস্‌চেকার মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ চেম্বারলেনের হিসাবমত বিলাতি সরকার তাঁহাদের কর্জ্জ টাকা কম সুদে পরিবর্ত্তিত করিয়া বাৎসরিক সুদের খরচা মোট ৩ কোটি ৭ লক্ষ পাউণ্ড কমাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে বাৎসরিক সুদের খরচা শতকরা ২০ টাকা বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রিটিশ সরকারের দেখাদেখি ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্টগুলিও তাঁহাদের দেয় সুদের হার কমাইয়া দিয়া ক্রয়শক্তি বর্দ্ধিত করিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছেন। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির দেনার মধ্যে ১০ কোটি পাউণ্ড কম সুদে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ কমাইতে সক্ষম হইয়াছেন। আরও নানা রকমের কার্য্য দ্বারা বেকার-সমস্যারও বহুল পরিমাণে সমাধান সম্ভব হইয়াছে।

মিঃ চেম্বারলেনের মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সূচনা হইয়াছে: মাত্র ডলার ও ফ্রাঙ্কের কলহের জন্যই পাউণ্ডের মূল্য স্থায়ী করা সম্ভব হয় নাই। অদূরভবিষ্যতে তাহাও সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তিনি আশা করেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার দিকে তাকাইলে যাহা নজরে পড়ে, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা খুব ভাল হইয়াছে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় বটে, কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ যে, গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিলে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল হইতে পারে। টাকা—সোণা, রূপা, তামা ও কাগজের জিনিস। কোনও গবর্ণমেন্টের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কখনও টাকার অভাব হইতে পারে না। কিন্তু যে ভাবে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, সেই ভাবে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণ সম্ভব কিনা, তাহাই চিন্তার বিষয়।

কোনও দেশে যদি প্রচুর কৃষিযোগ্য জমি থাকে এবং সেই দেশের ফসলের (কাঁচা মালের) পরিমাণ যদি এত বেশী হয় যে, তদ্বারা সে দেশের খাদ্য ও অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হইয়াও কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত থাকে এবং যদি সেই উদ্বৃত্ত কাঁচা মালকে শিল্পে রূপান্তরিত করিবার জ্ঞান সেই দেশের অধিবাসিগণের থাকে, তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্ত কাঁচা মাল দ্বারা প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্য বিনামূল্যে বিক্রীত হইলেও দেশীয় অধিবাসিগণের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের কোনও অভাব হয় না। যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াও সেই দেশ লাভবান্ হইতে পারে।

আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার উপকরণ—

১। দেশের সমস্ত লোকের আহার্য্য ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী প্রচুর ফসল উৎপাদনক্ষম জমি ও পর্য্যাপ্ত ফসল।

২। নিজের দেশের প্রয়োজন [illegible] অতিরিক্ত কাঁচা মাল উৎপন্ন করিবার মত আরও প্রচুর আবাদযোগ্য জমি।

৩। কাঁচা মালকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত করিবার জ্ঞান ও ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষে কিছু দিন পূর্ব্বেও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ চাষযোগ্য জমি ছিল। গ্রেট ব্রিটেন শিল্পজ্ঞান ও শিল্প-ব্যবস্থায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। ফলে দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন হওয়া অবধি ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে কোনও জাতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, ইউনাইটেড ষ্টেটসে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ার আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ আমাদের জানা নাই। যদি ইউনাইটেড ষ্টেটস্ তাহার কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ আরও বাড়াইয়া লইতে পারে এবং তাহার চাষের জ্ঞান এমন হয় যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষাও চাষের খরচা কম করিতে পারে এবং তাহার ফসলের পরিমাণ এত বেশী হয় যে, সে দেশের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের সংস্থান করিয়াও প্রচুর কাঁচা মাল উদ্বৃত্ত থাকে, অধিকন্তু তাহার শুল্ক-নীতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করে যে, অন্য দেশের

কোন শিল্পসম্ভার তাহার দেশে বিক্রীত হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় এবং সে যদি তাহার উদ্বৃত্ত কাঁচা মাল বিক্রয় না করিয়া তদুৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ অন্য দেশে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে সেই ইউনাইটেড ষ্টেটসের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইবে কিনা চিন্তার বিষয়।

আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের কৃষককে অধুনা যেরূপ শিক্ষা ও চাকরীর মোহে মুগ্ধ করা হইতেছে এবং কৃষিকার্য্য যেরূপ লাভহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অদূরভবিষ্যতে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স ও সোভিয়েট রুষিয়ার কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ এবং ফসল ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী হইয়া পড়িবে। তখন ইংলণ্ডের যে অবস্থা হইবে, তাহাতে তাহার আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হইবে বলিয়াই মনে হয়।

কম সুদে ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করিবার ফলে মিঃ চেম্বারলেন ভারতীয় কৃষকের তুলা এবং পাট অধিক পরিমাণে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা ক্রয় করাইতে সমর্থ হইবেন বটে এবং অল্প মূল্যে ভারতের বাজারে বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করাইয়া ইংলণ্ডের বিপন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে আপাততঃ রক্ষা করিতেও পারিবেন বটে, কিন্তু তাদৃশ প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বিনষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ আছে; উপরন্তু তাহাতে ভারতীয় কৃষকের কৃষির উপর আস্থা ফিরিয়া আসিবে না, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও বাড়িবে না এবং ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক প্রাধান্যও বজায় থাকিবে না, ইহাই আমাদের মনে হয়। সময় থাকিতে আমরা ভারতীয় সরকার ও বিলাত সরকারকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান

কোন মানুষ অথবা জাতির বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে বসিলে তাহার অতীতের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় দুশ্চিন্তা অথবা আনন্দের কিছু আছে কিনা তাহা বুঝিতে হইলে অতীতে কি ছিল তাহা অনুসন্ধান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যৌবন এবং জীবনের দৈর্ঘ্য মানুষের ও জাতির অবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। যে-জাতির অধিকসংখ্যক মানুষ ৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্মঠ থাকে এবং ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, সেই জাতি, যে-জাতির বেশীর ভাগ লোকই ৫০ বৎসরের আগে কর্ম্মশক্তি হারাইয়া বসে এবং ৬০ বৎসরের আগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদপেক্ষা উন্নত বলিতে হইবে।

ভারতের অতীতের ইতিহাস খৃষ্ট জন্মাইবার ছয় শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আমাদের চোখের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তদবধি এই ২৫০০ বৎসরের ইতিহাস ভারতবাসীর ক্রমিক পতনের বিবরণে পরিপূর্ণ। এই ২৫০০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ১০০০ বৎসর মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫০০ বৎসর ভারতীয় নৃপতিদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় অথবা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আত্মকলহের ইতিহাস। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রবিষয়ক কিছু কিছু জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তাহা বর্ত্তমান জগতের ঐ ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের তুলনায় গৌরবময় বলা যায় না। বর্ত্তমানে কোনও জাতি ভারতের সেই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া তাহাদের শিক্ষা, সমাজ অথবা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন না। সম্পূর্ণভাবে ঐ জ্ঞান অবলম্বিত হইলে রাজ্য অথবা সমাজ শৃঙ্খলিত ভাবে পরিচালিত হইতে পারে, তাহাও মনে করিবার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের এই ২৫০০ বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ভারতবাসীদের মধ্যে অথবা ভারতে এই সময়ের মধ্যে লোভনীয় কিছু উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। অথচ ইউরোপীয় ইতিহাসের ২৮০০ বৎসরের প্রায় প্রতি শতাব্দীতেই তাৎকালিক ইউরোপীয় প্রধান প্রধান জাতিগুলির ভারতবর্ষে আসিবার ঔৎসুক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি বাস্তবিকই ভারতবর্ষে লোভনীয় কিছু না থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের ভারতে আসিবার ঔৎসুক্য অর্থহীন হইয়া পড়ে। কাযেই মনে করিতে হয়, ভারতবর্ষে এবং ভারতবাসীদিগের মধ্যে লোভনীয় কিছু নিশ্চয়ই ছিল এবং তাহার উদ্ভব হইয়াছিল এই ২৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে।

এখন প্রশ্ন হইবে, ভারতের এই লোভনীয় জিনিষ কি ছিল এবং তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার উপায়ই বা কি? বর্ত্তমানে ভারতীয় দর্শনাদি যে অর্থে চলিতেছে, তাহাতে "পরকাল" এবং "আধ্যাত্মিক জ্ঞান" সম্বন্ধীয় অনেক লোভনীয়

কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু "দৈবানুকম্পা" না হইলে তাহা বুঝিবার অথবা তদনুযায়ী কার্য্য করিবার সামর্থ্য হয় না, ইহা আমাদের পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। কাযেই ঐ জ্ঞানে জাগতিক সুশৃঙ্খলিত জীবন পরিচালিত করিবার কোনও উপায়ের সন্ধান নাই, তাহা বলা যাইতে পারে।

ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থাও নানারূপ দোষ সম্বলিত, ইহাও ভারতবাসীদিগের মধ্যেই অনেকের মত। মাত্র ভারতের গ্রামের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি করিলে ভারতের বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। প্রত্যেক গ্রাম দেখিলেই মনে হয় যে, প্রতি গ্রামে কতকগুলি কৃষিযোগ্য ফলপ্রসূ জমিকে কেন্দ্র করিয়া কতিপয় কৃষক এবং এই কৃষকগুলির বিভিন্ন প্রয়োজন সাধনের জন্য কতকগুলি কামার, কুমার, তাঁতী, বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের সংখ্যা দেখিলেও মনে হয়, যেন গ্রামবাসীর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সমস্তই গ্রাম হইতে সরবরাহ করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যে শক্তিসম্পন্ন লোকের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। সমস্ত গ্রামের সমস্ত জমি লইয়াই ভারতবর্ষের পূর্ণতা। প্রতি বৎসর প্রচুর ফসল উৎপাদন করিয়া জমিগুলি যেন ভারতের সমৃদ্ধির ভাণ্ডার অফুরন্ত রাখিত। মনে হয়, যেন এমন একদিন ছিল যখন কৃষকের ছেলে, কামারের ছেলে, কুমারের ছেলে, তাঁতীর ছেলে, বৈদ্যের ছেলে, এবং ব্রাহ্মণের ছেলে জন্মাবধি পৈতৃক ব্যবসায়ে নৈপুণ্য লাভ করিবার সুযোগ পাইত এবং জীবিকা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে তাহাদের চাকুরী সংগ্রহের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইত না। মানুষ যে অশিক্ষিত অথবা বেকার হইতে পারে, তাহা যেন তাহাদের অজানা ছিল। ৩০ বৎসর আগেও প্রতি গ্রামে বহুসংখ্যক ৬০ বৎসরবয়স্ক কর্ম্মঠ কৃষক দেখা যাইত, ৮০ বৎসর বয়স্ক কৃষকের সংখ্যাও তখন অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। এমন যে ব্যবস্থা, যাহাতে জাতীয় সম্পদ্ অফুরন্ত হয়, জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষার জন্য কোনও ক্লেশ থাকে না, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী কর্ম্ম-নিয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং জীবন ও যৌবন দীর্ঘ হয় তাহা কি বাস্তবিক পক্ষে লোভনীয় নহে? আমাদের মনে হয়, কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের গ্রামের এই সংগঠন-সম্ভূত সমৃদ্ধি ভারতকে অতীতকালে অন্যান্য জাতির লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই ব্যবস্থার জন্যই ভারতবাসী গত সহস্র বৎসর হইতে পরাধীন হইলেও সেদিন পর্য্যন্তও অন্নাভাবে ক্লেশ পায় নাই। এই ব্যবস্থার মূলে অসাধারণ গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে এবং ভারতীয় দর্শনগুলি সেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ। অসাধারণ জ্ঞানের আধার ঐ দর্শনগুলি বহুদিন জীবিত ছিল এবং ঐ জ্ঞানরূপ শক্তিদ্বারা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী তাহার গ্রাম গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাই ঐ দর্শনগুলিকে স্মরণাতীত কাল হইতে সে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সমৃদ্ধির ভাণ্ডার অফুরন্ত হওয়ায় বহুদিন আর ঐ দর্শনের জ্ঞান ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় নাই; ফলে ভারতবাসী তাহার দর্শনের ভাষা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে এবং তাহাকে বিকৃত অর্থে চালাইতেছে। তবু তাহার গ্রামের ব্যবস্থার ফলে তাহার জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও এতদিন পর্য্যন্ত সে অন্নবস্ত্রের কষ্ট পায় নাই। কিন্তু আজ গ্রামের সেই ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ, কৃষকের দিনাতিপাত আর কৃষির দ্বারা হয় না, কৃষক-সন্তানদের নিকট আজ কেরাণীগিরির উপার্জ্জন লোভনীয়। কামারের সন্তান, কুমারের সন্তান, বৈদ্যের সন্তান সকলেই নিজ নিজ পুরুষানুক্রমিক জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় পরিহার করিয়া অন্য কোন উপায়ে জীবিকার্জ্জনের জন্য উদ্‌গ্রীব। জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। মোটের উপর, ভারতের গৌরবময় একটা ইতিহাস যে ছিল এবং সেই ইতিহাসের মূল উপকরণ গত ২৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের সেই বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন ভারতের গ্রামের ব্যবস্থায় পরিস্ফুট ছিল, কিন্তু তাহা আজ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এখনও সচেষ্ট হইলে ভারতবাসীর সেই অফুরন্ত সমৃদ্ধির ভাণ্ডার রক্ষা করা অসম্ভব নহে। কিন্তু আরও বিশ বৎসর নিশ্চেষ্ট থাকিলে ভারতের গৌরবকাহিনী কল্পনার কথা হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা আমাদের দেশবাসীকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে বলি।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ

আমাদের শিক্ষা, জীবিকার্জ্জনের উপায়, পারিবারিক ব্যবস্থা, সামাজিক আচার ব্যবহার, রাজ্য-পরিচালনের নিয়ম সমস্তই ইংলণ্ডের এবং ইংরেজের অনুকরণে নিয়ন্ত্রিত হইলেই

আমাদের মঙ্গল হইবে বলিয়া এদেশে একটা মনোভাব জাগিত রহিয়াছে। ইংলণ্ডের শিল্প-বিদ্যালয়ের অনুকরণে এদেশে শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে এবং ইংলণ্ডের কৃষিকার্য্যের অসাফল্যের প্রতিধ্বনিতে এদেশের লোকের প্রাণেও কৃষির প্রতি অবিশ্বাসের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ শিল্প-বাণিজ্যকে জীবিকার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, অতএব এদেশের পক্ষেও শিল্প-বাণিজ্যই জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইংরেজের দেশের উপর্জ্জনশীলা স্বাধীন মহিলার অনুকরণে এদেশের নারীদেরও গড়িয়া-পিটিয়া তৈয়ার করিতে হইবে। এবংবিধ চিন্তাধারা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারিত যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশের এই দুইটি জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার মূলে একই ভাবের প্রেরণা থাকিত। অবস্থার ঐক্য থাকিলে ব্যবস্থার ঐক্য সুফলপ্রদ হয় বটে, কিন্তু অবস্থার পার্থক্যে ব্যবস্থার পার্থক্য অনিবার্য্য। অন্যথা ফল কখনও মঙ্গলজনক হয় না, হইতে পারে না।

ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে স্থানহিসাবে পার্থক্য যথেষ্ট এবং মানুষ হিসাবেও ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিভিন্নতা অনেক।

ইংলণ্ড	ভারতবর্ষ
মোট জমি—১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩১ হাজার ২ শত ৭২ বিঘা।	মোট জমি—২৩০ কোটি ৩২ লক্ষ ১১ হাজার ১ শত ২০ বিঘা।
আবাদযোগ্য জমি—৩ কোটি ৭৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৯ শত ৭৩ বিঘা।	আবাদযোগ্য জমি—৬৯ কোটি ২৯ লক্ষ ৬২ হাজার ১ শত ৬০ বিঘা।
মোট জমির তুলনায় ফসলযোগ্য জমির হার—শতকরা ২২।	মোট জমির তুলনায় ফসলযোগ্য জমির হার—শতকরা ৪৬।
কৃষক—শতকরা ৭ জন।	কৃষক শতকরা ৬৫ জন।
শিল্প ও বাণিজ্যরত—শতকরা ৬৮ জন।	শিল্প ও বাণিজ্যরত শতকরা ১৭ জন।
সরকারী কর্ম্মচারী—শতকরা ১০ জন।	সরকারী কর্ম্মচারী শতকরা ৮ জন।

একদিকে ইংলণ্ডের উৎপন্ন ফসলে তাহার অধিবাসিগণের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যরূপ প্রয়োজনের পূরণ করা অসম্ভব, অন্যদিকে ভারতের উৎপন্ন ফসলে এদেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঁচা মাল রপ্তানী হইতে পারে। ইংলণ্ডের জমির উৎপাদিকা শক্তির যথেষ্ট ন্যূনতা সত্ত্বেও ইংরেজ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং জগতের সকলের কৃষ্টির শিক্ষক; আর অন্যদিকে ভারত, জমির উৎপাদিকা শক্তিতে সমৃদ্ধ হইলেও ভারতবাসী সকলের অনুগ্রহের পাত্র!

দুইটি দেশ ও জাতির মধ্যে এতখানি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাহাদের কার্য্যের বিধি ও ব্যবহারে পার্থক্য থাকার কি কোন সঙ্গত কারণ নাই?

ভারতের আইনসমষ্টি সংস্কার সম্পর্কে জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট ও ভারতবাসীর কর্ত্তব্য

গত সংখ্যায় আমরা জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট আলোচনা প্রসঙ্গে দুইটী জিনিষ দেখাইয়াছি। যথা—

১। শাসনকার্য্যের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবৃতির অভাব।

২। প্রকৃত শৃঙ্খলা কি তাহা পরিষ্কার না বুঝিয়া, রাষ্ট্র-পরিচালনার প্রতি কার্য্যে শৃঙ্খলার ব্যবস্থা না করিয়া, আইন ও শৃঙ্খলার বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তনকে রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি করার অযৌক্তিকতা।

এক্ষণে দেখা যাক্, জয়েণ্ট কমিটির সভ্যগণ কি উদ্দেশ্যে কোন্ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। কমিটির সভ্যগণের মতে স্বায়ত্তশাসন প্রজাগণের যেরূপ আকাঙ্ক্ষণীয়, বিদেশীয় সুশাসন কখনও সেইরূপ নহে। তাই তাঁহারা দেশীয় মন্ত্রীর দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালনরূপ ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট পরিচালিত গবর্ণমেণ্টই রাষ্ট্র-পরিচালনার আদর্শ ব্যবস্থা। পার্লিয়ামেণ্ট পরিচালিত শাসনকার্য্যের প্রধান উপকরণ চারিটী:

১। অধিকসংখ্যক সভ্যের অনুমোদিত পরিচালনা মানিয়া লইবার নীতি।

২। অধিকসংখ্যক সভ্যগণের মীমাংসা অল্প-সংখ্যক লোকের গ্রহণ করিবার ইচ্ছা।

৩। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া জাতীয় স্বার্থ পূরণের বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব।

৪। নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব।

এই চারিটী উপাদান বিগুমান থাকিলে তাঁহারা এখনই পার্লিয়ামেণ্ট পরিচালিত শাসনের অনুরূপ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রস্তাব করিতে পারিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ চারিটী উপাদান বিগুমান নাই এবং তাহার প্রধান কারণ হিন্দু মুসলমানের কলহ। এই জন্যই তাঁহাদিগকে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিতে হইয়াছে। যাহাই হউক, তাঁহারা দ্বৈত-শাসন সম্পূর্ণভাবে রদ করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহার প্রস্তাব করিয়াছেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আমাদের হিতকর কি অহিতকর, তাহার আলোচনা আমরা এখানে করিব না। আমাদের কংগ্রেসই এক সময় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাহিয়াছিলেন। আজ যখন আমরা তাহা পাইতে বসিয়াছি, তখন জয়েণ্ট কমিটির সভ্যগণ আমাদের ধন্যবাদার্হ। হিন্দু মুসলমানের কলহ যে অতীব প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও সত্য। মুসলমান-গণ যখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের সমর্থন করিয়াছেন, তখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন অনুমোদন করিবার জন্য, আমরা জয়েণ্ট কমিটির ইংরেজ সভ্যগণকে দায়ী করিবার যুক্তি সমর্থন করিতে পারি না। দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিসংবাদ এত প্রকট থাকিলে তৃতীয় পক্ষ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সমর্থন করিতে পারেন না, তাহারও যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আমাদের যে পাওয়া উচিত তাহা যখন কমিটির সভ্যগণ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং হিন্দু মুসলমানের কলহই যখন আমাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন যাহাতে হিন্দু মুসলমানের কলহ ক্রমশঃ বিলীন হয়, তদনুরূপ কোনও একটা ব্যবস্থা শাসন-সংস্কারের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্তু ঐরূপ কোন ব্যবস্থা সমগ্র রিপোর্টখানিতে আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

শাসন-ব্যবস্থা যাহাই হউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট থাকিলে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হইলে, হিন্দু মুসলমানের কলহের অবসান হইতে পারে কি না তাহা চিন্তা করিবার জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টকে ও আমাদের দেশবাসীকে অনুরোধ করি।

শিক্ষা

ভারতীয় দর্শন মহাসভা

বিগত ৪ঠা হইতে ৬ই পৌষ (২০শে হইতে ২২শে ডিসেম্বর) পর্য্যন্ত ওয়ালটেয়ারে ভারতীয় দর্শন মহাসভার দশম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজের গবর্ণর উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি ছিলেন বোম্বাই প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার প্রিন্সিপাল মেকেঞ্জি এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সার রাধাকৃষ্ণন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিগ্যালয় হইতে বহু দার্শনিক পণ্ডিত এই অধিবেশনে সমবেত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শন—মহাসভার এই চারিটী শাখায় বহু সুচিন্তিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

আমাদের মতে এই জাতীয় মহাসভা দর্শন বিষয়ের উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট পথ।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

বিগত ১৩ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) তারিখে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। উক্ত অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন, যোধপুরের প্রধান মন্ত্রী ঠাকুর সিং চৈন সিংহ এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন ডাঃ জাকির হোসেন।

ডাঃ জাকির হোসেন তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে দুইটি পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। যথা—

১। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ করিতে হইবে এবং যাহাতে ভারতের যুবকগণ বৈদেশিকতার মোহে আকৃষ্ট না হইয়া জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। শিক্ষার সংস্কার করিতে গিয়া শুধু শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবর্ত্তন করিলেই চলিবে না, পরন্তু বিগ্যালয়গুলি যাহাতে চরিত্রগঠনের কেন্দ্র হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রজাশাসিত গবর্ণমেণ্টকে যদি প্রজার হিতকারী করিয়া তুলিতে হয়, তবে বিগ্যালয় সমূহে ছাত্রদিগকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা শুধু কেরাণীগিরির উপযোগী কতকগুলি পুঁথিগত বিগ্যার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া, সঙ্কল্পবদ্ধ কার্য্যের দ্বারা

সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে।

ডাক্তার জাকির হোসেনের শিক্ষাসম্বন্ধীয় চিন্তা যে অনন্য-সাধারণ তাহা তাঁহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার বক্তব্যে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভারতের "বৈশিষ্ট্য" বলিতে কি কেবল মাত্র ভারতের সেই সদ্‌গুণ গুলি বুঝিতে হইবে যাহা ভারতে আছে এবং অন্যান্য দেশে নাই? যে দোষগুলি ভারতের নিজস্ব অর্থাৎ অন্য কোনও দেশে নাই, সেই দোষগুলিও কি তাহার "বৈশিষ্ট্য" নহে? "বৈদেশিকতা"র মধ্যে কি কিছুই অনুকরণীয় নাই? "কেরাণীগিরির উপযোগী কতকগুলি পুঁথিগত বিদ্যা" বলিতে কি বুঝিতে হইবে? আমাদের মনে হয়, উপরোক্ত কথাগুলি বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইলে তাঁহার বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হইত।

উক্ত অধিবেশনে অন্যান্য যে সমস্ত বক্তা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের কমিশনার সার জর্জ্জ এ্যাণ্ডারসনের বক্তৃতার প্রতি আমরা পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তিনি তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

> ভারতে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি নানারূপ দোষযুক্ত বলিয়া উহার সংস্কারের জন্য একটি আন্দোলন দেখা যাইতেছে। ইহা সুখেরই বিষয়, কারণ দোষ আবিষ্কৃত হইলেই উহার প্রতিকারের উপায় হইয়া থাকে। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা দিন দিনই যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে উহার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। বৃটিশ ভারতে শতকরা প্রায় ৪০টি বালিকা বিদ্যালয়সমূহে বালকদের সহিত সহ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতের অগণিত গ্রামসমূহে বালিকাদিগকে ভিন্ন শিক্ষা-দান করা যখন সম্ভব নহে, তখন প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্ত সহশিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। মাত্র পুরুষ-শিক্ষকের অধীনে বালকদিগের সঙ্গে বালিকাদের সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর অধীনে বালিকাদিগের সঙ্গেও অল্প-বয়স্ক বালকদের সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, কারণ শিশুদের পক্ষে পুরুষ-শিক্ষক অপেক্ষা স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাদানই অপেক্ষাকৃত বেশী সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। অনুন্নত সম্প্রদায়ও আজকাল শিক্ষালাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভুলিয়া আজকাল সার্ব্বজনীন শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যবস্থা না করিলে শিক্ষার বিস্তার সম্ভব নহে। উহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যভাবের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা থাকে। বর্ত্তমানে গ্রামে গ্রামে মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহের প্রচলন দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই প্রচেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলে ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়সমূহে আজকাল খেলাধূলার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন ভারতের শিক্ষিতের হার, শিক্ষানু-রাগের উৎকর্ষ ও বেকার-সংখ্যার দিকে আমাদের নজর পড়ে, তখন বাস্তবিকই নিরাশ হইতে হয়। শিক্ষানুরাগের উৎকর্ষ ও বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাপকাঠি আরও শক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু উহাতে কোনরূপ লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর এবং প্রত্যেক স্তরেরই মূলে একটি নির্দ্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তি থাকিলে উক্ত সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হইতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার সময় তিন বৎসরের পরিবর্ত্তে পাঁচ বৎসর হওয়া উচিত, কারণ পাঁচ বৎসরের কমে মানুষের পক্ষে শিক্ষিত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। এই সময়ের পরে অধিকাংশ ছাত্রই জীবন-ধারণোপযোগী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে এবং বাকী অল্পাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা-লাভে অগ্রসর হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা আরও স্বল্পকাল স্থায়ী হইবে। ইহাতে বালকগণকে প্রায় ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা হইবে। ইহা সমাপ্ত হইলে অনেকে বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করিবে; কতক বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা করিবে এবং অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইবে। বৃত্তি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাপকাঠি উন্নত করা সম্ভব হইবে।

শিক্ষা কিরূপে কার্য্যকরী করিতে হইবে এবং শিক্ষাদ্বারা মানুষ কিরূপে উপার্জ্জনশীল হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা স্যার জর্জ্জ এণ্ডারসনের বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। জীবিকার জন্য কোন কার্য্যে অথবা চাকুরীতে কিরূপ গুণের প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিলে শিক্ষাদ্বারা ছাত্র যে উপার্জ্জনশীল হইতে পারে, তাহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু ছাত্র ঐ ঐ গুণ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা তাহা বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা স্থির না করিয়া ছাত্র "শিক্ষিত" হইয়াছে এই আখ্যায় তাহাকে অভিহিত করিলে উদ্দেশ্য সফল হইবে কি? আমাদের মনে হয়, পরীক্ষার মাপকাঠি শক্ত করিবারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

বিগত ১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) হইতে ১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর) পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রবাসী

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বহু প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলা বাঙ্গালার মহানগরী কলিকাতায় সমবেত হইয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি হইয়াছিলেন স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শাখায়—যথা—দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বৃহত্তর বঙ্গ, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, শিক্ষাবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ টাউনহলে মূল অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙ্গালীগণের সন্তোষবিধানকল্পে ঐ সময় সঙ্গীত ও প্রীতি-ভোজনাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সাধারণ-সভাপতি স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বাঙ্গালা ভাষার রূপ, পরিচ্ছদ, লিপি ও উচ্চারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালা ভাষার এখন কৈশোর। সংস্কৃত, আরবী ও পার্শী ভাষার শব্দ ধার করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করার চেষ্টা না করিয়া উহাকে প্রকৃতির দেওয়া মুক্ত জলবায়ু ও সূর্য্যের তাপে বাড়িতে দেওয়াই ভাল। ভাষা সকলের বোধগম্য হওয়াই উচিত। ভাষাকে দুর্ব্বোধ করা পাণ্ডিত্য হইতে পারে, কিন্তু সে ভাষা সাধারণের ভাষা নয়। আমাদের কথিত ও লিখিত ভাষায় অনেক বৈষম্য রহিয়াছে। কিন্তু জীবন্ত ভাষার পক্ষে এ ব্যবস্থা প্রার্থনীয় বলিয়া মনে হয় না। চলতি ভাষাকে "বাঙ্গালা" বলিলে বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশের লোকেরা তাঁহাদের নিজেদের প্রাদেশিক ভাষাকে বাঙ্গালা বলিয়া চালাইবেন, এই তর্কের খণ্ডনকল্পে তিনি বলিয়াছেন যে, যে-ভাষা 'ভাল লেখকরা' বলিবেন বা লিখিবেন সেইটাই **standard** ও সকলের গ্রাহ্য হইবে। বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি যেমন যে ভাষাতে আছে সেই ভাবেই গ্রহণ করা উচিত বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। উহার অনুবাদ করিবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণই নিরর্থক হইবে। তিনি বাঙ্গালা লিপিকে সংস্কৃত লিপিতে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। দেবনাগরী অক্ষর প্রচলন করিলে বঙ্গভাষার প্রচার বৃদ্ধি পাইবে এবং উচ্চারণেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। দেবনাগরী অক্ষর না চালাইয়া (**Roman**) রোম্যান অক্ষর চালান সম্ভবপর কিনা এবং তাহাতে কি সুবিধা হইতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত উক্ত বিষয়ক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

আমরা স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা বুঝিতে পারি নাই। বাঙ্গালা ভাষার এখনও কৈশোর, অতএব উহাকে প্রকৃতির দেওয়া মুক্ত জল বায়ু ও সূর্য্যের তাপে বাড়িতে দেওয়াই ভাল, এই কথায় কি বুঝিতে হইবে যে, কিশোর ও কিশোরীর চালচলন শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ বিশৃঙ্খলতার অনুমোদন করিলে কিশোর এবং কিশোরীর মঙ্গল সাধন করা হইবে? স্যার লালগোপাল বলিয়াছেন, ভাষা সকলের বোধগম্য হওয়া উচিত। খুব ভাল কথা। ভাষা নিজ নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য এবং অপরের মনোভাব বুঝিবার জন্য, ইহা ভাষা সম্বন্ধীয় চিরন্তন সত্য। অতএব ভাষা বোধগম্য না হইলে তাহা অর্থহীন হয়। কিন্তু বালক অভিজ্ঞ প্রবীণের চিন্তাপূর্ণ কথা বুঝিতে পারে না বলিয়া বালক, যাহাতে চিন্তাপূর্ণ প্রবীণ হইতে পারে তাহার চেষ্টা না করিয়া, চিন্তাশীল প্রবীণ যাহাতে বালক হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিবার যুক্তি আমরা বুঝিতে পারি না। বালক তাহার মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহাও ভাষা, আবার চিন্তাশীল প্রবীণ তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহাও ভাষা। বালকের মন অপরিপক্ব, কাজেই তাহার ভাবও অপরিপক্ব এবং তাহার ভাষাও ভাসা-ভাসা। প্রবীণের চিন্তা অপেক্ষাকৃত অনেক গভীর। সে চিন্তার তলদেশ সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত। তাহাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিবার উপায় শৃঙ্খলাসম্মত না হইলে সাধারণের পক্ষে তাহাকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের মনে হয়, বালকের ভাষাকে শৃঙ্খলিত করিবার নামই ভাষা-বিজ্ঞান। তাহা না করিয়া, ভাষাকে সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য কথিত ভাষা অথবা বালকের ভাষা রক্ষা করিবার চেষ্টা ভাষার অবনতি সাধন করা। বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজী রোম্যান অক্ষরে চালাইবার যুক্তি আমাদের অবোধ্য। আমাদের কথা কহিবার প্রণালী, কথা কহিবার বিষয় সমস্তই বিদেশীর নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে ধার করিয়া লইয়াছি। কেবল বাকী আছে আমাদের অক্ষরগুলি। সংস্কৃত অক্ষরের বৈজ্ঞানিকতা আমাদের বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়িলেও আমরা এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা অক্ষর লিখিতে লিখিতে মনে করিতে পারি যে, আমাদের নিজস্ব অক্ষর একটা কিছু ছিল। তাহা ছাড়িয়া দিয়া রোম্যান অক্ষর গ্রহণ করিলে আমাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইবে, না বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে? আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা হইবে, না পরাধীনতার মাত্রা বৃদ্ধি করা হইবে? আমরা আমাদের বর্ত্তমান "মনীষী"দিগকে মূল প্রকৃতির সহিত ভাষার সংযোগ কোথায়, মনোভাব প্রকাশ করার প্রকৃতিগত

শৃঙ্খলা কোন ভাষায় রক্ষিত রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

বিগত ১৭ই পৌষ (২রা জানুয়ারী) কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিংডন এই অধিবেশনের উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করেন। নাগা পাহাড়ের ডেপুটী কমিশনার ডাঃ জে. এইচ. হাটন সাধারণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শাখায়—যথা, কৃষি-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিতে বিভিন্ন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যে রকমেই হউক একটা চেষ্টা হইতেছে, ইহা খুব আনন্দের বিষয় এবং যাঁহারা এই চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। বিজ্ঞান-কংগ্রেসে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার কোথাও জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়, তাহা বুঝিবার মত কোনও উপায় আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। জ্ঞান বলিতে কি বুঝায় তাহা আমাদিগকে না বুঝাইয়া দিলে, বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কার্য্যাবলী জ্ঞানলাভ করিবার সহায়ক হইতেছে কি না, তাহা বিচার করিতে আমরা অসমর্থ।

জীবিকা

কৃষি

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকার ঠিক করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব বৎসরে যে পরিমাণ পাটের চাষ করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান বৎসরে তাহার ষোলভাগের এগার ভাগ মাত্র জমিতে পাটের চাষ করিতে হইবে।

পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ লইয়া বেশ একটা হৈ-চৈ পড়িয়াছে এবং তাহা সজীবতার লক্ষণও বটে। তবে তাহাতে দেশের অথবা আমাদের কৃষকদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা চিন্তাসাপেক্ষ।

শিল্প

বিগত ১২ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর) তারিখে কলিকাতায় নিখিল ভারত সাবান প্রস্তুতকারী সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন মিঃ টি. এন. বসু। মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতে কতকগুলি সাবানের কারখানা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া আপনাদের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতাও একটা প্রধান অন্তরায়। ইহা দ্বিবিধ—[১] ভারতে সাবান আমদানি [২] বিদেশিগণ কর্ত্তৃক ভারতে সাবান প্রস্তুত করা। সম্প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সাবান প্রস্তুতকারী মেসার্স লিভার ব্রাদার্স বোম্বাই ও কলিকাতায় দুইটী বৃহৎ সাবানের কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহারা খুব অল্প খরচে সাবান প্রস্তুত করিতে পারেন বলিয়া অনেক কম মূল্যে সাবান বিক্রয় করিতে পারিবেন।

এইরূপ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় চারিটি: (১) যে সকল কারখানা এখনও এই সমিতির সভ্য হয় নাই, তাহাদিগকে সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া সমবেতভাবে কাজ করা (২) কিরূপ গুণযুক্ত সাবান প্রস্তুত করিতে ও কি মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য একটী কেন্দ্রীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা (৩) সম্মিলিতভাবে কাঁচা মাল ক্রয় করা এবং (৪) প্রচার-কার্য্য।

ভূয়োদর্শন হইতে জিনিষ বুঝিবাবার সামর্থ্য জন্মে। ঐ সামর্থ্যের নাম জ্ঞান। ভূয়োদর্শনের সুযোগ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না ঘটিলে কোন জিনিষ বুঝিবার জ্ঞান অর্জ্জন করা ও তদ্বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। পরন্তু, পরস্পর প্রতিযোগিতা থাকিলে কোন জাতির কোন বিষয়ক জ্ঞানের আলোচনা যাহাতে প্রতিযোগী জাতি জানিতে না পারেন, তৎসম্বন্ধেও সতর্কতার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশীয় লোকের সাবান প্রস্তুত করিবার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের যেরূপ অভাব এবং প্রতিযোগিতা যেরূপ প্রকট, তাহাতে সম্মিলিত গবেষণা সম্ভব নহে এবং ঐরূপ কোন গবেষণা আরম্ভ করিলে প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করা ত দূরের কথা, পক্ষান্তরে প্রতিযোগীকেই সাহায্য করা হইবে। সাবানের কাঁচা মাল সম্মিলিত ভাবে ক্রয় করিবার কথাও একটি সুন্দর কল্পনা মাত্র! সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতায় শিল্প-বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধীয় কাজকর্ম্মের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট অভাবের পরিচয় আছে।

রাজ্য পরিচালনা

বঙ্গে নূতন রাজস্বের ব্যবস্থা

বাঙ্গালা সরকারের রাজস্বের কতক অংশ ভারত সরকার গ্রহণ করেন বলিয়া অবশিষ্টাংশে বাঙ্গালা সরকারের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। সুতরাং তাঁহারা

অতিরিক্ত ৫টী রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। (১) গৃহস্থালীর জন্য যে সব বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয় তাহার unit প্রতি অতিরিক্ত কর সংস্থাপন (২) থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতিতে ১৲ টাকারও কম মূল্যের টিকিটের উপর প্রমোদ-কর সংস্থাপন (৩) প্রবেট-কর বৃদ্ধি (৪) কোর্টফি বৃদ্ধি (৫) তামাক প্রভৃতির উপর কর সংস্থাপন।

বাঙ্গলার আয় বাড়াইবার চেষ্টা সৎপরামর্শসিদ্ধ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর অতিরিক্ত ট্যাক্স দিবার মত সামর্থ্য আছে কিনা তাহা চিন্তার বিষয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য যাঁহারা বায়বাহুল্য করেন, তাঁহাদের নিকট অতিরিক্ত ট্যাক্স চাহিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করা হয় না কি? এইরূপ শাস্তিপ্রদানের যুক্তি আপাত-দৃষ্টিতে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারাও ত দেশেরই লোক? তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের অবস্থাবিরুদ্ধ নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষ আকাঙ্ক্ষা না করেন, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া সরকার কি যুক্তিতে তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে বাধ্য করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ইংলণ্ড ও ভারতের শিল্প

ভারত ও সিংহলের বাণিজ্য-কমিশনার স্যার টমাস আইনস্কাফ তাঁহার ১৯৩৩-৩৪ সালের রিপোর্টে ভারতের রপ্তানির হার বৃদ্ধি পাইয়াছে, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রিটিশ পণ্যের সমৃদ্ধির কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের শিল্প-প্রতিষ্ঠাতাগণ স্পষ্টই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ভুলিয়া গিয়া সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে উভয়েরই স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা হইবে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠাতাগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া সহানুভূতিসম্পন্ন হইলে তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে যে যথেষ্ট সুবিধা হয় তাহা খুবই সত্য। কিন্তু ভারত ও ইংলণ্ডের শিল্প-প্রতিষ্ঠাতাগণ কার্য্যতঃ কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন?

অটোয়া চুক্তির জের

বিগত ২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী) তারিখে লণ্ডনে অটোয়া বাণিজ্য-চুক্তির অনুপূরক স্বরূপ ভারত ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উহাতে ৭টী দফার উল্লেখ আছে। এই চুক্তি অনুসারে ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশী পণ্যের উপর আমদানী-শুল্ক খুব বেশী পরিমাণে ধার্য্য করা দরকার হইলেও ব্রিটিশ পণ্য সম্পর্কে তাহা প্রয়োগ করা চলিবে না। ইস্পাত ও কার্পাস পণ্যের ন্যায় গ্রেট ব্রিটেন জাত অন্যান্য কতিপয় ব্রিটিশ পণ্যও অপরাপর দেশজাত পণ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম শুল্কে ভারতে আমদানী হইতে পারিবে। ইহা ছাড়া ভারত সরকার প্রবর্ত্তিত কোনও রক্ষণ-শুল্ক ব্রিটিশ পণ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মনে হইলে, গ্রেটব্রিটেন উক্ত শুল্ক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিনা তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য টেরিফ বোর্ডকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

শুরু ও শিষ্যের, চালক ও চালিতের চুক্তির অভিনয় দেখিবার জিনিষ বটে! সমস্ত কাঁচামালের দাম বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িতেছে না, ইহা কি এই চুক্তির পিছনে যে উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহারই সাফল্যের পরিচয়? গ্রেটব্রিটেনের আন্তর্জাতিক প্রাধান্য বজায় থাকা যে ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল তাহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্প বজায় না থাকিলে গ্রেটব্রিটেনের আন্তর্জাতিক প্রাধান্য বজায় থাকিতে পারে কি না তাহা আমাদের ইংরেজ বন্ধুগণের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

স্বর্ণ রপ্তানী

গ্রেটব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর হইতে বিগত ২৭শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী) পর্য্যন্ত ভারত হইতে মোট ২১৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩ শত ৪৫ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

ইহা কি সুসংবাদ?

ব্যক্তিগত

মহাত্মা গান্ধী

ভারতীয় গ্রামগুলির উন্নতিকল্পে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের যে একটা প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "যদি গবর্ণমেণ্ট আমাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি অতি আশ্চর্য্যজনক ফল দেখাইতে পারি। কিন্তু এই সাহায্য যথোচিত মনোভাব লইয়া করিতে হইবে। অন্য কথায় বলিতে গেলে, গবর্ণমেণ্টকে আমার কার্য্য-তালিকার মূল সূত্র উপলব্ধি করিতে হইবে।"

তকলী দ্বারা কি কি কাজ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন—"তকলী অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ। ইহার সহিত একটু বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগ হইলে অনেক কিছু উপকার সাধিত হইতে পারে।"

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

দৈনিক সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ যে, পণ্ডিত মালব্য আগামী এপ্রিল মাসে জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারি কমিটির

রিপোর্টের এবং বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। তৎপূর্ব্বে শীঘ্রই তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধমূলক সঙ্ঘসমূহের প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিবেন।

লর্ড উইলিংডন

প্রায় একমাস কাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ভারতের গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিংডন বিগত ২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী) তারিখে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে কয়েকটী বক্তৃতাও প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের (Associated Chamber of Commerce) বার্ষিক সভায় তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্বন্ধে বহু আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন। ইউরোপীয় এসোসিয়েসনের ডিনার-সভায় তিনি জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের সমর্থনকল্পে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সময় তিনি বলেন যে, বৈজ্ঞানিকগণই কেবল মাত্র সহজপ্রাপ্য জিনিষগুলি দ্বারা বহু প্রয়োজনীয় জিনিসের আবিষ্কার করিতে পারেন; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির সরবরাহ করিবার জন্য সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

স্যার জন এণ্ডারসন

লেবং ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন যথেষ্ট দয়া ও হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী

বিগত ২৮শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী) রবিবার প্রাতঃকাল ১১টা ৪০ মিনিটের সময় স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী পরলোক গমন করিয়াছেন।

ঢাকা নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার বাল্য-শিক্ষা সেইখানেই লাভ করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা মাদ্রাসা, ঢাকা কলেজ, লণ্ডন, ফ্রান্স, জার্ম্মেনি, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা লাভ করিয়া গ্রে'জ ইন হইতে ব্যারেষ্টারী পরীক্ষায় পাশ করেন। ইহা ছাড়া তিনি বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় আরবীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পি-এ্চ-ডি হন।

তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ১৯১১ সালে তিনি ঠাকুর 'ল'-প্রফেসর নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটেরও তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

১৯১০ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত উক্ত সভায় ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি একবার ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন এবং পরে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এবারও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বিরূপে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সাউথবরা কমিটির এবং সাইমন কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। ১৯২০ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি মেদিনীপুর জিলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

তিনি ইসলাম আইন এবং ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

ডাঃ অভয়ঙ্কর

মধ্য-প্রদেশের জনপ্রিয় নেতা ডাঃ অভয়ঙ্করের মৃত্যুতে মধ্যপ্রদেশ যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ১৯২৬ সালে তিনি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া দিয়া দেশের কাজে যোগদান করেন। ঐ সালেই তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এ বৎসরেও তিনি উক্ত পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[ফাল্গুন—১৩৪১

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—জনৈক "অর্থনীতির ছাত্র"

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা কি ও তাহার পূরণের উপায় কি তাহার অনুসন্ধান করিতে বসিয়া আমরা মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। ভারতবর্ষের সমস্যা অথবা সমস্যার পূরণের সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে যাহা কিছু আলোচনা হইতে পারে তাহা অর্থনীতি শাস্ত্রান্তর্গত; আর মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার কথা মনোবিজ্ঞানান্তর্গত। আমাদের পাঠকগণ হয়ত ভাবিতেছেন—অর্থনীতি শাস্ত্রের আলোচনায় এত মনোবিজ্ঞানের কথা আসে কেন? আবার কেহ কেহ হয়ত আমাদের প্রবন্ধের নাম শুনিয়া আগ্রহের সহিত তাহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্যাপূরণ কি রূপে হইবে, তাহার প্রত্যক্ষ বা সহজ আলোচনা না দেখিয়া বিফলমনোরথ হইতেছেন এবং মনোবিজ্ঞানের কচকচি শুনিয়া বিরক্তি অনুভব করিতেছেন।

আমাদের পাঠকদিগের কৌতূহল-নিবারণার্থ আমরা আমাদের আলোচনার গতি ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি তাঁহাদিগকে জানান প্রয়োজন মনে করি।

আমাদের বেকার যুবক, কৃষক, উকিল, ডাক্তার, দোকানদার, শিল্পী, বণিক্ প্রভৃতির হতাশাক্লিষ্ট রূপ প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে আমাদের অবস্থা যে খুব খারাপ হইয়াছে তাহার উপলব্ধি হয়। প্রতিদিন ঐ সমস্ত দুঃখের চেহারা এবং দুঃখের কাহিনী যাহারা শুনেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের তলে ডুবিয়া থাকিলেও অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও আপনাদিগকে দুঃখ-গ্রস্ত অনুভব করিতে বাধ্য হন। যে দেশের অধিকাংশ লোক অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট সে দেশে আত্ম-প্রতারণা না করিলে কেহ নিজেকে ঐশ্বর্য্যবান্ মনে করিতে পারে না। কাজেই, দেশের আপামর সকলের অবস্থায় একটা গোলমাল আসিয়াছে তাহা বলা যাইতে পারে। এই সব চিন্তার ফলে মনে প্রশ্ন হয়, দেশের এই লোকগুলির দুরবস্থা দূর করিবার উপায় কি? তাহার পরই মনে হয় সুখ দুঃখ অবস্থাবিশেষ এবং ইহা কোন না কোন কার্য্যের ফল। দেশের লোকগুলি এমন কোন্ কার্য্য করিতেছে যাহার ফলে এতাদৃশ কষ্ট পাইতেছে?

এমন কি কার্য্য করিতেছে, যাহার ফলে আমাদের দেশের লোক এত কষ্ট পাইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া বাহির করাই হইবে—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যার নিরূপণ।

আমাদের দেশের লোক এমন কি কার্য্য করিতেছে যাহার ফলে দৈনন্দিন জীবনে তাহারা এত কষ্ট পায়, তাহা পরিষ্কার না জানা থাকিলে কি করিয়া তাহাদের কষ্ট দূর হইতে পারে, তাহার উপায় সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে।

দেশের লোকের কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মধ্যে কি ত্রুটী আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, "জাতি কাহাকে বলে, দেশ কাহাকে বলে"—তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। আমরা প্রথমেই তাহার আলোচনা করিয়াছি।

জাতি ও দেশ বলিতে যাহা বুঝায় সে বিষয়ে একটু চিন্তা করিলেই আমাদের পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, মানুষ কি তাহা না জানা থাকিলে জাতি ও দেশ কি তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝা যায় না। অধিকন্তু, আমাদের দেশের লোক কি ভাবে চলিলে অথবা কি কার্য্য করিলে নিদারুণ অর্দ্ধাশন ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা হইবে দেশের সমস্যা-পূরণের উপায় নির্দ্ধারণ। তাহাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কাজেই দেখা যাইতেছে —যে দিক দিয়াই হউক, মানুষ কি তাহা জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু মানুষ কেন অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহার বিচারপ্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানের যতটুক আলোচনা দরকার ততটুকু আমাদিগকে না করিলে চলিবে না।

[সচরাচর মানুষের বিভিন্ন কার্য্যে যাহা পরিলক্ষিত হয় তাহাতে মানুষ বলিতে কি বুঝায়, মানুষের সহিত পশুর পার্থক্য কোথায়, এবং বিভিন্ন মানুষের কার্য্যে কি পার্থক্য দেখা যায় তাহার আলোচনা ছিল—আমাদের "মানুষ" প্রসঙ্গের প্রথম কথায়। তাহা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, মানুষ চারিটী পদার্থের সমষ্টি (যথা —ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা) ।

(অবশ্য আমরা এতাবৎ "পদার্থ" শব্দটী ব্যবহার না করিয়া "যন্ত্র" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। তাহার কারণ, ভারতীয় ঋষিদিগের পদার্থ-বিজ্ঞানে "পদার্থ" শব্দের অর্থ এবং তাহার ব্যাখ্যা বহু বিস্তৃত। "যন্ত্র" শব্দটী কার্য্যপ্রসঙ্গে চলতি ভাষায় সহজবোধ্য।)

বুদ্ধির উৎকর্ষ-সাধনের সামর্থ্যই মানুষের ও পশুর মধ্যে পার্থক্যের কারণ। মানুষের কার্য্য চারি রকম—যথা, ইন্দ্রিয়-প্রধান, মনঃপ্রধান, বুদ্ধিপ্রধান এবং আধ্যাত্মিক। তদনুসারে মানুষকে চারি শ্রেণীতে (যথা—ইন্দ্রিয়প্রবণ, মনঃপ্রবণ, বুদ্ধি-প্রবণ এবং আধ্যাত্মিক) ভাগ করা যায়, তাহাও দেখান হইয়াছে।

চারি শ্রেণীর মানুষ কি রকম কার্য্য করে তাহার আলোচনাও আমরা করিয়াছি।

সচরাচর মানুষ কি রকম কার্য্য করে তাহা জানিতে হইলে অতঃই নিম্নলিখিত প্রশ্ন উঠে ; যথা :

(১) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের কার্য্য করে কেন ?

(২) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের পদার্থ চায় কেন ?

(৩) বিভিন্ন মানুষ যে বিভিন্ন রকমের কার্য্য করে তাহাতে তাহার পরিণাম কি হয় ?

(৪) মানুষ কি করিলে তাহার কার্য্যের ধারা পরিবর্ত্তন করিতে পারে ?

(৫) উদ্দেশ্য কি হইলে তাহা মানুষের হিতকর হয় ?

(৬) কার্য্য কিরূপ হইলে তাহা মানুষের মঙ্গলজনক হয় ?

(৭) কোন মানুষ আদর্শ স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে ? ইত্যাদি।

"মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা" প্রসঙ্গে আমরা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতেছি।

যাহা না হইলে মানুষের বাঁচিয়া থাকা অনিশ্চিত হয়, পক্ষান্তরে, যাহা হইলে মানুষের জীবন রক্ষা করা সুনিশ্চিত, তাহাই মানুষের হিতকর। মানুষের যাহা হিতকর তাহার নাম তাহার "প্রয়োজন।" প্রয়োজন কি তাহা না জানিয়া, না বুঝিয়া মানুষ যাহা চায়, তাহার নাম মানুষের "আকাঙ্ক্ষা।"

"মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা কি" তাহার অনুসন্ধান করিতে বসিয়া আমরা তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা কয়েকটী অংশে বিভক্ত করিয়াছি।

তাহার মধ্যে একটী "বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম।" এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত তিনটী প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিব :

(১) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের কার্য্য করে কেন ?

(২) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের পদার্থ চায় কেন ?

(৩) বিভিন্ন মানুষ যে বিভিন্ন রকম কার্য্য করে তাহাতে তাহার পরিণাম কি হয় ?

বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের কার্য্য করে কেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে "কার্য্য" ব্যাপারটি কি তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। আমরা গত সংখ্যায় তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটী বলিয়াছি :

(১) প্রত্যেক কার্য্যে (কর্ম্মে) অন্ততঃ পক্ষে একটী কর্ত্তা এবং একটী বিষয় থাকে। কার্য্যের বিষয়ের অপর নাম কার্য্যের উদ্দেশ্য।

(২) মানুষের কার্য্যের রকম এবং বিষয়ের নির্ব্বাচনের ফলে কার্য্যশক্তির তারতম্য হয়।

(৩) মানুষের কার্য্যের রকমানুসারে তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির তারতম্য হয়।

(৪) মানুষ যে উদ্দেশ্যে কার্য্য করে তাহা হইতে যাহা পায়, তাহার তারতম্য এবং নিজশক্তির তারতম্যের প্রকারভেদে মানুষের অবস্থা নির্দ্ধারিত হয়।

(৫) মানুষের অবস্থার তারতম্য হয় তাহার কর্ম্মফলে।

(৬) মানুষ কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন না কোনটী সব সময়েই কার্য্য করিতেছে। নিদ্রার সময়েও মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে, স্বেদ নির্গত হয়। তাহা তাহার নাসিকা ও পায়ু ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। কাজেই, নিদ্রার সময়ও তাহার কার্য্যের বিরতি নাই।

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের সহিত সূত্র বজায় রাখিবার জন্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমাদের মূল বক্তব্যের অনুসরণ করিতেছি।]

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম

'বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কার্য্য করে কেন?' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই জানিতে ইচ্ছা হয়, 'মানুষ বিভিন্ন হয় কেন?' ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, মানুষ ইন্দ্রিয়-প্রবণ, মনঃপ্রবণ প্রভৃতি হয় বলিয়া বিভিন্ন হয়। যদি আবার প্রশ্ন করা যায় যে, মানুষ ইন্দ্রিয়প্রবণ, মনঃপ্রবণ প্রভৃতি হয় কেন? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়প্রধান, মনঃপ্রধান ইত্যাদি কার্য্য করে বলিয়া মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর হইয়া পড়ে। আবার যদি প্রশ্ন হয় যে, সে ইন্দ্রিয়প্রধান, মনঃপ্রধান কার্য্য করে কেন? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাহার ইন্দ্রিয়শক্তির অথবা মনঃশক্তির আধিক্য থাকে বলিয়া, এবং তাহারই ফলে সে ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃ-প্রবণ হইয়া পড়ে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি এবং মনঃশক্তি বলিতে কি বুঝায়? এবং মানুষের শক্তির তারতম্য হয় কেন?

কোন শব্দের অর্থ কি তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, লিখিতে বা কথা কহিতে আমরা যে সমস্ত শব্দের ব্যবহার করি তাহা ব্যাকরণের সংজ্ঞানুসারে ক্রিয়াবাচক কিংবা বস্তুবাচক অথবা বিশেষণবাচক হওয়া উচিত।

পদার্থ-বিজ্ঞানের সহিত উপরোক্ত সংজ্ঞা মিলাইয়া পড়িলে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি 'কর্ম্ম' সম্বন্ধীয়; বস্তুবাচক শব্দগুলি 'দ্রব্য' সম্বন্ধীয়; বিশেষণবাচক শব্দগুলি 'গুণ' সম্বন্ধীয়। কাজেই যে কোন শব্দ ধরা যাউক তাহাকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্মের মধ্যে কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধীয় হইতেই হইবে।

আমরা দুনিয়ায় যাহা কিছু বিচার করি, চিন্তা করি অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যবহার করি তাহা হয় দ্রব্য, না হয় গুণ, না হয় কর্ম্মসম্বন্ধীয়। আমাদের শব্দও উহাদের মধ্যে কোন না কোনটীর প্রকাশক হওয়া উচিত। ভাষায় যে সমস্ত শব্দের ব্যবহার হয়, যদি তদ্দ্বারা কোন্ দ্রব্যের কিংবা কোন্ গুণের অথবা কোন্ কর্ম্মের কথা বলা হইতেছে, তাহা না বুঝা যায় এবং চেষ্টা করিলেও দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষ না করা যায়, তাহা হইলে সেই শব্দে ভাষার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয় না এবং ভাষা নিষ্ফল হয়। এখানে "প্রত্যক্ষ" শব্দে বুঝিতে হইবে—হয় ইন্দ্রিয়, নতুবা মন, নতুবা আত্মার দ্বারা উপলব্ধি করা।

কাজেই, আমাদিগকে প্রথমে ঠিক করিতে হইবে শক্তি শব্দে কি প্রকাশ হয় এবং তাহা কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয়।

শক্তি শব্দ দ্রব্যবাচক অথবা গুণবাচক অথবা কর্ম্মবাচক তাহা ঠিক করিতে হইলে দ্রব্য কি, গুণ কি এবং কর্ম্ম কি তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

ভারতীয় ঋষিদিগের পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের মতে—দ্রব্য নয়টী, যথা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, মন, আত্মা।

প্রত্যেক পদার্থের দুইটী অবস্থা—যথা, 'বিকৃতি' (বায়বীয়) এবং 'বিকার' (তরল এবং কঠিন)।

গুণ সতেরটী, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন।

কর্ম্ম বলিতে বুঝায় ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় মানুষ যাহা করে।

মানুষের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন-দ্রব্য ও আত্মা-দ্রব্য প্রকৃতির বিকৃতি অবস্থায় (অর্থাৎ, বায়বীয় অবস্থায়) আছে। (আত্মা ও মন-দ্রব্যের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।)

আধ্যাত্মিক মানুষে আত্মা-দ্রব্যের আধিক্য থাকে বটে,

কিন্তু তাহার বিকাশ ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়া হয় না। বুদ্ধি-প্রবণ মানুষে, আধ্যাত্মিক মানুষের তুলনায় আত্মাদ্রব্য কম থাকে, কিন্তু মনঃপ্রবণ এবং ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের তুলনায় আত্মা-দ্রব্য বেশী থাকে এবং তাহারও কার্য্যের বিকাশ হয় ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়। মনঃপ্রবণ মানুষে আত্মা-দ্রব্য কমিয়া গিয়া মন-দ্রব্যের আধিক্য হয় এবং তাহারও কার্য্য হয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষে মনঃপ্রবণ মানুষ অপেক্ষাও মন-দ্রব্য কমিয়া গিয়া, দিক্, কাল প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যের আধিক্য ঘটে এবং তাহারও বিকাশ হয় ইন্দ্রিয়ের সহায়তায়। কাজেই ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়া কোন শ্রেণীর মানুষেরই কোন কার্য্য হয় না।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে শক্তি শব্দটী যে কোন "কর্ম্ম" নহে তাহা বুঝিতে পারা যায় বটে, কিন্তু উহা "দ্রব্য" অথবা "গুণ" তাহার ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। উহা দ্রব্য অথবা গুণ তাহার উপলব্ধি না করিতে পারিলে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব নহে। কাজেই, শক্তি দ্রব্য অথবা গুণ তাহার উপলব্ধি করিতে হইলে নয়টী দ্রব্য এবং সতেরোটী গুণ কি পদার্থ, তাহারও উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়।

"দ্রব্য" অথবা "গুণ" কি পদার্থ তাহার উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায় নিজের সমস্ত অবয়বে কি আছে এবং তাহার সহিত বিশ্ব-সংসারের কি সম্বন্ধ তাহা লক্ষ্য করা।

মানুষের দেহে দশটী ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি আছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহারাই বা কি পদার্থ এবং কিরূপে তাহাদের কার্য্য সঙ্ঘটিত হয় তাহা সহজে বুঝা যায় না। নিজের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অবয়বে কি কি উপাদান আছে, তাহা বুঝিতে হইলে শরীর-স্থান বিদ্যার এবং শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার (Physiology & Anatomy) সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য ফিজিওলজি এবং অ্যানাটমী হইতে "মাইণ্ড"(মন) এবং "ইনটেলেক্‌ট্"(বুদ্ধি), দ্রব্য অথবা গুণ তাহা বুঝা যায় না।

আমাদের ঋষিদিগের দর্শন শাস্ত্র যে অর্থে বর্ত্তমানে প্রচলিত, তাহাতেও ইন্দ্রিয়শক্তি, অথবা মন, অথবা বুদ্ধি আমাদের অবয়বের মধ্যে কোথায় এবং কি অবস্থায় অবস্থিত তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। অথচ ভারতীয় ঋষিগণ যে, তাঁহাদের দর্শন-শাস্ত্রে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ্ প্রভৃতির শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। জীবের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং আত্মার কি কার্য্য, তাহারা কোন্ দ্রব্যে নির্ম্মিত, তাহাদের গুণ কি; জীব কি করিয়া কোথা হইতে তাহার অবয়বের উপাদানগুলি সংগ্রহ করে, কেন তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিরূপেই বা তাহাদের ক্ষয় নিবারিত হইতে পারে; এবংবিধ বিষয় সম্বন্ধে ভারতের দর্শন শাস্ত্র হইতে আমাদের যে ধারণা হইয়াছে তাহা প্রচলিত ধারণার বিরোধী। তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে গেলে বিরোধের আশঙ্কা আছে। বিরুদ্ধ ধারণা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ না করিলে প্রচলিত ধারণা কোথায় অসম্পূর্ণ এবং কিসের জন্য তদ্বিরোধী কথা বলিতে হইতেছে তাহা বুঝা যায় না। বিশেষ, বিস্তৃত ভাবে ফিজিওলজি এবং অ্যানাটমীর আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধ নহে। কাজেই, যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

মানুষের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অবয়বের দিকে এবং তাহাদের কার্য্যের দিকে লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত পদার্থ এবং কার্য্যকলাপ কয়েকটী সহজেই লক্ষ্য করা যায়:

[১] মানুষের ইন্দ্রিয় দশটী; ইহারা ভিতরকার কোন পদার্থের সহায়তা না পাইলে কোন কার্য্যই যে করিতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

[২] মানুষের শরীরের যে কোন স্থান পুরাপুরি দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলে, তাহার বাহিরের আবরণে মাংসের সমষ্টি দেখা যায় এবং ভিতরে যাহা আছে তাহা কতকগুলি তরল ও কঠিন পদার্থে বিভক্ত করা যায়। কঠিন পদার্থগুলিতে কাঠিন্যেরও তারতম্য আছে এবং সে তারতম্য বহু। কোনটা খুব শক্ত অস্থি, আবার কোনটা খুব নরম, কোনটা স্নায়ুর মত টলটলে। তরল পদার্থগুলিতেও তারল্যের তারতম্য আছে এবং সে তারতম্যও বহু। কোনটা শুক্রের মত গাঢ়, কোনটা জলের মত তরল, আবার কোনটা রক্তের মত অর্দ্ধ-গাঢ়।

[৩] মানুষের শরীরের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে বায়বীয় পদার্থের চলাচল হইতে পারে না। আপাত-

:তে, যে অস্থি অত্যন্ত কঠিন তাহাও মানুষ মরিয়া গেলে যে-কাঠিন্য অবলম্বন করে মানুষের জীবিতাবস্থায় তাহার তত কাঠিন্য যে থাকে না—তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। জীবিত মানুষের অস্থির অণু-পরমাণুর ভিতরেও বায়বীয় পদার্থ চলাচল করিতে পারে।

[৪] মানুষের আভ্যন্তরীণ বায়বীয় পদার্থ গাঢ়ত্বানুসারে বহুশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

[৫] মানুষের শরীরের ভিতরকার উপরোক্ত কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থগুলির গুণের (property) ভিতরও যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। এমন দুইটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না যাহার একটীর কোন গুণ অপরটীর মধ্যে লক্ষ্য হয় না।

[৬] মানুষকে অনবরত নিঃশ্বাস লইতে এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হইতেছে এবং সে তাহার শরীরের ভিতর বায়ুর সঞ্চয় করিতেছে। যে মুহূর্ত্তে তাহার আভ্যন্তরীণ সঞ্চিত বায়ু শরীরের কোন স্থানে চলাচল করিতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই শরীরের সেই স্থান ব্যাধিগ্রস্ত হয়। এবং আভ্যন্তরীণ সঞ্চিত বায়ু নিঃশেষিত হইয়া গেলে অথবা নিঃশ্বাসগ্রহণ বন্ধ হইলে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মানুষ আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বস্তুতে নির্ম্মিত, এই বস্তুগুলি বিভিন্ন গুণসম্পন্ন এবং তাহাদের কার্য্যও বিভিন্ন। কিন্তু মানুষের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অবয়বের এবং তাহাদের কার্য্যকলাপের দিকে একটু মনোযোগ করিয়া লক্ষ্য করিলেই, ঐ আপাতবৈষম্যের মধ্যেও তাহার উপাদানে একটা শৃঙ্খলা, তাহার নির্ম্মাণে একটা শৃঙ্খলা, তাহার উপাদানগুলির গুণে একটা শৃঙ্খলা এবং তাহাদের (উপাদানগুলির) কার্য্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে, ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার নিঃশ্বাসগ্রহণের বিশৃঙ্খলা হইলে তাহার কার্য্যকলাপের বিশৃঙ্খলা হয় এবং নিঃশ্বাস-গ্রহণ বন্ধ হইলেই তাহার মৃত্যু ঘটে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া যদি বলা যায় যে, মানুষের জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান ঐ বায়ুর ভিতর বায়বীয় অবস্থায় আছে, তাহা হইলে তাহা নিতান্ত অলীক মনে করিবার কারণ থাকে না।

ইহার উপর যদি আবার মানুষের শরীরের সমস্ত উপাদান গুলির যত রকম গুণ আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বিভিন্ন গুণগুলি নয় শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহা হইলে তাহার শরীরে যে নয় শ্রেণীর পদার্থ আছে, ইহাও বলা যাইতে পারে।

মানুষের শরীরে ঠিক নয় শ্রেণীর পদার্থ আছে কিনা তাহা আমরা পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাই নাই বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে এবং আমরা তাঁহাদের নিষ্কারণ বিশ্বাস করি।

তাঁহাদের কথা অনুসারে, নয় শ্রেণীর পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় মিলিত হইয়া বায়বীয়, তরল এবং কঠিন অবস্থায় আমাদের রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি আকারে শরীর গঠন করিয়াছে। পরিদৃশ্যমান আকাশের ভিতরও এই নয়টী পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় মিলিত হইয়া বায়বীয় অবস্থায় রহিয়াছে। মাত্রার তারতম্যের জন্য গাঢ়ত্বের তারতম্যের ফলে বায়বীয়, তরল ও কঠিন অবস্থা সংঘটিত হয়। মাত্রার তারতম্য সংগঠনে শৃঙ্খলা আছে এবং তারতম্য কেন হয়, তাহারও বিশ্লেষণ হইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত জানা গেল যে, মানুষের শরীর নয়টী পদার্থে গঠিত এবং তাহার তিন অবস্থা; যথা—কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। এবং পরিদৃশ্যমান আকাশ এই নয়টী পদার্থের বায়বীয় অবস্থার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু ঐ নয়টী পদার্থ কোথা হইতে কি করিয়া উৎপন্ন হয় এবং মানুষের শক্তি বলিতে কি বুঝায় তাহা কিছুই বোঝা গেল না।

কাজেই, নয়টী পদার্থের সৃষ্টিরহস্য ও মানুষের শক্তি কাহাকে বলে এবং তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে ঋষিগণ কি বলিয়াছেন তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই:

১। বিশ্বসংসারে যত কিছু বস্তু আছে তাহা মূলতঃ দুইটী উপাদানে গঠিত। সমস্ত বস্তুর অযুগ্ম উপাদান (element) এই দুইটী। তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বায়বীয় অবস্থায় আছেন। ইঁহাদের মধ্যে একটীর উপাদানের কখনও কোন বস্তুর সহিত রাসায়নিক

সংযোগ(chemical connection)* হয় না। সমস্ত বস্তুর সহিত তাঁহার যে সংযোগ আছে তাহাকে বাহ্যিক সংযোগ (physical connection)† বলা যাইতে পারে। এই সংযোগ প্রত্যেক বস্তুর অণু এবং পরমাণুর সহিতও আছে। ঋষিগণের ভাষায় এই উপাদানটীর নাম **পরম ব্রহ্ম**। চল্‌তি কথায় ইহাঁকেই "দুনিয়ার মালিক" বলা হয়। ইনি কখন কোথাও একেলা থাকিতে পারেন না। সমস্ত বস্তুর সহিত তিনি বায়বীয় অবস্থায় মিলিত হইয়া রহিয়াছেন। অপর অযুগ্ম উপাদানের নাম ঋষিগণের ভাষায় **পরা প্রকৃতি**। তিনি বায়বীয় অবস্থায় সমস্ত বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া আছেন। সমস্ত বস্তুর সহিত তাঁহার মিলনকে রাসায়নিক সংযোগ বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত দুইটী অযুগ্ম কারণেরই (elements) মূলতঃ কোন গুণ (property) নাই। দুইটীই সর্ব্বদা বায়বীয় অবস্থায় আকাশে এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। পরম-ব্রহ্ম কখনও কোন গুণ-(property)-বিশিষ্ট হন না। যে পদার্থের সহিত তিনি মিলিত হন সেই পদার্থের গুণই তাঁহার গুণ বলিয়া মনে হয়।

পরা-প্রকৃতির মূলতঃ কোন গুণ(property) না থাকিলেও তাঁহার সহিত পরম-ব্রহ্মের মিলন হইলেই তিনি গুণবিশিষ্টা হন। এবং মানুষের কাছে তিনি সর্ব্বদা গুণবতী। পরা-প্রকৃতি নিজে কোন কাজ করেন না। দুনিয়ায় যত কিছু কার্য্য হয় তাহা পরম-ব্রহ্মের কর্ম্ম। পরম-ব্রহ্ম একটু কালও চুপ করিয়া থাকেন না। আবার তিনি একাকীও কার্য্য করেন না। তাঁহার সমস্ত কাজ প্রকৃতির সহায়তায়। যে পদার্থ যেরূপ গুণসম্পন্ন হয় তাহার সংযোগে তিনি সেইরূপ কার্য্য করেন অর্থাৎ পদার্থের গুণানুসারে পদার্থের কার্য্য হয়।

২। পরম-ব্রহ্ম একক থাকিতে পারেন না। তিনি পরা-প্রকৃতির সহিত মিলিত হন এবং মিলিত হইলেই একটি গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় ঋষিদিগের ভাষায় প্রথম সৃষ্ট দ্রব্যটীর নাম "আ ত্মা" এবং উহার গুণের নাম "বু দ্ধি।" এই দ্রব্যটি বায়বীয় অবস্থায় প্রত্যেক জীবের ভিতর বিদ্যমান রহিয়াছে এবং জীবস্থিত ইহার নাম "জী বা ত্মা।" কোন কোন ঋষি ইহাকে "পু রু ষ" নামেও আখ্যাত করিয়াছেন। এই আত্মা-পদার্থের সহিত পরা-প্রকৃতির মিলন হইলে দ্বিতীয় গুণবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয়। ঋষিদের ভাষায় দ্বিতীয় পদার্থের নাম "ম ন" এবং উহার গুণের নাম "অ হ ঙ্কা র"। মনও একটি বায়বীয় পদার্থ। "আমি", "আমার", "আমার জন্য কোন্ কার্য্যটি করিব" এবংবিধ ভাবনা "অহঙ্কার" নামক গুণের অভিব্যক্তি।

এইরূপে আত্মা এবং মনের পর একটী একটী করিয়া নয়টী পদার্থের সৃষ্টি হয়।

প্রথমে ছিল পৃথক পৃথক দুইটী অযুগ্ম কারণ। তাহার পর দুইটী অযুগ্ম কারণের সংমিশ্রণে একটী গুণবিশিষ্ট মিশ্রিত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর পরা-প্রকৃতি ও একটী মিশ্রিত দ্রব্যের মিলনে, নূতন গুণবিশিষ্ট দ্বিতীয় মিশ্রিত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পর পরা-প্রকৃতির ও দুইটী মিশ্রিত দ্রব্যের সংযোগে নূতন গুণবিশিষ্ট তৃতীয় মিশ্রিত দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে মিশ্রণের মাত্রার বৃদ্ধির সহিত পৃথক

---

* যখন দুইটি বস্তুর সংযোগে তৃতীয় বস্তুর উদ্ভব হয় এবং উৎপন্ন বস্তুর অণু এবং পরমাণুর (property) উপাদান, বস্তু দুইটির অণু এবং পরমাণুর গুণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তখন সেই সংযোগকে রাসায়নিক সংযোগ বলা হয়। ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে "রূপ" একটি গুণ তাহা আগেই বলা হইয়াছে। রসায়ন-শাস্ত্র পড়িলে রাসায়নিক সংযোগের বিদ্যা লাভ করা যায়।

চাউল আর জল মিশাইয়া উত্তাপ দিলে ভাত হয়। ভাতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ—চাউলের রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কাজেই চাউল এবং জলের এই মিলন অথবা সংযোগকে রাসায়নিক সংযোগ বলা যায়।

† দুইটি বস্তুর যে সংযোগে তাহাদের অণু এবং পরমাণুর কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া তৃতীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়, সেই সংযোগকে বাহ্যিক সংযোগ বলে। পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) পড়িলে বাহ্যিক সংযোগের বিদ্যা লাভ করা যায়।

দুইখানি লোহার পাত জুড়িয়া বড় একখানি লোহার পাত প্রস্তুত করা বাহ্যিক সংযোগ।

পৃথক গুণবিশিষ্ট নয়টী দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সমস্ত দ্রব্যের মধ্যেই পরা-প্রকৃতি আছেন, কিন্তু মিশ্রণের মাত্রার বৃদ্ধির সহিত মিশ্রিত দ্রব্যের পরিমাণের তুলনায় পরা-প্রকৃতির পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই নয়টী পদার্থই যুগ্ম বটে, কিন্তু তাহাদিগকে মৌলিক পদার্থ বলা যাইতে পারে। ঋষিদিগের ভাষায় তাহাদিগের প্রত্যেককে এক একটী দ্রব্য বলা হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, দ্রব্য শ্রেণীভুক্ত যে সমস্ত পদার্থ তাহারা সর্ব্বদা দ্রবীভূত অথবা বায়বীয় অবস্থায় বিদ্যমান।

৩। আত্মা-দ্রব্যের গুণ(property) বুদ্ধি। তাহারই পর অহঙ্কার গুণের উৎপত্তি। যে দ্রব্য অহঙ্কার-গুণবিশিষ্ট, তাহার নাম মন। এক গুণবিশিষ্ট দ্রব্য অন্য গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত মিলিত হইলে মিশ্রিত দ্রব্যে দুইটী মিলিত দ্রব্যের দ্রব্যত্ব থাকিয়া যায়, এবং দুইটী গুণ(property) মিলিয়া তৃতীয় একটী গুণের উদ্ভব হয়, কিন্তু তাহাতে মিলিত দ্রব্যদ্বয়ের দুইটী বিভিন্ন গুণ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। মন-দ্রব্য অহঙ্কার-গুণবিশিষ্ট বটে, কিন্তু তাহার ভিতর বুদ্ধি-গুণের একান্ত অভাব।

৪। দুইটী দ্রব্য মিলিয়া যখন একটী দ্রব্য হয় তখন যে দ্রব্য দুইটীর মিলনে তৃতীয় দ্রব্যটী হয়, সেই দুইটী দ্রব্যকে 'কারণ-দ্রব্য' বলা হয়। তৃতীয় দ্রব্যটীকে 'কার্য্য-দ্রব্য' বলে। দ্রব্যগুলি কারণ-দ্রব্যের সংখ্যানুসারে পরে পরে সজ্জিত থাকে। আত্মা-দ্রব্যের কারণ একমাত্র পরা-প্রকৃতি, মন-দ্রব্যের কারণ আত্মা-দ্রব্য এবং পরা-প্রকৃতি, এবং দিক্-দ্রব্যের কারণ পরা-প্রকৃতি, আত্মা এবং মন। কাজেই, আত্মা-দ্রব্য যে স্থানে রহিয়াছেন তাহার পর আছেন মন-দ্রব্য, এবং তাহার পর আছেন দিক্-দ্রব্য। এই রূপে পরপর পৃথিবী-দ্রব্য পর্য্যন্ত আকাশে সজ্জিত আছে।

৫। আত্মা প্রভৃতি নয়টী দ্রব্য বায়বীয় অবস্থায় একটীর পর একটী সজ্জিত আছেন। ইহাদের এক একটী দ্রব্য পরে পরে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের এক একটী স্তরকে এক একটি "লোক" বলা যাইতে পারে। যথা, পৃথিবী-লোক, আপ-লোক, তেজ-লোক, বায়ুলোক ইত্যাদি।

(ভারতীয় ঋষিদিগের মধ্যে কেহ কেহ সাতটী পদার্থ এবং সাতটী লোকের কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা কাল এবং দিককে দ্রব্য শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। তাঁহাদের কথায় কাল ও বায়ু-দ্রব্যের দ্রব্যত্ব এবং দিক ও তেজ দ্রব্যের দ্রব্যত্ব প্রায় একরূপ। আমাদের মনে হয়, কাল ও বায়ুর মধ্যে এবং দিক ও তেজের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও গাঢ় চিন্তা করিলে সামান্য পার্থক্য পাওয়া যায়। কাজেই আমরা কাল ও দিককে পৃথক দ্রব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। দ্রব্যের বায়বীয় অবস্থাকে "প্রকৃতির বিকৃতি" বলা হয়।)

৬। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে নয়টী দ্রব্যের সৃষ্টি পর্য্যন্ত সৃষ্টির নিয়ম এই যে, পূর্ব্বে সৃষ্ট দ্রব্যগুলি একত্র মিলিত হইলে পরবর্ত্তী দ্রব্যের সৃষ্টি হয়; কোন দ্রব্য পৃথক্ ভাবে কোন দ্রব্যের সহিত মিলিত হয় না বা অপর কোন দ্রব্যের সৃষ্টি করে না। উদাহরণস্বরূপ, ব্যোম-দ্রব্যের সৃষ্টির পর সৃষ্টির অবস্থার কথা চিন্তা করা যাক। ব্যোম-দ্রব্য সৃষ্টি হইলে বিশ্বে আত্মা, মন, দিক, কাল এবং ব্যোম-দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন পুনরায় পরা-প্রকৃতি আত্মা, মন, দিক, কাল এবং ব্যোম-দ্রব্যের সহিত এক যোগে মিলিত হইবেন এবং ঐ মিলনের ফলে মরুৎ-দ্রব্যের সৃষ্টি হইবে। শুধু ব্যোম-দ্রব্যের সহিত অথবা ব্যোম ও আত্মা-দ্রব্যদ্বয়ের সহিত পরা-প্রকৃতি মিলিত হইবেন না বা অন্য কোন পৃথক দ্রব্য সৃষ্টি করিবেন না।

কিন্তু নয়টী দ্রব্যের সৃষ্টির পর আটটী দ্রব্য কখনও একটী একটী করিয়া, কখনও দুইটী দুইটী করিয়া, কখনও তিনটী তিনটী করিয়া, কখনও চারিটী চারিটী করিয়া, কখনও পাঁচটী পাঁচটী করিয়া, কখনও ছয়টী ছয়টী করিয়া, কখনও সাতটী সাতটী করিয়া, কখনও বা এক সঙ্গে, পৃথিবী

নামক দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়। ইহারই নাম বিভিন্ন মাত্রায় মিলন। এই বিভিন্ন মাত্রায় মিলিত পদার্থ পরা-প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া গ্রহ, উপগ্রহ, জল, স্থল এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ প্রভৃতি বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি করে। মাত্রার এই বিভিন্নতার জন্যই বায়বীয় অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া তরল এবং কঠিন অবস্থার উদ্ভব হয়। এই কঠিন ও তরল অবস্থাকে পূর্ব্বে পরা-প্রকৃতির "বিকার-অবস্থা" বলা হইয়াছে। তরল এবং কঠিন অবস্থার পদার্থগুলির মধ্যে সাধারণতঃ আত্মা-দ্রব্যের পরিমাণ, বায়বীয় অবস্থার মধ্যস্থিত আত্মা-দ্রব্যের পরিমাণের তুলনায় কম। আত্মা-দ্রব্যের পরিমাণ কম থাকা বশতঃ তরল এবং কঠিন অবস্থার পদার্থগুলির কার্য্যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত না হইলে প্রকৃতির বিরোধিতা আসিয়া পড়ে এবং ফলে "পৃথিবী-লোক" কলুষিত হয় এবং জীব নানারূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে।

এক্ষণে আমরা আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়—মানুষের উপাদান নয়টী পদার্থের সৃষ্টি কি করিয়া হয়; মানুষের শক্তি কাহাকে বলে ও তাহার উপলব্ধি করিতে পারা যায় কিনা,- তৎসম্বন্ধে উত্তর কি হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করিব।

বায়বীয় অবস্থায় আকাশে স্থিত নয়টী দ্রব্যের গুণ এবং মানুষের উপাদান-পদার্থের গুণ যদি এক হয়, তাহা হইলে মানুষের উপাদানে এই নয়টী দ্রব্য বিদ্যমান, তাহা বলা যাইতে পারে। কাজেই আকাশস্থিত নয়টী দ্রব্যের গুণ এবং মানুষের উপাদান-পদার্থের গুণ জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে।

কোন পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া যথাযথ ভাবে তাহার গুণ জানিবার উপায় দুইটী। যথা :

[১] পদার্থটীর আবয়বিক বিশ্লেষণ :

অর্থাৎ, পদার্থটীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্লেষণ করা। তাহা মাইক্রস্কোপ এবং ষ্টেথেস্কোপ দ্বারা কতক অংশে হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন দ্রব্যের দ্রব্যত্ব যথাযথভাবে জানা, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন ছাড়া হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। পরা-প্রকৃতির সাহায্যে পরম-ব্রহ্ম যে যন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন তৎসদৃশ কোন যন্ত্র মানুষ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে কি? যন্ত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য না হইলে তাহার উপর নির্ভর করা কতদূর সঙ্গত তাহাও বিচারসাপেক্ষ। কি করিয়া ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, তৎ সম্বন্ধে বহু আলোচনা ঋষিগণ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

[২] পদার্থটীর নামের শব্দগত বিশ্লেষণ :

ভাষার গঠন পরা-প্রকৃতির অনুগত না হইলে এবং পদার্থের নামকরণ তৎসম্মত না হইলে শব্দগত বিশ্লেষণ নিষ্ফল হয়। মানুষের জীবন তাহার নিকট-বর্ত্তী হাওয়ার (বায়বীয় পৃথিবীলোকের) সহিত সংযোগে। তাহার মনের ভাবের তারতম্যানুসারে নিশ্বাসগ্রহণের তারতম্য হয়; ক্রোধাবিষ্ট হইলে এক রকম ভাবে নিশ্বাস লয়, আর কামাবিষ্ট হইলে অন্য রকম ভাবে নিশ্বাস লয়, ইত্যাদি। তাহার নিশ্বাসগ্রহণের তারতম্যানুসারে তাহার শব্দের তারতম্য হয়, যথা, ক্রোধাবিষ্ট অবস্থার আওয়াজ আর কামাবিষ্ট অবস্থার আওয়াজ। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া যে ভাষার বর্ণমালা, বর্ণযোজন, পদগঠন এবং বাক্য-প্রণয়ন প্রণালী প্রস্তুত করা হয় তাহাকে পরা-প্রকৃতির অনুগত বলা যাইতে পারে। এই রূপ ভাষায় পদার্থের নামকরণ করা হইলে নামের মধ্যেই নামের অর্থ থাকিয়া যায়। এই ভাষা জানা থাকিলে কোন নামের অর্থের জন্য সংজ্ঞা-প্রণয়নের অথবা অভিধানের প্রয়োজন হয় না। কেহ তাঁহার ভূয়োদর্শনপ্রসূত কোন জ্ঞানের কথা বলিয়া গেলে অথবা লিখিয়া গেলে তাঁহার ভাষা হইতেই নিখুঁত ভাবে তাহা বুঝা যায়। এবং পরবর্ত্তী জ্ঞানের প্রসার সাধন করিতে পারা যায়।

সংস্কৃত ভাষার "আত্মা", "মন", "বুদ্ধি" প্রভৃতি শব্দের

মধ্যেই তাহাদের অর্থ নিহিত আছে। ইংরাজী সোল (Soul), মাইণ্ড (Mind), ইনটেলেক্‌ট (Intellect) প্রভৃতি শব্দের মধ্যে তাহাদের কোন অর্থ নিহিত নাই।

ঋষিদিগের কথানুসারে আকাশে স্থিত নয়টী দ্রব্য যখন বায়ুর সহিত আমরা নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করি তখন তাহা শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। স্পর্শানুভূতির অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে এই বায়ুর স্পর্শ কিরূপ তাহা জানা সম্ভব এবং আমাদের শরীরের বিভিন্ন উপাদানগুলির গুণও জানা সম্ভব। ভারতীয় ঋষিগণ যে, এইরূপ ভাবে পৃথিবীলোকের দ্রব্যগুলির এবং মানুষের শরীরের উপাদানসমূহের গুণ নির্ণয় করিয়া তাহার ঐক্য সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা মনে করিবার যথেষ্ঠ কারণ আছে।

সংস্কৃত ভাষার বিজ্ঞান যথাযথ ভাবে জানা হইলে আমাদের মনে হয়, স্পর্শানুভূতির, শব্দানুভূতির উৎকর্ষসাধনের উপায় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষেও ঐ গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। ঐগুণগুলির কথা নিখুঁত ভাবে জানা না থাকিলেও প্রচলিত সংস্কারানুসারে, হাওয়ায় যে আমাদের প্রাণ আছে তাহা বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় না।

কাজেই বলা যাইতে পারে যে, আত্মা, মন প্রভৃতি দ্রব্য হইতেই আমাদের শরীরের উৎপত্তি। বায়বীয় অবস্থা হইতে কি করিয়া তরল এবং কঠিন অবস্থা সঙ্ঘটিত হয় তাহাও আগে বলা হইয়াছে। শরীর-গঠন প্রণালীর দিকে চাহিয়া কিরূপে নিঃশ্বাস লইতেছি, তাহা কিরূপে ফুসফুসে যাইতেছে, হৃদ্‌যন্ত্রে কি ভাবে তাহার শোধন হইতেছে, হৃদ্‌যন্ত্র কতটুকু কাল নিঃশ্বাসের সহিত গৃহীত দ্রব্যগুলির শোধনে ব্যস্ত, আর কতটুকু কাল খাদ্যাদি হইতে গৃহীত দ্রব্যগুলির শোধনে ব্যয় করেন—তৎসম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিলে আমাদের কথার সার্থকতা বুঝা যায়।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমাদের পাঠকদিগকে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের শরীর কিসের দ্বারা গঠিত তৎসম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিলে, তাঁহাদের খাদ্য কি হওয়া উচিত তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন এবং তখন তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার হাত হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাইবেন এবং অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দূরীভূত হইবে। মানুষ শরীরের উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছে এবং তদনুসারে খাদ্যাখাদ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে অথচ সর্ব্বদা অসুস্থ আছে—এই দুইটী কথা সমঞ্জসীভূত নহে। অসুস্থতা, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু যখন এত প্রকট, তখন বুঝিতে হইবে মানুষের শরীরের উপাদান সম্বন্ধে এবং খাদ্যাদির সম্বন্ধে জ্ঞান বিকৃত। যিনি দরিদ্র তিনি হয়ত মনে করিতে পারেন—পয়সার অভাব ঘুচিলে অসুস্থতা প্রভৃতি সমস্তই দূরীভূত হইবে। কিন্তু তাঁহাকে আমরা ধনীর স্বাস্থ্যের ও যৌবনের দিকে নজর করিতে বলি। ধনবানদিগের মধ্যে অকর্ম্মণ্যতার কিছু অভাব আছে কি? বর্ত্তমান যুগে আশী বৎসর পর্য্যন্ত সারা পৃথিবীতে কয়জন বাঁচেন? আশী বৎসর কি একটা জীবনের পর্য্যাপ্ত দৈর্ঘ্য?

এক্ষণে মানুষের শক্তি কাহাকে বলে তাহার অনুসন্ধান করা যাক।

'শক্তি' শব্দের চলতি অর্থ কার্য্য করিবার ক্ষমতা। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং আত্মা তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য করেন। ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকেই নয়টী দ্রব্যের মিলনে উৎপন্ন, অথচ নয়টী দ্রব্য বিভিন্ন মাত্রায় মিলিত বলিয়া প্রত্যেকের কার্য্য বিভিন্ন এবং একটী আর একটীর কার্য্য করিতে পারেন না। "পৃথিবীলোক" হইতে গৃহীত মন নামক দ্রব্য হইতে মানুষের মনের এবং আত্মা নামক দ্রব্য হইতে মানুষের আত্মার গঠন হয়। সমস্ত উপাদান দ্রব্যগুলির মূল উপাদান পরা-প্রকৃতি। তাঁহার কোন কার্য্য-শক্তি নাই এবং ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা কোন কার্য্য করিতে পারেন না। অথচ দেখিতে পাই, ইন্দ্রিয়াদি সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে। কাজেই—প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি করিয়া ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যের সম্ভব হয়?

আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশের অভ্যন্তরে পরা-প্রকৃতি বিদ্যমান। পরা-প্রকৃতির সহিত পরম ব্রহ্মের মিলনও শরীরাভ্যন্তরে সংঘটিত হইতেছে। এই মিলনের নাম শক্তি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই মিলন উপলব্ধি করা যায়

কি-না ? ~~ইহার উত্তরে ভারতীয় ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই~~ :

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, পরম-ব্রহ্ম সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র পরা-প্রকৃতির দ্বারা কার্য্য করান এবং যে-উপাদানে পরা-প্রকৃতির অংশ বেশী সেই উপাদানই মানুষের বেশী কার্য্যকরী হয়। এখানে কার্য্যকরী শব্দে মানুষের হিতকারী অর্থাৎ যাহা মানুষকে সুস্থ এবং দীর্ঘজীবী করিতে পারে তাহাই বুঝিতে হইবে।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য মানুষের অন্তর্নিহিত পরা-প্রকৃতির সহিত পরম-ব্রহ্মের মিলনে সম্পন্ন হয়।

আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশের অন্তর্নিহিত পরা-প্রকৃতির সহিত পরম-ব্রহ্মের মিলনের নাম "শরীরের ঐ অংশবিশেষের শক্তি।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমাদের অন্তর্নিহিত পরা-প্রকৃতি ও তাহার সহিত পরম-ব্রহ্মের মিলনের উপলব্ধি করা যায় কিনা ?

ইহার উত্তরে ভারতীয় ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা চলতি ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় :

ভাই, বুদ্ধি আত্মার গুণ। তুমি বুদ্ধিপ্রবণ হও। নহিলে তুমি সরাসর নিজের শরীরের মধ্যে আত্মা-দ্রব্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাহার গুণ বুদ্ধিটীকে ধরিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও। তোমার প্রতি ইন্দ্রিয়ক্ষেপ বুদ্ধি-যুক্ত হউক। তাহা হইলে তুমি পৃথিবীলোক হইতে প্রতি নিশ্বাসে বায়বীয় অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে আত্মা-দ্রব্যের সঞ্চয় করিতে পারিবে, এবং তুমি আধ্যাত্মিক মানুষ হইয়া সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে তাহার দ্রব্যত্বই বা কি আর তাহার অন্যান্য গুণগুলিই বা কি তাহা দেখিতে পাইবে এবং তখন গুণগুলি হইতে দ্রব্যত্বকে পৃথক করিয়া দেখিবার সামর্থ্যও জন্মিবে। একবার দ্রব্যের দ্রব্যত্ব কি তাহা জানিতে পারিলেই তখন দ্রব্যত্ব ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট কি থাকে তাহার অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি জন্মিবে। তখনই ঐ দ্রব্যের মধ্যে পরা-প্রকৃতির সন্ধান মিলিবে। পরা-প্রকৃতিকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই পরম-ব্রহ্মের উপলব্ধি হইবে এবং তাহা হইলে নিজ নিজ শক্তি ক, তাহাও বোধগম্য হইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পরা-প্রকৃতির সহিত পরম-ব্রহ্মের মিলনের নাম শক্তি এবং তাহার উপলব্ধি করার উপায় বুদ্ধিপ্রবণ হওয়া ; তাহা সহজসাধ্য না হইলেও অসাধ্য নহে।

শক্তির তারতম্যের জন্য মানুষ যে বিভিন্ন হয় তাহা আগেই দেখান হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শক্তির তারতম্য হয় কেন ? মানুষের শরীর যে নয়টী দ্রব্যে গঠিত তাহা আমরা আগে বলিয়াছি। যে-দ্রব্যের মধ্যে পরা-প্রকৃতির অংশ অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান, যাহার শরীরে সেই দ্রব্যের আধিক্য, সেই মানুষই অধিকতর শক্তিমান হয়। আত্মা-দ্রব্যে পরা-প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। সেই জন্য যে-মানুষের শরীরে আত্মা দ্রব্যের আধিক্য আছে, সেই মানুষ অধিক শক্তিমান। এই রূপে আত্মা-দ্রব্যের তারতম্যানুসারে শক্তিরও তারতম্য সংঘটিত হয়।

মানুষের শরীরের আত্মা-দ্রব্যের মাত্রাভেদের জন্য মানুষ নিজে দায়ী কি-না, এ প্রশ্নও মনে জাগে। এ প্রশ্নের জবাবও আগে দেওয়া হইয়াছে। পরিদৃশ্যমান "পৃথিবীলোক" পরম-ব্রহ্ম ও পরা-প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন আত্মা-দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বিশ্লেষণ না করিয়া, হিতকর অথবা অহিতকর বিচারবিহীন হইয়া মানুষ আপাত-লোভনীয় পদার্থ(?), রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া, আত্মা-দ্রব্য সংগ্রহ বা সঞ্চয় না করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে অভ্যন্তরীণ আত্মা-দ্রব্যের অপচয় এবং কলুষ সাধন করিতেছে। বুদ্ধিপ্রবণ হইয়া বুদ্ধিপ্রণোদিত কার্য্য করিলে মানুষ আত্মা-দ্রব্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। তাহা না করিলে এবং তজ্জন্য শক্তিহীন হইলে মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাহাকে দায়ী করিবে ?

এই প্রসঙ্গের শেষ প্রশ্ন, মানুষ বিভিন্ন কার্য্য করে কেন ?

বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টিতত্ত্ব বলিবার সময় নয়টী দ্রব্যের সৃষ্টির পরে "পৃথিবীলোক" কিরূপে দ্রব্যবহুল এবং গুণবহুল হইয়া পড়ে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। গুণ অর্থে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে, যে-দ্রব্যের যে-গুণ থাকা উচিত, তাহা না থাকিয়া অন্য মাত্রার গুণ থাকিলে তাহাকে গুণবহুল বলা হয়। এই গুণবাহুল্যই মানুষকে সাধারণতঃ গুণপ্রয়াসী করে। গুণপ্রয়াসী মানুষ হয় ইন্দ্রিয়-প্রবণ না-হয় মনঃপ্রবণ। এই দুই শ্রেণীর মানুষের বিচার-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিচারশক্তিবিহীন মানুষের পরিণাম কি, তাহার বিস্তৃত আলোচনা বক্ষ্যমান প্রবন্ধের যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে। বিচারশক্তি বৃদ্ধি পাইলে আত্মা-দ্রব্য কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং পরিদৃশ্যমান "পৃথিবী-লোক" হইতে এবং খাদ্যাদি হইতে আত্মা-দ্রব্যের সংগ্রহ ও সঞ্চয় করা যাইতে পারে। মূল কথা, আত্মা-দ্রব্যের তারতম্যের জন্যই মানুষ বিভিন্ন হয় এবং বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কার্য্য করে।

বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পদার্থ চায় কেন?

মানুষ বিভিন্ন হইয়াও চারি শ্রেণীতে আবদ্ধ। কেহ আধ্যাত্মিক, কেহ বুদ্ধিপ্রবণ, কেহ মনঃপ্রবণ, কেহ বা ইন্দ্রিয়-প্রবণ। ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের মধ্যে পরা-প্রকৃতি অথবা আত্মা-দ্রব্যের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা কম। তাহার মধ্যে যে দ্রব্যবিশেষের আধিক্য আছে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ তাহাই আকাঙ্ক্ষা করে। মনঃপ্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ এবং আধ্যাত্মিক মানুষও স্ব স্ব উপাদানের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন পদার্থ আকাঙ্ক্ষা করেন। কাজেই বিভিন্ন মানুষের আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন হয়।

আগামী বারে, বিভিন্ন মানুষ যে বিভিন্ন কার্য্য করে ও তাহাতে তাহার কি পরিণাম, আমরা তৎসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। [ক্রমশঃ

অদৃষ্ট

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কালচক্র ঘুরিতেছে অদৃষ্ট—অজ্ঞাত আবর্ত্তন—
সীমাহীন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে তার;
গগনসীমান্তে ছায়া,—অদূরদর্শনে আলো জ্বলে,
দোলে ছায়া দূরে—দূরে, জ্বলে আর নিভে যায় আলো।

আলেয়ারে কে দেখেছে?—রূপহীন বিশ্বের বিস্ময়!
খধূপের মুখাগ্নিতে গৃহদাহ শুনেছ কি কেহ?
পর্ব্বতের পরিচয় বাড়বাগ্নি জ্বলন্ত অক্ষরে,
যোজন-গন্ধার মোহ সঞ্চারিত লোক-লোকান্তরে!

কালের দর্পণে কভু পড়ে নাক' অদৃষ্টের ছায়া,
আমারে ছাড়ায়ে তবু বড় হবে আমার প্রাক্তন ?
একান্ত প্রত্যক্ষ মোর অপ্রমেয় পুরুষকারের
রূপে রূপে বিকাশেরে কোন্ সত্যে করিব বঞ্চনা ?

কে জানে কোথায় বসি' বিধাতা লিখেন বিধিলিপি,
আপনার কর্ম্মফল অভিব্যক্ত অদৃষ্ট-লেখায়,
কেবা জানে কিবা তাহা ; প্রত্যক্ষ আমার বর্ত্তমান,
দেখিতেছি আমি সত্য,—প্রত্যক্ষ পুরুষকার মোর।

পথে ও প্রান্তরে আমি নিত্য গড়ি' নবসৌধরাজি,
আমি সেথা অভ্রভেদী, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য হাতে গড়া,
উৎকীর্ণ মন্দির, শোভা—সেথা শোভে আমারি সুন্দর !
অদৃষ্ট ছাড়ায়ে তাই ঊর্দ্ধে উঠে পৌরুষ আমার।

আমার ভাগ্যেরে আমি ভাঙ্গি গড়ি হেলায় কৌতুকে,
আমার সৃষ্টির মাঝে সাফল্যের আনন্দ আমার,
কীর্ত্তি মোর আমা হ'তে বড় হয়ে বাড়াল আমারে,
অদৃষ্ট অ-দৃষ্ট থাক,—সাধ্যতম পৌরুষ আমার।

সর্ব্বরাষ্ট্র বিচারালয়

—শ্রীকরুণা মিত্র

ভবিষ্যতে যুদ্ধ না হয় এবং পৃথিবীর সকল দেশ পরস্পরের সঙ্গে মিলিতভাবে, সদ্ভাব লইয়া বাস করিতে পারে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন বিগত ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশন্‌স বা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপন করেন। লীগের মন্ত্রণা-সভার (Council) প্রথম অধিবেশন হয়, ১৯২০ সালের ১৬ই জানুয়ারী। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে মার্কিন গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য

লীগ অব. নেশন্স সংক্রান্ত একটি ডকুমেন্টের প্রতিলিপি।

[ব্য]াক্তিবর্গকে জানান যে, তাঁহারা ভার্সাইয়ে সন্ধিপত্র * ratify [ব]া অনুমোদন করিতে পারিবেন না, অতএব বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে [য]োগদান করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। মার্কিন [যু]ক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্য্যের ও মর্য্যাদার [প]ক্ষে বিশেষ হানিকর হইয়াছে। অবশ্য আমেরিকা রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান না করিলেও এই প্রতিষ্ঠানের অনেক কার্য্যেই সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সম্প্রতি তাঁহাদের পররাষ্ট্র-সম্বন্ধ-নির্ণয়-সভার (Foreign Relations Committee) নির্দ্দেশ অনুযায়ী মার্কিন সেনেট স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে (Permanent Court of International Justice) যোগদান বাঞ্ছনীয় এইরূপ অভিমত দিয়াছেন। এই বিচারালয় লীগ অব নেশন্‌স-এর দ্বারা স্থাপিত এবং ইহা লীগের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই বিচারালয়ের কার্য্যে সহায়তা করিতে মার্কিন গভর্ণমেণ্টের এই সঙ্কল্প রাষ্ট্রীয় জগতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য এবং ইহা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সহিত কিভাবে জড়িত তাহার আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব মার্কিন সেনেটের এই সম্মতির গুরুত্ব কতখানি।

একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত অনেক মনীষী এই কল্পনাকে আকার দিবার নানাপ্রকার পন্থা উদ্ভাবন করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই—যদিও গত শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৯টি এবং দ্বিতীয় ভাগে ১১৭টি আন্তর্জাতিক বিরোধ সালিশীর (arbitration) দ্বারা মিটমাট হয়। ১৮৯৯ সালে হাগ শান্তির বৈঠক এই প্রকার সালিশীর পদ্ধতি স্থির করিয়া, একটি দপ্তরখানা (Secretariat) স্থাপন করেন ও উপযুক্ত সালিশ বা মধ্যস্থদের (arbitator) তালিকা প্রস্তুত করিয়া এই প্রক্রিয়া সহজ করিয়া আনেন। পরবর্ত্তী আট বছরে একটি স্থায়ী ট্রিবিউন্যাল দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করার জন্য কিঞ্চিদধিক আন্দোলন হয়। ১৯০৭ সালের দ্বিতীয় হাগ কনফারেন্স এই প্রস্তাবনার বিশদ আলোচনা করেন এবং এইরূপ একটি বিচারালয় স্থাপনের খসড়া প্রস্তুত করেন; কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য

* ভার্সাইয়ে সন্ধির প্রথম ভাগের প্রথম ছাব্বিশটি ধারা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্বন্ধে।

বিঘ্ন উপস্থিত হয়—স্থায়ী বিচারপতি নির্ব্বাচনের নিয়ম লইয়া এইবিষয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি বড় রাষ্ট্রগুলির সমান অধিকার দাবী করেন। পক্ষান্তরে, প্রধান রাষ্ট্রগুলি এই দাবী মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হন, যেহেতু এই নীতিতে গঠিত বিচারালয়ে তাঁহাদের ন্যায্য স্থান অধিকার করা প্রায় অসম্ভব। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে পর্য্যন্ত এই সমস্যার মীমাংসার জন্য অনেক বিফল চেষ্টা হয়।
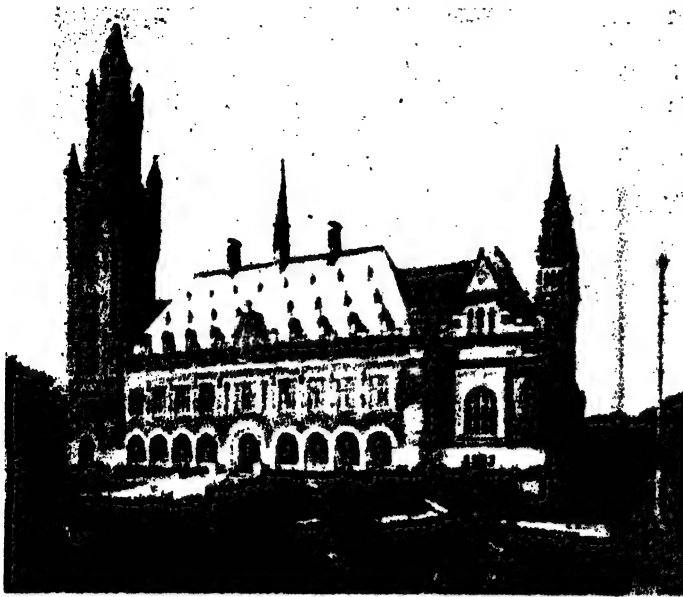
সর্ব্বরাষ্ট্র বিচারালয় [হাগ]।

যুদ্ধ-বিরতির পর নবগঠিত বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের মন্ত্রণা-সভা লীগের চুক্তিপত্রের নির্দ্দেশমত * বিভিন্ন দেশের বারজন ব্যবহারজীবীকে ঐ স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্ল্যান প্রস্তুত করিতে আহ্বান করেন। তাঁহাদের সভা ১৯২০ সালের ২৪শে জুলাই প্ল্যান পেশ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, ইটালী, ব্রেজিল, স্পেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে হইতে এক একটি সদস্য এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সেই বছর ২০শে ডিসেম্বর জেনেভায় একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া (Protocol of Signature) প্রস্তুত করিয়া স্থায়ী হাগ-রাষ্ট্রবিচারালয়ের সৃষ্টি হয় এবং স্বল্প পরিবর্ত্তনের পর পূর্ব্বোক্ত কমিটির প্ল্যান গৃহীত হয়। বাহান্নটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই Protocol রচনার সময় জেনেভায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু পরে সকলে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নাই —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাদের মধ্যে প্রধান।

লীগের শাসনতন্ত্রের সাহায্যে বিচারপতি নির্ব্বাচনের সমস্যার সমাধান হয়। আদালতের এগারজন বিচারপতি ও চার জন সহকারী বিচারপতি নয় বছরের জন্য নিযুক্ত হন। যতদূর সম্ভব সকল রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিকদের এই বিচারালয়ে কাজ করিতে সমান সুযোগ দেওয়া হয়। একই সময়ে একই দেশের একজনের বেশী এই আদালতে সদস্য হইতে পারেন না। নির্ব্বোরা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট।

* League Covenant এর চতুর্দ্দশ ধারায় আছে: "The Council shall formulate and submit to the Members of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice. The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character which the parties thereto submit to it. The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred to it by the Council or by the Assembly.

নিজেরাই তাঁহাদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন, রেজিষ্ট্রার নিয়োগ, ও কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করেন। বিচারের

চেয়ারম্যান পিটম্যান: আমেরিকার পররাষ্ট্র-সম্বন্ধ নির্ণয়-সভার কর্ম্মকর্ত্তা।

সময় যদি নয়জনের কম বিচারপতি উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সহকারী বিচারপতিরা তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করেন। যে সকল ব্যক্তির স্ব স্ব দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারাসনে বসিবার যোগ্যতা আছে তাঁহারাই এই আদালতের জজ হইবার অধিকারী। কোনও রাষ্ট্র কিম্বা লীগের সদস্য হাগ কোর্টে তাঁহাদের অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন; কোনও ব্যক্তিগত অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইলে সেই ব্যক্তিকে নিজের রাষ্ট্রের সাহায্য লইতে হয়। যে সব রাষ্ট্র লীগের সদস্যশ্রেণীভুক্ত নয় তাঁহাদের এই বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইবার সময় ইহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হয় ও যে রাষ্ট্র ইহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করার অঙ্গীকার করিতে হয়। সকল আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি সম্বন্ধীয় ব্যাপার এই আদালতের এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এই jurisdiction বাধ্যতামূলক নয়। তবে চুক্তিপত্রে এবং নিয়মাবলীতে (statute) একটি স্বীকৃতিমূলক ধারা যোগ করা হয়, যাহা স্বাক্ষর করিলে সেই রাষ্ট্র এই বিচারালয়ের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে বাধ্য। যে বাওন্নটি রাষ্ট্র ১৯২০ সালে ইহার স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ এই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। অতএব বর্ত্তমান জগতে শান্তিরক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের নিকট বেশী আশা করা অথবা ইহার উপর বেশী নির্ভর করা ভুল। প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কেবল ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী এই স্বীকৃতিপত্রে নিজেদের রাষ্ট্রের সম্মতি জানাইয়াছেন।

হাগ-কোর্ট নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। যথা:—

(১) কোনও সন্ধির বা চুক্তির (convention) ব্যাখ্যা;

(২) কোনও আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা;

(৩) আন্তর্জাতিক বিধান লঙ্ঘন করে এইরূপ কোনও ঘটনার; এবং

(৪] কোনও বে-আইনী কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্দ্দেশ।

১৯২২ সালে কোর্টের কার্য্যারম্ভের পর নূতন নূতন আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি হওয়ায় কোর্টের কর্ত্তৃত্বের সীমা বাড়িয়া গিয়াছে। তবে জগতে শান্তিরক্ষা করিতে সাহায্য করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

ভার্সাই সন্ধি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ইয়ুরোপের অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান এই বিচারালয় করিয়াছেন। আদালতের

সেনেটর বোরা।

উপকারিতা অনেক রাষ্ট্রই ইহার মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আগে আগে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ হইলে তাহার

সমাধান করা দুঃসাধ্য হইত, কারণ উভয় পক্ষই নিজেদের মত বা জেদ ত্যাগ করা আত্মসম্মানহানিকর মনে করিতেন। কিন্তু এখন আদালতের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে কাহারও লজ্জা হইবার কথা নয়।

বিচারকগণ : সর্ব্বরাষ্ট্র-বিচারালয়।

আমেরিকা বরাবরই ইয়ুরোপের "ঘরোয়া" ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিতে চায়। তাহাকে আদালতের মধ্যে আনিবার জন্য উক্ত নিয়ম কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা দরকার হইয়াছে। তবুও ইহাতে আমেরিকার যোগদানে সে দেশের অনেক রাজ-নৈতিকের আপত্তি আছে। তাঁহারা মনে করেন, কোর্টের কাজে সহযোগিতা করা আর লীগের কাজে সহযোগিতা করায় খুব বেশী তফাৎ নেই এবং লীগে একবার প্রবেশ করিলেই ইয়ুরোপের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সঙ্গে অযথা জড়িত হইয়া পড়িতে হইবে। সেনেটর বোরাকে এই দলের প্রধান নেতা বলা যাইতে পারে। তিনি ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী সদস্যরা সেনেটে তাঁহাদের পররাষ্ট্র-সম্পর্ক-নির্ণয় সভার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে ভোট দেন, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বিশেষ অনুরোধে সেনেট এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। অন্তররাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের (inter-state relations) পক্ষে আমেরিকার এই বিচারালয়ে যোগদান বিশেষ স্বাস্থ্যকর তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সেনেটর পোপ জানাইয়াছেন, তিনি ইহার পর লীগে যোগদান করার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন, কিন্তু এইরূপ প্রস্তাব বর্ত্তমানে গৃহীত না হওয়াই সম্ভব মনে হয়।

সর্ব্বরাষ্ট্র বিচারালয়ে আমেরিকার যোগদান সম্পর্কে

ফিলাডেল্‌ফিয়ার এন্‌কোয়ারার পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্র

Getting his feet wet.

জলে নামিতেই হইল !

দিব্যপ্রসঙ্গ

—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

যে সকল পুরুষ অসাধারণ শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা সহজেই জনসাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। গ্রীস দেশের অধিবাসীরা প্রাচীনকালে এইরূপ মহাপুরুষকে বলিত "হিরো", এবং হিরো-দিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। হিন্দুরা মহাপুরুষগণকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে কোন মানুষকে দেবতা বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিগণনা সম্ভব না হইলেও, মহাজন-ভক্তি বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দিন-পঞ্জিকায় বৎসরের প্রত্যেক দিন এক একজন "সেইণ্ট" বা সাধুর নামে উৎসর্গিত হইয়াছে। ফরাসী দার্শনিক কোম্‌ৎ (Comte) ঈশ্বরে বিশ্বাস বর্জ্জিত এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্মের ভিত্তি মানব জাতিতে বিশ্বাস, এবং অনুষ্ঠান মানবের সেবা। এই নূতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতৃগণের হিতার্থে কোম্‌ৎ যে সকল মহাজন নানা প্রকারে মানব জাতির হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নাম সম্বলিত একখানি নব দিন-পঞ্জিকা (A New Calendar of Great Men) সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। কোম্‌তের বিধি অনুসারে তারিখ লিখিবার সময় বারের এবং মাসের নাম না লিখিয়া দিনপঞ্জিকা অনুযায়ী মহাজনগণের নাম লেখা কর্ত্তব্য। কোম্‌তের কোন শিষ্যের মহাজনভক্তি কখনও এতদূর অগ্রসর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই পঞ্জিকায় ধর্ম্ম-সংস্থাপক, দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতিকে এক পংক্তিতে বসাইয়া কোম্‌ৎ মহাপুরুষ-ভক্তিকে নূতন আকার দান করিয়া গিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপে মহাজন-পূজার আর একজন পুরোহিত ছিলেন টমাস কারলাইল। কারলাইল মানব জাতির ইতিহাসে পরিণতি বা নিয়তির লীলা, বাহ্য অবস্থার প্রভাব বা জনসাধারণের কৃতকার্য্য দেখিতে পাইতেন না। তিনি মনে করিতেন মানব জাতির ইতিহাস মহাজনগণের কীর্ত্তির সমষ্টি মাত্র। তাঁহারাই মানব জাতির ভাগ্যবিধাতা। কবি লংফেলো বলিয়াছেন, মহাপুরুষগণের জীবনচরিত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, আমরাও আমাদের জীবনকে মহান্ করিয়া তুলিতে পারি। সেই মহাপুরুষগণ যদি আবার আমাদের দেশীয় এবং আমাদের জাতীয় হয়েন তবে সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়।

আমাদের দেশে মহাত্মা, মহাজন, মহাপুরুষ বলিতে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ পুরুষই বুঝায়। কিন্তু ঐহিক জগতে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রকৃত মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলেও সংযমের সহিত সাধনার আবশ্যক। এইরূপ ঐহিক সাধনায় সিদ্ধ পুরুষও মহাপুরুষরূপে গণনীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা এইরূপ মহাপুরুষদিগকে পূজা করিতে শিখিয়াছি। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রাজার এবং রাজপুরুষগণের লীলাক্ষেত্র। এই সকল রাজা এবং রাজপুরুষগণের মধ্যে মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধনরত, এবং সাধনায় যথাসম্ভব সিদ্ধ, মহাপুরুষের অভাব নাই। কিন্তু আদৌ স্বেচ্ছায় নহে, জন সাধারণের দ্বারা আহূত বা নির্ব্বাচিত হইয়া, রাষ্ট্রীয় সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন এই রূপ মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সুলভ নহে। সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ দুইজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই দুইজনের মধ্যে একজন, পালরাজ বংশের প্রথম রাজা গোপালদেব, যিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অরাজকতা নিবারণের জন্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; দ্বিতীয়, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সংঘটিত রাষ্ট্রবিপ্লবের নায়ক দিব্য, যাঁহার স্মৃতির পূজার জন্য আজ আমরা মিলিত হইয়াছি। প্রথম গোপালদেবের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ধর্ম্মপাল দেবের তাম্রশাসনে এই তিনটী শ্লোক আছে—

শ্রিয় ইব সুভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশি
শশধর ইব ভাসো বিশ্বমাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।

প্রকৃতি রবনিপানাং সন্ততে রুত্তমায়া
অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ববিদ্যাবদাতঃ ॥
আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যট স্ততঃ ॥
মাৎস্য-ন্যায় মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপালইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণি স্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন-যশোরাশি র্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাস-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥

গৌড়লেখমালায় ৺অক্ষয়কুমার মৈত্র এই সকল শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ দিয়া গিয়াছেন। আমি এখানে মর্ম্মকথা মাত্র আলোচনা করিব। এই তিনটী শ্লোকে দয়িতবিষ্ণু, বপ্যট এবং গোপাল এই তিন জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

দয়িতবিষ্ণু সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

"নৃপতিগণের উত্তম বংশের প্রকৃতি বা বীজপুরুষ সর্ব্ববিদ্যাবিৎ দয়িতবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এখানে দয়িতবিষ্ণুকে বিদ্বান্ এবং রাজবংশের জনক ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নাই। দয়িতবিষ্ণু রাজা বা রাজপুরুষ ছিলেন না। তাঁহার প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেবের প্রশস্তিকার যখন তাঁহাকে "সর্ব্ববিদ্যাবিৎ" ভিন্ন আর কোন বিশেষণে ভূষিত করিতে পারেন নাই, তখন মনে করিতে হইবে তিনি বিশেষ প্রভাবশালী লোক ছিলেন না। তার পরের শ্লোকে দয়িতবিষ্ণুর পুত্র বপ্যট সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"তারপর শ্রীবপ্যট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রশংসার যোগ্য, শত্রুনাশকারী, কৃতী ছিলেন, এবং বহু কীর্ত্তির দ্বারা সসাগরা পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।"

"খণ্ডিতারাতি", শত্রুনাশকারী, এই বিশেষণ হইতে বুঝা যায় বপ্যট একজন যোদ্ধা ছিলেন, এবং প্রসিদ্ধ ও প্রশংসনীয় যোদ্ধা ছিলেন। যিনি পৃথিবীকে কীর্ত্তির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য ধনী ছিলেন। কিন্তু এই শ্লোক হইতে বপ্যটের পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে আর কিছু বুঝা যায় না। ধর্ম্মপালদেবের পরবর্ত্তী পাল নরপালগণের তাম্রশাসনে দয়িতবিষ্ণু এবং বপ্যটের নাম মাত্রও নাই। তারপর তৃতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"তাঁহার (বপ্যটের) পুত্র নৃপতিগণের চূড়ামণি শ্রীগোপাল। অরাজকতা (মাৎস্যন্যায়) দূর করিবার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার (গোপালের) করে রাজলক্ষ্মীকে অর্পণ করিয়াছিলেন।"

শেষোক্ত বাক্যে একটী অভূতপূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর কোনও রাজবংশের প্রশস্তিতে রাজ্যপ্রতিষ্ঠার এরূপ বিবরণ দেখা যায় না। ইহা প্রশস্তিকারের বাঁধা গৎ নহে। সুতরাং এই অপূর্ব্ব ঘটনাকে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। প্রকৃতি অর্থ প্রজা। সুতরাং এই বাক্যের অর্থ হয়, প্রজাসাধারণ গোপালকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এই নির্ব্বাচন-কার্য্য যে কি ভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন। অবশ্যই ইহাকে য়ুরোপীয় প্লেবিসাইট (plebiscite) বা সার্ব্বজনীন নির্ব্বাচন বলা যায় না। এই নির্ব্বাচনের নির্ব্বাচক বোধ হয় ছিলেন গ্রামাধীশ, বিষয়পতি, মণ্ডলাধীশ এবং সামন্ত নরপতিগণ। এখন জিজ্ঞাস্য,কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে এই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল? গোপালের নির্ব্বাচনের কাল খুব সম্ভব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষ ভাগ। গোপাল কোন্ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? কামরূপের রাজা বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে বরেন্দ্রীকে পালরাজবংশের "জনকভূ" বা জন্মভূমি বলা হইয়াছে, এবং শেষোক্ত কাব্যে দেখা যায় বরেন্দ্রীই পালরাজ্যের কেন্দ্র ছিল। রামচরিত কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদে (১০) উক্ত হইয়াছে, বরেন্দ্রীর একদিকে গঙ্গা এবং আর এক (পূর্ব্ব) দিকে করতোয়া প্রবাহিত। বর্ত্তমান মালদহ, দিনাজপুর রাজসাহী, বগুড়া এবং পাবনা জিলা বরেন্দ্রীর অন্তর্গত। গোপালের নির্ব্বাচন আদৌ বোধ হয় এই প্রদেশেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার অন্যান্য প্রদেশেরও এই নির্ব্বাচনে সম্মতি থাকা সম্ভব। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগ লইয়া খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে শশাঙ্কের গৌড়রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বাক্‌পতির গৌড়বহো কাব্যেও আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব ভাগের বা গৌড় মণ্ডলের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং গোপালের নির্ব্বাচনের সময়ে বাঙ্গলার অপরাপর অংশের, বিশেষতঃ রাঢ়ের, অধিবাসিগণ বারেন্দ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

যে প্রদেশেই এই নির্ব্বাচন সম্পাদিত হইয়া থাকুক না কেন, এই মহৎ কার্য্য সেকালের বাঙ্গালী জন-নায়কগণের

আশ্চর্য্য দূরদর্শিতা, স্বদেশপ্রীতি এবং উদারতা সূচিত করে। আবার এই নির্ব্বাচন একদিকে যেমন নির্ব্বাচকগণের মহদ্‌গুণের পরিচয় দেয়, আর একদিকে তেমনই নির্ব্বাচিত গোপাল-দেবের অশেষ গুণের এবং অসামান্য শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দেয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মহাপুরুষের তুলনা পাওয়া যায় না। গোপালের বংশধরদিগের প্রশস্তিকারগণ এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাবাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা অতিশয়োক্তিপূর্ণ হইলেও ভিত্তিহীন নহে। গোপালের পৌত্র দেবপালের তাম্রশাসনের রাজপ্রশস্তিতে উক্ত হইয়াছে—

"অনুপম সৌভাগ্যশালী গোপাল লক্ষ্মীর সপত্নী পৃথিবীর পতি হইয়াছিলেন। বিনয়িবর্গের দৃষ্টান্তস্থল সেই রাজার শাসন-সময়ে পৃথু সগর প্রভৃতি নৃপতিবৃন্দ শ্রদ্ধেয় (বিশ্বাসযোগ্য) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

"তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর, আর প্রয়োজন নাই বলিয়া, মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া, আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচন বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল।"

অসাধারণ রণনৈপুণ্যের সঙ্গে বিনয় না থাকিলে গোপাল কখনও জনসাধারণের ভক্তি-বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিতেন না। রণকুঞ্জরগণের বন্ধনমুক্তি এবং বনে প্রত্যাগমনের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায়, নির্ব্বাচনের পর বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ শত্রুদমন করিয়া এবং আবশ্যক মত রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়া গোপাল গৌড়রাষ্ট্রকে শান্তিসুখ দান করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। গোপালদেবের বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বংশধরগণ ক্রমে তাঁহাকে বুদ্ধদেবের সমান আসনে উন্নীত করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল এবং পরবর্ত্তী পাল-নরপালগণের তাম্র-শাসনের আরম্ভে একই শ্লোকে একপক্ষে দশবল লোকনাথ বুদ্ধদেবের এবং অপর পক্ষে নরপাল গোপালের স্তুতি করা হইয়াছে। এই শ্লোকের রচয়িতা বুদ্ধদেবকে এবং গোপালদেবকে একই বিশেষণমালায় ভূষিত করিয়া শেষ চরণে বলিয়াছেন—

স শ্রীমান লোকনাথোজয়তি দশবলোঽন্যশ্চ
গোপালদেবঃ॥

"সেই শ্রীমান দশবল লোকনাথের জয় হউক, এবং, অপর পক্ষে, গোপালদেবের জয় হউক।"

যিনি এক সময়ে অরাজকতা নিবারণের জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন, এবং রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া যিনি জনসাধারণের আশা পূরণ করিয়াছিলেন, তিনি বোধিলাভ না করিয়া থাকিলেও, বুদ্ধ-দেবের চরিত্রের অনেক গুণ যে তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই রাজর্ষির জীবনী সম্বন্ধে প্রশস্তিকারগণের কয়েকটি ইঙ্গিত ভিন্ন আর কিছুই জানিবার উপায় নাই

প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক গোপালের রাজপদে প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন শত বৎসর পরে বাঙ্গালায় আর একটা আশ্চর্য্য ঘটনা, রাষ্ট্রবিপ্লব, ঘটিয়াছিল। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের অনন্তসামন্তচক্রের নির্ব্বাচিত নায়ক ছিলেন দিব্য বা দিব্বোক। গোপাল-দেবের নির্ব্বাচনকাহিনী না জানিলে এই রাষ্ট্রবিপ্লব ভাল করিয়া বুঝা যাইতে পারে না বলিয়া এই পূর্ব্ব ঘটনার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দিব্যপ্রসঙ্গের মুখবন্ধ করিলাম।

১৮৯৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত একখানি ক্ষুদ্র তাল-পাতার পুথি কিনিয়া আনিয়াছিলেন, এবং ১৯১০ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির যোগে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানির নাম রা ম চ রি ত। এই রা ম চ রি ত আর্য্যা ছন্দে রচিত একখানি সংস্কৃত কাব্য। এই কাব্যের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী। রা ম চ রি তে-র বিষয় অবশ্য বাল্মিকীর রামায়ণের নায়ক রামের চরিত; কিন্তু এই কাব্যখানির শ্লোকগুলির দুইপ্রকার অর্থ আছে। এক অর্থ রামায়ণের ঘটনার বর্ণনা; আর এক অর্থ গৌড়ের পালবংশীয় নরপতি রামপালের এবং তাঁহার পিতা, ভ্রাতৃগণ এবং পুত্রপৌত্রগণের ইতিহাস বর্ণনা। রামায়ণের প্রধান ঘটনা যেমন রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ এবং রাম কর্ত্তৃক রাবণ বধের পর সীতার উদ্ধার; রা ম চ রি তে র প্রধান ঘটনা দিব্য বা দিব্বোক কর্ত্তৃক পালনৃপতিগণের জনক-ভূমি বরেন্দ্রী হরণ বা অধিকার, এবং দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী ভীমকে বধ করিয়া রামপাল কর্ত্তৃক বরেন্দ্রী উদ্ধার। এই বরেন্দ্রী হরণ এবং রামপাল কর্ত্তৃক বরেন্দ্রী উদ্ধারকাহিনী কেবল যে সন্ধ্যাকর নন্দীই রামায়ণের মূল ঘটনার সহিত তুলনা করিয়াছেন তাহা নহে, কাশীর নিকটবর্ত্তী কমৌলী গ্রামে প্রাপ্ত কামরূপরাজ,

বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের রাজবংশপ্রশস্তিকার মনোরথও তাহা করিয়াছেন। যথা—

তস্যোর্জ্জস্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধিশীতকিরণঃ সাম্রাজ্যবিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূ-লাভাদ্ যথাবদ্যশঃ
ক্ষৌণী-নায়ক-ভীম-রাবণ-বধাদ্যুদ্ধার্ণবোল্লংঘনাৎ ॥

"সেই প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতি (বিগ্রহপালের) রামপাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামপাল পালরাজবংশরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত শীতল কিরণবিশিষ্ট চন্দ্রের তুল্য ছিলেন, এবং সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই রামপাল (রাম চন্দ্রের ন্যায়) যুদ্ধরূপ সাগর লঙ্ঘন করিয়া, পৃথিবী নায়ক ভীমরূপ রাবণ বধ করিয়া, জনকভূরূপ সীতা উদ্ধার করিয়া, ত্রিজগতে যশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন।"

রা ম চ রি ত আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেই বৈদ্যদেবের তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং তখন "জনকভূ" অর্থে যে কোন্ দেশ তাহা বুঝা যায় নাই। এই শাসনদাতা বৈদ্যদেব রামপালের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী গৌড়েশ্বর কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন, এবং কামরূপের বিদ্রোহ দমন করিয়া কুমারপালের নিকট হইতে কামরূপ রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী কুমারপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী গৌড়েশ্বর মদনপালের সময়ে রা ম-চ রি ত রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈদ্যদেবের শাসনের প্রশস্তিকার মনোরথ, এবং সন্ধ্যাকর নন্দী, সমসময়ের লোক; এবং ইহাঁদের উভয়ের বর্ণিত অনুরূপ বরেন্দ্রী হরণ এবং উদ্ধারকাহিনীর ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

রা ম চ রি ত কাব্যের রামপাল পক্ষের অর্থে ঐতি-হাসিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যানুসারে রা ম পা ল চ রি তে গৌড়েশ্বর তৃতীয় বিগ্রহ পাল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপাল, রাষ্ট্রবিপ্লবের নায়ক দিব্য, দিব্যের উত্তরাধিকারী বরেন্দ্রীপতি ভীম, তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় সুরপাল, সুরপালের অনুজ গৌড়েশ্বর রামপাল, রামপালের পুত্র গৌড়েশ্বর কুমারপাল, কুমার পালের পুত্র গৌড়েশ্বর তৃতীয় গোপাল, এবং রাম পালের অপর পুত্র গৌড়েশ্বর মদন পাল, এই নয় জন নরপতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই ইতিহাসের মধ্যে চমৎকার ঘটনা, গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপালের সময় দিব্যের নেতৃত্বাধীনে রাষ্ট্রবিপ্লব, দিব্য কর্ত্তৃক বরেন্দ্রী অধিকার, এবং ভীমকে বধ করিয়া রামপাল কর্ত্তৃক বরেন্দ্রী উদ্ধার। সন্ধ্যাকর নন্দী শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরনিবাসী নন্দী বংশীয় পিণাক নন্দীর পৌত্র, এবং মদন পালের সান্ধিবিগ্রহী, করণ কুলের অগ্রণী, প্রজাপতি নন্দীর পুত্র ছিলেন।

পাশ্চাত্যগণ যাহাকে ইতিহাস বলে, ঠিক তাহা সঙ্কলন করা সন্ধ্যাকরের উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাব্য রচনা। কবিপ্রশস্তিতে তিনি বলিয়াছেন—

অবদানম্ রঘুপরিবৃঢ়গৌড়াধিপরামদেবয়োরেতৎ।
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্মিকীঃ ॥

"রঘুপতি রামচন্দ্রের এবং গৌড়াধিপতি রামপালের এই কীর্ত্তি-কাহিনী কলিযুগের রামায়ণ; এবং ইহার রচয়িতা কবি কলিকালের বাল্মিকী।"

কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে পালনৃপতিগণে প্রশস্তি রচনা সন্ধ্যাকর নন্দীর আর এক উদ্দেশ্য ছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের নায়ক দিব্য, এবং রামপালের প্রতিদ্বন্দ্বী ভীম, সম্বন্ধে তাঁহার পক্ষপাতের কোন কারণ ছিল না; বরং ইহাদের বিপক্ষতাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং দিব্য ও ভীমের অনুকূলে সন্ধ্যাকর যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা অযথার্থ মনে করা যাইতে পারে না। তাঁহার অন্যান্য বিবরণও কবির কল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। কারণ এই কাব্যে বর্ণিত দ্বিতীয় মহীপালের এবং রামপালের সময়ের ঘটনা সন্ধ্যাকর প্রত্যক্ষ করিয়া না থাকিলেও, অনেক প্রত্যক্ষকারীর নিকট হইতে তাহার বিবরণ শুনিবার তাঁহার যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়া-ছিল; এবং তিনি যে নিরর্থক ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যকে বিকৃত করিয়াছেন এরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এই রা ম চ রি ত কাব্যে দিব্য দ্বিতীয় মহীপালের সময়ের রাষ্ট্রবিপ্লবের বিজয়ী নায়করূপে উল্লিখিত হইয়াছেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি কি ছিলেন তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে স্থানে স্থানে এই সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। রা ম চ রি তে তৃতীয় বিগ্রহপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

হরিণোপাসিতধামাবিগ্রহপালঃ কিলাভবদ্রাজা
নতভূভৃৎপংক্তিরথো গোত্ররত্নাকরেঽমুস্মিন্ ॥

সহসাবিতরণজিতকর্ণঃ ক্ষৌণীং যৌবনশ্রিয়োদূহে।
অশ্রান্তদানবারাতিশয়ো যোভূদ্বৃষানুচরঃ॥

"রত্নাকর সমুদ্রতুল্য ধর্ম্মপালের বংশে সিংহ অপেক্ষাও বিক্রমশালী রাজা বিগ্রহপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহপালের নিকট নৃপতিগণ প্রণত হইয়াছিলেন।

"এই বিগ্রহপাল দাহল পতি (চেদিপতি হৈহয় বংশীয়) কর্ণকে পরাজিত এবং পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার দুহিতা যৌবনশ্রীর সহিত পৃথিবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিগ্রহপাল অবিরত দান করিতেন এবং ধর্ম্মের অনুচর ছিলেন।"

বিক্রমপুরপতি যদুবংশীয় ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাঁহার পিতামহ জাতবর্ম্মা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

গৃহ্নন্ বৈণ্যপৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
যোঙ্গেষু প্রথয়চ্ছ্রিয়ং পরিভবংস্তাং কামরূপশ্রিয়ং।
নিন্দন্দিব্যভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়সাচ্ছ্রিয়ং বিততবান্ স্বাং সার্ব্বভৌমশ্রিয়ম্॥

"জাতবর্ম্মা বেণের পুত্র পৃথুর শ্রী অনুকরণ করিয়া, কর্ণের দুহিতা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া, অঙ্গদেশে স্বীয় খ্যাতি বিস্তার করিয়া, কামরূপ শ্রী পরাভূত করিয়া, দিব্যের বাহুবলের খ্যাতি অতিক্রম করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রী বিকল করিয়া, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া, সার্ব্বভৌম শ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন।"

জাতবর্ম্মা যে কর্ণের দুহিতা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল যে দাহলপতি (চেদিপতি কর্ণকে পরাজিত করিয়া পুনরায় রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই উভয় কর্ণই খুব সম্ভব অভিন্ন ব্যক্তি। সুতরাং জাতবর্ম্মা এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল সমসময়ের লোক ছিলেন। গৌড়েশ্বর বিগ্রহপালের সমসময়ে জাতবর্ম্মার পক্ষে সার্ব্বভৌমশ্রীর দাবী প্রশস্তিকারের অতিশয়োক্তি মাত্র। গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী কুমার দেবীর সারনাথের শিলালিপিতে রামপালের মাতুল মহন বা মথনকে অঙ্গাধিপতি বলা হইয়াছে। মথন বা মহন অবশ্য তাঁহার ভগ্নীপতি তৃতীয় বিগ্রহপালের এবং জাতবর্ম্মার সমসময়ের লোক ছিলেন। সুতরাং জাতবর্ম্মার অঙ্গদেশে শ্রীবিস্তার করার কথাও ঠিক অঙ্গদেশ অধিকার করা অর্থে গ্রহণ করা যায় না। জাতবর্ম্মার এই প্রশংসাবাচক শ্লোকের এই সকল অতিশয়োক্তি বিবেচনা করিলে মনে হয়, "নিন্দন্দিব্যশ্রিয়ং" অর্থ জাতবর্ম্মার কর্তৃক দিব্যের পরাজয় নহে; এই বাক্যের অর্থ, জাতবর্ম্মার ভুজশ্রী বা বাহুবলের খ্যাতি দিব্যের বাহুবলের খ্যাতিকে অতিক্রম করিয়াছিল। এই বাক্য প্রতিপাদন করে, জাতবর্ম্মার সমসময়ে দিব্য যুদ্ধ ব্যাপারে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দিব্যের এই খ্যাতিলাভের সুযোগ অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে। অর্থাৎ দিব্য তৃতীয় বিগ্রহপালের একজন সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছিতে প্রাপ্ত, রাজত্বের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসরে সম্পাদিত, তাম্রশাসনের চতুর্দ্দশ শ্লোকে বিগ্রহপালের সেনা গজেন্দ্রগণের প্রচুর জলপূর্ণ পূর্ব্বদেশে স্বচ্ছ জল পানের কথা আছে। ইহা হইতে মনে হয়, গৌড়াধিপতি মহীপালের সেনা পূর্ব্বদেশ (বঙ্গ) আক্রমণ করিয়াছিল, এবং সেই সময়েই হয়ত দিব্যের সহিত জাতবর্ম্মার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। *

সন্ধ্যাকর নন্দী রা ম চ রি তে একত্রে অম্বিত (কুলক) আটটী শ্লোকে (১।৩১-৩৮) রাষ্ট্রবিপ্লবের বিবরণ সমাপ্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিব—

প্রথমমুপরতে পিতরি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভারম্।
বিভ্রত্যনীতিকারম্ভরতে রামাধিকারিতাং দধতি॥ ৩১॥

"পিতৃবিয়োগের পর প্রথমতঃ ভ্রাতা মহীপাল রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত হইলে নিগড়বদ্ধ রামপাল ব্যথিত হওয়ায়—"

* ভোজবর্ম্মার বেলাব তাম্রশাসনের এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত অনুবাদের মধ্যে শেষ অনুবাদ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার কৃত (Inscriptions of Bengal, Vol. III, pp. 21-24)। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের মজুমদার মহাশয়ের অনুবাদ সকল অংশে সমর্থন করা কঠিন। তিনি "গৃহ্নন্বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং" বাক্যের অনুবাদ করিয়াছেন "By eclipsing (even) the glory of Prithu, son of Vena." "গ্রহ" ধাতুর অর্থ গ্রহণ। বেণের পুত্র পৃথু পৌরাণিক আদর্শ নৃপতি। পরবর্ত্তী নৃপতিগণের পক্ষে পৃথুর সমকক্ষতা দাবী করা সম্ভব, তাঁহাকে অতিক্রম করার দাবী সঙ্গত নহে। মজুমদার মহাশয় পাদটীকায় লিখিয়াছেন, পৃথু যেমন প্রথম রাজা, জাতবর্ম্মা তেমনি তাঁহার বংশের প্রথম রাজা ছিলেন। "গৃহ্নন্ বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং" ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন। এইরূপ অর্থে "গৃহ্নন্" পদের eclipsing অনুবাদ করা যায় না। আমি "গৃহ্নন্" অনুকরণ অর্থে গ্রহণ করিলাম। জাতবর্ম্মা পৃথুর নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন অথবা পৃথুর তুল্য কৃতী ছিলেন। মজুমদার মহাশয়ের কৃত "নিন্দন্ দিব্যশ্রিয়ং" বাক্যের "bringing to disgrace the strength of the arms of Divya"; অনুবাদ সমর্থন করা যায় না।

অপরভ্রাত্রাবসতি কষ্টাগারং মহাবনং ঘোরম্।
হতবিধিবশেন বায়সকুশীলতাভেত্তুকুচজানৌ ॥ ৩৩ ॥

"দুর্দ্দৈববশে অপর ভ্রাতা সুরপালের সহিত (যখন) রামপাল ভীষণ কারাগারে বাস করিতেছিলেন, এবং লতার মত বন্ধনকারী নূতন লোহার শৃঙ্খল তাঁহাদের জানু বিদীর্ণ করিতেছিল ।"

মায়িধ্বনিনা শঙ্কিতবিপদো ভর্ত্তুর্ভুর্বঃ প্রভূতায়াঃ।
নিকৃতিপ্রযুক্তিতো রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথাপন্নে ॥ ৩৭ ॥

টীকা

অন্যত্র মায়িনাং খলানাং ধ্বনিনা অয়ং রামপালঃ ক্ষমোঽধিকারী সর্ব্বসম্মতঃ ততশ্চ দেবস্য রাজ্যং গ্রহীষ্যতীতি সূচনয়া শঙ্কিতবিপদঃ মামসৌ হনিষ্যতীতি শঙ্কিতা বিপদ্যেন তস্য ভুবোভর্ত্তুর্মহীপালস্য প্রভূতায়া বহুতরায়া নিরাকৃতিপ্রযুক্তিতঃ শাঠ্যপ্রয়োগাৎ উপায়বধচেষ্টয়া তথা স্বনাকারেনাপন্নে দুর্গতে কনিষ্ঠে ভ্রাতরি রামপালে রক্ষিতরি ভাবার্থে।

তাৎপর্য্য। খল লোকেরা মহীপালকে পরামর্শ দিয়াছিল, "এই রামপাল ক্ষমতাশালী, সুযোগ্য এবং সকলের প্রিয়। সুতরাং ইনি আপনার রাজ্য কাড়িয়া লইবেন।" এই কথা শুনিয়া নৃপতি মহীপাল মনে করিলেন, "রামপাল আমাকে বধ করিবে" এবং অনেক শঠতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কারাগারে আবদ্ধ করিলেন।

এই তিনটী এবং আর চারিটী শ্লোকে কবি সন্ধ্যাকর অতি সংক্ষেপে রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকল বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী ঘটনা, গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপাল সন্দেহের বশে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়, সুরপাল এবং রামপালকে, লোহার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের অপর কারণ স্বরূপ কবি বলিয়াছিলেন, মহীপাল "অনীতিকারম্ভরত", অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত, এবং "ভূতনয়াত্রাণযুক্ত", অর্থাৎ সত্যের এবং নীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী ছিলেন। উপসংহারে মহীপালের এই প্রকার আচরণের ফল সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

মাংসভুজোচ্চৈর্দশকেন জনকভুর্দস্যুনোপধিব্রতিনা।
দিব্যাহ্বয়েন সীতাবাসালংকৃতিরহারি কান্তাস্য ॥ ৩৮ ॥

টীকা

অন্যত্র। অস্য রামপালস্য জনকভূঃ পৈত্রভূমির্বরেন্দ্রী সীতাবাসালংকৃতি লাঙ্গলপদ্ধতিকসত্যালংকারা চাবাসসংপন্নেত্যর্থঃ। অতএব কান্তা কমনীয়া দিব্যাহ্বয়েন দিব্য নাম্না দিব্বোকেন মাংসভুজা লক্ষ্যা অংশংভুঞ্জানেন ভূত্যেনোচ্চৈর্দশকেন উচ্চৈ মহতী দশা অবস্থা যস্য অত্যুচ্ছ্রিতেনেত্যর্থঃ দস্যুনা শত্রুনা তদ্ভাবাপন্নত্বাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্ম ব্রতং ছদ্মনি ব্রতী। যদ্বা আচারক্লিপ্ হেতুমন্নিজস্বামিনি অহারি গৃহীতা।

এই শ্লোকের মূল কথা হইল, "জনকভূ" পিতৃভূমি বরেন্দ্রী দিব্য নামক দস্যুকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। এই দিব্য বা দিব্বোক কিরূপ ছিলেন? "মাংসভুজা", রাবণের পক্ষে এই বিশেষণের অর্থ "মাংসাশী" রাক্ষস; দিব্য পক্ষে লক্ষ্মীর অর্থাৎ রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী। দিব্য গৌড়রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী ছিলেন; অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন। দিব্য আর কি ছিলেন? "উচ্চৈর্দশকেন", উচ্চ বা মহতী দশা বা অবস্থা যাহার, অর্থাৎ তিনি 'অত্যুচ্ছ্রিত' বা অতি উন্নতপদে অধিরূঢ় ছিলেন। কেন দিব্য রাজদ্রোহী হইয়াছিলেন আর একটী বিশেষণে তাহাও সূচিত হইয়াছে। "উপধিব্রতিনা", "উপধি" শব্দের অর্থ কপট। দিব্যকে এই বিদ্রোহব্রতের কপটব্রতী বলা হইয়াছে। টীকাকার লিখিয়াছে "অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয় তাহা ব্রত।" রাবণের পক্ষে "উপধিব্রতী" অর্থ ভণ্ডতপস্বী; রাবণ তপস্বীর বেশে সীতা হরণ করিয়াছিলেন। দিব্যের পক্ষে এই শব্দের অর্থ ভণ্ড-বিদ্রোহী। ইহার তাৎপর্য্য, দিব্যের বিদ্রোহ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না; ঘটনাচক্রে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তিনি রাজদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দিব্য উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন নাই, উপায়ন্তর না থাকায় রাজপদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভণ্ড তপস্বী হওয়া দোষের কথা; কিন্তু ভণ্ড বিদ্রোহী, অর্থাৎ যে সাধ করিয়া বিদ্রোহ করে না, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিদ্রোহ করে, সে মহৎ ব্যক্তি। এই বিদ্রোহ কোন জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। ইহা সর্ব্বজনীন বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রবিপ্লব। পূর্ব্বোদ্ধৃত রামচরিতের ১।৩১ শ্লোকের টীকায় টীকাকার লিখিয়াছেন—

প্রথমং পূর্ব্বং পিতরি বিগ্রহপালে উপরতে সতি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভারং ভূভারং বিভ্রতি সতি অনীতিকারংভরতে অনীতিকে নীতি বিরুদ্ধে আরম্ভে উদ্যমে রতে সতি মহীপাল বাড়্গুণগণাস্য * মন্ত্রিণো গুণিতমবগুণয়ম্ উপষ্টম্ভারম্ভটীমাত্রাদীষদ্গ্রহণেন মিলিতানন্তসামন্ত-

---

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ "শল্যস্য।" ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মূলে দেখিয়াছেন "পণ্যস্য।"

চক্রচতুরচতুরঙ্গবলবলয়িতবহলমদকলকরিতুরগতরণিচরণচারুভটচমূসম্ভার-সংরম্ভনির্ভরভয়ভীতরিক্তমুক্তকুন্তলপলায়মানবিকলসকলসৈন্যেন স্বতঃ ক্ষয়াতিশয়মাসেদুষা সহ সহসৈব বলদ্বিপপর্য্যয়কোটিকষ্টতরসমরমারভ্য নিরমজ্জত। রামাধিকারিতাং রামপালস্য তস্মিন্ সময়ে নিগড়বদ্ধস্য আধির্ম্মানসী বাধা তৎকরণশীলতাং দধতি এতদগ্রে স্ফুটয়িষ্যতি।"

দ্বিতীয় মহীপালের নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের ফলে মিলিত অনন্ত সামন্তচক্র চতুর চতুরঙ্গ সেনা লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান, আসন, সংশ্রয় (আশ্রয়), দ্বৈধীভাব (কপটতা) এই ষড়্‌গুণ বা ছয়প্রকার উপায়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রীর উপদেশ অবহেলা করিয়া মহীপাল অল্প-সংখ্যক ভয়ভীত পলায়নপর সৈন্য লইয়া ভীষণ সমর আরম্ভ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। রা ম পা ল চ রি তে-র আর দুইটী শ্লোকে কথিত হইয়াছে মহীপাল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। যথা—

লোকান্তরপ্রণয়িণো দুর্ন্নয়ভাজোঽগ্রজন্মনো ব্যসনাৎ।
পতিতাকারবতানুভাবাতুদহারি গোতমী তেন ॥ ২২ ॥

পরলোকগত দুর্নীতিপরায়ণ অগ্রজ মহীপালের নিষ্ফল যুদ্ধে রত হওয়ার ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর অন্ধকার রামপাল কর্তৃক অপসারিত হইয়াছিল।"

হত্বা রাজপ্রবরং [ভূয়ো] ভূমণ্ডলং গৃহীতবতঃ।
স নিরাস্থদস্ত্রকলয়া সহস্রদোর্ব্বিদ্বিষঃ স্বাস্থ্যম্ ॥ ২৯ ॥

"সহস্রবাহু নৃপতিশ্রেষ্ঠ মহীপালকে বধ করিয়া যে শত্রু ভূমণ্ডল অধিকার করিয়াছিল রামপাল সেই শত্রুর সৌষ্ঠব নষ্ট করিয়াছিলেন।"

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অনন্ত সামন্তচক্র মিলিত হইয়া যেমন গৌড়রাজলক্ষ্মীকে গোপালের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বরেন্দ্রীতে কতকটা সেই ঘটনারই পুনরভিনয় হইয়াছিল। যে ষড়্‌গুণগণ্য বা রাজ্য পরিচালনের ছয়টী উপায় প্রয়োগে পটু মন্ত্রী দ্বিতীয় মহীপালকে মিলিত সামন্তচক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তিনিই কি দিব্য? মিলিত অনন্তসামন্তচক্র যে দিব্যকে নায়ক নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এই বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া দিব্য বোধ হয় অল্পকালই জীবিত ছিলেন। সন্ধ্যাকর লিখিয়াছেন—

এতস্যানুজতনুজস্য চ ভীমস্য বিবরপ্রহরকৃতঃ।
সাভিখ্যায়া বরেন্দ্রী ক্রিয়াক্ষমস্য খলু রক্ষণীয়াভূৎ ॥১।৩৯॥

টীকা

অথাত্র সা ভূমিঃ অভিখ্যায়া নাম্না বরেন্দ্রী এতস্য অস্য দিব্বোকস্য যো অনুজো রুদোকঃ তদীয়তনয়স্য ভীমনাম্নঃ রন্ধ্রপ্রহারিণঃ ক্রিয়াক্ষমস্য অলংকর্ম্মীণস্য যথোক্তক্রমেণ রক্ষণীয়াভূৎ। স তত্র ভূপতিঃ বর্ত্তমানঃ।

দিব্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পরই বরেন্দ্রী "ত্রস্তা", তাড়াতাড়ি, দিব্যের অনুজ রুদোকের তনুজ বা পুত্র ভীমের রক্ষণীয়া হইলেন। ভীম রন্ধ্রপ্রহারী, অর্থাৎ ছিদ্র দেখিয়া আক্রমণকারী এবং ক্রিয়াক্ষম ছিলেন।

বরেন্দ্রীতে রাষ্ট্রবিপ্লবের নায়ক দিব্য এবং উপনায়ক দ্বিতীয় মহীপাল। কিন্তু কলিকাল-বাল্মীকি সন্ধ্যাকর নন্দীর কলিযুগ-রামায়ণ রা ম চ রি তে র নায়ক রামপাল এবং উপনায়ক ভীম। সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দী ভীমের চরিত্রের যথাযোগ্য পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই (২।২১—২৭)। তিনি লিখিয়াছেন, ভীমকে নৃপতিরূপে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করিয়াছিল। ভীম কল্পদ্রুমস্বভাব অর্থাৎ অত্যন্ত দাতা ছিলেন, এবং ধর্ম্মপথের পথিক ছিলেন। ভীম অবশ্য দিব্যের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং শিষ্যের আচরণ হইতে আমরা গুরুর আচরণও অনুমান করিতে পারি।

রামচরিতের টীকায় দিব্যকে কৈবর্ত্ত নৃপ বলা হইয়াছে। পুরাকালের কোনও মহাপুরুষের জাতিবিচারের সময় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সেকালের জাতিভেদে এবং একালের জাতিভেদে বিস্তর প্রভেদ আছে। সেকালে, এমন কি ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারলাভের পূর্ব্বে, গ্রামসমূহ ছিল রাষ্ট্রের সর্ব্বস্ব, এবং প্রত্যেক গ্রামে স্বরাজ ছিল। সুতরাং বিভিন্নজাতির গ্রামবাসীর মধ্যে গ্রাম্য স্বরাজপরিচালনের উপযোগী একতাও ছিল। এই একতার বন্ধনসূত্র ছিল গ্রামসম্বন্ধ। গ্রামের সকল জাতির নরনারী পরস্পরকে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ মনে করিতেন; গ্রামবাসী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পরস্পরকে ভাই ভগিনী, কাকা, দাদা ইত্যাদি সম্বন্ধ ধরিয়া সম্বোধন করিতেন। সেকালের গ্রাম সম্বন্ধের কিছু কিছু ভগ্নাংশ এখনও গ্রামে অবশিষ্ট আছে। বর্ত্তমানে গ্রাম্যস্বরাজ বিলুপ্ত হওয়ায়, এবং পাশ্চাত্যধরণে গঠিত শহর হইতে ধন, মান, এবং শিক্ষার অভিমান প্রবেশ করায়, জাতিভেদ বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেকালে ধনমানের গর্ব্বের বিষমিশ্রিত এইপ্রকার জাতিভেদের অস্তিত্বই ছিল না। বাঙ্গলার রাজা

প্রজা তখন বোধ হয় জাতি লইয়া বড় মাথা ঘামাইতেন না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজবংশের প্রশস্তির আরম্ভে চন্দ্রকে বা সূর্য্যকে বা চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় কোন ক্ষত্রিয় রাজাকে আদি পুরুষরূপে উল্লিখিত দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের বর্ম্মণ বংশীয় নৃপতিগণের এবং সেন-রাজগণের প্রশস্তিতে তাঁহাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলা হইয়াছে। কিন্তু পাল নরপালগণের এবং বিক্রমপুরের পূর্ণচন্দ্রাদি চন্দ্রনরপালগণের বংশপ্রশস্তিতে চন্দ্রের বা সূর্য্যের উল্লেখ নাই। রা ম চ রি তে (১।৩-৪) উক্ত হইয়াছে পালরাজগণ সমুদ্রবংশীয়। সমুদ্র চন্দ্রের উৎপত্তিস্থান। সুতরাং সমুদ্রবংশকে চন্দ্রবংশরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বৈদ্যদেবের কমৌলীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে (২য় শ্লোক) তৃতীয় বিগ্রহপালকে মিহির (সূর্য্য) বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। পাল রাজ্যের ইতিহাসের শেষ ভাগে, প্রায় একই সময়ে, এই দুইটী বিরোধী মতের প্রচার দেখিয়া মনে হয়, পালরাজগণ এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তবে কি তখন জাতিভেদ ছিল না? প্রাচীন তন্ত্রের গ্রাম্যস্বরাজ্যের দায়মুক্ত, গ্রামের সম্বন্ধবন্ধনবিচ্যুত, ধন-মান-গর্ব্বপুষ্ট, জাতিভেদ তখন ছিল না এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। কিন্তু তখন বর্ণধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। পাল বংশের তৃতীয় নরপতি দেবপালের মুঙ্গেরে প্রাপ্ত শাসনে দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

> শাস্ত্রার্থভাজা চলতোঽনুশাস্য
> বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে।
> শ্রীধর্ম্মপালেন সুতেন সোঽভূৎ
> স্বর্গস্থিতানামনৃণঃ পিতৃণাম্ ॥

"শাস্ত্রার্থজ্ঞ, ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত বিভিন্ন বর্ণকে অনুশাসন করিয়া স্বধর্ম্ম পথে স্থাপনকারী, ধর্ম্মপালকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া গোপাল স্বর্গস্থিত পিতৃপুরুষগণের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।"

মহাত্মা দিব্য যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন ছিল বিশ্বাসের যুগ এ দেশীয় বৌদ্ধেরাও হিন্দুই ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা বর্ণধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। সৌগত বা বৌদ্ধ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে এই শ্লোকটীই তাহার প্রমাণ। এই দেশীয় লোকে তখন মনে করিত (এবং এখনও অনেকে মনে করে) এই অল্পকালস্থায়ী জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য মোক্ষ-লাভের জন্য সাধন। বর্ণধর্ম্ম সেই সাধনের একটী সোপান। সুতরাং লোকে তখন সানন্দে কুলক্রমাগত আচার পালন করিয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিত। রাজপ্রশস্তিতে তৃতীয় বিগ্রহপাল "চাতুর্বর্ণ্য সমাশ্রয়ঃ", চারিবর্ণের আশ্রয় স্থান, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মিলিত অনন্ত সামন্তচক্র নির্ব্বাচিত গোপালদেব এবং দিব্য জাতিবর্ণের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন। সেকালের সামন্তচক্রের স্থলবর্ত্তী বর্ত্তমান জন-নায়কগণ। গোপালদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন সার্দ্ধ একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে এবং দিব্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন সার্দ্ধ আট শত বৎসর পূর্ব্বে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পরিবর্ত্তন, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি যে পল্লীসমাজ, যাহা মুসলমানগণকেও আপনার করিয়া ভাই, চাচা, নানায় পরিণত করিয়াছিল, তাহা প্রাণ হারাইয়াছে, এবং পল্লীসমাজের প্রাণশূন্য দেহ এখন আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্র নীতির বর্ত্তমান লক্ষ্য স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা চরম লক্ষ্য (end) নহে ; চরম লক্ষ্যে পহুঁছিবার পথ (means) মাত্র। রাষ্ট্রনীতির চরম লক্ষ্য, সার্ব্বজনীন কল্যাণ, সার্ব্বজনীন সুখসম্পদ। সন্ধ্যাকর নন্দী ভীমকে রাবণের আসনে বসাইয়া তাঁহার শাসনের সাফল্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> বিশ্বংভরেণ লক্ষ্মীর্লেভেঽমৃতমপ্যপলম্ভি সুমনোভিঃ।
> কিঞ্চ লভতেস্ম শংভূ রাজানং যং সমাসাদ্য ॥ ২।২৪ ॥

"রাজা ভীমকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করিয়াছিল ; সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন ; পৃথিবী কল্যাণ লাভ করিয়াছিল।"

এই লক্ষ্যে পহুঁছিতে হইলে সেকালেও যে উপায় অবলম্বন করিতে হইত, এখনও তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। সেই উপায় অনন্তসামন্তচক্রের মিলন ; সকল জনসেবকের ঐক্য। এরূপ ঐক্য বর্ত্তমানে সুকঠিন মনে হয়। যে দুইজন মহাপুরুষ বিশেষ বিপৎকালে এদেশে অনন্ত সামন্তচক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের সুমতি উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিতকথা আমাদের স্মরণীয়, মননীয় এবং কীর্ত্তনীয়। এইরূপ স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন আমাদের মনে ঐক্যের সুমতি উদ্বোধনের সহায়তা করিতে পারে। ইহাই দিব্যস্মৃতি উৎসবের সার্থকতা। আর এক কারণেও এই উৎসব বড় সময়োপযোগী হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ আত্মনির্ভর এবং আত্মমর্য্যাদা হারাইয়াছে। তাহাকে আবার দেশের দিকে ফিরাইয়া আনিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখা যায় না। *

* দিব্য-স্মৃতি-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালা সাহিত্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

* * *

যদিও বাঙ্গালী জাতির অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহা লক্ষণীয় যে অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি (অর্থাৎ আরবী ফারসী ও উত্তর-ভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা চিন্তা-প্রণালী, রীতিনীতি এবং বাস্তব সভ্যতা) বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনেও তেমন কার্য্যকর হয় নাই। সুফীমতের ইস্লামের সহিত বাঙ্গালী (অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দু) মনোভাবের একটা আপোষ হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান (কতকগুলি বিশেষ প্রান্তে বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত) বিশিষ্ট মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। যে দুই চারিজন বড় বড় আলেম মোল্লা ও মৌলবী বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে হইতেন, তাঁহারা নিজেদের আরবী-ফারসী কেতাবের মধ্যেই নিমগ্ন থাকিতেন, বাঙ্গালার চর্চ্চা তাঁহারা বড় একটা করিতেন না ; ফলে, আরবী-ফারসী জগতের খবর বাঙ্গালীর কাছে বেশী করিয়া পঁহুছায় নাই। কিছু কিছু আরবী প্রার্থনা, মুসলমানী স্মৃতিশাস্ত্রের কথা, এবং মুসলমানী ইতিহাস-পুরাণ কেচ্ছা-কাহিনী বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র। উত্তর-ভারতের এবং ভারতের বাহিরের দেশের মুসলমান সংস্কৃতির সহিত এবং কোরানানুমোদিত ইস্লামের সহিত বাঙ্গালী মুসলমান অতি আধুনিক কালে—বিগত মাত্র ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে—একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নানা কারণে তাহার জীবনে সে পরিচয় কার্য্যকর হইতেছে না।

বাঙ্গালী মুসলমান এখনও মনে প্রাণে খাঁটী বাঙ্গালী থাকায়, নব-আলোচিত বঙ্গ-বহির্ভূত মুসলমানী সংস্কৃতি তাহার প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিতেছে না। এই আলোচনা ময় ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ, এবং ইঁহাদের জ্ঞান মুখ্যতঃ মুসলমান সভ্যতা-বিষয়ক ইংরেজী পুস্তক হইতেই সংগৃহীত। বাঙ্গালী মুসলমান এখন বিষম দো-টানায় পড়িয়াছে। সজ্ঞান ভাবে একটী জাতির মনের মোড় ফেরানো কঠিন ব্যাপার—অজ্ঞাতসারেই এই কার্য্য হইয়া থাকে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের কেহ কেহ এখন একটী বাঙ্গালী মুসলমান সংস্কৃতি গঠনের প্রয়াস করিতেছেন। সহজ বাঙ্গালীত্বের দাবীতে—বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি তাহারই, এই সহজ বোধে—বাঙ্গালী মুসলমান সমগ্র ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার কিন্তু এখন তাহার মনঃপূত হইতেছে না—কারণ ইহার সঙ্গে কোরানের বা আরব জগতের কোনও যোগ নাই। তাহার মনে অস্বস্তির ভাব আসিয়াছে। যতই কেন "মুসলমান ইতিহাস" "মুসলমান সভ্যতা" বলিয়া বাঙ্গালী মুসলমান নিজের উৎসাহাগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করুন না, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আরবেরা সিরিয়া পারস্য ও মিসরে যে বীরত্ব দেখাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই বীরত্বের কাহিনীতে, ইংরেজীতে যাহাকে বলে legitimate pride—ন্যায়-সঙ্গত গর্ব্ব—তাহা তাঁহার মনের অন্তস্তল হইতে অনুভব করা কঠিন। বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে, সপ্তম শতকের আরব শৌর্য্য, বা দশম শতকের বোগ্দাদের আরব পারস্য ও সিরীয় পাণ্ডিত্য ও মানসিক উৎকর্ষ, বা ত্রয়োদশ শতকের স্পেনের স্পেনীয়, আরব ও মগরেবী নাগরিকতা ও সভ্যতা, অথবা পঞ্চদশ শতকের তুর্কী বীরত্ব—কেবল সমধর্ম্মিত্বের দোহাই পাড়িয়া এগুলি লইয়া গর্ব্ব করিতে রসবোধ-যুক্ত যে কোনও শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের মনে বাধ বাধ লাগিবে, তাঁহার হাসি পাইবে : "আমার মুসলমান জাতি কতবড়—

> অয় গুলিস্তানে অন্দালুস্, বহ্ দিন হৈ য়াদ তুঝ কো,
> থা তেরী ডালীওঁমেঁ জব আশিয়াঁ হমারা।
> মগ্‌রিব কে ব্যাদীওঁমেঁ হৈ গুন্‌জী আজাঁ হমারী।

'হে আন্দালুসিয়ার পুষ্পোদ্যান, সেদিন তোমার স্মরণে আছে কি, যখন তোমার শাখায় শাখায় আমাদের নীড়

অবস্থিতি করিত (অর্থাৎ আমাদের জাতি এক সময়ে স্পেন দখল করিয়াছিল); মগরেব্ (মরক্কোর) মরুভূমির নদীর তীরে আমাদেরই আজান-ধ্বনি গুঞ্জিত হইয়াছিল (অর্থাৎ আমরা মুসলমানেরাই মরক্কো জয় করিয়াছিলাম)'," ইত্যাদি গৌরব-গাথা তাঁহার কাছে নিজ ভারতীয়ত্বের বা বাঙ্গালীত্বের দৈন্যকে যেন উপহাস করিবে। কোনও বাঙ্গালী রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান যদি গর্ব্ব করে—"আমরা রোমান-কাথলিক জাতির লোক, আমরা কত বড়! আমাদেরই জাতি স্পেন হইতে আমেরিকায় গিয়া আমেরিকা দখল করিয়াছিল,—মেক্সিকো ও পেরুর মত দুই দুইটা সুসভ্য জাতির রাজ্য হেলায় জয় করিয়া সেখানে আমাদের ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়াছিল; আমাদের রোমান-কাথলিক জাতি পোর্ত্তুগাল হইতে বাহির হইয়া ব্রেজিল দখল করিয়াছিল, ভারতের সমুদ্রপথে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিত; আমাদের জাতিই ফ্রান্সে, ইটালীতে, স্পেনে, জার্ম্মানীতে কত বড় বড় গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছে, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যায় কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, কত দর্শন শাস্ত্রের বই লিখিয়াছে, কত জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছে,"—তাহা হইলে ইহা যেমন শুনায়, বাঙ্গালা-ভাষী, জাত্ বাঙ্গালীঘরের ছেলে, কেবল ধর্ম্মে মুসলমান বলিয়া, ফারসী, আরব, শামী, তুর্কী, মিসরী, মগরেবী হিস্পানীদের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া গৌরব-বোধের সঙ্গে যদি মাতামাতি করে, তবে তাহা তেমনই যুগপৎ হাস্যকর এবং করুণার উদ্রেককর ব্যাপার বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি-মাত্রেরই মনে লাগে।

ফরমাইস দিয়া ইচ্ছামত "জাতীয় সংস্কৃতি" তৈয়্যারী করা চলে না। বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে যেটুকু মুসলমান প্রভাব বিদ্যমান, ধীরে ধীরে এই পাঁচ ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া ইসলামগতপ্রাণ পূর্ণবিশ্বাসী আলেম মোল্লা মৌলবীদের চেষ্টায়ই হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের কেহ কেহ যে ভাবে বাঙ্গালায় ইস্লামী সংস্কৃতি আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মধ্যে Positive অর্থাৎ সংগঠনকারী দিক্ অপেক্ষা negative অর্থাৎ ধ্বংসকারী দিক্‌টাই প্রবল। ইস্লামীয় মনোভাব মানে ইঁহাদের কাছে মুখ্যতঃ যাহা ভারতীয়ত্বের বা হিন্দুত্বের বিরোধী; কারণ ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব ইঁহাদের চোখে "কুফ্‌র" বা বিধর্ম্মিত্ব এবং "শির্‌ক্" বা বহু-ঈশ্বর-বাদিত্বেরই নামান্তর। হিন্দু বা ভারতীয় মাটীতে জন্ম—এই কথাতেই যেন কুফ্‌র্ ও শির্‌ক্-এর আমেজ লাগিয়া আছে; তাই বহু ভারতীয় বা বাঙ্গালী মুসলমান নিজেকে সৈয়দ বা আরব, ইরানী, পাঠান, মোগল বা তুর্কী বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। বাঙ্গালী বা ভারতীয় মুসলমানের এই আত্ম-মর্য্যাদাবোধ-হীনতা তাহাদের পক্ষে—এবং আমাদের পক্ষেও বটে—এক হৃদয়বিদারক, সর্ব্বনাশকর ট্রাজেডি। পারস্যের মুসলমানেরা এই আত্মমর্য্যাদা হারায় নাই; ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পারসীকেরা নিজ জাতির আভিজাত্য, তাহার ঐতিহ্য ভুলিতে চাহে নাই—বরং তাহাদের শাহ্-নামা গ্রন্থে মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের পুরাণ-কথাকে তাহারা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ছিল। তুর্কী মুসলমানেরা তিন-চার শতকের বিস্মৃতির পরে আবার নূতন করিয়া তাহাদের জাতির গৌরব কথা—ধর্ম্মের নহে—ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে মুসলমান উপাদান যেটুকু আসিয়াছে, এতাবৎ তাহা বাঙ্গালীর জীবন ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রাখিয়াই আসিয়াছে। এখন কোনও কোনও দিক্ হইতে যে নবীন প্রয়াস হইতেছে, তদ্দারা ভাঙ্গন হইবে—কিন্তু তাহার দ্বারা বড় একটা কিছু গড়িয়া উঠিবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালী মুসলমানের প্রকৃতি, বিভিন্ন মুসলমান জাতির মনের ও সভ্যতার প্রকৃতি—এগুলিকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া বাঙ্গালী মুসলমানের মনকে চালিত করিবার চেষ্টা করিলে, একটা কিম্ভূত-কিমাকার বস্তুই সৃষ্ট হইবে, সত্যকার জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হইবে না।

* * *

বাঙ্গালা দেশে যে সংস্কৃতি গত এক হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, যে যে বস্তু বা অনুষ্ঠান বা মনোভাব অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নীচে তাহার একটা দিগ্‌দর্শন বা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতেছে।—

[১] বাঙ্গালার বাস্তব সভ্যতা—

বাঙ্গালার খড়ের চালের কুটীর; পূর্ব্ব-বঙ্গের বেতের ও বাঁশের কাজ (লুপ্তপ্রায়); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ—ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটী, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এই কাষ্ঠশিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা প্রাচীন হিন্দুযুগের কাষ্ঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্য্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল); ইটের মন্দির; ইটের উপরে নানা রকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে-খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র-স্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)—ইটে-খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় লুপ্ত।

চিত্রবিদ্যা—পুঁথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত), ও অন্য প্রকারের খাঁটি বাঙ্গালী চিত্র-পদ্ধতি, যথা—পশ্চিম-বঙ্গের পটুয়ার পট, পূর্ব্ব-বঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, শরায় ছবি আঁকা—এখন প্রায় লুপ্ত; মাটীর ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চালচিত্র আঁকা, মাটীর সঙের পুতুলে পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র—ইহাই আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিঁকিয়া আছে; রঙ্গীন মাটীর পুতুল, কাঠের পুতুল—গ্রামশিল্পের মধ্যে

অন্যতম শিল্প—জাপানী সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না; দাঁইহাট কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্ত্তি শিল্প ও অন্য ভাস্কর্য্য; মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতীর দাঁতের কাজ—মূর্ত্তি, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি (বাঙ্গালার হাতীর দাঁতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে); বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখের কাজ—শাঁখে খোদাই, আধুনিক মিহি কাজের শাঁখের সরু চুড়ি ইত্যাদি; সারা বাঙ্গালার সোনার কাজ—খেলনা, ঠাকুরের সাজ; ডাকের সাজ।

এতদ্ভিন্ন, ঢাকার রূপার তারের কাজ (filgree work), কলিকাতার রূপার নকাশীতোলা কাজ (repoussé work); কলিকাতার স্বর্ণকারদের অলঙ্কারশিল্প ও বিলাতী ধরণের মীনার কাজ—এগুলির প্রভাব বাঙ্গালার বাহিরেও গিয়াছে।

বাঙ্গালার পিতল-কাঁসার বাসন—মুর্শিদাবাদ খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল কাঁসা ও ভরণের বাসন, দাঁইহাট-কাটোয়ার, বোনপাস-বর্দ্ধমানের ও পূর্ব্ব-বঙ্গের নানা স্থানের পিতলের বাসন, কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেববিগ্রহ, নবদ্বীপের মূর্ত্তি-ঢালাই।

বাঙ্গালার খাদ্যদ্রব্য—বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট শাক সুক্তানি ঘণ্ট প্রভৃতি নিরামিষ ব্যঞ্জন ও তরকারী; বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ রীতি; বাঙ্গালার কাসুন্দী, ছড়াতেঁতুল, আচার; খেজুরে গুড়, পাটালী, মুড়ি মুড়কী, চালের গুঁড়া নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নানা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন; বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা ইত্যাদি; ছানার তৈয়ারী মিষ্টান্ন, বাঙ্গালার নিজস্ব নানা-প্রকারের সন্দেশ—পানিতোয়া, রসগোল্লা।

বাঙ্গালার পরিধেয়—মিহি মলমল, ঢাকার জামদানী, (ফুলতোলা কাপড়), টাঙ্গাইল শান্তিপুর চন্দ্রকোণা ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) প্রভৃতি স্থানের ধুতি ও সাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতী সাড়ী; মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর; বীরভূম, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রেশম; রাজশাহীর মটকা; বীরভূম তাঁতিপাড়ার ও কড়িধার তসর; বিষ্ণুপুরের রেশম—কেটে, চেলি, নকশাদার ও বুটিদার সাড়ী; অধুনা-বিলুপ্ত মুর্শিদাবাদের বালুচরের সাড়ী; হিমালয়-প্রান্তের মোটা পশমী কম্বল; অধুনা-প্রচলিত বাঙ্গালার ছাপা রেশমের সাড়ী।

কুমিল্লা নোয়াখালী ও শ্রীহট্টের শীতলপাটী।

বাঙ্গালার নিজস্ব কৃষি-শিল্প—নানা প্রকারের ধান; পান; পাট; বাঙ্গালার মাছের চাষ।

বাঙ্গালার নৌশিল্প—বিভিন্ন প্রকারের নৌকা (এই নৌ-শিল্প এখন প্রায় অবলুপ্ত); বীরভূমের বুহিতাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

[২] বাঙ্গালার অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি—

বাঙ্গালার সামাজিক বিধি ও ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান—বাঙ্গালার হিন্দুর সম্পত্তি-উত্তরাধিকার রীতি—দায়ভাগ; বাঙ্গালার সামাজিকতা—বিবাহ শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি, এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব ও মিত্র সম্মিলনের বিশেষ রীতি; বাঙ্গালার পূজা—দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, রাস, সরস্বতীপূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, বিশ্বকর্ম্মা পূজা প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ, এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর জীবনে দুর্গাপূজা; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ব্রতকথা, ছোট ছোট মেয়েদের বালিকাব্রত; পারিবারিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব—আটকৌড়ে, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, পৌষপার্ব্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, নূতন খাতা প্রভৃতি।

মেয়েদের আলিপনা-আঁকা, কাঁথা-সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প।

বাঙ্গালার লাঠিখেলা ও অন্য ক্রীড়া কসরৎ; রায়বেঁশে নাচ; পূজার সময়ের ঢাকী-ঢুলীদের নাচ; পূর্ব্ব-বঙ্গের আরতি নৃত্য; মেয়েদের ব্রত-নৃত্য; ও অন্য নৃত্য।

[৩] বাঙ্গালার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—

টোল-চতুষ্পাঠী; বাঙ্গালার সংস্কৃত বিদ্যা—জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীর্ত্তি; বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ; নবদ্বীপ ভাটপাড়া বিক্রমপুর কোটালিপাড়া ত্রিপুরা চট্টল বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পরম্পরা; নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্তগণ; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখ আচার্য্যগণ; মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ; বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক পদ—বৌদ্ধ চর্য্যাপদ, বড়ু চণ্ডীদাস; বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণ; শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব; কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত; ব্রজবুলী ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলী সাহিত্য; শাক্ত পদ—রামপ্রসাদ; রামায়ণ মহাভারতের বাঙ্গালা রূপ; শ্রীরাধাকৃষ্ণ কাহিনীর বাঙ্গালা দেশে বিশিষ্ট

অভিব্যক্তি ; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গল-কাব্যের উপাখ্যান—বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা ; লাউসেন-কথা (অধুনা কম প্রচারিত) ; পশ্চিম বঙ্গের ধর্ম্মপূজা ; বাঙ্গালার কথকতা ; কীর্ত্তন গান—কীর্ত্তনের অভিব্যক্তি—মনোহরশাহী, রাণীহাটী, গরাণহাটী প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্ত্তন ; বাউল ও ভাটিয়াল গান ; কবি, ঝুমুর, তরজা ও অন্য গ্রাম গীতি ; পাঁচালী ; বাঙ্গালার যাত্রা ; জারি গান ; মুসলমান মারফতী গান, মার্সিয়া গান ; বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান পুঁথী পড়ার সুর ; বাঙ্গালার পয়ার ; বাঙ্গালার শ্লোক পড়ার সুর ; পশ্চিমাঞ্চলের গানের বাঙ্গালায় প্রচার—বাঙ্গালার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুম্‌রী, চপ, খেমটা।

বাঙ্গালার সাহিত্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, চৈতন্য ও বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্র-বিষয়ক পুস্তক, পদাবলী-সাহিত্য, প্রাচীন বাঙ্গালার কাব্যাবলী (মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি) ; ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ; বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু—গীতিকবিতা।

এই রূপ সমস্ত বিষয় অবলম্বন করিয়া ইংরেজদের আগমন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধুনা ইহার কতকগুলি বিষয় একেবারে লোপ পাইয়াছে, কতকগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে, কতকগুলির আমরা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আছি। ইংরেজ আমলে বাঙ্গালী কতকগুলি নূতন জিনিসে, তথা এই প্রাচীন জিনিসগুলির অনেক গুলিতে, সমগ্র ভারতের দ্বারায় স্বীকৃত বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক কালের বাঙ্গালীর সংস্কৃতির বস্তু ইত্যাদির মধ্যে উল্লেখ করা যায়—

[১] বাঙ্গালার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম—রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী।

[২] বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্মের নবীন জাগৃতি—রামকৃষ্ণ ...হংস, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভূদেব, বিজয়কৃষ্ণ।

[৩] আধুনিক বাঙ্গালার সংস্কৃত চর্চ্চা—রাধাকান্ত দেব, ...নাথ তর্কবাচস্পতি, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ...রচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, ...লদাস ন্যায়রত্ন, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ তর্ক...শ, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পঞ্চানন তর্ক... দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্তরত্ন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

[৪] বাঙ্গালার সাহিত্য—ঈশ্বরচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন, হেম, নবীন, ভূদেব, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র।

[৫] বাঙ্গালার নবীন শিল্পপদ্ধতি—ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের পুনরুদ্ধার চেষ্টা—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও ইঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ।

[৬] বাঙ্গালার সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা ও সংরক্ষণ চেষ্টা—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, বিপিনচন্দ্র।

[৭] বাঙ্গালায় আরব্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বঙ্কিম প্রমুখ বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ভারতমাতার কল্পনা। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যাত্রামোহন সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

[৮] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের গবেষণা ;—আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ।

[৯] প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক বাঙ্গালার সার্থক গবেষণা—রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র দাস, শরৎচন্দ্র রায়।

বাঙ্গালার সংস্কৃতিতে যে একাধারে পাণ্ডিত্য ও কৃতকারিতার অভাব নাই, তাহা আধুনিক বাঙ্গালার বাচস্পত্যকার তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং বিশ্বকোষকার নগেন্দ্রনাথ বসুর দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

* * *

প্রসঙ্গতঃ বাঙ্গালী মুসলমানের সংস্কৃতি, এবং বিশিষ্ট বাঙ্গালী সংস্কৃতির কতকগুলি লক্ষণীয় অঙ্গ বা উপজীব্য বস্তু, অনুষ্ঠান ও প্রকাশ উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালার সংস্কৃতির গতির দিগ্‌দর্শনে আবার ফিরিয়া আসা যাউক।

মোগল যুগের মধ্যেই, বাঙ্গালা দেশে ইউরোপীয়—পোর্ত্তুগীস ওলন্দাজ ফরাসী দিনেমার ইংরেজ আসিল। ইংরেজ ধীরে

ধীরে দেশের রাজা হইয়া বসিল। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে ইংরেজের সহিত সাহচর্য্যের ফলে আর একবার যুগান্তর উপস্থিত হইল।

এই যুগান্তর এখনও চলিতেছে। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত, এই যুগান্তর ব্যাপারে আমরা চারিটি পর্য্যায় বা ক্রম দেখিতে পাই। [১] রামমোহনের যুগ, [২] ইয়ং বেঙ্গলের যুগ, [৩] বঙ্কিম ভূদেব-বিবেকানন্দের যুগ, ও [৪] অতি আধুনিক যুগ, বা লড়াইয়ের পরের যুগ।

[১] প্রথম যুগে ইউরোপীয় মনের সহিত বাঙ্গালী মনের প্রথম পরিচয়। এই প্রথম পরিচয়ের সময়ে, ভারতের প্রাচীন শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন একটু সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিল, একেবারে নিজেকে বিকাইয়া দিতে চাহে নাই। রামমোহন এই যুগের প্রতীক। ইনি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তখনকার দিনের সামাজিক জীবন ও নৈতিক আদর্শের ঊর্দ্ধে উঠিতে না পারিলেও, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সার কথা উপনিষদকে আশ্রয় করিয়া তিনি ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা যে একটা dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, উপনিষদেই ইহার পর্য্যবসান নহে,—এই বোধ না থাকায় রামমোহনের প্রস্তাবিত সমাধান বা সামঞ্জস্য একদেশদর্শী রহিয়া গেল; এবং বৈরাগ্যযুক্ত-চিত্তের মানুষ না হওয়ায় রামমোহন এদেশের মন যাহা চায় তদনুরূপ ঈশ্বরে একান্তভাবে নিমজ্জিত লোক-পূজিত ধর্ম্মগুরু হইতে পারিলেন না।

[২] দ্বিতীয় যুগে বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সহিত পরিচয়ের অভাবে ইহার প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহারা নানা উপায়ে ইউরোপীয় মনোভাব এমন কি ইউরোপীয় রীতিনীতি ও জীবন-যাত্রার প্রণালী—সমস্তই ভারতবর্ষের জীবনে আরোপ করিতে চাহিলেন। এরূপ উলটপালট করিবার মত সংখ্যা বা শক্তি তাঁহাদের ছিল না; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত বা শিশিক্ষু জনগণের মনে তাঁহারা একটা ছাপ দিয়া গেলেন।

[৩] তারপরে আসিল যথার্থ সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা—এই চেষ্টায় ছিল—প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাকে রক্ষা করিয়া, ইউরোপীয় সংস্কৃতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও আমাদের পক্ষে হিতকর তাহা আত্মসাৎ করা। বঙ্কিম, ভূদেব ও বিবেকানন্দের যুগে—অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৬৫ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত—জীবন ধীর মন্থর গতিতে চলিতেছিল; ইউরোপীয় সভ্যতা আজকালকার মত এতটা সর্ব্বগ্রাসী ভাবে আমাদের সমক্ষে তখন দেখা দেয় নাই, আমাদের জীবনে আজকালকার মত এত নানা জটিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাও আসে নাই। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া ধীরে-সুস্থে বিচার করিবার অবকাশ ছিল, তাই আমরা বঙ্কিমে ভূদেবে বিবেকানন্দে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে হিতকর, —তাহার সংহতিশক্তিকে দৃঢ় করিবার উপযোগী এবং তাহাকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিবার যোগ্য কথা পাই; সমীক্ষা ও অনুশীলন ছিল বলিয়াই বঙ্কিম ও মধুসূদন বাঙ্গালীর জন্য এমন চিরন্তন রস-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা বাঙ্গালীর সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

[৪] এখন বাঙ্গালা সংস্কৃতিতে যে যুগ চলিতেছে, তাহার মূল কথা হইতেছে—বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত, বাঙ্গালীর জীবনে ক্রমবর্দ্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক ও নৈতিক অবনমন, এবং আদর্শ-বিপর্য্যয়। এখনকার কালে চারিদিক হইতে ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব বাঙ্গালীর জীবনে আসিয়া পড়িতেছে —এই যে দ্রুত ভাববিনিময়, সংবাদ পত্রের ও সাহিত্যের বহুল প্রচার, চলচ্চিত্র ও সবাক্‌চিত্র প্রভৃতির যুগে এরূপটী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক অবস্থা-বৈগুণ্যে সামাজিক আদর্শও পরিবর্ত্তিত হইতেছে; প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ, যাহা এতাবৎ কন্যাপণ ও কন্যার সংখ্যাল্পতা হেতু নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, অর্থনৈতিক সঙ্কটে বেশী করিয়া ক্লিষ্ট হওয়ায় তাহা মধ্যবিত্ত ঘরেও আসিয়া পড়িতেছে; সহশিক্ষা-রূপ নূতন সমস্যাও আসিতেছে।

বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া বাঙ্গালীর খ্যাতি আছে। আধুনিক যুগান্তরের কালের উপরে বিচারিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে, অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৪০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজের আনুগত্য করিয়া আসিয়াছে; ইংরেজের বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে তাহার অর্থনৈতিক সঙ্কট হয় নাই, সে সমগ্র উত্তর-ভারতবর্ষ জুড়িয়া প্রভূত সম্মান ও চাকুরী উভয়ই

পাইয়া আসিয়াছে। অখ্যাত, অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত সুদূর প্রান্তিক প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া দিল্লীতে বা অন্যত্র পাঁচজনের সমাজে বাঙ্গালী বিশেষ প্রতিষ্ঠা এতাবৎ পায় নাই। ইংরেজের অনুচর হইয়া এবং রাজধানী কলিকাতার অধিবাসী হইয়া এখন সে এক অতি উচ্চ স্থান দখল করিয়া বসিল ; ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ মাথা-গরমও হইল। তাহার সে সুখের দিন আর নাই। এখন সে বাহির হইতে বিতাড়িত হইতেছে; অন্নাভাবে তাহাকে নিজ বাসভূমে পরবাসী হইতে হইতেছে। এপর্য্যন্ত বাঙ্গালী নিজেকে যে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে সে শিক্ষা আর তাহার জীবনে কার্য্যকরী হইতেছে না ; সে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে নিজের বৃত্তি ও নিজের জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিতেছে না, কেবল ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। দেশে তেমন বড় চিন্তানেতা নাই যিনি তাহাকে যথার্থ দিগ্‌দর্শন করান, তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া দেন, বজ্রনির্ঘোষ আহ্বানে তাহাকে পরিচালিত করেন।

* * *

এই অবস্থার মধ্যেও বাঙ্গালী সাহিত্য-সৃষ্টি করিবার জন্য লালায়িত—কেবল যা তা সাহিত্য নহে—বড় সাহিত্য। জাতির মধ্যে স্ফূর্ত্ত জীবনীশক্তি, অদম্য আশা, অটুট কর্ম্মশীলতা না থাকিলে সে জাতির মধ্যে কি সাহিত্য জন্মলাভ করিবে ? এই যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের দুই চারিজন সাহিত্যরথী বিদ্যমান, তাঁহাদের লইয়াই আমরা গৌরব করি : কিন্তু যুগধর্ম্মের ফলে অতি-আধুনিক বাঙ্গালীর সাহিত্য-চেষ্টা (অল্প দুই একজন প্রতিভাশালী লেখককে বাদ দিলে) ব্যর্থতার একটী হৃদয়-বিদারক প্রকাশ মাত্র।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং তাহার কৃতিত্ব বিচার করিয়া, তাহার উপস্থিত সঙ্কট-কালে মানসিক চর্য্যা সম্বন্ধে এই কয়টী কথা বলা যায়—

[১] বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি, ইহা সত্য বটে, কিন্তু এই ভাবপ্রবণতাই তাহার পূর্ণ পরিচয় নহে। বাঙ্গালী লক্ষণীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু সেই সাহিত্য, জগতে এমন অপূর্ব্ব কিছু বস্তু নহে ;—তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক কি শতখানেক বৈষ্ণব পদ এবং কতকগুলি আখ্যায়িকা, এবং আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে কতকটা মধুসূদনের কাব্যাংশ, বঙ্কিমের খানকয়েক উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা, ছোট গল্প, এবং কিছু কিছু অন্য রচনা—মাত্র এই কয়টী জিনিস আমরা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থাপিত করিতে পারি। ভাটিয়া বা মারোয়াড়ী অথবা পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীর তুলনায় বাঙ্গালী ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করিতে পারিতেছে না ; ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য অমনিই সিদ্ধান্ত করা হইল, বাঙ্গালী কবি জাতি, ভাবপ্রবণ জাতি, তাহার মধ্যে কর্ম্মশক্তি নাই, তাহার সমস্তটাই ভাবুকের খেয়ালে, কবির কল্পনায় নিঃশেষ হইয়া যায়। আমরাও এই কথাটা অনেকটা মানিয়া লইয়াছি ; রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর হইতে আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ সচেতন গৌরব-বোধ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, একটা গর্ব্বসুখে আমাদের চিত্ত ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গান ভারতবর্ষের রাষ্ট্রসঙ্গীত হইয়া গিয়াছে। সকলেই আমাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে মারোয়াড়ীর মত কৃতিত্ব না দেখিয়া আমাদের কল্পনাশক্তিরই তারিফ করিতেছে, আমরাও সেই কথা সত্য ভাবিয়া, প্রেমানন্দে নাচিতেছি,—আমাদের ব্যর্থতাকে আমরা আমাদের পাপপ্রকৃতিজাত বলিয়া, তাহার প্রতিকারের শক্তিকে খর্ব্ব করিতেছি। আমাদের দেশের নেতারা কেহ কেহ কীর্ত্তনের গানেই আমাদের ভাবুক প্রাণের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতেছেন। কবিতা ও গান, ইহাই যেন হইল আমাদের মানসিক সংস্কৃতির চরম ফল। বার বার একটা কথা শুনিয়া, আর সেই কথা ক্রমাগত মন্ত্রের মত জপ করিয়া, আমরা সেই কথাটাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি।

কিন্তু বাস্তবিক এই কথাটাই কি ঠিক? আমরা কি কেবল ভাবপ্রবণ জাতি ? আমাদের মধ্যে কি জ্ঞানের সাধনা, কর্ম্মের সার্থকতা নাই—হয় নাই ? আমার মনে হয়—ভাবুকতা, কল্পনাপ্রবণতা, সাহিত্যরসে মশগুল হইয়া থাকা—ইহা আমাদের মানসিক সংস্কৃতির একটা দিক্ মাত্র—সর্ব্বপ্রধান দিক্ নহে। প্রাচীনকালে কীর্ত্তনের সভায়, ও কবি বা পাঁচালী গানের আখড়ায়, বাউলদের জমায়েতে ও মারফতী গানের মজলিসে যেমন বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি পণ্ডিতের টোলেও তাহার জ্ঞানের দিক্‌টা প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানমন্দিরে বাঙ্গালাদেশ রিক্তহস্তে যায় নাই।

ভারতের সঙ্গীতোদ্যানে বাঙ্গালা কীর্ত্তন একটী বিশিষ্ট সুরভি পুষ্প সন্দেহ নাই ; কিন্তু বাঙ্গালার নব্য ন্যায়, বাঙ্গালায় সংস্কৃত কাব্য, বাঙ্গালার 'গীতগোবিন্দ', বাঙ্গালার বৈষ্ণব-গোস্বামীদের সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, এবং আধুনিক কালে বাঙ্গালার রামমোহন, বাঙ্গালার বিদ্যাসাগর, বাঙ্গালার কেশবচন্দ্র সেন, বাঙ্গালার বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী গবেষক প্রত্নতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক—ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান বৃদ্ধি করিতে, ভারতের চিন্তাকে পুষ্ট করিতে ইঁহাদের দান কম নয়, ইঁহারা বাঙ্গালার মানসিক সংস্কৃতির অপর একটী দিক্ এবং একটী বড় দিক্, নিছক ভাবপ্রবণতার অত্যাবশ্যক প্রতিষেধক দিক্‌কে প্রকাশ করিয়া আছেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুর এখন জীবন-মরণ সঙ্কট উপস্থিত ; আমাদের ভাবুকতা, কল্পনা-প্রবণতা সবই শুখাইয়া যাইতেছে এবং অন্নের অভাবে তাহা আরও শুখাইয়া যাইবে। জাতির জীবনে স্ফূর্ত্তি, আশা, আনন্দ, উৎসাহ, জয়ের আগ্রহ, না থাকিলে সেই জাতির মধ্যে সত্যকার প্রাণবন্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। আমাদের এখন সাহিত্য-সৃষ্টির বা সাহিত্য চর্চ্চার চেষ্টা, কল্পনার আবাহন, ভাবুকতার সাধন, সে যেন যে গাছের গোড়া শুখাইয়া আসিতেছে, শিকড়ে যাহার রস নাই, সেই গাছের আগডালে বারি সিঞ্চন করা। আমাদের জীবনে ভোগ করিবার, ত্যাগ করিবার কি আছে ? অর্জ্জন করিবার, জয় করিবার কি আছে ? যেটুকুও আছে, তাহা তো রক্ষা করিবারও পথ পাইতেছি না। এ অবস্থায় কি প্রকারের সাহিত্য আমাদের হাত দিয়া বাহির হইতে পারে ? বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে আগুন লাগিয়াছে ; রসচর্য্যা লইয়া মাতামাতি করা এখন তাহার পক্ষে নিতান্তই অশোভন দেখায়। এখন প্রাণধারণের, কোনও রকমে দুর্দ্দিনের রাত্রে টিঁকিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন তাহাকে সর্ব্ব-বিষয়ে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। এখন তাহার আত্মবিশ্লেষণ কার্য্যে তাহাকে জ্ঞান-শক্তি ও কর্ম্ম-শক্তির আবাহন করিতে হইবে—সে শক্তির পরিচয় সে দিয়াছে, সে শক্তি তাহার আছে, এবং সে শক্তি তাহার কল্পনা বা ভাবুকতা হইতে কোনও অংশে কম নহে।

[২] প্রত্যেক সমাজের মধ্যে দুই প্রকারের শক্তি কার্য্য করে—কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাপসারী, আত্মসমাহিতি-কারী এবং আত্মপ্রসারকারী। এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়। কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অনুপ্রাণনায় বাঙ্গালী সম্প্রতি একটু বেশী রকম করিয়া বহির্মুখী হইতে চাহিতেছে। এখানে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া তাহাকে একটু অন্তর্মুখী করা এখন তাহার প্রাণরক্ষার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিস্ফূরণের দোহাই দিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে অবাধ স্বাধীন গতি এই কেন্দ্রাপসারিত্বের একটী বাহ্য প্রকাশ। কিন্তু সমাজগত সমষ্টির বিভিন্ন অংশ-স্বরূপ ব্যক্তিগত ব্যষ্টি, যদি এইরূপে মুক্ত, স্বতন্ত্র, ও সংঘবিচ্যুত হইয়া অবাধ গতি অবলম্বন করিয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমাজ সমষ্টি আর সমষ্টিবদ্ধ থাকে না। এক কথায়, Social Discipline বা সমাজগত চর্য্যা বা নীতি বা বিনয় না থাকিলে সমাজ টিঁকিতে পারে না। এখন বাঙ্গালীর জীবনে বাহিরের ও ভিতরের নানা প্রতিকূলতার বিপক্ষে সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের অবাধ প্রসারের সময় ইহা নয় ; একমাত্র সংঘগত ভাবে অবস্থান দ্বারাই ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন ও স্বার্থ উভয়ই রক্ষা হইতে পারে। বাঙ্গালীর জীবনে এখন এই রক্ষয়িত্রী শক্তির আবাহন করিতে হইবে, আবার সমাজকে, সঙ্ঘকে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির উর্দ্ধে স্থান দিতে হইবে। কি ভাবে একার্য্য করা উচিত, তাহা অবশ্য বিচার-সাপেক্ষ। রক্ষয়িত্রী শক্তি মানে নিছক্ গোঁড়ামি নহে। দেশ ও কালের উপযোগী ভাবে নিজ জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হইতে বিচ্যুত না হওয়াই হইতেছে সামাজিক জীবনে কার্য্যকর রক্ষণশীলতা। একাজের জন্য প্রথম আবশ্যক, জ্ঞান, আলোচনা, অনুশীলন; নিজের জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে, এবং বাহিরের জগতের প্রগতি সম্বন্ধে। বাঙ্গালীকে আবার একটা ধরাবাঁধা discipline মানিতে হইবে—নাই-আঁকড়িয়া হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে রাশ ছাড়িয়া দিলে, তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিতে হইবে।

[৩] বাঙ্গালী কর্ম্মী নহে, তাহার এই একটা অপবাদ আছে। সত্য বটে, হাজারে হাজারে লাখে লাখে বাঙ্গালী অন্ন উপার্জ্জনের জন্য বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালার বাহিরে যায় নাই—যেমন পাঞ্জাবী বা হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালায় আসিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, এতাবৎ বাঙ্গালীর ঘরে একমুঠা ভাতের অভাব হয় নাই। সেদিন পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত

ঘরের ছেলের অন্নচিন্তা ছিল না। গরীব লোকে দেশে বসিয়াই পেট ভরাইতে পারিত বা আধ-পেটা খাইয়া কোনও রকমে থাকিতে পারিত, ১৫।২০ টাকার জন্য কাঁচা মাথা দিবার আবশ্যকতা তাহার ছিল না, 'রুটী-অর্জ্জন' করিতে তাহাকে বাহিরে ছুটিতে হইত না। এখন সে আবশ্যকতা আসিতেছে; আমার মনে হয়, তথাকথিত ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী, কবি বাঙ্গালী এখন দরকার পড়িলে কর্ম্মী বাঙ্গালী হইতে পিছপাও হইবে না। আবশ্যক পড়িয়াছে বলিয়াই ময়মনসিংহের বাঙ্গালী কৃষক এখন ঘর ছাড়িয়া আসাম প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, বর্ম্মা ও শ্যামে গিয়া বসবাস করিতেছে। দেখা গিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী অন্য জাতির লোকেদের চেয়ে কিছু কম কৃতিত্ব দেখায় নাই। মানুষের কর্ম্ম-শক্তি তাহার আভ্যন্তর urge বা তাড়নার উপরে নির্ভর করে। বাঙ্গালীর অবস্থা বৈগুণ্যে সে তাড়না আসিতেছে। বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া শ্রমী ও কর্ম্মী হইতেই হইবে। তুমি কবি ও ভাবুকের জাতি, তোমার দ্বারা এসব কিছু হইবে না—এইরূপ নিরুৎসাহ বাক্যে তাহার শত্রুরাই তাহাকে নিবৃত্ত করিবে।

[৪] বাঙ্গালীর বাঙ্গালীপনার বা বাঙ্গালীত্বের দিকে ঝোঁক দিয়া কেহ কেহ তাহাকে অসম্ভব রকমে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার মনে শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালীর মতন শিল্পী জাতি দুনিয়ায় নাই—প্রমাণ, বাঙ্গালী পটুয়ার পট, বাঙ্গালী ছুতারের কাঠ-খোদাই, মধ্য-যুগের বাঙ্গালার ইটে-কাটা মন্দিরের নকশা; বাঙ্গালীর মত বীর জাতি দুনিয়ায় নাই—প্রমাণ বাঙ্গালীর মল্লনৃত্য, রায়-বেঁশে নাচ; বাঙ্গালীর নাচ অপূর্ব্ব—প্রমাণ, বাঙ্গালার কোনও কোনও জেলার মেয়েদের মধ্যে বিলোপশীল ব্রত নৃত্য। আমাদের দেশের গ্রামশিল্পকে আমরা প্রাণ দিয়া ভালবাসিব, যতটা সাধ্য তাহাকে রক্ষা করিব; এই শিল্প আমাদের গ্রামীণ জীবনের একটী মনোহর অভিব্যক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া জগতের অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর জিনিসকে টেক্কা দিয়াছে আমাদের বাঙ্গালার এই শিল্প ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, এরূপ কথা প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙ্গালীর মুখে হাস্যের উদ্রেক করিবে। সাহিত্যে একজন রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গমাতা অঙ্কে ধারণ করিয়াছেন, তাই বলিয়া যেমন ইহা প্রমাণিত হয় না যে বাঙ্গালী মাত্রই কবি, তেমনি একজন অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল ভারতীর নিজ হস্ত হইতে তুলিকা পাইয়াছেন বলিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শিল্প বিষয়ে অসাধারণত্ব সূচিত হয় না।

আমরা ভারতের আর পাঁচটী জাতির মতই একটী প্রধান ভারতীয় জাতি আমাদের ভাবুকতা আছে আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের যথেষ্ট শিল্পবোধ আছে, ভারতের সভ্যতার ভাণ্ডারে হাত পাতিয়া কেবল লই নাই, দিয়াছিও যথেষ্ট; আমাদের সাহিত্য, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের বিদ্যা গবেষণা ও আবিষ্কার, আমাদের হিন্দুযুগের ও মধ্যযুগের মন্দির-শিল্প ও ভাস্কর্য্য, পট ও ইটে-খোদাই,—এসব গর্ব্ব করিবার বস্তু, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কোনও কোনও বিষয়ে বিশ্বজনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে ও করিবে; এইখানেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা। আমরা অনুচিত গর্ব্ব করিতে চাহি না; তবে যে কোনও অবস্থায় আমরা যে অকৃতকার্য্য হইব না, আমরা পূর্ব্ব কৃতিত্ব আলোচনা করিয়া সেইটুকু আত্মবিশ্বাস আমরা আমাদের প্রত্যেকের মনে আনিতে চাহি।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। শেষ এই কথা বলি—অনার্য্য এবং আর্য্য পিতৃপুরুষ ও সংস্কৃতি-গুরুদের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গালীরা যে মনঃপ্রকৃতি পাইয়াছি, তাহা নিন্দার নহে; আমাদের নৈসর্গিক পারিপার্শ্বিক ও ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নাই—আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম দিয়া তাহাকে প্রবর্দ্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে। উপস্থিত আমাদের মানসপ্রকৃতিতে কল্পনা ও ভাবুকতা এবং রসানন্দের দিকে ঝোঁক না দিয়া, আত্মরক্ষার জন্য আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মের দিকেই বেশী করিয়া ঝোঁক দিতে হইবে—ইহাই আমার নিবেদন।*

* রাঁচী হিন্দু "ফ্রেণ্ড্‌স্‌-ইউনিয়ন-ক্লাব" কর্ত্তৃক আহূত সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ রূপে পঠিত, ২১ কার্ত্তিক, ১৩৪১।

জমিদারের মেয়ে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(চার)

বিবাহ নির্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল।

পূর্ব্বের কথামত সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিরাগমন শেষ করিয়া বধূকে কাছে রাখা হইয়াছে। নাস্তির কষ্টের কোন কারণ নাই। শ্বশুর-বাড়ীর জানালা খুলিলে বাপের বাড়ীর জানালার মানুষ চেনা যায়, কথা কওয়াও চলে। সকালে একবার বিকালে একবার, সেখানে যাওয়ার ছুটী ত' দেওয়াই আছে। তাহার উপরে সুযোগ পাইলেই নাস্তি পলাইয়া গিয়া দিদিমাকে দেখিয়া আসে। তাহার উপর কাজের ভারও পড়িয়াছে—পান সাজা, পূজার ফুল বাছা এবং শিবনাথের জামা-কাপড় গুছাইয়া রাখার ভার পিসীমা তাহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু মা শিবনাথের জামা-কাপড় রাখিবার ভারটি নিতে দেন নাই, তাহার পরিবর্ত্তে সন্ধ্যায় পিসীমার পায়ে তেল দিবার কাজ দিয়াছেন। রাত্রে বৌ শোয় মায়ের কাছে। শিবনাথ এখনও সেই পিসীমার কাছেই শোয়, তবে বিছানাটা ভিন্ন হইয়াছে।

ফাল্গুন মাস ; গোমস্তারা সকলে পৌষ-কিস্তির আদায়ের হিসাব দিতে আসিয়াছে। মৌজা বেলেড়ার গোমস্তার ইরসাল অর্থাৎ সদরে পাঠান টাকার পরিমাণ খুব কম হওয়ায় পিসীমা আদেশ করিলেন, আদায় না হয়ে থাকে তুমি নিজে দিয়ে পূরণ ক'রে দাও ; তারপর আদায় ক'রে নেবে।

যোড়হাত করিয়া গমস্তা শ্রীপতি দে বলিল, পাঁচ টাকা মাইনের কর্ম্মচারী আমি, মহলের টাকা কি আমার ঘরে আছে মা !

পিসীমা প্রশ্ন করিলেন, সরকারের ঘরে কম দিয়ে কি শিবনাথ মাপ পাবে ? তার জমিদারী থাকবে কি ক'রে ?

নায়েবও দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, রাজার রাজস্বটা ত' দিতে হবে বাপু, জমিদারের মুনফা না হয় বলতে পার দিতে পারলাম না।

গোমস্তা বলিল, বড় গাছে বড় ঝড়ই লাগে মা। আপনাদের সহ্য না ক'রে উপায় কি ? প্রজার এবার বড় দুরবস্থা।

পিসীমা বলিলেন, সে শুনলে নাবালকের এষ্টেট চলবে না শ্রীপতি, চৈত্র-কিস্তিতে টাকা আমার আদায় চাই-ই। আদায় না হ'লে তোমাকে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে হবে।

বলিয়া পিসীমা স্নানে বাহির হইয়া গেলেন। কথাগুলি অন্দরের মধ্যেই হইতেছিল। নায়েব ও শ্রীপতি চলিয়া যাইতেছিল, শিবনাথের মা বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিলেন—শ্রীপতি।

শ্রীপতি ফিরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, মা।

মা নীচে আসিয়া দরদালানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, শোন ত' বাবা এদিকে একবার। সিং মশায়, আপনিও শুনুন।

নায়েব ও শ্রীপতি উভয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই মা বলিলেন, দরজাটা বন্ধ ক'রে দেবেন সিং মশায়।

তারপর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, সত্যিই কি প্রজাদের দুর্দ্দশা এবার খুব বেশী ?

শ্রীপতি যোড়হাত করিয়া বলিল, আমি মিথ্যে কথা বলিনি মা। আপনি তদন্ত করিয়ে দেখুন।

মা বলিলেন, আর একটা কথা আমি জিজ্ঞেসা করব বাবা। সত্যি উত্তর দিও। আচ্ছা, শিবুর বিয়েতে প্রজাদের কাছে কৌশল ক'রে টাকা আদায় করায় কি দুর্নাম হয়েছে বাবা ?

শ্রীপতি নীরব হইয়া রহিল।

মা আবার প্রশ্ন করিলেন, নায়েব বাবু !

নায়েব বলিল, ও কথা বাদ দেন মা, সংসারে দশ রকমের মানুষ আছে—দশ রকম বিশ রকম বলে, ও কথায় কান দিতে গেলে কি চলে !

মা বলিলেন, আমি টাকাটা ফিরিয়ে দিতে চাই।

শ্রীপতি বলিল, না মা, তা হয় না, সকলেই ত' তা বলে না, আর তাতে কি তাদের অপমান করা হবে না? অবশ্য আপনাদের কাছে তাদের আর মান অপমান কি?

মৃদু হাসিয়া মা বলিলেন, না-না, ও কথা ব'ল না বাবা, আঙ্গুলের ছোট বড় বাছা চলে না, মানুষেরও তাই, অবস্থার ছোট বড়তে ছোট বড় হয় না। যাক্ গে—আসুন আপনারা।

নায়েব যাইতে যাইতে বলিল, আমারই হয়েছে মরণ শ্রীপতি—এক মালিক যান উত্তরে, ত' আর একজন যাবেন দক্ষিণে। ছেলেটা বড় হ'লে যে বাঁচি।

সে সময় দোলের ছুটি, শিবনাথ তাহার ঘরের মধ্যে বসিয়া একটা পিতলের পিচকারীতে ন্যাকড়া জড়াইতেছিল। দোল আসিতেছে—রং খেলিতে হইবে। নয় বৎসরের নাস্তি পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। সিঁড়ির উপর হইতেই মা প্রশ্ন করিলেন, শিবু আছিস্?

ঘরের মধ্যে ঠিক পাশেই বধূর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া শিবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে শুষ্কস্বরে বলিয়া উঠিল, এঁ্যা!

নাস্তি কিন্তু অপ্রতিভ বা বিব্রত হইল না, সে চুপ করিয়া গুঁড়ি মারিয়া খাটের এক কোণে আত্ম-গোপন করিয়া বসিল। মা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। শিবু ভয়ে শুকাইয়া গেল।

মা বলিলেন, তোকে একটা কথা বলব শিবু!

শিবু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন, গোমস্তারা বলছিল এবার নাকি বড় দুর্বৎসর, ফসল ভাল হয় নি। প্রজারা খাজনা দিতে পারছে না।

শিবু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এবার তা হ'লে খাজানা নিও না মা।

মা বলিলেন, সে ছেড়ে দেবার মত অবস্থা ত' আমাদের নয়, তা ছাড়া জজ সাহেবকে প্রতি বৎসর নাবালকের এষ্টেটের হিসেব দিতে হয়; তিনি হয় ত' তা মঞ্জুর করবেন না। সে কথা আমি বলিনি বাবা। আমি বলছিলাম যে, এই দুর্বৎসরে প্রজাদের কাছে বিয়ের সময় টাকা আদায় করায় লোকে খুব দুর্নাম করছে।

মায়ের কথা শুনিতে শুনিতে শিবুর মুখ কখন চিন্তায় গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, সেটা খুব খারাপ হয়েছে মা।

মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, সেইটে তাদের ফিরে দিতে হবে শিবু। তোর পিসীমাকে ব'লে তাঁকে এইটেতে রাজী করাতে হবে।

শিবু বলিল, পিসীমাকে আমি রাজী করাব মা। একবেলা না খেলেই পিসীমা ঠিক মত দেবে।

—শোন্, বিয়ের টাকা ফিরে দিতে গেলে প্রজাদের অপমান করা হবে। তার চেয়ে সবার খাজানা হতে এবার এক টাকা ক'রে মাপ দেওয়ার হুকুমটা তোর পিসীমার কাছে করিয়ে নিতে হবে। অধিকাংশ লোকেই এক টাকা ক'রে দিয়েছে। বলবি, আমার বিয়ের বছরে এক টাকা ক'রে মাপ দিলে প্রজারা চিরদিন নাম করবে, আর আশীর্বাদ করবে।

—বেশীও ত' ক'জন দিয়েছে মা। পাচ টাকা দিয়েছে যোগী মোড়োল, খুদী মোল্যান, আরও কে কে, সব লেখা আছে, সিং মশায়ের কাছে।

—তারা অভাবী নয় শিবু, তারা ও কৌশল না করলেও দিত। তুই ওই এক টাকা মাপের হুকুমটাই ক'রে নে।

মা আর দাঁড়াইলেন না, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আজই বলিস নে যেন পিসীমাকে। গোমস্তারা সব আজ সন্ধ্যের সময় চলে যাবে, কাল বলবি। নইলে তারা বকুনি খেয়ে মরবে, পিসীমা ভাববে ওরাই সব তোকে ধরে পড়েছে।

মা চলিয়া গেলেন। বৌও সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একরাশ ঝুল মাখিয়া গুটি গুটি বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে শিবুর পিঠে গুড়ুম করিয়া একটা কিল মারিয়া বাহির হইয়া পলাইল।

* * *

পরদিন বেলা তখন নয়টা হইবে। বৌ উপরে পুতুল খেলিতে খেলিতে অঝোর-ধারে কাঁদিতে কাঁদিতে নামিয়া আসিল। শিবনাথ তাহার বড় চীনামাটির পুতুলটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

পিসীমা ডাকিলেন, শিবনাথ!

তখন শিবনাথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াই দুম্ দুম্ করিয়া নামিয়া আসিতেছিল, সে সিঁড়ি হইতেই আরম্ভ করিল, বিলিতী পুতুল কেন খেলবে ও?

রোষ-ক্ষুব্ধ বধূ জ্বলন্ত তুবড়ীর মত বলিয়া উঠিল, বেশ করব, খুব করব। আমি বিলিতী পুতুল খেলব, তাতে ওর কি?

শিবনাথ গম্ভীর স্বরে আদেশ করিল, নিত্য, ওপর থেকে আমার সরু বেতগাছটা আন ত!

বধূটি অকস্মাৎ পাগলের মত জিভ বাহির করিয়া অতি বিকৃতভাবে শিবনাথকে ভেঙাইয়া উঠিল, এ্যাঁই—এ্যাঁই—এ্যাঁই—।

পিসীমা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। মা'ও হাসিতে-ছিলেন, কিন্তু এবার তিনি শাসনের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, বৌমা! যাও, ঘরের মধ্যে যাও।

নাস্তি মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন, নিত্য, নায়েব বাবুকে ব'লে আয় অনন্ত বৈরিগীর কাছে লোক পাঠিয়ে দিতে, সে যেন তার দোকানে যা পুতুল আছে নিয়ে আসে, বৌমার যেটা পছন্দ হবে বেছে নেবে।

শিবনাথ বলিল, বিলিতী হলে কিন্তু অনন্তকে আমি বাড়ী ঢুকতে দেব না।

ঘরের মধ্য হইতে বৌ বলিয়া উঠিল, না দেবে না, একা ওর বাড়ী কি না!

মা সেলাই করিতে করিতে বলিলেন, বৌমা, তোমায় চুপ ক'রে থাকতে হয়।

উত্তর দিতে না পাইয়া বৌ শিবনাথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে ছোট একটি ভেংচী কাটিয়া দিল।

শিবনাথ বলিল, ওই দেখ, আবার আমায় ভেংচী কাটছে, আমি বেত দিয়ে ওর পিঠের চামড়া তুলে দেব।

মা বলিলেন, শিবু, মেয়েমানুষের গায়ে হাত ত' তুলতেই নাই, মুখে মারব বলাও দোষের কথা। ও কথা আর ব'ল না।

* * *

দ্বিপ্রহরে নায়েব ও গোমস্তাদের ডাকাইয়া খাজানা আদায়ের ব্যবস্থার বিষয়ে পিসীমা পরামর্শ করিতেছিলেন।

নায়েব বলিল, সুদ না থাকাতেই প্রজাদের এই মতি গতি। তারা বুঝছে খাজনা দিলেই ত' বেরিয়ে যাবে। য'দিন টাকাটা তারা নিজেরা খেলিয়ে নিতে পারে, তাই তাদের লাভ। ধরুন এ'বছর দিলেও সেই দশ টাকা দিতে হবে, দু' বছর পরেও সেই দশ টাকা। আগে দিলেই এখানে লোকসান। মহলে সুদ চলতি করুন।

পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, ছি, সিং মশায়।

নায়েব মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, দোগাছি মহলের কাগজে প্রজাদের কারও চৌদ্দ, কারও দশ, কারও বিশ বছরের খাজনা বাকী। একজনের দেখলাম ছাপ্পান্ন বছরের খাজনা বাকী। সুদ না হলে—

পিসীমা বাধা দিয়া বলিলেন, আর কখনও আপনি ও প্রস্তাব করবেন না সিং মশায়। বাপ পিতামহ যা করেননি তা করা হ'তে পারে না। কিন্তু শ্রীপতি, তোমার মহলে এমন ধারা বাকী কেন?

শ্রীপতি বলিল, ছাপ্পান্ন বছরের যার বাকী, তার খাজনা সামান্য, বৎসরে চার আনা ক'রে। ওরা বলে—জমিদার যখন আসবেন তখন এক সঙ্গে হুজুরকে দোব—এই আমাদের নিয়ম। বহুদিন ত' ও মহলে মালিক যান নি। শুনেছি বাবুর পিতামহ, আপনার পিতা, কর্ত্তাবাবু গিয়েছিলেন।

পিসীমা বলিলেন, হুঁ।

তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, খাজনা আদায় করতেই হবে। ধ'রে এনে বসিয়ে রেখে খাজনা আদায় কর। ফসল থাকলে আটক কর, খাজনা না দিলে তুলতে কি বেচতে দিও না। প্রত্যেক মৌজায় আর একজন ক'রে চাপরাশীর বন্দোবস্ত ক'রে দিন সিং মশায়।

গোমস্তাদের বিদায় দিবার সময় আবার তাহাদিগকে বলিলেন, নাবালকের এষ্টেট বলে ভয় ক'রে কাজ ক'র না তোমরা। মালিক তোমাদের ঘুমিয়ে আছেন, বিপদে পড়ে ডাকলেই সাড়া পাবে।

সকলে চলিয়া গেল। পিসীমা ভাবিতেছিলেন—শিবুকে একবার মহলে মহলে ঘুরাইয়া আনিলে হয়। মালিককে পাইলে গোমস্তাদের ভরসা বাড়ে, প্রজারাও মালিক পাইলে খুসী হয়। অনেক সময় অনাদায় বা প্রজাবিদ্রোহের মধ্যে গোমস্তার চক্রান্ত থাকে। স্কুলের কোন একটা ছুটী দেখিয়া দিন কয়েকের জন্য যাব। তিনি ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন নিত্য, শিবু কোথায় রে?

নিত্য উপরের বারান্দা পরিষ্কার করিতেছিল, সে বলিল, দাদাবাবু নিকছেন পিসীমা!

গোমস্তারা চলিয়া যাইতেই বৌটি আসিয়া পিসীমার কোলের কাছে বসিয়াছিল। সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, ও পদ্য লিখছে পিসীমা।

পিসীমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তুমি গিয়েছিলে বুঝি?

বৌ বলিল, আমাকে যে ডাকলে। প'ড়ে শোনালে আমাকে। অনেক লিখেছে পিসীমা। মায়ের নামে লিখেছে, সে কত কি—পারিজাত ফুল তব চরণের—এই সব।

পিসীমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কি লিখেছে?

বৌ বলিল, তারপর দেশ—দেশ ক'রে কত সব লিখেছে।

পিসীমা বলিলেন, এইটি ওর মাথায় ঢোকালে ওর মা।

বৌ এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, কাল যে দুজনে সকালে কথা হচ্ছিল সব। প্রজাদের দুর্দ্দশা—সেই বিয়ের সব নজরের টাকা ফিরে দিতে হবে। হ্যাঁ পিসীমা, আপনাকে বলে নি এক টাকা ক'রে খাজনা ছেড়ে দিতে হবে?

পিসীমা কোন উত্তর দিলেন না। আবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া বৌটি বলিয়া উঠিল—আমার নামেও পদ্য লিখেছে পিসীমা, আমাকে আবার লিখেছে 'সখি'!

বলিয়া সে মুখে কাপড় চাপা দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পিসীমাকে আর কিছু বলিতে তাহার সাহস হইল না। সে অতি সন্তর্পণে উঠিয়া দিদিমার বাড়ী পলাইয়া গেল।

* * *

নিত্য ডাকিয়াছিল—পিসীমা তোমায় ডাকছেন দাদাবাবু!

শিবনাথ কবিতা লিখিতেছিল, বলিল, হুঁ।

কিছুক্ষণ পরে সে বাহির হইয়া আসিল, বারান্দায় নিত্য তখনও কাজ করিতেছিল। শিবনাথ প্রশ্ন করিল—পিসীমা কোথায়?

নিত্য একখানা কাপড় কুঁচাইয়া তুলিতেছিল, সে বলিল, নীচে দরদালানে।

শিবু আবার প্রশ্ন করিল, গোমস্তারা সব চলে গিয়েছে?

নিত্য বলিল—হ্যাঁ।

শিবনাথ তর্ তর্ করিয়া নীচে আসিয়া দরদালানে পিসীমার কোলের কাছে বসিয়া পড়িল। পিসীমা যেমন বসিয়া ছিলেন, তেমনি বসিয়া রহিলেন, কোন সাড়া দিলেন না।

শিবনাথ তখনও কবিতা লেখার মেজাজেই ছিল, সে এত লক্ষ্য করিল না। সে বলিল, একটি কথা আছে পিসীমা!

পিসীমা একটু যেন নড়িলেন। শিবনাথ বলিল, এবার আমার বিয়ের জন্যে সমস্ত প্রজাদের এক টাকা ক'রে খাজনা—

পিসীমা বলিলেন, মাপ দিতে হবে?

শিবু আশ্চর্য্য হইয়া পিসীমার মুখের দিকে চাহিল।

অতি কঠিন কণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, না—সে হয় না।

তাঁহার চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি, শিবু ভয়ে চোখ নামাইয়া লইল।

(পাঁচ)

বাড়ীর সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। শৈলজা ঠাকুরাণী যেন অপরিমিত কঠোর, রুক্ষ, গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছেন। বিষয়-কর্ম্মে কোন পরামর্শ দেন না, কিন্তু পরামর্শ বা আদেশ না লইয়া কাজ করিলেও রক্ষা নাই। খাজনা মাপ হয় নাই বরং শাসন-সূত্র কঠোর আকর্ষণে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, স্পর্শ মাত্রেই যেন টঙ্কার দিয়া উঠে। পৌষ-কিস্তিতে যে-টাকা কম আদায় হইয়াছিল, চৈত্র-কিস্তিতে সে-টাকা পূরণ হইয়া উঠিয়া আসিল। পূজায় এখন পিসীমার বেশী সময় অতিবাহিত হয়। সেই সময়টুকুই সর্ব্বাপেক্ষা শঙ্কার সময়। এতটুকু শব্দ বা কথার সাড়া পাইলেই তিনি যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, ভর্ৎসনায় তিরস্কারে আর বাকী রাখেন না। বৌটি ভয়ে শুকাইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন পূজার ফুলের থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এরই নাম ফুল বাছা? এই তোর দূর্ব্বো বাছা হয়েছে? শিবপূজোর বেলপাতায় চক্র রয়েছে।

শিবনাথও সময়ে সময়ে বিদ্রোহ করিয়া উঠে—তাহার সহিত কোন কিছু বাধিলেই সে নিরম্বু উপবাস আরম্ভ করিয়া দেয়। একমাত্র শিবনাথের মা হাসিমুখে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সমস্ত কিছু অগ্ন্যুদ্গারের মধ্যে তিনি শ্বেতবরণা গঙ্গার মত সুশীতল বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে পড়িয়া অগ্নিকণাগুলি অঙ্গার হইয়া মিলাইয়া যাইত।

সকল বিষয়েই পিসীমার অসন্তোষ। খাইতে বসিয়া আহার ফেলিয়া দিয়া উঠেন। পান খাইবার সময়েও বিপদ বাড়িয়া উঠে। পান মুখে করিয়া ফেলিয়া দিয়া বধূকে তিরস্কার করেন, কিছু শেখ নাই মা তুমি। এর নাম পান সাজা?

ছিঃ-ছি! কাল থেকে পান আর খাব না আমি—তুমি যদি পান সাজ!

এদিকে বধূটিকে লইয়া বিপদ বাড়িয়া উঠিল। সে ক্রমাগত দিদি-মা'র বাড়ী পলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। বাঁড়ুজোদের খিড়কীর পুকুরের পশ্চিম পাড়ে বাড়ীগুলির একটা গলি দিয়া সহজেই নান্তির মামার বাড়ী যাওয়া যায়। কিন্তু গলিপথটা আবর্জ্জনাময়, ঘাটে যাইবার অবকাশ পাইলেই সে সেই পথে পলাইয়া যায়।

ক্রমে ক্রমে শিবনাথের মা'র হাসির মাধুর্য্য যেন ক্রমশঃ সমস্ত শান্ত হইয়া আসিতেছিল। পিসীমার উত্তাপ ধীরে ধীরে শীতল হইতেছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রখর রৌদ্রে সমস্ত যেন পুড়িয়া যাইতেছিল, আকাশের নীলিমা বিবর্ণ হইয়া গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে রুদ্ধ ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া আছে। চুট করিয়া পিসীমার ঘরের দরজাটা খুলিয়া বৌটি বাহির হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া পিসীমাও বাহির হইয়া এ দরজা ও দরজা, খিড়কীর দরজা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দরজাগুলি ভিতর হইতেই বন্ধ; কাহারও বাহির হইয়া যাওয়ার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না।

তিনি ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলেন। শিবুর ঘরের জানালার একটা ছিদ্র দিয়া দেখিলেন, বধূ শিবনাথের কাছেই রহিয়াছে।

শিবনাথ তাহাকে আদর করিতেছে, আর সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, গোবরডাঙ্গার বাবুদের বাড়ী বিয়ে হ'লে এ জ্বালা ত হ'ত না। দিন-রাত সবাই বকছে আমায়। দিদিমাও বলছিল তাই।

শিবনাথ মুখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আজ আবার একটা কবিতা লিখেছি, তোমাকেই লিখেছি শোন।

বধূর মুখে হাসি দেখা দিল, সে বলিল, পড় পড়; তুমি বেশ পড়-কিন্তু।

শিবনাথ পড়িতে আরম্ভ করিল—

শৈশব সাধ তুই, কাহিনীর কন্যা,
তোর হাসিতে মাণিক ঝরে মতিঝরা কান্না।

বৌ হাসিয়া বলিল, কার, আমার? বলিয়া শিবনাথের গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল। শিবনাথ চট করিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া বসিল। নান্তি আপনার মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কি রকম ভাত-ভাত গন্ধ তোমার মুখে? পান খাও না কেন?

শিবু বলিল, তুমি দাওনা কেন?

বৌ বলিল, খাবে?

শিবু সাগ্রহে বলিল, দাও।···কে, কে?

কাহার পদধ্বনি বারান্দায় ধ্বনিত হইয়া সিঁড়ির মুখে মিলাইয়া গেল। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত ভাবে চাহিয়া রহিল। নীচে বারান্দায় পিসীমা ডাকিলেন, নিত্য নিত্য!

নান্তি সভয়ে জিভ কাটিয়া ত্রস্তপদে নীচে গিয়া দরদালানে কৃত্রিম ঘুমে বিভোর হইয়া পড়িয়া রহিল।

সমস্ত অপরাহ্ণটা শিবুর বুক গুর্ গুর্ করিতেছিল। কিন্তু বেশ শান্তভাবেই কাটিয়া গেল। রাত্রে বৈঠকখানায় সে পড়িতেছে এমন সময় নিত্য ঝি আসিয়া ডাকিল, দাদাবাবু, দাদাবাবু, শীগ্গির আসুন। পিসীমার ফিট হয়েছে।

শিবু ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিল, কি ক'রে?

—শুয়ে ছিলেন, মা ডাকতে গিয়ে দেখেন জ্ঞান নাই—দাঁত লেগে গিয়েছে। কেষ্ট সিং কোথা গেল? নায়েব বাবু—ডাক্তারকে ডাকতে হবে যে!

দরদালানের ঘরে পিসীমা নিথর অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। শ্বাস-প্রশ্বাস অতি মৃদু। শিবনাথের মা নিজে মাথায় ও মুখে-চোখে জল সিঞ্চন করিতেছিলেন। নিত্য বাতাস করিতেছে। শিবনাথ উৎকণ্ঠিত বিবর্ণমুখে কাছে বসিয়া ছিল।

ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ রকম কেন হল? কখনও কখনও কি এ রকম হয়?

শিবনাথের মা বলিলেন, না। আজ পনের বছরের মধ্যে হয় নি। তবে পনের বছর আগে ফিটের ব্যারাম ছিল ঠাকুরঝির। একদিনে এক বিছানায় ওঁর স্বামী আর ছেলে মারা গিয়ে এই অসুখ হয়েছিল। তারপর শিবু হ'ল—সে আজ পনের বছর। শিবুকে পেয়ে—

পিসীমা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অল্প একটু নড়িলেন।

শিবনাথের মা ডাকিলেন, ঠাকুরঝি।

ক্লান্ত মৃদুস্বরে পিসীমা সাড়া দিলেন, যাই।

* * *

দিনতিনেক পরের কথা। পিসীমা তখনও অসুস্থ। কাহারও সহিত কথা তেমন বলেন না, বিশেষ বৌকে দেখিলে যেন জলিয়া যান।

শিবনাথ কাছারীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। পাশের রাস্তা দিয়া জনপাঁচেক পাঞ্জাবী পাঁচ ছয়টা ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। শিবনাথ তাড়াতাড়ি গিয়া ফটকে দাঁড়াইল।

একজন বৃদ্ধ পাঞ্জাবী জিজ্ঞাসা করিল, বাবু হায়, খোকা-বাবু?

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, হ্যায়। কেন?

পাঞ্জাবী বলিল, ঘোড়া বেচনে আসিয়েছি হাম্‌লোক। বাবু হামারা পাশ এক ঘোড়া লিয়া—বহুত রোজ হুয়া—উ ঘোড়া মালুম হোতা বাতেল্ হো গিয়া। নয়া বহুত আচ্ছা ঘোড়া হ্যায় হামারা পাশ।

পাঞ্জাবী ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবনাথ ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় চেয়ারের উপর বসিল।

বৃদ্ধের পিছনে তাহার ঘোড়াগুলিকে লইয়া তাহার দলবলও কাছারী-বাড়ীর প্রাঙ্গণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ হাসিমুখে নায়েববাবুকে অভিবাদন করিয়া বলিল, সেলাম বাবুজী, তবিয়ৎ আচ্ছা?

নায়েব একটু হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ—ভালা। বহুদিন পর যে?

পাঞ্জাবী বলিল, হাঁ বহুৎ রোজকে বাদ—সাত বরিষ হোগেয়া। মালিকবাবু, হুজুর হামারা কাঁহা হ্যায়, সেলাম ত ভেজিয়ে—রমজান সেখ আয়া হ্যায়। উ ঘোড়া হামারা কিধর হ্যায়?

নায়েব নীরব হইয়া রহিল। শিবনাথ দেখিতেছিল ঘোড়া-গুলিকে—ছয়টি ঘোড়া। একটি সাদা, একটি কালোয় সাদায় মিশ্রিত, তিনটি লাল, একটি কাল। অস্থির চঞ্চল ভঙ্গী ওই কাল ঘোড়াটির, ঘাড়ে কেশরের মত চুল, লেজটাও বোধ হয় মাটীতে ঠেকে—কিন্তু লেজ সে ঈষৎ উচ্চে তুলিয়া রাখে। সর্ব্বদাই সে ঘাড় নামায় আর তোলে, মুহুর্মুহু মাটীতে পা ঠুকিয়া হ্রেষারবে স্থানটা মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। শিবনাথের বুকের মধ্যে বাসনা তোলপাড় করিতেছিল। ওই ঘোড়াটার পিঠে সওয়ার হইয়া বাতাসের বেগে—সে কি আনন্দ! তাহার পিতার গল্প মনে পড়িল। শ্যামপুর মহল এখান হইতে পঁচিশ ক্রোশ পথ, সেখান হইতে তাঁহার পিতার অসুখের সংবাদ পাইয়া কয় ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়া-ছিলেন।

পাঞ্জাবীটির উচ্চকণ্ঠের চকিত ধ্বনিতে তাহার চমক ভাঙিল—আরে হায় হায়, মেরে নসীব, মালিক হামারা নেহি হ্যায়!

নায়েব কখন মৃদুস্বরে স্বর্গীয় মালিকের মৃত্যু-সংবাদ তাহাকে দিয়াছেন।

থাকিতে থাকিতে শিবনাথের মাকে মনে পড়িয়া গেল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল। সেবার বাইসিক্ল কিনিবার সময় মায়ের কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন—বিলাসের শেষ নাই শিবু, যত বাড়াবে তত বাড়বে, অথচ তৃপ্তি তোমার কখনও হবে না। এবার কিনে দিলাম কিন্তু ভবিষ্যতে নিজের মনকে নিজে শাসন কর।

পাঞ্জাবীও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ওহি কালা ঘোড়াঠো হাম লে আয়ে থে। হামারা মালিকজাদা কাঁহা দেওয়ান সাব—এহি এহি হাঁ—হাঁ হাম বহুৎ ছোটে দেখা থা। সেলাম হামারা হুজুর মালিক, হামারা কসুর ত' মাফ্ হোয় জনাব, হাম আপকো পহেলেই নেই পছানা।

শিবনাথকে দাঁড়াইতে হইল। সে বলিল, তোমরা এইখানে খাওয়া-দাওয়া কর। নায়েব বাবু, এদের সিধের বন্দোবস্ত ক'রে দিন।

পাঞ্জাবী বলিল, হাঁ হুজুরকে সওয়ার হোনেকা উমর ত' হো গেয়া। লে লিজিয়ে হুজুর আপকে নামকে চিন—

শিবনাথ বলিল, না।

নায়েবও সঙ্গে সঙ্গে বলিল, বাবু ছেলে মানুষ খাঁ-সাহেব। এত বড় ঘোড়া নিয়ে কি করবেন? পড়ে টড়ে গেলে—

পাঠান হা—হা করিয়া কৌতুকভরে হাসিয়া উঠিল। গির যাবেন বাবুসাব! তব একঠো ছোটা—

—নিয়ে এস কাল ঘোড়া। শিবনাথ আদেশ করিল। আদেশের ধ্বনির বাধা পাইয়া পাঠান নীরব হইয়া গেল। শিবনাথ লাফ দিয়া বাগানের বেদীর উপর উঠিয়া আঙুলের ইসারা করিয়া বলিল, হিঁয়া লে আও।

পাঠান হাসিয়া নায়েব বাবুকে বলিল, শেরকে বাচ্চা জনাব শেরই হোতা হ্যায়। তারপর ওদিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিল—লে আওরে কালা বাচ্চেঠো।

একটি লম্বা-চওড়া জোয়ান পাঠান ঘোড়াটির মুখ ধরিয়া আনিয়া বেদীটার পাশে দাঁড় করাইল। পাঠান বলিল, দেখিয়ে হুজুর, হামারা লড়কাকে লড়কা পন্‌রা বরিষ উমর। পাঞ্জাবসে সওয়ার হোকে চলা আয়া হিঁয়া।

তারপর সে ঘোড়ার লাগাম ও রেকাব ঠিক করিয়া দিয়া শিবনাথকে কোলে তুলিয়া ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া দিতে গেল। শিবনাথ পিছাইয়া গিয়া বলিল, হঠ যাও তুম।

বলিয়াই সে বেদীর উপর হইতে লাফ দিয়া ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া বসিল।

পাঠান আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। বলিল, বহুৎ আচ্ছা হ্যায়, বহুৎ আচ্ছা।

শিবনাথ ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল।

পাঠান বলিল, থোড়া ঠহরিয়ে হুজুর। তারপর সে নাতিকে আদেশ করিল, লে আও ত'রে ঘুঙুর।

ঘোড়ার পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া দিয়া সে বলিল, আব্ বাঁশী ত' ফুকারো রহমৎ।

শিবনাথকে বলিল, বিবিকে নাচ দেখ লিজিয়ে পহেলে।

বাঁশীর স্বর বাজিয়া উঠিতেই অশ্বিনীর পা উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে ঘুঙুরগুলি ঝুম ঝুম শব্দে বাজিতে আরম্ভ করিল।

* * *

নায়েব শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। এতক্ষণ কোন কথা সে বলিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় নাই। কিছুক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া সে অন্দরের মধ্যে শিবনাথের মায়ের নিকট গিয়া হাজির হইল। পিসীমা অসুস্থ অবস্থায় কয়দিন শয্যাশায়িনী হইয়াই আছেন। আর এ ক্ষেত্রে শিবনাথের মাতা ভিন্ন অপরের দ্বারা শিবনাথকে নিবারণ করাও যাইবে না।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া সিং মহাশয় নিত্যকে বলিলেন, মা কোথায় নিত্য?

মা দরদালানেই ছিলেন, বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, —কি বলছেন সিং মশায়?

সিং মহাশয় বলিলেন, মা, বাবু এক বিপদ বাধিয়েছেন, এক প্রকাণ্ড ঘোড়া কিনতে বসেছেন, দু'শ' আড়াইশ' টাকা দাম, তাছাড়া ঘোড়া থেকে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না।

মা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, শিবনাথ ঘোড়া কিনছে?

—হাঁ মা—আমি বারণ করবার ফাঁক পেলাম না। প্রকাণ্ড এক কাল ঘোড়া—

মা ডাকিলেন, নিত্য!

—মা!

—শিবনাথকে ডেকে আনত। বলবি এক্ষুণি ডাকছি আমি—তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

নিত্য চলিয়া গেল। নায়েব বলিল, আমি সরে যাই মা। আমার থাকাটা ভাল হবে না।

মা কোন কথা বলিলেন না, তাঁহার শুভ্র মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। নায়েব চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর শিবনাথ আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। মুখ তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া সে বলিল, কি বলছ?

মা দেখিলেন শিবনাথের শ্যামবর্ণ কিশোর মুখখানি থম থম করিতেছে।

মা বলিলেন, তুমি নাকি ঘোড়া কিনছ, শিবনাথ?

শিবনাথ অকুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল, হাঁ।

মা তেমনি স্বরে বলিলেন, না। ঘোড়া কিনতে হবে না।

শিবনাথ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আদেশ পালনের জন্য কোন ব্যগ্রতা তাহার দেখা গেল না। মাও নীরব। কিছুক্ষণ পর মা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, যাও—নায়েববাবুকে বলগে—ওদের পাচটা টাকা দিয়ে বিদেয় করে দিতে। দু'শ আড়াইশ' টাকা দিয়ে ঘোড়া কেনবার মত অবস্থা আমাদের নয়।

শিবনাথ যাইবার জন্য ফিরিল।

কিন্তু কি মনে করিয়া মা আবার ডাকিলেন, শিবু শোন,—শুনে যাও।

শিবু কাছে আসিলে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে বলিলেন, ছি বাবা—বিলাসে কি এমনি পাগল হতে হয়? তা' হ'লে ত' দু'চোখে যা দেখা যায় তাই নিতে হয়! দু'শ' আড়াইশ' টাকা গরীবদের দান করলে—ছি— কাঁদছ—না —না, কাঁদতে নাই

শিবনাথ চোখ মুছিয়া জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিল, তাই বলিগে মা।

কাছারীতে আসিয়া শিবনাথ পাঠানকে একথা বলিতে পারিল না, তাহার কেমন লজ্জা করিতেছিল। নায়েবকে বলিয়া দিয়া সে পড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চোখ হইতে তাহার টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

বাহিরে মৃদুভাষী নায়েবের সকল কথা সে শুনিতে পাইতেছিল না।

পাঠানের উচ্চ কণ্ঠস্বর সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল, সেলাম দেওয়ান সাহেব—যাতা হ্যায় তব।

—ফিরে নিয়ে যেয়ো না। কত দাম ঘোড়ার?

শিবু দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। কাছারীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া রোগশীর্ণ পিসীমা প্রশ্ন করিতেছিলেন,—চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি।

পাঠান চিনিতে ভুল করিল না, সে দৃপ্ত মূর্তিকে চিনিতে ভুল হইবার কথাও নয়। আভূমিনত সেলাম করিয়া পাঠান বলিল, দুই শত পঁচিশ, মায়ী!

এক তাড়া নোট নায়েবের হাতে দিয়া পিসীমা বলিলেন, আড়াই শ' টাকা আছে। দাম একটা ঠিক ক'রে নিয়ে দিয়ে দাও।

শিবনাথ বুকের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে বলিলেন, চড় ঘোড়ায় শিবু, আমি দেখি!

শিবু লাফ দিয়া গিয়া বেদীর উপর হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া বসিল। একজন পাঠান ঘোড়ার মুখ ধরিয়া রাস্তা ধরাইয়া দিতেই ঘোড়া ঘাড় বাঁকাইয়া উচ্চ পুচ্ছভঙ্গীর সঙ্গে দুল্‌কী চালে চলিয়া দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

পিসীমা বলিলেন, কেষ্ট সিং আস্তাবল সাফ করাও। তার পর স্থিরদৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মিনিট বিশেক পরে শিবু ফিরিল, ধূলিধূসরিত দেহ—মাথার পিছন হইতে পিঠ বহিয়া রক্ত ঝরিতেছিল।

পিসীমা আশঙ্কাভরে প্রশ্ন করিলেন, পড়ে গিয়েছিলি শিবু?

ঘোড়া হইতে নামিতে নামিতে শিবনাথ বলিল, লাগে নি পিসীমা, পিছনে মাথাটা একটু কেটে গিয়েছে শুধু।

পাঠান বলিল, ঘোড়া ত সয়তান নেহি হ্যায় এইসা।

শিবনাথ বলিল, না বদমাস নয়, রাস্তায় একটা ছোট বাঁধ ছিল, ও মেরে দিলে এক লাফ—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আগে—উল্‌টে পড়ে গেলাম। সেখানটায় বালি ছিল, না হ'লে লাগত। একটা পাথরে শুধু মাথাটা কেটে গেল।

নায়েব একটা টিপ লইয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল, ঘোড়ার গরচটা সই—।

টিপটা ফেলিয়া দিয়া পিসীমা বলিলেন, তোমাদের এষ্টেটের টাকা নয় সিং মশায়, এ আমার নিজের টাকা।

শিবনাথ শিশুর মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। কতদিন পর পিসীমা তাহাকে বুকের মধ্যে গভীর আবেগে চাপিয়া ধরিলেন, ক্ষতস্থানটিতে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন।

সে আবেষ্টনের মধ্যে শিবনাথ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে ডাকিল—পিসীমা!

পিসীমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

(ক্রমশঃ)

চতুষ্পাঠী

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রাণীজগতের রহস্য

ঃ উইপোকার সভ্যতা

কবি মরিস মেটারলিঙ্কের নাম আমরা সবাই শুনেছি। তাঁর কবিতা তাঁর নাটক বিশ্ব-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু কবিতা ও নাটক ছাড়া তিনি আরও একটি আশ্চর্য বই লিখেছেন। সে বই-এর বিষয়-বস্তুর কথা শুনলে প্রথমে অবাক হতে হয়। সে বই উইপোকাদের নিয়ে লেখা। উইপোকা সম্বন্ধে তিনি তাতে কাল্পনিক কোন কাহিনী রচনা করেন নি। তাদের জীবনযাত্রার সত্যকার ঘটনাই লিখে গেছেন। কিন্তু সে সত্য ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও মনোরম হয়েছে।

শুধু উইপোকা নয়, সাধারণতঃ আমরা যাদের নিতান্ত তুচ্ছ, নগণ্য মনে করে উপেক্ষা করি এমন অনেক ইতর প্রাণীর জীবনকাহিনী অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাদের জগৎ রূপকথার মায়াপুরীর চেয়েও রহস্যময়।

উইপোকার কথাই ধরা যাক্। বই, কাগজ থেকে কাঠ-কাঠরা কোন জিনিসের এদের কাছ থেকে রেহাই নেই আমরা জানি। মাঠঘাটে এদের তৈরী অদ্ভুত উই-ঢিবিও আমরা দেখেছি, কিন্তু তার ভিতর কি কল্পনাতীত জীবনযাত্রা যে চলে তা আমরা ধারণা করতেও পারি না। কোন রকম যাদুবলে এই ছোট কীটের জগতে প্রবেশ করতে পারলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। মানুষের তৈরী যে কোন নগরের চেয়ে তাদের উইটিবির রাজ্যের জীবনযাত্রা বিচিত্র। সঙ্ঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল জীবনে কর্তব্যনিষ্ঠা যদি সভ্যতার পরিচায়ক হয় তাহলে তারা আমাদের চেয়ে কম সভ্য নয়।

উইপোকার সঙ্গে পিঁপড়ের অনেক বিষয়ে মিল আছে। ইংরাজীতে সে জন্যে এদের বোধহয় শাদা পিঁপড়ে বলা হয়। কিন্তু আসলে এরা পিপীলিকাদের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র কীট। এই দুই জাতের কীটের শত্রুতা চিরন্তন।

শুধু পিঁপড়ে নয় আরও অনেক প্রাণীই এই পোকাদের
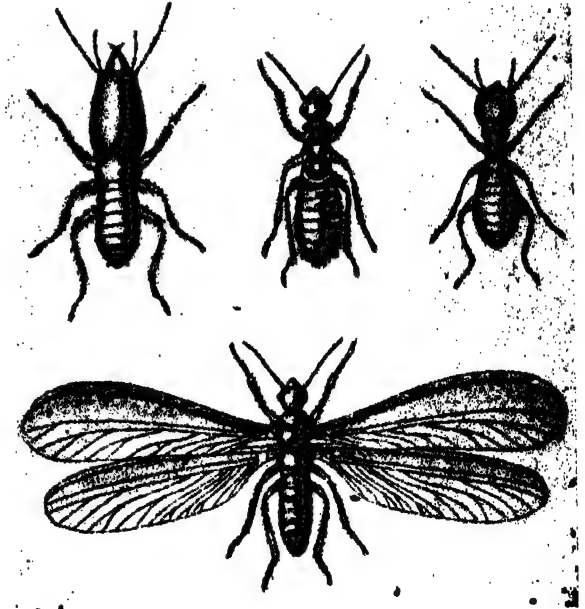
বিভিন্ন জাতের উইপোকা : উপরে ছবির বাম দিক হইতে—দাস-উই, রাণী-উই, সৈনিক-উই। নীচে পক্ষযুক্ত উই।

শত্রু। এদের নধর দেহ অনেক পশুপক্ষীরই উপাদেয় আহার। এই সমস্ত শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই এমন দুর্ভেদ্য করে তারা নগর নির্ম্মাণ করে। নগর না বলে

তাকে দুর্গ বলাই সঙ্গত। দুর্গের মতই তা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। সদাসতর্ক সশস্ত্র প্রহরীরা অনুক্ষণ তার পাহারায় আছে। আর সেই দুর্গের মধ্যে কৃষি থেকে আরম্ভ করে সভ্য জীবনের সমস্ত কাজকর্ম্ম নিখুঁত ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। তৈরী করে তারা সে ছাতার বীজ বসায়। প্রয়োজন হলে তারা সেগুলি স্থানান্তরিত করে। নূতন কোথাও উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন হলে তারা এই ছাতার বীজ সযত্নে সেখানে বয়ে নিয়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ ছাতার চাষ একমাত্র উইপোকারাই করতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা অনেক চেষ্টা করেও এ চাষের রহস্য আয়ত্ত করতে এখনও পারেন নি।

মরুভূমির মত উষর দেশেও উইপোকারা কৃষি ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য কি প্রণালীতে জল সংগ্রহ করে, উপরের ছবিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে। উপরে একেবারে বামে উইঢিবি। দীর্ঘ নলকূপের মত ৫০ হাত খাত জল সংগ্রহের জন্য খোঁড়া হইয়াছে দেখা যায়। এ ব্যাপারে ইহারা মানুষকেও হার মানাইয়াছে। ডাহিনে দাস-উই ও মৃত্যু অভিসার যাত্রী পক্ষযুক্ত উই।

এই চাষের জমিতে জলসেচনের জন্যে তারা যে ক্ষমতা ও বুদ্ধির পরিচয় দেয় তা অপূর্ব্ব। সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই উইঢিবি বেশী দেখা যায়। মরুভূমির মত উষর দেশে মানুষের কাছেই যেখানে জল দুষ্প্রাপ্য, সেখানেও তারা কেমন করে তাদের কৃষি ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্যে জল সংগ্রহ করে, সে সমস্যা বৈজ্ঞানিকদের কাছে অনেক দিন অমীমাংসিত ছিল। উইপোকার অন্যান্য অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে কেউ কেউ এমন অনুমান করতেও সাহস করেছিলেন যে, তারা কোন অজ্ঞাত উপায়ে বাতাসের অক্সিজেনকে উদ্ভিদ খাদ্যের হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে মিলিয়ে কৃত্রিম জল তৈরী করতে পারে! সম্প্রতি সে অনুমান সত্য নয় বলে জানা গেছে, কিন্তু তা বলে উইপোকাদের কৃতিত্বের গৌরব কমে যায় নি। মাটির গভীর তলায় যে জলীয় স্তর আছে একথা যেমন করেই হোক উইপোকারা জানে। তারা পঞ্চাশ হাত পর্য্যন্ত গভীর নলকূপের মত দীর্ঘ খাত খনন করে মরুভূমির মত প্রদেশেও জল সংগ্রহ করে থাকে!

উইপোকার কৃষিকর্ম্ম আজগুবি শোনালেও সম্পূর্ণ সত্য ব্যাপার। সত্যই তারা তাদের দুর্গের ভিতরে আণুবীক্ষণিক এক প্রকার ছাতাজাতীয় উদ্ভিদের চাষ করে। যত্নে জমি

উইপোকাদের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। দুর্গের ভিতর তাদের রাষ্ট্রকে প্রজাতন্ত্র না রাজতন্ত্র কি বলা উচিত ঠিক করা কঠিন। রাজা না হোক পিঁপড়েদের মত তাদের একজন রাণী আছে। সে-ই সকলের প্রধান। সমস্ত দুর্গবাসী তাঁরই সেবা করে। কিন্তু তাই বলে রাণীর হুকুমে সব চলে মনে করা ভুল। রাণী সকলের প্রধান হলেও কোন প্রভুত্বই তার নেই। আর সকলের মত রাণীও দুর্গের অমোঘ নিয়মের অধীন। নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের বাইরে এক পা যাবার তার উপায় নেই। রাণী দিনে—হাজার হাজার নয়—প্রায় একলক্ষ ডিম প্রসব করে। শ্রমিকের দল সেই অসংখ্য ডিমকে সযত্নে যথাস্থানে রেখে লালনের ব্যবস্থা করে। ডিম প্রসব করা ছাড়া রাণীর আর কোন কাজ নেই। কিছু করবার চেষ্টাও সে করে না। সমস্ত দুর্গ যে অমোঘ অলিখিত আইনে পরিচালিত হয় সে আইন কাউকে শেখাতে হয় না। সে আইনের জ্ঞান তাদের জন্মগত, তারা তা লঙ্ঘন করতে জানে না।

সন্তানসম্ভবা রাণী-উই : এক ঘণ্টায় প্রায় ৮৬০০০ হাজার ডিম পাড়িতে সক্ষম। নীচে দাস-উই।

উইপোকারা বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। রাণী ও রাজবংশীয় কয়েকটি রাজকুমার ও কুমারী ছাড়া আর সকলেই সেখানে দাস। দাসেদেরও কয়েকটি বিভাগ আছে। প্রথম, সৈনিকের দল। আকারে তারা সাধারণ দাস-উইপোকা থেকে বড়; তাদের ভিতর আবার দুটি শ্রেণী আছে। এক দলকে রাসায়নিক যোদ্ধা বলা যায়। তাদের মাথাটা একরকম পিচকারী বিশেষ। সেই পিচকারী থেকে একরকম বিষাক্ত রস শত্রুপক্ষের উপর নিক্ষেপ করে তারা তাদের অকর্ম্মণ্য করে দেয়। আর এক দল মুখের কাঁচির মত অস্ত্রের সাহায্যে শত্রু সংহার করে। সৈনিকদের পর আছে ইঞ্জিনিয়ার জাত। যন্ত্রপাতি বা কোন উপকরণের ধার তারা ধারে না। প্ল্যান এঁকে মাফজোখ করেও তারা কাজ করে না। নির্ম্মাণের উপকরণ তারা শরীর থেকেই নিষ্কাশন করে—প্ল্যানও থাকে তাদের মাথায়। কিন্তু এই ভাবে যে বিশাল ইমারৎ তারা নির্ম্মাণ করে, স্থাপত্যকৌশলে তার কোনই ত্রুটি থাকে না। উইঢিবিগুলির গঠন পদ্ধতি দেখলে মনে হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির রহস্যও তাদের অজ্ঞাত নয়। উইপোকাদের আকারের অনুপাতে বিচার করলে বড় বড় উইঢিবিগুলি মানুষের সর্ব্বোচ্চ মিনারকেও লজ্জা দিতে পারে। রাস্তাঘাট, ঘর, নলকূপ প্রভৃতির বিন্যাসেও তাদের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সৈনিক ও স্থপতি ছাড়া আর যে দল কৃষিকর্ম্ম ও ডিম থেকে প্রয়োজনমত বিভিন্ন শ্রেণীর উইপোকা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তাদের বৈজ্ঞানিক ছাড়া আর কি বলা যায়! সত্য কথা বলতে গেলে মানুষের বিজ্ঞান এখনও এ বিষয়ে তাদের নাগাল ধরতে পারে নি। যে কোন শিশুকে ইচ্ছামত সৈনিক, বৈজ্ঞানিক বা যে কোন ধরণের যে কোন আকারের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষমতার কথা আমাদের বিজ্ঞান এখনও কল্পনাই করতে পারে না। কিন্তু উইপোকারা জীব-বিজ্ঞানের সে কঠিন রহস্যও ভেদ করেছে। আশ্চর্য্য কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা তারা ডিম থেকে ইচ্ছামত যে কোন শ্রেণীর উইপোকা উৎপাদন করতে পারে। দুর্গে সৈনিকের অভাব হলে তারা ডিম থেকে সৈনিকই গড়ে তোলে, আবার যেদিন কোন কারণে তাদের রাণীর মৃত্যু ঘটে বা সে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, সেদিন উইপোকাদের নতুন রাণীর জন্য অন্য কোথাও সন্ধান করতে হয় না। যে কোন ডিমকে তারা রাণীতে পরিণত করতে পারে।

দুর্গের বাকী উইপোকা সকলেই দাস। তারা সকলেই

অন্ধ। সৈনিকদের মত তাদের আত্মরক্ষা বা আক্রমণের কোন অস্ত্রও নেই। কিন্তু তাই বলে তারা নগণ্য নয়। দুর্গের এই শূদ্র উইপোকারা এক হিসাবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

উইঢিবি (আফ্রিকা): ইহার উচ্চতা লক্ষণীয়।

তারাই সমস্ত দুর্গের আহার জোগায়। শুধু যে আহার জোগায় তা নয়, তারা অন্য সমস্ত উইপোকার হয়ে আহার জীর্ণও করে। উইপোকার জগতের একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, সেখানে দাসেদের ছাড়া আর কারও আহার জীর্ণ করবার পাকযন্ত্র নেই। দাসেরা নিজেদের শরীরে আহার পরিপাক করে সেই জীর্ণ-খাদ্য তাদের খাইয়ে দেয়। রাণী থেকে সৈনিক পর্য্যন্ত সকলকে এজন্য নির্ভর করতে হয় দাসেদের উপর।

এই দাস-উইপোকাদের পাকযন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা সাধারণ প্রাণীজগতের পক্ষে যা অসম্ভব সেই কাঠও অনায়াসে হজম করতে পারে। তাদের অন্ত্রের ভিতর 'প্রটোজোয়া'জাতীয় আণুবীক্ষণিক এক প্রকার জীবাণু প্রচুর পরিমাণে আছে। সেই 'প্রটোজোয়া'র সাহায্যেই তারা কাঠকে খাদ্যে রূপান্তরিত করতে পারে। আগে যে 'ছাতা'র কথা বলেছি, সেই ছাতার সাহায্যেও তারা কাঠকে খাদ্যে পরিণত করে।

উইপোকার জীবনে কর্ত্তব্যই প্রধান। সারা বৎসরের ৩৬৪ দিন তারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের কাজ করে যায় কিন্তু একটি দিন আছে তাদের উৎসবের। সমস্ত দুর্গে সেদিন সাজ-সাজ রব পড়ে যায় বলা যেতে পারে। নগরের পথে সেদিন ভীড় করে চলে সূক্ষ্ম রেশমী পাখায় সজ্জিত রাজ্যের রাজকুমার ও কুমারীর দল। দুর্গের চির-রুদ্ধ দ্বার একদিনের জন্য সেদিন খোলা হবে।

কিন্তু এ উৎসব সাধারণ আনন্দের নয়। এ উৎসব মৃত্যুর। রাজকুমার-কুমারীদের মরণ-অভিসারে যাত্রার এই একটি দিন। ভিতর থেকে দুর্ভেদ্য দুর্গ সেদিন খুলে যায়। আর স্বপ্নের মত কোমল পাখা মেলে নিরুদ্দেশের উদ্দেশে বার হয় রাজপুত্র ও কন্যারা। বাইরে নির্ম্মম মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে তারা জানে। তবু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। নিরাপদ আশ্রয়ের মায়া তাদের ধরে রাখতে পারে না, মৃত্যুর ভ্রূকুটি তাদের বিচলিত করে না। কোন দিন আর ফেরবার আশা নেই জেনেও তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উন্মুক্ত আকাশে পক্ষবিস্তার করে উড়ে যায় আর পিছনে শ্রমিকেরা চিরদিনের মত আবার দুর্গের উন্মুক্ত পথ গেঁথে ফেলে।

এই দুঃসাহসিক অভিসারের মৃত্যুই শেষ পরিণাম। তবু বৎসরের পর বৎসর কীট-জগতে অদ্ভুত রহস্যময় এই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি হয়।

একদিন সমস্ত উইপোকারই পাখা ছিল। তখন জীবন-সংগ্রামে টিঁকে থাকবার জন্যে যান্ত্রিক শৃঙ্খলার কঠিন শাসনে

তারা আত্মসমর্পণ করে নি। সেই মুক্ত অতীতের স্মৃতিকে অক্ষয় রাখবার জন্যেই তাদের এই বাৎসরিক মৃত্যুব্রত কি না কে জানে! কে জানে হয়ত বর্ত্তমান জীবনের কঠিন শৃঙ্খলার সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও তারা একদিনের জন্যে সে মুক্তির স্বাদ মৃত্যুর ভিতর দিয়েও পেতে চায়!

বৈজ্ঞানিকেরা এ অনুষ্ঠানের সঠিক অর্থ এখনও খুঁজে পান নি। সাধারণের সুখের জন্যে যে কীটজাতি নিজেদের ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছে, যাদের জীবনের সমস্ত কাজ প্রত্যক্ষ স্থূল প্রয়োজনের হিসাবে নির্ভুল ভাবে বাঁধা, তাদের এই একদিনের যুক্তি-হীন মরণোল্লাস মানুষের কাছে কোন গূঢ় ইঙ্গিত বহন করে আনে কি

ইতিহাসের সূচনা

§ আমেরিকার প্রথম উপনিবেশ

১৬২০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই। লণ্ডন থেকে একটি সেকেলে পাল-তোলা জাহাজ টেম্‌স্ নদী বেয়ে সমুদ্রে চলেছে। ৭০ জন তাতে যাত্রী। সাদাম্‌টন্ হয়ে সে জাহাজ যাবে ভার্জিনিয়ায়।

সে জাহাজের কাপ্তেন একজন ভূতপূর্ব্ব জলদস্যু। সে জাহাজের খালাসীরা ও নাবিকেরাও নেহাৎ সব ভাল মানুষ নয়। সমস্ত টেম্‌স্ নদীর তীরে তাদের অখ্যাতি বিস্তৃত।

আর সে জাহাজের যাত্রী কয়েকজন সাধারণ পুরুষ ও কয়েকজন সাধারণ পুরুষ ও মহিলা। তারা বিশেষ এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইংলণ্ডে তখন সে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককে কেউ ভাল চোখে দেখে না। উৎপীড়িত হয়ে তাদের এক দল আগেই ইংলণ্ড ছেড়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। জাহাজের যাত্রীরা তাদের সঙ্গেই মিলিত হয়ে শান্তিতে নিজেদের ধর্ম্ম অনুসরণ করবার জন্যে চলেছে সাগরপারের অজানা দেশে।

টেম্‌স্ নদী বেয়ে দূর সমুদ্রে সেদিন এমন অনেক জাহাজ পাড়ি দিয়েছিল; তাদের কথা কেউ স্মরণ করে রাখে নি। তাদের মধ্যে এই একটি জাহাজের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে যাবে তখন কে জানত! কে তখন ভেবেছিল এই জাহাজটির যাত্রা শুধু সাগরপারে নয়, এক মহাদেশের গৌরবময় ভবিষ্যতের উদ্দেশে!

সেকথা ভাবা সত্যি সেদিন অসম্ভব ছিল। এই সমস্ত যাত্রীকে সংগ্রহ করে সাগরপারে পাঠাবার ব্যাপারে যিনি উদ্যোক্তা ছিলেন, সেই দূরদর্শী সার ফার্ডিনাণ্ডো গর্জ্জেসও সে কল্পনা বোধ হয় করেন নি।

জাহাজটির নাম 'মে ফ্লাওয়ার' আর তার যাত্রীরা যে, আমেরিকার প্রথম উপনিবেশের অগ্রপথিক তা বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না। আজ যাদের নাম সমগ্র আমেরিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে রেখেছে, সেদিন কিন্তু তাঁরা ছিলেন অখ্যাত নগণ্য উৎপীড়িত একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক মাত্র। অনেকে ভুল করে তাঁদের পিউরিটান সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন। কিন্তু সে কথা ঠিক নয়। তাঁরা ছিলেন পিউরিটানদের চেয়েও গোঁড়া পৃথক এক সম্প্রদায়। তাঁদের সেপারেটিষ্ট বা 'বিচ্ছেদবাদী' বলা হয়। নিজেদের নাম তাঁরা দিয়েছিলেন পরিব্রাজক সম্প্রদায়। ধর্ম্মবিশ্বাসের
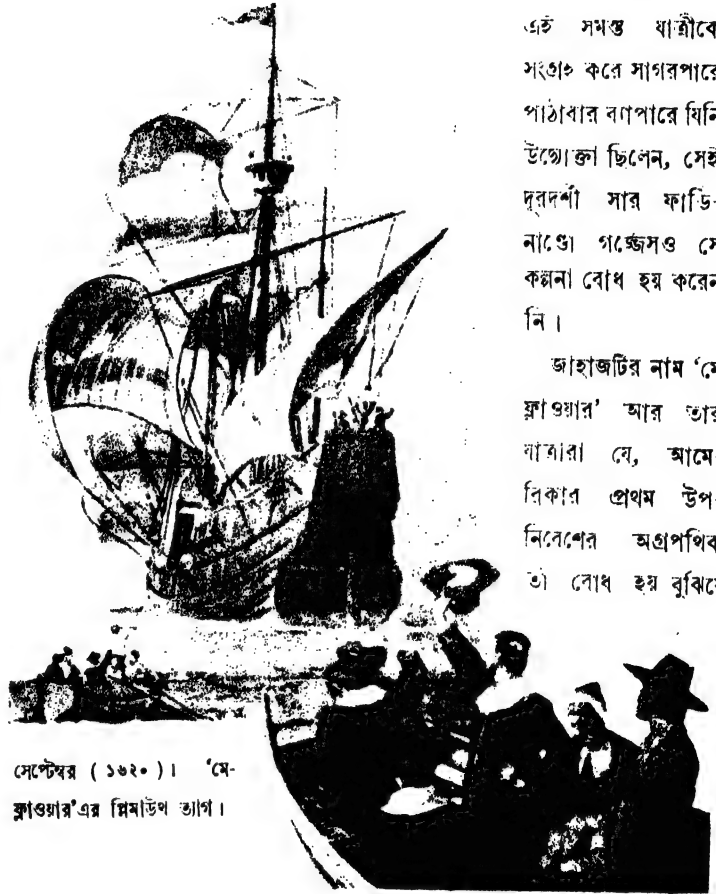
সেপ্টেম্বর (১৬২০)। 'মে-ফ্লাওয়ার'এর প্লিমাউথ ত্যাগ।

জন্যই এই পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের ইংলণ্ডে স্থান হয়নি। পিউরিট্যানরা সেখানে থাকতে পারলেও এঁদের অনেককে আগেই ইংলণ্ড ছেড়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল। সেখানেও সুবিধা না হওয়ায় তাঁরা আপাততঃ চলেছিলেন সমুদ্র পার হয়ে নূতন আবিষ্কৃত আমেরিকায়। কোন রাজ্য স্থাপনের বাসনা তাঁদের ছিল না, কোন ঐশ্বর্য্যে ও শক্তিতে সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্নও তারা দেখেন নি। তাঁদের একটি মাত্র কাম্য ছিল,—শুধু নির্ব্বিবাদে নিজেদের ধর্ম্মপথে চলবার সুবিধা পাওয়া।

আমেরিকায় পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের পদার্পণ।
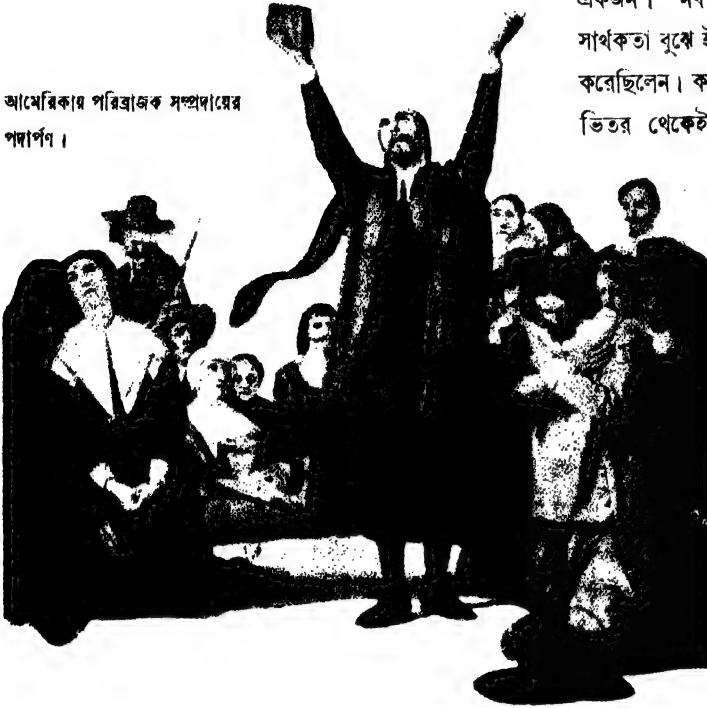
আশ্চর্য্যের বিষয়, অজানা দেশে বিপদের মাঝে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে যে সমস্ত গুণ সাধারণতঃ প্রয়োজন মনে হয় সে সব কিছুই তাঁদের ছিল না। তাঁদের কেউ বন্দুক পর্য্যন্ত ছুঁড়তে জানতেন না, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত হলেও একান্ত সত্য। জাহাজে ওঠার আগে তাঁরা কেউ কোনদিন একটা গাছও কাটেন নি, মাছ ধরতে পর্য্যন্ত জানতেন না। কিন্তু তবু যে বিপদসঙ্কুল দেশে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝে ইতিপূর্ব্বে দুর্দ্ধর্ষ জেলখানার কয়েদীরাও টিঁকে থাকতে পারে নি সেখানে তাঁরা এক গৌরবময় সমৃদ্ধ রাজ্যের সার্থক সূচনা করবার শক্তি কোথায় পেলেন? মনে হয় এ শক্তির উৎস তাঁদের গভীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস। এই গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসই তাঁদের সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হবার সাহস দিয়েছে, ধৈর্য্য দিয়েছে সমস্ত দুঃখের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার।

সব চেয়ে মজার কথা এই যে, 'পরিব্রাজক' সম্প্রদায়ের নিউ ইংলণ্ডে এই উপনিবেশ স্থাপনের মূলে ছিল কয়েকজনের প্রতারণা। সার ফার্ডিনাণ্ডো গর্জ্জেস সেই প্রতারকদের একজন। নব-আবিষ্কৃত আমেরিকায় উপনিবেশ-স্থাপনের সার্থকতা বুঝে ইতিপূর্ব্বে দুবার সার ফার্ডিনাণ্ডো তার চেষ্টা করেছিলেন। কষ্টসহিষ্ণু হবে মনে করে জেলখানার কয়েদীদের ভিতর থেকেই তিনি অধিকাংশ লোক বাছাই করেছিলেন উপনিবেশের জন্য। কিন্তু দুবারই তাঁর চেষ্টা বিফল হয়েছিল। নিউ ইংলণ্ডের নিদারুণ শীতের তুষারে সে সমস্ত উপনিবেশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অনাহারে ও শীতে তাদের সকলকেই প্রাণ দিতে হয়েছিল।

দুবার বিফল হয়েও সার ফার্ডিনাণ্ডো হতাশ হন নি। তিনি আবার নূতন ধরণের ঔপনিবেশিক খুঁজছিলেন। ঠিক সময়ে দৈবক্রমে হল্যাণ্ডপ্রবাসী এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ও খুঁজছিলেন নূতন কোন দেশ, যেখানে নির্ব্বিবাদে তাঁরা নিজেদের ধর্ম্ম-জীবন যাপন করতে পারেন। উভয়ের মিলন ঘটল, কিন্তু প্রতারণার ভিতর দিয়ে।

'পরিব্রাজক' সম্প্রদায় তাঁদের গন্তব্য স্থান ঠিক করেছিলেন হিমশীতল নিউ ইংলণ্ড, নয় মন্দোষ্ণ ভার্জ্জিনিয়া। ভার্জ্জিনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে যে কোম্পানী গঠিত হয়েছিল তাদের সঙ্গে এ সম্প্রদায়ের চুক্তিও হয়ে গিয়েছিল। 'স্পীড-ওয়েল' নামে একটি ছোট জাহাজ তাঁরা কিনেও ফেলেছিলেন। সে জাহাজে সকলকে কুলোবে না বলে আর একটি বড় জাহাজের ফরমাজ দিয়েছিলেন তাঁরা ইংলণ্ডে। সেই জাহাজই 'মে ফ্লাওয়ার'। এই দুটি জাহাজে করে তাঁরা ঠিক করে ছিলেন ভার্জ্জিনিয়ার উপকূলে গিয়ে বসতি গড়বার। কিন্তু

সার ফার্ডিনাণ্ডো ও তাঁর দলের ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। এক চাতুরীর দ্বারা তাঁরা এই সমস্ত যাত্রীকে নিউ ইংলণ্ডে নিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করলেন।

'মে ফ্লাওয়ারের' ক্যাপ্টেন সার ফার্ডিনাণ্ডোই সংগ্রহ করে দিলেন। সে ক্যাপ্টেনের নাম টমাস জোনস। আমেরিকার উপকূলে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সমুদ্রে সে দস্যুবৃত্তি করেছে। তারপর ধরা পড়ে সে কারারুদ্ধ হয়। সার ফার্ডিনাণ্ডো প্রমুখ কয়েকজন তাকে জেল থেকে উদ্ধার করলেন এই কাজের জন্যে। পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের সমুদ্রযাত্রার নেতা হল এক জলদস্যু।

ইংলণ্ড থেকে ক্যাপ্টেন টমাস জোনসের অধীনে 'মে ফ্লাওয়ার' ৭০ জন যাত্রী নিয়ে ইংলিশ প্রণালীতে 'স্পীড-ওয়েলের' সঙ্গে মিলিত হল। কিন্তু দিন পাঁচেক যেতে না যেতেই হঠাৎ 'স্পীডওয়েলে'র তলায় ছিদ্র দেখা গেল। জাহাজ আর চলবে না। সে ছিদ্রের রহস্যের কথা পরিব্রাজক সম্প্রদায় জানতে পারলেন না। তাঁরা 'স্পীডওয়েল' পরিত্যাগ করে উঠলেন 'মে ফ্লাওয়ারে'। 'স্পীডওয়েল' জাহাজ ফিরে গেল বন্দরে এবং তারপর ভূতপূর্ব্ব জলদস্যু ক্যাপ্টেন জোনসের পক্ষে সার ফার্ডিনাণ্ডোর গোপন নির্দ্দেশ অনুসারে এই সমস্ত যাত্রীকে ভার্জ্জিনিয়ার বদলে নিউ ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া বিশেষ কঠিন হল না।

সমুদ্রে মাসাধিককাল ভয়ঙ্কর ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ৯ই নভেম্বর তারিখে পরিব্রাজক সম্প্রদায় প্রথম স্থলের চিহ্ন দেখলেন। কিন্তু এ তো ভার্জ্জিনিয়া নয়, এ যে নিউ ইংলণ্ডের তুষারাবৃত উপকূল! ক্যাপ্টেন জোন্‌স জানালে যে, তার দোষ নেই, ঝড়ে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যাই হোক নিউ ইংলণ্ডও তো খুব ভাল জায়গা। এখানে অবতরণ করলে লাভ বই ক্ষতি নেই।

কিন্তু পরিব্রাজক সম্প্রদায় রাজী হলেন না। তাঁরা ভার্জ্জিনিয়াতেই যেতে চান। আবার জাহাজকে ঘোরাতে হল। কিন্তু ক্যাপ্টেন জোন্‌স বৃথাই এতদিন এ অঞ্চলে জলদস্যুবৃত্তি করে নি। সেই দিনই হঠাৎ জাহাজ গিয়ে পড়ল উত্তাল উর্ম্মি-উদ্বেলিত বিপদ-সঙ্কুল কেপ কডের উপকূলে। জাহাজ যায়-যায়। ক্যাপ্টেন জোন্‌স জানালে এই মুহূর্ত্তে পিছু না ফিরলে জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

তবু যাত্রীরা রইলেন তাঁদের সঙ্কল্পে অটল। তাঁরা ভার্জ্জিনিয়াতেই যাবেন। শেষ চালও ব্যর্থ হল দেখে এবার ক্যাপ্টেন জোন্‌স নিজ মূর্ত্তি ধারণ করলে। জাহাজের কাপ্তেন হিসাবে সে অস্বীকার করলে এই বিপদের মধ্যে জাহাজকে নিয়ে গিয়ে সকলকে বিপন্ন করতে। নিরুপায় হয়ে যাত্রীদের সায় দিতে হল তার কথায়। ৬৬ দিন সমুদ্রে অশেষ দুঃখ ভোগ করে পরিব্রাজক সম্প্রদায় নিউ ইংলণ্ডের উপকূলে অবতরণ করলেন। সার ফার্ডিনাণ্ডোর উদ্দেশ্য সফল হল।

সেই দিন আমেরিকার গৌরবময় ইতিহাসের সূচনা হল। জাতি ও দেশের ভাগ্য যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, দুর্জ্জ্ঞেয় সেই জীবন-বিধাতার কাজের পদ্ধতি, কোন্ পথ দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য তিনি সফল করেন তা মানুষের ধারণার অতীত।

অন্যতম এক মহাশক্তির অভ্যুদয় হল এমনি করে উৎপীড়িত এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দুঃসাহস ও দূরদর্শী একদল বৈষয়িকের চক্রান্তের সংযোগে।

ফাগুনে বাদল

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু করিব না কাজ—
তোমায় আমায় মুখোমুখি হ'য়ে শুধু বসে' র'ব আজ।
কহিব না কথা, গাহিব না গান, মেঘম্লান দিবালোকে
শুধু চেয়ে র'ব তনুমনপ্রাণ ভরিয়া দু'জোড়া চোখে।
আকাশ আজিকে ঘনায়ে এসেছে ধরার বুকের কাছে,
বহু দিবসের সঞ্চিত কথা কানে কানে কহিয়াছে।
চৌদিকে তাই শুভদৃষ্টির লজ্জাবসনসম
দীঘল শীতল ছায়া নামিয়াছে আজি সখি গাঢ়তম।
নিখিলে লেগেছে দিবসে দুপুরে রূপার কাঠির ছোঁয়া,
সজল সচল শুভ্র তিমিরে ধরণী হয়েছে ধোঁয়া।
ভূলোকে দ্যুলোকে ব্যথায় পুলকে হয়ে গেছে একাকার,
দিবসে নিশীথে, দিশিতে দিশিতে—কোনো ভেদ নাহি আর।
ভুবন ভরিয়া দুলিছে কেবল একখানি যবনিকা,
এ আঁধারে প্রিয়া,—তুমি এস নিয়া তোমার রূপের শিখা।
শুধু হাসি মুখে চেয়ে থাক তুমি, আমি শুধু চেয়ে দেখি,
দেবতা আজিকে কাজ ভুলিয়াছে—তুমি কাজ করিবে কি?

না, না, কাজ নয়, 'কোনো কাজ নয়,—কোনো কথা শুনিব না,
শুধু তব কাজ বসে' বসে' আজ স্বপনের জাল বোনা।
বাহিরে ঝরিছে ঝর ঝর ধারা,—বাতাস ফিরিছে গাহি;
কাজ করিবার অবসর আর নিখিলে কোথাও নাহি।
আজি কমলার কল্যাণে বাজে বাগ্‌বাদিনীর বীণা:
ভীরু আলো কাঁপে মুদিত নয়নে আঁধার কণ্ঠলীনা।
হেন দিনে আর তুলোনা তোমার কঠোর কাজের বুলি;
ওগো দয়া করে' ক্ষণেকের তরে সব কিছু যাও ভুলি।
ঘর-সংসার আহার-বিহার আচার-বিচার যত
ঘন বর্ষায় যাক ভেসে যায় যদি বারেকের মত।
জড় জীবনের যত জটিলতা যত বাধা ছোট বড়,
স্বপ্নের মত হোক অপগত, ওগো তুমি দয়া কর!
ঐ বাতায়নে বস আনমনে আলুলিত কুন্তলে,
কুসুম-সুরভি ভাসিয়া আসুক বর্ষা-শীকর জলে।
বীণাখানি তব বুকে বাজিবে কি গুঞ্জর তানে বালা,
নিশীথ নিবিড় আকুল অলকে দুলাবে বকুলমালা?
নীল নিচোলের আছে প্রয়োজন? ময়ূরীর কেকারবে?
কালো নয়নে কি কাজল না দিলে গুরুতর ত্রুটি হবে?

হয় যদি হোক, আমার এ চোখ কোনো দোষগুণ ধরি
বিবাদ বিচার করিবে না আর কা'রো সাথে সুন্দরি!
নীপশাখে আজ নাই বা ঝুলিল মিলনের ফুলডোর,
নাই হল গাওয়া কাজরীর গান অঙ্গনতলে মোর;
আজ অভিসার দিবসে নিশার ভুলিয়া চন্দ্র-তারা,—
ঐ দেখ তারে ডুবাল ক্ষমায় আকাশের আঁখিধারা!
আজ ত্রিভুবনে কোনো কিছু নাই ক্ষমা না পাবার মত;
মোরা পারিব না ক্ষমা করে' নিতে মোদের দীনতা যত?
প্রকৃতি আজি যে রং ভুলে গেছে, সমালোচনার আঁখি,
যেথা যত ছিল নিজেরে বাঁচাতে সে তাই দিয়েছে ঢাকি।
নিখিলে কোথাও কোনো কেহ নাই শুধু তুমি আমি আজ;
যা' করিবে তাই মধুর মানিব যা পরিবে তাই সাজ।

আহা, আহা, ওকি কোথা যাও সখি?
ঘরে বুঝি ডাকে কারা?
বাহিরে কে ডাকে শুনিতে পাও না? তাহারে দিবে না সাড়া?
ভুবনে ভুবনে ধ্বনিছে যে ডাক জলদমন্দ্রে আজি,—
যে ডাকে উঠিছে শিরায় শোণিত বীণার মতন বাজি—
যে ডাকে সহসা উষর ধূসর পুরানো জীবনখানা
নিমিষে ভরিল পুষ্পে পর্ণে, গন্ধে বরণে নানা,—
সেই ডাক তুমি স্বীকার করিতে কেন ভয় পাও অয়ি?
ভ্রূকুটিতে তব ত্রুটি রয়ে গেল—জান তা ছলনাময়ি!
রাশি রাশি কাজ থাকে থাক আজ যা বলে বলুক যে বা,
অনেক হয়েছে মানুষেরে বধি বিধি-বিধানের সেবা।
চির দিবসের যে নারী পুরুষ স্বজনে-সমাজে ঢাকা
সংসার-রথচক্রপেষণে লুটালো রক্ত মাখা—
দেবতা মানব সবারে তুষিয়া—মিটায়ে সবার দাবী
যাহারা কাটালো শিষ্ট জীবন কারা কি ভাবিবে ভাবি,
যৌবনে জরা বরি নিল গুরু-পরিজন-মেঘে ঢাকি—
আজি ফাল্গুনে পূর্ব্বপবন তাদের ফিরিছে ডাকি।
আজিকে তাদের ছুটি দিতে হবে—অবাধ অগাধ ছুটি;
আজ বাধা দিলে সহিবে না আর—সব বাধা যাবে টুটি।
কাজের সময় অনেক মিলিবে—জীবন কাটিল কাজে,
হেন বর্ষণ-বিধুর ফাগুন বারে বারে আসে না যে!
দয়া কর, কথা রাখ—
দেবতা আজিকে সদয় হয়েছে, প্রিয়ে তুমি হবেনাক?

চীনা শ্রমণদের ভারতদর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

খানের রাজ্য হইতে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের মধ্য দিয়া এবং হিমালয় পর্ব্বত পার হইয়া হিউয়েন কপিশ-রাজ্যে আসিলেন। পথে এক রাজ্যের রাজা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া বিশেষ সমাদর দেখাইলেন। এখানকার কোন কোন দুষ্ট লোক হিউয়েনের সহিত দুর্ব্যবহার করায় রাজা তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু হিউয়েনের অনুরোধে এই দণ্ড রহিত হওয়ায় জনসাধারণ হিউয়েনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিল।

ধর্ম্মসিংহ নামক একজন মহাপণ্ডিত আচার্য্যের সঙ্গে পথে তাঁহার পরিচয় হয় এবং ধর্ম্মসিংহ তাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। প্রজ্ঞাকর নামক আর একজন যুবা আচার্য্য পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; হিউয়েন তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রীত হইয়া একমাস তাঁহার কাছে "বিভাষা-সূত্র" পাঠ করিলেন। অনেক রাজ্যের রাজারা মন্ত্রী পাঠাইয়া হিউয়েনকে নিজরাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কপিশ-রাজ্যের লোককে হিউয়েন হিংস্র ও ভীষণ এবং তাহাদের ভাষাকে কঠোর ও পরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

এই যেসব রাজ্যের মধ্য দিয়া হিউয়েন আসিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের এসিয়ার মানচিত্র দেখিলে সেগুলি ভারতের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়; সে যুগেও এই রাজ্যগুলি ভারতের রাজ্যসীমার বাহিরে ছিল। কিন্তু তবুও হিউয়েন যেখানে গিয়াছেন, সেখানে শত শত সঙ্ঘারাম, বিহার, স্তূপ ও সহস্র সহস্র ভিক্ষু দেখিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুরা ভারতীয় নহে, সেই সেই রাজ্যের স্থানীয় লোক। এই ভিক্ষুদের মধ্যে ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ ও ভারতীয় আচার পালন হিউয়েন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই সব দেশের ভাষার বর্ণমালা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতের অনুরূপ ছিল এবং সাধারণ লোকের ভাষা, বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারে ভারতের প্রভাব খুব বিস্তৃত হইয়াছিল।

ইহা হইতে আমরা সে যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ও প্রভাব কিরূপ ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারি। এই রাজ্যগুলিতে হিউয়েন প্রধানতঃ হীনযানেরই প্রভাব দেখিয়াছিলেন, শুধু কপিশ-রাজ্যে মহাযান প্রচলিত ছিল। বহু সঙ্ঘারাম-স্তূপ প্রভৃতিতে হিউয়েন ছোট বড়, প্রস্তরনির্ম্মিত বা রত্নখচিত অনেক বুদ্ধপ্রতিমা দেখিয়াছিলেন এবং সেগুলির অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি লোক হইলেও হিউয়েনের ধর্ম্ম-প্রাণতা তাঁহাকে একটু কুসংস্কার-বিশ্বাসী করিয়াছিল। তিনি বহুস্থানে বুদ্ধের দেহাবশেষ, নখদন্তাস্থি প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন; এগুলি ও প্রতিমাগুলির সম্বন্ধে তিনি যাহাই শুনিতেন তাহাই বিশ্বাস করিতেন এবং সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। হিউয়েনের ভ্রমণবৃত্তান্তের এই অংশগুলি আমরা যথাসম্ভব বাদ দিয়া বলিব। কপিশ-রাজ্যের পর একটি পর্ব্বত পার হইয়া হিউয়েন ভারতে প্রবেশ করিলেন।

হি উ য়ে ন-ৎ সি য়াং-এ র ভা র ত-ভ্র ম ণ

হিউয়েন লাম্ঘান্ রাজ্যের মধ্য দিয়া নগরহার (ন-কিয়ে-লো-হো) নগরে (জালালাবাদ জেলার পুরাতন রাজধানী) আসিলেন। এস্থানের বৌদ্ধতীর্থগুলিতে তিনি পরিক্রমা, পূজা ও ধূপদান করিলেন। লাম্ঘানের রাজা হিউয়েনের সম্মানের জন্য পাঁচদিন ব্যাপী একটি ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। লামঘান্ হইতে ভিক্ষু প্রজ্ঞাকর নিজদেশে ফিরিয়া গেলেন। লামঘানের লোককে হিউয়েন অবিশ্বাসী ও দুষ্ট বলিয়াছেন।

নগরহার নগর হইতে ১০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি স্তূপে বুদ্ধের কপালাস্থি রক্ষিত ছিল। ভক্তেরা রেশমের উপর চন্দনের প্রলেপ লাগাইয়া তাহার উপর এই অস্থির ছাপ লইত

এবং যেরূপ ছাপ উঠিত তাহা দ্বারা ভবিষ্যতের ফলাফল নির্ণয় করিত। হিউয়েনের সঙ্গী দুইজন শ্রমণের মধ্যে একজন বুদ্ধমূর্ত্তি ও অপর জন পদ্মের ছাপ পাইল, হিউয়েন বোধিদ্রুমের ছাপ পাইলেন। অস্থিরক্ষক ব্রাহ্মণ হিউয়েনকে বলিলেন, "বোধিদ্রুমের ছাপ অতি দুর্লভ, আপনি নিশ্চয় বোধিলাভের আংশিক ফলভোগী হইবেন।"

নগরহার হইতে ২০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি গুহার ভিতর বুদ্ধমূর্ত্তির ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় শুনিয়া হিউয়েন সেখানে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি একটি ডাকাতের দলের হাতে পড়িয়াছিলেন: তরবারিহস্তে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সত্বর তাঁহার গৈরিক-বাস উন্মোচন করিয়া দেখাইলেন এবং এপথে দস্যুভয় আছে একথা কি তিনি শুনেন নাই, ডাকাতেরা একথা জিজ্ঞাসা করিলে হিউয়েন বলিলেন, তিনি তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, পথে হিংস্র জন্তু থাকিলেও তিনি ভীত হইতেন না, ডাকাতেরা ত' মানুষ। ইহাতে ডাকাতেরা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। গুহার মধ্যে গিয়া বহু পূজা-বন্দনা করিবার পর হিউয়েন বুদ্ধ-মূর্ত্তির ছায়া অতি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই ছায়াপ্রদর্শনে বোধ হয় পাণ্ডাদের কারসাজি ছিল।

নগরহারের লোককে হিউয়েন সরল, সাধু-প্রকৃতি ও সাহসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানকার স্তূপ ও সঙ্ঘারাম-গুলিকে তিনি জীর্ণদশায় দেখিতে পান। তারপর আবার পর্ব্বত পার হইয়া হিউয়েন গান্ধার-রাজ্যে (কিয়েন-তো-লো) আসিলেন। পুরুষপুর নগর (পো-লু-শ-পো-লো; বর্ত্তমান পেশোয়ার) তখন গান্ধার-রাজ্যের রাজধানী ছিল। নারায়ণ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, ধর্ম্মত্রাত, মনোর্হিত, পার্শ্বিক প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এই দেশে জন্মিয়াছিলেন। পুরুষপুরের শত শত সঙ্ঘারাম ও স্তূপগুলি হিউয়েন ভগ্নদশায় ও এখানকার লোককে অবৌদ্ধ দেখিতে পান। সম্রাট কনিষ্কের দ্বারা নির্ম্মিত অনেক স্তূপ প্রভৃতিও তিনি দেখিয়াছিলেন। এই সব পবিত্র স্থানগুলিতে যখন তিনি যাইতেন তখন রাজাদের দ্বারা পূর্ব্বে প্রদত্ত স্বর্ণরৌপ্য ও মূল্যবান্ বস্ত্রাদির অংশ প্রত্যেক স্থানে কিছু কিছু করিয়া দিতেন। এই রাজ্যের সলতুর নামক স্থানে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রণেতা পাণিনির জন্ম হইয়াছিল।

পুষ্কলাবতী, উটখণ্ড প্রভৃতি নগর হইয়া হিউয়েন অতঃপর উদ্যান নামক রাজ্যে আসিলেন; উদ্যান ও কাশ্মীর এই দুই রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও ফলফুলে হিউয়েন মোহিত হইয়াছিলেন কিন্তু এখানকার লোককে তিনি অলস ও চতুর বলিয়াছেন। ইহারা বিদ্যার সমাদর করিত কিন্তু বিদ্যালাভে প্রযত্ন করিত না। এখানকার বৌদ্ধ বিহারাদিরও অধিকাংশই জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তক্ষশীলা ও সিংহপুর-রাজ্যের মধ্য দিয়া ইহার পর হিউয়েন উরশ-রাজ্যে আসিলেন। এখানকার রাজা তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য নিজের মাতা ও ছোট ভাইকে পাঠাইয়াছিলেন। এখানকার সঙ্ঘারামগুলি পরিদর্শন করিয়া হিউয়েন একটি বিহারে রাত্রিযাপন করিলেন। সেই রাত্রে এই বিহারের ভিক্ষুরা স্বপ্নাদেশ পাইলেন যে, মহাচীন হইতে সৎশাস্ত্রান্বেষণে অতিথি আসিয়াছেন। ভিক্ষুরা এইজন্য মহোৎসাহে কয়েক-দিন ধরিয়া শাস্ত্রাবৃত্তি করিলেন। ক্রমে যখন হিউয়েনের রাজধানীতে পৌছিবার সময় হইল, তখন ছত্র চামর-পতাকা-হস্তে সহস্রাধিক অনুচরের সহিত সমগ্রী-পরিষৎ রাজা ও ভিক্ষুরা অগ্রগমন করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। সাক্ষাতের পর সকলে হিউয়েনের পাদবন্দনা করিলেন ও পথে অজস্র ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হইল; অবশেষে হিউয়েনকে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হইল।

পরদিন রাজা নিমন্ত্রণ করিয়া হিউয়েনকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন ও তাঁহার ভারত-ভ্রমণের উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ শাস্ত্র-গ্রন্থাদি নকল করিয়া দিবার জন্য কুড়ি জন ও তাঁহার সেবার জন্য পাঁচজন লোক নিযুক্ত করিলেন। এইখানে একজন বয়স্ক মহাপণ্ডিত আচার্য্য ছিলেন; হিউয়েন তাঁহার কাছে বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিউয়েনের মত ছাত্র পাইয়া বৃদ্ধের দেহে, মনে, নব প্রাণের সঞ্চার হইল; তিনি সমস্ত দিন এবং রাত্রির প্রথমাংশ ধরিয়া অক্লান্ত-ভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন এবং হিউয়েনও প্রতি শব্দের প্রতি প্রগাঢ় মনোনিবেশ করিয়া আবার সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এই পাঠন-পঠনের সময় সে দেশের সমস্ত পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়া উভয়ের আলোচনা শুনিতেন। তাঁহারা প্রথম প্রথম হিউয়েনকে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি করিতেন এবং হিউয়েন বিনা দ্বিধায় সুস্পষ্ট ভাষায় তাহার উত্তর দিতেন;

পরে আর কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে ভরসা পাইত না। হিউয়েন এখানে দুই বৎসর যাপন করিয়া তাহার পর টক্কদেশে গেলেন। লামঘান্ হইতে এই পর্য্যন্ত ভারতের প্রত্যন্তভাগে ছিল বলিয়া ভারতের সাধারণ লোকের আচার-ব্যবহার হইতে এই দেশগুলির আচার-ব্যবহার বিভিন্ন ও অনেকটা অমার্জ্জিত ছিল।

তারপর রাজপুরী-রাজ্য অতিক্রম করিয়া দুইদিন পরে চন্দ্রভাগা নদী (বর্ত্তমান চেনাব) পার হইয়া হিউয়েন জয়পুর নগরে পৌছিলেন এবং সেখান হইতে সকল নগরে আসিলেন। সকল হইতে যাত্রা করিয়া তিনি নরসিংহ নগরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বিস্তীর্ণ পলাশ-বনে প্রবেশ করিলেন। এখানে একটি ডাকাতের দল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত জিনিসপত্র লুটিয়া লইয়া তরবারি-হস্তে তাঁহাদের তাড়া করিল। হিউয়েন ও তাঁহার সঙ্গী দুইজন শ্রমণ পালাইয়া একটি নালার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং লুকাইয়া তাহা পার হইয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া একটি মাঠ পার হইলেন ; এখানে একজন ব্রাহ্মণ ক্ষেত চষিতেছিল, তাহাকে বিপদের কথা জানাইলে সে গ্রামে গিয়া শাঁখ বাজাইয়া লোক জড় করিয়া সশস্ত্রে ডাকাতদের খোঁজে গেল। সশস্ত্র লোকজন দেখিয়া ডাকাতরা পলায়ন করিল ; হিউয়েন সত্বর আক্রমণের স্থানে গিয়া নিজদলের লোকদের বন্ধনমুক্ত করিলেন ও লুটের অবশিষ্ট জিনিস গ্রামের লোকদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন। গ্রামের লোকে তাঁহাদের গ্রামে রাত্রিযাপনের জন্য লইয়া গেল ; তাঁহার দলের লোকেরা তখনও ক্রন্দন ও হা-হুতাশ করিতেছিল, হিউয়েন কিন্তু মহানন্দে হাস্য করিতেছিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হিউয়েন বলিলেন,"প্রাণই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, প্রাণ যখন রক্ষা পাইয়াছে তখন অপর জিনিসের কথা ভাবিবার প্রয়োজন কি ?"

পরদিন তাঁহারা টক্করাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তে একটি বড় নগরে (বোধ হয় বর্ত্তমান লাহোর) প্রবেশ করিলেন। এই নগরের পশ্চিমদিকের একটি আম্রবনে একজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, দেখিতে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক মনে হইলেও তাঁহার আসল বয়স নাকি ৭০০ বৎসর ছিল। তাঁহার দুইজন শিষ্য ছিল, তাহাদেরও বয়স নাকি শতাধিক বৎসর ছিল ! ব্রাহ্মণ হিউয়েনকে পাইয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং চারিদিকে হিউয়েনের আগমন-সংবাদ প্রচার করাইলেন ও ডাকাতের হাতে তাঁহার জিনিস লুটের কথা জানাইলেন। অনেক লোক ইহাতে বস্ত্রাদি উপহার লইয়া হিউয়েনকে দেখিতে আসিল এবং তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া জ্ঞানলাভ করিল। হিউয়েন বস্ত্রাদি দলের সকলের মধ্যে সমভাবে ভাগ করিয়া দিলেন এবং ব্রাহ্মণকেও একাংশ দিলেন। এখানে হিউয়েন একমাস থাকিয়া সূত্রাদি, "শতশাস্ত্র" এবং "শতশাস্ত্রবৈপুল্য" অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

তারপর পূর্ব্বদিকে ৫০০ লি গিয়া তাঁহারা চীনভুক্তি রাজ্যে পৌছিলেন। এই রাজ্যের "চীনভুক্তি" নাম হইবার কারণ এই যে, সম্রাট্ কনিষ্কের কাছে পরাজিত হইয়া চীনদেশের যে রাজপুত্রেরা আবদ্ধ হইয়া ছিল, তাহারা শীতকালে এখানে বাস করিত। পূর্ব্বে এ দেশে নাস্পাতি ও পীচফল পাওয়া যাইত না ; এই চীনদেশীয় রাজপুত্রেরা এই ফলগাছগুলি সে দেশে প্রথমে লাগাইয়াছিলেন বলিয়া পীচকে "চীনানি" এবং নাসপাতিকে "চীনরাজপুত্র" নাম দেওয়া হইয়াছিল, হিউয়েন এইরূপ লিখিয়াছেন। এখানে বিনীতপ্রভ নামে একজন মহাপণ্ডিত আচার্য্য ছিলেন এবং হিউয়েন চৌদ্দমাস এখানে থাকিয়া বিনীতপ্রভের কাছে "অভিধর্ম্ম-শাস্ত্র", "অভিধর্ম্ম-প্রকরণ" "শাসন-শাস্ত্র", "ন্যায়দ্বার-তারক-শাস্ত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

এখান হইতে হিউয়েন জালন্ধর রাজ্যে গিয়া "নগরধন" নামক বিহারে থাকিয়া আচার্য্য চন্দ্রবর্ম্মার কাছে চারমাস "প্রকরণ-পাদ-বিভাষা শাস্ত্র" পাঠ করিলেন। তারপর কুলুত, শতদ্রু, পার্য্যাত প্রভৃতি রাজ্য হইয়া তিনি মথুরা (মো-তু-লো) রাজ্যে পৌছিলেন।

হিউয়েন যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন সেখানকার বৌদ্ধ তীর্থস্তূপাদির যেমন বিবরণ দিয়াছেন, সেইরূপ সেই স্থানে কোন্ বৌদ্ধপণ্ডিত কি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহারও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কোন্ স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের হীনযান বা মহাযান বা অন্য দলের সেখানে প্রভাব কিরূপ তাহাও তিনি এবং ফা সিয়েন দুইজনেই বলিয়া গিয়াছেন। আবার বোধিসত্ত্বরূপে বুদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে ঘটিয়াছিল বলিয়া যে সব গল্প "জাতকে' বর্ণিত আছে, সেই গল্পগুলির সঙ্গে সংযুক্ত স্থানগুলির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে হিউয়েন গল্পগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

এসব কথা সাধারণ পাঠকের কাছে প্রয়োজনীয় বোধ হইবে না মনে করিয়া তাহার উল্লেখ আমরা করিব না। এমনও হইয়াছে যে, প্রচলিত কিম্বদন্তীর উপর বিশ্বাস করিয়া হিউয়েন অনেক স্থানে বুদ্ধ আসিয়াছিলেন এবং এই এই কাজ করিয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও ঐ ঐ স্থানে বুদ্ধের যাওয়া ঐতিহাসিকেরা গ্রাহ্য করেন না। হিউয়েন সে যুগের ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি অবস্থা এবং আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা আমরা ক্রমে বর্ণনা করিব।

মথুরাতে হিউয়েন বুদ্ধের ও প্রসিদ্ধ বুদ্ধশিষ্যদের দেহাবশেষ-গর্ভ অনেক স্তূপ দেখিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর পর্ব্বতিথি-গুলিতে এই সব স্তূপে মহাসমারোহে পূজা-উৎসবাদি হইত ; এই উৎসবে রাজারা, রাজমন্ত্রীরা ও অন্য বড়লোকেরা যোগ দিতেন। পূজার সময় রাজারা রাজমুকুট খুলিয়া রাখিতেন, এবং সকলেই ভিক্ষুদের চেয়ে নীচে মাটিতে আসন পাতিয়া

। মন্ত্রীরা স্বয়ং দানভিক্ষাদির পরিদর্শন করিতেন। "অভিধর্ম্ম"-অনুসারীরা সারিপুত্রের স্তূপে, ধ্যানাভ্যাসীরা মৌদ্গলায়নের স্তূপে, "সূত্র"-অনুসারীরা পূর্ণ মৈত্রেয়াণী পুত্রের স্তূপে, "বিনয়"-অনুসারীরা উপালির স্তূপে, ভিক্ষুণীরা আনন্দের স্তূপে, শ্রমণেররা রাহুলের স্তূপে এবং মহাযানীরা অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী এবং প্রজ্ঞাপারমিতার কাছে পূজা দিত। সঙ্ঘারামগুলির জন্য ধনীলোকেরা তাম্রলিপিতে দানপত্র লিখিয়া অনেক জমিজমা, বাড়ীঘর, লোকজন ও গবাদি দিতেন; রাজারা, বড়লোকেরা ও গৃহস্থেরা অনেক বিহার নির্ম্মাণ করাইতেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে ভিক্ষুদের অন্নবস্ত্রাদি দান করিতেন।

এখানকার লোকের খুব সম্পন্ন অবস্থা ছিল এবং ইহাদিগকে খুবই অল্প রাজকর দিতে হইত। রাজা বা রাজপুরুষেরা জনসাধারণের কাজে মোটেই অযথা হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজার খাস জমি যাহারা চাষবাস করিত, তাহারাও ইচ্ছা হইলে থাকিত, ইচ্ছা হইলে ছাড়িয়া যাইত। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না, বারম্বার বিদ্রোহকারীদের হাত কাটিয়া ফেলা ছাড়া অন্য শাস্তি হইত না। এখানে রাজ্যের কোথাও প্রাণী হত্যা হইত না, কেহ মদ বা পেঁয়াজ রসুন খাইত না, কেহই শূকর বা মুরগী পুষিত না বা গরু ও ছাগলের ব্যবসা করিত না, এবং কোন হাটবাজারে কসাইখানা বা মদের দোকান ছিল না। শুধু চণ্ডালেরা শিকার, মাছ ধরা প্রভৃতি ব্যবসায় করিত; ইহারা নগরের বাহিরে থাকিত এবং নগরের ভিতরে আসিলে একটা কাঠ বাজাইয়া পথে চলিত, শুনিয়া লোকে তাহাদের যাহাতে না ছুঁইতে হয় সেজন্য দূরে সরিয়া যাইত।

মথুরাতে একটি পাহাড়ের উপর প্রসিদ্ধ ভিক্ষু উপগুপ্তের (ইনিই সম্রাট্ অশোককে ধর্ম্মপ্রেরণা দান করেন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সঙ্ঘারাম ছিল এবং সঙ্ঘারামের উত্তরে একটি পাথরের ঘর ছিল। কথিত আছে, ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময় উপগুপ্ত যে-স্বামী-স্ত্রীকে অর্হত্ত্বফল লাভ করাইতে পারিতেন তাহাদের জন্য একটি করিয়া ছোট বাঁশের টুকরা এই ঘরে রাখিতেন। হিউয়েন, ফা সিয়েন প্রভৃতি পরিব্রাজকেরা এই ঘরে এইরূপ একগাদা বাঁশের টুকরা দেখিয়াছিলেন।

মথুরা হইতে হিউয়েন থানেশ্বর হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন। আমাদের দেশের লোকের গঙ্গাজলের পবিত্রতা সম্বন্ধে বিশ্বাসের উল্লেখ করিয়া তিনি ইহাকে কুসংস্কার বলিয়াছেন। এখানে জয়গুপ্ত নামক একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্যের কাছে তিনি এক শীত এবং অর্দ্ধ বসন্ত থাকিয়া সৌত্রান্তিক মতানুসারে বিভাষার ব্যাখ্যা শুনিলেন। তারপর গঙ্গা পার হইয়া মতিপুর-রাজ্যে আসিলেন, এখানকার রাজা জাতিতে শূদ্র ছিলেন। এখানকার মিত্রসেন নামক আচার্য্যের কাছে হিউয়েন অর্দ্ধ বসন্ত এবং এক গ্রীষ্ম থাকিয়া "তত্ত্বসত্য-শাস্ত্র", "অভিধর্ম্ম-জ্ঞান-প্রস্থান-শাস্ত্র" প্রভৃতি অধ্যয়ন করিলেন।

ইহার ৩০০ লি উত্তরে ব্রহ্মপুর নামে কোটরাজ্য ছিল, সেখানে অনেক দিন ধরিয়া স্ত্রীলোকে রাজ্য-শাসন করিত। রাণীর স্বামীকে রাজা বলা হইত বটে, কিন্তু রাজা রাজ্যশাসনের কিছুই জানিতেন না। সেখানকার পুরুষেরা শুধু ক্ষেত চষিত ও যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিত। এই রাজ্যকে লোকে "স্ত্রী-রাজ্য" বলিত। তারপর অহিক্ষেত্র, বীরাসন-রাজ্যের মধ্য দিয়া হিউয়েন কপিথ-রাজ্যে আসিলেন। বুদ্ধ একবার স্বর্গে গিয়া কিছুদিন থাকিবার পর এই কপিথ নগরে আবার স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে যে কাহিনী আছে, সেই সম্পর্কে রচিত কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন এখানে ছিল। এই রাজ্যের লোকের অবস্থা খুব ভাল ছিল; বহু দেশের লোক এখানে আসিত এবং নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। এখানে শত শত বিহার ও সঙ্ঘারাম এবং সহস্র সহস্র ভিক্ষু ছিল।

কপিথ হইতে হিউয়েন ২০০ লি উত্তর-পশ্চিমে কান্যকুব্জ (কিয়ে-জো-কিয়ো-শে-কিয়ো) রাজ্যে আসিলেন। রাজ্যের রাজধানী গঙ্গাতীরে অবস্থিত কান্যকুব্জ নগর প্রায় ২০ লি লম্বা ও ৫।৬ লি চওড়া ছিল। এখানে প্রায় একশত সঙ্ঘারাম ও দশ হাজার ভিক্ষু ছিল এবং হীনযান ও মহাযান উভয়েরই চর্চ্চা হইত।

নগরের চারিদিকে পরিখা ছিল। নগরের মধ্যে উচ্চ উচ্চ স্তম্ভ, উদ্যান, ফুল এবং দর্পণের মত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল সরোবর ছিল। অজস্র পরিমাণে মূল্যবান্ দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এখানে আসিত। এখানকার লোকের অবস্থা ভাল ও মনে সুখ ছিল। নগরের ঘরবাড়ীগুলি সমৃদ্ধ ও সুনির্ম্মিত ছিল এবং নগরের সর্ব্বত্র ফুলফলে ভরা ছিল। এখানকার লোক সাধু ও সরল প্রকৃতির ছিল, তাহারা দেখিতে সৌম্যদর্শন ছিল এবং উজ্জ্বল রঙের বিচিত্র বস্ত্র পরিত। ইহাদের মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা খুব ছিল এবং ইহারা পথে চলিতে তর্কবিতর্ক করিতে খুব ভালবাসিত। ইহাদের ভাষা সুমার্জ্জিত বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এখানে এক শত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও দুই শত হিন্দু-মন্দির ছিল।

(ক্রমশঃ)

সন্দেহ

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মনের সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ এবং সে সম্বন্ধ সময় সময় কিরূপ প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহার অনেক দৃষ্টান্তও আছে। ডাক্তাররা সকলেই তাহার পরিচয় পাইয়াছেন; সুতরাং আমিও পাইয়াছি। কিন্তু একটি ব্যাপারে একজন "রোগী"র ব্যবহারে তাহা যেমন পরিস্ফুট হইয়াছিল, তেমন আমার অভিজ্ঞতায় আর কখন হয় নাই। আজ সেই ঘটনাটিই বর্ণনা করিব।

তখন আমি অস্ত্র-চিকিৎসায় খ্যাতিলাভ করিয়া "বিশেষজ্ঞ" হইয়াছি এবং সাধারণ-চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়াছি। সেদিন সকালে দুইটি জটিল রোগের জন্য অস্ত্রোপচার করিয়া বেলা প্রায় একটার সময় ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। লোক দেখে, ডাক্তার মোটা "ফীস" লইয়া মোটরে উঠেন, কিন্তু তাহারা প্রত্যেক অস্ত্র-চিকিৎসায় ডাক্তারের স্নায়ুর অবস্থা কি হয়, তাহা অনুমান করিতেও পারে না, উপলব্ধি করা ত পরের কথা। বেগবান্ অশ্ব যখন গাড়ী লইয়া ছুটিয়া যায়, তখন দর্শকরা তাহার গতির ও গমনভঙ্গীর প্রশংসা করে; কিন্তু সে যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার শ্রমের বিষয় মনেই করিতে পারে না। ফিরিয়া আসিয়া উপরে যাইবার সময় ভৃত্যদিগকে বলিয়া গিয়াছিলাম, বেলা তিনটা পর্য্যন্ত যেন কোন কারণে আমাকে না ডাকে—লোক আসিলে অপেক্ষা করিতে বলিবে, টেলিফোনে কেহ কিছু বলিলে তাহা লিখিয়া রাখিবে।

আহার শেষ করিয়া আরামকেদারায় বসিয়া একখানা খবরের কাগজ নাড়িতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, "একজন বাবু—"

আমার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অবজ্ঞা করিয়া কেন যে সে আসিয়াছে, তাহা যে আমার বিরক্তির কারণ হইবে, তাহা মনে করিয়াই সে বলিল—"আমি আসতে না চাইলেও তিনি শুনলেন না; বল্লেন, দেরী হ'লে রোগী মারা যা'বে—এখ্খুনি খবর দিতে হ'বে।" অপ্রসন্নভাবে ভৃত্যকে বলিলাম, "আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

তখন বেলা আড়াইটা।

যে ঘরে প্রথমে রোগী দেখি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা টিপিলাম। ভৃত্য আগন্তুককে ঘরে দিয়া চলিয়া গেল। দেখিলাম, সম্মুখে এক যুবক—গৌরবর্ণ, সুদর্শন, বেশ-পারিপাট্যের অভাব নাই—মুখে আশঙ্কার ভাব, দক্ষিণ হস্ত যেন "ব্যাণ্ডেজ" করা।

বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, "আপনার কি দরকার?"

চেয়ারে বসিয়া আগন্তুক অত্যন্ত সন্তর্পণে হাতের আবরণ খুলিতে লাগিল, তাহার পর হাতখানি অপর হাতে ধরিয়া বলিল, "হাতের এই স্থানটায় অসহ্য ব্যথা—যন্ত্রণা, এ আর সহ্য করতে পারি না।"

হাতের উপর একটি স্থান একটি ক্ষুদ্র বৃত্তবেষ্টিত—লাল কালী দিয়া বৃত্তটি অঙ্কিত। আমি আমার চেয়ার টানিয়া লইয়া আগন্তুকের নিকটে লইলাম—বসিয়া বিশেষ যত্নসহকারে হাতখানি পরীক্ষা করিলাম। আমার আঙ্গুল চিহ্নিত স্থান স্পর্শ করিবামাত্র আগন্তুকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—তাহার মুখে যন্ত্রণার ভাব ব্যাপ্ত হইল কিন্তু আমি চিহ্নিত স্থানটিতে কোনরূপ অস্বাভাবিকতার পরিচয় পাইলাম না। যুবকের মুখভাব লক্ষ্য না করিলে মনে করিতাম, সামান্য ব্যথা—একটা ঔষধ লিখিয়া দিয়া ফীস লইয়া বিদায় দিতাম—কিন্তু তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া অণুবীক্ষণসাহায্যে পরীক্ষা করিব বলিয়া যুবককে আমার সহগামী হইতে বলিয়া উঠিলাম। সে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে হাতখানি কাপড়ে জড়াইয়া আমার সঙ্গে পার্শ্বস্থিত ঘরে আসিল।

আমি তাহার হাতখানি অণুবীক্ষণ-তলে রাখিব বলিয়া ধরিতেই সে যেন বিষম বেদনা পাইল।

আনুবীক্ষণিক পরীক্ষায়ও হাতে অস্বাভাবিক কিছুই পাইলাম না। তখন বলিলাম, "কিছুই নহে—একটা প্রলেপ—"

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া যুবক বলিল, "কিছুই নয়! যন্ত্রণায় আমার প্রাণ যায়—"

"কিন্তু পরীক্ষায় ত কিছুই পেলাম না।"

"হ'তে পারে না।"

বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "তবে আপনি অন্য কোন ডাক্তারের কাছে যা'ন।"

যুবক ব্যস্তভাবে বলিল, "না—না। সে ইচ্ছাও নাই—সে সময়ও নাই। দেরী হ'লে আমি মরে যা'ব।"

"কিন্তু আমি ডাক্তার, রোগীর চিকিৎসা করি—আমি সুস্থ শরীরে অস্ত্র চালাতে পারব না।"

যুবক যেন নিরাশ হইয়া পড়িল, তাহার পর বলিল, "ভাল, আমি নিজেই এই জায়গাটা কেটে বাদ দিচ্ছি; তা'র পর যা' করতে হয় আপনি করবেন। কত টাকা দিতে হ'বে?"

আমি বলিলাম, "আমি এক শ আটাশ টাকার কমে অস্ত্র চিকিৎসা করি না। কিন্তু—"

যুবক পকেট হইতে নোট, টাকা ও একখানি চাকুছুরী বাহির করিল। সে বাম হস্তে গণিয়া "ফী"র টাকা টেবলের উপর রাখিয়া অবশিষ্ট নোট ও টাকা পকেটে রাখিল; তাহার পর ছুরীর ফলা খুলিয়া চিহ্নিত স্থানে প্রযুক্ত করিতে উদ্যত হইল।

অগত্যা আমি অস্ত্র করিতে সম্মত হইয়া বলিলাম, "আমি টেলিফোনে একজন সহকারীকে ডাকছি; তিনি এসে ক্লোরোফর্ম্ম দেবেন।"

যুবক বলিল, "কোন দরকার নাই; আমি সহ্য করতে পারব।"

আয়োজন করিয়া লইয়া স্থানটি ঔষধ দিয়া ধৌত করিয়া ছুরী বাহির করিয়া বলিলাম, "আপনি মুখটা ফিরান।"

যুবক একটু ম্লানহাসি হাসিল।

অস্ত্র বসাইলেই সবল যুবকের ক্ষতমুখে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, তাহার দৃষ্টি ক্ষতস্থানে নিবদ্ধ—তাহার মুখে স্বস্তির ভাব—আনন্দের ভাব। সে বলিল, "মাংসটা বাদ দিয়ে দিন—হাড় পর্য্যন্ত।"

আমি তাহার নির্দ্দেশানুসারে কাজ করিলাম না—খানিকটা রক্ত বাহির হইবার পর হাতে ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, "খুব লেগেছে?"

যুবক বলিল, "না। মোটেই না—কি আরাম! আজ ঘুমাতে পারব। কতদিন ঘুমাতে পারি নি!"

আমি বিস্মিত হইলাম।

যাইবার সময় যুবক আপনার নাম ও ঠিকানা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে ব্যাণ্ডেজ খুলবেন?"

দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলাম। সে চলিয়া গেল।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা। তাহার পর হইতে রোগী আর টেলিফোনে ডাক আরম্ভ হইল।

রাত্রিকালে যখন দৈনন্দিন-লিপি লিখি, তখন মনে হইল—এ রোগীর ও ইহার রোগের কি ইতিহাস লিখিব? ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। শেষে যুবকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রোগবিবরণ কেবল 'হাতে অস্ত্রোপচার' লিখিয়া রাখিলাম। একবার মনে হইল, লোকটা পাগল নহে ত? মনকে বুঝাইলাম, সব রোগই যে আমরা ধরিতে পারি, তাহাও নহে। বিশেষ রক্ত বাহির হইবার পরই যখন রোগীর যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু ছিল।

[২]

সুস্থদেহ রোগীর ক্ষত পক্ষকাল মধ্যেই শুকাইয়া গেল। তাহার পর পনের দিন তাহার আর দেখা পাওয়া গেল না, কিন্তু যেদিন অস্ত্রোপচারের পর একমাস পূর্ণ হইল, তাহার পরদিনই সে আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই যন্ত্রণা—সেই অস্থিরতা, সেই অনুরোধ, স্থানটি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে! আমি কি করিব! স্থানটির ক্ষত পূর্ণ হইয়াছে—তাহাতে অসুস্থতার কোন চিহ্ন নাই; অথচ যুবকের ভাব দেখিয়া তাহার যন্ত্রণার কথাও মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। গতবার অস্ত্রোপচারের পর আমি অনেক ডাক্তারী পুস্তক পাঠ করিয়া ও সমব্যবসায়ীদিগের সহিত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে রোগ মানসিক বিকার। এই বিকার যে নিবৃত্ত হইবে, তাহাও মনে হয় না। তবে কতবার আমি এই পাগলের কথা মত তাহার অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিব? কিন্তু উপায় কি? অস্ত্রোপচারের ফলে সে ত কিছুদিনও ভাল থাকে! সে বলিল, ক্ষত শুকাইবার পর হইতে সে আবার যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে—যতদিন যাইতেছে, যন্ত্রণা তত বাড়িতেছে—

অনেক ভাবিয়া শেষে তাহার অনুরোধ পালন করিতে সম্মত হইলাম। সে যেন অকূলে কূল পাইল।

রক্ত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচলাম !"

এবারও পূর্ব্ববারের মত তাহার ক্ষত শুকাইয়া আসিলে সে চলিয়া গেল ; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ডাক্তারবাবু, আমার মনে হয়, একমাস পূর্ণ হলে আবার আপনার কাছে আসতে হবে।"

আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম, "না—আর আসতে হবে না। সব মাংস ত' কেটে বাদ দিয়েছি ; আবার ব্যথার—যন্ত্রণার কোন কারণ হতে পারে না।"

"তাই হ'ক। কিন্তু আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন না। যন্ত্রণাটা—"

সে আর অগ্রসর হইল না। আমি লক্ষ্য করিলাম, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ; সে অকারণ দৃঢ়ভাবে ওষ্ঠাধর চাপিয়াছে, যেন ভয়—পাছে কথা বাহির হয়।

[৩]

অস্ত্রোপচারের পর একমাস পূর্ণ হইবার দিন যত নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল, তত আমার রোগীটির কথা মনে হইতে লাগিল, সে কি সত্য সত্যই আবার আসিবে? আসিলে আমি কি করিব ?

মাস পূর্ণ হইবার পরদিন যখন সে আসিল না, তখন ভাবিলাম, সে আর আসিবে না।

সে আর আসিবে না বটে, কিন্তু পরদিন ডাকে তার পত্র পাইলাম—

"ডাক্তার বাবু,

আপনার কাছে বিদায় লইতেছি। বিদায় লইবার সময় আমার গোপন কথা না জানাইয়া পারিতেছি না। এ কথা আর কেহ জানে না ; কিন্তু অন্ততঃ একজনকে না জানাইয়া আমি বিদায় লইতেও পারিতেছি না।

"আমি যখন বি-এ পড়ি, তখন বিদেশের অনুকরণে এদেশে সহশিক্ষা-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদিগের সঙ্গে কয়টি যুবতী পড়িত। তাহাদিগের মধ্যে দুইজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। দুইজনের প্রকৃতি দুই প্রকার। ইন্দিরাকে দেখিলে যেমন গোলাপফুলের কথা মনে হইত, মনীষাকে দেখিলে তেমনই যূথিকার কথা মনে পড়িত। একজনের সৌন্দর্য্য যেমন, ভাবও তেমনই উজ্জ্বল ; সে যেন আপনার সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ—আর সেই গর্ব্বে গর্ব্বিত। আর একজন শুধু কোমল, যেন আত্মগোপন করিয়া সৌরভ ছড়াইতেই ভালবাসে। ইন্দিরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিবার প্রয়াস করিলেই বুঝিতে পারা যাইত—তাহাতে কণ্টক আছে ; মনীষার তাহা মনে হইত না। অথচ এই দুইজনে অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল।

"ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আমাকে ভালবাসায় মনীষার দিকে আকৃষ্ট করিল এবং সে আমার বিবাহের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিল না। অথচ দুই পরিবার হইতেই বিবাহে আপত্তি হইল—কেননা, বিবাহ অসবর্ণ হইবে। কিন্তু যৌবনের প্রবল প্রেম পরস্পরকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, আমরা কেহই আপত্তি মানিলাম না। আমি জানিতাম, আমার নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পিতা মাতা আমাকে ত্যাগ করিবেন। তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম ; দরিদ্র হইলেও আমি সে জন্য প্রস্তুত হইতাম, কিন্তু আমি দরিদ্র নহি—কারণ মাতামহের যে সম্পত্তি আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলাম, তাহাতে একটি পরিবারের অর্থার্জ্জনচিন্তা নিবারিত হয়। মনীষাও নারীসুলভ নির্ভর-প্রিয়তায় সর্ব্বতোভাবে আমার উপরে নির্ভর করিয়া অসাধারণ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল।

"আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। মনীষার পরিবারস্থ ব্যক্তিরা তাহাকে একেবারে বর্জ্জন করিলেন না বটে, কিন্তু আমার পিতা তাহাও করিলেন ; আমার পত্রোত্তরে তিনি লিখিলেন—'তুমি আমাকে যে বেদনা প্রদান করিলে, রামধনুর লাভচেষ্টায় তাহার সর্ব্বত্র এ মনস্তাপ ভোগ করিবে।' মনীষাকে আমি কিছুই গোপন করিলাম না ; পিতার পত্র পাঠ করিয়া সে চমকিয়া উঠিল—যেন কোন অলক্ষিত স্থান হইতে শর আসিয়া তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে।

"বড় সুখেই আমাদিগের দিন কাটিতে লাগিল। আমরা উভয়েই এম-এ পড়িতে লাগিলাম। যে সময় উভয়ে কলেজে থাকিতাম সেই সময়টুকু ছাড়া আমাদিগের ছাড়াছাড়ি হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাইবার সময় আমরা পরস্পরকে চুম্বন করিয়া যাইতাম, আসিয়া আবার সাগ্রহে চুম্বন করিতাম, যেন কতদিন পরে দেখা !

"মনীষার বন্ধু ইন্দিরা সপ্তাহে অন্ততঃ একবার আমাদিগকে দেখিতে আসিত। তাহার বিবাহের পরই তাহার ডাক্তার

স্বামী গবেষণার জন্য জার্ম্মানীতে গমন করিয়াছিল। ছয়মাস পরে সে ফিরিয়া আসিলে সেও কখন কখন স্ত্রীর সঙ্গে আসিত।

"দুই বৎসর কাটিয়া গেল। জীবন যেন আনন্দের উৎস, সেই উৎস হইতে কেবল অমৃতই উৎসারিত হইতেছে। কোন কোন দিন মনীষাকে বলিতাম—'বাবা লিখেছিলেন, রামধনু ধরবার চেষ্টায় মনস্তাপ পাব: কিন্তু আমরা রামধনু ধরতে পেরেছি।' সে পত্রের উল্লেখে মনীষা কিন্তু অস্বস্তি অনুভব করিত—বলিত, "ও কথা কেন?" কখন কখন আমি সে কথা উত্থাপিত করিতে চাহিলেই সে চুম্বনে আমার কথা বন্ধ করিয়া দিত।

"পরস্পরের চিন্তা ব্যতীত আমাদিগের আর কোন চিন্তাই ছিল না—যেন জগতে কেবল আমরা, আর সে জগৎ বসন্তানিল মধুরিত, নির্ঝরকলনাদে ও বিহগবিরাবে মুখরিত, কুসুমগন্ধামোদিত: সে যেন স্বপ্নলোক—নন্দনকানন। এই নন্দনে কি কখন পিতার অভিশাপ অকালজলদের মত উদিত হইয়া বজ্রাগ্নির দ্বারা তাহা দগ্ধ করিতে পারে? কালিদাস কি সে সম্ভাবনা কবিজনোচিত কোমলভাবে বুঝাইবার জন্যই নারদের বীণাচ্যুত কুসুমমাল্যের স্পর্শে ইন্দুমতীর মৃত্যু-কল্পনা করিয়াছিলেন?

"আমাদিগের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কিছুই গোপন ছিল না। কিন্তু কি কুক্ষণে একদিন মনে হইল, মনীষা তাহার সেলাইয়ের বাক্সটির চাবি কখন অঞ্চলচ্যুত করে না—কখন সে বাক্সটি চাবি না দিয়া কোথায়ও যায় না। কেন? ফুলে যদি কীট একবার প্রবেশ করে তবে সে তাহাকে নষ্ট না করিয়া নিবৃত্ত হয় না—মনে তেমনই সন্দেহ-পাপ একবার স্থানলাভ করিলে সুখ নষ্ট না করিয়া যায় না—মনও তাহাকে তাহার পুষ্টির উপকরণ যোগাইয়া দেয়। আবার যে স্থানে ভালবাসা যত প্রবল, সেই স্থানে সন্দেহ তত দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। ভালবাসায় কি কোন অভিসম্পাত আছে? আমার মনে সন্দেহ কেবলই বাড়িতে লাগিল। কেবলই কৌতূহল—বাক্সে কি আছে?

"সন্দেহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহার পর আমি সেই বাক্সটির মত বাক্সের চাবি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। বিবাহিত জীবনে সে-ই প্রথম আমার কাজ মনীষার কাছে গোপন করিলাম।

"এই সময় কলিকাতায় বেরিবেরি প্রবলভাবে দেখা দিল। একদিন দেখা গেল, আমার পা একটু ফুলিয়াছে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, অবিলম্বে স্থানত্যাগ করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। মনীষা সে জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। তিন দিনের মধ্যে আমরা মিহিজামে বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় গমন

"নূতন স্থানে আসিয়া মনীষার কি আনন্দ! কিন্তু আমি মুখে যত আনন্দই কেন দেখাই না, মনে সন্দেহের আগুনে পুড়িতেছিলাম।

"বাড়ীগুলি বাগানের মধ্যে অবস্থিত এবং সেই জন্য পরস্পর হইতে একটু দূরে অবস্থিত। তিন-চারদিনের মধ্যেই নিকটবর্ত্তী দুই একটি গৃহের অধিবাসীদিগের সঙ্গে আমাদিগের পরিচয় হইয়া গেল।

"সে দিন অপরাহ্নে মনীষা বলিল, 'যে বাড়ীর মেয়েরা ঐ দু দিন এসেছেন, তাঁরা আজ যেতে বলেছেন; চল।'

"আমি যে সুযোগ সন্ধান করিতেছিলাম, তাহাও মিলিল। আমি বলিলাম, 'তুমি যাও—আমার আজ যেতে ইচ্ছা করছে না।'

"মনীষার দৃষ্টিতে আশঙ্কার ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'কেন? অসুখ বোধ হচ্ছে?'

'না, ঠিক অসুখ নয়—তেমন ভাল লাগছে না।'

"সে আমার পায়ের ফুলা পরীক্ষা করিল। তাহার পর বলিল, 'তবে আজ থাক।'

'কেন? তুমি যাও।'

'না।'

"আমি জিদ করিয়া বলিলাম, 'তাঁরা যেতে বলে গেছেন; না গেলে ভাল দেখায় না। তুমি যাও।'

"মনীষা যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল; শেষে আমার কথায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমাকে চুম্বন দিয়া ও আমার চুম্বন গ্রহণ করিয়া গেল।

"সে যাইবার পর আমি গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া আমার সংগৃহীত চাবিগুলি বাহির করিয়া তাহার সেলাইয়ের বাক্স খুলিবার চেষ্টা করিলাম। কয়টি চাবি লইয়া চেষ্টার পর একটিতে বাক্স খুলিয়া গেল।

বাক্সে পশম ও রেশমের টুকরা প্রভৃতির নিম্নে কতকগুলি পত্র—সবগুলি একইরূপ কাগজে লিখিত—একটি সবুজ রেশমী ফিতা দিয়া বন্ধ।

আমার চক্ষু জলিয়া উঠিল—বুঝি মনের মধ্যে পশুও উগ্র হইয়া উঠিল। আমি পত্রগুলি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম; মনে একটু সঙ্কোচও হইল না। সেগুলি প্রেমপত্র—বিবাহিতা নারীকে তাহার প্রণয়ীর প্রেম-নিবেদন।

যত পড়িতে লাগিলাম, ততই ভাবিতে লাগিলাম—আমি যাহাকে দেবী বলিয়া মনে করিয়াছি, এ-ই তাহার স্বরূপ! তাহার এতদিনের ব্যবহার, এ কি নিপুণ অভিনয়! কি ছলনা!

মনে হইল, ভুল আমার। যে নারী অনায়াসে তাহার পিতামাতারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, সে কি আমার নিকট বিশ্বাসহন্ত্রী হইতে পারে না? কিন্তু মনে করিতে পারিলাম না, যে ভালবাসার জন্য সব ত্যাগ করিয়া আইসে, সে কখন ভালবাসার অপমান করিতে পারে না। আমার মনে তখন আগুন জলিতেছে, তাহাতে আমার বিবেচনা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। বিশ্বাস যখন নষ্ট হয়, তখন এরূপক্ষেত্রে বিবেচনা থাকিতে পারে না।

আমি পত্রগুলি যেমন সাজান ছিল, তেমনই সাজাইয়া সেই সবুজ ফিতায় বাঁধিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম, বাক্সটি বন্ধ করিয়া চাবি লুকাইয়া রাখিলাম।

এক ঘণ্টা পরেই মনীষা ফিরিয়া আসিল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমার মুখ-চুম্বন করিল। আমিও তাহাকে চুম্বন করিলাম বটে, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধরস্পর্শে মুখ যেন পুড়িয়া গেল।

মনীষা বলিল, "ওঁরা বেড়াতে যা'বার জন্য কত জিদ করছিলেন। অনেক বলে কাটিয়ে এসেছি। তুমি কেমন আছ?"

আমি বলিলাম, "ভাল।"

মনীষা আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার মুখ-ভাব ত সুস্থের মুখভাব নয়! নিশ্চয় তোমার অসুখ করছে। ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাই।"

আমি জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "পাগল হয়েছ?" সে হাসির গূঢ় অর্থ মনীষা অনুমান করিতেও পারিল না। তাহার অর্থ—অসুখের কারণ তুমি।

তাহার পর মনীষা বেশ-পরিবর্ত্তন করিতে গেল। আমার মনে হইল—এত সুন্দর, অথচ এত পাপী!

বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া সে আমার পাশে বসিল। নানা কথা বলিতে লাগিল, সে যেন বিহগীর প্রেমকূজন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, রাত্রি আসিল। সেই রাত্রি—শুইতে যাইবার সময় আমি বলিলাম, "তুমি যাও, আমি একখানা পত্র লিখে পাঁচমিনিটের মধ্যে যাচ্ছি!"

তাহার পর?

মনীষা শয্যায় শয়ন করিবার পর, আমি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমার দক্ষিণ মুষ্টিতে একখানা রেশমী রুমাল ছিল। সেইখানায় আমি আমার হাত জড়াই—দেখিয়াছেন। সে খানা তাহার গলার উপর দিয়া আমি শরীরের সমস্ত বল দিয়া গলা টিপিয়া ধরিলাম। সে একবার বিস্মিত ও শঙ্কিত-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল; বোধ হয়, আমার দৃষ্টি দেখিয়া ভয় পাইল; তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিল। সব শেষ। তাহার চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া আমার হাতে পড়িল।

মনে কি উল্লাস—বিশ্বাসহন্ত্রীকে তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছি।

তাহার পর ভৃত্যকে ডাকিলাম—ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইলাম। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, জীবনান্ত হইয়াছে। তিনি মত দিলেন, নিশ্চয়ই বেরিবেরিতে হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়াছিল; কোন কারণে তাহার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন তথায় বহু বেরিবেরি রোগী ছিলেন।

সংবাদ পাইয়া নিকটস্থ বাঙ্গলোগুলির কয়জন শবদাহের ব্যবস্থা করিতে আসিলেন, প্রত্যুষের স্বচ্ছান্ধকারে অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র নালার পার্শ্বে চিতানল জলিয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, আমার কৃত কাজের সব চিহ্ন সেই আগুনে পুড়িয়া গেল।

সেই চিতানলের উপর "শান্তি জল" ঢালিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। শান্তি কোথায়?

পরদিনই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম এবং আসিয়া, যেন কোন অস্বাভাবিক ঘটনাই ঘটে নাই এমনই বুঝাইবার

জন্য, মনীষার পিত্রালয়ে ও তাহার বন্ধু ইন্দিরার স্বামীকে সংবাদ দিলাম

সংবাদ পাইয়াই ইন্দিরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে এত বিচলিত দেখাইতেছিল, তিনি আসিয়াই আমাকে বলিলেন, "আপনার স্ত্রীর কাছে আমার কিছু জিনিস ছিল।"

আমি বলিলাম, "কি জিনিস ?"

"কতকগুলি পত্র।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মনীষা বলেছিলেন, সেগুলি তিনি তাঁ'র শেলাইয়ের বাক্সে রাখ্‌তেন। সেগুলি আমার বড় দরকারী।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি চিঠি ?"

তিনি যেন কাঁপিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "মনীষার কাছে আমি সেগুলি গোপনীয় বলে রেখে গিয়েছিলাম। তিনি কথনও সেগুলি সম্বন্ধে কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নি।" ইন্দিরার কণ্ঠস্বরে তাঁহার বিচলিতভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

আমি অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুতের শিখা বহিয়া যাইতেছে। আমার স্ত্রী অপরের গচ্ছিত জিনিস সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করেন নাই ; কিন্তু আমি—

চাবি আনিয়া বাক্সটি খুলিলাম, সেই চাবি খোলার শব্দে যেন আমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ ধ্বনিত হইল।

আমি পশম, সূতা প্রভৃতি সরাইয়া সে সকলের নিম্ন হইতে পত্রের তাড়া বাহির করিয়া ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কি—"

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তিনি যেন সেই তাড়াটি ছিনাইয়া লইলেন ; তাহার পর আমাকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মোটর চলিয়া গেল।

তখনই আমি আমার হাতে যে স্থানে মনীষার বিবাহিত জীবনে প্রথম ও শেষ অশ্রু পড়িয়াছিল, সেইস্থানে জ্বালা অনুভব করিলাম। যে অশ্রু শিশিরেরই মত পবিত্র তাহাতে কি জ্বালা অনুভূত হয় ?

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সেই জ্বালা বাড়িতে লাগিল। সেই জ্বালা লইয়া আহার নিদ্রা অসম্ভব হইয়া উঠিল। শেষে মনে হইল, ঐ স্থানটি কাটিয়া বাদ দিলে হয় ত যন্ত্রণার অবসান হইবে। তাই আপনার কাছে গিয়াছিলাম।

তাহার পরের ইতিহাস আপনি জানেন। আপনি আমাকে সে যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন নাই। কেমন করিয়া পারিবেন ? মনের ক্ষত ত আপনি চিকিৎসা করিতে পারেন না। আমার অপেক্ষা অল্প পাপী ম্যাকবেথ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—Canst thou not minister to a mind diseased ?"—আপনি কি ব্যাধিগ্রস্ত মনের চিকিৎসা করিতে পারেন ?

আমার পিতার অভিসম্পাত সফল হইয়াছে।

আমার যন্ত্রণা আবার পূর্ব্বের মত—বুঝি বা আরও তীব্র হইয়াছে। ঠিক এখন বুঝিয়াছি, আপনার চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না। আর তাহার প্রয়োজনও নাই। কারণ আমি আমার মনীষার কাছে যাইতেছি।

আমার বিশ্বাস, সে আমাকে ক্ষমা করিবে। সে কি কথন আমাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারে ? তাহার সন্দেহ ও সঙ্কোচের অতীত ভালবাসা কি ক্ষমারই এক রূপ নহে ? আর যদি সে আমার উপর রাগ করিয়া থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই বুঝিবে, আমার ভালবাসাও আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছিল। সে ত আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করে নাই, আমার বাহুবদ্ধ হইয়া যেমন ঘুমাইয়া পড়িত, আমার আঘাতে তেমনই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কেবল একবিন্দু অশ্রু পাত করিয়াছিল। সে আমাকে ক্ষমা করিবে। প্রেম-চুম্বনের ঐন্দ্রজালিক-স্পর্শে সব অপ্রীতি দূর হইয়া যাইবে।"

পত্রে ঠিকানা ছিল না। লেখকের শেষ ঠিকানা যাহা জানিতাম তথায় যাইয়া জানিলাম যে, সে সপ্তাহকাল পূর্ব্বে তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে। আর তাহার কোন সন্ধান পাই নাই। *

* হাঙ্গেরীর একটি গল্প অবলম্বনে লিখিত।

ত্যাগমাহাত্ম্য

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

বৈরাগী বটে সাধন ঠাকুর—
সার্থক মালাঝোলা !
হরির কৃপায় মিলেছে উপায়,
মুক্তির পথ খোলা।

যারে পায় তারে বিলায় সে প্রেম
বাধা নাহি কোনো ঠাঁই,
রসের কুঞ্জে কোনো দিকে কোনো
সেবা-অপরাধ নাই।

পাখী পুষিয়াছে,—দেখেছ ত চোখে—
আস্ত বনের পাখী !
কত বড় বড় বুলি তার মুখে—
কোথাও শুনেছ তা কি ?

(২)

রাসের সময় তারি আখ্‌ড়ায়
গুরুর পদার্পণ ;
সারাদিন তাই লাগিল সেথায়
নাম-সঙ্কীর্ত্তন !
সাধন-পথের গুরু কিনা, ঠিক
চেনা গেল নাক চোখে,
কথাগুলো তার বড় ভার-ভার
বুঝিল না সব লোকে।

(৩)

যা'বার সময় গুরুর চরণে
সাধন প্রণাম করি'
কাতরে শুধা'ল—এ ভবসাগর
কি করিয়া প্রভু তরি ?
কহিলেন গুরু, ভক্তি-পথের
উপায় যদি সে চাও,
হরির চরণে ভোগের কামনা
সকলই বিলায়ে দাও।

হাত যোড় করি' কহিলা সাধন—
কি আর কামনা আছে ?
একটা জীবন—সখী বিশাখার
ভিক্ষায় তাই বাঁচে ;
কোনো কাজ আর নাই ত আমার
হরিনামে বাঁচি মরি,
সেবাসঙ্গিনীসঙ্গে সদাই
গুপী-নাথে সেবা করি।
গোটা কয় গরু—দুগ্ধে তাদের
ঠাকুরের ভোগ লাগে,
পোড়া মনে তবু বৃন্দাবনের
গোপালের কথা জাগে।
তাঁরি নাম নিয়ে আছি দিনরাত,—
পাখী পুষিয়াছি ঘরে,
মধুর কণ্ঠে সেই সুধানাম
শুধু শুনিবার তরে।

(৪)

আয়ত চক্ষে ক্ষণেক চাহিয়া
রহি' শিষ্যের পানে,
কহিলেন গুরু—এতদিনে তব
বুঝিনু সেবার মানে !
কৃষ্ণসেবার নামে দাও শুধু
নিজ সেবাপরিচয়,
মনের পশুরে বশ কর, বাবা,
বনের পশুরে নয়।
ভোগের বিলাস হেরি' তব আমি
বুঝিয়াছি পলে পলে,
কৃষ্ণসেবার নাহি অধিকার
আত্মসেবার ছলে।

(৫)

সেই হ'তে সাধু ত্যজিল গুরুরে
ভাবি' মুক্তির কাঁটা,
সবাই বলিল,—এত বড় ত্যাগ—
সাবাস বুকের পাটা !
ভক্ত সাধন সেই দিন থেকে
লাগিল সমাজ-হিতে ;
গুরু ছেড়ে তাই গুর্ব্বীরে ভজে,
কোনো খেদ নাই চিতে।

অভিযান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

৬

কিরণ সোমনাথের বাড়ী হইতে সাত আট দিন পরে তৃষ্ণার সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিল। এখন যৌন-তত্ত্বের আলোচনাতেই তৃষ্ণা ও কিরণের অনেক সময় কাটিতেছে। কিরণ তৃষ্ণাকে ভরসা দিয়াছে যে, সে যৌন প্রেম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য তাহাকে জ্ঞাপন করিবে; সোমনাথ বৃদ্ধ হইয়াছেন, অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে কিন্তু "গীতা" "গীতা" করিয়া প্রায় উন্মাদ, সুতরাং সব কাজের বাহিরে গিয়াছেন। তৃষ্ণা সোমনাথের অধ্যাপনা সম্বন্ধে ইদানীং ভাল ধারণা পোষণ করে না—কিরণের এই মন্তব্যকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছে।

কিরণ এদিকে উৎসাহের আতিশয্যে তৃষ্ণাকে পড়াইবার নিমিত্ত প্রায় পাচশো টাকার পুস্তক কিনিয়াছে। আলোচনা যতই বাড়িতেছে ততই কিরণ আকৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ কিরণ, তরুণ ও অবিবাহিত।

এদিকে তৃষ্ণা তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীর কড়া শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া বেশীর ভাগ সময় কিরণের নিকটেই থাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় কিরণ সবেমাত্র তৃষ্ণার নূতন গল্পটি পাঠ শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইতেছে, এই সময়ে তৃষ্ণা হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগল কিরণ?" কিরণ বলিল, "বেশ আরম্ভ করেছিলে কিন্তু শেষটা কি করলে?" তৃষ্ণা বলিল, "কেন, যা স্বাভাবিক এ ক্ষেত্রে তাই করেছি—রমা তার স্বামীকে ছেড়েছে, বাড়ী থেকে পালাবে ঠিক করেছে, ছেলেই তার একমাত্র প্রতিবন্ধক যার জন্যে সে তার প্রেমাস্পদের কাছে যেতে পারছে না—ছেলেকে মেরে ফেলে—" কিরণ বাধা দিয়া বলিল, "এ যে একেবারে Out-heroding Herod…"।

তৃষ্ণা বলিল, "তুমি কিছু আর্ট বোঝ না—জান একজন এম-এ-পি-আর-এস্-পি-এইচ-ডি সমালোচক কি বলেছেন?" কিরণ বলিল, "বাবা, উপাধি ত অনেক কিন্তু কি বলেছেন তিনি?" তৃষ্ণা সগর্ব্বে বলিল, "বলেছেন যে এই Neo-romantic school-এ আমারই স্থান যে প্রথম তা আমি এই গল্পে প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।" কিরণ বলিল, "আমিও অবশ্য এম-এস্-সি, এম্-ডি ডাক্তার বটে, কিন্তু তবু ও কথা বুঝতে পারছিনে।" তৃষ্ণা বলিল, "সোমনাথদা বলেছিলেন—"

কিরণ বলিল, "সোমনাথদাকে তুমি বুঝতে পারনি।" তৃষ্ণা বাধা দিয়া বলিল, "ঐ তো তোমাদের দোষ, আমি বি-এ ফেল ক'রে পড়া-শুনা ছেড়ে দিয়েছি সেই জন্য, না—? মালা বেশ বুঝতে পারত বোধ হয়, কেন না সে এম-এ পাশ।" কিরণ বলিল, "মালার কথা কেন তৃষ্ণা—সে এ সব পড়েছে ও বুঝেছে, কিন্তু সে এতে ডুবে যেতে পারেনি, যা তুমি পেরেছ। তবে তার মনে কতকগুলো পুরোনো ভাব তার মাষ্টার সেই লোফারটা, ঐ যে নিখিলেশ—এমন ভাবে বসিয়ে দিয়েছে যে তার পক্ষে—।" তৃষ্ণা বলিল, "না না কিরণ—বিবাহ, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তার মতামত খুব advanced…।" কিরণ বলিল, "Advanced হ'লে কি হবে—মতামত অনুসারে কাজ করতে গেলেই সেই মাষ্টারের ভূত এসে ঘাড়ে চাপে—আর একটি ভূত দেখলাম এই যতীন, বিলেতে গিয়ে কিছু নিতে পারেনি।" এই সময়ে ঘড়ীর দিকে চাহিয়া তৃষ্ণা বলিল, "কাল আবার উনি বিলেত থেকে ফিরে আসছেন—আবার সেই জীবন।" কিরণ বলিল, "তা বটে—"

তৃষ্ণা নিজের বিবাহিত জীবনের অনেক কথাই বলিয়াছে। বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বামী তাহার বেজায় বেরসিক, ডাক্তারী ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার উৎসাহ দেখা যায় না। কি একটা রোগ আরোগ্য করিবার বীজাণু তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া বিলাতে আহূত হইয়াছেন। ফরাসী, জার্ম্মানী ইত্যাদি দেশেতে কোন কোন বিখ্যাত চিকিৎসক তাঁহার সম্পর্কে কি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, স্বামীর নিকট এই সব শুনিতে শুনিতে তৃষ্ণার কর্ণ নাকি বধির হইয়া গিয়াছে!

বেশ মোটা মাহিনা তাহার স্বামী পাইয়া থাকেন, কিন্তু

তাহাতে তৃষ্ণার বিশেষ লাভ হয় না। প্রত্যেক মাসে যে টাকা তাহার স্বামী আনেন, তাঁহার মাতাকে দিয়া থাকেন। মা যাহা দয়া করিয়া তৃষ্ণাকে দেন তাহাই তৃষ্ণার প্রাপ্য। আর সর্ব্বাপেক্ষা তাহার বিরক্তি জাগে, যখন সে দেখে সমস্ত দিবসের পর কর্ম্মক্লান্ত দেহে তাঁহার স্বামী আসিয়া বালকের ন্যায় মাতার কোলে মাথা রাখিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেন। এই সব ন্যাকামী তৃষ্ণার পক্ষে সহ্য করা কঠিন

কিরণ হাসিয়া বলিল, "তৃষ্ণা, তুমিও স্বামীর সঙ্গে বিলাত গেলে না কেন—জীবনে একটু বৈচিত্র্য আসত?" তৃষ্ণা বলিল,"সে চেষ্টা কি করিনি? তিনি বললেন, 'মার বেশী বয়স হয়েছে। আমি থাকব না—তোমার মাকে দেখা কর্ত্তব্য'।" কিরণ হাসিয়া বলিল "এঃ, একেবারে **hopelessly superannuated.**" তৃষ্ণা বলিল, "যা বলেছ কিরণ, জীবনে অনেক পেয়েছি—সাহিত্যসেবাতেও অনেক আনন্দ পেয়েছি। সোমনাথ দা অনেক কষ্ট করে আমাকে সব পড়িয়েছেন—তুমিও অনেক কষ্ট করছ। তুমি আমার লেখাকে অনেক এগিয়ে দিয়েছ—"

কিরণের বিরাট ঘরের স্তিমিত আলোকে মনে হইল যে, তৃষ্ণার সুন্দর মুখখানি নৈরাশ্যে ও দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিরণ তাহার আসন হইতে উঠিয়া তৃষ্ণার পিছনে আসিয়া তাহার ঘাড়ে হাত দিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "আমিও কম দুঃখী নয় তৃষ্ণা, তুমিও আমার জীবনে অনেক আনন্দ দিয়েছ—" আর কিছু বলিবে ভাবিতেছিল, এমন সময়ে ফটকে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। কিরণ বলিল, "চল, তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি—রাত্রি এগারোটা হয়েছে—আবার তোমার যা শ্বাশুড়ী" তৃষ্ণা কিরণের হা ধরিয়া উঠিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিল, "চল-

৭

মালা নিখিলেশের ফ্ল্যাটে আসিয়া দেখিল তাহার ক্ষুদ্র ক্যাম্প-খাটের দুই পাশে পুস্তক স্তূপীকৃত। দেওয়ালে সেতারটা একটি বিশ্রী ময়লা নেকড়ার থলিতে টাঙ্গানো। একটা চরকা, তাহার পাশে বিস্তর কাটা সূতা তাল পাকাইয়া রহিয়াছে।

দেওয়ালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী, সুরেন্দ্রনাথ, টলষ্টয়, দেশবন্ধু প্রমুখাৎ মহাপুরুষদের ছবি টাঙ্গানো রহিয়াছে কিন্তু একটি ছবিও সোজা ভাবে টাঙ্গানো নাই। পুরানো একটি এনামেলের চটা-ওঠা পেয়ালায় আগের দিনের খাওয়া চার খানিকটা তলানি পড়িয়া আছে।

টেবিলের উপর পুস্তকরাশি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। সম্মুখেই হার্বার্ট স্পেন্সারের এডুকেশন ও বারট্রাণ্ড রাসেল-এর এডুকেশন পাশাপাশি রহিয়াছে—দুইটিই নোটে ভরা। পাশে উড্রফের ভারতশক্তি ও রাসেলের ম্যারেজ ও মরাল্‌স্‌ও রহিয়াছে।

মালা আসিয়াই নিখিলেশের ঘর সুন্দর ভাবে সাজাইতে আরম্ভ করিল। সত্যকারের একনিষ্ঠ সাধকের ছাপ নিখিলেশের ঘরের প্রত্যেক বস্তুতে বর্ত্তমান। মালা অল্প আয়াসে ও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘর সুন্দরভাবে গুছাইয়া ফেলিল।

নিখিলেশ তাহার চাকরের সহিত বাজার করিয়া উস্কো-খুস্কো চুল, আধ ময়লা পাঞ্জাবী, ছেঁড়া চটী লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মালাকে দেখিল, দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "যা হোক এসেছ দেখছি।" তৎপরে ঘরের দিকে তাকাইয়া কহিল, "বা এর মধ্যেই বেশ গুছিয়ে ফেলেছ ত!" বলিয়াই হাসিয়া কহিল, "তুমি আমায় কিছুতেই আপ-টু-ডেট করতে পারবে না মালা।" মালা হাসিয়া বলিল, যদিও সে হাসির মধ্যে দুঃখই বেশী ছিল, আপ-টু-ডেট করব বলেই তো এসেছি।" নিখিলেশ হাসিয়া বলিল, "দেখ চেষ্টা করে—হাঁ তোমার মার বাতের কষ্ট কমেছে তো?" মালা বলিল, "এখন প্রায় গিয়েছে।" নিখিলেশ বলিল, "ভাল, তোমার মা কি বললেন যখন তুমি আসতে চাইলে?" মালা বলিল, "মা বললেন, নিখিলেশের বাড়ী যাবি তাতে আমার মতামতের দরকার কি?"

নিখিলেশ বলিল, "ভাল—আমি এখন আসি তবে। আফিসে গিয়ে চার দিনের ছুটী নিয়ে আসি।" নিখিলেশ চলিয়া গেল। সীতেশ চা রুটী ইত্যাদি দিয়া গেল।

নিখিলেশের মাতা ঘরে আসিয়া বলিলেন, "রুটী-টুটী খেয়ে নে, আয় তোর চুলগুলোয় তেল মাখিয়ে দি।" এই বলিয়া মালার কাছে আসিয়া বসিলেন।

* * *

সীতেশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌভাতের দিন মালা

অনেক গান গাহিয়াছে, গানের খুব সুখ্যাতিও হইয়াছে। কিরণকে মালা ও নিখিলেশ নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সে আসে নাই।

ফুলশয্যার রাত্রে যখন নববধূকে লইয়া সীতেশের ভগ্নী সীতেশের ঘরে দিয়া আসিল, তখন মালা বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। বধূর বয়স পনেরো কি ষোল হইবে, সলজ্জ ভাব—পায়ে মলের ঝুমুর ঝুমুর শব্দ, পাড়া-প্রতিবেশিনীদিগের মধুর কলহাস্য, সবই যেন মালা মুগ্ধ হইয়াই দেখিতেছে। এই হিন্দুর বিবাহ। মালা মনে মনে চিন্তা করিল যে, যাহারা বলে হিন্দুর বিবাহে কোন মনোহারিত্ব বা সৌন্দর্য্য নাই তাহারা নিতান্তই মূর্খ। তাহার অনেক পুঁথিগত ধারণা, যাহা কেবল-**abstract**-এর উপরে গঠিত এই **concrete**-এর সংঘাতে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

তৃষ্ণার স্বামী ডাঃ মৈত্র বিলাত হইতে আসিয়াছেন। মাতার নিকটে তৃষ্ণার অনেক নিন্দাবাদ শুনিয়াও তিনি বিশেষ কিছু বলিলেন না। মৈত্র-মাতা পুত্রের এই নীরব থাকাটা মোটেই পছন্দ করিলেন না, বরং বেশ চটিলেন।

বলা বাহুল্য যে, ডাঃ মৈত্র ইউরোপ ঘুরিয়া অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক মতামত এই অভিজ্ঞতার ফলে কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি ভারতের অতীতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা লইয়াই ফিরিয়া আসিয়াছেন। সত্যকারের মানুষের জীবনে তাঁহাদের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর ইহা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

তিনি আজ মহাবিপদে পড়িয়াছেন স্ত্রী আর মাতাকে লইয়া। একটা সামঞ্জস্যের বিশেষ প্রয়োজন।

তৃষ্ণার চরিত্র তিনি জানিতেন—তাহাকে শাসন বা তিরস্কার করিয়া কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না, বরং উল্টা উৎপত্তি হওয়ারই সম্ভাবনা।

সেই কারণে তিনি তৃষ্ণার কোন বিষয়ে বাধা দেন নেই। তিনি আজ তৃষ্ণাকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন "দেখ তৃষ্ণা, তুমি মাকে এত চটাও কেন? তাঁর চিন্তাধারা বা সংস্কার এ যুগে ঠিক খাপ খাবে না সেটা কি বুঝতে পার না? তোমার সব ব্যাপার যে তিনি ভাল চোখে দেখতে পারবেন না সেটা কি তোমার পক্ষে বোঝা এতই কঠিন?" তৃষ্ণা বলিল, "বুঝতে তো সবই পারি—কিন্তু প্রত্যহ এ গালাগালি, নির্য্যাতন সহ্য হয় না—তোমার অপূর্ব্ব মাতৃভক্তি কখনও তোমাকে আমার হয়ে দুটো কথাও মাকে বলাতে পারবে না।" মৈত্র সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, পরে বলিলেন, "তুমি যে ভাবে কিরণের সঙ্গে মেলামেশা করছ তাতে আমি কিছু বিশেষ মনে না করলেও মার কাছে সেটা ভাল বোধ হয় নি—তিনি যদি ঘৃণার চোখে এ ব্যাপারটাকে দেখে থাকেন তো দোষের কি হয়েছে? মার কি রাগের কোন কারণ নেই?"

তৃষ্ণা বলিল, "কি করব—এত কড়া শাসন আমার পক্ষে সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে—তাই বাড়ী ছেড়ে পালাই। তোমার কাছে বিয়ে হয়ে এসে অবধি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার মার আমাকে নিয়ে কেবল ঠাট্টা ও টিটকিরী, আর রাত্রে তোমার ডাক্তারী রিসার্চ্চের গবেষণা শুনতে শুনতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিরণ আমাকে পড়ায়, আমার লেখার সে ভক্ত, সে আমাকে বুঝেছে।" মৈত্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কি পড়ায়?" তৃষ্ণা সোৎসাহে বলিল "কেন, সেক্স সম্বন্ধে যা সোমনাথ দা পড়াতেন। সে শুধু আমাকে পড়াবার জন্য কত নূতন বই কিনেছে।" মৈত্র বলিলেন, "কেন, আমার তো এসব বই আছে। আচ্ছা আমার রিসার্চ্চের কাজ হয়ে গিয়েছে—এখন আমিই তো তোমাকে পড়াতে পারি।" এই কথা শুনিয়া তৃষ্ণার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এইটুকু সহানুভূতি সে যদি তাহার বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভে দশ বৎসর পূর্ব্বে পাইত, হয় তো তাহার জীবন অন্য ভাবে গঠিত হইত।

তৃষ্ণা সোৎসাহে বলিল, "সত্যি, তুমি আমায় পড়াবে বল?" মৈত্র স্ত্রীকে নিকটে টানিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" এই সময়ে মৈত্র-মাতা জগত্তারিণী গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "খোকা।" মার এই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে তৃষ্ণা ও মৈত্র উভয়েই শঙ্কিত হইলেন। মৈত্র শীঘ্র মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। মা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বাবা, আমি অনেক দিন এ সংসারে থেকেছি। এবার আমায় ছেড়ে দে, আমি কাশী গিয়ে পরকালের কাজ করি। আমার কি দরকার খোকা, এই সব গণ্ডগোল ঝগড়ার মধ্যে থাকবার—তুইও দেখছি আমার কথা আজকাল পছন্দ করিস নে।"

মৈত্র বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার জন্য মাতার আজীবন কষ্ট, ত্যাগ, ছাত্র-জীবনে তাঁহাকে যে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল তাহাতে যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে তো সবই তাঁহার মায়েরই প্রাপ্য, সে কথা মৈত্র কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারেন না। সেই মা জীবনের শেষ অঙ্কে তৃষ্ণার জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন! মার কথায় কোন উত্তর তিনি দিতে পারিলেন না—চোখ সজল হইয়া আসিল। জগত্তারিণীও কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে বলিলেন, "আমি যাব না কাশীতে, তুই কাঁদিসনে খোকা—আমি তো মরে যাইনি—কাঁদিস্নে, ষাট্ ষাট।" পুত্রকে চুম্বন করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি পূজায় গিয়া বসিলেন, পাছে সন্তানের অকল্যাণ হয়।

* * *

প্রায় দুই তিন মাস অতীত হইয়াছে। তৃষ্ণা নূতন উদ্যমে জীবন আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ঘরে টেবিলের পার্শ্বে মৈত্রের চেয়ার শোভা পাইতেছে। টেবিলের উপর **Sex Psychology, Experimental Psychology, Sociology** ইত্যাদি নানা বিষয়ক পুস্তক শোভা পাইতেছে।

তৃষ্ণার লেখাতে ইহারই মধ্যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তাহার লেখার ক্ষমতা চিরদিনই প্রতিভায় মণ্ডিত। কিন্তু আজ তাহার লেখার মধ্যে বেশ একটা সংযম, গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে, যাহা তাহার লেখাকে সত্যই স্থায়ী সাহিত্যে স্থান দিবে।

সে যখন তাহার পূর্ব্বলিখিত গল্প সব পাঠ করে তাহার নিজেরই আর ভাল লাগে না। কেবল তাহার মনে হয় যে, বিবাহিত জীবনের যে সুখ সে এতদিন পায় নাই তাহার জন্যই বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি রাগ ও বিতৃষ্ণা তাহার অনেক সূক্ষ্ম চরিত্রকে হীন ভাবে চিত্রিত করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে। লেখার মুন্সীয়ানাতে তাহা পাঠ্য হইলেও তাহাতে সত্যকারের বাঙ্গালীর প্রাণের পরিচয়ের অভাব। সে আজকাল শাশুড়ীকে অনেক কার্য্যে সাহায্য করে এবং মহাভারত ও রামায়ণ পাঠ করিয়া শোনায়।

একদিন ডাঃ মৈত্র সন্ধ্যার সময় আসিয়া দেখেন যে, তৃষ্ণা তাহার সব বিখ্যাত প্রেমের গল্পের বই আগুনে দিয়া খুব হাসিতেছে। ডাঃ মৈত্র হাসিয়া বলিলেন, "ও কি তৃষ্ণা ওগুলো পোড়ালে কেন, পাগল হ'লে নাকি? আমার যে কষ্ট হচ্ছে।" তৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "ওগুলো আমার পাগলামী আর হিষ্টিরিয়ার যুগের লেখা, এখন ও সব পড়লে আমারই রাগ হয়।"

মৈত্রও হাসিয়া উঠিলেন।

মেঘমালার সহিত নিখিলেশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে মালার মার আপত্তি ছিল। কিন্তু মালা এ বিবাহে সুখী হইবে বিবেচনা করিয়া নিখিলেশ ধনী ব্যারিষ্টার বা আই-সি-এস্ না হওয়াতেও সম্মতি দিয়াছেন। নিখিলেশের মা যখন এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন সম্মতি দান করিলে আজ এই বিবাহে মালার ঔৎসুক্য প্রকাশ করার ফলে তাঁহার মর্য্যাদায় যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা লাগিত না। যাহাই হৌক, এখন তিনি মালার বিবাহে সুখী না হইলেও অসুখী নন্।

মালাকে লইয়া যাইতে নিখিলেশ আসিয়াছে। সওদাগরের আফিসে ছুটী কম, অগত্যা তিন দিনের ছুটীতেই নিখিলেশের মধু-যামিনী কাটাইতে হইবে ও মালাকে লইয়া যাইতে হইবে

সোমনাথ এই নবদম্পতীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—তাঁহার পরিচিত বন্ধু ইন্দ্র ও তপন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সোমনাথের বাড়ীতে সম্প্রতি আর এক দম্পতী অভ্যাগত হিসাবে উপস্থিত আছেন। ইহাঁরা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, তৃষ্ণারাণী ও তাঁহার স্বামী ডাঃ মৈত্র।

সেদিন সন্ধ্যায় তৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "সোমনাথদা আপনার কথাই ঠিক—সাহিত্যে আধুনিক প্রগতির যে তোলপাড় তা শুধু দেশের আঁধিই বটে। যখন আসে তখন প্রলয়ের তাণ্ডব নিয়ে আসে, মনে হয় তখন ভেঙ্গে-চুরে ওলট-পালট করে দিয়ে যাবে—কিন্তু যেমন শীঘ্র আসে তেমনি শীঘ্র চলে যায়। ভাঙ্গাচোরার কিছুই লক্ষণ পাওয়া যায় না। কেবল খানিক ধূলো বালি রেখে যায়।" সোমনাথ বলিলেন, "বুঝেছ তো তৃষ্ণারাণী?" ডাঃ মৈত্র বলিলেন, "বোঝেনি, খুবই বুঝেছে—তা না হ'লে ওর নামজাদা সব প্রেমের মনস্তত্ত্বপূর্ণ গল্পগুলি সব পোড়াল?" সোমনাথ চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ বল কি সুরেশ—পোড়াল! তৃষ্ণা কাছে এস—কাছে এস।" তৃষ্ণাকে কাছে টানিয়া লইয়া মেঘনাথ বলিলেন, "Bravo তৃষ্ণা।" তৃষ্ণা সোমনাথের হাত ধরিয়া বলিল,—"সোমনাথদা আমার এ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আপনার মনোবিজ্ঞান কি বলে?" এর উত্তরে সোমনাথ হাসিয়া

বলিলেন "এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছে Sublimation, পরে সংস্কারের সাহায্যে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে—অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে তুমি যে সুখী হওনি এবং এই বিবাহিত জীবনের দুঃখ বা অতৃপ্তি, যাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে একটা **unapproved complex** বলে, সেই দুঃখটাকে দূর করবার জন্য সাহিত্যসেবার আনন্দ রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন যে **approved complex** তারই তুমি সাহায্য নিয়েছিলে। এই পন্থা বা প্রক্রিয়াকে মনস্তত্ত্ববিদরা **Sublimation** বলে থাকেন। এই **Sublimation**-এর ফলে মানুষের জীবনে বা সাহিত্যে অনেক বড় কাজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ঠিক **Sublimation** কাজ করতে পারে নি। সাহিত্য-সেবার আনন্দের মধ্যে তোমার গার্হস্থ্য জীবনের অশান্তি বা দুঃখ প্রবল ভাবে আক্রমণ করাতে তুমি উত্তেজনার বশে অনেক সময়ে **balance** হারিয়ে ফেলেছিলে। কিন্তু এখন তোমার **unapproved complex**টা আপনিই দূরীভূত হয়েছে, অথচ সাহিত্যসেবার আনন্দটা বর্ত্তমান। এই কারণে এই আনন্দের মধ্যে একটা **balance**, সংযম দেখা দিয়েছে—সেটা তোমার বর্ত্তমান প্রকৃতি। তোমার আগেকার লেখার সঙ্গে তোমার বর্ত্তমান প্রকৃতি খাপ খাচ্ছে না, সেই কারণে ঐ সব লেখার মধ্যে তুমি নিজেই অনেক অস্বাভাবিকতা দেখতে পাও, তাই নয় কি?" তৃষ্ণা বলিল, "অস্বাভাবিক শুধু নয়, নিছক পাগলামী ব'লে মনে হয়—**Sublimation** ঠিক হয়নি তা বুঝলাম। কিন্তু সংস্কার কি করে সাহায্য করলে তা তো বুঝতে পারছি নে সোমনাথদা?"

সোমনাথ হাসিয়া বলিলেন "তুমি যে বঙ্গনারী, হিন্দু রমণী তৃষ্ণা, ইবসেনের নোরা নও, তোমার মধ্যে প্রকৃতিগত সংস্কার রয়েছে যে, হিন্দু নারীর এক মাত্র প্রেয়, কাম্য—স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর সহানুভূতি, স্বামীর সাহচর্য্য, শ্বাশুড়ীর সহৃদয় ব্যবহার—এই সংস্কারের জন্য যেদিন তোমার সাহিত্য-সেবার আনন্দে সুরেশ যোগ দিয়েছে, যেদিন তোমার শ্বাশুড়ী তোমাকে "বৌমা" বলে সস্নেহে ডেকেছেন, সেই দিনই তুমি এমন সহজে এমন অনায়াসে স্বামীর হৃদয়ে শ্বাশুড়ীর কোলে ফিরে এসে শান্তির আনন্দ পেয়েছ—এ শুধু সম্ভব হয়েছে তুমি ভারতের নারী ব'লেই, অন্য দেশের হ'লে কখনই সম্ভব হত না, অন্ততঃ এই অল্প সময়ের মধ্যে—তাদের জাতীয় সংস্কার বাধা দিত, **Separation, Divorce**-এর ভূত এসে ঘাড়ে চাপ্‌ত।' ডাঃ মৈত্র হাসিয়া বলিলেন, "সোমনাথ দা আপনি নাকি সাত বছর বিলেতে ছিলেন?" সোমনাথ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সুরেশ, আমার বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর তোমার বৌদি তিন বছর মোট বেঁচে ছিলেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিতের মেয়ে - আমার শ্বশুর তাঁকে খুব যত্ন ক'রেই সংস্কৃত পড়িয়েছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে তোমার বৌদির কাছে আমার কত শিক্ষা হয়েছিল—তাঁরই কাছে আমি সংস্কৃত সাহিত্য পড়বার প্রেরণা পাই—তিনিই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কার কত দামী—নিঃস্ব করে আমায় চলে গিয়েছেন সুরেশ, একেবারে নিঃস্ব।" সোমনাথের চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। তৃষ্ণা সোমনাথের কাছে আসিল।

এই সময়ে বাহির হইতে "সোমনাথ দা" ডাক শোনা গেল। সোমনাথ শীঘ্র চশমা পুঁছিয়া উঠিয়া ডাকিলেন, "এস ইন্দ্র।" ইন্দ্র ও তপন আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃষ্ণা ডাঃ মৈত্রের সহিত ইহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তপন তৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরণের কি খবর?" তৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "আমার ইদানীং যে সব গল্প বেরিয়েছে তা পাঠ করে সে আনন্দ পায় না বলেছে আর সে বিবাহ করেছে।" সোমনাথ বলিলেন, "বাঁচা গিয়েছে।"

কিছুক্ষণ পরে নিখিলেশ ও মালা আসিল।

তৃষ্ণা মালাকে দেখিয়াই জড়াইয়া ধরিল আর বড় স্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ?" মালা বলিল, "ভাল আছি। কিরণ কেমন আছে—তার বৌ খুব বিদুষী বোধ হয়, না?" তৃষ্ণা হাসিয়া বলিল, "বিদুষী কি না জানি না তবে বড় কড়া স্ত্রী।" সোমনাথ বলিলেন, "কেন?" তৃষ্ণা বলিল, "কিরণ বিয়ের পর বলেছিল যে তার স্ত্রী পছন্দ করেন না, সে অন্য স্ত্রীলোকের সহিত বেশী সাহিত্য চর্চ্চা করে। তার বদলে তাঁর সঙ্গে সে সময়টা সংসার চর্চ্চা করলে সময় কাটে ভাল, জীবনে আনন্দ বাড়ে বৈ কমে না।"

মালা একদৃষ্টে তৃষ্ণার দিকে চাহিয়া ছিল।

তপন বলিল, "**Atmosphere** বড়ো **serious** হয়ে পড়েছে ইন্দ্রদা, একটা কমিক গান না হলে আর পারা যাচ্ছে না।"

ইন্দ্র গাহিল—

"Your Mills and Herbert Spencers
Failed to make you men sirs
You, for their precious sake made us
Forget our Geeta, our Sabitri and Seeta…"

তখন পুরুষদের দিক হইতে সোমনাথ গাহিয়া উঠিলেন—

"a terrible mistake our dears, a terrible mistake"

বিচিত্র জগৎ

—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

মাছের দেশ জাপান

গাঢ় অন্ধকার রাত্রি। সে রাত্রিকে উজ্জ্বল মশালের আলোয় ক্ষত-বিক্ষত করে 'নাগারা' নদীর ওপার দিয়ে চলেছে নৌকার বহর। মশালের রাঙ্গা আলোয় নদীর জল রক্তের মত দেখাচ্ছে, নৌকাগুলোকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত। বড় বড় যেন প্রহরীর মত এই কটি মানুষকে নিয়ে চলেছে। জলের ছলাৎছল আর ক্বচিৎ সামুদ্রিক পাখীর তীক্ষ্ণ চীৎকার ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা ভয়াবহ কিছু নয়। জাপানী ধীবরেরা শুধু মাছ ধরতে বেরিয়েছে। তাদের জাল নেই, কোন রকম
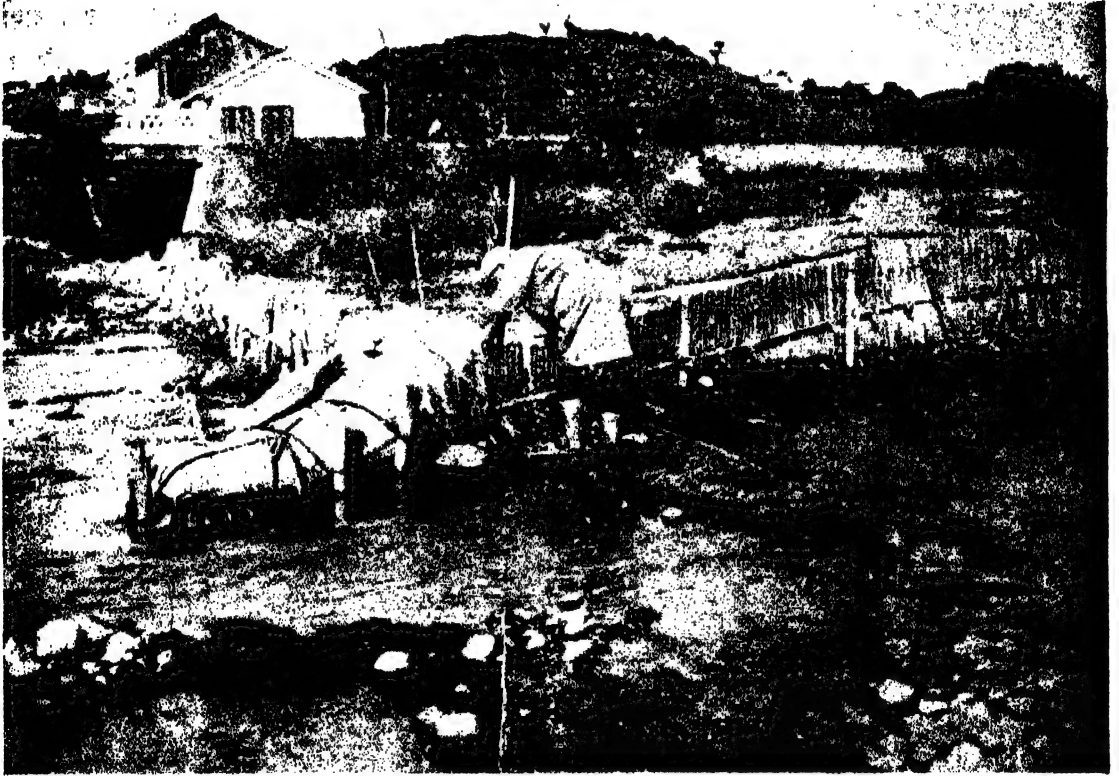
জাপানী ধীবরের মাছ ধরিবার এই পদ্ধতি বাঙ্গালা দেশে নূতন লাগিবে না। এই দেশেও বর্ষাকালে এমন 'দোয়াড়' পাতা পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।

সামুদ্রিক 'করমোরাণ্ট' পাখী প্রতি নৌকায় দশ বিশটা করে বসে আছে। আলোর রক্ত আভা লেগে তাদের কোন অপার্থিব জগতের প্রাণী বলে মনে হচ্ছে। নৌকার মানুষগুলি যেন নগণ্য। অন্ধকার রাত্রে কোন দুঃস্বপ্নের জগতে তারা ছিপও নেই। সামুদ্রিক 'করমোরাণ্ট' পাখীগুলির সাহায্যেই তারা মৎস্য শীকার করে। অনেকটা আমাদের দেশের উদ্বিড়াল সাহায্যে মাছ ধরার মত।

অন্ধকার রাত্রে জাপানী জেলেরা মশাল জালিয়ে নদীতে

নৌকা চালায়। এক একজন জেলে দশ পোনেরটি পাখী,

রান্নাঘরে মাছ কুটিতে ব্যস্ত জাপানী রমণী।

তাদের পায়ে বাঁধা সুতো দিয়ে পরিচালনা করে। মশালের আলোয় প্রলুব্ধ হয়ে মাছ ভেসে ওঠে নৌকার চারধারে আর শিকারী 'করমোরাণ্ট'গুলি বিদ্যুতের মত দ্রুত গতিতে ছোঁ• মেরে তাদের তুলে নিয়ে আসে। পাখীগুলির গলায় একটা লোহার আংটা লাগান। ছোট ছোট মাছ তারা নিজেরাই উদরস্থ করে, কিন্তু বড় মাছগুলিকে পারে না। সেগুলি জেলের প্রাপ্য। এই উপায়ে নৌকায় নেহাৎ অল্প মাছ ওঠে না। এক একটি পাখী ঘণ্টায় বড় বড় দু'শ মাছ ধরতে পারে। গড়ে ঘণ্টায় দেড়শ'র কম মাছ ধরা পড়ে না।

এই কাজের জন্য শিক্ষিত 'করমোরাণ্ট' পাখীর দাম খুব বেশী। আটশ থেকে দু'হাজার টাকায় তারা বিক্রী হয়। এই পেটুক সামুদ্রিক পাখীকে শিক্ষিত করে তোলা অত্যন্ত কঠিন। এক একটি পাখীকে তৈরী করতে দুটি বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম দরকার হয়।

এইভাবে পাখী দিয়ে মৎস্য শীকার কিন্তু জাপানের সর্ব্বত্র হয় না। শুধু গিফুর কাছে নাগারা নদীতে এই পদ্ধতি প্রচলিত। মে থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই ধরণে মাছ ধরা চলে এবং আইনতঃ মাত্র কুড়ি জনকে এই অধিকার দেওয়া হয়।

জাপানে মাছ ধরবার পদ্ধতি অনেক রকম। মাছ ধরার বিদ্যায় পৃথিবীর কোন জাতি তাদের সমকক্ষ বলে মনে হয় না। সমুদ্রই তাদের এ বিদ্যায় এমন পারদর্শী করে তুলেছে। মাটির চেয়ে সমুদ্র সেখানে অনেক বেশী অকৃপণ। সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগও তাদের চারদিক দিয়ে। জাপান সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূভাগ একত্র করলে বাঙ্গালা দেশের খুব বেশী হবে না, কিন্তু তার সমুদ্র-উপকূল সমগ্র ভারতবর্ষের সমুদ্র-উপকূলের
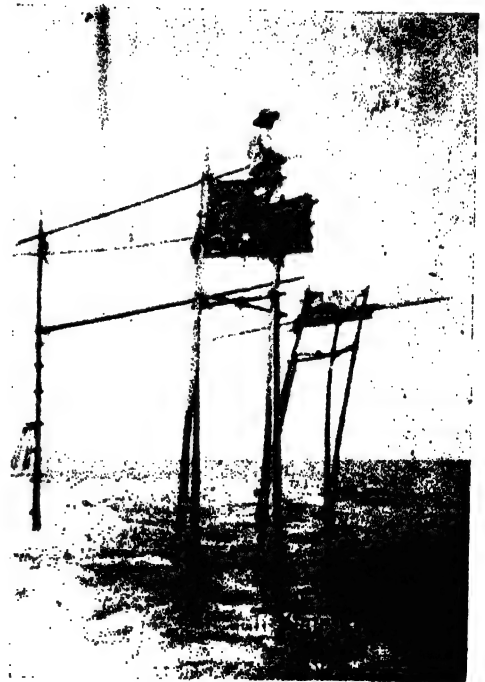
জাপানী ধীবরের 'উয়োমি' : ধীবর প্রহরীকে মাছের ঝাঁকের উদ্দেশে দণ্ডায়মান দেখা যায়।

চেয়ে অনেক বেশী। সমগ্র জাপান সাম্রাজ্যে তিন হাজারেরও বেশী দ্বীপ আছে। কোন দ্বীপের পরিধি ছয় মাইলের বেশী নয়।

জাপানের সমুদ্র মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীতে পূর্ণ। জাপান-সমুদ্রে নিজস্ব যে সব জাতির মাছ আছে, তা ছাড়া বিষুবরেখা ও উত্তর-মেরু প্রদেশ থেকে দুটি উষ্ণ ও শীতল সমুদ্র-প্রবাহ জাপান-সমুদ্রকে অজস্র নতুন মাছ উপঢৌকন দিয়ে যায়। বহু শতাব্দী ধরে জাপানে ধীবরের ব্যবসা উন্নতি লাভ করে আসছে। ধীবর সম্প্রদায়ের সেখানে মর্য্যাদাও অন্য শ্রমজীবীদের তুলনায় অনেক বেশী। সাহিত্যে বিশেষ করে তাদের স্থান গৌরবময়। বহু কাহিনী, বহু নাটক এই সদা-প্রফুল্ল শ্রেণী নিয়ে রচিত হয়েছে, প্রাচীন গাথায় তারা অমর হয়ে আছে।

তাদের জীবনযাত্রা হয়ত সব সময়ে সুখের নয়, কিন্তু তাতে বৈচিত্র্য আছে। সমুদ্রের ধারে তাদের গ্রামগুলি দেখলে এখনও প্রাচীন কালের কথা মনে পড়ে। সমুদ্রের কাছে পাহাড় থাকলে সেই পাহাড়ের উপর একটি জায়গায় এখনো সেই প্রাচীন কালের মত দেখা যায়, ধীবর প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত দিন। মাছের ঝাঁক উপকূলের দিকে এলে সে-ই প্রথম খবর দেয় সমস্ত গ্রামকে। দেখতে দেখতে ধীবরেরা এসে জড় হয় সমুদ্রতীরে। বিশাল জাল বয়ে দুটি প্রধান নৌকা তারপর সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে। মাছের ঝাঁকের আগে তাদের দূর সমুদ্রে পৌঁছোতে হবে। সেখানে পৌঁছে তারা জলে জাল নামিয়ে ক্রমশঃ পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। অন্য নৌকাগুলি এইবার মাছের ঝাঁককে তাড়িয়ে সেই জালের ভিতর ফেলবার ব্যবস্থা করে। নৌকাগুলি যখন অপর তীরে এসে পৌঁছোয়, তখন মাছের ঝাঁক তার ভিতর অধিকাংশ আটক হয়ে গেছে।

মাছের ঝাঁকের প্রতি লক্ষ্য রাখবার জন্যে এই রকম উচ্চ স্থানকে 'উয়ো-মি' বলা হয়। যেখানে পাহাড় নেই, সেখানে সমুদ্রতীরে বাঁশ দিয়ে এই রকম উঁচু মঞ্চ তৈরী করা হয়।

জাপানী ডুবুরী। সম্মুখে সীমাহীন সমুদ্রের অগাধ জলরাশিকে ইহাদের ভয় নাই।

ভাতের পর মাছই যে জাপানীদের প্রধান খাদ্য একথা বলাই বাহুল্য। মাছ বলতে তারা সামুদ্রিক সব প্রাণীই বোঝে। এ বিষয়ে তাদের রুচি অত্যন্ত উদার। তিমির মাংস, হাঙ্গরের মাংস, শঙ্খ ও ঝিনুক জাতীয় প্রাণী, অক্টোপাস ও সেই জাতীয় কাট্‌ল মাছ থেকে আরম্ভ করে শয়তান মাছ ও গায়ে ডুমো ডুমো বড়ি বসান বিকট চেহারার সামুদ্রিক প্রাণী পর্য্যন্ত অনেক কিছু তারা পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করে।

মাছের যে কোন বড় বাজারে গেলেই তাদের এই রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। নাগাসাকির মাছের বাজারই সব চেয়ে বড়। পৃথিবীতে এত বড় মাছের বাজার নাকি আর নেই। সেখানে কত ধরণের সামুদ্রিক প্রাণী যে আছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কোন দোকানে তিমির বড় বড় লাল মাংসের চাঁই বিক্রী হচ্ছে; কোথাও চৌবাচ্চায় বাচ্চা অক্টোপাস ও কাট্‌লমাছ কিলবিল করছে। চিংড়ি, কাঁকড়া, বড় বড় সামুদ্রিক মোচা-চিংড়ি কোথাও স্তূপাকারে সাজান। হাঙ্গরের মাংস ও তার ডানা চীনেদের মত জাপানীদের কাছেও অত্যন্ত উপাদেয় জিনিষ। ম্যাকেরেল, টুনি, বনিটো, সার্ডিন প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছ ত' আছেই, তাছাড়া শঙ্খ ও বড় বড় ঝিনুক জাতীয় প্রাণীও বাদ যায় না। এছাড়া আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাণ মাছ। জাপানীদের এটি অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। জাপানে অনেক সরাই আছে, শুধু বাণমাছ রান্নাই যাদের বিশেষত্ব। বাণ মাছের হোটেলে গেলে হোটেলের কর্ত্তা প্রথমেই অতিথিকে নিয়ে যাবেন একটি বৃহৎ চৌবাচ্চার কাছে, সেখানে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় সুপুষ্ট বড় বড় মাছ সাপের মত কিলবিল করছে। অতিথি যে মাছটি পছন্দ করবেন সেইটেই তাঁর জন্যে তৎক্ষণাৎ রান্না হবে। মাছ পছন্দ করার এই ব্যাপারটি জাপানীদের কাছে অনুষ্ঠানের মত। এ অনুষ্ঠান সাঙ্গ হবার পর একজন দাসী এসে অতিথিকে একটি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে পুরো একটি ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর তাঁর বাছাই-করা মাছটি রেঁধে ভাত ও বড় বড় গাজরের চাটনির সঙ্গে তাঁকে দেওয়া হয়।

বাণ মাছ শুধু নয়, অন্যান্য মাছের হোটেলও আছে। বিশেষ একটি মাছের রান্নাতেই তাদের সুনাম। এ সমস্ত হোটেলের খুব পসার। জাপানীরা মাছের অত্যন্ত ভক্ত। সিমোনোসেকিতে কয়েকটি হোটেল আছে, শুধু 'ফুগু' নামে একরকম গোল মাছ রান্নার জন্যে। এ মাছের রক্ত ভয়ঙ্কর বিষ। মাছটি সম্পূর্ণ ভাবে পরিস্কৃত ও ধৌত যদি না হয়, তাহলে তার এক বিন্দু রক্ত মানুষের পেটে গিয়ে সর্ব্বনাশ করতে পারে। প্রতি বৎসর 'ফুগু' মাছ খেয়ে অনেক লোক মারা যায়। কিন্তু তবু জাপানীরা এ মাছের লোভ ত্যাগ করতে পারে না, হোটেলগুলির ভীড় কমে না।

আরও অনেক জিনিষের মত রান্নায়ও জাপানীরা অসাধারণ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার পরিচয় দেয়। আহার্য্য দ্রব্য শুধু সুস্বাদু হলেই চলবে না, সুন্দর ভাবে সাজান হওয়া দরকার। জাপানীতে একটি প্রবাদ আছে যে, খাবার চাখতে হয় চোখ দিয়ে। ভাল যে কোন হোটেলে কিম্বা সাধারণ মধ্যবিত্ত কোন গৃহস্থের বাড়িতে খাবার সাজান দেখলেই, এ প্রবাদ যে তারা মানে তা বোঝা যায়। সাধারণ মূলো, গাজর বা তরী তরকারীও তারা সোজাসুজি পাতে দেয় না। তাদের হাতে ছুরি চালানর কৌশলে এ সমস্ত অপরূপ ফুলের মত দেখতে হয়। প্লেটের ওপর তাদের মাছ সাজান একটা দেখবার মত জিনিষ। একরকম মাছ রান্নার নাম 'নোবোরি তাই'—এর মানে হল, উজান বেয়ে মাছের সাঁতার। প্লেটের ওপর রান্না মাছ এমন ভাবে সাজান থাকে যে দেখলেই মনে হয় এখনি সেটি লাফ দিয়ে পালিয়ে যাবে। আহারের বর্ণবিন্যাসের ওপরও তাদের লক্ষ্য আছে। মাছের রঙের সঙ্গে ঝোলের বা 'কাই'এর রঙের মধুর সামঞ্জস্য করতে তারা জানে।

জাপানী রান্নার মাছই সর্ব্বেসর্ব্বা। সব কিছুতেই তাদের মাছ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আহার ছাড়া মাছের অন্য ব্যবহারও সে দেশে আছে।

লাল, নীল মাছ সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে বড় জাতের পাওয়া যায় জাপানে। জাপানী বাড়িতে এই পোষা মাছের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। এই মাছের চাষ সেখানে অনেক কাল থেকে হয়ে আসছে। নানা অপরূপ চেহারার মাছ তারা তৈরী করে তুলেছে বহু যুগের সাধনায়। শুধু তাই নয়, এই মাছের চামড়াও তারা কাজে লাগিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিলাসীদের দোকানে এক রকম অত্যন্ত দামী জুতো পাওয়া যায়, সে জুতো জাপানের কিয়োটো নগরের লাল নীল মাছের চামড়ায় তৈরী।

এভারেষ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী—আম্‌নি মাচেন

পৃথিবীর মানচিত্র সামনে খুলে ধরলে আজকের দিনে মনে হয় তার সমস্তটাই ভরে গেছে নিখুঁত বিবরণে। মানুষের অনুসন্ধিৎসার আজ আর কোথাও এতটুকু সুযোগ নেই।

কিন্তু মানচিত্র কখনো সম্পূর্ণ সত্য কথা বলে না। কাগজের ওপর রঙের তুলির টান অনেক দুর্গম স্থানের দুরধিগম্যতা ঢেকে দেয়, অনেক অজ্ঞাতদেশের অনাবিষ্কৃত রহস্য তার তলায় চাপা পড়ে যায়।

একশ বছর বাদে কি হবে বলা যায় না, কিন্তু এখনো পৃথিবীতে দুঃসাহসীদের যাবার জায়গা আছে। শুধু যে মানচিত্রের অনেক ফাঁকা যায়গা এখনো ভরাট করবার আছে তা নয়, অনেক রেখা, রঙ তার শোধরাতেও হবে। অনেক পাহাড় বসাতে হবে নূতন করে, অনেক নদীর রেখাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আরও দূরে, অনেক অরণ্যকে প্রসারিত করে দিতে হবে অজানিত দিকে।

মানচিত্রের ছোট ছোট সংশোধনের কাজ নিতাই চলেছে, আশ্চর্য্য তাতে হবার কিছু নেই। আশ্চর্য্য হতে হয় এই দেখে যে, এখনো শুধু সংশোধন নয় বড় বড় সংযোজনও তাতে হয়। ট্রান্স-হিমালয়ার মত বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর চিহ্ন এসিয়ার মানচিত্রে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে কেন যাত্রা সুরু করেছে তার রহস্য সোয়েন হেডিনের জন্যে সেদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেছিল।

মাত্র পাঁচ বছর আগে সভ্য জগতকে এক মার্কিন বৈজ্ঞানিক পর্য্যটক এক সংবাদ দিয়ে বিস্মিত করেন ;—উচ্চতায় এভারেষ্টের সমান এক গিরিশৃঙ্গ আবিষ্কারের গৌরব তিনি প্রথম লাভ করেছেন। এ শৃঙ্গ হিমালয়ের নয়, তিব্বত ও চীনের সীমান্তবর্ত্তী আম্‌নি মাচেন্ পর্ব্বতমালার।

তিব্বত ও চীন যেখানে মিশেছে সেখানকার এই পর্ব্বতমালার কথা সভ্য জগতের এতদিন কিছুই জানা ছিল না। একমাত্র হিমালয় ছাড়া এত উচ্চ গিরিশৃঙ্গ যে কোথাও থাকতে পারে একথা কেউ কল্পনাও করেন নি। দুর্গম এই অজ্ঞাত প্রদেশে দুর্দ্দান্ত হিংস্র ন্‌গোলক জাতি অভ্রভেদী এই গিরিশৃঙ্গের রহস্য সযত্নে পাহারা দিয়ে এসেছে।

তিব্বত-সীমান্ত : হোয়াংহোর যাত্রাপথে বিরাট গিরিগুহা। তলদেশে দণ্ডায়মান মনুষ্যের তুলনায় ইহার উচ্চতার পরিমাপ বুঝা যাইবে।

ন্‌গোলক জাতি সংখ্যায় একলক্ষের বেশী হবে না, কিন্তু তারা নির্ম্মম দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার জাতি। চীনারা ভয়ে তাদের কাছ ঘেঁষে না, তিব্বতী অসভ্য জাতিরাও পারতপক্ষে তাদের ঘাঁটাতে সাহস করে না। সভ্য জগতের কৌতূহলী দৃষ্টির বাইরে এই প্রদেশেই তারা তাদের নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে। কিন্তু তার প্রতিধ্বনি পর্য্যন্ত আমাদের কানে পৌছোয় না।

মার্কিন পর্য্যটক জোসেফ রক দৈবাৎ এই গিরিশৃঙ্গের কথা শোনেন আর এক বিখ্যাত পর্য্যটকের মুখে। ১৯২৩ সালে তিনি বর্ম্মা থেকে একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানে দক্ষিণপূর্ব্ব তিব্বতে যাচ্ছিলেন, পথে বিখ্যাত ইংরাজ পর্য্যটক জেনারেল জর্জ্জ পেরেইরার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় য়ুনানে। পেরেইরার পিকিং থেকে 'লাসা' পর্য্যন্ত বিখ্যাত অভিযান তখন সাঙ্গ হয়েছে। তিনিই মিঃ রক্‌কে এই বিস্ময়কর পর্ব্বতচূড়ার সন্ধান দেন ও হিংস্র ন্‌গোলক জাতির কথা জানান।

জেনারেল পেরেইরার নিজেরই এ পর্ব্বতমালা আবিষ্কার

করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মৃত্যু এসে তাকে বাধা দিল। তিব্বত ও চীনের তুষারাবৃত সীমান্তে, পথেই হল পথিকের সমাধি।

আম্‌নি মাচেন আবিষ্কারের চেষ্টা এর পূর্ব্বেও একবার নিষ্ফল হয়েছিল। রুষ পর্য্যটক রোবোরভস্কি এই পর্ব্বতমালার সন্ধানে এসেই মাঙ্গুন গিরিসঙ্কটের কাছে হিংস্র তিব্বতীদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন।

মানুষের কৌতূহলের ওপর পর্ব্বতের দেবতার বুঝি অভিশাপ আছে। কিন্তু সে অভিশাপ দুঃসাহসীকে নিরস্ত করতে পারে না। জোসেফ রক ১৯২৯ সালে সেই পর্ব্বতমালার সন্ধানেই অভিযান করেন। পর্ব্বতের দেবতা এবার বুঝি ছিলেন প্রসন্ন। আম্‌নি মাচেন শৃঙ্গ পৃথিবীর মানচিত্রে চিহ্নিত হল।

কিন্তু এ অভিযান সার্থক হলেও সহজ হয়নি। জোসেফ রককে আম্‌নি মাচেনের সন্দর্শনলাভের জন্য অনেক পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি যখন পথে বেরিয়েছেন, তখন সিনিংএর মুসলমানদের সঙ্গে সেদিকের তিব্বতীদের লড়াই চলেছে গাঞ্জার সমতল ভূমিতে। সে যুদ্ধের বিবরণ শুনলে মনে হয় জেঙ্গিস খাঁর আমলে আমরা ফিরে গেছি। পৃথিবীর এই স্বল্পপরিচিত অংশে মানুষ যে কি ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করে, তারও আভাস সে বিবরণে পাওয়া যায়। তিব্বতীরা প্রথমে সিনিংবাসীদের যুদ্ধে হটিয়ে দিয়েছিল, তারপর কিন্তু কোকোনরের শাসনকর্ত্তা মা চিনের অধীনে পরাজিতেরা আবার শক্তি সংগ্রহ করে এল এগিয়ে। তিব্বতীরা তাদের রুখতে পারলে না। তিব্বতীদের মধ্যে যারা ধরা পড়ল, বুড়ো আঙ্গুলে দড়ি বেঁধে টাঙ্গিয়ে জীবন্ত অবস্থায় তাদের উদরপ্রদেশ কেটে ফেলে উষ্ণ পাথর ভরে দেওয়া হল। বিজয়ীরা নারী ও শিশু কাউকে রেহাই দিলে না।

হোয়াংহোর তীরে তিব্বতী লামাদের মঠ।

রক সাহেব বলেছেন, তিব্বতীদের একজন ভাল নেতা থাকলে তারা অনায়াসে সিনিংবাসীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারত। কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার সহযোগিতা নেই। বীরত্বে তারা কম যায় না। নগুরা নামে যাযাবর এক দুরন্ত তিব্বতী জাতির অশ্বারোহী সৈনিকেরা এই যুদ্ধে শুধু তাদের বিশহাত লম্বা বর্শা দিয়ে যত শত্রু সংহার

করেছিল, বন্দুকের গুলিতে তত মরে নি। কিন্তু সুশিক্ষিত মোসলেম সৈন্যদের কাছে তারা শেষ পর্য্যন্ত পরাস্ত হল। লাব্রাঙ মঠ পড়ল মা চিনের হাতে।

যুদ্ধের পর লাব্রাঙের ভয়ঙ্কর পৈশাচিক দৃশ্যের বর্ণনা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। সৈনিকদের ছাউনির সামনে কাঠের খুঁটিতে শিশু ও নারীর ছিন্নমুণ্ড বসান। ছাউনির দেয়ালে মালার মত তিব্বতীদের ছিন্নশির সাজান। বিজয়ীরা সহরের মধ্যে বিভীষিকা-সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকে দশ পোনেরটি করে নরমুণ্ড দুপাশে ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে ঘুরল কয়েকদিন।

জানাতে অধ্যক্ষ বিদেশীর অজ্ঞতায় একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেছিলেন—'আছে তুমি জান না, আমাদের শাস্ত্রে যে লেখা আছে।' মঠাধ্যক্ষ রক সাহেবকে ভূগোল শিক্ষা দেওয়ারও চেষ্টা করছিলেন। পৃথিবী চ্যাপ্টা ও সমতল এবং তার মাঝখানে আছে বিশাল এক পর্ব্বত। সূর্য্য তারই পেছনে অস্ত যায়—এই হল তাঁর শাস্ত্রীয় ভূগোল।

এদেশে মানুষের অবস্থা শোচনীয়। মনের ও বাইরের দারিদ্র্য তাদের অপরিসীম। কুসংস্কারে যেমন তাদের মন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি অপরিচ্ছন্ন তাদের দেহ ও বাসস্থান।

অভ্রভেদী আম্‌নি মাচেন চূড়া: উপরে মেঘের খেলা দ্রষ্টব্য।

নিত্য যারা আতঙ্কের মধ্যে বাস করে এই নৃশংসতা তাদের ভয়ের দুর্ব্বলতারই বিকৃত প্রকাশ।

শুধু নৃশংসতা নয়, তিব্বতের এই সীমান্তের লোকের অজ্ঞতাও অসাধারণ। তারা পৃথিবীর কোন খবর এখনও পায়নি। লাব্রাঙ মঠের অধ্যক্ষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বৃদ্ধ লামা মিঃ রককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'তুমি অনেক দেশ ঘুরেছ শুনছি। যে দেশের মানুষের ভেড়া গরু কুকুরের মত মাথা হয়, সে দেশে গেছ কখনও!' রক সাহেব তেমন দেশ নেই

এত নোংরা জাত পৃথিবীতে আর কোথও বোধ হয় নেই।

কিন্তু মানুষ যেমন কুৎসিত, প্রকৃতি তেমনি অপরূপ। মানুষকে ছোট করে প্রকৃতি এখানে নিজেকে বিশাল ভাবে প্রকাশ করেছে। সুউচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশের মাঝে গিরিনদী হোয়াংহোর দুরন্ত ধারার সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। চারিদিকে তার অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, তবু উন্মত্ত অভিসারিকার মত দুর্দ্দম প্রেরণায় সে এসেছে বেরিয়ে, ছুটে চলেছে গহন অরণ্যের ভেতর দিয়ে, নির্ভয়ে ঝাঁপ দিয়ে

পড়েছে পর্ব্বত থেকে পর্ব্বতে। বিশাল পাষাণপ্রাচীর তাকে রোধ করতে পারেনি, সমস্ত বাধা সে তুচ্ছ করেছে। এই প্রদেশে সভ্য মানুষের পদধূলি কখনও পড়েনি। রক সাহেব সেখানে অপরূপ সব পুষ্প-তরু পেয়েছেন, যার নাম এখনও বিজ্ঞান জানে না, এমন সব পশুপক্ষীর সন্ধান পেয়েছেন যা সভ্য মানুষ এখনও দেখেনি। ভারবাহী চমরীর বাহিনী নিয়ে সুদীর্ঘ পর্য্যটনের পর বহু বিপদ পার

সে যাযাবর জাতীয় পার্ব্বত্য একজন তিব্বতী। মিঃ রকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করে সে উঠে এল উপরে, তারপর আমনি মাচেনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জ্বালিয়ে দিলে পার্ব্বত্য তরু জুনিপারের একটি শাখা। নতজানু হয়ে তারপর সে আমনি মাচেনের উদ্দেশে তিনবার প্রণাম জানালে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। আমনি মাচেন সুউচ্চ একটি গিরিশৃঙ্গ মাত্র নয়, ওখনকার সমস্ত দুর্দ্দান্ত জাতির মহান

হোয়াংহোর সর্পকুণ্ডলী।

হয়ে অবশেষে রক সাহেব আমনি মাচেনের দেখা পেলেন। শুভ্র তুষারাবৃত তিনটি শৃঙ্গ উঠেছে ঘন নীল আকাশে, কল্পনাতীত কোন বিশাল মন্দিরের চূড়ার মত। তাদের নাম দ্রান্দেল রংসুথ, সেন রেজিন্ ও আমনি মাচেন।

বিজ্ঞানের দিক থেকে মিঃ রক যখন এই নব আবিষ্কৃত বিশাল গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা নিরূপণ করছেন তখন আর একটা লোক অন্য এক দিক থেকে সেই গিরিশিখরে উঠছে।

দেবতা।

মিঃ রক বিস্মিত হয়ে কাজ থামিয়ে এই অসভ্য তিব্বতীর দিকে চেয়ে ছিলেন। কে জানে সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই যাযাবর অশিক্ষিত তিব্বতীর দৃষ্টি হয়ত বিজ্ঞানের চেয়ে গভীর! তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালার উদ্বেলিত স্থির সমুদ্রের মাঝে শান্ত-সমাহিত এই নিঃসঙ্গ অভ্রভেদী গিড়িচূড়াকে সেই যথার্থ রূপে দেখতে জানে।

পরিহাস

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দোতলার ঘরের জানালার নীচেই ছোট এক-তলা বাড়ী—বাড়ীর সঙ্গে খানিকটা খোলা জমি। সেই জমিতে ছোট ফুলের বাগান। বাড়ীখানি রমেশ চক্রবর্ত্তীর।

রমেশ চক্রবর্ত্তী খৃষ্টান ; মিশন স্কুলে লাইব্রেরীয়ানের চাকরি করে। মাহিনা সামান্য। রমেশের স্ত্রী সুধীরা বড় লক্ষ্মী। সংসারে কাজ আছে—তার উপর পাড়ার মেয়েস্কুলে টীচারী ; এবং কাজ-কর্ম্মের অবসরে নিজের হাতে বাগানখানির পরিচর্য্যা করে। মরশুমী ফুলের দিন বাগানে যে বর্ণ-সুষমার সৃষ্টি হয়, পাশের দোতলা বাড়ীর মালিক নৃপেন সান্যাল তাহার দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া ভাবে, পয়সা থাকিলেই জীবনে সুখ পাওয়া যায় না—সুখের মূল ভিন্ন মাটীতে গজায়।

রমেশ খৃষ্টান, নৃপেনও তাই। পাড়াটায় বাঙালী খৃষ্টানদের বাস। নৃপেন চাকরি করে এক বড় সওদাগরী অফিসে। মাহিনা অসামান্য না হইলেও আজকালকার দিনে সামান্য নয়।

পৌষ মাস। সুধীরার বাগানখানিতে প্যান্সি, পপি, লার্ক্‌স্পার, ডালিয়া প্রভৃতি রঙীন ফুলে অজস্র বাহার খুলিয়াছে। দোতলা বাড়ীর ঘরে জানালার সামনে দাঁড়াইয়া নৃপেন সান্যাল নিজের হাতে দাড়ি কামাইতেছে, আর মাঝে-মাঝে নীচেকার বাগানের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকাইয়া দেখিতেছে।

আটটা বাজিয়া গিয়াছে। সুধীরা নিত্যকার মত ঝরা লতা-পাতা কুড়াইয়া বাগান পরিষ্কার করিতেছে। এটুকু তার নিত্য-কর্ম্ম। তারপর সে চলিয়া যায় স্নান করিতে ; স্নানের পর একবার আসিয়া বাগানে দাঁড়ায়। ওদিক হইতে ডাক আসে—ওগো! সুধীরা চলিয়া যায়। তারপর সুরু হয় তার দিনের কাজ। রান্নাবান্না ; স্বামীকে খাওয়াইয়া অফিসে পাঠানো ; ছোট একটি ছেলে, তারক—তার স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা এবং অবশেষে নিজে আহারাদি সারিয়া চাকরি রাখিতে বাহির হয়। পরণে বাগেরহাটের শাড়ী, গায়ে ছিটের একটি ব্লাউশ—নিত্য এক পোষাক। পরিয়া যায়, ফিরিয়া আসিয়া কাচে—কাচিয়া ইস্ত্রী করে এবং যখন বাহির হয়, তখনি পরিচ্ছন্ন বেশ। এগুলা নৃপেন সান্যালের অজানা নয়। পাশাপাশি বাস—এবং নিজের সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখিয়া দেখিয়া তার মন পাশের বাড়ীর এই অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা-পারিপাট্যে মোহিত হইয়া আছে। সুধীরাকে নিত্য দেখিয়া দেখিয়া তার এমন ভাল লাগিয়া গিয়াছে যে···

কথাটা প্রকাশ করিলে দোষ। কিন্তু নৃপেন ভাবে, যদি সংসারে অদল-বদল সম্ভব হইত তো সে তার এই গৃহ, সুন্দরী পত্নী নীলিমা—সব ছাড়িয়া পাশের ঐ ছোট বাড়ীটিতে সুধীরার পাশে গিয়া আশ্রয় লইত। দিন আরামে কাটিত।

আজ দাড়ি কামাইতে কামাইতে বাগানে সুধীরাকে দেখিয়া সেই কথাই তার মনে হইতেছিল। পাশের ঘরের দরজা এখনো ভেজানো। খড়খড়ি বন্ধ। স্ত্রী নীলিমা এখনো শয্যা ছাড়িয়া ওঠে নাই। মায়ের দেখাদেখি মেয়ে দীপ্তিও বিছানায় পড়িয়া আছে। দীপ্তির বয়স আট বৎসর। এ বয়সে এতখানি আলস্য—নৃপেন সান্যাল কত অনুযোগ করে,—এত-বেলা অবধি শুয়ে থাকিস্ কেন দীপ্তি···?

নীলিমা ঝঙ্কার তুলিয়া জবাব দেয়,—উঠে কি করবে, শুনি? শীত-কাল। ওকে তো পরের চাকরি করতে যেতে হবে না! লেপ ছেড়ে যদি উঠতে নাই চায়···

নৃপেন চুপ করিয়া যায়। মনের মধ্যে বিরক্তির শিখা রী-রী করিতে থাকে। মেয়ে তার মায়ের মত এমনি আলস্যে বাড়িয়া ওঠে, নৃপেন চায় না। কিন্তু উপায় কি?

তাই যখন পাশের বাড়ীটির দিকে সে চাহিয়া দেখে, ওখানে কখন ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে—কখন ওখানে জাগিয়াছে···

নীলিমা এমন—হয়তো তারি দোষে। যেদিন নীলিমা প্রথম আসিয়া পাশে দাঁড়ায়, সেদিন সে ছিল শুধু প্রেয়সী··· প্রিয়া···জীবনের কুঞ্জখানিকে শুধু প্রেমের কল-গানে মুখরিত রাখিবে। সেদিন সংসারের কথা মনে জাগে নাই—যে-সংসারে কাজ করিতে হয়—যে-সংসারে যার যা কাজ, নির্দ্দিষ্ট থাকে।

নীলিমা উঠিত বসিত, নৃপেন দেখিত, তার দেহে মাধুরী-ছন্দ, নৃত্যের দোলা। তার অঙ্গ যাহাতে যৌবন-শ্রীতে লীলায়িত হইয়া ওঠে, সেজন্য নৃপেন্দ্রর যত্নের ত্রুটি ছিল না। বিলাতী ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া রাজ্যের ক্রীম, রুজ, পাউডার, লোশন; নানা ছাঁদের অঙ্গাবরণ আনিয়া সে নীলিমাকে সাজাইত। নীলিমা ছিল তার যৌবন-বিলাসের সামগ্রী···

তারপর আসিল দীপ্তি, টুটুল—সঙ্গে সঙ্গে গৃহ ভরিয়া গেল দাস-দাসীতে। এ-ব্যবস্থা সে-ই করিয়াছে। নীলিমাকে যেন এতটুকু কাজের ভার না সহিতে হয়!

আজ নৃপেনের হাতে-রচা সে কুঞ্জখানিতে নীলিমা যদি ফুলের মত ফুটিয়া থাকে তো তাহাতে নীলিমার অপরাধ? নৃপেনের চোখের নেশা কাটিয়াছে বলিয়া নীলিমা নিজের জীবনটাকে আজ উল্টাইয়া দিতে পারে না তো!

ও-বাড়ীর সুধীরা··· ?

নৃপেন বিছানা ছাড়িয়া ওঠে খুব সকালে। উঠিয়া কাছাকাছি একটু বেড়াইয়া আসে। ফিরিবার সময় দেখে, রমেশের বাড়ীতে বাহিরের ঘরে টেবিল পাতা; রমেশ বসিয়াছে, তার পাশে ছেলে তারক; সুধীরাও আছে। তিনজনে বসিয়া চা পান করিতেছে। তারপর কাজ···

শীত শুধু তাদের গৃহেই পড়ে নাই। শীতের সকালে লেপের আরাম শুধু তার গৃহেই আঁটা নাই। অথচ ঐ সুধীরা—তারো বয়স বেশী নয়। নীলিমার চেয়ে সে দু'এক বৎসরের ছোট বৈ বড় হইবে না।

সুধীরার স্বামীর রোজগার কম। সুধীরাকেও চাকরি করিতে হয়। গৃহে দাস-দাসীর অভাব। তা হোক। তবু যদি আরো খানিকক্ষণ সুধীরা বিছানায় পড়িয়া থাকে তো তার সংসারের কোথাও সেজন্য বাধিবে না। ঐ তো তিনটি প্রাণী।

নৃপেনের সংসারে একটি মেয়ে শুধু বেশী।

সুধীরার কি প্রয়োজন ছিল ঐ বাগান রচিবার? ও সময়টুকু অনায়াসে বিছানায় সে পড়িয়া থাকিতে পারিত! তা থাকে না। কাজের দিকে সুধীরার যে এই অনুরাগ—ইহাতেই সুধীরাকে নৃপেনের এত ভাল লাগে।

*

পথে রমেশের সঙ্গে নৃপেনের দেখা হয়। ছেলেবেলা হইতে পাশাপাশি বাস। নৃপেন বলে,—ভাল তো?

হাসিয়া রমেশ জবাব দেয়—ভাল।

নৃপেন বলে—বাগানখানি বেশ করেছো।

রমেশ জবাব দেয়,—ওঁর সখ। একটা-না-একটা কাজ নিয়ে আছেন। সংসারও ওঁর। আমার কি-বা রোজগার! এই যে জামা গায়ে দেখছ—উনি তৈরী করেছেন। ওঁর চেষ্টাতেই দু'পয়সা আসছে। ন্যাকড়ার ফুল তৈরী করেন—বাজারে ভাল দামে বিক্রি হয়। তার পর টেবল্ ক্লথ, পর্দ্দা, লেশ···এমন স্ত্রীর দাম আমি বুঝলুম না! খেটে সারা হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা।

নৃপেনের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে বলিল,—একটু বিশ্রাম দেওয়া ভাল।

রমেশ হাসিল, হাসিয়া জবাব দিল—তা যদি বল তবে বলি ভাই,—মেয়েদের কাজ-কর্ম্মের চাপে রাখাই উচিত। অবসর পেয়ে পা মেলে বসলেই কেবল সংসারের নানা ছল ধরবেন! স্ত্রীচরিত্র···

তাই কি?

নৃপেন চুপ করিয়া রহিল। কথাটা তার জীবনে খাটিয়াছে বটে! নীলিমাকে এত দিয়াও কোনদিন সে শুনিল না, নীলিমা খুশী-মনে বলিল—ওগো—

না! নীলিমার অনুযোগের অন্ত নাই। কি সে চায়, তাও যদি প্রকাশ করিয়া বলিত।

নৃপেন ভাবে, বলিলে একবার সে চেষ্টা করিয়া সেই জিনিষ আনিয়া নীলিমার হাতে দেয়। দিয়া দেখে, হাসি-মুখে নৃপেনকে সে অন্তরের আনন্দ জানায় কি না, তৃপ্তি তার মেলে কি না।

রমেশ বলিত,—তোমার কি ভাই? পয়সা আছে—অভাব নেই। আমাদের মত···

নৃপেন্দ্র মনে মনে বলিত, তুমি মূঢ়। তোমার স্ত্রী যে হাসি-মুখে সংসারের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন—সংসারে এমন সৌষ্ঠবশ্রী, এমন পরিপাট্য! এমন স্ত্রী যার গৃহে, তার আবার দুঃখ কোথায়? তর্কের বা বিরোধের একটা উঁচু কথা সে কোন দিন কানে শোনে নাই। সে তো ও-সংসারে গন্ধ বসিয়াছে। কি পরিপূর্ণ তৃপ্তি ওখানে।

অথচ রমেশ! সামান্য আয়। তার উপর তার যে স্বভাব। বেশভূষায় চাকচিক্য। আর জানে তাসের আড্ডা আর রেসের মাঠ। হতভাগা! এমন হতভাগা স্বামীকে একটা রূঢ় কথা সুধীরা কখনো বলিয়াছে! ও বাড়ীর দিকে অনেক বার মনোযোগ রাখিয়াও নৃপেন সুধীরার মুখে তার দুর্নাম বা কোন অনুযোগ কোনদিন শোনে নাই। স্বামী-স্ত্রীকে এক জায়গায় দেখিয়াছে কত দিন—সুধীরার মুখ চিরদিন দেখিয়াছে হাসিতে উজ্জ্বল।

মূর্খ রমেশ! সে তার এত-বড় সম্পদের কোন সংবাদ রাখে না। বোঝে না, সে কি ভাগ্যবান। নহিলে সংসারের কথা উঠিলে সে অনুযোগের সুর তোলে? নৃপেনের সুখে বিভোর থাকে? জানে না, নৃপেনের গৃহে শান্তি নাই। তুচ্ছ কথায় নীলিমা কি কলরব না তোলে। তার অপব্যয়ের অন্ত নাই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাস-দাসী ···খরচ বাড়িয়া চলিয়াছে। ছেলেমেয়েরা ডাগর হইতেছে —তাদের লেখাপড়া শেখানো···মেয়ের বিবাহ···একটু বুঝিয়া চলার কত দরকার, নীলিমা তা কখনো বুঝিবে না। বলিলেও বুঝিতে চাহিবে না। দু'পয়সা থাকিলে লাভ নৃপেনের নয়—সে লাভ নীলিমারও।

একদিন কথাটা সে পাড়িয়া ছিল,—এই যে অফিসে মাহিনা কমিয়াছে···

কিন্তু নীলিমা সে কথার উত্তরে কি না বলিয়াছে,—নৃপেনের মন দিনে দিনে ইতর হইয়া উঠিতেছে। নিজের স্ত্রীকে ছেলেমেয়েকে সুখী দেখিতে চায় না। তারা যদি আরাম পায় তো সে আরাম ছাঁটিয়া তাদের গরীব-দুঃখীর মত হতভাগা করিয়া ছাড়িবে। দাস-দাসীদের দু'একজনকে ছাড়ানো? তাহা বুঝি সম্ভব? দাশুকে ছাড়াইবে? তার কাজ করিবে বেহারী? কথা শুনিলে গা জ্বালা করে। অভিমান, রাগ—শেষে অশ্রু অবধি বর্ষিয়া যায়। বেচারা নৃপেন সে দৃশ্যে চোরের মত ঘাড় হেঁট করিয়া সরিয়া পড়ে।

[২].

সেদিন বৈকালের দিকে রমেশের সঙ্গে দেখা।

রবিবার। গৃহে ছোট একটু বিপ্লব ঘটিয়াছিল। নৃপেন গেল-মাসের হিসাব-নিকাশ দেখিতেছিল, সজ্জিত বেশে নীলিমা আসিয়া কহিল,—দশটা টাকা নিলুম গো তোমার ব্যাগ থেকে।

নৃপেন তার পানে ফিরিয়া চাহিল। নীলিমা কহিল,—বায়োস্কোপ দেখতে যাচ্ছি। গ্লোবে।

হিসাবের খাতা খোলা। গেল-মাসে নীলিমা বায়োস্কোপ দেখিতে খরচ করিয়াছে বত্রিশ টাকা। হিসাব সদ্য দেখিয়াছে—মনে আছে। নৃপেন্দ্র কহিল,—গেল মাসে বায়োস্কোপে কত টাকা খরচ করেছ, জান?

নীলিমার প্রসন্ন মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িল। গম্ভীর কণ্ঠে সে কহিল,—অত হিসেব করে বাস করা চলে না। যা দরকার, তা করতে হবে তো!—খরচের কথা ভেবে তা ছেঁটে মানুষ বাঁচতে পারে না।

নৃপেন্দ্রর বুকটার মধ্যে ছোট শিখাটি লেলিহান হইয়া উঠিল। এক পয়সা সঞ্চয় নাই! অথচ আজ পনেরো বৎসর চাকরি করিতেছে! মোটা মাহিনার চাকরি।

বহু চেষ্টায় কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া নৃপেন্দ্র কহিল,—বায়োস্কোপ দেখাটা এত বেশী দরকার নয় নীলিমা, যার জন্য·

কথা শেষ হইল না। নীলিমা কহিল,—তোমার পক্ষে না হতে পারে, আমার পক্ষে দরকার। ভাত-ডালের মত দরকার। এই যে তোমার দরকার আপিস যাওয়া—আপিসের সাহেবদের এটা-ওটা কিনে উপহার দেওয়া—আমার তো সে দরকার হয় না।

নৃপেন্দ্র কহিল, তার সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখা সমান? কি পাও বায়োস্কোপে?

নীলিমা কহিল—সে তুমি বুঝবে না থাক্, ও তোমায় বোঝাতে পারবো না। তবে যতদিন বাঁচব, অন্নবস্ত্রের মত মনের এ-খোরাক তোমাকে জোগাতে হবেই। আমি মানুষ এবং আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না। জানি, আমার কথা কোনদিন তোমার ভাল লাগবে না। আমি চললুম। সঙ্গে যাচ্ছে টুটুল আর দীপ্তি। ও-বাড়ীর নন্দদা আর তার স্ত্রীকেও পথ থেকে নিয়ে যাব। নন্দদা একদিন আমাদের শিবপুরে পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিল। তার শোধ দেওয়া কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। কারো কাছে আমি ঋণী থাকতে চাই না—সামান্য ব্যাপারেও নয়।

নীলিমা অকুন্ঠিত চিত্তে চলিয়া গেল। নৃপেন্দ্র ক্ষণেক গুম্ হইয়া রহিল; তারপর হিসাবের খাতা বন্ধ করিয়া ভাবিল, কিসের সংসার! কাহার মুখ চাহিয়া সংসার করা! এ-সংসারের আবার হিসাব কি! দূর হোক্ যেদিকে দু'চোখের দৃষ্টি যায়, চলিয়া যাইবে।

ভাবিতে ভাবিতে মাথায় রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। সে জামা গায়ে দিয়া পথে বাহির হইল। বাহির হইতে রমেশের সঙ্গে দেখা—রমেশের গৃহের দ্বারে।

রমেশ কহিল,—ঘোড়ার খবর রাখ নীপু?

ঘোড়া! নৃপেন্দ্র বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে রমেশের পানে চাহিল। রমেশ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—কালকের রেসের কথা ভাবছি। কর্ণফ্লাওয়ার খুব ভাল ঘোড়া—ওয়েট্ কম—পাঁচ-সাতটা টিপ্ পাচ্ছি তার ফেভার-এ। যদি প্লেস-এ খেলি মোটা দরে…

নৃপেন্দ্র কহিল,—ও সব খবর আমার জানা নেই।

রমেশ কহিল,—বসন্তর জন্য দাঁড়িয়ে আছি। তার টিপ্ ভাল। তার আসবার কথা আছে। চা খেতে বলেছি। মানে, একটু দেনা হয়ে গেছে। রেসে বড্ড হার হেরেছি… ভাই। ঐ সুধীরা—তার দু'গাছা চুড়ি পর্য্যন্ত বন্ধক পড়েছে।

সুধীরার চুড়ি! হতভাগা রাস্কেল!…অমন স্ত্রীর অঙ্গ হইতে গহনা খুলিয়া জুয়া খেলিতে তোর মন এতটুকু সঙ্কুচিত হয় না? নৃপেন্দ্র গমনোদ্যত হইল; সহসা দ্বারপ্রান্তে সুধীরা…সুধীরা ডাকিল,—নৃপেন বাবু…

নৃপেন্দ্র ফিরিয়া চাহিল। সেই হাসি সুধীরার মুখে। হাতে? না, চুড়ি নাই। কথাটা সত্য। নৃপেন্দ্রর বুকখানা দুলিয়া উঠিল।

সুধীরা কহিল,—কোথাও যাচ্ছেন?

নৃপেন্দ্র কহিল,—না।

সুধীরা কহিল,—একবার আসবেন? খুব ভাল গোলাপ ফুটেছে…ডচেস অফ লণ্ডনডারি। দেখবেন?…মানে, আপনি আমার বাগানের সুখ্যাতি করেন…

এ নিমন্ত্রণ এড়ানো অসম্ভব। নৃপেন্দ্র কহিল,—এস রমেশ…

রমেশ কহিল,—তোমরা যাও ভাই…আমি বসন্তর জন্য দাঁড়াই। সে আবার আমার বাড়ীর নম্বর জানে না।

মূর্খ হতভাগা!

জগতের এমনি নিয়ম। এখানে এই রমেশ, আর তার গৃহে নীলিমা। দুনিয়ায় সকলে যদি পরস্পরের মন বুঝিয়া চলিত, তাহা হইলে পাশাপাশি দুটি গৃহ আজ স্বর্গ হইত। স্বর্গ!

তা যদি না বুঝিল তো যারা পরস্পরকে বোঝে, তারা কেন পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়ায় না? সংসারগুলা কি সুখেই না তাহা হইলে ভরিয়া থাকে!

নৃপেন্দ্রকে সুধীরা আনিল তার সেই ছোট বাগানে। লতায়-পাতায় তৃণ-পল্লবে পুষ্প-ভূষণে অপরূপ সজ্জা। মন এখানে মশগুল হইয়া ওঠে। সুধীরা বাগান দেখাইল। গাছগুলির সঙ্গে তার প্রাণের কতখানি আবেগ, কি মায়া বিজড়িত, গদগদ ভাবে সে-কথা বলিতে লাগিল। সে একা… কেহ নাই তার এ কাজে সাহায্য করিবে এই বাগান তার …তার সব…

নৃপেন্দ্র কহিল,—এ কাজে রমেশের একটু টেষ্ট তৈরী করিয়ে নিন।

ম্লান মৃদু হাস্যে সুধীরা কহিল,—এ টেষ্ট তৈরী করানো যায় না, নৃপেনবাবু। এ টেষ্ট হয় মনের টানে!

নৃপেন্দ্র কহিল,—তবু স্ত্রীর যখন এত সখ, তখন অন্ততঃ ফর দি সেক অব লাভ ফর হিজ ওয়াইফ

সুধীরার মুখে পাণ্ডুর ছায়া। সুধীরা নিশ্বাস ফেলিল; —কোন কথা বলিল না।

নৃপেন্দ্র বুঝিল। এ প্রশ্নের উত্তর নাই। মনে পড়িল নিজের জীবনের কথা। এই যে…সে যা চায়, নীলিমা সেদিক দিয়া যায় না তো।

নৃপেন্দ্র কহিল,—রমেসের রেসের নেশা কাটাতে পারেন না?

সুধীরা কহিল,—উনি ভাল বোঝেন…

নৃপেন্দ্র বুঝিল, নম্র শান্ত প্রকৃতি। তাই সুধীরা সহিয়া আছে। কিন্তু স্ত্রী সত্যই বাঁদী নয়! তারো নিজের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, মন আছে।

সে কহিল,—এই অতিরিক্ত দাস্ত-ভাবেই রমেশকে আপনি মানুষ হতে দিলেন না।

সুধীরা কোন জবাব দিল না; গাছ হইতে একটা

গোলাপ ছিঁড়িয়া নৃপেন্দ্রর দিকে ফিরিল ; ফিরিয়া ফুলটি তার হাতে দিয়া কহিল,—নেবেন ?

উদ্গত নিশ্বাস রোধ করিয়া নৃপেন্দ্র কহিল,—নিশ্চয়।

তারপর চা···

সুধীরা কহিল,—মিসেস সান্যাল তো বাড়ী নেই। চা এখানে খান।

এ-চায়ে নৃপেন্দ্রর অরুচি থাকিতে পারে না। বসন্তও বসিয়াছে—হাতে চায়ের পেয়ালা। তার সঙ্গে রমেশ তখন গভীর আলোচনায় নিমগ্ন।

সুধীরা কহিল,—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

রমেশ কহিল,—এই যে! ওহে বসন্ত, চা শেষ কর।

চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া নৃপেন্দ্র ভাবিতেছিল, কেন? কেন সব অদল-বদল হইয়া যায় না? যাক রমেশ তার ঐ দোতলা বাড়ীতে। নৃপেনের চাকরিতে রমেশ সুখে বাহাল থাকুক!···স্ত্রী নীলিমা···হোক্ সে রমেশের স্ত্রী! আর এই ছোট এক-তলা বাড়ী···রমেশের ঐ পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকরি! নৃপেন্দ্র তাহা লইয়া পরম সুখে বাস করিবে···পাশে থাকিবে সুধীরা··তার ঐ বাগান···যে-বাগান সে, সুধীরা নিজের হাতে রচিয়াছে।—সুধীরার সকল কাজে নৃপেন্দ্র হইবে সহায়, সঙ্গী ; জীবনে তখন চাহিবার আর কিছু থাকিবে কি!

সেদিন সে গৃহে ফিরিল—তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তার বসিবার ঘর···জানালায় পর্দ্দা আঁটা। পর্দ্দার এক দিককার ঝালর ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কদর্য্য! নৃপেন্দ্র ডাকিল,—লালু···

লালু বেয়ারা ; আসিয়া দেখা দিল। নৃপেন্দ্র কহিল,—ছুঁচ সুতো নিয়ে আয়।

লালু সবিস্ময়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নৃপেন্দ্র বলিল,—দাঁড়িয়ে রইলি যে?

লালু জানাইল, ছুঁচ-সুতা মেমসাহেব কোথায় রাখেন, সে তাহা জানে না।

রাগিয়া—ঝাঁঝালো স্বরে নৃপেন্দ্র কহিল,—দোকান জান? যে-দোকানে ছুঁচ-সুতো পয়সা দিলে পাওয়া যায়?

লালু মাথা নীচু করিল। নৃপেন্দ্র কহিল,—দয়া করে কোনো দোকান থেকে কিনেই আন।

লালু চলিয়া গেল।

ছুঁচ-সুতা আসিলে নৃপেন্দ্র পর্দ্দার ছিন্ন ঝালর টাঁকিতে বসিল। এ-কাজগুলা নীলিমা করিতে পারে না? সারাক্ষণ কি যে সে করে···

আশ্চর্য্য! মানুষ এমন নিষ্কর্ম্মাও থাকিতে পারে!

বাহিরে মোটরের শব্দ। নৃপেন্দ্র ফিরিয়া চাহিল না। অচিরে সে-ঘরে নীলিমার প্রবেশ। নীলিমা কহিল,—কি হচ্ছে?

নৃপেন্দ্র বেশ শান্ত স্বরে বলিল,—ঝালরটা ছিঁড়ে গেছে। বিশ্রী দেখায়। তাই···

নীলিমা কহিল,—আমি জানি। তোমার সংসারে দানাপানি খাচ্ছি, এটুকু দেখব না—ভাব? এমন নিমকহারাম সত্যই নই। দাশুকে আজ বলে গেছি, দর্জ্জীকে খবর দিতে।—এসে সেলাই করে দিয়ে যাবে। শুধু এ পর্দ্দা নয়—আরো কাজ আছে। সত্যি-মিথ্যে—দাশুকে ডেকে না হয় জিজ্ঞাসা কর···

নৃপেন্দ্র কহিল,—জিজ্ঞাসা করতে চাই না। তবে···

নীলিমা কহিল,—তবে—কি?

নৃপেন্দ্র কহিল,—এ কাজটুকুর জন্য দর্জ্জীর মুখাপেক্ষী না হলেও পারতে! সামান্য কাজ।

নীলিমা কহিল,—ঐটুকু পারব না। বিয়ে করেছ বলে আমি তোমার কেনা বাঁদী নই সত্যি!

নৃপেন্দ্র কহিল,—একে বাঁদীগিরি বলে না।···তা যদি মনে কর, তবে আমিও বলতে পারি, তোমাদের জন্য আমিই বা কেন এত খেটে মরি!

নীলিমা কহিল,—না খাটলেই পার। আমি তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে বলি নি যে, ওগো, আপিসে তুমি সাহেবদের পা চেটে বেড়াও।

রাগে নৃপেন্দ্র জলিয়া উঠিল। সে ডাকিল,—নীলিমা···

নীলিমা কহিল,—চোখ রাঙাচ্ছ কি! তুমি যে-ভাবে কথা কও, তাতে মনে হয়, আমাদের খেতে পরতে দিয়ে তুমি খুব মহত্ব দেখাচ্ছ। এতে মহত্ত্ব নেই! যার সঙ্গে বিয়ে হতো, সে-ই আমায় মাথায় করে রাখত!···বিয়ের সখ থাকলে

মানুষ বিয়ে-করা স্ত্রীর খোরাক-পোষাকের ভাল ব্যবস্থাই করে। শুধু মানুষ নয়। জন্তু-জানোয়ারেও সে ব্যবস্থা করে থাকে।···তোমার কথায়, তোমার ব্যবহারে আমার এমন মনে হয়···

নৃপেন্দ্র কহিল,—কি? ডিভোর্স?

নীলিমা কহিল—ভদ্রতায় বাধে। না হলে···

নীলিমার দুই চোখে বর্ষা নামিল। নৃপেন্দ্র কহিল,—চেয়ে দেখ একবার পাশের বাড়ীর দিকে। ঐ রমেশের স্ত্রী সুধীরা···

নীলিমা কহিল,—তার মত আমাকে চাকরি করতে হবে না কি?

নৃপেন্দ্র কহিল,—সে ক্ষমতা থাকলে তোমার এ-নবাবী সাজত। সুধীরা রোজগার করে। তার রোজগারের পয়সা বাজে সখে সে খরচ করতে পারত—নিজের হাতে সংসারের কাজও তাকে করতে হতো না। কিন্তু নিজের এ স্বার্থ সে দেখে না। তার রোজগারের পয়সা সে সংসারে দান করে।

নীলিমা কহিল,—তার সঙ্গে আমার তুলনা করো না··· তুমি যদি রমেশ বাবুর মত পঁচিশ টাকার কেরাণী হতে···

নীলিমা চুপ করিল।

নৃপেন্দ্র কহিল,—তা হলে তুমি মাষ্টারী করতে যেতে··· না?

নীলিমা কহিল,—তা নয়। তা হলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েও হতো না। সুধীরার বাবা আর আমার বাবা—দুজনের পজিসন-এ অনেক তফাৎ ছিল।

নৃপেন্দ্র কহিল,—তা থাক্। তোমার সঙ্গে সুধীরারও অনেকখানি তফাৎ। সে কাজের লোক—বুদ্ধিমতী। তুমি···

ঝাঁঝিয়া নীলিমা কহিল,—কি! তার মুখে-চোখে অগ্নি-শিখা। চকিতে সে-ভাব সম্বরণ করিয়া আবার বলিল,—তোমার ঐ সুধীরাকে বল, রমেশ বাবুর সঙ্গে ডিভোর্সের ব্যবস্থা করুক; ক'রে তোমায়···এত প্রেম! আমার জানা ছিল না।

রাগিয়া উচ্চ কণ্ঠে নৃপেন্দ্র ডাকিল,—নীলিমা···

নীলিমা সে-আহ্বানে সাড়া দিল না; জলন্ত বিদ্যুতের মত দৃষ্টি হানিয়া সে-ঘর হইতে চলিয়া গেল।

[৩]

এক সপ্তাহ পরের কথা।

রাত্রি প্রায় আটটা। নীলিমা গিয়াছে সিনেমায়। সে দিন এম্পায়ারে মরিশ্ শেভলিয়র কি একটা নূতন ছবি দেখানো হইতেছে। নৃপেন্দ্র একা বসিয়া অফিসের কাগজ-পত্র দেখিতেছে, সহসা সুধীরা আসিয়া ডাকিল,—নৃপেন বাবু···

নৃপেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। সুধীরা! এ কি বেশ! চোখ দুটা ঠিকরিয়া যেন বাহির হইয়া পড়িবে। নৃপেন্দ্র কহিল,—কি খবর?

সুধীরা কহিল,—ভারী বিপদ। ওঁর অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে ···রেস দেখে ফিরছিলেন···খিদিরপুর পুলের কাছে এক-খানা লরি এসে চাপা দিয়েছে। পা ভেঙ্গেছেন। আছেন হাস-পাতালে। ওঁর এক বন্ধু এসে এই মাত্র খবর দিলেন।

নৃপেন্দ্রর দেহে রোমাঞ্চ! সে কহিল,—যাবেন?

সুধীরা কহিল,—একা আমার ভয় করছে···যদি কিছু··· আপনি দয়া করে···

কথাটা বলিতে বলিতে সুধীরা একেবারে তার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

নৃপেন্দ্র কহিল,—আমি এখনি যাচ্ছি। কোন্ হাসপাতাল?

সুধীরা কহিল—শম্ভুনাথ হাসপাতাল।

নৃপেন্দ্র তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা করিয়া ভৃত্যকে কহিল,—একখানা ট্যাক্সি।

সুধীরা কহিল,—আমি যাব আপনার সঙ্গে।

—আসুন।···কিন্তু তারক?

সুধীরা কহিল—লখিয়াকে বলেছি তার কাছে থাকবে।

ট্যাক্সিতে করিয়া দুজনে আসিল হাসপাতালে।

খবর সত্য। চোট্ খুব বেশী। একখানি পা কাটিয়া দিতে হইবে। কোন মতে প্রাণটা রহিয়া গিয়াছে। তবে সে সম্বন্ধেও ডাক্তাররা সুনিশ্চিত আশ্বাস এখন দিতে পারেন না···

সুধীরার মনের দীপ নিবিয়া গেছে। তার দুই চোখে জল

নৃপেন্দ্র কহিল,—বাড়ী চলুন।

বাষ্পার্দ্র স্বরে সুধীরা কহিল,—নৃপেনবাবু··

নৃপেন্দ্র কহিল,—কাল আবার আসবেন। শুনলেন তো, এখন এমন বিশেষ ভয় নেই; তবে সুনিশ্চিত আশা দিতে পারেন না। কাল আমিই আপনাকে নিয়ে আসব সঙ্গে করে। দরকার হয়, রমেশ যতদিন এখানে থাকবে, আপনাকে নিয়ে আসব। এ অবস্থায় বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না, সুধীরা।

সুগভীর নিশ্বাসে সমস্ত প্রাণটাকে সুধীরা যেন বাহির করিয়া দিল; দিয়া বলিল,—ওঃ···

ফিরিতে রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল।

নীলিমা আগেই ফিরিয়াছে। আহারাদি সারিয়া সে শয়ন করিয়াছে।

নৃপেন্দ্র আহার করিল না। রুচি নাই। বেচারী সুধীরা! তার কথা, তার ভবিষ্যৎ। নৃপেন্দ্রর মনে অন্ধকার নামিল।

তারপর গৃহে···

নীলিমা তার কোন সংবাদ রাখে না। আজ নৃপেন্দ্র যদি লরি চাপা পড়িত? নীলিমা হাসপাতালে তাকে দেখিতে যাইত—ঐ সুধীরার মত অমনি ব্যাকুল মনে?

অসম্ভব!

আকাশে টুকরা টুকরা কালো মেঘ জমিয়াছিল। চাঁদের জ্যোৎস্না মেঘের ছায়ায় মলিন।

সুধীরার দুঃখে হয়তো! সুধীরা বড় ভাল। তার দুঃখে চাঁদ মলিন হইবে, সে কি বড় কথা!

নৃপেন্দ্রর মনে একটা চিন্তা মেঘের মত বাড়িয়া আর সব চিন্তাকে ঢাকিয়া দিল। রমেশের যদি কিছু হয়···?

দুদিন পরে অফিসের সাহেব ডাকিলেন,—নিরপেনড্রো···

নৃপেন্দ্র গিয়া সামনে দাঁড়াইল।

সাহেব বলিলেন,—বোম্বাইয়ের অফিসে হিসাব-পত্রে বড় গোলমাল চলিয়াছে। আপাততঃ তিন মাসের জন্য একজন কর্ম্মচারী প্রয়োজন। সে সব খাতাপত্র দেখিতে। তাই স্থির করিয়াছি, তোমাকে পাঠাইব। তুমি সস্ত্রীক যাইতে পার।

নৃপেন্দ্র ভাবিল, মন্দ কি! ছাড়াছাড়ি হইলে যদি নীলিমার মন—

সে কহিল,—না সাহেব, আমি একাই যাব। স্ত্রী গেলে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার অসুবিধা ঘটবে।

সাহেব কহিলেন,—তোমার ইচ্ছা।

নৃপেন্দ্র কহিল,—কবে যেতে হবে?

সাহেব কহিলেন,—কাল।

—যাব।

—অল্ রাইট, নিরপেনড্রো! সেখানে যত দিন থাকিবে, দেড়শো টাকা অ্যালাওয়্যান্স বেশী পাইবে।

চমৎকার!

গৃহে ফিরিয়া নৃপেন্দ্র নীলিমাকে এ কথা বলিল। শুনিয়া নীলিমা কহিল,—দেখ, আমাদের বাঙলা দেশে কথা আছে —স্ত্রী-ভাগ্যে ধন।

নৃপেন্দ্র কহিল,—তাই দেখছি।

হাসিয়া নীলিমা কহিল,—একটা আব্দার করব। মিসেস রাহার চমৎকার ডিজাইনের এক-ছড়া···

তার কথায় বাধা দিয়া নৃপেন্দ্র কহিল,—আমি অফিসে বসে বজেট তৈরী করেছি, নীলিমা। কিছু জমাতে চাই। দরকার। আর বেহুঁসিয়ারী চলবে না।

এই অবসরে টাকা বাঁচাব। টুটুলকে বিলেত পাঠাব— বড় হলে। সেজন্য এখন থেকে ব্যবস্থা চাই। আমি স্থির করেছি, তোমাদের এখানকার খরচের জন্য দুশো টাকা দেব— সংসার দাস-দাসী এই সব বাবদ। এর মধ্যে চালাতে হবে। একজন চাকর, একজন দাসী, আর কুক্। ব্যস্! এতে না পার, আমার কোন দায় থাকবে না।

নীলিমা কহিল,—তুমি কি ভেবেছ···

শান্ত স্বরে নৃপেন্দ্র কহিল,—আমি ভেবেছি, এর চেয়েও কমে চালাতে হবে ক্রমে। এ ব্যবস্থা তার প্রথম পরিচ্ছেদ।

নীলিমা রাগ করিল; ঝঙ্কার তুলিল; শেষে অশ্রু-বর্ষণ! নৃপেন্দ্র তবু অটল।

রাত্রি আটটায় নৃপেন্দ্র গেল সুধীরার সঙ্গে দেখা করিতে; সুধীরাকে এ সংবাদ দিল। সুধীরা কহিল,—কিন্তু···

নৃপেন্দ্র কহিল—বুঝেছি সুধীরা। হাসপাতালে যাওয়া? তোমার এই উদ্বেগ! সে ব্যবস্থা করে যাব। কিছু মনে করো না সুধীরা, তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি, তাছাড়া রমেশ আমার বাল্যবন্ধু,—তোমাদের এই বিপদ। আপাততঃ দুশো টাকা তুমি রাখ। আমি দূরে থাকব—খুব দুর্ভাবনা

থাকব। আমায় নিত্য খবর দিয়ো—রমেশ কেমন থাকে—তোমরা কেমন থাক। তোমার মনের এখন যেমন অবস্থা, স্কুল থেকে ছুটী নাও। টাকার জন্ম ভেব না। আমার অনেক টাকা অনেক দিকে অপব্যয় হয়, তা থেকে কিছু বাঁচিয়ে যদি তোমাদের এত বড় বিপদে দিতে পারি তো টাকার তাতে সার্থকতা হবে। কোন কিছুর দরকার হলে আমায় জানাতে সঙ্কোচ করো না—বুঝলে!

বাষ্পার্দ্র নয়নে নৃপেন্দ্রর পানে সুধীরা চাহিয়া রহিল। করুণা, স্নেহ···এত বেশী পুঞ্জিত রাখিয়াছ ভগবান। দীন-দরিদ্রকে তুমি তো কখনো ভুলিয়া থাক না...হে প্রিয় ঈশ্বরের পুত্র!

[৪]

ক্ষণে-অক্ষণে যাত্রা।

কথাটা মিথ্যা নয়। অপমানে আক্রোশে জ্বলিয়া নীলিমা একদিন শয্যা গ্রহণ করিল।

সুধীরার বিপদে স্বামীর মন বিগলিত হইয়াছে; স্বামীর টাকা ওখানে গিয়া পৌছিয়াছে; এ সংবাদ কৃতজ্ঞ সুধীরার মারফৎ পাঁচ জনে যখন শুনিয়াছে, তখন নীলিমার কানে তাহা পৌছিবে না, সমাজ এখনো এতখানি ষট্‌চক্র-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে নাই।

এবং এ আক্রোশ সে বর্ষণ করিল নৃপেন্দ্রকে পত্র লিখিয়া; তার জের একদিন দোতলার জানলায় দাঁড়াইয়া সুধীরাকে স্পষ্টাক্ষরে শুনাইয়া দিতেও ছাড়িল না।

নৃপেন্দ্র এ আক্রোশের যে জবাব দিল, তার ফলে এখানে কলিকাতার পল্লীতে নীলিমা তার বিরুদ্ধে অসংযমের নানা অপবাদ রটাইবার সুযোগ পাইল।

তাহাতেও নৃপেন্দ্র টলিল না।···তখন নীলিমা গেল তার মায়ের কাছে পরামর্শ লইতে।

পরামর্শ ছিল সুপ্রতুল। বিশেষ, সিভিলিয়ান সিসিল দত্ত সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের একটি সুন্দরী পত্নীর সন্ধান করিতেছিল। সিসিল দস্তুরমত সাহেব! দু-বৎসর অন্তর য়ুরোপ ঘুরিতে বাহির হন।

আইন তার অক্‌টোপাসের বাহু-জালে বিবাহের বাঁধনটুকু মচ্ছিন্ন করিয়া দিল; তখন নীলিমা আসিয়া দাঁড়াইল মুক্তির অঙ্গনে, আইনের জয়-গানে চিত্ত ভরিয়া। ওদিকে বেচারী সুধীরা···

রমেশ সারিয়া উঠিতেছিল। সহসা কোথা দিয়া কি একটা ছোট উপসর্গ দেখা দিল। তার ফলে রমেশকে সংসারের সম্পর্ক কাটাইয়া চলিয়া যাইতে হইল প্রভুর চরণ-তলে··· হয়তো বিচারের জন্ম!

তার কবরে পুষ্প-ভার রাখিয়া অশ্রু-ভরা চোখে গৃহে ফিরিয়া সুধীরা দেখিল, তার জীবন একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে।...

সাত-আট মাস পরে নৃপেন্দ্র গৃহে ফিরিল। শূন্য গৃহ। শুধু পুরানো খানশামা বেহারী আছে গৃহের প্রহরা-কার্য্যে। টুটুল ও দীপ্তি—তারা আছে বোর্ডিংয়ে। ডিভোর্সের মামলা আপোষে মিটিবার সময় নৃপেন্দ্রের এটর্নি এ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

সেই গৃহ। গৃহের নীচে সেই বাগান।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নৃপেন্দ্র দোতলার খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। বাগানে সুধীরা···

বৈশাখ মাস। বাগানে রাশি রাশি বেল জুঁই চামেলী ফুটিয়াছে। হাসনুহানার গন্ধে বাতাস ভরিয়া আছে।

সেই সুধীরা! আশ্চর্য্য—এখনো তেমনি আছে। সংসারে এত বড় পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল···

তার জীবনে—সুধীরার জীবনে কি পরিবর্ত্তন! অথচ ঐ বাগান! ও বাগানে তেমনি ফুলের বাহার! সুধীরার ভাল লাগে···আজো···!

ও-বাগান? ঐ ফুল? সমস্ত প্রাণ হায়-হায় করিয়া উঠিল। হায়রে, জীবন-পথে যাত্রা সুরু করিয়া কি সে ভাবিয়া ছিল! আর এতখানি পথ চলিয়া আসিয়াছে···কিন্তু কি পাইয়াছে? কি চাহিয়াছিল···

বসন্ত-বাতাস পুষ্প-বনে পুষ্প-পল্লব দুলাইয়া হায়-হায় করিয়া বহিয়া গেল!

নৃপেন্দ্র ধীরে ধীরে গিয়া রমেশের গৃহে প্রবেশ করিল। তারক সামনে বসিয়া অঙ্ক কষিতেছিল। নৃপেন্দ্র তাকে এড়াইয়া বাগানে বসিল।

এক-ঝাড় রজনীগন্ধা। তার কাছে বসিয়া গাছের গোড়ায় মাটীর ঢেলা ভাঙ্গিতেছে সুধীরা। নৃপেন্দ্র ডাকিল,—সুধীরা…

সুধীরা চমকিয়া উঠিল; ফিরিয়া চাহিল। সবিস্ময়ে কহিল,-আপনি…!

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—কবে এলেন?

—আজ…একটু আগে।

সুধীরার নয়নে উদাস দৃষ্টি…নৃপেন্দ্রর চোখে করুণ ছায়া! সুধীরা দৃষ্টি নামাইল।

সুধীরা কহিল—আপনাকে চিঠি আর লেখা হয়নি।

নৃপেন্দ্র কহিল—আমিও লিখিনি, সুধীরা।

কয়মাসের ঘটনা বায়োস্কোপের ছবির মত দুজনের মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল। সুধীরা কহিল,—কি হয়ে গেল! পৃথিবী যেন হঠাৎ উল্টে গেছে।

নৃপেন্দ্র কোন কথা কহিল না।

সুধীরা কহিল,—কেন আমাকে এ দয়া করেছিলেন আপনি!

তার দুই চোখের কোণে জল ঠেলিয়া আসিল।

নৃপেন্দ্র কহিল,—আমি তোমায় বড় শ্রদ্ধা করি, সুধীরা …তুমি জান না, এক দিনের জন্যও জীবনে আমি আরাম পাইনি। আমি বড় হতভাগা!—আমার সারা জীবন… যেন তীব্র অভিশাপ!

সুধীরা মুখ নামাইল; ধীর ভাবে কহিল,—ছেলেমেয়ে…

নৃপেন্দ্র কহিল,—জানি। কিন্তু নিজের জীবনে কি পেলুম? মানুষ শুধু কর্ত্তব্যই পালন করবে? তার মন যদি আরাম চায়…শান্তি চায়…তৃপ্তি চায়…

সুধীরা নিশ্বাস ফেলিল, কোন জবাব দিল না।

নৃপেন্দ্র কহিল,—নিজের মস্ত অভাব বুঝেছিলুম তোমার ছোট্ট সংসারটির পানে চেয়ে। সকাল থেকে রাত্রি…দেখেছি তোমার অনলস হাত—তোমার হাসি-ভরা প্রসন্ন মুখ! সংসারের পরিচর্য্যা করছ! শান্ত মন…কি করে মনকে এমন তৃপ্তি-সুখে ভরে রেখেছিলে, সুধীরা?

সুধীরা আবার চাহিল নৃপেন্দ্রর মুখের দিকে। নৃপেন্দ্রর চোখে সে দেখিল কিসের দীপ্তি…কি যেন বিহ্বলতা!

নৃপেন্দ্র কহিল আজ ফিরে এসেছি…শূন্য ঘরে! ফেরবার প্রলোভন ছিল না। তবু…।

নৃপেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। সুধীরা তার দিকে আবার চাহিল।

নৃপেন্দ্র কহিল,—এই বাগানটির পানে চেয়ে থাকব।… পৃথিবীতে যত সুখ—তা এই বাগানে আছে, সুধীরা!

সুধীরা কাঁপিতেছিল। নৃপেন্দ্র পকেট হইতে শুষ্ক ফুলের পাপড়ি বাহির করিয়া কহিল—চিনতে পার?

সুধীরার চোখে বিস্ময়! নৃপেন্দ্র কহিল,—গোলাপ…তুমি দিয়েছিলে। তোমার বাগানের ফুল…তোমার হাতের পরশে ফোটা গোলাপ…ডচেশ্ অফ্ লণ্ডনডারি!

পরের দিন। সকাল হইয়া গিয়াছে। নৃপেন্দ্র বিছানায় পড়িয়া আছে…

সুধীরা আসিয়া কহিল,—এখনো ওঠেন নি?

নৃপেন্দ্র কহিল,—না।

—অফিস নাই?

—না। তিন মাসের ছুটী নিয়েছি।

সুধীরা কহিল,—চা এনেছি।

নৃপেন্দ্র উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিল; চা পান করিল।…

নৃপেন্দ্র কহিল,—সংসার চলছে কিসে?

—দুর্দ্দশার একশেষ। জানেন না বোধ হয় বাড়ী ভাড়া জমে আছে প্রায় দুশো টাকা। আমার সে স্কুলটি উঠে গেছে। দু-তিনটি বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে পড়াই। তারক ফ্রী পড়ছে স্কুলে।…দিন চলে না। ইনি পথে বসিয়ে রেখে গেছেন। —ইদানীং কিছু করতেন না…স্কুল থেকে কি টাকাও ভেঙ্গেছিলেন…

নৃপেন্দ্র কহিল,—আমায় দেবে তোমার ভার নিতে সুধীরা ‥ তোমার সংসারের?…সংসারে তুমিও কিছু পাওনি!… তবু ও হাসি…

সুধীরা কহিল,—থাক্! ও কথা আর বলবেন না…

নৃপেন্দ্র কহিল,—আমার কাঙাল মন, সুধীরা। কিন্তু তোমাকে সত্য বলছি, যদি তোমাকে পাশে পেতুম…এখনো যদি পাই…জীবনকে এখনো সার্থক করতে পারি।

সুধীরা মাথা নামাইল।

নৃপেন্দ্র কিছু বলিল না; সুধীরার দিকে চাহিয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে চিন্তার পর চিন্তা চলিয়াছে, যেন ট্রেণে।

সুধীরা চোখ তুলিল। তার দু' চোখে জলের আভাস। সেই সঙ্গে···

নৃপেন্দ্র বুঝিল—ঐ সঙ্গে করুণ মিনতি।

নৃপেন্দ্র কহিল,—এস সুধীরা, আমরা নূতন করে জীবন সুরু করি। যে মহাপ্রলয় ঘটে গেছে আমাদের বুকের উপর দিয়ে···তারপর নূতন জীবন···নূতন আলো

সুধীরা কহিল,—আমি বড় দুঃখী।

বিবাহের পর রাঁচির মোরাবাদি পাহাড়ে দুজনে বসিয়া আছে···

সুধীরা কহিল,—তিন ছেলেমেয়েকে বাড়ীতে এনে রাখ। তাদের জন্য থাকবে দাস দাসী। মানুষের মত মানুষ হোক···

নৃপেন্দ্র কি ভাবিতেছিল···চোখে স্বপ্নাবেশ! আবেগ-ভরা স্বরে সে কহিল,—খড়খড়ি থেকে দেখতুম—দুটি হাত সংসারের কল্যাণ-কর্ম্মে শ্রান্তিহীন···আমার বুক ভরে উঠত! সেদিন থেকে মনে মনে তোমাকে চেয়েছি—ভাল বেসেছি। পুরুষের প্রার্থনার-যোগ্য সঙ্গিনীর মূর্ত্তি তো সেই!

হাসিয়া সুধীরা কহিল,—কি কষ্ট ছিল! এক মিনিট একটা চিন্তার অবসর ছিল না। দারিদ্র্য···অভাব···যেদিকে চাই, দারিদ্র্যের শীর্ণ কঙ্কাল···নিরুপায় দারিদ্র্য! সেদিক থেকে মনকে ফিরিয়ে ভুলিয়ে রাখব বলে বাগান নিয়ে মাতলুম। তবু যখনি তোমার বাড়ীর দিকে চাইতুম, নীলিমাকে দেখতুম—খড়খড়িতে নানা রঙের পর্দ্দা···দোরে মোটর। সে মোটরে চড়ে নীলিমা বেরুচ্ছে···নিশ্বাসে মন ভরে উঠত···ভাবতুম, কি অপরাধ করেছি ঈশ্বর···জীবনকে জীবনের মত ভোগ করতে পারলুম না! ভাবতুম কি-পুণ্য নীলিমা করেছিল! শুনেছি মানুষ প্রাণ ভরে যে-কামনা করে, তার সে কামনা পূর্ণ হয়।···অপরের জিনিষ কামনায় হিংসা, জানি। তবু মানুষের মন তো!···বল না, সে কি পাপ?···এখন ভাবি, পাপ হোক, পুণ্য হোক—জীবনকে যখন আরামে ভোগ করতে পেয়েছি, তখন তা ভোগ করব!···এত সুখে আমায় তুমি সুখী করেছ···আমার কামনা তুমি পূর্ণ করেছ···এ আমি কখনো ভুলব না!

বলিতে বলিতে আবেগে সুধীরা তার মাথা একেবারে লুটাইয়া দিল নৃপেন্দ্রর পায়ের উপর।

ওদিকে পাহাড়ের আড়ালে পৃথিবীর উপর হইতে সমস্ত আলো কুড়াইয়া, গুটাইয়া সূর্য্য অস্তাচলে চলিয়াছিল। নৃপেন্দ্র স্থির দৃষ্টিতে সেই তিমিরায়মান আকাশের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিল।

তারপর সুধীরার পানে চাহিয়া ভাবিল, আকাশের রঙ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সুধীরার মন কি বদলাইয়া গেল? তার মুখে চোখে সেই অমলিন হাসি···সে হাসি, কৈ, আজ তো দেখা যায় না! এই সম্পদের মধ্যে, ভোগের মধ্যে সে-হাসি কি মিলাইয়া গেল?

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার কথা

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পঞ্চাশ বৎসর শতাব্দীর পরিমাপে অর্দ্ধাংশ। পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন সময় পূর্ব্বকাল—সেকাল, না একাল?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

তরুণদল তাঁহাকে বাতিল যুগে ফেলিতে চাহিবেন; প্রাচীনরা তাহাকে "সেদিন" বলিয়া মনে করেন। এ দেশে মানুষের সাধারণ আয়ুষ্কালের তুলনায় পঞ্চাশ বৎসর অল্পকাল নহে; কিন্তু যে কালসমুদ্রের বেলাবালুবিস্তারে আমরা সলিলের অক্ষরে আমাদিগের কার্য্যপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া অমরত্ব-লাভের দুরাশা মনে পোষণ করি, তাহার তুলনায় অর্দ্ধশতাব্দী একান্তই নগণ্য—উপেক্ষণীয়, জলে জলবিম্ব না হইলেও সমুদ্রের নীলাম্বুবিস্তারে একটি ফেণচূড় তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কিন্তু সে যাহাই কেন হউক না, যে দেশের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচিত হইতেছে, নূতন ভাবের প্লাবন যাহার অতীতের অনেক চিহ্ন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, যে দেশের সমাজে পরিবর্ত্তনের চাঞ্চল্য সপ্রকাশ, সে দেশের পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা কখনই অবহেলার যোগ্য হইতে পারে না। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, যে-বর্ত্তমান অতীতের সহিত আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না, সে-বর্ত্তমান কখন ভবিষ্যতের স্থায়ী ভিত্তি হয় না—সে বর্ত্তমানের উপর যে ভবিষ্য-সৌধ রচিত হয়, তাহা চোরাবালুর উপর রচিত প্রাসাদের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া নষ্ট হয়। অতীতই বর্ত্তমানের প্রকৃত ও দৃঢ় ভিত্তি।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালার ভাবরাজ্যের ও কর্ম্মরাজ্যের নায়কগণ এই সত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং করিয়াছিলেন বলিয়াই পঁচিশ বৎসরের কিঞ্চিদধিককাল পূর্ব্বে (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) যে জাতীয় আন্দোলন বাঙ্গালায় উদ্ভূত হইয়া সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, আর যে ভাবমন্দাকিনী দীর্ঘকাল বাঙ্গালীর হৃদয়ে হরজটাজালমধ্যে ত্রিপথগার মত, পথের সন্ধান করিয়া শেষে সেই আন্দোলনের গোমুখীমুখে প্রবাহিত হইয়া জাতির উদ্ধারসাধনোপায় করিয়া দিয়াছিল—সেই আন্দোলন ও সেই ভাব দমিত ও দলিত করিবার দুরাশায় বিদেশী আমলা-তন্ত্র সরকার যখন সভাসমিতি নিয়ন্ত্রণকল্পে নূতন আইন করিতে

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া মহারাষ্ট্রের মনীষী সন্তান গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালার লোকের প্রকৃতির সহিত পরিচিত বলিয়া আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সাহস করিতেছি। বাহুবলের দ্বারা তাহাদিগকে দমিত করা সম্ভব হইবে না। বহু বিষয়ে বাঙ্গালীরা সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাতি। তাহাদিগের ত্রুটির বিষয় আলোচনা সহজসাধ্য। ত্রুটি প্রকৃতির উপরেই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তাহাদিগের যে বহু অসাধারণ
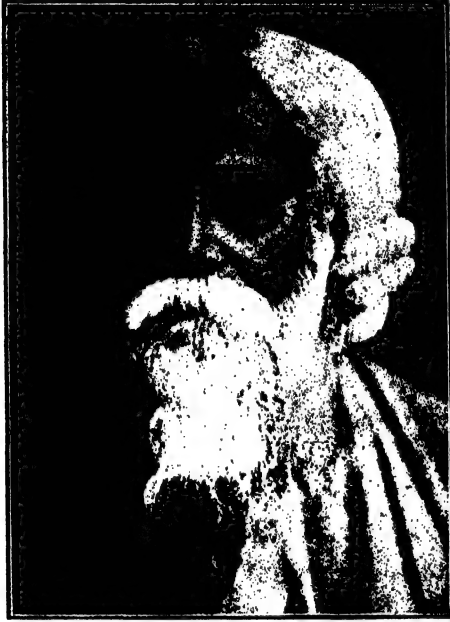
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গুণ আছে, সে সকল অনেক সময় অবজ্ঞাত হয় ভারতবাসীর পক্ষে যে সকল কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার মুক্ত, প্রায় সে সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীরা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরিগণিত। বাঙ্গালীদিগের মধ্য হইতে অধুনা সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম-সংস্কারকদিগের দলে কয়জন অতি প্রসিদ্ধ লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। বাঙ্গালায় বাগ্মী, সাংবাদিক ও রাজনীতিকদিগের মধ্যে কয়জন সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিদ্যমান। * * * বিজ্ঞানের, ব্যবস্থাশাস্ত্রের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কি লক্ষ্য করি? সমগ্র ভারতে সন্ধান করিলে কোথায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বৈজ্ঞানিকের, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের মত ব্যবহারাজীবের ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কবির সন্ধান পাওয়া যাইবে? এই সকল লোককে প্রকৃতির 'সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি' বলা যায় না; পরন্তু বাঙ্গালীজাতির স্বাভাবিক নিয়মে যেরূপ মনীষীর উদ্ভব হইতে পারে, ইঁহারা সেইরূপ লোক।"

গোখলে মহাশয় যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পঁচিশ বৎসরের কীর্ত্তিকথা স্মরণ করিয়াই তাহা করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্ন-ভাস্কর যেমন আপনার কিরণে নভোমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখে, বাঙ্গালীর মনীষা তেমনই সেই সময়ে ভারতবর্ষ আপনার কিরণে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। সেই পঁচিশ বৎসরের বাঙ্গালা প্রাচীর ও প্রতীচীর ভাবসঙ্ঘাতসম্ভূত-বিক্ষোভের অবসানে শৃঙ্খলার মধ্যে চারিদিকে আপনার প্রতিভাস্ফুরণ করিয়াছে। তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তীকালের বাঙ্গালীরা ভারতে উন্নতির পথে পথি-প্রদর্শকের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন; যেদিকেই অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, সেই দিকেই বাঙ্গালীর প্রতিভালোক অন্ধকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

এদেশের অন্য কয়টি প্রদেশে যেমন, বাঙ্গালায়ও তেমনই বাণিজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইংরাজ-বণিকদিগকে অনেক চেষ্টা করিতে ও অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রচলিত কাহিনী এই যে, গেব্রিয়েল বৌটন নামক একজন জাহাজী চিকিৎসক ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে কোন সম্রাট্-নন্দিনীর চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করিয়া পুরস্কার স্বরূপ বাঙ্গালায় ইংরাজের বাণিজ্যাধিকারের ছাড় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৌটন ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মোগল-রাজদরবারে উপস্থিত হয়েন নাই। তাহার পূর্ব্বে, ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে, আট জন ইংরাজ মশোলীপটন হইতে একখানি দেশীয় নৌকায় যাত্রা করিয়া বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গতাড়ন সহ্য করিয়া উড়িষ্যার মহানদীর মোহানায় উপনীত হয়েন। তখন উড়িষ্যা শাসন-ব্যাপারে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত, বাঙ্গালা বলিলে—বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা বুঝাইত। ২১শে এপ্রিল তারিখে তাঁহারা মোগল-দিগের শুল্কশালার (কুৎঘর বা গুমরিক) সান্নিধ্যে হরিশপুরে নোঙ্গর ফেলেন। শুল্কশালার হিন্দু অধ্যক্ষ তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করেন। উড়িষ্যার শাসক বাঙ্গালার নবাব-নাজিমের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইলেও ইংরাজ-বণিকরা তাঁহাকেই নবাব-নাজিমের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। বণিকরা তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত

হইলে তিনি অনুগ্রহব্যঞ্জক ভাবে বণিকদলপতি কার্টরাইটের দিকে মস্তক হেলাইয়া আপনার পাদুকামুক্ত চরণ তাঁহাকে চুম্বন করিতে দেন। কার্টরাইট দুইবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে তাঁহার চরণ চুম্বন করেন। ফলে কার্টরাইট উড়িষ্যার যে কোন বন্দরে ইংরাজদিগের বাণিজ্য করিবার ছাড় লাভ করেন। কিন্তু নানারূপ বিঘ্নহেতু ইংরাজ বণিকদিগের পক্ষে তথায় তিষ্ঠান দুঃসাধ্য হয় এবং ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা দিনেমারদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া হুগলীতে আড্ডা

রামমোহন রায়

স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে বহুদিন কিরূপ সন্ত্রস্তভাবে বাস ও বাণিজ্য করিতে হইত, পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে নবাব সিরাজদ্দৌলার কোপভয়ে পলায়িত কাশিমবাজার-কুঠীর ওয়ারেন হেষ্টিংশের—কাশিমবাজার জমীদারবংশের বংশপতি কান্ত বাবুর (তৎকালে "কান্ত মদী" নামে পরিচিত) দোকান-ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষায় বুঝিতে পারা যায়। পলাশীর যুদ্ধের পরও ইংরাজ বণিক মাত্র। মীরকাশেমের স্বল্প কালব্যাপী শাসনের শেষে বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ব্বল মীরজাফরকে দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়া ইংরাজ যখন আপনার ক্ষমতা পরিমাপ করিতে পারেন, তখনই এদেশে ইংরাজের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার আরম্ভ।

সেই সময় হইতে এদেশের লোক প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হইতে থাকেন এবং ইংরাজের প্রভুত্বস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিচয় প্রভাবে পরিণতি লাভ করে। তাহার ফলে যে নব্য বঙ্গের উদ্ভব হয়, তাহার প্রথম যুগে রামমোহন রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাম-মোহনের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইলেও তিনি যে নিরস্ত-পাদপ দেশে একমাত্র শালতরু ছিলেন তাহা নহে; পরন্তু বহুশৃঙ্গ ভূধরের শৃঙ্গসমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বলিয়াই আজ দূর হইতে উদয়াস্তভাস্করকরোজ্জ্বল তাঁহার উচ্চ শিরই সর্ব্বাগ্রে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে। ইংরাজ শাসকরা যখন এদেশে সংবাদপত্রের অধিকার-সঙ্কোচক আইন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন যাঁহারা সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ইংরাজের আদালতে আর্জ্জী পেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও রামমোহন একজন—তিনি একক নহেন। সুতরাং তিনি তখন বাঙ্গালার মনীষীদিগের অন্যতম এবং তাঁহারা নূতন ভাব অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। রাম-মোহন কার্য্যব্যপদেশে বিলাতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাতী বেশের অনুকরণ করেন নাই; তিনি প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের কতকগুলি আচারের পরিবর্ত্তন প্রয়াসী হইয়া-ছিলেন, কিন্তু দ্বিজের চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন নাই; তিনি ইংরাজদিগের সহিত মিশিতেন, কিন্তু তাঁহার উপাসনাগৃহে—যে স্বতন্ত্র কক্ষে বেদপাঠ হইত, তথায় ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বর্ণের লোকের প্রবেশাধিকার দিতেন না। তাঁহার সমসাময়িক দ্বারকানাথ ঠাকুরের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথও হিন্দু আচারের অনুরাগী ছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিবার পর যুবক কেশবচন্দ্র সেন পরি-বর্ত্তনের আগ্রহে "আদি ব্রাহ্ম-সমাজে" বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া "নববিধান-সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তিনিও চিরাগত সংস্কারের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই এবং পাত্রপাত্রীর বিবাহের জন্য তিনি যে বয়স নির্দ্দিষ্ট

করিয়াছিলেন অর্থাৎ পাত্রপাত্রীর অন্যূন যে বয়স স্থির করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অল্প বয়সে কুচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহাতেই শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ" স্থাপন করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

রামমোহন রায়ের পরবর্তীদিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারফলে শিক্ষিত সমাজে উচ্ছৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। তখন হিন্দু-কলেজের ছাত্র "ইয়ং বেঙ্গল" দল এদেশের প্রচলিত সংস্কারমাত্রকেই কুসংস্কার মনে করিয়া তাহার সংহারে উদ্যত হইয়াছিলেন; সে চেষ্টার ব্যর্থতা যে অবশ্যম্ভাবী তাহা আগ্রহের আধিক্যে কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকরা এদেশকে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ও এদেশের ঘটনাসমূহকে ভ্রান্ত বলিয়া মত প্রচার করিতেন এবং ইংরাজীশিক্ষিত বহু বাঙ্গালী যুবক ইংরাজের অনুকরণই সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা বিস্তার করিতে থাকেন।

কিন্তু সে বিশৃঙ্খলা বাঙ্গালীর ধাতুসহ নহে বলিয়া তাহা বহুদিন স্থায়ী হয় নাই—হইতে পারে নাই; অল্পদিনেই প্রতিক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাঙ্গালী তখন কালোপযোগী সংস্কার-বিরোধী ছিলেন না এবং সমাজে সংস্কারপ্রবর্ত্তনের পরিচয়ের অভাব নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজে পরিবর্ত্তন-প্রবর্ত্তন উগ্র বিদ্রোহের দ্বারা হয় নাই—স্বাভাবিক নিয়মে সমাজপতিদিগের দ্বারা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে হইয়াছে। এক্ষেত্রেও সেইজন্য দীনবন্ধু মিত্র ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিবার স্বপ্নে বিভোর নিমচাঁদকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার 'সধবার একাদশী' সংস্কারাগ্রহে অপ্রকৃতিস্থদিগকে তীব্র তিরস্কার। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের' "পত্র-সূচনায়" লিখিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান্ এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি, বা যত ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি 'সাহেব' কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়।"

বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার প্রথম পরিচয়-ফলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ধাতুগত জাতীয়তার ভাব সে উচ্ছৃঙ্খলা স্থায়ী হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল।

প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ—মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে দুইজন দিক্‌পাল—ইংরাজীতে রচনা আরম্ভ করিয়া তাহা ত্যাগ করেন এবং তাঁহাদিগের অবদানে বাঙ্গালা সাহিত্য বরেণ্য হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রই যুবক রমেশচন্দ্র দত্তকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইংরাজী রচনার দ্বারা বাঙ্গালীর স্থায়ী যশোলাভের আশা নাই—গোবিন্দচন্দ্র ও শশীচন্দ্র দত্ত ইংরাজীতে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রচিত ইংরাজী কবিতা কখন স্থায়ী হইবে না; কিন্তু মধুসূদনের বাঙ্গালা

কবিতা রচনা যতদিন বাঙ্গালা-সাহিত্য থাকিবে ততদিন স্থায়ী হইবেই।

সেই প্রতিক্রিয়ার পর, দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল

যুবক বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্র।

এবং সেই সময় বাঙ্গালায় যে মনীষাস্ফুরণ হয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। জমী নানা কারণে পতিত থাকিলে বা কৃষিকার্য্যে বাধা ঘটিলে তাহার পর বন্যাবারিপাতোর্ব্বর ভূমিতে উপযুক্ত যত্নে চাষ করিলে যেমন শস্য ফলে, তখন রাজনীতিক অশান্তিমুক্ত বাঙ্গালায় অনুশীলনফলে তেমনই মনীষার স্ফুরণ হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক নূতন যুগের শেষ হইতেছিল। দিনান্ত তপন তখন পশ্চিমদিকচক্রবালে হেলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহার কিরণ আকাশে কি বিচিত্র বর্ণচ্ছটা ছড়াইয়া দিয়াছে!

তখন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বাঙ্গালীর জন্য সাহিত্যের সকল বিভাগের দ্বারমুক্ত করিয়া তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী তখন সাহিত্যের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি না করিয়া মানুষ গড়িবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। 'আনন্দ-মঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' আংশিকরূপে যাহা ব্যক্ত করিয়াছে, সেই আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি—'কৃষ্ণচরিত্রে'। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন হিন্দুর পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজক হেষ্টির সহিত ইংরাজীতে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; শেষ বয়সে তিনি তাঁহার দেশবাসীকে 'অনুশীলন'-তত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন এবং যিনি ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুযুধান্ কৌরব ও পাণ্ডববাহিনীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মানবজাতিকে কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মসম্বন্ধে গীতার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন-কথার আলোচনা করিয়া অনুশীলন-ধর্ম্মের পরিণতি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক কাশীনাথ ত্র্যম্বকতেলাং বোম্বাইয়ে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—ইংরাজীতে; পরে বালগঙ্গাধর তিলক ও মোহনদাস করমচাদ গান্ধী গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তিনি সে বিষয়ে তাঁহাদিগের পূর্ব্বগামী।

এইরূপে তৎকালে বাঙ্গালী মনীষার সকল ক্ষেত্রেই অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদিগের অগ্রণী। আজ যাঁহারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিজ্ঞান-গবেষণাগার দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন, তাঁহারা কি কলিকাতায় পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে পরিকল্পিত বিজ্ঞান-সভার কথা অবগত আছেন? তাহার অনুষ্ঠানপত্রে অনুষ্ঠাতা মহেন্দ্রলাল সরকার লিখিয়াছিলেন—

"এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; তন্নিমিত্ত ভারত-বর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করি-বার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে,

রমেশচন্দ্র দত্ত।

এবং আবশ্যকমতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা-সভা স্থাপিত হইবে।

"ভারতবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন

বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য; আর ভারতবর্ষ-সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে,

মহাত্মা গান্ধী।

তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।

"সভা স্থাপন করিবার জন্য একটি গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিবিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটি আবশ্যকানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা, বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞান-শাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী, কিন্তু উপয়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।"

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা লিখিবার সময় মনে হয়, তাহারও পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে—যখন এদেশে বিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষা কি প্রকার হইবে, ইংরাজগণ তাহার আলোচনা করিতেছিলেন, তখন—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী রামমোহন রায় তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, সরকার দেশে বিদ্যাবিস্তারকল্পে যে অর্থব্যয় করিবেন, তাহা গণিত, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে ব্যয়িত হইলে উপকার হইবে এবং সেই জন্য আবশ্যক পুস্তক ও যন্ত্রাদি-সম্বলিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে য়ুরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় লোকের দ্বারা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—প্রতীচ্য আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু যখন তাঁহার বিজ্ঞান-সভার বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তখনও বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা বিস্তার হয় নাই—প্রেসিডেন্সী কলেজ ও খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজকদিগের সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ ব্যতীত অন্যান্য কলেজে বিজ্ঞান-পরীক্ষাগার ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের সর্ব্বপ্রথম বে-সরকারী মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতার কারমাইকেল কলেজের অনুষ্ঠাতা রাধাগোবিন্দ করের মত মহেন্দ্রলাল সরকারও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু একাধিক কারণে মহেন্দ্রলালের কার্য্য রাধাগোবিন্দ বাবুর কার্য্য অপেক্ষাও দুষ্কর হইয়াছিল। প্রথম কারণ—ডাক্তারী শিক্ষা অর্থকরী বলিয়া লোককে
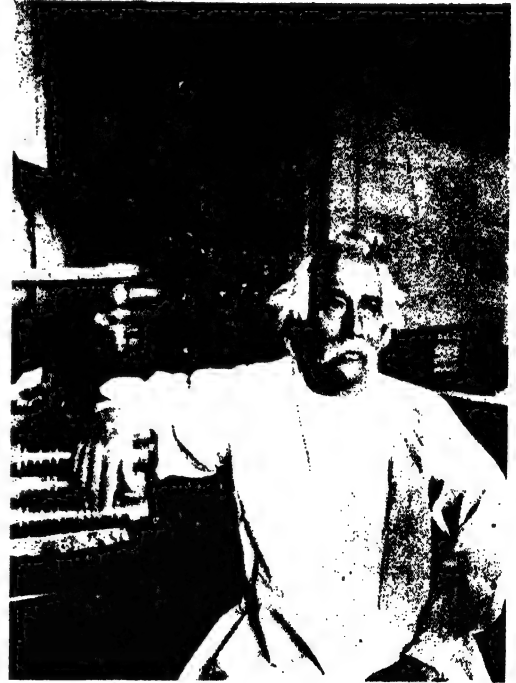
মহেন্দ্রলাল সরকার।

সহজে আকৃষ্ট করে এবং তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা সপ্রকাশ; কিন্তু বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-চর্চ্চায় সেরূপ

স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব নহে। দ্বিতীয় কারণ—মহেন্দ্রলালের কার্য্য বহুদিন পূর্ব্বের এবং তখনও বিজ্ঞান-শিক্ষার উপযোগিতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিশেষভাবে এ দেশে উপলব্ধ হয় নাই ; সে হিসাবে মহেন্দ্রলাল সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী। আবার তিনি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি ত্যাগ করায় সমব্যবসায়ীদিগেরও অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সমব্যবসায়ীরা তাঁহার অর্থোপার্জ্জনোপায়ও নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবশ্যক অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গদর্শনে' এই অনুষ্ঠানের আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় :—

"অনুষ্ঠাতা মহেন্দ্রবাবু চাঁদা বা স্বাক্ষরকারীদিগের নাম সাদরে গ্রহণ করিতেছেন। এই অনুষ্ঠানপত্র আজ আড়াই বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে। এই আড়াই বৎসরে বঙ্গ-সমাজ চল্লিশ সহস্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন।"

কিন্তু মহেন্দ্রবাবু উদ্যম ত্যাগ করেন নাই এবং তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে। বিজ্ঞান-সভার গবেষণাগারে গবেষণাফলে কোন বৈজ্ঞানিক যে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বাঙ্গালীরা তখন মাতৃভাষাকে কিরূপ পূর্ণ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চাশ বৎসরেরও কিছু অধিককাল পূর্ব্বে বঙ্গ-সমাজ-মধ্যে প্রচারিত মিষ্টার বীম্‌সের সাহিত্য-সমাজ-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। এই বীম্‌স্ ভারতের আধুনিক আর্য্য ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলনে ও সভ্যতা-বর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে।"

মিষ্টার বীম্‌স্ বাঙ্গালার এই উন্নতি লক্ষ্য করিয়া মনে করিয়াছিলেন—"বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার এবং সাহিত্যে প্রয়োগযোগ্য ভাষা-নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে ভাষার সচ্ছন্দ গতি প্রহত হইত [illegible] ও উন্নতির [illegible] বাঙ্গালাভাষাকে এইরূপ নিয়মব[illegible]

নবীনচন্দ্র সেন।

করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। সে ভাষা নিজের প্রয়োজনে আপনি আপনার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর ভাষার যে রূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহারই আবশ্যক পরিবর্ত্তন সম্পাদিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যিকরা লেখ্য ভাষা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। সমগ্র বাঙ্গালায় একই লেখ্য ভাষার সাহায্যে ভাব ও জ্ঞানের প্রচার হইবে, ইহা বাঙ্গালার মনীষীরা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই সকলে একরূপ ভাষা ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চব্বিশ পরগণার বঙ্কিমচন্দ্র, যশোহরের মধুসূদন ও দীনবন্ধু, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ও চট্টগ্রামের নবীনচন্দ্র যদি, যিনি যাঁহার প্রদেশাংশের কথ্য ভাষায় রচনা করিতেন, তবে আজ বাঙ্গালার কি অবস্থা হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। বাঙ্গালা ভাষার জীবন-শক্তির পরিচয় তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীলতায় পাওয়া যায়। সংস্কৃতানুযায়ী ভাষার রীতি পণ্ডিতদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া মুসলমান শাসনকালে যাবনিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। "যে মুসলমানেরা পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর এই বঙ্গে আধিপত্য করিয়াছেন; ধর্ম্মে মাণিকপীর, সত্যপীর, ওলাবিবি, বনবিবি চালাইয়াছেন; ধর্ম্ম সংস্কারে দশ-সংস্কারের উপর সমাধিসংস্কার চালাইয়াছেন; কৃষিবিজ্ঞানে মামদোভূতকে প্রত্যেক কবরস্থানে বসাইয়া রাখিয়াছেন; যে যবন সাধারণ বাঙ্গালীর নয়নপথে পরীকে জিনীকে আকাশমার্গে উড়াইতেছিলেন; যে যবন বাঙ্গালীদেহের উপরার্দ্ধের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, আহারপদ্ধতির উন্নতি (?) শিক্ষা দিয়াছেন, সমস্ত ভূভাগের বন্দোবস্ত নিজমতে করিয়াছেন, আয়ব্যয়নিরূপণপদ্ধতি নিজমতে প্রচার করিয়াছেন; সেই যবন যে বাঙ্গালা ভাষার রীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

এ কথা বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। তাহার প্রমাণের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হয় না। যে ভারতচন্দ্রের "ভারতীভরসা"—যিনি বাঙ্গালায় মুসলমান শাসন ও ইংরাজাধিকারের সন্ধিস্থলে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সভাকবিরূপে কথার তাজমহল রচনা করিয়াছিলেন, সেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত কবি ভারতচন্দ্রের রচনায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁহার রচনার একদিকে যেমন তাঁহার সংস্কৃতে অসাধারণ অধিকার সপ্রকাশ, অন্যদিকে তেমনই বহু যবন-শব্দের অনায়াস ব্যবহারে তৎকালীন প্রচলিত ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের ভাষা তাঁহার কল্পিত বর্দ্ধমানের মত; তাহার একদিকে—

"ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥"

আর এক দিকে—

"ইংরাজী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থামে বান্ধা বাজি॥"

ভারতচন্দ্রের রচনায় যাহা দেখা যায়, তাহা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল:—

"দুনিয়ার মাঝে, বাবা, সব ভরপূর,
বাবা, সব ভরপূর।"

আর—

"দুনিয়ার মাঝে, বাবা, সব হায় ফাঁক,
বাবা, সব হায় ফাঁক।"

ইংরাজী শাসনের প্রভাবও বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে প্রতিভাত। বহু ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা রচনায় অবাধে ব্যবহৃত হইতেছে এবং ইংরাজীর ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশীয় রচনারীতিও বাঙ্গালায় অনুসৃত হইয়াছে। উপন্যাস—ইংরাজী ও ফরাসী উপন্যাসের অনুকরণে—সেইরূপ পদ্ধতিতে রচিত হইয়াছে ও হইতেছে।

মধুসূদন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে অবস্থানকালে চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন —"ইতালী বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন"—তথায় কবিদিগের অনুকরণে তিনি চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তাহাতে প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকরা কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালা ভাষা যে অনায়াসে ভিন্ন দেশীয় শব্দ ও ভাব গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে, তাহাই তাহার সজীবতার চিহ্ন।

ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর এদেশে শিক্ষাবিস্তার জন্য নূতন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তখন বাঙ্গালায় ব্যাকরণ হইতে অভিধান পর্য্যন্ত রচনার উৎসাহ দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার যেমন বর্ণপরিচয় ও সাহিত্যপাঠ রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও বৈয়াকরণ লোহারাম শিরোমণি যথাক্রমে ভূবিদ্যা, পাটিগণিত ও ব্যাকরণ রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'প্রথমশিক্ষা বীজ-

গণিত' সঙ্কলিত করেন। যাঁহারা পাটিগণিত, বীজগণিত, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষাপুস্তক রচনা করেন, তাঁহাদিগের গঠিত পরিভাষা আজও ব্যবহৃত হইতেছে। সেই সকল পরিভাষা গঠনে তাঁহারা অবশ্যই সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁহাদিগের কার্য্যের গুরুত্ব যে অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কলিকাতায় শত বৎসর পূর্ব্বে যে মেডিক্যাল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই এদেশে ঐজাতীয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের পথিপ্রদর্শক। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্রথম চিকিৎসাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, তখন বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যেই তাহাতে য়ুরোপীয় চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত-কলেজে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যাপনার আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আরবী ও উর্দ্দু অনুবাদ-গ্রন্থের সাহায্যে ঐ কার্য্য সম্পাদনের জন্য মাদ্রাসায় একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ঐ বৎসর ১লা জুন তারিখে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে মৃত জন্তুর দেহ লইয়া শববাবচ্ছেদ করিয়া শিক্ষাদান হইত। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দু মধুসূদন গুপ্ত সর্ব্বপ্রথম মানুষের মৃতদেহ এই কার্য্যের জন্য ব্যবহার করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রতীচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য ৪ জন বাঙ্গালী ছাত্র—সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু ও গোকুল শীল—য়ুরোপ যাত্রা করেন। ঐ বৎসরই হাসপাতালের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া মতিলাল শীল হাসপাতাল-গৃহ নির্ম্মাণ জন্য মেডিক্যাল-কলেজ সংলগ্ন ভূমি প্রদান করেন। তখন কলেজে বাঙ্গালায় শিক্ষাপ্রদানের একটি বিভাগ ছিল। তাহাই পরে ক্যাম্পবেল স্কুলে পরিণত হয়। ঢাকাতেও ঐরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন ক্যাম্পবেল স্কুলেও ইংরাজীতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়—বাঙ্গালা অবজ্ঞাত! বাঙ্গালী ছাত্র কেন যে তাহার মাতৃ-ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষার সাহায্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে, তাহার সঙ্গত কারণের সন্ধান পাওয়া যায় না। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে—ডাক্তার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন—এ দেশের দেশীয় ভাষাই শিক্ষার্থীদিগের মাতৃভাষা—সে ভাষা শিক্ষায় অর্থ ও সময়ের ব্যয় অধিক হয় না; কাজেই সহজবোধ্যতা ও ব্যয়াল্পতা দেশীয় ভাষায় শিক্ষার পক্ষে প্রবল যুক্তি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে দেশীয় ভাষায় বহু পুস্তকের অভাবই প্রথম অসুবিধা। সে অসুবিধা দূর হইতেছিল এবং যদি সহসা সরকার বঙ্গদেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞান পঠনপাঠনে বাঙ্গালা ভাষা নিষিদ্ধ না করিতেন, তবে আজ, বোধ হয় আর সে অসুবিধা অনুভূত না। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে এবং তাহার পরেও বহুদিন বাঙ্গালায় এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচিত হইয়াছিল।

রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম্মের নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনাকেই সাধনার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এ কল্পনা তিনি বিদেশ হইতে বা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে সংগ্রহ করেন নাই। হিন্দুধর্ম্ম প্রণেতারা মানবচরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন। তাঁহাদিগের কথা—"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই

স্বামী বিবেকানন্দ।

অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে শ্রীকৃষ্ণ।" খৃষ্টধর্ম্ম-যাজকরা ও তাঁহাদিগের পূর্ব্বে মুসলমানরা হিন্দুধর্ম্মের বাহিরের আড়ম্বর মাত্র দেখিয়া তাহার নিন্দা করিতেন। সেই ধর্ম্মের তত্ত্ব বিদেশেও প্রচার করিয়া প্রতীচ্যের ভ্রান্তির অবসান করাইবার কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বাঙ্গালী কেশবচন্দ্র সেন। তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গমন করেন। তাঁহার সুহৃদ্ ও সহকর্ম্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে নানা দেশে প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেদিকে বাঙ্গালাই দিক্‌পাল।　[ক্রমশঃ

প্লাবন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোনও দিন যাহা ঘটে না, ঘটা একরকম অসম্ভব বলিয়াই সকলের ধারণা, সেদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে তাহাই ঘটিল। তাস-পাশার আড্ডা, বন্ধু-বান্ধবের মজলিশ, সবের মায়া ও মোহ ত্যাগ করিয়া হেরম্বনাথ সন্ধ্যার পরেই গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পরিচিত মোটরের পরিচিত হর্ণের শব্দে চকিত হইয়া গৃহিণী সেলাই ফেলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শঙ্কা হইয়াছিল, কর্ত্তা হয়ত, অসুস্থ হইয়া এই অসময়ে গৃহে ফিরিলেন। রাত্রি দশটার পূর্ব্বে দুই একবার তিনি দ্বিতলে উঠিয়াছেন তাহা অসুস্থ হইয়াই। আজও তাই মনে হইয়াছিল। তাঁহাকে সুস্থ শরীরে উপরে আসিতে দেখিয়া গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটিল। ক্ষণপ্রভা কাজকর্ম্ম তুলিয়া রাখিয়া এক দৌড়ে নীচে নামিয়া গেল। ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব করিয়া খানিকটা গাড়ী চড়িয়া বেড়াইয়া আসিবার ইচ্ছা। ইন্দু তখনও নিজের শয়ন-কক্ষে, দ্বার বন্ধ।

হেরম্বনাথ হল-ঘরের সোফায় গৃহিণীর পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, আজ পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠল, না ইয়ার-বন্ধুরা বয়কট্ করলে, না তাস-পাশার দুর্ভিক্ষ হলো? আমার তো ভয়েই প্রাণ উড়ে গেছল; ভাবলুম, অসুখ-বিসুখ হয়ে ফিরলে নাকি! ব্যাপার কি বল দিকিন?

হেরম্বনাথের বয়সটা হঠাৎ যেন ত্রিশ বৎসর কমিয়া গেল: সোফাটা টানিয়া গৃহিণীর সোফার গায়ে লাগাইয়া, এক গাল হাসিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলুম।—বলিয়া লাবুর বাম হাতখানি ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিলেন।

হাতটি মুক্ত করিয়া লইয়া লাবু বলিলেন, ত্রিশ বছরের মধ্যে, একটি দিন যে কাজ করবার ফুর্সৎ হলো না, আজ হঠাৎ সেই কাজ করতে এসেছ, এই কথা আমি বিশ্বাস করছি আর কি!

—বিশ্বাস না কর ত আর কি করছি বল। কিন্তু সত্যি আজ সবাইকে আসতে বারণ ক'রে দিয়ে এলুম।—বলিয়া প্রৌঢ়বয়স্ক হেরম্বনাথ যুবক-হেরম্বনাথ হইয়া দ্বিতীয় বার লাবুর কর ধারণ করিলেন।

কৈফিয়ৎটি তবুও গৃহিণীর মনঃপূত হয় নাই। না হইবারই কথা। যে লোককে কোনও কাজের কথা শুনাইতে হইলে, পাঁচ সাতদিন ধরিয়া অবসর খুঁজিতে হয়; যে লোকের কথা বলিবার অবকাশের নিদারুণ অভাব, সেই লোক গল্প করিতে অথবা গল্প শুনিতে বসিবে! গৃহিণী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে, আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তবে, কৈফিয়তে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট না হইলেও, খোস খবরের ঝুটাও ভাল হিসাবে মনটি যে প্রফুল্ল হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না।

হেরম্বনাথ প্রেমিকের মত, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখছ?

দেখছি—বলিয়া গৃহিণী হাসিয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, কৈ, গল্প করছ না?

হেরম্বনাথ সাশ্চর্য্যে কহিলেন, বাঃ, গল্প আমি করব, না তুমি করবে? আমি ত শুনব।

গৃহিণী মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তবে যে ঘরে ঢুকেই বললে, গল্প করতে এলুম।

—তাই বললুম না কি! তবেই ত।

বেচারা সত্যই মুস্কিলে পড়িয়াছেন। গল্প করার অভ্যাস ত নাই-ই, কেমন করিয়া বলিতে হয় বা কেমন করিয়া শুনিতে হয়, সে সম্বন্ধেও এই ব্যক্তির কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। ওয়েলিংটন জুট, বরাকর কোল্, হিমালয়ান্ রেল প্রভৃতির শেয়ার কিরূপ চড়-চড় উঠিতেছে ও তর-তর নামিতেছে, সে বৃত্তান্ত কণ্ঠস্থ আছে; দাবার ছকে মাস্ত্রীবরকে কি ভাবে সপ্তরথী-পরিবৃত অভিমন্যু-বৎ বধ করা যায়, সে কৌশল সবিস্তারে বর্ণন করিবার শক্তিরও অভাব নাই। কিন্তু আর কোন গল্পের সহিত ভদ্রলোক এ জীবনে পরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই। গৃহিণী তখনও তাঁহার পানে চাহিয়া

মিটি-মিটি হাসিতেছিলেন, একটা কিছু না বলিলেও নয়। তাই চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সোনার দামটা আবার চড়তে আরম্ভ করল—বুঝলে ?

প্রাণপণ কষ্টে হাস্য গোপন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, এখন কত হোল ?

—প্রায় চৌত্রিশ ! হবে না ? জাহাজ ভরে ভরে সোনা বিলেত চলে গেল, দাম না চড়ে পারে ?

গৃহিণী বলিলেন, সত্যই ত !

আবার সব চুপ। কর্ত্তা ঘড়িটার দিকে চাহিলেন, সাতটা বাজিতে দশ মিনিট ; বোধ হয় দম ফুরাইয়া আসিয়াছে। পেণ্ডুলামটা বড় আস্তে আস্তে প্রাণহীনের মত দুলিতেছে। পাখার ব্লেডগুলায় ধুলা জমিয়াছে, চাকরগুলা করে কি ? এঃ, কড়িকাঠে কুমীরকে পোকা বাসা বাঁধিয়াছে ; নাঃ, নিজে না দেখিলে কিছু যদি হয় ! হেরম্বনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যখন এইরূপে দৃশ্যের পর দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া, মনোমধ্যে ঘন ঘন চিন্তার খোরাক যোগাইতেছিল, তখন অবরুদ্ধ হাস্যের চাপে তস্য গৃহিণীর শরীরটা ফুলিয়া ফুলিয়া অবশেষে ফাটিয়া চৌচির হইবার উপক্রম করিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত হাসি আর চাপিতে পারিলেন না, বলিলেন, তারপর ?

হেরম্ব অপ্রতিভ হইয়া ঐ 'তারপর'টা উচ্চারণ করিয়া গৃহিণীর পানে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পরমুহূর্ত্তেই ত্রুটী সারিয়া লইবার জন্য বলিলেন, দেখ, এবার হল-ঘরটা পেন্ট করিয়ে নিতে হবে, কি বল ?

গৃহিণী তখনও হাসিতেছিলেন, বলিলেন, তারপর ?

হেরম্ব হাসিয়া বলিলেন, তারপর তুমি।

গৃহিণী পুনশ্চ কহিলেন, তারপর ?

—আবার তারপর ? তারপর আমি। মানে, তুমি আর আমি।

গৃহিণী বলিলেন, খুব গল্প করতে শিখেছ ত !—বলিয়া সোহাগভরে হেরম্বকে একটুখানি ঠেলিয়া দিলেন। গল্প করিতে জানেন না বলিয়া হেরম্বনাথ যে রসিকতার জবাব দিতেও অক্ষম তাহা নহে। ঢিলটি খাইয়া, পাটকেলটি ফিরাইয়া দিতে একটি মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। হঠাৎ মনে পড়িল, মেয়েরা কেহ কাছে-পিঠে নাই ত, চারিদিক দেখিতে দেখিতে বলিলেন, ইন্দু কোথা ? খনা ?

গৃহিণী বলিলেন, খনা ত এই ছিল, বোধ হয় গাড়ী পেয়ে বেড়াতে গেছে। তারপর, দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কক্ষটি দেখাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, বড় রাণী বোধ হয় গোসা-ঘরে।

—কেন, কেন ? ইন্দু, ইন্দু !—বলিতে বলিতে তিনি রুদ্ধ কবাটে ঠেলা দিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। কক্ষ অন্ধকার। হেরম্বনাথ ডাকিলেন, ইন্দু, কি করছিস রে ?

—শুয়ে আছি বাবা।

—অসময়ে শুয়ে কেন ? উঠে আয়, উঠে আয়। আমি কোথায় তাস-টাস সব বারণ করে উপরে এলুম, তোদের সঙ্গে গল্প করব বলে ! উঠে আয় মা, উঠে আয়।

—আসছি বাবা ; তুমি বস।

পরমুহূর্ত্তে আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং এক মিনিট পরে ধীর, মন্থর গমনে ইন্দু হল-ঘরে আসিয়া পিতার পার্শ্বের সেটি-টায় বসিল। মা'র পানে সে চাহে নাই ; চাহিতে পারে নাই। মুখটি আড় করিয়াই ঘরের বাহির হইয়াছিল। এবং সেই ভাবেই আসিয়া বসিল।

হেরম্বনাথ কন্যার পিঠের উপর সস্নেহে হাত রাখিয়া, ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিলেন, শরীর ভাল আছে ত রে ?

—আছে—বলিয়া পার্শ্বের ক্ষুদ্র টেবিলের উপর হইতে একখানা ইংরাজী মাসিক পত্র তুলিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট—এই রকম করিয়া সময় কাটিতে লাগিল, অথচ একটি কথাও নাই। গৃহিণী অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন, ইন্দুর দৃষ্টি পুস্তকের পত্রে নিবদ্ধ, হেরম্বনাথ অবোধ শিশুর মত একবার কন্যার, আর একবার কন্যার জননীর পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। বিস্ময়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে।

ইন্দু মেয়েটির স্বভাবের স্বল্প পরিচয় দিতে হইতেছে। মেয়েটি বাচাল নয়, আবার ভিজা বিড়ালও নয় ; কথা বেশী বলে না ; তবে চুপ করিয়া বা গুম হইয়া বসিয়া থাকিতেও পারে না। পিতামাতার সম্মুখে এমন ভাবে বসিয়া থাকিতে তাহাকে কখনও দেখা যায় নাই। একটা কিছু যে ঘটিয়াছে, অথবা মাতা ও দুহিতার মধ্যে মনান্তর ঘটিয়াছে, ইহা বুঝিতে হেরম্বনাথের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার বিশেষ দোষও নাই। ইন্দু যে কাহারও উপর

রাগ করিয়া মুখ গোমড়া করিতে পারে, ইহা তাহার পিতার একেবারেই অজ্ঞাত ও অপরিকল্পিত। কিন্তু যখন বুঝিলেন, সত্যই তাহাই, তখন ভদ্রলোকের ভিতরটা অস্বস্তিতে ভরিয়া গেল। ঘটনাটা কি ঘটিয়াছিল জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জাগ্রত না হইল তাহা নহে, কিন্তু তাহা মুহূর্তের জন্য; পরমুহূর্তেই তিনি তাহা বিস্মৃত হইলেন। প্রতীকারোপায়ও যেমন অজ্ঞাত, সামঞ্জস্য-বিধানের পন্থাও তদ্রূপ অজ্ঞাত। তাঁহার কেবল মনে হইল, তাস-পাশাগুলা বারণ করিয়া আসা উচিত হয় নাই। কেন যে বন্ধুবান্ধবকে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ভাবিয়া মনস্তাপের সূচনা মাত্রেই মনে পড়িয়া গেল, ইন্দুর বিবাহ সম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্যই আজ আড্ডা স্থগিত রাখিয়া আসিয়াছেন। আসিয়া, এই বিভ্রাট!

দুহিতার সম্মুখে মাতা, অথবা মাতার সম্মুখে দুহিতা আসল কথাটা যে কেহই বলিতে পারিবে না, কি করিয়া জানি না, এ বোধটুকু হেরম্বনাথের হঠাৎ জন্মিল। একজনকে সরাইতে না পারিলে কোন কথাই হওয়া সম্ভব নয়। হেরম্বনাথের মাথায় বুদ্ধি খেলিল; গৃহিণীর দিকে চাহিয়া, বলিলেন, হ্যাঁগা, একটু চা খাব নাকি?

গৃহিণী তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন—খাবে? করতে বলি। আমি জানি তুমি 'মার্কেটে' চা খেয়েছ, তাই জিজ্ঞেস করিনি।

—'মার্কেটে' খেয়েছি বৈ কি! আর এক পেয়ালা হলে মন্দ হয় না।

—বেশ ত, মন্দ হবার দরকারই বা কি! ভালই হোক্। আমি চা করিয়ে আনছি, তার সঙ্গে আর কিছু খাবে?

—তা খেতে পারি।—বলিয়া হেরম্বনাথ হাসিলেন। গৃহিণী মনে মনে সবই বুঝিলেন। তবে তাঁহার মন নাকি দৃঢ়তায় পূর্ণ ছিল, তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধেও সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ ছিল না, তাই তিনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

হেরম্বনাথ বেশ করিয়া চারিদিকে দেখিয়া লইয়া ডাকিলেন, ইন্দু।

ইন্দু কাগজখানা বন্ধ করিল।

—কি হয়েছে বল্ ত মা?

নতমুখে ইন্দু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হেরম্বনাথ বলিলেন, শীগ্‌গির বল্ মা, তোর মা হয় ত এখুনি এসে পড়বেন, আর আমার শোনা হবে না। কি হয়েছে বল্ ত?

—আমাদের বাড়ীতে আর আসবে না।

—আসবে না? কে আসবে না? বিমল? কেন, আসবে না কেন? কে বললে আসবে না?

—আমায় বলে গেছে।

—বলে গেছে? আসবে না! তাই ত।

হেরম্বনাথের মনে হইল, সংসারের ঘটনাগুলা কেবলই জট্ পাকায়; তাস-পাশা ঢের সহজ সরল।

ইন্দু বলিল, মা এক রকম বারণই করে দিয়েছেন আসতে।

সমস্যা যে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনুভব করিয়া হেরম্বনাথের মন কেবলই তাস-পাশার দিকে ছুটিতেছিল। পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া, ইন্দু অভিমানভরে কহিল, তার বড্ড লেগেছে বাবা।

—লাগবারই ত কথা।—বলিয়া ফেলিয়াই হেরম্বনাথ স্ব-প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, কিছু ভয় নেই মা, ও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। বিমল যে নিশানাথের ছেলে! আমার বাড়ী যে তারই বাড়ী।

—কিন্তু বাবা, সে আর কোন দিন আসবে না।

—না, আসবে না! দেখ না, কালই আমি আন্‌ছি তাকে।

ইন্দু বলিল, না বাবা।

—না কি রে? নিশানাথের ছেলে! পাঠশালা থেকে বুড় বয়স পর্য্যন্ত নিশানাথ আর আমি—তোরা তার কি জানিস্? আজ নিশানাথ নেই, তার ছেলে আমার পর হয়ে যাবে! দূর পাগলী! আমি কালই ডেকে আনছি।

ইন্দু ধীর স্থিরকণ্ঠে কহিল, না বাবা, তুমি ডাকতে পাবে না; আর সেও আসবে না।

হেরম্বনাথ রাগ করিয়া বলিলেন, আসব না বলবার যো কি! তার বাবা মরবার সময় আমার হাতেই না তাকে দিয়ে গেছে! আমার কথা ঠেলবে বিমল? পৃথিবী উল্টে যাবে রে, উল্টে যাবে।

ইন্দু বলিল, যতদিন কাজকর্ম্মের জোগাড় না হয়—

হেরম্বনাথ বলিলেন, চুলোয় যাক্ তার কাজকর্ম্ম ! কালই আমি সব ব্যবস্থা করছি।

কন্যা সবিস্ময়ে পিতার মুখের দিকে চাহিল।

—তোর ও ছেলেমানুষী কথা আমি শুনব না, কিছুতেই না। নিশানাথ মরবার সময় ছেলেটাকে আমায় দিয়ে গেল, আমিও তাকে জামাই করব কথা দিলুম, আর একটা বছর কাটতে না কাটতে সব গোলমাল হয়ে যাবে! পাগল আর কি! কালই আমি পঁচিশ হাজার টাকা তার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে কাজ সুরু করতে বলে দিচ্ছি।

ইন্দুর বুক কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল ; মুখচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; বলিল, কিন্তু সে ত তোমার টাকা নেবে না বাবা। আর তুমিও কথা দিয়েছ—

—তাইত! তা' আমি তাকে দান নাই করলুম, কর্জ্জ দোব ; কর্জ্জ নিয়ে কাজ করুক, পরে শোধ করবে!—এক মিনিট থামিয়া আবার বলিলেন, এ কিন্তু তোর বড় অন্যায় ইন্দু। আমার মেয়ে, আমার জামাই, আমি যৌতুক দিতে পারব না? এ কোন দেশী নিয়ম রে? কোন কলেজের কোন বইয়ে পড়েছিস্ বল ত?

ইন্দু কথা বলিল না ; তবে সে যে তাহার মতে অবিচলিত তাহার মুখের প্রত্যেকটি রেখায় তাহা সুস্পষ্ট। সেদিকে সান্ত্বনার কোনই আশা নাই বুঝিয়া, হেরম্বনাথ নিজের মনেই বলিলেন, আমি কালই বিমলদের বাড়ী যাচ্ছি—

ইন্দু বলিল, তা' তুমি একশ বার যেও ; কিন্তু টাকা নিতে ব'ল না ; সে নেবে না, আমি জানি।—তারপরই অনুনয় করিয়া বলিল, তুমি শুধু একটি কাজ ক'রো বাবা। মাকে তুমি—

—সে বলতে হবে না মা ; সে আমি ঠিক করব। কিন্তু আমি ভাবছিলুম কি, এই ফাগুনেই তোদের—

বাধা দিয়া ইন্দু বলিল, উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করা কি উচিত? জ্যেঠামশায়ের একটা ইন্সিওর ছিল, মা ছেলের তাই থেকে চলছে কোন গতিকে। সেটা ফুরুলে তারপর?

হেরম্বনাথ কি বলিতেছিলেন, ইন্দু তার আগেই বলিল, মা ঠিকই বলেছেন, উপার্জ্জন না করলে বিয়ে করা উচিত নয়।

—এ সব ইংরেজী কথা। নাঃ!—বিরক্তভাবে তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

ইন্দু গালিচার উপর বসিয়া পড়িয়া পিতার পা'দুটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুমি শুধু ঐটি কর বাবা। মা যেন তাড়াতাড়ি ক'রে—বলিতে বলিতে ইন্দু কাঁদিয়া ফেলিল। অতিকষ্টে কথাটা শেষ করিল, তাহলে আমি বাঁচব না।

হেরম্বনাথ কন্যাকে সস্নেহে উঠাইয়া বলিলেন, সে হবে। কিন্তু তোমাকেও আবার কলেজে ভর্ত্তি হতে হবে মা।

—পড়তে আমার ভাল লাগে না বাবা।

—তা বললে হবে না। পড়ার অছিলায় দেরী করা যেতে পারে ; নইলে তোমার মা কিছুতেই শুনবেন না।

—কিন্তু আমার যে ভাল লাগে না।

—আচ্ছা বিমল কি বলে? পড়া সম্বন্ধে?

—তার ইচ্ছে নয়।

হেরম্বনাথ চিন্তিত মুখে বলিলেন, তাইত!

ইন্দু বলিল, আমার হাতে সংসারের সমস্ত ভার দাও বাবা, তাই নিয়ে আমি বেশ থাকব।

—আচ্ছা, না হয় তাই—বলিতে বলিতে অথবা ভাবিতে ভাবিতে হেরম্বনাথ নীচে নামিলেন এবং ক্ষণপ্রভাকে লইয়া মোটর সেই মাত্র গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিয়া, মহেন্দ্র বাবুর গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে তাস-পাশা দাবা-সতরঞ্চের বারমাস রথদোল।

চা জলখাবার লইয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, কর্ত্তা নাই। স্বামী বিবেকানন্দের জ্যোতিরোজ্জ্বল মূর্ত্তিখানির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইন্দু যেন সেই ত্রিদিবজয়ী সন্ন্যাসীর আননবিচ্ছুরিত তেজোধারায় স্নান করিতেছিল। মাকে দেখিয়া তন্ময়ত্ব ঘুচিল, বলিল, বাবা ত নীচে গেলেন এই মাত্র!

—কৈ, নীচেও ত নেই!

ক্ষণপ্রভা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবা মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী চলে গেছেন।

মা হাসিলেন ; মেয়েরাও হাসিল।

বোধ হয় মেঘ কাটিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিশানাথের সহকর্ম্মী পশুপতি বাবু জজ-আদালতে সেরেস্তাদার। বিমল মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিত।

পশুপতি বাবু ভরসার কথা কোনও দিনই বলিতে পারেন নাই। একদিন হঠাৎ প্রফুল্লভাবে বলিলেন, আজই তোমার কথা ভাবছিলুম, ভালই হয়েছে, এসে পড়েছ। একটা টিউসনি করবে?

টিউসনি শুনিয়া বিমল দমিয়া গেল। কিন্তু যাহা হউক একটা কিছু না করিলেও নয়। বলিল, করব।

পশুপতি বলিলেন, আমাদের জজ সাহেবের মেয়েকে পড়াতে হবে। সাহেব আজই আমাকে বলছিলেন। বরিশালে ছিলেন, ক'বছর মেয়েটির লেখাপড়া ভাল হয় নি। এখন ভাল ক'রে পড়াতে চান। পঞ্চাশ টাকা দেবেন টিউটরকে। করবে?

বিমল বলিল, আজ্ঞে হাঁ।

পশুপতি বলিলেন, খুব ভাল কথা। তা' বেশ, তুমি কোথা থেকে একটু ঘুরে ফিরে এস, তিনটে নাগাদ এলেই হবে। আমি টিফিনের সময় সাহেবের চেম্বারে গিয়ে কথা পাকা ক'রে আসব।

—যে আজ্ঞে, বলিয়া বিমল বাহির হইয়া গেল। কোথায় যাইবে! আদালতের হাতার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আদালতের ভিতরে কি হয় সে তাহা দেখে নাই, জানেও না, বাহিরে দেখিল, যেন উৎসব-ক্ষেত্র। চা-চপ-কাটলেটের দোকানে কি ভিড়! ময়রার দোকানেই বা কম কি! মুখ-কাটা ডাবের খোল পর্ব্বতের আকার ধারণ করিয়াছে। সোডা লেমনেডের দোকানের সম্মুখেও জনতা। সারি সারি কেরোসিন কাঠের বাক্স সাজাইয়া নানা বয়সের পান-ওয়ালী বসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে ঘিরিয়া পাঁচ সাত জন লোক—সামলাপরা মোক্তার, তকমা-আঁটা পেয়াদা, টাই-বাঁধা কোটপরা উকিল, ক্যাম্বিশের জুতা, ছিটের কোট গায়ে, চাদর গলায় মামলাবাজ। পানওয়ালী যেন হাকিম, এক হাতে পান চূণ খয়ের দিতেছে, যেন রায় লিখিতেছে, নথ নাড়িয়া বা অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গি করিয়া একটি একটি কথা বলিতেছে, যেন রায় দিতেছে, আর উকীল মোক্তার আমলা পেয়াদা আসামী ফরিয়াদী সেই রায় হাঁ করিয়া গিলিয়া খাইতেছে। দুই একজন নবা উকীলকেও এই হাকিমের এজলাসে ভক্তিভরে সমাসীন দেখিয়া, বিমল দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল।

বটবৃক্ষতলে দুই উকীলে বচসা লাগিয়া গিয়াছে। পরস্পরের অভিযোগ একজন অপরের মক্কেল ভাঙাইয়া লইয়াছেন। অনেক বাকবিতণ্ডা, গালিগালাজের পর তাঁহাদের মধ্যে যদি বা আপোষ-নিষ্পত্তি হইল, মক্কেল খালি পকেট দেখাইয়া মা কালীর দিব্য করিয়া কহিল, আসছে দিনে উকীল বাবুদের পাওনাগণ্ডা নিশ্চয়ই মিটাইবে। মক্কেলের পকেট, কোঁচার খুট, কাছা, অবশেষে জুতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদারক করিয়া সহধর্ম্মিণীর সহোদর-জ্ঞানে প্রিয়-সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিয়া, উকীলদ্বয় পানের দোকান হইতে ধারে দুইটি বিড়ি ক্রয় করিয়া, দড়ির আগুনে ধরাইয়া লইয়া নবাগত শিকারের আশা-পথ পরিক্রম করিতে লাগিলেন।

খুব শীঘ্রই তিনটা বাজিয়া গেল। বিমল পশুপতিবাবুর কাছে উপস্থিত হইতেই, তিনি বলিলেন, এস, এস, সাহেব চেম্বারেই আছেন, তোমার সঙ্গে এখনই কথা কইবেন।

কথায় খুব বেশী সময় লাগিল না। মেয়েটি মেধাবিনী, লেখা পড়া ভালই করিত, মেদিনীপুরে ম্যালেরিয়া হওয়ায় কেবলই ভুগিয়াছে, পড়াশুনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ বৎসর যদিই না পারে, আগামী বৎসরে ম্যাট্রিক দিতে পারিবেই। জজ সাহেব শুনিয়াছেন, কলিকাতায় খুব সস্তায় প্রাইভেট টিউটর পাওয়া যায়; তিনি সস্তার পক্ষপাতী নহেন; পঞ্চাশ টাকার কম কোন ভদ্রলোককে বলা যায় না।

জজ সাহেব বাঙ্গালী। কিন্তু বাঙ্গালীত্ব বড় কম। বাঙ্গালা কথা একটিও বলিলেন না। সিগারেট ধরাইবার সময় বিমলকেও অফার করিয়াছিলেন, খায় না শুনিয়া কৌটা পকেটে পুরিলেন। শেষ কালে বলিলেন, আপনি সম্মত?

বিমল পশুপতি বাবুর পানে চাহিল। পশুপতিই বলিলেন, ইয়েস, হুজুর।

আজ সন্ধ্যায় আসিতে বলিয়া জজ সাহেব কাগজ সই করিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিয়া পশুপতি সানন্দে কহিলেন, এতদিন পরে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন বলতে হবে। জজ সাহেবকে যদি সন্তুষ্ট করতে পার বাবা, চাকরীর ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কড়া জজ বলে মিঃ ঘোষের যেমন নামডাক, গবর্ণমেণ্টের কাছে তেমনই প্রতিপত্তি। একখানি চিঠি বের করেছ কি, গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস মারে কার সাধ্যি! তোমার বাবা আমায় হাতে করে কাজ শিখিয়ে-

ছিলেন বাবা, আমা হ'তে তোমার যে এতটুকু কাজ হল, এইতেই আমি ধন্য হয়ে গেলুম বাবা। ভগবান করুন তোমার ভাল হোক; উন্নতি হোক। নিশানাথ দাদা যেন স্বর্গ থেকে খুশী হন। তোমার মাকে আমার প্রণাম দিও বাবা।

বিমল পশুপতি বাবুকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইল। আজিকার সফলতার সংবাদটি কতক্ষণে জননীকে জানাইতে পারিবে, তাহারই জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দুঃখিনী মাকে সারা জীবন কষ্টেই দিনাতিপাত করিতে হইয়াছে। পিতার আয় ছিল সামান্য, কোন গতিকে সংসারটি চলিত মাত্র; অন্ধকারাচ্ছন্ন সারা জীবনের একমাত্র আশার প্রদীপটির পানে চাহিয়াই জীবন কাটিয়াছে। কিন্তু এমনই হতভাগ্য পুত্র সে, কোনদিনই প্রদীপে তৈল সংযোগ করিতে পারে নাই। পিতার মৃত্যুর পর হইতে সংসার ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছিল। লেখাপড়া শিখিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীর অধিকারী হইয়া কোথায় মাতার দুঃখের অবসান করিবে, তা নয়, হতাশার পীড়নে তাঁহাকে কেবলই পীড়ন করিয়া আসিতেছিল। দুটি প্রাণীর সংসার, পঞ্চাশ টাকায় একরূপ চলিয়া যাইবে, আপাততঃ ইহাই কি কম সান্ত্বনা! বিমলের মনে হইতেছিল, ট্রাম যথেষ্ট বেগে ছুটিতেছে না। কলিকাতা শহরের পথে পথে সহস্র সহস্র মোটর ছুটিতে দেখিয়া কোন দিন সে কিছু মনে করে নাই। অভাগার বুক ভাঙিয়া দিয়া, আজই প্রথম একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

জননীর পদতলে বসিয়া বিমল সংবাদ বিবৃত করিল; মার দু'নয়নে জল আসিয়া পড়িল; ছেলের চিবুক ধরিয়া মা আশীর্ব্বাদ করিলেন, ভগবান দুঃখিনীর বাছার উপর প্রসন্ন হইলে তিনি হাসিমুখে মরিতে পারেন।

শেষে বলিলেন, হাঁা বাবা বিমু, তোর কাকাবাবুকে খবরটা দিবি নে?

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

মা বলিলেন, আমাকে যেমন খবরটি দিয়ে সুখী করলি, তাঁকেও তেমনই খবরটি দিয়ে আয় বাবা! তাঁরাও ত তোকে বড় কম ভালবাসেন না বাবা!

বিমল তথাপি নীরব। মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চুপ ক'রে রইলি কেন রে? ঠাকুরপোদের বাড়ী যাস নে নাকি? তাঁর যে বড় বড্ড বড় কষ্ট রে, তিনি যেতে না যেতে এক বছরের মধ্যে সম্পর্ক তুলে দিলি বাবা।—মাতার চক্ষুর্দ্বয়ে জল টল টল করিতে লাগিল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, শেষ দিনটিতেও বার বার করে ঠাকুরপোর কথাই বললেন। বললেন, আমি যাচ্ছি, হেরম্ব রইল। হেরম্ব বিমলকে দেখবে। দায়ে অদায়ে হেরম্বই বিমলের অভিভাবক রইল।—একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, তুইও ত যেতিস্ বাছা, কবে থেকে যাওয়া বন্ধ করলি? হাঁারে বিমু, সত্যি করে বলবি, কাকাবাবু কাজ কর্ম্ম করে দেন নি বলে কাকাবাবুর ওপর অভিমান করেছিস বুঝি?

তবুও বিমল কথা বলিল না। মা পুনশ্চ বলিলেন, একটি কথা কোনদিন মুখে ফুটে বলেন নি বটে, তবে ভাবে বুঝতুম, তাঁর বড্ড ইচ্ছে ছিল, ইন্দুকে বৌ ক'রে আনেন। সেই কাল-রাত্রির কথা তোর মনে আছে বিমু? সেই যে আমার পানে চেয়ে বললেন, একটি সাধ পূর্ণ হোল না, আর বলতে পারলেন না, নিঃশ্বেসটি বেরিয়ে গেল, মনে আছে বাবা?

বিমল জননীর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া, বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, আছে মা।

আমার আজও মনে হয়, ঐ কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন—তিনি আবার চক্ষু মুছিলেন। কিয়ৎপরে কহিলেন, কতদিন মনে করেছি ঠাকুরপোকে ডেকে কথাটা বলি। বলি নি তোর একটা কাজ কর্ম্ম হয় নি বলে। তোর গলায় গোড়া থেকেই একটি বোঝা চাপিয়ে দিতে আমার ভরসা হয় না বাবা। ইন্দু মেয়ে ভাল, বড়লোকের মেয়ে হলেও বড়লোকী চাল নেই তা আমি জানি। তবু, আমার নাইকো-ঘরে তাকে আনতে আমার সাহস হয় না। ভগবান যদি মুখ তুলে চান, সেই আশাতেই চুপ ক'রে আছি।

বিমল তাড়াতাড়ি বলিল, তাই চুপ করেই থাক মা।

কিন্তু, একবার ঠাকুরপোর সঙ্গে কথাটা ক'য়ে রাখতে পারলে ভাল হয়।

—সে তখন একদিন হবে মা।

—আচ্ছা তাই। কিন্তু তুই একবার যা, বলে আয়।

সে যে যাইবে না, কাজেই বলাও হইবে না, এ কথাটা বিমল মা'কে বলিতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এইমাত্র একটি ক্ষুদ্র সুসংবাদ দিয়া মাতাকে যতখানি আনন্দ

দিয়াছে, এই কথায় তাঁহাকে তাহার চেয়ে অনেকখানি দুঃখ দিবে।

—মুখ হাত ধুয়ে ফেল্, আমি মোহনভোগ করে আনি, একটু জল খেয়ে ভবানীপুর বেড়িয়ে আয়, বলিয়া মা উঠিয়া গেলেন।

ভবানীপুর! জীবনের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে, ঐ নামধেয় পল্লীটি। কত সুখ-আশা, কত কামনা, কত বাসনা ঐ পল্লীর সঙ্গে জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বিমল হাতের উপর মাথা রাখিয়া মাদুরটায় শুইয়া পড়িল।

যাইতে হইবেই; কিন্তু সংবাদ দিবার জন্য নয়: একবার চোখে দেখিয়া চলিয়া যাইবে। সংবাদটি ইন্দুকে দিতে পারিলে মন প্রসন্ন হয়, তাহা সত্য; কিন্তু দিবার উপায় নাই। যে গৃহে অসঙ্কোচে প্রবেশাধিকার নাই, সে গৃহের কাহাকেও পত্র লিখিবার দুরাকাঙ্ক্ষাও সে পোষণ করে না। আর সংবাদটিও এমন উজ্জ্বল নয় যে, ইন্দুর মাতা তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন।

জলযোগ করিয়া বিমল ভবানীপুরে গেল। পরিচিত পথ, পরিচিত গৃহ, পরিচিত ফটকের সম্মুখ দিয়া চলিবার সময় নয়নদ্বয় মনের কড়া শাসন মানিল না। বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া ইন্দু দাঁড়াইয়াছিল! এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ইন্দু যেন একখানি বিষাদময়ী প্রতিচ্ছবির মত দাঁড়াইয়া ছিল, বিমলকে দেখিবা মাত্র তড়িতালোকে গৃহের মত, নিমিষে হাস্যময়ী প্রতিমা হইয়া উঠিল। বিমল চলিয়া গেল।

অনেকখানি পথ ঘুরিয়া সে যখন আলিপুরে জজ সাহেবের কুঠিতে পৌছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বেহারা তাহাকে ড্রয়িং-রুমে লইয়া গেল। সেখানে জজ সাহেব, পত্নী পুত্র-কন্যা সকলেই বসিয়া ছিলেন। মিঃ ঘোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিমলকে অভ্যর্থনা করিয়া সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। অবশেষে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ছায়া, তোমার মাষ্টার মশাইকে তোমার পড়বার ঘরে নিয়ে যাও।

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, শুনুন সুবিমল বাবু, আমার মেয়ে ছায়া অঙ্কে ভারী কাঁচা, অঙ্ক ওর মাথায় ঢুকতেই চায় না। অন্য সাবজেক্ট একরকম চালিয়ে নিতে পারে, কেবল অঙ্কটা পারে না। আপনাকে সেদিকে বিশেষ ক'রে অ্যাটেনসান দিতে হবে।

বিমল বলিল, যে আজ্ঞে।

আসুন মিঃ রায়—ছায়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কথাগুলি বলিল।

মেয়েটিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ হইবামাত্র বিমল দেখিল, মেয়েটি সুন্দরী, আদবকায়দাদুরস্ত এবং সে বিবাহিতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন রবিবার। বেলা তিনটা বাজিয়াছে। হেরম্বনাথের বৈঠকখানা-ঘর কচে-বারোর হুঙ্কারে ঘন ঘন বিকম্পিত হইতেছে। গৃহিণী ইন্দুর মাথার বেতো চুল বাছিতেছিলেন, ক্ষণপ্রভা অনেকগুলা ছবির বইয়ের ছবি দেখিতে দেখিতে বইগুলির মধ্যে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ফটকে মোটর ঢুকিল। তাহাতে কৌতূহলের কোন কারণ ছিল না। ছুটীর দিনে আড্ডাধারীদের সংখ্যাধিক্য ঘটেই; আড্ডাধারী-দের মোটর আছে। কিন্তু দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইতেই ইন্দু মায়ের কোলের উপর হইতে মাথাটা টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিল, কে আসছে!

এক মিনিট পরেই গৃহিণীর আবু-দি, তাঁহার জা', জায়ের কন্যা প্রভৃতি আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আবু ও লাবু দুই বাল্য-বন্ধু। আভা দুই এক বৎসরের বড় বলিয়া ছেলেবেলা হইতেই লাবণ্য তাহাকে দিদি বলিতেন। এক গ্রামের মেয়ে, দুই পরিবার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। দূরসম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল।

গৃহিণী সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতেছিলেন, আবু দি কহিলেন, বসলে হ'বে না, তোমাদের সব নিতে এসেছি। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা ছেলেদের একটি নাটক অভিনয় করবে, আজ তার পোষাক-মহল্লা, তোমাদের যেতে হবে। আগে খবর দিতে পারি নি, কেন না ঠিক ছিল না। তাতে আর কি হয়েছে বল্? কাপড় পরে নিতে কতক্ষণই বা সময় লাগবে! যা ইন্দু, চট করে কাপড়টা বদলে নে। তুইও ওঠ না ভাই লাবু।

একটু আগে খবর দিলে ভাল হতো ভাই। বলিতে বলিতে গৃহিণী কাপড় বদলাইতে গেলেন।

ইন্দু অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—করিয়াও ছিল, কিন্তু প্রবল স্রোতে তৃণখণ্ডের মত আপত্তি ভাসিয়া গেল। আবু-দি বলিলেন, আমি সব কাজ ফেলে ছুটে এসেছি, 'না' বললে শুনছে কে? শীগগির শীগগির নে ইন্দু। আমি না পৌছোলে ছেলেরা সব হাত-পা গুটিয়ে বসে পড়বে!

ইহার পরে আর কোন কথাই চলিল না।

নীচে কর্ত্তাকে খবর পাঠান হইল। কর্ত্তা শশব্যস্তে কহিলেন,বাস্‌রে! মহেন্দ্র তিনবার আমায় মাৎ করেছে, আমার কি নড়বার যো আছে!

সংবাদ-বাহক নিবেদন করিল,মা ঠাকরুণরা যাচ্ছেন, আপনাকে তাই বলতে বললেন।

খুব ভাল।—বলিয়া তিনি গজ দিয়া মহেন্দ্রের নৌকাডুবি ঘটাইলেন।

আবু-দি'র বাড়ীর ছেলেরা সত্য সত্যই অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় করিল। বহু বিখ্যাত সমজদার ও গুণীজন অভিনয়-স্থলে উপস্থিত ছিলেন; সকলেই অভিনয় ও নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। নাটকটির নাম—"অদৃষ্টের পরিহাস।" অল্প-বয়স্ক বালকেরা সরস্বতী পূজার দিন সমবেত হইয়া তাহাদের স্ব স্ব ভবিষ্যৎ জীবনের কাল্পনিক চিত্রাঙ্কন করিতেছে, এই বিষয়ের ভিত্তির উপরে নাটকটি সুগঠিত। লেখক আবু-দির দেবর। তিনি আবার হাকিম।

অভিনয় সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। রঙ্গপীঠের উপরে সভা বসিল। জনৈক প্রবীণ হাকিম ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা করিয়া নাটকের লেখককে অভিনন্দিত ও বালক অভিনেতৃবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনেকে লেখককে মাল্যবিভূষিত করিলেন; ছেলেদেরও নানা উপহার দান করিলেন।

সভান্তে সকলে যখন বিদায় হইতেছে, লেখক আসিয়া আবু-দি'র পার্শ্ববর্ত্তিনী তরুণীকে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কেমন লাগল বলুন?—এই তরুণী ইন্দু।

এত লোক থাকিতে লেখক তাঁহার অভিমত জানিতে চাওয়ায় ইন্দু অত্যন্ত বিস্মিত হইল; পুলকিত যে না হইল তাহা নহে! তবে লজ্জাও বড় কম নয়। ইন্দু অতি কষ্টে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সুন্দর হয়েছে।

লেখক বলিলেন, আর একদিন অভিনয় হবে। সরস্বতী পূজার দিন সন্ধ্যায়। সেদিনও আসতে হবে।

আবু-দি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—নিশ্চয়ই আসবে। আমি লাবুকেও বলে দিয়েছি।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায়?

আবু-দি বলিলেন, বাড়ীর মধ্যে ওঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে গেছেন। এলেন ব'লে। তা ঠাকুর পো, বড় গাড়ী ত সরযূদের নিয়ে বেলেঘাটা যাচ্ছে, আমি বলি কি, তোমার গাড়ীতে তুমি ইন্দুদের পৌছে দিয়ে এস না কেন!

—তা বেশ ত! আমার গাড়ী ত বাইরেই রয়েছে। চলুন, আপনাদের রেখে আসি।

ইন্দু আবু-দির পানে চাহিতেই, তিনি বলিলেন, দাঁড়াও ভাই, আমি ওর মা'কে ডেকে আনি।

আবু-দি অদৃশ্য হইতেই, লেখক ইন্দুকে বলিলেন, আসুন, আমরা ততক্ষণ গাড়ীর কাছে যাই।

গাড়ীর কাছে আসিয়া লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ড্রাইভ করেন?

ইন্দু সলজ্জ হাস্যে কহিল, আমি শিখিনি। আমার ছোট বোন খনা চমৎকার ড্রাইভ করে। আমি বড্ড নার্ভাস, ভয় হয়, তাই চেষ্টাও করিনি কখনও।

—নার্ভাস প্রথমটা সকলেই থাকে; দুই একদিন অভ্যাস করলেই নার্ভাসনেস্ কেটে যায়। শিখে রাখাটা ভাল। অনেক মেয়েই ত আজকাল ড্রাইভ করেন।

এই সময়ে দেখা গেল, আবু-দি, তাঁহার স্বামী, ইন্দুর মা ও ক্ষণপ্রভা সেই দিকেই আসিতেছেন। লেখক বলিলেন, খুব সোজা! একটু মনোযোগ দিলে দু'দিনও লাগে না।

—দুদিনও লাগে না?

—না। আমি আপনাকে একদিনে শিখিয়ে দিতে পারি; অবশ্য যদি আপনি রাজী হন। মনোযোগ দিতে হবে কিন্তু—

ইন্দুর মুখটি অকস্মাৎ ম্লান হইয়া আসিল; মৃদুস্বরে বলিল, মনোযোগ দিতে পারব কি! কে জানে!

যাঁহারা আসিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইতেই, লেখক আবু-দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমিও কেন চল না বৌদি, ওঁদের পৌছে দিয়ে আসবে।

আবু-দির স্বামী বলিলেন, যাও না, একটু বেড়ানও হবে 'খন।

তাই চল।

প্রথমে লাবুকে উঠিতে হইল, আবু-দিও উঠিলেন। ক্ষণপ্রভাও উঠিল। ইন্দুও সেই দিকে আসিতেছিল, আবু-দির দেবর বলিলেন, ওখানে আর ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি! আপনি এদিকে উঠে পড়ুন—ড্রাইভিংটা দেখা, শিক্ষার প্রথম সোপান।

ইন্দু বুঝি একটু ইতস্তত করিতেছিল, আবু-দি বলিলেন, দেরী করিস নে, উঠে পড় ইন্দু।

আবু-দির স্বামী ভ্রাতাকে বলিলেন, ওরে প্রণয়, ফেরবার সময় একটা দোকান থেকে একটিন সিগারেট আনিস ত!

আনিবে, বলিয়া প্রণয় গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। ছোট্ট গাড়ীখানা, নূতন—তক্-তক্ ঝক্-ঝক্ করিতেছে। ড্যাস্-বোর্ডে আলো জ্বলিতেছে, চালক কোন্ কলটি কি কাজ করে, কোন্টি কি নির্দ্দেশ করে, কোন্টি স্বাধীন, কোন্টির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, এই সব তত্ত্ব ইন্দুকে বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন। ভদ্রলোকটির বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল। ইন্দুর মনে হইল, এত সহজ জানিলে সে ত কবে শিখিয়া ফেলিতে পারিত! গাড়ীর কখন গতি বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার কখন হ্রাস পাইতেছে, এবং কতটা বাড়িতেছে আর কতটা কমিতেছে এই সব দেখিতে দেখিতে ভবানীপুর আসিয়া পড়িল। আবু-দি রাস্তা নির্দ্দেশ করিলেন। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া ইন্দু বলিল, ডান দিকে আমাদের গেট।

বাড়ীর সামনের রাস্তাটা অল্পপরিসর বলিয়া সকল গাড়ীকে একটু এদিক-ওদিক করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, প্রণয় এক ঝোঁকেই ভিতরে ঢুকিয়া বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী-বারান্দার দিকে যাইতে যাইতে ইন্দুকে বলিল, শিখবেন ত?

—তা শিখলে হয়, বলিয়া ইন্দু হাসিল। হাসিটি অত্যন্ত ম্লান। কিন্তু সেই ম্লান হাসিটুকুও প্রণয় যেন প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া লইল। বলিল, তাহ'লে কাল বিকেলে আসব?

ইন্দু ত্রস্তচকিত ভাবে বলিয়া উঠিল, না, না, বিকেলে নয়, বিকেলে আমার সুবিধে হবে না এইখানেই রাখুন। —যেন নামিতে পারিলে বাঁচে, এই ভাবে বাম হস্তে চলন্ত গাড়ীরই দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

দ্বারবান্ বাগানের ও গাড়ী-বারান্দার সমস্ত আলো জ্বালিয়াছিল। উদ্যানের সে কি বিচিত্র শোভা! বিদ্যুতালোকে কালো কালো গাছগুলিতে নানা বর্ণের সীজন ফ্লাওয়ার ফুটিয়া বাগানটিকে যেন হাস্যপ্রফুল্ল করিয়া রাখিয়াছে। যেদিকে চক্ষু পড়ে, তরু, লতা ও ফুল। নিশীথিনীর স্নিগ্ধতা, বিদ্যুতালোকের ঔজ্জ্বল্য উভয়ে মিলিয়া উজ্জ্বলে-মধুরে গড়া এক মায়ালোকের সৃষ্টি করিয়াছে।

গৃহিণী বলিলেন, একটু বসলে হোত না?

আবু-দির আগেই প্রণয় বলিলেন, আজ আর নয়; রাত হয়ে গেছে অনেক; আর একদিন তখন আসব।

—নিশ্চয়ই আসবেন। গৃহিণী কন্যাদ্বয়কে বলিলেন তোমরাও বল ওঁদের আসতে।

ক্ষণপ্রভার চোখে ও সেই সঙ্গে মাথায় নূতন মোটরখানা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাই ক্ষণপ্রভা সর্ব্বাগ্রে ও সাগ্রহে কহিল, কবে আসবেন? কাল?

ইন্দুও বলিল, আসবেন। আপনিও আসবেন মাসিমা।

আবু-দি কহিলেন, আচ্ছা গো আচ্ছা, আসব। আর তোমাকে খাতির করে মাসিমা-টাসিমা করতে হবে না। কাল যদি নাও পারি পরশু বিকেলে আসব। কি বল ঠাকুরপো পরশু বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে তুমি আমায় আনতে পারবে না?

—তা পারব না কেন?—বলিয়া ফেলিয়াই প্রণয় ইন্দুর পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। না আসিবার জন্য বিস্ময়জনক মিনতি যেন দুইটি চোখে ভরিয়া রহিয়াছে প্রণয় কিছু বুঝিল না।

দুই বাল্য সখীতে একান্তে কি কথা কহিতেছিলেন, সেই ফাঁকে প্রণয় বলিল, বিকেলে আসায় আপনার অমত আছে?

ইন্দু স্পষ্টকণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ।

—তাহ'লে কখন আসব বলুন?

সন্ধ্যের পর।

বেশ—তাই।

ইন্দুর নয়নে আননে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রে ইন্দু যখন বারান্দায় আসিয়া সামনের জনবিরল রাজপথটির পানে চাহিল, তখন তাহার মনে হইল, কাহার মুখ দেখিয়া আজ তাহার নিশাবসান হইয়াছিল, সমস্ত দিনটাই নষ্ট! সে যে এই পথ দিয়া গিয়াছে, এই বারান্দার পানে চাহিতে চাহিতে গিয়াছে, ইহা মনে পড়িতে ইন্দুর মনখানি যেন দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। (ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

তাজমহল
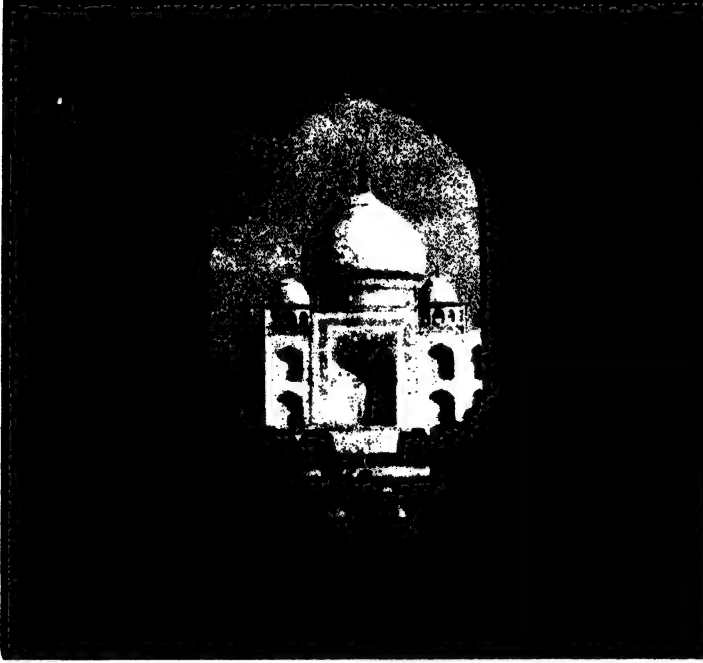
আলোক-চিত্র—শ্রীপ্রশান্তকুমার মজুমদার।

তাজের অনেক ছবি বাহির হইয়াছে যাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধ আছে, ক্যামেরা আছে তাজের ছবি তুলিতে তাঁহারই আগ্রহ জন্মে এই ছবিখানির শিল্পী, বালক। তাজ-তোরণে দ্বিতলে অলিন্দ হইতে তাজের সৌন্দর্য্য যে অধিকতর বিকশিত হয়, তাহা বুঝিয়া শিল্পী ছবিখানি তুলিয়াছেন।

মূলগন্ধকুঠী বিহার

সারনাথের নূতন বুদ্ধ-মন্দিরের অভ্যন্তর-প্রাচীরে ভগবান তথাগতের জীবনের ঘটনাবলী চিত্রিত করা হইতেছে। জাপানী চিত্র-শিল্পীরা এই কার্য্যের ভার পাইয়াছেন। মূলগন্ধকুঠি বিহারটির নির্ম্মাণ-কৌশল অতীব মনোরম। চিত্রখানিতে আকাশের মেঘের খেলা চমৎকার রূপে পরিস্ফুট। ক্ষুদ্রতম ক্যামেরার কাচে শিল্পী মেঘ ধরিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

আলোক-চিত্র—শ্রীপ্রশান্তকুমার মজুমদার।

বেসুরো

—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

ডাক্তারের নাম ফণীন্দ্র। নামটি উগ্র কিন্তু মানুষটি অতি নরম, কথায়-বার্ত্তায় লোকব্যবহারে; ফণীন্দ্র না বলে সুনির্ম্মল বলে তাঁকে অভিহিত করলে তাঁর অন্তর-বাহ্যের শুচিতার অনুরূপ হত।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁর পত্নীর মৃত্যু হয়; তিনি আর বিবাহ করবেন না এই সংকল্প করে আপাততঃ খুব শান্ত জীবন অতিবাহিত করছিলেন। কিন্তু কোন্ পথে ভবিতব্যের নিগূঢ় নির্দ্দেশ এই ঘূর্ণায়মান জগতটাকে নিয়ে যাচ্ছে তা নির্ণয় করে কার সাধ্য! গল্প-কথায় আছে, নদীতে কুমীরের মুখে রাজপুত্রের মৃত্যু লিখিত ছিল বলে, রাজপুত্র কখনও কোন জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হতেন না। রাজার হুকুমে রাত্রিদিন একজন রক্ষী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। বহুদিন পরে, বড় হয়ে, রাজপুত্র একদিন বললেন—"কখনও নদী দেখি নি; নদীর তীরে ত' আর কুমীর বসে নেই।" রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে নদীতীরে পরিভ্রমণ করতে গেলেন। জলের নিকটবর্ত্তী হবামাত্র রক্ষী ভীষণ গর্জ্জন করে কুমীরের মূর্ত্তি ধরে বললে—"আমি এতদিন পরে ভবিতব্যের লিখন সম্পূর্ণ করবার অবসর পেলাম।" এই বলে রাজপুত্রকে মুখে নিয়ে গভীর জলে চলে গেল।

ডাক্তারের বিপত্নীক জীবনে ভবিতব্যের অমোঘ নির্দ্দেশ অদ্ভুত পথে তাঁকে নিয়ে গেল। জীবন-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া হল না, তাকে একেবারে প্রবাহের ক্ষুরধার স্রোতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেললে।

* * *

ডাক্তার প্রতিদিন পাগলা-গারদের বিকৃত-মস্তিষ্কদের সংবাদ নিতে একবার করে টহল দিতে যেতেন। খাকি শর্ট, শার্ট, আর মাথায় শোলা হ্যাট। মেহেরুকে তার ভাই গারদে যেদিন ভর্ত্তি করে দিয়ে যায়, সেইদিন থেকেই, ডাক্তারের সঙ্গে চোখোচোখি হবার মুহূর্ত্ত থেকে, সে ডাক্তারের প্রতি কঠিন হয়ে তাকিয়ে দেখে। ডাক্তার দিনের পর দিন তাকে না দেখার ভাণ করেই দেখে যান, কারণ যে-পাগল চিকিৎসকের প্রতি প্রসন্ন নয়, তার তত্ত্বাবধান বা চিকিৎসা সে ডাক্তারের দ্বারা হয় না।

মাস তিনেক পরে ডাক্তারের মনে হল মেহেরু যেন ঠাণ্ডা হয়েছে—যেন প্রসন্ন হয়েছে। কিন্তু ডাক্তার ভুল বুঝেছিলেন; পাগলও আত্মগোপন করে নিজের অভিসন্ধিকে ঢেকে রাখতে পারে। ডাক্তার কাছে গিয়ে অতি মৃদুস্বরে বললেন—মেহেরু, কেমন আছ?

মেহেরু। কেমন আছি, ডাক্তার জানে না, রোগী জানে!

ডাক্তার। তা হলে তুমি ভালই আছ আমি মনে করছি।

মেহেরু। মনে করছেন, কাজে করছেন না ত?

ডাক্তার। কেন, কি করেছি আমি? অথবা কি করিনি, বলত?

মেহেরু। এই খাঁচায় পুরে রেখেছেন কেন, তা হলে?

ডাক্তার। আচ্ছা—এখনি খাঁচার দ্বার খুলে দিচ্ছি; তা হলে তুমি ভাল আছ মানবে ত?

মেহেরু কথার উত্তর দিলে না। আঁচলের অগ্রভাগটা পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ির মত করতে করতে দুই তিনটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললে। ডাক্তার মনে করলেন, অভিমান হয়েছে।

টার্ণ-কি এসে চাবি খুলে দিলে। মেহেরু কক্ষের মধ্য হতে ছুটে বেরিয়ে এসে ডাক্তারের সম্মুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার বললেন—কি দেখছ? ডাক্তার নিজে দেখছিলেন, এত রূপ কিসের জন্ত ছিন্নতন্ত্রী এসরাজের মত এমন বেসুরো হয়ে গেছে।

মেহেরু। ডাক্তার, আমার হাতে যদি রিভল্‌ভার থাকত, আমি এখনি তোমায় শুট্ করতাম।

ডাক্তার। না, তুমি করতে না।

মেহেরু। নিশ্চই করতাম; তুমি প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা দৈত্য, তুমি এই দুনিয়ার কত অশান্তি এনেছ তার ইয়ত্তা আছে?

ডাক্তার। কিন্তু সে দৈত্যটাকে কি তুমি সত্যি সত্যি মারতে চাও?

মেহেরু। কি করে মারি?—বলে আঁচলটাকে নিষ্মম ভাবে পাকাতে লাগল।

ডাক্তার। কেন, রিভল্‌ভার দিয়ে।

মেহেরু। রহস্য করছেন।—বলে, সমুদ্রের মত ফুলে ফুলে গর্জ্জন করে উঠল।

ডাক্তার। তুমি যদি শান্ত হও, আমি তোমাকে তোমার প্রচণ্ড দৈত্যটাকে সংহার করবার উপায় বলে দিতে পারি।

মেহেরু। তুমি রহস্য ক'র না বলছি। কি উপায় করে দেবে, দৈত্যবধ কি সহজ!

ডাক্তার তাঁর পকেট থেকে রৌপ্যধবল রিভল্‌ভারটা বার করে প্রসারিত হাতের উপর রেখে বললেন—মার দেখি দৈত্যটাকে।

মেহেরু রিভলভারটা হাতের কাছে দেখে পেছিয়ে গেল—তার স্ফীত বক্ষ সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তার দীর্ঘনিঃশ্বাস দুঃখময় হয়ে গেল, চক্ষু জলে ভরে গেল, সে বলে উঠল—তুমি দৈত্য নও, ওগো তুমি দৈত্য নও, তোমাকে আমি চিনি নি, আমায় মাপ কর, আমায় বাঁচাও, আমায় খাঁচায় বন্ধ করে রেখ না। এই বলতে বলতে সে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, ডাক্তারের পায়ের কাছে বসে পড়ল।

ডাক্তার তার হাত ধরে তুলে বললেন, তোমার দাদাকে খবর দি, তিনি যেখানে তোমাকে রাখতে বলবেন, তোমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দেব।

মেহেরু উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু চলতে পারলে না। তাকে ষ্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে যেতে হল। সে উত্তেজনার পর এত নিরুৎসাহ, নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। তাকে গারদের ভিতরই একটা সজ্জিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। সে কক্ষটা কন্‌ভালেসেন্টেদের জন্য। তার সারাদিনের প্রোগ্রামটাও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের হওয়ায় সে যেন একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল।

* * *

ডাক্তার মেহেরুর ভ্রাতা না আসা পর্য্যন্ত মেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না। তাঁর মনের ভিতর ডাক্তারি ছাড়া আরও কথার উদয় হওয়ায় তিনি নিজের প্রতি একটু কঠিন হয়েই দূরে রইলেন। মেহেরুর ভাই এসে পৌছুলে তাকে সব কথা বললেন—তাকে আর বেশীদিন গারদে রাখা চলবে না, সে ভালর দিকেই যাচ্ছে, শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবে—তাকে তুমি বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে?

মেহেরুর ভাই। কোথায় নিয়ে যাব, ডাক্তার সাহেব? আমরা দুই ভাই বোনে গরীবের সংসার পেতে দিন গুজরান করতাম। মেহেরুর মাথা খারাপ হওয়ার পর থেকেই ত' আমাদের সে নীড়টি ভেঙ্গে গেছে; ওকে কোন ভালমানুষের হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব মনে করেছিলাম, সে ত' ঘটল না। মানুষ মরে যায়, সে সয়; তার এ জীবন্মৃত অবস্থা দেখে আমিও জীবন্মৃত হয়েছি। আমার সামর্থ্য কি ওকে ধরে রাখি, ওর পরিচর্য্যা করি! ও বড় হয়েছে, সহজ থাকলে নিজেই সামলে নিত, আমি ওকে এ অবস্থায় কি করে সামলাব, ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার। কিন্তু আর ওকে আটকে রাখা ভাল হবে না। মুক্ত, স্বচ্ছন্দ থাকলে ও সেরে যাবে; প্রথমে একটু সাবধানে নজরে নজরে রাখতে হবে, পরে ও আপনিই আপনাকে বুঝে নেবে।

মেহেরুর ভাই। সেই কটা দিনও যে আমি রাখতে সাহস পাচ্ছি না, ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার কিছু অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন—দেখ, ওকে দিন কতক যদি আমার কাছে রাখি তা হলে তোমার কিছু আপত্তি আছে?

মেহেরুর ভাই। ডাক্তার সাহেব, আপনি মহানুভব; আপনার যদি কোন দিকে না বাধে, আমার দিকে কোন বাধাই ত' আমি দেখছি না। আপনি জানেন, আমরা মুসলমান; আপনার তাতে বাধবে কি না, আমি কি করে বলি।

ডাক্তার সরকারের চাকর; মেহেরু পাগল হয়ে গারদে এসেছে—তাকে গারদ থেকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে স্থান দেওয়ায় কথা উঠবে। উপর-ওয়ালারা কি চক্ষে দেখবেন কে জানে! মেহেরু পূর্ণযৌবনা মুসলমান রমণী; মুসলমানগণের দিক দিয়েও আপত্তি উঠতে পারে, ঘোঁট পাকতেও পারে। নিজের বাড়ীতে রাখার কথাটা তাঁর হৃদয়ের উৎস থেকে উঠেছিল, তার মুখ তাঁকে জোর করেই বন্ধ করতে হল।

ডাক্তার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে আর কথা কইতে পারলেন না। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, যদি ওকে

কোন বোর্ডিংএ রেখে দেওয়া যায়; তাতে কোন্ দিক দিয়ে কি আপত্তি উঠবে? হিন্দুর বোর্ডিংএ ত' স্থান হবে না, মুসলমানদের এমন বোর্ডিং আছে বলে ত' আমার জানা নেই। খৃষ্টান মিশনারীরা কি ওকে রাখবে? ওর ভাই কি তাতে রাজী হবে? ডাক্তার স্থির করলেন, দেখি না মিস হ্যারিসনকে বলে; তিনি খুব দয়াশীলা, যদি তিনি ওকে নিতে রাজী হন তখন মেহেরুর ভাইকে বলা যাবে।

মিস হ্যারিসন মেডিকেল-মিশনের কর্ত্রী, খৃষ্টান ধর্ম্মের বিশ্বাস, আশা ও দরদ এই তিনের প্রতীকস্বরূপিণী বলে লোকে তাঁকে জানে। তাঁকে গিয়ে যখন ডাক্তার বললেন—তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। অন্য কেউ হলে মনে করতেন হয় ত যে, খৃষ্টান খোঁয়াড়ে আর একটি মেষ প্রবিষ্ট হবে এই আশায় গুরু-মা মিস হ্যারিসন সম্মত হয়ে গেলেন; কিন্তু ডাক্তার তা একবারও মনে করলেন না।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যখন ডাক্তার বাড়ী ফিরিলেন তখন তাঁর মনে হল, আর কোথাও ত' আশ্রয় পাবার আশা নেই—তখন খৃষ্টান মিশনের ভিতর যদি স্থান মেলে, মেহেরুর ভাই তাতে কি রাজী হবে না?

মেহেরুর ভাই কিন্তু কোন আপত্তি করলে না, সে হাতে স্বর্গ পেলে।

পরদিন প্রত্যুষে ডাক্তার মেহেরুর কামরায় গিয়ে উপস্থিত। মেহেরু জিজ্ঞাসা করলে, যেন একটু বিমর্ষ—আপনি কোথায় ছিলেন, এতদিন আসেন নি কেন?

—আসি নি, তোমারই জন্য?

—আমি কি করেছি?

—কিছু কর নি, তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে, কোথায় তোমার থাকার ব্যবস্থা করা যায় তাই স্থির করছিলাম। তুমি ত' ভাল হয়ে গেছ। আর এখানে থাকা কেন?

—কোথায় স্থির করলেন?

—মিস হ্যারিসনের মিশন-বাড়ীতে—

—সাহেববাড়ীতে? আপনি সাহেব, তাই আমিও সাহেবের কাছে থাকতে পারব, এটা আপনি মেনে নিলেন কেন?

—না মেহেরু, আমি আর কোথাও তোমার থাকবার সুবিধা করতে পারলাম না; তোমার দাদার কাছে কি তোমাদের কোন অতিথিশালায়, কি হিন্দুদের কোন আশ্রমে—

—আপনার বাড়ীতে থাকা যায় না সেটাও স্থির করে নিয়েছেন ত?

—তা আমি স্থির করিনি, সাহস করতে পারলাম না।

—কেন? আমি তা হলে, হয় বাঘ কি ভালুক, নয়ত আমি সত্যি সত্যি ভাল হইনি।

—ও দুটার কোনটাই সত্য নয়, তবুও তুমি যা বলছ তা সম্ভব হবে না।

—আচ্ছা, চলুন, আমি খৃষ্টান মিশনরিদের আশ্রয়েই না হয় যাই। সেখান থেকে ত আবার আমায় এখানে ফিরে আসতে হবে না? সত্যি ডাক্তার সাহেব, এই স্থানটা যেন আমায় বেঁধে রেখেছে, নইলে বাইরে আমার খৃষ্টান মিশনরীর আশ্রয় ছাড়া আর আশ্রয় নেই কেন?

—মেহেরু, তুমি দুঃখ ক'র না, ভেব না। যদি মিশনরীদের আশ্রয় তোমার না সহ্য হয়, তোমাকে এখানে ফিরে আসতে হবে না, তা তোমায় বলে রাখলাম।

—আপনি সাহেব মানুষ, আপনার মিশনরী ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমার ভাল লাগবে না, আমি যে আগে থেকেই বুঝতে পারছি।

—না না আগে থেকেই কিছু বুঝ না, আগে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

—চলুন তবে এখনি যাই।

—এত তাড়াতাড়ি কেন; তুমি সকাল সকাল স্নান কর, খাও। আমার কার খানা পাঠিয়ে দেব, তোমার দাদা এসে তোমায় নিয়ে যাবে; মিস হ্যারিসনের আশ্রমে আমি থাকব এখন; তোমাকে সেখানে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আসব।

—আচ্ছা। মেহেরু শুধু এই বলে অতি বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ডাক্তার চলে গেলেন।

* ৫ * *

"ভবিতব্য মান? মানতেই হবে।" এই বলে ডাক্তার কথা আরম্ভ করলেন।

আমি। মানতেই যদি হবে, তা হলে মানি কি না মানি, এ প্রশ্নটা ত' অবান্তর হয়ে গেল।

ডাক্তার আমার কথাটা কানেই যেন না করে বলে চললেন—আমরা কতটুকুই বা দেখতে পাই। প্রতি মুহূর্ত্তে অতীতটাকে ভুলি, আর ভবিষ্যতের পরদার ভিতর দিয়ে আজগুবি খেয়াল দেখতে দেখতে দিন কাটাই। যেটা হবে তার ইঙ্গিত হয় ত কিছু কিছু পাই, কিন্তু তাতে নিজের ইচ্ছা ও কল্পনা এতখানি মিশে থাকে যে, সত্য যা হবে তার স্বরূপ অদ্ভুত রকম ঘোলাটে হয়ে যায়।

আমি। ডাক্তার, তোমার কথাগুলোই যে অদ্ভুত রকম ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, তাতে কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ডাক্তার। অতটা জোর করে নিঃসন্দেহ হওয়াও একটু মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা বলতে হবে। নিঃসন্দেহ আর নিশ্চয়, এ দুইএ তফাৎ খুব বেশি নয়—মানুষ নিশ্চয় হলেই ত সত্যটাকে প্রায় ধরে ফেললে বললেই হয়। কিন্তু যাক্ সে কথা। মেহেরু আজ কি বলছে জান? সে খৃষ্টান হবে। যেদিন তাকে পাগলা-গারদ থেকে মিস্ হ্যারিসনের মিশনবাড়ীতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করি সেদিন সে প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠে ছিল—বলেছিল আমি সাহেব কি না, তাই খৃষ্টানের আশ্রয়ে তাকে রেখে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না—কিন্তু গারদ তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল তাই নাস্তি গতিরন্যথা বলে সে সেখানে যেতে রাজি হয়েছিল। কয়েক মাস পরেই কি না সে বলে খৃষ্টান হব। এটা, সেদিনকার চিত্র দেখে ভবিষ্যতের যবনিকা ভেদ করে, কেউ দেখতে পেত?

আমি। কিন্তু এখন যখন সে ঐ কথা বলছে সেটা ত আর ভবিষ্যতের কথা নয়, সেটা ত বর্ত্তমান, সেটা ত অতীতের ঘটনা-সমষ্টির পরিপাক। সেটার অর্থ কি ত বুঝতে চেষ্টা করা যাক্।

ডাক্তার। তাও কি হয়। তার মনে কি আছে, সে যা চাচ্ছে সেটা অতীতও নয় বর্ত্তমানও নয়, সেটা হচ্ছে নিছক অনাগত। সেটা না বুঝতে পারলে ত আর বর্ত্তমানে তার খৃষ্টান হওয়ার উদ্দেশ্য বা কারণ বুঝা যায় না

আমি। সোজা ব্যাখ্যা হচ্ছে, সে এখনও ঠিক সারে নি—পাগলস্য নানা ভঙ্গী।

ডাক্তার। ব্যাখ্যাটা সোজা হলেই যে সত্যি হবে তার ত কোন কথা নেই। আমার বুদ্ধিতে যতটা যায়, তাতে দেখছি সে ত পাগলে নয়—সে বেশ চিন্তার শৃঙ্খলা রেখে চিন্তা করতে পারছে, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রেখে কথা কইতে পারছে।

আমি। কিন্তু এক লাফে তার খৃষ্টানের প্রতি ঘৃণা থেকে হঠাৎ খৃষ্টান হওয়ার সংকল্পের মধ্যেও কি সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছ? তা হলে, হয় সামঞ্জস্যের মানে অন্য রকম, না হয়, পাগলামীটা সংক্রামক হয়ে তোমাতে এসে পৌছবে।

ডাক্তার বলে উঠলেন—দেখ, কোনটা সংক্রামক আর কোনটা সংক্রামক নয় তা ঠিক বলা যায় না। সাধারণতঃ ছোঁয়াচে রোগ বলে যে রোগ আছে সেগুলা দেহের ছোঁয়াচ মাত্র। মনেরও যে ছোঁয়াচ হতে পারে না তা বলা যায় না। আমি একদিন পাগলা গারদের ইনস্পেক্সনে গেছি—দেখি কতকগুলা সাহেব মেম পাগলা-গারদ দেখতে গেছে—একটা পাগল তখন—দুহাত তুলে, ঘুরে ঘুরে নাচবে। দর্শকদের মধ্যে একটা মেম মাথা নেড়ে বলে উঠল—নাঃ—হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না।—বলেই সে নাচ সুরু করে দিলে, সে নাচ আর থামে না—থামাতে চেষ্টা করলে দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠে—বস্, তাকে গারদে আটক করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। বাস্তবিক কে পাগল কে সহজ, কে কখন পাগল, কখন পাগল নয় এটা নির্ণয় করা বড় সহজ কথা নয়।

আমি। তাই দেখছি।

ডাক্তার বিস্ময়ের সহিত বলে উঠলেন—কি দেখছ?

আমি। ছোঁয়াচ বলে দেহ মনের যদি কিছু থাকে ত' সেটা যে শুধু ব্যাধি মাত্র—তা নাও হতে পারে ত'?

ডাক্তার বললেন—তোমার কথাগুলো সাধারণতঃ খুবই স্পষ্ট। এত অস্পষ্ট করে কথা বলছ কেন? খুলেই বল না।

আমি। স্পষ্ট কথাটা এই যে মেহেরুর ছোঁয়াচ তোমাকে লেগেছে। সেটাকে পাগলামীর ছোঁয়াচই বলতে হয়, কারণ Love is a madness.

ডাক্তার বলে উঠলেন—পাগল!

আমি। মাতাল অনেক সময় সবাইকে মাতাল ভাবে, সে মনে করে স্থির যদি কেউ থাকে ত' সে—আর দুনিয়াশুদ্ধ সবাই টলটলায়মান। পাগলও ভাবে সে-ই সহজ আর সবাই পাগল।

ডাক্তার বলে উঠলেন—দেখ, মিস হ্যারিসনের স্নেহ ও যত্ন যদি ও না পেত তা হলে ওর খৃষ্টানের প্রতি যে ঘৃণা

তা থেকেই যেত, আজ সে খৃষ্টান হব বলে সংকল্পও মাথায় আনত না। হিন্দু কি মুসলমানের কাছে ওরকম স্নেহ যত্ন পাওয়া যায় এমন প্রতিষ্ঠান ত দেখা যায় না।

আমি। একেবারে যায় না তা নয়, তবে ঠিক হয়ত অমনটী না পাওয়া যেতে পারে।

ডাক্তার একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন—তোমার যদি আত্মীয়া কেউ বিকৃত-মস্তিষ্ক হয়ে গিয়ে, বা অন্য কোন কারণে গৃহের বাহিরে একটা শুচি, শান্তিময়, সুব্যবস্থিত আশ্রয়স্থল খোঁজে—তাকে কোন হিন্দু আশ্রম বা মুসলমান আখড়ায় প্রাণ-ধরে দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হতে পার? এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি?

আমি। তা নেই বটে, প্রয়োজনও হয় ত নেই।

ডাক্তার আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন—এই ত প্রয়োজন হয়েছে, কোথায় স্থান ছিল বলত?

আমি। মিস হারিসনের মনে সুধু মমতা, স্নেহ ইত্যাদিই দেখছেন—তাঁর খৃষ্টানী মিশনরী হৃদয় কি একটা নূতন কনভার্টের লোভে খানিকটা মমতা ও স্নেহের ভান করে নি?

ডাক্তার বললেন—হয়ত করেছে কিন্তু তারও তলায় তুমি কি নারীর প্রতি একটা সত্যিকারের শ্রদ্ধার প্রমাণ পাও না? ওরকম প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে নেই, তার মূল কারণ হচ্ছে নারীর প্রতি যে অতখানি যত্ন করতে হবে, তার ভাবনা আমাদের মনেই আসে নি কোনদিন। তুমি এই গারদখানার উচ্চ প্রাচীর দেখেছ ত? আর ওই জেলখানার প্রাচীর দেখছ—মুরশিদাবাদের নবাববাড়ীর হাবেলীর চার-পাশে ঠিক ঐ রকমই কারাপ্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে; কাশিম-বাজারের রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের প্রাচীরও ঐ রকম কাল উচু দৈত্যের মত অন্তঃপুরবাসিনীগণের পাহারায় নিযুক্ত আছে। নারীকে আমরা বাস্তবিক সম্মানের সহিত যত্নের অধিকারিণী করি নি কখনও—তাই ঐ "নরকের দ্বারগুলো"কে লোহা দিয়ে আবৃত করে রেখেছি।

আমি। কিন্তু আদত কথাটা চাপা পড়ে গেছে—মেহেরু খৃষ্টান হবে কেন?

ডাক্তার বললেন—কিছু বুঝতে পারি না। যদি মিস হারিসনের স্নেহে যত্নে আকৃষ্ট হয়ে মিশনারীর মিশন নিয়ে জীবন যাপন করবার সংকল্প করে থাকে ত' তাকে খৃষ্টান ত' হতেই হবে।

আমি। কিন্তু ডাক্তার সাহেবকে যদি হিন্দু বলে তার জানা থাকত, তা হলে সে হয়ত ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে যাবার আব্দার করত এবং গোময় সেবন করে প্রায়-শ্চিত্তেরও জন্য প্রস্তুত হত।

ডাক্তার। এসব আজগুবি কথা তোমার মাথায় কোথা থেকে আসছে!—যেন কথাটা চাপা দেবার জন্য ডাক্তার বললেন—কিন্তু তুমি যাই বল, যেখানে আমরা আশ্রয় দিই না আর কেউ দেয় মানুষের মন তার দিকেই ত ঝোঁকে।

আমি। মিস হারিসনের আশ্রয়টা যে মেহেরু তোমারই আশ্রয় বলে মনে করছে না তা কেমন করে জানলে?

ডাক্তার নির্ব্বাক হয়ে রইলেন, আর কোন কথা তাঁর মুখ থেকে আধঘণ্টা কাল বহির্গত হল না। আমি বিদায় নিলাম।

* * *

মিস হারিসন। মেহেরু প্রভুর ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু আজ সে বলছে যে মিশন ত্যাগ করে যাবার তার সময় হয়েছে। আমি মনে করেছিলাম সে মিশনেই থাকবে, তা সে থাকতে চাচ্ছে না।

ডাক্তার অতি বিমর্ষ হয়ে বললেন—মেহেরুকে নিয়ে আমি বড় বিব্রত হলাম।

মিস হারিসন। এখন সে যদি মিশন থেকে চলেই যায় ত' যত শীঘ্র যায় ততই ভাল।

ডাক্তার বললেন—একটু অপেক্ষা করতে পারবেন না? আমি মেহেরুর ভাইকে সংবাদ দি; সে যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারে।

মিস হারিসন। আমি বেশী দিন অপেক্ষা করতে পারব না। ওর ভাই ওকে ফিরিয়ে নিলে ও আবার মুসলমান ধর্ম্মে ফিরে যাবে। আজকাল হিন্দুকেও খৃষ্টান করে সোয়াস্তি নেই তাকে আবার শুদ্ধ করে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছে।

ডাক্তার। কিন্তু আপনি কি মনে করেন, মুসলমান খৃষ্টান হলে, মানুষটা একেবারে বদ্‌লে যায়। অথবা হিন্দু খৃষ্টান হলে সে তার সমস্ত অতীতকে মুছে ফেলে নূতন মানুষ হয়ে যায়?

মিস হারিসন। তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। যাক ফিরে তারা তাদের অন্ধকারের মধ্যে, আমরা তাদের আলোয় আনবার চেষ্টা করে ভগবানের কাছে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করেছি।

ডাক্তার। মেহেরুকে একবার দেখে যেতে পারি কি ?

মিস হ্যারিসন। নিশ্চয়ই পারেন এবং মিশনে থাকবার জন্য যদি দুটো কথা বলেন —আমি বাধিত হব।

মেহেরু আপনিই এসে উপস্থিত হল। মিস হ্যারিসন বললেন, মেহেরু এখন তোমাকে Rachel বলেই ডাকব, তুমি ঐ নামেই ভগবানের কাছে পরিচিত। তোমার অশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ডাক্তার সাহেব, তিনি যে উপদেশ দেন তা তোমার মেনে চলা উচিত।

মেহেরু মিস হ্যারিসনের দিকে না তাকিয়ে একেবারে সোজা ডাক্তার সাহেবের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—আর আমায় এখানে রাখবেন না, আমায় নিয়ে চলুন আপনার বাড়ী ; আমি ত' খৃষ্টান হয়েছি, আপনার ধর্ম্মে আর আমার ধর্ম্মে ত আর প্রভেদ রাখি নি।

ডাক্তার। মেহেরু, তুমি কি বলছ, আমার জন্যে তুমি খৃষ্টান হয়েছ ? আমি ত' খৃষ্টান নই, আমি হিন্দু।

—আঁা, কি করলুম, আরও দূরে চলে গেলুম, তোমার নাগাল পেলুম না ! পাগল কর, আমায় পাগল কর, খোদা, আমার সব গোলমাল করে দাও।

ডাক্তার মেহেরুর হাত ধরে পাশে একখানা কেদারায় বসিয়ে দিলেন—মেহেরু কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।

কাঁদতে দেখে ডাক্তার একটু আশ্বস্ত হলেন। অতি শান্ত ভাবে বললেন—মেহেরু, তুমি মুসলমান থেকে খৃষ্টান হয়েছ বলে কি আমার কাছে থেকে আরও দূরে চলে গেছ ? তুমি মুসলমান থেকেও আমার যত কাছে ছিলে, খৃষ্টান হয়েও তত কাছেই আছ, একটুও দূরে যাও নি।

মেহেরু। তবে আমায় তোমার বাড়ী নিয়ে চল না কেন ? আমাকে তা না হলে আবার গারদে পুরে রাখ, গারদে পুরে রাখ, পাগল কর, পাগল কর।

ডাক্তার। স্থির হও ; তোমার ভাইকে বলি সে যদি রাজী হয় তবে ত'।

মেহেরু। কেউ রাজী হবে না, তা হলেও যদি আমাকে তোমার কাছে না রাখ তা হলে আবার আমাকে পাগল করে দাও, পাগল করে দাও।

ডাক্তার (অতি মৃদুস্বরে)—মেহেরু, স্থির হও, আমি তোমাকে আমার বাড়ী নিয়ে যাব, তোমার ভাইকে যদি রাজী করতে না পারি—তা হলেও। কিন্তু তোমার ভাই তোমায় ভালবাসে। সে রাজী হবে।

মেহেরু ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে অতি করুণ স্বরে বললে কিন্তু তুমি আমাকে যদি অগত্যা নিয়ে যাও, তাহলেই বা আমি কি করে যাই ! না, আমায় পাগল করে দাও, খোদা, আমাকে পাগল করে দাও।

মিস হ্যারিসন উঠে গেলেন 'তুমি পাগল ছাড়া আর কিছু কখনও ছিলে কি না সন্দেহ' এই কথাগুলি অতি নির্দ্দয় ভাবে বলতে বলতে। কেউ শুনলে কি না সেটাও সন্দেহ রয়ে গেল - কারণ ডাক্তার মেহেরুর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন --চল আমার বাড়ি, ভবিতব্যের হাত কেউ এড়াতে পারে না, আর এড়াবই বা কেন ?

* * *

আমি ডাক্তারের পাঠগৃহের একখানা ইজি-চেয়ারে বসে আছি, ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করেই বললেন—**Love is a madness** তুমি বলেছিলে। কিন্তু আমি দেখছি **it is madness that makes one love.**

আমি। ওটা এপিঠ-ওপিঠ, জিনিষটা একই।

ডাক্তার। আমি মেহেরুকে বিবাহ করেছি শুনেছ ?

আমি। গোপনে কেন ?

ডাক্তার। গোপনে কি বিবাহ হয় ?

আমি। তা বটে—গোপনে প্রেম হয়, গোপনে বিবাহ হয় না বটে।

ডাক্তার। আমাদের প্রেমও গোপনে হয় নি, বিবাহও নয়। তবে উভয়ত্র বিশেষ কোন আড়ম্বর হয় নি এই মাত্র। মেহেরু ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু সুখী হয়েছে কি না বলতে পারি না।

আমি। বিবাহটা কি মন্ত্র পড়ে হল, পৌরোহিত্য করলে কে ? মন্ত্রটাই বা কি ভাষায় পড়া হল ? 'মৎ গৃহে তৈলং নাস্তি ইস ওয়াস্তে কলু বাড়ি **going**'—এই রকম একটা কিছু ভাষায় বোধ হয় ! সুখ-দুঃখের কথা যা বলছ সেটা লয়লার মজনুকে না পাওয়ার গল্পটা উল্টে দিয়ে যদি পাইয়ে দেওয়াই যায়, তা হলেও সুখ-দুঃখের জবাবদিহি কি কেউ করতে পারে ?

ডাক্তার। **Love making does not necessarily lead to love-marriages but loving does.**

আমি। তুমি আবার ভালবাসলে কবে? তুমি ত' পরোপকারই করে এসেছ, ডাক্তার হয়ে পাগলের চিকিৎসার ব্যবস্থাই করেছ। তবে প্রেম-ব্যাধির চিকিৎসা করতে গেলে না হয়, তোমারও তাই হয়ে গেছে, ছোঁয়াচ লেগে গেছে। তাতে রোগী ভাল ত' হয়ইনি, চিকিৎসকই রোগে পড়ে গেছে। এতে সুখ-দুঃখের কথা কি থাকতে পারে?

ডাক্তার। তুমি যে রকম হাল্‌কা ভাবে সবটাকে ভাবছ, তাতে তোমার সঙ্গে কথা কয়ে কোনই লাভ নেই।

আমি। ও রোগের ধরণই ঐ; সব কথায় গোড় না দিয়ে গেলেই অর্থাৎ ভেবে-চিনতে বিচার করে কথা কইতে গেলেই যেটা বিচারের পরিধির বাইরে সেটাকে সত্যি সত্যিই খুব হাল্‌কা করেই ফেলা হয়; কিন্তু উপায় কি? যে সেই দিব্য বস্তুর কবলের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা কইবে সে ত' হাল্‌কা হবেই।

ডাক্তার কিছু বিচলিত হয়েই কথা বন্ধ করলেন। আমিও একটু পরে নমস্কার করে উঠে পড়লাম। ডাক্তারের মুখ তমসাচ্ছন্ন—দুরে দিগন্তে বদ্ধদৃষ্টি।

* * *

সূর্য্য উঠছে। ডাক্তার অবাক হয়ে তাঁর দ্বিতল গৃহের বারান্দায় রেলিংএ ভর করে তন্ময় হয়ে দেখছেন। সম্মুখে বিস্তৃত সবুজ মাঠ, পশ্চাতে শীর্ণা ভাগীরথী, দুরে ঘন আম্রশ্রেণী, আকাশে খণ্ড মেঘের রক্তিমা পূর্ব্ব গগনকে অভিভূত করে ফেলেছে। আমি আস্তে আস্তে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাক্তার বলে উঠলেন, সূর্য্য-উপাসনার ভিতর একটা কিছু সত্য ছিল; ঐ ঘটা করে সূর্য্যোদয় দেখে সূর্য্যদেবকে 'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্ব-পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।'—বলে মাথা যে আপনি নত হয়ে আসে।

ডাক্তার হাত জোড় করে মামুলি ধরণে প্রণাম করলেন না বটে, কিন্তু তাঁর সমস্ত দেহমন যেন শ্রদ্ধাঞ্জলিবদ্ধ হয়ে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নুয়ে পড়ল।

আমি। ডাক্তার, আমি তোমার কিছু বুঝতে পারলুম না। তুমি বিজ্ঞানের আদ্যশ্রাদ্ধ করে শেষে যদি সূর্য্যোপাসক হয়ে যাও, তা' হলে তোমার ভিতর হয়ত তুমি কিছু অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না, কিন্তু অপরের পক্ষে বিপদ করবে। তোমাকে ঐ ভাগীরথীর জলে অবগাহন করতে দেখে লোকে ত' হাঁ করে থাকে; কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলে অনেক ভগবতী সেবনের প্রায়শ্চিত্ত করছেন; কেউ বলে রক্ত ঠাণ্ডা হলে আরও কত কি দেখবে। আমি ওসব কথায় কান দিই না, কিন্তু সূর্য্যোপাসনার সঙ্গে বিজ্ঞানের, অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নির্ণয় করতে না পারলে তুমি একটা হেঁয়ালীই হয়ে যাবে, এখনি ত' কতকটা হয়ে দাঁড়িয়েছ।

ডাক্তার। আচ্ছা, বিজ্ঞানের উপরেও যে কিছু আছে, তোমাকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছি। ঐ যে ঘটা করে সূর্য্যোদয়, তার অন্তরের সুরের সঙ্গে আর একটা সুর মিলিয়ে দি, দেখ, কেমন মিলে যায়। ঐ রঙ, ঐ বিরাট সূর্য্যমূর্ত্তির সঙ্গে এক সুরে মিলে গিয়ে, কেমন তোমার আমার হৃদয়ের কোন্ অজ্ঞাত কন্দরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে দেখ।

এই বলেই ঘরের মধ্যে গ্রামোফোনে দম দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর মেসেজ খানা চড়িয়ে দিয়ে উদীয়মান দিবাকরের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মেসেজটী অপূর্ব্ব, সূর্য্যমূর্ত্তিও অপূর্ব্ব, কিন্তু দুইএ মিলে কি দাঁড়াল তা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। ডাক্তার বলে উঠলেন—ঐ রঙের সুর, আর এই সুরের রঙ কেমন মিলে গেল, দেখলে?

আমি। এ ত' একটা বক্তৃতা, আর ও ত' রঙের একটা বিরাট মেলা, এ দুইএ মিলল কি করে?

ডাক্তার। মিলল গিয়ে তোমার আমার বুকে, বক্তৃতার সুর যেখান থেকে উঠেছে, ঐ রঙের সুরও সেইখান থেকেই উঠেছে। আর তোমার আমার চৈতন্য ও বুদ্ধির অতীত যে স্থান সেই খানে গিয়ে মিলে গেল।

আমি। তুমি একটী mystic—

ডাক্তার। আচ্ছা, আর একটা সুর বাজাই। সেটা ঐ রঙের সঙ্গে মোটেই মিলবে না, দেখ।—বলেই লজপত রায়ের একটা বক্তৃতা চড়িয়ে দিলেন, বললেন—দেখ এ বক্তৃতার সুরটা মাথার মগজ থেকে উঠেছে, যেটাকে বলে বুদ্ধির গোমুখী—এ সুরে সুর-সরিৎ মন্দাকিনীর কলধ্বনি নেই।

আমি। আমি ত' এই বক্তৃতাটা খুব তেজস্বী বলে মনে করছি।

ডাক্তার। কিসের তেজে তেজস্বিতা বুঝতে পারছ? এটা বুদ্ধির তেজে তেজীয়ান—তার প্রবেশ বুদ্ধি পর্য্যন্ত। কিন্তু বুদ্ধির অতীত যে স্থান, সে স্থান পর্যান্ত এর গতি নেই।

আমি। বুঝলাম না।

ডাক্তার। আচ্ছা, আবার একটা জিনিষ চড়াই দেখ—বলে "মীরা বাই"-এর একখানা গান চড়িয়ে দিলেন, বললেন—এই বার একবার দেখ দেখি, এই গানের সুরের সঙ্গে ঐ রঙের সুর মিলে যায় কিনা!

যখন মীরা, কণ্ঠের অপূর্ব্ব স্বচ্ছতা ও মাধুর্য্যের সঙ্গে গানের শেষ ছত্র—"তব্ মিলে নন্দলালা"—গাইলেন, তখন আমারও যেন মনে হল, রঙে সুরে আকাশ-বাতাস পুরে উঠেছে। দু'জনে বহুক্ষণ চুপ করে রইলাম।

ডাক্তার। কি বুঝলে?

আমি। কিছু বুঝিনি। একটা কি-যেন, কি-যেন-কি এই মাত্র বুঝলাম।

ডাক্তার-পত্নী সেইক্ষণে ছাদের উপর উঠে এসে একটু তীব্র ভাবেই বলে উঠলে—আজ প্রাতঃকালেই গ্রামোফোন চলেছে দেখছি যে।

ডাক্তার। আর ঐ গ্রামোফোনটা দেখছ না? সর্ব্ব-পাপনাশী সর্ব্ব অন্ধকার-বিধ্বংসী ঐ যে রংয়ের সুর দিগন্ত ভাসিয়ে দিচ্ছে—সেটা ত' খুব প্রত্যুষেই আরম্ভ হয়েছে।

ডাক্তার-পত্নী। সেটা রোজই হয়—কিন্তু রোজই ত' গ্রামোফোন চলে না, তাই বলছি। এই বলে অবজ্ঞাভরে চলে গেলেন।

আমি। ডাক্তার, তুমি সেদিন সেই প্রমত্ত সেপাইটাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে শান্ত করলে, আর ঘরের গৃহিণীটাকে ত আয়ত্ত করতে পারছ না!

ডাক্তার। সেখানেও সুর মেলেনি, যেমন সুর মিলল অমনি শান্ত। ঘটনা কি হয়েছিল জান? সেপাইটার পদোন্নতি হবার কথা হয়নি বলে, মাথা খারাপ হয়ে সে পাগলের মত দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছিল। তার জুড়িদাররা তার সঙ্গে জুড়িদারের মত ব্যবহার করছিল না—সে যখন ব্যারিকের ছাদের উপর উঠে, কাঠের সিঁড়িটাকে আসুরিক বলে মাটিতে ফেলে দিয়ে, বন্দুকে গুলি ভরে সকলকে শাসাচ্ছিল, যে কাছে যাবে তাকেই গুলি করবে—তখন তার প্রাপ্য পদোন্নতির অভাবজনিত যে বিক্ষোভ, তাতে তাকে একদিকে যেমন উন্মত্ত করেছিল, অপরদিকে তার জুড়িদারদের সঙ্গে তার যে হৃদয়ের বন্ধন ছিল তাকে ছিঁড়ে দিয়েছিল—তাদের কথা বেবাক তার কানে বেসুরো লাগছিল। পরে তার উপরওয়ালারা যখন তার উপর তম্বি করে তাকে ক্ষান্ত করবার চেষ্টা করছিল, তখনও তার প্রাণের সুরের সঙ্গে সেই উপরওয়ালার কথার সুর মিলছিল না। আমি যখন শুনলাম, তখন হাঁসপাতালে একটা মুমূর্ষু রোগীর শেষ পরিচর্য্যা করছি, তখনই আমার মনে হল, লোকটা একটা বিশ্রী কাণ্ড করে পরকেও মারবে, নিজেও মরবে। তাই আমি তৎক্ষণাৎ গেলাম, নিরস্ত্র হয়ে, হৃদয়ের মধ্যে তার জন্য সত্যিকারের ব্যথা নিয়ে গিয়ে তাকে বললাম—"দেখ, আমি তোমার জুড়িদার নই, তোমার উপরওয়ালা নই, আমি ডাক্তার, তোমার মনে আছে ত আমাকে? সেই তোমার ব্যথা ভাল করে দিয়েছিলাম, শান্ত হও, আজকের ব্যথাও আমি ভাল করে দেব।" এই বলে যখন মইখানা লাগিয়ে উঠতে গেলাম উন্মত্ত সেপাইটা বললে—"ওরা সব ওখানে রয়েছে কেন, তাড়িয়ে দাও ওদের, নইলে গুলি করব। কেবল তুমি আর আমি থাকব—বাস্।" আমি তাই করলাম, শুধু হাতে মইয়ে উঠে গেলাম—ছাতের উপর সে আর আমি। চারিদিকে তাকিয়ে যখন দেখলে যে আমি ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তখন সে সেলাম দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"ক্যা হুকুম, ডাক্তার সাহেব?" আমি বললাম—"তোমার বন্দুকটা আমাকে দাও।" সে তৎক্ষণাৎ তাই করলে। আমি তাকে মৃদুস্বরে বললাম—"চল আমার সঙ্গে, নেমে যাই চল। সে শিশুটির মত আমার সঙ্গে নেমে এল, আমি তাকে আমার মোটরে চড়িয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। এইত ব্যাপার, এও সুরের খেলা।

আমি বললাম—সে একবার উন্মত্ত বন্দুকের ট্রিগারটা টানলেই সুরের খেলা কি অসুরের খেলা বোঝা যেত।

ডাক্তার। না, না, তা হতেই পারে না, আমি যে

সুর বেঁধে নিয়ে তবে উঠেছিলাম ছাদের উপর; হলামই বা একলা; দশজনে কি করে, যদি সে দশ জন সুরে না বলে ?

আমি। ঘরের ভিতর হবে এত বেসুরো বলবে কেন ?

ডাক্তার। কি জানি, পারছি না। চেষ্টা করছি—না পারায় দুঃখ দিচ্ছি—পাচ্ছিও—

* * *

"দেখ বন্ধু, মেহেরুর সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ এটা যুগ-যুগান্তরের সম্বন্ধ"--ডাক্তার এই বলে কথা আরম্ভ করলেন।

আমি। যুগ যুগান্তরের অহিনকুল সম্বন্ধটা কিছু সুদীর্ঘ, কিন্তু পূর্ব্ব-সম্বন্ধের কথা আপনার এজন্মে কিছু মনে পড়বে না কি ?

ডাক্তার। মনে পড়ছে না, কিন্তু মনের অন্তরতম স্তরে যেন অনুভব করছি।

আমি। কিন্তু অত নীচু স্তরে না গিয়ে আর পূর্ব্বজন্মের দিকে না চেয়েও আপনি কি বিরোধের উপাদানস্বরূপ ইহজন্মের কিছু দেখতে পারছেন না ? মুসলমান থেকে খৃষ্টান, তার পর না-হিন্দু, না-মুসলমান, না-খৃষ্টান—এ ব্যবস্থাটা ত' **normal** নয়। আপনার মেহেরুর এ অব্যবস্থিত অবস্থা অব্যবস্থিত চিত্তবৃত্তিরই ত' পরিচয়। তার উপর পাগল; আপনি চিকিৎসক, তাই সাহস করে পাগল নিয়ে ঘর করছেন। করেছিলেন আমাদের সতী ঠাকরুণ, তা ভুগতেও হয়েছিল তাঁকে—শেষে জীবনপাত পর্য্যন্ত --

ডাক্তার। দেখ, আমার মনে হয় পূর্ব্বজন্মে মেহেরুর সঙ্গে আমার জীবন-মরণের সম্বন্ধ ঘটেছিল, সে আমাদের হিন্দুর ঘরে যা প্রায়ই ঘটে থাকে তাই; আমার হাতে অনেক নির্য্যাতন ভোগ করেছিল, তারই হিসাবনিকাশ প্রতিদান বা প্রতিশোধ যাই বল, নেবার জন্য এ-জন্মে সে আমার কাছে এসেছে। আমার ভয় হয় এ জীবনে হয় ত তার প্রতিশোধ নেওয়া, অর্থাৎ আমার প্রায়শ্চিত্তের শেষ হবে না। শেষ পর্য্যন্ত আমাকে মেহেরুর প্রতিশোধের সহায়তা করে যেতেই হবে।

আমি। তবু তিনি যে পাগল। তিনি যে মুসলমান থেকে এখন হ য ব-র-ল একটা জগাখিচুড়ী, তা মনে করতেই পারছ না।

ডাক্তার। হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান তা নিয়ে ত' মানুষটা নয়। সেটা ত' একটা নামমাত্র, রূপ ত' নামের অধীন নয়। হিন্দুর যে বিশ্বাস স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, ইহ পরকালের সম্বন্ধ, সেটা আংশিক ভাবে সত্য, শুধু ইহ পরকাল নয়, পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তার সঙ্গে জড়িত।

আমি। তা হলে ব্যাপারটা ত বড় একঘেয়ে। সেই একই দুইটি প্রাণী জন্মে জন্মে মিলবে, কখনও কপোত-কপোতীর মত কখনও বা অহিনকুলের মত। কিন্তু কপোত-কপোতীর জীবনে এমন কি চঞ্চুপীড়া উপস্থিত হতে পারে যে, পরজন্মে একেবারে সাপে নেউলের সম্বন্ধ নিয়ে সেই দুইটী প্রাণী জন্মাবে, তারপর কি করে সে জন্মের পরীক্ষা শেষ করে আবার দুইটী সুখী জীবন মিলিত হবে, এ একটা নিদারুণ হেঁয়ালী।

ডাক্তার চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে নির্ব্বাক হলেন। এমন সময় দেখতে পেলাম মেহেরু বারান্দায় পায়চারি করছে। আমি বিদায় নিলাম, মেহেরু অন্য দ্বার দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলে।

* * *

মেহেরু। ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার। আবার ও নাম কেন ?

মেহেরু। মাঝে মাঝে আমার ঐ নামটাই জিহ্বাগ্রে এসে পড়ে এবং তারই সঙ্গে গারদ-ঘরে সেই প্রথম দিনে চোখো-চোখির চিত্র মনে আসে।

ডাক্তার। সেটা কেন আসে জানি না। সেটাকে ভোলবার মত কি কিছু করি নি।

মেহেরু। করেছ অনেক কিছু কিন্তু ভুলতে পারি না তা কি করব! হয়ত কখন ভুলতেও পারব না।

ডাক্তার। কি জানি। আজ খুকুরাণীর খবর কি ?

মেহেরু। খুকুরাণীর খবরটা আমাকেই বহন করে এনে দিতে হবে ? তারও কি তোমার কাছে কিছু পাওনা নেই, সে ত' তোমার রক্ত নিয়েই জন্মেছে।

ডাক্তার। সে যখন হাসে তোমারই মত তার গাল দুটিতে টোল খেয়ে যায়।

মেহেরু। অতএব সে আমার, তোমার নয়।

ডাক্তার। আমি কি তাই বলিছি।

মেহেরু। আমার পাগল হওয়া যেন একটা ভীষণ ঝঞ্ঝার মত ভিতর ও বাহির সব ওলট্ পালট্-করে দিয়ে কোথা

থেকে আমাদের দুজনকে একত্র পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলে, কিন্তু পাশাপাশি হলেও মেশামেশি হল না।

ডাক্তার সেই বহুবার পুনরুক্ত কথাগুলি চাপা দেবার জন্য বলে উঠলেন - ভবিতব্যের তত্ত্ব-নির্ণয় ত কেউ করতে পারে নি। এখন, আজকের সমস্ত দিনের কার্য্যসূচী কি?

মেহেরু। সেটা ভবিতব্যকেই জিজ্ঞাসা না করে আমাকে করছ কেন?

ডাক্তার। আচ্ছা তুমি আজ গঙ্গাস্নান করতে যাবে না?

মেহেরু। মুসলমান, তারপর খৃষ্টানের আবার গঙ্গাস্নান কি? নদীতে অবগাহন বল।

ডাক্তার। আচ্ছা তাই।

মেহেরু। কিন্তু নদীস্নানেরও প্রত্যবায় আছে ত' তোমাদের শাস্ত্রে অর্থাৎ ডাক্তারী শাস্ত্রে, পাগলকে নদীস্নানে ছেড়ে দিতে নেই।

ডাক্তার। তুমি পাগল নও, তুমি খৃষ্টান নও, তুমি মুসলমান নও, তুমি হিন্দু নও, তুমি আমার মেহেরু, আর খুকুরাণীর মা। আর তোমাকে একলা ছেড়ে দেওয়ারও কোন কথা নেই, আমিও তোমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে বা নদীস্নানে—যাই বল যাব।

মেহেরু। সঙ্গীকো ধর্ম্মমাচরেৎ বলে হেসে উঠল। ডাক্তারের সে হাসিটা ভাল লাগল না।

* * *

আমি। কি করে কি হল, ডাক্তার?

ডাক্তার। কি জানি, দুজনে ভরা গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলাম হঠাৎ মেহেরু গভীর জলে চলে গেছে দেখলুম। ইচ্ছা করে কি স্রোতের টানে তা বুঝতে পারলুম না। ধরতে গেলুম যেন ধরা দিতে চাইলে না। সে কোন দিনই ত' ধরা দিলে না। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি। কিছু বলেছিল স্নানে যাবার আগে কি পরে?

ডাক্তার। কিছুই বলেনি। তবে আজ সকাল থেকে তার হাসিটা আমার ভাল লাগছিল না।

এমন সময় নার্স খুকুরাণীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। খুকুরাণীর মুখে স্বর্গের হাসি, গাল দুটীতে টোল খেয়ে যাচ্ছে, দুটী কচি হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের কোলে আসবার জন্য ব্যগ্র, ডাক্তারের চক্ষু ছল্ ছল্ করছে, বললেন—মেহেরু বলত এ আমার মেয়ে, তাই সে আমাকে দিয়ে চলে গেল। আশ্চর্য্য!

আমি। ডাক্তার তোমার স্বরে সে যে ভিড়ল না, এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর আমি কিছু দেখছি না।

পুতুলখেলার ইতিকথা

—শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

সকলের চেয়ে ছোট মোর কন্যাটি,
এবারকারের রথের মেলায় গিয়ে;
কিনিয়া এনেছে ছোট এক পরিপাটি
মোমের পুতুল, সতেরো পয়সা দিয়ে।
মহা আনন্দে তার সাথে 'করি' খেলা,
কেটে যায় তার সারা বরষার বেলা,
আহারের কথা ভুলে গেছে সে যে আজ,
খালি ঘুরে ফিরে পুতুলটি বুকে নিয়ে।

জানি একদিন ঘুচে যাবে এই খেলা,
সত্যকারের খোকা তার হবে যবে;
পুতুলের খেলা সেদিনের সারাবেলা
মিছে হ'য়ে যাবে নূতনের উৎসবে।
তবু যবে একা বসি' বাতায়ন পাশে,
মাঝে মাঝে চেয়ে রবে দূর নীলাকাশে,
আজিকার এই পুতুলখেলার কথা
স্মৃতির মতন মনেতে উদিত হবে।

বিধাতার উপর একহাত

এতকাল জাপানী কবিরা ওখানকার রমণীদের ক্ষুদ্র বঙ্কিম চোখের সৌন্দর্য্যেই মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে জাপানী মহিলারা তাঁহাদের যুরোপীয় ভগিনীদের নিকট চক্ষুর দিক দিয়া খাটো হইয়া থাকিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন। তাই আজকাল অনেকেই অস্ত্রোপচারের সাহায্যে তাঁহাদের চোখগুলিকে বড় করিয়া লইয়া বিধাতার উপর এক হাত লইতেছেন।

কোজো উক্লুডু (Kozo Ukludu) নামে জাপানের একজন চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিনা যন্ত্রণায় লোকের চক্ষুকে কাটিয়া বড় করিয়া দিবার এই পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কারের পর বিশ ত্রিশ হাজার জাপানী নারী ও পুরুষ তাঁহার নিকট অস্ত্রোপচার করাইয়া যুরোপীয় ধরণের সুন্দর চোখের অধিকার লাভ করিয়াছেন।

—শ্রীচিত্রগুপ্ত

অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে

অস্ত্রোপচারের পরে

বক্রত মুখের কৃতিত্ব

জগতে, অন্ততঃ পাশ্চাত্যদেশ সমূহে, মানুষের কোন কৃতিত্বই মূল্যহীন নহে। ওদেশে ভাল করিয়া মুখ ভ্যাংচাইতে পারিলেও নিছক বাচনিক প্রশংসার উপর আরও কিছু বাস্তব পুরস্কার মিলিয়া থাকে। এই চিত্রের ডানদিকের ভদ্রলোকটি বিলাতের অক্সফোর্ড নামক স্থানের অধিবাসী। তাঁহার ধারণা ছিল তাঁহার মত অমন করিয়া মুখ ভ্যাংচাইবার ক্ষমতা জগতে আর কাহারও নাই। তদনুসারে তিনি নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার এই ঘোষণায় অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহারই এক প্রতিবেশী আসিয়া তাঁহার চেয়ে অনেক বেশী করিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন (বামদিকের চিত্র)।

—শ্রীচিত্রগুপ্ত

জেতা বিজিত

ইংলণ্ডের বাণিজ্যনীতি ও ভারতবর্ষের সহিত তাহার বাণিজ্য-চুক্তি

অটোয়া চুক্তির সর্ত্তানুসারে বিগত ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৫), ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য নিয়মিত করিবার জন্য "ইণ্ডো-ব্রিটিশ-ট্রেড-এগ্রিমেণ্ট" নামক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই সংবাদ আমরা গতবারে দিয়াছি।

গত ২৯এ জানুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে এই চুক্তিপত্র-সম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তি-পত্রের বিরুদ্ধে সংক্ষেপতঃ তিনটি কথা উঠিয়াছিল। যথা :

১। এই চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় বণিক্-সম্প্রদায়ের মতামত লওয়া হয় নাই।

২। এই চুক্তিটি বিশেষভাবে ব্রিটিশের স্বার্থানুকূল।

৩। এই চুক্তি ভারতীয়দিগের 'ইচ্ছানুরূপ বাণিজ্যরক্ষার নীতি'-প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে।

বাণিজ্য-সচিব (Commerce Member) স্যার জোসেফ ভোর এই আপত্তি তিনটির জবাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এই চুক্তির মধ্যে নূতন কিছুই নাই। এই পরিষদ যে সমস্ত নীতি ও কার্য্য অতীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়াছে, এই চুক্তিতে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই চুক্তির উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না।

চুক্তির বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার উত্তরে বাণিজ্য-সচিব যাহা বলিয়াছেন তাহার কোনরূপ সমালোচনা আমরা করিব না। তবে বাণিজ্য-সচিবকে আমাদের দুইটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয়। এক, বর্ত্তমানে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বাণিজ্যনীতি কি? দুই, তাহা কি বস্তুতঃ ইংলণ্ড এবং ভারতের পক্ষে হিতকর?

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-নীতি কি তাহা সঠিক জানিবার উপায় আমাদের নাই। তৎসম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে হইলে ভারতের অধিকারলাভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইংরাজের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। ১৭৫৭ সাল হইতে ইংরাজের ভারতাধিকারের সূচনা বলিতে হইবে। তাহার ১০০ বৎসর পূর্ব্বের ইংলণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইংলণ্ডের আন্তর্জ্জাতিক কোনও সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সময়ের ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের বিবাদে পরিপূর্ণ। ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের বিরোধের মীমাংসা হইবার পর ইউনাইটেড কিংডম (United Kingdom) গঠিত হয় এবং তাহারই কয়েক বৎসর পরে ফ্রান্স এবং স্পেনের সহিত বিরোধের সূত্রপাত। এই সময় ইংলণ্ডের যত কিছু আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা মাত্র ইউরোপীয় কয়েকটি দেশের সহিত এবং তাহার বিকাশও বিবাদ-বিসংবাদে। ১৭৫৭ সালের পর আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের বিস্তৃতি লক্ষিত হয় এবং এই আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধও যুদ্ধবিবাদে পরিপূর্ণ। ইহারই কিছুকাল পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংলণ্ড ইউরোপীয় সমস্ত জাতির সহিত বিবাদ মিটাইয়া সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্য আগ্রহশীল। ইহার পর ইংরাজের অবাধ বাণিজ্যনীতির (Free Trade) পরিচালনা, ইংরাজের সাম্রাজ্য-গঠন এবং সমৃদ্ধিলাভ। ঘটনাচক্রে ১৯১৪ সালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ। তাহারই পর দেখা যায়, ইংলণ্ডের বাজার অনেক পরিমাণে ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ এবং জাপান দখল করিয়া বসিয়াছে। আরও পরিলক্ষিত হয় যে, ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ এবং জাপান এক্সচেঞ্জকে (exchange) বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপকরণরূপে ব্যবহার করিতেছে। এই সময় আবার ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশগুলির সহিত ইংলণ্ডের সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইবার একটা প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ইহারই পর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেশগুলিকে লইয়া অটোয়ার চুক্তি। জগতের অন্য কোন জাতি এই চুক্তির পক্ষভুক্ত নহে।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি বিচার করিয়া দেখিলে স্বতঃই মনে হয় যে, ভারতে আধিপত্যলাভ করিবার পর হইতে ইংলণ্ড কোনও দিন কোনও জাতির সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে বিবাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অথচ ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ প্রভৃতি কতকগুলি দেশ ইংলণ্ডের ইচ্ছানুরূপ চুক্তিতে তাহার সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইতে সম্মত নহে। ফলে ইংলণ্ডের বাধ্য হইয়া নিজের সাম্রাজ্যমধ্যে যাহাতে বাণিজ্য-প্রাধান্য বজায় থাকে, তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। ইহারই ফলে অটোয়া প্যাক্ট (Ottawa Pact)।

বাণিজ্যে প্রাধান্য বজায় রাখিবার প্রধান উপকরণ চারিটি, —কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, কৃষির ব্যবস্থা, এবং শিল্পের ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া মাল-চালানের (transport) ব্যবস্থাও বাণিজ্য-প্রাধান্য রক্ষায় অপরিহার্য্য।

শিল্প-বিজ্ঞান ও শিল্পের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংলণ্ড এখনও অদ্বিতীয় কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ প্রভৃতি অন্যান্য দেশ যে প্রায় তাহার সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আয়তনের কথা চিন্তা করিলে ইংলণ্ডে যে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের অনুরূপ কৃষির ব্যবস্থা হইতে পারে না তাহা সুনিশ্চিত। তাহার (ইংলণ্ডের) কৃষি-বিজ্ঞানও খুব উন্নত নহে। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের সহায়তায় বাণিজ্যক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির সমকক্ষতায় ইংলণ্ড নিজের কৃষি-ব্যবস্থার অভাব পূরণ করিয়া আসিতেছে। মাল-চালানের (transport) ব্যবস্থায় ইংলণ্ড এখনও অদ্বিতীয়।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের দিকে নজর দিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, কৃষির ব্যবস্থা এবং শিল্পের ব্যবস্থা দ্রুত গতিতে উন্নতিলাভ করিতেছে। তাহার কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক বেশী। তাহার শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ জগতের সমস্ত বাজারেই ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। কাজেই অটোয়া চুক্তি দ্বারা অনুমান করা যায় যে, ইংলণ্ড ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সহিত বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য তাহার নৌবহর ও শুল্ক-নীতিকে অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। শুল্ক-নীতিদ্বারা বাণিজ্য রক্ষা করিবার চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল, সমস্ত পণ্যদ্রব্যের আভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধি করা এবং তাহাতে বাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের আংশিক ভাবে সহায়তা করা হয় বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। শুল্ক-নীতি সফল করিতে হইলে শুল্কের পরিমাণ ক্রমশঃই অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি করিতে হয় এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল আন্তর্জ্জাতিক অসন্তোষ। ইহার ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ইতিহাসে ইহার উদাহরণের অভাব নাই।

কাজেই বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ চারিটিতে (কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, কৃষির ব্যবস্থা ও শিল্পের ব্যবস্থা) অপ্রতি-দ্বন্দ্বী হইবার চেষ্টা না করিয়া অটোয়া প্যাক্ট এবং তাহার পরবর্ত্তী চুক্তিগুলি দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-প্রাধান্য রক্ষা করার চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা চিন্তার বিষয়।

আমাদের মনে হয়, অটোয়া প্যাক্ট দ্বারা ইংলণ্ডের বাণিজ্য-প্রাধান্য এখনও কিছুদিন রক্ষা হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ কৃষি-বিজ্ঞানে ও কৃষির ব্যবস্থায় ভারতবর্ষাপেক্ষা উন্নতিলাভ করিতে পারিলে, ইংলণ্ড এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের মধ্যে যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইবে, তাহার ফল ইংলণ্ডের পক্ষে বিষময় হইতে পারে; এবং কৃষিব্যবস্থায় ভারত একবার তাহার শ্রেষ্ঠত্ব হারাইলে ভারতবর্ষের পক্ষে যে অনিষ্ট হইবে তাহার সংশোধন সহজ সাধ্য হইবে না।

অতীত ও বর্ত্তমান ভারতের কৃষির অবস্থা

কৃষির অবস্থা পরীক্ষা করিতে হইলে, কৃষকের আর্থিক অবস্থা ও তাহার কৃষির উপর আস্থা এবং জমির উৎপন্ন শস্যের হার সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কৃষকের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্দ্ধারণ করিবার উপযোগী লিখিত কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। ভারতের সাধারণ লোকের তাৎকালিক আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা হইতে কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে মতপার্থক্য আছে ইহা জানিতে পারি। কৃষকদিগের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধেও

যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। কৃষকেরা টিনের ঘর করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কৃষকদিগের ভিতর কেহ কেহ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে, কৃষক-কন্যারা ইংরাজী, সংস্কৃত ও শুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবংবিধ অবস্থা দেখাইয়া কেহ কেহ বলেন, কৃষকদের অবস্থা ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে, আবার কাহারও কাহারও মতে কৃষকের অবস্থা ক্রমশঃই হীন হইয়া পড়িতেছে।

অতীত ভারতে প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হারই বা কি ছিল তাহাও সঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে গত কয়েক বৎসরের গবর্ণমেন্টের কৃষি-বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিলে প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হার যে কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে তাহা লক্ষ্য করা যায়।

কৃষকের কৃষির উপর আস্থা যে ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ত্রিশ বৎসর আগেও বঙ্গদেশের চটের এবং তূলার কলগুলিতে বাঙ্গালী মজুর পাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। অন্যান্য প্রদেশের মজুরগুলিকেও আবাদের সময় এবং ধান কাটার সময় অবসর দিতে হইত। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। বাঙ্গালার যে কোনও জেলায় যে কোনও রকমের কল খুলিলে বাঙ্গালী মজুরের অভাব হয় না। অন্যান্য প্রদেশের মজুরদিগকেও আবাদের এবং ধান কাটার সময় আর ছুটি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কৃষকদের সকলেরই মুখে এখন প্রায় একই রকম কথা, যথা—"আর কিছু না করিলে শুধু কৃষিদ্বারা আমাদের আর চলে না।" কৃষকদিগের কৃষির উপর এই আস্থাহীনতা দেখিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাহাদের একদিন কৃষির উপর আস্থা ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। কৃষির উপর এই আস্থাহীনতার মূলে আছে কৃষিলব্ধ উপার্জ্জন। কোনও সময় ছিল যখন কৃষক তাহার কৃষিলব্ধ উপার্জ্জনে সন্তুষ্ট হইত, এখন আর ঐ উপার্জ্জনে সন্তুষ্ট হয় না। মোটের উপর প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হার যে কমিয়াছে, ফলে কৃষকের নিজ অবস্থায় যে অসন্তুষ্টি ঘটিয়াছে তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়।

কৃষকের এবং কৃষির অবস্থার এই বৈষম্য সম্বন্ধে আমাদের গবর্ণমেণ্ট যে কখনও চিন্তা করেন না, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে তাহা বলা যায় না। লিন্‌লিথগো কমিশনই ইহার প্রমাণ। কমিশনের ঐ রিপোর্টে কৃষি-গবেষণা, কৃষি-শিক্ষা, কৃষির মূলধন, সেচ প্রণালী প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায়ও ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী কিছু কিছু কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পাটের চাষ সঙ্কোচের জন্য গবর্ণমেণ্টের যেরূপ চেষ্টা চলিতেছে তাহা দেখিলেও গবর্ণমেণ্ট কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন এমন বলা যায় না। তথাপি কৃষকের ও কৃষির অবস্থার উন্নতির কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অথচ ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষির জন্যই ভারতের সমৃদ্ধি এবং এই সমৃদ্ধির জন্যই যুগে যুগে, স্মরণাতীত কাল হইতে পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতবর্ষে আসিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতেন ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এখন জিজ্ঞাস্য, ভারতের কৃষির অবস্থায় এত বৈষম্য ঘটিল কিরূপে?

কৃষির প্রধান উপাদান কি তাহা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই নজর পড়ে বর্ষাকালের দিকে। বৃষ্টির জলে ফসল যেরূপ ভাল হয়, অন্য কোনও জলে ফসল সেরূপ হয় না ইহা আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস। বৃষ্টির জলের সঞ্চয়স্থান পর্ব্বত, এবং পর্ব্বত হইতে নামিয়া সেই জল নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। যে সমস্ত নদীর পাড় নদীবক্ষ হইতে অত্যুচ্চ বা অতি-নিম্ন নহে, সেই সমস্ত জমির উর্ব্বরা শক্তি সাধারণতঃ অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। বৃষ্টির জল চাষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকারী কেন, তাহার অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, বৃষ্টির জলের বিশুদ্ধতাই ইহার কারণ ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, যে-নদী যত উচ্চ পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদী তত বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ।

ভারতবর্ষের গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্ম্মদা এবং তাপ্তী প্রভৃতি নদীগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে অনুমান করা যায় যে, তাহাদের উৎপত্তিস্থান হইতে সমুদ্রের সহিত মিলনের স্থান পর্য্যন্ত দুই পাড় প্রায়শঃ নদীবক্ষ হইতে খুব উচ্চ অথবা খুব নিম্ন নহে। যাহাতে নদীর পাড় প্লাবিত না হইতে পারে অথবা জলের রস গ্রহণে নদীর নিকটবর্ত্তী জমিগুলির কোনও বাধা না জন্মে, এইরূপ একটা চেষ্টা যেন কেহ করিয়াছিল তাহা মনে হয়। নদীগুলির কোনও অংশে কোন সেতু বা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া নদীর স্রোত প্রবাহে বিঘ্ন-সৃষ্টির কোনও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না।

নদীগুলি বৃষ্টির বিশুদ্ধ বারি বহন করিয়া অবাধে সমুদ্র পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতে পারিত এবং তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি এমনভাবে ঢালু ছিল যে, সারা ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলেই যাহাতে অনায়াসে রস সঞ্চিত হয়, কেহ যেন যত্ন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ভারতের নদীগুলির এই অবস্থান পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এমন কোনদিন ছিল যখন ভারতবাসী জানিত যে,

(১) কৃষি জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান উপায়।

(২) বৃষ্টির জল কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়।

(৩) দেশের মধ্যে নদীকে অবাধে চলিতে দেওয়া দেশের সর্ব্বত্র জলসিঞ্চনের প্রধান উপায়

এবং ইহার জন্যই সারা ভারতবর্ষের জমি উর্ব্বরা-শক্তিতে জগতের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের সমাজ-সংগঠনের দিকে নজর দিলে অনুমান করা যায় যে, কৃষক যাহাতে কৃষির উপর আস্থাহীন না হয়, তদ্বিষয়ে ভারতবাসীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। জীবিকা-সংস্থানের যে-বিভাগে সাধারণতঃ উপার্জ্জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সমাজের সমস্ত লোক সেই বিভাগে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য সমধিক পরিমাণে উৎসুক হইয়া পড়েন তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন ভারতে (অবশ্য ২৫০০ বৎসর আগেকার ভারতের কথা আমরা অনুমান করিয়াছি) জীবিকানির্ব্বাহের চারিটী উপায় ছিল, যথা—কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য এবং শিক্ষা। এই চারিটি বিভাগের উপার্জ্জনও এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, তাহাদের মধ্যে খুব বেশী তারতম্য ঘটিত না। ইহা ভারতীয় দর্শনাদি গ্রন্থপাঠে অনুমান করা যায়। আমাদের মনে হয়, অতীত ভারতের জমির উর্ব্বরা-শক্তি এবং কৃষির উপর অনুরক্তির কারণ, ভারতের নদনদী সমূহের অব্যাহত গতি এবং সামাজিক ব্যবস্থা। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে তাহার নদীর আর সে অবাধ গতি নাই। কোথাও বা সেতু দ্বারা, কোথাও বা রেলপথ দ্বারা, কোথাও বা ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের ও লোকাল-বোর্ডের রাস্তা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে জমির উর্ব্বরা-শক্তি কমিয়া গিয়াছে। জীবিকা-সংস্থান ব্যাপারেও ১৫৲ টাকা বেতনের চাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০০০৲ টাকা বেতনের চাকুরী পর্য্যন্ত কৃষকের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে সমস্ত কৃষক কৃষির উপর আস্থাহীন হইয়া চাকুরী-জীবনে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

এই পরিবর্ত্তনগুলি আপাতদৃষ্টিতে প্রায় সকলেরই পক্ষে লোভনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ক্রমে ক্রমে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হারাইতেছে, এই পরিবর্ত্তনগুলিই তাহার প্রধান কারণ কি না তাহা আমরা আমাদের গবর্ণমেণ্টকে ও দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শিক্ষা

বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা

বঙ্গীয় পাবলিসিটি বোর্ড (Pnblicity Board of Bengal) সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশের শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে যেখানে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩ শত ৮০ জন ছাত্রী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিলেন, সেখানে ১৯৩৩ সালে শুধু প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেই ২৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩ শত ৩৮ জন এবং সর্ব্বশুদ্ধ ২৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯১ জন দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় খৃষ্টান বালকবালিকাগণের ৩ ভাগের ২ ভাগই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ছাত্রগণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় নাই বটে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ছাত্রগণের সংখ্যা দিন দিনই দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯২২ সালে এই শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ছিল, ৮২ হাজার ৮ শত ৫২ জন; ১৯২৭ সালে ছিল, ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ১ শত ৭৯ জন; ১৯৩২ সালে ছিল, ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৪ জন এবং ১৯৩৩ সালে ইহাদের সংখ্যা হইয়াছে, ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ২ শত ২০ জন। অর্থাৎ ১৯২২ সালের তুলনায় ১৯৩৩ সালে উহাদের সংখ্যা ৫ গুণেরও বেশী বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নমঃশূদ্র এবং পোদশ্রেণীর লোকেরাই শিক্ষাবিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহশীল। মুসলমান ছাত্রগণের সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২২ সালে মুসলমান ছাত্রগণের সংখ্যা ছিল, মোট সংখ্যার শতকরা ৩·৫ জন; ১৯৩২ সালে ছিল ৫·২ জন; এবং ১৯৩৩ সালে হইয়াছে ৫·৩ জন।

যে বাঙ্গালাদেশের উচ্চশিক্ষিত লোক পৃথিবীর মধ্যে প্রতিযোগিতায় স্থানলাভ করিতে সমর্থ, সেই বাঙ্গালাদেশেরই

অগণিত অশিক্ষিত লোকসংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। উক্ত বোর্ড ইহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যথেষ্ট বিদ্যালয়-সংস্থাপনোপযোগী অর্থের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ বলিলে অন্যায় হইবে। সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারোপযোগী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট আছে এবং যে সকল ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাহারা যদি সকলেই প্রাথমিক শিক্ষার শেষ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই অশিক্ষিতের সংখ্যা বাঙ্গালাদেশ হইতে বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার জনগণ এত দরিদ্র যে, তাঁহারা তাঁহাদের বালকবালিকাদিগকে শিক্ষিত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে যতদিন দরকার, ততদিন বিদ্যালয়ে রাখিতে সমর্থ হয় না; তৎপূর্ব্বেই জীবনধারণোপযোগী কোন না কোন একটা কাজে প্রবিষ্ট করাইতে বাধ্য হন। ফলে যেটুকু বিদ্যা তাঁহারা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহাও অনতিকাল মধ্যেই বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

পাবলিসিটি বোর্ডের এই বিবৃতির তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। যথা :

[১] বাঙ্গালাদেশের উচ্চশিক্ষিত লোক পৃথিবীর মধ্যে প্রতিযোগিতায় স্থানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

[২] বাঙ্গালাদেশের অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অগণিত।

[৩] বাঙ্গালার জনগণ এত দরিদ্র যে, তাঁহারা তাঁহাদের বালকবালিকাদিগকে "শিক্ষিত" পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে যতদিন দরকার, ততদিন বিদ্যালয়ে রাখিতে সমর্থ হয় না।

উপরোক্ত প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, "শিক্ষিত" বলিতে কি বুঝিবে? শুধু লিখিতে এবং পড়িতে জানিলেই কি "শিক্ষিত" পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারা যায়? বাঙ্গালাদেশের "শিক্ষিত" যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন লোক গবর্ণমেণ্টের চাকুরী না পাইলে নিজের চেষ্টায় যথেষ্ট পরিমাণে জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ? আমাদের দেশে শিক্ষার জন্য শিক্ষা (learning for the sake of learning) বলিয়া একটা প্রচলিত কথা আছে। সেই হিসাবে আমাদের অনেক বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সত্য এবং তাঁহারা জগৎকে চমৎকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাও সত্য, কিন্তু তাঁহারা কোন্ জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না এবং যে বিজ্ঞান এবং দর্শন আমাদের নিরন্ন বেকারদিগের গ্রাসাচ্ছাদনেরও কোন উপায়ই নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই, সেই বিজ্ঞান ও দর্শনের শিক্ষা যে কিরূপ শিক্ষা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে,সাধারণ লোক যদি বুঝিতে পারিতেন যে, "শিক্ষিত" হইতে পারিলেই স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহের অভাব হইত কি? যেখানে গেলে আহার্য্য পাইবে বলিয়া লোকের ধারণা থাকে সেখানে যাইতে কাহার অনিচ্ছা? শিক্ষালাভ করিলেই অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে এবং সম্মানকর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাকেই মূল উদ্দেশ্য রাখিয়া শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ইহা যদি জনসাধারণের জানা থাকিত, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাঙ্গালাদেশে এত অগণিত থাকিত না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস

বিগত ১১ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস-প্রতিপালনোপলক্ষে একটি বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হইয়া ময়দানাভিমুখে গমন করেন। সেখানে বাঙ্গালার গবর্ণর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর স্যর জন এণ্ডারসন এবং ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগান করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসে ছাত্রীগণের চ্যান্সেলারের অনুমোদনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে মার্চ্চ করিয়া ময়দানাভিমুখে গমন করিবার সংবাদ আনন্দের বটে! কিন্তু যাঁহাদের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীকে পুরুষোচিত ও সৈনিকসঙ্গত চালচলনে অভ্যস্তা হইতে শিখাইতেছেন, তাঁহাদের কয়জনের পারিবারিক জীবন সুখের, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য আমরা ছাত্রীগণের অভিভাবকদিগকে অনুরোধ করি।

স্যার জন এণ্ডারসনের বক্তৃতা

অতি অল্পকাল মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও ইতিহাসের গবেষণায় পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং বঙ্গদেশের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কি বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া স্যার জন এণ্ডারসন বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র পেশা বা চাকুরীর সংস্থান এবং বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যানুশীলনের উপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে ছাত্রগণের চিন্তাধারা ও চরিত্রের উপর ইহা কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল, ইহা কিরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত, এবং সামাজিক ও জাতিগত জীবনের সার্থকতা ও পরিপূরণকল্পে ইহা কতদূর সহায়তা করিতে সক্ষম, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণকে শিক্ষার্থিগণের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল মাত্র অতীত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া কার্য্য করিয়া গেলেই চলিবে না, পরন্তু উহা প্রতিপূরণ করিয়াও যাহাতে জাতীয় জীবন সুস্থ ও সবল রাখিবার উপযোগী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য নিজের নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। শিক্ষা যেন আমাদিগকে নিয়মানুবর্ত্তী, সঙ্ঘবদ্ধ এবং সাহসী করিয়া তুলিতে সমর্থ হয় এবং বুদ্ধির দ্বারা যেটি ভাল মনে করিব নির্ভীকভাবে সেইটি সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য আনিয়া দেয়।

চ্যানসেলার মহোদয়ের বক্তৃতা অনুসারে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও ইতিহাসের গবেষণায় পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।" কিন্তু আমরা ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। ইহা কোন্ দেশের বিজ্ঞান ও ইতিহাস? জগতের কোন্ দেশ বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধি সমস্ত জগৎকে এক সময় আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা কি আমাদের চ্যানসেলার মহোদয়ের জানা নাই? সেই সমৃদ্ধি কি বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত গঠিত হইয়াছিল, আমাদিগকে এইরূপ বুঝিতে হইবে? বিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত যদি সমৃদ্ধিগঠন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির মূলেও যে একটা বিশেষ জ্ঞান ছিল, ইহা অনুমান করিলে কি অন্যায় হইবে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অদ্যাবধি সেই বিজ্ঞানের কয়টি গবেষণা করিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি কি? যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বিজ্ঞানের অনুসন্ধান না মিলিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস বলিয়া যাহা প্রচারিত হইতেছে, তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে হইবে না কি? কাল্পনিক ইতিহাসের মূল্য কতটুকু, তাহাতে গৌরব করিবারই বা কি আছে? চ্যানসেলার মহোদয় আরও বলিয়াছেন যে, "কেবলমাত্র পেশা বা চাকুরীর সংস্থান এবং বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যানুশীলনের উপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব নির্ভর করে না।" ইহাতে কি আমরা বুঝিব যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষার ছাপ পাইয়া বাহির হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পেশার সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন? চ্যানসেলার মহোদয় কি অনুসন্ধান করিয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-প্রাপ্ত কয়জন ছাত্র গবর্ণমেণ্টের অথবা সওদাগরী অফিসের চাকুরী না পাইয়া নিজের নিজের বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনে এতাবৎ সক্ষম হইয়াছেন? কয়েকজন উকিল, ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন? তাঁহাদের মধ্যেই বা কয়জন জীবনযুদ্ধে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা কি তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? স্যার জন এণ্ডারসনের কার্য্যকলাপে আমরা এতাবৎকাল যাহা দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার বক্তৃতার এই অংশে তাঁহার নিজের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে কি-না, তাহা আমাদের সন্দেহ করিতে ইচ্ছা হয়।

তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি যাহা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, শিক্ষার পদ্ধতি যদি তদনুরূপ হয় তাহা হইলে তিনি বাস্তবিকই বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদার্হ হইবেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত গৌরব-কাহিনীর একখানি মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও যে তিনি খুবই আশাবাদী তাহা তাঁহার বক্তৃতায় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলেন যে, শুধু অতীতে যাহা ছিল, তাহা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব না, বরং অতীতের মধ্যে যাহা দোষযুক্ত

ছিল তাহার সংশোধন করিয়া নূতন নূতন কর্ম্মপদ্ধতির অনুশীলন দ্বারা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের আদর্শ স্থানীয় করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে যত্নপরায়ণ হইব।

উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের সেদিনের অনুষ্ঠান দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছেন যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও তদনুযায়ী সুবিধা পাইলে তাঁহারা পৃথিবীর যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অনুরূপ সংগঠন-ক্ষমতা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন।

বর্ত্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্রগণের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত, আত্মনির্ভরশীল, কর্ম্মপরায়ণ, নির্ভীক, জাতীয় কৃষ্টিতে গৌরবান্বিত, সঙ্কীর্ণতাহীন, ও জাতিগত-বিদ্বেষ-বিহীন হইয়া শিক্ষা ও স্বাধীনতার বার্ত্তা বহন করিয়া ভবিষ্যৎ বাঙ্গালার নেতৃস্থানীয় হইতে পারেন।

ভাইস-চ্যান্সেলারের বক্তৃতায় অনেক আশার বাণী ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তিনি নবীন হইলেও বাঙ্গালী তাঁহাকে তাহাদের শিক্ষার গুরুর গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। কাজেই তাঁহার দায়িত্ব অনেক এবং তাঁহাকে তাহা মনে রাখিতে হইবে। তিনি ছাত্রীগণকে মার্চ্চ করাইয়া ময়দানে লইয়া গিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম নবীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি যে সমস্ত আশার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা না দেখাইলে অধিকতর নবীনতার পরিচয় প্রদান করা হইবে। তাঁহার বক্তৃতায় "অন্তর্নিহিত মহাশক্তি" "আত্মনির্ভরশীল" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে। এই সমস্ত শব্দ তিনি চিন্তা করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন কি? শ্রমজীবীও জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত হয়; কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা আত্মনির্ভরশীল হইয়া জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত হইতে হইলে যাহাতে বুদ্ধির বিকাশ হয়, তদনুরূপ শিক্ষার প্রয়োজন। কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে বুদ্ধির বিকাশ সাধন সম্ভব হয়, তাহা তিনি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গবর্ণমেণ্টের চাকুরিয়া ও সওদাগরী অফিসের কর্ম্মচারী এবং বেকারের সংখ্যা এতাবৎকাল যত বাহির হইয়াছে, তাহার তুলনায় আত্মনির্ভরশীলের সংখ্যা অতীব নগণ্য। কাজেই তাঁহার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আত্মনির্ভরশীল যুবক প্রস্তুত করিতে হইলে শিক্ষার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা তাঁহার কার্য্য মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিব।

মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী

বিগত ১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন ঐ দিবস 'Anderson Casualty Ward" নামক গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় উক্ত শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতি ছিলেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মেজর-জেনারেল ডি পি গয়েল, স্যার নীলরতন সরকার, স্যার বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, স্যার হাসান সুরাবর্দ্দি প্রমুখ বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভদ্রমহোদয় উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

সহশিক্ষা

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি নয় দশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকবালিকাগণের সহশিক্ষার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং উক্ত বয়স্ক বালকদিগের বিদ্যালয় সমূহে যথেষ্ট পরিমাণে স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সময় পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছে। কেবল মাত্র যে সকল স্থানে একাধিক বিদ্যালয়ের অভাব, সেখানে সহশিক্ষা চলিতে পারিবে।

আমাদের মনে হয়, ছেলেমেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সহশিক্ষা না হওয়াই ভাল।

শিক্ষাবিস্তার

মধ্যপ্রাদেশিক সরকারের ১৯৩৩-৩৪ সালের শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, সরকারের অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও উক্ত বৎসরে মধ্যপ্রদেশে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি

হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ১৩১টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ১৪ হাজার ৩ শত ৩১ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বৎসরে ১১৭টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহাতে ৯ হাজার ২শত ৪৯ জন ছাত্র বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। বিদ্যালয় সমূহের সংখ্যার অনুপাতে এ বৎসরে গড়ে বিদ্যালয়পিছু ৭৭ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও একটি কথা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শত-করা অন্ততঃ ৪৮ জন শেষ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়া থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হইয়া এবং তদনুসারে শিক্ষপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আনন্দের বিষয় হয়।

ইরাণ না 'পার্সিয়া'?

পারস্য সরকার সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিগত ২৫০০ বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্য দেশ যাহাকে পার্সিয়া(Persia) নামে অভিহিত করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে আগামী ২১শে মার্চ্চ হইতে ইহাকে ইরাণ (Iran) নামে অভিহিত করিতে হইবে। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং মানুষের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দৃষ্টিপাত করিলে 'পার্সিয়া' শব্দটি নাকি 'ইরাণ' শব্দ দ্বারা যাহা বুঝায়, তাহার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না, ইহাই পারস্যবাসী বিশেষজ্ঞগণের মত।

'পার্সিয়া' শব্দটি আমরা প্রাচীন গ্রীক জাতির নিকট হইতে পাইয়াছি। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে পার্সিপোলিস (Persepolis) নামে পরিচিত জনৈক সম্ভ্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল পার্স (Pars) প্রদেশের অন্তর্গত। গ্রীকগণ সর্ব্বপ্রথম যে পারস্যবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হন তাঁহারা এই 'পার্সি' প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া, গ্রীকগণ ঐ দেশটিকে পার্সিস (Persis) বলিতেন এবং সেখানকার অধি-বাসীগণ পার্সাই (Persai) নামে অভিহিত হইত।

আরবগণের বিশ্বাস যে, সেই প্রাচীন কালেও সেখানকার অধিবাসীগণ ঐ দেশটিকে 'ইরাণ' নামেই অভিহিত করিতেন। ঐ নাম আজও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং ঘটনাক্রমে 'ইরাণ' শব্দটী উর্দ্দু এবং হিন্দী ভাষায় "দেশ" অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। আরবদের আক্রমণ সময়ে আরবী ভাষায় 'পে' (Peh) ধ্বনিটির অনুরূপ কোনও শব্দ না থাকায় প্রদেশটী পার্স (Fars) নামে পরিচিত হয় এবং এই কারণেই পাশ্চাত্য জগতের মানচিত্রগুলিতে অদ্যাপি 'পার্সিয়া' শব্দটি দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজনীতি ও শিক্ষা

কিছুদিন হইল লণ্ডনে কয়েকটি শিক্ষা-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে।

গিল্ডহলে প্রধান শিক্ষক-সঙ্ঘের সাধারণ বাৎসরিক সভায় মিঃ জেনকিন টমাস (Mr. Jenkyn Thomas) সাহেব সভাপতির অভিভাষণে শিক্ষার মধ্যে রাজনীতির স্থান সম্বন্ধে লণ্ডন শ্রমিক দলের মতের সমালোচনা করেন। লণ্ডনের শ্রমিকদল নাকি লণ্ডনের শিক্ষা-সমিতিকে তাঁহাদের অধীন বিদ্যালয়সমূহের পুস্তকগুলি যাহাতে মহাজন-তান্ত্রিক (Capitalistic) ও অস্ত্রতান্ত্রিক (Militaristic) না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন। মিঃ জেনকিন টমাস ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন যে, আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে কোনও রাজনৈতিক দল শিক্ষাবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং যে সকল পুস্তক বর্ত্তমানে বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হইতেছে, সেগুলি কোনও রাজ-নৈতিক দলের সমর্থনকল্পে লিখিত বলিয়াও তিনি মনে করেন না। কাজেই এইরূপ ব্যাপারে মনে করিতে হইবে যে, ইংলণ্ডের অতীব দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে।

ভাষা ও সভ্যতা

আধুনিক ভাষা পরিষৎ-(Modern Language Association)-এর একটি সভায় প্রোফেসর এবরক্রম্বি (Lascelles Abercrombie) বলেন যে, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির সহিত 'ক্ল্যাসিক্স্'-(classics)-এর কোনরূপ দ্বন্দ্ব নাই। 'ক্ল্যাসিক্স্' না জানিলে কি করিয়া যে ছাত্রদিগকে ইংরেজী ভাষা শিখান সম্ভব হইতে পারে তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। এই প্রসঙ্গে স্যার ই, ডেনিসন রস্ (Sir E. Denison Ross) বলেন যে, বালককে 'ক্ল্যাসিক্স্' শিখিতে বাধ্য করিলে তাহার শিক্ষার উন্নতিপথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইবে। প্রোফেসর জে, ডবলু ম্যাকেল

(Professor J. W. Mackail) এই বিতর্কে যোগদান করেন এবং সোল্লাসে প্রচার করেন যে, গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষা আদৌ মৃত ভাষা নহে, পরন্তু উহারা অমর। কোনও ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময়ে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা উহার মধ্য দিয়া সাধারণভাবে সভ্যতা (civilization) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

কৃষি

বাঙ্গালায় ফলের চাষ

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে যে সমস্ত জমিতে পাটের চাষ বন্ধ করা হইবে তাহাতে যাহাতে ফলের চাষ হইতে পারে তৎসম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশে একটা প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি "ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ"-(Imperial Council of Agricultural Research) এর অধীনে কৃষ্ণনগরে একটি গবেষণাগার খোলা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে প্রায় ৯ একর পরিমাণ একখণ্ড জমিকে কৃষিযোগ্য করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ঐ জমিখণ্ড জঙ্গলে এবং নানাবিধ কীটে পরিপূর্ণ ছিল। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা জমিটিতে আবাদ করা হইতেছে এবং শীঘ্রই উহা কৃষিযোগ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই স্কিমের ভার-প্রাপ্ত অফিসার মিঃ এস, জি, শর্ঙ্গপাণি (Mr. S. G. Sharngapani) জনৈক প্রেস-প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর খাদ্য অত্যন্ত অপ্রচুর এবং খাদ্যের এই অপ্রচুরতা দূর করিতে হইলে তাহাকে অধিকতর পরিমাণে ফল আহার করিতে হইবে। যে সকল জমিতে পাটের চাষ বন্ধ করা হইবে, সেই সকল স্থানে যাহাতে ফলের চাষ করা যাইতে পারে, তাহার গবেষণাই কৃষ্ণনগরের এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। আনারস, পেঁপে, কলা, আতা, পেয়ারা এবং লেবু প্রভৃতি ফল সম্বন্ধেই সাধারণতঃ গবেষণা করা হইবে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হইবে গরীব চাষাদের সাহায্য করা, ধনীদের নহে। পাঁচ বৎসরের জন্য এই স্কিমটির বাবদ প্রায় ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।

কোনও স্থানকে আবাদ করিতে হইলে, যদি নানাবিধ ব্যয়সাধ্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে গরীব চাষার সহায়ক হইবে ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কোনও কার্য্যের পন্থা সহজ ও সরল না হইলে গরীব চাষা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে কি?

শীতের প্রকোপে শস্য নষ্ট

মাঘ মাসের প্রথমে ভারতের নানা স্থানে এ বৎসর শীতের বিশেষ প্রাবল্য অনুভূত হইয়াছে। নাসিক হইতে একটি খবরে জানা যায় যে, সেখানকার গ্রামসমূহে শীতের আধিক্য হেতু প্রচুর পরিমাণে শস্য নষ্ট হইয়াছে। কাডবা (Kadwa Canal) অঞ্চলে তুষারপাত হেতু আখের চাষ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মোটামুটি ক্ষতির পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আখ ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে শতকরা ৬০ হইতে ৭৫ টাকার পরিমাণ শস্য নষ্ট হইয়াছে।

আঙ্গুর—৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে শতকরা ৬০ টাকারও বেশী পরিমাণ শস্য নষ্ট হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত শাকসব্জী প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শিল্প

চট্টগ্রামে নূতন শিল্প-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রাম সহরে প্রায় ৪০টি যুবক বর্ত্তমানে সাবান প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে আরও তিনটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যথা, শ্রীপুরে একটি পিত্তলের কারখানা, জোরার-গঞ্জে একটি মৃৎপাত্রের কারখানা এবং ফতেহাবাদে একটি ছাতার বাঁটের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় কলকারখানা

ভারতীয় কল-কারখানা সম্বন্ধীয় ১৯৩৩ সালের গণনালিপি (Statistics) বাহির হইয়াছে। উক্ত বৎসরে রেজেষ্টারীকৃত কল-কারখানার সংখ্যা ৯,৪৩১ হইতে ৯,৫৫৮এ দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় কল-কারখানা আইনের অন্তর্গত চলতি কলকারখানার সংখ্যা ছিল ৮,৪৫২। পূর্ব্ব বৎসরে ২১১টি কম ছিল। এই ৮,৪৫২টির মধ্যে ৩,৯৩৩টি ছিল সারা বৎসর চলতি এবং অবশিষ্ট ৪,৫১৯টি বৎসরের কিছু সময় চলিয়াছিল।

ব্রিটিশ ভারতে চিনির কারখানা ১৯৩২ সালে ছিল ১৬৬টি, কিন্তু ১৯৩৩ সালে উহার সংখ্যা হইয়াছে ২১৩। সংযুক্ত প্রদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যাতেই উন্নতি বেশী হইয়াছে। মধ্য-প্রদেশ ও ব্রহ্মদেশে কয়েকটি নূতন ধানের কল রেজেষ্টারী হইয়াছে। অন্যদিকে বঙ্গদেশে কয়েকটি ধানের ও তেলের কল, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে কয়েকটি নীলের এবং ব্রহ্মদেশে কয়েকটি কাঠের কারখানা সমস্ত বৎসরই বন্ধ রহিয়াছে।

এই বৎসরে গড়ে ১৪,০৩,২১২ জন শ্রমিক কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। পূর্ব্ব বৎসরে ইহা হইতে ১৬,৪৯৯ জন বেশী ছিল। বোম্বাইতে পাঁচটি কল বৎসরের শেষ ভাগে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় উহারা কোনরূপ হিসাব দাখিল করে নাই। এই ৫টি কলে নিযুক্ত ১০,৭৬৭ জন শ্রমিক ধরিলে পূর্ব্ব বৎসর হইতে শ্রমিকের সংখ্যা বেশী কম হইবে না। পাটের কলে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা ছিল ২,৫৭,১৫৭। পূর্ব্ব বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ২,৬৩,৪৪২। কাপড়ের কলে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা ছিল ৩,৬২,০২৭। পূর্ব্ব বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ৩,৯৭,৩৫৮। নূতন কারখানা যতগুলি হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হইয়াছে চিনির কারখানা এবং তাহাতেও

১৫,০০০ জন নূতন শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে। স্ত্রী-শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯৩২ সালে ছিল ২,২৫,৬৩২ জন এবং ১৯৩৩ সালে ছিল ২,১৬,৮৩৭ জন। শিশু-শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯৩২ সালে ছিল ২১,৭৮৩ জন এবং ১৯৩৩ সালে ছিল ১৯,০৯১ জন।

কুটির-শিল্প

বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী পুণায় শিল্প-প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে ভারতীয় কুটিরশিল্প, বনজ, কৃষিজাত দ্রব্য এবং চিত্র ও কলা সম্বন্ধীয় জিনিষগুলিই বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিচালক সমিতি কুটিরশিল্পকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে যত্নবান। আগামী ১০ই মার্চ্চ উক্ত প্রদর্শনীর কার্য্য শেষ হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

১। ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে বণিজ্য-সম্বন্ধ উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে অষ্ট্রিয়া হইতে ১১ জন ব্যবসায়ী লোক সম্প্রতি বোম্বাই সহরে পৌছিয়াছেন। ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অষ্ট্রিয়া হইতে ভারতে রপ্তানির হার অধিকতর উন্নত করা সম্ভব কিনা ইহার অনুসন্ধান করাই তাঁহাদের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

২। বেকার-বীমা সম্বন্ধে লণ্ডনে যে ষ্টেটুটারী কমিটি গঠিত হইয়াছিল সেই কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন যে প্রত্যেক বেকারের প্রতি সপ্তাহে তাঁহার নিজের জন্য ১২॥০ শিলিং স্ত্রীর জন্য ৬॥০ শিলিং এবং প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য ২ হইতে ৩ শিলিং পাওয়া উচিত।

৩। ল্যাঙ্কাশায়ারের ভারতীয় তুলা সমিতির প্রথম বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী পাঠে জানা গেল যে, উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এ যাবৎ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ হইতে শতকরা ১০০ ভাগেরও বেশী অর্থাৎ পূর্ব্বের পরিমাণের দ্বিগুণেরও অধিক তুলা আমদানী করিয়াছে। এই বিবরণীতে আরও প্রকাশ যে, সম্প্রতি ল্যাঙ্কাশায়ারের আরও কতকগুলি কল ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ব্যবহারে সন্তুষ্টিলাভও করিয়াছে। এইরূপে চাহিদার বৃদ্ধির উপরই যে ভারতীয় তুলার চাষের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না, ইহাই উক্ত বিবরণীতে সুস্পষ্ট রূপে বিবৃত রহিয়াছে।

৪। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তি হইয়া গিয়াছে। আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের কয়লা ক্রয় করিবে, বিনিময়ে ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডের গবাদি পশু ক্রয় করিবে। ইংলণ্ডের ডোমিনিয়ন সেক্রেটারী (Dominion Secretary, মিঃ জে. এইচ. টমাস (Mr. J. H. Thomas) সাহেব মনে করেন যে, উক্ত চুক্তির ফলে ইংলণ্ড বৎসরে ১২,৫০,০০০ টন কয়লা আয়র্লণ্ডে রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে এবং উহা দ্বারা ৫০০০ লোকের কর্ম্মের সংস্থান হইবে।

রাজ্য পরিচালনা

ব্যবস্থা-পরিষদ

বিগত ২১শে জানুয়ারী নবগঠিত ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের স্যার আবদার রহিম এবং সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কংগ্রেসের জাতীয় দলের মিঃ অখিলচন্দ্র দত্ত। স্যার আব্দার রহিম ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত দুইজনই বঙ্গদেশবাসী, বাঙ্গালী। আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করি। ২৪শে জানুয়ারী ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন পরিষদের নবনির্ব্বাচিত সদস্যগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায়, ইংরাজগণ যে ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, ইহা ফুটাইয়া তুলিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কর্ম্মপদ্ধতিতে পার্থক্য থাকিলেও ইংরাজগণ ও ভারতীয়গণ, উভয়েরই যে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতিই একমাত্র লক্ষ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই বলিয়াই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কার সম্বন্ধীয় বিল যে, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির তুলনায় অনেক উন্নত এবং ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর, তাহা বলিতেও দ্বিধা করেন নাই।

পরিষদে এ যাবৎ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। প্রথম, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য-চুক্তি এবং দ্বিতীয়, জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট।

প্রথমটির সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে স্থানাভাবে আমরা এবারে কিছু বলিতে পারিলাম না। আগামী মাসে এ সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বেতার ও সরকার

বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি যশোহর জেলার কতিপয় গ্রামে বেতারবার্ত্তা প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। বেতার-বার্ত্তার সাহায্যে পল্লী-সংস্কার এবং পল্লীবাসীগণের আদর্শ গঠনের সহায়তা করাই এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিগত

মিঃ র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড

বিগত ২রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড নিউ কাসল্‌-(New Castle)-এ এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়

(exchange) প্রথার অসামঞ্জস্যগুলি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইলে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্যার কোনরূপ সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, জগতের জাতিসমূহ এখনও এই বিষয়ের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কেবল কল-কারখানার দ্রব্য প্রস্তুত করিলেই চলিবে না। পরন্তু উৎপন্নকারী ও ক্রেতার মধ্যে সন্তোষজনক সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে। এবং জাতিসমূহও উন্নত হয়।

স্যার স্যামুয়েল হোর

ভারতীয় শাসন-সংস্কার বিল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর অক্সফোর্ডে একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, এই বিল কয়েকজন কল্পনা-প্রবণ লোকের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কল্পনামাত্র নহে। পরন্তু আজ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট যত সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল এই ভারত সমস্যা বিশেষ বিচারবুদ্ধি দ্বারা সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বক্তৃতায় স্যার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছেন যে, জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে ও ইংলণ্ডে আজ পর্য্যন্ত কেহই ইহার পরিবর্ত্তে গঠনমূলক কোনও স্কিম প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

হের হিটলার

"সার" প্রদেশ পুনরায় জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইবার পর হের হিট্‌লার আবেগময়ী ভাষায় প্রচার করিয়াছেন যে, ফরাসীর সহিত এখন আর জার্ম্মানীর রাজ্য লইয়া কোনরূপ বিরোধ নাই। সুতরাং শান্তি ও পুনর্ম্মিলনের সুসময় সমাগত। তিনি আরও বলেন যে, জার্ম্মানী এখন আন্তর্জ্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক। একদিকে যেমন তাঁহারা জগতের অন্যান্য পরাক্রমশালী জাতিসমূহের সহিত সমশক্তিবিশিষ্ট হইবার জন্য সচেষ্ট, অন্যদিকে তেমনি তাঁহারা জগতের যাবতীয় নরনারীর কল্যাণকল্পে আন্তর্জ্জাতিক সখ্যস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প।

স্যার জন এণ্ডারসন

মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন উত্তর ও মধ্য বঙ্গের কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও বহরমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইয়াছে। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "জ্ঞান-সাগর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের রেশম-সঙ্ঘে তিনি দুই শত টাকা সাহায্যস্বরূপ প্রদান করেন। জিয়াগঞ্জে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর হাসপাতাল পরিভ্রমণকালে তিনি সেখানে ইসাবেল মেলর মেটারনিটি ওয়ার্ড (Isabel Mellor Maternity Ward) এবং লুসি জয়েস্ আউট-পেসেণ্টস্ ডিসপেনসারী (Lucy Joyce Out-patients Dispensary), এই দুইটির উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং উক্ত মিশনারীদের কার্য্যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া সাহায্যস্বরূপ পাঁচ শত টাকা উপহার প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নাম 'বঙ্গশ্রী'র পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত—তিনি বিদেশ হইতেও এই পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ও গল্প পাঠাইয়াছেন। শিবপুর কলেজ হইতে বি-ঈ পাশ করিয়া তিনি ভাগলপুরে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ সনে রি-ইনফোরস্‌ড কংক্রিটের কাজ ভাল করিয়া শিখিতে তিনি ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। এই জানুয়ারী মাসে দেশে ফিরিয়াছেন। প্যারিসে থাকিতে তিনি

সেখানে ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান ব্যুরো নামে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করিয়াছিলেন। সে প্রতিষ্ঠানটি আজও বর্ত্তমান। তাঁহার মতে, বর্ত্তমানে এদেশের যেসব শিক্ষিত বেকার যুবক আছেন, তাঁহাদের যে কেহ কোন প্রকারে ইউরোপে পদার্পণ করিলেই জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গশ্রীর পাঠকবৃন্দকে জ্ঞাত করিবেন।

লর্ড আরস্‌কিন

বিগত ১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড আরস্‌কিন মান্দ্রাজের রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস পর্য্যবেক্ষণ করেন। সেখানকার ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন যে, আজকাল সকলেরই শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। কেহ কেহ মনে করেন যে, শিক্ষিত হইয়াও আজ কাল চাকুরীর যোগাড় করা যখন এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন পড়াশুনার কোনই মূল্য নাই। কিন্তু ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতা চিরদিন স্থায়ী হইবে না। ইহার অবসান হইলে সর্ব্বত্রই শিক্ষিত লোকের আদর হইবে। আজকাল জগতে কোনও জাতি অশিক্ষিত থাকিতে পারে ইহা কল্পনা করাও সুকঠিন। সুখের বিষয় যে, ভারতবর্ষ ক্রমেই শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা যদি শিক্ষার মধ্য দিয়া ঠিক বুঝিতে পারি যে, পরার্থে কার্য্য করাই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য এবং নিজ নিজ স্বার্থানুকূল কার্য্যে প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায় না, তাহা হইলে এই জগতের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন আকার ধারণ করিবে এবং জগতে আনন্দের মাত্রা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে।

মহাত্মা গান্ধী

প্রায় একমাস কাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়া বিগত ১৪ই মাঘ (২৮এ জানুয়ারী) মহাত্মা গান্ধী দিল্লী পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তিনি প্রধানতঃ হরিজন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। দিল্লী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিন হরিজন-পল্লীতে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচিত বহুসংখ্যক সদস্যের এক সভায় মহাত্মা গান্ধী এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার মতে প্রবল জনমত গঠন না করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মন্দির-প্রবেশের অনুকূল কোনরূপ বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন করা সঙ্গত নহে; কারণ এই সকল বিষয়ে ভোটাধিক্য দ্বারা কোনরূপ কার্য্যকরী ফল লাভ হয় না। কিন্তু আইন দ্বারা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, কারণ অস্পৃশ্যতার সহিত নাগরিক অধিকার বিশেষভাবে জড়িত। হিন্দু সদস্যগণ মিলিতভাবে এই বিষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও ব্যবস্থাপরিষদের এইরূপ আইন প্রণয়ন করা উচিত। তিনি আশা করেন, পরিষদের হিন্দু সদস্যগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

মহাত্মাজী আরও বলেন যে, হরিজনদের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিতে পরিষদের সদস্যগণকে যথাসাধ্য চাপ দেওয়া উচিত এবং নানা স্থানে হরিজনদের উপর যে অত্যাচার উৎপীড়ন হইয়া থাকে, তাহার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন কি না তদ্বিষয়ে তাঁহাদের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

বিগত ৬ই মাঘ (২০এ জানুয়ারী) রবিবার ৺কাশীধামে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙ্গা নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি মোটেই গোঁড়া ছিলেন না। সমাজসংস্কার বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট উদারতা ছিল। সাত আট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কাশীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারাই আসিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

রায় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর

বিগত ২৬এ মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী) ২৪ পরগণার পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেমও উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর গ্রামের উন্নতিকল্পে তিনি যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। বীরনগর গ্রামকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করিয়া, গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পথ পরিষ্কৃত করিয়া গ্রামখানিকে তিনি আদর্শ পল্লীগ্রামে পরিণত করিতে সচেষ্ট ছিলেন এবং সে কার্য্যে সফলতা লাভও করিয়াছিলেন। আদালতে তিনি দুর্দ্ধর্ষ উকীল হইলেও, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িকতা লোকপ্রসিদ্ধ ছিল। বহু দুঃস্থ, দুঃখী পরিবার, বহু দরিদ্র ছাত্র রায় বাহাদুরের অর্থসাহায্যে দিনাতিপাত করিত, শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ লাভ করিত। রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবার নয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৩ বৎসর হইয়াছিল।

আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের নিদারুণ শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
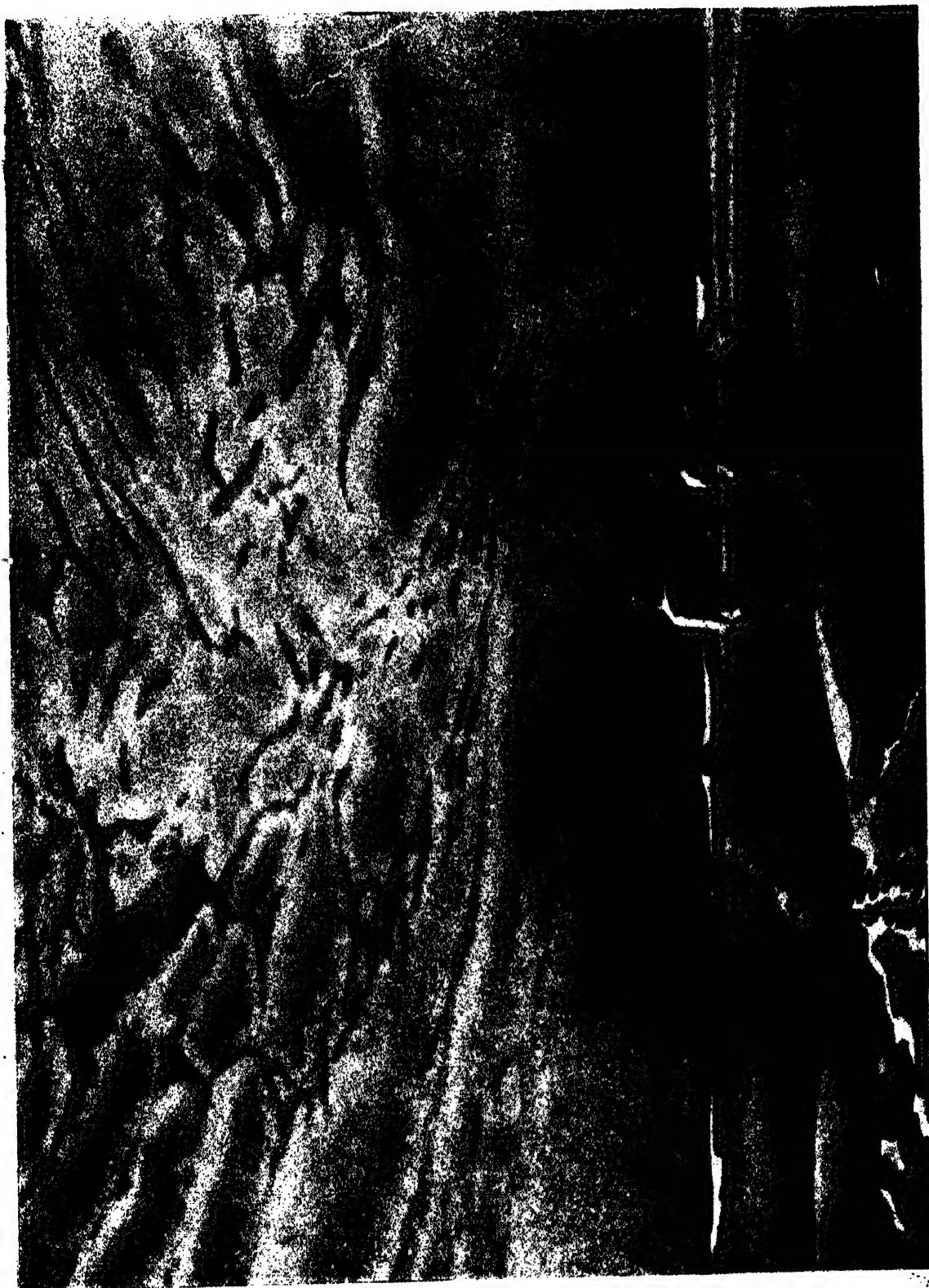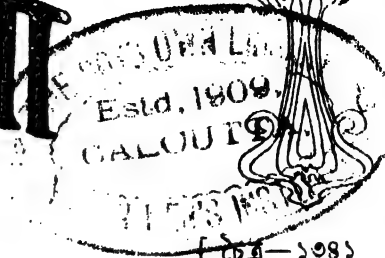
৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা]

বিষয়-সূচী

[চৈত্র—১৩৪১

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—জনৈক "অর্থনীতির ছাত্র"

[অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া মানুষ সম্বন্ধে বিবিধ কথা কেন লিখিতে হইতেছে তাহা আমরা আমাদের পাঠকদিগকে গতবারে জানাইয়াছি।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা কি তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। কিন্তু দেশের জাতীয় সমস্যা কিরূপে বিশ্লেষণ করিতে হয় তাহা না জানা থাকিলে কোন্ দেশের সমস্যা কি তাহা নিরূপিত হয় না। কাজেই "দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায়" সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে।

'জাতি', 'দেশ'—এই দুইটী শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ জানা না থাকিলে, "কোন দেশের কোন জাতি" সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, আলোচ্য বিষয় কি কি হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কাজেই 'জাতি' বলিতে কি বুঝায় এবং 'দেশ' বলিতে কি বুঝায় তাহার অনুসন্ধানও করিতে হইয়াছে।

ঐ অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, 'জাতি' বলিতে বুঝায় "এক এক দেশে তৎ তৎ দেশবাসী লোকগণের সমষ্টি" এবং 'দেশ' বলিতে বুঝায় "জমি, জীব ও জল হাওয়ার সমষ্টি"। (দুই-এর ভিতরই 'দেশবাসী লোকের' ও 'জীবের' কথা লেখা আছে)।

কাজেই 'জাতি' ও 'দেশ' এই দুইটী শব্দ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে এবং "কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণে" আলোচ্য বিষয় কি কি হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে "মানুষ বলিতে কি বুঝায়" তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

'মানুষ' প্রসঙ্গে আমরা এতাবৎ যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, মানুষ সর্ব্বদা কোন না কোন কাজ করে। মানুষ বলিতে কি বুঝায় তাহা নিরূপণ করিতে হইলে মানুষের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। কাহারও কার্য্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে মনে রাখিতে হয় যে, কার্য্যের অন্ততঃ পক্ষে একটা 'কর্ত্তা' এবং একটা 'বিষয়' অথবা একটা 'উদ্দেশ্য' থাকে। আরও মনে রাখিতে হয় যে, কর্ত্তার 'কার্য্যশক্তি', 'কার্য্যের প্রণালী', 'কার্য্যের উদ্দেশ্য'—এই তিনটী ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত।

মানুষের কার্য্যশক্তি, কার্য্যের প্রণালী এবং কার্য্যের উদ্দেশ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত—ইহার পরিষ্কার অর্থ এই যে :—

১। মানুষের কার্য্যশক্তির তারতম্যানুসারে তাহার কার্য্যের উদ্দেশ্যের এবং কার্য্যের প্রণালীর তারতম্য হয়।

২। মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্যের তারতম্যানুসারে তাহার কার্য্যের প্রণালীর এবং কার্য্যশক্তির তারতম্য হয়।

৩। মানুষের কার্য্যের প্রণালীর তারতম্যানুসারে তাহার কার্য্যশক্তির এবং কার্য্যের ফলাফলের (অর্থাৎ, কার্য্যের উদ্দেশ্যের পরিণতির) তারতম্য হয়।

সংক্ষেপতঃ বলিতে হয় যে, কার্য্যশক্তি, কার্য্যের প্রণালী এবং কার্য্যের ফলাফল—এই তিনটীর মধ্যে একটীর তারতম্যে অপর দুইটীর তারতম্য সংঘটিত হয়।* অতএব ইহার যে কোন একটীর সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জিত হইলে অপর দুইটীর জ্ঞানলাভ করা সহজসাধ্য হয় এবং 'মানুষ' বলিতে কি বুঝায় তাহা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

* যাঁহারা "অদৃষ্টবাদী" তাঁহারা অদৃষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, "অদৃষ্ট" শব্দের অর্থ "যাহা দেখা যায় না"। যে কার্য্যফলের কারণ সম্বন্ধে মানুষ অপরিজ্ঞাত সাধারণতঃ সেই কার্য্যফলকে অদৃষ্টজনিত বলা হয়। একজনের যাহা অপরিজ্ঞাত আর একজনের তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে। কাজেই "অদৃষ্ট" নামে কোন দ্রব্য নাই। ইহা জ্ঞানের তারতম্য-পরিচায়ক।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, স্ব স্ব কার্য্যশক্তি পরীক্ষা করিতে শিখিলে কার্য্যের উদ্দেশ্য এবং প্রণালী কি হওয়া উচিত এবং কার্য্যের ফলাফল কি হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। কিন্তু নিজ নিজ কার্য্যশক্তি পরীক্ষা করিতে না শিখিয়া এবং পরীক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র কার্য্যের উদ্দেশ্য (object) এবং প্রণালী (method) নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের ফল (অর্থাৎ, কার্য্যশক্তির তারতম্য এবং উদ্দেশ্যের পরিণতি) কি হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কোন্ প্রণালীতে কার্য্য করিলে কি ফল হইতে পারে তাহা না জানা থাকিলে সমস্ত রকমের কার্য্য নিস্ফল হইবার আশঙ্কা থাকে।

কাজেই, কি করিয়া নিজ নিজ কার্য্যশক্তি পরীক্ষা করিতে হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন এবং অভ্যাস করা মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয়—তাহা বলা যাইতে পারে।

নিজ নিজ কার্য্যশক্তি পরীক্ষা করিতে হইলে 'শক্তি' কাহাকে বলে এবং কি রূপে ইহা উপলব্ধি করিতে হয় তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়। 'শক্তি' বলিতে বুঝায় পরা-প্রকৃতির সহিত পরম-ব্রহ্মের মিলন এবং 'বুদ্ধিপ্রবণ' হইলেই তাহা উপলব্ধ হয়। বুদ্ধিপ্রবণ হইতে হইলে 'বুদ্ধি' কাহাকে বলে, বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যের' লক্ষণ কি এবং 'বুদ্ধিপ্রবণ' হইতে হইলে কি প্রণালীতে কার্য্য করিতে হয় তাহা জানা আবশ্যক।

'বুদ্ধি' একটী গুণবাচক শব্দ এবং তাহা পরিলক্ষিত হয় মানুষের কার্য্যে। মানুষ যখন তাহার কার্য্যের উদ্দেশ্য এবং পন্থা-নির্ব্বাচনের সময়ে—আমি অমুকটার জন্য কেন কার্য্য করিব? অথবা, আমি অমুক প্রণালীতে কার্য্য কেন করিব? ইত্যাদি 'কেন'-সম্বলিত বিশ্লেষণ আরম্ভ করে—তখন বুঝিতে হয় যে, মানুষ 'বুদ্ধিগুণ'-বিশিষ্ট হইয়াছে। যে কার্য্যে বুদ্ধিগুণ পরিলক্ষিত হয় এবং যাহার (অর্থাৎ যে কার্য্যের) ফলে মানুষের প্রকৃত হিতসাধন হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা করা যায় তাহার নাম 'বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য'। যে মানুষের জীবনে 'বুদ্ধি-প্রধান' কার্য্য বেশী তাহার নাম 'বুদ্ধিপ্রবণ' মানুষ। 'বুদ্ধি', বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য' এবং 'বুদ্ধিপ্রবণ' মানুষ সম্বন্ধীয় ঐ সমস্ত কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু মাত্র 'বুদ্ধিপ্রবণ' শব্দটীর অর্থ কি তাহা জানিতে পারিলেই 'বুদ্ধিপ্রবণ' হওয়া যায় না। 'বুদ্ধিপ্রবণ' হইতে হইলে কার্য্য যাহাতে 'বুদ্ধিপ্রধান' হয় তাহার চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টা খুব সহজসাধ্য নহে। মানুষ জন্মাবধি 'ইন্দ্রিয়প্রবণ'। শিক্ষাদ্বারা 'মনঃপ্রবণতা' পর্য্যন্ত অর্জ্জিত হইতে পারে। কোন একটী বস্তু দেখিবামাত্র নির্ব্বিচারে তাহাকে মনোরম বলিয়া ধরিয়া লওয়া সাধারণতঃ মানুষের স্বভাব। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা বড় জোর সার্টিফিকেট দেখেন, দশজনে ঐ বস্তু সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার ধৈর্য্যসম্পন্ন লোক অতি বিরল। কাজেই, বুদ্ধিপ্রবণ হইতে চেষ্টা করিলে বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের লক্ষণ ও তাহার পরিণাম কি তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। 'ইন্দ্রিয়-প্রধান' ও 'মনঃপ্রধান' কার্য্যের পরিণাম কিরূপ বিষময় এবং 'বুদ্ধিপ্রধান' ও 'আধ্যাত্মিক' কার্য্যের পরিণাম কিরূপ উন্নতিপ্রদ, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ থাকিলে 'বুদ্ধিপ্রবণ' হইবার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে।

অধিকন্তু, 'দেশ' বলিতে কি বুঝায় তাহা বিস্তৃত ভাবে জানিতে হইলে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষার বিষয় আলোচনা করিতে হয়। মানুষের কোন্ বস্তুটী প্রয়োজনীয় এবং কোন্টী তাহার আকাঙ্ক্ষণীয় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও বিভিন্ন কার্য্যের বিভিন্ন পরিণাম কি তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

কাজেই বিভিন্ন মানুষ যে বিভিন্ন প্রণালীতে কার্য্য করে, তাহাতে তাহার পরিণাম কি হয়—তৎসম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিতে পারা যায়।

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের সহিত সূত্র বজায় রাখিবার জন্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমাদের মূল বক্তব্যের অনুসরণ করিতেছি।]

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম

মানুষ সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে হইলে তাহার শক্তি, কার্য্যপন্থা এবং কার্য্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়।

মানুষের কার্য্যপন্থা চারি প্রকার; যথা—ইন্দ্রিয়প্রধান, মনঃপ্রধান, বুদ্ধিপ্রধান এবং আধ্যাত্মিক।

কার্য্যানুসারে মানুষ চারি শ্রেণীর; যথা—ইন্দ্রিয়প্রবণ, মনঃ-প্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ এবং আধ্যাত্মিক।

মানুষের শক্তিকেও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি, বুদ্ধিশক্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কথা বলিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষ মূলতঃ এক শ্রেণীর এবং যে সমস্ত গুণের তারতম্যের জন্য তাহাকে পশু, পক্ষী এবং উদ্ভিদ্ হইতে পৃথক্ করা হয় তাহা (সেই সমস্ত গুণ) সকল মানুষেরই অল্প-বিস্তর আছে। এই গুণগুলির নাম ; ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন (কর্ম্মচেষ্টা), সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান। এই গুণগুলির অভিব্যক্তি হয় তাহার কার্য্যের উদ্দেশ্যে।

মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুই রকম ; যথা— শিক্ষা-বিষয়ক ও জীবিকা-বিষয়ক।

কার্য্যের এই দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য পাঁচটী ক্ষেত্র অধিকার করে ; যথা—নিজ, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এবং সমগ্র মনুষ্য জাতীয়।

ক্ষেত্রভেদে মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দশ রকম হইতে পারে ; যথা—নিজ শিক্ষা-বিষয়ক, পারিবারিক শিক্ষা-বিষয়ক, সামাজিক শিক্ষা-বিষয়ক, জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক, মনুষ্য-সমাজের শিক্ষা-বিষয়ক ; নিজ জীবিকা-নির্ব্বাহ-বিষয়ক, পারিবারিক জীবিকা-নির্ব্বাহ-বিষয়ক, সামাজিক জীবিকা-নির্ব্বাহ-বিষয়ক, জাতীয় জীবিকা-নির্ব্বাহ-বিষয়ক এবং মনুষ্য-সমাজের জীবিকা-নির্ব্বাহ-বিষয়ক।

উক্ত পাঁচটী ক্ষেত্রের শিক্ষা দ্বিবিধ ; যথা - শক্তি এবং জীবিকা-নির্ব্বাহ-নিয়ামক।

প্রত্যেক রকম শিক্ষার ক্রম তিনটী ; যথা—বিজ্ঞান, ব্যবহার এবং প্রয়োগ।

শক্তি-নিয়ামক শিক্ষা চারি রকম ; যথা—ইন্দ্রিয়শক্তি-নিয়ামক, মনঃশক্তি-নিয়ামক, বুদ্ধিশক্তি-নিয়ামক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি-নিয়ামক।

জীবিকা-নির্ব্বাহ-নিয়ামক শিক্ষা চারি রকম ; যথা—কৃষি, পশুপালন, শিল্প এবং বাণিজ্য।

ক্ষেত্রভেদে শিক্ষা সর্ব্বসমেত একশত কুড়ি রকম।

শিক্ষা ও জীবিকানির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

মূলতঃ এক শ্রেণীর হইলেও শিক্ষাভেদে এবং কার্য্যের উদ্দেশ্যভেদে মানুষ বহু রকমের হয়, কিন্তু এই পার্থক্যের পরিমাণ খুব গুরু (অর্থাৎ, বেশী) নহে। এই পার্থক্যে মানুষের সামর্থ্যের তারতম্যও খুব বেশী হয় না।

কার্য্যানুসারে মানুষের যে চারিটী শ্রেণী হয় (যথা, ইন্দ্রিয়-প্রবণ, মনঃপ্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ এবং আধ্যাত্মিক) তাহার দ্বারা মানুষের সামর্থ্যেরও শ্রেণীবিভাগ করা যায়। ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া অনুমিত হইলেও মূলতঃ তাহাদের সামর্থ্যের পার্থক্য খুব কম এবং তাহারা এক শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। তাহার প্রমাণ, তাহাদের কার্য্য-ক্ষমতায় ও জীবনের দৈর্ঘ্যে। নিয়োগকর্ত্তার ভ্রান্তিতে চাকুরী-ক্ষেত্রে তাহাদের বেতনের তারতম্য সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু চাকুরী না পাইলে নিজ জ্ঞান, উদ্ভাবনী-শক্তি এবং প্রযত্ন দ্বারা উপার্জ্জনের সামর্থ্য প্রায় সমস্ত ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের এক রকম। ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের সহিত মনঃপ্রবণ মানুষের যত বৈষম্য, অথবা মনঃপ্রবণ মানুষের সহিত বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের যত বৈষম্য, ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের পরস্পর অথবা মনঃপ্রবণ মানুষের পরস্পর বৈষম্য তত অধিক নহে।

কাজেই, "বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম" প্রসঙ্গে আমরা কেবল একত্রে চারি শ্রেণীর মানুষের পরিণামের কথা আলোচনা করিব।

যে রকমই হউক, একটা কার্য্যশক্তি লইয়া মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে কোন না কোন কার্য্য করে এবং কার্য্যেরও কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। পর মুহূর্ত্তেই ঐ কার্য্যের ফলে সে যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, হয় তাহার (অর্থাৎ, উদ্দেশ্য) সফল হয়, অথবা বিফল হয় এবং তাহার কার্য্যশক্তির হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয়। পুনরায় পরিবর্ত্তিত কার্য্যশক্তি লইয়া নূতন উদ্দেশ্যে এবং নূতন প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করে। আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্য না হইলেও নিজ নিজ কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে সজাগ থাকিলে প্রতিনিয়ত তাহার কার্য্য-শক্তির, কার্য্য-প্রণালীর এবং কার্য্যোদ্দেশ্যের এই পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করা অসাধ্য নহে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কার্য্যকলাপে তাহার কার্য্যশক্তির ও কার্য্যপ্রণালীর কিরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় এবং যে উদ্দেশ্যে কার্য্য করা হয় তাহার লাভালাভ সম্বন্ধে কি ঘটে, ইহার আলোচনা হইবে—আমাদের "বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম" সম্বন্ধীয় প্রথম কথা। মানুষ যে যে উদ্দেশ্য লইয়া

কার্য্য করে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে যতই বিভিন্ন হউক না কেন, গভীর ভাবে বিচার করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল উদ্দেশ্যের মূলে কার্য্যক্ষমতা লাভ করার এবং জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। যৌবনের দৈর্ঘ্য কার্য্য-ক্ষমতার পরিচায়ক এবং পরমায়ুর দৈর্ঘ্য জীবনরক্ষার পরিচায়ক।

দুনিয়ায় এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা মাত্র আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ করিতে পারেন, কিন্তু মনঃপ্রবণ ও ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ উন্নতি লাভ করিয়া বুদ্ধিপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক না হইতে পারিলে, করিতে পারেন না। আবার এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা মাত্র মনঃপ্রবণ ও ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ করিতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধি-প্রবণ মানুষ অবনতি লাভ করিয়া মনঃপ্রবণ ও ইন্দ্রিয়প্রবণ না হইলে, করিতে পারেন না। আবার এমন কতকগুলি কার্য্য আছে যাহা চারি শ্রেণীর মানুষই করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন।

শিক্ষা এবং জীবিকা-নির্ব্বাহক কার্য্য চারি শ্রেণীর মানুষই করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। কিন্তু মানুষের জীবনী অথবা কার্য্যশক্তির মূল কোথায়, মানুষ কোথা হইতে তাহা সঞ্চয় করিতেছে এবং মানুষের মধ্যে কোথায় তাহাদের স্থান ও মানুষ কিরূপে নিজ কার্য্যে ইহাদিগকে নিয়োগ বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে—মনঃপ্রবণ ও ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ তাহার অনুসন্ধান করিতে সমর্থ নহেন। এই জাতীয় কার্য্য মাত্র বুদ্ধি-প্রবণ ও আধ্যাত্মিক মানুষই করিতে পারেন। আবার যশ এবং উপভোগের উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য বুদ্ধিপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক মানুষ করিতে পারেন না। তাহা কেবল ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ মানুষেরই অধিকারভুক্ত। ইহারই জন্য ইন্দ্রিয়প্রবণ ও মনঃপ্রবণ মানুষের কার্য্যক্ষমতার পরিমাণ ও জীবনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত কম এবং বুদ্ধিপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্য-ক্ষমতার পরিমাণ এবং জীবনের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী। প্রকৃত বুদ্ধিপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক মানুষ কখনও পরাধীন হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়প্রবণ ও মনঃপ্রবণ মানুষের উপর আধিপত্য করেন। প্রসঙ্গতঃ ইহাও মনে রাখিতে হইবে, জীবনে দুই চারিটী বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য করিলেই বুদ্ধিপ্রবণ হওয়া যায় না। জীবনের অধিকাংশ কার্য্য বুদ্ধিপ্রধান হইলে মানুষ বুদ্ধিপ্রবণ হয়।

আমাদের কথায় পাঠকগণ বিস্মিত হইতেছেন কি? লক্ষ্য করিয়া দেখুন, মানুষ দুই একটী বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য করিতে পারে বলিয়া সিংহ, ব্যাঘ্রাদিকে শৃঙ্খলিত করিতেছে। ইন্দ্রিয়শক্তির অপর নাম যে "পশুশক্তি", তাহা আমাদের প্রবন্ধ হইতে ক্রমশঃ পরিষ্কার বুঝা যাইবে। যদি পশুশক্তির উপর বুদ্ধিশক্তির প্রাধান্য না থাকিত, তাহা হইলে জগতে মানুষের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইয়া সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত। সিংহ এবং ব্যাঘ্র-শাসিত পশুরাজ্যের দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও লক্ষিত হয় যে, বুদ্ধিপ্রবণ না হইয়াও তাহারা অনায়াসে রাজত্ব করিতেছে। মানুষ নিজ কার্য্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে না শিখিলে মনঃপ্রবণ এবং ইন্দ্রিয়-প্রবণ থাকিয়া যায়। ফলে দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিপ্রবণ-মানুষ-হীন হইয়া পড়িতেও পারে। তখন ইন্দ্রিয় এবং মনঃপ্রবণ মানুষের রাজত্বও সম্ভব হইতে পারে। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা আমরা স্থানান্তরে করিব।

যে কার্য্যগুলি (অর্থাৎ, শিক্ষা ও জীবিকা-নির্ব্বাহের কার্য্য) চারি শ্রেণীর মানুষই করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন, মানুষভেদে তাহার প্রণালী বিভিন্ন হয়। ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের শিক্ষার প্রণালী মনঃপ্রবণ মানুষের শিক্ষার প্রণালী হইতে পৃথক্। আবার মনঃপ্রবণ মানুষের শিক্ষার প্রণালী বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের শিক্ষার প্রণালী হইতে বিভিন্ন, ইত্যাদি। একই কার্য্যে প্রণালীর পার্থক্যের জন্য কার্য্যফল পৃথক্ হয়। একই বিষয়ে বিভিন্ন প্রণালীর কার্য্যে ফল কিরূপ বিভিন্ন হয় এবং মানুষের শক্তির কিরূপ তারতম্য হয় তাহার আলোচনা হইবে—আমাদের "বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম" সম্বন্ধীয় অন্যতম কথা

ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের পরিণাম

[১] ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য

ইন্দ্রিয়ের স্বভাব কেবল কার্য্য করা। বিনা উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য হয় না তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। কোন্ বস্তুর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব এবং কোন্ বস্তুর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব না তাহা নির্দ্ধারণ করা মনের স্বভাব, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ইহা স্বভাব নহে। অথবা কেন এই বস্তুটীর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব এবং

কেন অপর কোন বস্তুর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব না তাহার বিচার করা বুদ্ধির স্বভাব, ইন্দ্রিয়ের স্বভাব নহে। কাজেই, যাহার মন এবং বুদ্ধি উৎকর্ষ লাভ করে নাই, তাহার কার্য্যে কোন একটী বস্তুবিশেষের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। যে কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের সংশ্লিষ্ট হয় তাহাকেই ইন্দ্রিয়-সুখকর অথবা দুঃখকর বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকে। তাহাতে কোন সংকল্প অথবা বিকল্প (অর্থাৎ, বাছাবাছি বা selection), অথবা বিচার (অর্থাৎ, বিশ্লেষণ বা analysis) থাকে না। যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের সুখকর বলিয়া মনে হয়, তাহার প্রতি তাহার অনুরাগ এবং যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের পক্ষে দুঃখকর (অথবা, অপ্রীতি-কর) বলিয়া মনে হয়, তাহার প্রতি তাহার বিদ্বেষ জন্মে। যে বস্তুর প্রতি ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ জন্মে তাহা লাভ করিবার ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয় তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিবার অথবা তাহার সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা হয়। প্রীতিকর বস্তু লাভ করিতে পারিলে এবং অপ্রীতিকর বস্তুর সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে পারিলে তৃপ্তি লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় এবং তাহার (অর্থাৎ, তৃপ্তির) জন্য ইন্দ্রিয় কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। তৃপ্তিলাভের কার্য্যে যদি কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহা অপসারিত করিবার ইচ্ছা জন্মে এবং যে বাধা উপস্থিত করে তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা জাগে।

কাজেই, ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যের উদ্দেশ্য হয় বস্তুর অবয়বের উপভোগ দ্বারা তৃপ্তিলাভ এবং প্রতিশোধ লওয়া (অর্থাৎ, জব্দ করা)। অথচ কোন্ বস্তু পাইলে তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব এবং বিঘ্নকারীর কতখানি অবস্থার বিপর্য্যয় হইলে প্রতিশোধ লওয়া হয় তাহা নির্দ্ধারিত থাকে না।

[২] ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের কার্য্য-প্রণালী

কোন্ প্রণালীতে কার্য্য করিব এবং কোন্ প্রণালীতে কার্য্য করিব না তাহা স্থির করা মনের স্বভাব কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্বভাব নহে। কেন এই প্রণালীতে কার্য্য করিব এবং কেন অপর প্রণালীতে করিব না তাহার বিচার করা বুদ্ধির স্বভাব এবং তাহাও ইন্দ্রিয়ের স্বভাব নহে। কাজেই, ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যে কোন একটী প্রণালীবিশেষের উপর লক্ষ্য থাকে না।

বুদ্ধিপ্রবণ অথবা মনঃপ্রবণ লোক দ্বারা পরিচালিত না হইলে ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যে কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী থাকে না। ইন্দ্রিয় যখন যেরূপে কার্য্য করিতে চায় সেইরূপে কার্য্য করিতে থাকে।

[৩] ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের শক্তি

আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ তাহার অবয়বে (চেহারায়), ইন্দ্রিয়শক্তিতে যথেষ্ট শক্তিমান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহার মনঃশক্তি অথবা বুদ্ধিশক্তি অথবা আধ্যাত্মিক শক্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ থাকে না। নিজ মনঃশক্তি প্রভৃতির অভাববশতঃ অন্য কাহারও মনঃশক্তি দ্বারা পরিচালিত না হইলে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি ভীষণাকার ধারণ করে এবং তাহা হিংস্র সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুর শক্তির তুল্য হয় এবং সর্ব্বদা অন্য শ্রেণীর মানুষের শক্তিদ্বারা পরাভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ জগতের সমস্ত বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে অজ্ঞ। সমস্ত বস্তুই তাহার কাছে অন্ধকারময়। সমস্ত বস্তু ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের কাছে অন্ধকারাবৃত বলিয়া ভারতীয় ঋষিগণের ভাষায় তাহারা **তামসিক**।

[৪] ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের কার্য্যের পরিণাম

(১) উদ্দেশ্য বিষয়ে পরিণাম :

কোন্ বস্তু পাইলে তৃপ্তিলাভ হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারিত না থাকিলে ক্ষণিকের জন্যও তৃপ্তিলাভ হয় না। তৃপ্তি পাইবার আশায় যে কোন বস্তুর সাক্ষাৎকার হয় তাহাই পাইবার ইচ্ছা জন্মে এবং হয়ত ঐ বস্তুটীও লাভ হয়। কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। আবার অপর একটা বস্তু পাইবার ইচ্ছা হয়। এইরূপে একটীর পর অপর একটী বস্তুর উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইয়া ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ কার্য্য করিতে থাকে। তাহার মধ্যে কোন কোন বস্তুলাভ করা সম্ভব হয় না, আবার কোন কোন বস্তুর লাভ ঘটিলেও কিছুতেই ক্ষণিকের জন্যও তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের প্রতিশোধ লইবার বাসনাও চরিতার্থ হয় না। বিঘ্নকারীর কতখানি বিপর্য্যয় হইলে প্রতিশোধ লওয়া হয় তাহা নির্দ্ধারিত না থাকায় তাহার প্রতি আক্রমণের পর আক্রমণ চলিতে থাকে; তাহাতে হয়ত বিঘ্নকারীর বিনাশ পর্য্যন্ত সাধিত হয়, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের প্রতিশোধের মাত্রা পূর্ণ হয় না।

(২) কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় পরিণাম :

ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের কার্য্য বিশৃঙ্খল ভাবে আরম্ভ হয়। এবং বুদ্ধিপ্রবণ অথবা মনঃপ্রবণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত না হইলে কখনও ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের কার্য্যের শৃঙ্খলা সাধিত হয় না। ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ সাধারণতঃ সহজেই অন্য শ্রেণীর মানুষের পরিচালনাধীন হয় এবং অন্য শ্রেণীর মানুষের উপদিষ্ট শৃঙ্খলানুসারে কার্য্য করে। অন্য শ্রেণীর মানুষ তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শৃঙ্খলাধীন করিতে পারেন।

(৩) জীবিকার্জ্জন, কার্য্যক্ষমতা রক্ষা এবং আয়ুষ্কাল সম্বন্ধীয় পরিণাম :

কেবল বস্তুর অবয়ব উপভোগে তৃপ্তির এবং হিংসাবৃত্তির চরিতার্থ করা কার্য্যের উদ্দেশ্য হইলে, জীবিকার্জ্জন যে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য তাহাও মানুষ ভুলিয়া যায়। তাহার ফলে জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা না করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। ফলে জীবিকার ব্যবস্থা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা আরম্ভ হয়।

ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের ক্ষুধার সময় খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কোন বিচার থাকে না। যাহা পায় তাহাই খায় এবং তাহাই তাহার খাইবার ইচ্ছা চরিতার্থ করে। খাদ্যের সঙ্গে যে কার্য্যক্ষমতার এবং জীবনরক্ষার নিকট সম্বন্ধ আছে, ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের সে জ্ঞানেরও অভাব। অন্য শ্রেণীর মানুষের সহায়তা না পাইলে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের জীবিকার্জ্জন প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ তাহার জীবন এবং কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে এবং তাহার জীবন ও কার্য্যক্ষমতা অন্য শ্রেণীর মানুষের তুলনায় খুবই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের সহায়তা পাইলে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের জীবন ও যৌবন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়, অন্যথা ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়প্রাধান্য সর্ব্বদা ভীরুতা আনয়ন করে।

[৫] ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের বিবিধ অবস্থা

(ক) স্বাধীন অবস্থা

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষকে বন্য পশুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, স্বাধীন অবস্থায় তাহারা অন্য শ্রেণীর মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক। কাজেই, কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের স্বাধীনতা থাকে না। সর্ব্বদা তাহাদিগকে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন দ্বারা শাসিত করিতে হয়।

(খ) পরাধীন অবস্থা

পরাধীন অবস্থায় ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ বিবিধ শ্রেণীর হইয়া পড়ে।

ইন্দ্রিয়প্রবণতার প্রাথমিক অবস্থায় (যথা, পাহাড়িয়ার অবস্থা) মনঃপ্রবণ মানুষের অধীন হইলে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের মনুষ্যত্বের কোন উন্নতি হয় না, কারণ মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে মনঃপ্রবণ মানুষ নিজেই সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহেন। এই সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে। মনঃপ্রবণ মানুষ আংশিকভাবে নিজ শারীরিক ও ইন্দ্রিয়শক্তির উন্নতি বিধান করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের অধীনস্থ ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের শারীরিক ও ইন্দ্রিয়শক্তির উন্নতি বিধান হয়। সমাজের শৃঙ্খলা বিধানে মনঃপ্রবণ মানুষের অস্ত্র শারীরিক শক্তি। শারীরিক শক্তিকে ভিত্তি করিয়া আইন ও শৃঙ্খলা রচনা দ্বারা মনঃপ্রবণ মানুষ তাঁহাদের সমাজ পরিচালন করেন। কাজেই তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। মনঃপ্রবণ মানুষের অধীনস্থ ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ ভীরু হইয়া পড়ে এবং প্রায়শঃ ইন্দ্রিয়প্রবণই থাকিয়া যায়। তাঁহাদের অধীনতায় খুব কম সংখ্যক লোক নিম্ন শ্রেণীর মনঃপ্রবণতায় উন্নীত হয়।

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ খুব উন্নত শিক্ষাবিধি প্রণয়ন করিয়া এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের অধীনস্থ সকল শ্রেণীর মানুষের মনুষ্যত্বের উন্নতি বিধান করেন। তাঁহাদের সমাজগঠনে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষদিগকে শারীরিক শক্তিতে ভীতিপ্রদর্শন করিবার বহুল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় না, কারণ তাঁহাদের ব্যবস্থায় ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ যাহাতে মনঃপ্রবণ এবং বুদ্ধিপ্রবণ হইতে পারে তাহার যথেষ্ট আয়োজন থাকে। তাঁহাদের (অর্থাৎ, বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের) পরিচালিত সমাজের অধিকাংশ লোক বুদ্ধিপ্রবণ হইয়া থাকেন। যাঁহারা খুব অবনত থাকেন, তাঁহাদিগকেও উন্নত মনঃপ্রবণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে। প্রায় কেহই ইন্দ্রিয়প্রবণ থাকে না। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের পরিচালিত দেশের জমি ও জল হাওয়ার যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়। ফলে, দেশ সর্ব্বতোভাবে সুখের

আগার এবং মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য স্বতঃই অনায়াসলব্ধ হইয়া পড়ে। তখন দেশের প্রত্যেকেই নিজ নিজ শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ হন, এবং সর্ব্বোপরি, সকলকে পরিচালনায় সমর্থ বুদ্ধির ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সতর্কতা অবলম্বন না করিলে এই অবস্থায় সমগ্র দেশ-পরিচালনার উপযোগী সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের প্রয়োজন না থাকায় তাঁহাদের সংখ্যার হ্রাস হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ লোপ পায়। সমগ্র দেশ-পরিচালনার উপযোগী সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের লোপ হইলেও তাঁহাদের রচিত দেশ বহুদিন সুখের আগার থাকে এবং সকলের পক্ষে লোভনীয় হয়। কিন্তু মানুষগুলির ক্রমিক পতন আরম্ভ হয়। তখন অন্য দেশের অনুন্নত ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ লোকের ইন্দ্রিয় ও শারীরিক শক্তির সহিত প্রতিযোগিতার সামর্থ্য কমিয়া যায়। এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে বিজিত হইয়া অনুন্নত ইন্দ্রিয়প্রবণ ও মনঃপ্রবণ বিজেতার সংশ্রবে দেশের সমগ্র লোকের আবার ইন্দ্রিয়প্রবণ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এমন কি দেশের জমিগুলির উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া গিয়া অন্নাভাব উপস্থিত হইতে পারে এবং জল হাওয়া রোগের জীবাণুতে পরিপূর্ণ হইয়া দেশের সমস্ত লোককে এবং উদ্ভিদ্‌কে ব্যাধিগ্রস্ত করিতে পারে।

(গ) কার্য্যের অবস্থা

ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের অধিকাংশ কার্য্যই ইন্দ্রিয়প্রধান। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জীবনে একটীও মনঃপ্রধান অথবা বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য থাকিবে না, তাহা নহে। ইন্দ্রিয়প্রধান মানুষের কার্য্যেও কখন কখন মনের ও বুদ্ধির প্রাধান্য থাকিতে পারে। যে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য যত বেশী তাহাকে তত উন্নত ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ বলা যায়। ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ মাত্রেরই ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যের সংখ্যা বেশী হয় এবং বুদ্ধি ও মনঃপ্রবণ কার্য্যের সংখ্যার তারতম্যানুসারে তাহাদের তারতম্য হয়।

[৬] ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের এবং ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যের উদাহরণ

মানুষের বাল্যকালের প্রায় সমস্ত কার্য্যই ইন্দ্রিয়প্রধান। কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্দ্ধক্যাবস্থায়ও ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্য অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের দ্বারা সংগঠিত সমাজে কেহই সারাজীবন ইন্দ্রিয়প্রবণ থাকে না। সাধারণতঃ সমাজের নিম্নস্তরের লোকের ইন্দ্রিয়প্রবণ হইবার আশঙ্কা বেশী। তাহারা স্বাধীনতা পাইলে, সিংহ ও ব্যাঘ্রের মত মানুষের জীবন হত্যা করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে না। কাজেই তাহাদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়। কিন্তু কোন দেশে যখন বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের বিকাশ হইতে থাকে তখন তাঁহারা সমাজের তথাকথিত নিম্ন স্তরের লোককেও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের সমাজগঠনের ফলে তথাকথিত নিম্নস্তরের লোকগুলিও নিরুপদ্রবে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষে আজকাল শিল্পক্ষেত্রে শ্রমজীবীদিগের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহাদিগের ইন্দ্রিয়প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতের অগণিত কৃষক নিরক্ষর হইয়া এখনও নিরুপদ্রবে ও স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের পাহাড়িয়া জাতিগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে ইন্দ্রিয়প্রবণতার উদাহরণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মোটের উপর ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ এখনও বিরল। এখানে এমন একদিন ছিল, যখন মানুষ তাহার জীবনে মাত্র একটী ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্য করিলে অশিক্ষিত এবং নিম্নস্তরের লোক বলিয়া পরিগণিত হইত। এখনও ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষ প্রায়ই দেখা যায় না বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্য সমস্ত স্তরের লোকের মধ্যেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্য করিয়াও সমাজে এবং রাষ্ট্রে নেতৃত্ব পাইতে বাধা না জন্মিলে দেশে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র এরূপ নহে। ইউরোপীয় ইতিহাসে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেও ব্যর্থ প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়ীদ্বয়ের যে প্রতিযোগিতার কথা (Knighthood) শোনা যায়, তাহা ইন্দ্রিয়প্রাধান্যের পরিচয়। এখনও ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে নিম্নস্তরের মধ্যে বহু ইন্দ্রিয়প্রবণ লোক বর্ত্তমান তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

যে সমস্ত কার্য্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং মাৎসর্য্যের লক্ষণ প্রকাশ্য ভাবে পরিস্ফুট, তাহা ইন্দ্রিয়প্রধান।

শিক্ষার কার্য্য, শিক্ষকতার কার্য্য, পরোপকারের কার্য্য এবং দেশ-হিতৈষণার কার্য্যও ইন্দ্রিয়প্রধান হইতে পারে; আমরা তাহার আলোচনা যথাস্থানে করিব।

মনঃপ্রবণ মানুষের পরিণাম

[১] মনঃপ্রবণ মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য

মনের স্বভাব কোন্ বস্তুর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব এবং কোন্ বস্তুর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব না—তাহা স্থির করা। সংকল্প স্থির হইলে ঈপ্সিত কার্য্য করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সূচিত হয়।

কেন এই বস্তুটীর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব এবং কেন অপর কোন বস্তুর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব না—তাহার বিচার করা বুদ্ধির স্বভাব। মন কেবল স্থির করে কোন্‌টা করিব, কিন্তু কেন তাহা করিব তাহার বিচার করা মনের ধর্ম্ম নহে। অথচ কোন্ উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে স্বতঃই উদ্দেশ্যের নির্ব্বাচন আরম্ভ হয়। কোন বস্তুর নির্ব্বাচন আরম্ভ হইলে যত কিছু বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে থাকে, তাহার কতক পরিত্যক্ত হয়, কতক গৃহীত হয়। নির্ব্বাচনের (অর্থাৎ, বর্জ্জনের ও গ্রহণের) কার্য্য সাধারণতঃ দুই রকমে সম্পন্ন হয়; যথা,—

(১) সংস্কারানুসারে;

(২) প্রয়োগলব্ধ ফলানুসারে।

মানুষ বাল্যাবধি তাহার পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নানা রকম গ্রন্থকর্ত্তা ও বক্তাগণের সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ সংসর্গ হইতে নিজ নিজ হিতাহিত সম্বন্ধে কতকগুলি সংস্কার প্রতিনিয়ত লাভ করে। সংসর্গজ এই সংস্কারগুলি সর্ব্বদা তাহার মনে জাগরূক থাকে। কি উদ্দেশ্যে কার্য্য করিলে তাহার হিতসাধন হইতে পারে এই প্রশ্নের উদয় হইবা মাত্র, প্রথমেই সংসর্গজ সংস্কারগুলির কথা মনে পড়ে এবং তদনুসারে নিজ হিতসাধন করিবার কার্য্যের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তাহা নির্ব্বাচিত করিয়া লয়।

আবার কখন কখন সংস্কারগুলি মনে উদয় হইবা মাত্র এরূপ প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, অমুক বস্তুটীর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিলে আমার যে হিতসাধন হইতে পারে তাহা মনে করি কেন? এই 'কেন' প্রশ্নের সমাধান দুই রকমে হয়; যথা—

(১) অমুক লোকটী খুব বড়। (অথচ তাহাকে যে কেন বড় বলা হইবে, কি কি কার্য্যশক্তিসম্পন্ন হইলে একজন মানুষকে বড় বলা যাইতে পারে তাহার বিচার কেহ করে না)। তিনি যখন অমুক বস্তুটীর উদ্দেশ্যে কার্য্য করেন অথবা অপরকে কার্য্য করিতে বলেন, তখন ঐ বস্তুটীকে নিশ্চয়ই হিতসাধক মনে করিতে হইবে।

(২) অমুক বস্তুটীর উদ্দেশ্যে কার্য্য করিয়া অমুক অমুক যখন উন্নত হইয়াছে দেখা যাইতেছে, তখন দেখা যাক ঐ কার্য্য করিয়া কি ফল হয়।

কোন্ উদ্দেশ্যে কার্য্য করিব তাহার নির্ব্বাচন করিতে বসিয়া কেন উদ্দেশ্যবিশেষকে গ্রহণ করিব এই প্রশ্নের উদয় হইলেও যদ্যপি প্রয়োগলব্ধ ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সংসর্গ বা সংস্কারানুসারে উদ্দেশ্যবিশেষকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মনের কার্য্য চলিতেছে।

বাছাবাছি করিয়া মন কতকগুলি বস্তুর সঙ্গলাভোদ্দেশ্যে (অর্থাৎ, বস্তু লাভ করিবার উদ্দেশ্যে) কার্য্যারম্ভ করে।* বুদ্ধি কোন বস্তুর সঙ্গলাভাকাঙ্ক্ষা করে না। তাহার কার্য্যের উদ্দেশ্য হয় বস্তুর পরীক্ষা এবং সেই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হয় বস্তুটী হিতকর কিনা তাহার নির্দ্ধারণ অথবা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।

মনোদ্রব্যের গুণ "অহঙ্কার"। কাজেই, মন যাহা কিছু চায় তাহা নিজের অথবা যাহাদিগকে সংস্কারানুসারে নিজ বলিয়া প্রতীতি জন্মে তাহাদের জন্য। কোন বস্তু হিতকর কিনা তাহা স্বকীয় ব্যবহার দ্বারা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা না করিয়া অপর কাহারও কথানুসারে হিতকর বলিয়া ধরিয়া লইলে, সেই বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না। জ্ঞানলাভোদ্দেশ্যে কোন বস্তুর ব্যবহার না করিয়াও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কল্পিত গুণাগুণের ধারণার বশবর্ত্তী হইলে সেই বস্তুর প্রতি আকর্ষণ অথবা বিদ্বেষ আসিয়া যায়। মন যাহা দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাহার প্রতি ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ জন্মে এবং তাহা লাভ করিবার ইচ্ছা হয়। আবার যাহার প্রতি মনের বিদ্বেষ উপস্থিত হয় তাহার প্রতি ইন্দ্রিয়েরও বিদ্বেষ উপস্থিত হয় এবং তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিবার,

* এইখানে মনে রাখিতে হইবে, "বস্তুর সঙ্গলাভ" এবং "বস্তুর জ্ঞানলাভ" দুইটী বিভিন্ন কথা। বস্তুর সঙ্গলাভে তাহার উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার উপাদানকে বিশ্লেষণ করিবার এবং প্রত্যেক উপাদানের কার্য্যশক্তি কি রকমের ও কতটুকু তাহা লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয়।

অথবা তাহার সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা হয়। তখন মনঃপ্রধান কার্য্যে ও ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না প্রীতিকর বস্তু লাভ করিতে পারিলে এবং অপ্রীতিকর বস্তুর সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে পারিলে তৃপ্তিলাভ হইবে বলিয়া মনে হয় এবং তাহার জন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তৃপ্তিলাভের কার্য্যে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহা অপসারিত করিবার ইচ্ছা হয় এবং যে বাধা উপস্থিত করে তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হয়।

কাজেই, মনঃপ্রধান কার্য্যের উদ্দেশ্য স্বকীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কতকগুলি বস্তুর নির্ব্বাচন, অর্জ্জন, অবয়ব উপভোগে তৃপ্তিলাভ করা, অথবা প্রতিশোধ লওয়া। অথচ কার্য্যের ফলে যাহা লাভ হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে হিতকর (অর্থাৎ, শক্তিবর্দ্ধক) কি না, তৎসম্বন্ধে কোন বিচার করা হয় না।

[২] মনঃপ্রবণ মানুষের কার্য্য-প্রণালী

কোন্ প্রণালীতে কার্য্য করিব এবং কোন্ প্রণালীতে কার্য্য করিব না তাহা স্থির করা মনের স্বভাব। কিন্তু কেন ঐ প্রণালীতে কার্য্য করিব এবং কেন অপর প্রণালীতে করিব না তাহার বিচার করা বুদ্ধির স্বভাব।

সাধারণতঃ সংসর্গজাত সংস্কার দ্বারা মনঃপ্রবণ মানুষ সমস্ত কার্য্যের প্রণালী স্থির করেন বটে, কিন্তু ঐ কার্য্য-প্রণালী ঈপ্সিত ফলসাধক কি না তাহার বিচার করেন না। এই বিচারহীনতার ফলে, ঐ কার্য্য-প্রণালী দ্বারা উদ্দেশ্য-সাধন অনিশ্চিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের উপর যথোপযুক্ত আস্থা থাকে না এবং উহা যথাযথভাবে আয়ত্ত করা হয় না। ফলে মনঃপ্রবণ লোকের কার্য্য-প্রণালীতে আংশিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হইলেও পূর্ণ শৃঙ্খলা কখন বজায় থাকে না এবং সর্ব্বদা অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার উদ্ভব হয়।

[৩] মনঃপ্রবণ মানুষের শক্তি

কার্য্যবিধি নির্ব্বাচন, বস্তু অর্জ্জন, উপভোগ, তৃপ্তিলাভ, প্রতিশোধ লওয়া,—এবম্বিধ বহুরকমের উদ্দেশ্য মনঃপ্রবণ লোকের কার্য্যে নিহিত থাকায় মনঃপ্রবণ লোক আপাত-দৃষ্টিতে বহুশ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত। কেহ বা কোন্ কার্য্য কি প্রণালীতে হওয়া উচিত তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে নানা-রূপ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন এবং পণ্ডিত, ব্যবস্থাপক প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হন। কেহ বা সর্ব্বদা অর্জ্জন করিতে ব্যস্ত থাকিয়া কর্ম্মবীর আখ্যা প্রাপ্ত হন। কেহ বা উপভোগের চাঞ্চল্যবশতঃ 'বিলাসী' বলিয়া আখ্যাত হন। আবার কেহ বা প্রতিনিয়ত 'স্নিগ্ধ তৃপ্তির' বর্ণনা করিয়া 'সন্ন্যাসী', 'ধার্ম্মিক,' 'সাধু,' 'কবি' প্রভৃতি উপাধি বিভূষিত হন। কাহারও কাহারও কার্য্যে সর্ব্বদা প্রতিশোধ লওয়ার প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকায় 'হিংসুক', 'নৃশংস' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হন। আপাতদৃষ্টিতে মনঃপ্রবণ লোক বহুশ্রেণীর, বহু-রকম সম্মান ও অসম্মানের পাত্র হইলেও তাঁহাদের কেহই মানুষের আভ্যন্তরীণ যে সমস্ত সূক্ষ্ম বস্তু চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়া এবং বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহার (অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ সেই সমস্ত সূক্ষ্ম বস্তুর) জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারেন না। মনঃপ্রবণ লোকের জ্ঞান, বস্তুর তরল এবং কঠিন অবস্থায় সীমাবদ্ধ। কোন বস্তুর বায়বীয় অবস্থার সম্যক জ্ঞান বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ ব্যতীত অপর কেহ অর্জ্জন করিতে পারেন না। কাজেই মনঃপ্রবণ মানুষ 'শক্তি' কাহাকে বলে তাহা সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহেন এবং তাঁহাদের শক্তিও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহারা বিবিধ শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাঁহাদের যৌবনের এবং জীবনের দৈর্ঘ্যের তারতম্য খুব কম। সাধারণ লোক যাঁহাদিগকে মাতাল, লম্পট, চরিত্রহীন বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহাদের যৌবনের (অর্থাৎ, কর্ম্মক্ষমতার) স্থায়িত্ব এবং জীব-নের (অর্থাৎ, পরমায়ুর) পরিমাণ—আর যাঁহারা সন্ন্যাসী, সাধু, পণ্ডিত, যোদ্ধা, কর্ম্মবীর, চরিত্রবান বলিয়া সম্মানিত হন, তাঁহা-দের যৌবনের স্থায়িত্ব এবং জীবনের পরিমাণ প্রায় তুল্য। হয়ত ২০।২৫ বৎসরের পার্থক্য পাত্রবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এই পার্থক্য কার্য্যতঃ একান্ত নগণ্য। কাজেই সমস্ত মনঃপ্রবণ মানুষকে একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে এবং তাঁহাদিগের শক্তি খুব সীমাবদ্ধ, অধিকাংশ স্থলেই প্রায় তুল্য। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, লম্পট এবং পণ্ডিতের শক্তি একরূপ হইলেও এবং মানুষ হিসাবে উভয়ের ভিতর বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও 'গুণ' হিসাবে লাম্পট্য আমাদের সর্ব্বদা ঘৃণার্হ এবং পাণ্ডিত্য আমাদের

পূজ্য। কারণ লাম্পট্য মানুষের কার্য্যে ইন্দ্রিয়প্রাধান্য আনয়ন করে এবং প্রকৃত পাণ্ডিত্য বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যে পটুতা প্রদান করে। প্রকৃত পণ্ডিত না হইয়াও যাঁহারা পাণ্ডিত্যের ভান করেন, তাঁহারা মানুষ হিসাবে অনুকরণযোগ্য না হইলেও, পাণ্ডিত্য গুণ সর্ব্বথা বরণীয়।

মনঃপ্রবণ মানুষ জগতের সমস্ত বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত। সমস্ত বস্তুই তাঁহার কাছে উপরঞ্জিত। সেই জন্যই ভারতীয় ঋষিগণের ভাষায় তাঁহারা **রাজসিক**।

মনঃপ্রবণ মানুষ স্বাধীন হইতে পারেন বটে এবং নিম্ন শ্রেণীর মনঃপ্রবণ মানুষের উপর এবং সকল শ্রেণীর ইন্দ্রিয়-প্রবণ মানুষের উপর প্রভুত্বও করিতে পারেন বটে, কিন্তু সহজেই বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের নিকট পরাজিত হন।

[৪] মনঃপ্রবণ মানুষের কার্য্যের পরিণাম

(১) উদ্দেশ্য বিষয়ে পরিণাম :

[ক] আকাঙ্ক্ষাপূরণের বস্তুর নির্ব্বাচন :—কোন্ বস্তুর ব্যবহারে মানুষের শক্তির প্রকৃত উন্নতি হয় তাহা প্রয়োগ দ্বারা নির্দ্ধারিত না করিয়া মাত্র সংসর্গজাত সংস্কার দ্বারা স্থির করিলে তাহা (অর্থাৎ, ঐ বস্তু) মানুষের হিতকর না হইবার সম্ভাবনা থাকে। দুইটী মানুষ যখন সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে, তখন যে বস্তুটী একজনের হিতকর তাহা অপর সকলের হিতকর নাও হইতে পারে। কাজেই একটী বস্তুকে একজন স্বকীয় হিতসাধনার্থ আকাঙ্ক্ষণীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বলিয়া উহা সকলেরই হিতসাধক, এই যুক্তি অনুসারে বস্তুর নির্ব্বাচন ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে

[খ] বস্তুর অর্জ্জন :—সংসর্গজাত, সংস্কারলব্ধ কার্য্য-প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে বস্তু অর্জ্জন করাও অনিশ্চিত হয়। যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়া হয়ত শক্তিবিশেষসম্পন্ন লোক বস্তুবিশেষের অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ঠিক সেই প্রণালী অপর কোন লোকের উপযোগী নাও হইতে পারে, কারণ দুই জন লোক সর্ব্বতোভাবে তুল্য শক্তি সম্পন্ন হন না।

[গ] তৃপ্তিলাভ :—তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্যে কোন বস্তুর অর্জ্জন করিতে চেষ্টার ফলে বস্তুটী অর্জ্জিত হইলে কর্ম্ম-সাফল্যের জন্য সাময়িক তৃপ্তিলাভ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু সেই তৃপ্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আবয়বিক সঙ্গ উপভোগের কার্য্যে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়ের ক্লান্তি অনিবার্য্য। কাজেই উপভোগ-কার্য্য দ্বারা তৃপ্তিলাভ দুরাশা মাত্র।

[ঘ] প্রতিশোধ লওয়া :—মনঃপ্রবণ মানুষের প্রতিশোধ লওয়ার বাসনা চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু প্রতিশোধ লওয়ার কার্য্যটী ইন্দ্রিয়প্রধান। তাহাতে মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনঃশক্তির হ্রাস হয়।

(২) কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধীয় পরিণাম :

প্রয়োগ এবং ফলাফলের বিচার দ্বারা কার্য্য-প্রণালী স্থির না করিয়া সংসর্গজাত সংস্কার দ্বারা তাহা (কার্য্য-প্রণালী) নির্ব্বাচন করিলে উদ্দেশ্য-সাধন অনিশ্চিত হয়। উদ্দেশ্য-সাধন অনিশ্চিত হইলে সর্ব্বদা অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার উদ্ভব হয় এবং কার্য্য-প্রণালী ক্রমশঃ অধিকতর বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে।

(৩) জীবিকার্জ্জন, কার্য্য-ক্ষমতা রক্ষা এবং আয়ুষ্কাল সম্বন্ধীয় পরিণাম :

বস্তুর অবয়ব উপভোগে তৃপ্তির এবং হিংসা-চরিতার্থতা কার্য্যের উদ্দেশ্য হইলে জীবিকার্জ্জন যে একান্ত প্রয়োজনীয় ও সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, মানুষ তাহাও ভুলিয়া যায়। তাহার ফল কি হয় তাহা আমরা ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের জীবিকার্জ্জনাদি-বিষয়ক পরিণাম সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণে আলোচনা করিয়াছি। জীবিকার্জ্জন, যৌবনরক্ষা, এবং আয়ুষ্কালের দৈর্ঘ্যের অবস্থা বিষয়ে ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ মানুষের পরিণাম সমান ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের জীবিকার্জ্জন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়, যৌবন (অর্থাৎ, কার্য্য-ক্ষমতা) বেশী দিন থাকে না এবং পরমায়ু সাধারণতঃ অল্প হয়। মনঃপ্রবণ মানুষের জীবিকার্জ্জন-ক্ষমতা, যৌবন এবং জীবনের দৈর্ঘ্য ঠিক ঐরূপ। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের সহায়তা পাইলে ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃ-প্রবণ মানুষ উপরোক্ত ত্রিবিধ বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে পারেন। কেবল শারীরিক শক্তি বিষয়ে মনঃপ্রবণ মানুষ, ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের তুলনায় উন্নতিলাভ করেন। ইন্দ্রিয়-প্রবণ মানুষের কার্য্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা না থাকায় তাহার শারীরিক শক্তির ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে থাকে, কিন্তু মনঃপ্রবণ মানুষের কার্য্যে আংশিক শৃঙ্খলা থাকায় শারীরিক শক্তির অবনতি ঘটে না। পরন্তু, মনঃপ্রবণ মানুষ কার্য্যের উদ্দেশ্য

নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, অথচ বুদ্ধির কার্য্য কি তৎসম্বন্ধে ধারণাহীন। কাজেই, শারীরিক শক্তির উন্নতি বিধান করা তাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়গুলির অন্যতম। ইহার ফলে মনঃপ্রবণ মানুষের শারীরিক শক্তি ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে।

[৫] মনঃপ্রবণ মানুষের বিবিধ অবস্থা

(ক) স্বাধীন অবস্থা

মনঃপ্রবণ মানুষ কতকগুলি নির্ব্বাচিত বস্তুর অর্জ্জনোদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাদের কার্য্যে আংশিক শৃঙ্খলা থাকে। তাঁহারা যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য কার্য্য করেন, তাহা হইলে আংশিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু কেন কোন্ কার্য্য করিতেছেন তাহা সম্যক্ভাবে না জানা থাকায় জীবিকার্জ্জন বিষয়ে তাঁহাদের পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ তাঁহাদের ঘটে না। মনঃপ্রবণ মানুষের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষার প্রধান অস্ত্র, শারীরিক শক্তি। জীবিকার্জ্জনের জন্যও তাঁহারা শারীরিক শক্তিকেই ভিত্তি করিয়া নানা রকম সংগঠনের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে সময় সময় প্রত্যক্ষভাবে শারীরিক শক্তির ব্যবহার দ্বারা আবার কখন কখন কৌশলপ্রয়োগে জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকেন। মনঃপ্রবণ মানুষ সর্ব্বদা বুদ্ধিপ্রবণ লোক দ্বারা পরাভূত হন এবং তাঁহাদের অধীনস্থ থাকেন। কিন্তু বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের অভাবে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অবনত মনঃপ্রবণ এবং ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন।

(খ) প্রভুত্বাবস্থা

মনঃপ্রবণ লোকের প্রভুত্ব-সংরক্ষণের প্রধান অস্ত্র শারীরিক শক্তি। বহু প্রকারে তাহার প্রয়োগ হয়।

কোন কার্য্য কেন করিতে হয় তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকায় অথচ বস্তুর নির্ব্বাচনের প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকায় মনঃপ্রবণ লোকের প্রভুত্ব-সংরক্ষণের সংগঠনগুলিতে সর্ব্বদা নানা রকম নির্ব্বাচনের নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

শিক্ষা এবং জীবিকার্জ্জনোপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব বশতঃ মনঃপ্রবণ মানুষের অধীন ব্যক্তিদিগের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না এবং স্ব স্ব সামর্থ্যের উন্নতি করিয়া কিরূপে জীবিকার্জ্জন করিতে হয় তাহারও উপায় নির্দ্ধারিত হয় না।

তাহার ফলে তাঁহাদের অধীন ব্যক্তিদিগকে জীবিকার্জ্জনে নানারকম প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে হয়। ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্যবিধি অধিকতর কঠিন করিবার প্রয়োজন হয়। এমন কি ক্রমে ক্রমে জীবিকার্জ্জনও অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে।

অবয়ব উপভোগ দ্বারা তৃপ্তিলাভেচ্ছাবশতঃ মনঃপ্রবণ লোকের প্রভুত্বাবস্থায় নানারূপ উপভোগের জিনিষের সৃষ্টি হয় এবং প্রজাবৃন্দ তাহার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে হিতকর কিনা তাহার বিচার করে না।

মানুষ যাহা কিছু করে তাহা তাহার কার্য্যক্ষমতা লাভ ও জীবনরক্ষার জন্য। অথচ কিরূপে তাহা সম্ভব, তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া উপভোগের জিনিষের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিলে অতর্কিতভাবে কার্য্য-প্রণালীতে নানারকম কার্য্য-ক্ষমতাহানিকর এবং জীবন-নাশকর ব্যবস্থা সংঘটিত হয়। ইহার ফলে মনঃপ্রবণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত স্থান ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর ও অধীনস্থ লোকেরা অকর্ম্মণ্য এবং তত্রত্য সমস্ত লোক অল্পায়ু হইয়া পড়ে। যে ভূখণ্ড অস্বাস্থ্যকর, তাহার জমিগুলির উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাও রুগ্ন হয় এবং মানুষের ব্যাধির সৃষ্টি করে। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ, স্বাস্থ্য এবং অস্বাস্থ্য আছে। অসুস্থ উদ্ভিদ্ অথবা তদুপজীবী পশুর মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহার করিলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

জনগণের জীবিকার্জ্জনে অসুবিধা ঘটিলে, তাহাদের কার্য্যক্ষমতা কমিয়া গেলে, তাহারা অল্পায়ু হইলে, এবং জমিগুলির উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস পাইলে নানা রকমের অসন্তোষের সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে এবং মনঃপ্রবণ লোকের কর্ত্তৃত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়। এইরূপে মনঃপ্রবণ লোকের কীর্ত্তি বা কার্য্যকলাপ কখন দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

জ্ঞান ও প্রযত্নের দ্বারা মনঃপ্রবণ মানুষ বুদ্ধিপ্রবণতা লাভ করিতে পারেন। মনঃপ্রবণ মানুষের দেশে বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের উদ্ভব হইলে এবং পরিচালন-ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইলে সুখসমৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে। এ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা আমরা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব।

(গ) পরাধীন অবস্থা

মনঃপ্রবণ মানুষ, বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের অথবা অপেক্ষাকৃত উন্নত মনঃপ্রবণ মানুষের পরিচালনাধীন হইতে পারেন।

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের পরিচালনাধীন মনঃপ্রবণ মানুষ যথা-বিহিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য করিবার শক্তি লাভ করেন। এমন কি বুদ্ধিপ্রবণাখ্যা লাভের যোগ্যও হইতে পারেন। দেশের জমির অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া উৎপাদিকা-শক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করে, জল হাওয়ার অবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। "বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের পরিণাম" প্রসঙ্গে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

মনঃপ্রবণ মানুষের পরিচালনাধীন অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মনঃপ্রবণ মানুষ ক্রমশঃ অবনতি লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়প্রবণ হইয়া পড়েন। তাহার ফলে তাঁহারা যে শিক্ষার নামে অশিক্ষা অথবা কুশিক্ষা অর্জ্জন করেন এবং স্বকীয় প্রযত্ন-দ্বারা জীবিকার্জ্জন-শক্তি লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে যে ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহার বোধ পর্য্যন্ত তাঁহাদের লুপ্ত হয়।

একমাত্র বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের ভাষা সম্পূর্ণ শৃঙ্খলানুগত। মনঃপ্রবণ মানুষের ভাষা ঠিক তদনুরূপ না হইলেও ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের ভাষার মত সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল নহে। মনঃপ্রবণ মানুষ পরাধীন অবস্থায় যখন ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়প্রবণ হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের ভাষাতেও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। মনে রাখিতে হইবে, ব্যাকরণহীনতা ভাষার বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক।

(ঘ) কার্য্যের অবস্থা

মনঃপ্রবণ মানুষের জীবনের অধিকাংশ কার্য্যই মনঃপ্রধান। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার জীবনে একটীও ইন্দ্রিয়প্রধান অথবা বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য থাকিবে না, তাহাও নহে। মনঃপ্রবণ মানুষের কার্য্যেও কখন কখন ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির প্রাধান্য থাকিতে পারে। মনঃপ্রবণ মানুষের বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য যত অধিক, তাঁহাকে তত উন্নত মনঃপ্রবণ মানুষ বলা যায়। আর যাঁহার যত অধিক ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্য তাঁহাকে তত অবনত মনঃপ্রবণ মানুষ বলা হয়।

মনঃপ্রবণ মানুষ মাত্রেরই মনঃপ্রধান কার্য্যের সংখ্যা বেশী এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যের সংখ্যার তারতম্যানুসারে তাঁহাদের তারতম্য হয়।

[৬] মনঃপ্রবণ মানুষের এবং মনঃপ্রধান কার্য্যের উদাহরণ

ভারতবর্ষে ইন্দ্রিয়প্রবণ অথবা বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিতে ক্লেশ হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, মনঃ-প্রবণ মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন ক্লেশ নাই। যে কোন স্বাধীন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া গেলে মনঃপ্রবণ মানুষের যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় এবং তাহারই ফলে লিখিত ইতিহাসে * কোন জাতির দীর্ঘ কাল ও বিস্তৃত স্থানব্যাপী প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা যাঁহাদের সহিত সচরাচর মিশিয়া থাকি, তাঁহাদের মধ্যেও মনঃপ্রবণ মানুষই যে অধিক তাহা তাঁহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই অনুমান করা যায়।

যে সমস্ত কার্য্য তথাকথিত ভদ্রতার আবরণে প্রচ্ছন্ন ভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এবং মাৎসর্য্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় তাহাই মনঃপ্রধান।

শিক্ষার কার্য্য, শিক্ষকতার কার্য্য, পরোপকারের কার্য্য এবং দেশ-হিতৈষণার কার্য্যও মনঃপ্রধান হইতে পারে। আমরা তাহার আলোচনা যথাস্থানে করিব।

আগামীবারে আমরা "বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের পরিণাম" সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব

[ক্রমশঃ]

* ভারতবর্ষের ও চীনের ইতিহাস এখনও আমূল প্রকাশিত হয় নাই। আমাদের দেশীয় ও বিদেশীয় মনীষীরা ঐ দুইটী দেশের প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া যাহা প্রচার করিতেছেন তাহার মধ্যে সত্যের অপেক্ষা কল্পনার ভাগ অধিক কিনা তাহা বিচারসাপেক্ষ। আমাদের প্রবন্ধে ভারতবর্ষের এবং চীনের প্রাচীন ইতিহাস এখনও অলিখিত বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইয়াছি।

পৃথিবীর অধঃপ্রান্তে

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

বাল্যের ভৌগোলিক পরিচয়ের পর যতদূর মনে পড়ে সুমেরু-কুমেরুর সন্ধান পাই আমরা একেবারে বড় হয়ে মহাকাব্যের মধ্যে: "পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে, সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে"। কবির এ আশ্বাসবাণী সেদিন মনের মধ্যে একটা গর্বিত অহঙ্কার জাগ্রত করে তুললেও, চির-তুষারাবৃত পৃথিবীর এই দুই প্রান্ত সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত কিছু ধারণা আমাদের ছিল না।
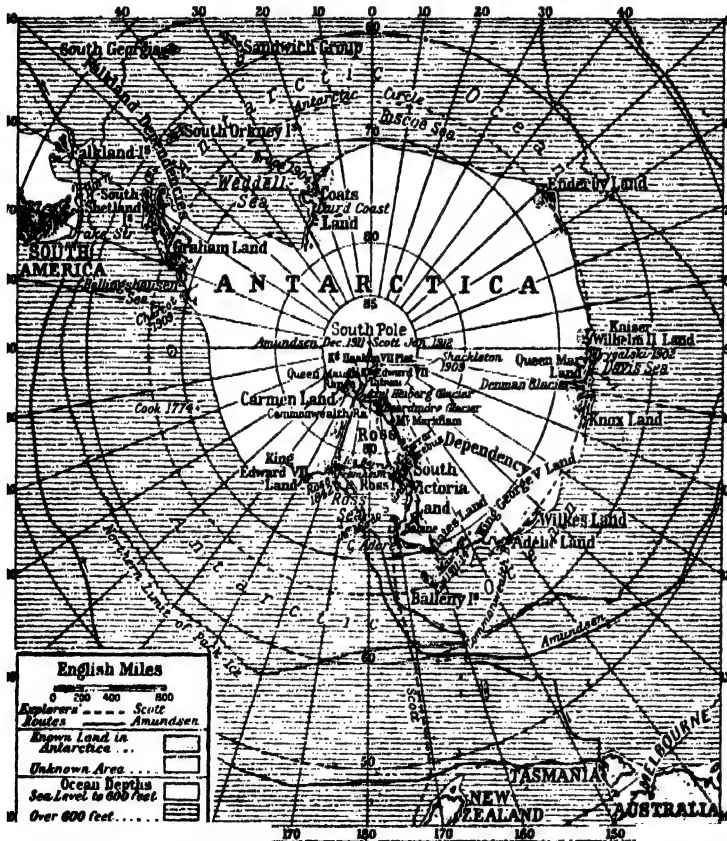
সুদূরতম দক্ষিণে পৃথিবীর অধঃপ্রান্ত, কুমেরুর মানচিত্র: মানচিত্রে শাদা জায়গাগুলি আজও অনাবিষ্কৃত; আমুণ্ডসেন (১৯১১) স্কট (১৯২১) প্রভৃতি মেরু-অভিযানকারী কর্তৃক কিয়দংশ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর পৃথিবীর মানচিত্রেও এই দুই ভূ-ভাগের বিবরণ অজ্ঞাত-প্রদেশ বলে চিহ্নিত ছিল। কারণ তখনও পর্য্যন্ত কোনো মানুষ সেখানে পৌছতে পারেনি, ক্রমে এর অস্তিত্বও লোকে ভুলে যেতে বসে-ছিল। কারণ নব নব ভূখণ্ডের সন্ধানে যারা তরণী নিয়ে সপ্তসাগরে পাড়ি দিয়ে ঘুরেছিল, তারা সবাই একে একে ফিরে এসে বলেছিল, 'আমরা এতদিন যা শুনে এসে-ছিলেম তা ভুল। পৃথিবীর মেরু-প্রদেশে বরফাচ্ছন্ন বারিরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। ভূমির কোনো চিহ্নই সেখানে নেই, তবে, আশে-পাশে ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ আছে বটে, কিন্তু সে গুলি ও আগ্নেয়গিরি-শিখরে কণ্টকিত।

শ্রীযুক্ত আবেল্ টাসম্যান (যিনি নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন), ১৬৪২ খৃঃ অব্দে মেরুদেশের সন্ধানে ঘুরে

ঘুরে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবু তিনি বেশ জোর করেই বলে গিয়েছিলেন যে, নিউজিল্যাণ্ডের আরও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের বুক জুড়ে নিশ্চয়ই এক বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে।

এই ঘটনার প্রায় ১২০ বছর পরে প্রসিদ্ধ ভূপর্য্যটক ও জগদ্বিখ্যাত সমুদ্রবিদ্ শ্রীযুক্ত আলেকজাণ্ডার ডাল্‌রিম্পেল কাগজে-কলমে একথা লিখে ছাপার হরফে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থিত করে বলেছিলেন যে, পৃথিবীর অবাচ্য অংশের (tropics) ৫০°, পঞ্চাশ ডিগ্রী দক্ষিণে আর সমুদ্র নেই, সেস্থানটি সমস্তই কঠিন মৃত্তিকার দেশ।

ডাল্‌রিম্পেলের এই ঘোষণার ঠিক দশ বৎসর পরেই ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কুক দক্ষিণ মেরুর সেই অজ্ঞাত মহাদেশ আবিষ্কারে যাত্রা করেন এবং মেরু-সাগরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে এসে বলেন, ভূমির নিশানা কোথাও পাওয়া গেল না, মেরু-মহাদেশের কথাটা নেহাৎ কবির কল্পনা। চারিদিকে জমাট বরফ। সেই তুষার-প্রাচীর ভেদ করে যদি কোনো যাদুকরের তরণী অগ্রসর হ'তে পারে তা হ'লে হয়ত সে কোনো মহাদেশের সন্ধান পাবে, কিন্তু সম্ভবতঃ তার সে আবিষ্কার জগতের কোনো প্রয়োজনেই লাগবে না।

এই ঘটনার প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে রুষ-রণতরী-পরিচালক নৌ-সেনাপতি বেলিংস্‌হৌসেন পুনরায় দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারে যাত্রা করেছিলেন। তাঁর অভিযানও নিষ্ফল হয়েছিল। যদিও তিনি ক্যাপ্টেন কুকের দলবলের চেয়ে আরও অনেক বেশী দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অদৃষ্টেও সে অজ্ঞাত মেরুদেশ অজ্ঞাতই র'য়ে গিয়েছিল। তারপর ১৮৪১ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ এই রুষ-নাবিকের নিষ্ফল অভিযানের প্রায় বিশ বৎসর পরে ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিন মেরু-সন্ধানীরা
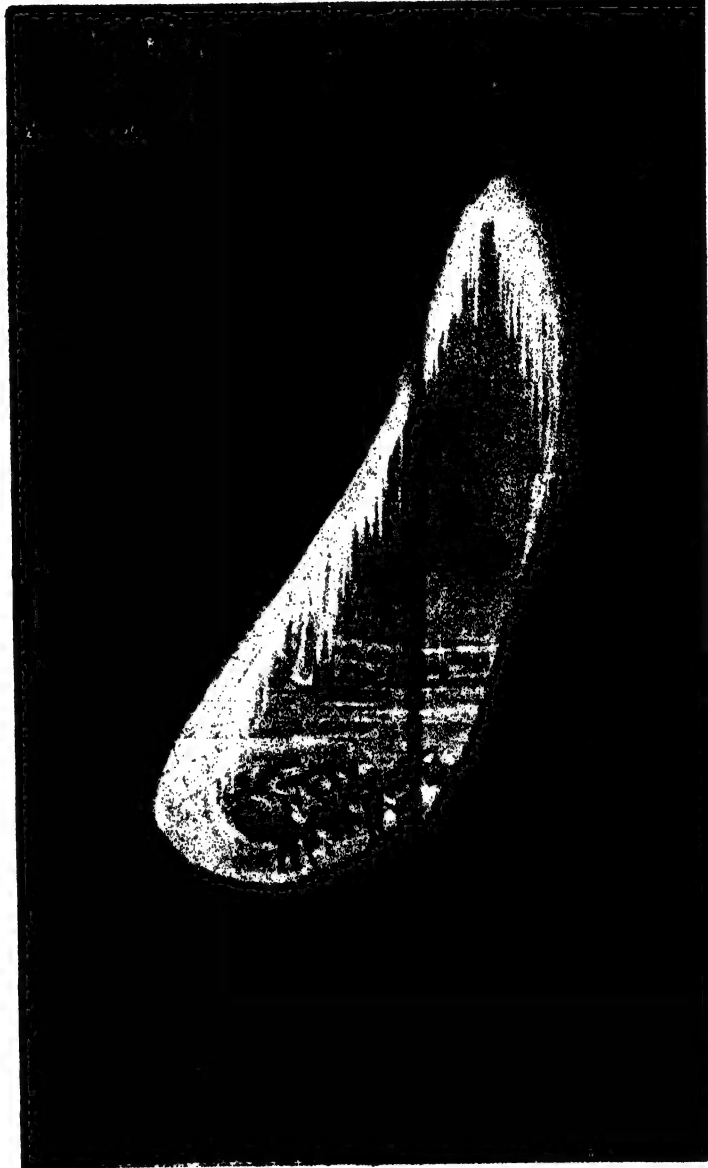
এই তুষার-শৈলের খানিকটা খসিয়া পড়িয়া বিগলমান বরফবিন্দু শোভিত সুন্দর একটি দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে: দূরে ক্যাপ্টেন স্কটের জাহাজ "টেরা-নোভা" পরিদৃশ্যমান।

ঝাত্যাবিক্ষুব্ধ তুষার স্তূপ : পশ্চাতে মাউণ্ট এয়ারবুস [Mt. Erebus]।

জনমনুষ্যহীন পেঙ্গুইন রাজ্য : কেপ রয়েড্স।
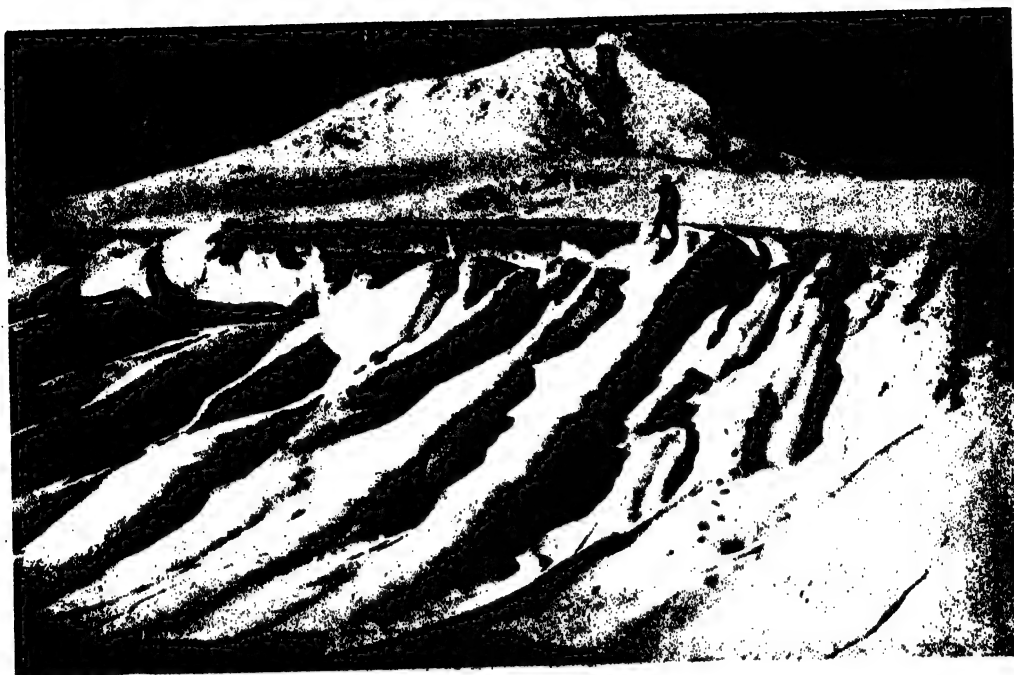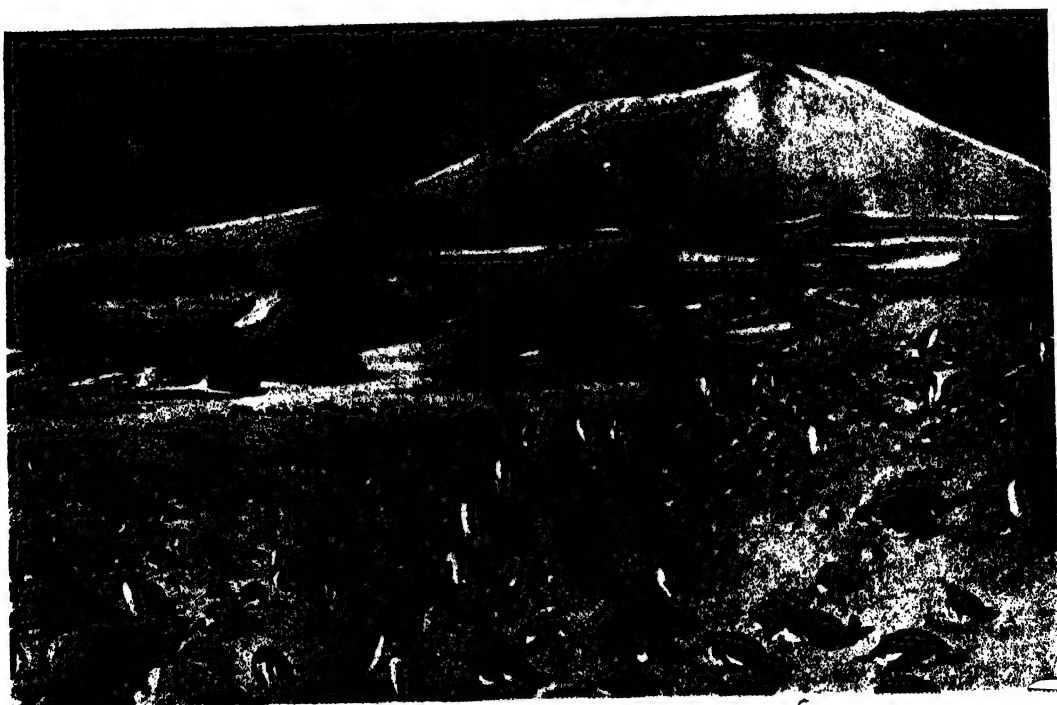
সেই অজ্ঞাত মহাদেশের সীমানা খুঁজে পেয়েছিলেন। য়ুরোপ ও অষ্ট্রেলিয়া একত্র করলেও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের আয়তন যে তদপেক্ষাও বড় এ সত্যও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যে ভূখণ্ডের অস্তিত্ব এতকাল ধ'রে শুধু অনুমান ও সংশয়ের মধ্যে সংগুপ্ত ছিল তা' এইবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থায়ী আসন অধিকার ক'রে বসল।

পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত, অর্থাৎ মাথার দিকে ও তলার দিকে ঈষৎ চাপ্টা—ছেলেবেলা থেকে একথা শোনা আছে। ভূ-গোলক অর্থাৎ গ্লোবের আকার কিন্তু অনেকটা ফুটবলের মত। এই গোলকের উর্দ্ধ ও অধঃ-প্রান্তকে যথাক্রমে বলা হয় সুমেরু ও কুমেরু। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বললে ঠিক বলা হয় না, কারণ গোলাকার কোন পদার্থের এরূপ নির্দ্দিষ্ট নামকরণ নিরাপদ নয়। এর উর্দ্ধদিক এবং অধঃপ্রান্ত, দুইই চক্রাকারে উভয় মেরুবিন্দুর অভিমুখে ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হয়ে এসেছে। অতএব চতুর্দ্দিকই সেই বেষ্টনীর মধ্যে ধরা পড়ে, কেবল-মাত্র উত্তর দক্ষিণ নয়। পূর্ব্বে যে কমলালেবুর উপমা দেওয়া হয়েছে সেই কমলালেবুর মাথার দিকে ঠিক মধ্যস্থলে যদি একটি শলাকা বিদ্ধ ক'রে তলার দিকে ঠিক বোঁটার মধ্য দিয়ে বার করা হয়, তা হলে সেই শলাকাটি হয়ে উঠবে সেই লেবুর মেরুদণ্ড এবং তার উভয় প্রান্ত যে স্থান বিদ্ধ করেছে সেই স্থান হবে মেরুবিন্দু। উপরের দিক উর্দ্ধ মেরু-প্রান্ত; নিম্নদিক অধঃ মেরুপ্রান্ত। উপরের মেরুবিন্দুকে কেন্দ্র করে যদি একটি চাকতি কাটা যায়, তা হলে সেইটি হবে পৃথিবীর উর্দ্ধ প্রান্ত বা উদীচ্য মেরুপ্রদেশ। আর নিম্নের মেরুবিন্দুকে কেন্দ্র ধরে যদি আর একটি চাকৃতি কাটা যায় তা

রস আইলাণ্ড হইতে সত্তর মাইল দূরের ভিক্টোরিয়া-ল্যাণ্ডের দৃশ্য।

হ'লে সেটি হবে পৃথিবীর অধঃপ্রান্ত বা অবাচ্য মেরুপ্রদেশ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই অবাচ্য মেরুপ্রদেশ-বা পৃথিবীর অধঃপ্রান্তস্থ ভূভাগের রহস্য বর্ণনা করব। আমাদের প্রধান
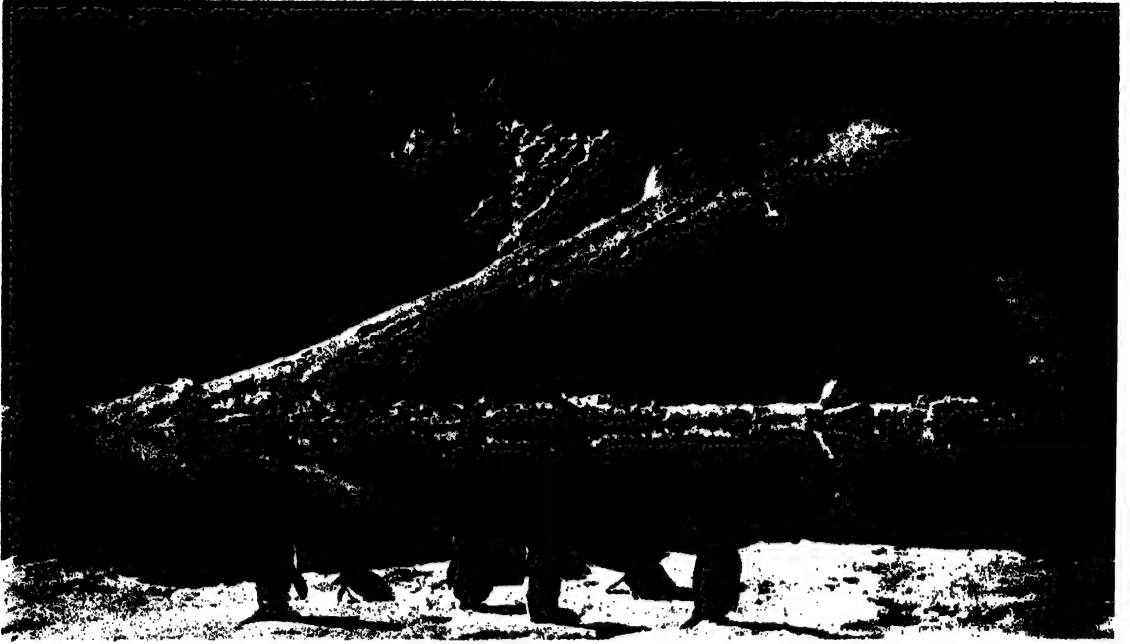
মেরু দেশের সুদূর দক্ষিণে পেঙ্গুইনদের প্রভাতরৌদ্র সেবন।

অতিকায় শীল (Weddel Seal) : তুষারভূমিতে গতি মন্থর হইলেও সমুদ্রের জলে ইহার সন্তার দেখিবার মত।

অবলম্বন অবশ্য শ্রীযুক্ত ফ্র্যাঙ্ক ডেবেনহ্যামের মেরু-অভিযান-কাহিনী। ইনি বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই মেরু-প্রদেশে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন স্কটের শেষ মেরু-অভিযানে, তাঁর সঙ্গী হ'য়ে।

মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর অধঃপ্রান্তস্থ এই বিস্তৃত ভূখণ্ড যেন চারিদিকে জলরাশিবেষ্টিত একটি বিশাল দ্বীপ। এই মহাদেশের নাম এ্যাণ্টারটিকা। আমাদের ভাষায় অবাচ্য ভূমি। এর চারিদিকে বহুদূর পর্যান্ত বিস্তৃত অক্ষয় তুষারখণ্ড সদা সতর্ক প্রহরীর মত এর সীমান্ত রক্ষা করছে চিরদিন। জলের পরই কোথায় যে বরফ শেষ হয়ে ঠিক জমি সুরু হয়েছে তার সন্ধান পাওয়া দুরূহ। চারিধারে অনন্ত প্রসারিত নীলাম্বুরাশি তরঙ্গায়িত হয়ে দুলছে,—অবাধ অপার অগাধ বলে মনে হয় এই মেরু-সমুদ্রকে। দূরে দূরে দু' একটি ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ যেন মরুভূমির বুকে উর্বর ক্ষেত্রের মত কোন রকমে সেই বিশাল জলরাশির আলোড়নের মধ্যে আত্মরক্ষা ক'রে নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বাতাস এখানে নিরন্তর পশ্চিমাভিমুখী। এই অবাচ্য ভূমির পরিধি বারো হাজার মাইল।

বার্ণ গ্লেসিয়ারের চিরনীহার বাহু: নীচে ক্যাপ্টেন স্কটের সারমেয়-বাহিনীকে বিশ্রাম করিতে দেখা যায়।

পৃথিবীর মধ্যে এমন বৃহৎ এক ভূখণ্ড, অথচ এর সম্বন্ধে আমরা এত অল্প জানি! নিজেদের ঘরের খবর না রেখে আমরা চলেছি কিনা মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে! গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে যাবার আগ্রহের আমাদের অন্ত নেই—অথচ মেরুপ্রদেশ হাতের কাছে পড়ে রয়েছে—পনেরো আনা অপরিচিত হ'য়ে। দক্ষিণ আমেরিকা হ'তে এই মেরু-প্রদেশ মাত্র সাত শত মাইল। নিউজিল্যাণ্ড হ'তে এ স্থানের দূরত্ব দেড় হাজার মাইল। অষ্ট্রেলিয়া থেকে আরও কিছু দূর, এবং আফ্রিকার মরুভূমি হ'তে এই মেরুস্থানের দূরত্ব দু' হাজার মাইল মাত্র!

সবৎসা শীল।
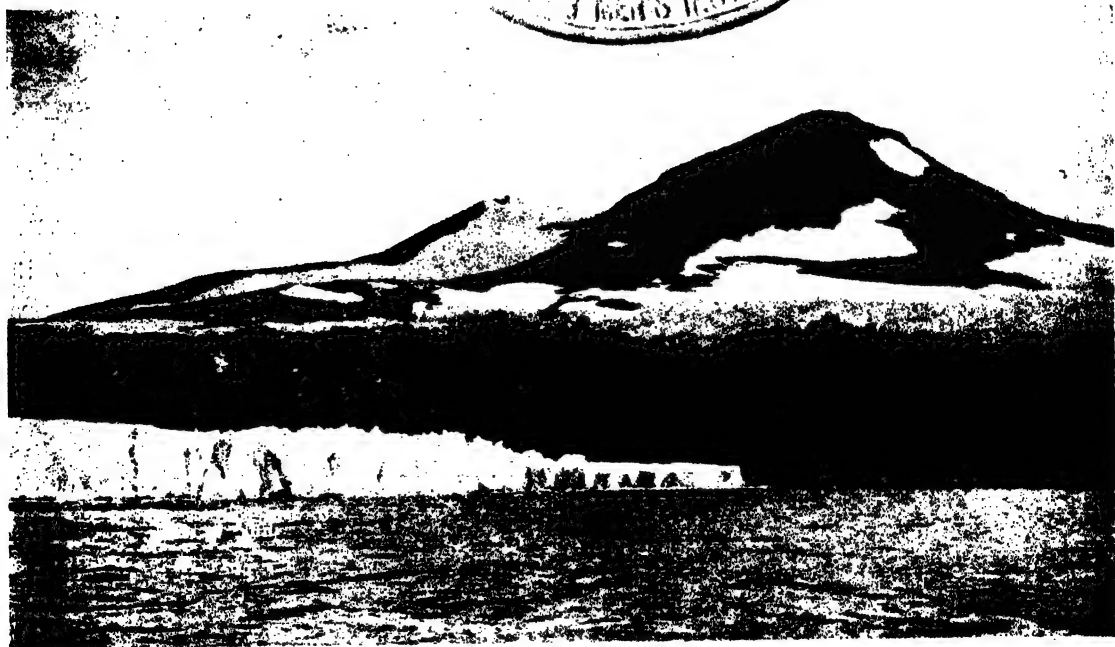
মেরু-প্রদেশের সীমান্ত ঘিরিয়া দুর্ভেদ্য তুষার-প্রাচীর মেরু-যাত্রীর চিরবাধাস্বরূপ প্রবহমান। উপরে রস বেরিয়ারের একাংশ দেখা যাইতেছে।

এই মেরু-মহাদেশের আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একটু অস্পষ্ট। মানচিত্রে এটিকে দেখায় একটি পেয়ারা বা ন্যাস্‌পাতি ফলের আকার। দক্ষিণ-আমেরিকার দিকে যেন এর বোঁটাটি ক্রমশঃ সরু হয়ে এগিয়েছে। এই ফলটির নিটোল গায়ে মনে হয় যেন 'ওয়েড্‌ডেল'-সমুদ্র ও 'রস'-সাগর দুপাশে দুই কামড় বসিয়ে খানিকটা ক'রে খুব্‌লে খেয়েছে। দক্ষিণ-আমেরিকার আকৃতির সঙ্গে এই মেরুপ্রদেশের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আকার এর যাই হোক, এই মহাদেশের বারো হাজার মাইল বিস্তৃত সীমানার মাত্র তিন হাজার মাইল পর্য্যন্ত ভূ-পর্য্যটকেরা ধরতে ছুঁতে পেরেছেন। বাকীটার পরিচয় কতক অনুমানসাপেক্ষ ও অধিকাংশ অজ্ঞাত।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই মেরু মহাদেশের বিশাল কূলের পরিচয় আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ না জানতে পারলেও দুঃসাহসী মানব তার কৌতুহল চরিতার্থ করবার জন্য এর কঠিন দুস্তর তুষারবেষ্টনী ভেদ ক'রে এর হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে পৌছতে পেরেছিল। মেরুপ্রদেশের একেবারে মেরু-বিন্দুতে গিয়ে তারা দাঁড়িয়েছিল। পৃথিবীর এই অধঃপ্রান্তের কেন্দ্র-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে তারা দেখেছিল, তুষারাবৃত এক গড়ানে-ভূমির উপর এসে তারা পৌছেছে, কিন্তু মৃত্তিকার চিহ্নমাত্রও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। চারিদিকে বরফ এবং বরফের পর জল! সে জলের আর শেষ নেই যেন অনন্ত বিস্তীর্ণ দুরন্ত পারাবার! অথচ ভূগোলের হিসাবে তারা তখন সাগর-সমতল হ'তে ন'হাজার ফুট উর্দ্ধে দণ্ডায়মান ছিল। মানুষের দৃষ্টি যদি একান্ত সীমাবদ্ধ না হ'য়ে সুদূরপ্রসারী হ'ত তা হলে তারা দেখতে পেত যে, তারা যে ভূখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই মেরু-উপত্যকার পরিধি মাত্র তিনশত মাইল বিস্তৃত, তার পরই তার চারিধার গোল হ'য়ে ছাতার মত বৃত্তাকারে নিম্নাভিমুখে গড়িয়ে নেমে গেছে। মাত্র ত্রিশ মাইল পরেই সমুদ্র-বক্ষের সমতল ভূমি। সেখান থেকে দেখতে পাওয়া যেত চার শ' মাইল বিস্তৃত বিরাট তুষারস্তূপ সাগরজলে ভাসমান। সেই তুহিনবেষ্টনীর কিনারায় ঘুরে ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে অতলান্ত মহাসাগরের অবিরাম সঙ্গম চলেছে।

মেরুকেন্দ্র সমুদ্রবক্ষের সমতল ক্ষেত্র হ'তে ন' হাজার ফুট উচ্চ হলেও তার চারিদিক গড়িয়ে নেমে এসেছে ছ' হাজার ফুটের মধ্যে। সমুদ্রবক্ষের সমতল ক্ষেত্র হ'তে মাত্র ছ' হাজার ফুট উচ্চ এই ভূভাগ চারিদিকে প্রায় ১৪০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত তার পরই একেবারে খাড়া নেমে এসে শেষ হয়েছে 'আদেলী' তীরভূমির তটপ্রান্তে এসে। পৃথিবীর অধঃপ্রান্তে যে মেরুপ্রদেশ তার সঠিক বর্ণনা এই পর্য্যন্তই দেওয়া চলে। তারপর যা কিছু সবই অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে গড়ে তোলা। মেরুপ্রদেশের সীমান্ত হয়ত আরও ছ'শো মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি এর তটপ্রান্ত বহুদূর পর্য্যন্ত কেবলই তুষারাবৃত। সুতরাং এ বিষয়ে জোর ক'রে কিছু বলা চলে না। এই বরফাচ্ছন্ন মেরুপ্রদেশের তুষার-রাশি ক্রমশঃ গলে গলে একটা জলনিকাসের পথ করে নিয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সে প্রবাহের আজও কোনো সন্ধান মেলেনি। মোটের উপর এ দেশের এই ব'লেই বর্ণনা করা চলে যে—বড় বড় বিশাল উপত্যকা চিরতুষারাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে রয়েছে, নিস্তব্ধ

পেঙ্গুইন জননীর শাবক-প্রহরা।

নির্জ্জন বৈচিত্র্যহীন, অথচ অতি বিরাট এই মেরুপ্রদেশ! ষাট লক্ষ বর্গ মাইল এর বিস্তার, কিন্তু বরফে ঢাকা পড়েনি এমন জমি মাত্র ছ' হাজার বর্গ মাইলের বেশী চোখে পড়ে না। উপস্থিত যা জানা গেছে তাতে এদেশের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতচূড়ার উচ্চতা পনেরো হাজার ফিটের অধিক নয়। এদেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু।

মেরুপ্রদেশের সীমান্তে যে বরফের ব্যবধান ভূমি থেকে সমুদ্রকে তফাৎ ক'রে রেখেছে তার বর্ণনা শুনলে বিস্মিত হ'তে হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সার্ জেমস্ ক্লার্ক রস্ পৃথিবীর এই অধঃপ্রান্তস্থ মেরুকেন্দ্রে পৌছবার জন্য অভিযান করেছিলেন। কিন্তু মেরুপ্রদেশের সীমানার কাছে এসে তিনি প্রথম বাধা পেলেন বরফের স্তূপের কাছে। তাঁর জাহাজের মাস্তুলের চেয়েও উঁচু সেই বরফের স্তূপ! তার কোনো পাশ দিয়ে ঘুরে যাবারও উপায় ছিল না, কারণ এই তুষার-প্রাচীর পথরোধ করে বিস্তৃত ছিল প্রায় হাজার মাইল পর্য্যন্ত। স্থানে স্থানে এই বরফস্তূপের উচ্চতা ছিল ১৭০ ফিটেরও বেশী! ফরাসী দেশের চেয়েও আকারে বৃহৎ এই বিরাট তুষারস্তূপ, কিন্তু সমুদ্র-বক্ষে ভাসমান! ধীরে ধীরে উত্তরদিকে নড়ে যাচ্ছে বোঝা যায়। এর গতিবেগ বছরে আধ মাইলের বেশী নয়। মাঝে মাঝে এর অঙ্গচ্যুত হ'য়ে বড় বড় বরফের চাঁই সমুদ্রজলে বহুদূর পর্যন্ত ভেসে যায়। ১৯১১ সালে ক্যাপ্টেন আমুণ্ডসেন এই বরফের বুকে নেমে প্রায় বৎসরাধিককাল বাস করেছিলেন।

পেঙ্গুইনের চিরশত্রু অতিকায় কৃষ্ণ-শকুনির (Skua Gull) নীড়।

পৃথিবীর অধঃপ্রান্ত হ'তে খসে-পড়া এক একটা বরফের চাঁই—উঁচু হবে প্রায় দেড়শ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে এক একটা তিরিশ মাইলেরও বেশী—সমুদ্রের বুকে বহুদিন ধরে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। গরম আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়লেও এতবড় বিরাট বরফের চাঁইটি গলে যেতে বেশ কিছুদিন সময় নেয়। একবার এই রকম কয়েকটি বিপুল তুষারস্তূপ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছাকাছি পর্যান্ত এসে পড়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দু'হাজার মাইল পর্যান্ত ভেসে এলেও এ বরফের চাঁই সহজে গলতে চায় না।

মেরুপ্রান্তের এই তুষাররাশি যে কত অগণিত শতাব্দী ধ'রে জমে উঠেছে তার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সমুদ্র যে প্রতি বৎসর এর কলেবর কতকটা বৃদ্ধি করে এ সন্ধান জানতে পারা গেছে। শীতের দিনে প্রতি বৎসর মেরু-সন্নিহিত সাগরজল প্রায় পাঁচ ফুট গভীর পর্য্যন্ত চারিপাশে জমে বরফ হয়ে যায়, এবং সেই বরফের সঙ্গে মেরুতটের তুষাররাশির মিতালী ঘটে। বসন্ত ও গ্রীষ্মে এই সাগরতুষারের সঙ্গে মেরুতুষারের মিত্রতা ছুটে যায়। সাগর-তুষার তখন মেরুতুষারের আলিঙ্গন হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যেতে সুরু করে। তখন এই তুষারমণ্ডল দেখে মনে হয় যেন মেরু-সুন্দরীর স্ফটিক-নীবিবন্ধন শ্লথ হয়ে পড়েছে। এই সাগর-তুষারবেষ্টনী গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার শীত এসে পড়ে এবং আবার সাগরজল মেরুপ্রান্তে জমে উঠে তুষারহারে পরিণত হয়। বছরের পর বছর সেখানে এই একঘেয়ে বরফের খেলা চলেছে। শিল্পীর চোখে এই তুষাররাজ্যের শোভা ও সৌন্দর্য্য হয়ত অতুলনীয় ও উপভোগ্য! কিন্তু বিষয়ী লোকে একে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে না। তারা বলে এত বড়

একটা দেশ, এই দুরন্ত বরফে আক্রান্ত হয়ে নিষ্ফল অস্তিত্ব বহন করছে। ভূতত্ত্ববিদেরা এখানে এসে খুঁজে পায় পৃথিবীর সেই শৈশবকালীন বিস্মৃত, অতীত যুগের তুহিনশীতল আবহ, যখন সমস্ত জগৎ পড়ে ছিল এমনিই তুষারাবৃত ও জনহীন হয়ে!

পৃথিবীর অধঃপ্রান্তের আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা হ'লেও একেবারে অসহ্য নয়। এখানে উত্তরে বাতাস এবং পূবে হাওয়া দুইই পৃথিবীর বিবর্ত্তনের অনুপাতে পালাক্রমে প্রবাহিত। এত হাওয়া কিন্তু পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। দিবারাত্র যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে! আদেলীভূমিতে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে বাতাসের বেগ সেখানে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী! মাঝে মাঝে এক একটা দমকা হাওয়া ছুটে চলে ঘণ্টায় প্রায় একশ' মাইল। ক্ষণে ক্ষণে এখানে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয়। মেরুপ্রদেশের এ একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সারাবছর ধ'রে প্রায়ই থাকে ৩২ ডিগ্রীরও কম। কিন্তু ওঠা নামা করে ৩২ থেকে ৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত! সমুদ্রকূলে আবার শূন্য ডিগ্রী ছাড়িয়ে আরো পনেরো ডিগ্রী বেশী নীচু হ'য়ে পড়ে। এদেশে কখনো বৃষ্টি হয় না। বর্ষণ যা হয় তা ঐ তুষার কিংবা হিম। অথচ গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের উত্তাপ এদেশে নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু, হ'লে কি হবে, বরফের স্তূপ সে উত্তাপ সমস্ত গ্রাস করে নেয়। তাই নিদাঘে তুষারতরঙ্গ মেরু-সমুদ্রের একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ব'লে পরিগণিত হয়েছে

এই চিরতুষারাচ্ছন্ন হিমশীতল মহাদেশে কেমন ক'রে যে উদ্ভিদ জন্মায় ও বেঁচে থাকে, এ এক আশ্চর্য্য ঘটনা।

শীতকালে চারিপার্শ্বে সমুদ্রের উপরিদেশ তুষারে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু আহারান্বেষণে শীলকে এই তুষারস্তরের তলদেশস্থ জলরাশিতে যাইতে হয়। উপরের চিত্রে আহারান্বেষণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত একটি শিলকে তুষারগহ্বর হইতে উঠিতে দেখা যাইতেছে।

মেরুকেন্দ্রে অবশ্য কোনো উদ্ভিদের চিহ্ন নেই, কিন্তু সেখান থেকে কতক দূরে খুব কম করেও কুড়ি রকমের পাহাড়ী উদ্ভিদ আর রং-বেরংয়ের শৈবাল জন্মাতে দেখা যায়। উত্তরপ্রান্তে

গ্রেহামভূমির কতকাংশে আবার এক প্রকার মোটা মোটা ঘাসও গজায়। শৈবালপুঞ্জের মধ্যে দু'রকম পোকার অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া গেছে এবং মেরুকেন্দ্র হ'তে যতদূর সরে আসা যায় ততই আরও সব কীট পতঙ্গের সাক্ষাৎ মেলে। স্থলচর জীব বা প্রাণী বলতে প্রকৃতপক্ষে এখানে কিছুই নেই: থাকা সম্ভবও নয়, তবে মেরুসমুদ্রে নানা জীবের বসবাস আছে বটে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাঝামাঝি এক রকম জীবেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এখানে এদের বলে 'প্ল্যাঙ্কটন্' বা উদ্ভিজ্জ জীব! এরা একটা কিছু অবলম্বন করে জলের মধ্যে ঝোলে বা দোলে। সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়াতে পারে না। এখানে আণুবীক্ষণিক জীবাণু ও পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্রতম দ্বিদল উদ্ভিজ্জাণুর প্রচুর আবির্ভাব দেখা যায় গ্রীষ্মকালে। এ সময় সমুদ্রকূলের শুভ্র তুষাররাশি একেবারে পীতাভ হ'য়ে উঠে এদের অগণিত বালুকণার মত কঙ্কালসার অস্তিত্বের আবরণে। মেরুসাগরের সর্ব্ব প্রাণীর এরাই হ'য়ে উঠে তখন প্রধান খাদ্য। এই খেয়েই বাঁচে অসংখ্য কুচো কাঁকড়া ও ক্ষুদে-চিংড়ি! বরফের দেশের তুষারসমুদ্রচারী পেঙ্গুইন পাখী, শীলমাছ, এমন কি তিমি-রাজেরও এরাই হ'য়ে উঠে একমাত্র আহার্য্য। বরফ সরে গেলে সমুদ্রজলে চিরপরিচিত জেলী ফিশ্ এবং অক্টোপাস্ও দেখা দেয়। গেঁড়ি, গুগ্‌লী, প্রবাল, স্পঞ্জ, সৈকত-শোষক প্রভৃতি বরফ না জমে উঠা পর্য্যন্ত সমুদ্রে লীলাখেলা করে। মৎস্যাদিরও অভাব নেই। তিন চার রকমের মাছ এ পর্য্যন্ত মেরুসাগরে দেখতে পাওয়া গেছে। পাখীও উড়ে আসে, কিন্তু দু' এক রকমের বেশী কারুর চোখে পড়েনি। 'আলবাট্রস্' পক্ষী হ'ল দক্ষিণ মহাসাগরের মহাবিহঙ্গ। কিন্তু এরা মেরুভূমির বাসিন্দা নয়। সময়বিশেষে এখানে উড়ে আসে মাত্র। আবার উড়ে চলে যায়। 'পেট্রেল' পক্ষীরও প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এখানে। তুষারপ্রদেশের একমাত্র প্রকৃত অধিবাসী কিন্তু পেঙ্গুইনরা। আর এক প্রকার পক্ষীও সেই বরফের দেশে বাস করে, তাদের বলে 'স্কুয়াগল্' বা সাগরবলাকা। অনেকটা আমাদের দেশের গাংচিলের মত! পেঙ্গুইন পাখী এই মেরুপ্রদেশে এ পর্য্যন্ত ছ'রকম দেখতে পাওয়া গেছে। 'জেন্টু', 'রিংড়্' 'কিং' 'আদেলী' 'এম্পায়ার' ও সাধারণ পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনের জীবনকাহিনী বেশ চিত্তাকর্ষক, পরে কোনো সময়ে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। শীলমাছের সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলবার আছে। তিমি অনেক রকমের এখানে পাওয়া যায়। তিমিমাছ ধরাও এখানে সহজ। শীল আর তিমিই মেরুপ্রদেশে মৎস্যজীবীদের প্রায়ই আকর্ষণ করে নিয়ে আসে।

খনিজ পদার্থের মধ্যে তাম্র প্রভৃতি দু'একটি ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে গ্রেহামল্যাণ্ডে। আর ঠিক তার বিপরীত দিকে দক্ষিণ ভিক্টোরিয়াল্যাণ্ডে বিশাল কয়লার খনির খোঁজ পাওয়া গেছে। কিন্তু ব্যবসায়ের পক্ষে এ সবের অস্তিত্ব এই নির্ব্বান্ধব তুষারপুরে একান্তই নিষ্ফল! একমাত্র তিমির ব্যবসায়ই এখানে খুব বেশী রকম চলে এবং যথেষ্ট লাভ হয় তাতে। কারণ জাহাজে বসেই তিমি মাছ ধরা চলে। পৃথিবীর অধঃপ্রান্তস্থ এই মহামেরুদেশ কতকালে যে মনুষ্যবাসের যোগ্য হবে—তা অনুমান ক'রেও বলা চলে না।

সতর্ক ইউরোপ

গত ২২ মাসের মধ্যে ইউরোপের সকল দেশে ৬০০ শত রাজনৈতিক গোয়েন্দা ধরা পড়িয়াছে। এদেশ ওদেশের বিপক্ষে গোয়েন্দা লাগাইয়াছে—আগামী যুদ্ধের বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে। মোটামুটি গণনায় বলা যাইতে পারে, সমগ্র ইউরোপে প্রায় ১০ হাজার এই ধরণের গোয়েন্দা আজ ঘোরা-ফেরা করিতেছে। এই সকল গোয়েন্দাদিগের আচরিত উপায়াদি বিষয়ে লিখিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান লিখিতে হয়। সিদ্ধ ডিমের মধ্যে বেগুণী কালীতে লিখিয়া সংবাদ পাঠানো হইতে সুরু করিয়া সেলাইয়ের রকমফের, হরেকরকম ডাকটিকিট, সব কিছুর সাহায্যেই এই গোয়েন্দারা সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছে।

প্রত্যেক পথচারী বৈদেশিককেই ইউরোপের প্রতি দেশে আজ গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

অন্তরে বাহিরে

—শ্রীরাধারাণী দেবী

তোমার কর্ম্মের ক্ষেত্রে আছো যথা অহরহ মাতি'
ব্যস্ত মন ন্যস্ত নিজ কাজে !
হে বন্ধু ! সেথায় তুমি করো নাই মোরে তব সাথী
ডাকো নাই সে ভুবন মাঝে !
আননে বুদ্ধির দীপ্তি, ললাটে চিন্তার দিব্য রেখা,
দুর্জ্জেয় সন্ধানে যবে যোগী সম মগ্ন রহো একা,
জটিল সমস্যা মাঝে সমাহিত সেই মূর্ত্তি দেখা
কী মোহ সে কিছু জানি না যে !

দূর হতে শ্রদ্ধাভরে সবিস্ময় গরবে গৌরবে
সসম্ভ্রমে করি নমস্কার !
সমস্ত হৃদয়খানি ভরে ওঠে সৌভাগ্য-সৌরভে
উথলে পুলক-পারাবার।
তোমায় সকাল সন্ধ্যা রূপে রসে বর্ণে গন্ধে গানে
সুন্দর করি যে আমি প্রাণের পরমামৃত দানে,—
প্রহরের খরদাহ জুড়াইতে এসো এইখানে
সার্থকতা সেই তো আমার !

হে জ্ঞানি ! তোমার জ্ঞান কর্ম্ম মাঝে সমন্বয় লভি'
রচে যেথা ধ্যানলব্ধ ফল,—
সেথা তো আপনি তুমি দেখ নাই আপনার ছবি,
অপরূপ সে রূপ উজ্জ্বল !
সুদূর দুর্গম তীর্থে মন্দিরের রত্নবেদী' পরে
দূর হতে দেবতারে দেখেছ কি ক্ষণেকের তরে ?
দেখেছ সূর্য্যের দীপ্তি দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে ?
চিত্ত তাহে হয়নি বিহ্বল ?

হেথায় যখন থাকো প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণে,
সে রূপ একান্ত মম চিনা !
প্রশান্ত মূরতি তব ভরি' রহে আনন্দ কিরণে,
মুহূর্ত্ত চলে না আমা বিনা !
সন্ধ্যায় সুখের পাত্রে পূর্ণ হয় মাধুর্য্যের ভার,
মর্ম্মের গোপন হর্ম্ম্যে মুক্ত করি দাও রুদ্ধদ্বার,
সেখানে কেবল শুধু তুমি আমি, কেহ নাহি আর,
ধরণী বাহিরে রহে দীনা !

কাছে এলে ভালবাসি,—কাছে পেলে সুনিবিড় প্রেমে
নিবেদিয়া ধরি মোর সব !
দূর হতে শ্রদ্ধাভরে লভি' তব দীপ্যমান ক্ষেমে,
—মনে হয়, তুমি সুদুর্ল্লভ !
জীবন-প্রাঙ্গন তব সুদূর বিস্তৃত,—তারি মাঝে
আমারে আননি টানি জনতার কোলাহলে কাজে,—
দিয়েছ সেথায় ঠাঁই, যেথা তব সুখ দুখ রাজে ;—
—সেই মম চরম গরব !

———

মীরা বাঈ

—স্বামী ভূমানন্দ

রাজপুতনার অন্তর্গত মারবার প্রদেশের যোধপুর ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা রাঠোর বংশীয় রাব জোধাজীর চতুর্থ পুত্র, দূদাজী স্বকীয় পরাক্রমপ্রভাবে মেড়তায় এক পৃথক রাজ্য সংস্থাপন করেন। রাঠোর বংশের মেড়তিয়া শাখা এই দূদাজী হইতেই আরম্ভ। দূদাজী তাঁহার চতুর্থ পুত্র রত্নসিংহকে, তাঁহার ভরণপোষণের জন্য কুড়কী, বাজোলী প্রভৃতি বার খানি গ্রাম জায়গীর প্রদান করেন। রত্নসিংহের কোন পুত্র ছিল না। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা হইয়াছিল; এই কন্যারই নাম মীরাবাঈ।

মীরার জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর ঘটনাদি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

ইতিহাস হইতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে মনে হয় সম্বৎ ১৫৫৫, অর্থাৎ ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে কুড়কী গ্রামে মীরার জন্ম হয়। মীরার বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। এই জন্য তাঁহার পিতামহ দূদাজী, মীরাকে কুড়কী হইতে মেড়তায় আনাইয়া নিজের নিকটে রাখিয়া লালন পালন করেন। দূদাজী পরম বৈষ্ণব ছিলেন; কাজেই তাঁহার নিকট থাকিতে থাকিতে মীরার অন্তরে ক্রমে ভগবদ্ভক্তি অঙ্কুরিত হয়। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে (সং ১৫৭২) দূদাজী স্বর্গারোহণ করেন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরম দেবজী রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রাজ্যপ্রাপ্তির এক বৎসর পরেই, তিনি চিতৌড়ের সিসোদিয়া রাজবংশের মহারাণা সংগাজীর (সংগ্রাম সিংহের) জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজের সহিত মীরার বিবাহ দেন ও মীরা স্বামীর সহিত চিতৌড় গমন করেন। কয়েক বৎসর পরে (অনুমান ১৫১৯ হইতে ১৫২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে), যুবরাজ ভোজরাজের মৃত্যু হয়। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণা সাংগাজীর মৃত্যু হয় ও ভোজরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (অর্থাৎ, মীরার দেবর) রত্নসিংহজী মেবারের মহারাণা-পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু চারি বৎসর পরে তাঁহারও দেহান্ত হয় ও রত্নসিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যজী মহারাণা-পদে অভিষিক্ত হন।

বাল্যকালেই মীরারে ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। মীরা শৈশবেই তাঁহার সহচরীদিগের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পূজাদি ও উৎসব ব্যাপার লইয়া ক্রীড়া করিতেন। এই সময় এক দিন মীরা তাঁহার মাতার সহিত কোনও বিবাহোৎসব দেখিতে যান। বিবাহ শেষ হইয়া গেলে, মীরা জিজ্ঞাসা করেন, "মা, আমার স্বামী কে?" উত্তরে পরিহাসচ্ছলে মাতা বলেন, "তোমার স্বামী গিরিধারী লাল।"

মাতার এই বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলেও, মীরা এই সময় হইতেই স্বামী-ভাবে ভজনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মীরার পিতৃভবনে এক সাধু আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার নিকট একটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিল; তিনি উহা পূজা করিতেন। মীরা সাধুকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার ঠাকুরের নাম কি, ও ঐ বিগ্রহটি সাধুর নিকট প্রার্থনা করেন। সাধু বলেন, তাঁহার বিগ্রহের নাম, "গিরধর লাল", কিন্তু তিনি উহা মীরাকে দিতে অস্বীকার করেন। বালিকা মীরা ঐ বিগ্রহের জন্য 'জেদ' ধরিয়া বসেন ও দুই দিন অনাহারে পড়িয়া থাকেন। কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া পিতামাতা উভয়েই সাধুকে অর্থাদি দিয়া বহু বিনয় করিয়া মীরার জন্য ঐ মূর্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু সাধু বলেন, "আমি আমার ইষ্টদেব হইতে কখনও পৃথক থাকিতে পারিব না।" এবং তাঁহার বিগ্রহ লইয়া স্থানান্তরে গমন করেন। রাত্রে সাধু স্বপ্নে দেখেন যে, গিরিধারী লাল তাঁহাকে বলিতেছেন, "যদি মঙ্গল চাও ত' আমাকে এই বালিকার নিকটে থাকিতে দাও।" প্রত্যুষে সাধু ঐ বিগ্রহটি মীরার পিতাকে প্রদান করেন। এই সময় হইতেই মীরা অধিকতর ভক্তির সহিত গিরিধারীর সেবাপরায়ণা হন ও তাঁহাকে নিজের স্বামীজ্ঞানে ভজনা করিতে থাকেন। মীরার অধিকাংশ দোঁহার শেষ ভাগে দেখা যায়, "মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর"; "মীরা-পতি

গিরধারী" এবং "গিরধরজী ভরতার" পদও মীরার দোহায় দোঁহাতে পাওয়া যায়।

ভোজরাজের সহিত বিবাহ হইলেও মীরা অন্তরে 'গিরিধারীই তাঁহার প্রকৃত স্বামী' এই ধারণা করিয়া ভোজরাজের সহিত বাস করেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই ভোজরাজের মৃত্যু হয়। বৈধব্য-দশা প্রাপ্ত হইয়াও মীরা শোকে মুহ্যমান হইলেন না। পরন্তু, তাঁহার ভক্তি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং তিনি স্বকীয় ধৈর্য্যপ্রভাবে বৈধব্য-শোক দমন করিয়া অধিকতর তীব্রতার সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় তিনি সাধু রৈদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁহার নিকট 'স্বরূপ-সাধন প্রণালী' অবগত হইয়া তাঁহার শিক্ষানুসারে 'দিন দুনা, রাত চৌগুণা' সাধন-ভজনে কাটাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন, রৈদাস মীরার গুরু ছিলেন না, কিন্তু মীরার দোঁহাতে দেখা যায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন :

[ক] রৈদাস সংত মিলে সতগুরু।
[খ] গুরু মিলিয়া রৈদাস জী দীনহী জ্ঞান কি গুটকা।
[গ] মীরা নে গোবিংদ মিল্যা জী,
গুরু মিলিয়া রৈদাস।

কাজেই রৈদাস যে মীরার গুরু ছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

গুরুর উপদেশ লাভ করিয়া অধিকাংশ সময়ই মীরা সাধন-ভজনে কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে সংসারে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল, এবং একমাত্র গিরিধারীর সেবাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও ব্রত হইয়া উঠিল। আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল ও তিনি 'হিন্দুরাণী-সুরজ' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে অনেক সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; এবং মীরা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদিগের সেবা করিতেন ও তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্মালাপে রত থাকিতেন। রাণা বিক্রমাদিত্য রাজ-কুলবধূর এবংবিধ ব্যবহার অনুমোদন করিতেন না। তিনি সাধুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে মীরাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু মীরা দেবরের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। নিরুপায় হইয়া রাণা চম্পা ও চমেলী নামে দুইটি সুচতুর স্ত্রীলোককে মীরার তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করেন ও যাহাতে মীরা সাধুসন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশিতে না পারেন তদনুযায়ী, এবং মীরাকে রাণার মতানুবর্ত্তিনী করিবার চেষ্টা করিতে, তাহাদিগকে উপদেশ দেন। চম্পা ও চমেলী মীরাকে অনেক প্রকারে বুঝাইতে থাকেন যে, রাজকুমারী ও রাজকুলবধূ হইয়া তাঁহার সাধারণ লোকের সহিত মেশামেশি করা অনুচিত, ইহাতে কুলমর্য্যাদা নষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ রাণা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু মীরা উত্তরে বলেন, "আমার মন এখন গিরিধরলালেই তন্ময়, আমার আর কুলমর্য্যাদাই বা কি আর রাজত্বই বা কি?" তিনি তাহাদিগকে আরও বলেন :

সীসোদ্যা রুঠ্যো তো ম্হারো কাঁই করলেসী।
... ...
হরি রূঠ্যা কুমহলাস্যা হো মাঈ।

অর্থাৎ, রাণা রুষ্ট হইয়া আমার কি করিবেন? কিন্তু হরি যদি আমার উপর রুষ্ট হন তাহা হইলে আমার কি দশা হইবে! আশ্চর্য্যের বিষয়, মীরার এই সব কথা শুনিতে শুনিতে সঙ্গ-গুণে কিছুদিন পরে চম্পা ও চমেলীর মধ্যেও ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ পায় ও তাহারা মীরার ভজনের সহায়তা করিতে থাকে। রাণা এই সংবাদ শুনিয়া আরও ক্রুদ্ধ হন এবং মীরার সাধন-ভজনের বাধা জন্মাইতে থাকেন। কিন্তু, মীরাকে তিনি কিছুতেই সাধুসঙ্গ হইতে বিরত করিতে পারিলেন না। এদিকে প্রকাশ্য ভাবে সাধুসঙ্গ করার ফলে চিতৌড়ে মীরার নামে কেহ কেহ কুৎসা রটনা করিতেও বিরত হয় নাই। তাহাতে রাণা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া মীরাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

রাণার ভগিনী উদাবাঈ, রাণার এই সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন ও নিজেই মীরার মতিগতি ফিরাইবার ভার গ্রহণ করেন। উদাবাঈ মীরার মহলে গিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, তোমার বর্ত্তমান আচরণে সমস্ত সহরময় তোমার নিন্দা হইতেছে; তুমি রাজ-কুলবধূ, তুমি তোমার মর্য্যাদানুরূপ আচার ব্যবহার কর। মীরা উত্তর দেন :

সাধু মাতা-পিতা কুল মেরে, সজন সনেহী জ্ঞানী।
সন্ত চরণ কী সরণ রৈণ দিন, সদা কহত হুঁ বাণী।
রাণাকো সমঝারো জায়ো, মৈঁ তো বাত ন মানী।
মীরা কে প্রভু গিরধর নাগর সন্তোঁ। হাত বিকানী।

উদাবাঈ এবংবিধ উত্তর পাইয়াও আশা ত্যাগ করিলেন না, মীরার সঙ্গে থাকিতে থাকিতে উদাবাঈও ক্রমে মীরার পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও মীরার প্রতি বিদ্বেষ-ভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভজনে যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। মীরার শাশুড়ীও নানা প্রকারে মীরাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; পরন্তু, এই সমস্ত বিরুদ্ধ ব্যবহারে মীরার ভজন ও সাধুসঙ্গে অনুরাগ আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

রাণা এই সমস্ত সংবাদে আশ্চর্য্য হইলেন ও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মীরাকে হত্যা করিবার জন্য স্থির-সঙ্কল্প হইয়া ভগবানের চরণামৃত বলিয়া, দয়ারাম পাণ্ডাদ্বারা, মীরার নিকট একটি স্বুবর্ণ-পাত্রে বিষ প্রেরণ করেন। উদাবাঈ রাণার এই উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন ও মীরাকে সতর্ক করিয়া ঐ চরণামৃত পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, মীরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, যে-বস্তু ভগবচ্চরণামৃত বলিয়া আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করা ভক্তির বিরুদ্ধ-রীতি। এই কথা বলিয়া মীরা ভক্তিসহকারে ঐ পাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সমস্ত বিষ পান করিয়া ফেলেন। কেহ কেহ বলেন, এই বিষ ভক্ষণে মীরার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন, এই বিষ মীরার দেহে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল ও এই সময় হইতে মীরা সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। বিষভক্ষণে যে মীরার মৃত্যু হয় নাই তাহা মীরার স্বরচিত দোঁহাতেই পাওয়া যায় :

[ক]　বিষ রা প্যালা রাণোজী ভেজ্যা, দীজো মেড়তনী হাথ।
　　কর চরণামৃত পীগঈ, ম্হার সবল ধনী কা সাথ॥
　　বিষ কো প্যালো পীগঈ ভজন করে উস ঠোর।
　　থাঁরী মারী না মরু, ম্হারী রাখনহারো উর॥
[খ]　জহর কা প্যালা রাণা ভেজ্যো, অমৃত দীন্হ বনায়।
　　ন্হায় ধোয় জব পীরণ লাগী, হো অমর আঁচায়॥

উদাবাঈ মীরার এই অলৌকিক শক্তি ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে থাকেন। একদিন মীরা ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া স্বরচিত পদকীর্ত্তন করিতেছিলেন ; উদাবাঈ সেই কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ মীরাকে গুরুপদে বরণ করিলেন ও মীরার উপদেশ গ্রহণ করিয়া মীরার সহিত সাধনভজন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আর একদিন উদাবাঈ অত্যন্ত ভক্তিসহকারে মীরাকে বলেন, "তুমি আমাকে একবার গিরিধারীলাল প্রত্যক্ষ দর্শন করাইয়া দাও।" মীরা এই পবিত্র সঙ্কল্পের আন্তরিকতা বুঝিতে পারিয়া চম্পা, চমেলী প্রভৃতি সখীদিগকে লইয়া গিরিধারীলালের ভোগের নিমিত্ত নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ভোগাদি প্রস্তুত হইলে, তাহা লইয়া চম্পা, চমেলী প্রভৃতি ভক্তিমতী সখীগণ ও উদাবাঈ-এর সহিত বসিয়া, মীরা বিরহ ও প্রেমবিষয়ক পদরচনা করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভজন করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে মীরার বিরহ ও ব্যাকুলতা যখন চরম সীমায় পৌছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মীরার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন ও মীরার গলা ধরিয়া বলিলেন, "তুমি কেন এত অধীর হইতেছ ?" এবং সকলের সমক্ষে মীরার সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। সতর্ক প্রহরীগণ মীরার গৃহে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাণাকে জাগরিত করিয়া সংবাদ দিল যে, মীরার গৃহে কোন পুরুষ আসিয়াছে ও মীরার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে। রাণা এই সংবাদে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মুক্ত তরবারিহস্তে ছুটিয়া গিয়া মীরার মহলে প্রবেশ করিলেন ও চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া কোন পুরুষ দেখিতে না পাইয়া মীরাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। মীরা বলিলেন, "আমার পরম বন্ধু গিরিধরলাল ত তোমার সমক্ষেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?" রাণা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কয়েকজন স্ত্রীলোক ভিন্ন অপর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কিছুকাল পরে রাণার দৃষ্টি হঠাৎ গৃহস্থিত পালঙ্কের উপর পড়িল ও শয্যার উপর এক বিরাট পুরুষ দেখিয়া তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া রাণা মীরাকে বলিলেন, "তুমি আমাদিগের কুলদেবতা একলিঙ্গের ভজনা কর না কেন ? তোমার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি দেখিলে প্রাণে আতঙ্ক হয়।" এই বলিয়া রাণা সভয়ে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই আলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াও রাণা মীরাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। একদিন একটি ঝাঁপির ভিতরে কয়েকটি বিষধর সর্প বন্দী করিয়া ভগবানের পূজার নিমিত্ত ফুল ও মালা বলিয়া রাণা মীরার নিকট প্রেরণ

করেন। মীরা ভগবৎ কৃপায় রাণার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াও ভক্তিসহকারে ঐ ঝাঁপি গ্রহণ করিলেন ও সকলের সমক্ষে ঝাঁপি খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে একটি শালগ্রাম ও সুগন্ধি ফুলের মালা রহিয়াছে। এক সময় রাণা মীরার শুইবার নিমিত্ত লৌহকণ্টক-যুক্ত একখানি খাট প্রেরণ করেন। মীরা অণুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া সেই লৌহ-কণ্টকের উপর শয়ন করিতেন। যিনি মীরার জন্য বিষকে অমৃত ও সর্পকে পুষ্প-মাল্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, তিনিই মীরার জন্য লৌহ কণ্টককে কোমল পুষ্প-শয্যায় পরিণত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। মীরা তাঁহার দোহাতে এই কণ্টক-শয্যার উল্লেখ করিয়াছেন :

শূল সেজ রাণা নে ভেজী দীজ্যো মীরা সুলায়।
সাঁঝ ভঈ মীরা সোবন লাগী, মানো ফুল বিছায়॥

সত্য যুগে ভগবান যে ভাবে ভক্ত প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, দেখা যায় কলিযুগেও তিনি ঠিক সেই ভাবেই ভক্ত মীরাকে রাণা বিক্রমাদিত্যের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছেন। মীরা রাণার অমানুষিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াও, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করেন নাই; কারণ তিনি প্রত্যেক দুঃখের সময়ই ভগবানের অনুগ্রহ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন; ও দুঃখকে সুখ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তিনি তাই নিজেই বলিয়াছেন, "দুঃখ জহাঁ তঁহ পীর।" অর্থাৎ যেখানেই দুঃখ সেখানেই ভগবান। মীরার এই উক্তি পাঠ করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর উক্তি মনে পড়ে। কুন্তী বলিয়াছেন, 'যখনই আমরা বিপদে পড়িয়াছি তখনই তোমার দর্শন পাইয়াছি; অতএব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, যেন সর্ব্বদাই আমাদের বিপদ উপস্থিত হয় ও তোমার পুনর্জ্জন্মহারী দর্শন পাই :'—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদগুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদ পুনর্ভবদর্শনম্॥

রাণার দুর্ব্যবহারে ও অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া মীরা চিতৌড় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। মীরার জ্যেষ্ঠতাত বীরম দেবজী মীরার অবস্থা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন ও মীরাকে চিতৌড় হইতে মেড়তায় আনিয়া পরম আদর ও যত্নে রাখেন। কিন্তু সেখানেও তিনি স্বাধীন ভাবে সাধুসঙ্গ করিতে না পারায়, অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাসনা করেন। অপর পক্ষে, মীরা চিতৌড় পরিত্যাগ করার পর হইতে চিতৌড়ে নানাবিধ বিপদ উপস্থিত হইতে লাগিল। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শা চিতৌড় আক্রমণ করিয়া দুইবার লুণ্ঠন করেন; রাণা বিক্রমাদিত্য বুঁদি পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। চিতৌড় বাহাদুর শার আক্রমণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও পৃথ্বীরাজের জারজ পুত্র বনবীর এই অবসরে বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করিয়া স্বয়ং মেবারের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। এদিকে যোধপুরের রাব মালদেবজী মীরার জ্যেষ্ঠতাত বীরম দেবজীর নিকট হইতে মেড়তা কাড়িয়া লন। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল, উভয় পক্ষের এই প্রকার অবস্থা-বিপর্যয় দেখিয়া মীরা তীর্থপর্যাটনে বহির্গত হন।

তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে মীরা বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন ও সেখানে সাধুসঙ্গ করিতে থাকেন। কথিত আছে, শ্রীজীবগোস্বামী এই সময় বৃন্দাবনে ছিলেন। মীরা তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাকে বাটীর ভিতর হইতে বলিয়া পাঠান যে, তিনি কোন স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। মীরা এই কথা শুনিয়া উত্তর পাঠান—"শুনিয়াছিলাম, বৃন্দাবনে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর সকলেই তাঁহার সখী; আর জানিলাম এখানে শ্রীকৃষ্ণের একজন ভাগীদার আছেন।" এই প্রেম-পূর্ণ উত্তর শুনিয়া শ্রীজীব গোস্বামী লজ্জিত হইয়া দ্রুতগতি বাহিরে আসিয়া মীরাকে আদরের সহিত বাড়ীর ভিতর লইয়া যান ও তাঁহার সহিত আলাপ করেন। কিছু কাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া মীরা দ্বারকা গমন করেন ও সেখানে ভগবান রঞ্ছোড়জীর দর্শন, সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায় নিরত থাকিয়া স্বাধীন-ভাবে সাধন-ভজন করিতে থাকেন।

"রঞ্ছোড়জী" নামটি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধপরিত্যাগ করিয়া (রণছোড়কে) সপরিবারে দ্বারকা গমন করেন; এই জন্য ভগবানের এক নাম "রঞ্ছোড়" (রণছোড়)। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা এই "রঞ্ছোড়জী" নামেই দ্বারকায় ভগবানের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বারকার এই "রঞ্ছোড়জী" বিগ্রহ এখন আহমদাবাদের নিকটবর্ত্তী খেড়া জেলার অন্তর্গত ডাকোরে বিদ্যমান আছেন। গুজরাট অঞ্চলে রঞ্ছোড়জীর যে সমস্ত ভজনসঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা হইতে ভগবানের দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া

ডাকোরে আগমনের একটি বিবরণ পাওয়া যায়। ভগবান তাঁহার এক পরম ভক্তকে অনুগৃহীত করিবার জন্য তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন: "তুমি আমাকে ডাকোরে লইয়া গিয়া আমার সেবা কর; দ্বারকার পূজারীগণ তোমাকে বিগ্রহ দিতে অস্বীকার করিলে তুমি তাহাদিগকে আমার সমান ওজনের স্বর্ণ দিতে স্বীকার করিও, আমি ওজনে অর্দ্ধ রতিরও কম হইব, তুমি সেই পরিমাণ স্বর্ণ সঙ্গে লইয়া যাইও।" স্বপ্নাদেশ অনুসারে দ্বারকায় আসিয়া পূজারীগণের নিকট রণ্ছোড়জীর মূর্ত্তি প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহারা বিগ্রহ দিতে অস্বীকার করেন। ভক্ত তাঁহাদিগকে বিগ্রহের সমান ওজনের স্বর্ণ দিতে অঙ্গীকার করিলে পূজারীগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া ঐ বিগ্রহটি ভক্তকে দিতে স্বীকার করিয়া ঐ মূর্ত্তিকে তুলাদণ্ডের একদিকে স্থাপন করেন। মূর্ত্তিটি অর্দ্ধরতি স্বর্ণ অপেক্ষাও লঘু হওয়ায় পূজারীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অর্দ্ধরতি পরিমাণ স্বর্ণ লইয়াই বিগ্রহটি ঐ ভক্তকে অর্পণ করেন; তিনি উহা ডাকোরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এদিকে চিতৌড়ের নানা দুর্ঘটনার পরে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে, বিক্রমাদিত্যজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয় সিংহজী রণবীরকে পরাস্ত করিয়া পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া মহারাণা-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার তিন বৎসর পরে রাব বীরম দেবজীও স্বকীয় রাজ্য মেড়তা পুনরায় অধিকার করেন, কিন্তু মেড়তা-বিজয়ের দুই মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাব জয়মল্লজী মেড়তার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে চিতৌর ও মেড়তা উভয় পক্ষ হইতেই মীরাকে দ্বারকা হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু মীরা দ্বারকা ছাড়িয়া চিতৌড় বা মেড়তায় যাইতে অস্বীকার করেন। দ্বারকাক্ষেত্রে ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে মীরা স্বর্গারোহণ করেন।

মীরার দেহান্ত সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। মীরা চিতৌড় হইতে চলিয়া যাইবার পর সেখানে নানাবিধ দুর্ঘটনা ঘটে। তাহাতে কেহ কেহ রাণাকে বলেন যে, ভগবদ্ভক্ত মীরা দেশ হইতে বিদায় লওয়াতেই দেশের এই অবস্থা; যেখানে ভগবদ্ভক্ত বাস করেন, সেখানে কোন বিপদ হইতে পারে না। এই সমস্ত কথা শুনিয়া রাণা মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মীরাকে আনিবার জন্য একজন সং ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় পাঠান। কিন্তু মীরা দ্বারকা ছাড়িয়া আসিতে অস্বীকার করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ এই বলিয়া "ধরণা" দিয়া পড়েন যে, যে পর্য্যন্ত মীরা চিতৌড় না যাইবেন সে পর্য্যন্ত তিনি অন্ন-জল গ্রহণ করিবেন না। ব্রাহ্মণের এই অবস্থা দেখিয়া মীরা দুঃখিত ও দয়ার্দ্র হইয়া বলেন: "আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ভগবান রণ্ছোড়জীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসি।" আরাধ্য দেবতা রণ্ছোড়জীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে এই চিন্তায় অধীর হইয়া মীরা ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করেন ও ভাবে তন্ময় হইয়া স্বরচিত পদ কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলের সমক্ষে রণ্ছোড়জীর মূর্ত্তিতে লীন হইয়া যান। চিহ্নস্বরূপ তাঁহার বস্ত্রের এক অংশ মাত্র রণ্ছোড়জীর মুখে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন, মীরাবাঈ পূর্ব্বজন্মে শ্রীকৃষ্ণের সখী ছিলেন এবং তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান তাঁহাকে এই বলিয়া বর দেন যে, "কলিযুগে আমি নিজ রূপেই তোমার স্বামী হইব।" বঙ্গদেশে যেমন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার ভাবাবেশের কতকগুলি উক্তিকে পূর্ব্বাবতারের প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করেন, পশ্চিমাঞ্চলেও সেইরূপ মীরাবাঈ-এর ভাবাবেশের উক্তিগুলিকে অনেকে পূর্ব্বজন্মের দ্যোতক বলিয়া মনে করেন। মীরার এবংবিধ উক্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেওয়া হইল:

> মীরা কহে প্রভু কবরে মিলোগে
> পূর্ব্ব জনম কে সাথা।

অর্থাৎ, হে প্রভু, তুমি আমার পূর্ব্বজন্মের সাথা; তোমার সহিত আমার কবে পুনরায় মিলন হইবে!

> মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
> পূরব জনম কা হৈ কৌল।

অর্থাৎ, পূর্ব্বজন্মের প্রতিশ্রুতি অনুসারেই গিরিধারী নাগর মীরার প্রভু।

> সখী রী লাজ বৈরন ভঈ,
> শ্রীলাল গোপালকে সংগ কাহে নাহীঁ গঈ।
> কঠিন ক্রুর অক্রুর আয়ো সাজী রথ, কহ নঈ।

অর্থাৎ, হে সখি, ক্রুর অক্রুর যখন রথ সাজাইয়া গোপালকে কোথায় লইয়া যাইবার জন্য আসিল, তখন লজ্জাই

আমার শত্রু হইল; আমি কেন তখন গোপালের সঙ্গে গেলাম না!

মীরার "ক্রুর অক্রুর" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীদিগের উক্তি মনে পড়ে :

ক্রুরস্ত্বমক্রুরসমাখ্যয়া স্ম………

পশ্চিমদেশে, বিশেষতঃ রাজপুতানা অঞ্চলে, ভাট বা চারণদিগের মুখে এখনও বহু পুরাতন ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ঘটনা মুখে মুখে বিবৃত হইতে হইতে কালে বিকৃত, বিপরীত আকারও ধারণ করিয়াছে। মীরাবাঈ সম্বন্ধেও এবংবিধ অনেকগুলি ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি লিপিবদ্ধও হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে গেলে তাহাদিগের অনেকগুলিই ভিত্তিহীন ও সামঞ্জস্যবিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। এইরূপ কয়েকটি প্রবাদ নিম্নে আলোচিত হইল।

প্রথমতঃ, কেহ কেহ বলেন, রাণা কুম্ভজীর সহিত মীরার বিবাহ হয়। মীরা গিরিধারীলালকে সঙ্গে না লইয়া বিবাহসভায় যাইতে অস্বীকার করেন, প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণনাও এই বিবাহসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। চিতৌড়ে কুম্ভস্বামী ও আদিবরাহের দুইটি মন্দির প্রস্তত হইয়াছিল। একটি বৃহদাকার, অপরটি ক্ষুদ্রায়তন। কেহ কেহ বলেন, বৃহৎ মন্দিরটি রাণা কুম্ভজী কর্ত্তৃক ও ক্ষুদ্র মন্দিরটি তাঁহার স্ত্রী মীরাবাঈ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। টড সাহেব এই সমস্ত জনশ্রুতি-মূলে মীরাকে কুম্ভজীর রাণী বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন ও পরবর্ত্তী অনেক লেখক টড সাহেবের উক্তিকে অবলম্বন করিয়া মীরাকে রাণা কুম্ভের রাণী বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, এই কিংবদন্তীটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কারণ মীরা যে মেড়তার রাজকুমারী ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত রাব্ দুদাজী ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া মেড়তা অধিকার করিয়া নবরাজ্য স্থাপন করেন। দুদাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরম দেবজী ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মীরাবাঈ বীরম দেবজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে মহারাণা কুম্ভের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ কুম্ভজীর মৃত্যুর নয় বৎসর পরে মীরার জ্যেষ্ঠতাত বীরম দেবজীর জন্ম হয় ও কুম্ভজীর মৃত্যুর ৩০ বৎসর পরে মীরার জন্ম হয়। কাজেই মীরা রাণা কুম্ভজীর স্ত্রী, এই প্রবাদটি সম্পূর্ণই অমূলক। মাড়বার, মেড়তা ও মেবারে যে সমস্ত প্রাচীন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে পরিষ্কারই প্রমাণ পাওয়া যায়, মহারাণা সংগাজীর পুত্র যুবরাজ ভোজরাজের সহিতই মীরার বিবাহ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কাহারও কাহারও মতে মীরার দেবর রাণা বিক্রমাদিত্যের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মীরা গোস্বামী তুলসীদাসকে পত্র প্রেরণ করেন ও তুলসীদাসও সেই পত্রের উত্তর দেন। উভয়ের মধ্যে এই পত্রব্যবহার সম্বন্ধে দোঁহাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহরূপেই প্রতিপন্ন হয় যে, এবংবিধ পত্রব্যবহার আদৌ সম্ভব নয়। কারণ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ, বিক্রমাদিত্য রাণা-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার এক বৎসর পরে) তুলসীদাসের জন্ম হয়। কাজেই মীরার প্রতি রাণার অত্যাচারকালে তুলসীদাস বালক ছিলেন মাত্র, তাঁহার ধর্ম্মজীবন তখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। মীরার মৃত্যুকালে (১৫৪৭ খৃষ্টাব্দ) তুলসীদাসের বয়ঃক্রম মাত্র ১৪ বৎসর ছিল। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তুলসীদাসের সহিত মীরার পত্রব্যবহার সম্বন্ধে প্রবাদটিও সম্পূর্ণ অলীক।

তৃতীয়তঃ, মীরার ভক্তি ও প্রেমের কথা যখন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন সম্রাট আকবর তানসেনকে সঙ্গে লইয়া মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন ও মীরা আকবরের সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে ও তানসেনের সহিত রাগরাগিণী সম্বন্ধে যেভাবে আলাপ করিয়াছিলেন তাহাতে উভয়েই বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই প্রবাদটিও পূর্ব্ব প্রবাদগুলির ন্যায়ই অমূলক। কারণ, আকবর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন। মীরার মৃত্যুকালে (১৫৪৭ খৃষ্টাব্দ) আকবর পঞ্চম বর্ষীয় বালকমাত্র; তখন পর্য্যন্ত তিনি সম্রাট হন নাই। কাজেই, সম্রাট আকবরের মীরার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহাকেও সত্য বলা চলে না।

মীরা সম্বন্ধে যাঁহারা পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে পূর্ব্ববর্ণিত প্রবাদগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি "ভক্তমাল"-প্রণেতা নাভাজীও তুলসীদাস ও আকবর-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীকে সত্য ঘটনা বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রজীও এই ঘটনাগুলিকে সত্য ধরিয়া লইয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া মীরার মৃত্যুকাল সং ১৬২০ (১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ) হইতে সং ১৬৩০-(১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ)-এর মধ্যে অনুমান করিয়াছেন। কোন কোন লেখক মীরার জন্ম সং ১৬৭৫ (১৬১৯ খৃষ্টাব্দ) সাব্যস্ত করিয়াছেন ও তাঁহাকে রাঠোর সরদার জৈমলের কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিচার করিলে ইহার কোনটিই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

মীরার দোঁহা বলিয়া যে সমস্ত বাণী প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত দোঁহাও আছে। নিজের অভিমত জ্ঞাপন অথবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত স্বার্থপর ব্যক্তির দ্বারাই এবংবিধ দোঁহা রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। দোঁহাগুলির রচনাভঙ্গী এরূপ যে তাহা দেখিয়া নিঃসন্দেহে বলা যায় না উহা মীরার স্বরচিত কি না। তবে, যেগুলির তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য নাই সেগুলিকে নিঃসন্দেহেই প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে।

কোন কোন দোঁহাতে মীরার স্বামীকে মহারাণা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ও মীরাকে পতি-হন্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ; এবং মীরার স্বামীর সহিত সদ্ভাব ছিল না, স্বামীর প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ও বিরুদ্ধ ভাব ছিল ও তাঁহার স্বামী তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেন, ইত্যাদি নানাবিধ কুৎসা মীরার নামের দোঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। মীরার স্বামী ভোজরাজ যুবরাজ অবস্থাতেই দেহত্যাগ করেন ; কাজেই তাঁহাকে মহারাণা বলিয়া বর্ণনা করাও ভুল। যখন একদিকে মীরার ভক্তিপ্রবণতার ও অপরদিকে রাণা বিক্রমাদিত্যের অত্যাচারের কাহিনী চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন, প্রজাদিগের মনে মীরার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মাইবার জন্য রাণা কয়েকজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নানাবিধ কুৎসাপূর্ণ দোঁহা মীরার নাম দিয়া রচনা করাইয়া সাধারণের ভিতরে প্রচার করিয়াছিলেন। সম্প্রদায়বিশেষ মীরাকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার উদ্দেশেও মীরার নামে দোঁহা প্রস্তুত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কেহ কেহ বলেন, মীরা চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। ইহার একই মাত্র কারণ, বোধ হয়, প্রচলিত একটি দোঁহা। দোঁহাটির শেষভাগে দেখা যায়—"গৌর কৃষ্ণকী দাসী মীরা।" এই দোঁহাটিকে প্রক্ষিপ্ত না বলিয়া পারা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, "মীরা কহে বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা" ভণিতাযুক্ত যে দোঁহাটি এদেশে মীরার বাণী বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা মীরার রচিত নয়, উহা তুলসীদাসের বলিয়া মনে হয়। মীরা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে বহু অনুসন্ধান চলিতেছে ; আশা করা যায়, এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে মীরার জীবনের অনেক প্রকৃত তথ্য জানা যাইবে ও সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভুল ধারণাও দূরীভূত হইবে।

সং ১৬১৩ (১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসে যোধপুরের রাও মালদেবজী পূর্ব্ব ঈর্ষাবশতঃ মেড়তার যাবতীয় রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করেন, কেবল ভগবান চতুর্ভুজীর মন্দির ও রাজপ্রাসাদের কিয়দংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে ; এই অংশ অদ্যাবধি সুরক্ষিত আছে। এই অংশে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন প্রকোষ্ঠ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাই মীরার ভজন-মন্দির এবং মীরার মাহাত্ম্য-প্রভাবেই মালদেবজী রাজপ্রাসাদের এই অংশ ধ্বংস করিতে সক্ষম হন নাই। প্রত্যুতঃ, এই কিংবদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হিন্দি, গুজরাটী, রাজপুতনা, ব্রজভাষা ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় মীরার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার রচিত পদগুলিতে এই সমস্ত ভাষার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি "নরসী জী কী মায়রা", "রাগগোবিন্দ", "গীতগোবিন্দ কী টীকা" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত দোঁহাগুলি সরল ও সুললিত ; তন্মধ্যে বিরহ-সম্বন্ধীয় পদগুলি যেমন মর্ম্মস্পর্শী তেমনই ভাবোদ্দীপক। প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ পদগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যে সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী প্রচলিত আছে, মীরার পদাবলী তাহা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়। বরং কতকগুলি পদে নূতন ভাবের যোজনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পদগুলির আলোচনা ও তুলনা করা এস্থলে সম্ভব নয় ; নিম্নে কয়েকটি মাত্র পদাংশের উল্লেখ করিলাম।

বিরহের অবস্থায় পত্র লিখিয়া দূরস্থ প্রিয়ের সংবাদ লইবার প্রবৃত্তিটা স্বাভাবিক। মীরার প্রাণেও এই ভাবের উদয় হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার পত্র লেখা ঘটে নাই, কারণ তিনি বলিতেছেন :

পতিয়াঁ মৈঁ কৈসে লিখূঁ, লিখিহি ন জাঈ ॥
কলম ভরত মেরে কর কংপত, হিরদো রহো থর্রাঈ ॥
বাত কহূঁ মোহিঁ বাত ন আবৈ, নৈন রহে ঝর্রাঈ ॥

অর্থাৎ, পত্র কেমন করিয়া লিখিব, লেখা ত যায় না; কলম ডুবাইতেই হাত কাঁপিতেছে, বুক ধড়ফড় করিতেছে, কি কথা লিখিব কিছুই মনে আসিতেছে না, চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিতেছে। মীরা বিরহের অবস্থায় পত্র লেখাসম্বন্ধে এই উক্তি করিয়াছেন। আবার চিরমিলনের অবস্থায় বলিয়াছেন :

[ক] জিন কে পিয় পরদেশ বসত হৈঁ, লিখি লিখি ভেজেঁ পাতী।
মেরে পিয় মো মাহিঁ বসত হৈঁ, কহূঁ ন আতীজাতী ॥

[খ] ঊরাঁ কে পিয় বার দেস বসত হৈঁ, লিখ লিখ ভেজে পাতী।
মেরা পিয়া মেরে রিদে বসত হৈ গূঁজ করূঁ দিন রাতী।

অর্থাৎ, যাহার প্রিয়জন বিদেশে বাস করে, সে পত্র লিখিয়া তাহার সংবাদ আনয়ন করে; কিন্তু আমার প্রিয় আমার হৃদয়ের মধ্যেই বাস করিয়া দিবা-রাত্রি গুঞ্জন করিতেছে, কোথায় যায়ও না, আসেও না; কাজেই পত্র লিখিব কাহাকে? দুই ভাবের দোঁহাতে মীরা তাঁহার সাধনার ক্রমোন্নতি অতি সুন্দরভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। বিরহের অবস্থায় মীরার প্রতীক্ষাসূচক পদগুলি মর্ম্মস্পর্শী :

[ক] রঙ্গ সেজিয়া বহু রংগকী বহু ফুল বিছায়ে হো
পংথ মৈঁ জোহোঁ শ্যামকা অজহুঁ নহি আয়ে হো।

অর্থাৎ, বহু রং-এর ফুল বিছাইয়া শয্যা-রচনা করিয়া শ্যামের পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছি : কিন্তু, আমার শ্যাম এখনও আসিল না।

[খ] তারা গিণ গিণ রৈণ বিহানী।

অর্থাৎ, প্রিয়তমের অপেক্ষায় বসিয়া নক্ষত্র গণিয়াই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

[গ] গিণতে গিণতে ঘিস গঈরে, মেরী উঁগলিয়োঁ কী রেখ।
[ঘ] গিণতে গিণতে ঘিস গঈঁ উঁগলী, ঘিস গই উঁগলী কী রেখ।

অর্থাৎ, তুমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে; সেই সময় হইতে তোমার অপেক্ষায় দিন গণিতে গণিতে আমার অঙ্গুলি ও অঙ্গুলির রেখা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই ভাবের পদ অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বিরহ-বেদনা স্বয়ং অনুভব করিয়া সেই ভাবের বশে মীরার মুখ হইতে যে সমস্ত বাণী বহির্গত হইয়াছে, তাহার সহিত কবির কল্পিত বিরহের অভিব্যক্তির তুলনা করা চলে না।

মীরার আরতির বর্ণনাও অতি চমৎকার :

য়া তন কো দিবলা করূঁ, মনসা কী বাতী হো।
তেল জলাউঁ প্রেম কো বল্ দিন রাতী হো ॥

অর্থাৎ, আমি এই দেহকে প্রদীপ ও মনকে সলিতা করিয়া প্রেমের তৈল জ্বালিয়া ভগবানের আরতি করিব।

তাঁহার আত্ম-নিবেদন ও প্রার্থনা কতকগুলি সুমধুর দোঁহায় লিপিবদ্ধ আছে : তন্মধ্যে একটি পদাংশ উল্লেখ করিলাম :

পত্থর কী তো অহিল্যা তারী, বন কে বীচ পড়ী।
কহা বোঝ মীরা মেঁ কহিয়ে, সৌ উপর এক ধড়ী ॥

অর্থাৎ, অহল্যা পাথর হইয়া জঙ্গলে পড়িয়া ছিল, তুমি সেখানে গিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলে; আর মীরাই কি তোমার এত বড় বোঝা যে সে 'পাল্লার উপর পাঁচ সের?'

কাম, ক্রোধ ও লোভকে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব; তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

মীরাবাঈও অতি সুন্দর ভাবেই ভগবদ্বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :

কাম কূকর লোভ ডরী, বাঁধি মোহিঁ চংডাল।
ক্রোধ কসাই রহত ঘটমেঁ কৈসে মিলৈ গোপাল ॥
বিলার বিষয়া লালচী রে, তাহি ভোজন দেত।
দীন হীন হ্বৈ ছুধা রত সে, রাম নাম ন লেত ॥

সদ্‌গুরুর কৃপায় সাধন-প্রভাবে মীরা কামাদি বৃত্তির অতীত হইয়াছিলেন এবং তিনি সাধনার অন্তরায় নিদ্রাকেও যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার অন্য দোঁহাতে পাওয়া যায় :

[ক] জ্যাঁরে হিরদে হরি বকে, ত্যাঁ কূঁ নীঁদ ন আরে

অর্থাৎ, যাহার হৃদয়ে হরি বাস করেন তাহার নিদ্রা আসে না।

[খ] ঊর সখী পিউ সূত গমায়ে, মৈঁ জু সখী পিউ জাগি গমায়ে

অর্থাৎ, অন্যান্য সখীগণ প্রিয়ের সহিত ঘুমাইয়া রাত্রি কাটায়, কিন্তু সখি, আমি আমার প্রিয়ের সহিত জাগিয়াই থাকি, ঘুমাই না।

মীরা ভগবানকে পাইয়াও কেন না-ঘুমাইয়া জাগিয়া থাকিতেন, তাহার কারণ তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন :

ইন নৈনন মেরা সাহিব বসতা
ডরতী পলক ন নাউঁ রী।

অর্থাৎ, আমার স্বামী আমার নয়নে বাস করেন। পলক ফেলিলে পাছে আর তাঁহাকে দেখিতে না পাই, এই ভয়ে আমি চক্ষু বুঁজি না, জাগিয়াই থাকি। শ্যামাবিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতে ঠিক এই ভাবটি পাওয়া যায় :

আমি ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখি।
নয়ন মুদিলে পাছে তারা-হারা হ'য়ে থাকি॥
এক দিন ঘুমায়েছিলাম,
স্বপ্নে তারা হারাইলাম,
আমি ঐ ভয়ে মা তারা, তোমায় নয়নে নয়নে রাখি॥

সাধন-পথের পথিক হইতে হইলে যেমন কাম-লোভাদি দেহজ স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে দমন করিতে হয়, সেইরূপই ঘৃণা, লজ্জা, কুল, মান, অপমান প্রভৃতি কাল্পনিক সংস্কার-গুলিরও মূলোচ্ছেদ করিতে হয়। মীরা এই সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করিয়া অষ্টপাশমুক্ত হইয়াই জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :

লাজ সরম কুল কী মরজাদা, সীর সে দূর করী।
মান অপমান দোউ ধর পটকে, নিবসী হঁ জ্ঞান গলী॥

মীরা তাঁহার স্বরচিত দোঁহাতে তাঁহার সাধনপ্রণালী-সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত ইঙ্গিতের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করা, এমন কি অনুমান করাও যায় না। মীরা সাধু রৈদাসের নিকট হইতে উপদেশ লইয়া আন্তরসাধন আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। রৈদাস ও কবীর উভয়েই রামানন্দের শিষ্য; কাজেই, কবীর* ও রৈদাসের সাধন একভাবেরই। সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে যখন প্রথমে দেহে আত্মদর্শন হয়, তখন একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়; কিন্তু এই অবস্থার অভাব হইলেই সাধকের প্রাণে একটা অসহনীয় অভাব বোধ হয়। মীরারও তাই হইয়াছিল। তিনি যখন সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন তখন বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া আনন্দ-রসে বিভোর থাকিতেন। এবং ব্যুত্থানকালে সেই অবস্থার অভাবে প্রাণে যন্ত্রণা অনুভব করিতেন; ইহাই মীরার বিরহ। সাধনার চরম সীমায় পৌঁছিয়া যখন তিনি অখণ্ড ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তখনই তাঁহার বিরহের অন্ত হইয়াছিল; তিনি নিজেই বলিয়াছেন: "মেরে পিয় মো মহিঁ বসত হৈঁ, কহুঁ ন আতি জাতী।" অর্থাৎ, আমার প্রিয় সর্ব্বদাই আমার মধ্যে রহিয়াছেন, তিনি যানও না আসেনও না; কাজেই, আমার বিরহের অবসর কোথায়?

মীরা প্রথমে তাঁহার গিরিধারীকে পরিচ্ছিন্ন দেবতাকারে ভজনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া সেই গিরিধারীকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"তুম্ প্রভু পূরণ ব্রহ্ম হো।" সাধন-সম্বন্ধে মীরার কয়েকটি ইঙ্গিত নিম্নে দেওয়া হইল :

[ক] চলো অগম কে দেস কাল দেখত ডরে।
রহ ভরা প্রেম কা হৌজ হংস কেলী করে॥

অর্থাৎ, হে মন, তুমি সেই অগম্য দেশে চল ; যমও সেই দেশ দেখিতে ভয় পায়; সেখানে প্রেমপূর্ণ সরোবরে হংস ক্রীড়া করিতেছে।—একটি ক্ষুদ্র পদে মীরা তাঁহার সাধনের গুহ্য সঙ্কেতটি বলিয়া গিয়াছেন। সাধক গোবিন্দ চৌধুরীরও এইভাবের একটি পদ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিও মীরার সেই অগম্য দেশকে একটি সরোবর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন :

তা'তে কালে জাল ফেলে না দেখিয়ে গভীর।
সাঁতারিছে তায় সদা সাধন-হংস, বাধাতার প্রেমে আছে সোহহং হংস॥

রামপ্রসাদও গাহিয়া গিয়াছেন :

কালী পদ্মবনে হংসী হ'য়ে হংস সনে করে রমণ।

[খ] বিন করতাল পখারজ বাজে অনহদ কী ঝনকার রে।
বিন সুর রাগ ছতী সূঁ গাবে রোম্ রোম্ রংগ সার রে॥

অর্থাৎ, আমার হোলীতে করতাল, পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্র অভাবেই অনাহত ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতেছে, ও সুর ও রাগ অভাবেও ওঁকারধ্বনিতে ছত্রিশ রাগিণীর আলাপ হইতেছে।

[গ] সুন মহল মেঁ সুরত জমাউঁ সুখ কী সেজ বিছাউঁ রী।

অর্থাৎ, আমি শূন্যমহলে প্রেম জমাইয়া সুখের শয্যা পাতিব।

[ঘ] সেজ সুসমনা মীরা সোবে।

অর্থাৎ, মীরা সুষুম্নাতে শয্যা করিয়া শুইবে।

* মৎপ্রণীত "কবীর-পন্থা" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য মূলতঃ ১৩৪০ সালে "বঙ্গশ্রী" মাসিক পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

মীরা যখন ভগবদ্ধ্যানে তন্ময় থাকিতেন তখন সময় সময় তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি মাতাল অবস্থায় আছেন। মীরা নিজেই নিজের এই অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন :

ঔর সখী মদ পী পী মাতী, মৈঁ বিন্ পীয়াঁ মদ মাতী।
প্রেম ভঁঠী কো মৈঁ মদ পীয়ো, ছকী ফিরূঁ দিন রাতী॥

অর্থাৎ, অন্যান্য সখীরা মদ খাইয়া মত্ত হয়, আমি বিনা মদেই মাতাল হইয়াছি: আমি প্রেমভাটীর চোয়ান মদ খাইয়াছি। আমি দিনরাত মত্ত হইয়া ফিরিব। রামপ্রসাদও এই অবস্থায় ঠিক এইভাবেরই পদ রচনা করিয়াছিলেন :

ওরে সুরা পান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে ;
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরু দত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে
আমার জ্ঞান শুঁড়ীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে॥

গুরুর দয়ায় সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইতে মীরা বুঝিয়াছিলেন, "য়ো সংসার চহরকী বাজী"—এই সংসার মুহূর্ত্তের বাজী, নিমেষমধ্যে ইহা অন্তর্হিত হইবে, পঞ্চ মহা-ভূতেরও অস্তিত্ব থাকিবে না ; কেবল রহিবেন একমাত্র অবিনাশী আত্মা। "বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।" মীরা বলিয়া গিয়াছেন :

চংদা জায়গা সুরজ জায়গা জায়গা ধরণ অকাসী।
পবন পানী দোনোঁ হী জায়ংগে, অটল রহে অবিনাশী॥

মীরা বাঈ-এর গানগুলি বাংলা দেশে যে ভাষায় চলিয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই ভুল। নীচে একটি গানের মূল পাঠ দেওয়া হইল। এই গানটিতে ভগবানের নিকট মীরার আবদারের ভাবটি অতি মধুর। তিনি তাঁহার নিকট চাকর থাকিতে চাহিতেছেন ও বলিতেছেন :

ম্হানে চাকর রাখো জী, গিরিধারী লালা চাকর রাখো জী
চাকর রহসূঁ বাগলাগাসূঁ, নিত উঠ দরসন পাসূঁ।
বৃন্দাবন মেঁ কুংজ গলিন মেঁ, গোবিন্দ লীলা গাসূঁ॥
চাকরী মে দরসন পাউঁ সুমিরণ পাউঁ খরচী।
ভাব ভগতি জাগীরী পাউঁ, তানো বাতা সরসী॥

কবি সত্যেন্দ্রনাথ কৃত এই গানের অনুবাদটির সহিত সকলে পরিচিত হইলেও ইহার মর্ম্ম নীচে দেওয়া হইল।

অর্থাৎ, হে গিরিধারী লাল, তুমি আমাকে চাকর রাখ, আমাকে চাকর রাখ। আমি চাকর থাকিয়া বাগান তৈয়ার করিব, রোজ সকালে উঠিয়া তোমার দর্শন পাইব, ও বৃন্দাবনের গলিতে গলিতে গোবিন্দলীলা গাহিয়া বেড়াইব। চাকরীতে তোমার দর্শনত পাইবই, আবার মাহিয়ানাও পাইব তোমার ধ্যান ; ভাব ও ভক্তি জায়গীর পাইব। (তোমার কত লাভ!)

দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস

১৯৩৫ সনে ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট ঘটনাবলীর 'বার্ষিকী' অনুষ্ঠিত করিতে হইলে, কোন্ কোন সাহিত্যিকের এবং কি কি সাহিত্য-পুস্তকের ও সাহিত্যিক ঘটনার কথা মনে আসে, জন-ও-লণ্ডনস্-উইক্‌লিতে জি. কিঙ্ নামে জনৈক লেখক তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন। নীচে তাহার সারাংশ দেওয়া হইল :

সন ৩৫ খৃষ্টাব্দ : সেণ্ট পলের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

৭৩৫ খৃষ্টাব্দ : 'ইক্‌লেজিয়াষ্টিকাল হিষ্ট্রী'র প্রখ্যাত লেখক বিডের পরলোক গমন।

১১৩৫ খৃষ্টাব্দ : বিখ্যাত ইহুদী-শাস্ত্রাচার্য্য মেমনাইডিস্ (Maimonides) জন্মগ্রহণ করেন।

১২৩৫ : আর একজন খ্যাতনামা ইহুদী-শাস্ত্রাচার্য্য কিম্‌চির (Kimchi) মৃত্যু।

১৪৩৫ : ইতালীবাসী জনৈক ধর্ম্মযাজক ক্যালেপিনো (Calepino) কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাষাসমন্বিত অভিধান-প্রকাশ।

১৫৩৫ : ইউটোপিয়া-(Utopia)-লেখক স্যর টমাস মূরের ফাঁসী। র‍্যাবেলেয়ার গার্গাণ্টুয়া এণ্ড পাণ্টাগ্রুয়েল প্রকাশিত। মইল্‌স্ কভারডেল কৃত প্রথম সম্পূর্ণ ইংরেজী বাইবেল প্রকাশিত।

১৬৩৫ : ফ্রান্সে রিশলু কর্ত্তৃক আকাদেমি ফ্রাঁসের (Academie Francaise) উদ্বোধন।

১৭৩৫ : ইংরেজ লেখক স্যামুয়েল জনসনের বিবাহ। ঔপন্যাসিক লরেন্স ষ্টার্নের ম্যাট্রিক পাশ। ইত্যাদি।

১৮৩৫ কয়েকখানি প্রকাশিত বই :—ব্রাউনিং-এর প্যারাসেল্‌সাস ; কোল্‌রিজের টেব্‌ল-টক ; ডিস্‌রেলীর ভিণ্ডিকেশন অব দি ইংলিশ কনষ্টিটিউসন। এই সালে ডিকেন্স মর্নিং ক্রনিক্‌লের রিপোর্টারের চাকুরী করিতেছেন। ইমার্সনের দ্বিতীয়বার বিবাহ। উইলিয়ম কবেট ও ল্যাম্বের মৃত্যু। আলফ্রেড অষ্টিনের (টেনিসনের পরে 'পোয়েট-লরিয়েট' হন) জন্ম। মার্ক টোয়েন ও অ্যাণ্ড্রু কার্নেগীর জন্ম। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা দিলে, বোবা ছেলে কথা কহিতে পারে, এ কথা বলিলে আমাদের দেশে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা আমাদিগকে পাগলা-গারদে পাঠাইতে চাহিবেন। আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ কলিকাতা সহরে মূক-বধির বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও, এই সহরেই এমন অভিমত প্রকাশ করিবার লোকের অভাব হইবে না। অন্ধ বই পড়িবে মূক কথা বলিবে, এ কথা আজও কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। যাঁহারা আমাদিগের স্কুলে মূক-বধির ছেলেমেয়েদিগকে কথা বলিতে শুনিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে লজ্জা দেন এই প্রশ্ন করিয়া, মশায়, আপনারা কি দেবতা? এই ধরণের প্রশ্ন হইতে স্বতঃই মনে হয় যে, আমাদের দেশে এ বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষিতদের মধ্যেও কম। তাই তাঁহাদের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে মূক-বধির শিক্ষার প্রাথমিক আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

সাধারণতঃ মূক-বধিরকে "হাবা" বলা হয়। কথাটির অর্থ ভাল নয়: "হাবা" বলিতে সাধারণতঃ নিতান্ত বুদ্ধিহীনকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে মূক-বধির হইলেই বোকা হইতে হইবে, ইহার কোন মানে নাই।

সাধারণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির কম-বেশী থাকে, মূক-বধির ছেলেমেয়েদের মধ্যেও ঠিক সেই রকম। কাহারও সাধারণ বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, কাহারও মাঝারি, কেহ একদম নিম্ন স্তরের।

মূক-বধিরদিগকে এইরূপ হীন দৃষ্টিতে দেখার জন্য আমাদের দেশের লোকদিগকে সর্ব্বদাই দোষ দেওয়া চলে না। কারণ এখনও এ সব বিষয়ে আমাদের চোখ ফুটে নাই। পঞ্চাশ বৎসর আগে য়ুরোপ, আমেরিকাতেও মূক-বধিরদের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা ছিল। স্কুলগুলি চলিত দাতব্যখানা হিসাবে। অনেক স্কুলের নামের শেষাংশে Asylum কথাটি দেখিতে পাওয়া যাইত—Lunatic বা Leper Asylum-এর মত।

যেদিন সে দেশে মূক-বধিরদের শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক হইল, দেশের সমস্ত মূক-বধির ছেলেমেয়ে স্কুলে যাইতে বাধ্য হইল, সেদিন লোকের দেখিবার ভাবও বদলাইয়া গেল। কেহই আর মূক রহিল না, কাজেই dumb কথাটার ব্যবহার উঠিয়া গেল। তুমি মূক, এ কথা বলিলে প্রত্যেক বধিরই অসন্তুষ্ট হয়। আমাদের স্কুলেও যে ছেলেমেয়েরা পড়িতে আসে, তাহারা "বোবা, হাবা" আখ্যাগুলি সহ্য করিতে পারে না।

মূকত্ব কোন প্রকার ব্যাধি নয়। আমরা সকলেই আংশিক ভাবে মূক। আমরা যে যে ভাষা বুঝিতে পারি না, সেই সেই ভাষা সম্পর্কে আমরা মূক। সেই সেই ভাষা সম্পর্কে আমরা বধির নই, কারণ আমরা ভাষার শব্দগুলি শুনিতে পাই, কিন্তু পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই বলিয়া শব্দগুলির অর্থ বুঝি না, বা সে ভাষায় কথা বলিতে পারি না।

মূক-বধির শিশুর ব্যাধি তাহার কানে, তাহার বাক্-যন্ত্রে নয়। সে জন্মাবধি বা অতি শৈশবাবস্থা হইতে কোন শব্দ শুনিতে পায় না, কাজেই কথা বলিতেও শিখে না। কথিত ভাষা আমাদের জন্মগত অধিকার নয়, ইহা শিক্ষাসাপেক্ষ। জন্মের পর শিশু সর্ব্বদাই তাহার চারিপার্শ্বে কথিত ভাষা শুনিয়া, তাহা অনুকরণ করিয়া, কথা বলিতে শিখে। যাহার কান নাই, সে এই শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, কাজেই সে কথা বলিতে শিখে না।

কোন হিংস্র জন্তু সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া গিয়া লালন-পালন করিয়াছে, এইরূপ গল্প আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই। এইরূপক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, মানব-শিশু তাহার পশু মাতার ন্যায় স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং পশুদের ডাকের ভাষা বুঝিতে ও ডাকিতে শিখিয়াছে। তাহাকে আবার যখন মানব-সমাজে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, তখন সে ধীরে ধীরে মানুষের কথা শিখিয়াছে। বনে পাঠাইবার দরকার নাই, যদি কোন সদ্যোজাত শিশুকে গৃহে রাখিয়া, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে, কথিত ভাষার আবেষ্টনী হইতে সরাইয়া লওয়া

যায়, তাহা হইলে সেই শিশু কোন দিন কথা বলিতে শিখিবে না।

যে ভাষার মধ্যে শিশুকে রাখা যায়, সে সেই ভাষাই শিখে। মাতৃ-ভাষা বলিয়া জন্মগত কিছুই নাই। বাঙ্গালী ছেলেকে বিলাতে রাখিলে, সে ইংরেজী-ভাষা শিখিবে ও বলিবে। খাঁটি বাঙ্গালীর ছেলেকেও বাঙ্গালাদেশে থাকিয়া বাঙ্গলাভাষা শিখিতে হয়। কর্ম্মোপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী-পরিবার পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা উর্দ্দু বা হিন্দী ঠিক সেই দেশের ছেলেমেয়েদের মত সহজভাবেই বলিতে শিখে। আমরা স্কুলে যেভাবে ইংরেজী শিখি, উহা ভাষাশিক্ষার স্বাভাবিক প্রণালী নয়। আমরা ইংরেজী শিখি তর্জ্জমা করিয়া। শিশুর ভাষাশিক্ষা এইভাবে হয় না। সে ভাষা শিখে কেবল কান দিয়া শুনিয়া শুনিয়া।

শৈশবে কান নষ্ট হইয়া গেলে, শিশু উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে, মূক হইয়া যায়। যেটুকু ভাষা সে শ্রবণশক্তি নষ্ট হইবার পূর্ব্বে শিখে, তাহা ব্যবহার করিতে না পারিয়া শীঘ্রই ভুলিয়া যায়। শ্রবণশক্তি নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে সে যেটুকু ভাষা কান নষ্ট হইবার পূর্ব্বে শিখিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া যাইবে না।

অনেক ছেলেমেয়ে জন্মাবধি এত কম শুনে যে, তাহা দ্বারা সম্যকরূপে ভাষা-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ইহারা অল্প-বেশী কানে শুনে এবং যতটুকু শুনে তাহার উপর নির্ভর করিয়া অশুদ্ধভাবে কথা বলিতে শিখে। সাধারণ স্কুলে এইরকম অনেক ছেলেমেয়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা কানে কম শুনে বলিয়া ক্লাসে সকলের সঙ্গে সমান তালে চলিতে পারে না। শিক্ষক মহাশয়গণ এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্য, এই রকম ছেলেমেয়েদিগকে বোকা বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখেন। ফলে, তাহাদের নিজেদের শক্তির উপর অনাস্থা জন্মিয়া যায় এবং ক্রমশঃ তাহাদের বুদ্ধির ফলক ভোঁতা হইয়া পড়ে। যদি, এই রকম ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ডাক্তারি পরীক্ষা দ্বারা শ্রবণশক্তির পরিমাপ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তবে হয়ত তাহারা পরিবারের, তথা দেশের গৌরব স্বরূপ হইতে পারে। ছেলেরাই দেশের ও সমাজের প্রকৃত সম্পদ। অথচ, আমরা নিজেদের অজ্ঞতার জন্য এবং অবহেলা করিয়া, কত সম্পদ নষ্ট করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

কেহ ত্রিশ বৎসর বয়সে বধির হইলে, তিনি তাঁহার কথিত ভাষা ভুলিয়া যাইবেন না বটে, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার বাক্-শব্দের সাধারণ মিষ্টতার কিছু হানি হইবে। কারণ, আমরা কানের সাহায্যেই শব্দের মাধুর্য্য উপলব্ধি করি।

আমরা চক্ষু, কর্ণ ও স্পর্শ, প্রধানতঃ এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য, সামঞ্জস্য রাখিয়া এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আমাদের মানসিক বৃত্তির সম্যক বিকাশ করা। এই জন্যই কেবল পুঁথি-গত বিদ্যায় এত বিপদ! ইহাতে চোখ বা হাতের শক্তি ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না।

তিনটি ইন্দ্রিয়ের কোনটির অভাব হইলে, আমরা বাকী দুইটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা দিতে পারি। যাহারা অন্ধ, তাহাদিগকে কর্ণ ও স্পর্শের সাহায্যে শিক্ষা দিতে পারি। যাহারা বধির, তাহাদিগকে চক্ষু ও স্পর্শের সাহায্যে শিক্ষা দিতে পারি। যাহাদের দুইটি ইন্দ্রিয়ের অভাব, তাহাদিগকেও অবশিষ্ট একটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অন্ধ বা বধিরকে মুখ্যতঃ স্পর্শজ্ঞানের ভিতর দিয়াই শিক্ষা দেওয়া হয়। হেলেন কেলার ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মূক-বধিরকে যতই শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন, কোনদিন তাহাকে সাধারণ ছেলের সঙ্গে সমান করিয়া তুলিতে পারা যাইবে না। ইহা অসম্ভব। সাধারণ ছেলের শিক্ষার সমস্ত পথ খোলা। তাহার কত রকম সুবিধা। জীবন-সংগ্রামের দৌড়ে মূক-বধির মস্ত 'হ্যাণ্ডিক্যাপ' লইয়া দৌড়াইতেছে। সাধারণ ছেলেদের সঙ্গ ধরা তাহার সাধ্যের অতীত। অবশ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চেষ্টা ও সুযোগের উপর অনেক নির্ভর করে। অন্ধ ও বধির হইয়াও হেলেন কেলারের মানসিক বিকাশ এত প্রশস্ত হইয়াছে, যাহা অনেক সাধারণ ছেলেমেয়ে শত চেষ্টা করিয়াও পারিবে না। তিনি সাধারণ গণ্ডীর বাহিরে। তাঁহাকে দেখাইয়া সাধারণভাবে কোন কথা বলা চলে না। তাঁহার শুধু একটা অস্বাভাবিক অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল

তাহা নয়; তিনি যে রকম সুবিধা পাইয়াছিলেন, তাহা কোন রাজার মেয়ের পক্ষেও লাভ করা দুরূহ।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চক্ষু ও স্পর্শের সাহায্যে মূক-বধিরদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। মূক-বধির শিশু স্কুলে আসিলে, প্রথমে তাহার দৃষ্টি ও স্পর্শ, এই দুইটি ইন্দ্রিয়কে নানা উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। মাদাম মন্তেসরি শিশু-শিক্ষার জন্য যে ইন্দ্রিয়-প্রকর্ষণ (sense training) প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা তিনি মূক-বধির ও অন্ধ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তিনি নূতন কিছুই দেন নাই। আমরা মূক-বধির ও অন্ধ শিশুকে শিক্ষা দিবার জন্য যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতাম, তাহা তিনি সাধারণ শিশুর শিক্ষাকল্পে ব্যবহার করিয়াছেন। একটি সাধারণ প্রবন্ধে এই ইন্দ্রিয়-প্রকর্ষণ (sense training) সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে লেখা সম্ভবপর নয়, পরে আর একটি প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শিশু কথা বলিতে শিখিবার আগে কথা বুঝিতে শিখে, ইহা গৃহে শিশুদিগকে একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। একটি এক বৎসরের শিশুর সহিত তাহার মা, বাবা, ভাই-বোন প্রভৃতি সকলেই কথা বলেন, সে তাঁহাদের প্রায় সমস্ত কথাই বুঝিতে পারে; কিন্তু নিজের মনের ভাব তখনও কথিত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না কথা বলিতে পারিবার আগেই সে শুনিয়া শুনিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ শুধু দেখিয়া বা স্পর্শ করিয়া বা স্বাদ লইয়া হয়, সে সম্পর্কে মূক-বধির শিশু সাধারণ শিশুর সহিত সমান। রসগোল্লার স্বাদ মিষ্ট, তেঁতুল টক, কুইনাইন তিক্ত,—ইহা সকল শিশুই সমানভাবে বুঝে; ইহা বুঝিতে কথিত ভাষার দরকার হয় না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা কান ও চোখের সাহায্যে যত বেশী হয়, এত আর কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না। এইজন্য এই দুই ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটির অভাব হইলে, আমাদের শিক্ষায় বাধা পড়ে, এবং আমাদের অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তি সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কথিত ভাষার অভাবের জন্য একটি ছয় বৎসরের মূক-বধির শিশুর জ্ঞানের পরিমাপ (যাহাকে ইংরেজীতে বলা হয়, intelligence quotient) একটি দুই বৎসরের সাধারণ শিশুর সমান। কাজেই, একটি ছয় বৎসরের মূক-বধির শিশু যখন প্রথমে স্কুলে আসে, তখন আমরা তাহাকে একটি দুই বৎসরের শিশুর মতই ব্যবহার করি।

মূক-বধির শিশুকে ইন্দ্রিয়-প্রকর্ষণ-এর সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠপাঠের সাহায্যে সাধারণ জিনিসের নামের সহিত পরিচয় করানো হয়। টেবিল, চেয়ার, কলম, পেনসিল, আম, কলা প্রভৃতি যে সব জিনিস আমরা সর্ব্বদা আমাদের চারিধারে দেখিতে পাই, সেই জিনিসগুলিকে অথবা তাহাদের মডেল বা ছবি এক এক করিয়া ক্লাসে আনা হয়, এবং বারংবার উচ্চারণ করিয়া জিনিসগুলির নাম উচ্চারণ করিতে ওষ্ঠদ্বয়ের যে অবস্থান ও গতি হয়, তাহার সহিত জিনিসগুলির কি সম্পর্ক তাহা দেখান হয়। ইহাকেই বলে ওষ্ঠপাঠ। এই ওষ্ঠপাঠ মূক-বধিরদিগের শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। পরে এই বিষয়ে বিশদভাবে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রথম কয়েকমাস কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইন্দ্রিয়-প্রকর্ষণ, ওষ্ঠপাঠ শ্বাস-নিয়ামন (breathing exercise) বিষয়ে প্রাথমিক পাঠ দেওয়া হয়। এইগুলি কথা বলিতে শিক্ষা দিবার ভিত্তি। শ্বাস-নিয়ামন প্রথম দুই তিন বৎসর নিয়মিতভাবে দেওয়া হয় ওষ্ঠপাঠ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বধিরের বাক্-যন্ত্রে কোন ব্যাধি থাকে না। কথা বলিতে বাক্-যন্ত্রের যেরূপ প্রক্রিয়া হয় তাহা বধির যথাযথভাবে করিতে পারিলে, সেও কথা বলিতে পারিবে। প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ করিতে বাক্-যন্ত্রগুলির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হয়। চোখ দিয়া দেখিয়া ও স্পর্শদ্বারা অনুভব করিয়া বধির শিশু এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে উপলব্ধি করিতে পারে, এবং অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। বর্ণগুলির মূল উচ্চারণ শিক্ষার পর, কথিত ভাষায় উচ্চারণের যেরূপ নানাবিধ সংমিশ্রণ হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়। এইভাবে সে প্রথমে ছোট কথা হইতে আরম্ভ করিয়া, ধীরে ধীরে বড় বড় বাক্য বলিতে পারে। বর্ণের মূল উচ্চারণ কি এবং কি উপায়ে বধির শিশুকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, পরে আর একটি প্রবন্ধে তাহা লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

মূক-বধিরকে কথা বলিতে শিক্ষা দিবার ব্যাপারকে অসম্ভব ভাবিয়া, আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তবে, ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অপরিসীম ধীরতা ও সহিষ্ণুতা না থাকিলে, মূক বধিরদের শিক্ষকতায় সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। অবশ্য সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকও সকলে হইবার উপযুক্ত হইতে পারেন না; যদিও আমাদের দেশের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, সর্ব্ব-নিম্ন স্তরের লোকরাই শিশুদিগের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

মূক-বধিরকে কেবল কথা বলিতে এবং দুই পাতা বই পড়িতে শিক্ষা দিলেই আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হইবে না। যাহাতে তাহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া নিজেদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, সেইজন্য উপযুক্ত হাতের কাজ শিক্ষা দিতে হইবে। দুইটা কথা বলিতে পারিলেই তাহাদের জীবন সার্থক হইবে না। যাহাতে তাহারা অপরের গলগ্রহ না হয়, এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেই করিতে পারে, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নবজন্ম

—শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র

পৃথিবীর বুকে দোলে তরঙ্গে অন্যায়-অবিচার,
অঙ্গে অঙ্গে ওঠে ঝঞ্ঝনা, ভয়াল আর্ত্তনাদ ;
কাঁপে নীহারিকা, সপ্ত-ঋষিরা শিহরায় বারে বারে,
মেঘের আড়ালে হাহাকার করে ক্ষীণ-পাণ্ডুর চাঁদ !
কেন্দ্রচ্যুত হ'ল গ্রহ-তারা, উল্কারা পড়ে খসে'
ধূমকেতু নাড়ে পুচ্ছ তাহার মহা উদ্ধত রোষে,
ভৈরব নাচে তাতা থৈ থৈ ; অশনির নির্ঘোষে
বিদ্যুৎ আনে আঁধারের বুকে আলোর আশীর্ব্বাদ।

স্নেহ-মায়া আর মমতায় ঘেরা পুরানো জগতে মোর
ভাঙন ধরেছে ; শিহরে সেথায় ধ্বংসের বিভীষিকা,
প্রেয়সী ঘুমাও ! ছিন্ন করিয়া তোমার বাহুর ডোর
আমি চলিলাম ; অন্তরে মোর জ্বলেছে বহ্নিশিখা ;
সেই অরুণিম বহ্নিশিখায় নূতন করিয়া আজ
আমি লভিলাম নূতন জনম নবীন জগত-মাঝ,
মোর বক্ষের মাঝে জাগ্রত প্রেমের রাজাধিরাজ,
টানিয়া দিয়াছে বয়ানে তাহার মৃত্যুর যবনিকা।

ঘন কুয়াশায় ঢেকেছে আকাশ ; বাসক-শয়নে মোর
লীলায়িত তনু এলায়ে ঘুমায় প্রেয়সী পরম সুখে,
নয়নে র'য়েছে গত মিলনের আনন্দ আঁখি-লোর,
লীন হ'য়ে আছে ক্ষীণ হাসি তার মধু-মঞ্জুল মুখে ;
মোর গ্রীবাখানি বাম বাহু দিয়া আছে আঁকড়িয়া ধরি'
চতুর্দ্দশীর চন্দ্র-কিরণ-সম্ভবা সুন্দরী
বিনা সঙ্কোচে নির্ভয়ে সে যে মোরে নির্ভর করি'
র'য়েছে ঘুমায়ে মুখখানি তা'র লুকায়ে আমার বুকে

জাগরণ, আজ মহা জাগরণ,—নব-জাগরণ মোর,
দিগন্ত ভরি' প্রলয়-তূর্য্য বাজে ভৈরব রবে ;
ঘুচে গেছে আজ আতুর নয়নে মোহ-নিদ্রার ঘোর
ভ্রূকুটি-কুটিল, প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের কলরবে !
ঘুমাও প্রেয়সী, ঘুমাও, ঘুমাও, সীমাহীন নীলাকাশে
উঠিয়াছে ঝড় ; ঘরের প্রদীপ ওই নিভে নিভে আসে,
এই আলো-ছায়া ঘেরা তরঙ্গে ছাড়ি' পুরাতন বাসে,
চলিলাম আমি যোগ দিতে মহাজীবনের উৎসবে।

মৃতসঞ্জীবনী

—শ্রীচিত্রগুপ্ত

কিছুকাল পূর্ব্বে ক্যালিফোর্ণিয়ার এক ল্যাবোরেটরীতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল।

শুভ্র পরিচ্ছদ পরিহিত তিনজন বৈজ্ঞানিক, অপারেটিং-টেবলের উপর একটি সুস্থকায় কুকুরকে শয়ন করাইলেন। তাহার পর এক ব্যক্তি তাহার মুখকে একটি মুখোসে এমন ভাবে আবৃত করিলেন, যাহাতে কুকুরটি নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় জীবনরক্ষক অক্সিজেন-সমন্বিত নির্ম্মল বায়ুর পরিবর্ত্তে একটি পাত্র হইতে আগত নাইট্রোজেন গ্যাস পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই ভাবে অক্সিজেন হইতে বঞ্চিত থাকার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার নড়িবার শক্তি রহিত হইল। মাংসপেশীগুলি অবসন্ন হইয়া অবশেষে কুকুরটির মৃত্যু হইল।

চার মিনিট কাল কুকুরটি ঐ অবস্থাতেই রহিল। তাহার পর বৈজ্ঞানিকগণ ইন্‌জেকশনের সূচের মধ্যে একপ্রকার তরল ঔষধ লইয়া সূচটিকে কুকুরটির হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বিঁধাইয়া দিলেন। ঔষধটি কুকুরটির হৃৎপিণ্ডের ভিতর প্রবেশ করান হইলে তাঁহারা তাহার বক্ষের উপর ষ্টেথিস্‌কোপ বসাইয়া হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এই ভাবে কাটিবার পর আনন্দে তাঁহাদের চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চার মিনিট মৃত থাকিবার পর কুকুরের দেহে আবার নব জীবন সঞ্চারিত হইল! তাহার পর দুই একদিনের মধ্যে সে স্বয়ং আহার গ্রহণ করিল, এবং দুই এক সপ্তাহের ভিতর সে হাঁটিতে, দৌড়াইতে, খেলা করিতে এবং আদেশ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইল।

ঘটনাটি অবিশ্বাস্য মনে হইলেও এই ভাবে সত্যই মানুষ অবশেষে তাহার বহু শতাব্দীর পোষিত স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে এতদিনে সে তাহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত মৃত-সঞ্জীবনীর আবিষ্কারে উল্লসিত হইবার সুযোগ পাইল।

এই সঞ্জীবনী ঔষধের আবিষ্কারক ক্যালিফোর্ণিয়ার একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক। তাঁহার নাম ডাঃ রবার্ট ই. কর্ণিশ (Dr. Robert E. Cornish)। তিনি বলেন যে, যদিও তাঁহার আবিষ্কার মাত্র কুকুরের উপরই পরীক্ষিত হইল, তথাপি ঐ ভাবে শ্বাসরোধে মৃত মানুষকেও তিনি তাঁহার ঔষধের সাহায্যে ঐ রূপ সহজেই বাঁচাইয়া তুলিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। বাস্তবিক তাঁহার এই বিশ্বাসে সন্দেহ করিবার কারণ থাকিতে পারে না।

রাশিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ডে, বাল্‌টিমোরে এবং ক্লীভল্যাণ্ডে অন্য ধরণের গবেষণায় ব্যাপৃত বৈজ্ঞানিকগণও একই ধরণের বিশ্বাস পোষণ করেন।

বাল্‌টিমোরে কয়েক জন বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক শক্তির আঘাতে হত বলিয়া বিবেচিত একটি কুকুরের স্তব্ধ হৃৎপিণ্ডে অল্পভাবে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে আবার কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিয়াছেন।

ডাঃ কর্নিশ মৃত কুকুরের দেহে জীবনসঞ্চারের প্রতীক্ষা করিতেছেন: কুকুরটি কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিল।

রাশিয়ার কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ডাঃ সার্জ্জ ব্রুকহ্যানেনকোর (Serge Brukhonenko) আবিষ্কৃত কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের সাহায্যে, গলরজ্জুর দ্বারা আত্মঘাতী এক মৃত ব্যক্তির শরীরে জীবনসঞ্চারের লক্ষণ দেখাইয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ লোকটিকে সম্পূর্ণভাবে মৃত বলিয়া মত প্রকাশ করার তিন ঘণ্টা পরে তাহার দেহটিকে ল্যাবোরেটরীতে লইয়া যাওয়া হয়।

সেখানে লইয়া গিয়া চিকিৎসকগণ তাহার দেহের একটি অবিশুদ্ধ রক্তবাহিনী শিরা এবং একটি পরিষ্কৃত রক্তবাহিনী ধমনীকে ঈষৎ চিরিয়া সেই চেরা-মুখের সহিত কৃত্রিম হৃদ্‌-যন্ত্র হইতে আগত দুইটি নলের মুখ জুড়িয়া দিলেন। তাহার পর ইলেক্‌ট্রিক মোটর চালাইয়া পাম্পের সাহায্যে শিরা হইতে অপরিষ্কৃত কালো রক্ত টানিয়া লইয়া শিরাটিকে রক্ত-শূন্য করিয়া

ফুসফুসের সাহায্যে পরিষ্কৃত, ও অক্সিজেনে পূর্ণ করিয়া অপর পাম্পের দ্বারা ধমনীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। ধমনীর মধ্য দিয়া সেই অক্সিজেন পূর্ণ পরিষ্কৃত রক্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহার দেহস্থিত জীবকোষ গুলিকে ধীরে ধীরে অক্সিজেন প্রদান করিয়া সঞ্জীবিত করিলে লোকটি মুদ্রিত চক্ষু উন্মীলিত করিয়া মৃতের ন্যায় তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত চিকিৎসকদের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুই মিনিট পরে তাহার দেহ হইতে জীবনের চিহ্ন আবার বিলুপ্ত হইল।

জলমগ্ন মৃতকল্প ব্যক্তির দেহে জীবনের ক্রিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই যন্ত্রটির ব্যবহার সম্প্রতি লণ্ডনে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মস্কোর ডাক্তার ব্রুকহ্যানেনকোর আবিষ্কৃত কৃত্রিম হৃদযন্ত্র। চিত্রে যেরূপ দেখা যাইতেছে ঐভাবে যন্ত্রটিকে মৃত কুকুরের মাথার সহিত সংযুক্ত করিয়া সাফল্যের সহিত ব্যবহার করা হইয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাল্টিমোরের য়ুনিভার্সিটি হস্পিটালে অপারেটিং-টেবলের উপর শায়িতা এক রমণীর দেহে নাড়ীর সন্ধান না পাইয়া একজন শুশ্রূষাকারী চীৎকার করিয়া ওঠেন। অস্ত্র-চিকিৎসক রোগিণীর বক্ষের মধ্যে পূর্ব্বাহ্নে কর্ত্তিত পথের মধ্য দিয়া হস্ত প্রবেশ করাইয়া তাহার হৃৎপিণ্ডটিকে অঙ্গুলির সাহায্যে ক্রমান্বয়ে টিপিয়া ধরিতে ও ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ কৃত্রিমভাবে রক্তকে সঞ্চালিত করাইবার পর রোগিণীর হৃৎপিণ্ড আবার স্বয়ংক্রিয় হইয়া উঠিল। তাহার পর যথারীতি তাঁহার দেহে আবশ্যক মত অস্ত্রোপচার করা হইল। এখন মহিলাটি সম্পূর্ণ সুস্থ।

সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা নামক স্থানের একজন ধৈর্য্যশীল বৈজ্ঞানিক জলমগ্ন বা বিদ্যুতাহত মৃতকল্প লোকদিগের দেহ লইয়া পরীক্ষা-মূলক চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যে-সব দেহে নাড়ীর সন্ধান বা জীবনের কোন লক্ষণ প্রকাশিত থাকে না, তিনি সেই সব দেহের হৃৎপিণ্ডকে খুব সন্তর্পণে মর্দ্দন করিয়া অনেক ক্ষেত্রে দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে তাহাতে স্পন্দন আনিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া থাকেন।

মৃতদেহকে পুনর্জ্জীবিত করিতে না পারিলেও একজন ফরাসী চিকিৎসকও নিতান্ত কম কৃতিত্বের পরিচয় দেন নাই। তিনি চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে মৃত একটি শিশুর হৃৎপিণ্ডকে মর্দ্দনের সাহায্যে স্বয়ং-ক্রিয় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জাপানেও একজন চিকিৎসক একটি মৃত বালকের শুষ্ক হৃৎপিণ্ডকে স্পন্দনশীল করিয়া অনুরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

কর্ণেল-এর (Cornell) প্রফেসর উইল্ডার ডি. ব্যাঙ্ক্রফ্ট (Prof. Wilder D. Bancroft) সমস্যাটির অন্যবিধ সমাধানের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করা এবং মুমূর্ষুর মৃত্যুকে দীর্ঘকালের জন্য পিছাইয়া দেওয়া, এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যে খুব বেশী আছে তাহা নহে। তিনি বলেন, সোডিয়াম রোডানেট্ (Sodium Rhodanate) নামক রাসায়নিক বস্তুটির সাহায্যে যে কোন লোকের আয়ুকে অন্ততঃ দুই বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া যায় এবং পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর কোনও লোক ইহা সেবন করিলে তাহার স্নায়ু ও মস্তিষ্কের তেজ ও তারুণ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং তাহার রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। সুতরাং তিনি এই দিক দিয়া মৃত্যু জয় করিবার উপায় আবিষ্কারে চেষ্টিত। তবে তাঁহার চেষ্টা সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার থাকে এই যে, কোন শুভদিনে তিনি তাঁহার আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষকে রোগ ও জরাজনিত মৃত্যুর আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিলেও অপঘাতজনিত মৃত্যুর কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন না। অপর পক্ষে কোন ব্যক্তি যদি সত্যকার মৃতসঞ্জীবনীর আবিষ্কারে সক্ষম হন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বদিক দিয়াই মৃত্যুকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ডাঃ কর্নিশ-এর আবিষ্কার যতই বিস্ময়কর হউক সে ঔষধ কেবলমাত্র শ্বাসরোধে মৃত জীবের উপর চারিমিনিট পরে প্রযুক্ত হইয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যরূপ বিভিন্ন পরীক্ষার পূর্ব্বে তাহা ঠিক মৃতসঞ্জীবনী বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত কিনা তাহা বিবেচ্য।

অবশ্য ডাঃ কর্নিশ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীর বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে মৃত্যু

সংঘটিত হইবার পর তাহার দেহ লইয়া পরীক্ষা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি বলেন যে, অপরাধীর ঐ ভাবে মৃত্যু হইলে চিকিৎসকগণ যখন তাহাকে মৃত বলিয়া একযোগে মত প্রকাশ করিবেন তখন তিনি সেই দেহকে একখানি বোর্ডে বাঁধিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রণালীতে তাপপ্রয়োগের প্যাড সংলগ্ন করিবেন। অতঃপর সূচিমুখদ্বারা তাহার শিরার মধ্যে মেথিলিন ব্লু (Methylene blue) নামক রাসায়নিক পদার্থ ইন্‌জেক্ট করিয়া তাহার দেহস্থিত মৃত্যুসংঘটনকারী বিষের প্রতিষেধ করিবেন। পরে মুখোসের সাহায্যে তাহার ফুস্‌ফুসে বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রবেশ করাইয়া বোর্ডখানিকে আঘাতের সাহায্যে এমন ভাবে কম্পিত করিবেন, যাহাতে তাহার দেহের রক্ত সঞ্চালিত হইবার সুযোগ পায়। অবশেষে তাহার একটি বড় শিরার মধ্যে প্রধানতঃ মানুষের রক্ত হইতে প্রস্তুত অ্যাড্রিন্যালীনযুক্ত তাঁহার ঔষধটি ইন্‌জেক্ট করিয়া দিবেন। এই ঔষধটিতে স্তব্ধ হৃৎপিণ্ডকে পুনঃস্পন্দিত করিবার অদ্ভুত শক্তি বিরাজিত। সুতরাং তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া তিনি অবশ্যই মৃত ব্যক্তির দেহকে সঞ্জীবিত করিতে পারিবেন।

অনেক চিকিৎসক মত পোষণ করেন যে, এইভাবে মৃত ব্যক্তিকে সঞ্জীবিত করা সম্ভবপর হইলেও তাহার মস্তিষ্ককে কিন্তু আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যাইবে না। ডাঃ কর্নিশ কিন্তু তাহা বিশ্বাস করেন না।

মৃতদেহে জীবন সঞ্চারিত করিবার যন্ত্র।

বস্তুতঃ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর জীবকোষগুলি অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ বলেন, যে-মুহূর্ত্তে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই মস্তিষ্কের কোষগুলিও কর্ম্মশক্তি হারায়, এমন কি তিনি মনে করেন যে, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়া যাইবার আগেও যদি নাড়ীর গতি অত্যন্ত মন্দ হইয়া আসে, তাহা হইলে হৃৎস্পন্দন থামিবার পূর্ব্বেই মস্তিষ্ক-কোষগুলির মৃত্যু হইতে পারে।

একজন ফরাসী চিকিৎসক মস্তিষ্ক-কোষের মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মৃত্যুর পর কুড়ি মিনিটের মধ্যে মস্তিষ্ক-কোষগুলি বিকল হইয়া যায়। সুতরাং অনেক চিকিৎসকের ধারণা যে, কৃত্রিম উপায়ে মৃত ব্যক্তির শরীরে জীবন সঞ্চারিত হইলেও তাহাকে দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইবে, এমন কি তাহার মনোবৃত্তিগুলি পর্য্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যাইবে।

ডাঃ কর্নিশ কিন্তু কুকুরের উপর তাঁহার পরীক্ষা সম্পাদন করিয়া উপরোক্ত মতের অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি শ্বাসরোধের ফলে মৃত যে কুকুরটির প্রাণদান করিয়াছেন, সে তাহার স্বাভাবিক মস্তিষ্কশক্তি হারায় নাই।

ডাঃ কর্নিশের অবলম্বিত পদ্ধতির ভিত্তি বহুকাল পূর্ব্বে, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের জনৈক চিকিৎসক কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। সে ভদ্রলোকটির নাম ছিল ডাঃ টমাস এ্যাডিসন (Dr Thomas Addison)। তিনি কিংস্ হসপিটালের ডাক্তার ছিলেন। হৃৎপিণ্ড-সম্বন্ধীয় এক প্রকার রোগের ঔষধ আবিষ্কারে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। সেই রোগে রোগীর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অস্বাভাবিক হইয়া যাইত, নাড়ী অনিয়মিত ও দুর্ব্বল হইত এবং গাত্রচর্ম্ম তাম্রবর্ণ ধারণ করিত। ডাঃ এ্যাডিসন আবিষ্কার করিলেন যে মানুষের কীড্‌নীর দুই ইঞ্চি উপরিস্থিত সুপ্রারেণাল গ্ল্যাণ্ড (Suprarenal gland) নামক গ্রন্থি ক্রিয়াহীন হইয়া পড়িলে এই রোগ হয়। হৃৎপিণ্ড ও শিরনিচয়ের উপর এই গ্রন্থি-নির্গত রসের রহস্যজনক প্রভাব আছে। সে সময় এই গ্রন্থি সম্বন্ধে চিকিৎসকগণেরও বিশেষ জ্ঞান ছিল না। যাহাই হউক, পরে ডাঃ এ্যাডিসনের নামানুসারে এই রোগটির নাম দেওয়া হয় Addison's disease।

গবেষণাকারী চিকিৎসকগণ শীঘ্রই এই গ্রন্থির নির্য্যাস প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আবিষ্কৃত হইল যে, রক্তপাতসংবরণে এই গ্রন্থিনির্য্যাসের অসাধারণ কার্য্যকারিতা আছে। তদনুসারে অস্ত্রচিকিৎসকগণ দীর্ঘকাল এতদুদ্দেশ্যে এই গ্রন্থি-নির্য্যাস ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তখনও এই বস্তুটি লইয়া চিকিৎসকদিগকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, কারণ বাতাস লাগিলেই এ-বস্তুটি নষ্ট হইয়া যাইত।

অবশেষে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে যোকিচি তাকামিনে (Jokichi Takamine) নামক একজন জাপানী চিকিৎসক নিউইয়র্কে বসিয়া এই গ্রন্থি-নির্য্যাসের অনুরূপ গুণসম্পন্ন অ্যাড্রিন্যালীন (Adrenalin) নামক বস্তুটির আবিষ্কার করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই আবিষ্কার জগতের কি অত্যাশ্চর্য্য মহোপকার সাধন করিয়াছে তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

তাঁহার মৃত্যুর পর বৎসর সেণ্ট লুইস্ হস্‌পিটালে তাঁহার আবিষ্কারের অদ্ভুত কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হয়।

একদিন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক অস্ত্রচিকিৎসার্থ উক্ত হাঁসপাতালে আসেন এবং তাঁহার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। তাহার দিন পনের পরে তাঁহার শরীরে দ্বিতীয় বার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। এবারে অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁহার শরীরে এ্যানেস্থেটিক (Anaesthetic) প্রয়োগ করিবার পর দেখা গেল, তাঁহার শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম শক্তি সম্পন্ন ইলেক্ট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ্ (Electrocardiogragh) নামক যন্ত্রের সাহায্যেও তাঁহার হৃৎস্পন্দনের সাড়া পাওয়া গেল না। তখন কৃত্রিম উপায়ে তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল।

অবশেষে চিকিৎসকগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অ্যাড্রিন্যালীন দিয়া একটি ঔষধ প্রস্তুত করিলেন এবং রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবার পাঁচ মিনিট পরে তাঁহার হৃৎপিণ্ডে সেই ঔষধের একটি ইনজেকশন দিলেন। ঔষধের আশ্চর্য্য ফল ফলিল। ইনজেকসন্ দিবার পর ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁহার প্রশ্বাস বহিতে এবং হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হইল।

তদবধি এইরূপ ব্যাপার সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই নিত্য সংসাধিত হইতেছে। অস্ত্রোপচারকালে শত শত নারী ও পুরুষের হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে, বহুসংখ্যক সদ্যোজাত শিশু মৃতবৎ প্রতীয়মান হইলে, এবং বৈদ্যুতিক শক্তির আঘাতে কোন ব্যক্তি মৃত সাব্যস্ত হইলে পর, এই চিকিৎসার দ্বারা তাহাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনা হইতেছে।

ডেট্রয়েটে অল্পদিন পূর্ব্বে পুলিশ একদল দস্যুকে অনুসরণ করিবার সময় একটি দস্যুকে গুলির দ্বারা পাতিত করে। পরে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার দেহে জীবনের কোন লক্ষণ না দেখিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহার শরীরে অ্যাড্রিন্যালীন প্রয়োগ করিয়া তাহার চেতনা সম্পাদন করা হয়। তৎপরে পুলিশ তাহার নিকট হইতে তাহার দলের সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার পর লোকটি মারা যায়।

যাহা হউক, যে সব ক্ষেত্রে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত লোককে বাঁচাইয়া তোলা হইয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রে তাহাদের প্রকৃত মৃত্যু হইয়াছিল এ কথা চিকিৎসকরা কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন, ঐ সব ক্ষেত্রে রোগীদের মৃত বলিয়া বোধ হইলেও তাহারা সত্য সত্য মরে নাই বলিয়াই তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তোলা সম্ভবপর হইয়াছিল।

এ বিষয় লইয়া তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করা মুস্কিল। কারণ, জীবের দেহ ঠিক কোন্ অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার সম্যক্ মৃত্যু হয় তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ জীবদেহের মৃত্যু হঠাৎ ঘটে না। দীর্ঘকাল ধরিয়া খুব ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া তাহার সমগ্র দেহটির মৃত্যু ঘটে। বিজলী বাতির সুইচ্‌টি টিপিয়া দিলেই যেমন সঙ্গে সঙ্গে ঘর অন্ধকার হইয়া যায়, জীবের দেহ সেরূপ আকস্মিক ভাবে প্রাণহীন হইয়া পড়ে না। একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের পতন যেমন ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় মৃত্যুও সারা দেহে সেইরূপ ধীরে ধীরে ঘটে। দেহ-রাজ্যের রাজধানী মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের পতন সর্ব্বাগ্রে ঘটে। কিন্তু দেহের অন্য স্থানের কোষগুলির মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে হয় না। অবশ্য মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড শক্তি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে কোষগুলির ভবিষ্যৎও তখনি স্থিরীকৃত হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ড ক্রিয়াহীন হওয়ায় রক্তচলাচল বন্ধ হয়, সুতরাং রাজধানী হইতে তাহাদের খাদ্যরূপ অক্সিজেনের সরবরাহ স্থগিত হইয়া যায়। তাহা ছাড়া অপকারী রাসায়নিক বিকৃতি ও মৃত্যু-সংঘটনকারী জীবাণুগুলির সহিত রাজধানী হইতে আগত সাহায্যের অভাবে একা একা যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়া মরিতে থাকে।

এ অবস্থায় যদি তাহারা বাহির হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইত তাহা হইলে মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও বাঁচিতে পারিত, এমন কি সংখ্যায় বাড়িতেও পারিত। কিন্তু রাজধানীর পতন হইয়াছে সুতরাং সাহায্য পাঠাইবে কে? অতএব তাহারা নিরুপায়ের মত শত্রুহস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া শুধু একে একে মরিতেই থাকে।

বাঁচিবার সাহায্য পাইলে দেহকোষগুলি মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের অভাব সত্ত্বেও বাঁচিতে পারে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে রকফেলার ইন্‌ষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা একটি মুরগীর হৃৎপিণ্ড হইতে জীবন্ত টিস্যুসমন্বিত খানিকটা অংশ কাটিয়া রাসায়নিক ঔষধের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলেন। টিস্যুগুলি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। ইংলণ্ডে একজন বৈজ্ঞানিক ব্যাঙ্-এর মেরুদণ্ড হইতে আহৃত মজ্জার অতি ক্ষুদ্র অংশ ঐ ঔষধের মধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, সেটি শুধু যে আটচল্লিশ ঘণ্টা জীবিত ছিল তাহা নহে, ঐ সময়ের মধ্যে তাহার আয়তনও বহু শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আরও আধুনিক কালে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছেন যে, পশুর চর্ম্ম হইতে সংগৃহীত জীবকোষকে ঔষধের মধ্যে ঠিকভাবে রাখিতে পারিলে তাহা হইতে লোম জন্মাইতে পারে।

সুতরাং ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, জীবদেহ হইতে ঠিক কোন্ সময়ে জীবনকে বিতাড়িত করিয়া মৃত্যু তাহাতে প্রভাব স্থাপন করে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যদিও মৃত্যুর সহিত শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রহিত হওয়ার একান্ত সম্বন্ধ, তথাপি এই লক্ষণগুলিকেই মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা চলে না।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেখানে চিকিৎসকগণ সর্ব্বপ্রকারে পরীক্ষা করিয়াও জীবদেহে জীবনের অস্তিত্বের সন্ধান পান নাই সেখানেও জীব সত্য সত্য মরে নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনের একটি পার্কে মৃত বলিয়া অনুমিত

একটি বালককে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসকগণ মৃত্যু-প্রচার-পত্র (death certificate) প্রদান করিলে তাহার সমাধির আয়োজন করা হইতেছে, এমন সময়ে তাহার জননী আসিয়া উদ্যোগকারিগণকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিয়া তাহাদিগকে বালকের জন্য পূর্ব্বপ্রদত্ত আরও তিনখানি মৃত্যু-প্রচারপত্র দেখাইলেন। অবশেষে বালকটি সারিয়া উঠিয়া মাতার সহিত হাঁটিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

আমাদের দেশে অনেক সুস্থ ব্যক্তিও স্বেচ্ছায় সমাধিপ্রভাবে মৃতকল্প অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন এ সংবাদ আশা করি পাঠকগণের অবিদিত নহে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে লাহোরে মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমক্ষে যোগী হরিদাস নামক জনৈক সাধু সমাধির দ্বারা তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথামত তাঁহার সমাধি-অবস্থার পর তাঁহার নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখবিবর মোমদ্বারা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে একটি থলির মধ্যে ভরিয়া থলির মুখ সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর থলিশুদ্ধ তাঁহাকে একটি বাক্সের মধ্যে ভরিয়া বাক্সটিকে কয়েক ফুট মাটির নীচে পুঁতিয়া তাহার উপর মাটি চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে এই ভাবে মাটীর নীচে পুঁতিয়া সেইস্থান সতর্ক প্রহরীদ্বারা চল্লিশ দিন দিবারাত্র বেষ্টিত রাখা হয়। চল্লিশ দিন পরে মাটি খুঁড়িয়া তাঁহাকে তোলা হইলে দেখা গেল তাঁহার শরীর ঈষৎ বিশুষ্ক হইয়াছে। নতুবা তাঁহার শরীরের অবস্থা অন্যদিক দিয়া ভালই আছে। তাঁহাকে তোলা হইবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তিনি আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকগণ নিশ্চিত মৃত্যু নিরূপণ করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন। তদনুসারে ইলেকট্রোকার্ডিও-গ্রাফ নামক সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। তিন বৎসর হইল ওহিওর অন্তর্গত ক্লীভল্যাণ্ড নামক স্থানে জর্জ্জ ক্রাইল্ (George W. Crile) নামক একজন চিকিৎসক মৃত্যু-পরীক্ষার একটি বৈদ্যুতিক উপায় আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ডাঃ আইকার্ড (Dr. Icard) নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক এতদুদ্দেশ্যে হলদে রঙের এক প্রকার ইন্‌জেক্‌সনের আবিষ্কার করিয়াছেন। পরীক্ষিত ব্যক্তির সত্যকার মৃত্যু সংঘটিত না হইয়া থাকিলে এই ইন্‌জেক্‌শনের ফলে তাহার অক্ষিপল্লবের তীরেখা হরিদ্রাভ হইয়া যায়।

অবশ্য এই সমস্ত উপায়েও যে মৃত্যুনিরূপণ নির্ভুল হইবে তাহাও খুব জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত মৃত্যুকে ঠিকভাবে নিরূপিত করিবার উপায়ের আবিষ্কার সম্বন্ধে মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে। এই মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যাওয়া সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত বেশী নিদর্শন আছে যে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইলে বর্ত্তমান নিবন্ধে কুলাইবে না। সুতরাং সে বিষয়ে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যাহা হউক, পরিশেষে বর্ত্তমান নিবন্ধের বক্তব্য শুধু এই যে, মানুষ কোনও দিন প্রকৃত মৃত-সঞ্জীবনীর আবিষ্কারে সক্ষম হউক বা না হউক, বৈজ্ঞানিকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অন্ততঃ পক্ষে মানুষের অজ্ঞতাজনিত অনেক অকাল-মৃত্যু নিবারণে সক্ষম হইয়াছেন, মানুষের আশার সীমাকে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ মানুষ এতকাল প্রিয়জনের দৈহিক অবস্থা দেখিয়া যত শীঘ্র তাহার মৃত্যু-সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কাঁদিয়া উঠিত, এখন আর অত শীঘ্র কাঁদিবার জন্য প্রস্তুত হইবে না। পূর্ব্বে মানুষ 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' করিত, এখন শ্বাসরোধ হইয়া গেলেও সে আশা ছাড়িবে না। এখন সে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি ব্যর্থ হইয়া যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আশার সহিত প্রতীক্ষা করিবে।

ডাঃ কর্ণিশ ও তাঁহার মতাবলম্বীরা অবশ্য সত্যকার মৃতসঞ্জীবনীর আবিষ্কার সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা পোষণ করেন এবং তাঁহারা কোনদিন আশা ছাড়িলেও নূতন আশাবাদী বৈজ্ঞানিকের অভাব হইবে না।

একটি প্রেমের গল্প

ইংরেজী সাহিত্যের গৌরবরবি বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্স উনিশ বৎসর বয়সে একবার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি পার্লিয়ামেণ্টের সামান্য রিপোর্টার মাত্র। কিন্তু প্রেমে পড়িলেন একজন ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের কিশোরী কন্যার সঙ্গে। ইহার কুড়ি বৎসর পরে 'ডেভিড কুপারফিল্ডে' তিনি তাঁহার এই প্রেমসংক্রান্ত অনুভূতি ডোরা স্পেনলোর ও ডেভিড কুপার ফিল্ডের প্রেমের আখ্যানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের মেয়েটির নাম ছিল মারিয়া বিড্‌নেল। মারিয়া বিড্‌নেলের বাপ-মা ডিকেন্সের এই প্রেমের কথা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন। নিঃসম্বল ভবঘুরের সঙ্গে তাঁহারা মেয়ের বিবাহে অমত জানাইলেন।

প্রত্যাখ্যাত হইয়া ডিকেন্স নিরাশ প্রেমিকের মত আত্মহত্যা করিলেন না। তাঁহার প্রকৃতিতে ইহা মানাইত না। তিনি নীরবে সরিয়া আসিয়া কৃতী হইবার সাধনার ব্রতী হইলেন। কুড়ি বৎসর পরে মারিয়ার সঙ্গে আবার তাঁহার দেখা হইল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ, শরীরে মেদ জন্মিয়াছে। এবং রঙ্ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। এই মারিয়ার পরিচয় ডিকেন্স 'লিট্‌ল ডরিট' পুস্তকে ফ্লোরা ফিঞ্চি-এর চরিত্রে দিয়া গিয়াছেন।

চীনা শ্রমণদের ভারতদর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

মধ্যভারতে হিউয়েনের অভিজ্ঞতা

হিউয়েন-এর ভারত-ভ্রমণের সময় শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন এখানকার রাজা ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন জাতিতে বৈশ্য-রাজপুত। হর্ষবর্দ্ধনের সৈন্যদলে প্রথমে ৫০০০ হস্তী, ২০০০ অশ্ব এবং ৫০,০০০ পদাতিক ছিল। তিনি সর্ব্বত্র দেশজয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যদলের বিশ্রামের অবকাশ ছিল না, এবং শেষে তাঁহার বিপুল বাহিনীতে ৬০,০০০ হস্তী ও ১,০০,০০০ পদাতিক হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসর যুদ্ধ করিবার পর তিনি দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি অস্ত্রশস্ত্র কোষ-বদ্ধ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার আদেশে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রাণীহত্যা নিবারিত হইয়াছিল, তিনি নিজে আমিষ-ভোজন ত্যাগ করিয়া অন্য সকলকে তাঁহার আদর্শ পালন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধতীর্থগুলিতে বহু সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন নিজে কঠোর মিতাচার পালন করিতেন এবং ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অতীব কঠোর পরিশ্রম করিতেন। প্রাণীহত্যা বা আমিষভোজন-কারীর প্রতি তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন; ইহার মার্জ্জনা ছিল না। তিনি গঙ্গার কূলে কয়েক সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং নগর ও জনপদের রাজপথে বহু পুণ্যশালা স্থাপন করিয়াছিলেন; এই পুণ্যশালাগুলিতে অতিথি ও আতুরদের অকাতরে অন্নজল দেওয়া হইত ও তাহাদের চিকিৎসার জন্য বৈদ্য ও ঔষধাদির ব্যবস্থা ছিল।

হর্ষবর্দ্ধন পাঁচ বৎসর পর পর একটি "মহামোক্ষ-পরিষৎ" ঘোষণা করিতেন; অর্থাৎ এই সময় তিনি রাজকোষের সমস্ত সঞ্চয় বিলাইয়া দিতেন, শেষে সৈন্যদের অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। প্রতি বৎসর তিনি সর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের একত্র করিয়া খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণ করিতেন; বিহারগুলি সুসজ্জিত করা হইত এবং তিনি আচার্য্যদের শাস্ত্রবিচার শুনিয়া নিজে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণ করিতেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাঁহার শাসননীতি ছিল। দুষ্ট লোকের তিনি পদলাঘব এবং যোগ্য ব্যক্তির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেন। কোন আচার্য্য যদি জ্ঞানী ও শীলবান হইতেন তবে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতেন। শীলবান ব্যক্তি যদি বিশেষ বিদ্বান না হইতেন তবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা হইত, কিন্তু বিশেষ সম্মান করা হইত না। ধর্ম্ম বা সমাজের নিয়ম যে না মানিত তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত, রাজা তাহার মুখদর্শন করিতেন না বা তাহার কথা শুনিতেন না। কোন সামন্ত-রাজা বা রাজমন্ত্রী যদি ধর্ম্মপালনে বিশেষ যত্নবান হইতেন, তবে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে নিজের সঙ্গে সমান আসনে বসাইয়া বন্ধু-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দিকে তিনি ফিরিয়াও চাহিতেন না।

রাজকার্য্যের জন্য সর্ব্বক্ষণ দূতেরা হর্ষবর্দ্ধনের কাছে গমনা-গমন করিত। প্রজাদের মধ্যে কোনরূপ অন্যায় আচরণ হইলে হর্ষবর্দ্ধন নিজে সেখানে যাইতেন। ভ্রমণের সময় হর্ষবর্দ্ধন যেখানে যাইতেন, সেখানে সাময়িকভাবে আসন প্রস্তুত করা হইত। বর্ষাকালে তিনি ভ্রমণ করিতেন না। ভ্রমণের সময় তিনি নিজ আবাসে সব ধর্ম্মের লোককে উত্তম ভোজ্যে আহার করাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে যতজন বৌদ্ধ থাকিতেন তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যক থাকিতেন ব্রাহ্মণ। দিনকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া হর্ষবর্দ্ধন তাহার এক ভাগ রাজকার্য্যে এবং এক ভাগ ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিতেন।

হিউয়েন কান্যকুব্জে পৌছিয়া "ভদ্র-বিহার" নামক বিহারে তিন মাস থাকিয়া বীর্য্যসেন নামক একজন ত্রিপিটকাচার্য্যের কাছে বুদ্ধদাস-প্রণীত বিভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এইবার হিউয়েনের সঙ্গে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সাক্ষাৎ হয় নাই; যখন হইয়াছিল তখন ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট এই পণ্ডিত ভিক্ষুকে রাজার অধিক সম্মান দেখাইয়াছিলেন। সে কথা পরে যথাস্থানে বলিব।

হিউয়েন এখন উত্তর-ভারতের প্রায় মধ্যস্থানে আসিয়াছেন। অতঃপর তিনি যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিবার আগে তিনি ভারত সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে সব কথা বলিয়াছেন, এইবার তাহার উল্লেখ করিব।

ভারতের অনেক নাম আছে কিন্তু সবগুলির প্রামাণিকতা বুঝা যায় না। পুরাকালে এই দেশকে "শিনতু" (সিন্ধু?) বা "হিন্তো" বলা হইত, কিন্তু এখন শুদ্ধ-উচ্চারণ অনুসারে ইহাকে "ইন্তু" (ইন্দু) বলা হয়। ইহার অর্থ 'চন্দ্র'। দেশের এই নাম হইবার কারণ এই যে, রাত্রে যেমন চন্দ্রের আলোতে চারিদিক উদ্ভাসিত হয় সেইরূপ মুনিঋষিদের উজ্জ্বল প্রভায় এইদেশ আলোকিত হইয়াছে। 'হিন্দু'-নামের এই যে ব্যুৎপত্তি হিউয়েন দিয়াছেন তাহা বোধহয় পণ্ডিতদের কল্পনা-প্রসূত, কারণ অন্য বহুতর প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে মনে হয়, সিন্ধু নদের নামের অপভ্রংশে এই দেশের নাম 'হিন্দু' হইয়াছিল।

হিউয়েন এদেশের জাতিভেদ, বিস্তার, জলহাওয়া, জ্যোতিষ, পঞ্জিকা, ষড়ঋতু প্রভৃতির বর্ণনা দিয়াছেন। ভারতে দূরত্ব মাপা হইত 'যোজন' দ্বারা; এক যোজন বলিতে সেনাদল একদিনে যতটা কুচ করিয়া যাইতে পারে ততটা দূরত্ব বুঝায়, তাহাও কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন দূরত্বজ্ঞাপক হইয়াছিল। গরুর হাম্বারব যতদূর পৌছে তাহাতে এক ক্রোশ হইত।

নগর ও গ্রামে অনেকগুলি ফটক থাকিত, প্রাকার বিস্তৃত ও উঁচু হইত, রাস্তা ও গলিগুলি আঁকাবাঁকা বিসর্পিত আকারের এবং অপরিচ্ছন্ন ছিল; পথের দুই দিকে দোকান সাজান থাকিত এবং দোকানগুলিতে যথাযোগ্য চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। কসাই, জেলে, নট, জল্লাদ, মেথর প্রভৃতি লোক নগরের বাহিরে বাস করিত এবং নগরের মধ্যে আসিতে হইলে পথের বাঁ পাশ দিয়া চলিত। ইহাদের বাড়ীগুলি মাটির দেওয়াল দিয়া ঘেরা এবং নগরের দেওয়াল ইঁট বা টালি দিয়া গাঁথা হইত। নগর-প্রাকারের উপর বাঁশ ও কাষ্ঠনির্ম্মিত অনেক স্তম্ভ, বাড়ীগুলিতে অলিন্দ ও মিনার থাকিত। এইগুলি কাঠের তৈরী এবং চূন, সুরকি, বা টালিতে আবৃত থাকিত। খড়, শুক্না ডালপালা বা পাটা দিয়া ঘরের ছাদ তৈয়ার হইত। চূন, কাদা ও শুদ্ধতার জন্য গোবর দিয়া দেওয়াল লেপিত হইত।

বিভিন্ন ঋতুতে এ দেশের লোক ফুল ছড়াইত।

সঙ্ঘরামগুলি অতি সুন্দর করিয়া সযত্নে নির্ম্মিত হইত। ইহার চার কোণে চারটি তিনতলা স্তম্ভ থাকিত; কড়ি ও কাঠগুলি বিভিন্ন রকমের চমৎকার আকারে খোদাই করা হইত; দরজা, জানালা এবং দেওয়াল বহুচিত্রিত এবং ভিক্ষুদের কক্ষগুলি ভিতরে চিত্রালঙ্কৃত ও বাহিরে সাদাসিধা হইত। সঙ্ঘারামের ঠিক মধ্যস্থলে খুব বড় ও উঁচু সভাগৃহ (অর্থাৎ, হলঘর) থাকিত। নানা আকারের অনেকতলা ঘর ও প্রকোষ্ঠ প্রভৃতি থাকিত, এগুলি নির্ম্মাণের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। দরজাগুলি পূর্ব্বদিকে খুলিত, রাজার সিংহাসনও পূর্ব্বমুখী হইত।

সাধারণতঃ লোকে মাটিতে আসন পাতিয়া বসিত। সব আসনই প্রায় এক মাপের, কিন্তু রাজা, ধনী ও উচ্চরাজকর্ম্মচারীদের চৌকি ও আসনে অনেক রকম কারুকার্য্য থাকিত। রাজার সিংহাসন বৃহৎ, উচ্চ ও বহু মণিমাণিক্যখচিত হইত এবং মহামূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদিত পাদপীঠও রত্নপরিশোভিত হইত। ধনীরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী চিত্রিত ও অলঙ্কৃত আসনে বসিতেন।

এ দেশের পরিচ্ছদ কাটিয়া সেলাই করিয়া বানান হইত না, পুরুষেরা কোমরে জড়াইয়া বগলের নীচ দিয়া সেই পরিচ্ছদ আনিয়া শরীরের ডান দিকে ঝুলাইয়া দিত। সাধারণতঃ সদ্যধৌত সাদা কাপড়ই লোকে পরিত, মিশ্রিত রঙের বা কারুখার্য্যখচিত কাপড়ের চলন অল্পই ছিল।

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পা পর্য্যন্ত পড়িত এবং তাহাদের স্কন্ধদেশ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিত। স্ত্রীলোকদের মাথার মধ্যস্থানে একটা ঝুঁটির মত এবং বাকি চুল আল্‌গা থাকিত।

পুরুষদের কেহ কেহ গোঁফ কামাইত বা অন্যরূপ অদ্ভুত কাণ্ড করিত! লোকে মাথায় উষ্ণীষ পরিয়া তাহাতে ফুলের মালা ধারণ করিত এবং গলায় রত্নহার দিত। পরিধেয় বস্ত্র সূতা, কাঘায় বা ক্ষেমে প্রস্তুত হইত; চিক্কণ ছাগলোম বা অন্য পশুলোমেও কোন কোন বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঠাণ্ডাদেশ বলিয়া উত্তর-ভারতে লোকে আঁট কাপড়চোপড় ব্যবহার করিত। বৌদ্ধেতর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকে কেহ ময়ূরপুচ্ছের, কেহ গাছের ছালের, কেহ পাতায় প্রস্তুত পরিধেয় পরিত, কেহ বা উলঙ্গ হইয়া থাকিত। কেহ দাড়ি গোঁফ

কামাইয়া ফেলিত, কেহ লম্বা চুল দাড়ি রাখিত, কেহ গলায় নরমুণ্ডের মালা ঝুলাইত। সকল প্রদেশের পরিধানরীতি এক রকম ছিল না। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরা আহার ও পরিধেয় বিষয়ে খুব পরিচ্ছন্ন ছিলেন। রাজা, রাজমন্ত্রী প্রভৃতি বড়লোকেরা মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ করিতেন, মাথায় ফুলের মালা দিতেন, রত্ন-খচিত উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন, এবং রত্নহার ও বলয় পরিতেন। লোকে সাধারণতঃ খালি পায়ে থাকিত, কেহ বা পাদুকা ব্যবহার করিত।

এ দেশের লোকের নাসিকা উন্নত ও চক্ষু উজ্জ্বল হইত। কেহ কেহ দাঁতে লাল বা কাল রং করিত, চুল বাঁধিত ও কান ফুটাইত।

শারীরিক পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এদেশের লোকের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল; ইহারা স্নান না করিয়া আহার করিত না, পূর্ব্বের ভোজনের অবশিষ্ট গ্রহণ করিত না, এবং একপাত্র হইতে একাধিক লোক ভোজ্য গ্রহণ করিত না। পাথর বা কাঠের বাসন একবার ব্যবহৃত হইলে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত, ধাতুপাত্র মাজিয়া ঘসিয়া রাখা হইত। আহারের পর দাঁতন দিয়া লোকে মুখ ধুইত। আচমনের পূর্ব্বে লোকে পরস্পরকে স্পর্শ করিত না। মলমূত্রাদি ত্যাগের পর লোকে স্নান ও চন্দন, হলুদ প্রভৃতি সুগন্ধ বিলেপন করিত। রাজার স্নানের সময় ঢাক বাজিত ও বাজনার সহিত স্তবগান করা হইত। পূজার পূর্ব্বে বা রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে লোকে স্নান করিত।

হিউয়েন আমাদের দেশের বর্ণমালা, লিখনরীতি প্রভৃতিরও বিবরণ দিয়াছেন। মধ্যদেশের (অর্থাৎ, মথুরা হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত ভূভাগ) লোকের ব্যবহৃত ভাষাকে তিনি দেবভাষার মত মৃদু ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়াছেন। এখানকার উচ্চারণ পরিষ্কার, শুদ্ধ ও সর্ব্বদেশের লোকের অনুকরণযোগ্য। প্রত্যন্ত দেশের ভাষাও তাহাদের প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহারের মতই মধ্যদেশের চেয়ে হীন। প্রত্যেক প্রদেশে সেখানকার ভালমন্দ ঘটনাবলীর লিখিত বিবরণ রাখিবার জন্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। এই লিখিত বিবরণগুলিকে 'নীলপিট' বলা হইত।

শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বালকদের দ্বাদশ-অধ্যায়ের 'সিদ্ধবস্তু' নামক গ্রন্থ পড়ান হইত। সাত বৎসর বয়সের পর পঞ্চবিদ্যা শিখান হইত, যথা শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা, হেতুবিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র) ও অধ্যাত্মবিদ্যা। ব্রাহ্মণেরা চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিতেন, যথা আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ (আচার, জ্যোতিষ, ও সামরিক কলাকৌশল) এবং অথর্ব্ববেদ (গুপ্ত-বিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুবিদ্যা)। শিক্ষকরা খুব পণ্ডিত ও জ্ঞানী ছিলেন এবং সযত্নে ও সুকৌশলে ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। প্রায় ত্রিশ বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ছাত্রেরা গৃহে ফিরিয়া উপার্জ্জন আরম্ভ করিয়া প্রথমে গুরুদক্ষিণা দিত। শিক্ষকদের কেহ কেহ মহাজ্ঞানী ছিলেন এবং সংসার হইতে দূরে সরল জীবন যাপন করিতেন: তাঁহারা অর্থ বা যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তাঁহাদের নাম সমাজে রাষ্ট্র হইলে তাঁহারা রাজসভায় না আসিলেও রাজা তাঁহাদের সম্মান দেখাইতেন এবং সকলেই তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিত। এইজন্য তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে পারিতেন। নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা কাজ চালাইতেন, বহু ধন থাকিলেও তাঁহারা জীবিকার জন্য ভিক্ষায় বাহির হইতেন। আবার এমন লোকও দেশে অবশ্য ছিল যাহারা বিদ্যার সমাদর করিলেও আহার, বেশবিন্যাস ও আমোদেই সমস্ত অর্থ ব্যয় করিত।

বৌদ্ধদের মধ্যে হিউয়েন আঠারটি বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখিয়া-ছিলেন, ইহারা সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-কলহ করিত। কাহারও খ্যাতি খুব বাড়িলে তিনি সভা ডাকিয়া বিচার-তর্ক করিতেন এবং অপর পক্ষের দোষগুণ বিচার করিতেন। যিনি তর্কশক্তি, প্রতিভা বা ভাষানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারিতেন, তাঁহাকে সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে বসাইয়া সঙ্ঘারামের ফটক পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইত; যে তর্কে পরাজিত হইত, বা ন্যায়-শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিত বা ভাষার দৈন্য প্রকাশ করিত, তাহার মুখে রঙ্ মাখাইয়া গায়ে ধূলাকাদা দিয়া মাঠের মধ্যে রাখিয়া আসা হইত।

খুব সাহসী লোকদের মধ্য হইতে সেনানায়কদের বাছিয়া লওয়া হইত। সেনানায়করা রাজপ্রাসাদের চারিপাশে ছাউনি করিয়া বাস করিত, তাহারা যুদ্ধের সময় সেনাদলের পুরোভাগে থাকিত। সেনাদল পদাতিক, অশ্ব, হস্তী ও রথ এই চারি অঙ্গে বিভক্ত ছিল। হস্তীগুলির দেহ সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত এবং তাহাদের দাঁতে তীক্ষ্ণ কাঁটা লাগান থাকিত। একজন সেনা-

নায়ক রথে বসিয়া যুদ্ধসংক্রান্ত আদেশ দিতেন, তাঁহার দুইপাশে বসিয়া রক্ষীরা রথ চালাইত; রথে চারটি ঘোড়া থাকিত। সেনাপতি রথে বসিয়া থাকিতেন এবং রক্ষীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রথচক্রের পাশে পাশে চলিত। অশ্বারোহী সেনারা সকলের আগে চলিয়া অক্রমণ নিবারণ করিত এবং যুদ্ধের সময় ইতস্ততঃ সংবাদ বহন করিত। পদাতিকরা আক্রমণরোধে সহায়তা করিত। সাহস ও বল দেখিয়া পদাতিকদের সেনাদলে লওয়ার নিয়ম ছিল। পদাতিকদের হাতে লম্বা বল্লম ও প্রকাণ্ড একটি ঢাল, কখনও বা তলোয়ার থাকিত: এই অস্ত্র হাতে লইয়া সুতীব্রবেগে তাহারা যুদ্ধে অগ্রসর হইত। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রগুলি সূচ্যগ্র ও সুতীক্ষ্ণ হইত। বর্শা, ঢাল, ধনু, বাণ, তলোয়ার, ছোরা, কুড়ালি, বল্লম, পরশু, শক্তি প্রভৃতি এবং অনেক রকমের ক্ষেপণাস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত।

দেশের সাধারণ লোক স্বভাবতঃ লঘুচিত্ত হইলেও সাধু ও সরল প্রকৃতির ছিল। অর্থসম্বন্ধীয় ব্যাপারে তাহারা কখনও কাহাকেও ঠকাইত না এবং রাজবিচারে তাহারা করুণা দেখাইত। পরজন্মের কর্ম্মফলকে তাহারা বড় ভয় এবং বর্ত্তমান জীবনের ঘটনাকে তাচ্ছিল্য করিত। লোকের সঙ্গে ব্যবহারে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা বা জুয়াচুরি করিত না এবং কখনও প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত না।

রাজার শাসন খুবই সদয় এবং লোকের ব্যবহার বড় নম্র ও মধুর ছিল। অপরাধী বা রাজদ্রোহী লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল; রাজ্যে গোলযোগ অতি কদাচিৎ হইত। রাজশাসন অমান্য বা আইন ভঙ্গ করিলে সে বিষয়ে তন্ন-তন্ন করিয়া বিচার করা হইত এবং অপরাধীকে কারারুদ্ধ করা হইত। শারীরিক শাস্তি কিছুই দেওয়া হইত না বটে কিন্তু অপরাধী মরুক বা বাঁচুক কেহই তাহা গ্রাহ্য করিত না, তাহাকে মানুষের মধ্যেই গণনা করা হইত না। সমাজবিধি বা ধর্ম্মনীতি উল্লঙ্ঘন করিলে, বিশ্বাস ভঙ্গ বা মাতাপিতার আদেশ অবজ্ঞা করিলে অপরাধীর নাক-কান বা হাত-পা কাটিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বনে-জঙ্গলে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া অন্য অপরাধে অর্থদণ্ড হইলেও শাস্তি মার্জ্জনা করা হইত। ফৌজদারি মামলার তদন্তের সময় প্রমাণসংগ্রহের জন্য কোনরূপ শারীরিক অত্যাচারের ব্যবস্থা ছিল না; অপরাধী যদি সরল ভাবে দোষস্বীকার করিত তবে তদনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা হইত, কিন্তু জেদ করিয়া দোষ অস্বীকার করিলে বা অপরাধ সত্ত্বেও মিথ্যা-প্রমাণের চেষ্টা করিলে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য শাস্তির পূর্ব্বে চার রকম পরীক্ষা করা হইত—যথা, জলপরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষা, ওজনপরীক্ষা ও বিষপরীক্ষা। জলপরীক্ষায় অপরাধীকে থলির মধ্যে পুরিয়া পাথরের পাত্রে বসাইয়া গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত, যদি সে ডুবে ও পাত্র ভাসে তবে সে অপরাধী এবং যদি পাত্র ডুবে ও সে ভাসে তবে সে নিরপরাধ। অগ্নিপরীক্ষায় একটি লোহার চাদর গরম করিয়া অপরাধীকে তাহাতে বসাইয়া তাহার উপর হাত পা রাখিতে বা চাটিতে বলা হইত; যদি ফোস্‌কা পড়ে তবে সে অপরাধী, যদি ফোস্‌কা না পড়ে তবে সে নিরপরাধ। দুর্ব্বল বা ভীরু লোক এই পরীক্ষায় ভয় পাইলে একটি ফুলের কুঁড়ি আগুনের কাছে ফেলা হইত, যদি কুঁড়ি পুড়িয়া যাইত তবে সে অপরাধী আর যদি কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিত তবে সে নিরপরাধ। ওজন-পরীক্ষায় অপরাধীকে দাঁড়িপাল্লায় একটি পাথর দিয়া সমভাবে বসান হইত; যদি লোকটি ঝুলিয়া পড়ে তবে সে নিরপরাধ। বিষপরীক্ষায় একটি ভেড়ার ডান উরুতে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহাতে অপরাধীর খাদ্যের কিয়দংশ বহুবিধ বিষ মিশ্রিত করিয়া লাগান হইত; যদি ভেড়া মরিয়া যাইত তবে সে অপরাধী, যদি বাঁচিত তবে সে নিরপরাধ।

হিউয়েন এ দেশের বহুবিধ নমস্কার, প্রণাম ও অভিবাদন-প্রথার, চিকিৎসার এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তিন রকমের ছিল, দাহ, জলে বিসর্জ্জন এবং অরণ্যে বর্জ্জন। বৃদ্ধেরা, আশাহীন রোগীরা কখনও কখনও স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিত; আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে শেষ আহার করিবার পর ইহারা নৌকায় করিয়া বাজনা বাজাইয়া গঙ্গার মাঝখানে গিয়া জলে লাফাইয়া পড়িত। ইহাতে দেবজন্ম হইবে অনেকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কখন কখন এইরূপ স্বেচ্ছায় মৃত্যু-বরণকারীদের এক আধ জনকে অর্দ্ধজীবিত অবস্থায় নদীর চড়ায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত।

দেশের শাসনব্যবস্থা সদয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া শাসনযন্ত্র সরল ছিল। গৃহ ও পরিবার-পরিজনের কোন

তালিকা রাখা হইত না। লোককে বেকার খাটান হইত না। রাজার খাসজমি চারভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ হইতে রাজ্যশাসনব্যয় ও পূজাদির ব্যয়নির্ব্বাহ হইত; দ্বিতীয় হইতে মন্ত্রীদের ও প্রধান রাজকর্ম্মচারীদের বেতন প্রদত্ত হইত; তৃতীয় হইতে যোগ্য ব্যক্তিদের বৃত্তিদান এবং চতুর্থ হইতে ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রভৃতিকে দান করা হইত। রাজকর লঘু ছিল, লোকের কাছে রাজা নিজের জন্য অল্পই কাজ আদায় করিতেন। সকলেই নিজ নিজ সম্পত্তি শান্তিতে রক্ষা করিত ও ভরণপোষণের জন্য সকলেই চাষবাস করিত। যাহারা রাজার জমি চাষ করিত তাহারা উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজাকে করস্বরূপ দিত। নদী-পারাপারের সেতু, রাস্তা প্রভৃতি ব্যবহারের জন্য নামমাত্র শুল্ক লওয়া হইত। সাধারণের কাজের জন্য লোকের প্রয়োজন হইলে লোককে জোর করিয়া কাজ করান হইত বটে, কিন্তু কাজের জন্য যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইত।

সেনাদল প্রত্যন্তদেশ রক্ষা করিত, বিদ্রোহ দমন করিত এবং রাজপ্রাসাদ পাহারা দিত। প্রয়োজন অনুসারে লোককে সেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হইত; তাহাদের নির্দ্ধারিত পুরস্কার থাকিত এবং প্রকাশ্যভাবে তাহাদের কাজে ভর্ত্তি করা হইত। রাজভৃত্যদের প্রত্যেকের ভরণপোষণের জন্য নির্দ্ধারিত জমি ছিল।

পেঁয়াজ রশুন কেহ খাইত না, যাহারা খাইত তাহাদের নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইত। মাছ, মেষমাংস, মৃগমাংস প্রভৃতি সাধারণতঃ টাট্‌কাই খাওয়া হইত, কখন কখন লোনাও খাওয়ার রীতি ছিল। শূকর, মোরগ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট মাংস খাইলেও নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। লোকে অনেক রকমের মদ্যপান করিত। ক্ষত্রিয়েরা আঙ্গুর-রস বা ইক্ষু-রস পান করিত, বৈশ্যেরা সুগন্ধি মদ্য পান করিত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণরা আঙ্গুর-রস ও ইক্ষু-রসের একরকম সরবৎ পান করিত কিন্তু তাহা পচান বা মাদক নয়। হিউয়েন জাতিভেদ-প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বিবাহদ্বারা লোকে জাতিতে উঠিত বা নামিত; ইহাতে মনে হয় সে সময়ে অসবর্ণ বিবাহের খুব প্রচলন ছিল।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হিউয়েন যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে উত্তর-ভারতের অবস্থা, সব সময়েই যে এরূপ ছিল তাহা মনে করা ঠিক হইবে না।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপে ভয়ের রাজত্ব

স্যর ফিলিপ গিব্‌স্ বর্ত্তমান ইংলণ্ডের সাংবাদিক জগতে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কিছুদিন পূর্ব্বে 'ইউরোপীয়ান জার্নি (European Journey)' নামে তাঁহার একখানি বই বাহির হইয়াছে। কয়েক মাস ধরিয়া তিনি ফ্রান্স, জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নিতান্ত অখ্যাত গ্রাম্য ব্যক্তিদির সহিত সাধারণ কথাবার্ত্তায় দেশের দেশের সত্যকার অবস্থা জানিবার চেষ্টা করেন—এই পুস্তকে তিনি তাঁহার সেই চেষ্টার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ফ্রান্সের লোক তাঁহাকে বলিয়াছে: শতকরা নিরনব্বইটি ফরাসী মধ্যপন্থী; ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে ইস্পাতের তরবারির মত ইংলণ্ড পড়িয়া আছে।

সুইজার্ল্যাণ্ডে গিয়া শুনিলেন: জাপান কর্ত্তৃক চীনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারাতেই লীগের শক্তি বোঝা গিয়াছে।

ইটালীতে শুনিলেন: ফ্যাসিজমের পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, তাহার চাইতে দেশের অবস্থা ভাল হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, সাধারণ দেশবাসী সর্ব্বদা ত্রাসের মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে। সকল দেশেরই ভয়, পাছে আর একটি যুদ্ধ বাধে। জার্ম্মানীতে ভয়, রুষে জাপানে যদি সঙ্ঘর্ষ বাধে এবং ফ্রান্স যদি রুষের সঙ্গে যোগদান করে, তবে জার্ম্মানীরও বিপদের মধ্যে না গিয়া উপায় নাই। ফ্রান্সে ভয়—বুঝি যুদ্ধ বাধিল। ফ্রান্সে ও জার্ম্মানীতে একটা বোঝাপড়া হওয়ার দরকার—সকল দেশেই সব লোক এই কথা বলাবলি করিতেছে। ইংলণ্ডের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু ইংলণ্ডের ভয়—পাছে কোন দলাদলির মধ্যে গিয়া পড়িতে হয়।

প্লাবন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
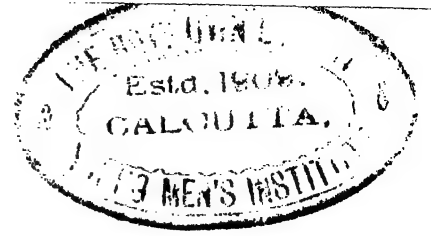
—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছায়ার পড়িবার ঘরটি বিলাতী ছাঁদে নয়নাভিরাম করিয়া সজ্জিত। কক্ষের ভূষণে ছায়ার সৌন্দর্য্য ও রুচিজ্ঞানের পরিচয় সুপরিস্ফুট। ছায়া মেধাবিনী, বিমল মনে মনে ইহা বুঝিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মনোযোগিতা কোন সময়েই যেন খাপ খায় না। ছায়া যতটুকু পড়ে, সহজেই তাহা আয়ত্ত করে; কিন্তু পড়ায় মন বসাইতে তাহার আগ্রহের একান্ত অভাব। ছায়া স্পষ্টই বলে, লেখাপড়ায় তাহার মন বসে না; তাহার বাবা তাহাকে অব্যাহতি দিতে রাজী, কেবল মা'র জেদেই 'বুড়া বয়সে'ও তাহাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য আবার এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে।

ছায়ার স্বামী অশোক বিলাতে। বিবাহের তিনদিন পরে, অর্থাৎ ফুলশয্যার পরদিন ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাতে গিয়াছে। তিন বৎসর অতীতপ্রায়, পড়া-শুনা কিরূপ করিতেছে তাহা জানিতে পারা যায় নাই; পাস যে করে নাই তাহা সকলেই জানে। প্রথম বৎসর অশোক প্রতি মেলে ছায়াকে দীর্ঘ পত্র লিখিত; দ্বিতীয় বৎসরে পত্র হ্রস্ব হইয়াছিল; তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে পত্র-সংখ্যা কমিয়া যায়; কয়েক মাস হইতে অশোকের পত্র দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে। ছায়ার পিতার আত্মীয় বন্ধু ও বন্ধুপুত্র, যাঁহারা বিলাতে আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে যে সমস্ত সংবাদ সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে সকলেই মর্ম্মাহত। অশোক সে-দেশে আছে সত্য, কিন্তু কখন্ যে কোথায় থাকে, কোথায় তাহার বাসা, 'ইনে' আছে অথবা 'ইন্' ছাড়িয়াছে কোন খবর কাহারও জানা নাই। মাঝে মাঝে রাত্রে লণ্ডনের আলোকিত রাজপথে অশোককে দেখা যায় বটে, কিন্তু যে-ভাবে দেখা যায় তাহা লিখিতে অনেকেরই প্রবৃত্তিতে বাধিয়াছে।

তাঁহাদের প্রবৃত্তিতে বাধিলেও এখানকার লোকের অনুমানে বাধা জন্মিল না। অশোকের আত্মীয়-স্বজন যেমন, বৃদ্ধ পিতা তদবধি শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, উঠিবেন সে ভরসা নাই। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ছায়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল. বৃদ্ধ পুত্রবধূর মুখদর্শনেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা, ইহার বাপ-মা তাঁহার ছেলেটিকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, টাকা দিয়া বিলাত পাঠাইয়া তাহার ইহকাল ও সেই সঙ্গে পরকালের মাথাও খাইয়াছেন। এই কালেও তাঁহার বিশ্বাস, ব্রাহ্মরা ম্লেচ্ছ, তাহারা সকল জাতির ছোঁয়া খায় এবং গোমাংস ব্যতিরেকে তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। বৃদ্ধ পাড়াগাঁয়ের লোক, কলিকাতার লোকের কথায় তাঁহার নিদারুণ অবিশ্বাস। কলিকাতার লোক প্রাণান্তে সত্য বলে না, ইহা তাঁহার আর একটি বিশ্বাস।

ছায়াদের গৃহে এই ব্যাপারে তেমন চাঞ্চল্য দেখা যায় নাই। মিঃ ঘোষ নিজে বিলাতে ছিলেন, ব্যারিষ্টার। তিনি বলেন, অধিকাংশ যুবাই দিন কতক একটু বিগড়ায়, তারপর ঘুরিয়া আসে। তাঁহাদের সময়ের প্রায় সব ছাত্রই সময় বিশেষে একটু-কি-বলে-তাই হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে না ফিরিয়াছে কে? সংসারই বা না গড়িয়াছে কে? ছায়ার মা প্রথমটা খুব রাগ করিয়াছিলেন, টাকা বন্ধ করিয়া জামাতাকে শাস্তি দিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, পরে আবার শান্ত হইয়াছেন। ফর্সা মেয়ে বিয়ে করিবার জন্য যে দেশের ছেলেরা পাগল, গোরোচনা গৌরীর দেশে গিয়া তাহাদের যদি একটু মতিভ্রান্তি ঘটে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ছায়ার আচরণ অতীব আশ্চর্য্যজনক। অশোকের অধঃপতনের সংবাদ তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিয়াছে এমন মনে হয় না।

এত সব ব্যাপার বিমলের জানিবার বা শুনিবার কথা নয়, ছায়া-ই সবিস্তারে তাহাকে জানাইয়াছে। ধনী বা তথাকথিত আধুনিক সমাজের সহিত বিমলের কোন পরিচয় ছিল না; এই সমাজের গঠনবিন্যাস সম্বন্ধেও তাহার কোন জ্ঞান ছিল না। অশোক বিলাতে যে কীর্ত্তি করিয়াছে, এই সমাজে তাহার

সহজ ভাবে, গল্পচ্ছলে সব কথা বলিতে শুনিলা বিস্ময়ের তাহার অবধি রহিল না। প্রথমটা এই সব গল্প শুনিতে তাহার আগ্রহের অভাব ছিল; ছায়ার বাক্যস্রোতে বাধাও দিয়াছিল কিন্তু ছায়া তাহা গ্রাহ্য করে নাই।

কন্যার ভবিষ্যৎ-জীবন গঠনে মিসেস ঘোষ অতিমাত্রায় সজাগ। বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি কন্যাকে নৃত্য-গীতাদিতে পারদর্শিনী করাইয়া লইয়াছিলেন; আদব কায়দা ও আধুনিক হাব-ভাব সম্বন্ধেও ছায়া পিছাইয়া ছিল না; কেবল লেখা-পড়ায় তাহাকে উন্নত করিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে তিনি তৎপ্রতি অবহিত হইয়াছেন। মেমেদের দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অশোক যেন একটি দেশী-মেমই পায়, মেয়েকে মিসেস ঘোষ সেই ভাবেই প্রস্তুত করিতে যত্নবতী হইয়াছেন।

আজও বিলাতের কথা উঠিয়া পড়িয়াছিল। ছায়া অঙ্কের বই, খাতা বন্ধ করিয়া বলিল, মিষ্টার রায়, এমন কোন ব্যবস্থা হ'তে পারে না যাতে অঙ্কটা বাদ দিয়ে পরীক্ষায় পাস করা যায়?

বিমল বলিল, এখানে তেমন ব্যবস্থা নেই, শুনিছি বিলেতে আছে।

—বিলেত দেশটা বেশ, বলিয়া ছায়া টেবিলের উপর রক্ষিত অশোকের ফটোখানির দিকে চাহিল।

বিমল হাসিয়া বলিল, আপনি বিলেত গেলেন না কেন? তা' হলে ত—

তির্য্যক গতিতে ফিরিয়া ছায়া প্রশ্ন করিল—তা' হলে কি?

বিমল যেন একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; বলিল, তা হ'লে অঙ্ক নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করতে হত না।

ছায়া হাসিল; বলিল, তা ঠিক।

এক মিনিট পরে আবার বলিল, দেখুন মিষ্টার রায়, পাস আমি করতে পারব না, সে আমিও জানি; আপনিও জানেন। মা জেনেও জানতে রাজী ন'ন। আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

—কি বলুন?

—আপনি সন্ধ্যাবেলা না এসে, বিকেলে আসতে পারেন না?

বিমল চিন্তিত ভাবে বলিল, বিকেলে?

ছায়া কহিল, হাঁ। আপনি ত আর কোথাও কাজ করেন না বলেছেন, বিকেলে আপনার কি বিশেষ অসুবিধে আছে?

বিমলের মন বলিল, অসুবিধা একটু আছে বৈকি! একজন সারাদিন ধরিয়া তাহারই আশা পথ চাহিয়া থাকে, তাহাকেই নিরাশ করিতে হয়। আজ বিকালটা নিষ্ফল গিয়াছে, দেখা হয় নাই, বোধ হয় সে গৃহে ছিল না; দুইবার বাড়ীটার সামনের পথ ধরিয়া বিমল হাঁটিয়া গিয়াছে, আসিয়াছে, ইন্দুর দেখা পায় নাই। কাল নিশ্চয়ই ইন্দু সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, পরেও থাকিবে। শুধু চোখের দেখা! তাহা হইতেও, তাহাকে বঞ্চিত করিতে মন সরে কৈ?

তাহাকে নীরব দেখিয়া ছায়া আবার বলিল, আপনার সুবিধে না হয় যদি, তবে যেমন আসেন, তেমনই আসবেন।—তারপর, একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, আমার কিন্তু সন্ধ্যেবেলাটা বই নিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না। ডিনারের আগে পর্য্যন্ত কত লোক আসেন, কত গল্পগুজব হয়, আমিই শুধু বাদ পড়ে থাকি।

বিমল দ্বিধা পরিহার করিয়া বলিল, বেশ আমি কাল থেকে বিকেলেই আসব।

ছায়ার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; সাগ্রহে কহিল, বিশেষ অসুবিধে হবে না ত আপনার?

—অসুবিধে কিছু না। তবে—বিমল থামিয়া গেল। ছায়া কথাটার শেষ জানিবার জন্য কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; তারপর জিজ্ঞাসিল, 'তবে' ব'লে থামলেন যে?

এই সময়ে সামনের পর্দ্দাটা ফাঁক করিয়া টাই-আঁটা একটি সুশ্রী ও আধুনিক-ভাবাপন্ন যুবক উঁকি মারিতেই, ছায়া বলিল, এক মিনিট, আমি আসছি, বলিয়াই সে বাহির হইয়া দশ পনেরো মিনিট কাটাইয়া আসিল। এই যুবকটিকে বিমল কয়দিনই এই সময়ে আসিতে দেখিয়াছে।

বিমল যে কৌতূহলবর্জ্জিত মানব তাহা নহে; তবে অনধিকার-চর্চ্চার প্রবৃত্তি দমন করিবার অভ্যাস আছে বলিয়া কোনদিন ছায়াকে কোন প্রশ্নই সে করে নাই। আজও করিল না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া ছায়া নিজেই আজ কৈফিয়ৎ দিতে বসিল। বলিল, ও আমার কাজিন, সমীর ওর নাম, সিনিয়র কেম্বিজ পাস ক'রে ব'সে আছে, অক্সফোর্ডে সীট্ পাচ্ছে না। রাত আটটা ন'টা পর্য্যন্ত আমি পড়ার ঘরে আটকা থাকি বলে ওরা সব ভারি

ডিসাপয়েন্টেড হয়ে ফিরে যায়। তাইত আপনাকে বলছিলুম। ওদের ডিসাপয়েন্ট করতে আমার ভারি খারাপ লাগে।

শেষ কথাটা বিমলের বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল। তবুও সে সংযতভাবে বলিল, কাল থেকে তাই হবে মিসেস বোস।

ছায়া আনন্দ-আপ্লুতকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনি আমায় মিসেস বোস বলেন কেন? আমাকে ছায়া বলেই ত' সবাই ডাকে।

বিমল হাসিল।

ছায়া বলিল, ইন্দু ব'লে যে মেয়েটিকে আপনি পড়াতেন, তাঁকেও কি আপনি আপনি বলতেন?

বিমল অপরাধীর মত উত্তর করিল, না।

—তবে আমাকেই বা আপনি-আপনি করেন কেন?

বিমল ভাবিতেছিল, ইহার কি সদুত্তর দেওয়া যায়?

ছায়া জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দু ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস ক'রে আই-এ পড়ল না কেন?

বিমল বলিল, সে'ও আপনারই জুড়িদার, পড়তে চায় না।

ছায়া অকৃত্রিম দুঃখের স্বরে কহিল, আমার জুড়িদার কেন হতে যাবেন তিনি! তিনি ত ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করেছেন।

—তা ক'রেছেন!

—আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়?

বিমল বলিল, হয়।

—আপনি তাঁকে পড়তে বলেন না?

—না।

—কেন?

বিমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কি হবে পড়ে?

ছায়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, ঠিক বলেছেন মিঃ রায়। আমরা ত আর চাকরী করতে যাচ্ছি নে। মা যে এ কথাটা কিছুতেই বোঝেন না।

ইহার কয়েক দিন পরে, বিকালে পড়াইতে আসিয়া বিমল দেখিল, অনেকগুলি বিবাহের প্রীতি-উপহার ছড়াইয়া, ছায়া একমনে কবিতা লিখিতেছে। নমস্কার করিয়া, বিমলকে বসাইয়া বলিল, আমার এক কাজিনের বিয়ে। সমীরকে ত আপনি দেখেছেন, তার দাদা প্রবীরের বিয়ে। প্রবীরও আমার গ্রেট ফ্রেণ্ড! আমার ওপর কবিতা লেখার ভার। লিখছি কিন্তু ভাল হচ্ছে না, আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে।

বিমল হাসিয়া কহিল, কবিতার যে আমি কিছুই বুঝি নে ছায়া।

—না, আপনি আবার বোঝেন না! আমি ব'লে আপনার ভরসাতেই এই ভার নিলুম! আপনার আরও কিছু কাজ আছে মিঃ রায়।

—আমার আবার কি কাজ?

—আমাদের সমাজের বিয়েতে প্রোগ্রাম ছাপা হয় জানেন ত?

—না।

—হয়। তাতে সংস্কৃত মন্ত্রগুলিকে ভেঙ্গে বাঙলা করতে হয়। সেইটি আপনাকে করে দিতে হবে।

—তা বোধ হয় পারব।

ছায়া চেয়ার ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, বয়কে বলি চা দিতে, কেমন?

বলিতে হইল না, তন্মুহূর্ত্তে 'বয়' চা লইয়া প্রবেশ করিল। চা প্রস্তুত করিয়া ছায়া বিমলকে দিল, নিজে লইল। তারপর, একখানা হরিদ্রাবর্ণের তুলোট কাগজে ছাপা ছিন্নপ্রায় প্রোগ্রাম দেখাইয়া বলিল, ওতে বিয়ের মন্তরগুলো আছে, ওরই অনুবাদ করতে হবে।

বিমল প্রোগ্রামটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। ছায়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে যাইতে, এক সময়ে প্রশ্ন করিল, এ আপনার কেমন মনে হয়?

বিমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

এই যে, বলিয়া সে একটা স্থান দেখাইয়া দিল। বিমল পড়িল:

ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

ইন্দু বলিল, অসহ্য ন্যাকামী ব'লে মনে হয় না আপনার?

—না।

—আমার ত হয়। "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক", আবার অনেকে ঐ সঙ্গে বলে কি জানেন?—উভয়ের মিলিত হৃদয় ঈশ্বরের হউক,—বিয়ে করতে ব'সে কোনও বর বা কোন বধূ এ কথা যে মনে করে, আমি তা মানি নে।

বিমল সহজ ও সরল হাস্যের সহিত প্রশ্ন করিল, তুমি মনে কর নি ছায়া ?

—একবারও না।

—কিন্তু মন্ত্রটি বলেছিলে ত ?

ছায়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, ওটা ত আমার বলবার নয়। ওটা যে—

বিমল কাগজটা দেখিয়া লইয়া ত্রুটী স্বীকার করিল, তাই বটে। তারপর সমস্ত প্রোগ্রামটা আগাগোড়া চক্ষু বুলাইয়া লইয়া বলিল, বিয়ের মন্ত্র বাঙলাতেই হওয়া উচিত। বেশীর ভাগ ছেলে মেয়ে ভাল করে সংস্কৃত জানে না, পুরুত ম'শায় অং-বং ক'রে মাথামুণ্ড যা আউড়ে যান, বর ক'নে তার কতক উচ্চারণ করে শুধু, বেশীর ভাগ উচ্চারণও করতে পারে না, তা মানে বোঝা ত পরের কথা। আপনাদের ব্রাহ্ম-সমাজের ব্যবস্থাটি বেশ।

ছায়া মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, তা হ'লে আপনি যখন বিয়ে করবেন, ব্রাহ্ম-সমাজের ব্যবস্থাটিই রাখবেন।

বিমল মনে মনে প্রসন্ন না হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ না করিয়া, বলিল, বিয়ে করলে ত !

—কেন, বিয়ে করবেন না ?

—না।

ছায়া আব্দার ধরিল, কেন বলুন না ?

বিমল ম্লান হাসিয়া নত মুখে বলিল, গরীবের কি ঘোড়া-রোগ সাজে ?

কথাগুলা তাহার নয় ; কিন্তু সেগুলা বুকের ভিতরে যেন জাঁতিয়া বসিয়া আছে। শ্লেষ্মারোগী শ্লেষ্মা উঠিলে যেমন স্বস্তি বোধ করে, কথাটা বলিয়া বিমলও একটু স্বস্তি পাইল।

কেহ বিবাহ করিবে না শুনিলে, কেন জানি-না নারী-মাত্রেরই দুঃখ হয়। ছায়াও নারী এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও নয়। দুঃখিত ভাবে কহিল, কিন্তু মিঃ রায়, আপনার চেয়েও যারা গরীব তারা কি বিয়ে করে না ?

—তারা কি করে জানি নে ;—কিন্তু, আপনি পড়বেন কখন ?

—হ্যাঁ ! আজ আর পড়েছি ! কবিতা দু'টো শেষ করতেই হবে, তারপর আপনাকে দিয়ে কারেক্ট করিয়ে রাত্রে সমীরকে দোব, সে বলেছে খুব আর্টিষ্টিক ক'রে ছাপিয়ে এনে দেবে। আপনি ততক্ষণ এইটে দেখুন না ! আমি পড়ব ? আচ্ছা—

এতদিনের ভালবাসা
কত প্রেম কত আশা—

পড়িতে পড়িতে থামিয়া, টীকা করিল, প্রবীর রেণুকে অনেক দিন থেকে ভালবাসত কি-না, এনগেজ্‌ড-ই ত' ছিল প্রায় দু বছর, সবাই এক রকম ডিসগাস্টেড হয়ে গেছল। লং এনগেজমেণ্ট ইজ নো গুড। আপনি কি বলেন মিঃ রায় ?

বিমল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল। ভদ্রঘরের কোন যুবতী বিবাহিতা মেয়ে যে এই সকল কথা একজন অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধে কহিতে পারে ইহা তাহার কাছে কল্পনার অতীত। তাহার মনের মধ্যে যে মন থাকে, সেই মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। মাঝে মাঝে ছায়ার মুখের উপর, দেহের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া সে শুধু নিজের বিস্ময়ের বোঝা বৃদ্ধি করিতেছিল।

ছায়া কবিতা সংশোধনে মন দিয়াছিল, শেষ করিয়া মুখটি তুলিয়া বলিল, এইখানটায় বড্ড আটকেছে—

পূর্ব্বরাগ শেষ হ'লো
অনুরাগ-পালা প'লো
বাকী শুধু—

'মান' করব না 'বিরহ' করব ? মান থাকলে 'প্রাণ'-এর সঙ্গে বেশ মিল হয়। এই যে প্রণয়-দাদা। একেবারে সাইকোলজিক্যাল মোমেণ্টে এসে পড়েছ।

পর্দ্দা সরাইয়া 'অদৃষ্টের পরিহাস' নাটকের লেখক ডেপুটী প্রণয়কুমারের প্রবেশ।

—তোমার মা কোথা ?

বোধ হয় শোবার ঘরে, চেঞ্জ করছে, বেরোবো। কিন্তু তুমি আমার কবিতা দুটো ঠিক ক'রে দিয়ে যাও। মিঃ সেন, ইনি আমাদের গ্রেট ফ্রেণ্ড, মিঃ রুদ্র। প্রণয়-দা, ইনি মিঃ রায়। আমি পড়ি ওঁর কাছে।

'হা ডু ডু', বলিয়া প্রণয়কুমার হস্ত প্রসারিত করিলেন। অনুমানে ভর করিয়া বিমল হাত বাড়াইতে, করমর্দ্দন করিয়া 'ভেরী গ্ল্যাড টু মিট ইউ' বলিয়া, প্রণয় ছায়াকে বলিল, তোমার মাকে ডাক, একটা নেমন্তন্ন ক'রে যাই।

—কিসের নেমন্তন্ন প্রণয় দা ? তোমার বিয়ের নাকি ? কবে ? কোথায় ? তোমার নবীন জীবনসঙ্গিনীর কথা বল কিছু, শুনি, আমি আগেই কনগ্রাচুলেট করছি।

—না, না, ওসব নয়, ওসব নয়। আমাদের বাড়ীর ছেলেরা আমার লেখা একটা নাটক প্লে করবে, তারই নেমন্তন্ন।

—পুওর নেমন্তন্ন! আমি কোথায়—

—মা'কে ডাক, আমার এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে।

—মা এখনি আসবে প্রণয় দা, তুমি বস না। ঐ বুঝি কার্ড? দেখি বলিয়া ছায়া প্রণয়ের হাত হইতে খামে বন্ধ কার্ড একখানি টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল; পরে বলিল, প্রণয় দা, মিঃ রায়কে তুমি আসতে বলবে না?

কবি বা সাহিত্যিক যশঃপ্রার্থীর নিকট ইহাপেক্ষা প্রিয় কার্য্য হইতে পারে না, প্রণয় সাগ্রহে বলিলেন, নিশ্চয়! সাদা কার্ড আমার সঙ্গেই রয়েছে, নামটা বল ত ছায়া?

বিমল অস্পষ্ট স্বরে ছায়ার উদ্দেশ্যে কহিল, আমাকে কেন আবার? আমি ও সবের কি বা বুঝি?

ছায়া সে কথায় যেন কর্ণপাত না করিয়াই বলিল, সুবিমল রায়, এম-এ।

প্রণয় কার্ডে নাম লিখিয়া, আবার খামে ভরিয়া, খামের উপরে নাম লিখিয়া বিমলের হাতে দিয়া বলিল, আসবেন কিন্তু।

ছায়া উঠিয়া গিয়া প্রণয়ের কাঁধের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, প্রণয় দা, শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

প্রণয়কে লইয়া ছায়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছিল, বিমল দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজ ত আর তুমি পড়ছ না, আমি যাই।

—কাল আসছেন ত? আচ্ছা, শুভরাত্রি।

উভয়কে নমস্কার করিয়া বিমল ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল। তখন সেই ঘরেই ইহাদের গল্প জমিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সংসারের ভার পাইয়া ইন্দু যেন বাঁচিয়া গিয়াছে। এই কাজে যে এত আনন্দ ও মাদকতা ছিল, তাহা কোনদিন সে ধারণাতেও আনিতে পারিত না। ঠাকুর, চাকর, ঝি, আশ্রিত, প্রতিপাল্য সকলেই তাহার পানে চাহিয়া আছে; তাহার আদেশ পালন করিবার জন্য, তাহার নিকট একটু আদর, একটু যত্ন পাইবার জন্য সকলেই উন্মুখ হইয়া আছে। ইন্দুও সমস্ত ভার এমন ভাবে হাতে তুলিয়া লইয়াছে, কোথায় এতটুকু ফাঁকও থাকিতে দেয় নাই। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবার ভারও সে নিজের হাতে লইয়াছে।

ইহাতে ইন্দুর লাভও হইয়াছে অনেক। সময় যে কোথা দিয়া, কেমন করিয়া স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়, তাহা সে বুঝিতেও পারে না। মাও একেবারে বদলাইয়া গিয়াছেন। আগে এই খাম-খেয়ালী মেয়েটির উপর তিনি প্রায়ই অপ্রসন্ন থাকিতেন, এখন তাঁহার মুখখানি সর্ব্বদাই প্রসন্নতামণ্ডিত। ইন্দু যেন বাঁচিয়া গিয়াছে।

কিন্তু দিনের আলো যখন নিভিয়া আসে, স্কুল-কলেজ-প্রত্যাগত ছাত্রদল, কর্ম্মান্তে শ্রমক্লিষ্ট শুষ্কমুখ কেরাণীবাবুরা কেহ বাজারের পুঁটলী হাতে, কেহ কাগজে জড়ান টিফিনের বাক্স হাতে সামনের রাস্তা দিয়া গৃহে ফিরিয়া যান, দিনের কাজ শেষ করিয়া ফেরিওয়ালারা শ্রান্তকণ্ঠে হাঁকিয়া হাঁকিয়া চলিয়া যায়, রাস্তার ধারের গ্যাসের আলো অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে, পথ জনবিরল হইয়া পড়ে, তখন আর ইন্দু আপনাকে সম্বরণ করিতে পারে না। সেদিন তাহারা গৃহে ছিল না, বিমল আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে কি না জানে না, তারপর দিন হইতে রোজই অপরাহ্নে সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলিয়া ইন্দু বারান্দাটিতে আসিয়া সেলাই লইয়া, পথের উপরে চক্ষু পাতিয়া বসিয়া থাকে, চক্ষু ভরিয়া অবসাদ আসে, নিরাশার পীড়নে বুকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠে।

বিমলকে সে শিশুকাল হইতে জানে। কথা দিয়া, কথা রাখে না এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। সে-যে কথা দিয়াও আসে না, শুধু চোখের দেখাটাও দেয় না, ইহার যে অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে ইন্দুর একবারও তাহা মনে হইল না। পুরুষ মানুষ, কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিতে হয়, পাঁচজনের সঙ্গে দেখা করিবার দরকার হয়, এ সকল কথা একবারও মনে উঠিল না! তাহার নিজের মনের মাপকাঠিতে বিচার করিয়া ইহাই তাহার মনে হইতেছিল, যত কাজ থাক আর যত দরকারই থাক, বিকালের এই সময়টুকু কোন কাজ, বা কোন দরকারই বিমলকে আটকাইতে পারিবে না। পৃথিবীতে কাজই বড়, ভালবাসার দাবীকে তাহার মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, এ জ্ঞানটুক ইন্দুর ছিল না। বিমল যে আসে নাই, আসিতেছে না, তাহার মূলে অন্য কোন কারণের কথা তাহার

একটিবারও মনে পড়িল না। সে নিঃসন্দেহে ভাবিল, বিমলের অসুখ করিয়াছে, তাই সে আসে না।

খবর লইবার কোন উপায়ই নাই। চিঠি লিখিতে সাহস হয় না। বিমল পছন্দ করিবে না। যাইয়া দেখিয়া আসিবে, সে সম্ভাবনাও নাই। অসুখের কথা যত ভাবে মন তত বিচলিত হয়। সে যেন মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পায়, ধূম্রমলিন প্রায়ান্ধকার গৃহের একটি অপরিষ্কৃত বিছানায় পড়িয়া রোগ-যন্ত্রণায় বিমল ছটফট করিতেছে, শিয়রে তাহার মাতা একাকী। কে ডাক্তার ডাকিবে, কে ঔষধ আনিবে, ডাক্তারের ভিজিট কোথা হইতে আসিবে, ভাবিতে ভাবিতে ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

পাচক আসিয়া ডাকিতে তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিল। বাহিরে তাসের-আসর বসিয়াছে, চা, জলখাবার পানের তলব পড়িয়াছে, ইন্দু চোখের জল সামলাইয়া নীচে চলিয়া গেল। মা হলঘরে আছেন, ক্ষণাও সেখানে, তাই সে পথে না গিয়া, ঘুরিয়া অন্য পথ ধরিয়া নীচে নামিল। সে রাত্রে আহারে তাহার রুচি হইল না। আহার্য্যের সামনে বসিতেই সেই দৃশ্য তাহার মনের চোখে ভরিয়া ভাসিয়া উঠিল। হয়ত ঔষধ পড়ে নাই, হয়ত পথ্যাভাবে সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ইন্দু পিতার প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিল কিন্তু এমনই বিপাক, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরেও তাস শেষ হইল না। অনেক বকা-ঝকা করিয়া ইন্দুকে শুইতে পাঠাইয়া গৃহিণী শুইয়া পড়িলেন।

ভোর বেলা উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া ইন্দু পিতার সন্ধানে আসিয়া জানিল, পিতা খুব ভোরেই বাহির হইয়া গিয়াছেন; এবেলা ফিরিবেন না, আফিস-ফেরৎ একেবারে সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরিবেন।

মধ্যাহ্নের পর আবার যখন অপরাহ্ন আসিয়া পড়িল, ইন্দুর মন আগেকার যা কিছু গড়া, সব ভাঙ্গিতে বসিল। বোধহয় বিশেষ কোন কাজে ক'দিন আসিতে পারে নাই, আজ ঠিক আসিবে। মন উৎসাহ দেয়, আবার নিরাশও করে। আশা ও নিরাশা, উৎসাহ ও অবসাদের মধ্য দিয়াই অপরাহ্ণ যখন উত্তীর্ণ হইতে চলিল, বিলীয়মান দিনের আলো পথচারীদের অস্পষ্ট করিয়া ফেলিল, তখন ইন্দুর মনখানিতে ঘনান্ধকার পরিব্যাপ্ত। মন আবার সেই সদ্যঃ ভাঙ্গা কথাই ভাবিতে বসিল, নিশ্চয়ই সে অসুস্থ।

তবু কি মন আশা ছাড়ে! হয়ত কাজের মধ্যে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে তাই দেরী হইয়াছে, এইবার আসিবে এ আশাও কি কম! পাছে বারান্দা হইতে স্বল্পালোকে তাহাকে দেখা না যায়, ইন্দু বাগানে গেল। বাগান ফুলে ফুলে ফুলময়, রূপে, গন্ধে মাতোয়ারা। ফটকের সামনে এক ঝাড় সীজন-ফ্লাওয়ার ফুটিয়া পথিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিত। ইন্দু সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। যাহারা শুধু ফুল দেখিতে দেখিতে পথটি অতিক্রম করে, আজ ফুলের মাঝে ফুলরাণীকে দেখিয়া তাহাদের অনেকের চলচ্ছক্তি হ্রাস পাইল; কাহারও কাশি আসিল; কেহ একবার গিয়া, আবার ফিরিল, আবার গেল। পথিকের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখে এ-রকম ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা যে কত বড় নির্লজ্জতা, ইন্দু যে তাহা বুঝিতেছিল না, তাহা নহে, হায়, মন যে তবু প্রলুব্ধ করে! নিরাশা যে কেবলই আশা জাগায়!

ঘনান্ধকার ধরিত্রীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আর আশা নাই ভাবিয়া যে মুহূর্ত্তে ইন্দু গৃহগমনোদ্যত হইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাদ্দিক হইতে প্রচণ্ড আলো পড়িয়া বাগানটিকে সচকিত করিয়া তুলিল ও মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। ইন্দু ত্বরিত গতিতে চলিয়া যাইতেছিল, আরোহী ডাকিলেন, ইন্দু!

সমুদ্রমন্থনে যত হলাহল উঠিয়াছিল, সেই সমস্ত হলাহল যদি নীলকণ্ঠের মত আমার লেখনী-কণ্ঠে ভরিয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলেও এই মোটর, এই মোটর-আরোহী ও তাহার সাদর আহ্বানে ইন্দুর মনের হলাহল সম্যক্ বর্ণন করিতে পারিতাম কি-না সন্দেহ। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য!

মোটর থামাইয়া আরোহী যখন দ্বিতীয় বার আহ্বান দিলেন, ইন্দু ফিরিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

আরোহী প্রণয়।

—বৌদি আসতে পারলেন না, নেমন্তন্ন করতে বেরুলেন। আমারও অনেক যায়গায় দরকার ছিল, কিন্তু ভাবলুম, তোমাদের কথা দিয়েছি আসব, দেখা করে যাই।

তত্‌ক্ষণে ইন্দু আপনাকে সংযত করিয়া ফেলিয়াছে। মৃদুস্বরে কহিল, চলুন, মা ওপরে।

প্রণয় পুষ্পিত তরুলতার পানে চাহিতে চাহিতে বলিলেন, তোমার বাগানটি দেখলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। এত যায়গায় ত যাই, এমন সাজান ফুলের বাগান একটিও দেখি নে।

দরোয়ান বাগানের আলো জ্বালিয়া দিয়াছিল।

ইন্দু বলিল, এখানেই বসবেন? বেশ ত মালী চেয়ার আনুক না।—মালীকে ডাকিতে গিয়া থামিল, আবার বলিল, কিন্তু মা ত' এখানে বসতে পারবেন না। বাবার তাসের আড্ডার বাবুরা সব এখনই আসতে আরম্ভ করবেন।

প্রণয় কহিলেন, তোমার মা বুঝি এখানে আসেন না?

'তোমার', 'তোমাদের' শব্দগুলা ইন্দু লক্ষ্য করিয়াছিল, প্রথমটা একটু খারাপও লাগিয়াছিল কিন্তু স্বপক্ষে এই যুক্তিই সে মানিয়া লইল, মা'র আবুদি'র দেবর, বয়সেও বড়, হাকিম লোক, 'তুমি' সম্ভাষণে দোষ নাই।

বলিল, অন্য সময়ে আসেন, এখন আসবেন না।

প্রণয় বলিলেন, কিন্তু এ জায়গাটি চমৎকার! ফুল অনেক বাগানে ফোটে, হয়ত বেশীও ফোটে; কিন্তু এমন ক'রে সাজাতে কেউ পারে না।

আর একবার সমস্ত বাগানখানি দেখিয়া লইয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, এ তোমারই কাজ ব'লে মনে হচ্ছে। তাই না?

ইন্দু নতমুখে বলিল, প্রথম বছর মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর থেকে আমিই করাই মালীদের দিয়ে।

আর একজন তাহার রুচিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যবোধ, শিল্পপ্রতিভা দিয়া ইন্দুকে সাহায্য করিত, এ বছরও করিয়াছিল। প্রত্যেকটি তরুলতায়, ফুলে পাতায় তাহার যত্ন আজও রূপ ধরিয়া আছে। মনে পড়িয়া ইন্দুকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিল।

বলিল, আপনি উপরে চলুন।

—চল, বলিয়া প্রণয়কুমার অনিচ্ছাসহকারে চলিতে লাগিলেন। সিঁড়ির কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি যে ড্রাইভিং শিখবে বলেছিলে।

—আমি বলেছিলুম!

সেদিন বললে না, শিখলে হয়!

ইন্দু হাসিয়া বলিল, ওঃ, তাই!

ওয়েল হাফ্‌ এন আওয়ার ইজ কোয়াইট্‌ সাফিসিয়েণ্ট।

কিন্তু আমার যে এখন অনেক কাজ!—থামিয়া তখনই আবার বলিল, আসুন ত ওপরে।

মা'র কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া ইন্দু চলিয়া গেল। চা, খাবার প্রস্তুত করাইয়া, নীচে তাসের আড্ডায় ও উপরে প্রণয়কে পাঠাইয়া দিয়া, ঠাকুরকে রান্নার কাজ সব বুঝাইয়া দিয়া সে যখন উপরে আসিল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

প্রণয় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ইন্দুকে দেখিয়া আবার বসিলেন।

ইন্দুর মা হাসিয়া বলিলেন, ইন্দু আজকাল আমাদের ঘরের অন্নপূর্ণা হয়েছে, বুঝলেন প্রণয় বাবু! রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করা, লোকজনকে খাওয়ান দাওয়ান, সমস্ত কাজ ইন্দুই করে

প্রণয় কুইনিন খাওয়ার মত ভাবে বলিলেন, সে ত' খুব ভাল।

মেয়ের মা'রা মেয়ের গুণ বর্ণনা করিবার সুযোগ বা অবসর পাইলে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ইন্দুর মা'ও মা। বলিতে লাগিলেন, কলকাতার বড়লোকদের মেয়ের মত কেবল সাজ পোষাকের ঠমক নিয়ে আমার মেয়ে থাকে না। আমার এত বড় সংসারটি নিজের ঘাড়ে নিয়ে ও যেমনটি চালাচ্ছে, অনেক বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে কেন, মেয়ের মা'রাও পারে না।

নিজের প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তিত করিবার মানসে ইন্দু প্রণয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আবু মাসি কোথায় গেছে বললেন?

প্রণয় বলিলেন, পরশু সারস্বত সম্মেলন, তারই সব নেমন্তন্ন সারতে গেছেন বোধ হয়। তোমরা আসছ ত?

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, ক'টার সময় হবে?

—বিকেলে-পাঁচটায় আরম্ভ হবার কথা। একটু দেরীও হতে পারে। আট-টায় ভাঙ্গবে।

ইন্দু কথা বলিল না। বিকেলে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

প্রণয়বাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, আজ তা' হলে উঠি।

রুণা ও ইন্দু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নামিতেছিল, সিঁড়িতে আসিয়া প্রণয় বলিলেন, আজ ত খুব হল! কাল আসব, বেরুবে?

ইন্দু সাশ্চর্য্যে কহিল, কোথায় বেরুব ?

প্রণয় বলিলেন, ড্রয়িংরুমে।

ক্ষণপ্রভা সোল্লাসে কহিল, হাঁ হাঁ, আসবেন, আসবেন। আমি শিখব।

প্রণয়কুমার ইন্দুর মুখের পানে সাগ্রহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল ইন্দু, কাল আসব ?

স্থানটি অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক-আলোকে উদ্ভাসিত। সেই আলোকে প্রণয়ের দৃষ্টিটাকে ইন্দু সহজ বলিয়া ভাবতে পারিল না। যেন কত মিনতি ভরা, যেন বড় আগ্রহে আকুল। তা' ছাড়া, সে দৃষ্টিতে যেন আরও কিছু ছিল। সেই কিছু কি, তাহা ইন্দু বুঝিল না। তা না বুঝুক, তাহাকে 'না' করিতেও পারিল না। বলিল, আসবেন বৈকি !

প্রণয় আরও পরিষ্কার উত্তর চাহেন ; বলিলেন, যদি বার হও, তবে আসি।

ক্ষণপ্রভা বলিয়া উঠিল, দিদিটা ভীতু ; আমি একটু একটু জানি। আমাকে আপনি ভাল ক'রে শিখিয়ে দেবেন।

প্রণয়ের দৃষ্টি তখনও ইন্দুর আননে নিবদ্ধ। ইন্দুকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ক্ষণপ্রভা তাহাকে একটি ধাক্কা দিয়া বলিল, বল্ না দিদি।

ইন্দু হাসিয়া বলিলেন, বললুম ত !

—কি বললে ?

—আসবেন। দেখব চেষ্টা ক'রে।

প্রণয়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ ! দু'দিন চেষ্টা কর, তা হ'লেই হয়ে যাবে।

ইন্দু সহাস্যে কহিল, আমি তা বলি নি। আমি বলছি, কাজকর্ম্ম সেরে রাখবার চেষ্টা করব।

—তাই করে রেখ। আমি বরং খানিক আগেই আসব।

ত্রস্তা হরিণীর মত ইন্দু বলিল, না, না, তার আগে নয়, তা হ'লে একেবারেই হবে না।

—বেশ। আজ যে সময় এসেছিলুম, সেই সময় এলে অসুবিধে হবে না ত ?

—না। কিন্তু মা'কে বলেছেন ?

—না, এখনও বলা হয় নি ? তার দরকার আছে ? বেশ, কালই বলব।

উপরে উঠিবার আগে ইন্দু বাবার খানসামাকে ডাকিয়া খবর লইয়া জানিল, খেলা মোটে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম হইতেই বাবু হারিতেছেন ; মহেন্দ্রবাবু জিতিতেছেন।

ইহা হইতে অনুমান করা শক্ত ছিল না যে আজও রাত্রি যামের এধারে খেলা শেষ হইবে না। হারিলে হেরম্বনাথের এমন জেদ চাপে যে যদি সারা রাত এমনি কাটিয়াও যায়, না জিতিতে পারিলে খেলার শেষ হইবে না। কতদিন এমন হইয়াছে, সন্ধ্যার আড্ডা পরের দিন আপিসের বেলা হইলে তবে ভাঙ্গিয়াছে। মধ্যে নামমাত্র খাওয়া-দাওয়া হইয়াছে ; কেবল চা পান ও তামাকের বিরতি ছিল না।

যদিই সকাল সকাল খেলা ভাঙ্গে, সে যেন খবর পায়, খানসামাকে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়া উপরে চলিয়া গেল। গৃহিণী তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন, বলিলেন, আবু-দি জিজ্ঞেস করে পাঠিয়েছে, তুই কি ওদের সভায় একখানা গান করতে পারবি ?

ইন্দু আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, আমি !—তাহার মুখে এমনই একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল, যাহা সহজেই বুঝাইয়া দিল যে এর চেয়ে অসম্ভব ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না।

গৃহিণী বলিলেন, আমিও তাই বলেছি।

ইন্দু সাশ্চর্য্যে কহিল, তুমি আবার কি বললে ?

বললুম, ইন্দু গান-টান বড় করে না।

ইন্দু খুশী হইয়া বলিল, বেশ করেছ মা !

গৃহিণী কহিলেন, প্রণয় বলছিলেন, ওঁর নাটকের চাষা এসে যখন বাঙলা দেশের কথা বলছেন, সেই সময় উইংস-এর ওধার থেকে একটা গান যদি কেউ গায়, খুব ভাল হয়। উনি গান লিখেওছেন। তাই বলছিলেন, ইন্দু যদি গানখানা গাইতে রাজী থাকেন, কাল এসে তিনি সুরটা ঠিক ক'রে দিয়ে যেতে পারেন।—বলিয়া গৃহিণী কন্যার সম্মতির আশায় তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্দু বলিল, রক্ষে কর মা ! একে ত আমি, তায় গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, তার ওপর নতুন গানে সুর দিয়ে—হয়েছে আর কি !

বলছিলেন, ইন্দু যদি না গান্, তা হ'লে কোন ছেলেকে দিয়ে গাওয়াবেন। সে জায়গায় একটি গান হলে খুব ভাল

লাগবে।—একটু থামিয়া আবার বলিলেন, কোন্ জায়গাটা তোর মনে আছে ত ইন্দু ?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, সেই যে—

"আমি দেখি পাহাড় থেকে জল নেমে আসছে নদীতে। নদী সেই জল বুকে ধরে তর্ তর্ বেগে কুলু কুলু রবে গান গাইতে গাইতে বয়ে যাচ্ছে আমার জমির পাশ দিয়ে। জমি শুষে নিচ্ছে তার রস। আমাকে দিচ্ছে ফুল, ফল, শস্য। আমার মরাই-ভরা ধান, ক্ষেত-ভরা ফসল, গাছভরা ফল, পুকুর-ভরা মাছ; আমার গোয়াল-ভরা গরু, ঘর-ভরা ছেলে-মেয়ে। ভোরে পাখীরা গান গেয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, সন্ধ্যায় তারা গান গেয়ে বিশ্রাম করতে ব'লে যায়। আমার ঘরের পাশে নদী, তার পাশে লতায় পাতায় ঘেরা মালঞ্চ। দিনের শেষে কর্ম্মান্তে পালঙ্কে বসে বাঁশের বাঁশীতে আমি বাজাই ইমন। এই আমার দেশ, এই আমার বঙ্গভূমি !"

—ও জায়গাটা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে মা।

গৃহিণী ভাবগদগদস্বরে বলিলেন, শুনতে শুনতে গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ইন্দু বলিল, মনে হয়, আমাদের বাঙলা দেশকে চোখের সামনে দেখছি। খুব সুন্দর ঐ জায়গাটা।

ক্ষণপ্রভা বলিল, সেইটে আরও ভাল—

"লিখিবে পড়িবে
মরিবে দুঃখে
আর, মৎস্য ধরিবে
খাইবে সুখে।"

ইন্দু তাহার পিঠে গুম্ করিয়া একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, প্রায় তোমার মনের কথা কি-না !

ইন্দুর মা বলিলেন, ছোট্ট ছেলেটি করেছিল কিন্তু বেশ। মাথায় মস্ত পাগড়ী, হাতে লম্বা হুইল ছিপ, কেউ বলছে লেখা পড়ার কথা, কেউ বলছে চাষের কথা, কেউ বলছে কল-কারখানার কথা; সে ঘাড় নাড়ছে আর বলছে—

ক্ষণপ্রভা মা'র মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—

"লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে
আর মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।"

ইন্দু বলিল, সব ছেলেই ভাল করেছে, না মা ?

হাঁ। নাটকটি ভাল, কথাগুলি মিষ্টি—
—চমৎকার !

ইন্দুর মা' মনস্তত্ত্বের ছাত্রী ছিলেন না, তাহা আমরা জানি; তবুও, গুণগ্রাহিতা যে অনেক ক্ষেত্রে সুফল প্রসব করে ইহা তাঁহার অজানা ছিল না; ইন্দুর মুখে নাটকের উচ্চ প্রশংসা শুনিয়া একদিকে যেমন অপার আনন্দ হইল, সেই সঙ্গে আশার সুবর্ণ-দীপটিও হৃদয়মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইল। সুপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে না চায় কে ? প্রণয় সুপাত্র এবং সৎপাত্র ! নামেই দোজবরে, একটা কাঁটাও নাই, তাহার যে বয়স সে বয়সে অনেকে দারপরিগ্রহই করে না। রূপ, গুণ, অর্থ, বিত্ত, পদ, মান, এমন সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। 'আবুদি' বলিয়াছে, কত রাজা-রাজড়ার ঘর হইতে কথা আসিতেছে, তাহার দেবর রাজী নয়। পাস-করা মেয়ে অনেক পাওয়া যায়, প্রণয় সে সবও পছন্দ করে না; বিলাত-ফেরৎ সমাজেও তাহার দারুণ অরুচি, যাহারা বিলাত যায় নাই তাহাদিগকে বিলাত-ফেরতদিগের কন্যারা মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। দাম্ভিকা মেয়েরা প্রণয়ের কাছে পাত্তা পাইবে না। সে নিজে সাদাসিধা কবি লোক, সাদাসিধা মেয়ে পাইলে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, নতুবা চাকরী-বাকরী, সাহিত্য ইত্যাদি লইয়াই সে থাকিবে। 'আবুদি' আর একটি কথা বলিয়াছেন, ইন্দুর রঙটি তেমন ফর্সা নয়, নাকটিও একটু বড়; চোখ দুটাও খুব ভাসা-ভাসা নয়, তবু যে পাঁচশ' মেয়ের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতে, ইন্দুকেই ঠাকুরপোর মনে ধরিয়াছে, তাহার কারণ ইন্দুর অটুট স্বাস্থ্য। বাঙলাদেশের কোন্ মেয়ে ইন্দুর মত স্বাস্থ্যবতী ?...'ঠাকুরপোর নিজের স্বাস্থ্য যেমন, যাকে ও বিয়ে করিবে, তার স্বাস্থ্যও তেমনই হওয়া চাই। ইন্দুকে দেখেই তাই ত ওর মন পড়ে গেল। নইলে সুন্দরী মেয়ের অভাব কি ! আর ঠাকুরপো টাকা-পয়সাও চায় না। কিছুই না ও চায় সেই মেয়েটি, যে মেয়ে রোগের ডিপো নয়। একবার ঠেকেছে কি না, সে বউটা এসেছিল, জন্মরোগা। তিনটে মাসও বাঁচল না।'

সকাল হইবা মাত্র ইন্দু পিতাকে ধৃত করিল। হেরম্বনাথ গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন, ইন্দু কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন, ভাল কথা, বিমলের একটি কাজ হয়েছে।

মেঘে যেমন দামিনী খেলে, বর্ষাকালে মেঘের মধ্য হইতে যেমন চন্দ্র বাহির হয়, ইন্দুর মুখও তেমনই হাসিয়া উঠিল। পিতার ইঙ্গিতেগারে ভর দিয়া, তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইন্দু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি কাজ?

—কি কাজ! তা'ত কৈ বললে না!

—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—হাঁা হয়েছিল বৈ কি! শেয়ার-মার্কেটে গিয়ে বলে এল যে আমায়।

—কি কাজ তা তুমিও জিজ্ঞাসা করলে না!

হেরম্বনাথ চিন্তিত মুখে বলিলেন, ভুল হয়ে গেল মা! তাইত!

ইন্দুর হাসি পাইতেছিল, সেই 'তাইত!' এলোপ্যাথি ঔষধশাস্ত্রে ক্যাষ্টর অয়েল যেমন, হেরম্বনাথের কথার মধ্যে ঐ 'তাইত'টি তেমন! কত জটিল জটিল সমস্যার সহজ সমাধান যে ঐ একটি মাত্র 'তাইত' দ্বারাই হইয়া যায়, তাহা তাঁহার আত্মীয়-বন্ধু সবাই জানে।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, তোমায় কবে বললে বাবা?

হেরম্বনাথ বলিলেন, তা তিন চার দিন হবে। হাঁা, তা হবে বৈ কি!

—তা তুমি এতদিন বলনি কেন?

—বলি নি, না? ভুল, ভুল! আর ভুলের দোষই বা কি! মহেন্দরটা তিনদিন ধরে যে রকম মাৎ করছে—

ইন্দু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল, মা'কে বলবে না বাবা?

—হাঁা হাঁা বলতে হবে বৈকি! কৈ তিনি গেলেন কোথা?

—থাক্ বাবা, মা'কে এখন বলবার দরকার নেই! সব খবর যখন জানা নেই—

—তা বটে।

—আর নিজে এসে বললে মা খুশী হবেন।

হেরম্বনাথ আগাগোড়া সব ভুলিয়া, খেই হারাইয়া বলিয়া বসিলেন, সেও বুঝি বলে নি তোদের কাছে?

—কে?

—কে কিরে, বিমল, বিমল! বিমল তোদের কিছু বলেনি?

ইন্দু নতমুখে বলিল, সে কি আমাদের বাড়ীতে আসে যে বলবে! কেন তুমি ত জান বাবা!

হেরম্ব বলিলেন, তাই ত! খবরটা ত তা হ'লে—

বাধা দিয়া ইন্দু বলিল, তার দরকার নেই বাবা!—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। যে কথাটা তাহার গলার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া কণ্ঠরোধের উপক্রম করিতেছিল, তাহা এই যে, কাজের খবরটা সব চেয়ে দামী কাহার কাছে? কিন্তু, মনে পড়িতেই, চোখে জল আসে কেন? [ক্রমশঃ

কালস্রোত

দিন যায়, রাত্রি যায়, যায় বর্ষ চলি'।
আজি যেথা অট্টালিকা, কাল সেথা ধূলি।

—শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কিম্বদন্তী

লোকমুখে যুগে যুগে যেই বার্ত্তা বাঁচে,
তুচ্ছ হোক্ তবু তাহা কভু নয় মিছে।

—শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রদর্শনী

[তরুণ শিল্পী শ্রীসৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় চারিখানি ব্যঙ্গচিত্রে বর্ত্তমান বাঙ্গালীর জীবনের 'চতুরাশ্রমে'র পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বে ছিল, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, যতি। এখন ছাত্রত্ব, ভলান্টিয়ারত্ব, কেরাণীত্ব, স্বামীত্ব।]

পণ — প্রারম্ভে

একবার তোরা ..

পণরক্ষা — পরবর্ত্তী

কে জানিত আসবে...

প্রায়শ্চিত্ত—জীবিকার্জ্জন সূচনা

তখন দশটা বাজে...

প্রসাদ—অন্তিমে

শুধু তোমার বাণী নয়…

অপরাজিতা

—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল
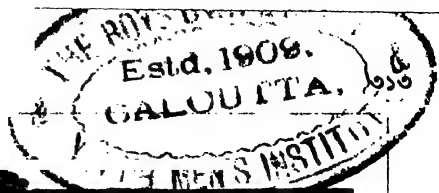
প্রতিভা ঢাক্‌না খুলিয়া সন্দেশের থালার দিকে চাহিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন,—"ও মা দেখেছ কাণ্ড, তিন তিনটে সন্দেশ খেয়ে ফেলেছে,—দাঁড়া, তোদের একদিন কি আমার একদিন, পিঠের ছালচামড়া কারু আস্ত রাখব না।" কথা শেষ করিয়া বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে চারি জন সেখানে ছুটিয়া আসিল এবং একবার সন্দেশের থালা, এক বার তাঁহার ভ্রুকুটিল-কুটিল মুখের দিকে চাহিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতিভা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোদের পেট ভরে খাওয়াই তবু তোদের আহিক্কে মেটে না, কেন সন্দেশ চুরি করে খেয়েছিস, বল্‌?"

চারিজনই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা ত চুরি করে খাই নি।"

প্রতিভা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "না, তোরা খাস নি, রাস্তার লোক চুরি করে খেয়েছে। দাঁড়া তোদের মজা দেখাচ্ছি।"

একজন বলিল, "না মা আমি খাই নি।"

অপর জন বলিল, "সত্যি বলছি কাকিমা, আমি খাই নি।"

তৃতীয় জন বলিল, "খাই নি মা।"

চতুর্থ জন বলিল, "কখ্‌খনও খাই নি কাকিমা।"

এমন সময় প্রতিভার পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা অপরাজিতা ওরফে অপু ছুটিতে ছুটিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "আমায় ডাকছিলে মা?"

প্রতিভা কহিলেন, "তুইও বলে ফেল, কে খেয়েছে জানি না, ভেবেছিস মিথ্যে বলে রেহাই পাবি।"

অপু বলিল, "কে মিথ্যে কথা বলেছে মা, কে কি খেয়েছে মা?"

প্রতিভা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "যেন কিচ্ছু জানেন না, একেবারে ভালমানুষটি! এ তোরই কাজ, তুই-ই সন্দেশ চুরি করে খেয়েছিস।"

অপু সহজভাবে কহিল, "হ্যাঁ মা, আমি খেয়েছি, বড্ড খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই চুপি চুপি—"

প্রতিভা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। অপরাজিতার পিতা দূরে দাঁড়াইয়া এই বিচার-অভিনয় দেখিতেছিলেন। তিনি দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অপরাজিতার হাতখানি টানিয়া মুক্ত করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

প্রতিভা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চোরকে আবার আদর ক'রে কোলে নেওয়া হচ্ছে, ছেড়ে দাও বলছি, ওর পিঠের চামড়া তুলে তবে ছাড়ব।"

অশেষ হাসিয়া কহিলেন, "সে ব্যবস্থা না করে, আগে ওকে একটা সন্দেশ দাও দিকি।"

প্রতিভা তেমনই ক্রোধস্বরে কহিলেন, "এই যে দিচ্ছি—ওকে আগে কোল থেকে নামিয়ে দাও দিকি! শাস্তি না দিলে ওর নোলা বেড়ে যাবে। পরের ঘরে গিয়ে এই নোলার জন্যে শাশুড়ীর কাছে ঝাঁটা খেয়ে মরবে—আর আমরাও কি রেহাই পাব।"

অশেষ তেমনই ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তুমি বড্ড রেগে গেছ দেখছি। কিন্তু বিচারকের ত রাগ করলে চলবে না,—ধীর সুস্থ হয়ে বিচার করতে হবে। আচ্ছা ধর, অপু যদি আর পাঁচজনের মত বলত আমি খাই নি, তা হ'লে তুমি কি করতে?"

প্রতিভা কহিলেন, "মেরে পিঠের চামড়া তুলতুম, আর কি করতুম!"

অশেষ কহিলেন, "বেশ, চুরির শাস্তির বিধান পরে কর, ও যে সত্যি কথা বলেছে তার জন্যে আগে ওকে পুরস্কার দাও, পুরস্কার হচ্ছে আর একটা সন্দেশ!"

প্রতিভা কহিলেন, "তোমার সঙ্গে আর পারি নি বাপু! তিনটে সন্দেশ চুরি করে খেলে তাতে হ'ল না, আবার আর একটা দাও। ঐ রইল থালাশুদ্ধ, তোমার আদুরে মেয়েকে যত ইচ্ছে খাওয়াও।"

অশেষ কহিল, "এ তোমার অন্যায় রাগ। আর দেখ, তিনটে সন্দেশ ও একলা খেয়েছে বলছ, তা কখনও হতে পারে না, আচ্ছা তুমি অপুকেই জিজ্ঞেস কর,—আচ্ছা আমিই জিজ্ঞেস করছি, বল ত মা অপু আর কে কে খেয়েছে?"

অপু কহিল, "ওরা সবাই খেয়েছে বাবা।"

চারিজনে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওর মিথ্যে কথা, ও একলা খেয়েছে, আমরা খাই নি।"

অশেষ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "অপু মিথ্যে কথা বলতে জানে না, তোদেরই মিথ্যে কথা। বেত আনতে বলি?"

সভয়ে চারিজন বলিয়া উঠিল, "আর মিথ্যে কথা বলব না, অপু আমাদের সবাইকে ভাগ করে দিয়েছে।"

অশেষ কহিলেন, "আজ ছেড়ে দিলুম, ফের মিথ্যে কথা বললে বেত খাবি। দাও ত অপুকে একটা সন্দেশ, সবাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ও খাবে, ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে।"

প্রতিভা একটি সন্দেশ লইয়া অপুর হাতে দিলেন

অশেষ কহিলেন, "সত্যি বলার পুরস্কার এই সন্দেশ, আর মিথ্যে কথা বলার শাস্তি এই সন্দেশ খাওয়া দেখা।"

চারিজনে একে একে বলিল, "আমরাও সত্যি কথা বলব, সন্দেশ দেবে ত মা, সন্দেশ দেবে ত কাকিমা?"

অশেষ কহিলেন, "যদি আর কখ্‌খনও মিথ্যে কথা না বলিস্ তা হ'লে সন্দেশ পাবি।"

সমস্বরে উত্তর হইল, "আর কখ্‌খনও মিথ্যে কথা বলব না।"

অশেষ হাসিয়া কহিলেন, "মনে থাকে যেন, কিন্তু চুরি করে সন্দেশ খেলে মার খেতে হবে।"

ফটিক বলিয়া উঠিল, "কই অপু ত মার খেলে না, ও যে সন্দেশ খাচ্ছে।"

অপু তখন প্রফুল্লচিত্তে সন্দেশ খাইতেছিল।

ফটিকের কথা শুনিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হো হো করিয়া করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অপু কহিল, "আর চুরি করে খাব না, খেতে ইচ্ছে হ'লে মার কাছে চাইব।"

মন্থু মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, "চাইলে মা যে দেয় না।"

অশেষ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "তোর মার দোষই দেখছি সব চেয়ে বেশী। ভারি অন্যায় ত, ওরা সন্দেশ চাইলে তুমি দাও না।"

প্রতিভা হাসিয়া কহিল, "কি নিমকহারাম ছেলে মেয়ে গো—পেট চিরে খাওয়াই, তবু বলে কি না চাইলে মা দেয় না। ভাল করে দোব'খন!"

এই বলিয়া প্রতিভা সন্দেশের থালার উপর ঢাকনা চাপা দিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সেদিনকার মত প্রসঙ্গটি এই খানে শেষ হইয়া গেল।

দিন সাতেক পরের কথা। কোন কুটুম্ব-গৃহ হইতে এক হাঁড়ি রসগোল্লা আসিয়াছে। ছেলে মেয়েদের প্রত্যেকের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিয়া বাকিগুলি সেই হাঁড়িশুদ্ধ সিকের উপর তুলিয়া রাখিয়া প্রতিভা নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছেন।

আধ ঘণ্টা পরে ফটিক আর মন্থু অশেষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আজ আমরা রসগোল্লা চুরি ক'রে খেয়েছি, এই ত আমরা সত্যি কথা বললুম, আমাদের একটা করে রসগোল্লা দাও।"

অশেষ তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "ওঃ, ফের চুরি করে খেয়েছিস, কেন চুরি করেছিস আগে বল্?"

ফটিক ভয়ে ভয়ে কহিল, "আর করব না, এইবার একটা রসগোল্লা দাও, অপুকে যেমন সন্দেশ দিয়েছিলে।"

অশেষ কহিলেন, "রসগোল্লা দেবে ত তোর মা।"

ফটিক কহিল, "তুমি বলে দাও, না হ'লে মা দেবে না। আমরা সত্যি কথা বলেছি, আমাদের দুজনকে দেবে আর কাউকে নয়।"

এমন সময় প্রতিভা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ওরা রসগোল্লা রসগোল্লা করে কি বলছে গা?"

অশেষ হাসিয়া কহিলেন, "ওরা আজ তোমার রসগোল্লা চুরি করে খেয়ে তাই আমায় জানাতে এসেছে। এই সত্যি কথা বলার জন্যে ওরা আর একটা করে রসগোল্লা পুরস্কার চাইছে।"

প্রতিভা গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওমা কোথায় যাব গা, ওদের পেটে পেটে এত বুদ্ধি! তুমিই ত ওদের এই লোভ জন্মিয়ে দিয়েছ।"

অশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "আমি! আমি কি ওদের শিখিয়ে দিয়েছি নাকি তোমার রসগোল্লা চুরি করে খেতে?"

প্রতিভা কহিলেন, "না, তা স্পষ্ট করে বল নি বটে, কিন্তু কি করে রসগোল্লা সন্দেশ পাওয়া যায়, তার ত একটা পথ দেখিয়ে দিয়েছ। ওরা ছেলেমানুষ, অত শত কি বোঝে, ওরা ভেবেছে রসগোল্লা চুরি করে খেয়েছি বললেই আর একটা রসগোল্লা পাওয়া যাবে।

অশেষ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "তুমি এসব কি বলছ?"

প্রতিভা কহিলেন, "ঠিক কথাই বলছি, আজ রসগোল্লার হাঁড়ি সিকেয় তুলে রেখেছি, সেখান থেকে ওরা চুরি করবে কি করে!"

অশেষ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "অ্যাঁ, ওরা এত বড় মিথ্যে কথা আমার সাম্‌নে বলছে, বড় হ'লে ওরা ত চোর ডাকাত হবে।"

অপু কখন্ তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। অপু বলিয়া উঠিল, "ওরা আমাকেও ঐ কথা বলবার জন্যে তোমার কাছে ডেকে আনছিল। আমি বললুম আমি কেন মিথ্যে কথা বলব, মিথ্যে কথা কি বলতে আছে। ওরা ত আমার কথা শুনলে না, তোমার কাছে এসে মিথ্যে করে বললে, ওরা রসগোল্লা চুরি করে খেয়েছে।"

কন্যার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া অশেষ কহিলেন, "অপু মা, দে ত' ওদের কান মলে, খুব জোরে মলে দিবি, বুঝলি, আর কখনও যেন ওরা মিথ্যে কথা না বলে।"

অপু তৎক্ষণাৎ পিতার আদেশ পালন করিল। তাহার ক্ষুদ্র হস্তে যত শক্তি ছিল, তাহা প্রয়োগ করিতে সে এতটুকু ইতস্ততঃ করিল না। কান মলিতে মলিতে বার বার বলিতে লাগিল, "বল্, আর কখনও মিথ্যে কথা বলবি!"

প্রতিভা কন্যার হাত ধরিয়া কহিলেন, "খুব হয়েছে, ছেড়ে দে কান।"

কান ছাড়িয়া দিয়া অপু কহিল, "তুমি জান না মা, ওরা বড্ড মিথ্যে কথা বলে, আমি বারণ করি তা শোনে না। কান মলা খেলে আর করবে না।"

প্রতিভা কহিলেন, "যা যা আর জ্যাঠামি করতে হবে না,—পাকা বুড়ী।"

ফটিক আর মনু চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সে স্থান ত্যাগ করিল। অপুও তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রতিভা স্বামীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, "অপুই তোমার নাম রাখবে,—এই বয়েস থেকে তোমার মত সত্যাশ্রয়ী হয়ে উঠছে। যাই বল অত সত্যবাদী হওয়া কিন্তু ভাল না।"

অশেষ ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি একথা বলছ! এই কি সত্যি তোমার প্রাণের কথা?"

প্রতিভা কহিলেন, "তোমার দুরবস্থা দেখলে বলতে হয় বৈ কি!"

গভীর বিস্ময়ে অশেষ কহিলেন, "আমার দুরবস্থা!"

প্রতিভা কহিলেন, "দুরবস্থা নয় ত কি বলব বল? এই ত দেখছি কোন জায়গায় দু'মাসের বেশী চাকরী করতে পার না; এর দোরে তার দোরে ঘুরে বেড়াও। সত্যাশ্রয়ী হওয়ার এই ত দশা।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অশেষ কহিলেন, "এইবার থেকে তা হ'লে মিথ্যে কথা বলা অভ্যাস করব।"

অপ্রস্তুত হইয়া প্রতিভা কহিলেন, "আমি কি তাই বলছি,—সংসার এখন এমন হয়েছে যে লোকে সত্যের আদর করে না।"

প্রতিবাদ করিয়া অশেষ কহিলেন, "ও কথা বল না, ও বড় ভুল কথা। সত্যের আদর যদি না থাকত তা হ'লে বিশ্ব-সংসার অচল হয়ে যেত।"

প্রতিভা এইবার হাসিয়া কহিলেন, "এ যে কলিকাল, তাই অচল হয় নি। না, এই তর্ক উঠলে আমার কাজকর্ম্ম সব পণ্ড হয়ে যাবে। তর্ক করবার সময় এখন নেই।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অপরাজিতার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সত্যভাষণের আকর্ষণও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভুলিয়াও তাহার মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বাহির হইত না। সত্য বলাটা তাহার যেন মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। শুধু সত্য কথা বলা নহে, তাহার আচরণের মধ্যে ছদ্ম কিছুই দেখা যাইত না। যে কাজ অন্যায় বলিয়া বুঝিত তাহা সে কখনও করিত না।

একটা অভ্যাস আর একটি অভ্যাসের এমনই ভাবে সহায়ক হইয়া থাকে।

সেদিন প্রতিভা তাহার স্বামীকে কহিলেন, "না বাপু তোমার ঐ মেয়ের জালায় ত' আর পারি না। হাঁড়ির খবর পাঁচজনকে দিয়ে বেড়াবে। সত্যাশ্রয়ী হয়েছে কি না—যা হয় এর ব্যবস্থা কর বাপু।"

অশেষ হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে তাকে মিথ্যাশ্রয়ী করে তুলি? তবে সে কাজের ভার তোমারই নিতে হবে।"

প্রতিভা কহিলেন, "এ ঠাট্টার কথা নয়, সত্যি আমি জালাতন হয়ে উঠেছি। পরশু ঠাকুরঝি তোমার জন্যে বড় এক বোতল আচার পাঠিয়েছেন—আজ দুপুর বেলা তিনটে মেয়ে সঙ্গে করে এনে, সব তাদের দিয়ে খাইয়ে দিলে। আমি যতই বলি, আচার কোথায় পাব, তোমার মেয়ে ততই বলে, কেন পিসিমা যে আচার দিয়েছে—আচারের বোতল বের করিয়ে তবে ছাড়লে, মাঝে পড়ে আমিই মিথ্যেবাদী হয়ে গেলুম, মেয়েরা সব হাসতে লাগল।"

"দাঁড়াও অপুকে আমি শাসন করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া অশেষ 'অপু, অপু' করিয়া হাঁকিতে লাগিলেন।

'বাবা।' বলিয়া অপরাজিতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

অশেষ অত্যন্ত গম্ভীর মুখে কহিলেন, "কাল মেয়েদের সঙ্গে করে এনে তোর মার সব আচার খাইয়ে দিয়েছিস?"

অপু কহিল, "তারা ত সব খায় নি বাবা, আদ্ধেকটা খেয়েছে।"

প্রতিভা কহিলেন, "বোতলশুদ্ধ খাওয়াতে পারলে তোমার মেয়ে খুব খুসী হত দেখছি।"

অশেষ কহিলেন, "আচারের খবর কেন তুই তাদের দিতে গেলি?"

অপু কহিল, "তারা যে জিজ্ঞেস করলে, তোদের বাড়ী আচার আছে ভাই; আমি কি বলব?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা বলিয়া উঠিলেন, "বলবি, নেই।"

অপু তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তা হলেই ত মিথ্যে কথা বলা হল বাবা।"

প্রতিভা ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, "ওটুকু মিথ্যে বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না।"

অশেষ ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "না না, ওটুকু অতখানি নেই—মিথ্যে মিথ্যে। মিথ্যে কথা একবার বলতে আরম্ভ করলে আর রক্ষে নেই। কেবলই লোভ হবে মিথ্যে কথা বলতে।" হঠাৎ থামিয়া অপুকে তিনি দুই হাতে বুকের উপর তুলিয়া লইলেন; স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "অপু মা, সত্যিই ত বলবে, সত্যি কথা বলে তুমি ঠিকই করেছ। কি করছিলে, পড়ছিলে? যাও মা, পড়গে, খুব মন দিয়ে পড়।"

অপু প্রফুল্ল মনে চলিয়া গেল। কক্ষমধ্যে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

অশেষ প্রথমে কথা কহিলেন, "দেখ, ছেলেমেয়েদের সামনে আমাদের কখনও মিথ্যে কথা বলতে নেই।"

প্রতিভা গম্ভীর মুখে কহিলেন, "বেশ গো বেশ, এবার থেকে ঘরে যা কিছু থাকবে, রাস্তার পাঁচটা ছেলে মেয়ে ডেকে বিলিয়ে দেব, তা হ'লেই ত হল!"

অশেষ হাসিয়া কহিলেন, "এ তোমার রাগের কথা হল? আমি ত' তোমায় কিছু অন্যায় বলি নি। তুমি ত' বোঝ, তোমায় আর কি বলব, মাকে দেখেই মেয়েরা শেখে। আর দেখ, আমাদের ত' আরও ছেলেমেয়ে আছে—একই ভাবে তাদের আমি শিক্ষা দিচ্ছি, কই তারা ত' অপুর মত সত্যকে এমনভাবে আঁকড়ে থাকতে পারছে না—দেখছ ত তারা পদে পদে মিথ্যা কথা বলছে; একটা মেয়ে যাতে—"

বাধা দিয়া প্রতিভা বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমায় আর বলতে হবে না। সেই চেষ্টাই আমি করব। একবার বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে তুমি শীগগির থামবে না, তা আমি জানি। এখন চললুম, আমার ঢের কাজ আছে। শুধু কথায় ত' আর পেট ভরবে না।"

বৎসর দুই পরের কথা। অপরাজিতা তখন উচ্চ-প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। সেদিন ইন্‌স্‌পেক্টার স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিবেন। বালকবালিকারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে সদা-ধূলি-মলিন স্কুল-গৃহের যথাসম্ভব সংস্কার করা হইয়াছে। পরিদর্শক আসিবার অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রধান শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের জনে জনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "দেখ্, ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু তোদের জিজ্ঞেস করবেন, মাষ্টার মশায় তোমাদের মারেন কি না! তোরা সবাই বলবি, না সার, মাষ্টার মশায় ত' আমাদের মারেন না।

বুঝলি, যদি মারের কথা কেউ বলিস তা হ'লে তোদের আর রক্ষে থাকবে না। এই বেত দেখছিস্ ত!" এই বলিয়া বেতগাছটি বার কতক শূন্যে আস্ফালন করিয়া লইয়া সজোরে টেবিলের উপর আঘাত করিয়া বলিলেন, "বুঝলি, ঠিক এই ভাবে পিঠে পড়বে। মনে থাকে যেন, সবাই বলবি, না সার, মাষ্টার মশায় ত মারেন না।"

ইহা যে মিথ্যা ভীতিপ্রদর্শন নহে, ছাত্রছাত্রীরা তাহা বিশেষ রূপেই জানে। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরা সবাই বলব,—না সার, মাষ্টার মশায় ত মারেন না।" কেবল অপরাজিতা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় অবশ্য তা লক্ষ্য করিলেন না।

ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু যথাসময়ে স্কুলে পদার্পণ করিলেন প্রধান শিক্ষক তাঁহাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন।

এ প্রশ্ন সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার মহাশয় তোমাদের মারেন ?"

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "না সার, মাষ্টার মশায় ত আমাদের মারেন না।"

প্রধান শিক্ষকের মুখে চাপা হাসি খেলিয়া গেল।

ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমি যাকে জিজ্ঞেস করব, সেই উত্তর দেবে। সবাইকে ত আমি জিজ্ঞেস করিনি।"

তিনি এক এক করিয়া দশটি বালক বালিকাকে প্রশ্ন করিলেন, দশ জনই উত্তর করিল, "না সার, মাষ্টার মশায় ত মারেন না।"

তারপর অপরাজিতার পালা আসিল। তাহাকেও সেই প্রশ্ন করা হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সে ইতস্ততঃ করিল—বেত পিঠে পড়ে পড়ুক! তারপর কম্পিতকণ্ঠে সে কহিল, "মারেন সার।"

প্রধান শিক্ষকের মুখখানি সহসা ম্লান হইয়া গেল। তাহার অন্তরের মধ্যে দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি কটমট দৃষ্টিতে অপরাজিতার দিকে চাহিলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু কহিলেন, "বেত দিয়ে মারেন ?"

উত্তর হইল, "হ্যাঁ সার।"

"আর কি ভাবে মারেন ?"

"দু'টো আঙুলের মধ্যে পেন্সিল রেখে খুব জোরে আঙুল দু'টো চেপে ধরেন। এত লাগে সার, ক'দিন আঙুলে ব্যথা থাকে।"

"হুঁ, আর কি রকম করে মারেন ?"

"টেবিলের ওপর খুব জোরে মাথা ঠুকে দেন সার।"

উত্তেজিত ভাবে ইন্‌স্‌পেক্টার প্রশ্ন করিলেন, "আর, আর ?'

অপরাজিতা কহিল, "রগের ওপর ধাঁই করে এমন চড় মারেন, সব অন্ধকার হ'য়ে যায়, চোখে কিছু দেখতে পাই না সার।"

আপন মনে ইন্‌স্‌পেক্টার বলিয়া উঠিলেন, "পশু।" তারপর প্রধান শিক্ষকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপনি এ কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যাতে অবিলম্বে আপনাকে পদ-চ্যুত করা হয় তারই ব্যবস্থা করা হবে। নিয়ে আসুন খাতা।"

প্রধান শিক্ষক কি বলিতে গেলেন, তিনি ধমক দিয়া উঠিলেন, "কোন কথা শুনতে চাইনি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনি সব ছেলেমেয়েদের পাখীপড়া করে শিখিয়ে-ছেন—যে শিক্ষক ছাত্রদের মিথ্যে বলতে শেখায়, সে শিক্ষকতা কাজের একেবারেই অনুপযুক্ত। যান, নিয়ে আসুন খাতা।"

অপরাজিতার দিকে চাহিয়া পুনরায় তিনি কহিলেন, "তোমার ওপর আমি ভারি খুসী হয়েছি। এমনই ভাবে সত্য কথা বলবে।"

অপরাজিতা কহিল, "হ্যাঁ সার, বাবাও আমায় এই কথা বলে দিয়েছেন, আমি ত মিথ্যে কথা বলি না।"

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন, "সত্যি কথা বলার জন্যে তোমাকে একখানা ভাল বই পুরস্কার দেব।" তারপর অপরাপর ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মিথ্যে কথা বলার কি শাস্তি তা তোমরা জান ?"

কয়েকজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমাদের মাষ্টার মশায় যে শিখিয়ে দিলেন সার, আর কখনও মিথ্যে কথা বলব না সার।"

"আচ্ছা এবারকার মত তোমাদের মাপ করলুম। আর কখনও এমন কাজ কর না।" তিনি এই কথা বলিয়া খাতা লইয়া লিখিতে বসিলেন।

প্রধান শিক্ষকের নিকটও অপরাজিতার পুরস্কার লাভ ঘটিল। তবে সে পুরস্কার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। ইন্‌স্‌পেক্টার চলিয়া গেলে শিক্ষক অতি নির্ম্মমভাবে অপরাজিতার পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করিলেন,—পাচ সাত জায়গা দড়া-দড়া হইয়া ফুলিয়া উঠিল, এবং দুই তিন জায়গা কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। ফলে অশেষ আসিয়া শিক্ষককে শাসাইয়া স্কুল হইতে কন্যার নাম কাটাইয়া লইলেন। এ ব্যাপার ঐখানে শেষ হইল না, আদালত অবধি গড়াইল এবং সাত দিনের জন্য শিক্ষক মহাশয়কে শ্রীঘরেও অবস্থান করিতে হইল। তবে সে সব কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

এই ঘটনার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অপরাজিতা তখন কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে সে পড়িতেছে। এখন সে বড় হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিছক সত্য কথা বলিতে গিয়া, ন্যায় পথে চলিতে গিয়া তাহাকে যে মাঝে মাঝে লাঞ্ছনা বা নির্যাতন ভোগ করিতে হইত না তাহা নহে। তথাপি নিজের আদর্শে সে অচল, অটল।

শোভনা অপরাজিতার নীচের শ্রেণীতে পড়ে। অপরাজিতার মত সেও প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। সেই বিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল, যে প্রথম হইয়া এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, এক বৎসরের জন্য তাহাকে বেতন দিতে হইবে না এবং পাঠ্য পুস্তকগুলি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ নিজব্যয়ে ক্রয় করিয়া দিবেন। শোভনার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র। অর্থদ্বারা পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করিয়া বেতন দিয়া শোভনাকে স্কুলে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। শোভনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, এবং লেখা-পড়া শিখিবার তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই সে মন দিয়া পড়িয়া প্রতি বৎসর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিত। ক্রমে অপরাজিতার সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। একদিন যদি একজন কোন কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইত, অপর জন সেদিন পাঠে আর মন দিতে পারিত না, ছুটি হওয়া মাত্র বন্ধুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাহার সংবাদ লইয়া আসিত। একজন হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলে অপরজন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিত। জলযোগের ছুটির সময় দুইজনে নিরালায় বসিয়া গল্পগুজব করিয়া সময়টুকু অতিবাহিত করিত। অপরাজিতা বাড়ী হইতে যে খাবার আনিত, দুই জনে তাহা বণ্টন করিয়া খাইত। শোভনা যদি হঠাৎ কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিত, "তুই রোজ আমায় খাওয়াস, আমি ত তোকে একদিন কিছু খাওয়াতে পারি না। আর আমি খাব না।" অভিমান করিয়া অপরাজিতা বলিত, "বেশ ত খাস নি—কাল থেকে যদি আমি খাবার আনি ত কি বলেছি, দুজনে উপোস করে থাকব।" এই বলিয়া সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিত। শোভনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিত। অপরাজিতার চক্ষুও শুষ্ক থাকিত না। অন্যান্য মেয়েরা তাহাদের দুই জনকে উদ্দেশ করিয়া কত ঠাট্টাবিদ্রূপ করিত, কত ছড়া কাটিত। তাহারা দুজনে শুধু হাসিত। এমনই একটানা আনন্দের মধ্যে তাহাদের দীর্ঘ তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন অষ্টম শ্রেণীতে একটি নূতন ছাত্রী আসিয়া ভর্ত্তি হইল। ষান্মাসিক পরীক্ষায় পাঁচ নম্বর বেশী পাইয়া সে প্রথম স্থান অধিকার করিল। শোভনা একেবারে মুসড়াইয়া পড়িল। তাই ত, বাৎসরিক পরীক্ষাতেও এই নূতন ছাত্রীটি যদি প্রথম স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? বেতন দিয়া পড়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা ত' তাহার হইবে না, এইখানেই পড়াশুনার খতম তাহাকে করিতে হইবে। তাহার যে বড় সাধ ছিল, ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাশ করিয়া সে জলপানি পাইবে, দরিদ্র পিতার অর্থকষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম করিবে। তাহার সে সাধে যে বাজ পড়িবে।

অপরাজিতা কহিল, "কোন ভাবনা নেই তোর, এখনও পরীক্ষার ছ' মাস বাকি, আমরা এক সঙ্গে পড়ব, দেখি না ও কেমন করে তোকে ছাড়িয়ে যায়। আমি বলছি, তুই-ই ফাষ্ট হয়ে উঠবি।"

শোভনা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমার বড্ড ভয় করছে, যদি না পারি।"

অপরাজিতা জোর দিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই পারবি।"

দেখিতে দেখিতে বাৎসরিক পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। শোভনা প্রাণপাত করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত

হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সেবার ঠিক তাহারই পাশে অপরাজিতার বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, শোভনা মনে অনেকখানি বল পাইল। অতি উৎসাহের সহিত সে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে লাগিল। তুইটি দিন ভাল ভাবেই কাটিল। অঙ্কের দিন গোল বাধিল। একটা অঙ্ক শোভনা কিছুতেই করিতে পারিতেছিল না। এটি না করিতে পারিলে তাহার দশ নম্বর কাটা যাইবে। প্রথম স্থান অধিকার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তাহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল। ঘণ্টা পড়িবার আর বেশী বিলম্ব নাই, এমন সময় শোভনা অতি নিম্নস্বরে অপরাজিতাকে কহিল, "অপুদি, এই অঙ্কটা যে কষতে পাচ্ছি না ;" বলিয়া সেই অঙ্কটির উল্লেখ করিল। অপরাজিতা প্রথমটা কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরীক্ষার সময় বলাবলি করার অভ্যাস তাহার ছিল না। ইহা ত' একেবারেই ন্যায়সঙ্গত নহে, পরন্তু অত্যন্ত গর্হিত। কেমন করিয়া এ কাজ সে করিবে ? কিন্তু শোভনার ব্যগ্র, কাতর মুখের দিকে চাহিতেই নিজেকে সে ভুলিয়া গেল এবং অঙ্কটি কি করিয়া কষিতে হয়, তাহার খেই ধরাইয়া দিল। গভীর আনন্দে শোভনার মুখ ভরিয়া উঠিল, চাপা গলায় সে কহিল, "এইবার আমি পারব।" সঙ্গে সঙ্গে শোভনা অঙ্কটি কষিতে আরম্ভ করিল।

অঙ্কটি সবে মাত্র সে শেষ করিয়াছে, এমন সময় দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তুমি আর অপরাজিতা বলাবলি করেছ, ঘণ্টা পড়লে তোমরা তুজনে সেক্রেটারীর কাছে যাবে। সেখানে তোমাদের বিচার হবে। অশোকা, লিলি, মায়া—ওরা তিনজনে দেখেছে।"

অশোকা সেই নূতন ছাত্রীটির নাম।

গভীর ভয়ে শোভনার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অপরাজিতা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট তুই পরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। যে যাহার কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া গুঞ্জন করিতে করিতে কক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল।

কাতর কণ্ঠে শোভনা কহিল, "কি হবে অপু দি ? কেন মরতে জিজ্ঞেস করতে গেলুম ! না হয় এই অবধি পড়া শেষ হয়ে যেত, এমন ভাবে অপমানিত হয়ে স্কুল ছাড়তে হ'ত না। কিন্তু এ কি করলুম, তোমার যে সর্ব্বনাশ করলুম অপুদি।" সে কাঁদিয়া ফেলিল।

কম্পিতকণ্ঠে অপরাজিতা কহিল, "অন্যায় করেছি শোভনা, অন্যায় করেছি ! তোর মুখের দিকে চাইতে, সব যেন কেমন হয়ে গেল ! বলে ফেললুম।"

এমন সময় দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "শোন অপরাজিতা, তোমায় চুপি চুপি একটা কথা বলতে এলুম,—দেখ সেক্রেটারী যখন তোমায় জিজ্ঞেস করবেন, হাঁা বলে ফেল না। তুমি যে রকম ন্যাকা মেয়ে, তাই তোমায় সাবধান করে দিয়ে গেলুম। একটা সুবিধে তোমাদের হয়েছে—তোমার কথা ছাড়া আর কারু কথা তিনি বিশ্বাস করবেন না। ভয়ে হাঁা বলে ফেল না যেন, তা হলে তোমাদের তুজনকেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেন, কারো কথা শোনবার লোক তিনি নন।" এই কথা কয়টি বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

অপরাজিতা ও শোভনা সেক্রেটারী নিকুঞ্জবাবুর কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অশোকা, লিলি ও মায়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে।

নিকুঞ্জবাবু শোভনাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "শুনছি তোমরা গুরুতর অপরাধ করেছ। যদি কথাটা সত্য হয় তোমাদের তুজনকেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এখন যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও—তুমি অপরাজিতাকে কিছু জিজ্ঞেস করছিলে ?"

শোভনা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না।

নিকুঞ্জবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, "সত্যি বল, তুমিই বা কি জিজ্ঞেস করলে, অপরাজিতাই বা কি বললে ?"

শোভনা কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "অপুদি ত কোন কথাই বলে নি। একটা অঙ্ক কি করে কষতে হয় আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে তখন মুখ গুঁজে লিখছিল, সে মুখও তুললে না, কিছু বললেও না, সব দোষ আমার, অপুদির কোন দোষ নেই।"

নিকুঞ্জবাবু অপরাজিতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তিনটি মেয়ে বলছে, তুমি আর শোভনা বলাবলি করছিলে ;—কথাটা সত্য ?"

অপরাজিতার বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। অবিচলিত কণ্ঠে সে কহিল, "হাঁ। সত্যি আমরা বলাবলি করেছি, একটা অঙ্ক কি করে কষতে হয় শোভনা আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, আমি থেই ধরিয়ে দিয়েছি।"

অশোকা, লিলি ও মায়ার বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া নিকুঞ্জবাবু কহিলেন, "তোমরা না বলছিলে অপরাজিতা কখ্খনও স্বীকার করবে না, মিথ্যে বলবে, এখন দেখলে? যাও, না জেনে কাউকে আর কখনও মিথ্যেবাদী ঠাউরো না।"

নিকুঞ্জবাবুর এখানে একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এই নিকুঞ্জবাবুই স্কুলের সেই ইনস্‌পেক্টার, যিনি সত্য কথা বলার জন্য অপরাজিতাকে একদিন পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী হইয়াছেন।

নিকুঞ্জবাবু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "তোমরা খুব অন্যায় করেছ। তোমাদের শাস্তি হওয়া দরকার। তোমাদের বলবার কিছু আছে?"

অপরাজিতা কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমাকে যে শাস্তি হয় দিন, শোভনাকে দয়া করুন, এবারকার মত তাকে ক্ষমা করুন। আর কখনও সে এ কাজ করবে না।"

নিকুঞ্জবাবু হাসিয়া কহিলেন, "শুধু শোভনাকে কেন, তোমাকেও ক্ষমা করলুম। কেন জান?"

অপরাজিতা ও শোভনার চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল।

চেঞ্জে

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

সঙ্গিনী আর সঙ্গীরা সব বেড়াতে গিয়েছে চলে
পোলো-গ্রাউণ্ডেতে খেলা আছে আজ। মাথাটা
ধরেছে বলে'
আমি যাইনিকো; কোথায় বা যাব?—
ভালো লাগেনাকো রোজ
দুবেলা বেড়ানো, বাড়ী বাড়ী ঘোরা, হেথা-হোথা
বন-ভোজ!
যত বাজে-কাজে সময় কাটানো এরা দেখি ভালবাসে!
আমার কী জানি মন করে হুহু, চোখে খালি
জল আসে।
হল্লা-হুজুগ হৈচৈ আর হুল্লোড় সারাখন
একঘেয়ে আর কতো সওয়া যায়?···
লাগে না কি জ্বালাতন?···
ভেবে তো মোটেই পাইনে হদিশ কী করে যে
এরা পারে,—
দিনে ও রাত্রে তাস নিয়ে ব্রিজে মেতে যেতে
একেবারে!...
আজ কাপ্‌রেস্—কাল পাখী মারা—পরশু
মোটর ট্রীপ্,
এতেই ওদের এঞ্জয়মেণ্ট্?—লাইফ্ এতই চীপ্?

হরদম্ এই হাল্‌কা হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছি যেন!—
ভাবছি কেবলি কবে ফিরে যাব?...এলুম
এখানে কেন?

* * *

চারিদিক ঠিক ছবির মতন,—উঁচু টিলাটির পাশে
পাইনের বনে বসে আছি একা;··· এখন জ্যৈষ্ঠি মাসে
কন্‌কনে শীতে কাঁপছে শরীর, শাল জড়িয়েছি গায়ে,
উলেন-ব্লাউজ ফ্লানেল-সেমিজ মোটা মোজা
জুতো পায়ে!
সেখানে কিন্তু ভীষণ গরম, সারারাত 'ফ্যান' চলে!···
তেষ্টা মেটে না সিরাপ মেশানো ঠাণ্ডা বরফ জলে।
ভাবছি, এখন এ সময়ে 'তিনি' সেখানে কী করছেন?
কোর্ট থেকে ফিরে পোষাক বদলে ধুতি নিয়ে
পরছেন?
কিংবা হয়তো চলেছেন ক্লাবে; বাড়ীতে
কে থাকে একা?
এমন সময়ে কোনো ক্লায়েন্ট এলে কি সায়েবের
পাবে দেখা?
বিকেলে বাড়ীতে বোধ'য় এখন খান্ নাকো
কফী আর!
গরমের দিনে সরবৎ ফল,—সেই তো চমৎকার!

বিশেষ নিষেধ করেই লিখেছি, সেদিনের চিঠি পেয়ে,—
'এ সময়ে আর তিন চার বার কাজ নেই কফী খেয়ে।
কোর্ট থেকে এসে সরবৎ খেয়ো সঙ্গে টাট্‌কা ফল
রেফ্রিজারেটারে রাখে যেন রোজ তোমার
'লিথিয়া'-জল
বৈজু বেয়ারা,—ভালো করে নিজে বলে দিও
তুমি তাকে
বোম্বাই আম আপেল আঙুর সব যেন
ঠিক রাখে।'

* * *

পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ের ঢেউ, সারি সারি
নীল চূড়ো!
পড়েছে সূর্য্যি তারি আড়ালেতে ছড়িয়ে
সিঁদুর গুঁড়ো!
সূর্য্যি ডোবাটি দেখবার লোভে প্রায় হেথা
আসি একা!
নীলের বুকেতে হাজারো রংয়ের লুকোচুরি যায় দেখা!
এলোমেলো পারা গান গায় যেন পাত্‌লা
পাইন পাতা!
বন-চামেলীর মিষ্টি গন্ধে ঝিম্‌ঝিম্‌ করে মাথা!
আকাশের কোলে নেই কোনো পাখী, ফোটেনি
এখনো তারা
একটানা সুরে ঝরে ওই দূরে বীডন্‌ ঝরণা ধারা।
খাসিয়া পাড়ায় সুরু হয়ে গেছে নাচ গান ভরপূর!
শোনা যায় তারি আবছা আওয়াজ মেয়েলী
গলার সুর!

* * *

জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যেটা ঠিক কাটানো চলে না ঘরে
নিশ্চয় ফের বেবী অষ্টিনে 'ষ্ট্র্যাণ্ডে' গেছেন পরে।
এ সময় টুকু গঙ্গার ধারে হাওয়ায় বেড়াতে বেশ!
কিম্বা ঢাকুরে লেকে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে কাটান শেষ!
সিনেমায় আছে 'সেভেন্থ হেভেন্‌' দেখেছি পেপারে
আজ!
ইভনিং শো'তে তিনি কি যাবেন? বেশী না
থাকিলে কাজ?

ওমা!...ভুলে গেছি! আমি বড় বোকা!
আজ যে শুক্রবার!...
মিটিঙ্‌ রয়েছে সেনেট হাউসে সন্ধ্যে ছ'টায় তাঁর!
আজকে বেড়াতে যাবেন কী কোরে,—গিয়েছেন
সেইখানে!
জল টল খেতে পেয়েছেন কি না বাড়ী ফিরে,
কেবা জানে!
আমি থাকলে তো খাওয়াতুম ঠিক মিটিঙে
যাওয়ার আগে!
সারা দিন খেটে ঘরে ফিরে কিছু না খেলে কি
ভালো লাগে?...
নাঃ; কাজ নেই মিছে দূরে থেকে,—
ছটফট করে মন।
শরীর আমার বেশ সেরে গেছে। আর কেন?...
জ্বালাতন!
যে টুকু সেরেছি তাও যাবে ভেঙে! ছোড়-দিকে
বলি আজ,
বর্ষা এখন নামলো পাহাড়ে, আর থেকে কিবা কাজ?
ভগ্নীপতিরা রাজী ন'ন মোটে নামতে এখন প্লেনে।
দিদিরা বেজায় জব্দ করেছে আমাকে পাহাড়ে এনে!

* * *

ওই দলবল আস্‌ছে ইদিকে,—হয়তো আমারি
খোঁজে।
কী সর্ব্বনাশ!..জামাইবাবুর শোনা যায় গলা
ও যে!...
শালী শালা নিয়ে সোরগোল করে আসছে
পাইন বনে।
এখানে আমাকে দেখলে একলা ওরা কী
ভাব্‌বে মনে?
ঠাট্টার চোটে কোরবে পাগল দেবে হেসে হাততালি।
"বিরহিণী" বলে অল্‌রেডি ওরা ক্ষ্যেপায়
আমাকে খালি।
জ্যোৎস্না উঠেছে।..রাত হয়ে গেছে।—
তাই তো।...ছি ছি ছি! কী এ!
—ওরা আসবার আগেই বাড়ীতে পালাই
এধার দিয়ে।

ইতিহাসের ভিত্তি

ঃ ঔপনিবেশিকদের আত্মত্যাগ

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের অগ্রপথিক 'পরিব্রাজক' সম্প্রদায় কেমন করে সার ফার্ডিনাণ্ডো গর্জেস প্রভৃতির চক্রান্ত ও ভূতপূর্ব একজন জলদস্যুর চাতুরীতে মন্দোষ্ণ ভার্জ্জিনিয়ার বদলে শীতল নিউ-ইংলণ্ডের উপকূলে নীত হয়েছিলেন সে কথা আগে বলা হয়েছে। এবার বলব প্রথম ঔপনিবেশিকদের গোড়ার দিকের দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা। কি কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁদের যেতে হয়েছিল, তার কাহিনী শুনলে বোঝা যাবে, আমেরিকার ভবিষ্যৎ গৌরবের পত্তন যাঁরা করেছিলেন তাঁরা কি ধরণের মানুষ ছিলেন। যে অসীম সহিষ্ণুতা, অটল ধৈর্য্য ও অদম্য উৎসাহের পরিচয় তাঁরা দিয়েছিলেন তার তুলনা পাওয়া কঠিন।

সমুদ্র-উপকূলে 'পরিব্রাজক' সম্প্রদায় ত' অবতরণ করলেন, কিন্তু প্রথম উপনিবেশ ত' যেখানে-সেখানে স্থাপন করা যায় না! তার জন্যে উপযুক্ত স্থান খোঁজা প্রয়োজন। পর পর দুটি দল বসতির উপযুক্ত ভাল জায়গা খুঁজে না পেয়ে ফিরলেন ব্যর্থমনোরথ হয়ে। তৃতীয় দল তারপর নৌকায় করে আবার বার হলেন। এক সপ্তাহ বাদে তাঁরা যখন ফিরলেন, তখন ক্যাপ্টেন জোন্স্ ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌছেছে; পরিব্রাজক সম্প্রদায়কে অসহায় ভাবে ফেলে পলায়ন করতেও সে প্রস্তুত।

সুখের বিষয়, পরিব্রাজকদের সন্ধান এবার ব্যর্থ হয় নি। চমৎকার একটি বন্দরের মত জায়গা তাঁরা পেয়েছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'প্লিমাউথ'। এই বন্দরের সন্ধান পাওয়া অবশ্য সহজ হয় নি। পথে বিপদ তাঁদের গেছে অনেক। শীত তখন এত দারুণ যে, দাঁড় টানবার সময় জলের ছাট নৌকার গায়ে লাগতে না লাগতে জমে গেছে। পথে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গেও তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে। রেড-ইণ্ডিয়ানরা কয়েকটা তীর ছুঁড়ে তাঁদের সম্ভাষণ করেছে—সন্ধানী দলও বন্দুক ছুঁড়ে তার উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু উভয় পক্ষের কেউ তাতে খুন-জখম হয়নি। কারণ রেড-ইণ্ডিয়ানদের তীর তাঁদের নাগাল পায়নি এবং অনভ্যস্ত পরিব্রাজকদের হাতের তাগ চমৎকার।

সন্ধানী দল সুখবর নিয়ে এলেও তাঁদের জন্যে দারুণ দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল। এই দলের নেতা, উইলিয়াম ব্রাড্ফোর্ডের স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতির মধ্যে একদিন কেমন করে জাহাজ থেকে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে ডুবে গেছেন। আর একটি অনাথ ছেলেও এরি মধ্যে মারা গেছে।

পরিব্রাজকদের দুঃখের দিনের এই হল সূত্রপাত। তাঁরা স্ত্রী-পুরুষ মিলে সবশুদ্ধ ১০২ জন ছিলেন। এই ১০২ জন সকলেই পরিব্রাজক নয়; দশজন ভৃত্য, একজন পেশাদারী সৈনিক তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে, এবং চারটি অনাথ ছেলেও এঁদের মধ্যে ছিল। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে এই অনাথ ছেলেগুলি এসেছিল একরকম ক্রীতদাস হয়ে। কথা ছিল, ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাদের বিনা মাইনেতে প্রভুদের বেগার খাটতে হবে। কিন্তু ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেগার খেটে স্বাধীনতা লাভের আগেই মৃত্যু তাদের তিনজনকে মুক্ত করে দেয়। দশজন ভৃত্যের মধ্যে মাত্র একটি শেষ পর্য্যন্ত বাঁচে। নভেম্বর মাসে তাঁরা জাহাজ থেকে নেমেছিলেন, পরের বৎসর মার্চ্চ মাসে দেখা যায় তাঁদের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে গেছে।

পরিব্রাজক সম্প্রদায়ের একটি ব্যাপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মসম্প্রদায় হিসাবে তাঁদের ভাবলেই মনে হয়, যেন তাঁরা

সবাই দীর্ঘ পক্কশ্মশ্রুবিশিষ্ট, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত একদল লোক। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তার বিপরীত। উইলিয়াম ব্রাডফোর্ড ঔপনিবেশিকদের নেতা। তাঁর বয়স তখন মাত্র ৩১। পরিব্রাজকদের অধিকাংশের বয়সই ৩০-এর নীচে। কিন্তু বয়সে যুবক হলেও তাঁরা প্রবীণ ছিলেন বুদ্ধিতে, চিত্তের স্থৈর্য্যে। তাই কোন বিপদই তাঁদের কাতর করে নিরুৎসাহ করতে পারেনি।

১৬ই ডিসেম্বর তারিখে 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজ সন্ধানী-দলের নির্দ্দেশ অনুসারে নূতন-'প্লিমাউথ' বন্দরে প্রবেশ করে। তারপর উপনিবেশ স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়। ঔপনিবেশি-কেরা সঙ্গে করে প্রয়োজনীয় বিশেষ কিছুই নিয়ে আসেন নি। ঘোড়া, গরু অথবা কোনরকম গাড়ী, এমন কি একটা লাঙ্গল পর্য্যন্ত আনার কথা তাঁদের মনে হয়নি। এই অনভিজ্ঞ ঔপনিবেশিকদের সে বিষয়ে কেউ পরামর্শও দেয় নি। কি মনে করে বলা যায় না, শুধু গোটা কয়েক কুড়ুল ও বাগানের যন্ত্রপাতি তাঁরা এনেছিলেন। আর ছিল তাঁদের সঙ্গে বন্দুক, গুলি, বারুদ। এই কুড়ুল দিয়ে তাঁদের কাজ আরম্ভ হল।

বড় বড় গাছের গুঁড়ি কেটে তাই দিয়ে মাটির প্রলেপের সাহায্যে অপটু হাতে তাঁরা তাঁদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করলেন। গাছের পাতা দিয়ে তার চাল ছাওয়া হল। সেই কাঠের গুঁড়ির তৈরী ঘরই একদিন অভ্রভেদী স্কাই-স্ক্রেপার হয়ে সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করবে—কে সেদিন ভাবতে পেরেছিল!

সাধারণের জন্যে এই ঘরটি নির্ম্মিত হওয়ার পর ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের আলাদা বাসস্থান নির্ম্মাণে মন দিলেন। বিভিন্ন পরিবারের জন্যে ১৯টি এমনি পৃথক ঘরের মাল-মশলা সংগ্রহ হতে লাগল। তখন ঔপনিবেশিকদের ভিতর অদ্ভুত এক রোগ দেখা দিয়েছে মহামারীরূপে। দুর্ব্বল হাতে গাছ কাটতে কাটতে, ক্লান্ত পদে সেই গাছের গুঁড়ি বহুদূর থেকে টেনে আনতে আনতে তাঁরা অনেকেই শয্যা নিলেন। সে শয্যা থেকে অধিকাংশকেই আর উঠতে হলনা। একদিকে রোগীর শুশ্রূষা, মৃতের সৎকার, আবার—আর এক-দিকে নিদারুণ শীতের মধ্যে সমস্ত সম্প্রদায়ের আহারের ও ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে যে কজন সুস্থ ছিলেন, তাঁদের প্রাণান্ত হতে লাগল। কোন কোন সময়ে ছয় সাত জন ছাড়া সমস্ত উপনিবেশে আর সুস্থ কেউ থাকেনি। তবু ঔপনিবেশিকদের মুখে কোনদিন এতটুকু হতাশার রেখা দেখা যায়নি, কোন অসন্তোষ তাঁরা প্রকাশ করেননি, অকরুণ ভাগ্যের বিরুদ্ধে, কোন অভিযোগ তাঁদের কাছে শোনা যায়নি।

এই মহামারী যে কি, তখনকার পরিব্রাজকেরা না জানলেও আজকালকার ডাক্তাররা অনুমান করতে পেরেছেন—এ রোগের নাম 'স্কার্ভি'। তুষারাবৃত দেশে সদ্য জাহাজ থেকে নেমে টাটকা শাকসব্জি প্রভৃতি খাদ্যের অভাবেই এ রোগ তাঁদের ভিতর এমন মারাত্মক ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

ব্যাপার গুরুতর হয়ে দাঁড়াল, যখন নাবিকদের ভিতরও এ রোগ দেখা দিলে। জাহাজের বদ্ধ খোলের ভেতর অন্ধকার, দুর্গন্ধ, অপরিষ্কার কামরায় মৃত ও মুমূর্ষু নাবিকদের রোগশয্যার পাশে তখন কিন্তু পরিব্রাজকেরাই এসে দাঁড়ালেন। মৃত্যুর অন্ধকারে তাঁদের চরিত্রের মহিমা এইবার সব চেয়ে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পেল। তাঁদের নিজেদের দেখবার লোকেরই তখন একান্ত অভাব, তবু যারা তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করে, এক রকম জুলুম করেই অবাঞ্ছিত দেশে নামতে তাঁদের বাধ্য করেছে, সমুদ্র-যাত্রার সমস্ত পথ যারা পরিব্রাজকদের ধর্ম্মানুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করে কুৎসিত অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে তাঁদের অশেষ পীড়া দিয়েছে, তাদের শুশ্রূষা করতে আসতে তাঁরা এতটুকু দ্বিধা করলেন না। সহস্র ধর্ম্ম-উপদেশেও যাদের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, মহান আত্মত্যাগের এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে সেই দুর্দ্দান্ত দস্যু-প্রকৃতির নাবিকেরাও যে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু আছে কি?

ঐশ্বর্য্যে নয়, বাহুবলে নয়—এই ত্যাগের ভিত্তিতেই জাতির ইতিহাস যে দৃঢ় হয়ে থাকে—আমেরিকাই তার প্রমাণ।

জীবনের আদি জননী

§ সমুদ্রের কথা

সমুদ্র সম্বন্ধে কৌতূহল নেই এমন লোক বোধ হয় চেষ্টা করলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমুদ্র যারা দেখেছে আর এখনো সে সৌভাগ্য থেকে যারা বঞ্চিত, সকলেরই আছে তার প্রতি সমান টান। ডাঙ্গা থেকে আলাদা, অন্য এক জগৎ বলেই যে সমুদ্রের প্রতি আমাদের এই আকর্ষণ সে মনে

করনা। সমুদ্রের আকর্ষণের আরো গূঢ় কারণ আছে। 'হে আদি জননী সিন্ধু' শুধু কবিতার উচ্ছ্বাস নয়, একান্ত সত্য কথা। সত্যিই পৃথিবীর প্রথম প্রাণ-শক্তির আরম্ভ হয়েছিল সমুদ্রে। সেখান থেকে জীবন ধীরে ধীরে ডাঙ্গায় উঠে এসেছে। কিন্তু এখনও সমুদ্রকে আমরা ছাড়িয়ে আসতে পারিনি। সমুদ্র আছে আমাদের রক্তে। জীবতত্ত্ববিদেরা দেহের রক্ত ও সমুদ্রের জলের তুলনামূলক পরীক্ষা করে দেখেছেন, দুইএর ভিতর একই ধরণের লবণাক্ত জল আছে। এই দুরকমের জলে নানারকম লবণ জাতীয় জিনিষের পরিমাণও এক। সমুদ্রের জলই সমস্ত রক্তের ভিত্তি।

সে সুদূর সমুদ্র-বাসের স্মৃতি এখনও আমাদের শরীরে আছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সেই আদিম সমুদ্রের টানই আমাদের দেহে আমরা টের পাই। শুধু স্মৃতি নয়, সামুদ্রিকতার সমস্ত চিহ্নও এখনও আমরা লোপ করতে পারিনি। শিশু যখন ভ্রূণ অবস্থায় থাকে তখন গোড়ার দিকে তার ঘাড়ের দুধারে মাছের কাণকোর মত দুটি জিনিষ দেখা যায়। সে কাণকো লোপ পায় তার পরে। বাতাস থেকে নয়, জল থেকেই যে একদিন আমাদের অক্সিজেন নিতে হত, এটা হল তারই প্রমাণ।

কিন্তু সে যাই হোক; সমুদ্র থেকে আমরা এখন অনেক দূরে সরে এসেছি।] সমুদ্রের প্রতি আমাদের টান যতখানি আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততখানি নেই। পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগ সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি। জাহাজে করে আমরা সমস্ত সাগরে পাড়ি দিচ্ছি অনেক দিন থেকে, কিন্তু সে শুধু তার 'খোসা'র উপর দিয়ে বলা যেতে পারে। সমুদ্রকে শুধু উপর থেকেই ত জানা যায় না। অতল তার গভীরতা। এভারেষ্ট চূড়াকে ডুবিয়ে দিয়েও থই পাওয়া যায়না এমন গভীর সমুদ্রও আছে আমাদের এই প্রশান্ত মহাসাগরে। সে গভীর

সমুদ্রতলের জগৎ: বৈজ্ঞানিকেরা কিরূপে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রতলের খবর রাখেন এই ছবিতে তাহাই দেখানো হইয়াছে; বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রাণীর খবরও ইহাতে পাওয়া যাইবে।

স্তরের কথা উপর থেকে জানবার চেষ্টা করা বৃথা।

তবু উপর থেকেই সমুদ্রের কম বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিষুব-রেখা থেকে আরম্ভ করে দুই মেরু পর্য্যন্ত সমুদ্র নানা রূপে বিস্তৃত হয়ে আছে। তার বিভিন্ন শীতল ও উষ্ণ স্রোতের ধারার জটিলতা, তার নানামুখী বায়ুপ্রবাহের

বিভিন্ন গতির রহস্য বড় কম নয়। উষ্ণ থেকে শীতল মেরু পর্য্যন্ত প্রাণী জগতের পরিবর্ত্তনও অনুসরণ করবার মত জানার অসুবিধা অনেক। যত নীচে নেমে যাওয়া যায়, সমুদ্রে জলের চাপ তত বেশী। খুব ভাল ডুবুরী আজকালকার আধুনিক যন্ত্র-পোষাক পরেও বেশী দূর নামতে পারে না। তা ছাড়া সমুদ্রের নীচে খানিক দূর গেলেই অন্ধকার। দুই শত ফিটের পর সূর্য্যের আলো আর পৌছোয় না। তার পরে যে অন্ধকার-রাজ্য আরম্ভ হয়েছে, সেখানকার রহস্য জানতে মানুষকে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

সমুদ্রতলের শীকার ধরবার রঙ্গীন ফাঁদ।

কিন্তু সে পরিশ্রম সার্থক। সমুদ্রের অতলের এই অন্ধকার-রাজ্য মানুষের কল্পনাকে হার মানিয়ে দিয়েছে। এই অন্ধকার-রাজ্যে কত অদ্ভুত ধরণের প্রাণী যে নিজের নিজের স্তরে বাস করে তার এখনও হিসাব হয়নি। তাদের কয়েকটিকে মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

এই পাতালপুরীর প্রাণীগুলি সম্বন্ধে সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল তাদের নিজস্ব আলো। সূর্য্যের কিরণ যেখানে পৌছায় না সেখানে প্রকৃতি নিজে থেকেই আলোর ব্যবস্থা করেছে। অন্ধকার সাগর-তলের সমস্ত প্রাণীই স্বয়ম্প্রভ। জোনাকির মত তাদের প্রত্যেকের গা থেকেই আশ্চর্য্য এক শীতল আলো বেরোয়। সেই আলোর সাহায্যেই তারা শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার সঙ্গে শীকার ধরার কাজ
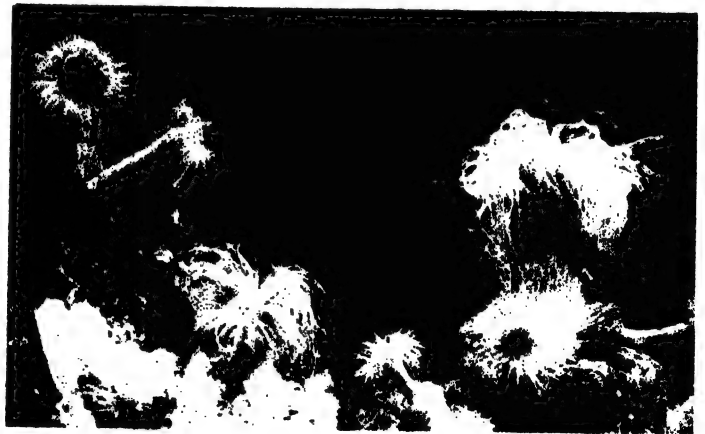
কিন্তু সমুদ্রের গভীরতাকে না জানলে তাকে সত্য করে জানা হয় না। ডাঙ্গার সঙ্গে সমুদ্রের তফাৎ এই যে, ডাঙ্গায় বলতে গেলে জীবনযাত্রার রঙ্গমঞ্চ এক রকম একতলাতেই সম্পূর্ণ। পাখী যত উর্দ্ধেই উঠুক আর সাপ যত নীচেই গর্ত্ত করুক, মাটির উপরের একটি স্তরেই তাদের জীবন আবদ্ধ। কিন্তু সমুদ্রের জীবন-রঙ্গমঞ্চ অনেকগুলি তলায় ভাগ করা। সে সমস্ত তলায় যারা বাস করে, অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে তারা এক সমান স্তরে মিলতেই পারে না। এক তলার প্রাণীর আর এক তলায় যাবারই ক্ষমতা নেই। নিজের নিজের স্তরের জলের চাপের সঙ্গে তাদের শরীরের সামঞ্জস্য আছে। সে স্তর ছাড়িয়ে নীচে তারা নামতে পারে না, উপরে উঠলেও সর্ব্বনাশ। ফুলোন বেলুনের মত তারা ফেঁসে যায়।

বহু স্তরের এই সমুদ্রের রহস্য ভেদ করা সহজ নয়। সবে মাত্র এ কাজ আরম্ভ হয়েছে। সমুদ্রের উপরতলাগুলিতে যারা থাকে তাদের কথা আমরা অনেকদিন থেকেই জেনে আসছি। সমুদ্রের গভীর-তলা সম্বন্ধে কোন ধারণাই মানুষের ছিল না। গভীর সমুদ্রের কথা

সমুদ্রতলের অপরূপ উদ্যান।

চালায়। এ আলোক যেমন মনোহর তেমনি উজ্জ্বল। ফরাসী একদল বৈজ্ঞানিক গভীর সমুদ্র থেকে প্রবাল জাতীয় একরূপ স্বয়ম্প্রভ জীব তুলে এনে তাঁদের জাহাজের ল্যাবরেটারিতে

·পৃথিবীর উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গ এভারেষ্টকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলে তাহার এই অবস্থা দাঁড়াইবে ; ইহা হইতে সমুদ্রের অতলতার পরিমাপ বুঝা যায়।

রেখেছিলেন। আলোর উজ্জ্বলতা পরীক্ষা করবার জন্যে ল্যাবরেটারির অন্য সমস্ত বাতি নিবিয়ে দেবার পর দেখা যায়, সেই প্রাণীগুলির আলোকে সাধারণ বইএর ছোট লেখা বার তের হাত দূর থেকেও অনায়াসে পড়া যায়।

সমুদ্রের এই অন্ধকার-রাজ্যের অধিবাসীদের চোখগুলিও অদ্ভুত। অন্ধকারে বহুযুগ বাস করে তাদের চোখের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। অনেকের চোখ সেখানে একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, কারুর কারুর চোখের বালাই আর লম্বা ছিপের সাহায্যে তারা চোখের কাজ সারে।

এই অন্ধকার-রাজ্যে তারা জীবনধারণ করে পরস্পরকে আহার করে'। সেখানে ছোট বড় কোন প্রভেদ নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেককে শীকার করে ফিরছে। যে ভোগ্য, সেই ভোক্তা। নিজের আকারের দ্বিগুণ তিনগুণ বড় প্রাণীকে আক্রমণ করে উদরস্থ করতে এরা দ্বিধা করে না। তাদের উদরের গঠনই এমনি যে তাকে অনায়াসে অনেকখানি প্রসারিত করা যায়।

পরস্পরকে আহার করা ছাড়া তাদের খাদ্যসংগ্রহের আর একটি উপায় আছে। উপরের স্তর থেকে মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ অনবরত নীচে পড়ছে। সেই শব-বৃষ্টি নীচে পর্য্যন্ত বড় একটা পৌঁছোতে পারেনা। মাঝ-পথে নানা স্তরের অধিবাসীরা অনেকেই সেগুলির সদ্ব্যবহার করে ফেলে।

কিন্তু এই থেকে প্রশ্ন হতে পারে সমুদ্রে মূল আহার কি? সেখানে বড় প্রাণীরা ছোটকে এবং সকলে পরস্পরকে আহার করে সত্য, কিন্তু তাতে খাদ্য-রহস্যের সমাধান হয় না। পৃথিবীতে

আমরা জানি উদ্ভিদই সমস্ত প্রাণের ভিত্তি। কীটপতঙ্গ থেকে ছোট ও বড় নিরামিষাশী প্রাণী উদ্ভিদের উপর জীবন ধারণ করে। মাংসাশী ও আমাদের মত সর্ব্বভুক প্রাণীরও শেষ আশ্রয় সেই উদ্ভিদ। কিন্তু সমুদ্রে মূল খাদ্য কি ?

এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত বিস্ময়কর। সমুদ্রে পৃথিবীর মত কোন উদ্ভিদ নেই। উদ্ভিদ বলে যাদের মনে হয় সেগুলি সবই নানা জাতীয় প্রাণী। অগভীর সমুদ্রের নীচে নেমে গেলে দেখা যায় বিচিত্র এক অরণ্য—স্বপ্নের মত অপরূপ

সমুদ্রতলের এক জাতীয় স্বয়ম্প্রভ মাছের ঝাড়।

সব ফুল সেখানে ফুটে রয়েছে। কিন্তু মজার কথা এই যে, সেগুলি ফুল নয়, শীকার ধরবার রঙ্গীন ফাঁদ মাত্র। সেগুলি গাছও নয় একরকমের প্রাণী। গাছের মত তারা মৃত্তিকার রস শোষণ করে, বাতাস ও সূর্য্যালোকের সাহায্যে তাকে দেহের কাজে লাগায় না। তারা অন্য জীবিত প্রাণীই আহার করে বেঁচে থাকে।

পৃথিবীর মত কোন উদ্ভিদ না থাকলেও উদ্ভিদজাতীয় জিনিষ সমুদ্রে অবশ্য আছে এবং তারাই সামুদ্রিক জীবনের ভিত্তি। কিন্তু তাদের চোখে দেখা যায় না। মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে অঞ্জলি ভরে যদি তার নীল জল তুলে নিয়ে দেখা যায়, তাহলে তাকে নিতান্ত স্বচ্ছ বলে মনে হবে। কিন্তু সেই স্বচ্ছ জলে কোটী কোটী প্রাণ-কণিকা আছে। সেইগুলিই সমুদ্রের উদ্ভিদজাতীয় খাদ্য-মূল। উদ্ভিদের মত তারা মাটিতে শিকড় চালাবার সুযোগ পায় না, কিন্তু সমুদ্রের জলের জড় উপকরণকে সূক্ষ্ম শিকড়ে সংগ্রহ করে বাতাস ও সূর্য্যের আলোর সাহায্যে তারা জৈব পদার্থে পরিণত করে উদ্ভিদেরই মত। সমুদ্রে সূর্য্যের আলো বেশীদূর পৌছায় না বলেই ভেসে থাকবার প্রয়োজনে এই সমস্ত উদ্ভিদজাতীয় জিনিষকে আণুবীক্ষণিক হয়ে ভেসে থাকার সমস্যা পূরণ করতে হয়েছে। এই আণুবীক্ষণিক সামুদ্রিক প্রাণ-কণিকার বৈজ্ঞানিক নাম হল 'প্লাঙ্কটন'। সমুদ্রের সমস্ত জীবজগতকে এই প্লাঙ্কটনের উপরই নির্ভর করতে হয়। এই প্লাঙ্কটনের রহস্য জানলে সমুদ্রের জীবনলীলার বৈচিত্র্যের অর্থও স্পষ্ট করে বুঝা যায়। আণুবীক্ষণিক প্লাঙ্কটন আহার করে যারা জীবন নির্ব্বাহ করে, তারাও প্রায় আণুবীক্ষণিক নানা রকম জীব। তাদের মধ্যে চিংড়িজাতীয় অতি ক্ষুদ্র একটি প্রাণীর প্রাধান্য আরও বেশী। সূর্য্যালোক যতদূর পর্য্যন্ত পৌছায় ততদূর পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্রের জল এই সমস্ত আণুবীক্ষণিক প্রাণীতে পরিপূর্ণ। তুষার-শীতল মেরু-প্রদেশ থেকে সমুদ্রের অতল অন্ধকারে যত বিচিত্র জীবের সন্ধানই পাওয়া যাক না কেন তাদের সকলের জীবন-টীকা অদৃশ্যপ্রায় এই প্লাঙ্কটনের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

জাবাল সত্যকাম

— শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

"মা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি গুরুগৃহে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করি।" জননী জবালার দুই চক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আজ তাঁহার মত সুখী কে? সন্তানের জীবন গড়িবার জন্য মাতার যে পলে পলে জীবন-দান—আজ তাহা সার্থক হইয়াছে। সত্যকাম আজ ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মকে জানিবার জন্য উৎসুক। জননী জবালা পুত্র সত্যকামকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"মা, আমার গোত্র কি? গুরু জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব?"

বেদপাঠে, ব্রহ্মচর্য্য-অনুষ্ঠানে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার; এই তিন বর্ণেরই গোত্র-পরিচয় আছে। গোত্র-পরিচয় না দিতে পারিলে ত' গুরু শূদ্র বলিয়া তাহাকে গ্রহণ না করিতেও পারেন।

মাতা জবালা চোখে অন্ধকার দেখিলেন। মাতার পরিচয় বিনা ত' সত্যকামের আর কোন পরিচয় দিবার নাই। অথচ সে পরিচয় ত' সাধারণে গ্রাহ্য করিবে না,—পুত্রের জীবনের সব উচ্চ আশা নিষ্ফল হইবে।

ক্ষণেকের জন্য মাতা জবালা সন্দেহ-দোলায় দুলিয়াছিলেন: তাহার পরেই তিনি সঙ্কল্প স্থির করিলেন। জীবনে জবালা কখনও পুত্রকে সত্য বিনা মিথ্যার পথে যাইতে দেন নাই। আজ তাঁহার পুত্রের সাধন-পথে তিনি এই শ্রেষ্ঠ পাথেয় দিয়াই তাহাকে গুরুগৃহে পাঠাইবেন। জগতে সত্যই একমাত্র কাম্য ও একমাত্র অবলম্বন।

জননী জবালা পুত্রকে কোলে টানিয়া লইয়া পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস সত্যকাম, তোমার কি গোত্র তাহা আমি জানি না, তোমার পিতৃ-পরিচয়ও আমি দিতে পারিব না। তুমি দুঃখিনী জবালার পুত্র—এই তোমার মাত্র সত্য পরিচয়। গুরুকে তুমি তোমার সত্য পরিচয়ই দিও।"

সত্যকাম মাতার চরণ বন্দনা করিয়া গুরু গৌতমের আশ্রমোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

গুরু গৌতম সশিষ্য বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সত্যকাম যাইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিল, "ভগবান, আমি আপনার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহি, দয়া করিয়া আপনার আশ্রমে স্থান দিন।"

গুরু গৌতম সত্যকামের স্নিগ্ধ শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন, তাহার বিনয়-নম্র বচনে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "বৎস তোমার গোত্র-পরিচয়?"

সত্যকাম দ্বিধা-সঙ্কোচ না করিয়াই উত্তর করিল, "আমার গোত্র-পরিচয় দিবার কিছুই নাই। আমি মাতা জবালার পুত্র—এই আমার একমাত্র সত্য পরিচয়। মাতা আমাকে এই পরিচয়েই পরিচিত হইতে বলিয়াছেন।"

ঋষি গৌতম বালকের এই শান্ত, ধীর, স্পষ্ট সত্যবাক্যে মুগ্ধ হইলেন। কি সরল সত্যময় বাক্য! বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৌতম ঋষি বলিলেন, "বৎস, তোমার বাক্যেই তোমার পরিচয় পাইয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ এমন সরল সত্য কথা বলিতে পারে না। সমিধ লইয়া আইস, আমি তোমার উপনয়ন দিব।"

সত্যনিষ্ঠ জননীর তপস্যা, সত্যকামের সত্য ব্রত—আজ সার্থক হইল। সত্যদ্রষ্টা ঋষি গোত্রহীন বালককে ব্রাহ্মণ বলিয়া আশ্রমে বরণ করিয়া লইলেন।

সত্যকামের পরিচয় আজ জাবাল সত্যকাম, সেই পরিচয়ই আজ তাহার গৌরবের হইয়া দাঁড়াইল। তাহার জীবন আজ সার্থক—যে ব্রহ্মজ্ঞানের স্বপ্ন সে বাল্যাবধি দেখিয়াছে, আজ গুরুর কৃপায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারিবে। গুরুর আদেশ পাইয়া বালক সত্যকাম যজ্ঞকাষ্ঠ বহিয়া আনিল। আচার্য্য গৌতম তাহার উপনয়ন দিয়া তাহাকে বেদ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। সত্যকাম আজ সত্যকারের ব্রাহ্মণ, ঋষি-শ্রেষ্ঠ গৌতমের শিষ্য।

গৌতম ঋষি একদিন সত্যকামকে বলিলেন, "বৎস, এই চারি শত গাভীর সেবার ভার তোমার উপর—তুমি ইহাদের পরিচর্য্যা কর।"

গাভীগুলি ছিল নিতান্ত কৃশ। সে গুরুকে প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে বলিল, "প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন। এই সেবক হাজার হৃষ্টপুষ্ট গাভী লইয়া আশ্রমে ফিরিবে।"

সত্যকাম একান্তে বনে বসিয়া গাভীর পরিচর্য্যা ও তপ-সাধনা করে। দিন, মাস, বৎসর চলিয়া যায়, কিন্তু সত্যকামের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহাকে যে হাজার গাভী লইয়া ফিরিতে হইবে সে কথাও সত্যকাম ভুলিয়া গেল।

সত্যকামের এই একনিষ্ঠ প্রাণ-মন-ভোলা সাধনা দেখিয়া দেবগণের আসন টলিয়া উঠিল। একদিন বায়ু-দেবতা একটি ধেনুর মারফৎ বলিলেন, "সত্যকাম, আর কেন, আমরা ত হাজার হইয়াছি, এইবার আমাদের গুরুগৃহে লইয়া চল।"

দেবগণ সত্যকামের আচরণে ভারি প্রীত হইয়াছিলেন। তাহারা সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিলেন।

সত্যকাম আজ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন—তাহার চিত্ত এখন শান্ত ও ধীর। সত্যকাম সহস্র গোধন লইয়া গুরুর চরণে উপনীত হইলেন।

সত্যকামের দিব্য কান্তি দেখিয়া গুরু বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "সত্যকাম, ব্রহ্ম-দীপ্তি তোমার চোখে-মুখে ভাসিতেছে, কে তোমাকে এ-জ্ঞান দিলে?"

"প্রভু, দেবগণ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু ভগবান ত জানেন গুরু-সকাশেই ব্রহ্ম-বিদ্যা শিখিতে হয়। আপনার নিকট হইতেই আমি সমস্ত তত্ত্ব শুনিতে বাসনা করি।"

গুরু সত্যকামের বাক্যে অতীব প্রীত হইলেন। গুরু কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে দেবতা-প্রদত্ত জ্ঞানও সত্যকামের মনঃপূত হইতেছে না। ঋষি-শ্রেষ্ঠ গৌতম তখন তাহাকে সমুদয় ব্রহ্মতত্ত্ব সবিস্তারে বলিলেন।

কত দিন যায়—সময়ে জাবাল সত্যকাম একজন প্রধান আচার্য্য হইলেন। তাঁহার আশ্রমে শিক্ষালাভের জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে শিষ্য আসিতে লাগিল।

সত্যকাম গুরুর নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বিবাহ করেন এবং সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সহিত একযোগে ব্রহ্মধ্যান ও বিদ্যাদান করিতে থাকেন। তাহার আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীও সত্যকামের পত্নী কুশলাকে মাতৃ-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন।

সত্যকামের প্রধান এক শিষ্য ছিল—উপকোমল। তাহার গুরুসেবা, তাহার স্নিগ্ধ স্বভাব সত্যই ছিল অতুলনীয়, কিন্তু এমনই তাহার দুরদৃষ্ট যে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলেও গুরু তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিলেন না। যাহারা তাহার পরে আসিয়াছিল তাহারাও জ্ঞান-লাভ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু উপকোমলের প্রতি গুরুর দয়া হইল না। তারপর, একদিন গুরু সত্যকাম, শিষ্য উপকোমলকে কিছু না বলিয়াই, তীর্থ করিতে দূর দেশে চলিয়া গেলেন।

গুরুর এই তাচ্ছিল্য উপকোমল আর সহ্য করিতে পারিলেন না—তিনি অন্নজল পরিত্যাগ করিলেন। ঋষি-পত্নী কুশলা শিষ্য উপকোমলের এই উপবাসের কথা শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি উপকোমলকে কত অনুরোধ উপরোধ করিলেন, "বৎস, ওঠ, অন্ন গ্রহণ কর—ব্রহ্মচারীর এ অভিমান শোভা পায় না।"

উপকোমল বিনীত ভাবে বলিলেন, "মা, প্রাণে বড় ব্যথা পাইয়াছি। আমার জীবনের কোন সাধই পূর্ণ হইল না।"

শিষ্যের দুঃখে মাতা কুশলার চক্ষু বহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল, তিনি সান্ত্বনার বাণী খুঁজিয়া পাইলেন না।

ঋষি সত্যকামের যজ্ঞশালার অগ্নিগণ এই দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উপকোমলকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস উপকোমল, আমরা তোমার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি—তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতেছি।"

উপকোমল অগ্নিগণের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

সত্যকাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রিয় শিষ্য উপকোমলকে ডাকিলেন। উপকোমল নিকটে আসিতেই গুরু তাহার মধ্যে ব্রহ্মদীপ্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, কে তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন?"

"প্রভু, আপনি গুরু, আপনি বিনা আর কে উপদেশ দিবেন?"—তাহার পর ইঙ্গিতে সভয়ে অগ্নিদের দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অগ্নিরা কাঁপিয়া উঠিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া উপকোমলের মনেও ভয় হইল।

কিন্তু ভয়ের কোন কারণ ছিল না। সত্যকাম তাঁহার শিষ্যের এই সৌভাগ্যোদয়ে প্রীত হইয়াছিলেন। বহু দিন পূর্ব্বের সেই শিষ্যাবস্থায় গোধন-সেবা ও তপশ্চর্য্যার কথা তাঁহার স্মৃতিপটে আজ জাগিয়া উঠিল। তাঁহার প্রিয় শিষ্য উপকোমল তাঁহার ন্যায়ই দেবগণকে নিজ সাধনবলে তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করুক—এই ছিল তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। এতদিনে তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল। আজ গুরুর সেই সাধনা ও তপস্যা শিষ্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত দেখিয়া গুরু নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। হৃষ্ট-চিত্তে গুরু সত্যকাম তখন উপকোমলকে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বর্ণনা করিলেন।

উপকোমলের তপস্যা ও সাধনা আজ সকল দিক দিয়াই সার্থক হইল। ধন্য সত্যকাম, ধন্য তাহার গুরু গৌতম, ধন্য তাহার শিষ্য উপকোমল! [ছান্দোগ্য উপনিষদ্]
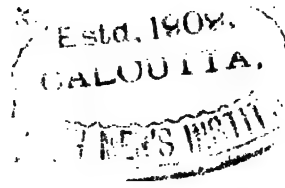
নকড়ির স্বপ্ন

—শ্রীকুড়নচন্দ্র সাহা

নকড়ি দেশত্যাগী হয় দুইবার, আবার দুইবার দেশের মাটিতে ফিরিয়া আসে। মধ্যেকার দিনগুলি পাড়ার লোকের দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছিল।

নকড়ির উদ্দেশ্যে যে সুরস ছড়াটি ছেলেদের রসনাগ্রে নৃত্য করিত, সেটিকে জীয়াইয়া রাখার মত কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধান তাহারা রাখিত না। তাই নকড়ির নিরুদ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে নকড়ির দরজায় আসিয়া তাহারা ধর্ণা দিল, চুপি চুপি পাচিল টপকাইয়া উঠানের আনাচে-কানাচে তাহার খোঁজ করিল; এমন কি উঠানের শাখাবহুল আমগাছটায় পর্য্যন্ত উঠিয়া দেখিতে বাদ রাখিল না। কারণ, একবার তাহাদের ছড়ারস উপভোগ করিতে করিতে ঘণ্টাকয়েকের জন্য নকড়ি গাছের পত্র-পল্লবের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, এবারও থাকাটা কিছু বিচিত্র নয়। ছেলেরা ঘর খুঁজিয়া এবং আমগাছে উঠিয়াও নিশ্চিন্ত হইল না। তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে নকড়ির গৃহসংলগ্ন প'ড়ো জমিটায় প্রবেশ করিল। ভাঁট ও আতা-গাছের জঙ্গল পার হইয়া পানাঢাকা পচা ডোবাটায় ক্রমাগত অনেকগুলি ঢিল ছুঁড়িয়া নকড়ির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শেষে সত্য সত্যই ফিরিয়া আসিল।

সবাই ভাবিল, নকড়ি আর ফিরিবে না। পাড়ার লোকের যে অত্যাচার সে এতদিন মুখ বুজিয়া সহিয়া আসিয়াছে, সে অত্যাচারের মহান প্রতিশোধ লইবার জন্যই সে চুপি চুপি তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে।

নকড়ির জন্য একে একে সকলেরই সহানুভূতি দেখা দিল।

—কাজটা তোমরা ভাল করনি হীরু, আমি তখনই তোমাদের বলেছিলাম। যিনি কথাটা বলিয়া চুপ করিলেন, তাঁহার নাম গণপতি। গণপতি বয়সে প্রবীণ, তবে সময় বিশেষে নবীনের দলেও তাঁহার গতিবিধি আছে।

হীরু বসিয়া বসিয়া বাঁহাতের আঙুল দিয়া ঘাসের ডগা ছিঁড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, মরে যাই গো, উনি বলেছিলেন আমাদের, আর আমরা ওঁর নিষেধ শুনিনি, নকড়িকে নাচালে কে আগে, বলি সে কথা মনে আছে কি, ও গণপতি?

—তা গণপতি বলবে কি, তুমিই কি কম বাপু? কেন, ঘটকালি করেছিলে মনে নেই?

বক্তার কথার ভঙ্গীতে হীরু হাসি চাপিতে পারিল না। একটু হাসিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল,—ও হো হো, কান্তি দা আমাদের ছিলেন না সে সময়, নইলে আর গয়নার অর্ডারটা ফসকায়, তুমি কি বল কৃষ্ণ?

—না ভাই, আমার বড্ড দুঃখ হয়, কোনদিন ত বেচারা কারোর অনহিত করেনি।

আলোচনাটা এই ভাবেই চলে, এবং সমাগতদের মধ্যে বক্তার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পায়, নকড়ির উপর সহানুভূতির মাত্রাটা ততই বাড়িয়া চলে। দেশে থাকিতে এতদিন যাহাকে কেহ চেনে নাই, এখন তাহার অভাবে ইহাদের দুঃখের অবধি নাই।

মাস দুই পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় নকড়ির দেখা মিলিল। পায়ে এক হাঁটু ধূলা, একমুখ দাড়ি গোঁফ, সেগুলা লম্বা লম্বা ও খোঁচা খোঁচা হইয়া, মুখখানাকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। নকড়ি অবিনাশের বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া ফুড়্ ফুড়্ করিয়া হুঁকা টানিতেছে আর বলিতেছে,—দেশত্যাগী হব কিসের জন্যে, হ্যাঁ অবিনাশ, চোদ্দপুরুষের ভিটেয় তেল সল্তে পড়বে না, নকড়ি সইবে কোন্ প্রাণে বল ত বাপু, টাকার বিষ আমার কার জন্যে,—বিষয় সঙ্গে যাবে?

অবিনাশ বলিল,—কিন্তু আমরা ত ভেবেছিলাম এবার আমাদের ছেড়ে গেলে বুঝি। এই ত আজও সবাই দুঃখ করছিল কত!

—করবে না বলছ কি অবিনাশ? আমিই কি তোমাদের কথা কম ভেবেছি! কিন্তু ওরা ছেড়ে না দিলে আসি কি করে বল দেখি—বলিয়া সে তার জয়নগরের ভাগ্নের যত্ন-আত্তির কথা একে একে বলিতে আরম্ভ করিল। এই ভাগ্নেটি নকড়িকে কতখানি স্নেহের চোখে দেখে, অবিনাশ

তাহা জানিত! গেল বছর নকড়ির গৃহে আসিয়া নকড়ির মৃত্তিকাগর্ভস্থ এক ঘটী টাকা লইয়া সে রাতারাতি সরিয়া পড়িয়াছিল। শূন্য ঘটি দেখিয়া নকড়ি পরদিন চুল ছিঁড়িয়াছিল, মাথা খুঁড়িয়াছিল—অবিনাশ কোন কথা কহিল না।

একটু পরে নকড়ি উঠিয়া পড়িল। সে ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সবাই রে রে করিতে করিতে বাড়ি পর্য্যন্ত তার সঙ্গে গেল। ছেলেরা অবধি শপথ করিয়া ফেলিল, ভবিষ্যতে আর একটি দিনের জন্যও তাহার উদ্দেশে কোন ছড়া কাটিবে না।

নকড়ির এই দেশত্যাগের মূলে একটি চক্রান্ত ছিল। ছোট বেলায় নকড়ির একবার বিয়ের কথা হয়, বাপ তখন জীবিত। মা মারা যায় আগেই। নকড়ির বাপ ঘটা করিয়া বৌ আনিবেন ঠিক হইল। নকড়ি গোপনে খোঁজ লইয়া জানিল, মেয়ে সুন্দরী, বাপের টাকাও আছে, কিন্তু একটি খুঁত, ইঁহাদেরই কে একজন কবে কুলে কালি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নকড়ি বাপের কাছে কোন আপত্তি করিল না, বাপ যে পয়সা-লোভী! মনে মনে ঠিক করিল, এমন মেয়ে ঘরে আনিয়া সে পিতৃকুলের নাম ডুবাইবে না। করিলও তাই। বিয়ের রাত্রে বরের খোঁজ পাওয়া গেল না। পাল্‌কি হইতে কনের বাপের বাড়িতে পা দিয়াই নকড়ি সরিয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর আরও দুই একবার বিয়ের কথা হয়, কিন্তু কোন না কোন ছুতায় নকড়ি তাহা প্রত্যাখ্যান করে। বাঁচিয়া থাকিতে নকড়ির বাপ আর ছেলের বৌ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

পাড়ার হীরু ছেলেটি ছিল উৎসাহী। একদিন আসিয়া বলিল, কনে ঠিক হ'য়েছে নকড়ি দা।

নকড়ি বলিল, তুমি ঠিক করলেই ত' আর আমার হ'ল না। তুমি দেখে মেয়ে, আমি দেখব মেয়ের কুল। বিয়ের বয়স আমার পার হয় নি জেন!

—আমি বুঝি আর কুলের খবর নিই নি, দাদার মাথার চুল এখনও কাঁচা আছে কিনা!

নকড়ি গম্ভীর ভাবে শুধাইল, ঠিক হ'ল কোথায়?

হীরু অতঃপর মেয়ের নাম-ধাম হইতে আরম্ভ করিয়া তার পিতৃকুলের এক এক করিয়া যে পরিচয় দিল, নকড়ির তাহাতে মাথা ঠিক রাখাই দায় হইল। মৃদু হাসিয়া বলিল,—ঝাউডাঙ্গার রুক্মিণীবাবুকে আমি চিনি হীরু, হ্যাঁ, বনেদি ঘর বটে, আগে ফি সনে দুর্গোপূজো হ'ত। মেয়েটা সেয়ানা, কেমন?

—সতেরই পড়েছে, ঘর-আলো-করা মেয়ে। এসেই সংসার দেখতে পারবে, চল না দেখে আসবে একদিন।

নকড়ি বলিল, কি দেখব আবার, অমনি ঘরই আমি খুঁজছিলাম এতদিন। তুমি যখন দেখে এসেছ, তখন ত তার কোন কথাই নেই, সামনের অঘ্রানেই তা হ'লে—

হীরু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—আটকাবে না তা'তে। কিন্তু মেয়ের বাপের একটু কথা ছিল যে-গয়নাগুলো তোমাকে দিতে হবে, কারণ তাঁর এখনকার অবস্থা—

নকড়ি আর কিছু শুনিতে চাহিল না। সে হীরুকে একরকম ঠেলিয়া লইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। পুরানো কাঠের সিন্দুকের ডালাটা তুলিয়া সে একে একে বাহির করিল সোনার চিক্ তাবিজ, মালা, অনেকগুলি। হীরু সেগুলি একটি কাপড়ের পুঁটুলি করিয়া লইয়া ঝাউডাঙ্গার রুক্মিণী বাবুর গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

বিয়ের দিন স্থির, মধ্যরাত্রে লগ্ন। ঝাউডাঙ্গার তিনক্রোশ পথ, মধ্যরাত্রে যাত্রা করিলে আর কতক্ষণ? বর সাজিয়া গোধূলিলগ্নে সেই যে নকড়ি বেহারাদের পাল্‌কিতে গিয়া চড়িল, নামিল একেবারে সকাল বেলায়। বেহারাদের আর দোষ কি, বেচারিরা পথ ভুল করিয়া ফেলিয়াছে।

কনে-পক্ষের কে একজন আসিয়া খবর দিল, রুক্মিণী বাবু লগ্ন বহিয়া যায় দেখিয়া মেয়েকে অন্যপাত্রে সমর্পণ করিয়াছেন। আশে-পাশে দুই চারিজন মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। ব্যাপারটা নকড়ির এতক্ষণে উপলব্ধি হইল। একবার সে বলিল—হীরু কই? আমার গহনা—না তাও তোমরা দেবে না?—তার পর পাল্‌কিতে উঠিয়া বেহারাদের সে ফিরিয়া চলিতে ইঙ্গিত করিল। গহনা নকড়ি পায় নাই। ইহাই তাহার দেশত্যাগের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় ইতিহাস আরও করুণ। এবারকার ঘটক অবিনাশ। নকড়ি নিজে গিয়া মেয়ে দেখিল। মেয়ের বাপ গরীব, কিন্তু ঘর নিখুঁত। কাল হইলেও মেয়েটি ডাগর, শ্রী আছে। কোন পক্ষেরই পাওনা-থোওনা নাই। না থাকুক, অমন ঘরের মেয়ে আনিতে নকড়ির আপত্তি ছিল না।

বিয়ের সব ঠিক, নকড়ি বসিয়া বসিয়া অবিনাশের সহিত ফর্দ্দ করিতেছে, এমন সময় কে আসিয়া খবর দিল, গত রাত্রি হইতে কনে ও সেই গাঁয়ের আর একটি ছেলের খোঁজ হইতেছে না। নকড়ির মাথায় বাজ পড়িল। ঘণ্টাখানেক পর ব্যাপার কি জানিবার জন্য—নিজেই সে পায়ে হাঁটিয়া পাত্রীর গৃহে যাত্রা করিল। সেখানে দুই চারিজনকে শুধাইয়া কনের সম্বন্ধে যে উপাদেয় ইতিহাস সে সংগ্রহ করিল,—তাহা লইয়া পরম উল্লাসে সে অবিনাশের কাছে ফিরিয়া আসিল। পরদিনই পাড়ার ছেলেদের মুখে তাহার সম্বন্ধে আর একটি নূতন ছড়া শোনা গেল :

রেধোর নাতি নকড়ি
সাতপুরুষের মান,
ক'নে পালায় মনের খেদে
কুলের খবর চান !

নকড়ি পাগল হইয়া উঠিল। সে ত' কোন কুল-মজানিকে বিয়ে করে নাই, তবে তাহার উদ্দেশে ছড়া কেন? নকড়ি ঘর হইতে বাহির হয় না,—ছোঁড়ারা তাহাকে ভীমরুলের মত চাপিয়া ধরে কিন্তু এমন করিয়া আর কয়দিন যায়! নকড়ির ঘরের দরজায় একদিন কুলুপ উঠিল।

এই ইতিহাসটি অল্প দিনের। দশদিনের দিন নকড়ি গ্রামে ফিরিয়া অবিনাশের কাছে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—তোমাকে একবার রুইতনপুরে যেতে হবে, তুমি আমার সাক্ষী আছ অবিনাশ। ওঠ, যেতে যেতে বলছি সব। দারোগার কাছে হক্ কথা ব'ল তুমি, রেয়াৎ আমি করি না কাউকে।

অবিনাশকে আর উঠিতে হইল না। উঠানের জল-চৌকিটার উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই নকড়ি খুলিয়া বলিল।

ব্যাপার এই,—নকড়ি গিয়াছিল দিন কয়েকের জন্য ভাগ্নের বাড়ি বোড়াইতে। চিরটা কাল যে, একই জায়গায় কাটাইতে হইবে এমন ত কোন কথা নয়। আর ভাগনেরাও তাকে চিঠি দিয়াছিল, নইলেই বা সে যাইবে কেন! অবিনাশ ত' স্বচক্ষে তা'র মেহগ্নি কাঠের পুরানো বাক্সটি দেখিয়াছে! এণ্ডির চাদর, ফরাশডাঙ্গার ধুতি, মায় রেলির বাড়ির দামি ছাতাটা পর্য্যন্ত সে ইহার ভিতর পুরিয়া রাখিত।—বাক্সটা সে এবার সঙ্গে করিয়াই যায়। কাল ভোরবেলা হইতে বাক্সটির অদর্শন ঘটিয়াছে। ঝোপঝাড় পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াও ইহার সন্ধান হয় নাই। নকড়ির বিশ্বাস, এ কাজ আর কারোর নয়, তা'র ভাগ্নের দ্বারাই সম্ভব। কারণ দু' তিন দিন রাত্রিবেলায় শুইয়া শুইয়া ভাগ্নে ও ভাগ্নে-বধূর মুখে ফিস্‌ফিস্ গুজগুজ অনেক কথা সে শুনিয়াছে। এখন বুঝিয়াছে, রাত্রে শুইয়া শুইয়া ঐ বাক্সটির কথাই তাহারা আলোচনা করিত। এমন গুরুতর অন্যায়ের প্রতিকার না করিয়া সে ছাড়িয়া দিবে না; অবিনাশ যখন বাক্সের কথা জানে, তখন তাহার হইয়া দারোগার কাছে সকল কথাই খুলিয়া বলিবে।

চোখে চশমা চড়াইয়া অবিনাশ খাতায় সুদ কষিতে-ছিল,—কথাটা শুনিয়া সে মনে মনে হাসিল। প্রকাশ্যে গম্ভীর হইয়া বলিল,—বাক্সটা রেখে গেলে আমরা চুরি ক'রে নিতাম নাকি! না, দেশে ফিরতে না, এই ছিল ঠিক?

নকড়ি কপালে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া বলিল,—গোবিন্দ জানেন কি ইচ্ছে ছিল! তোমাদের ছেড়ে আমি থাকতে পারি অবিনাশ, পেরেছি কোন দিন? পরশু মা আসছেন, কাল ঢাকে কাঠি পড়বে; বাড়ি আসি আসি ক'রে দুরাত্রি ঘুম নেই, এমন সময় কপালের ফের,—ভাল কথা, তোমার পুরানো জুতা জোড়াটা কোথায় রেখেছ?

বলিতে বলিতে অবিনাশ যেখানে বসিয়া ছিল, ঠিক সেই-সেইখানে আসিয়া বলিল, হুঁ ঐ ত' আছে। পূজোটা ওতেই আমি সেরে নেব এবার। জামা-কাপড় ত আছে!

সত্যি কথা, জামা-কাপড় থাকিলেও নকড়ি কোন দিন ব্যবহার করিত না। কেবল বিজয়ার দিন বিকালবেলায় সাজিয়া-গুজিয়া সে ফিট্ ফাট্ হইয়া নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইত। বৎসরের এই একটি দিনে নকড়িকে বড় ব্যস্ত দেখাইত। দুপুর হইতে সে সাজসজ্জা করিত। বার্নিশ-করা নূতন জুতা জোড়াটা ঘণ্টাখানেকের জন্য পায়ে দিয়া আসিয়া তাহাকে সেই যে সে চালের বাতায় টাঙ্গাইয়া রাখিত,—বৎসরের মধ্যে আর দ্বিতীয়বার ইহার প্রয়োজন হইত না।

অবিনাশের জুতাজোড়াটা কোঁচার কাপড় দিয়া মুছিতে মুছিতে নকড়ি বলিল—খাসা আছে অবিনাশ, যা মনে করছি

তাই। সন্তানের ইচ্ছা মা কি না পূর্ণ ক'রে থাকতে পারেন! হ্যাঁ ফ্যাসাদে আর কাজ নেই অবিনাশ। যা যাবার তা গিয়েছে, সন্তানকে মা একটু ছলনা করলেন বৈ ত নয়। দারোগার কাছে যেতে হবে না তোমাকে।

অবিনাশ খাতা রাখিয়া তখন পঞ্জিকা খুলিয়া বসিয়াছিল, বলিল,—কাজটা কি ভাল হবে তা'তে!

—ভাল আর মন্দ, বিচার করব আমি না তুমি? বলিতে বলিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—যেও না, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। অবিনাশ বাধা দিল।

নকড়ি বসিল না, তেম্‌নি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। চশমাটা অবিনাশ খাপের ভিতর পুরিতে পুরিতে বলিল, বলতে ভরসা পাই, যদি রাগ না কর।

নকড়ি বসিতে বসিতে বলিল—কি এমন কথা!

—কথাটা তারণের, আমার নয়। ওর ছোট মেয়েটাকে ত' দেখেছ। বলছিল, বুঁচির ত আর বিয়ে হ'ল না। নকড়ির সঙ্গে মালা বদল হলে কেমন হয়। ঘাটের বাছার আইবুড়ো নামটাও ঘুচে যায়। বললাম, আমি ত'ার কি বলব। তুমি ওকে শুধিয়ে দেখ। কেমন, ঠিক বলিনি?

হাউই-এর পুচ্ছে আগুন দিলে যেমন সঁৎ করিয়া উর্দ্ধে উঠে, ঘরের ভিতর নকড়ি ঠিক তেমনিভাবেই ঝাঁপাইয়া উঠিল। চোখ দুটি যতদূর বিস্ফারিত করা যায়, সে দুটিকে ততদূর বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল,—এ কথা বলল তোমাকে অবিনাশ! এমন কথা বার করল মুখ থেকে! আচ্ছা বেটার স্পর্দ্ধা ত! না, এ অপমান নকড়ি সহ্য করবে না অবিনাশ, তুমি দেখে নিও। অবিনাশের চোখের উপর দিয়া একরূপ নাচিতে নাচিতেই নকড়ি বাহির হইয়া গেল।

সম্প্রতি এই ব্যাপারটা লইয়াই পাড়ায় একটি উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। নকড়ির ন্যায় একটি সুপাত্রের সম্বন্ধে তারণের অমনভাবে রসিকতা করা যে উচিত হয় নাই, একথা গাঁয়ের বালক-বৃদ্ধ সবাই এক মুখে স্বীকার করিল। নকড়ি কানা অথবা খোঁড়া হইলে কথা ছিল না, তার বংশের কোথাও খুঁত থাকিলেও নকড়ি দুঃখিত হইত না; কিন্তু সবদিক বজায় রাখিয়া যে পৈতৃক ভিটায় এখনও তাহাদেরই মধ্যে বাস করিতেছে—তারণের এতখানি ধৃষ্টতা সে সহ্য করিবে কি

পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেন্ট, 'গ্রাম্যসিংহ' গণপতি বলিল,—তোমার দশ টাকা জরিমানা করতাম তারণ, কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে রেহাই দিলাম। রুক্মিণীবাবুর মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল, তোমার মনে নেই?

তারণ ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, সেখানে হয় নি কিনা, বুঁচির কথাটা তাই অবিনাশ খুড়োকে বলেছিলাম।

—হয়নি, তোমার মুখের কথায় হয় নি? পাল্কীবেহারা পথ ভুল করলে, বর পৌঁছল না, লগ্ন পার হয় দেখে রুক্মিণী বাবু অন্য পাত্র দেখলেন না? দোষ রুক্মিণীবাবুর?

—না দোষ আমারই। তারণের মাথা হেঁট হইয়া গেল।

নকড়ির রাগের একটা কারণ ছিল, তাহাই বলি।

দোষ বেচারা তারণের নয়, দোষ মেয়ের কপালের। মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হয় কোন্ রাশিতে কে জানে, তবে দেখিতে হইয়াছিল মন্দ নয়। শান্ত নিরীহ দুটি চোখ, টিকোল নাক, কপালে একটি জড়ুল-চিহ্ন লইয়া ছোটবেলায় উঠানময় হামাগুড়ি দিয়া সে খেলা করিয়া বেড়াইত। তারণের বউ ঘর নিকাইতে নিকাইতে বলিত, দেখেছ গো, তাকাচ্ছে কেমন তোমার মুখের দিকে। নাও না একটিবার কোলে, মেয়ে বলে কি কোলে নিতেও দোষ?

গরীবের গৃহস্থালী! পর পর তিনটি মেয়ের জন্ম দিয়া তারণের মেজাজ তখন সপ্তম পর্দ্দায় উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া চতুর্থবারে তার পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাওয়ার বাসনা ছিল। তারণ ঝাঁকিয়া উঠিয়া উত্তর দিত,—আমি কেন নেব মাগী, সখ থাকে নে না তুই কোলে। তারণের বউ আর কথা কাটিত না। একদিন হইয়াছে কি, মেয়েটি রোয়াকে পিঁড়ির উপর বসিয়া বসিয়া খেলা করিতেছে, তারণের বউ একটু বাহিরে আসিয়াছিল, হঠাৎ গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ! তারণের বউ ছুটিয়া আসিয়া দেখিল—খুকী পিঁড়ে উল্টাইয়া উঠানে গড়াইতেছে। সাড়া নাই, চোখ দুটি উল্টাইয়া যাওয়ার মত। চোখে মুখে জল দিতেই মেয়েটি কতরাইয়া কাঁদিয়া উটিল। বরাতের জোর, মেয়েটি টিঁকিয়া গেল, কিন্তু সোজা হইয়া আর সে হাঁটিতে শিখিল না। বুকের চেড়োর উপর গলাটা দিন দিন সরু ও কুৎসিতভাবে সবাইএর চোখে পড়িল। সকলে বলিল,

গো-দানোর হাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মেয়েটি বড় ভাল করে নাই, তারণের ঘাড়ে চিরদিন সে একটি বোঝা হইয়া থাকিবে।

কথাটা বাড়ানো নয়। চৌদ্দ বছর বয়সেও বুঁচি পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান তালে খেলাঘরের সংসার করিতে লাগিল। তারণ দুই একবার এ-গাঁ সে-গাঁ করিয়া মেয়ের সত্যিকারের সংসারের সন্ধান করিয়া অবশেষে গুম্ খাইয়া বসিয়া পড়িল।

একবার তারণের উদ্ধার হওয়ার কথা, এমন সময় কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। বুঁচির আশীর্ব্বাদ শেষ—আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা বুঁচির মাথায় ধান-দূর্ব্বা ছিটাইয়া গলায় তেঁতুল-পাতার হার অবধি ঝুলাইয়া দিয়া কোন্ গাঁয়ের এক বুড়া বাড়ী চলিয়া গেল! বুঁচির মা সেই হার পাইয়া মহাখুসি! কিন্তু বিয়ের দিন পর্য্যন্ত তাহাদের আর অপেক্ষা করিতে হইল না। দিন দুই পর সকালবেলায় একদিন বুঁচি পথের দিক হইতে মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিল—শূন্য গলাটা দেখাইয়া যাহার নাম উচ্চারণ করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল, ঠিক দুইদিন আগে সে-ই বুঁচিকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছে।

হার চুরি লইয়া তারণ আর থানা-কাছারি করিল না। পাছে কিছু হইয়া যায়! কিন্তু পাড়ায় একটা সোরগোল পড়িয়া গেল, তারণের দুঃসাহসের কথা লইয়া আশপাশের পাঁচখানা গ্রামের লোক নানা আলোচনা আরম্ভ করিল। তাহাতে তারণ আর ভুলিয়াও কোনদিন বুঁচির বিয়ের কথা মুখে আনিবে না, এই অনুমানই সত্য নির্দ্ধারিত হইল।

ইহার কিছুকাল পরে নকড়িকে লইয়া এই ব্যাপার। নকড়ির রাগ হওয়াটা অন্যায় কিসে?

মাস চার পাঁচ কাটিয়া গিয়াছে।

পাড়াটা নিরুপদ্রব। নকড়ির বিয়ের নাম আর কারোর মুখে নাই। ছেলেরা পর্য্যন্ত নকড়িকে ভুলিয়া গিয়াছে, নকড়ি খায়-দায়, আর ঘুরিয়া বেড়ায় ও ঘুমায়। কেবল সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা রান্না করিতেই যেটুকু কষ্ট। কাজটা আগে আগে নকড়ির কঠিন মনে হইত না, উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া সে মোড়ায় আসিয়া বসিত। বসিয়া বসিয়া কোনদিন পড়িত মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব। রাজান্তঃপুরে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন রাজকন্যা উত্তরাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেছে। রাজসভায় কঙ্কবেশে যুধিষ্ঠির। বিরাট পর্ব্ব রাখিয়া কোনদিন মন দিত উদ্যোগ পর্ব্বে। কুরুপাণ্ডবের সমরসজ্জা দেখিতে দেখিতে নকড়ির উনানের ভাত ফুটিয়া উঠিত। আজকাল মহাভারত আর ভাল লাগে না, গোটা সময়টাই নকড়ি চুপ করিয়া কাটায়। রান্নাও দুবেলা নয়, একবেলায় ঠেকিয়াছে। কিন্তু একটাবেলারই বা কে রাঁধে! কেউ ত' কোনদিন খাওয়ার জন্য তা'কে সাধাসাধি করে না। সুপাচ্য অন্নব্যঞ্জন আগলাইয়া লইয়া অনেক রাত অবধি উনানের পাশেও বসিয়া থাকে না। ছোটবেলায় একবার নকড়ি দেখিয়াছিল, মা রান্না সারিয়া তা'কে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বারবার ঘর-বার করিতেছে। বাবা কি একটা কাজে স্থানান্তরে গিয়াছেন। বাবা সে রাত্রে ফিরিলেন না, মাও আর জলটুক্ পর্য্যন্ত মুখে দেয় নাই। নকড়ির কে আছে যে, বসিয়া বসিয়া এমন করিয়া রাত জাগিবে! এই ত' সেদিন গাঁ ছাড়িয়া গিয়াছিল, ঘরে কেউ তাহার মুখ চাহিয়া থাকে নাই; ফিরিয়া আসিয়া দেখে, কাক শালিক চামচিকায় উঠানটা গো-ভাগাড় করিয়া তুলিয়াছে, ঘরের ভিতর ভ্যাপসা গন্ধ, কোণে কোণে ঝুড়ি ঝুড়ি ঝুল জমিয়াছে। সংসারে লক্ষ্মী না থাকিলে এমনই হয়! নকড়ি নিজের হাতে সব পরিপাটি করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পর নকড়ি সেদিন অবিনাশের বাড়ীতে বেড়াইতে গেল। হীরু, গণপতি, কুঞ্জ—পাড়ার সবাই ছিল। কথাটা চলিতেছিল নীলমণির ছেলে মাখনকে লইয়া। মাখন কলিকাতা হইতে ডাক্তারি পড়িয়া এইবার গ্রামে ফিরিয়াছিল; ছেলেটি নম্র ও মিষ্টভাষী। দুদিনেই পসার জমাইবে তার আর কোন্ কথা। এই মাখনের বিয়ে হইতেছে দুর্গাপুরে। মেয়েটি সুশ্রী। উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত একদমে পড়িয়া ফেলিয়াছে। ভবতোষবাবু মেয়েকে চল্লিশ ভরির গহনা দিবেন। ইহা ছাড়া, জামাইএর বাইসাইকেল, হাতঘড়ি, এমন কি একটি ডিসপেন্সারির আসবাব। নকড়ি বসিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।

অবিনাশ এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাচ্ছ ত নকড়ি?

—কোথায়?

—বরযাত্র, শুনলে কি এতক্ষণ!

নকড়ি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উত্তর দিল, সময় পাইলে সে যাইবে বৈকি।

কেহ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। আসন্ন উৎসবে সবাই মাতিয়া উঠিয়াছে। নকড়ি ভাবিল, অবিনাশ এখনই তা'র বিয়ের কথা তুলিবে। কিন্তু এক মিনিট দুই মিনিট করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, নকড়ির কথা আর উঠিল না। নকড়ি সেই একই কথা শুনিতে লাগিল,—ডাক্তার আর দুর্গাপুরের ভবতোষ। শুনিতে শুনিতে কখন এক সময়ে সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দিনকয়েক পরে নকড়ি একখানা চিঠি পাইল। চিঠি লিখিয়াছেন দূর-সুবাদের এক পিসীমা। রত্নচূড় পোষ্টাফিসের ছাপমারা চিঠি। নকড়ি চিঠি পড়িল :

বাবা নকড়ি, মেয়ের মাতুল রাজি হইয়াছে। মেয়ের মার সেই দোষটির জন্য মনঃকষ্ট করিও না। আজকাল কেউ কি আর অত দেখে! গাঁয়ে বউমাকে লইয়া যাইতে না চাও, আমার এখানে থাকিও।

শেষ দুই ছত্রে নকড়ি পড়িল—একশোটি টাকা তোমাকে দিতে হইবে, ছাঁদলা খরচের জন্য। দুশো হইতে অনেক কষ্টে আমি একশোয় রাজি করাইয়াছি। টাকাটা কালই আমার নামে পাঠাইও, যেন ভুল না হয়।

নকড়ির আনন্দ ধরিল না। আপনার লোকে চেষ্টা না করিলে, পরে কি আর কিছু করিয়া দেয়! ভাবিল, চিঠিখানা সে একবার অবিনাশকে দেখাইয়া আসে। পিসীমা দেখিয়া শুনিয়া যে মেয়ে ঠিক করিয়াছেন, সাধ্য কি, তেমন একটি মেয়ে কেউ খুঁজিয়া দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল। অবিনাশ এ চিঠি দেখিলে বলিবে কি! পাড়ায় যে তার মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না। অক্ষুণ্ণ বংশমর্য্যাদা লইয়া সে পৈতৃক ভিটায় বাস করিতেছে। তা'র সাত পুরুষের খবর সবাই ত জানে। বংশের মর্য্যাদা সে কি নষ্ট করিতে পারে? চিঠিখানা পুনরায় পড়িতেই নকড়ির রাগ হইল। মেয়ের মার কেবল চরিত্র-দোষই যথেষ্ট নয়, আবার একশোটি টাকা নগদও চায়। নকড়ির সাত-পুরুষের মধ্যে কেউ মেয়ের ঘরে জুতোর ধূলাও দিয়াছে কোনদিন? নিদারুণ ক্ষোভে চিঠিখানা নকড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল।

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। বিয়ের জন্য তিন চারি জায়গায়, নকড়ি চিঠি দিয়াছে, কোন উত্তর আসে নাই। এ গ্রামে কেউ তা'র শত্রুতা করিতেছে নিশ্চয়, নইলে এমন হইবে কেন? অবিনাশও আর তা'র সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কথা কয় না। ব্যাপারটা নকড়ির সন্দেহজনক মনে হইল। ঘটকালিতেও আর বিশ্বাস নাই, পরের উপর নির্ভর করিয়াই নকড়ি এতদিন ঠকিয়া আসিতেছে।

নকড়ি ঠিক করিল, দিনকয়েকের জন্য নিজে বাহির হইয়া একবার ক'নের চেষ্টা দেখিবে।

* * *

পরদিন সকাল বেলায় নকড়ি পাড়ার পথ দিয়া যাইতে যাইতে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। কে ডাকিতেছিল,—নকড়ি ও নকড়ি দা।

নকড়ি পিছন ফিরিয়াই দেখিল, পথের ধারে ষষ্ঠীগাছ তলায় বসিয়া বসিয়া পাড়ার কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছে। তাহাদের ভিতর হইতে নকড়িকে ডাকিয়াছিল বুঁচি, তারণের সেই কুৎসিত মেয়েটি।

বুঁচির দিকে একবার আরক্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁত খিচাইয়া নকড়ি চলিতে লাগিল।

কিন্তু আবার ডাক!

—ও নকড়ি দা, গেলে যে, শোন—না।

—পেছনে ডাক্‌লি কের, ইয়ার্কি পেয়েছিস্ বুঝি। বলিতে বলিতে তীব্র একটি ভ্রূকুটি করিয়া বুঁচি যেখানে বসিয়া ছিল, নকড়ি ঠিক সেই জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল! কিন্তু কি আশ্চর্য্য; নকড়ির মুখের অপ্রসন্ন দৃষ্টি দেখিয়া মেয়েটি মোটেই ভয় পাইল না, বেশ সপ্রতিভভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

গলা নামাইয়া নকড়ি বলিল,—কি, বল্‌ছিস্ কি তুই!

—আমাদের নতুন ঘরখানা দেখে যাও, কেমন হয়েছে বল দেখি?

ষষ্ঠীতলার খানিকটা জায়গায় ইঁট দিয়া বৃত্তাকারে একখানি ঘর হইয়াছে। ছোট উঠানের একদিকে ধুলির কাঁড়ি, একটি মাটির ছোবায় গোটা কয় পাকা তেলাকুচা জলের উপরে ভাসিতেছিল। নকড়ি একটু কৌতুক বোধ করিয়া একপাশে বসিল।

বুঁচি দেখাইতে লাগিল, ভাত রান্না হয়ে গেছে, দু'টো তরকারী, ডাল, মাছের ঝাল, আমড়ার অম্বল এসবও তৈরী, ছেলেরা পুকুরে ডুব দিতে গিয়েছে, তাদের খাওয়াইয়া তবে সে মাথায় এক ফোঁটা তেল দিয়ে একটা ডুব দিবে।

নকড়ি চুপ করিয়া শুনিতেছিল।

বুঁচি ত্রিকালগতা গৃহিণীর মত বলিতে লাগিল, আর বল না নকড়ি দা, মুখপোড়া ছেলেদের এত বলি যে, বাপ সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে আমায় রেহাই দে, খেয়ে-দেয়ে আমি একটু গড়াই কি চোখ বুঁজি—তা যদি কথা কানে তুলবে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে থাক্ করলে! আমার মরণ হ'লে বাঁচি।

শুনিতে শুনিতে নকড়ির বুকের ভিতরটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। ঠিক তো, বাড়ীর গিন্নীরা এই রকম করিয়াই বলে তো!

হঠাৎ নিজের প্রসঙ্গ পরিহার করিয়া নকড়ির মাথার পানে চাহিয়া বুঁচি বলিয়া উঠিল:

—ওমা, তোমার মাথার চুল যে পেকেছে নকড়িদা। বুঁচি উঠিয়া তাড়াতাড়ি একটি চুল তুলিয়া নকড়ির হাতে দিল।

—একটা, আর পাকে নি ত?

—অনেক পেকেছে, এই যে।

পাকা চুলগুলি বাঁহাতের তেলোয় রাখিয়া নকড়ি ডান হাতের আঙ্গুল দিয়া গণিতে লাগিল, এক, দুই, তিন, পাঁচ, সাত। এদিকে সকালবলার স্নিগ্ধ রৌদ্র,—ছায়া-শীতল গাছের তলায় সরুপাড় একখানী শাড়ী পরিয়া বুঁচি বসিয়া বসিয়া হাসিতেছে। এই সময় গামছা কাঁধে দুই তিনটি ছেলেকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া, বুঁচি জিভ্ কাটিয়া একগলা ঘোমটা টানিয়া দিয়া, বলিয়া উঠিল, ওমা! উনি যে!

'উনি'কে জানিতে নকড়ির দেরী হইয়াছিল। ছ'সাত বছরের হাবলাগোছের একটি ছেলে বলিল, কৈ গো গিন্নি, ভাত হল?

এই যে দিই—বলিয়া বুঁচি কাদামাটীর সংসারে মন দিল।

নকড়িকে 'উনি'র দল এতক্ষণ দেখে নাই, গাছটা আড়াল পড়িয়াছিল। এদিকে আসিতে তাহাকে দেখিয়া তাহারা কে কোথায় চম্পট দিল, ভাত বাড়িয়া অনেক হাঁকা-হাঁকি করিয়াও বুঁচি সন্ধান পাইল না। তখন বুঁচির তর্জ্জন-গর্জ্জন সুরু হইল, আর পারিনে, মা গো! মিন্সে আমায় জ্বালিয়ে খেলে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নকড়ি নির্জ্জনে পাইয়া বুঁচির কাদামাখা একখানা হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বুঁচি, আমার জন্যে ভাত রেঁধে বসে থাকতে পারবি?

বুঁচি অম্লানমুখে বলিল, হুঁ।

—অনেকগুলো ক'রে তরকারী রাঁধতে পারবি?

বুঁচি ঘাড় নাড়িয়া কহিল—হুঁ।

নকড়ি চারিদিক দেখিয়া লইয়া গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিল, আমায় বিয়ে করবি?

বুঁচি প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; তারপর লজ্জায় যেন জড়াইয়া গিয়া বলিল,—হুঁ।

নকড়ি আহ্লাদে গদ গদ হইয়া বলিল, তা হ'লে কিন্তু ছোঁড়াদের সঙ্গে কাদামাটি ঘাঁটতে পাবি নে।

—কে চায় ঘাঁটতে! বলিয়া বুঁচি হাঁড়ীকুড়িতে এক লাথি দিয়া বসিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর অবিনাশ বাহিরের ঘরে বসিয়া বসিয়া একখানি ফর্দ্দ করিতেছিল:

আটজন বেহারা সমেত পাল্‌কি ১ খান।

রসুনচৌকি ১ দল।

হাউইবাজি ৬টা।

নকড়ি ফর্দ্দর উপর ঝুঁকিয়া ছিল। বলিয়া উঠিল,—রংমশালটা ওরই সঙ্গে ধ'রে দাও অবিনাশ,—দুটো বেশী ক'রে দিও বাপু। বুঁচি রোসনাই ভালবাসে।

মরীচিকা

মনোমধ্যে রচিতেছি কতকিছু বিচিত্র, মধুর।
আজ যাহা ভাবিতেছি, কাল দেখি—সম্পূর্ণ সুদূর!

—শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মহাপ্রাণ

যা'র ব্যথা তা'র কাছে পর্ব্বত-প্রমাণ।
পর দুঃখে ভাগ লয়—সেইতো মহান্।

—শ্রীবীরেন্দ্র

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

[২]

পূর্ব্বে যে প্রাচীন পন্থায় সংস্কৃত-চর্চ্চা হইত, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহারও পূর্ব্বে বাঙ্গলায় রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর 'শব্দকল্পদ্রুম' সঙ্কলন করিয়া অভিধান-সাহিত্যে নূতন পথ মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং প্রাচীনপন্থী ছিলেন এবং পুণ্যার্জ্জনাশায় বৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তথায় গমনের পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন :

কিং করোমি কুতো যামি জরয়াপীড়িতোঽধুনা।
বিনা বৃন্দাবনে বাসং ন পশ্যামি শ্রেয়ঃ ক্বচিৎ ॥

তথায় উপনীত হইয়া তিনি লিখিয়াছেন :

ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি যদ্‌বৃন্দাবনমাগতঃ।
অত্র দেহপাতনেন পূর্ণকামোভবামাহম্ ॥

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী।

তিনি বৃন্দাবনবাসী হইবার পর বড় লাট তাঁহাকে প্রদত্ত উপাধির নিদর্শন স্বহস্তে প্রদান জন্য আহ্বান করিলে তিনি ব্রজমণ্ডল হইতে দূরে যাইতে অস্বীকার করায় আগ্রায় দরবার করিয়া তাঁহাকে উহা প্রদান করা হয়। তিনি এক দিকে যেমন সংস্কৃত-চর্চ্চায় অবহিত ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড ষ্ট্যানলী এ দেশে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রদান সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, তদনুসারে বাঙ্গালা সরকার সে বিষয়ে নেতৃগণের মত জ্ঞাত হইতে চাহিলে রাধাকান্ত যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সমীচীনতা আজ আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। তিনি বলেন :

"লোক সুদৃঢ় দেশীয় ভাষা শিক্ষার সুফল লাভ করিলেই তাহাদিগকে সমাজের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি ও শিল্পশিক্ষাপ্রদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য হইবে। যে শিক্ষায় ছাত্রগণ সামান্য ইংরাজী শিখিয়া লাঙ্গল, কুঠার ও তাঁত (অর্থাৎ যে যাহার পরিবারের ব্যবসা) ত্যাগ করিয়া দলে দলে চাকরীর জন্য সরকারের ও বণিকদিগের দ্বারস্থ হইবে এবং অনেকেই হতাশ হইলেও ইংরাজীশিক্ষার গর্ব্বে যে যাহার 'জাতির ব্যবসায়' প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া নিষ্কর্ম্মা হইবে—সে শিক্ষা যেন প্রবর্ত্তিত না হয়।"

রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যেমন 'শব্দকল্পদ্রুম' সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তেমনই কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আবার হোরেশ হেম্যান উইলিয়ম যেমন ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান রচনা করিয়াছিলেন, উইলিয়ম কেরীর পর তেমনই তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালা-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম প্রচারিত হয়। এই অভিধানের ভূমিকায় গ্রন্থকার রামচন্দ্র শর্ম্মার বাঙ্গালা অভিধানের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যাঁহারা সংস্কৃত মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মাতাবচাঁদ রায় বর্দ্ধমানের কাপুর-ক্ষত্রিয় জমীদারবংশের পোষ্যপুত্র ছিলেন। বাঙ্গালী না হইলেও তিনি ঐ জমীদারবংশে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মত বাঙ্গালারই হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বহু পণ্ডিতের দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করান এবং দীর্ঘ ৩০ বৎসর কাল এই কার্য্য পরিচালিত হয়।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রামায়ণের অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া অক্ষয়

মনমোহন ঘোষ।

কীর্ত্তি স্থাপন করেন। এই সকল অনুবাদগ্রন্থ বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ভাষাসৌধের দৃঢ় ভিত্তি গঠিত করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাগ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্রের' ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"সর্ব্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।" পরবর্ত্তী কালে প্রবল প্রভাবশালী রমেশচন্দ্র দত্ত পণ্ডিতদিগের সাহায্যে সমগ্র ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং দরিদ্র সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায় রামায়ণের ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত যেমন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে হিন্দুস্থানের মহাকাব্যদ্বয়ের চরিত্র ও ঘটনার সহিত তাহাদিগের "অমৃত-সমান" কথা বিতরণ করিত, তেমনই যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতির মধ্য দিয়া হিন্দু-ভারতের ভাবধারা বাঙ্গালার নর-নারীর হৃদয়ে উপনীত হইত। এক সময় দাশরথী রায়ের পাঁচালী সমগ্র পশ্চিম বঙ্গকে যেন পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার গান গ্রামে গ্রামে গীত হইত:

"হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হ'বে রাধাসতী।
মুক্তি-কামনা আমারি হ'বে বৃন্দা গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হ'বে মা যশোমতী।
* * *
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, হরি; পুরাও ইষ্ট এই মিনতি।
আমার প্রেমরূপ যমুনাকূলে আশা-বংশীবটমূলে
সদয় ভাবে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসতি।
—ইত্যাদি।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার নানা কেন্দ্রে দর্শন-চর্চ্চা হইত। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, ঢাকা প্রভৃতি কেন্দ্রে তখন সারস্বত সমাজ বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় তখন হিন্দু দর্শনের পরিচয়-পুস্তক রচিত হইয়াছে। দর্শনের মত স্মৃতি ও ন্যায়ের চর্চ্চাও তখনও বহু পণ্ডিতকে ব্যাপৃত রাখিত। রাখালদাসের নব্যন্যায়ে পাণ্ডিত্য তাহার পরও বহুদিন সমগ্র ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিস্মিত করিয়াছে।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্যের 'পদার্থবিদ্যা', বরদাপ্রসাদ ঘোষের রসায়ন-বিষয়ক পুস্তক, যদুনাথের শরীর-পালন এ সবই প্রায় ঐ সময়ের।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

শ্যামচরণ সরকারের 'ব্যবস্থা-দর্পণ' পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত।

এই সকল হইতে বুঝা যায়, তখন বাঙ্গালাভাষা আর অনাদৃত নহে। তবে তখনও সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালাই ব্যবহৃত

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হইত না। সত্য বটে, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি-সভায় প্রথম বাঙ্গালায় বক্তৃতা হইয়াছিল, কিন্তু সাধারণতঃ সভাদির কার্য্য প্রধানতঃ ইংরাজীতেই নির্ব্বাহ হইত। কেশবচন্দ্র সেন বাঙ্গালায় ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিতেন এবং সে সকল তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতারই মত হৃদয়গ্রাহী হইত। তাঁহার পর কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি বাঙ্গালা বক্তৃতায় শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। কিন্তু রাজনীতিক কার্য্যে কোন বক্তৃতায় বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইত না। বহুদিন পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে—কৃষ্ণনগরে যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ প্রথম স্থির করেন—প্রত্যেক প্রস্তাবে এক জন বক্তা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সরকার যত দিন না বুঝিবেন যে, জনগণ আমাদিগের অনুবর্ত্তী, তত দিন তাঁহারা আমাদিগের অধিকার লাভের দাবী জনগণের দাবী বলিয়া স্বীকার করিবেন—এমন আশা করা যায় না; সুতরাং প্রত্যেক প্রস্তাব জনগণকে তাহাদিগের মাতৃভাষায় বুঝাইয়া দিতে হইবে। সম্মিলনের সেই অধিবেশনে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বাঙ্গালা বক্তৃতায় সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরবৎসর নাটোরে সম্মিলনের অধিবেশনে বাঙ্গালার ব্যবহার হইয়াছিল; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় স্বীয় অভিভাষণের ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন। সেই বৎসরের অধিবেশনে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা ইংরাজীতে যেমন বাঙ্গালাতেও তেমনই বক্তৃতা করিতে পারিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই তিনি 'বঙ্গদর্শন' প্রচার কল্পনা করেন। তৎকালে তথায় এক সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র হইয়াছিল এবং যাঁহারা সেই কেন্দ্রে সাহিত্যালোচনা করিতেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন প্রভৃতির সহিত তাহাদিগের মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথেরও নামোল্লেখ করিতে
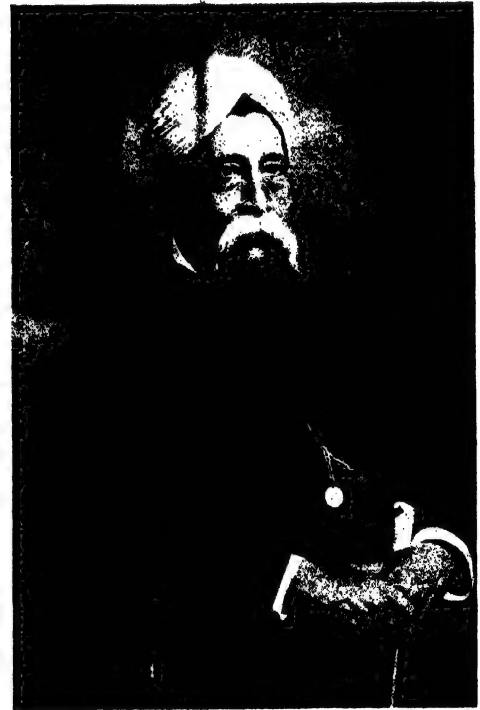
বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

হয়। তখন লালবিহারী দে তথায় কলেজে অধ্যাপক এবং 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ও তথায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালায় যে ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মৌলিক গবেষণার পরিচয় ছিল না বটে, কিন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের যে বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—'তাহা মুষ্টিভিক্ষা হইলেও সুবর্ণের মুষ্টি', তাহা গবেষণাপ্রসূত। রামদাস সেনের 'ঐতিহাসিক রহস্য' ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য প্রদান করে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহে ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধারনৈপুণ্য সপ্রকাশ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখন ভারতের পুরাতত্ত্বের সন্ধান করিতেছেন—প্রস্তরে ও পুঁথিতে যে সত্য লোকলোচনের অগোচরে ছিল, তাহা লোককে দেখাইয়া ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিতেছেন—প্রতিপন্ন করিতেছেন, কি স্থাপত্যে, কি ভাস্কর্য্যে, কি সঙ্গীতে, কি চিত্রবিদ্যায় ভারতবর্ষ কখনও পরমুখাপেক্ষী ছিল না। কিন্তু তাঁহার রচনা প্রধানতঃ ইংরাজীতে। বাঙ্গালার ইতিহাসের জন্য বাঙ্গালীর আগ্রহ বঙ্কিমচন্দ্র রচনায় প্রকাশ করিয়াছিলেন :

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

"কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরামের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরও জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে?"

ইংরাজ-লিখিত ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"তাহা ইতিহাস নয়। তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্ম্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিত মাত্র।"

রামদাস সেন

বহুদিন পরে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :

"বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। * * * যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে

পারি না যে, ইহার দর বেশী দর বেশী হউক, বা না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র সে সোণারূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যিনি যাহাই লিখুন না কেন—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলিমজুরের কাজ করিয়াছি—এপথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন-বার্ত্তা ত শুনিলাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। সেই জন্যই তিনি এমন কথা লিখিয়াছিলেন। ইহার পর বাঙ্গালী বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ উদ্ধারে ও ইতিহাস রচনায় বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় যে বহু উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করেন নাই। শরৎকুমার রায় বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবার ঐকান্তিক বাসনায় "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেই সমিতির জন্য তাঁহারই চেষ্টায় যে পুরাবস্তু-সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আজ যেমন বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে, ভবিষ্যতে যে তেমনই ভারতের ও বিদেশের লোককেও আকৃষ্ট করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই অনুসন্ধান-সমিতি-সঙ্কলিত ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত 'গৌড়লেখমালা'র অবতরণিকায় সম্পাদক যথার্থ ই লিখিয়াছেন:

"বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত কেবল বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার সম্বন্ধই একমাত্র সম্বন্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত এবং ভারতসীমার বাহিরেও নানাস্থানের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল।"

যে বাঙ্গালায় "মাৎস্য-ন্যায় (অরাজকতা) দূর করিবার অভিপ্রায়ে জনসাধারণ (প্রকৃতিভিঃ) বপ্যটতনয় গোপালকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিলেন" অর্থাৎ শাসক নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ) সেই বাঙ্গালার ইতিহাসে যে লিখিবার অনেক বিষয় আছে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই অনুসন্ধান-সমিতির

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভ্যরূপে রমাপ্রসাদ চন্দ প্রথম প্রাচীন বঙ্গের সম্বন্ধে ইতিহাস 'গৌড়রাজমালা' রচনা করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহিঞ্জদারোর লুপ্ত নগর আবিষ্কার করিয়াই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাঙ্গালী ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন-কালের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, শিবাজীর ইতিহাসও সমসাময়িক বিবরণ হইতে সংগৃহীত ও রচিত হইয়াছে।

আজ বাঙ্গালার শিল্পীরা ভারতীয় চিত্রকলায় এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) শ্যামাচরণ শ্রীমানী বাঙ্গালায় 'আর্য্য-জাতির শিল্পচাতুরি' নামক পুস্তকে এ দেশে হিন্দুদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন :

"আর্য্যজাতির শিল্পজ্ঞান যে কতদূর উন্নত ছিল, তাহা কতিপয় ইউরোপীয় ও একজন এতদ্দেশীয় (রামরাজ) পণ্ডিত পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। * * * আমি সেই সকল ও অন্যান্য গ্রন্থ আলোচনা করিয়া, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা শিল্প-সম্বন্ধে যে সকল বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"'বঙ্গদর্শন' যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির।' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরি-পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের' দ্বারা যে পথ মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই পথে 'আর্য্যদর্শন', 'বান্ধব', 'জ্ঞানাঙ্কুর' প্রভৃতি দেখা দিয়াছিল। 'ভারতী' তাহার পরবর্ত্তী। 'বঙ্গদর্শনের' তৃতীয় খণ্ডে—চতুর্থ সংখ্যায়, আমরা 'আর্য্যদর্শনের' ও 'বান্ধবের' উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহাতে 'আর্য্যদর্শন' সম্বন্ধে লিখিত ছিল :

"গত দুই বৎসর মধ্যে আমরা অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র সমাদরপূর্ব্বক পাঠকদিগের নিকট পরিচিত করিয়াছি। বিশেষ আহ্লাদের সহিত এখানিও পরিচিত করিতেছি। ফলে এখানির বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক; আপনার গুণে ইহা সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছে।"

'বান্ধব' সম্বন্ধে লিখিত হয় :

"ইহা আর একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র। পশ্চিম বাঙ্গালায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সেরূপ ছিল না। * * * যাহা হউক এই উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রের প্রকাশারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।"

এই সকল মাসিকপত্র বাঙ্গালীর কাছে ভাবসম্পদ সুলভ করিয়াছিল।

সংবাদপত্র-সেবায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর প্রাধান্য ছিল, সন্দেহ নাই। এ দেশে সংবাদপত্র প্রকাশ ইংরাজ শাসনের ফল। ইংরাজ শাসকদিগের অনেকেই এ দেশে দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন—এখনও যে সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এমন বলা যায় না। ইহার কারণ, তাঁহারা এই বিজিত দেশে বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের কার্য্যের সমালোচনায় প্রীতিলাভ করেন না। কিন্তু কোন কোন ইংরাজ শাসক সেই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখাইয়া দিয়াছেন। সিভিল সার্ভিসের চাকুরীয়া যে ইংরাজ সার চার্লস ষ্টিভেন্স ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ছয় মাসের জন্য বাঙ্গালার ছোট লাট হইয়াছিলেন, তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—এ দেশে দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত পত্র সরকারের কাজের সমালোচনাই করিবেন; যদি কোন দেশীয়-পরিচালিত পত্রের সম্পাদক কেবলই ইংরাজ-শাসনের ও ইংরাজ শাসকদিকের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকেন, তবে ইংরাজ শাসকরা বুঝিবেন, তিনি স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে কায করিতেছেন, তিনি শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। এ দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচকল্পে সরকার নানা বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রধানতঃ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অধিকারসঙ্কোচ জন্য লর্ড লিটনের সরকার আইন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আইন দেশীয় ভাষায় পরিচালিত পত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া পত্রের প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ—তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা মতিলাল ঘোষ প্রভৃতির সহযোগিতায় পরবর্ত্তী সংখ্যা ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়া অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান

করিয়াছিলেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক 'পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমারকে গুরু বলিয়া অভিহিত করিতেন। বাঙ্গালায় যখন বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালা ও ইংরাজী নানা সংবাদ-পত্র পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়, তখনও অন্যান্য প্রদেশ সে বিষয়ে বহু পশ্চাতে ছিল। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট,' গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী,' দ্বারকানাথ

শিশিরকুমার ঘোষ।

বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রই পরবর্ত্তী সংবাদপত্র সমূহের সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'প্রভাকর' বর্ত্তমান যুগের সংবাদপত্র হইতে কিছু ভিন্ন ছিল বাঙ্গালার সংবাদপত্রে প্রথমাবধিই দেশের লোকের অভাব ও অভিযোগের আলোচনা হইত এবং সরকারের কাজের সমালোচনা থাকিত। সে সকল পত্রের পরিচালনে নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যাইত।

বাঙ্গালায় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী,' কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী,' কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'হিতবাদী' ও উপেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বসুমতী' দেশাত্মবোধপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

বাঙ্গালায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাও পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা। অভিনয়ের জন্য নাটক ও প্রহসন রচনা হয় এবং মধু-সূদন দত্তও সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত চরিত্রের লোক এখনও আমরা দেখিতে পাই :

বাইরে ছিল সাধুর আকার মনটা কিন্তু ধর্ম্মধোয়া ;
ধর্ম্মপাতায় ভ্রমাশূন্য, ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া।

হয়ত সমাজে তাহাদিগের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' কেবল নাটক হিসাবেই আদরণীয় নহে, পরন্তু তাহা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে পীড়িতের অভ্যুত্থান। তাঁহার অন্যান্য নাটকে তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় প্রকট।

পূর্ব্বে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে যাহাদিগের অবসরের প্রাচুর্য্য ছিল, তাঁহারাও সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির চর্চ্চায় ও উন্নতিসাধনে যত্নবান হইতেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের ও কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত-বিষয়ক বহু পুস্তক, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগেছিয়ায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহিত্যচর্চ্চা ইহার পরিচায়ক। যিনি 'কাশীখণ্ড' বাঙ্গালায় প্রকাশ করেন সেই জয়নারায়ণ ঘোষাল ইঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইনি বারাণসীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'কাশী খণ্ডের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশে বাঁশবেড়িয়া জমীদারবংশের নৃসিংহদেব রায় মহাশয় ইঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই :

মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥
মিত্রশত চৌদ্দ শকে পৌষমাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হইল তবে॥
শূদ্রমণিকুলে জন্ম পাটুলি নিবাসী।
শ্রীযুত নৃসিংহ দেব রায়াগত কাশী॥
তাঁর সহ জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা।
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥

পঞ্চাশ বৎসরের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার সীমা অতিক্রম করিয়া বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, রাজপুতানায় ও পঞ্জাবে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল যে সরকারের চাকরী লইয়াই গিয়াছিলেন, তাহা নহে। সে সকল স্থানে এক এক জন বাঙ্গালী দিক্‌পালের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আজ বিহারে বিহারীরা শিক্ষিত হইয়া "বিহারে বিহারী ব্যতীত অন্যের

স্থান নাই”—বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নূতন বিহার বাঙ্গালীর সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যুক্ত-প্রদেশে বাঙ্গালী বহুদিন হইতেই সুপরিচিত। শৈবদিগের তীর্থশিরোমণি—হিন্দুভারতের রাজধানী বারাণসীতে যেমন, বৈষ্ণবদিগের মোক্ষলাভক্ষেত্র বৃন্দাবনে তেমনই বহু বাঙ্গালীর বাস। “অৰ্দ্ধবঙ্গেশ্বরী” মহারাণী ভবানী পঞ্চক্রোশী কাশীর লুপ্ত সীমা নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালী ভক্তদিগের চেষ্টায় লুপ্ত বৃন্দাবনের পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। বহু হিন্দু নরনারী জীবনের সায়াহ্ন এই দুই স্থানে যাপন করিতেন শৈব বারাণসীতে দেহরক্ষা করিয়া মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে ভস্মীভূত হইবার বাসনা করিতেন, বৈষ্ণব বৃন্দাবনের রজে শেষ শ্বাস ত্যাগ করিলে ধন্য হইবেন মনে করিতেন। কাজেই যুক্ত প্রদেশে বহু বাঙ্গালীর গতায়াত ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৯২ বৎসর বয়সে যাহার মৃত্যু হয়, সেই অসাধারণ কর্ম্মী কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী রাজপুতানা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্যভারত, বেলুচিস্থান ও হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশ, এই সকল স্থানে ভিক্ষার দ্বারা ৩২টি কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রবাসে বাঙ্গালীর আশ্রয়ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্জাবে শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং কর্পূরতলার মহারাজার পুত্র (রাজা সার) হরনাম সিংহ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া রাজভোগ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালী গোলোকনাথের কন্যাকে বিবাহ করেন। তৎকালে ও তাহার পরেও বাঙ্গালার বাহিরে নানাস্থানে বাঙ্গালী ব্যবহারাজীব, বাঙ্গালী চিকিৎসক, বাঙ্গালী শিক্ষক সমাদৃত ছিলেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতা ইংরাজাধিকৃত ভারতের রাজধানী। ভারত সরকারের দপ্তর বৎসরের মধ্যে কয় মাস কলিকাতা হইতে সিমলায় স্থানান্তরিত হইত বলিয়াও বহু বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে বাঙ্গালার বাহিরে যাইতে হইত। বাঙ্গালী যে স্থানেই গিয়াছেন, সেই স্থানেই নিজ প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় প্রকট করিয়াছেন। বাঙ্গালার বাহিরে দুর্গোৎসব-ব্যবস্থা বাঙ্গালীর কীর্ত্তি। আর বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিও অল্প হয় নাই। এই “শ্যামা জন্মদার” ভক্তসন্তান মধুসূদন বিদেশে বাঙ্গালায় অমর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে বিহারবাসী বাঙ্গালী বলদেব পালিতের ‘কর্ণার্জ্জুন কাব্য’ ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। যে কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় যমুনার কূলে আগ্রায় কর্ম্মক্ষেত্র লাভ করিয়াছিলেন,—সেই “যমুনা-লহরী”-লেখকের হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা তাঁহার

কত কাল পরে বল ভারত রে
দুঃখ সাগর সাঁতারি' পার হবে?

সঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছিল।

গোবিন্দচন্দ্র রায়।

বাঙ্গালীরা কার্য্যব্যপদেশে যে স্থানেই গমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই রামনিধি গুপ্তের সেই কথা মনে রাখিয়াছেন :

নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা
পূরে কি আশা?

পঞ্চাশ বৎসরকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালী ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে কার্য্যে তখন অগ্রণী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৯১ বঙ্গাব্দে তিনি বরিশাল হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা নিম্নে একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

“তুমি অবশ্য জান, এখানে আমার যেমন জাহাজ চলচে, তেমনি ফ্লোটিলা কোম্পানি নামক একটি ইংরেজ কোম্পানির জাহাজ চলচে। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলচে। ফ্লোটিলা কোম্পানির অনেক খরচপত্র, লোকজনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়।”

এই পত্রখানি 'বালকে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর বাঙ্গালী নানা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—সাফল্যলাভও করিয়াছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ বৎসরই ঐ পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "নব্য ভারতের মানচিত্র" অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মানচিত্রের ব্যাখ্যাংশ হইতে আমরা নিম্নলিখিত কথা কয়টি উদ্ধৃত করিলাম :

"সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে এখনকার প্রকৃত চিত্র দেখিতে পাইবে, এবং ভারতের গর্ভে ভারতের ভবিষ্যৎ কিরূপে অল্পে অল্পে গঠিত হইতেছে, তাহারও আভাস পাইবে। * * * (সিংহগ্রসিত ভারতের) শরীরের অভ্যন্তরে যে চিত্রের আভাস দেখা যাইতেছে উহার অর্থ কি? উহা ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট-পুরুষ। যে বঙ্গদেশ সিংহের পাকস্থলীর মধ্যে (কারণ বাঙ্গালাকে সিংহ যতটা হজম করিয়া ফেলিয়াছে, এমন আর কাহাকেও না) সেই বঙ্গদেশেই অদৃষ্ট-পুরুষের মস্তক দেখা যাইতেছে। জিহ্বাস্বর্বস্ব বাকসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর বুদ্ধি ঐ মস্তকে জাজ্বল্যমান। উত্তর-পশ্চিমে অদৃষ্ট-পুরুষের বাহু কেন প্রসারিত তাহা কি বলিতে হইবে? গতিবিধি বাণিজ্যের প্রাণ সুতরাং পদদ্বারা বাণিজ্য সূচিত হইতেছে।"

তখন কেবল বাঙ্গালীর নহে, সকলেরই বিশ্বাস ছিল, বাঙ্গালায় ভারতের মস্তক—মনীষা।

[ক্রমশঃ

একশত বৎসরেরও পূর্ব্বে

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন : "...১৮১৪ সালে কাশীধামে জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির হস্তে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিয়া যান। গবর্ণমেণ্টকে ইংরাজী শিক্ষা দানবিষয়ে উদাসীন দেখিয়াই তিনি ঐ প্রকার করিয়া থাকিবেন।

এদেশে রাজপুরুষগণ অনেক সময়ে প্রজাবৃন্দের চিন্তা, রুচি, প্রভৃতি ও আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া কিরূপে দূরে দূরে বাস করেন, তাহার অপরাপর প্রমাণের মধ্যে একটী প্রমাণ এই যে, যখন দেশের সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গবর্ণর জেনেরেল ও তাঁহার পরিষদবর্গ কেবল প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন ও নদীয়া ও ত্রিহুতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। নদীয়া ও ত্রিহুতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য কি না, এই চিন্তা করিতে গিয়া তাঁহাদের বোধ হইল যে, এতদূরে উক্ত কালেজদ্বয় স্থাপন করিলে তাহাদের পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও উন্নতিবিধানাদি করিবার সুবিধা হইবে না। কাশীর কালেজ ও কলিকাতার মাদ্রাসা এই উভয় বিদ্যালয়ের সমুচিত তত্ত্বাবধান করার কঠিনতাও কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের এই সংস্কারকে বলবান করিয়া থাকিবে। তখন তাঁহারা কলিকাতাতে একটী সংস্কৃত কালেজ স্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন।

১৮২৩ সালে কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন্ নামে যে কমিটী স্থাপিত হয়, তাহার প্রতি এই কালেজ স্থাপনের ভার অর্পিত হইল এবং ১৮১৩ সাল হইতে যে বার্ষিক একলক্ষ করিয়া টাকা জমিতে ছিল তাহা তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইল। তাঁহারা মহোৎসাহে সংস্কৃত কালেজ স্থাপন, ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান, ও প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য কিরূপ ব্যয় হইতে লাগিল, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে আরবী আবিস্নেসা নামক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রায় ২০,০০০ বিশহাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল,........."

বাঙ্গালীর মেয়ে

—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে, নিখিল ভারত ও বিশ্বের সকলের জন্য বাঙ্গালীর উদ্বেগের অন্ত নাই, কিন্তু নিজের দেশ বা জাতির জন্য একবারও সে ভাবিবার অবকাশ পায় না। কথাটি সত্য। সকল বিষয়ে এবং সকল আন্দোলনে বাঙ্গালী অগ্রণী হয়, কিন্তু সার বস্তু ভোগ করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। পরের জন্য ভাবিয়া পরকালের জন্য হয়ত কিছু সঞ্চয় করে, কিন্তু ইহকালের দুঃখ হইতে পরিত্রাণের সুযোগ পায় না।

বর্ত্তমান নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই নিখিল জগতের নারী হিতৈষণার প্রাবল্য দেখিয়া ঠিক এই কথাই মনে হয় এবং কোনরূপ প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাকে মনের মধ্যে শিকড় গাড়িতে দিবার বিশেষ পক্ষপাতী না হইলেও, আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর নিজের ঘর সামলাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হওয়ার সময় আসিয়াছে। বিশ্বের সকল জাতির মেয়েদের জন্য ভাবিবার লোক আছে, কিন্তু আমাদের মেয়েদের জন্য ভাবিবার কেহ নাই। ফলে বাঙ্গালীর একদল মেয়ে প্রগতির নামে এতখানি অগ্রগামিনী হইয়া চলিয়াছেন যে, সেই বাধাবিনির্ম্মুক্ত গতি দেখিয়া যেমন চিন্তা জাগে, তেমনি আর একদলকে অত্যন্ত স্থাণু দেখিয়া মনে সংশয় হয়, কখনও তাঁহাদের দাঁড়াইবার শক্তি হইবে কিনা।

বাঙ্গালী মেয়েদের আদর্শ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল দিকে আমরা যদি এখনও দৃষ্টি না দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের পরিণতি যে ভয়াবহ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা দেশের মেয়েদের সম্মুখে এক শ্রেণীর লোক নারী-প্রগতির ধূয়া ধরিয়া যে আদর্শের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন, তাহার মধ্যে সত্যের রূপ কতটুকু এবং মিথ্যার গ্লানি কতখানি তাহাও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে।

বাঙ্গালী মেয়ে বলিতে আমাদের মনে তিন শ্রেণীর নারীর কথা মনে হয়। প্রথম, উগ্র শিক্ষিতা নারী—পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিতা, বিলাসিনী, বিদেশী সমাজের অন্ধ অনুকরণে মত্ত, আসল কাজের চেয়ে সভা-সমিতি করিয়া নারী-সমাজের মুখপাত্র হইবার জন্য আগ্রহান্বিতা, পৌরুষের সাধনায় নিমগ্না, অর্দ্ধ-শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা নারীদের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবপরায়ণা এবং যাবৎ পুরুষ-সমাজের প্রতি বীতরাগ-সম্পন্না। ইঁহাদের সহিত বাঙ্গালার বিরাট নারী-সমাজের আসল যোগ যে নাই তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের মনে হয়, ইঁহারা নারীজীবনকে এমন অদ্ভুত রকমে গড়িয়া তুলিতে চান যে, তাহাতে পৌরুষের প্রাবল্যই অনুভূত হয়—কিন্তু নারীত্বের কমনীয়তা হ্রাস পায়। ঘরের চেয়ে পরই হয় ইঁহাদের কাছে আপন এবং বাহিরের জগতের প্রতি আকর্ষণ হইয়া ওঠে দুর্নিবার। এই ধরণের নারী গৃহসুখকে কোনকালেই বড় করিয়া ভাবিতে পারেন না এবং ইঁহাদের লইয়া যাঁহারা ঘর বাঁধিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন সংসারে শান্তি ও সুখ কতখানি!

অবশ্য শিক্ষিতা নারীমাত্রেরই যে এমনি ভাব তাহা বলা চলে না। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিতা নারীদের মধ্যেও স্তরভেদ আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষা-লাভ করিয়াও নারী-জীবনের অন্যান্য বিশেষ কর্ম্মে নারীধর্ম্মকে বাদ দিয়া যাঁহারা চলেন না, ঘরকে যাঁহারা নারীর প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া ভাবেন, তাঁহারাই কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। সমাজে সেরূপে শিক্ষিতা নারী যে নাই এমন নহে, তবে সংখ্যায় অতি অল্প।

দ্বিতীয়—অর্দ্ধ-শিক্ষিতা নারী। বিবাহের পূর্ব্বে হয়তো কিছুদিন বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সুযোগ মিলিয়াছিল, তাহার পর গৃহে গল্প উপন্যাস পাঠ করিয়া সময় কাটিয়াছে, শিক্ষার অহঙ্কারটুকু আছে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই। অনেক সময় ইঁহাদের নিকট হইতে বড় বড় কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পদে পদে নিজেদের মূঢ়ত্বের পরিচয় দেন। এই স্তরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত নারীও আছেন। তাঁহারা যেটুকু শিক্ষা পাইয়াছেন তাহা প্রকাশের জন্য ব্যগ্র নহেন, অথচ শিক্ষার ফলে জীবনকে সহজ ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করিবার শক্তি রাখেন।

তৃতীয়—অশিক্ষিতা নারী। সারা বাঙ্গালার অধিকাংশ গৃহে ইঁহারাই অধিষ্ঠিতা। এই নারীসমাজের অবস্থা বহুদিক দিয়া দুঃখময়। সংসারে আসিয়া নারীজীবনকে শুধু দুর্ভর কর্ম্মভারে অবনমিত করিয়া, নিজেদের বুকের রক্ত দিয়া, নিজের পরিবারের সেবা করিয়াই ইঁহারা নারীজীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহেন। সমাজের নির্যাতন ও অন্যায়ের প্রতিকার করিবার সামর্থ্য ইঁহাদের নাই, জগতের প্রায় প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেই শিশুর ন্যায় অজ্ঞতা—সকল দিক দিয়া ইঁহারা উপায়হীন। বহু বৎসরের বাধাসঙ্কুল জীবনকেই ইঁহারা নারীত্বের শ্রেষ্ঠ সুলক্ষণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

জীবনকে বড় করিয়া দেখিবার সুযোগ তাঁহাদের নাই এবং সে সুযোগ কামনা করিতেও তাঁহাদের মন চাহে না।

এখন কথা হইতেছে, বাঙ্গালার মেয়ে কোন্ পথে চলিবে? কি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সে তাহার জীবনকে গঠিত করিয়া গৃহে ও সমাজে শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবে? আদর্শ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার মত স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া ও অন্যান্য জাতির নারীপ্রগতির ধারা লক্ষ্য করিয়া যে আদর্শের কথা মনে উদয় হয়, তাহারই সম্বন্ধে দু এক কথা বলিব।

নারীকে শিক্ষা দিবার, নারীজাতির অবস্থা উন্নত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন এ যুগে উঠিতে পারে না, কারণ ইহা বর্ত্তমানকালে অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, নারীদের আমরা যেভাবে শিক্ষা দিবার আয়োজন করিতেছি তাহা কি ঠিক? এ যুগের কালেজী শিক্ষা ও কৃষ্টি-সাধনের চাপে পড়িয়া নারী তাহার নারীত্বের কমনীয় রূপ অধিকাংশ স্থলে হারাইতে বসিয়াছে। তাহারা জ্ঞানরাজ্যে (?) প্রবেশ করিয়া নারীত্বের সত্য-কার মূল্য অনেকখানি হারাইয়া ফেলে। ইহার কারণ আমাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি। পুরুষ ও নারীর শিক্ষাদান প্রণার সমতা রক্ষিত হউক, কিন্তু যে রীতি ও যে ভাবের অনুসরণ করিয়া পুরুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়, নারীর শিক্ষাদান-পদ্ধতি হিসাবে তাহাকে অনুমোদন করা চলে না। নর-নারীর মধ্যে শরীরগত যে পার্থক্য বর্ত্তমান, প্রকৃতিদেবী নিজহস্তে সে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লজিকে, ইতিহাসে নারীকে ব্যুৎপত্তিলাভ করাইয়া যদি নারীপ্রগতি-আন্দোলন চরমতম সফল হইয়াছে বলিয়া ধারণা হয়, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের চরম অলসতাই প্রকাশ পাইবে। নারীর গৃহধর্ম্ম যে শিক্ষার কত বড় অঙ্গ, তাহা আমরা আজ ভুলিতে বসিয়াছি। গৃহধর্ম্মকে বাদ দিয়া বাহিরের শিক্ষায় দীক্ষা দিয়া কোন দিনই নারীকে পূর্ণ মর্য্যাদার সহিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যাইবে না। অপর পক্ষে নারীকে গৃহধর্ম্মটুকু মাত্র শিক্ষা দিয়া সংসারে বা সমাজের অন্য সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখিয়া জগতের অন্যান্য দেশের নারীদের তুলনায় হীন করিয়া রাখিবার প্রস্তাবও বোধ হয় এ যুগের কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সমর্থন করিবেন না।

প্রত্যেক নারীর আদর্শ যে এক হইবে এমন কথা বলা চলে না। তবে নারী-জীবনের মূল আদর্শ ভুলিয়া সকল বিষয়ে শুধু পুরুষদের অনুকরণ করিলে নারী ভুলই করিবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে, বাঙ্গালা দেশের কয়েকজন শিক্ষিতাভিমানিনী মহিলা পুরুষদের সহিত সকল বিষয়ে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া নিজেদের সামাজিক জীবনের সুখ শান্তিকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং সেজন্য ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারা কম অসুখী হন নাই।

ভুল হইতেছে আমাদের বুঝিবার। নারীর প্রগতির মূলে এমন একটা ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য নিজেদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে গড়িয়া তোলা। অথচ পুরুষকে বাদ দিয়া নারীর চলিবার উপায় নাই, আবার নারীকে বর্জ্জন করিয়া পুরুষের চলিবার উপায় নাই। নারীর অধিকার বলিয়া যে কথা উঠে সেই অধিকার যে কি—তাহাই সকল সময় তথাকথিত শিক্ষিতা নারীরা ও প্রগতিপন্থীরা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। পুরুষ এবং নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের বিভাগ যদি আমরা মানিতে অস্বীকার করি তাহা হইলে ভুল করিব। পুরুষ যাহা করে নারীরা ঠিক তাহাই করিতে পারেন না এমন কথা বলি না; কিন্তু পুরুষদের যাহা করা প্রয়োজন নারীর ঠিক তাহাই করা প্রয়োজন নহে। একথা পুরুষদের পক্ষেও অংশত খাটে।

সৃষ্টির আদিকালে হয়তো পুরুষ এবং নারী নিজেদের বন্ধনহীন জীবনে কর্ম্মবিভাগ রাখেন নাই; উভয়েই হয়তো একই ভাবে জীবনযাপন করিত; কিন্তু তাহার পর উভয়েই বুঝিল কর্ম্মবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য্য এবং সমাজ-জীবনে প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে নিজেদের ক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তাহারা ঘর বাঁধিল।

এই সীমা ঠিক রাখিয়া চলার মধ্যে ছোট-বড়র কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ার বড় কি উকিল বড় তাহা লইয়া মাথা ঘামানো যেমন চলে না, তেমনি নারী বড় কি পুরুষ বড় তাহা লইয়া তর্ক নিস্ফল। প্রত্যেকেরই প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজ করিবার সুযোগ যথেষ্ট আছে এবং প্রত্যেকেই স্ববিভাগে যথেষ্ট কৃষ্টিত্ব দেখাইবার অবসর পাইতে পারেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন বহু নারী আছেন যাঁহারা পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহারা বাহিরের কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে, সকলের জন্যই কি সেই ব্যবস্থা হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, ব্যষ্টির জন্য স্বতন্ত্র যে ব্যবস্থা হয়, সমষ্টির জন্য সে ব্যবস্থা নিরূপণ করা কোন বিষয়েই হইতে পারে না।

বাঙ্গালীর সমস্ত মেয়েদের জন্য যে সাধারণ শিক্ষার প্রচলন করার প্রয়োজন এবং তাঁহাদের শিক্ষার মধ্যে নারীত্বের পূর্ণরূপ দান করিবার জন্য যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করার আবশ্যকতা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি, সেগুলি প্রচলনের জন্য সমাজসেবক ও শিক্ষাদাতৃগণের চেষ্টা করা এবং সাধারণভাবে গৃহীমাত্রেরই নারীর শিক্ষা-সাধনায় যথোচিত সাহায্য করা বর্ত্তমানে বিশেষ কর্ত্তব্য।

নারীর পাতিব্রত্য, নিষ্ঠা, শিশুপালন, পরিজনসেবা ও দেশের ও সমাজের কল্যাণে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করা ধর্ম্ম হিসাবে গণ্য। এই ধর্ম্মের রক্ষণে পুরুষের পক্ষে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য ও সহজসাধ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে পুরুষের নিজেদেরও যে কতখানি গড়িবার দায়িত্ব আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। সমাজ নারীকে বিধিনিষেধের গণ্ডী দিয়া আট-কাইয়া রাখিয়াছে, এক হিসাবে ভালই করিয়াছে। কিন্তু নারীর দিক হইতে পুরুষের নিকট হইতে কতকগুলির প্রত্যাশার দাবী আছে, নিজেদের জীবনে সে সংযম ও দায়িত্বপালনের প্রশ্ন উঠাইতে না দিয়া যদি গৃহস্বামী হিসাবে পুরুষ শুধু নারীর নিকট ক্রমাগত নানারূপ দাবী জানাইতে থাকি তাহা হইলে সে দাবী টিকিবে না। দুই পক্ষের প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় সমাজব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। অবশ্য এখানেও কথা উঠে, পুরুষ যাহা করে নারীও প্রতিদান বা প্রতিফল দিবার জন্য যদি তাহাই

করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে নারী লাভবান হইতে পারে কিনা? আমাদের মনে হয় লাভের আশা নারীর দিক দিয়া নাই। কারণ, সমাজের পুরুষশক্তি প্রবল এবং সে প্রবলতার বিরুদ্ধে নারীর কমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরাভব অনিবার্য্য। বিধাতার অলঙ্ঘ্য নির্দ্দেশ নারীকে সেস্থলে ছোট হইয়া থাকিতে হয়। তবে একথা সত্য যে, নারীসমাজে যদি রীতিমত শিক্ষার প্রচার হয় তাহা হইলে তাহার তেজঃশক্তির নিকট পুরুষের অন্যায় অত্যাচার হ্রাস পাইতে বাধ্য। কিন্তু সে শিক্ষা ভুল পথে পরিচালিত হইলে অথবা প্রচলিত শিক্ষার 'গড্ডালিকা-প্রবাহে' গা ভাসাইয়া দিলে অকাঙ্ক্ষণীয় ফললাভ হইতে পারে না।

মোট কথা আমরা চাই বাঙ্গালীর প্রত্যেক মেয়েকে সেই রূপ শিক্ষা দেওয়া, যাহার দ্বারা সে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে সতেজ ও স্বাস্থ্যবতী হইয়া উঠে এবং গৃহলক্ষ্মীর রূপে সত্যই ঘর আলো করে।

আমরা নারীকে শিক্ষাদানের বিরোধী নহি কিন্তু অনেক সময় শিক্ষা-প্রণালীর দোষে অমৃত বলিয়া যাহা পান করাইতে যাই, তাহা গরল হইয়া দাঁড়ায়। সংসারে কোন্ নরনারী না সুখে বাস করিতে চায়? কিন্তু এই সুখ নারীকে শুধু বাহিরের শিক্ষায় শিক্ষিত করিলেই কি মিলিয়া থাকে? নারীর জীবনের গোড়া হইতে একটা আদর্শ গড়িয়া লইবার জন্য ধারা নির্দ্দেশ না করিলে তাহার মন অনেক সময় বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে; ইহা অনেকে না স্বীকার করিলেও সত্য।

তাহার পর আর একটি কথা বিবেচনার যোগ্য। ইউরোপের আদর্শে আমাদের নারীরা যদি গড়িয়া উঠেন, তাহা হইলেও তাহার ভিতরে যথেষ্ট কৃত্রিমতা থাকিবে; ভারতবর্ষের মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না এবং সেই আদর্শ গঠন করিতে গিয়া সমাজের রূপ বিকৃত আকার ধারণ করিবে। প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক দেশের স্বতন্ত্র আবহাওয়া আছে এবং সেই আবহাওয়া তাহার বাহ্য শরীর ও আভ্যন্তরিক মনের উপর ক্রিয়া করে। ইউরোপের নারীদের ও ভারতবর্ষের মেয়েদের মন ও শরীর বাহ্যতঃ একরূপ হইলেও তাহার ভিতরে পার্থক্য আছে ও এবং থাকিবে। অতদূর যাইবার প্রয়োজন নাই, ভারতবর্ষের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় যে, বাঙ্গালীর মেয়েদের সহিত অপর দেশের মেয়েদের অনেক তফাৎ। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, একের পক্ষে ঠিক যাহা সঙ্গত ও শোভন, সকলের পক্ষে তাহাই প্রযুজ্য হইতে পারে না। এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া আমাদের মেয়েদের শিক্ষাদান করা ও শিক্ষালাভ করা আবশ্যক। তবে ইহাও ঠিক নয় যে, ইউরোপের নারী-সমাজের কোন কিছুই গ্রহণ করিব না যাহা সত্য যাহা মঙ্গলকর, যাহা দেশের প্রয়োজনীয় তাহা সর্ব্ব-দেশে গৃহীত হইবেই। তাহার পর শিক্ষার পূর্ব্বে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি বলিলেই চলে। আমাদের শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা মেয়েদের অধিকাংশেরই স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির পথে চলিয়াছে—বিশেষ করিয়া আমরা যাঁহাদের রীতিমত শিক্ষিতা করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করি, তাঁহাদের স্বাস্থ্য শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। মেয়েদের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর সারাজাতির স্বাস্থ্য নির্ভর করে, অথচ সে দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। ইহা যে মাত্র মেয়েদের দোষ তাহা নহে; দোষ আমাদের সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের। আমাদের নিজেদের অসংযম, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা সমগ্র জাতির মেয়েদের ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। দারিদ্র্যাপেক্ষা কুসংস্কারে মন আমাদের এতখানি আচ্ছন্ন যে, মেয়েদের স্বাস্থ্যচর্চ্চার কথা শুনিলে আমরা ক্ষেপিয়া উঠি। স্বাস্থ্য রাখিতে হইলে খাদ্য ও জীবনের আনন্দ কত-খানি প্রয়োজন, তাহা আমরা মেয়েদের সম্পর্কে কয়জন ভাবিয়া থাকি? কর্ম্ম-ব্যস্ততার অজুহাতে আমরা নিজেদের লইয়া ব্যস্ত, তাঁহাদের দিকে দেখিবার অবসর আমাদের কোথায়? স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলো-চনা এদেশের চিকিৎসকরা বহুবার বহু পত্রিকায় করিয়াছেন, অতএব সে প্রসঙ্গ না তুলিয়া সে বিষয়ে শুধু অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বঙ্গ-সংসারের একটি দিন

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

সেদিন রবিবার। গরীব গৃহস্থের সংসার হইলেও, রবিবারের বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত নহে। গৃহে আফিসের চাকুরিয়া ও 'বাবু' আছেন। রবিবারে আফিস বন্ধ, স্নানাহারের তাড়া নাই; বিশ্রাম, আড্ডা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্য এই দিনটিই ভরসা। এই রবিবার ও ছুটির দিনগুলিতে তাঁহাদের অকাজ যত বাড়ে, আমাদের কাজও তত বাড়ে। অন্যান্য দিনগুলিতে তাঁহারা কাজে মগ্ন, আর আমাদের অকাজের চাপ প্রবল। "বঙ্গশ্রী"র সম্পাদক মহাশয় আমার নিকট একটি দিনের রোজনামচা চাহিয়াছেন। আমাদের বৈচিত্র্যবিহীন, নীরস, গন্ডময় জীবনের একখানি পত্র তাঁহার পাঠক-পাঠিকাদের কোন্ কাজে লাগিতে পারে আমি ভাবিয়াই পাইতেছি না। তাঁহার আদেশ (তিনি বলেন, অনুরোধ) লঙ্ঘনের সাধ্য আমার নাই। সত্য সত্যই আমি ভাবিয়া পাই না, আমি যে কথা লিখিব বা বলিব, তাহার সহিত পরিচয় কাহার নাই? আমার মত গৃহস্থবধূর জীবনধারায় এমন নূতনত্ব কি থাকিতে পারে যাহা শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে? আমাদের জীবনের কথা, আমাদের রান্না বা ভাঁড়ারঘরের মত, থোড় বড়ি খাড়া ও খাড়া বড়ি থোড়েই পরিপূর্ণ। ইহাতে রুচি কাহার হইতে পারে? তবু যখন আদিষ্ট হইয়াছি, তখন একটি দিনের সংসার-চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পাইব। সফল হইলে ভাগ্য মানিব: বিফলে সম্পাদকমহাশয়কে নিন্দিব। ... বাছিয়া একটি রবিবার

লইলাম। তাহার কারণ, রবিবারে কিছু বৈচিত্র্য থাকে, খোড় বড়ি থাড়ার সঙ্গে যেন একটুকরা মাছ পড়ে।

এই সেদিন সরস্বতী পূজা হইয়া গিয়াছে, মাঘের শেষ ; মাঝে একদিন বৃষ্টিও হইয়া গেল, আবার একটু শীত পড়িয়াছে। ঘুম যথানিয়ম ভোরেই ভাঙিয়াছিল, রবিবার বলিয়া শয্যাত্যাগে তাড়া ছিল না, বিছানাতে পড়িয়া রহিলাম। পাতলা লেপের মধ্যে চক্ষু মুদিয়া থাকিতে ভাল লাগে। গৃহ-কর্ত্তারা উঠিয়াছেন, ধীরে সুস্থে প্রাতঃকৃত্যাদি সারিতেছেন। অন্য দিনে সাতটার আগে চা খওয়া শেষ হয়, বাবুদের মধ্যে কেহ বাজারে, কেহ খবরের কাগজে, কেহ ক্ষৌরকর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন, রন্ধন-ঘরে আমাদের তখন ডাল নামিয়া গিয়াছে।

ভোর বেলা চা যেমন মিষ্ট ও উত্তেজক, বেলা বাড়িলে ততটা নয়। লোকে বলে, নেশা। তা কি আর মিথ্যা? বিছানায় শুইয়া আরাম মিলিতেছে বটে, তবে মনে হইতেছে চা-টা খাইতে আরও আরাম লাগিবে।

বাড়ীতে দুটি বধূ। বড়'র দারিত্ব বেশী সত্য, কাজ ছোটরই বেশী। অনুমানে সকলের প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ বুঝিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠা গেল। দাঁতন করিতে আমার একটু বেশী সময় লাগে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সহরে আসিয়া, সুদীর্ঘকালেও গেঁয়ো অভ্যাসটা ছাড়িতে পারি নাই। বড় জা'কে রান্না-ঘরের বারান্দায় দেখিয়া চায়ের জলটা লইতে বলিয়া স্নান-কামরায় ঢুকিলাম। দিদি জল লইবেন কিন্তু চা আমাকে ঢালিতে হইবে, রোজই হয়, আমি যে ছোট। ছোট কাজগুলা আমি করি। বড়-হাঁড়ীর ভাত নামান আমার সাধ্যে কুলায় না, দিদি হাঁড়ী ভাঙ্গার ভয়েও বটে, হাতে পায়ে ফ্যান ফেলিয়া কাণ্ড ঘটাইবার শঙ্কারও বটে, ভাতের হাঁড়ীর কানার কাছে আমাকে ঘেঁসিতে দেন না।

স্নান-কামরার খোলা জানালার সাম্নে দাঁড়াইয়া দাঁতন ঘসিতে ঘসিতে দেখিলাম, দিদি চায়ের কেৎলি লইয়া চা'য়ের ঘরে ঢুকিলেন। মুখ ধুইয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তন ও কেশ সংস্কার করিয়া এবং এ সময়েও যেটুকু প্রসাধন অত্যাবশ্যক, সেটুকু—অর্থাৎ কপালে একটি সিঁদুরের টিপ পরিয়া চা'য়ের ঘরে ঢুকিলাম। গৃহকর্ত্তা তিন জনেই তিনখানা চেয়ার অধিকার করিয়া উপবিষ্ট। জ্যেষ্ঠ সংবাদপত্রে নিবিষ্টমন, মধ্যম অর্থাৎ আমাদের 'তিনি' আমার হইয়া কতকটা কাজ সারিয়া রাখিয়াছেন—পাঁউরুটি কাটিয়া টোষ্টারে ভরিয়া টোষ্ট পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, বাকী শুধু মাখম মাখান। ছোটবাবু অবিবাহিত, তিনি বড়বৌদির পাশে বসিয়া বাজারের ফর্দ্দ লিখিতেছেন।

মাসকাবারী বাজার আসিবে, ফর্দ্দ লিখিতে সময় লাগে অনেক, দিদির ফুর্সৎ নাই, ডালের হাঁড়ী চড়াইয়া দিতে আদিষ্ট হইলাম। ফিরিয়া আসিবা-মাত্র ভাসুর মহাশয় অকস্মাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, মেজ-মার কি মত?

আগা জানি না, গোড়াও অবশ্যই অজ্ঞাত, ভাসুর ছাড়া অন্য সকলের পানে আমি চাহিয়া রহিলাম।

সমস্যা এই যে, আজ মাংস হইবে কি না। দুইজন বিপক্ষে, দুইজন পক্ষে ভোট দিয়াছেন, আমার মত যেদিকে পড়িবে, সেই দিক ভারী হইবে। কে কোন্ পক্ষে তাহা আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইল না। আমি মাংস ভালবাসি, পক্ষে মত দিলাম। ভাসুর মহাশয় প্রসন্ন হাস্যের সহিত বলিলেন, আমাদের পক্ষে তিন, তোমাদের পক্ষে দুই। আমরা জিতিয়াছি। মাংস হইবে।

আমার জা মাংসের বিপক্ষে ছিলেন ; ভোটে হারিয়াও তিনি মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। আমি বরাবর দেখি, দিদি গণতন্ত্রের মূল কথাটি মানিতে কিছুতেই রাজী নহেন। দিদির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মা'কে সেই জন্যই প্রতি কথাতে ভোটে আহ্বান করিয়া উত্যক্ত করিয়া তোলে আর মজা দেখে। ছেলে মেয়েরা এখন বোলপুরে ; দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। আমার কোল আজও শূন্য।

দিদির আপত্তির কারণ বুঝিতে দেরী হইল না। কাল দিদির ভগ্নীপতি, ভগ্নী, পুত্রকন্যা লইয়া আসিয়া অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করিয়া গিয়াছেন, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিতে খুটিতে হইয়াছে, শরীরে জুৎ নাই, মাংস হইলে ভাল ভাল বাটনা, পেঁয়াজ, আদা, গরমমসলা বাটিতে হইবে ; আমি ছেলে মানুষ, রোজকার বাটনা রোজ বাটি, কিন্তু ভারী বাটনা চাপাইয়া দিয়া আমার নড়া ব্যথা করাইতে তাঁহার দারুণ অনিচ্ছা ও আপত্তি। ভাসুরের সামনে ও সঙ্গে কথা বলি বটে, তবে বেশী নয়। তাই, দিদির কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহাকে, সেই সঙ্গে অন্য সকলকেও জানাইলাম, 'ভারি ত বাটনা। আর আমি ত কচি খুকুটি নই। ওঁরা খেতে চাইছেন, তবু দিদি যেন কি!'

কনিষ্ঠ দেবরকে বাজারের ফর্দ্দ, টাকা প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়া দিদি দ্রৌপদী (রান্নাঘরে!) হইতে গেলেন ; আমি আবার উপরে উঠিলাম। তিনটি ঘরে বিছানা তুলিয়া, কতক রৌদ্রে দিয়া, কতক ঘরের কোণের টুলের উপরে সাজাইয়া, তিনটি ঘর, বারান্দা ঝাড়া-মোছা করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া যখন নীচে আসিলাম, দিদি শিলের পাশে তিন চারটি বাটী সাজাইয়া বসিতে উদ্যত হইয়াছেন। দিদি একটু মোটা, থস্‌থসে, গায়ে জোরও কম ; তাঁহার হাত হইতে নোড়া ছিনাইয়া লইতে কষ্ট হইল না। 'চিমড়ে ছুঁড়ী'কে গালিগালাজ করিয়াও যখন নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন দিদি সেইখানে বঁটী, আসন আনাজের টুকরী আনিয়া তরকারী কুটিতে বসিলেন।

একটা কথা বলিব? ছোট মুখে বড় কথা বলা উচিত নয়, আমি জানি ; তবু বলিব? যদি কোন অপরাধ হয়, যাঁহারা আমার রোজনামচা পড়িবেন, তাঁহারা যেন মার্জ্জনা করেন। অনেক মেয়ে, আমাদের বয়সের মেয়ে (১৮-২০) নানারকম ব্যায়াম করেন শুনিয়াছি : ডন-বৈঠক, গ্রিপ ডাম্বেল, স্কিপিংএর কথাও শুনিয়াছি। ব্যায়াম করিলে পরিশ্রম হয়, পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাটনা বাটা, জল তোলা, রান্না, পরিবেশন (বাসন মাজায় পরিশ্রম কিরূপ হয়, তাহা অনুমানে জানি মাত্র) প্রভৃতি কাজে যতখানি পরিশ্রম ও ব্যায়াম হয়, কস্‌টুম পরিয়া, ছবি মিলাইয়া আর্সির সাম্নে দাঁড়াইয়া 'কসরৎ' করিলে কি ততখানি পরিশ্রম ও ব্যায়াম হয়? আমি কাহারও প্রতি বক্র কটাক্ষ করিতেছি না, কথাটা মনে উঠিল, তাই বলিলাম। তুলনাও আমি করিতেছি না, কারণ আগে যে গুলির নাম আমি করিয়াছি, তাহা সবই লোকের মুখে শোনা বা মাসিক পত্রিকায় পড়া, একটির স্বাদও আমার জানা নাই। যে সকল ভাগ্যবতী (যদি কেহ থাকেন) দুইটিরই স্বাদ গ্র

করিয়াছেন, কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি উপকারী, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি অপকারী, সে সম্বন্ধে কথা বলিতে পারেন ; আমি তাহা পারি না। তবে এইটি আমি খুব বুঝি, আমরা যাহা করি, শরীর-বিজ্ঞানের মতে তাহা যাহাই কেন হউক না, আমাদের গরীব দুঃখীর সংসার তাহাতে উপকৃত হয়। আমি যদি আমার সংসারের উপকার বা শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, আমার জীবন আমি সার্থক মনে না করিব কেন? আমার বড় বোন ভাগ্যক্রমে অবস্থাপন্ন গৃহের বধূ হইয়াছেন। জামাইবাবু ব্যারিষ্টার, ইংরাজী খবরের কাগজে রোজ লীডার (প্রবন্ধ?) লেখেন, অনেক সভায় বক্তৃতা করেন। আমার দিদি তাঁহাদের পাড়ায় একটি মেয়ে-স্কুল বসাইয়াছেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মেয়ে জোগাড় করিয়াছেন। অনেক টাকা উঠাইয়াছেন। খুব সাধ ছিল, আরও টাকা উঠাইয়া, মস্ত একটা স্কুল-বাড়ী করাইবেন। হঠাৎ বাতে তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। কাজ বন্ধ!

আগে শুধু অজীর্ণ, অম্বল ছিল, এখন বাত ; বাতে বুক দুর্ব্বল, ঘোরাফেরা বারণ, স্কুল চলিতেছে, কিন্তু উন্নতির গতি রুদ্ধ। বিছানায় শুইয়া শুইয়া দিদি কেবলই হা-হুতাশ করেন। সদ্য বিলাত হইতে আসিয়া জামাইবাবু দিদিকে দিয়া কত চার্ট মুখস্থ করাইয়াছেন, কত ডন্ ফেলাইয়াছেন, দিদি তাঁহার আশা মিটাইতে পারিলেন কই? চারটি ছেলে হইয়াছে, তাহাতেই দিদি যেন অথর্ব্বদের সামিল। মাঝে মিশেলে আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া আমাকে দেখেন, আর আক্ষেপ করিয়া বলেন, 'আমি যদি তোর মত চরকীর মত ঘুরে বেড়াতে পারতুম!' ভাবটা বোধ করি মোটা ও নড়বড়ে দেহটা আমাকে দিয়া আমার ইস্পাতের মত দেহটা লওয়ার ইচ্ছা, আমি কিন্তু এই বিনিময়ে একটুও রাজী নই।

বাড়ীর কর্ত্তারা ন'টা হইতে সাড়ে ন'টার মধ্যে আপিসের ভাত খাইতে অভ্যস্ত। যে-সময়ের যেটি অভ্যাস, সময় আসিলে সেটি স্বতঃই মনে পড়ে। আমার ঘরের এলার্ম-এ ঘড়িটায় রোজ পৌনে ৬টায় এলার্ম বাজে ; শনিবার রাত্রে এলার্মের চাবিতে দম দিই না, তবুও রবিবার পৌনে ছ'টায় ঘড়িটা খট করিয়া একটা শব্দ করে—অভ্যাসবশেই বোধ হয়। আজ ন'টার সময় ভাসুর ও তাঁহার মধ্যম জাতা রান্নাঘরের রোয়াকে আসিয়া পেটে হাত বুলাইতে লাগিলেন। জানা গেল, চালভাজা ও চীনেবাদাম ভাজা হইলে তাঁহাদের ভাল লাগে। দিদি চাল বাহির করিতে গেলেন, বাটনার হাত ধুইয়া ফেলিয়া আমি চীনাবাদামের খোসা ছাড়াইতে বসিলাম।

বাজার আসিল। মাংসটা উনানে বসাইয়া দিয়া দুই জায়ে ভাঁড়ারে মাসকাবারী দ্রব্যাদি গুছাইয়া ফেলা গেল। বেলা বারটা বাজিয়া গেল। বাবুরা তখনও গড়িমসি করিয়া ঘুরিতেছেন দেখিয়া দিদি ধমক দিলেন।

আহারাদি শেষ হইতে দেড়টা বাজিল। সকড়ি বাসনকোসন গুছাইয়া কলতলায় রাখিয়া আমরা যখন উপরে উঠিলাম, ঠিকা-ঝি আসিয়া বাসন মাজিতে বসিল। অনেকগুলি বিছানা রৌদ্রে দেওয়া ছিল, তুলিয়া, একটু গড়াইব মনে করিতেছি, দিদি ডাক দিলেন। তাঁহার বয়স যতই কেন হউক না, তাঁহার ধারণা চুল পাকিবার সময় হয় নাই; কিন্তু বিধাতার এমনই অবিচার যে, তাঁহার মাথার অনেকগুলি চুলে পাক ধরাইয়া দিয়াছেন। যত রাগ বিধাতার উপর, তত আক্রোশ বিকৃতবর্ণ চুলগুলির উপর। হুকুম হইল, তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে। ছোট বয়সে ঠাকুরমার পাকা চুল তুলিতাম। তাহাতে পরিশ্রম ছিল না, লাভও ছিল। ঠাকুর-মার চুল মুঠা মুঠা তুলিলেও কোন পক্ষের ক্ষতি ছিল না, আর কুড়ি প্রতি পয়সার বন্দোবস্ত ছিল। দিদির পাকাচুল তোলার মধ্যে অনেক বিপত্তি, অনেক খুঁজিতে হয়, কাঁচায় টান পড়িলে তাঁহার ব্যথা লাগে, চুলে হাত দিলেই তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হয়; কাহাকেও নিদ্রাবিষ্ট দেখিলে আমার চোখ দু'টা কোন বাধা মানে না, মুদিয়া থাকিতে চায়, আর পয়সার ব্যবস্থা যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আরও মুস্কিল আছে, আমার হাত পক্ককেশ অন্বেষণে বিরত হইবামাত্র দিদির নিদ্রাবেশ ছিন্ন হইয়া যায় এবং ছেলেমানুষকে দিবানিদ্রার কদভ্যাস হইতে মুক্ত করিবার জন্য, নিজে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করতঃ উৎপাটিত কেশ-গণনায় মনোনিবেশ করিতে থাকেন।

অন্য অন্য দিন এসকল কাজের অবসর থাকে না। দুপুরটা আমাদের সেলাই করিয়াই কাটে। আমার জা, 'সরোজনলিনী'তে ছাত্রী থাকিয়া সেলাইয়ের কাজটা খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন।

নিজের, ছেলেমেয়ের জামা, সেমিজ, ব্লাউজ, বডি, পাঞ্জাবি, শার্ট, ত বটেই, বাবুদের প্যান্ট-কোটও কখনও দর্জ্জির বাড়ী যায় না। দর্জ্জির খরচটা কমে, তাই বলিয়া একেবারে কমে না। শুনিয়াছি, ভাসুর মহাশয়ের নিকট দিদি রীতিমত বিল আদায় করেন। সত্যমিথ্যা জানি না, আর তাঁহারা গুরুজন, সত্য মিথ্যা জানিবার চেষ্টাও করি না। সূচী-শিল্পে আমারও হাত নিপুণ ছিল, কিন্তু সে সব কাজ প্রায় বন্ধ। জা এবং তাঁহার দেবর মন্তব্য করিয়াছেন, যে-সমস্ত শিল্পে সংসারের উপকার নাই, তাহা নিষ্প্রয়োজন, কাজেই নিষ্প্রয়োজন শিল্প যত সূক্ষ্ম ও সুন্দর হউক, তাহাতে সময় ও অর্থ নষ্ট করিতে আমারও আর ইচ্ছা হয় না। তাই আমিও দিদির কাছে শার্টের কাট শিখিতেছি। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের মা'দের কাছে কাপড়ের উমেদারী করিতেছি, তাঁহাদের ছেলেদের জামা আমি করিয়া দিব। দুই চারিটা অর্ডারও যে পাইতেছি না, এমন নয়।

সাড়ে চারিটায় চা-পর্ব্ব শেষ হইয়া গেলে, বাবুরা বেশ-বাস করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। মাসের প্রথম রবিবারর-টিতে প্রায়ই আমাদের বায়োস্কোপ যাওয়া হয়। সে কথা আজও উঠে নাই, তাহা নহে। দুইখানা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িয়া পড়িয়া বাবুরা শেষে মত দিলেন যে, দেখিয়া আনন্দ পাইবার মত ছবি আজ কোথায়ও নাই। আগামী রবিবারের জন্য বায়োস্কোপ 'পোষ্টপোন্ড' রহিল। মাসের প্রথম রবিবার ছাড়া বায়োস্কোপ যাওয়া ঘটিয়া উঠে না, কারণ দরিদ্র গৃহস্থের সংসারে মাসের [illegible] দিন কাটিতে না কাটিতে অর্থসমস্যা নিদারুণ কঠিন হইয়া পড়ে। মাসে এক-দিন, তাহা ত্যাগ করিতেও

আমরা রাজী ছিলাম; কিন্তু ভাসুর-মহাশয় তাহা সমর্থন করেন না। কলেজে তিনি মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন; তাঁহার মত এই যে, মনকে একটু-আধটু বৈচিত্র্য না দিলে মন বড়ই পঙ্গু হইয়া যায়। বৈচিত্র্য-টৈচিত্র্য বুঝি না, তবে একদিন যে ছবি দেখিতে যাওয়া হয়, সেটা বেশ লাগে। ছবি যেমনই হউক, মনটা যেন আনন্দ পায়। হয়ত ইহারই নাম বৈচিত্র্য। পাশের বাড়ীর সরযূরা সপ্তাহে তিনচারদিন বায়োস্কোপে থিয়েটারে যায়। যাইবেই; তাহারা অবশ্য ধনী লোক, তাহাদের পয়সারও দুঃখ নাই, গাড়ী মোটরেরও অভাব নাই। কিন্তু রোজ রোজ ভাল লাগে কি করিয়া কে জানে! বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, আবার দৈনন্দিন কার্য্য। প্রথমে ঘর পরিষ্কার, তারপর তিন ঘরের শয্যা প্রস্তুত করিয়া, চুল বাঁধিতে বসিতে হয়। এ কাজটি মনের মত করিয়া করিতে অনেক সময় লাগে। দিদি কত ঠাট্টা করেন। দিদির কি! ঠাট্টা করিলেই হইল। আমার মত এক বোঝা চুল থাকিলে বুঝিতাম, কেমন এক মিনিটে বাঁধা হইত! সব কথা আমি খুলিয়া বলিতে পারিব না; বলিতে ইচ্ছা থাকিলেও পারিব না, এইজন্য যে এ-লেখা হয়ত পুরুষেরও চোখে পড়িবে। তাঁহারা আমাদের, নারী জাতিকে কি ভাবিবেন! তবু একথা না বলিয়া পারিব না যে, আর্সির সামনে বসিয়া প্রসাধনান্তে যখন টিপটি, কাজলটি পরি, সীমন্তে যখন সিন্দূর পরি, অলকে যখন কুসুম গুঁজিয়া দিই, তখন কোন একটি পুরুষের কথা ভাবিয়াই যে মনের ভাঙ্গ-গড় করি, এরকমটি নয়, ওরকম—ওরকম নয় সে রকমটি করি, তাহা বলিতে আমার একটুও লজ্জা নাই। কাপড় কাচিয়া আসিয়া যখন সান্ধ্যবস্ত্র পরিধান করি, তখনও মনে সেই ভাব। এ সাজ, এ কাপড়, এ বেশবিন্যাস তাঁহার মনঃপূত হইবে ত? লজ্জার মাথা খাইয়া আরও একটা কথা বলিব। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, শয্যাপ্রবেশের পূর্ব্বে শেষ প্রসাধন-টুকু না করিয়া কোন দিন আমি শয়নকক্ষে ঢুকি নাই। রাত্রে যদি কোন দিন কপালের সিন্দূরবিন্দুটি মুছিয়া গিয়াছে জানিতে পারিয়াছি, নিঃশব্দে উঠিয়া আর একটি সিন্দুরবিন্দু আঁকিয়া বিছানায় ফিরিয়াছি। কোনদিন রান্নাঘরের কাপড়ে বা ময়লা কাপড়ে শুইতে গিয়াছি এমন কথা ত আমার মনে পড়ে না। তার জন্য কি কম পরিশ্রম করিতে হয়? রাত্রের কাপড়টি কাচিয়া, শুকাইয়া নিজে ইস্ত্রী করিয়া লওয়া আমার অনেক দিনের অভ্যাস; আমি ছাড়িতে পারিব না। দিদি রঙ্গ করিয়া বলেন, আমার মেম-সাহেবের ঘরে জন্ম লওয়া উচিত ছিল। ফর্সা কাপড়, পরিচ্ছন্ন কাপড় কি মেয়েদের জন্য 'কপিরাইট রিজার্ভড!'

সন্ধ্যার পর, রান্না-বান্না সারিয়া যে অবসর-টুকু পাই, সেটুকু কাটে বই পড়িয়া। দিদির ধারণা, আমার গলাটি মিষ্টি, দরদ দিয়া আমি পড়িতে পারি, রামায়ণ মহাভারত হইতে কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা যাহাই কেন যোগাড় করিয়া আনান না, আমাকে পড়িতে দিয়া, নিজে চক্ষু মুদিয়া শুনিতে শুইবেন। এই বইগুলো নিজে যতবার পড়িয়াছি, দিদিকে বোধহয় তার দশ বার গুণ বেশী বার পড়িয়া শুনাইয়াছি। বার বার পড়া বই আরও পড়িতে কি কাহারও ভাল লাগে? কিন্তু দিদি এমনই লোক, পুরাতন মাত্রেরই তিনি অতি মাত্রায় ভক্ত। বিদ্রোহ করিয়া করিয়া এখন আমি হার মানিয়াছি। রোজই সেই হরধনু ভঙ্গ করিতে হয়, না হয় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, অথবা বারুণী হইতে রোহিণীকে উদ্ধার করিয়া উড়ে মালীকে ডাকিয়া, মুখে ফুঁ দিতে বলি; "কালীর বোতলটা"র গলায় গলায় কালী দেখাইতে দেখাইতে আমার হাড়-কালী মাস-কালী হইয়া গেল, দিদির আর পুরাতন হয় না। আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, দিদি এবার বাপের বাড়ী গেলে, ঐ বইগুলা দিয়া আমি মনের আনন্দে উনুন ধরাইয়া ফেলিব। ঘুঁটের খরচও বাঁচিবে, আমার উপন্যাস-চর্চ্চাটি পাওয়াও হইবে। মা গো, কত চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে—কত বড় বড় লোকের এক হইতে আট দশ ইঞ্চি লম্বা লম্বা নামওয়ালা সব বই বাহির হইয়াছে, দিদির কি একদিনও একটু ইচ্ছা হয় না যে, পড়িয়া দেখি! দিদি যেন কেমন!

সপ্তাহের অন্য দিন রাত্রি ন'টা, সাড়ে ন'টার মধ্যে গৃহকর্ম্ম শেষ হইয়া যায়; রবিবারে রাত্রি ১১টা বাজে। সারাদিনের কর্ম্মাবসানে, কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহ-মন শয্যাশ্রয় করিয়া যে স্বর্গসুখানুভব করে, তাহা আমি কেমন করিয়া প্রকাশ করিব! অনিদ্রা কি জানি কেমন। শুনিয়াছি, অনেকে সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইতে বাধ্য হ'ন। কেন জানি না! আমি দেখি, বিছানায় ঢুকিতে না ঢুকিতে চক্ষু দু'টি বুঁজিয়া আসে। আমাদের বাড়ীর লোকে কখনও কখনও এমন অভিযোগও করেন যে, ঘুমন্ত অবস্থায় আমার উপর দিয়া হাতী চলিয়া গেলেও নাকি আমার ঘুম নষ্ট হয় না। হইবেও বা! হাতী যখন চলে নাই কোনদিন, তখন সত্য মিথ্যা নিরূপিত হইতে পারে কেমন করিয়া?

এই ত আমাদের দৈনন্দিন জীবন! ইহা পাঠে পাঠক-পাঠিকার কি উপকার হইতে পারে, তাহা আমার মত অল্পশিক্ষিত নারীর বুদ্ধির অতীত। আমি আগেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—আমি মাত্র আদেশ পালন করিলাম; ফলাফলের দায় আমার নয়। শ্রীগীতায় ভগবান কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, ফলের জন্য উদ্‌গ্রীব না-ই হইলাম।

বাসন্তীর গল্প

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পূজার সংখ্যা 'বাসন্তী' বাহির হইবে, তাহা লইয়া ব্যস্ত। প্রেসে ওদিকে চার-পাঁচখানা উপন্যাস আসিয়া পড়িয়াছে, পূজার পূর্ব্বে বাহির করিয়া দেওয়া চাই; নগদ পয়সার লোভে প্রেস আমার কাগজের প্রুফ ঠিক সময়ে দিতে পারে না, কাজেই দিনে পাঁচ-সাত বার প্রেসে ছুটিতে হয়! এমন ব্যাপার যে কোনদিকে চাহিবার অবসর নাই।

প্রেস হইতে সদ্য একতাড়া প্রুফ লইয়া ফিরিয়াছি, সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এক ভদ্রলোক!

আমি কহিলাম—লেখা এনেছেন তো? পাশের ঘরে ম্যানেজারের কাছে রেখে যান।

ভদ্রলোক কহিল,—রেখে যাওয়া চলবে না। এই পূজা-নাম্বারেই গল্পটি দিতে হবে···

বিরক্ত হইলাম। কহিলাম,—তা হয় না মশায়। পূজার লেখা সব প্রেসে দেওয়া হয়ে গেছে। তা থেকে বাদ দেবার মত কিছু নেই। অনেক নামজাদা লেখকের গল্প···পয়সা দিয়ে নিয়েছি···বুঝছেন, এ হলো পূজা-নাম্বার! নতুন লেখকদের গল্প এ মাসে দেওয়া চলবে না। তা ছাড়া আপনার লেখা এখনো পড়িনি···

ভদ্রলোক চেয়ার টানিয়া বসিল, কহিল,—আপনার কাগজের গ্রাহক বেশী বলেই আমার এত আগ্রহ। এ সংখ্যায় ছাপা না হলে ছাপাবার সার্থকতা থাকবে না। বোঝেন তো, কস্মিন কালে যারা বাঙলা মাসিক-পত্র পড়ে না, তাদের মধ্যেও অনেকে এই পূজা-নাম্বারখানা পড়ে···

আশ্চর্য্য লোক! আমি তার পানে চাহিলাম,—ভদ্রলোক হাসিল—ম্লান হাসি। হাসিয়া সে কহিল,—আপনি শুনুন। পড়তে হবে না, আমি পড়বো'খন।

আমি কহিলাম,—না, না···এখন সময় নেই। দেখছেন একতাড়া প্রুফ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি···

ভদ্রলোক কহিল,—বলেন, আমি না হয় প্রুফ দেখে দিচ্ছি —আপনি এক-মনে পড়ে ফেলুন। আমার গল্পটা কাল্পনিক নয়—সত্য ঘটনা।

চটিয়া কহিলাম,—সত্য গল্প আমরা ছাপি না। পাতার নীচে এ্যাস্‌টারিস্ক দিয়ে 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে'—এ-সব ফুটনোট আমার কাগজে চলবে না।

ভদ্রলোক কহিল,—ফুটনোট নাই দিলেন। তার জন্য আমি লালায়িত নই। কথায় কথায় আপনাকে এটা বললুম।

লালধারী চায়ের পেয়ালা আনিল,—সেই সঙ্গে দু পীস টোষ্ট রুটি।

ভদ্রলোক কহিল,—ভালোই হলো। চা খাবেন তো! বেশ, আপনি চা খান, গল্পটা আমি মোটামুটি আপনাকে বলি···দেখবেন, এ গল্পে sex আছে, complication আছে। বুঝি তো, পাঠকরা কি চায়···আমিও আপনার কাগজের একজন পাঠক। সত্যি বলতে কি, অন্য কাগজে কি এ-গল্প ছাপাতে পারি না? পারি। আপনার কাগজের উপর শ্রদ্ধা খুব বেশী বলেই বাসন্তীতে ছাপাবার ঝোঁক।··· তা আপনার বেয়ারাকে বলবেন দয়া করে' এক পেয়ালা চা আমার জন্য আনিয়ে দিতে? তেষ্টায় গলা শুকিয়ে রয়েছে। ক' পয়সা নেবে? চার?

ভদ্রলোক ব্যাগ খুলিয়া একটা আনি বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল। আমি কহিলাম,—পয়সা রেখে দিন। এ-পেয়ালা আপনি নিন···লালধারীর পানে চাহিয়া বলিলাম, —আর এক পেয়ালা চা আন্···

লালধারী চলিয়া গেল। ভদ্রলোক বলিল,—ধন্যবাদ! বলিয়া অসঙ্কোচে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

আমি প্রুফে মনোনিবেশ করিলাম।

সহসা ভদ্রলোক আমার প্রুফের উপর হুমড়ি খাইয়া কহিল,—গল্পটির নাম দেখছি 'রমণী-হৃদয়'! বাঃ! খাসা নাম তো!

আমি সে-কথায় মনোযোগ দিলাম না। ভদ্রলোক কহিল, —সম্পাদকতা করতে [illegible] বিস্তর 'রমণী-হৃদয়ের' চর্চ্চা নিশ্চয় করেছেন! কি বলেন?

ভালো পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছি। তার পানে চাহিলাম,—চোখে বিরক্তি ছিল। তার তাহাতে কি কিছু আসিয়া যায়!

সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল – রহস্যময়! রমণী-হৃদয়ে যে রহস্য, সত্যি, তেমন রহস্য দুনিয়ার আর কিসে আছে!

এ মন্তব্যে নিমেষে লোকটার পরিচয় পাইলাম। এ-লোক আসিয়াছে বাসন্তী কাগজে গল্প ছাপাইতে! 'বাসন্তী' যেন স্ক্যাভেঞ্জার—রাজ্যের লোকের মনের ময়লা বহিয়া বেড়ায়!

ভদ্রলোক কহিল—ও গল্পটিতে নিশ্চয় খুব গাঢ় রহস্যের সাড়া আছে? কে লিখেছে?

আমি কহিলাম,—গোষ্ঠ চক্রবর্ত্তী।

—হ্যাঁ, লিখিয়ে বটে! কিছু বোঝবার জো থাকে না গল্পের গোড়া পড়ে কোথায় কি ভাবে তার শেষ হবে। Excellent লেখা…যাকে বলে, marvellous!

চা আসিল। পেয়ালা মুখে তুলিলাম।

ভদ্রলোক বলিল—আপনি সুলোচনার নাম শুনেছেন নিশ্চয়?

আমি কহিলাম,—ফিল্ম-এ্যাক্ট্রেস তো? না, কেশ তৈল? 'সুলোচনা' তেলের বিজ্ঞাপন আমার কাগজে আছে।

ভদ্রলোক কহিল—না, না…একটা গাঁয়ের নাম। আসান্‌সোলের কাছে গ্রাম। সেই গ্রামেরই ঘটনা আমি এ-গল্পে লিখেছি। সত্য ঘটনা…তা হলে কি হবে? এতে আছে প্রাণের সজীব লীলা…আরব রজনীর গল্পেও এমনটি পাবেন না! সেখানে বাস করতেন রঞ্জন রায়…মস্ত জমিদার—তাঁর এক মেয়ে বিজলী।…আর ছিল অমূল্য দত্ত এবং বেহারী মল্লিক, the eternal villain…বিজলী সুন্দরী—যেন রূপের বিদ্যুৎ!

আমি কহিলাম—বলেছি তো, এ মাসে আপনার গল্প ছাপা হতে পারে না…ম্যানেজারের কাছে রেখে যান। পড়ে যদি বুঝি ছাপবার মত, তাহলে পরের মাসে চেষ্টা দেখবো।

ভদ্রলোক কহিল—পরের মাসে ছাপা আর না ছাপা দুই সমান। এই মাসেই ছাপতে হবে। বলেন,—তার জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি।

এ-কথায় জলিয়া উঠিলাম। কি ভয়ানক লোক! ঘুষ দিয়া গল্প ছাপাইতে চায়!… কড়া কিছু বলিব ভাবিয়া তার পানে চাহিলাম। কিন্তু চাহিবামাত্র চট্ করিয়া নিজেকে সম্বরণ করিলাম। মুখের কথা একবার বাহির হইয়া গেলে আর ফিরিবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, পঞ্চাশটা টাকা …এই পূজার বাজার…

মন আপনা হইতে দরদে ভরিয়া উঠিল। কোমল স্বরে কহিলাম,—কি এমন কারণ যে এ মাসে না ছাপলে চলবে না?

ভদ্রলোক কহিল,—কারণ আছে।

আমি কহিলাম—কোনো আত্মীয়-বন্ধু মরণাপন্ন না কি যে কোনো মতে ছাপিয়ে তাঁকে দেখাতে চান? তা যদি হয় তো যা বললেন…

ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া কহিল—এক রকম মরণ-বাঁচনের ব্যাপারই বটে! গল্পটা না পড়েন, শুধু শুনুন…মানে, প্লটের আদ্‌রাটা…

সম্পাদকীয় মর্য্যাদা-রক্ষার উদ্দেশ্যে কহিলাম,—কিন্তু শুধু প্লটে তো গল্প হয় না। ষ্টাইল চাই…আর্ট চাই। জানেন তো, একালে গল্প নিয়ে কি বাদানুবাদ চলেছে – আমাদের পুরোনো কত লেখককে সেজন্য বাতিল করে দিতে হয়েছে মাসিকপত্র চালাতে হলে পাঠকদের pulse feel করা চাই কি না!…

ভদ্রলোক কহিল—ষ্টাইল আছে বৈ কি। সেটুকু দেখতে কতখানি বা সময় লাগবে? প্লটটা আমি আপনাকে বলি… সময় বাঁচবে। আমার গল্পের প্রুফ নিয়ে আপনাকে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না। প্রুফ আমি দেখে দিয়ে যাবো'খন।

এত কাল সম্পাদকতা করিতেছি, কিন্তু এমন লেখক কখনো দেখি নাই। আগে হইতে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, তার লেখা গল্প আমার পছন্দ হইয়াছে এবং তাহা আমার বাসন্তীতে ছাপা হইবে।

রাগিব কি হাসিব স্থির করিতে পারিলাম না। তবে দুটার কোনটাতেই সুফল মিলিবে না, বুঝিতেছিলাম। যে-রকম নাছোড়বান্দা…

সেই সঙ্গে পঞ্চাশটা টাকা…

না হয়…

কহিলাম—কি প্লট চটপট বলুন…আমার এখনো প্রুফ বাকী পাহাড়-প্রমাণ

ভদ্রলোক কহিল—না, আমি খুব সংক্ষেপে সেরে নেবো ···মানে, just to give you an idea···বুঝছি তো আপনার time কত valuable!

[২]

ভদ্রলোক বলিল—রঞ্জন রায়ের জমিদারী দেখাশুনা করতো ঐ অমূল্য। অমূল্য না দেখলে জমিদারীর অবস্থা কি দাঁড়াতো বলা কঠিন। এ সম্বন্ধে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর যে সার্টিফিকেট দিয়ে এসেছিলেন, তা এখনো রেকর্ড-জাত হয়ে আছে জমিদারী-সেরেস্তায় আর পাচটা কাগজ-পত্রের সঙ্গে। অমূল্য বয়সে তরুণ। জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করলেও একালের রোমান্স সম্বন্ধে সে খুব সচেতন। জমিদারীর আয় নানা দিক দিয়ে সে বাড়িয়ে তুলেছিল। সুলোচনা গ্রামের আশেপাশে বন। সেই বনের পরই সাঁওতাল-পরগণার জঙ্গল···রঞ্জন রায়ের জমিদারীতেও বহু জঙ্গল। সে জঙ্গলে পাওয়া যায় রবার, ···তবে গিয়ে অভ্র, কয়লা, হাতীর দাঁত···এ-কথা নিশ্চয় জানেন?

সবিস্ময়ে কহিলাম—আজ্ঞে না, আমি জানি না। আসানসোলে হাতী আছে, সে খবরও জানা ছিল না।

ভদ্রলোক কহিল—আসানসোল নয়; সুলোচনা বললুম তো, হাজারিবাগ-জঙ্গলের লাগাও এ জঙ্গল···হাতী সেখানে আছে। আগে কেউ জানতো না···ঐ অমূল্য বহু সন্ধানে হাতীর উদ্দেশ পায়। উদ্দেশ পাবমাত্র হাতীর দাঁত জোগাড় করার সে ব্যবস্থা করে। তা থেকে অগাধ পয়সা আমানত হতে থাকে। ওখানকার হাতীর দাঁতে ছড়ি পর্য্যন্ত তৈরী হয়। সঙ্গে আনিনি··তবে আপনার যদি ছড়ির সখ থাকে, বলবেন, best ছড়ি একগাছি আপনাকে আনিয়ে দেবো। কিন্তু থাক--হাতীর কথা এ গল্পে আমি লিখিনি। আমি লিখেছি সুলোচনায় যে রোমান্স ঘটেছিল, তার কথা।

অমূল্যর প্রাণপাত পরিশ্রমে আট বৎসরে সুলোচনার যে সমৃদ্ধি জাগলো, তা অপূর্ব্ব। সেই সমৃদ্ধির জোরে জমিদার রঞ্জন রায় সরকারের কাছ থেকে পেলেন 'রাজা' খেতাব। তাঁর ছবি এখানকার খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। 1927এর 4th January তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য়। ঐ তারিখের অন্য অনেক কাগজেও রাজার ছবি ছাপা হয়। *সে ছবির ব্লক অমূল্য পাঠায়।

রাজা রঞ্জন রায় প্রায় বলতেন তোমাকে এমন কিছু বখশিস্ দিতে চাই অমূল্য, যা পেয়ে তুমি সত্যি খুব খুশী হবে। কি তুমি চাও? বলো···

অমূল্য হাসতো আর বলতো—দেবেন রাজা বাহাদুর! বখশিস আমি চেয়ে নেবো।

আপনাকে আগেই বলেছি, অমূল্য হিসাব-নিকাশ করে বেড়ালেও তার প্রাণ ছিল, হৃদয় ছিল। সে হৃদয়ে তরুণ-যৌবনের অনেক সাধ-আশা!

রঞ্জন রায়ের মেয়ে বিজলী এই সমৃদ্ধির তলে-তলে রূপ-বেড়ে উঠছিল।···ঐ যে বেহারীর কথা বললুম—সে ছিল অমূল্যর বন্ধু। পিতৃমাতৃহীন, অনাথ, দরিদ্র, অসহায় অমূল্যর স্নেহের আশ্রয়ে বসে লেখাপড়া শিখে সে পণ্ডিত হয়ে উঠছিল। সেই সঙ্গে বিজলীর পড়ার মাষ্টার হলো—তাও ঐ অমূল্যর কৃপায়। সরল-বিশ্বাসী অমূল্য! অমূল্যর বিষয়-বুদ্ধি থাকলেও একালের কথা-সাহিত্য তার পড়া ছিল না!

বেহারী বড় কথা কইতো না—চুপচাপ থাকতো। নাটকে উপন্যাসে যে সব villain দেখেন, তারা বড্ড বেশী বকে; বড্ড বেশী তারা আস্ফালন করে বেড়ায়। দেখেছেন নিশ্চয়? আচ্ছা, বলুন তো, ও জায়গায় কোনো লেখকের psychology আমার ভাল বোধগম্য হয় না···এটা তাঁদের villain চরিত্র আঁকায় মস্ত ভুল নয় কি?

আমি কহিলাম—সম্পাদক-হিসাবে জানা আর নামজাদা লেখকদের লেখা গল্প-উপন্যাস আমি ছাপি বটে, কিন্তু সমালোচক-হিসাবে সে লেখার সঙ্গতি-বিচার কখনো করিনি।

ভদ্রলোক কহিল—গল্প ছেপে পরেও তার বিচার করেন না?

আমি কহিলাম—না। নামজাদা লেখকদের গল্প না পড়েই প্রেসে দিই। পড়ি শুধু প্রুফে। তারপর মাসের পর মাস আসছে যাচ্ছে—লেখা ছাপা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। পড়বার সময় পাবো কখন?

আমার পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া ভদ্রলোক কহিল সম্পাদকী করতে হলে সাহিত্য-বিচারের শক্তি সত্যই লোপ পায়।* আমারো এ··· ধারণা দাঁড়িয়েছে।

* সুধী সম্পাদকগণ ক্ষমা করিবেন, এ ··· লেখকের নয়; উক্ত ভদ্রলোকটির। —লেখক

আমি কহিলাম—বুঝেছি, আপনার গল্প সেই মামুলি-গোছ? অর্থাৎ···

ভদ্রলোক বাধা দিয়া বলিল—না, না···দয়া করে এতক্ষণ যদি শুনলেন তো বাকীটুকু শুনুন।···মামুলির কথা যা বলছেন, গোড়ায় সবই মামুলি-ভাবে সুরু হয়। আমাদের জীবনের পানে চেয়ে দেখুন না···সেই অন্নপ্রাশন, স্কুলে যাওয়া, পাশ করা, বিয়ে-থা, ছেলেমেয়ে হওয়া—আগাগোড়া মামুলি। তার পর কারবারে ফেঁপে কেউ হয়ে দাঁড়ায় কার্নেগি, কেউ বা জেলে যায় নোট জাল করে! রোমান্স যা, তা জীবনের মধ্যাহ্নে দেখা দেয়।

নিরুপায় ভাবেই চুপ করিয়া রহিলাম। ভদ্রলোক বলিল—একদিন বেহারী এসে অমূল্যর কাছে সনিশ্বাসে জানালে, তার জীবন বিপন্ন, অমূল্যর সাহায্য চায়···

অমূল্য চমকে উঠলো, বললে—কি হয়েছে? ক্ষ্যাপা হাতী তাড়া করেছে? না, কোনো সাঁওতাল?

বেহারী বললে, তা নয়। সে বিজলীকে খুব গভীর ভাবে ভালো বেসেছে। বিজলীকে না পেলে সে বাঁচবে না। তার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।

অমূল্যর সঙ্গে তখন বেহারীর কথাবার্ত্তা চললো; অমূল্য বললে,—বিজলীকে এ কথা বলেছো?

বেহারী।—না। আমার বড় লজ্জা করে। আমার কাছে সে পড়ে।

অমূল্য।—তাতে কি! পড়তে পড়তে প্রেম···সাহিত্যে বিস্তর নজীর আছে।

বেহারী।—আমি তার পানে মুখ তুলে চাইতে পারি না, তা এ কথা বলবো কি!

অমূল্য।—তার দিক থেকে অনুরাগের কোন লক্ষণ?

বেহারী।—না। সেই তো মুস্কিল! কি করে জানবো?

অমূল্য।—হুঁ!

কথা এই পর্য্যন্ত।

রাত্রে সেদিন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। অমূল্য ঘরে শুয়ে আছে, চোখে ঘুম আসছে না! একরাশ চিন্তা এমন হুটোপাটি বাধিয়ে তুলেছে যে নিদ্রা বেচারী সে চিন্তার জঙ্গলে ঘেঁষতে পারছে না!

অমূল্য ভাবছিল, বিজলী! রাজকন্যা বিজলী! তার চোখের সামনে দিয়ে কোথাকার আশ্রিত এই বেহারী তাকে নিয়ে চলে যাবে তার চিত্ত-কাননের উপর দিয়ে একেবারে কোন্ অজানা রাজ্যে! সে নিশ্বাস ফেলে ভাবলো, আর নয়। রাজার কাছে বখশিস্ সে চাইবে এবং সে-বখশিস্ ঐ রাজকন্যা! বিজলী ছাড়া তার চাইবার বস্তু এখন আর-কিছু নেই!

রাজার কাছে কথাটা সে প্রকাশ করে বললো। রাজা হাসলেন, হেসে বললেন—কি করে তা হবে অমূল্য! হাজার হোক, তুমি একজন গোমস্তা···

অমূল্য বললে—কিন্তু আপনার এ রাজ্য চলছে এই গোমস্তার বুদ্ধিতে!

রাজা বললেন—তা বুঝি। তবু তুমি গোমস্তা! পাঁচজনে কি বলবে? এখন আমি ছোট জমিদার নই—সরকারের খেতাবী রাজা।

অমূল্য বললে,—বিয়ে হলে আমিও একদিন রাজা হবো।

রাজা নিশ্বাস ফেলে বললেন—তা হয় না অমূল্য। তার চেয়ে চাও তুমি বিনা-খাজনায় ঝাড়ুমারির অজগর জঙ্গল··· সে-জঙ্গলে হাতী আছে, মৌমাছি আছে। আমি দেবো। কিন্তু মেয়ের সঙ্গে বিয়ে!···আমার সাধ, জামাই হবে পাশ-করা।

অমূল্য বললে—পাশ যদি চান্ তো ঐ বেহারীকে জামাই করবেন?

ক্ষণকাল চিন্তা করে রাজা বললেন,—মন্দ কি! চেহারাখানি চমৎকার। একবার যদি বিলেত পাঠিয়ে দিই··· সব দোষ ঢেকে যাবে, মস্ত পোজিশন্ হবে।

অমূল্য ফুঁশে উঠলো, বললে—রাজা রঞ্জন রায়, আমি এই দণ্ডে কাজে ইস্তফা দিচ্ছি। আসুন কোথা থেকে আনতে পারেন আমার মত ম্যানেজার···

রাজা অমূল্যর হাত ধরলেন, ধরে বললেন,—দয়া করো অমূল্য···ভালো পাত্রী খুঁজে তোমার বিয়ে দেওয়াবো···

অমূল্য বললে—লাখো-গুণ ভালো পাত্রী পেলেও অমূল্য তাকে বিবাহ করবে না। হয় রাজকন্যা বিজলী···নয় সুলোচনা থেকে আমার বিদায়!

বেণীমাধবের ধ্বজা
শ্রীললিতমোহন সেন
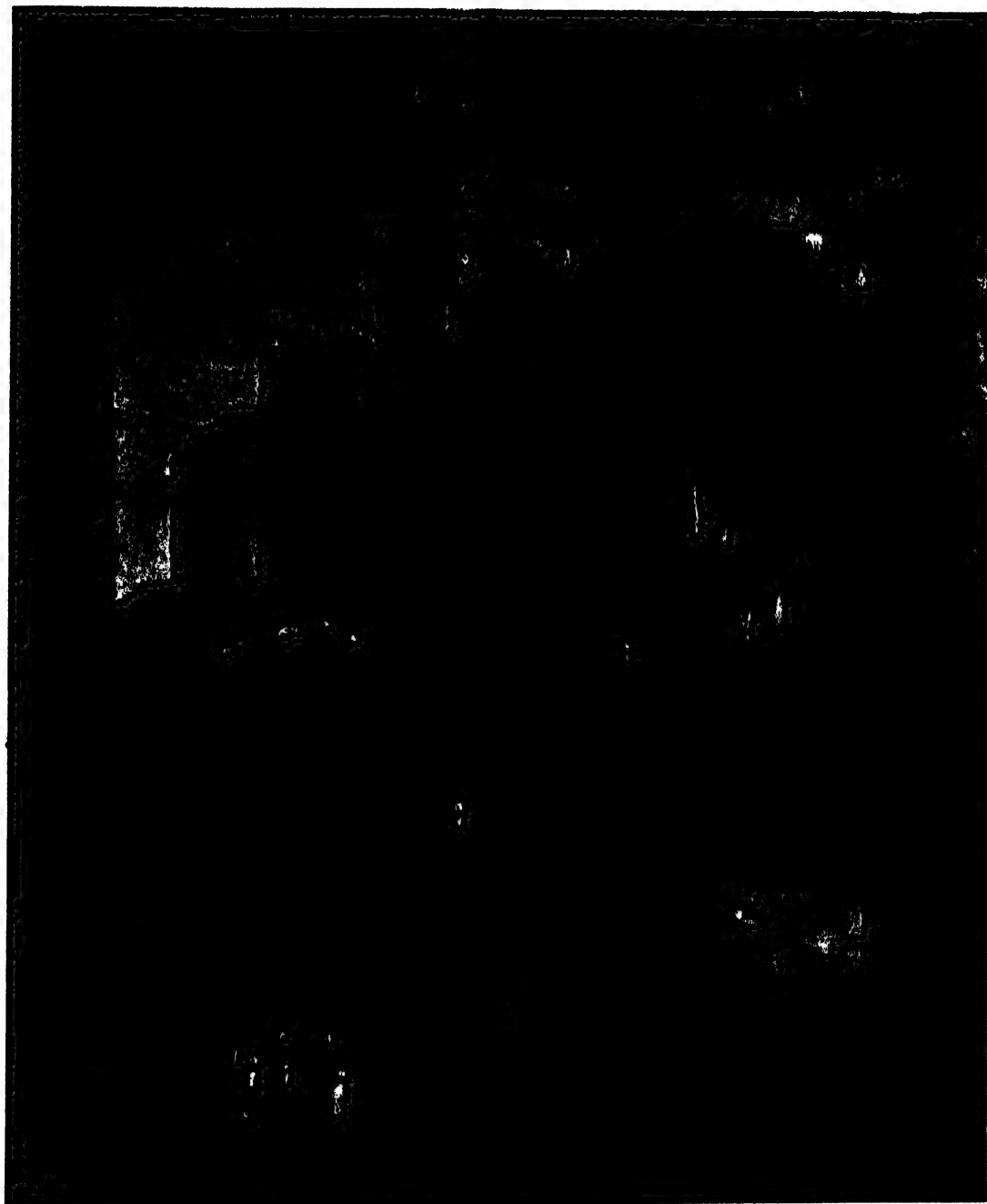
(শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে)
[আকাডেমি অব ফাইন আর্টস্ একজিবিশনে স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত]

রাজা বললেন—একদিন সময় দাও, অমূল্য···

অমূল্য বললে—এক দিন কেন রাজা বাহাদুর? দুদিন সময় দিচ্ছি···

আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল। কি বিপদেই পড়িয়াছি! এই লক্ষ্মীছাড়া প্লট। কহিলাম—কিন্তু এ গল্প···একালে চলবে না মশায়। আমায় আপনি মাপ করবেন।

ভদ্রলোক বলিল—কেন চলবে না?

আমি কহিলাম—শুধু জমিদারী-টমিদারীর কথাই চলেছে···নায়িকা বিজলীর কথা বললেন,—রূপসী কিশোরী! অথচ তার কথা এতটুকু নেই। একালের পাঠক-পাঠিকা··· বোঝেন তো···রস চায়! Love-এর নানা জটিলতা! Complications! ঐ বিজলী ডাগর হয়েছে-বেহারী মাষ্টারের সঙ্গে তার দু'চারটে daring episodes···তা নেই!···ভালো কথা, আপনার এ গল্প ছেলেদের কোনো ম্যাগাজিনে দিন না! ঐ হাতীর ব্যাপারটা ফুটিয়ে লিখলে ভারী মারাত্মক এ্যাডভেঞ্চার হয়ে উঠবে। চাই কি, কোনো ভদ্রলোকের বাগান-বাড়ীতে সভা ডাকিয়ে ছেলেদের সাহিত্যে 'রথী' বলে নাম কিনতে পারবেন। এখন তো এদিকটায় ঘরোয়া বন্দোবস্ত চলেছে।

কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়।

ভদ্রলোক যে-ভাবে আমাকে পাইয়া বসিয়াছে।···সে বলিল, —ব্যস্ত হবেন না। শেষের দিকে নায়িকা বিজলী আসবে বৈ কি। তার সে-মূর্ত্তি একদম একালের সাহিত্যের।

নাঃ! উঠিবে না। ছাড়িবে না। অগত্যা কহিলাম—তাহলে চটু করে সেরে নিন। বুঝছেন তো···প্রুফগুলো···

ভদ্রলোক কহিল,—অন্দরে দুদিন যে একটা ট্রাজেডির অভিনয় চলেছে, সদরে বসে অমূল্যর তা বুঝতে বাকী রইলো না।

তৃতীয় দিনে মুখ-হাত ধুয়ে অমূল্য সেরেস্তায় এসে বসেছে, আর কোনো কর্ম্মচারী তখনো আসেনি···হঠাৎ সে-ঘরে বীণার সুর বাজলো,—অমূল্য বাবু···

চোখ তুলে অমূল্য চেয়ে দেখে, সামনে ম্লান স্বর্ণলেখা! অর্থাৎ বিজলী।

অমূল্য উঠে দাঁড়ালো··হাজার হোক, রাজার কন্যা! রাজা তার প্রভু।

স্থির অবিচল কণ্ঠে বিজলী বললে—আপনি বিবাহের ব্যবস্থা করুন···

অমূল্য যেন চমকে উঠলো। বললে—কার বিবাহ?

বিজলী বললে—আপনার।

অমূল্য একটা উচ্ছৃত নিশ্বাস চেপে বললে—পাত্রী?

বিজলী বললে—আমি···শ্রীমতী বিজলীপ্রভা···

বিজলীর স্বর অকম্পিত।

অমূল্য বললে—রাজা-বাহাদুরের সম্মতি আছে?

বিজলী বললে—নিশ্চয়। না হলে নিজে থেকে আমি এসেছি সে কথা বলতে! আমি প্রগল্‌ভা হতে পারি, কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা নই।

অমূল্যর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। সে বললে—আজই আমি আয়োজন সুরু করবো, রাজকন্যা।

অমূল্যর সেদিন কাজ করা হলো না। সে বাড়ী চলে এলো। এসে দেখে, বিহারী তার বিছানাপত্র বাঁধছে। অমূল্য বললে—কোথায় চলেছ বেহারী?

সজল চোখে বেহারী অমূল্যর পানে তাকালো, তাকিয়ে বললে—যেদিকে দু'চোখ যায়···

অমূল্য বললে—হুঁ! আমার বিয়েয় তাহলে থাকছো না? শুনেছো, রাজকন্যা বিজলী নিজে এসে জানিয়েছেন···

বেহারী কেঁদে ফেললে—অনেকক্ষণ কাঁদলো; পরে চোখের জল মুছে বললে,—নারীর মন চিরদিন রহস্যময়! না হলে···

অমূল্য বললে,—না হলে কি?

বেহারী বললে—একদিন যখন আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে, আজ তখন নিষ্ঠুর হয়ো না। আমি মানুষ···আমার এ প্রাণ উপন্যাসের নায়কের প্রাণ নয় অমূল্য···

অমূল্যর প্রাণের মধ্যে কোন্ দৈত্য, না, দানব তখন বিদ্রূপের অট্টহাস্য জুড়ে দিয়েছে···ওরে আশ্রিত, ওরে পদানত, আমার কণ্ঠের বিজয়-মাল্য তুই কণ্ঠে ধরবি, এমন তোর স্পর্দ্ধা! এখন···?

বেহারী বললে,—আমি আশা করেছিলুম বিজলী শেষে···

অমূল্য বললে,—সে রাজার মেয়ে। জানে, রাজ্য আগে···

বেহারী চলে গেল। অমূল্যর সঙ্গে হলো বিজলীর বিবাহ।

ফুলশয্যার রাত্রে বধূকে আদর করতে এসে অমূল্য দেখে, তার মুখ ম্লান। মধুযামিনীর আনন্দ তাকে যেন স্পর্শ করতে পারে নি।

অমূল্য ডাকলে—বিজলী···বিজু···

বিজলী বললে,—কাকে ডাকছো? কে বিজলী? কে বিজু?

অমূল্য বললে,—তুমি বিজলী···

বিজলী বললে—আমি? না, আমি বিজলীর ছায়া। তার ম্লান স্মৃতি মাত্র।

অমূল্য অবাক। বেচারা উপন্যাস পড়েনি। সে বললে,—কিন্তু তুমিই রাজা রঞ্জন রায়ের কন্যা বিজলী···

বিজলী বললে,—রাজার কন্যা হতে পারি—কিন্তু বিজলী নই।

অমূল্য বললে—বিজলী কোথায় গেল?

বিজলী বললে,—সে প্রশ্ন তুলো না···আমি তা বলতে পারবো না। তুমি চেয়েছিলে রাজকন্যাকে···না হলে বাবার রাজ্য রক্ষা পায় না। তাই সে রাজ্য রক্ষা করতে আমি আমার দেহ দান করছি! দধীচি নিজের অস্থিদান করেছিলেন জগৎকে বাঁচাবার জন্য···আমিও তেমনি আমার এ রূপ, এই যৌবন···

অমূল্য চমকে উঠলো, এ-কথার মানে বুঝতে পারলো না। সে বললে,—কিন্তু তোমার মন···সে মন তুমি কোথায় রেখে এলে?

বিজলী থর-থর কেঁপে উঠলো; বললে,—না, না, সে কথা জিজ্ঞাসা করো না···আমি বলতে পারবো না···বলতে পারবো না গো। মন্ত্র পড়ে বিয়েই করেছো, তা বলে মনের এত সন্ধান কেন? সেখানেও আমি স্বাধীন নই?

বিজলীর সারা অঙ্গ কাঁপছিল···যেন ভিতরে মস্ত ঘূর্ণী ঝড় বয়ে চলেছে। তার আঘাত সহ্য করতে না পেরে সে পড়ে যাচ্ছিল। অমূল্য ধরে তাকে [illegible]ক নিল···তারপর শয্যায় তার দেহ বিছিয়ে দি[illegible]।···সে ভাবলো, সে কি মহাদেব? সতীর প্রাণহীন দেহ বুকে বয়ে ধরণীর পথে তাকে চলতে হবে?···কি হবে এ বিবাহে, যদি বধূর মন না পেলো!

আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইল। এমন গল্প··· বাসন্তীতে ছাপানো···অসম্ভব!

কিন্তু পঞ্চাশটা টাকা!

কহিলাম—বুঝেছি···তারপর ওরা ঘর করতে লাগলো। বিজলী হলো সংসার চালাবার যন্ত্র···আর অমূল্য তপস্যা-রত রইলো বিজলীর হারা-মনকে ফিরিয়ে আনবার জন্য।

ভদ্রলোক কহিল—না। এঃ! **Very sorry**। তা হলে আপনি কিছুই বুঝতে পারেন নি।···সেভাবে গল্প শেষ হলে **triangular complication** আসবে কেন? **Triangle**, মশায়, **eternal triangle** হলো আজকালকার গল্পের প্রাণ! নাহলে গল্প গল্প হবে না। সে-জ্ঞান আমার আছে। বাকীটুকু শুনুন, তবে তো বুঝবেন।

ঘড়িতে তিনটা বাজিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম··· প্রুফ লইতে প্রেস হইতে লোক আসিবে তিনটায়।

আমি কহিলাম—থাক! দিয়ে যান...কিন্তু পঞ্চাশটি টাকা ঐ সঙ্গে রেখে যাবেন। চেক নয়। নগদ টাকা।

পকেট হইতে পাঁচখানা দশ টাকার নোট লইয়া ভদ্রলোক টেবিলে রাখিল···চট্ করিয়া লইতে পারিলাম না। কেমন যেন বাধিতেছিল।

ভদ্রলোক কহিল—শেষটুকু শুনুন···না হলে আমার কর্ত্তব্য পালন হবে না।

নোট ক'খানা সন্তর্পণে ঠেলিয়া প্যাডের তলায় চালান করিলাম। মনে একটু শান্তি পাইলাম। অনেকগুলা পাওনাদারের প্রসন্ন মুখ মনের পর্দ্দায় ছায়া-ছবির মত ভাসিয়া উঠিল।

ভদ্রলোক কহিল,—বিজলীর ভঙ্গীতে অমূল্য একটু প্রমাদ বোধ করলো। এ অবস্থায় কি তার এখন কর্ত্তব্য? এত সাঁওতাল, হাতী, বদমায়েস প্রজা বশ করে সামান্য স্ত্রীর কাছে হবে পরাজয়! কিন্তু নারীর হৃদয়ের হিসাব-নিকাশ তো কখনো খতিয়ে দেখেনি। উপায়?

বিজলীর বিবাহে বিজলী উপহার পেয়েছিল অনেকগুলো

বাঙলা বই—কবিতা আর গল্প-উপন্যাস। বরাত ঠুকে তারি একখানা সে খুলে বসলো। খুলতেই দেখে, একটা পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

গজপতি বলিল—তাই হোক্! তুমি তোমার চিত্ত-হারা দেহ-বিত্তই আমার সেবায় উৎসর্গ করো! আমি তোমার ঐ চিত্ত-হীন দেহ-বিত্তে নিজেকে ঐশ্বর্য্যশালী করে তুলি! যতদিন তোমার যৌবন, ততদিন আমার সম্পদ! তার পর···বেশ, আমি নিরাশ হবো না। তোমার হারা চিত্তকে তপস্যায় ফিরিয়ে আনবো···সাধনায় জাগ্রত করে তুলবো··মাটীর প্রতিমার বুকে ভক্ত যেমন আরাধনায় প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে!···

কথাটা পড়ে অমূল্য ভাবলো, চমৎকার! সেও তাই করবে। কিন্তু কি সে সাধনা? কি আরাধনা? উপন্যাসের পাতায় পাতায় গোঁজ করেও তার কোনো সন্ধান মিললো না। না মিলুক! ঐ কথাগুলো মুখস্থ করে সে বিজলীর সামনে আউড়ে গেল ..

সে কথা শুনে বিজলী নিশ্বাস ফেললে, ফেলে উঠে বসলো···

তারপর সুরু হলো অমূল্যর জীবন-অধ্যায়ে নূতন পর্ব্ব··· পাষাণী প্রিয়ার বুকে প্রাণ-জাগানোর সাধনা!

সে এলো কলকাতায়···ফিরলো একরাশ বাঙলা বই কিনে। অমূল্য কবিতা লিখতে সুরু করলো। বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ন; বচন-বিন্যাসে ছিল প্রচুর নৈপুণ্য। এই বচনের মোহে কত দুরন্ত প্রজাকে শায়েস্তা করেছে, বশীভূত করেছে···বিজলী তো নারী! বাঙালীর ঘরের স্ত্রী!

বচন-বিন্যাসে প্রিয়ার চিত্তকে সে বিমুগ্ধ করতে লাগলো— কবিতা লিখে প্রিয়াকে শোনাতে লাগলো···বিজলীর মনের সে গভীর কালিমা যেন কাটছে···অমূল্যের মনে হতো, ছায়ায় যেন ক্রমে কায়ার আভাস জাগছে!

পরিশ্রম খুব বেশী হচ্ছিল। তার উপর খবর আসছে, ওদিকে হাতীশুঁড়োর জঙ্গলে বাঘ এসে হাতী মারছে··· কালিডোবার অভ্রখনিতে মূষিকের উৎপাতে অভ্র একেবারে চুরমার হচ্ছে···গাঁজাপটীর প্রজারা ধর্ম্মঘটে খাজনা বন্ধ করেছে ···সে সবের তদ্বির, সঙ্গে সঙ্গে কবিতা লেখা, বচন-মাধুর্য্যে প্রিয়ার চিত্ত-জাগরণের বিপুল সাধনা! অমূল্যর মাথা যেন ভোঁ-ভোঁ করছিল। হিসাবের খাতায় সে কবিতা লিখতে লাগলো; কবিতার খাতায় লিখতে লাগলো প্রজাদের বাকী খাজনার হিসাব!

এমন যখন তার মনের অবস্থা, তখন খবর এলো, দেওয়ালভাঙ্গার প্রজারা সেখানকার কাছারি-বাড়ী লুট করবার উদ্যোগ করেছে···

তখনি তাকে ছুটতে হলো দেওয়ালভাঙ্গায়।

কাছারিতে গিয়ে দেখে, সকলের মন ভয়ে থম্‌থম্ করছে! খাতা খুলে দেখে, সর্ব্বনাশ! হিসাবের খাতার বদলে সে এনেছে কবিতার খাতা।

ওদিকে দূরে হৈ-হৈ রব শোনা গেল। অবস্থা ভেবে অমূল্যর দেহ ঝিমঝিম করে উঠলো। সে মূর্চ্ছিত হয়ে খাটের পাশে লুটিয়ে পড়লো।

যখন জ্ঞান হলো, তখন নিমেষে অনুভব করলে, মাথার জড়তা কেটে গেছে···হাজার হাজার কথায় মাথা ভরপুর; হাজার হাজার ফন্দী বুকে গিজ্‌গিজ্ করছে···প্রজা বশ করতে এই সব ফন্দীই প্রধান অস্ত্র।

প্রজারা শায়েস্তা হলো···কারো পাই-পয়সা খাজনা বাকী রইলো না!

অমূল্য বিজয়ী বীরের মত রাজ্যে ফেরবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালো সাঁওতাল দফাদার মংরু। তার হাতে ছোট ভাঁড়। সে ভাঁড়ে তৈল।

মংরু বললে—হুজুরের জন্য তেল এনেছি। মাথায় মাখবেন। মাথা ভালো থাকবে···মাথা ঘামাতে পারবেন। এর জোরেই হুজুর এ-যাত্রা চাঙ্গা হয়েছেন।

বটে! অমূল্য তেলের ভাঁড় নিয়ে বললে,—এ তেল আমার অনেক চাই। পারবে জোগান দিতে?

মংরু বললে,—ক' মণ চাই?

অমূল্য বললে—হুঁ! আচ্ছা, খবর পাঠাবো। যত চাই, জোগাবে?

—আলবৎ হুজুর!

অমূল্য ফিরে এলো গৃহে। এসে দেখে, বিপর্য্যয় ব্যাপার। লোকজনের মুখ বিষাদ মলিন। ব্যাপার কি? বিজলী ভালো আছে তো? তারা সংবাদ দিলে, বিজলী দেবী চলে গেছেন···

অমূল্যর বুকখানা ধড়াস করে উঠলো। সে বললে—তোরা রাখতে পারলি নে?

দরোয়ান বললে—মা-জী কেঁদে বললেন, প্রাণের আহ্বানে বাধা দিস নে, ভজন সিং! এ গৃহ আমার অরণ্য, প্রেমহীন অন্ধপুরী! শ্মশান!

ভজন সিং হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো। তার গালপাট্টা বয়ে জলের ধারা নামলো—যেন ভাদ্রের বানে কাশ-বন ডুবছে …ডুবছে!

বজ্র-হুঙ্কারে অমূল্য বললে,—শয়তান! কাঁদছিস? ভেতো বাঙালী নোস্! তোর কান্না মানায় না! ডালরুটি খাস্—মাড়োয়ার থেকে এসেছিস,—না বেচলি কাপড়, না কিনলি বাগান-বাড়ী! তোর কান্না সাজে না। চুপ কর!

ভজন সিং এ-তিরস্কারে টিট হয়ে গেল। বাঙলা দেশের লোণা-ভরা হাওয়ার উপর বয়ে এলো মেবার পাহাড়ের ধূম বাষ্পরাশি। সে বললে,—হুজুর! জী!

অমূল্য বললে,—রাজবাড়ীতে খবর দিয়েছিস?

দরোয়ান বললে,—সেখানে খবর দিয়েছি হুজুর। মহারাজ পাঁচ হাজার টাকা বকশিস্ দেবেন, হুকুম জারি করেছেন, রাজকন্যাকে আনতে পারলে।

—হুঁ! অমূল্য বললে—ও-টাকা আমি চাই। বিজলীকেও চাই!…কখন তারা গেছে?

—এখনো আধ ঘণ্টা হয় নি হুজুর।

অমূল্যর কাছে ছিল টাইম-টেব্‌ল্। চট্ করে সেটা খুলে সে বললে,—দশ মিনিট বাকী ট্রেণ ছাড়তে। আমার ঘোড়া…

ঘোড়া এলো। অমূল্যর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল…

সেই তেলের ভাঁড় ছিল কাছে—খানিকটা তেল নিয়ে মাথায় ঢালতে মাথা চাঙ্গা হয়ে উঠলো…হাজার ফন্দী মাথায় জাগলো। অমূল্য ঘোড়া ছুটিয়ে দিল…

কিন্তু বাধা। হাটের দিন। পথে অসম্ভব ভিড়। সে ভিড় ঠেলে ষ্টেশনে পৌঁছুতে দু' মিনিট দেরী! হায়রে, রেলওয়ে কোম্পানি শুধু টাইম্ রেখে গাড়ী চালায়, মানুষের মনের পানে কখনো তাকালো না।

তবু…না…মাথায় ফন্দী ফুটছে ফোয়ারার ধারার মত। সেই তেলের গুণ! নিশ্চয়!

ট্রেণ-লাইনের ধার দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অমূল্য চললো… চাষার ক্ষেত মাড়িয়ে, কলা ডিঙ্গিয়ে, তারের বেড়া টোপকে… ট্রেণ তার ঘোড়ার সঙ্গে তাল রাখতে পারলো না! একটা সিগনালের কাছে গিয়ে সিগনালটা অমূল্য দিল টেনে… সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ থেমে গেল…

অমূল্য এসে সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার সামনে দাঁড়ালো,—বিজলী তখন পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক বেহারীর বুকে মাথা হেলিয়ে তার পানে চেয়ে আছে…নিশ্চিন্ত আরামে।

তেলের গুণে অমূল্যর দেহে তখন হাতীর বল। সে বিজলীর চুলের ঝুঁটি ধরে এক-টানে তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল; নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল গ্রামের দিকে—ফিরলো সেই জলা পার হয়ে, ক্ষেত মাড়িয়ে।

ট্রেণের সিগনাল সিগনালার তখন ফেলে দিয়েছে। ট্রেণ দাঁড়ালো না—চললো। আর তার কামরায় বসে রইলো পণ্ডিত বেহারী হতভম্বের মত। যেন তার দেহ থেকে প্রাণটাকে হিঁচড়ে কে বার করে' নিয়ে গেছে!

বেচারা! শুধু কেতাব পড়ে পাশ করেছে দুনিয়ার কোনো কিছু যে জানলো না।

বাড়ী ফিরে অমূল্য ডাকলো,—বিজলী…

বিজলী বললে,—আমায় ক্ষমা করো গো! আমি… আমি…

অমূল্য বললে কাকে চাও তুমি, বেছে নাও। এই বিজয়ী বীর আমাকে? না, সেই হতভম্ব পণ্ডিত ভীরু বেহারীকে? কাকে চাও? স্বামীকে? না, প্রণয়ীকে?

বিজলী কোনো কথা বললো না, চুপ করে রইলো। তার মনের মধ্যে তখন সিনেমার ছবি…ট্রেণ চলেছে, চলেছে …বেহারী একা! বিজলী মূর্চ্ছিত হলো!

এইখানেই গল্পের শেষ…খারাপ লাগলো?

নোটগুলা প্যাডের তলায়। প্যাডখানা সবলে চাপিয়া রাখিয়া আমি নিশ্বাস ফেলিলাম, বলিলাম,—না। এমনিই তো সকলে লিখছে! অর্থাৎ নারী-চরিত্রের ঐ রহস্য… এ বেশ complication রয়ে গেল! বিজলী যে জবাব দিল না, ঐখানটা চমৎকার! ঐখানে আর দু' তিনটে উপন্যাসের প্লট জমাট বেঁধে রইলো। চান দ্বিতীয় পর্ব্ব, তৃতীয় পর্ব্ব চালাতে পারবেন—আনাতোল ফ্রান্সের ষ্টাইলে। কি বলেন?

হাসিয়া ভদ্রলোক কহিল—মানে, পাঠকদের কাছে কখনো ধরা ছোঁওয়া দেওয়া নয়। গল্প উপন্যাস শেষ করবেন না কখনো—শেষের দিকটায় দেবেন শুধু ধোঁয়া। জানি তো একালের লেখার ধরণ। তাছাড়া আর একটু কথা আছে। এর মধ্যে ঐ তেলের নামটা আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি···ওটার নাম মত্ত-মাতঙ্গ তেল। তেলটা হাতীর ব্রেন থেকে তৈরী। পূজার বাজারে এ গল্পটি ছাপাতেই হবে ···আমার বিশেষ উপকার হবে।···আপনাকে পরে বলবো ···আপনারও লাভের সম্ভাবনা আছে···

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলাম। কিসের দ্বিধা! আর্ট মানিয়া চলিলে পাঠকেরা আমার ছাপাখানার বিল শুধিতে আসিবে না। তার চেয়ে গল্প ছাপিয়া যদি নগদ পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যায় তো পরম লাভ! এক মাসের সংসার-খরচ! এ বাজারে কে দেয়? তা ছাড়া পূজার সংখ্যায় যা-তা লেখা অনায়াসে চালানো যায়।··· গাদার মাল! পাঁচখানা কাগজ তো দেখিতেছি···

কহিলাম,—আচ্ছা, দেবো! এ মাসের কাগজেই ছাপ্‌বো।

—ধন্যবাদ···তাহলে এখন আর বিরক্ত করবো না। আসি। আপনার এখনো প্রুফ দেখা বাকী! বলেন, আমি এসে এ গল্পের প্রুফ দেখে দিয়ে যাবো।

কহিলাম, বেশ!

পূজার সংখ্যা 'বাসন্তী' ছাপা হইবার দু'দিন পরে ভদ্রলোক আবার আসিয়া হাজির। আমি তখন বিলের তাগিদ বাঁচাইবার জন্য দোতলায় বসিয়া আত্মরক্ষা করিতেছি। চাকরকে বলা আছে, পাওনাদার আসিলে বলিবে, বাবু কাশী গিয়াছেন ভয়ঙ্কর nervous debility।

ভদ্রলোক আসিয়া চাকরকে বলিল,—ও কাশী আমার জন্য নয় রে। আমি বুঝি।···তুই যা, গিয়ে বল্, অর্ডার এনেছি··· মস্ত অর্ডার···

চাকরটি পুরাতন। আমার কায়দা-কানুন তার বিশেষ বিদিত। সে আসিয়া সংবাদ দিলে ভদ্রলোককে দোতলার ঘরে আনিলাম। নিরাপদে কথাবার্ত্তা চলিবে।

ভদ্রলোক কহিল,—আমার নামটা সেদিন বলা হয়নি। আমার নামই অমূল্য। ও গল্পের নায়ক আমি।

আমি কহিলাম,—ও কাহিনী তাহলে···

অমূল্য হাসিল, হাসিয়া কহিল—বাজে। বানানো। তবে গল্পে মস্ত রহস্য আছে···

আমি কহিলাম—রমণী-হৃদয়ের রহস্য তো?

অমূল্য হাসিল; জোর-হাসি। হাসিয়া কহিল—না, তৈল-রহস্য। মানে, আমি বেকার। আমার এক বন্ধুর কারবার আছে। সে এই পূজার বাজারে একটা তেল বার করেছে,—"মত্ত-মাতঙ্গ তৈল"। এখন কেশ-তৈলের গল্প-প্রতিযোগিতা হয়েছে না? আমরা সে পথে যাইনি। আমার লেখার সখ আছে। কাজেই গল্প লিখে তার মধ্যে তেলের কথা সাঁধ করিয়ে দিয়েছি। বিজ্ঞাপনের খরচের জন্য বন্ধু দিয়েছিলেন একশো টাকা।···পঞ্চাশ আপনাকে দিয়ে গেছি ···বাকী পঞ্চাশ আমি নিয়েছি আমার কমিশন।···যেজন্য এখন এসেছি, বলি। সামনের মাস থেকে ঐ তেলের বিজ্ঞাপন কোয়ার্টার-পেজ করে আপনার কাগজে দেবো। কণ্ট্রাক্ট করুন। আপাততঃ ছ মাসের কণ্ট্রাক্ট···তার দাম আগাম দেবো···একটু বিবেচনা করে দাম নেবেন। ওর মধ্যে আমার কমিশন থাকা চাই।

আমি কহিলাম,—কিন্তু আমি বুঝলুন না, ও তেল কাল্পনিক গল্পের তেল বলেই লোকে বুঝবে। তাতে আপনাদের কি সুবিধা···

অমূল্য কহিল,—প্রুফ দেখতে বসে ছোট একটু ফুটনোট গুঁজে দিয়েছি, ছাখেন নি? ও, আপনি আবার ছাপা হলে কোনো লেখা পড়ে দেখেন না! প্রুফ দেখার ভার আমিই তো নিয়েছিলুন। সেই ফাঁকে অর্ডার-প্রুফে ফুট-নোট ঢুকিয়ে দিয়েছি, "এ তৈলটি কাল্পনিক নয়। সত্যই এ তৈল বাজারে পাওয়া যায়। ১২ নম্বর দরাফ খাঁ লেন, বৈঠকখানা বাজার।"

বটে! আমি কহিলাম—আপনার বুদ্ধি বেশ আছে তো!

অমূল্য কহিল—বিজ্ঞাপনে লিখে দিয়েছি, "এ তৈলের গুণাগুণ সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। বাসন্তীর পূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পে এ তৈলের ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে।"

বিস্ময়ে তার পানে চাহিয়া রহিলাম। অমূল্য কহিল, —কি দেখছেন?

মুখে কোন কথা বলিলাম না। ভাবিতেছিলাম, বাসন্তী কাগজের জন্য অমূল্যকে যদি ক্যানভাসার রাখা যায় ভালো কমিশনে—তাহা হইলে আগামী বর্ষে বাসন্তীর তহবিল হয়তো··· কিন্তু কমিশনের দিকে তার যা ঝোঁক, ভাবনা শুধু তাহা লইয়া!

নির্ভুল ঘড়ির অধিকাংশই উৎকৃষ্ট সময় দেখাইবার জন্য দোলক-দণ্ডের দোলনের উপর নির্ভর করে। বায়ুর চাপ ও তাপ সমান থাকিলে এবং ভূকম্পনাদি না হইলে ধরিয়া লওয়া যায় যে, জ্যোতির্বিদের ঘড়ি অতিশয় নির্ভুলভাবে সেকেণ্ড গণনা করিয়া যায়। দোলক-দণ্ডের দোলন-হারের সামান্য পরিবর্তন বা সংশোধন আবশ্যক হইলে, নক্ষত্রের মধ্যাকাশ অতিক্রমের সময় দেখিয়া তাহা করিয়া লওয়া যায়।

জ্যোতির্বিদের ঘড়ি সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য নহে। প্রথমতঃ উহা বৃহৎ ; দ্বিতীয়তঃ, উহা 'নিবাত নিষ্কম্প' অবলম্বনের সহিত সংযুক্ত করিয়া অশেষ যত্নে সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে হয়।

এক সেকেণ্ড সময়কে শতাধিক ভাগে বিভক্ত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা বিদ্যুৎ-চালিত সুর-শলাকাকে (tuning fork) সময়ের মান (standard) হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুর-শলাকা চালিত নানা যন্ত্র আজকাল ব্যবসায় ও বাণিজ্যক্ষেত্রে চলিতেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিককে যদি
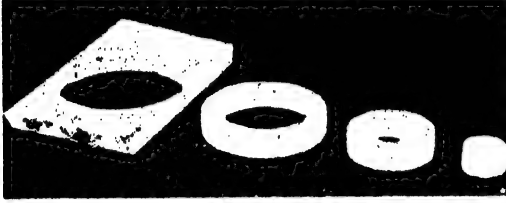
করাতের কাটা শেষ হইলে, নির্বাচিত দানাগুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক বা বলয় কাটিয়া লওয়া হয়। এখানে একটি ক্রীষ্টাল-ফলক, দুইটি অঙ্গুরীয়ক এবং একটি মধ্য-ফলক বা চাক্তি দেখান হইয়াছে।

সেকেণ্ডের এক লক্ষ বা ১০ লক্ষ ভাগ করিতে হয়, তবে তিনি কি করিবেন? তখন তাঁহার দোলকদণ্ড বা সুর-শলাকা, কোনটাই কাজে আসিবে না।

আজকাল আমরা বলিয়া থাকি, অমুক রেডিও-ষ্টেশন ৫০০ মিটার দীর্ঘ তরঙ্গে কাজ করে। ইথারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে ৩০,০০,০০,০০০ কোটি মিটার চলে। অতএব,প্রতি সেকেণ্ডে কয়টি তরঙ্গ হয়, হিসাব করিলেই দেখা যায়—উক্ত ষ্টেশনে প্রতি সেকেণ্ডে ৬,০০,০০০ লক্ষ বার বিদ্যুৎস্পন্দন সৃষ্টি করা হয়। আমেরিকার ফিডারাল রেডিও-কমিশনের মতে এই স্পন্দনসংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯ শত ৫০ হইতে ৬ লক্ষ ৫০-এর মধ্যেই রাখিতে হইবে। এক সেকেণ্ড সময়কে অসম্ভব রকম সূক্ষ্ম সমানাংশে বিভক্ত করিবার নানাবিধ প্রয়োজনের মধ্যে এই একটি।

আমাদের অনেকের কাছেই হয়ত এক সেকেণ্ডকে এত অধিক অংশে বিভক্ত করা অতীব আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়। আবার উহা যে এরূপ শুদ্ধভাবে গণনা করা যায়, যাহাতে এক নিযুত ভাগের মধ্যে এক ভাগের অধিক ভুল হয় না—ইহা আরও আশ্চর্য্যজনক। কিন্তু পূর্ব্বে যে ক্রীষ্টালের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে অতি সহজেই এই কার্য্য সম্পন্ন করা যায়।

যে মূল-নীতির উপর এই ক্রীষ্টাল-অঙ্গুরীয়কের ক্রিয়া নির্ভর করে, তাহা সাধারণ এক ডেলা চিনির সাহায্যেই বুঝান যাইতে পারে। অন্ধকার গৃহে এক ডেলা চিনি লইয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিলে, ভগ্ন অংশ হইতে এক প্রকার ক্ষুদ্র নীলাভ আলো নির্গত হয়। ইহার কারণ এই যে, কোন কোন দানা-দার পদার্থের উপর চাপ পড়িলে, ইহার ভিতর সামান্য পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল ধরিয়াই এ তথ্য অবগত আছেন। আর, ইহাও জানা আছে যে, ক্রীষ্টালের দানাকে স্বল্প পরিমাণ হ্রস-বর্দ্ধমান বা বিপরীত-সঞ্চারী বিদ্যুৎ প্রবাহের (A. C.) প্রভাব-ক্ষেত্রে রাখিলে ইহা আপনা আপনি স্পন্দিত হইতে থাকিবে ; পক্ষান্তরে উক্ত ক্রীষ্টালের উপর হ্রস-বর্দ্ধমান চাপ দিতে থাকিলে ইহার ভিতর একবার যোগাত্মক, পরক্ষণেই বিয়োগাত্মক ; আবার যোগাত্মক, পরক্ষণেই বিয়োগাত্মক—এই ভাবে পরস্পর বিপরীত-সঞ্চারী বিদ্যুত-প্রবাহ উৎপন্ন হয়। অতএব এখানে ক্রীষ্টালের সাহায্যে দ্রুতস্পন্দী বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করিবার একটি উপায় লক্ষিত হইতেছে। তাহা ছাড়া, স্পন্দমান ক্রীষ্টালের দোলন খুব নিয়মিত সময়ে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে দোলকদণ্ডের অনুরূপ ; দোলক যেমন নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর একবার একদিকে, তাহার পর অন্যদিকে দুলিতে থাকে, ইহাও তেমনি একদিকে স্পন্দিত হইয়া যোগাত্মক ও অন্যদিকে স্পন্দিত হইয়া বিয়োগাত্মক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। কিন্তু দোলকদণ্ডের ন্যায় এক সেকেণ্ড বা অর্দ্ধ সেকেণ্ড নির্দ্দেশিত না করিয়া ইহা প্রয়োজনানুসারে এক সেকেণ্ডের লক্ষ বা নিযুত ভাগ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশিত করিতে পারে।

এই সমস্ত স্পন্দনক্ষম ক্রীষ্টালের অনন্ত কার্য্যকরী সম্ভাবনা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে কোয়ার্টস্-এর (quartz) দানাকেই সর্ব্বাংশে উপযোগী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। নানা আকৃতির দানা লইয়া পরীক্ষা করিবার ফলে অবশেষে ইঞ্চিখানেক লম্বা ও কয়েক ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট অঙ্গুরীয়কের আকৃতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইল। "বেল্ টেলিফোন ল্যাবরেটরী"র আটতালার একটি ঘরে এইরূপ চার খণ্ড ক্রীষ্টাল আছে। ইহাদের তিনটি, এক সেকেণ্ডকে এক লক্ষ ভাগে বিভক্ত করিতে পারে। চতুর্থটি সামান্য একটু পৃথক হারে চলিয়া অপর তিনটির সময়ের সংশোধকরূপে কাজ করে। অধিক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে কাজ করিতে হইলে স্পন্দনসংখ্যা কমাইতে হয়, এই উদ্দেশ্যে বায়ু-শূন্য নলের (sub-multiple generators) পরিক্রমা (circuit) ব্যবহার করিয়া একটু জটিল প্রক্রিয়াতে স্পন্দনসংখ্যা কমান হইয়া থাকে। একবারে অধিক না কমাইয়া, প্রথমবারে ১,০০,০০ হইতে ২৫,০০০-এ, দ্বিতীয় বারে ২৫,০০০ হইতে ৫০০০ এ, এবং তৃতীয় বারে ৫,০০০ হইতে ১০০০-এ নামান হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে স্পন্দনসংখ্যার মান হিসাবেই এই যন্ত্রের উদ্ভব ও পরিণতি হইয়া থাকিলেও, বস্তুতঃ ইহা সময়েরও মান বটে। স্পন্দন-দ্রুতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০০০ হইলে, প্রত্যেক স্পন্দনে এক সেকেণ্ডের ঠিক ১০০০ ভাগ সময় লাগে। স্পন্দনের সংখ্যা গণনা করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিলেই বেশ নির্ভুলরকমের ঘড়ি পাওয়া গেল। ক্রীষ্টাল খণ্ডের স্পন্দন-দ্রুতি যে পরিমাণ নিয়মিত হইবে,

এই ঘড়িও সেই পরিমাণ শুদ্ধ বা নির্ভুল সময় দেখাইবে. ক্রীষ্টালের তালে তালে আবর্ত্তন করে, এইরূপ একটি বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করিয়া, উপযুক্ত কল-কব্জার সহোযো উহাদ্বারা ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া আমরা প্রয়োজনানুরূপ সময়-নির্দ্দেশক ঘড়ি প্রাপ্ত হই। ল্যাবরেটরীতে
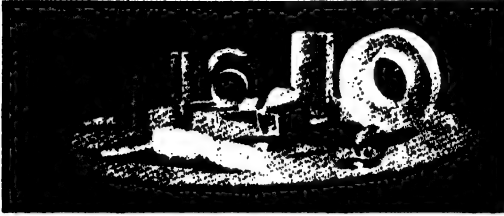
পরীক্ষার জন্য ক্রীষ্টালগুলিকে এইরূপ বিভিন্ন আকারে কাটা হইয়াছিল; আলোচ্য অঙ্গুরীয়কটি সকলের ডান দিকে দেখান হইয়াছে।

ব্যবহৃত এই ধারণের ঘড়িতে সেকেণ্ড নির্দ্দেশ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রতি-দিন ওয়াশিংটন নগরের নৌ-বিভাগের বিমান-বীক্ষণাগার (Naval Observatory) হইতে নক্ষত্রের মধ্যাকাশ অতিক্রমের সময় দেখিয়া যে সঙ্কেত প্রেরণ করা হয়, তাহার সহিত এই ঘড়ি মিলাইয়া সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। দেখা গিয়াছে, এইরূপ সংশোধন না করিলেও এই সব ক্রীষ্টাল পরিচালিত ঘড়িতে সম্বৎসরে ১০ সেকেণ্ডের অধিক সময়ের ব্যতিক্রম হয় না। এই ক্রীষ্টালগুলির স্পন্দন-দ্রুতি উত্তাপের তারতম্যে অতি সামান্য মাত্রায় পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র; যাহা হউক এটুকুও দূর করিবার জন্য এক প্রকার স্বতঃক্রিয়ার সাহায্যে (antomatically) উহার উষ্ণতা ১ সেণ্টিগ্রেড্ ডিগ্রির একশতাংশের মধ্যেই স্থির রাখা হয়।

এই ক্রীষ্টাল খণ্ডের স্পন্দনকে আদর্শ বা মান হিসাবে গ্রহণ করা যায়। টেলিফোনের তারযোগে কিম্বা অন্যবিধ উপায়ে ইহার স্পন্দনগতি দেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ করা যাইতে পারে। অতএব দেশের যে কোনও স্থানে এই প্রকার ক্রীষ্টাল-পরিচালিত ঘড়ি থাকিলে, বেল্ টেলিফোন ল্যাবরেটরীর ক্রীষ্টাল-স্পন্দনের মানের সহিত তুলনা করিয়া তাহার সময়-সংশোধন করা সম্ভব হয়।

আবার, দেশের যে কোন স্থানে নির্দ্ধারিত স্পন্দন-দ্রুতিতে কাজ করিবার আবশ্যক হইলে, এই কোয়ার্টস্-ক্রীষ্টালের অঙ্গুরীয়কের যাদুকরী প্রভাবে তাহা সুসাধ্য হয়। আজকাল, অনেক বড় বড় বেতার প্রেরক ষ্টেশনের স্পন্দনদ্রুতি ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ইহার সাহায্যেই নিয়ন্ত্রিত করা হয়। দেশের যে কোনও স্থানে স্পন্দন-মান বা সময়-মান প্রস্তুত করিতে হইলে বা তুলনা করিতে হইলে, এই এক খণ্ড ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়কের সাহায্যেই তাহা করা যাইতে পারে, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার। শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও নানাভাবে ইহার ব্যবহার হয়।

বর্ত্তমানে অতি বৃহৎ বৃহৎ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক শক্তির মূলে দেখা যায়, অতি ক্ষুদ্র বা সামান্য উপকরণ ক্রিয়া করিতেছে। এই সমস্ত সামান্য উপকরণেই যে কত প্রচণ্ড শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময় লাগে। এই অতি সাধারণ ক্ষুদ্র ক্রীষ্টাল-বলয়, কালই যাহা নিতান্ত জড় পদার্থ মাত্র ছিল এবং যাহার সম্ভাবনার বিষয় আমাদের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল, আজ তাহা নানা উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য অশেষ প্রকার কাজে লাগিতেছে। নিপুণ-বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ইহা এখন একটি প্রকাণ্ড নিয়ামক শক্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বিবিধ

অভিনব সময়-কুঞ্জী

মূল্যবান ধন-সামগ্রী বা দলিলপত্র সময়-কুঞ্জী দ্বারা সুরক্ষিত থাকিলে, দস্যুর আদেশে খাজাঞ্চী বা অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত কুঞ্জী খুলিতে চেষ্টা করিলেও

১ম চিত্র। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে খুলিবে না। দস্যুর পক্ষে অবশ্য নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা অসম্ভব; কাজে কাজেই তাহার অপহরণ-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। চিত্রে এই ধরণের কয়েকটি কুঞ্জী দেখান হইয়াছে।

২য় চিত্র। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

১ম চিত্র : ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের উপযোগী অতিরিক্ত নগদ মুদ্রা রাখিবার সময়-কুঞ্জী-ওয়ালা সিন্দুক। অতিরিক্ত মজুদ-টাকা নীচের থাকে সময়-কুঞ্জী দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

৩য় চিত্র।

২য় চিত্র : টাকা বাহির করিবার আবশ্যক হইবার পূর্ব্বেই খাজাঞ্চী সিন্দুকের নীচের থাকের ডায়াল বা চক্র ঘুরাইয়া দিতেছে ; কিন্তু এখন হইতে নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ না হইলে কোন ক্রমেই এই সিন্দুক খোলা যাইবে না।
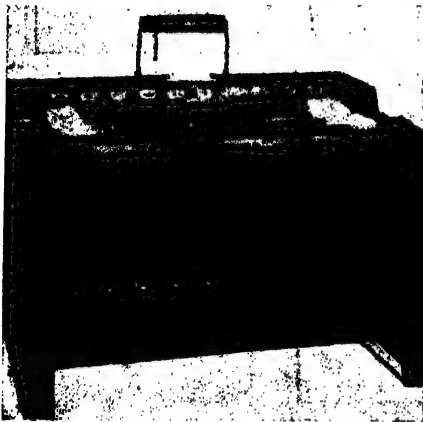
৪র্থ চিত্র।

কোন দস্যু মজুদ-টাকা আত্মসাৎ করিবার জন্ত জোর-জুলুম করিলেও কোন ফল হইবে না ; তালার উপর একটি লেবেল দেখিয়া সে বুঝিতে পারিবে, কতক্ষণ পরে উহা খুলিতে পারা যাইবে। কিন্তু দস্যুর 'ব্যবসায়' এরূপ যে, নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সে পারে না। কাজে কাজেই খালি হাতে চম্পট দেওয়া ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই।

৩য় চিত্র : খাজাঞ্চীকে যখন পিস্তল দেখাইয়া দস্যু সিন্দুক খুলিতে বলে, তখন বাধ্য হইয়াই তাহাকে সিন্দুকের চক্র ঘুরাইতে হয়। যদি শুধু অক্ষর মিল করিয়াই তালা খোলা যাইত, তবে অনেক সময় দস্যুর মনস্কামনা সিদ্ধ হইত। কিন্তু সময়-কুঞ্জী-দ্বারা সুরক্ষিত সিন্দুকের চক্র ঘুরাইয়া অক্ষর মিল করিয়া দেওয়ার পর হইতে কলকব্জা চলিতে আরম্ভ করে ; আর নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ না হইলে উহা কিছুতেই খোলা যায় না। উপরে একটি সঙ্কেত দেখিয়া দস্যু ইহা বুঝিতে পারে। এক প্রকার বিলম্বিত ক্রিয়ার কুঞ্জীতে এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, চক্র ঘুরাইলেই গোপনে অপর আফিসে তাহার খবর পৌঁছিয়া যায়।

৪র্থ ও ৫ম চিত্র : ব্যাঙ্কে ও কারবার-আফিসে যাহাতে মূল্যবান কাগজ-পত্র ও নগদ মুদ্রা চোরে লইতে না পারে, কিম্বা বাজে লোকে ঘাঁটাঘাঁটি করিতে না পারে, এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বামে একটি খোলা "রেকর-ডেস্ক" ও দক্ষিণে একটি বন্ধ "রেকর-ডেস্ক" সিন্দুকের চিত্র দেখান হইতেছে। চক্র ঘুরাইয়া বোতামটি টিপিলেই অল্প সময়ে এই সিন্দুক বন্ধ করিতে বা খুলিতে পারা যায়।
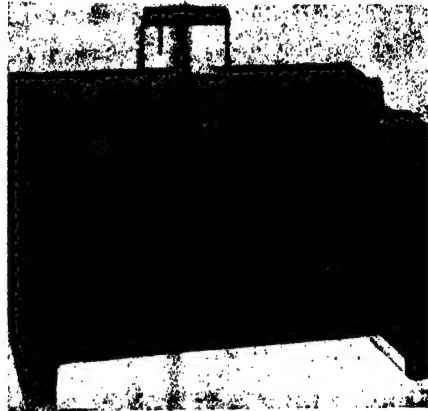
৫ম চিত্র।

রান্নায় ভিটামিন-ক্ষয়

খাদ্য রন্ধন করিবার সময় কয়েক ভাবে ভিটামিন ক্ষয় হয়। উত্তাপে পুড়িয়া কিছু ভিটামিন নষ্ট হইতে পারে, কিম্বা (রান্নায় অতিরিক্ত জল ব্যবহার করা হইলে) রান্নাশেষে পরিত্যক্ত জলীয় পদার্থের সহিত দ্রবীভূত অবস্থায় খানিকটা ভিটামিন চলিয়া যায়। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের Home Economics Bureau বা গৃহস্থালীর ব্যয়-নীতি-সংক্রান্ত সজ্ঘ মনে করেন যে, এই অপচয়ের পরিমাণ নির্ভর করিতেছে, রান্না করিতে কত সময় লাগে তাহার উপর, পাত্রমধ্যে বায়ু আছে কিনা তাহার উপর, এবং সর্ব্বোপরি ভিটামিনের দ্রবণ-ক্ষমতার উপর।

ভিটামিন 'বি' 'সি' এবং 'জি' সহজেই জলে দ্রবীভূত হয় ; ভিটামিন 'সি' সহজেই উত্তাপে পুড়িয়া নষ্ট হয় ; ভিটামিন 'বি' অতি দীর্ঘকাল জলমধ্যে ফুটাইলে নষ্ট হয় বটে, কিন্তু ফুটন্ত জলে এক ঘণ্টা কাল রাখিলেও বিশেষ নষ্ট হয় না ; ভিটামিন 'বি' ও 'সি' উভয়ই ক্ষারময় স্থানে যত শীঘ্র নষ্ট হয়, অম্লময় স্থানে তত শীঘ্র হয় না।

ভিটামিন 'এ' জলে সামান্ত পরিমাণ দ্রবীভূত হয় মাত্র; এবং সচরাচর রান্না করিতে বা সেঁকিতে যে উত্তাপ ব্যবহৃত হয়, তাহাতেও সহজে নষ্ট হয় না। তবে, ভাজিবার সময় উষ্ণতা আরও অধিক হয় বলিয়া ইহা নষ্ট হইয়া যায়; তাহা ছাড়া অম্লজান বা অক্সিজেনের সংস্পর্শে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলেও ইহা নষ্ট হয়। ভিটামিন 'ডি' 'জি' এবং 'ই' বেশ তাপ সহ্য করিতে পারে—সাধারণ রন্ধনের উত্তাপে ইহাদের কিছু হয় না।

ভিটামিনের প্রাচুর্য্য হিসাবে যে কোন পক্ব খাদ্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ অবশ্য উক্ত দ্রব্যটি রন্ধনের পূর্ব্বে স্বাভাবিক অবস্থায় উহাতে কি পরিমাণ ভিটামিন ছিল তাহার উপর নির্ভর করিবে। রন্ধনের পরেও টোমাটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' থাকে; অনুমান হয়, রন্ধনকালে টোমাটোর অম্লতা ইহার স্বাভাবিক উচ্চ-হারের ভিটামিন 'সি' রক্ষা করিতে অনেকাংশে সহায়তা করে।

মোটামুটি বলিতে গেলে, অল্প উষ্ণতায় অধিকক্ষণ ধরিয়া রন্ধন করিলে ভিটামিনের যে পরিমাণ অপচয় হয়, অধিক উষ্ণতায় রাখিয়া অল্পক্ষণে রন্ধন শেষ করিলে অপচয় তদপেক্ষা কম হয়। এতদ্ব্যতীত, যথাসম্ভব অল্প জল ব্যবহার করিয়া (বা, সম্ভব হইলে মোটেই জল না দিয়া) রন্ধন করিলে ভিটামিনের ক্ষয় কম হয়। এই কারণে যথাসম্ভব অল্পকাল ব্যবহার করিয়া অধিক তাপে অল্পক্ষণে রন্ধন শেষ করাই প্রশস্ত। রন্ধনশেষে অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ অবশিষ্ট থাকিলে তাহা সুরুয়া বা অন্ত কোন প্রকারে ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়। জলীয় বাষ্প বা ষ্টীমের সাহায্যে রন্ধন করিলে সময়ও অল্প লাগে, আর জলও অধিক ব্যবহার করিতে হয় না, এজন্য অনেকেই এই উপায়ে রন্ধন করা অধিকতর স্বাস্থ্য-নীতিসম্মত মনে করেন।

ছাপা-কাগজের পুনরায় ব্যবহার

আমেরিকায়, টেলিফোনের পুরাতন ডাইরেক্টরীগুলি ঐ বিভাগের কর্ম্মচারীরা নূতন ডাইরেক্টরী দিবার সময় ফেরত লইবার জন্য এত ব্যগ্র হয় কেন? হইতে পারে, কেহ ভুলক্রমে পুরাতন ডাইরেক্টরীর নম্বরদৃষ্টে টেলিফোন করিয়া বিভ্রাট বাধাইয়া সময় নষ্ট করিবে, এই জন্যই উক্ত কর্ম্মচারীদের এই সতর্কতা। কিন্তু নূতন ডাইরেক্টরী প্রকাশিত করিবার সময় প্রতিবারে পুরাতন ডাইরেক্টরীর যে স্তূপ জমিয়া ওঠে, সেগুলির সহিত রাসায়নিক গবেষণারও যোগাযোগ আছে।

বহুকাল যাবৎ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পুরাতন কাগজ হইতে ছাপার কালী মুছিয়া ফেলিবার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতেছে। সময় সময় কতকটা সন্তোষজনক ফলও পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রায় ছাপার কালিতেই অঙ্গারের যে অতি সূক্ষ্ম কণিকা থাকে, তাহা দূর করিতে এত অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হয় যে, ছাপা-কাগজের কালিমা-মোচন এতদিন মোটেই লাভজনক হয় নাই।

হঠাৎ একজনের মাথায় আসিল সহজ ও সস্তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মুছিয়া ফেলা যায় এরূপ কোন কালি ব্যবহার করিলেই ত চলে। যাহা হউক, এইরূপ গুণযুক্ত কালি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই ভাবিয়া দেখা গেল, এমন কি জিনিষ ছাপান যাইতে পারে, যাহার জন্য প্রচুর পরিমাণে কাগজ আবশ্যক হইবে, এবং সময় সময় পুরাতন পুস্তকগুলি সংগ্রহ করাও কঠিন হইবে না। দেখা গেল, টেলিফোনের ডাইরেক্টরীই এ কাজের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে। অতএব, টেলিফোন কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করা হইল যে, উপরোক্ত গুণবিশিষ্ট কালি দ্বারা তাহাদের ডাইরেক্টরী ছাপান হইবে। এই কালিতে অঙ্গারচূর্ণ না থাকায়, সহজেই তরল হাইপো-ক্লোরাইড ও সালফার-ডাই-অক্সাইড দ্বারা ইহার মসীবর্ণ বিদূরিত করা যায়।

উক্ত ডাইরেক্টরীর পৃষ্ঠার মসী-মোচনের প্রক্রিয়া এইরূপ: প্রথমতঃ একটি কলে মলাটগুলি ছিঁড়িয়া ফেলে, এবং পৃষ্ঠাগুলি খুলিয়া সাদা কাগজ হইতে রঙিন কাগজ পৃথক করে। অতঃপর অন্য কলের সাহায্যে কাগজগুলি পিষিয়া তুলার মত করিয়া ফেলে, এই তুলার মত পদার্থের উপর সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়া হয়, তাহাতে কালির রঙ উঠিয়া গিয়া পরিষ্কার সাদা ধূনিত তুলা বাহির হইয়া পড়ে। অবশেষে ইহা কাগজের কলে ফেলিয়া, ইহা হইতে সম্পূর্ণ নূতন কাগজ পাওয়া যায়। প্রধানতঃ কাঠের শাঁস হইতে যে কাগজ উৎপন্ন হয়, সেই কাগজই এই প্রক্রিয়ার পক্ষে উত্তম।

বিমানবিহারীদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা

উড়ো-জাহাজের অভিজ্ঞতা হইতে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইতেছে। দুই বৎসর যাবৎ পরীক্ষা করিয়া 'ইউনাইটেড্ এয়ার লাইন্স্' এই বিবরণ দিতেছেন যে, শীতের কয়েক মাসে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভূপৃষ্ঠের শীতল বায়ুর উপরিভাগে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বায়ুর স্তর লক্ষিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে, সাধরণতঃ এরূপ মনে করা হইত যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধের দিকে প্রতি হাজার ফিটে প্রায় ৩·° ডিগ্রী (ফার্ণ হাইট) করিয়া উষ্ণতা কমিতে থাকে। কিন্তু বিমান-বিহারীরা ইহার বিপরীত ব্যাপারই লক্ষ্য করিয়াছেন। এমন কি অনেক সময় তাঁহারা উর্দ্ধস্তরের ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ৪·° ডিগ্রী পর্য্যন্ত অধিক উষ্ণতা লক্ষ্য করিয়াছেন।

উর্দ্ধস্তরের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আরও সুশৃঙ্খলায় সহিত পরীক্ষা চলিতেছে। রেডিও-টেলিফোনের সাহায্যে বিমান-বিহারীদের সহিত এতৎসংক্রান্ত সংবাদ আদান-প্রদান করা হইয়া থাকে। উর্দ্ধস্তরের এইরূপ তাপ-বৈপরীত্যের কারণ সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতেছে যে: (১) সম্ভবতঃ উষ্ণমণ্ডল হইতে উষ্ণবায়ু উপরের দিকে সঞ্চালিত হয়, (২) কিম্বা ভূপৃষ্ঠের নিকটে শীতল বায়ুর একটা স্তর আছে, (৩) অথবা তাপ-বিকীরণের দরুণ বায়ুমণ্ডলের নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া পড়ে।

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

[১]

পৌষ মাসের শুক্লপক্ষ রাত্রি।

কিন্তু দুদিন হইতে বর্ষা নামিয়া, আকাশকে যে ভাবে ঘনঘটায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, চন্দ্রের আর কোন অস্তিত্বই যেন নাই। একে অসময়ে, তাহাতে শীতকালে বর্ষার উপদ্রবে, মানুষের কষ্টের আর সীমা নাই, কিন্তু সে কষ্টকেও অগ্রাহ্য করিয়া, পল্লীগ্রামের কর্দ্দমাক্ত পথ বহু কষ্টে অতিক্রম করিয়া, গ্রামের ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে বহুলোক আসিয়া জমিদার-বাড়ীর বহির্বাটিতে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। ভৃত্যেরা বাড়ীর সব কয়টি আলো জ্বালিয়া প্রকৃতির উপর প্রতিশোধ তুলিয়া, বাড়ীটিকে আলোময় করিয়া রাখিয়াছে।

আকাশের বর্ষণ আর এখন ছিল না, তাই ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র লোকে জটলা পাকাইয়া বসিয়া ছিল। বাড়ীর ভৃত্যদেরও আজ আর কোন কাজ নাই; কেহ এখানে কেহ ওখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যেন প্রহরের পর প্রহর গণিতেছিল। ঘরের সকল কাজ হইতে আজ তাহাদের ছুটি; ঘরের গৃহিণী,—জমিদার বাবুর পত্নী আজ সংসার হইতে চিরদিনের জন্য ছুটি লইয়া চলিয়াছেন। আজ একটি দিনের জন্য প্রতিদিনের নির্দ্ধারিত সংসারের সকল কাজ নাই বা হইল! আজ তাই প্রভু ভৃত্য সকলের ছুটি।

রান্নাঘরে উনুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রায় নিভিয়া আসিয়াছে, ঠাকুর বারকয়েক তাহার পানে তাকাইয়া অবশেষে স্তব্ধ ভাবে চুপ করিয়া দরজার পাশে বসিয়া আছে। সম্মুখের বড় ঘরটির বারান্দার এক কোণে বসিয়া আছে বাড়ীর ঝিয়েরা। গৃহমধ্যে বিস্তীর্ণ শয্যার উপরে তাহাদের প্রভুপত্নীর আজ শেষ নিদ্রার পালা,—এই নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য ডাক্তার কবিরাজের এখনও গৃহমধ্যে বসিয়া প্রবল আয়োজন চলিয়াছে,—মানুষের অহংকারের যে আর শেষ নাই, প্রতি পদে পদে, বিধানকর্ত্তা বিধাতাকেও যে তাহারা জয় করিতে চাহে, এ গৃহে যেন আজ তাহারই নির্লজ্জ প্রকাশ! ডাক্তারটি তাঁহার জ্ঞানের সীমানা বুঝিয়া এতক্ষণে উঠিয়া একটি চেয়ারের উপর শ্রান্ত ভাবে বসিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু, খল-বড়ি লইয়া বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়ের ঠকঠকানি এখনো চলিয়াছে।

শয্যার এক প্রান্তে, কতকগুলি স্তূপীকৃত বালিশে ভর দিয়া যুবক গৃহস্বামী হাঁটু দুইটিতে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। একবার মুখ তুলিয়া পত্নীর পানে তাকাইয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া, নতমস্তকে গৃহমধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল।

রাত্রি গভীর হইতেছে, আজ শেষ রাত্রি, আর কত দেরী? দেরী আর কই! যুবক থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তকাল কবিরাজের ঠকঠকানির পানে চাহিয়া দেখিল, তারপর মৃদুস্বরে কহিল, বৃথা কষ্ট করছেন কবরেজ মশাই, রেখে দিন,—

বৃদ্ধ কবিরাজ মাথা তুলিয়া পলকের জন্য একবার গৃহস্বামীকে দেখিয়া লইলেন, মুহূর্ত্ত কাল হাত দুইটি তাঁহার বিরাম হইয়াই, পরমুহূর্ত্তেই আবার চলিতে লাগিল—ঠক্ ঠক্ ঠক্।

মুক্ত দ্বারপথে একটা আলোর রেখা দেখা দিল। দাসীর হাতে আলো দিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বধূর শাশুড়ী পূজা সারিয়া মন্দির হইতে আসিতেছেন, অশ্রুসিক্ত মুখখানি ঢাকিবার জন্য মাথার এক পাশের কাপড়খানি একটু বেশি বাড়ান, হাতে ঠাকুরের চরণামৃত ও প্রসাদী ফুল। ঘরে ঢুকিয়া ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে নত হইয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা বধূর মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন; বধূর মাথায় এবং ঠোঁটে একটু চরণামৃত ছোঁয়াইয়া যে ছেলেটি বসিয়া হাওয়া করিতেছিল, তাহার হাত হইতে পাখাটা লইয়া, তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে অবসর দিয়া, শয্যাপ্রান্তে বসিলেন। সারাদিন ধরিয়া ঠাকুরের পদতলে মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া, যে ভীষণ কান্নাটাই বৃদ্ধা কাঁদিয়াছেন, তাঁহার চোখে মুখে তাহার সকল চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। নতমস্তকে হাঁটিতে হাঁটিতে পুত্র একবার মাথা তুলিয়া মায়ের মুখের পানে চাহিল, তাহার পর একবার গিয়া খোলা বারান্দায় একটু দাঁড়াইল,—আবার আসিয়া ঘরের ভিতর হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

দূর হইতে অস্ফুট স্বরে মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ এদিকে ভাসিয়া আসিতেছিল, মা…মা…মা·

মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর দুই বৎসরের শিশুটিকে তাহার ঝি আজ আর কিছুতেই শান্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, প্রতিবেশিনীদের সকলের সমবেত চেষ্টাও বার বার ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল; একবার যদি শিশুটি একটুখানি চুপ করে, আবার পরক্ষণেই দ্বিগুণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে, তাহার করুণ কণ্ঠের মা, মা কান্নার প্রতিবেশীদের চক্ষুতে অশ্রু আজ আর বাধা মানিতেছিল না,—কেন এত বুকফাটা কান্না কে জানে! অতটুকু শিশুটাও কি বুঝিতে পারিয়াছে,—তাহার মা তাহাকে চিরদিনের জন্য অনাথ করিয়া রাখিয়া আজ চলিয়া যাইতেছে।

মা…মা……মা—কেবল মা…মা…মা…

শিশুকণ্ঠের এই করুণ আর্ত্তনাদে বাহিরের লোকেরা সকলে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। মায়ের কানেও বুঝি এতক্ষণে এই ব্যাকুল আহ্বান প্রবেশ করিল, নিদ্রাচ্ছন্ন চক্ষু দুইটি রোগিণী যেন বহু কষ্টে একটুখানি মেলিয়া তাকাইলেন, শাশুড়ী বধূর পানে তাকাইয়াই ছিলেন, এইবার ঈষৎ নত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহ-ভরে কহিলেন, মা, মা, ঘুম ভাঙ্গল মা? মা? একটু দুধ খাবে? খাবে না? আচ্ছা, একটু ফলের রস খাও,—কেমন? না? আচ্ছা থাক, কি চাই তবে মা, বল?

বধূ খানিকক্ষণ তেমনই ভাবে শুধু তাকাইয়া রহিল, ঠোঁট দুইটি ঈষৎ একটু নড়িল বোধ হয়, বোধ হয় কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অবশ কণ্ঠে স্বর ফুটিল না। দুই তিনবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর অবশেষে চক্ষু দুইটি দিয়া তাহার ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সারাদিনের অসহনীয় বেদনা-ভোগের পর, এ দৃশ্যে শাশুড়ী আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, মুখে কাপড় গুঁজিয়া বধূর শয্যাপ্রান্তেই লুটাইয়া পড়িলেন। ঘাড়খানি আস্তে আস্তে একটু ফিরাইয়া বধূ স্বামীর পানে তাকাইল, অতি আদরের সহিত পত্নীর চোখের জল নিজের কোঁচার কাপড়ে মুছিয়া, মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্বামী কহিল, 'কি চাই সুধা? খোকনকে? খোকনকে দেখবে?'

বধূর অশ্রুজল অবিরামভাবে পড়িতেই লাগিল। ভাষা যাহার আজ ফুরাইয়া গিয়াছে, মনের কথা সে কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে! নিজেকে প্রাণপণে সম্বরণ করিয়া, পত্নীর বালিশের উপর মাথা রাখিয়া, দুইহাতে পত্নীর মুখখানি কাছে টানিয়া, পরিষ্কার কণ্ঠে সুরেন্দ্র কহিল, 'কেঁদ না সুধা, এই ত' মা রয়েছেন তোমার পাশে, খোকনকে আনতে গেছেন, আমি ত' আছিই, কাঁদছ কেন, কেঁদ না.—এই যে খোকন।'

সুরেন দ্বারপ্রান্তে উঠিয়া গিয়া পুত্রকে বুকে করিয়া শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। কবিরাজ মহাশয়ও উঠিয়া তাঁহার খল-বড়ি লইয়া রোগিণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভীষণ তিক্ত কটু ঔষধ, সুরেন হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে জানাইলেন, আর কোন প্রয়োজন নাই, বৃথা আর কষ্ট দেওয়া না হয়।

খোকন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আস্তে আস্তে তাহাকে পত্নীর পাশে শোয়াইয়া দিয়া সুরেন বালিশের উপর ঝুঁকিয়া পত্নীর অশ্রুজল আবার মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে কহিল, 'খোকন এসেছে, এই যে তোমার পাশে শুয়েছে সুধা, চেয়ে দেখ—'

যে কণ্ঠে এতক্ষণে বহু কষ্টেও কোন শব্দ উচ্চারিত হয় নাই, সেই কণ্ঠেই সহসা একটা জড়ানো জড়ানো অস্পষ্ট শব্দ ফুটিয়া উঠিল, গৃহস্থিত সকলে চমকিয়া উঠিয়া শয্যার পানে তাকাইল, সুরেনও কান পাতিয়া অতি নিবিষ্ট হইয়া শুনিল, 'খোকন, খোকন, সোনা, পান্না মাণিক।'

[২]

তাহার পর দীর্ঘ পাচ ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

একজনের অভাবে সংসারে প্রায়ই তাহার স্থান শূন্য পড়িয়া থাকে না, একজন যায়, আর একজন আসিয়া সে স্থান পূর্ণ করে। গাছের ফুলটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, আবার সে গাছ নূতন নূতন ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠে, খাল বিল গ্রীষ্মে শুকাইয়া শোভাহীন হয়, আবার নববর্ষার নব জলে নবীন রূপে উচ্ছ্বসি হইয়া, ফুলিয়া ফাঁপিয়া এপারে ওপারে আনন্দের পরশ ছোঁয়াইয়া বহিয়া যায়।

সুধার অভাবে যে সংসার একদিন শূন্য হইয়া গিয়াছিল, নির্ম্মলা আসিয়া সে সংসার আবার ভরিয়া তুলিল।

সংসারে আবার সকলই ঠিক সেই রকমই হইল সত্য, কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা কিসের ব্যবধান রহিয়াই

গেল। যে যায় সে চলিয়া যায় সত্য, কিন্তু মাঝখানে তাহার যে একটি জীবনস্মৃতি রাখিয়া যায়, গুরুভার পাষাণের মত মাঝখানে থাকিয়া, দুই পক্ষের গভীর মিলনে সে কেবলই বাধার সৃষ্টি করে।

নির্ম্মলার কেবলই মনে হইত, সে যেন কিছুই পাইতেছে না, সংসারের সকল কিছুতেই তাহারই যে পূর্ণ অধিকার, তাহা সে যেমন জানিত, গৃহের অন্য সকলেও জানিত তেমনই। কিন্তু তথাপি, কোন কিছু করিতে গেলেই তাহার মনে হইত, গৃহের দাসদাসী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলে যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছে। যেন প্রতিক্ষণেই সেই স্বর্গগতার সঙ্গে তাহার তুলনার আলোচনাই সকলে করিতেছে।

ফলে এই হইল, পুরাতন কাহাকেও নির্ম্মলা সহিতে পারিল না, দাসদাসীরা কেহ বিদায় লইয়া দেশে গেল, কেহ অন্যত্র চাকুরির সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল। আশ্রিত ীয়-স্বজনেরা কেহ কাশীবাস করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য ব্যগ্র হইলেন, কেহ অন্য আত্মীয়-স্বজনের জন্য সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এইরূপে এক প্রকার শূন্য গৃহেই নির্ম্মলা তাহার অধিকার স্থাপন করিল, শাশুড়ী পূর্ব্বেই বধূর অনুগামিনী হইয়াছিলেন, সুতরাং সেদিক দিয়া নির্ম্মলার আশঙ্কার কোন কারণ রহিল না।

সকলেই গেল, কেবল বহু দুঃখ ও অপমান বোধ করিয়াও একজন কিছুতেই গেল না, সে সুধার শিশুপুত্র পানুর ঝি কামিনী। সুধার রোগের সময় হইতেই সে পানুকে বুকে বুকে রাখিয়া মানুষ করিতেছিল। কামিনীকে নির্ম্মলা যদি বা সহিতে পারিত, কিন্তু পারিত না কেবল তাহার ডাকের জন্যই। অন্য সকলে নির্ম্মলাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত, কিন্তু কামিনী তাহাকে 'নতুন মা' ডাকিয়া সর্ব্বদাই কেবল পুরাতনের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিত।

যাহা হউক, এমনি করিয়া, সকল কিছু নূতনের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের সংসার আবার নূতনরূপে চলিতে আরম্ভ করিল।

(ক্রমশঃ)

আর্থিক অবস্থার খতিয়ান

প্রদেশ ও বিভাগ	মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	ঘাট্‌তি (টা
বঙ্গদেশ	১১,০২,৩৩,০০০	১১,৭১,৫০,০০০	৬৯,১৭,০০০
আসাম	২,২৮,৮৬,০০০	২,৮৪,০৬,০০০	৫৫,২০,০০০
বিহার	৫,৩১,০০,০০০	৫,৪৫,০০,০০০	১৪,০০,০০০
যুক্তপ্রদেশ	১২,৭০,০০,০০০	২,৮৭,০০,০০০	১৭,০০,০০০
বোম্বাই	১৪,৩৩,৩০,০০০	১৪,৬২,৬০,০০০	২৯,৩০,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৪,৮০,৭৩,০০০	৬,১৩,৭৩,০০০	১,৩৩,০০,০০০
রেলওয়ে	১৩,৫০,০০,০০০	১৫,৪০,০০,০০০	১,৯০,০০,০০০
			উদ্বৃত্ত
পঞ্জাব	১০,৩৯,১৬০০০	১০,৩৮,৬০,০০০	৫৬,০০০
মাদ্রাজ	১৬,৪৪,৮০,০০০	১৬,৫৩,৬৫,০০০	৪,৮৫,০৬০

শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষার ক্রম

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষায় আমাদের ছেলেদের কোনও উন্নতি হইতেছে না, তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন—এই শ্রেণীর আলোচনা দেশের প্রায় সকলের মুখেই আজকাল শোনা যায়। এই সকল আলোচনায় নানারকমের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব শোনা যাইতেছে এবং অল্প-বিস্তর পরিবর্ত্তন সাধিতও হইতেছে। কিন্তু শিক্ষার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা, এই ধরণের কোন প্রস্তাব হইতে পাওয়া যায় না।

শিক্ষার কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, মানুষ কেন শিক্ষা চায় তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। মানুষ কেন শিখিতে চায়, সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয়—"সে সর্ব্বদা স্বীয় অভীষ্ট লাভ অথবা স্বীয় অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যগ্র।" বস্তুতঃ, মানুষ সর্ব্বদা ইচ্ছার সেবক। এমন কোন মানুষ নাই যাহার কোন না কোন ইচ্ছা নাই। যাহাতে সেই ইচ্ছার পূরণ হইতে পারে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কিসে মানুষের ইচ্ছাপূরণ হওয়া সম্ভব তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, মানুষ কি কি ইচ্ছা করে তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

কিন্তু কোন্ মানুষের কি ইচ্ছা তাহা নির্ভুলভাবে দেখা খুব সহজ নহে। কারণ মানুষের আপন আপন ইচ্ছা তাহার মনের ভিতর লুক্কায়িত থাকে। তাহার (অর্থাৎ, ইচ্ছার) অভিব্যক্তি হয় মানুষের কর্ম্মচেষ্টায় বা প্রযত্নে। কাজেই, মানুষ কি কি ইচ্ছা করে তাহা জানিতে হইলে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কর্ম্মচেষ্টা লক্ষ্য করিতে হয়। বিভিন্ন কর্ম্মচেষ্টা হইতে যাহা লক্ষ্য করা যায় তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যেন মানুষ বিভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য লইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে যতই বিভিন্ন হউক না কেন, তাহাদিগকে (অর্থাৎ, উদ্দেশ্যগুলিকে) গম্ভীর ভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল উদ্দেশ্যের মূলে কার্য্যাক্ষমতা লাভ এবং জীবন রক্ষা করিবার ইচ্ছাই সর্ব্বপ্রধান।

কাজেই, যদ্দ্বারা মানুষ কার্য্যাক্ষমতা লাভ করিতে এবং জীবন রক্ষা করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভই মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, একথা বলা যাইতে পারে।

কার্য্যাক্ষমতা লাভ ও জীবনরক্ষার উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জ্ঞানের প্রয়োজন :

(১) কার্য্যাক্ষমতা কাহাকে বলে ?

(২) মানুষের জীবন বলিতে কি বুঝায় ?

(৩) জ্ঞান কাহাকে বলে ?

(৪) জগতের সমস্ত বস্তুর গুণাগুণ কি ?

(৫) কোন্ বস্তুর ব্যবহারে মানুষের কিরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব ?

(৬) কোন্ বস্তুগুলি মানুষের কার্য্যাক্ষমতা লাভের ও জীবনরক্ষার সহায়ক ?

(৭) যে বস্তুগুলি মানুষের কার্য্যাক্ষমতা লাভের ও জীবন-রক্ষার সহায়ক তাহাদের ব্যবহার ও উপার্জ্জন-বিধি কি কি ?

মানুষের কার্য্যাক্ষমতা ও জীবন কাহাকে বলে তাহার জ্ঞান যাহাতে হয়, তাহাকে 'মনুষ্য-তত্ত্ব' বলা যায়। জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা যাহাতে জানা যায় তাহাকে 'জ্ঞান-তত্ত্ব' বলে। সমস্ত বস্তুর গুণাগুণ যাহাতে জানা যায় তাহাকে 'বস্তু-তত্ত্ব' বলে। কোন্ বস্তুর ব্যবহারে মানুষের কিরূপ অবস্থা

হয় এবং কোন্ বস্তুগুলি মানুষের কার্য্যক্ষমতা লাভের ও জীবনরক্ষার সহায়ক, এই জ্ঞান লাভ যাহাতে হয় তাহাকে 'বস্তুগুণ-বিচারতত্ত্ব' বলা যায়। যাহাতে বস্তুগুলির যথাযথ উপার্জ্জন-প্রণালী ও ব্যবহার-প্রণালী পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম 'ব্যবস্থা-তত্ত্ব'। সুতরাং পাঁচটী তত্ত্বকে মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় বলা যাইতে পারে:

(১) মনুষ্য-তত্ত্ব,
(২) জ্ঞান-তত্ত্ব,
(৩) বস্তুতত্ত্ব,
(৪) বস্তুগুণ-বিচারতত্ত্ব, এবং
(৫) ব্যবস্থা-তত্ত্ব।

এই পাঁচটী তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে কোন মানুষকে যুক্তিযুক্ত ভাবে সম্পূর্ণ শিক্ষিত বলা যায় না। অথচ সহজে ঐ তত্ত্বগুলি বোধগম্য হওয়া সম্ভব নহে। ঐ তত্ত্বগুলি বোধগম্য করিতে হইলে, প্রয়োজন:

(১) ভাষা-বোধ
(২) মনোযোগ ও সত্য-নিরূপণের প্রাথমিক পন্থাজ্ঞান
(৩) কালের ব্যক্ত রূপের জ্ঞান
(৪) স্থানের ব্যক্ত রূপের জ্ঞান
(৫) ইন্দ্রিয়গুলির সম্পূর্ণ শক্তিশীলতা ও আংশিক পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা।

বালক সাধারণতঃ একটী বয়সবিশেষে উপনীত না হইলে তাহার ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন ও আংশিক পর্য্যবেক্ষণক্ষম হয় না। ইহারই জন্য, একটী বয়সবিশেষে উপনীত না হইলে বালককে উপরোক্ত কোন তত্ত্বোপদেশ দেওয়া সমীচীন নহে এবং ঐ বয়সের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত যাহাতে বালকের ভাষাবোধ, মনোযোগ, সত্য-নিরূপণের প্রাথমিক পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান, কালের ও স্থানের ব্যক্ত রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার পর বস্তু-তত্ত্ব ও জ্ঞান-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। ইহারই নাম 'শিক্ষার ক্রম'।

কাজেই, শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে ভাষা-বোধ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবস্থা-তত্ত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। জগতের লিখিত * ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে উপরোক্ত সমস্ত তত্ত্বগুলির যথাযথ জ্ঞান-সম্পন্ন কোন জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার জন্যই ইতিহাস এক একটী জাতির জলবুদ্বুদের মত উত্থান ও পতনের আখ্যায়িকা মাত্র। বিভিন্ন জাতিসমূহ রাষ্ট্রহিসাবে স্বাধীন হইলেও অর্থনীতি বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী।

কোন জাতি সুদীর্ঘ জীবনসম্পন্ন না হইলে মনুষ্য-তত্ত্ব প্রভৃতি পাঁচটী তত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, কারণ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা না জন্মিলে কোন বস্তুর মৌলিক অযুগ্ম উপাদান কি তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে এবং বিশেষ পর্য্য-বেক্ষণ-ক্ষমতা শতাব্দীর পর শতাব্দীর ভূয়োদর্শন হইতে উৎপন্ন হয়। যতদিন পর্য্যন্ত বস্তুর মৌলিক অযুগ্ম উপাদান সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যাবতীয় তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ভ্রম-প্রমাদ-পরিশূন্য হওয়া সম্ভব নহে এবং ততদিন বিজ্ঞানের নামে মনুষ্যজীবন-ধ্বংসকারী অজ্ঞানের খেলা চলিতে থাকিবে। এই অবস্থায় অভিমানাত্মক মোহে মুগ্ধ হইলে জাতীয় উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। কিন্তু যে জাতি স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানের অভাব সম্বন্ধে সজাগ, সে জাতি তত্ত্বজ্ঞানের অভাবযুক্ত হইলেও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকে। তাহার জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতগণ বিভিন্ন তত্ত্বের বিভিন্ন শাখার গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া ছাত্রের মত মূল জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপলব্ধি কতদূর অগ্রসর হইল তাহা লক্ষ্য করিতে থাকেন। এই সকল জাতির শিক্ষার ব্যবস্থায়, বিভিন্ন তত্ত্বের বিভিন্ন শাখার গবেষণায় নিযুক্ত পণ্ডিতগণের মিলিত তত্ত্বালোচনার আয়োজনের প্রয়োজন হয় এবং প্রকৃত পণ্ডিত-গণও এই প্রকার মিলন-সভায় নিজেদিগকে পণ্ডিত বলিয়া ঘোষণা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। অধিকন্তু, অপর কেহ তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলিলে লজ্জানুভব করেন। পণ্ডিতগণের এই প্রকার অবস্থাই শিক্ষার ক্রমোন্নতির পরিচায়ক। শিক্ষার অন্য কোন অবস্থা অবনতির পরিচায়ক এবং সে শিক্ষা জাতীয় কল্যাণের পক্ষে আপজ্জনক।

শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচনের ও শিক্ষাপদ্ধতির বিচারবিধি

শিক্ষণীয় বিষয় যথাযথভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে কিনা এবং তাহা যথাবিহিত প্রণালীতে ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করা হইতেছে কিনা, এবংবিধ পরীক্ষাকার্য্যের নাম শিক্ষণীয় বিষয় নির্ব্বাচন ও শিক্ষাপদ্ধতির বিচারবিধি।

* আমাদের হিসাবে ভারতবর্ষের ও চীনের ইতিহাস এখনও অলিখিত।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলির নির্বাচন হয় এবং তদনুযায়ী ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, হয় শিক্ষণীয় বিষয়-নির্বাচনে, না হয় শিক্ষা-প্রণালীতে অথবা উভয়তঃ কোন না কোন ভ্রম রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য দুইটী; যথা—কার্য্যক্ষমতা লাভ এবং জীবন রক্ষা। যদি ছাত্রগণ কার্য্যক্ষমতা লাভ করিতে এবং জীবন-রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচন এবং শিক্ষা-পদ্ধতি ভ্রমাত্মক।

কাহারও কার্য্যক্ষমতা লাভ হইয়াছে কিনা তাহার প্রধান পরিচয় তাহার স্বাবলম্বন শক্তিতে, যৌবনের দৈর্ঘ্যে এবং নিরপরাধ ও সন্তুষ্টিপূর্ণ জীবনে। যখন কেহ অপরের বিনা নির্দ্দেশে নিজ প্রযত্ন দ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তু কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে এবং তাহা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তখন তাঁহাকে স্বাবলম্বী বলা যাইতে পারে। যাঁহার জীবিকার্জ্জনের কার্য্য-পদ্ধতি অপরের নির্দ্দেশানুসারে নির্দ্ধারিত, তাঁহাকে স্বাবলম্বী বলা যায় না।

যাঁহারা ৫০ বৎসর বয়সেই রুগ্ন হইয়া প্রতিদিন আংশিক ভাবেও রোগের উপশমের জন্য সময়াতিপাত করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগের যৌবনের দৈর্ঘ্য ৫০ বৎসর বলিতে হইবে। বালক হিসাবে ও যুবক হিসাবে যিনি কার্য্যক্ষম তিনি মনুষ্য হিসাবে কার্য্যক্ষম নাও হইতে পারেন ইহা বলাই বাহুল্য; কারণ, সর্ব্ববিধ গুণ পরিস্ফুট না হইলেও মানুষ বালক ও যুবক হইতে পারে, কিন্তু "মানুষ" হয় না। প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, মানুষের জীবনে প্রথম বিংশতি বৎসরে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শক্তিশালী হয় না এবং ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণ শক্তিশালী হইবার পর অন্ততঃপক্ষে বিংশতি বৎসর ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ না করিলে কোনও বস্তুর বিবিধ অবস্থা সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা লাভ হয় না। পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা লাভ করিবার পরও বিষয়বিশেষের জ্ঞান লাভ করিতে অন্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর লাগে। কাজেই, যাঁহার যৌবনকাল ৫০ বৎসরের অধিক দীর্ঘ নহে তাঁহাকে কার্য্যক্ষম বলা যায় না।

শৃঙ্খলাবিরুদ্ধ কার্য্য সাধারণতঃ অপরাধ নামে অভিহিত হয়। কোন্ কার্য্য শৃঙ্খলাবিরুদ্ধ তাহার সংজ্ঞা দিতে হইলে বলিতে হয়, যাহা অপরের কার্য্যক্ষমতা লাভ ও জীবনরক্ষার কার্য্যের অসুবিধাকর, তাহাই শৃঙ্খলাবিরুদ্ধ। যে মানুষ নিজে কার্য্যক্ষম তিনি কখনও অপরের কার্য্যক্ষমতা-লাভের ও জীবন-রক্ষার কার্য্যের অসুবিধাকর কোন কার্য্য করিতে পারেন না। কাজেই, যে মানুষ সুব্যবস্থিত রাজ্যের রাজদ্বারে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হন তাঁহাকে কার্য্যক্ষম বলা যায় না।

সম্যক্ সক্ষমতা লাভ করিয়া মানুষ যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাতেই সে পরমোন্নতি লাভ করে ইহা বাস্তব সত্য। কাজেই, প্রকৃত কার্য্যক্ষম ব্যক্তি আপন আপন কার্য্যে একনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করেন। যাঁহারা অপরিণত বয়সে জীবিকার কোন পন্থায় নিপুণতা লাভ করিবার আগে একই সময় বিবিধ রকমের কার্য্যভার (যথা—শিক্ষা, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি) গ্রহণ করেন, অথবা প্রতিনিয়ত এক রকমের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য অন্য রকমের কার্য্য আশ্রয় করেন, তাঁহাদের একনিষ্ঠতার অভাব বলিতে হইবে এবং বাহ্যতঃ সন্তুষ্ট থাকিলেও বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট বলিতে হইবে। অবশ্য পরিণত বয়সে জীবিকার কোন পন্থাবিশেষের নিপুণতা লাভ করিয়া তদ্বিষয়ে অধ্যাপনা করা অথবা তদ্বিষয়ক উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্য আশ্রয় করা ঐকান্তিকতা এবং সন্তুষ্টির পরিচায়ক।

পরমায়ু কত দীর্ঘ হইলে মানুষ যথোপযুক্ত জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে বলা যাইতে পারে, তাহা বর্ত্তমান জগতে নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। মোটের উপর, মানুষ যদি ৭০ বৎসরের আগেই কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহা হইলে মানুষের জীবন নিষ্ফল হইয়াছে বলা যাইতে পারে; কারণ, ৫০ বৎসরের আগে বিষয়বিশেষের নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে—ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ৫০ বৎসরের পর অন্ততঃ আরও ২০ বৎসর কাল জীবিত না থাকিলে কোন সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যোচিত কাজ করা যায় না, তাহা বলা যাইতে পারে।

অতএব শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষা-পদ্ধতির যথাযথভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে কি না, অথবা শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কিনা, তাহার বিচার করিবার উপায় পাঁচটী, যথা-

(১) স্বাবলম্বী লোকের সংখ্যা,

(২) ৫০ বৎসর বয়স্ক নীরোগ লোকের সংখ্যা,
(৩) নিরপরাধ লোকের সংখ্যা,
(৪) সন্তুষ্ট লোকের সংখ্যা,
(৫) সত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থা

আমরা বলিয়াছি, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষা-পদ্ধতি অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থা যথাযথভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে স্বাবলম্বী, ৫০ বৎসর বয়স্ক নীরোগ, নিরপরাধ, সন্তুষ্ট এবং ৭০ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিতে হয়। কাজেই, ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যবস্থা যথাযথ কিনা তাহার বিচার করিবার জন্য উপরোক্ত পাচ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিব।

(১) স্বাবলম্বী লোকের সংখ্যা

ভারতবর্ষের অধিবাসীকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পর্য্যায়ে বিভক্ত করিলে দেখিতে পাই, যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জন চাকুরীজীবী এবং যাঁহারা অশিক্ষিত তাঁহারা শ্রমজীবী। শ্রমজীবীদিগের ভিতর শতকরা প্রায় ৮৫ জন এখনও কৃষক। অবশিষ্টাংশ শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যের শ্রমজীবী। গত ৩০ বৎসরের দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া গিয়া বিবিধ শ্রমজীবীর সংখ্যা এবং শিক্ষিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। এখানকার কৃষকদিগকে স্বাবলম্বী বলা যাইতে পারে, কারণ কৃষক-সন্তানেরা নিরক্ষর হইলেও তরুণ অবস্থাতেই তাহারা কৃষিকার্য্যে সামর্থ্য লাভ করে এবং সংস্কারানুসারে যথাসময়ে যথাবিধি বীজ বপন করিয়া অন্যের বিনা সাহায্যে প্রচুর শস্যোৎপাদন করে। অবশ্য তাহারা এই সংস্কার অথবা শিক্ষা কবে কাহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান জগৎ এখনও অনভিজ্ঞ।

বিবিধ কার্য্যের শ্রমজীবীগণকে ও চাকুরীয়াগণকে স্বাবলম্বী বলা যায় না। এক্ষণে যাঁহারা বিবিধ কার্য্যের শ্রমজীবী, তাঁহারাও কিছুদিন আগে কৃষক অথবা কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতি শিল্পি-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কামার, কুমার, তাঁতী প্রভৃতিরাও যে এদেশে কোন দিন স্বাবলম্বী ছিলেন, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যাঁহারা এক্ষণে চাকুরীজীবী, তাঁহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যাই বেশী। এই তিন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক কতদিন হইতে জীবিকার জন্য চাকুরী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সঠিক বলা যায় না বটে, তবে তাঁহাদের কতক অংশ যে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্ব হইতেই চাকুরী-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কোন দিন যে তাঁহারা সকলেই স্বাবলম্বী ছিলেন তাহা সুনিশ্চিত। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল যখন ইহার প্রায় সমস্ত অধিবাসী, এমন কি নিম্নস্তরের লোক-গুলিও স্বাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃই ভারতবর্ষে স্বাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে এবং প্রচলিত ভাষায় যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া আখ্যাত, তাঁহাদের মধ্যেই পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইতেছে।

(২) পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক নীরোগ লোকের সংখ্যা

নীরোগ লোকের সংখ্যা নিরূপণ করিবার উপায় রুগ্ন লোকের সংখ্যা নির্ণয় করা। ভারতবর্ষের বাৎসরিক রুগ্ন লোকের সংখ্যাবিষয়ক কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণী আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। আন্তর্জ্জাতিক মহাসভার (League of Nations) স্বাস্থ্য-শাখা (Health Organisation) হইতে জগতের ৩৪টী জাতির স্বাস্থ্য-বিবরণী (Report on the Public Health Progress) প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের কোন স্থান নাই এবং তাহার কোন স্বাস্থ্য-বিবরণী পাওয়া যায় না। কাজেই, ভারতবর্ষের রুগ্ন লোকের সংখ্যা আমাদের অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

বয়সবিশেষে মৃত্যুর হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল কিনা, তাহা লক্ষ্য করিলে রুগ্ন লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে অথবা কমিতেছে তাহা আংশিকভাবে অনুমান করা যায়। স্বীয় পরিচিত জন-সমাজের অসুস্থতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও অনুমানের সহায়তা হয়।

১৯০১ সাল হইতে দশ বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লোক-গণনা আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে ৩০ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক লোকের মৃত্যুর হার যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই—

সাল	৩০-৪০ বয়স্কের মৃত্যুহার	৪০-৫০ বয়স্কের মৃত্যুহার	৫০-৫৫ বয়স্কের মৃত্যুহার
১৯০১-১১	২৬·২ %	৩৫·৬ %	৩২·৭ %
১৯১১-২১	৩১ ৯ %	৩৭·৭ %	৩৫ %
১৯২১-৩১	৩০·৬ %	৪০·৭ %	৫৪ %

উপরোক্ত মৃত্যুর হার হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ৩০ বৎসরের উপরে ভারতবাসীর মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তিদের শতকরা ৫৪ জনের মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষিত সমাজে (অন্ততঃ পক্ষে, বাঙ্গালীদিগের মধ্যে) যাঁহারা ৪০ বছরের উর্দ্ধবয়স্ক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে অজীর্ণ এবং বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ভারতীয় গ্রামে ত্রিশ বৎসর আগেও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ৫০।৬০ বৎসরের কর্ম্মঠ লোকের সংখ্যা যাহা দেখা যাইত এখন আর তাহা যায় না। এইরূপ পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এমন একদিন ছিল যখন ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক পঞ্চাশ বৎসরের উপরেও নীরোগ থাকিতেন; কিন্তু ক্রমেই নীরোগ লোকের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া স্বাবলম্বনে সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য কি তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রহ করিতে পারিলে রুগ্ন হইবার সম্ভাবনা হ্রাস পায় না কি?

(৩) নিরপরাধ লোকের সংখ্যা

পুনঃ পুনঃ ফৌজদারী আইনের যেরূপ পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইতেছে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধের রকম এবং সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষিত সমাজের সন্তানগণের পর্য্যন্ত নরহত্যা করিবার কুণ্ঠা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তি এবং স্বদেশী ডাকাতি তাহার প্রমাণ। যে দেশে ভ্রূণহত্যা মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং কদাচিৎ ভ্রূণহত্যার কথা শোনা যাইত, সেই দেশে ভ্রূণহত্যার সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে এইরূপ অনুমান করা কি নিতান্ত অমূলক হইবে? আজকাল যে উপায়ে সন্তান-জনন-নিরোধ প্রথা আরম্ভ হইয়াছে তাহা কি ভ্রূণহত্যারই রূপান্তর নহে? এবং তাহার প্রচলন প্রকাশ্য-

অথচ এই দেশের কৃষকদিগের রীতিনীতি ও চাল-চলনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনুমান হয় না কি যে, সমাজের শ্রমজীবীদিগকেও এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করা হইয়াছিল যে, তাঁহারা পর্য্যন্ত নিরপরাধ, শৃঙ্খলিত জীবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন? শ্রমজীবীদিগের মধ্যে এইরূপ শৃঙ্খলাযুক্ত নিরপরাধ জীবন বর্ত্তমান জগতের আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় কি?

কথঞ্চিৎ মনোযোগের সহিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের রীতিনীতি ও চালচলন পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, এখানে এমন একদিন ছিল, যখন আপামর সকলে নিরপরাধ ও শৃঙ্খলাযুক্ত জীবন অতিবাহিত করিত। অপরাধ কাহাকে বলে এবং মানুষ যাহাতে অপরাধ না করে তাহা শেখান কি শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য নহে? শিক্ষার নামে আজ যাহা চলিতেছে তাহা যদি প্রকৃত শিক্ষা হইত, তাহা হইলে কি অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারিত।

(৪) সন্তুষ্ট লোকের সংখ্যা

যাঁহারা নিজের নিজের জীবিকা-পন্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া এক সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু পন্থা অথবা প্রতিনিয়ত পন্থান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহারা কোন পন্থার একনিষ্ঠ সেবক নহেন বলিতে হয়, এবং বুঝিতে হয় যে, তাঁহারা নিজের নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহের কার্য্যে অসন্তুষ্ট।

ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থার দিকে কথঞ্চিৎ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এক কালে ভারতবর্ষের শ্রমজীবীগণ পর্য্যন্ত নিজের নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। সমাজের কোন শ্রেণীর লোকের আর্থিক উপার্জ্জনের পরিমাণ অপর কোন শ্রেণীর লোকের উপার্জ্জনের তুলনায় খুব বেশী হইলে, যে-ব্যবসায়ে উপার্জ্জন খুব বেশী হয়, সেই ব্যবসায়ে সকলেই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইতে পারে। অথচ সমাজ অথবা রাষ্ট্র-পরিচালনায়, শ্রমজীবীর, চিকিৎসকের, শিক্ষকের, ব্যবহারাজীবীর, ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকের সমান প্রয়োজন এবং প্রত্যেকেরই খাদ্যাদিরও তুল্য প্রয়োজন। সমাজ-গঠনের সময় যাহাতে দেশে প্রচুর খাদ্যশস্যের উৎপত্তি হয় এবং তাহার

যথাসাধ্য অল্প থাকে, যদি সে ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে সমাজের কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোকের অর্থোপার্জ্জন খুব বেশী হইয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে না, অথচ প্রত্যেকেরই পক্ষে স্ব স্ব প্রয়োজনীয় বস্তুর অর্জ্জন করা সম্ভব হয় এবং সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। ভারতীয় ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের লিখিত বিবিধ সাহিত্যে বহুরকম টাকার আদান-প্রদানের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঋষিদিগের দ্বারা দেবভাষায় লিখিত কোন সাহিত্যে একমাত্র সহজলব্ধ কড়ি ছাড়া আদান-প্রদানের জন্য আর কোন রূপ টাকার * ব্যবহারের পরিচয় প্রায়শঃ পাওয়া যায় না। কাজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রাচীন যুগে † ভারতবর্ষে আদান-প্রদানের জন্য কড়ির ব্যবহার প্রচলন করিয়া ঋষিগণ রাষ্ট্রীয় সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর স্ব স্ব ব্যবসায়ে সন্তুষ্টচিত্তে কর্ত্তব্যনির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জাতীয় ব্যবস্থার অন্যথা হইলে শিক্ষার ব্যবস্থা দুষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হয়। কারণ ইহার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করা শিক্ষা-সাপেক্ষ।

বর্ত্তমানে যে মাত্র এই ব্যবস্থারই অন্যথা হইয়াছে তাহা নহে। ত্রিশ বৎসর আগেও অধিকাংশ ভারতবাসীর ভিতর যে সন্তুষ্টি দেখা যাইত এখন আর তাহা দেখা যায় না। খুব অল্পসংখ্যক কয়েকটি মেম্বর, মন্ত্রী, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের (**Imperial, Provincial** এবং **Subordinate Services**) জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক বেতনের চাকুরীর সৃষ্টি হওয়ায় দেশের আপামর সকলে তাহার জন্য লালায়িত হইয়াছেন এবং ত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে কেহ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। শ্রমজীবি-সন্তান তাঁহার শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রথম প্রথম কেরাণীগিরি ও স্কুলের শিক্ষকতা-পদের আরাধনা করেন। যে মুহূর্ত্তে কেরাণীগিরি ও স্কুলের শিক্ষকতা-পদ লাভ হয়, তখনই আবার উচ্চতর বেতনের চাকুরী তাঁহার আরাধ্য হয়। প্রত্যেক শ্রমজীবীই অসন্তুষ্ট চিত্তে সারাজীবন কালাতিপাত করেন। অবশ্য-প্রয়োজনীয় শ্রমজীবীর কার্য্যে আর কেহ আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। ফলে, ভারতবর্ষের অফুরন্ত সমৃদ্ধির ভাণ্ডার শূন্য হইবার কারণ ঘটিতেছে।

বর্ত্তমানে প্রচলিত ভাষায় যাঁহাদিগকে শিক্ষিত বলা হয়, ঠিক ঐ জাতীয় শিক্ষিত লোক প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল কিনা তাহা বলা কঠিন। তবে যে সময়ে ভট্ট, আচার্য্য এবং মিশ্র প্রভৃতি উপাধির উৎপত্তি হইয়াছে এবং দিগ্বিজয়ের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তখন হইতে যে তথাকথিত শিক্ষিত লোকের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। তখন হইতে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে অসন্তুষ্টির উৎপত্তি না হইলেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে অল্প-বিস্তর অসন্তুষ্টির সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এই অসন্তুষ্টি ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিতেছে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীবীর আইন অধ্যাপনা, অথবা লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যাপনা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বণিকের অর্থনীতি অধ্যাপনা, এই প্রকারে যে কোন কার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া তাহার অধ্যাপনা, কর্ষণ, শিল্প অথবা বাণিজ্য কখনও দোষাবহ হইতে পারে না, বরং ইহা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু জীবিকা-নির্ব্বাহের কোন কার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ না হইয়া এক সঙ্গে (অর্থাৎ জীবিকা-নির্ব্বাহের এক কার্য্যের সঙ্গে) তদ্বিষয়ক অধ্যাপনা অথবা শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য অসন্তুষ্টির পরিচায়ক এবং কুশিক্ষার পরিবর্দ্ধক ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে এক সঙ্গে অলব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীবী এবং অধ্যাপক, অলব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক এবং অধ্যাপক, অলব্ধপ্রতিষ্ঠ বণিক্ এবং অধ্যাপকের সংখ্যা যত, ত্রিশ বৎসরের আগেও তত ছিল না। যাঁহারা ৩০ বৎসরের আগেকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং স্মরণ করিতে পারেন, তাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে সহজেই সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

মোটের উপর, সন্তুষ্ট লোকের সংখ্যা সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন ভারতে অধিকাংশ ভারতবাসীই সন্তুষ্ট ছিলেন। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত, বহুদিন হইতেই

---

* এখানে "টাকা" শব্দ ঠিক প্রচলিত অর্থে (অর্থাৎ Rupees বলিতে যাহা বুঝায় সেই অর্থে) ব্যবহৃত হয় নাই। "টাকা" শব্দের অর্থ পণ্যদ্রব্য আদান প্রদানের যন্ত্র (medium) বুঝিতে হইবে।

† "প্রাচীন যুগ" বলিতে বুঝিতে হইবে, যে সময় ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি উপাধির উৎপত্তি হয় নাই, অর্থাৎ এখন হইতে ন্যূনপক্ষে ২৫০০ বৎসরের আগে।

শ্রমজীবীদিগের মধ্যে সন্তুষ্টি ছিল। বর্ত্তমানে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৫) ৭০ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা

৫০ বৎসরের অধিকবয়স্ক লোকের মৃত্যুর হার ইতিপূর্ব্বে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কার অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরিণতবয়স্ক লোকের মৃত্যুর হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। কিংবদন্তী ও প্রাচীন লোকের কথা হইতে যাহা বোঝা যায়, তাহাতে অনুমান হয় যে, এদেশে কয়েক শতাব্দী আগেও পরিণতবয়স্ক কর্ম্মঠ লোকের সংখ্যাই বেশী ছিল। ভারতীয় উপনিষদ্‌গুলির ভিতর মানুষের জীবন, যৌবন, জরা, মৃত্যু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা সম্বন্ধে বহু আলোচনার পরিচয় আছে। অবশ্য সে আলোচনাগুলি অধুনা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাতে তাহার ভিতর সাধারণের ব্যবহারোপযোগী কোন কথা পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, ঐ আলোচনাগুলি সমস্তই সাধারণের প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারযোগ্য। কিন্তু ভট্ট, আচার্য্য, মিশ্র প্রভৃতি পূজনীয় পণ্ডিতগণ ঋষিদিগের প্রকৃত ভাষা আংশিক ভাবে বিস্মৃত হইয়া সমস্ত আলোচনাগুলিকে বিকৃতার্থে প্রচার করিয়াছেন এবং আমরা এখনও তাহার বিকৃতার্থ গ্রহণ করিতেছি। বর্ত্তমান অর্থ ভ্রমহীন কি ভ্রমপূর্ণ নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারা যায় কিনা তাহার বিচার ছাড়িয়া দিলেও, আমাদের ঋষিগণ, অর্থাৎ আমাদের দেবতাগণ তাঁহাদের অকৃতী সন্তানগণের জীবন কি করিয়া রক্ষা হইতে পারে, কি করিয়া আপামর সকলের কর্ম্মক্ষমতার সৃষ্টি ও স্থিতি সাধিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই আলোচনার ফলে যে-জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল তাহাতে ভারতবর্ষে এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন প্রায় সমস্ত ভারতবাসীর জীবনকাল কল্পনাতীত দীর্ঘ ছিল।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যবস্থা যথাযথ কিনা তাহার বিচারকল্পে স্বাবলম্বী, নীরোগ, নিরপরাধ, সন্তুষ্ট এবং পরিণত-বয়স্ক লোকের সংখ্যা পর্য্যালোচনায় যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা হইতে বলিতে হইবে যে, উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের কখন ভারতে কি অবস্থা ছিল তাহা সংক্ষেপতঃ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনটী যুগে বিভক্ত করিতে হয় এবং লোকগুলিকে দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হয়। তিনটী যুগের নাম 'বর্ত্তমান' 'মধ্য' এবং 'প্রাচীন'। বর্ত্তমান সময় হইতে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভাবধি (অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) ভারতের 'বর্ত্তমান যুগ'; ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে অন্ততঃ পক্ষে ২০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের 'মধ্য যুগ'; এবং তাহার পূর্ব্বে ভারতের 'প্রাচীন যুগ' বলা যাইতে পারে। দুই শ্রেণীর লোকের নাম—শ্রমজীবী ও তত্ত্বাবধায়ক। কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, প্রভৃতিকে শ্রমজীবী বলা যাইতে পারে। আর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, তিলি, সাহা প্রভৃতিকে তত্ত্বাবধায়ক বলা যাইতে পারে। *

প্রাচীন যুগে—প্রকৃত শিক্ষার পরিচায়ক স্বাবলম্বন প্রভৃতি যে পাঁচটী গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রমজীবী ও তত্ত্বাবধায়ক, এই উভয় শ্রেণীর প্রায় সকল লোকের মধ্যেই পূর্ণরূপে দেখা যাইত—এবং 'মনুষ্য-তত্ত্ব' প্রভৃতি পাঁচটী তত্ত্ব নির্ভুল অর্থে প্রচারিত ছিল। এই যুগে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয় এবং তাহার যথাযথ ভাব প্রকাশ ছিল।

মধ্য যুগে ঐ পাঁচটী গুণ তত্ত্বাবধায়ক শ্রেণীর মধ্যে কাহারও কাহারও আংশিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তখনও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে এই পাঁচটী গুণ প্রায়শঃ বিরাজিত ছিল। এই সময় সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানে আংশিক বিকৃতি প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ফলে তত্ত্বগুলির প্রকৃত অর্থ দুজ্ঞেয় হইয়াছে। ক্রমশঃ মূল তত্ত্বগুলির বহুল প্রচার পর্য্যন্ত খুব সীমাবদ্ধ হয়। বর্ত্তমান যুগে ঐ পাঁচটী গুণ তত্ত্বাবধায়ক শ্রেণীর (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ,

* সংস্কৃত "আর্য্য" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত (Etymological) অর্থ "তত্ত্বাবধায়ক" বলা যাইতে পারে এবং "শূদ্র" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বর্ত্তমানে "শ্রমজীবী" বলিতে যাহা বোঝায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। তত্ত্বাবধানার কার্য্য মূলতঃ তিন শ্রেণীর, যথা (১) শিক্ষা ও জীবিকা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচলন বিষয়ক, (২) প্রণীত ও প্রচলিত ব্যবস্থা সংরক্ষণ বিষয়ক, (৩) শ্রমজীবীদিগের মধ্যে জীবিকা ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রচার ও সংগঠন বিষয়ক। "ব্রাহ্মণ", "ক্ষত্রিয়" ও "বৈশ্য"—এই তিনটী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যাহা বুঝায় তাহাতে উপরোক্ত তিনশ্রেণীর কার্য্য তাঁহাদের ছিল, ইহা ধরা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে সমাজের জাতিবিভাগ ঠিক প্রাচীন যুগের

বৈশ্য, কায়স্থ, তিলি, সাহা প্রভৃতির) ভিতর প্রায়শঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং শ্রমজীবীদিগের মধ্যেও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানে মধ্যযুগে যে বিকৃতি ঘটিয়াছিল তাহার (অর্থাৎ বিকৃতির) কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং বিদেশীয় ভাষাগুলির অনুকরণে এবং বিদেশীয়গণের হাতে সেই বিকৃতির মাত্রা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তত্ত্বগুলির অর্থও অধিকতর বিকৃত হইতেছে। কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান যুগে একটী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বৈদেশিকগণ জ্ঞান-পিপাসু। তাঁহাদের জ্ঞান-পিপাসা বশতঃ বিকৃতার্থে হইলেও তত্ত্বগুলির পুনঃ প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। লুপ্ত সূত্রগুলি লোকচক্ষে আবির্ভূত হইয়াছে। বৈদেশিকগণের অনুকরণে দেশীয় লোকগণ পুনরায় বিকৃতার্থে তত্ত্বগুলির আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে লোকের অবস্থায় যাহা দেখা যায়, তাহা হইতে বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। অচিরে ইহার চিন্তাপূর্ণ সংস্কার সাধিত না হইলে অগণিত শ্রবজীবীদিগের ভিতর যে বিশৃঙ্খলা আসিবে, তাহাতে ভারতের ও জগতের পূজ্যপাদ ঋষিদিগের পূর্ণজ্ঞানের পরিচায়ক, ধ্বংসাবশিষ্ট যৎসামান্য যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে তাহা পর্য্যন্ত লোপ পাইবে। ভারতের ঋষিগণ কাহার জন্য কি করিয়াছিলেন তাহার বিচার করিবার, অথবা প্রমাণ করিবার সুযোগ এখনও আমাদের হয় নাই। যদি কখনও আবার তাঁহাদের ভাষা পূর্ণভাবে পুনর্জ্জীবন লাভ করে, তাহা হইলে তাঁহাদের বেদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, মীমাংসা, দর্শন ও সংহিতা প্রকৃত অর্থে প্রচারিত হইবে এবং তাঁহাদের কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আমরা পাঠকদিগকে শুধু এইটুকু বিশ্বাস করাইতে চাহি যে, আমরা তাঁহাদের মোহমুগ্ধ অকৃতী সন্তান। তাঁহারা যে প্রকৃত জ্ঞান কি, বুদ্ধি কি তাহা উপলব্ধি করিয়া তজ্জাত সংগঠন-কার্য্যে সমস্ত জগৎকে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের আগে যে আর কোন ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহা কি তাঁহাদের বিরোধীর অভাবের পরিচায়ক নহে? বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব কি ঋষি-সন্তানদিগের জ্ঞানের বিকৃতির পরিচায়ক নহে? তাহার পর যে একটীর পর একটী করিয়া অসংখ্য ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে কি বুঝা যায় না যে, জগতে প্রকৃত 'বুদ্ধি' কি, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে? "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ", "বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্", ইত্যাদি "ব্যাস"বাক্য কি তাৎপর্য্যহীন?

ভারতের অগণিত শ্রমজীবীদিগের ভিতর একবার বিশৃঙ্খলা ঘটিলে কাহার কি অবস্থা হইবে তাহা আমরা আমাদিগের বিদেশীয় এবং দেশীয় বন্ধুদিগকে কল্পনা করিতে অনুরোধ করি। ভারতের যে সমৃদ্ধি স্মরণাতীত কাল হইতে বিদেশীয়দিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহা তাহার শ্রমজীবীদিগের দ্বারা উৎপন্ন। কাজেই বলিতে হয়, ভারতের শ্রমজীবী জগতের অনেকের প্রাণধারণের সহায়তা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সেই সমৃদ্ধির অধিকাংশ আজ বিলুপ্ত।

এখনও যাহা আছে, তাহা রক্ষিত হইলে আমাদের ইংরাজ বন্ধুগণ তাঁহাদের আন্তর্জাতিক প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারিবেন। যদি রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের আর আকর্ষণীয় কিছু থাকিবে না এবং তখন ভারতবর্ষে রাজত্ব থাকিলেও—সতত আর্থিক ক্লেশ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা ঘটিবে।

দেশীয় বন্ধুদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলমান রাজত্বের পতনের পর দেশে ডাকাতি প্রভৃতি যে সমস্ত বিশৃঙ্খলার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা মুষ্টিমেয় 'তত্ত্বাবধায়ক' শ্রেণীর দ্বারা সংঘটিত এবং তাহাতে 'শ্রমজীবী'দিগের অংশ খুব সামান্য। সম্মুখে আশঙ্কার যে সমস্ত চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহা অনতিবিলম্বে বিলুপ্ত করিতে না পারিলে বুভুক্ষু শ্রমজীবীদিগের যে অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহাতে দেশের অবস্থা আরও বিভীষিকাপূর্ণ করিয়া তুলিবে। ইংরাজের হাত হইতে রাজত্ব কাড়িয়া লইলেও তখন সকলকে ভাসিয়া যাইতে হইবে।

ভারতের শিক্ষার ক্রমিক অবনতির দায়িত্ব ও কারণ

বিভিন্ন যুগের ভারতের শিক্ষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবাসীর শিক্ষার চূড়ান্ত অবনতি ঘটিয়াছে 'মধ্যযুগে'র শেষ ভাগে। 'প্রাচীন যুগে'র গবেষণার ফলে কল্পনাতীত উন্নত তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জিত হইয়াছিল এবং খুব

উন্নত শিক্ষার প্রচার হইয়াছিল। তাহার (অর্থাৎ শিক্ষার) ফলে ত্রিবিধ উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমতঃ, সমস্ত লোক, এমন কি শ্রমজীবিগণ পর্য্যন্ত শিক্ষিত হইয়া স্বাবলম্বী ও শৃঙ্খলাযুক্ত জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বস্ত্র-বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাহার ফলে জমীগুলিকে চূড়ান্ত ভাবে উর্ব্বর করিয়া তোলা হইয়াছিল এবং যাহাতে ঐ উর্ব্বরতা চিরদিন রক্ষিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যাহাতে লোকের শিক্ষা ও জীবিকা সহজলব্ধ হয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তাহার আয়োজন করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ, দেশের জল হাওয়া যাহাতে বিকৃত না হইতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

'মধ্যযুগে' তত্ত্বজ্ঞান বিকৃত হয় এবং সুশিক্ষার প্রচার বন্ধ হয়। তাহার ফলে 'তত্ত্বাবধায়ক' শ্রেণী তখনই (অর্থাৎ মধ্য-যুগেই) বহুলাংশে অবনত হইয়া পড়েন। কিন্তু 'প্রাচীন যুগে'র সুশিক্ষার ফলে 'শ্রমজীবী' শ্রেণীর স্বাবলম্বন ও শৃঙ্খলাযুক্ত জীবনে সামান্য সামান্য বিকৃতি ঘটিলেও বহুলাংশে অবিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে বস্ত্র-বিজ্ঞানের বিকৃতিবশতঃ জমী-গুলির উর্ব্বরতা রক্ষার কার্য্যে ক্রমশঃ অমনোযোগের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রাচীন যুগের কার্য্যফল তখনও বিদ্যমান ছিল এবং জমীগুলির উর্ব্বরতা বহুলাংশে রক্ষিত হইয়াছিল। জ্ঞানের বিকৃতিবশতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বহু বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় এবং দেশের জল হাওয়ার বিকৃতি-নাশকর কার্য্যগুলি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়ে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের বিকৃতি বশতঃ দেশবাসিগণের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটিতে আরম্ভ করে এবং বৈজ্ঞানিকগণের প্রভাব ও প্রতাপ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কিন্তু 'প্রাচীন যুগে'র কার্য্যের প্রভাব তখনও বিদ্যমান থাকায় দেশের জলহাওয়া সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর হয় নাই এবং সামাজিক চাল-চলনে বহু স্বাস্থ্যকর আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

'বর্ত্তমান যুগ' আরম্ভ হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞান ও সুশিক্ষার অভাব লইয়া। তাহার ফলে 'তত্ত্বাবধায়ক' শ্রেণীর লোক নামে বিদ্যমান থাকিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাদের অস্তিত্ব নাই বলা যাইতে পারে। তাঁহারা ক্রমেই কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া পড়িতেছেন। 'প্রাচীন যুগে'র কার্য্যের প্রভাব এই যুগেও আংশিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকায়, ইহার প্রারম্ভাবস্থায় শ্রমজীবীদিগের মধ্যে স্বাবলম্বী ও শৃঙ্খলিত জীবন পরিলক্ষিত হইত, জমীগুলি আংশিক পরিমাণে উর্ব্বর ছিল, এবং জল হাওয়া কতক অংশে স্বাস্থ্যকর ছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগের নিখুঁত তত্ত্বজ্ঞান বর্ত্তমান জগতে অপরিজ্ঞাত থাকায় তাহার কার্য্যগুলির তাৎপর্য্য বর্ত্তমান জগতে প্রায় সম্পূর্ণ অবোধ্য এবং সেই কার্য্যগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। তাহার ফলে শ্রমজীবিগণের স্বাবলম্বী ও শৃঙ্খলিত জীবন, জমীগুলির উর্ব্বরা শক্তি এবং দেশের স্বাস্থ্যকর জল হাওয়া পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

কাজেই, ভারতের অবস্থার অবনতির কারণ বলিতে হইবে শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাবের কারণ বলিতে হইবে যে-তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভারতের শিক্ষা-প্রণালী রচিত হইয়াছিল এবং তাহার সুশৃঙ্খল ও সুচারু অবস্থা সাধিত হইয়াছিল সেই তত্ত্বজ্ঞানের বিকৃতি ও অভাব। তাহার জন্য দায়ী করিতে হইবে ভারতের প্রাচীন যুগের 'তত্ত্বাবধায়ক' শ্রেণীর লোক-দিগকে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি জাতীয় লোককে, যাঁহারা অধুনা শিক্ষিত শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত।

অনেকে ইংরাজদিগকে ভারতের বর্ত্তমান অবনতির জন্য দায়ী করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয় তাহা সমীচীন নহে। যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভারতের লোক-চরিত্র গঠনের, জমীর উর্ব্বরতা সাধনের এবং জলহাওয়ার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছিল, তাহা পরিজ্ঞাত না হইলে ভারতের লোভনীয় অবস্থাগুলির মূল কারণ কি তাহা জানা ও তাহা রক্ষা করা সম্ভব নহে। কোন তত্ত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পর্য্যালোচনা না করিলে তাহার নিখুঁত জ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। কাজেই কোন জাতি দীর্ঘায়ুসম্পন্ন না হইলে কোন তত্ত্বের নিখুঁত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন না। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের আখ্যা-য়িকানুসারে লণ্ডন সহরের প্রতিষ্ঠা হয় রোমানদিগের দ্বারা ৪৭ খৃষ্টাব্দে এবং ঐ সমস্ত আখ্যায়িকায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে ইংরাজের বর্ত্তমান বিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তাহাও অতর্কিত ভাবে, ইহা বলা যাইতে পারে। ১৫০ বৎসরের কোন জ্ঞান নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া কখনও সমী-

চীন নহে এবং ১৫০ বৎসরের জ্ঞানের আলোচনাকে প্রাথমিক আলোচনা বলা যাইতে পারে। তৎসমস্ত জ্ঞানদ্বারা ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান বোঝা সম্ভব নহে। কাজেই, ভারতীয় অবস্থা বুঝিতে যদি কোন ভ্রম হইয়া থাকে, তাহার জন্য বরং ইংরাজের "জাতীয় বয়সকে" দায়ী করা যাইতে পারে, কিন্তু ইংরাজ জাতিকে দায়ী করা যায় না।

ভারতে ইংরাজের জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদের প্রযত্নের জন্য ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ হওয়ার কারণ আছে। তাঁহারা যখন ভারতে আসেন, তখন প্রাচীন যুগের তত্ত্বজ্ঞানের বিকৃতি-সাধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল, এমন কি—শিক্ষার প্রথম সোপান যে ভাষাশিক্ষা, তাহার আয়োজন পর্য্যন্ত খুব সীমাবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। সংস্কৃত ভাষার যে একটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞান আছে এবং ঐ ভাষায় যে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু তত্ত্বজ্ঞান আছে, তাহা তখনও অজ্ঞাত ছিল এবং এখনও অজ্ঞাত আছে। কাজেই, তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টার অভাবের জন্য দায়িত্ব যদি কাহারও থাকে তাহা ভারতবাসীর। ইংরাজকে তাহার জন্য দায়ী করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডে যে শ্রেণীর শিক্ষাবিধি প্রচলিত ছিল, ভারতবর্ষেও ঠিক সেই শ্রেণীর শিক্ষাবিধি প্রচলিত হইয়াছিল। কাজেই বলিতে হইবে ইংরাজ তাহার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষার উন্নতি করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন।

এই শিক্ষায় ইংরাজের দেশেও সুফল হয় নাই এবং ভারতবর্ষেও সুফল হইতেছে না। ফল যে ভাল হয় নাই তাহা ইংরাজের জানা আছে কি না আমরা জানি না। যদি না জানা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য ইংরাজকে কতক দায়ী করা যায়। এই অংশে ইংরাজের দায়িত্ব থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবাসী একটা শ্রেষ্ঠতর শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রস্তাব ইংরাজের সমক্ষে উপস্থিত করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে ইংরাজের নিন্দার যুক্তিযুক্ততা আমরা বুঝিতে পারি না।

ইংরাজের চেষ্টায় প্রাথমিক ভাষাশিক্ষা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছিল। ফলে দেশীয় কয়েকটী ভাষা আংশিক শৃঙ্খলিত ভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল। ভাষা শৃঙ্খলিত না হইলে কোন বস্তু-তত্ত্ব আমূল এবং অভ্রান্তভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না

ইংরাজের চেষ্টায় যে প্রাথমিক ভাষাশিক্ষা পুনরায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ইংরাজী ভাষায় রেঃ লালবিহারী দে, এন. এন. ঘোষ, পার্সিভ্যাল সাহেব, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী ইত্যাদি এবং বাংলা ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত প্রায় সমস্ত ইংরাজী ও বাংলা সাধারণের বোধগম্য এবং তাহার আভ্যন্তরীণ চিন্তায় একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীর আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থকারদিগের ইংরাজী ও বাংলা প্রায়শঃই আমরা বুঝিতে পারি না, এমন কি উচ্চ উপাধিধারী ও সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণের অধিকাংশ প্রবন্ধের মধ্যে চিন্তার কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণ শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যেও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজীতে এম-এ পাশ করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ইংরাজী লিখিবার ক্ষমতা জন্মে না, বাংলাতে এম-এ পাশ করিয়া নির্ভুল বাংলা লিখিবার ক্ষমতা হয় না। এমন কি, ভাষাকে যে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিলে ভাষার ভ্রান্তি ও অভ্রান্তি বিচার করা সম্ভব হয়, তাহা (অর্থাৎ সেই শৃঙ্খলা) পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুবকদিগের এই যে দুরবস্থা তাহা কবে সূচিত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিতে বসিলে বলিতে হয়, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার সূচনা হইয়াছে ত্রিশ বৎসর আগে। কারণ এখন যাঁহারা ৪০ বৎসরের কম বয়স্ক এবং যাঁহারা ৪০ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক এবং যাঁহারা পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স্ক, তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং মূল ধারণায় পরিষ্কার পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেই দেখা যায় যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার আংশিকভাবে আমাদের দেশবাসীর হস্তগত হইয়াছে।

কাজেই বলিতে পারা যায় যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য ইংরাজ তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী একটা প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রাথমিক ভাষাশিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তত্ত্বশিক্ষা আরম্ভ হয় নাই এবং অন্ততঃ পক্ষে বাঙ্গালায় অবনতি-ই আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহার জন্য দায়ী বাঙ্গালী।

আমরা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান চ্যান্সেলার ও

অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে মনোযোগ কামনা করিতেছি এবং অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটের বিষয় স্মরণ করেন এবং আমাদের কথাগুলি তাঁহাদের বিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে কোন যুক্তি আছে কি না তাহার বিচার করেন। আমরা তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিবার উদ্দেশ্যে কোন যুক্তির অবতারণা করি নাই। বাঙ্গালী যুবকগুলিকে যখন সাক্ষাৎ ভাবে বিচার করি, তখন দেখিতে পাই তাহাদের ভিতর বহু বৈশিষ্ট্য। তাহাদের উপাদানে যেন এমন কিছু আছে যাহা গড়িয়া তুলিতে পারিলে (যাহা এখন স্বপ্নবৎ বলিয়া মনে হয়) সজীব ও সবল হইয়া দাঁড়াইতে পারে। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের কোন স্থান নাই এবং তাহাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট নানা জাতীয় টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউসনের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে যাহা করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, তাহাতে তাহারা কয়েকটী কুলির সর্দ্দাররূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং তাহাই হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী যুবকের উপাদানে প্রকৃত উন্নত মানুষের উপাদান আছে বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে এবং তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের।

সুজলা, সুফলা বাঙ্গালায় কেন অন্নাভাব হয়, ইত্যাদি বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনার নিন্দা করিতে হইল। আশা করি, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থার মুল সূত্র, প্রয়োজন ও উপায়

শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষার ক্রম কি তাহা জানা থাকিলে শিক্ষা-ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করা সহজ হয়। মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য জনসাধারণ যাহাতে স্বাবলম্বী, নীরোগ, সন্তুষ্ট, নিরপরাধ এবং দীর্ঘজীবী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাহাতে অল্প বয়স হইতেই ভাষাশিক্ষা, মনোযোগ অভ্যাস ও যথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারে এবং কালের ও স্থানের ব্যক্ত রূপের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, শিক্ষার ক্রমানুসারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। শিক্ষণীয় বিষয় পাচটী ; যথা—বস্তু-তত্ত্ব, জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্যবস্থা-তত্ত্ব, বস্তুগুণবিচার-তত্ত্ব ও মনুষ্য তত্ত্ব।

শিক্ষা দিবার উপায় দুইটী—মৌখিক উপদেশ ও পুস্তক। শিশু একটি বয়সবিশেষে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠ করিবার সামর্থ্য লাভ করে না। কাজেই, প্রত্যেক শিশুকে তাহার সেই বয়সবিশেষ পর্য্যন্ত মৌখিক উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত। মৌখিক-উপদেশ-শিক্ষকগণের ভাষা প্রভৃতি প্রাথমিক পাচটী বিষয় শিক্ষা দিবার সামর্থ্যের প্রয়োজন।

পুস্তকের সাহায্যে কোন বিষয়বিশেষের শিক্ষা দিতে হইলে ঐ পুস্তকগুলি যাহাতে নির্ভুলভাবে লিখিত হয় এবং শিক্ষকগণ যাহাতে তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞানসম্পন্ন হন, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

ভাষা প্রভৃতি পাচটী প্রাথমিক শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষা বালকের ষোড়শ বৎসরের মধ্যে পূর্ণ হওয়া যুক্তিযুক্ত। ইহাকে 'প্রাথমিক শিক্ষা' বলা যাইতে পারে। ইহার পর চারি বৎসর মধ্যে 'বস্তু-তত্ত্ব', 'জ্ঞান-তত্ত্ব' ও 'ব্যবস্থা-তত্ত্বে'র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন। ইহাকে 'ব্যবহার-শিক্ষা' বলা যাইতে পারে। তাহার পর দুই বৎসর 'বস্তুগুণবিচার-তত্ত্বে'র শিক্ষার প্রয়োজন। ইহাকে 'প্রয়োগ-শিক্ষা' বলা যাইতে পারে।

বস্তু-তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য যাবতীয় বস্তুর উপাদান, গুণ ও কর্ম্ম কি করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় তাহা (অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণের প্রণালী), বিবৃত করা।

'জ্ঞানতত্ত্বের' প্রধান উদ্দেশ্য যাবতীয় বস্তুর প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন, উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে জ্ঞান লাভ করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া।

'ব্যবস্থা-তত্ত্ব'কে প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা—

(১) প্রচলিত রাষ্ট্র-পরিচালনা ও জীবিকা-সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা-বিষয়ক এবং (২) ব্যবস্থা-প্রণয়ন বিষয়ক। ইহার প্রথমাংশ ব্যবহার-শিক্ষার অন্তর্গত এবং দ্বিতীয়াংশ প্রয়োগ-শিক্ষার অন্তর্গত।

'গুণবিচার-তত্ত্বে'র প্রধান উদ্দেশ্য জীবিকা-সংগ্রহের প্রচ-

লিত পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবৃতি প্রদান। জীবিকার বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে 'বিভিন্ন গুণ-বিচারতত্ত্ব' প্রণীত হওয়া সঙ্গত।

'মনুষ্য-তত্ত্ব' বলিতে বুঝিতে হইবে, মানুষ বলিতে কি বুঝায়, মানুষ বিভিন্ন কেন, মানুষের জীবন কাহাকে বলে এবং মনুষ্যোৎপত্তির মূল কারণ কি কি, তদ্বিষয়ক বিবৃতি।

কোন বালককে যদি ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ভাষা, মনোযোগ অভ্যাস, যাথার্থ্য নিরূপণ, কালের ও স্থানের ব্যক্ত রূপ সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া তাহার পর চারি বৎসর কি প্রণালীতে যাবতীয় বস্তুর উপাদান, গুণ ও কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় এবং তৎ সম্বন্ধীয় নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান কি পদ্ধতিতে লাভ করিতে হয় তাহার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিংশতি বর্ষীয় যুবক কোন্ জিনিষ ও ব্যবস্থা তাহার প্রয়োজনীয় অথবা বর্জ্জনীয়, তাহা অপরের বিনা নির্দ্দেশে নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকারে শিক্ষিত যুবক যদি জানিতে পারে যে, দেশে জীবিকা-সংগ্রহের কি কি পদ্ধতি আছে এবং তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা কি কি, তাহা হইলে অনায়াসে সে তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহ-প্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে। ইহার পর যদি আবার জীবিকা-নির্ব্বাহ-বিষয়ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে ঐ যুবক অনায়াসে তাহাও শিক্ষা করিতে পারে। এতাদৃশ শিক্ষিত যুবকের স্বাবলম্বী, নীরোগ, সন্তুষ্ট, নিরপরাধ ও দীর্ঘজীবী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জীবিকা-নির্ব্বাহের পদ্ধতিগুলি সুব্যবস্থিত না থাকে, তাহা হইলে মাত্র জীবিকা-নির্ব্বাহের পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া জীবিকার উপার্জ্জন করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রণয়নও দেশীয় লোকের কার্য্য। যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহারা যদি 'বস্তু-তত্ত্ব', 'জ্ঞান-তত্ত্ব', 'ব্যবস্থা-তত্ত্ব', 'গুণবিচার-তত্ত্ব' ও 'মনুষ্য-তত্ত্ব' পরিজ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জীবিকা-নির্ব্বাহের পদ্ধতিগুলির আয়োজন, জমিগুলির উর্ব্বরতা লাভের ও রক্ষার আয়োজন এবং দেশের জল হাওয়া কিরূপে স্বাস্থ্যকর হইতে পারে তাহার আয়োজন সাধিত হইতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধে হয়ত নানারূপ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু একটু মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, একমাত্র শিক্ষা-বিভাগ যথাবিহিত ভাবে ব্যবস্থিত হইলে দেশের সমস্ত অবনতি অবরুদ্ধ হইতে পারে।

এই সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বিশদভাবে পর্য্যালোচিত না হইলে মূল সূত্র পরিষ্কার না হইবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু বিশদ আলোচনা এ স্থানে সম্ভব নহে।

এই ব্যবস্থা-কার্য্যে দেশীয় লোকের ও ইংরাজের সহযোগ প্রয়োজন।

ইংরাজের প্রয়োজন দেশীয় লোকের সহায়তা এবং দেশীয় লোকের প্রয়োজন ইংরাজের সহযোগিতা। ইংরাজ যতই কর্ম্মঠ ও বুদ্ধিমান হউন, পরিণতবয়স্ক, কর্ম্মে প্রকৃত অভিজ্ঞ দেশীয় লোক তাঁহাদের স্বদেশবাসীর প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজন কি তাহা যত বুঝিতে পারিবেন, ইংরাজের পক্ষে তাহা তত বোঝা সম্ভব নহে। আমরা তাঁহাদিগকে ইয়োরোপীয় গ্রন্থকারদিগের "Individual autonomy", "Liberty" প্রভৃতি বিষয়ক যুক্তি অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ যে তত্ত্বজ্ঞান-সম্ভূত সংগঠন দ্বারা ভারতবর্ষের লোভনীয় সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল তাহা বুঝিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে হইলে জাতীয় জীবনের যে বয়সের প্রয়োজন, ইংরাজের জাতীয় জীবন এখনও সে বয়সে উপনীত হয় নাই। সুপরিচালিত হইয়া সাধনা করিলে ভারতবাসীর পক্ষে সে তত্ত্বজ্ঞান বুঝিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অধিকন্তু, ইংরাজ দেশের রাজা এবং প্রকৃতপক্ষে দেশীয় লোকের উপরিতন স্তরে প্রতিষ্ঠিত। শ্রেষ্ঠতর বলিয়া অভিমান করিবার যুক্তি তাঁহাদের আছে, কিন্তু কায়-মনোবাক্যে সেই অভিমান পরিত্যাগ না করিলে উপযুক্ত ভারত-বাসীর সহায়তা পাওয়া সম্ভব নহে। তাঁহারা অভিমান পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন করিবার লোক পাওয়া খুবই সহজ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভ্রম দেখাইতে সক্ষম লোক পাওয়া সম্ভব হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে এবং ভ্রম দেখাইবার লোক না জুটিলে তাঁহাদের ভ্রম চিরদিনই থাকিয়া যাইবে।

অন্যদিকে দেশীয় লোকদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ইংরাজ তাঁহাদের রাজা। রাজার অসহযোগে রাজার সহিত কলহ করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের অবনতি-রোধকর কোন কার্য্য করা সম্ভব নহে। দেশের অবনতি-রোধকর

কার্য্য করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে না পারিলে রাজত্ব লাভ করাও সম্ভব নহে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ এখনও বহু সম্পদে পরিপূর্ণ। তাহা একবার নষ্ট হইয়া গেলে পুনরুদ্ধার করা খুব সহজ নহে। যে দেশে কোন সম্পদ নাই, সেই দেশ লইয়া রাজার সহিত ঝগড়া করায় দেশের কিছু নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এখানে দেশের সম্পদ বজায় রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া রাজার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলে দেশের অবনতি ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। বিদেশীদের উপর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের হাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলে দেশবাসীরই বেশী ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

শিক্ষা

ব্যায়ামচর্চ্চা ও শিক্ষা

আমাদের গত সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ভারতবর্ষে শিক্ষাবিষয়ক যে সমস্ত বিবরণী ও বক্তৃতা প্রকাশ হইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারিটী :—

(১) ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-কমিশনারের রিপোর্ট

(২) আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের রিপোর্ট

(৩) কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনে চ্যান্‌সেলরের বক্তৃতা

(৪) উক্ত কন্‌ভোকেশনে ভাইস-চ্যান্‌সেলরের বক্তৃতা।

উপরোক্ত রিপোর্ট ও বক্তৃতা কয়টি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ছাত্রদিগের খেলাধূলা ও ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাস্থ্যই মানুষের বড় মূলধন এবং ব্যায়ামচর্চ্চা স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য। এই হিসাবে ছাত্রদিগের পক্ষে ব্যায়ামচর্চ্চা ও খেলাধূলা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাও অতীব সত্য। কিন্তু যে পরিমাণে ছাত্রদিগের মধ্যে খেলাধূলা ও মার্চ্চ করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহা একটু বাড়াবাড়ি রকমের বলিয়া আমাদের মনে হয়।

ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয় শিক্ষিত হইবার জন্য। নানা রকম পুস্তক পড়িতে অভ্যস্ত হইয়া এবং কুচ-কাওয়াজ করিতে শিক্ষা করিয়া বড় বড় 'সার্টিফিকেট' অর্জ্জন করিতে পারিলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তদপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় সেই শিক্ষা, যে শিক্ষায় তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাবলম্বী হইয়া নিজের নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, সন্তুষ্ট চিত্তে নীরোগ ও নিরপরাধ জীবন অতিবাহিত করিতে পারে এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দেশীয় লোক এমন শিক্ষা চায়, যাহাতে ঐ গুণগুলির বিকাশ হয়।

ছাত্রগণকে স্বাবলম্বন প্রভৃতি গুণান্বিত করিতে হইলে, যাহাতে তাহাদের বুদ্ধির উন্মেষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন। বালকদিগের সাধারণ প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করা। খুব সতর্কভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিবার ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে তাহারা যাবতীয় তত্ত্ব বুঝিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে ছাত্রগণ ইন্দ্রিয়প্রবণই থাকিয়া যায়, কখনও তাহাদের বুদ্ধির উন্মেষ হয় না। কার্য্যক্ষেত্রেও দেখা যায়, ছাত্রদিগের গাহিতে-বাজাইতে, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিতে ও খেলাধূলা করিতে প্রশ্রয় দিলে, তাহাতে তাহাদিগের উৎসাহ যত সহজে আসে, কোনও জিনিষ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ তত সহজে আসে না। ইন্দ্রিয়প্রধান প্রবৃত্তিকে বুদ্ধিপ্রধান কর্ম্মানুগতায় পরিবর্ত্তিত করাই শিক্ষার নৈপুণ্য। অতিরিক্ত মাত্রায় খেলাধূলার প্রশ্রয় দিলে তাহা কখনও সাধিত হয় না।

কুচ-কাওয়াজের নৈপুণ্য ইন্দ্রিয়ের শৃঙ্খলার পরিচয় হইতে পারে বটে, কিন্তু বুদ্ধির শৃঙ্খলার পরিচয় নহে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাম্য বুদ্ধির শৃঙ্খলা, কুচকাওয়াজের শৃঙ্খলা নহে। দরিদ্র পিতামাতাগণ পয়সা খরচ করিয়া সাধারণ কনেষ্টবল অথবা গোরা-সৈনিক ('tommy') হইবার জন্য তাহাদের সন্তানদিগকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না। ঐ জাতীয় শৃঙ্খলা বুদ্ধির শৃঙ্খলার কোন সহায়তা করে কিনা তাহাও সন্দেহজনক। সাধারণ সৈনিকদিগের মধ্যে কয়জন বিশিষ্ট বুদ্ধির কার্য্যে সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে এতাবৎ সক্ষম হইয়াছেন? অবশ্য আমরা এমন কথা বলি না যে, কুচ-কাওয়াজ করা একান্ত দোষাবহ। আমাদের বক্তব্য ছাত্রদিগের মধ্যে ঐ জাতীয় কার্য্যের বাড়াবাড়ি ভাল নয় এবং তাহার নৈপুণ্যও ততটা শ্লাঘ্য নহে।

শিক্ষাবিভাগের ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশে তাঁহাদের শিক্ষার চেষ্টা এতাবৎ অভীষ্ট সাধন করিতে পারে নাই। ছাত্রগণকে স্বাবলম্বন শিখাইতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট চাকুরী সৃষ্টি করিয়া বেকার-সমস্যার পূরণ করিতে পারিবেন না এবং স্বাবলম্বন শিখাইবার প্রধান যন্ত্র বুদ্ধির উন্মেষ করা। ছাত্রদিগের ইন্দ্রিয়-প্রধান প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে, নতুবা সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হইবে।

মাতৃভাষা

বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সভার এক অধিবেশনে প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি অনুমোদিত হইয়াছে। তদনুসারে ইংরেজী ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়েই পরীক্ষার্থীগণ মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে পারিবেন। বালিকাদিগের শিক্ষণীয় বিষয় পৃথকভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই নূতন পদ্ধতি ১৯৩৭ সাল হইতে কার্য্যকরী হইবে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা তাহার বাঙ্গালী কর্তৃপক্ষের অভীষ্টানুগ। আমরা যতদূর শুনিয়াছি, ইহা শিক্ষিত সাধারণ বাঙ্গালীরও অভিপ্রেত। মাতৃ-ভাষা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পরিপুষ্ট হইলে তাহার সাহায্যে শিক্ষা যত সহজ হয় অন্য কোন ভাষায় তত সহজ হয় না, তাহা সত্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, গত ৩০ বৎসর হইতে বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি নিরুদ্ধ হইয়াছে এবং এক্ষণে ইহা ব্যাকরণ-হীন হইয়া বিশৃঙ্খলার রাস্তায় চলিতেছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এই ভাষায় কোন গভীর চিন্তাশীল তত্ত্ব প্রকাশ করা অতীব দুরূহ। ছাত্রেরাও সাধারণতঃ চিন্তাশীল বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভাষার এই অবস্থায় তাহার সাহায্যে প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইবে এবং তাহাতে শিক্ষার অবস্থা আরও হীনতর হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের মনে হয়, মাতৃভাষার ব্যাকরণের শৃঙ্খলাসাধন করিয়া লইয়া, কয়েক বৎসর পরে ছাত্রদিগকে তাহাতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইলেই ভাল হইত।

কনভোকেশন

বিগত ২রা মার্চ্চ শনিবার সিনেট-হাউসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চ্যান্সেলর স্তর জন এণ্ডারসন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রের প্রায় ৯০০ গ্রাজুয়েট এবারের কনভোকেশনে উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ৩৮ জন মহিলা ছিলেন।

চ্যান্সেলার মহোদয়ের বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য বিষয় চারিটী:—(১) বাঙ্গালার সাধারণের মতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি দোষ-যুক্ত বলিয়া শীঘ্রই গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রী শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিবেন। (২) চ্যান্সেলর মহোদয়ের মতে শিক্ষা-পদ্ধতি এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত যাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষার পরেই অধিকাংশ ছাত্র হয় কোন না কোন পেশা অবলম্বন করিতে পারে, নতুবা বিভিন্ন ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউশনে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। (৩) মাত্র শিক্ষার অগ্রগতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে, পরন্তু ছাত্রগণ যাহাতে নেতৃত্ব, শৃঙ্খলানুগতি, সহযোগিতা এবং সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে তৎপ্রতিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দৃষ্টি থাকা উচিত। (৪) গতানুগতিকভাবে লেখাপড়ার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া যুবকগণের খেলাধূলা, উপযুক্ত বিশ্রাম ও পরস্পর আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা নাগরিক জীবনের সম্পূর্ণ উপযোগী গুণসমূহ অর্জ্জন করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ও যথারীতি বক্তৃতা দান করেন।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান চ্যান্সেলার মহোদয় যে বহু বিষয়ে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে যত্নশীল হইয়াছেন এবং ঐ পরিবর্ত্তনগুলি যাহাতে জনমত-সম্মত হয়, তদ্বিষয়ে যে তিনি সচেষ্ট আছেন তাহা তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ছাত্রগণ যাহাতে স্বাবলম্বী হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন এবং নীরোগ, নিরপরাধ, সন্তুষ্ট ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারেন তদনুরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি বাঙ্গালার জনসাধারণ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্র বর্ত্তমানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে খুব কমসংখ্যক শিক্ষিতলোকই চাকুরী না করিয়া, অপরের বিনা নির্দ্দেশে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন। যাঁহারা ভোকেশন্যাল ট্রেনিং প্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশই স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হওয়া ত দূরের কথা, কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যালয়ের পূর্ণ শৃঙ্খলা সম্বন্ধীয় শিক্ষা পাইবারও অযোগ্য। নতুবা শিক্ষিত, বাঙ্গালী যুবক বেকারের সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। কাজেই আমরা আশা করি, বাঙ্গালার শিক্ষা-মন্ত্রীর শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে বিবৃতির আভাস চ্যান্সেলার মহোদয়ের বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ছাত্র-

গণ, যদ্বারা স্বাবলম্বন প্রভৃতি গুণ অর্জ্জন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। ঐ পদ্ধতিগুলি যে রূপে স্বাবলম্বন প্রভৃতি গুণার্জ্জনের সহায়ক হইবে তাহাও শিক্ষা-মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে জনসাধারণকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিবেন।

ভাইস্-চ্যান্সেলর মহোদয়ের বক্তৃতা হইতে আমাদের পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবার মত কি কি আছে তাহার নির্ব্বাচন করিতে বসিয়া আমরা কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহার বক্তৃতায় বহু শ্রুতিমধুর ও সুসজ্জিত কথা দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু যে প্রণালীর কথা হইতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য-সাধনক্ষম, বিচারপূর্ণ কার্য্যপ্রচেষ্টার অনুমান হয়, তাহার কিছুই আমাদের নজরে পড়িতেছে না। বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকদিগের এখন অতীব দুর্দ্দিন। তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে সাধারণতঃ দায়ী করা যায় বটে, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্বই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভাইস্-চ্যান্সেলর মহোদয় কার্য্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ণধার। কাজেই তাঁহার দায়িত্ব অতীব গুরুতর। সময়বিশেষে 'ধরা-ছোঁয়াহীন' বক্তৃতা ব্যক্তিবিশেষের কৌশলপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হইতে পারে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটে চাকুরী না পাইলে ছাত্রগণ কি করিয়া স্বাবলম্বনে জীবিকা উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় তাহার কি চেষ্টা করিতেছেন তদ্বিষয়ে পরিষ্কার বিবৃতি ভাইস্-চ্যান্সেলর মহোদয়ের মুখ হইতে পাওয়ার আশা করা কি বাঙ্গালার জনসাধারণের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত ?

ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-কমিশনারের রিপোর্ট

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের কমিশনার স্যার জর্জ্জ এ্যাণ্ডারসন (Sir George Anderson) নয়া-দিল্লীতে ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ক ১৯৩২-৩৩ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। গত মে মাসে প্রকাশিত ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত এই পঞ্চ-বাৎসরিক শিক্ষা-রিপোর্ট অপেক্ষা এই রিপোর্টে অধিকতর আশার বাণী ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত পঞ্চ-বাৎসরিক রিপোর্টে তিনি নিম্ন-লিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে বড়ই নৈরাশ্যপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা—

১। শিক্ষার্থীর সংখ্যাহ্রাস

২। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অপব্যবহার

৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সুবিবেচনাসম্মত লক্ষ্যে পরিচালিত না হওয়ায় অযোগ্য ছাত্রগণের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হওয়া

৭। বিবিধ শিক্ষাকার্য্যের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

বর্ত্তমান রিপোর্টে উল্লিখিত ক্রটীসমূহের অনেকগুলি এবং তদ্ব্যতীত আরও অনেক ক্রটী যে বিশেষভাবে অতীত কার্য্যেরই ফল এবং মাত্র বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থা-পরিচালকদের ভ্রমপ্রসূত নহে ইহা স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে। শিক্ষা-বিষয়ক এই অবনতির কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া কমিশনার সাহেব ৭টী প্রধান কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—১। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা, ২। প্রবল আর্থিক অনটন, ৩। অতিরিক্ত মাত্রায় তাড়াতাড়ি ব্যয়সংক্ষেপ, ৪। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের শিক্ষাকার্য্যের উপর প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অভাব, ৫। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাবিভাগ অপেক্ষা উন্নত শিক্ষা-বিভাগ (Educational Service) গঠনে গভর্ণমেণ্টের অকৃতকার্য্যতা, ৬। বিদ্যালয় পরিদর্শনের অপকর্ষতা এবং ৭। প্রদেশ সমূহের শিক্ষা-বিষয়ক কার্য্য-পরিচালনে ও তৎসম্বন্ধীয় সমন্বয় সাধনে কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতার অভাব।

সুখের বিষয় যে, এই সকল বিশেষ অসুবিধা এবং জটিলতা থাকা সত্ত্বেও কোন কোনও বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বহু প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষই প্রাথমিক শিক্ষার এই হতাশাব্যঞ্জক ফল উপলব্ধি করিয়া উহার প্রতিকারকল্পে যথাযোগ্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন কোন প্রদেশে গ্রাম্য-জীবনের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য গ্রাম্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গ্রাম্য-শিক্ষা প্রণালী প্রণয়নেরও চেষ্টা করা হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদিগকে পৃথক বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে সাধারণ বিদ্যালয় সমূহেই শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। আরও সুখের বিষয় যে, শরীর চর্চ্চার উন্নতি, খেলাধূলার ব্যবস্থা, সুরক্ষিত বাগান, খেলার মাঠের সুবন্দোবস্ত এবং ডাক্তারী পরিদর্শনের ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখায় বিদ্যালয়গুলি পূর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময় ও মনোরম স্থানে পরিণত হইয়াছে। অনেক প্রদেশেই এক্ষণে বিদ্যালয়গুলি সুবিবেচনা-সম্মত লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

আলোচ্য বৎসরে ভারতে মোটের উপর ২ হাজার ৪ শত ৪৫টী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হ্রাস পাইয়াছে। যদিও বঙ্গদেশে ১ হাজার ৩ শত ৬৭টী অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির জরুরী উন্নতি সাধনের প্রয়োজন হওয়ায় ঐ বৃদ্ধির কোনরূপ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯২৭-২৮ সালে যেখানে ভারতে ৬ লক্ষ ১৭ হাজার ৭ শত ২৬ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেখানে আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৮৬ হাজার ৯ শত ৯৫ জন ছাত্রের বৃদ্ধি

খুবই অকিঞ্চিৎকর এবং ইহাতে নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। তবে সুখের বিষয় যে, বঙ্গদেশে প্রায় ৮০ হাজার এবং বিহারে প্রায় ২৭ হাজার ১ শত ৯৮ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবে আবার ৩৭ হাজার৭ শত ৯৭ জন ছাত্র হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমান আর্থিক অনটনই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কৃষি

নয়া-দিল্লীতে কৃষি-গবেষণাগারের ভিত্তি স্থাপন

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী নয়া-দিল্লীতে ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিংডন রাজকীয় কৃষি-গবেষণাগারের (Imperial Institute of Agricultural Research) জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। বড়লাট সাহেব প্রসঙ্গক্রমে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; সুতরাং তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন যে, এই প্রকার প্রতিষ্ঠান হইতে ভারত যথার্থই লাভবান হইবে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ ইহা খুব সত্য। কি উপায়ে, কোন্ সময়ে ভারতবর্ষের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাদের উর্ব্বরতা সাধন ও রক্ষার জন্য কি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের কৃষককে স্বীয় ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই বা কি পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল, এই সকল বিষয়ে গবেষণা হইলে বর্ত্তমান ভারতবাসীর প্রচুর উপকার সাধিত হইবে।

বড়লাট সাহেব এই গবেষণা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

ময়মনসিংহে প্রজা-সম্মেলন

ভারতীয় কৃষকগণের অবস্থা যে খারাপ হইয়া পড়িয়াছে এবং এই কৃষকগণের উপরই যে ভারতের অবস্থা নির্ভর করে তাহা আজকাল কেহ কেহ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহে নিখিল বঙ্গ প্রজাসম্মিলনী আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা সরকারের কৃষি ও শিল্প-বিভাগের মন্ত্রী নবাব কে. জি. এম. ফারোকি সাহেব এই সম্মিলনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক্।

শিল্প

বঙ্গদেশের তাঁতশিল্পের উন্নতিকল্পে ভারত গবর্ণমেণ্ট চলতি বৎসরের জন্য ৩৫ হাজার এবং আগামী বৎসরের জন্য ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের এতাদৃশ অর্থ-মঞ্জুর যে প্রজার দুঃখ-মোচনের চেষ্টার লক্ষণ তাহা নিঃসন্দেহ এবং তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু বর্ত্তমানে বস্ত্রশিল্প-বিজ্ঞানের যে অবস্থা, তাহাতে মিলজাত বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কুটীর-শিল্পজাত বস্ত্রের দ্বারা খুব বেশী লোকের জীবিকার্জ্জন সম্ভব নহে। অথচ গবর্ণমেণ্ট যদি জমিগুলির উর্ব্বরতা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং যাহাতে কৃষকগণ তাহাদের উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা খাদ্যেতর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিতে পারে, তদনুরূপ আভ্যন্তরীণ বিনিময়-প্রথার (internal exchange of commodities) ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃষকগণ বৎসরের সাত মাস পরিশ্রম করিয়াই তাহাদের সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ অর্জ্জন করিতে পারে। যাহাতে কৃষক অতিরিক্ত আর পাঁচ মাস স্বীয় পরিধানের জন্য নিজ কুটীরে বস্ত্র প্রস্তুত করে তাহার ব্যবস্থা করা হইলে অনায়াসে সে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কৃষির উন্নতি না করিয়া অথবা তাঁতী যাহাতে কৃষিকার্য্যদ্বারা তাহার অধিকাংশ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা না করিয়া, কেবল মাত্র তাঁত-শিল্পের উন্নতি দ্বারা কাহারও সম্পূর্ণ জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা সফল হইতে পারে না, তাহা আমাদের গবর্ণমেণ্ট চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? আমাদের মনে হয়, এ জাতীয় অর্থদানে কোন যথার্থ হিতকর অভীষ্ট পূরণ করিবে না।

বাঙ্গালায় লবণশিল্প

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শেঠ হনুমান পোদ্দার অর্থসদস্য গ্যার জন্ উডহেডকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কুটীরশিল্পরূপে বঙ্গদেশে লবণশিল্পের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট কি কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন? অর্থসদস্য ইহার উত্তরে বলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষার্থ মেদিনীপুরের কাঁথিতে এবং চট্টগ্রামের কক্সবাজারে দুইটী লবণ-শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশানুসারে কাঁথিতে একটী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এইটা সফল হইলে এই মার্চ্চ মাসে কক্সবাজারেও একটী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। 'ষ্টেট্ এড টু ইণ্ডাষ্ট্রিজ এ্যাক্ট'-(State Aid to Industries' Act)-এর অধীনস্থ 'বোর্ড অফ ইণ্ডাষ্ট্রিজ'-(Board of Industries)-এর নিকট এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। শিল্প-রাসায়নিক (Industrial Chemist) কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের ফলে বোর্ড মন্তব্য

প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে কুটীর-শিল্পরূপে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা নাই।

ভারতে চলচ্চিত্র-শিল্প

ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতির (Motion Picture Society) উদ্যোগে সম্প্রতি বোম্বাইতে নিখিল ভারত চলচ্চিত্র কন্ভেন্শনের (All-India Motion Pictures Convention) প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন মিঃ বি. ভি. যাদব। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, চলচ্চিত্র-শিল্প ভারতে কেবলমাত্র প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কাঁচা ফিল্মের (raw film) উপর যেরূপ অধিক পরিমাণে আমদানি-কর (import duty) ধার্য্য রহিয়াছে, তাহাতে উহা না কমাইলে এই শিল্পের উন্নতি অসম্ভব হইবে। যে কোন শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলেই উহার কাঁচা মালের (raw materials) দাম যথাশক্তি হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয়।

মিঃ যাদব আরও বলেন যে, সিনেমা (cinema) থিয়েটার (theatre) প্রভৃতির উপর প্রমোদকর বসান উচিত নহে। ইহা বিলাসিতার প্রশ্রয় নহে, পরন্তু ইহা শিক্ষার সহায়ক। যাহাতে উপদেশাত্মক ও শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ ফিল্ম্ (film) সমূহের প্রবর্ত্তন হইতে পারে গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। গবর্ণমেণ্ট যখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, তখন চলচ্চিত্র-সমিতির উপযুক্ত প্রচারকার্য্য (propaganda) দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে সজাগ করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

চলচ্চিত্র সমূহে অধুনা যে জাতীয় চিত্র সাধারণতঃ দেখান হয়, তাহাতে যে শিক্ষণীয় বিষয় অনেক থাকে তাহা নিঃসন্দেহ! কিন্তু ইহা কোন জাতীয় শিক্ষা? এই সকল চলচ্চিত্রের শয়ন-কক্ষের ছবিগুলি যে জাতীয় শিক্ষাপ্রদ, আমাদের মনে হয়, —নিৰ্জ্জীব, নিরামিষাশী, ভিক্ষুক ভারতবাসীর ঐ জাতীয় শিক্ষা না হওয়াই ভাল।

ভারতের শিল্পোন্নতি

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী নয়া-দিল্লীতে নিখিল ভারত শিল্প-প্রদর্শনীর তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও শ্রমিক সদস্য স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্ (Sir Frank Noyce) এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিল্প দিন দিনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং গবর্ণমেণ্টের রক্ষণশুল্ক এই উন্নতির একটী কারণ বলিতে হইবে। এই উন্নতির মূলে ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস্ ডিপার্টমেণ্টের (Indian Stores Department) কার্য্যাবলীও নিহিত রহিয়াছে। এই ডিপার্টমেণ্ট আজকাল বাৎসরিক যত কাপড় ক্রয় করিয়া থাকে তাহার শতকরা ৭৯ ভাগই ভারতে প্রস্তুত। এতদ্ব্যতীত কাঁচের দ্রব্য, ধাতুজ পালিস, বার্ণিস প্রভৃতি অন্যান্য আরও অনেক ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করা হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট যে ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য উৎসুক তাহা শিল্প-সভার (Industries Conference) পুনর্গঠন এবং 'বুরো অফ ইনডাষ্ট্রিয়াল ইনটেলিজেন্স্ এ্যাণ্ড রিসার্চ্চ'-(Bureau of Industrial Intelligence and Research)-এর প্রতিষ্ঠা দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। অবশেষে তিনি ভারতীয় শিল্প-প্রস্তুতকারীগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলেন যে, যদিও গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় শিল্পোন্নতির সহায়তা করিয়াছেন, তথাপি ভারতীয় শিল্প-প্রস্তুতকারীগণ এই সহায়তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হন নাই।

ভারতীয় শিল্প-প্রস্তুতকারীগণ যে গবর্ণমেণ্টের সহায়তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহা খুব সত্য। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের শিল্প-প্রস্তুতকারীগণ এই জাতীয় সহায়তার সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছেন কি? যদি পারিয়া থাকেন, তবে ল্যাঙ্কাসায়ার টলটলায়মান কেন? বিলাতে বেকারের সংখ্যা এত বেশী কেন? ক্রেতার অবস্থা ভাল না হইলে কখনও কোন শিল্পের উন্নতি সাধন করা সম্ভব কি না তাহা স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্ ভাবিয়া দেখিবেন কি? কোন দেশীয় ক্রেতার অবস্থার উন্নতি বিধান করিবার দায়িত্ব কাহার? সেই দেশের গবর্ণমেণ্টের নয় কি

ব্যবসা-বাণিজ্য

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশন

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের (Indian Chamber of Commerce) বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মিঃ এ. এল. ওঝা (Mr A. L. Ojha) তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, ভারতের আর্থিক দুরবস্থার প্রতীকারকল্পে গবর্ণমেণ্টের অনতিবিলম্বে জাতীয় পরিকল্পনাকে ভিত্তি করিয়া আবশ্যকমত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বৃটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার পর হইতে এ যাবৎ বহু পরিমাণ স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। ইহাতে দেশের যে কিরূপ ক্ষতি হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আবার বাঙ্গালা দেশে নূতন কর বসাইয়া সরকারের আয় বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু অন্যদিকে ব্যয় কমাইবার দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। অধিকন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন-কর্ত্তন উঠাইয়া দিয়া ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবারই ব্যবস্থা হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী নয়া-দিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় স্থির হইয়াছে যে, আগামী ২২শে মার্চ্চ হইতে ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাঙ্কের 'অংশ' (share) ক্রয়ের জন্য দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে। মোটের উপর, ৫ কোটী টাকা পরিমাণ অংশ (share) বিক্রয় হইবে। প্রত্যেকটী অংশের মূল্য ১০০৲ টাকা এবং উহা ১০০৲ টাকাতেই বিক্রয় হইবে। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ৫ লক্ষ অংশ (share) বিক্রীত হইবে।

অংশবিক্রয়ের জন্য ৫টী কেন্দ্র স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে কত টাকা পরিমাণের অংশ বিক্রয় হইবে তাহাও স্থির করা হইয়াছে।

১। কলিকাতা ১৪৫ লক্ষ টাকা,
২। বোম্বাই ১৪০ লক্ষ টাকা,
৩। দিল্লী ১১৫ লক্ষ টাকা,
৪। মান্দ্রাজ ৭০ লক্ষ টাকা,
৫। রেঙ্গুণ—৩০ লক্ষ টাকা।

মোট—৫ কোটী টাকা।

অংশীদারগণকে বর্ত্তমানে শতকরা বাৎসরিক ৩।০ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহা বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

রেলওয়ে বাজেট

বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারত গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে-সদস্য স্যার জোসেফ ভোর (Sir Joseph Bhore) ১৯৩৫-৩৬ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটে প্রকাশ যে, ভারতীয় রেলওয়ে সমূহের দুর্দ্দিনের অবসান হইতেছে। বিগত কয়েক বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ কম হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। যাত্রীগণের ভাড়া বাবদে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও মাল-চালানের ভাড়া বাবদে আয় অনেক বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া প্রকাশ।

বাজেটের আলোচনাপ্রসঙ্গে পরিষদের অনেক সদস্যই ভারতীয়দিগকে রেলওয়ে কর্ম্মচারী করা সম্বন্ধে বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। কেহ কেহ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের নানাবিধ অসুবিধা সম্বন্ধে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

২২শে ফেব্রুয়ারী এই বাজেট সম্বন্ধীয় আলোচনা আরম্ভ হইলে কংগ্রেসীদলের নেতা মিঃ ভুলাভাই দেশাই রেলওয়ে-বোর্ডের খরচ ৮৫ হাজার টাকা হইতে এক টাকায় পরিবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং উহা ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ৭৫টী ভোট ও বিপক্ষে ৪৭টী ভোট গৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান রেলওয়ে-বোর্ডের ভারতের স্বার্থের উপর কোনরূপ নজর নাই বলিয়াই এই প্রস্তাবের অবতারণা। মিঃ দেশাই ইহার পরিবর্ত্তে নূতন আর একটী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করার যৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে রেলওয়ে সমূহ যখন ভারতীয়দিগের অর্থদ্বারাই পুষ্ট হইতেছে তখন ইহার পরিচালনার ভার ভারতীয়গণের উপরই থাকা উচিত।

ভারতে বেকার-বীমার স্থান

বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও শ্রমিক সদস্য স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্ (Sir Frank Noyce) বেকার-বীমা সম্বন্ধীয় আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-মহাসভার অষ্টাদশ অধিবেশনে বেকারদের সাহায্যকল্পে বেকার-বীমা ও বেকার-শান্তির জন্য অন্যান্য যে সকল ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছে, তাহা ভারতে অনুমোদিত হইতে পারে না, কারণ ভারতের অবস্থা স্বতন্ত্র।

২১শে ফেব্রুয়ারী এই আলোচনা পুনরুত্থাপিত হইলে মিঃ এন্. এম্. যোশী (শ্রমিক) এক সংশোধনী-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, জেনেভায় অনুমোদিত বেকার-শান্তি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা যাহাতে যত সত্বর সম্ভব ভারতে অবলম্বিত হইতে পারে, তদুপযোগী কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হউক। এই প্রস্তাবটী ভোটে দেওয়া হইলে ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে ৫২টী করিয়া ভোট গৃহীত হয়। অতঃপর প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচনী (casting) ভোটে প্রস্তাবটী গৃহীত বলিয়া প্রকাশ করা হয়।

এতক্ষণ ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন না, সংশোধিত প্রস্তাবটী ভোটে দেওয়ার সময় বাণিজ্য সদস্য সভায় উপস্থিত হন—এবং এবারে প্রস্তাবটীর বিরুদ্ধে একটী ভোট বেশী হওয়ায় প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু পরিষদ মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন মতামত গ্রহণ না করায় পরিষদে একটী অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সময় স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্ বলেন যে, নূতন শাসন তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পরে বেকার-সমস্যা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আলোচ্য বিষয় হইবে। কাজেই এই পরিষদের বর্ত্তমানে এই বিষয়ে কোনরূপ মতামত গ্রহণ না করা অন্যায় হইবে না।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ

ব্যবস্থা-পরিষদে বিগত মাসে তিনটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। প্রথম, ১৯৩৫-৩৬ সালের রেলওয়ে বাজেট, দ্বিতীয়, বেকার-বীমা এবং তৃতীয়, ভারত সরকারের ১৯৩৫-৩৬ সালের বাজেট।

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসদস্য পরিষদে ৩৫-৩৬ সালের বাজেট পেশ করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব বাবদ আয় হইবে মোটের উপর ৯০ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়

হইবে ৮৮ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং উদ্বৃত্ত থাকিবে ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা। এই উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে কিছু কিছু কর হ্রাস করা হইবে বলিয়া প্রকাশ হইয়াছে। যথা—

১। আয়-করের উপর যে উদ্বৃত্ত কর বসান হইয়াছে তাহার ও সুপার-ট্যাক্সের (super tax) এক-তৃতীয়াংশ কমান হইবে।

২। ১০০০ হইতে ২০০০ টাকা আয়ের উপর যে আয়-কর ধার্য্য আছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ কমান হইবে।

৩। রৌপ্যের প্রতি আউন্সের কর (duty) পাঁচ আনা হইতে দুই আনায় পরিবর্ত্তিত হইবে।

৪। কাঁচা চামড়ায় রপ্তানী-শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

অর্থসচিব আরও ঘোষণা করিয়াছেন যে, লবণের উপর যে অতিরিক্ত আমদানী-শুল্ক রহিয়াছে, তাহা আর এক বৎসর মাত্র ধার্য্য থাকিবে। কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদ যদি উহা এখনই উঠাইয়া দেওয়া ভাল মনে করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজী আছেন।

১৯৩৩-৩৪ সালের উদ্বৃত্ত রাজস্ব ৬২ লক্ষ টাকা ও ১৯৩৪-৩৫ সালের উদ্বৃত্ত ৩ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা, মোট ৩ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা। এই টাকা নিম্নলিখিত ভাবে খরচ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে :

(১) গ্রাম সমূহের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রদেশসমূহকে অর্থ সাহায্য বাবদ	১ কোটী টাকা
(২) রাস্তা-উন্নয়ন তহবিলে বিশেষ সাহায্য বাবদ	৪০ লক্ষ টাকা
(৩) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাস্তা তৈয়ারী বাবদ	২৫ লক্ষ টাকা
(৪) বেতার-বার্ত্তা বাবদ	২০ লক্ষ টাকা
(৫) বিমানচালনা বাবদ (Aviation)	৯১ লক্ষ টাকা
(৬) পুসার কৃষি-গবেষণাগার দিল্লীতে স্থানান্তর বাবদ	৩৬ লক্ষ টাকা
(৭) ঋণ কমাইবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ খাটান বাবদ (Additional allotment for Debt reduction)	৭৫ লক্ষ টাকা
	মোট—৩ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা

রাজ্য-পরিচালনা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ঃ

স্যার জন এণ্ডারসনের বক্তৃতা

প্রায় দুই মাস বন্ধ থাকিবার পর বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে বাঙ্গালার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন পরিষদে এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার প্রথমেই বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সন্ত্রাসবাদ (terrorism) অনেক পরিমাণে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে যে কড়া পুলিশ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা একটুও শিথিলতা প্রাপ্ত হইলে উহা পুনরুজ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

বাঙ্গালাদেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি-বিধানকল্পে গবর্ণমেণ্ট যে যত্নপরায়ণ, তাহার প্রমাণ স্বরূপ গবর্ণর মহোদয় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ, স্থানে স্থানে সমবায়ঋণ-সমিতি গঠন প্রভৃতি কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালার প্রায় ২৫ হাজার স্কোয়ার মাইল (square mile) পরিমাণ অনুন্নত জমির পুনরুদ্ধারের জন্য শীঘ্রই একটী বিল প্রকাশিত হইবে বলিয়া তিনি জ্ঞাপন করেন। উপযুক্ত জল চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া কৃষির উৎকর্ষ সাধন করা এবং ম্যালেরিয়ার অপনোদনই ইহার উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যে নূতন পাঁচটী কর আদায়ের প্রস্তাব করিয়াছেন, উহাতে দেশের দরিদ্রতম জনসাধারণের কোনরূপ ক্ষতি হইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন এবং উহা প্রস্তাবিত রূপেই পরিষদে গৃহীত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

অবশেষে তিনি জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্টের গুণগান করেন, উহা যে বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল এবং ভারতের হিতকারী তাহাও বেশ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন।

'বঙ্গ-উন্নয়ন বিল'

(Bengal Development Bill)

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন 'বঙ্গ-উন্নয়ন বিল' (Bengal Development Bill) উত্থাপন করেন। এই বিলের উদ্দেশ্য বাঙ্গালার পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-বিষয়ক উন্নতি বিধান করা।

এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বিত হইবে :

১। মৃতপ্রায় নদীগুলির সংস্কার করিয়া অবাধ নদীস্রোত প্রবাহিত করা

২। পরিচালনাধীন সেচের ব্যবস্থা করা

৩। ড্রেনের ব্যবস্থা করা।

নদীর জলের পলি হেতু এই জমিগুলি এক সময় ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ছিল। আবার যদি ঐ পলিযুক্ত জলের ব্যবস্থা করা যায় তবে সেই উর্ব্বরতা পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। এই কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু জমির উর্ব্বরতা-শক্তির বৃদ্ধিহেতু এই ব্যয়ের উপযুক্ত প্রতিদান ও পাওয়া যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় যখন জমি উন্নত হইয়া শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে তখন ঐ বর্দ্ধিত আয়ের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকিবে। অতীতে ড্রেণ ও সেচের ব্যবস্থায় যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী পয়সাও ফিরাইয়া লন নাই। ইহাতে জন সাধারণ উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিই হইয়াছে।

এই বিলে কেবল যে জনসাধারণকে তাঁহাদের বর্দ্ধিত আয়ের অর্দ্ধভাগ গবর্ণমেণ্টকে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু জমির উর্ব্বরতার বৃদ্ধিহেতু তাহাদিগকে শস্যোৎপাদনের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিতে বাধ্য করা হইবে এইরূপ প্রস্তাবও করা হইয়াছে। স্রোতের জলের পলিতে জমি নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত হইবে এবং দেশের স্বাস্থ্যও উন্নত হইবে, কিন্তু জনসাধারণকে ইহার জন্য কিছু দিতেও হইবে। জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত এই স্কিম্ কার্য্যকরী হইতে পারে না। যদি কেহ গবর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ জমি অকর্ষিত রাখেন, তবে যে সকল লোক জমির চাষ দ্বারা শস্যোৎপাদনের বৃদ্ধি করিবেন, তাঁহারা যে পরিমাণ অর্থ গবর্ণমেণ্টকে দিবেন ঠিক সেই হারে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

বর্ত্তমানে যে সকল জমি চাষের সম্পূর্ণ অযোগ্য, সে সকল জমির উপর কর ধার্য্য করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে বিচার করিবেন এবং এই স্কিম সার্থক হইলে অর্থাৎ পতিত জমিগুলির যথেষ্ট উন্নতি হইলে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত জমির উপর ধার্য্য কর কমাইয়া দিতে পারেন।

এই বিল সম্পর্কীয় কার্য্যে আদালতের কোনরূপ অধিকার থাকিবে না।

উপসংহারে স্যার নাজিমুদ্দিন বলেন যে, এই বিলটী যদি আইনে পরিণত হয় এবং ইহার উদ্দেশ্য সফল হয়, তবে বাঙ্গালাদেশের নদীগুলি আবার পূর্ববেগে প্রবাহিত হইবে, জিলাগুলি জনাকীর্ণ হইবে, জমিগুলি শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হইবে, কৃষকগণ স্বাস্থ্যবান, কর্ম্মপটু ও অবস্থাপন্ন হইবেন এবং প্রাদেশিক বাজেটেও উদ্বৃত্তাংশ থাকিয়া যাইবে।

শোকসংবাদ

প্রিয়ম্বদা দেবী

গত ৪ঠা ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যায় বাঙ্গালার মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায়

স্বর্গীয়া প্রিয়ম্বদা দেবী

৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার "রেণু", "পত্রলেখা" ও "অংশু" বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রিয়ম্বদা দেবী অল্প বয়সে স্বামী হারাইয়া একটি মাত্র পুত্র লইয়া সংসারে বাস করিতেছিলেন; ১৯০৬ সালে তাঁহার শেষ সম্বল পুত্রটিও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এই দুর্ঘটনার পর হইতেই প্রিয়ম্বদা দেবী নারী-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়া আত্ম-সুখদুঃখকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার বহু নারীমঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রধানা কর্ম্মী ছিলেন। জীবনের শেষাংশের কয়েকটি বৎসর নানা রোগে তাঁহাকে একরূপ অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতা শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী আজও জীবিতা। অশীতিপর বৃদ্ধা জননীর এই নিদারুণ শোকে আমরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বিবিধ

সদ্ধর্ম্ম-বিহার

কলিকাতা-বাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপানীরা, কলিকাতার দক্ষিণ সীমান্তে লেক রোডে একটি বৌদ্ধ-বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাসমারোহে বিহারটির উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। কলিকাতা শহরে বহু জাপানী বাস করিয়া থাকেন, এতাবৎ তাঁহাদের কোন ধর্ম্মমন্দির কলিকাতায় ছিল না। সদ্ধর্ম্ম-বিহার সেই অভাব মোচন করিল। মন্দিরটির ভিতরে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত, মন্দিরটি জাপানী শিল্পকলার অনুসরণে গঠিত; দরজা-জানালাতেও জাপানদেশীয় কাষ্ঠ প্রভৃতি ব্যবহৃত
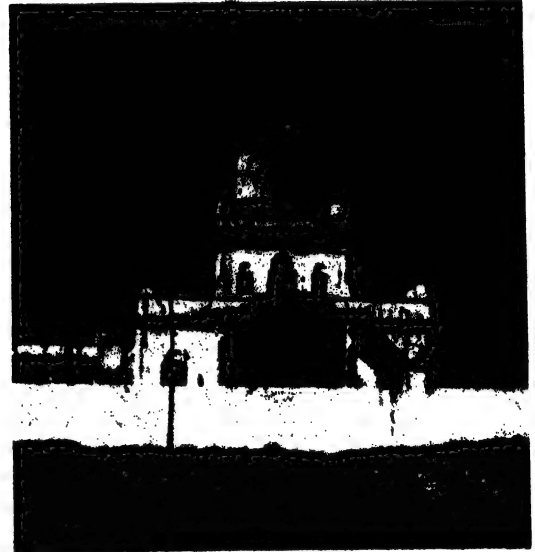
সদ্ধর্ম্ম বিহার [আলোকচিত্র—শ্রীপ্রশান্তকুমার মজুমদার

হইয়াছে। জাপানীদের স্বদেশীয় শিল্প ও দ্রব্যাদির সর্ব্বত্র সমাদর সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
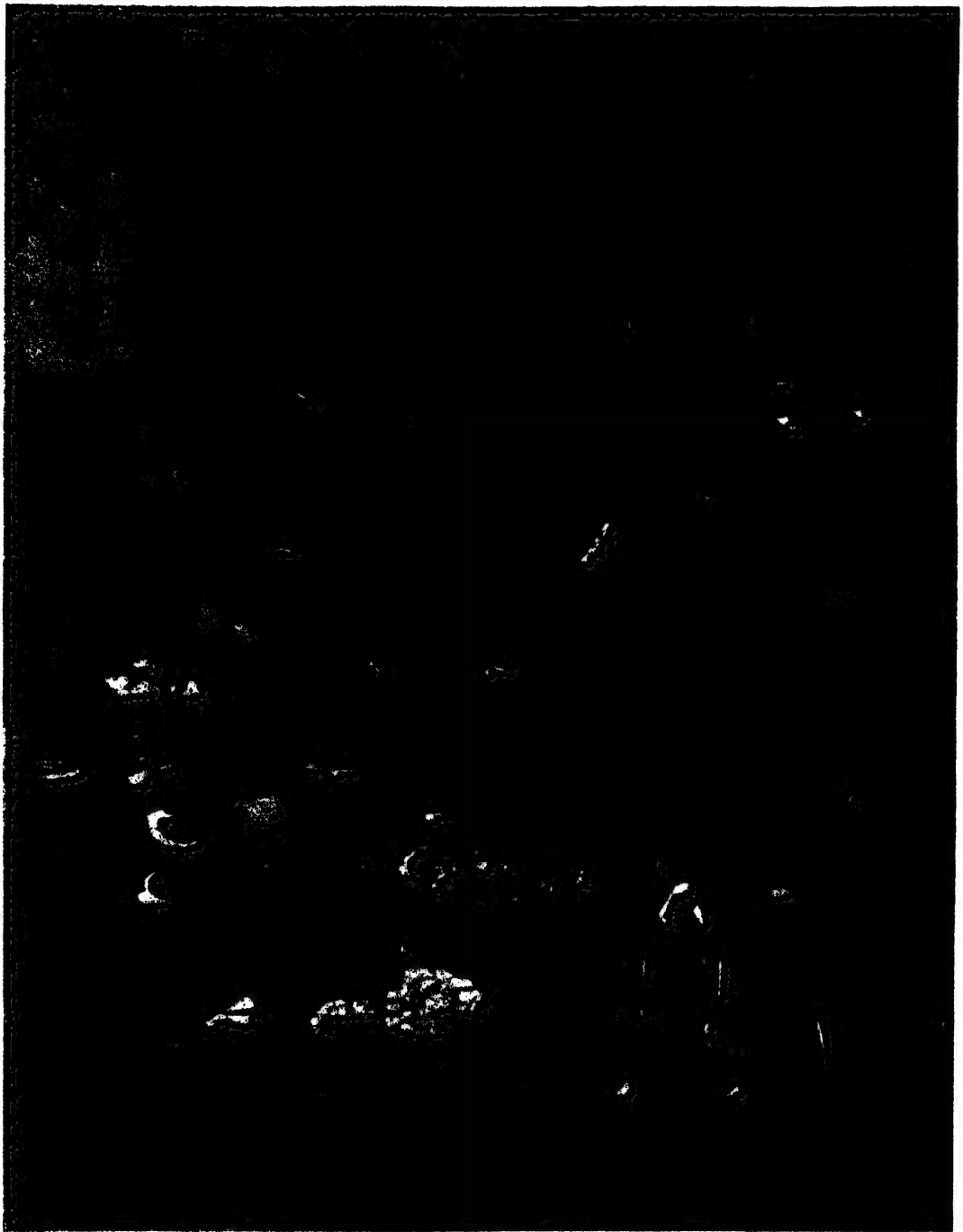
ঘরকরণা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

যাইতে পারে। কোন্ বস্তু কি কি উপাদানে গঠিত, বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি গুণ ও কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন এবং সমুদয় বস্তুটী কি গুণ ও কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন, তাহা জানিতে হইলে বস্তুটীকে বিধিবদ্ধ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। কাজেই "বস্তু ও তাহার কর্ম্ম বুঝিবার প্রযত্ন" বলিতে বুঝিতে হইবে "বস্তুকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা"।

এই জগতের প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ তৃপ্তিলাভের জন্য সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ চক্ষু বুজিয়া কোন বিষয়বিশেষ চিন্তা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, কেহ কেহ বস্তুবিশেষকে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ব্যবহার করিয়া (অর্থাৎ সুদৃশ্য বস্তু দেখিয়া, সুশ্রাব্য ধ্বনি শুনিয়া, সুগন্ধিদ্রব্যের ঘ্রাণ লইয়া, সুস্বাদু দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, সুকোমল দ্রব্যের স্পর্শানুভব করিয়া) এবং কেহ কেহ বা বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যবহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা কোন্ উপাদানে কি বস্তু গঠিত এবং তাহার কর্ম্মশক্তি কি তাহা জানিতে পারিলেই তৃপ্তিলাভ করেন এবং তাহা জানিবার জন্যই ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করেন। ইন্দ্রিয়-প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ এই উভয় শ্রেণীর মানুষেরই লক্ষ্য থাকে তৃপ্তিলাভ করা এবং তাঁহাদের বিবেচনানুসারে তৃপ্তিলাভ করিবার উপায়—জিনিষের সঙ্গ অথবা অবয়বের উপভোগ। বস্তুর সঙ্গ বা অবয়ব অথবা উভয়ই উপভোগ করিতে না পারিলে ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ মানুষের তৃপ্তি হয় না।

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষও প্রথমতঃ তৃপ্তিলাভের জন্যই কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু সঙ্গ অথবা অবয়ব উপভোগে কখনও তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন হয় না।

হিতকারী না হইলে কোন বস্তুকে তাঁহারা তৃপ্তিপ্রদ মনে করেন না। বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যের প্রথম লক্ষ্য বস্তুবিশেষ মানুষের হিতকারী কিনা তাহার বিচার করা এবং তদুদ্দেশ্যে বস্তুকে বিশ্লেষণ করা। মানুষ যখন নিজেকে বুদ্ধিপ্রবণ করিতে সমর্থ হন তখন বস্তুর উপাদান, গুণ ও কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এবং তাহার জন্যই তিনি সমস্ত বস্তুর বিধিবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করেন। তখন আর তাঁহার কোন তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যাবতীয় বস্তুকে কি করিয়া তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবেন তদুপায় নির্দ্ধারণ করা তাঁহার একমাত্র কাম্য হইয়া পড়ে।

[২] বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কার্য্যপ্রণালী

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কার্য্যের প্রণালী কিরূপ হইতে পারে তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যের উদ্দেশ্য "বস্তুবিশেষ মানুষের হিতকারী কিনা তাহার বিচার করা এবং তদুদ্দেশ্যে বস্তুকে বিশ্লেষণ করা"।

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কোন একটা বিশেষ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবার ইচ্ছা উপস্থিত হইলে প্রথমেই মনে মনে প্রশ্ন উপস্থিত হয় "আমি ঐ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিব কেন?" পর মুহূর্ত্তেই আবার স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, "আমার এমন কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যদ্দ্বারা বস্তুবিশেষ আমার হিতকারী কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি"।

বস্তুবিশেষ হিতকারী কিনা তাহা যথাযথ ভাবে নির্দ্ধারণ করিবার একমাত্র উপায়, ঐ বস্তুর প্রয়োগ। কাজেই বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বদা শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং মানুষের হিতকারী কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নানারূপ প্রয়োগে (applications) পরিপূর্ণ।

কোন্ দ্রব্য অথবা কর্ম্ম মানুষের হিতকারী তাহা নির্দ্ধারণ-কল্পে বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ বহু রকমের দ্রব্য এবং কর্ম্মপদ্ধতি ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদা এই দ্রব্য এবং এই কর্ম্মপদ্ধতি হিতকারী কিনা তৎসম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্য থাকে। যে মুহূর্ত্তে প্রয়োগের দ্বারা মনে হয় যে উহা হিতকারী নহে, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা অন্য কোন দ্রব্যের অথবা কর্ম্মপদ্ধতির প্রয়োগ আরম্ভ করেন।

কোন্ কাজ করিয়া কি ফল হইতেছে এবং ঐ ফল মানুষের হিতসাধক কিনা তদ্বিষয়ে বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রবণ ও মনঃপ্রবণ মানুষ কোন্ কার্য্যের কি ফল তদ্বিষয়ে আদৌ চিন্তা করেন না। একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সিনেমা দেখিলে তৃপ্তি হয়, বিশ্রামলাভ ঘটে—এবংবিধ সংস্কারবশে ইন্দ্রিয়প্রবণ ও মনঃপ্রবণ মানুষ প্রতিনিয়ত সিনেমা দেখিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে তৃপ্তি ও বিশ্রামলাভ হইতেছে কিনা তাহা একবারও চিন্তা করেন না। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ তৃপ্তি ও বিশ্রামের জন্য সিনেমা দেখিতে গেলেও তাহাতে বাস্তবিকপক্ষে তৃপ্তি ও বিশ্রামলাভ হয় কিনা, তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন। এই চিন্তার ফলে সিনেমা দেখায় যে চক্ষুর অস্বাভাবিক

পরিশ্রম হয়, তাহাতে যে দৃষ্টিশক্তির অকালে হীনতা-প্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে, বহু জনে পরিপূর্ণ স্থান যে অস্বাস্থ্য প্রদান করিতে পারে, এবংবিধ বিষয়গুলি তাঁহার বিবেচ্য হয় এবং উপসংহারে স্থির করেন যে, সিনেমা দেখায় তৃপ্তি ও বিশ্রামের তুলনায় অতৃপ্তি ও পরিশ্রমের পরিমাণই অধিক। ইন্দ্রিয়প্রবণ ও মনঃপ্রবণ মানুষ এই পরিণাম উপলব্ধি না করিতে পারিয়া দিনের পর দিন সিনেমা দেখিতে থাকেন এবং পরোক্ষভাবে আত্মহত্যা সাধন করেন। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ অবস্থা-বিশেষে সিনেমা দেখিতে গেলেও তাহাতে আত্মহত্যাকর কি পরিণাম সংঘটিত হইতে পারে, তাহা উপলব্ধি করেন এবং পুনরায় সিনেমা দেখার আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করেন।

কাজেই বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কার্য্য সর্ব্বদা শৃঙ্খলা-পরিপূর্ণ, সর্ব্বদাই নানাবিধ পরীক্ষায় পরিপূর্ণ এবং পরিবর্ত্তনশীল। বুদ্ধি-প্রবণ মানুষ যে-কোন কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করুন না কেন, তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, বস্তু ও কর্ম্মবিশেষ মানুষের হিতকারী কিনা তাহার পরীক্ষা করা। যে মুহূর্ত্তে পরীক্ষা দ্বারা ঐ কর্ম্মপদ্ধতি হিতকারী নহে বলিয়া অনুমান করেন, তন্মুহূর্ত্তে তিনি অন্য কোন কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন।

অনমনীয়তা (obstinacy), ঔদ্ধত্য (arrogance) প্রভৃতি কখনও বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাহা একমাত্র মনঃপ্রধান ও ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যেই সম্ভব হয়।

[৩] বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের শক্তি

কোন বস্তুর সঙ্গ অথবা অবয়ব উপভোগ করা যখন কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য হয়, তখন ঐ বস্তুর লাভ করিতে না পারিলে উত্তেজিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। উত্তেজিত হইলে মানুষের শক্তি ক্ষয় হয়, তাহা বলা বাহুল্য। জিনিষটী লাভ করিয়া উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্রিয়ের ক্লান্তি অনিবার্য্য, তাহাতে শক্তির ক্ষয় হইয়া থাকে। কাজেই ইন্দ্রিয়-প্রবণ ও মনঃপ্রবণ মানুষের যৌবন ও জীবন অকালে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

সঙ্গ এবং অবয়বের উপভোগ করা যখন কোন কার্য্যের উদ্দেশ্য না হইয়া, বস্তুটী মানুষের হিতকারী কিনা তাহা পরীক্ষা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তখন বস্তুটী লাভ করিতে না পারিলেও কোনরূপে উত্তেজিত অথবা নিরুৎসাহ হইতে হয় না। কোনরূপ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান না থাকায় ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ ক্লান্তি আসিবার সম্ভাবনাও কমিয়া যায়। উত্তেজনা, উৎসাহহীনতা এবং ইন্দ্রিয়ক্লান্তি না আসিলে মানুষের শক্তি-হ্রাস হইবার সম্ভাবনা একরূপ থাকে না বলিলেও বলা যাইতে পারে।

"মানুষের জীবন" ব্যাপারটী লক্ষ্য করিলে মানুষের জীবনে দুইটী অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী তাহার অস্থি, মাংস, রক্ত ও ইন্দ্রিয়াদিসম্বলিত অবয়ব এবং অপরটী প্রাণাদি বায়ু এবং অবয়বের সংযোগসম্বলিত কর্ম্মশক্তি। মানুষ মরিয়া গেলে তাহার অবয়ব থাকিয়া যায় বটে, কিন্তু কর্ম্মশক্তি থাকে না। কাজেই মানুষের জীবন-রক্ষা বলিতে বুঝিতে হয় অবয়ব-রক্ষা এবং কর্ম্মশক্তি-রক্ষা।

অবয়ব-রক্ষা বলিতে বুঝিতে হয়—অস্থি, মাংস এবং রক্ত প্রভৃতি উপাদানের রক্ষা। আর কর্ম্মশক্তি-রক্ষা বলিলে বুঝিতে হয় ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিশক্তির রক্ষা।

মানুষের অবয়ব কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত, কোন্ উপাদান—কোন্ দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্মসম্পন্ন, মনুষ্যেতর কোন্ বস্তু—কোন্ দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্মসম্পন্ন—তাহা নিখুঁত ভাবে জানা থাকিলে মানুষ সহজেই নিজ নিজ পূর্ণাবয়ব রক্ষা করিতে পারে। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ সর্ব্বদা সমস্ত বস্তুর বিশ্লেষণ-তৎপর এবং তাহার জন্য তিনি পূর্ণাবয়ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ মানুষ সর্ব্বদা উপভোগে ব্যস্ত থাকায় নিজের অবয়ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন না, পরন্তু উপভোগের কার্য্যে সর্ব্বদা পরোক্ষভাবে নিজের অবয়বের বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয় ও মন যখন স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকে তখন ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনঃশক্তি কি তাহা বুঝা সম্ভব হয় না, এবং তাহার ফলে মানুষ সর্ব্বদা উপভোগবিষয়ক কার্য্যে উত্তেজনা, উৎসাহহীনতা এবং ইন্দ্রিয়ক্লান্তি অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। কাজেই তাঁহার শক্তির হ্রাস হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় এবং মন যখন বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হয়, তখন প্রাণাদি বায়ু এবং অবয়বের সংযোগে যে কর্ম্মশক্তির উদ্ভব হয়, তাহা উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা ঘটে, এবং কর্ম্মশক্তির রক্ষা ও পরিপুষ্টি করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

কাজেই বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ অবয়ব-রক্ষা, কর্ম্মশক্তি-রক্ষা এবং জীবন-রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইন্দ্রিয়প্রবণ ও মনঃ-প্রবণ মানুষের এই সামর্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। এক কথায় বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কর্ম্মশক্তি ও সামর্থ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, আর মনঃপ্রবণ ও ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষের কর্ম্মশক্তি ও সামর্থ্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ প্রয়োগ দ্বারা বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধীয় ভ্রম দূরীভূত করেন এবং বিধিবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার 'সত্ত্ব' (অর্থাৎ উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মশক্তি) সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন। ইহারই জন্য ভারতীয় ঋষিগণের ভাষায় তাঁহারা **সাত্ত্বিক** বলিয়া অভিহিত।

শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজ্য এবং সমাজ পরিচালনার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর বুদ্ধিমান্ মানুষের দ্বারা বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ পরিচালিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও নিজের জীবিকা ও স্বাস্থ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হন না।

[৪] বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কার্য্যের পরিণাম

(১) উদ্দেশ্য বিষয়ে পরিণাম

মানুষ যখন নিজেকে বুদ্ধিপ্রবণ করিতে সমর্থ হন তখন বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্মশক্তি জানাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি। তদনুসারে যাবতীয় বস্তু-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করাই "বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের" কার্য্যের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের উদ্দেশ্য বিষয়ে কি পরিণাম হইতে পারে তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় মাত্র ইহাই বিচার্য্য হয় যে, বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের "জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব কি না"। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিপ্রবণ হইলেও সমস্ত মানুষ যে-সমস্ত গুণ ও কর্ম্মের জন্য মানুষ বলিয়া চিহ্নিত (অর্থাৎ যে-সমস্ত গুণের জন্য মানুষ 'মানুষ', এবং অন্যান্য জীব হইতে পৃথক্) সেই সমস্ত গুণ এবং কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। যে সমস্ত গুণ ও কর্ম্মের জন্য মানুষ 'মানুষ' বলিয়া চিহ্নিত, তাহাদের নাম—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান। যদিও যাবতীয় বস্তুর জ্ঞানলাভ করাই বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তাঁহার যাবতীয় কার্য্যই জ্ঞানলাভবিষয়ক, তথাপি ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। আহার-বিহারের ইচ্ছা বুদ্ধিপ্রবণ মানুষেরও থাকে। ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃ-প্রবণ মানুষের সহিত বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের পার্থক্য এই যে, ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ মানুষ আহার-বিহারের জন্য বহু কার্য্য করিয়া থাকেন, আর বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্যই আহার-বিহারের কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, জ্ঞানলাভ করিবার কার্য্য করিতে করিতে আহার বিহারের বস্তুলাভ করা সম্ভব হয় কি? তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, যাঁহারা কোন্ বস্তু মানুষের হিতকারী তাহা নিরূপণ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা মনুষ্যসাধারণের অতীব হিতকামী। মনুষ্যসাধারণ তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা শ্রদ্ধাযুক্ত এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাদের ইচ্ছাপূরণ করিতে যত্নবান থাকেন।

বুদ্ধিপ্রবণতার ফলে বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের ইচ্ছা, দ্বেষ সর্ব্বদা নিয়মিত। সাধারণ মানুষের তুলনায় বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের ঈপ্সিত বস্তুর সংখ্যা অল্প ও জটিলতাশূন্য। একে তাঁহাদের ঈপ্সিত বস্তুর সংখ্যা অল্প, তাহাতে আবার তাহা পূরণ করিবার লোকের সংখ্যা বহু, কাজেই বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের ঈপ্সিত আহার-বিহার অর্জ্জনে কোন অসুবিধা ঘটে না। জ্ঞানলাভ বিষয়েও বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতে থাকেন। কোন্ বস্তুটী মানুষের হিতকর, কোন্ বস্তুটী অহিতকর—প্রয়োগ দ্বারা তদ্বিষয়ক বিশ্লেষণের ফলে তাঁহাদের দ্বারা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতে থাকে। বস্তুবিষয়ক একমাত্র জ্ঞানলাভ করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা কোনও বস্তুবিশেষ সময়বিশেষে বুঝিতে না পারিলেও দুঃখানুভব করেন না। কোন একটী বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া মানুষ যখন উত্তেজনা অথবা দুঃখানুভব করে, তখন বুঝিতে হইবে তাঁহার কার্য্যে জ্ঞানলাভ করা ছাড়া যশোলাভ অথবা আধিপত্যলাভ ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা যথাযথ ভাবে বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, কোন সময়ে তাঁহাদিগের কোন বস্তু অবোধ্য হইলেও প্রতিনিয়ত বিধিবদ্ধ চেষ্টার ফলে কোন বস্তু চিরদিন তাঁহাদের অবোধ্য থাকে না। কাজেই বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের উদ্দেশ্য কখনও নিষ্ফল হয় না, ইহা বলা যাইতে পারে।

(২) কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় পরিণাম

ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য কতকগুলি বস্তুর সঙ্গ এবং অবয়বের উপভোগ দ্বারা তৃপ্তিলাভ।

উপভোগ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য হওয়ায় বহু জিনিষই তাঁহারা উপভোগ্য বলিয়া মনে করেন, ফলে বহু জিনিষের উপার্জ্জন করা তাঁহাদের কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। তাঁহাদের উপভোগের রকমও বহু। কিন্তু বুদ্ধিপ্রবণ লোকের উদ্দেশ্য একটী—যথা বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জ্জন। আর, প্রকৃত জ্ঞান কখনও একাতিরিক্ত নহে। তাঁহারা বহু বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেও সমস্ত বস্তুই ব্যবহার করেন একটী মাত্র উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাজেই বুদ্ধিপ্রবণ লোকের সমস্ত কার্য্যে শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়।

(৩) জীবিকার্জ্জন, কার্য্যক্ষমতা-রক্ষা এবং আয়ুষ্কাল সম্বন্ধীয় পরিণাম।

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ মাত্র জীবিকার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই কোন কার্য্য করেন না, অথচ কখনও তাঁহাদের জীবিকার অভাব হয় না—তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। কোন ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক ক্লান্তিকর কোন কার্য্য বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ করেন না। কাজেই তাঁহাদের যৌবন ও জীবন সহজে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বদাই তাঁহারা কর্ম্মপটুতা রক্ষা করিতে পারেন। প্রকৃত বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের শারীরিক শক্তি, মনঃ-প্রবণ মানুষের শারীরিক শক্তি অপেক্ষা অধিক।

[৫] বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের বিবিধ অবস্থা

(ক) স্বাধীন অবস্থা

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ সমাজ অথবা রাষ্ট্রের শৃঙ্খলিত পরিচালনার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের বশ্যতা স্বীকার করিলেও কখনও নিজ অন্নসংস্থানের জন্য কাহারও বশ্যতা স্বীকার করেন না। এই হিসাবে তাঁহারা সর্ব্বদাই স্বাধীন এবং সকলেরই মঙ্গলকারী।

(খ) প্রভুত্বাবস্থা

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ যখন কোন সমাজ অথবা রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন, তখন শারীরিক শক্তির ব্যবহার করেন না। কি উপায়ে সাধারণের মঙ্গলসাধন করা যাইতে পারে, ইহা বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের সর্ব্বদা চিন্তার বিষয় হইয়া থাকে। তাঁহারা সর্ব্বদাই নিজ নিজ জ্ঞানলাভের জন্য ব্যস্ত এবং রাষ্ট্র-পরিচালন-ব্যবস্থায় জনসাধারণকে তাঁহারা এমন ভাবে শিক্ষিত করিতে চেষ্টিত হন, যাহাতে জনসাধারণ স্ব স্ব হিতকর কার্য্যসমূহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন। জনসাধারণ যাহাতে কর্ত্তব্যবোধ হইতেই নিজ নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রের শৃঙ্খলারক্ষা করিতে পারেন—এবংবিধ শিক্ষা দেওয়াই বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কার্য্যপরিচালনার একটী প্রধান উদ্দেশ্য। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কীর্ত্তি ও কার্য্যকলাপ কখনও ক্ষণস্থায়ী হয় না। বুদ্ধিপ্রবণ লোকের দ্বারা পরিচালিত রাজ্যের জনসাধারণ প্রায় আপামর সকলেই স্বাবলম্বী, সন্তুষ্ট, নিরপরাধ, দীর্ঘ জীবন ও দীর্ঘ যৌবন-সম্পন্ন হইয়া থাকে। সমস্ত জমি উর্ব্বরাশক্তির এবং জলহাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তির চরম উন্নতিলাভ করে। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের ভাষা সর্ব্বদাই শৃঙ্খলাযুক্ত এবং মনের ভাব সর্ব্বদা পরিস্ফুট।

(গ) কার্য্যের অবস্থা

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের জীবনের অধিকাংশ কার্য্যই বুদ্ধিপ্রধান। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের জীবনে কোন অবস্থায়ই একটীও মনঃপ্রবণ বা ইন্দ্রিয়প্রবণ কার্য্য থাকিবে না, তাহা নহে। কোন মানুষ জন্মাবধি বুদ্ধিপ্রবণ হইতে পারে না—ইন্দ্রিয়প্রবণতা এবং মনঃপ্রবণতা শৈশবের ও যৌবনের স্বরূপ। প্রকৃত শিক্ষা না হইলে ইন্দ্রিয়প্রবণতা এবং মনঃপ্রবণতা থাকিয়া যায়। একমাত্র যথাযথ শিক্ষার দ্বারাই ইন্দ্রিয়প্রবণ ও মনঃপ্রবণ মানুষ বুদ্ধিপ্রবণতা লাভ করিতে পারে। একবার বুদ্ধিপ্রবণ হইলে ইন্দ্রিয়প্রধান ও মনঃপ্রধান কার্য্য একরূপ তিরোহিত হইয়া যায়—বলা যাইতে পারে।

[৬] বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের এবং বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যের উদাহরণ

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ কখনও যশের আকাঙ্ক্ষা করেন না। কাজেই ব্যক্তিগত ভাবে কোন মানুষ বুদ্ধিপ্রবণ হইলেও তাঁহাকে জনসাধারণ সহজে জানিতে পারে না। সাধারণতঃ তাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন বটে, কিন্তু যখন তাঁহারা সমাজ অথবা রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা সকলের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের রাজ্য-পরিচালনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সাধারণতঃ শারীরিক শক্তির ব্যবহার করেন না। প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণকে স্বাবলম্বী, নিরপরাধ, সন্তুষ্ট, দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘ জীবনসম্পন্ন করিয়া তোলেন। বর্ত্তমান জগতে সমস্ত জাতি যেরূপ যুদ্ধবিগ্রহের কল্পনায় সর্ব্বদা উন্মত্ত, প্রত্যেক জাতির

জনসাধারণের অধিকাংশ স্বকার জীবিকার জন্য যেরূপ পরমুখাপেক্ষী, এবং তদুপরি প্রত্যেক জাতির ভিতর অপরাধী লোকের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—তাহা দেখিলে কুত্রাপি বুদ্ধিপ্রবণ লোক-শাসিত রাজ্য বর্ত্তমানে আছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়।

আধ্যাত্মিক মানুষের পরিণাম

[১] আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের উদ্দেশ্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভ করা। তাঁহারা যত কিছু কার্য্য করেন, সমস্তই জ্ঞানলাভ করিবার জন্য। কিন্তু জ্ঞানলাভ করিবার কার্য্য আরম্ভ করিবা মাত্রই জ্ঞানলাভ হয় না এবং কোন বস্তুবিষয়ক কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেও সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার ক্রম তিনটী বলা যাইতে পারে, যথা :

(১) বস্তুটা মানুষের হিতকারী কিনা তাহা জানা,

(২) বস্তুটীর উপাদান কারণ কি এবং তাহার কার্য্য শক্তিই বা কোথা হইতে উদ্ভূত তাহা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে উপলব্ধি করা,

(৩) প্রত্যেক বস্তুর উপাদানের ও কার্য্যশক্তির মূল উৎস কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা।

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ যাবতীয় বস্তু মানুষের হিতকারী কিনা তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বস্তুর বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন এবং তাহার উপাদান কারণ কি এবং কোথা হইতে বস্তুর কর্ম্মশক্তি উদ্ভূত হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত ঐ বস্তুর মধ্যে উপলব্ধি করেন বটে, কিন্তু বস্তুর উপাদানের ও কার্য্যশক্তির মূল উৎস কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন না। অথচ ঐ মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে না পারিলে কোন বস্তু সম্যক্‌ভাবে মানুষের হিতকারী কি না, তাহা নিখুঁতভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না।

বস্তুর উপাদান কারণ কি এবং তাহার কর্ম্মশক্তি কোথা হইতে উদ্ভূত, ইহা বস্তুর মধ্যে উপলব্ধি করার নাম ভারতীয় ঋষিদিগের ভাষায় বস্তুর "আত্মা"কে উপলব্ধি করা।

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ বস্তুর আত্মা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন। যখন মানুষ বুদ্ধিপ্রধান কার্য্যের সাহায্যে বস্তুর কার্য্যকারণ বিশ্লেষণ করিতে করিতে প্রত্যেক বস্তুর আত্মা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন তাঁহাকে আধ্যাত্মিক মানুষ বলা যাইতে পারে।

কাজেই আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য বস্তুর উপাদান ও কর্ম্মশক্তির (অর্থাৎ আত্মার) মূল উৎস কোথায় তাহা খুঁজিয়া বাহির করা।

[২] আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যপ্রণালী

আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁহাদের কার্য্য বস্তুর যে অবস্থা বিষয়ক, সে অবস্থা সাধারণ মানুষের অপরিলক্ষিত। বস্তুতঃ মানুষ নিজ আত্মাকে (অর্থাৎ নিজের উপাদান কারণ এবং কর্ম্মশক্তি কোথা হইতে আসিতেছে তাহাকে) নিজের অভ্যন্তরে উপলব্ধি করিতে না পারিলে অপর কোন বস্তুর আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন না এবং আত্মাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে বস্তুর যে অবস্থা হইতে তাহার (বস্তুর) আত্মার কার্য্যের উদ্ভব হইতেছে তাহাও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

মানুষ নিজে বুদ্ধিপ্রবণ না হইয়া মনঃপ্রবণ হইলেও বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কার্য্য কি হইতে পারে, তাহার অধিকাংশ নিখুঁতভাবে অনুমান করিতে পারেন। কারণ বস্তুর যে অবস্থার জ্ঞানলাভ করা বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য, তাহা মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু বস্তুর যে অবস্থা আধ্যাত্মিক মানুষের পর্য্যালোচ্য, তাহা মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এবং কিয়দংশ কোন ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য নহে, একমাত্র আত্মারই গ্রাহ্য।

কাজেই কোন লেখক, মনঃপ্রবণ হইলেও তাঁহার পক্ষে বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের কার্য্যপ্রণালী কি হইতে পারে তাহা নির্ভুলভাবে অনুমান করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক না হইয়া আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যপ্রণালী অনুমান করিবার চেষ্টায় ভ্রম-প্রমাদের আশঙ্কা থাকে।

আমরা ভারতীয় ঋষিদিগের কথা হইতে আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা অনুমান করিতে পারি, তাহাতে ঐ কার্য্যপ্রণালী যে অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ তাহা বলা যাইতে পারে।

[৩] আধ্যাত্মিক মানুষের শক্তি

বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ যখন বস্তু বিশ্লেষণ করিতে করিতে তাহার (বস্তুর) আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া আধ্যাত্মিক আখ্যাযোগ্য হন, তখন তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ মানুষের তুলনায় জীবন-রক্ষা বিষয়ে সমধিক শক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। আধ্যাত্মিক মানুষ তাঁহার উদ্দেশ্যের সমগ্রসীভূত কাজ করিতে করিতে মানুষের উপাদানের ও কর্ম্মশক্তির মূল উৎসের অনুসন্ধান করিয়া তাহার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলে অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। সে শক্তি সাধারণ ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই অবস্থায় মানুষের জীবন কি তাহা সম্যক্‌রূপে এবং নিখুঁত-ভাবে বুঝা সম্ভব হয়, জীবনের কোনরূপ ক্ষয় আরম্ভ হইলে তাহা উপলব্ধি করা যায় এবং কি করিয়া জীবনের ক্ষয় বন্ধ করা সম্ভব হইতে পারে তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। "মানুষ তিন চারিশত বৎসর বাঁচিতে পারে" এই জাতীয় কোনরূপ কথা বর্ত্তমান জগতে আজগুবি গল্প বলিয়া পরিগণিত হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমাদের মনে হয় মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে এবং প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক হইতে পারিলে তিন চারি-শত বৎসর পরমায়ুলাভ করা খুব দুঃসাধ্য নহে। সংস্কৃত ভাষাবোধের বিকৃতির জন্য আজ ভারতীয় ঋষির বস্তু-বিষয়ক বিজ্ঞান বহু অলীক কথার পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু যদি কখনও সংস্কৃত ভাষাবোধ যথাযথ হয়, তাহা হইলে ভারতের বেদ ও দুইটী মীমাংসা হইতে বস্তু-বিষয়ক বহু অভূতপূর্ব্ব জ্ঞানের সংবাদ পাওয়া যাইবে এবং তখন কি করিয়া মানুষের জীবন ও যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করা যায় তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। হয়ত ইহাও উপলব্ধি করা যাইবে যে, বেদ-মূলক জ্ঞানের সাহায্যে ভারতবর্ষের সংগঠন করিয়া এই ভারতবর্ষেই মানুষের যৌবন ও জীবন যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে ভারতীয় ঋষিগণ সমর্থ হইয়াছিলেন।

[৪] আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যের পরিণাম

(১) উদ্দেশ্য বিষয়ে পরিণাম

আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য বস্তুর উপাদান ও কর্ম্ম-শক্তির উৎস খুঁজিয়া বাহির করা, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মানুষ একবার আধ্যাত্মিক হইতে পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সহজ হয়—তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আধ্যাত্মিক মানুষের ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্মগুলি খুব নিয়মিত হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় না। আধ্যাত্মিক মানুষ আহার-বিহারের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্য কোন কার্য্য করেন না বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক কার্য্য করিবার জন্য তাঁহার আহার-বিহারের ইচ্ছা পূরণ করিতে হয়। বস্তুবিষয়ক জ্ঞান অসীম হওয়ায়, আধ্যাত্মিক মানুষ অতি সহজেই তাঁহার আহার-বিহারের ইচ্ছা পূরণ করিতে সমর্থ হন।

(২) কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে পরিণাম

আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যপ্রণালী সম্যক্‌ রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য।

[৫] আধ্যাত্মিক মানুষের বিবিধ অবস্থা

(ক) স্বাধীন অবস্থা, প্রভুত্বাবস্থা ও পরাধীন অবস্থা

আধ্যাত্মিক মানুষ কখনও পরাধীন হন না এবং বস্তুতপক্ষে তাঁহারা সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্যযুক্ত হইলেও কার্য্যতঃ কাহারও উপর প্রভুত্ব করেন না। রাজ্য-পরিচালনা সাধারণতঃ বুদ্ধিপ্রবণ মানুষের দ্বারা সাধিত হয়। বুদ্ধি-প্রবণ মানুষের কার্য্যে ভ্রান্তি থাকা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক মানুষের ভ্রান্তির সম্ভাবনা ক্রমশঃই কমিয়া যায়। যখন দেশে আধ্যাত্মিক মানুষের উদ্ভব হয়—তখন তাঁহাদের জ্ঞানের সহায়তা লইয়া বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ সাধারণের বিবিধ কার্য্যের সংগঠন করিয়া থাকেন। ফলে সমস্ত ব্যবস্থাই অভ্রান্ত হওয়া সম্ভব হয় এবং জনসাধারণের যাহা কিছু কাম্য তাহাও সুলভ হয়।

(খ) কার্য্যের অবস্থা

আধ্যাত্মিক মানুষের জীবনের অধিকাংশ কার্য্যই আধ্যাত্মিক। তাঁহারা কখনও কখনও বুদ্ধিপ্রধান কার্য্য করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কোন সময়েই ইন্দ্রিয়প্রধান ও মনঃ-প্রধান কার্য্য করেন না। যে আধ্যাত্মিক মানুষ তাঁহার উদ্দেশ্যের সমগ্রসীভূত কার্য্যে যত অধিক অগ্রসর, তাঁহাকে তত উন্নত আধ্যাত্মিক মানুষ বলা যাইতে পারে।

[৬] আধ্যাত্মিক মানুষের এবং আধ্যাত্মিক কার্য্যের উদাহরণ

বর্ত্তমান জগতে মানুষের জীবন ও যৌবনের দৈর্ঘ্যের যেরূপ দ্রুত পতন আরম্ভ হইয়াছে, অধিকাংশ মানুষ যেরূপ পর-মুখাপেক্ষী হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং অসন্তুষ্টি ও অপরাধ যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আধ্যাত্মিক মানুষের একান্ত অভাব হইয়াছে বলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শিল্পী শ্রীসুধীর
কুমার দত্ত।

শিল্পীর দক্ষিণ হস্ত একেবারে
অকর্ম্মণ্য। বাম হস্তে
তাঁহাকে শিল্প-সাধনা
করিতে হয়।

ধৃতরাষ্ট্র বাবা

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

পরিবার সমৃদ্ধ, বনেদী। বিষয়-আসয় এক, অন্ন ভিন্ন। এক সময়ে সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিতেন, তখন হইতে অন্ন ভিন্ন ছিল, তাহাই রহিয়াছে। তিন ভাই, তিন বৌ—ছেলে মেয়ে অনেক। সকলের সঙ্গে সকলের সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতির বন্ধন আছে। তবু যে পৃথকান্ন কেন, তাহার অবশ্য কারণ আছে; কিন্তু তাহা বিবৃত করিবার স্থান ও কাল এখানে ও এখন নয়।

বড় ভাই ইন্দুপ্রকাশ, এ্যাডভোকেট, বয়স পঞ্চান্ন। দেবদ্বিজসাধুসন্ন্যাসীতে অগাধ ভক্তিসম্পন্ন। তস্য গৃহিণী বিমলা দেবী বাড়ীর বড় গিন্নী; বয়স হইয়াছে, চেহারাটিও ভারিক্কে; দুই ছেলে। বড় ছেলের দু'টি মেয়ে; দুই মেয়ের যথাক্রমে চারিটি ও তিনটি করিয়া ছেলে ও মেয়ে। সন্ধ্যার পরই নাতি নাতনীদের লইয়া তিনি সেই যে শোবার ঘরে ঢোকেন, আর তাঁহার সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। ছোট ছেলে অকৃতদার।

মেজবাবু বিন্দুপ্রকাশ, ব্যারিষ্টার, বয়স উনপঞ্চাশ। যথেষ্ট আয়, অপরিমিত ব্যয়। তাঁহার গৃহিণী শোভনা দেবীর বয়স আটত্রিশ উনচল্লিশ হইলেও দেখায় ত্রিশের নীচে; সন্তানাদি নাই। বৎসরে দুইবার কাশীতে বিশ্বেশ্বর, তারকেশ্বরে তারকনাথ, আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর প্রভৃতি দেবতাদিগের দ্বারে ও মন্দিরে ধর্ণা দিয়া আসিয়াছেন, আজ কত দিন! কত পূজা-অর্চ্চনাই না করিয়াছেন, দেবতারা মুখে যেমন কথা বলেন না, দেখা যাইতেছে, কানেও তেমনই কথা শোনেন না। শোভনা দেবী কাশীধামে সন্ন্যাসীদিগের জন্য একটি মঠ নির্ম্মাণ করাইতেছেন, কুড়ি হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, আরও কয়েক হাজার লাগিবে। এত কাণ্ড করিয়াও, তিনি যে সন্তানের মুখ দেখিতে পাইলেন না, সে দোষ কাহার? ইদানীং তাঁহার মনে হইয়াছে, পূজার্চ্চনা, সাধুসন্ন্যাসীসেবা ইত্যাদিতে কোন বিঘ্ন থাকে বলিয়াই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে না। ইহাতেও তাঁহার মনঃপীড়ার অবধি নাই।

ছোটবউ ও ছোটবাবুর কথা পাড়ার সর্ব্বজনবিদিত। ইহারা যেন কপোত-কপোতী। পাঁচটি ছেলে, দুইটি মেয়ে হইয়া গিয়াছে, বড় মেয়েটির বিবাহের বয়স হইয়া আসিল, তবুও ইহারা যেন নবদম্পতী। এই সেদিন যেন ফুলশয্যা হইয়াছে। ছোট বাবু ল'-কলেজের প্রোফেসর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, বহু ইংরাজী ও বাঙলা সাময়িক পত্রের নিয়মিত লেখক; টেম্পারেন্স এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি; রেটপেয়ার্স সোসাইটীর সম্পাদক; ইয়ংমেন্স ডিবেটিং ক্লাবের পেট্রন; পল্লীর মহিলা সমিতি, বালক সঙ্ঘ, তরুণ ছাত্র-সভা, ব্যায়াম-অনুশীলন সভা প্রভৃতির বিশিষ্ট সভ্য। লোকটি ক্ষণজন্মা। এতগুলা কাজ তিনি করেন কখন, ইহা দস্তুরমত বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহাকে দিনের মধ্যে ছয় হইতে সাত এবং রাত্রে বার'র মধ্যে সাড়ে এগারো ঘণ্টা ছোটবধূর ঘরের মধ্যেই বিরাজিত থাকিতে দেখা যায়। তিনি একজামিনের খাতা দেখেন, ছোটবউ পেন্সিল কাটিয়া দেন; কলেজে পড়াইবার জন্য আইন-বই ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তিনি যে সমস্ত পৃষ্ঠা নির্ব্বাচিত করেন, খবরের কাগজের শিরোদেশ কর্ত্তন করিয়া লম্বা লম্বা ফ্ল্যাগ করিয়া ছোটবউ পত্রাঙ্ক-নির্দ্দেশকচিহ্ন আঁটিয়া দেন; প্রোফেসারের চশমার কাচ মুছিবার জন্য স্যালভাইট্-বস্ত্র-খণ্ড, ফাউণ্টেন পেনে কালী ভরিবার জন্য ফিলার, সরুগলা নস্যের শিশি হইতে নস্য বাহির করিবার জন্য খড়িকা এ সমস্তই ছোটবধূ ইলাকে সর্ব্বদা হাতের কাছে জোগাড় রাখিতে হয়। ইলা মেয়েটি বড় ভাল। এই সমস্ত গুরুতর ও কঠিন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সাতটি পুত্র-কন্যার খবরদারী করিতে তাহার যে সময়াভাব হয় না, ইহাও অনেকের নিকট যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। অপিচ বাড়ীর বড় এবং ছোট, মান্য ও নগণ্য, দাস এবং দাসী, পুরুষ ও নারী সকলকে, সকল স্থানে ও সকল সময়ে হাসাইয়া বেড়ান ইলার আর একটি বড় কাজ। অত্যাবশ্যক কার্য্য করিবার জন্য তাহাকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। বড়গিন্নীর ঝি মাছ কুটিতেছে, চিল ছোঁ মারিয়া একটুকরা মাছ লইয়া

গেল—ব্যাপারটা সামান্য, কাহারও জানিবার কথা নয়, কোথা হইতে আর এক জাতীয় চিলের মত ছোটবউ আসিয়া ঝি'র মাথা, হাত, বঁটি পরীক্ষা করিতে বসিল। চিল শুধু মাছই লইল, না সেই সঙ্গে আরও কিছু সংগ্রহ করিল! মেজদি' পূজায় বসিয়াছেন, তাঁহার কাবুলী বিড়ালটি পার্শ্বে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে ছোটবউ পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া, তাহার সামনে কোশাকুশি, পঞ্চপাত্র প্রভৃতি রাখিয়া আসিয়া বাড়ীশুদ্ধ লোককে মেজদির পূজার ঘরে পাঠাইয়া দিল। বড় জা মুড়ি ভালবাসেন। রোয়াকে, রৌদ্রে পা ছড়াইয়া বসিয়া ঘি-মাখা মুড়ী, মটরশুঁটি, ছোলাভাজা বা নারিকেল খণ্ড, রোজ খাওয়া চাই। দাঁতগুলায় তেমন জোর নাই—অবশ্য কেহ বলিলে তিনি প্রবলবেগে প্রতিবাদ করেন—মুড়ীর সরা শেষ করিতে তাঁহার অনেক সময় ও অনেক পরিশ্রম লাগে। হঠাৎ এক সময় সরা পান না, হাত বাড়াইয়া না পাইলে, চক্ষু খুলিতে হয়, চক্ষু খুলিলে দেখা যায়, সরা অদৃশ্য। আর চক্ষু তুলিলে দৃষ্ট হয় যে, ছোটবউ দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঘোররবে কাক তাড়াইতেছে। তাড়াইবার ভঙ্গী ও ভাষার কি বাহার! মুখপোড়া কাক! দিদিমণির মুড়ীর সরা চুরী করে পালান? দাঁড়াও না, পুলিসে খবর দিয়ে দু'পায়ে বেড়ি পরিয়ে তবে ছাড়ব! বড় জা' বলিলেন, তবে রে বাঁদরী, তুই আমার সরা নিয়ে গেছিস্। আমি মনে করলুম, শিবে কি বিশু কেউ নিয়ে পালাল বুঝি!

শিবে ও বিশু ওরফে যথাক্রমে শিবনাথ ও বিশ্বনাথ বড়-গিন্নীর দুই অপ্রাপ্তবয়স্ক দৌহিত্র।

এই গেল পরিবারের পরিচয়। এইবার কাজের কথা বলি। কয় মাস হইতে মেজবধূ ঠাকুরাণীর মহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের বড় ভিড় লাগিয়াছে। হলঘর খানি হইতে রোজই হোম-যাগ-যজ্ঞের ধোঁয়া, ছাই, মন্ত্রের শব্দ বিনির্গত হইতেছে। গতকল্য পুত্রেষ্টি-যাগ সমাপন করিয়া যে 'বাবা'টি দক্ষিণান্ত হইয়া বিদায় লইয়াছেন, শিবু দেখিয়া আসিয়াছে, মেজ দিদু তাঁহাকে দশখানা একশ' টাকার নোট দিয়া, প্রণাম করিয়া খামচা খামচা পায়ের ধুলা লইয়া মাথায়, বুকে, পেটে মালিস করিয়াছেন। শিবু বড়বধূর বড় মেয়ে সতীর বড় ছেলে, বছর বার বয়স।

সেই কথাই হইতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাচলিতেছিল, গোড়াটা আমাদের ধর্ত্তব্য নয়, আগা অর্থাৎ শেষটা এইরূপ।

ছোট বধূ ঘোররবে কাক তাড়াইতেছে।

—তুমি যদি আমায় ভরসা দাও বড় দি, আমি ঠিক পাঁচটি হাজার টাকা বার ক'রে আনি।

—কি ক'রে পারবি?

—শুনবে? শোন, কিন্তু কাউকে ব'লো না। ভারী পেট-আলগা মানুষ, না খাবার, না কথা, তোমার পেটে যদি কিচ্ছু হজম হয়!

—থাম্ লা ছুট্‌কী থাম! আমায় তুই পেট-আলগা বলিস্! আমি পেট-আলগা যদি, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এতগুলো নাতি নাতনীর দিদিমা হলুম কি করে লা? তোর বিয়ে দিয়ে আনলে কে লা? তোর ছেলেমেয়েদের মানুষ করছে কে লা? তোর ভাতার যে বরাবর পাশ ক'রে জলপানি পেল, কে ওকে

তোর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে পড়তে বসাত না ছুটকী? তুই তখন কোন্ পাদাড়ে পড়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করছিলি না ছুঁড়ী?

—চুপ বড়দি চুপ, যা বল, তা বল, ছুঁড়ী ছুঁড়ী ক'রো না, চারদিকে ছেলেমেয়ে ঘুরছে। একেই ত তোমার আস্কারায় আমায় কেউই মানে না, তার ওপর—

—আমার আস্কারায়, না তোর ব্যাভারে না? দিন রাত মাগভাতারে চকাচকীর মত বসে' থাকলে কেউ মানে কখনও?

—ঐ ত তোমাদের দোষ বড় দি! মানুষটা যে কত অলবড্ডে, সেটা ত তোমরা দেখবে না। একদিন কলেজ থেকে এসে শার্ট খুলতে খুলতে ব'লে উঠল, তার কাছাটা হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছে না। খুলে গেছল, খুঁজে দিই, তবে হয়! একদিন দেখি, খাটের গদি-গুলোকে রোদ্দুরে দিয়ে আইন-বই সাজিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে আছে। ব্যাপার কি? না, বইগুলোয় ছাতা ধরে যাচ্ছে, তাই রৌদ্রে দেওয়া হয়েছে, পড়বার কিছু হাতে নেই তাই চোখ বুজে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছে! যাক্ গে, ও সব বাজে কথা। কাজের কথা এই যে, কর্ত্তারা পরীর পাত্তর দেখতে যাচ্ছেন কবে বল ত?

—রবিবারে। রবিবারে সকলেই যাবে, ফিরতে বিকেল।

—ঠিক ত?

—হ্যাঁ।

—বেশ, রবিবারেই মেজদি'র মহলে 'ধৃতরাষ্ট্র বাবার' শুভাগমন হবে।

—সে আবার কে?

—নাঃ, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না বড় দি! গল্পের বই পড়তে বসলে কি, আগে উপসংহারটি পড়া চাই। কথা পড়ল ত অমনি কুলুজী চাই! ধৃতরাষ্ট্র কে? তার বাপের নাম কি? ক'টি ছেলে ক'টি মেয়ে? কোথায় বাস? কি করে? ধৃতরাষ্ট্র চোখে দেখে, না অন্ধ? অত খোঁজে তোমার দরকার কি বাপু? সোজা কথা জেনে রাখ, এক সময়ে ধৃতরাষ্ট্র বাবা একশত পুত্রের জনক ছিলেন, এক্ষণে শ্রীশ্রীধৃতরাষ্ট্র পরমহংস। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণে কল্পতরু বিশেষ। তাঁর আশীর্ব্বাদ পেলে, মেজদি'র দুঃখ নিশ্চয়ই ঘুচবে। তবে একটু মুস্কিলও আছে।

—কি মুস্কিল?

—বাবা কোথায়ও যান না, আমার ন'দাদা ধৃতরাষ্ট্র বাবার শিষ্য, অনেক কষ্টে একবার আমাদের বাড়ীতে এনেছিলেন, বাবার অসুখের সময়। দক্ষিণে লেগেছিল, পাঁচ হাজার। ধৃতরাষ্ট্র বাবা ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় অনেক মন্দির, অনাথ আশ্রম, বিধবা-ভবন ক'রে দেন কি-না, তাই তাঁকে কাঞ্চন ছুঁতে হয়।

—তা'তে আর মুস্কিল কি বল্! মেজো ত খোলামকুচির মত টাকা ছড়াচ্ছে, ধেরতোরাষ্ট্র বাবার জন্যে পাঁচ হাজারে সে ব্যাজার হবে না।

—পাঁচ হাজারে হচ্ছে কৈ বড় দি! আমার যে আধাআধি কমিশন চাই! দালালী নিতে হবে না?

—মরণদশা আর কি! তুমি কোন্ দুঃখে দালালী নিতে যাবে?

—দালালী নিতে দোষ কি! তবে তুমি যখন বলছ, না হয় নাই নিলুম। এমনই ক'রে দিই।

বড়বধূ বিমলা স্নেহস্বরে বলিলেন, আহা দে দে তাই করে দে! একটা কিছু কোলে পাক্। মাগী বর্ত্তাক্।

ছোটবধূ বলিল, তুমি কিন্তু কিছুটিতে থাকতে পাবে না; কোন কথায় না। আমি যা যা ব'লে দোব, শুধু তাই করবে। প্রথম নম্বর শোন, আমি কাল বাপের বাড়ী যাচ্ছি—

—অ্যাঁ! ঠাকুরপো—

—সঙ্গে যাবে। বাক্স-বিছানা গাড়ু-গামছা রেখে কেউ যায়? হ্যাঁ, তুমি জেনে রাখ আমার কাকার ব্যামো। কিছুদিন আমরা সেখানেই থাকব। কাল চিঠি এসেছে, জান ত?

—কি ক'রে জানব? তুই কি কিছু বলিস্ না? আর বলবার তোর সময়ই বা কোথা? দিন রাত পায়রার খোপের মধ্যে বক্ বকম্ করবি—

ছোটবধূ রাগ করিয়া বলিল—

বক্ বকম্ ছোলার ডাল
ছোলা হলে খাব ডাল।

তা' চিঠিখানা তোমায় পাঠিয়ে দোবখন, পড়ে দেখো। আর পড়েই বা কি হবে ছাই? পড়বেই বা কি ক'রে বল? কোথায় চশমা, কোথায় কি, পড়ার নামে তোমার যে ভয়!

—পড়ার নামে আমার ভয়! তোর কথাগুলো দেখ্ ছুটকী, বড্ড চ্যাটাম্ চ্যাটাম্! তোর ভাতারের ঘুম ভাঙিয়ে একজামিনের পড়া করিয়েছে এতকাল কোন্ গতরখাকী রে?

—তুমি গতরখাকী কেন হতে যাবে বড় দি! যাক্, যা বলি শোন, ন'দাদাকে দিয়ে খবর আনিয়ে কালই তোমায় চিঠি লিখব, ধৃতরাষ্ট্র বাবা কবে আসবেন, কি বৃত্তান্ত। তুমি চিঠি পেলে মেজদিকে ব'লে সব ব্যবস্থা করিও। আমি এখন অবশ্য মেজদি'র সঙ্গে একটু কথা ক'য়ে রাখছি। বুঝলে ত?

—হ্যাঁ রে ছুটকী, ধেরতোরাস্‌টো বাবা রোগা হবার একটু ওষুধ দিতে পারেন না?

—এলে—ব'লো। পারবেন বোধ হয়।

২

দিব্যপ্রকাশ—বাড়ীর ছোটবাবু, নামটা এতক্ষণ অপ্রকাশ ছিল বলিয়া আমরা দুঃখিত। তবে আমাদেরও বিশেষ দোষ নাই। যেহেতু ছোট তরফে তাঁহার অস্তিত্বের পরিচয় বড় অল্প। সে মহলকে পাড়ার লোকে রঙ্গ করিয়া জাহাঙ্গীরবাগ বা নূরজাহান-মহল বলিত। একদিন অতি প্রত্যূষে নূরজাহান-মহল খালি করিয়া দিব্যপ্রকাশ সপুত্র-কন্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। আইন-বিদ্যালয়ের পুস্তকরাজি, ইত্যাদি এবং প্রভৃতিও সঙ্গে গেল। প্রকাশ, দিব্যপ্রকাশ বাবুর খুড়শ্বশুর মহাশয় অসুস্থ, ভ্রাতুষ্কন্যাজামাতাকে এখন কিছুদিন সেখানেই থাকিতে হইবে।

যেদিন তাঁহারা গেলেন, তাহার পরদিন এ বাড়ীতে এই চিঠি আসিল।

৫০।১০।৯।১০।৩।২।১।৪এ নন্দী ষ্ট্রীট
নূতন বালিগঞ্জ, কলিকাতা
বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীচরণকমলালয়াসু

বড় দিদিমণি, আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। কাকাবাবুর বড় অসুখ, দশ বারজন ডাক্তার, তিন চারজন কবরেজ, দুইজন হোমোপ্যাথী তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। সকালে কবরেজী মতে অরিষ্ট, রসায়ন, দুপুরে নস্য সিন্ধু, বেলে থার্ট, রাত্রে শিশি শিশি ফিভার মিকচার, লিনিমেণ্ট, চলিতেছে। একজন অবধূত ছাই-ভস্মও দিতেছেন। সকলেই বলিতেছেন, কোন ভয় নাই। শুনিয়া আমরা খুব আশ্বস্ত আছি। আমরা এখন কিছুদিন এখানে থাকিব। আপনি আমার জানোয়ারগুলিকে দেখিবেন। হরিণটাকে যেন কেউ চান করায় না; ময়ূরগুলা যেন ঘরেই থাকে, নইলে ছেলেপুলেদের কামড়াইয়া দিবে। ময়নাটাকে পড়ান হয় যেন; শিবু জিমিকে লইয়া সকালে হেদোয় বেড়াইতে যায় ত? ক্যানারী ক'টাকে মধু যেন রোজ রাত্রে বারান্দা হইতে ঘরে তুলিয়া রাখে, যে বেরালের উপদ্রব!

আমাদের এখানে এক সিদ্ধ-বাবা আসিয়াছেন। কত চিরকেলে রোগীর রোগ যে সারাইয়াছেন তাহা বলা যায় না। আমাদের পাড়ায় একজন বৌয়ের বছরে দুইবার ছেলেমেয়ে হইয়া মরিয়া যাইত, সিদ্ধ-বাবার মাদুলী ধারণ করিয়া তাঁহার ছেলে এবার বাঁচিয়া আছে। খুব মোটা ও নাদুসনুদুস চমৎকার ছেলে হইয়াছে। সিদ্ধ-বাবার নাম ধৃতরাষ্ট্র বাবা। আর একটি বাঁজা বৌয়ের যে কি সুন্দর ছেলে হইয়াছে তা' আর আপনাকে কি বলিব? মেজদিদিমণি অনেক সাধুসেবা করিলেন, বরাতের দোষে কিছুই হইল না। মেজদি'মণি যদি বলেন, ধৃতরাষ্ট্র বাবাকে রবিবার দিন ও বাড়ীতে পাঠাইতে পারি। ধৃতরাষ্ট্র বাবা কাহারও বাড়ী যান না, তবে যদি দয়া করিয়া যান, তাহা হইলে যাহার যাহা কামনা, তখনি তাহা পূরে। বাবা হরিদ্বারে সাধুদিগের জন্য আশ্রম তৈরী করিতেছেন, বিশ হাজার টাকা দরকার। ধৃতরাষ্ট্র বাবা মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট কিছু চাহেন না তাই, নহিলে বিশ হাজার টাকা এক মিনিটে পাওয়া যায়। পনেরো হাজার টাকা তাঁহার তিনজন ভক্ত দিয়াছে। মেজদি'মণি কি বাকী পাঁচ হাজার দিবেন?

আপনারা আমাদের অসংখ্য প্রণাম জানিবেন, ছেলেদের মেয়েদের সকলকে আমার হইয়া একটি করিয়া চুমু দিবেন। কেহ যেন বাদ না পড়ে।

পত্রের উত্তরে কুশল লিখিয়া চিন্তা দূর করিতে ভুলিবেন না।

আপনার আদরের—
ছুটকী।

পুঃ। ওঁরা বলিতেছেন, রবিবারে ১১টার গাড়ীতে পাত্র

দেখিতে যাওয়ার কথা আছে। বড় ঠাকুর ও মেজ ঠাকুরের সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে মিলিবেন।

—ছুটকী

পুনশ্চ। জিমি আর ন্যাকার করে না ত? উহাকে দই মাখা ভাত দিতে বলিবেন।

—ছু

পুনশ্চ পুনশ্চঃ। মেজ দি'র মত যেন কালই জানিতে পারি।

—ইলা পোড়ারমুখী

মেজবধূ ঠাকুরাণী চিঠিখানি বার বার পড়িয়া বড় জা'কে বলিলেন, তুমি আজই চিঠির জবাব দাও বড় দি। রোববারে যেন অতি অবিশ্যি বাবাকে পাঠায়। কোনমতে অন্যথা না হয়।

বড়বধূ বলিলেন, একবার মেজ ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস্ করবি নে?

– তুমি পাগল হলে নাকি বড় দি? জিজ্ঞেস্ করলেই ত বকুনী খেতে হবে। বলবে, আমি করব রোজগার, আর তুমি করাবে ভূত ভোজন? আমিও ছাড়ি নে বড় দি, বলি খুব। বলি, মেয়ে মানুষ হ'তে যদি আমার দুঃখু বুঝতে! ভিখিরী হাত থেকে ভিক্ষে নেয় না, শুভকাজ-কর্ম্মের বাড়ীতে কিছুতে হাত দেবার যো নেই, বাঁজা মেয়েমানুষ দেখলে সবাই সরে' সরে' বসবে! পুরুষ মানুষ এ দুঃখের কি বুঝবে বল?—মেজবধূ কাঁদিয়া ফেলিলেন। বড়গিন্নীর বিষম ব্যাধি, কাহারও কান্না দেখিলে তাঁহারও কান্না আসে। মোটা মানুষের কাঁদাও মুস্কিল! কোথায় হাত, কোথায় আঁচল, কোথায় চোখ, অষ্টবজ্র সম্মিলন করিতেই প্রাণান্ত! তিনিও প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া পড়িয়া বলিলেন, চুপ কর মেজো, চুপ কর। আমি ছুটকীকে আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি।

তারপর দুইজায়ে সুখদুঃখের অনেক কথাই হইল। কথাগুলার বেশীর ভাগই মেজার মন্দ বরাত সম্পর্কিত। না 'তিনি' বয়স থাকিতে আর একটি বিবাহ করিলেন, না ভগবান 'ইহার' মুখের পানে চাহিলেন। 'ওঁর' কি, বললেই বলবেন, শিবু আছে, মুখাগ্নি যোচায় কে? কিন্তু দিদি, ছেলের হাতের আগুনটি কোন্ বাপ মা না চায় বল ত? না জানি আর জন্মে কত পাপই করেছিলুম, এ জন্ম ত এমনিই গেল, আসছে জন্মও হা-জল হা-জল ক'রে বেড়াতে হ'বে!

বড়বধূ সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ছুটকী ত অত ক'রে লিখেছে, দেখ না, ধেরেতোরাসটো বাবার দয়া হ'লে—

—ছুটকীর দু'হাতভরা হীরের চুড়ী গড়িয়ে দোব। তুমি কিন্তু চিঠিটা লেখ দিদি, যে তোমার ভুলো মন, ভুলে ব'সে থাকবে।

—না, রে না, এই লিখছি তোর সামনে, বলিয়া তিনি শিবুর হাতের লেখার খাতার একখানি পাতা ছিঁড়িলেন। শিবুর কলম দোয়াত লইয়া লিখিলেন—

শ্রীদুর্গা

স্নেহের ছুটকী

তোমার পত্র..............................

৩

ইলার ন'দাদা 'সন্নিসি' লোক। সে দাড়ি কামায় না, মাথার চুল ছাঁটে না, দাড়ীতে সাবান বা মাথায় তেল দেয় না। সাদা কাপড় গেরিমাটিতে রঙাইয়া পরে। চর্ম্ম-পাদুকার পরিবর্ত্তে রোপ-সোল্ ব্যবহার করে। নখগুলা এত বড় করিয়া বসিয়াছে যে, বাড়ীর ছেলেরা তাহার কাছে ঘেঁসে না, বোধ হয় ভাবে সামান্য আদরেও তাহাদের গাত্রচর্ম্ম উদ্ভিন্ন হইতে পারে। তিনি বিবাহ করেন নাই, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া; তবে লোকটি ভাল, মেজাজটি চমৎকার। পরোপকারী, আশ্রিতবৎসল, সদাহাস্যরসপরায়ণ। এমন লোক যে বিয়ে-থা না করিয়া কেমন করিয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া থ' হইতে হয়।

ন'দাদা বলেন, দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে দেশের লোকের কৌমার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে।

ইলার সঙ্গে ন'দাদার ভারি ভাব। যৌবনে দিব্যপ্রকাশ ও ন'দাদা সহপাঠী ছিলেন; পরে একজন ভগ্নীপতি অন্যজন শ্যালক হইয়াছেন। বিবাহের ঘটক ন'দাদাই। বোন্টি বিশেষ সুখী ও খুশী, ইহাতে ন'দাদার বড়ই আনন্দ। ইলার কথা উঠিলেই ন'দাদা রুক্ষ চুলে চিরুণী পুরিয়া হাঁচড়াইতে এবং আঁচড়াইতে থাকেন; কেশ তৈলাক্ত করিতেও ইচ্ছা হয়।

ইলার সব পরামর্শ ন'দাদার সঙ্গে।

প্রথমটা ন'দা রাজী হন নাই। পরে ইলা যখন বুঝাইল, ন'দা মাত্র ধৃতরাষ্ট্র বাবার তল্পী বহন করিয়াই অব্যাহতি পাইবেন, তাঁহাকে কথাও কহিতে হইবে না, ধুনী হইতে ছাই তুলিয়া সমাগত নর-নারীকে বিতরণ করিতে হইবে না—ঔষধভিক্ষুককে ঔষধ, সন্তানভিখারীকে মাদুলী, ঐশ্বর্য্য প্রত্যাশীকে ফুল; চাকুরী-লোলুপকে বিগ্রহবিধৌত বারি দান করিয়া ভণ্ডামীর চূড়ান্ত অভিনয় করিতে হইবে না, পক্ষান্তরে অকুস্থলে গিয়া মৌনী চেলা সাজিয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে—তখন ন'দাদা রাজী হইয়া গেলেন। শুধু রাজীই নয়, তখনই সামার্স এণ্ড কোম্পানী হইতে নারী-সজ্জাকর ও নাট্যমন্দির হইতে গোঁফদাড়ী পরচুলা লইয়া ইলার ঘরে আসিয়া উদয় হইলেন। আজ রবিবার, দিব্যপ্রকাশ দশটার সময় আহারাদি সারিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় বড় দুঃখে বার চৌদ্দটা 'তা খাইয়া' ইলাকে বলিয়া গিয়াছেন, তোমার দাড়ী গোঁফপরা মুখে 'এই' খাইতে পাইলাম না, এ আমার বড় দুঃখু! ইলা অঙ্গীকার করিয়াছে, আর একদিন সে মূর্ত্তি দেখাইয়া সকল দুঃখের অবসান করিবে।

বেলা বারটা হইতে সাজ সুরু হইল। সামার্স-এর বাড়ীর মেয়েটি, উঃ, কি অদ্ভুত লোক, ইলার অমন যে শিশিরধোয়া গোলাপের মত রঙ, তাহাকে কি করিয়া যে ঘোলাটে তামাটে করিয়া তুলিল! উঃ, সত্যিই উঃ—

ন'দাদা পরচুলা পরাইলেন, গোঁফদাড়ী আঁটিয়া দিলেন, ইলা নিজে গৈরিক ধারণ করিল, রুদ্রাক্ষ পরিল, মেম্ আবক্ষ-কক্ষ বাঘছাল বাঁধিয়া দিল। দুইটা বাজিতে কুড়ী মিনিট দেরী, ট্যাক্সি আসিতে প্রবলপরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র বাবা ও তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধন শ্যামবাজারের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

হাঁা, একটা কথা বলিতে হইতেছে। কথাটা গোপনীয়, কিন্তু না বলিলেও নয়। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র বাবা আর্সির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের ছবি দেখিয়া নিজেই চমকিলেন। যে লোক দাড়ীগোঁফ শুদ্ধ মুখে কি একটা কার্য্য করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিল, সে লোক উপস্থিত থাকিলে মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার মত অত্যল্প স্থানও যে মুখমণ্ডলে নাই ইহা মনে করিয়া হাসি চাপা তাহার দায় হইয়া উঠিতেছিল। হাসিবার উপায় নাই—ন'দার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট, হাসি বন্ধ। হাসিবামাত্র চুক্তিভঙ্গ। চুক্তিভঙ্গে—ড্যামেজ। ড্যামেজ, তিন দিন তিন রাত্রি দিব্যপ্রকাশের নিরবচ্ছিন্ন অদর্শন! গুরুতম দণ্ড! কাজেই হাসা হইল না—হাসিতে হাসিতে হাসি হইল না।

ভাগ্যে ইলার ছেলেমেয়েদের আজ দশটার পরেই তাহাদের মাসীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই রক্ষা; বাড়ীতে থাকিলে মার এই বেজায় রুক্ষ রুদ্র মূর্ত্তি দেখিলে তাহারা কি করিত? ন'দাদা এই সময় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, ইলা ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া লইল। আর্সিতে হাসিটা দেখিয়া সেই অনুপস্থিত লোকটির কথা মনে পড়িয়া গেল। উপস্থিত থাকিলে সে-লোক যে নিদারুণ স্থানাভাব সত্ত্বেও এই হাসির স্থানটির সদ্ব্যবহার অবশ্য করিত, ইহা মনে পড়িয়া সে আর একবার হাসিল। ন'দা নাই ত? নাঃ!

আচ্ছা, সেই লোকটি এখন একবার ফস্ করিয়া আসিয়া পড়িতে পারে না!

ও বাড়ীতে বিশেষ সমারোহ! মেজবধূরাণী বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। একশত রকমের সুখাদ্য, সুপেয়, সুগন্ধ দ্রব্য সচরাচর দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় ধৃতরাষ্ট্র বাবা সেই যে পাকান পাকান চোখ দুইটা কড়িকাঠে লাগাইয়া বসিয়াছেন, না একবার চাহিলেন, না একবার কৃতার্থ করিলেন। বাবার চেলাটিও তথৈবচ। ঘরের কোণে কুশাসন বিছাইয়া নিমীলিতনেত্র মেজবধূ গণিয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট দিয়াছেন, সে ঐ মাটীতে পড়িয়াই রহিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্র বাবা চক্ষু ফিরাইলেন না। অনেক সাধু বাবাই ত এ-বাড়ীর এ-ঘর পবিত্র করিয়াছেন, দর্শনী বা প্রণামী মাটীতে পড়িয়া থাকিয়া কদাচ অসম্মান ভোগ করে নাই; পাছে ভক্তের অন্তরে ব্যথা লাগে, প্রাপ্তিমাত্রেণ ঝুলিতলস্থ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র বাবার কাঞ্চন-ঔদাসীন্য দেখিয়া মেজবধূঠাকুরাণী যত বা উল্লসিত তত বা বিচলিত হইয়াছেন। বাবা যে সিদ্ধপুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার দুঃখ যদি তাঁহার সিদ্ধ-অন্তরপ্রদেশে না পৌঁছে, তাহা হইলে দুঃখিনীর মনস্কাম সিদ্ধ হইবে কি করিয়া?

ঘরটি ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুলের গন্ধে আমোদিত, ফুল-চন্দন অগুরু ইত্যাদির শোভা ও গন্ধও আছে। মেজবধূ

ধৃতরাষ্ট্র বাবার পায়ের কাছে গললগ্নীকৃতবাসে হাত জোড় করিয়া উপবিষ্ট—বাবা দুই একবার 'হঠ্ যাও, হঠ্ যাও' বলিয়া ধমকাইয়াছেন, মেজবধূ সে কথা কাণে তুলেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র বাবা পা দুটিকে হাঁটুর নীচে যতখানি সম্ভব চাপিয়া ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া বসিয়া আছেন। পায়ের ধূলা দিতে এত কৃপণতা কোন সাধুরই দেখা যায় না। মেজবধূ তাই বড়ই ভড়কাইয়া গিয়াছেন—বুঝি বা বাবার দয়া হয় না। বড়বধূ দুই কোলে দুই নাতনীকে লইয়া নীরবে বসিয়া। ছুটকী যাহা কিছু বলিয়াছে, যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মেজবধূর দুঃখ ঘুচিবেই, তিনিও শেষাশেষি রোগা হওয়ার একটি ঔষধ বা কবচ চাহিয়া লইবেন, এই ভরসায় তিনিও ঠায় বসিয়া আছেন। পাড়াপড়শী কত লোক আসিতেছে, প্রণাম করিতেছে, দর্শনী ফেলিতেছে, বসিয়া থাকিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। এক সময়ে এমন অবস্থা ঘটিল যে ঘরে আর লোক ধরে না। বড়বধূ সামনের বারান্দায় সতরঞ্চ পাতাইতে গেলেন।

তা তিনি যান, এই সময়ে আমাদিগকে একবার বহির্বাটীতে যাইতে হইতেছে। বেলা তখন পাঁচটা, বাড়ীর বড়কর্ত্তা, ইন্দুপ্রকাশ শশব্যস্তে গৃহে ফিরিলেন। তিনি পাত্র দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন, তাঁহাকে মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। হঠাৎ সেই কলিক্‌টা তাঁহাকে ট্রেণেই প্রায় অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল। দরওয়ান মহীপৎসিংকে সঙ্গে লইয়া তিনি ফিরিয়াছেন, তাঁহার অনুজদ্বয় পাত্র দেখিতে গিয়াছে। ইন্দুপ্রকাশ বিধান ডাক্তারের বাড়ী হইয়া ইঞ্জেকসান লইয়া গৃহে আসিয়া শুনিলেন, এক জাগ্রত সাধু আসিয়াছেন। যুগপৎ কলিকের স্মৃতি ও ইঞ্জেকসানের বেদনা চক্ষুর পলকে ইন্দুপ্রকাশের মগজ আলোড়িত করিয়া তুলিল। তিনি জামা-কাপড় বদলাইবার সময় পাইলেন না, ঘাম মুছিতে তর সহিল না, জুতার ফিতা খুলিতে সবুর সহিল না, ফট্ ফট্ করিয়া ফিতা ছিঁড়িয়া জুতা খুলিয়া, "বাবা রক্ষে কর," "বাবা রক্ষে কর" রবে চীৎকার করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া, কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে সোজা গিয়া ধৃতরাষ্ট্র বাবার জানুনিম্ন হইতে পা দু'টি হড় হড় করিয়া টানিয়া বাহির করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বাবা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। লোকে বুঝিল, বাড়ীর কর্ত্তার এইরূপ হঠাৎ প্রবেশ ও অকস্মাৎ চরণাকর্ষণের ফলে ধৃতরাষ্ট্র বাবা বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বাবার করমচার মত রাঙা চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নি ছুটিতেছে। পটে আঁকা মদনভস্মের ছবির কথা অনেকের মনে পড়িয়া গেল! যাহারা বসিয়া ছিল, তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল, যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা বাহির হইয়া পড়িল, আর যাহারা এপর্য্যন্ত বাহিরে থাকিতেই বাধ্য হইয়াছিল, না-জানি কি হইল ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল। এক মিনিটের মধ্যে এত সব কাণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু বাড়ীর বড়কর্ত্তার কোনই খেয়াল নাই। যূপকাষ্ঠাবদ্ধ ছাগমস্তককে যেমন প্রাণপণ বলে টানিয়া ধরা হয়, বড়কর্ত্তাও ধৃতরাষ্ট্র বাবার একখানি চরণ সেই ভাবে ধরিয়া টানিতেছেন।

এই বেয়াদপি আর সহ্য হয় না। ধৃতরাষ্ট্র বাবা ক্রোধ-কম্পান্বিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইলেন। সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায় ভাবিয়া প্রতিবেশীরা স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থে সৃষ্টির সীমার বাহিরে অর্থাৎ স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল।

সৃষ্টি রসাতলেই যাইত। হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র বাবার চেলা লম্বা ত্রিশূলটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিকট কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, যে যেখানে আছ, এই মুহূর্ত্তে সরে যাও। বাবার ওপর দেবতার ভর হয়েছে, দেবতা ওঁর দেহ স্পর্শ করেছে, সব সরে যাও।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি' বলিয়া সকলেই বাহির হইয়া গেল। অপ্রসন্ন মুখে, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে মেজবধূও বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-শিষ্য দুর্য্যোধন বলিলেন, তুম ঠাহ্‌রো! বলিয়া কমণ্ডলু কাৎ করিয়া খানিকটা মন্ত্রপূত বারি মেজবধূর অঞ্জলিবদ্ধ করে ঢালিয়া দিলেন এবং ইঙ্গিতে পান করিতে বলিলেন। মেজবধূঠাকুরাণী পরম ভক্তিভরে জলটুকু ঢুক করিয়া গিলিয়া ফেলিতেই, দুর্য্যোধন বাবা বলিলেন, আভি বাহার যাও!

তাঁহাকে বিদায় করিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ন'দাদা কাছে আসিতে ইলা বলিল, ন'দাদা, ভাসুর মশায়ের কাণ্ডটি দেখলে ত! এখন উপায়?

ন'দাদা বলিলেন, উপায় পরে ভাবা যাবে। এখন পালাই চ'।—বলিয়া ন'দাদা নোটের তাড়াটি উঠাইয়া লইলেন।

ট্যাক্সি আসিল। ধৃতরাষ্ট্র বাবা গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, বড়কর্ত্তা আবার কোথা হইতে রৈ রৈ করিয়া আসিয়া ট্যাক্সির

পাদানের কাছে বসিয়া পড়িলেন, কলিক-এর স্থানটা এখনও টন্ টন্ করিতেছে, ইঞ্জেকসানের জায়গাটা ফুলিয়া রহিয়াছে।

—বাবা রক্ষে কর, বাবা রক্ষে কর—নইলে আমি পা ছাড়ব না।

—দাদা কি করেন! দাদা কি করেন!—বলিতে বলিতে দিব্যপ্রকাশ আসিয়া বড় দাদাকে সরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে বড়দাদা আগুন হইয়া উঠিলেন।

"ম্লেচ্ছ, কুলাঙ্গার, দু' পাতা ফিলজফি পড়ে একদম গোল্লায় গেছ! সাধু সন্ন্যাসীর মর্য্যাদা বোঝ না! সাহেব হয়েছ সব। অথচ ঐ জটা ও গেরুয়াই ভারতের সাধনার—সরে যা, হতভাগা—"

দিব্যপ্রকাশ দেখিলেন নিরুপায়। দাদা একটা কাণ্ড করিবেনই। শেষে কি করিতে কি-হয়, বলিলেন, তা' বলে পা'য়ে হাত দেবার দরকার কি।

—তুই সরে যা এখান থেকে! সাধু সন্ন্যাসীর পা ধরতে পাওয়া ভাগ্যের কথা—বলিয়া তিনি যেমন হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন, দিব্যপ্রকাশ ডান হাতে তাঁহাকে, বামহস্তে ধৃতরাষ্ট্র বাবার দাড়ীতে টান দিলেন। উভয় পদার্থ একই সঙ্গে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। দাড়ী গোঁফ এবং জটা এক সূতায় বাঁধা, একের সঙ্গে অপর অভিন্ন—তিনটিই এক সঙ্গে খসিল। বড় কর্ত্তা মুখ ফিরাইলেন; ফিরাইতে ফিরাইতে বসিলেন। বসিলেন রাস্তার ধূলার উপর! ধৃতরাষ্ট্র বাবা কাপড়ে মুখ ঢাকিলেন। বাবা স্বেদস্নান করিতেছিলেন।

অনেকদিন পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' সম্পর্কে ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন মেজবধূঠাকুরাণী নোটগুলা ফেরত পাইয়া গালে হাত দিয়া

—"বাবা রক্ষে করো—বাবা রক্ষে করো।"

সেই যে বসিলেন, কাজের বাড়ীতে একটি পান সাজিয়া কাহার উপকারও করিলেন না।

বড়বধূঠাকুরাণী তিনদিন তাঁহার আদরের ছুটকীর সঙ্গে কথা বলেন নাই। কিন্তু আজ আর পারিতেছেন না, ছুটকীর নিকটই এক গ্লাস জল চাহিবেন কিনা, তাহাই ভাবিতেছেন।

জন্মনিরোধ

...আমাদের দেশে জনসংখ্যা কি এত অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে যে জন্ম-নিরোধ না করিলেই নয়? নিম্নলিখিত তালিকাটি হইতে ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে জন্মনিরোধের প্রশ্ন ভারতবর্ষে উঠিতেই পারে না।

গত ১৯৩১ সনে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা শতকরা ১০·৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সিংহলে বাড়িয়াছে শতকরা ১৮; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ১৬; গ্রেটবৃটেনে শতকরা ৫·৪। কিন্তু ৫০ বৎসরে গ্রেটবৃটেনে এই বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৫৩·৮; পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ছিল শতকরা ৩৯ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৪ কম। গত ১৮৯১ হইতে এই ৪০ বৎসরে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ২২ কিন্তু ইংলণ্ডে ছিল শতকরা ৩৭; অর্থাৎ ভারতবর্ষ অপেক্ষা শতকরা ১৫ বেশী। ... ...

... ...লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশে আহার্য্যের সংস্থান নাই, এই অজুহাতও টিঁকিতে পারে না, বৃটিশ ভারতে ৬৬ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমি কৃষি-কার্য্যের উপযোগী আছে; এতন্মধ্যে শতকরা ২২ পরিমাণ জমি পাওয়া যায় না এবং শতকরা ১৩ ভাগ বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন। অবশিষ্ট শতকরা ৬৫ ভাগ জমির মধ্যে ১৯৩২-৩৩ সনে মাত্র শতকরা ৩৪ ভাগ জমিতে শস্যের আবাদ করা হইয়াছিল। সুতরাং শতকরা ৩১ ভাগ জমিতে কোন ফসল আবাদ করা হয় না; এই আবাদযোগ্য জমি বিনা চাষে পড়িয়া থাকে। মিঃ পোর্টার বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালা দেশে আবাদযোগ্য সমস্ত জমিতে যদি চাষ করা হয় তবে, তথায় বাঙ্গলার বর্ত্তমান অধিবাসীর দ্বিগুণসংখ্যক লোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। ... ... (সঞ্জীবনী)

চণ্ডীদাস কি তিনজন ছিলেন ?

—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

[১]

চণ্ডীদাস সমস্যা ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। আজ পর্য্যন্ত কবির বিশেষ কোন পরিচয় আবিষ্কৃত হয় নাই, মাত্র জানা গিয়াছে যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস নামে একজন কবি ছিলেন, এবং মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে কবির গান আস্বাদন করিতেন। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহত্তোষণী টীকায় রাসপঞ্চাধ্যায়োক্ত—'কাব্য' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসের নাম করিয়াছেন। টীকার অংশটী এইরূপ—"কাব্য শব্দেন পরম বৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ"। আমাদের দৃষ্টিতে ইহাই বোধ হয় চণ্ডীদাসের নামের প্রথম উল্লেখ। লক্ষ্য করিবার বিষয় শ্লোকাংশে চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে তাঁহার দুইটী (গীতি) কাব্য "দানখণ্ড" ও "নৌকাখণ্ডে"র নাম রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে প্রণীত প্রেমবিলাস, চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বহু কবির রচিত গানে চণ্ডীদাসের নাম উল্লিখিত আছে। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয়, এই যে চণ্ডীদাস—ইনি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি ইঁহার মৌলিক রচনা। ইঁহাকেই আমরা আদি বা বড়ু চণ্ডীদাস নামে অভিহিত করিয়াছি।

আমাদের মনে হয়, এই চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুরের অধিবাসী ছিলেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক দুইজন কবি তরুণীরমণ ও রায়শেখরের চণ্ডীদাস-বন্দনার পদে নান্নুরের নাম পাওয়া গিয়াছে।

(১)

নান্নুর সরসিজ দ্বিজ কুল ইন্দু। পীরিতি-রসাল গীত-মাধবী-বন্ধু।
রামিনী সঙ্গিনী প্রেম রস ভোর। অনুখণ সঁওরণ যুগল কিশোর।
যাক' অমিয়া গীত গম্ভীরা মাহ। রায় স্বরূপ সঙ্গে রস নিরবাহ।
রাতি দিবস শ্রুতি ভরু করু পান। কলিযুগ পাবন প্রেম নিধান।
চণ্ডীদাস পদপল্লব আশ। রায়শেখর তছু দাস অনুদাস।

(২)

সহজ পীরিতি জানিবে কে। বাসুলী যাহারে জানাএছে॥
রজনী সাজনী নান্নুরে গিয়া। করে করে বাঁধি রামীরে দিয়া॥
সহজ ভজন কথাটী কহে। যজন যাজন যেমতি হয়ে।
তিনের সহিত তিনের মেলা। তিনকে লইয়া তিনের খেলা॥
তিন যে ডুবিল দুয়ের মাঝ। দুয়েতে মাতিল কহিতে লাজ॥
রসের সাগরে উঠিল ঢেউ। তরুণীরমণে দেখেবা কেউ॥

[বীরভূম বিবরণ ৩য় খণ্ড, ৮পৃঃ]

পদটীর সাঙ্কেতিক অংশের অর্থ সহজিয়াগণ দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রথম অর্থ, তিনের অর্থাৎ নায়কের সহিত তিনের অর্থাৎ নায়িকার মিলন। (নায়ক, নায়িকা, শ্রীরাধা ও গোবিন্দ তিন অক্ষর) তিনকে—নায়িকাকে লইয়া তিনের নায়কের খেলা। তিন—যুগল (নায়ক নায়িকায়) দুয়ের অর্থাৎ রসের মাঝে ডুবিল। দুয়েতে অর্থাৎ রতিতে মাতিল। দ্বিতীয় অর্থে, নায়িকা ও নায়কের নাম রামিনী ও অনন্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের অপর নাম অনন্ত, ভণিতার কয়েক স্থানেই—"অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাহিল" এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। সহজিয়াগণের কেহ কেহ এই নাম অবগত আছেন।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যেও নান্নুরের উল্লেখ আছে।

নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে বাসুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে সুখ যে পাইবে কোথা॥

[(নীলরতন সম্পাদিত) পদাবলী ৩৪২ পদ]

সহজ ভজনের পদের মধ্যেও নান্নুরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নান্নুরের মাঠে পাতের কুটীর নিরজন স্থান অতি।
বাসুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথি ভজন করয়ে নিতি॥

পদকর্ত্তাগণের মধ্যে নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নান্নুর গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।

জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকলগুণে।
অনুপম যাক' যশ রসায়ন গাওত জগত জনে।
নান্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে বাসুলী প্রসন্ন হইয়া।
রাই কানু দুঁহু নওল চরিত কহয়ে নিকটে গিয়া।

ধুবনী মহিমা সীমা জানাইল শুভ সে বাসুলী দেবী।
নরহরি কহে পাইল দুলহ প্রেম চণ্ডীদাস কবি॥

সহজ ভজনের অঙ্গ একখানি পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। তাহার মধ্যে পাই—

নান্নুড় গ্রামেতে বাসুলীর ঈশান কোণেতে।
চণ্ডীদাসের বাসাঘর আছয়ে সেথাতে॥
রামী রজকিনীর ঘর সেথান হইতে।
দক্ষিণেতে এক পোয়া নিকট সাক্ষাতে॥

সহজ ভজনের আরও একটী পদে আছে—

নিত্যার আদেশে বাসুলী চলিল সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে প্রবেশ যাইয়া করে॥

প্রাচীন পুঁথির আজিও ভালরূপ অনুসন্ধান হয় নাই। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, অন্যত্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, এসিয়াটীক সোসাইটী এবং মফঃস্বলে ব্যক্তিবিশেষের পাঠাগারে বা গৃহে যে সমস্ত পুঁথি রহিয়াছে, সে সমস্তের বিশেষ আলোচনা হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও একথা একরূপ জোর করিয়াই বলা যায় যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সময় হইতেই নান্নুরের সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

চণ্ডীদাস যে দেবীর উপাসক ছিলেন—চণ্ডীদাস-পূজিতা সেই বাগীশ্বরী মূর্ত্তি আজিও নান্নুরে পূজা পাইতেছেন ইঁহার দুই হাতে বীণা, একহাতে পুস্তক ও অন্যহাতে অক্ষমালা আছে। অগ্নিপুরাণে ৫০ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকার্দ্ধে এইরূপ 'পুস্তাক্ষমালিকা-হস্তা বীণাহস্তা সরস্বতী' মূর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাগীশ্বরীই অপভ্রংশে "বাসলী" নামে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে উল্লিখিতা হইয়াছেন। ইনি নান্নুরে বিশালাক্ষী ও বাসুলী এই দুই নামেই পরিচিতা। সরস্বতীর পৌরাণিক প্রণাম-মন্ত্রে পাইতেছি—

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥

কোন কোন মন্ত্রে "বিশ্বরূপে" পাঠও পাওয়া যায়। এই মন্ত্র হইতে বাগীশ্বরী বা সরস্বতীর বিশালাক্ষী নামের রহস্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন কিনা জানিনা, তবে তিনি যে নায়িকা লইয়া উপাসনা করিতেন এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। এই বাগীশ্বরী উপাসনা হইতেই যে অন্ততঃ কবির নায়িকা-সাধনের প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে, একথা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে। অন্য একটী প্রবন্ধে বাগীশ্বরীর সঙ্গে এই সাধন-রহস্যের সম্বন্ধ ও চণ্ডীদাস প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

আমরা যাঁহাকে আদি বা বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়া মনে করি, তাঁহারই রচিত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নাম দিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশ করিয়াছেন। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম-বঙ্গে—তথা রাঢ়দেশে যে ভাষা প্রচলিত ছিল কৃষ্ণকীর্ত্তনে সেই ভাষা প্রায় অবিকৃত আছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ এবং ভাষাতত্ত্বে বাঙ্গালার একপত্রী পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট যুক্তি-বিচারে এই সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, দুইটী প্রধান পালা, এবং পালা দুইটীর কবিত্বাংশেও মৌলিক রচনা ও কবিপ্রতিভার লক্ষণ সুস্পষ্ট। সনাতন গোস্বামীর উক্তি হইতে এই দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। মঙ্গল-কাব্যের লক্ষণ বিচারে এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্র-প্রয়োগে আমি সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের কথা-বস্তুর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে রাঢ়ে প্রচলিত প্রাচীন লোক-গীতি ঝুমুরের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থ ঝুমুরের ধারায় রচিত একখানি অভিনব এবং আদি কৃষ্ণমঙ্গল। এইরূপ নানা দিক্ দিয়া আলোচনা পূর্ব্বক আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, কৃষ্ণকীর্ত্তন আদি বা বড়ু চণ্ডীদাসের মৌলিক রচনা। আমার এবং সুনীতি কুমার বাবুর সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর প্রথম খণ্ডে আমরা চণ্ডীদাসের পদের যে শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকেই আদর্শরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে শ্রেণীর পদের জন্য বাঙ্গালা-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে সেইরূপ পদের সংখ্যা প্রচুর না হইলেও নিতান্ত কম নহে। পদাবলী-সাহিত্যের যে কয়েকটী পদে চণ্ডীদাসের চণ্ডীদাসত্ব সুপরিস্ফুট, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উৎকৃষ্ট পদগুলির সঙ্গে তাহার ভাব, ভাষা, ও রস-

* বঙ্গশ্রী, ২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যার ২০১ পৃষ্ঠায় নান্নুর হইতে সংগৃহীত বাসুলীদেবীর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

মাধুর্য্যের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটী পদাংশ ও পদাবলীর একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কৃষ্ণকীর্ত্তনের বানানের পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

যে কানু লাগিয়া মো আন না চাহিল বড়াই
না মানিল লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আমা উপেখিয়া রোষে
আন লইয়া বঞে বৃন্দাবনে॥
বড়াই গো কত দুখ কহিব কাহিনী!
দহ বলি ঝাঁপ দিল সে মোর শুকাইল লো
মুই নারী বড় অভাগিনী॥

এই যে সুর—"দহে ঝাঁপ দিয়াও শরীর জুড়ায় না, পিপাসার বারি মিলেনা, দহ শুকাইয়া যায়", ইহাই চণ্ডীদাসের কবিতার প্রাণ। প্রেম করিয়া কলঙ্কই সার হইল, দুঃখের সাগর পার হইতে পারিলাম না, কূলে আসিয়া ভরাডুবি ঘটিয়া গেল, এই সুরই চণ্ডীদাসের সর্ব্বস্ব। এইবার পদাবলীর পদ আস্বাদন করুন।

ধিক্ রহু জীবনে পরাধিনী যেহ।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ নেহ॥
এ পাপ কপালে বিহি এহি সে লিখিল।
সুধার সায়র মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভেদিয়া কেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পীরিতি অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে যাঞা ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥

যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিবেন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণমঙ্গলের পারম্পর্য্য বিচার করিতে হইবে। এই বিচারে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, পরবর্ত্তী কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাব কিরূপ সুস্পষ্ট। চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কবি মালাধর বসু শ্রীচৈতন্যের জন্মগ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই 'গোবিন্দবিজয়' বা 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন। বটতলার প্রকাশিত গোবিন্দবিজয় অসম্পূর্ণ। প্রাচীন হস্ত লিখিত গোবিন্দবিজয়ের পুঁথিতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড পালা দুইটী পাওয়া যায়। গোবিন্দবিজয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাবে, ভাষায়, উপমায় বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহার পরবর্ত্তী কবি কবিশেখর শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন ব্যক্তি। তিনি শ্রীখণ্ডের ঠাকুর রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে কবিশেখর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহার অনেক পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ অনেকে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত কবিশেখরের কয়েকটী উৎকৃষ্ট পদকে বিদ্যাপতির নামে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' একখানি উৎকৃষ্ট মঙ্গলকাব্য। 'গোপালবিজয়ের' দানখণ্ডে এমন অনেক ছত্র আছে, যাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধাকে মথুরার হাটে লইয়া যাইবার ছল করিয়া বড়াই বনপথে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন, এবং কোনও অছিলায় স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন বড়াই "খেড় আর আগুনি" এক ঠাঁই করিয়া কোথায় পলাইয়া গেল। এই উপমা এবং এই ধরণের আরো অনেক উপমা ও কথা অবিকল গোপালবিজয়ে পাওয়া যাইতেছে।

মহাপ্রভুর সমসাময়িক আর একজন মঙ্গলকাব্য-প্রণেতার নাম মাধবাচার্য্য। ইনি মহাপ্রভুর শ্যালক। ইহাঁর কৃষ্ণমঙ্গলে,—অব্যবহিত পরবর্ত্তী কবি বিপ্র পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলে এবং দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে দান ও নৌকাখণ্ডের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দান ও নৌকাখণ্ডের ভাব, ভাষা ও উপমাদির সাদৃশ্য এত অধিক যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

[২]

বড়ু চণ্ডীদাসের পর দ্বিজ চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিতে হয়। এক সময় আমার ধারণা ছিল যে, দীন চণ্ডীদাসের সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডীদাসের কোন পার্থক্য নাই, উহা একটী ভণিতার গোলযোগ মাত্র। বড়ু শব্দটিও দ্বিজ শব্দের রূপান্তর বলিয়া মনে হইত। সুতরাং অনুমান করিয়াছিলাম যে, লিপিকর প্রমাদেই বড়ু দ্বিজ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি কারণে সে ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কারণ কি তাহা বলিতেছি। দ্বিজ যে বড়ু বা বটু শব্দের রূপান্তর, এমন নাও হইতে পারে। ভুবনেশ্বরে শিবের যাহারা পাণ্ডা, তাহাদের মধ্যে বড়ু উপাধিধারী একটী পৃথক সম্প্রদায় আজিও বর্ত্তমান

রহিয়াছে। পূজার ফুল তুলিয়া আনা, জল তুলিয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যভেদে পুষ্পবড়ু, গড়াবড়ু প্রভৃতি নামভেদ আছে। বড়ুরা শূদ্রাণী বিবাহ করেন, ইহাঁদের মধ্যে শূদ্র জাতীয় লোকেরও অভাব নাই। ইহাঁরা ভরদ্বাজ, নাগেশ, কৌণ্ডীণ্য প্রভৃতি গোত্ররক্ত। বড়ুয়া বলেন ভুবনেশ্বরে তাঁহারাই প্রধান পাণ্ডা, কাশীতে যেমন লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়, পুরুষোত্তমে যেমন দয়িতা পাণ্ডা, শ্রীরঙ্গমে জঙ্গমগণ, ভুবনেশ্বরেও তেমনই বড়ুদের প্রাধান্য। প্রমাণ স্বরূপ এই শ্লোকটী তাঁহারা আবৃত্তি করেন।

কাশ্যাং লিঙ্গা ইতি খ্যাতা দয়িতা পুরুষোত্তমে।
শ্রীরঙ্গে জঙ্গম প্রোক্ত একাম্রে বটুকাহ্বয়।

একাম্রক্ষেত্র ভুবনেশ্বরেরই অপর নাম। আমাদের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতা আদি চণ্ডীদাস—অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস এই পাণ্ডাজাতীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। অথবা তিনি বড়ু উপাধি-ধারী শূদ্রজাতীয় পাণ্ডা-বংশধর এবং বাগীশ্বরী বা বাসলী বা বিশালাক্ষীর পূজক বা উপাসক। শূদ্রাণী বিবাহে এই সম্প্রদায়ের আপত্তি নাই একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হয়তো অনন্ত বড়ু বিবাহ করেন নাই। তিনি সাধনার জন্য রামী রজকিনীকে সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামীর প্রবাদ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

এই বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষার জন্যই পরবর্ত্তী চণ্ডীদাস দ্বিজ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছিলেন। পদাবলী-সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পদকর্ত্তা অনেক মাধব ছিলেন বলিয়া বাসু ঘোষের ভ্রাতা মাধব স্বরচিত পদে মাধব-ঘোষ ভণিতা দিয়াছেন। গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষার জন্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নিজ নামের সঙ্গে পামরী, দাসিয়া আদি যোগ করিয়া দিতেন। প্রসিদ্ধ কবিপতি বলরামের সঙ্গে পার্থক্য রাখিতে গিয়া অন্য একজন বলরাম দীন ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, নিজের দীনতা-প্রকাশ, সম্ভ্রম, সঙ্কোচ ইত্যাদি নানা কারণে ভণিতার এই পার্থক্য রক্ষা করা হইত। কৌলীন্য প্রখ্যাপন বা ঔদ্ধত্য প্রকাশের কোন চিহ্ন ইহার মধ্যে নাই। এই দ্বিজ চণ্ডীদাসকে আমি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া মনে করি। নরোত্তম শাখা গণনায় একজন চণ্ডীদাসের নাম আছে।

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥—[নরোত্তমবিলাস]

নরোত্তম-বন্দনায় একটী পদে দীন চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। ইহা দীনত্বাব্যঞ্জক, কিন্তু মূল পদে দ্বিজ ছিল কিনা জানিবার উপায় নাই। দীন ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া, তিনিই যে সুবৃহৎ কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য-রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস, এরূপ অনুমান সঙ্গত হইবে না। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তোফী আবিষ্কৃত, আমাদের সম্পাদিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা" দীন চণ্ডীদাসের রচিত বৃহত্তম মঙ্গলকাব্যের প্রথমাংশ। এই অংশে কবি সিদ্ধপুরাণ ইত্যাদি আকর গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার রচনা তৃতীয় শ্রেণীর কবিরও উপযুক্ত নহে। দ্বিজের সঙ্গে এবং বড়ুর সঙ্গে তাঁহার রচনার আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। নরোত্তম-শিষ্যের পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ অপরূপ রচনা এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অননুমোদিত অজ্ঞাতনামা সিদ্ধ-পুরাণাদির উল্লেখ সম্ভবপর ছিল না। নরোত্তম ঠাকুর বাঙ্গালার এক গৌরবময় কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মণ্ডলী-বদ্ধ হইয়াছেন, সম্প্রদায়ের শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, নানা স্থানে উপাসনা-মন্দির নির্ম্মিত এবং উপাস্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এহেন সময়ে বৈষ্ণব-আবেষ্টনের মধ্যে বসিয়া ঐরূপ গ্রন্থ প্রকাশ বাতুলের প্রয়াস মাত্র। ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ প্রায়ই পরস্পরে মিলিত হইয়া ভাবের আদান-প্রদান ও নানা সংসঙ্গের আলোচনা করিতেন। কয়েকটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্মিলন এই সময়েই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস, নরোত্তম প্রভৃতি আচার্য্যগণের শিষ্যানুশিষ্যের সংখ্যা প্রায় অযুতকে অতিক্রম করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শাখাগণনায় কয়জনের মাত্র নাম রহিয়াছে। যাঁহারা কোন না কোন কারণে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শাখাগণনায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং নরোত্তম-শিষ্য চণ্ডীদাস যে খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন ইহা নিশ্চিত। আমার ধারণা "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" ইহাঁরই রচিত। পদের ভাব আধুনিক। পদে মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত ভাবের প্রভাব পরিস্ফুট। এ পদ যে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে না ইহা সুনিশ্চিত। অবশ্য তাই বলিয়াই যে ইহা নরোত্তম-শিষ্যের স্কন্ধেই আরোপ করিতে হইবে এমন কোন

কথা নাই। আমি আমার অনুসন্ধানের ফল পরে প্রকাশ করিব। এখন অনুমানের কথাটা জানাইয়া রাখিলাম মাত্র। আমাদের সম্পাদিত পদাবলীর মধ্যে দেখাইয়াছি "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বারে" এবং "রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা" পদ দুইটী "উজ্জ্বল নীলমণি"-ধৃত দুইটী শ্লোকের ভাবানুবাদ মাত্র। তন্মধ্যে "রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা" কবিতাটীর প্রথমাংশ যে শ্লোকের প্রথমাংশের আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে শ্লোকটী শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর রচিত নহে। তিনি স্বীয় সঙ্কলিত পদ্যাবলী গ্রন্থে মানের পর্য্যায়ে ঐ শ্লোকটী কস্যচিৎ বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। উপরোক্ত পদের ভাষাও আধুনিক। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভাবোন্মাদের কথা না জানিলে ঐরূপ পদ লেখা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। বড়ু চণ্ডীদাসের অনুকরণেও দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়েকটী পদ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাঁর পদের সংখ্যা বেশী নহে। বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ মিশিয়া গিয়াছে। খুব সাবধানে না বাছিলে গোলযোগের সম্ভাবনা প্রচুর। আমরা পাঠকগণকে আমাদের সম্পাদিত চণ্ডীদাস পদাবলী আলোচনা করিয়া মতপ্রকাশে অনুরোধ করিতেছি।

নিম্নে দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটী পদ ও উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোক উদ্ধার করিলাম।

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবারে
তিলে তিলে আইস যাও।
মন উচাটন নিঃশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চাও॥
রাই এমন কেনে হৈলে।
গুরু দুরুজনে ভয় নাহি মনে
কোথা বা কি দেবা পাইলে।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি কর।
বসি থাকি থাকি উঠহ চমকি
ভূষণ খসাইয়া পর॥
রাজার ঝিয়ারী বয়সে কিশোরী
তাহে কুলবতী বালা।
কিবা অভিলাসে বাড়াইলা লালসে
বুঝিতে নারি এ ছলা॥
তোমার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইলা চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকিলে কালিয়া ফাঁদে॥

শ্লোকটি এই—

ত্বমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশস্যসৌ
ঝটিতি ঘটিকা মধ্যে বারান্ শতং ব্রজসীমনি।
অগণিত গুরু ত্রাসা শ্বাসান বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরী দৃশোর্দ্বয়ম্!

(উজ্জ্বলনীলমণি, পূর্ব্বরাগ, ১১ শ্লোক)

হে কিশোরি, কেন মুহূর্ত্তমধ্যে শীঘ্র শীঘ্র শতবার গৃহ হইতে ব্রজসীমায় যাতায়াত করিতেছ? কেনই বা গুরুজনের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কদম্ব কাননে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ?

[৩]

অনুমিত হয় দীন চণ্ডীদাসের উপাধি ছিল দেব, জাতিতে ইনি কায়স্থ। ইনি হয়তো বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা কয়েকটী পদে দেব চণ্ডীদাস ভণিতাও দেখিয়াছি। ইনি স্বনামধন্য মহাভারত-রচয়িতা কবি কাশীদাসের কনিষ্ঠ পিতৃব্য ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। আমরা কাশীদাসের কনিষ্ঠ গদাধর দাসের 'জগৎমঙ্গল' হইতে কবির পরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি।

ভাগীরথী তটে বাস ইন্দ্রাণী সে নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গী গাম॥
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ দেব পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি।
দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি॥
ধ্রুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।
ধ্রুবরাজ পুত্র হৈল সে মীনকেতন॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়।
তাহা হৈতে জনমিল এ তিন তনয়॥
বহুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
বহুপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি॥
প্রিয়ঙ্কর সুরেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীসুখদেব পঞ্চমে শ্রীধর॥

শ্রীমুখের পুত্র হৈল দুঃখী শ্যামনাম।
বিরচিল গোবিন্দ মঙ্গল গুণধাম॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু সুধাকর মধু শ্রীরাম রাঘব॥
সুধাকর নন্দন এ তিন পরকাশ।
ভূমীন্দ্র কমলাকান্ত দেব চণ্ডীদাস॥
দেব শ্রীকমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস।
জগন্নাথ দেখি ওড়ে করিলেন বাস॥
কমলাকান্তের হলো এ তিন কোঙর॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ দাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করে গুরু কৃপার প্রকাশ।
রচিল কৃষ্ণের গুণ শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে॥
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগৎ মঙ্গল কথা করিল প্রকাশ।

এই পরিচয় হইতে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি। দুঃখী শ্যামদাসের পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতার নাম ভবানী এই মাত্রই আমাদের জানা ছিল। কিন্তু তিনি যে কাশীরামের পূর্ব্বপুরুষ তাহা জানিতাম না। আমাদের অনুমান কাশীদাস-পিতৃব্যই দীন ভণিতা দিয়া কৃষ্ণমঙ্গলের একখানি বৃহত্তর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। গদাধর নিজকে দীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণকিঙ্কর এবং কাশীদাসও দীন ভণিতা দিয়াছেন। সুতরাং এই চণ্ডীদাস যদি দীন ভণিতা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের রচিত যে খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন, পত্রাঙ্ক এবং পদসংখ্যা দেখিয়া তাহার আকার বৃহৎ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ব্যোমকেশ বাবুর আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা তাহারই সূচনা। সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় না। বৃহত্তর-পুঁথি নানাস্থানে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাহার যেমন রুচি ও প্রয়োজন সে ততটুকু নকল করিয়াছে, কিম্বা সমস্ত পুঁথির অধিকাংশ নষ্ট হওয়ায় বাকী অল্পাংশ পড়িয়া আছে। বিপ্র পরশুরাম, জীবন চক্রবর্ত্তী, শঙ্কর কবিচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেরই পুঁথির এই অবস্থা দেখিয়াছি। সমবেত অনুসন্ধান ভিন্ন এই সমস্ত পুঁথি উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। পুঁথিগুলি আবিষ্কৃত হইলে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি হইবে। নিম্নে গদাধর দাস বর্ণিত বংশ-পত্রিকা ক্রমানুসারে সাজাইয়া দেওয়া হইল।
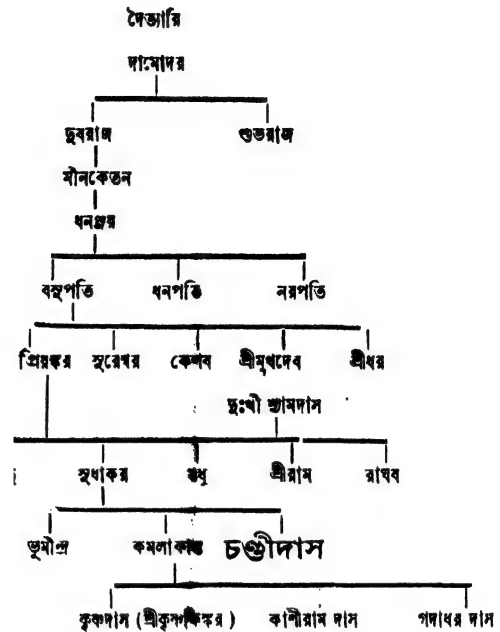
ব্যোমকেশ বাবুর আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলার পরের অংশ স্বর্গীয় নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে পাওয়া যায়। জন্মলীলার পুঁথি খণ্ডিত। এই পুঁথিতে কৃষ্ণের বাল্যলীলার আরো অনেকাংশ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। যেখানে কৈশোর লীলা আরম্ভ হইয়াছিল তাহার পরবর্ত্তী অংশ নীলরতন বাবুর পুঁথিতে পাইতেছি। এই অংশে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার পূর্ব্বরাগ, মিলনাদি বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পরের অংশ মণীন্দ্রবাবু আবিষ্কার করিয়াছেন। মণীন্দ্র বাবুর পুঁথির লেখা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়।

* * *

চারি পুরাণ বাটি সখা উক্তি হয়ে।
পূর্ব্বরাগ নবোঢ়ার কথা কহিল নিশ্চয়ে॥
সুবল মিলন আর পূর্ব্ব কথা শুনি।
নানা মত পুরাণ কথা রসতত্ত্ব মানি॥
শ্রীভাগবতে আছে সখার বর্ণন।
রাধিকার নাম তত্ত্ব পরম কথন॥
বিস্তার না কৈল ব্যাস রাখিলা গোপনে।
সাঁচিয়া সকল গ্রন্থ লেখিল যতনে॥

এ সট সম্বাদ কথা অপূর্ব্ব কথন
পিক সনে শুক পক্ষ কহেন বচন ॥
পিক কহে শুনিলাম পূর্ব্বরাগ কথা,
সখাউক্তি নবোঢ়া রস রতিগুণ গাথা ॥
আর কিছু কহ শুক শুনিয়ে শ্রবণে।
অমিত বচন কথা শুনি এক মনে ॥
শুক কহে শুন পিক আর এক শ্রেণী।

*		*		*		*

দীন চণ্ডীদাস কহে সমুদ্রের কণি ॥

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বরাগ, সুবল-মিলনাদি নীলরতন বাবুর সংগ্রহে আছে। এইরূপে মিলাইয়া লইলে দীন চণ্ডীদাসের রচনার বহুলাংশ আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমরা দীন চণ্ডীদাসের একটী উৎকৃষ্ট রচনা তুলিয়া দিলাম। পাঠক বন্ধু ও দ্বিজের সঙ্গে মিলাইয়া তুলনা করিয়া দেখিবেন।

নিন্দ চন্দন সব দূরে তেয়াগিয়া।
রাইভাবে পুলকিত নয়ন মুদিয়া।
বয়ানের হাস ছিল সেহ দূরে গেল।
চূড়ার ময়ূর পাখা কতি না পড়িল ॥
চম্পক মালতী মালা পড়ে কোন খানে।
করের মুরুলী খান তাহা নাহি জানে ॥
পায়ের নূপুর পড়ে পীতি বাস ধরা ॥
নাহি জানি কোথা গেল ভঙ্গি বেশ চূড়া ॥
সঘনে নিশ্বাস নাসা আঁখে পড়ে জল।
রাইয়ের সে রূপ হেরি অঙ্গ টল টল ॥
মোর মন লুবধ ভ্রমর নাহি জ্ঞান।
পরবাসে বসতি করিল এই ঠাম ॥
সে নব কিশোরী রাধা সদা পড়ে মনে।
রাই ভাবে পুলকিত চণ্ডীদাস ভণে ॥

দুঃখী শ্যামদাসের কথা ছাড়িয়া দিলে দীন চণ্ডীদাসের রচনা দেখিয়া মনে হয় দেববংশের কবিত্ব-প্রতিভার সেই বোধহয় প্রথম বিকাশ। কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধরের যে কবিত্ব-প্রতিভায়—বিশেষ কাশীরামদাসের অমৃত-সমান যে রচনা-সম্পদে বঙ্গ-সাহিত্য সমৃদ্ধ, দীন চণ্ডীদাসে তাহারই অঙ্কুর উদ্ভূত হইয়াছিল।

পাঠকগণ এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন, আমরা মাত্র ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া পদের শ্রেণীবিভাগ করি নাই। কিম্বা কেবলমাত্র ভাষার উপরেই আমাদের পদবিচারের ভিত্তি রচিত হয় নাই। সমসাময়িক ইতিবৃত্ত, বঙ্গ-সাহিত্যের কৃষ্ণ-মঙ্গল-কাব্যের ক্রমপারম্পর্য্য, কথাবস্তু, ভাব, ভাষা, উপমা অলঙ্কার-সূত্র, ভণিতা এবং বৈষ্ণব-দর্শন ও সাধন-পদ্ধতির যথাবুদ্ধি বিচার করিয়া আমরা পদবিভাগ ও পদকর্ত্তৃ-পরিচয় নির্দ্ধারণ করিয়াছি। কতদূর সফলকাম হইয়াছি, রসজ্ঞ পাঠকগণ তাহার বিচার করিলে অনুগৃহীত হইব।

ভারতে ছাত্রবৃন্দের বিলাস

লাহোরের দয়াল সিংহ কলেজের পুরস্কার বিতরণ সভায় লায়ালপুরের সাব জজ সেখ আবদুল হক বলিয়াছেন যে, এ-দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট-কর হইয়াছে ছাত্রদিগের বিলাস। লাহোর কলেজের ছাত্রগণ গড়পড়তায় অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ছাত্রদিগের অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করে। তাহারা এমন সকল আধুনিক ফ্যাসানের বস্ত্র পরিধান করে যাহা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকে ব্যবহার করিতে সক্ষম নহে। যে সকল ছাত্র মাসে ৭০।৮০৲ টাকা কলেজে ব্যয় করে, তাহারা শিক্ষা সমাপনান্তে তাহার অর্দ্ধেকও উপার্জ্জন করিতে পারে না, তাহার ফলে তাহার আত্মীয়স্বজন বিরক্ত হয়, অবশেষে হতাশ হইয়া ছাত্র এমন সকল কার্য্য করে যাহা অতীব ভীষণ।

পাশ্চাত্য দেশ হইতে যে বস্তুতন্ত্রতা পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছে, তাহা ভারতকেও গ্রাস করিতেছে। ছাত্রগণ প্রত্যহ দেখিতে পাইবে 'সু ও কু'র চিরন্তন সংগ্রাম চলিতেছে, একটিতে জীবনে কিছুই প্রদান করিতেছে না এবং আজীবন কঠিন সংগ্রাম, আঘাত লাভ দুশ্চিন্তা; অপরটিতে সুখ সমৃদ্ধি, জন-প্রিয়তা ও আরাম লাভ।

আপনারা স্বীকার করিবেন যে, মেলামেশার ফলে যাহারা ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে বিপরীত মতাবলম্বী তাহাদের সহিত প্রীতির সম্পর্ক হয়, কিন্তু যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করা যায় তবে একের সহিত অপরের মিলনের কোনো আশা থাকে না। ইহাই হইল সাম্প্রদায়িক শিক্ষাবিধানের দোষ।

ভ্রষ্টলগ্ন

—শ্রীরাধারাণী দেবী

হে বিদ্রোহি! আজ এলে নতশির নতজানু হয়ে
অসময়ে স্বস্তিবাণী লয়ে।
শান্তির পতাকা হেরি প্রসারিত তব শুভ্রকেশে,—
আসিয়াছ শান্ত নম্র বেশে!
যৌবন-তাণ্ডব তব অন্তর্হিত উন্মত্ততা সহ;
জীবনের শূন্যপুরী হইয়াছে বুঝি বা দুর্ব্বহ,
করে লয়ে সন্ধিলিপি প্রত্যাগত আজি তুমি সেথা,
—একদিন আসো নাই যেথা!

স্বেচ্ছায় উপেক্ষাভরে ত্যজেছিলে এ' সাম্রাজ্যভূমি!
—প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি
প্রিয়ার সহজ প্রেম, সুন্দর প্রাণের স্নিগ্ধ নীড়;—
যে-হাটের হট্টগোল ভীড়
তোমারে করিয়াছিল বিমোহিত কোলাহলে তার,
উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের সে-প্রমত্ত উন্মাদনা ভার
জীর্ণ চীর সম তোমা ত্যজি' আজ গেছে দূরে সরে'!
—জীবনেরে ব্যর্থতায় ভরে'!

তোমার বসন্ত নিঃস্ব হয় নাই আজো?—হতে পারে।
—এসেছ কি তাই মম দ্বারে?
অনাদরে অপমানে গেছে চলে আমার ফাগুন!—
বৈশাখের জ্বলন্ত আগুন
ছায়াহীন এ জীবন প্রান্তরে বর্ষিছে খরদাহ!
—হে বঞ্চিত! ভোগক্লান্ত! হেথা এসে এবে তুমি চাহ
অতীতের সেই স্নিগ্ধ সুশীতল প্রেমামৃত বারি!!
—কে জানে সন্ধান আজি তারি?—

একদা মন্দিরে মম এসেছিল বসন্তের রাতি,
সুরভি আকুল শতবাতি
জ্বলেছিল জীবনের পুষ্পাকীর্ণ সুরম্য বাসরে!
সেদিনের আনন্দ আসরে—
তোমারি লাগিয়া পাতা হয়েছিল রাজ-সিংহাসন,
করে বরণের মাল্য, কণ্ঠে মুগ্ধ প্রেমসম্ভাষণ
আমি ছিনু অর্ঘ্য তব অষ্টাদশ বসন্তের ফুলে
নিবেদিত ও' চরণ-মূলে!

কতবার ষড়ঋতু বিবিধ কুসুমগন্ধে ছাওয়া,
—বৃথাই করেছে আসা যাওয়া!
আমার অশ্রুর বাষ্পে ম্লান হয়ে গেছে চন্দ্রালোক,—
আনন্দ ছেয়েছে তীব্রশোক!
আশার মঞ্জরী মোর বৃন্তচ্ছিন্ন হয়েছে প্রাতেই,
নিঃসঙ্গ করেছি যাত্রা তন্দ্রাহীন তিমির-রাতেই,
বন্ধুর এ' পথে মোরে তুমিই দিয়েছ বন্ধু ঠেলে!
—এতকাল পরে আজ এলে!

মধুঋতু ব্যর্থ মম। অকালেই এসেছে নিদাঘ;
অগ্নিতপ্ত তার তীব্ররাগ
দগ্ধ করিয়াছে দেহ।—কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝাঘোর
বিধ্বস্ত করেছে গেহ মোর!
নব তপস্যায় আজি বসিয়াছি দীপ্ত সূর্য্য শিরে,
পঞ্চাগ্নির হোমকুণ্ড জ্বলিতেছে চারিপার্শ্ব ঘিরে,
হেথা নাই শীতলতা, প্রীতির আশ্রয় কিছু নাই,—
—পুড়ে সব হইয়াছে ছাই।

তোমার আমার যাত্রা একলক্ষ্যে আজি আর নহে,
—ভিন্ন মুখে চলেছি উভয়ে!
চলে বিপরীত মুখে দুইখানি জীবনের রথ,
—নির্ব্বাচিয়া নিজ নিজ পথ!
তবুও বিশুষ্ক আঁখি আজো মোর ভরে' আসে জলে,
একদা চেয়েছি যারে তারেই ফিরাত হল বলে'!
দুর্ল্ভ বল্লভ মম দ্বারে এল অকিঞ্চন-বেশে,—
আমার প্রেমের মৃত্যুশেষে।

হয় তো এ' স্মৃতি মোর জীবনের শূন্য শুষ্ক পাতে
কোনও চৈত্র-পূর্ণিমার রাতে,—
ঝিল্লী-মুখরিত কোনও কেয়াগন্ধী আষাঢ়ের সাঁঝে
হয় তো বা উদাস অকাজে
রচিবে বিচিত্র লিখা নবরসে নব বর্ণজালে।
কোনও এক নিশান্তের সুপ্তিশেষে অস্ফুট সকালে
তোমার নিরাশা-ম্লান আঁখি দু'টি স্মরণে ফুটিবে;
—মৃত প্রাণ সঞ্জীবি' উঠিবে।

মীরা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

[৩]

সৎমা হিসাবে পানুর উপর নির্ম্মলার যে খুব একটা বিদ্বেষভাব ছিল তা বলা যায় না, বরং এই শিশুটির কচি মুখখানি তাহার মনে একটা মায়ারই সৃষ্টি করিয়াছিল। ঝির কোলে বসিয়া বসিয়া কেমন এদিকে ওদিকে তাকায়, পানু বলিয়া ডাকিলেই কেমন একটু মুচকি হাসিয়া, কোঁকড়া চুলে ঢাকা ফরসা মুখখানি তাড়াতাড়ি ঝির বুকে লুকাইয়া ফেলে, নির্ম্মলার দেখিতে ভারী ভাল লাগিত। এই ভাল লাগা হয়ত সত্যকারের ভালবাসাতেই পরিণত হইতে পারিত, যদি না বাড়ীর প্রত্যেকের একটা ভয়-চকিত দৃষ্টি, পানুর কাছে তাহাকে দেখিলেই, একেবারে পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। প্রথম প্রথম নির্ম্মলা এই ভাবটিকে এক রকম অগ্রাহ্য করিয়াই চলিত, কিন্তু পানুর কচি মনটিতেও যে, তাহার সম্বন্ধে নানারকম ভীতির সঞ্চার করিয়া পরিজনেরা পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতেছে, ইহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। ইহার পরেই আশ্রিত আত্মীয়ের দলকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া সে নূতনভাবে গৃহ-সংস্কারে মন দিল,—গৃহের পুরাতন সকল কিছুই বিতাড়িত হইয়া, নূতন আসবাব-পত্রে নূতন মানুষে নূতন সংসারের প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু নির্ম্মলার তবু জয় হইল না, ক্ষুদ্র শিশুর মনে একবার যাহাকে শত্রু বলিয়া পরিচয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর মন তাহার কখনও আর প্রসন্ন হইল না।

পরাজয় হইল বটে, কিন্তু ইহাতে নির্ম্মলার দুঃখিত হইবারও খুব বেশি কারণ কিছু ছিল না। সতীনের ছেলে 'মা' নাই বা বলিল, ইহাতে ষোল সতর বছরের একটি নব-বিবাহিতা মেয়ের বেদনা-বোধ হওয়ার কথা কিছু নয়, কিন্তু সত্যই তাহার নব-পরিস্ফুট নারীত্বে সে আঘাত পাইল, যখন দেখিল, স্বামী তাঁহার হৃদয় মন দিয়া সম্পূর্ণভাবে পত্নীকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি যদি সহস্তে পুত্রকে আনিয়া তাহার কোলে দিয়া বলিতেন, এই নাও তোমার ছেলে, তুমি যেমন করিয়া পার, যেমন তোমার ইচ্ছা তেমন করিয়া তুমি ইহাকে মানুষ করিয়া তোল, তবে স্বামীর সে পরম দানকে সে'ও আগ্রহ এবং যত্নের সঙ্গেই পরিপূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করিত ; সে যদি জানিত স্বামী তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, কোন গোপনতা আর তাঁহার মধ্যে নাই, সে বিশ্বাসের প্রতিদান সে'ও তেমনি করিয়াই দিতে পারিত ; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। পুত্রের দিক দিয়া একটা লুক্কায়িত বেদনার ভাব পত্নীর কাছে তিনি যে ভাবে গোপন করিয়া চলিতেন, পত্নীর কাছে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠিত, কিন্তু নির্ম্মলাও অভিমান করিয়াই এ সম্বন্ধে স্বামীকে কোন প্রশ্ন করিল না। দাসদাসীদের উপর পুত্রের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া, পুত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ তিনি তাহাদের দিতেন, নির্ম্মলা সকলই শুনিতে পাইত, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন দিন কোন একটি প্রশ্নও সে করিল না। এমনই করিয়া, সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, পানু কোনদিন নির্ম্মলাকে মা' বলিয়া জানিতে শিখিল না, এবং কচি ছেলেটি বলিয়া নির্ম্মলারও প্রথমে যে একটুখানি আকর্ষণ হইয়াছিল, ধীরে ধীরে এক সময়ে কখন তা অদৃশ্য হইয়া গেল।

এমনই করিয়া দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল, নির্ম্মলার কোলে পর পর দুইটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ম্মলাকে হঠাৎ যেন একেবারে প্রবীণা গৃহিণী করিয়া তুলিল। সেই কিশোরী সুন্দরী নির্ম্মলার বিনম্রনম্র ভাবটি সংসারের কুটিলতার নীচে চাপা পড়িয়া, তাহাকেও ধীরে ধীরে কখন দাম্ভিক ও কুটিল করিয়া তুলিল। তাহার পর বড়লোকের বাড়ীতে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী থাকিলে এবং তাহার সৎছেলে থাকিলে সাধারণতঃই যেমন মা-মাসী-জ্যেঠিদের সৎপরামর্শ দিবার জন্য শুভাগমন হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহার বিরাম হইল না। ফলে অভাগা পানুর দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য একমাত্র কামিনী ছাড়া আর কেহ রহিল না, মাতৃহীন স্নেহহীন বিশাল পুরীতে পানু দাসীর কোলে কোলেই মানুষ হইতে লাগিল। তাহার পিতারও আজ-

কাল অবসর বিশেষ ছিল না, গ্রামের ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে এবং জমিদারীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকার জন্য, গৃহের দিকে মন দিবার তাঁহার খুব অবসরও হইত না, যখন বা হইত মিষ্টি হাতের মিষ্টি সেবাটুকুর ভিতরেই তখন আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি ক্লান্তি দূর করিতেন।

সেদিন বোর্ডের মিটিং বসিয়াছিল, এবং তাহার কাজ সমাপ্ত করিয়া বাড়ী ফিরিতে জমিদার মহাশয়ের রাত একটু বেশীই হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের ছেলেদের পড়িবার যে পাঠশালাটি ছিল, তাহাতে আর চলে না, বড় করিয়া একটা স্কুল করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, আজিকার মিটিংএ সেই কথাই উঠিয়াছিল। শীতের রাত, গরম একটি দামী চাদর গায়ে জড়াইয়াও জমিদার মহাশয়ের কাঁপুনি তবু কিছুতেই কমিতেছিল না। আগে আগে যে ভৃত্যটি বাতি হাতে নিয়া চলিতেছিল, তাহারই স্বল্প আলোকে, সাবধানে পথ দেখিয়া চলিতে চলিতে, আজিকার মিটিংএর কথাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাড়ী ফিরিতেছিলেন।

গৃহের সম্মুখে আসিতেই, দোতলার আলোকোজ্জ্বল কক্ষে মেয়েদের লইয়া মায়ের যে কলহাস্যের উৎসব চলিয়াছে, তাহারই একটু ঝঙ্কার আসিয়া কানে প্রবেশ করিতেই, মনটা কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটি কদিন জ্বরে ভুগিয়া উঠিয়া, কাল মাত্র ভাত খাইয়াছে, তাহাকে এত হাসানো নির্ম্মলার অন্যায়, মেয়েটি হয়ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারে! একটু দ্রুতপদে বাকী পথটুকু অতিক্রম করিয়া, তিনি অন্দরের দালানে গিয়া উঠিলেন, দালানের এক পাশ দিয়া সারবন্দি ঘরগুলি—আগে যেগুলি আশ্রিত আশ্রিতায় সর্ব্বদাই ভর্ত্তি হইয়া থাকিত, সেগুলি এখন একরকম খালিই পড়িয়া আছে। ঘরগুলির গাঢ় অন্ধকারের পানে একটিবার তাকাইয়া চলিতে চলিতে, সহসা জমিদার মহাশয় চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, ও ঘরের ওই ভাঙ্গা তক্তাপোষটির উপরে খালি একটা মাদুরের উপর শুইয়া ও কে? পান্নু? পান্নু কেন এখানে এই সময়ে? এই ভীষণ শীতে? মুহূর্ত্তকাল সেখানে দাঁড়াইয়া ঘরটিতে ঢুকিতে ঢুকিতে ভৃত্যকে প্রশ্ন করিলেন, ওখানে কে? খোকা বাবু? এখানে কেন?

এখানে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর ভৃত্যও জানিত না, সে ত' রোজই দেখে, কামিনী ঝির কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খোকা বাবু এইখানেই শুইয়া থাকে, তাহার পর কত রাত্রে কামিনী ঘুমন্ত খোকাবাবুকে কোলে করিয়া উপরে উঠিয়া যায়।

মনিবের গলার সাড়া পাইয়াই কামিনী রান্না-ঘরের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, এ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিরক্ত স্বরে মনিব কহিলেন, এতরাত্রে এই ঠাণ্ডায় খোকন একলা এখানে শুয়ে রয়েছে, দেখনি তোমরা কেউ?

নতমুখে বিনম্র ভাবে কামিনী বলিল, আজ্ঞে পিসিমার পূজো সেরে আসতে দেরী হয়ে যায়, খোকন সন্ধ্যের পরই ঘুমিয়ে পড়ে, একলা উপরে শুতে চায় না, তাই এইখেনেই শুইয়ে দিই। গায়ে ত চাদর একটা দিয়ে গিয়েছিলাম, এই যে পায়ে ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিয়েছে।

জমিদার শয্যার প্রান্তে দাঁড়াইয়া পুত্রের পানে তাকাইয়া দেখিলেন, গায়ে একটি হাত-কাটা ছোট জামা, পরণে একটা হাফ-প্যাণ্ট, ফরসা ফর্সা সুন্দর কচি কচি হাত পাগুলি শীতে যেন নীল হইয়া আসিয়াছে, হাঁটুটি একেবারে বুকের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া অনাথের মত ঘুমাইয়া আছে। ঘরের একপ্রান্তে একটি আলো জ্বলিতেছে, তাহাতে বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছিল না, পিতা ভৃত্যের হাত হইতে আলোটি তুলিয়া লইয়া পুত্রের পানে তাকাইয়া দেখিলেন, পায়ের একটা আঙ্গুলে একটা ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো, হাঁটুতে একটি জায়গায় খানিকটা রক্ত শুকাইয়া আছে, তাহার উপর একটু বাটা হলুদও লেপন করা হইয়াছে বোঝা যায়।

পিতার চক্ষুদুটি আর্দ্র হইয়া আসিল, কোমল সুরে কহিলেন, পায়ে কি হয়েছে ওর? এখানে রক্ত, ওখানে বাঁধা?

কামিনী কহিল, আজ্ঞে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল, তাই হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিয়েছিলাম, রক্ত পড়েছিল, ফুলেছে,—

—রক্ত পড়েছে, ফুলেছে, ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেই পারতে,—

কামিনী চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না। জমিদারবাবু শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া পায়ের ক্ষতটিতে হাত দিতেই খোকন কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিল। পিতা কহিলেন, পান্নু এখানে কেন শুয়ে আছ বাবা, শীত করছে যে বড্ড, চল উপরে যাই।

পায়ের ব্যথার স্থানটিতে হাত দিয়া বসিয়া খোকন কাঁদিতে লাগিল। পিতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তাহার পর ভৃত্যের পশ্চাতে পশ্চাতে সাবধানে উপরে উঠিতে লাগিলেন। দোতলায় সিঁড়ির উপরেই ছোট একটি ঘরে একটি বৃদ্ধা মেঝেতে পা ছড়াইয়া বসিয়া, চোখে চশমা দিয়া আলোর সম্মুখে মহাভারত পড়িতেছিলেন, জমিদার বাবু 'পিসিমা' বলিয়া ডাক দিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া দাঁড়াইলেন। এই পিসিমাটি জমিদারবাবুর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া; সংসারের কোন কিছুরই ধার ধারেন না, সারা দিন রাত নিজের পূজা অর্চ্চনা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, কাহারও কোন কথাতে কোনও কথাই কখনও বলেন না। তাই ইনি সংসারের নূতন ব্যবস্থার পরও এ সংসারেই টিঁকিয়া গিয়াছিলেন, রাত্রিবেলা পান্নুকে লইয়া কামিনী আসিয়া তাঁহার কাছেই শুইত।

জমিদার বাবু পিসিমা বলিয়া ডাকিতেই, বইয়ের উপর হইতে মুখ তুলিয়া পিসিমা বলিলেন, কে, সুরেন? কি বাবা?

রুদ্ধ ক্ষোভে বিকৃত স্বরে সুরেন কহিলেন, নীচ থেকে পান্নুকে নিয়ে এলাম পিসিমা, এই দুর্জ্জয় শীতে একলাটি খালি গায়ে নীচে তক্তাপোষে পড়ে ঘুমুচ্ছিল, তোমরা কেউ একে একটু দেখতে পার না পিসিমা! বাড়ীতে এত লোক, আমিই না হয় বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকি!

পিসিমা চুপ করিয়া রহিলেন।

শয্যার একপ্রান্তে অতি যত্নে পুত্রকে শোয়াইয়া দিয়া তাহার ক্ষতের সেই ময়লা ন্যাকড়াটি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, তখনই সেই গুলি তিনি স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া আইডিন দিয়া বাঁধিয়া দিলেন। পুত্র যতক্ষণ কাঁদিতে লাগিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে না ঘুমাইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পিতা নীরবে গম্ভীর মুখে তাহার কাছে বসিয়া রহিলেন।

সেই রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে কোনও কথাই হইল না।

[৪]

ইহার পর পুত্রের চিন্তা সুরেন্দ্রনাথের বুকে একটা বিষম বোঝার মত চাপিয়া বসিল। ভবিষ্যতে তাহার কি হইবে, সে চিন্তা ত' দূরের কথা, এখন বর্ত্তমানেই যে চলা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে, এমনি করিয়া গাছে চড়িয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া বা পুকুরের জলে সাঁতার কাটিয়া জীবনে হয়ত কোন মতে বাঁচিয়া থাকাটা চলিবে, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলের জীবন এই ভাবে চলে না। তা ছাড়া প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকাটাই বা চলে কি করিয়া, কামিনী মহোৎসাহে সেদিন বর্ণনা করিতেছিল, গাছের ডাল হইতে পাখীর ছানা চুরি করিয়া আনিতে গিয়া, কি করিয়া সেদিন সে সাপের মুখ হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছে! একদিন বাঁচিয়াছে আর একদিনও যে বাঁচিয়া আসিতে পারিবে সে কথা কে বলিতে পারে! শিক্ষা নাই, শিক্ষা দিবার কেহ নাই—নাঃ, এই ভাবে আর রাখা যায় না, কিন্তু কি করিয়াই বা রাখা যায়! কোন বোর্ডিং-স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া কি? সাত বছরের ছেলেটার পক্ষে সেটা ভয়ানক কষ্টকর হইবে। কোন দিন যে শাসন পায় নাই, বোর্ডিং-এ অত কড়া শাসন তাহার সহ্য হইবে না।

কলিকাতায় নিজেদের বাড়ী আছে বটে, এবং জমিদারী-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা নিত্যই লাগিয়া থাকায়, সেখানে আমলা কর্ম্মচারীদের থাকিবার সুব্যবস্থাও আছে, কিন্তু এই টুকুন ছেলেকে সেখানকার সেই স্নেহহীন কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়া পড়ানো চলে না, কিন্তু কোন উপায়ও যে আর চোখে পড়ে না।

অবশেষে বহু দ্বিধাজড়িত ভাবে একটি স্থানের কথা মনে পড়িল, সেটি তাঁহাদের কলিকাতার উকিল বিনয় বাবুর গৃহ। বিনয়বাবুর স্ত্রী শিক্ষিতা সুগৃহিণী। প্রস্তাবটা করিতে প্রথমে একটু সঙ্কোচ হইবে বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও অসম্মত হইবেন না, ইহা নিশ্চয়। তাঁহাদের একটিমাত্র সন্তানকে যে-ভাবে তাঁহারা মানুষ করিয়া তুলিতেছেন, ইহা ত' তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। সে গৃহে রাখিলে, তাঁহার সন্তানটিও ঐরকম ভাবেই মানুষ হইয়া উঠিবে। মাতৃহীন ক্ষুদ্র শিশুটিকে বিনয়বাবুর স্ত্রী যে সন্তানের মতই স্নেহে প্রতিপালন করিয়া তুলিবেন এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই, নারী সতীনের ছেলেকেই সহিতে পারে না, পরের ছেলেকে সে বুকে করিয়া রাখে।

পুত্রের সম্বন্ধে এসব চিন্তার কোন কিছুই তিনি পত্নীর নিকটে প্রকাশ করিলেন না, মনে মনে তাঁহার একটু দুঃখবোধ হইতেছিল, সর্ব্বস্ব দিয়া যাহাকে তিনি ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার

মাতৃহীন অভাগা এই ক্ষুদ্র শিশুটিকে সে সহিতে পারিল না ! তাহারই বা দোষ কি, তিনি নিজেও ত' এতদিন উহার উপর খুব বেশী মনোযোগ দেন নাই, বাঁচিয়া আছে চোখে দেখিতে পাইতেছেন, এই জ্ঞানই ত' যথেষ্ট ছিল, বহুদিন পরে আজ অতীতের কথা, অতীতের ভাবনা তাঁহাকে একটু বিমনা করিয়া দিল। কাছারি-ঘরে একটি আরাম-কেদারায় শুইয়া চক্ষু মুদিয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিলেন।

কলিকাতায় একটা মোকদ্দমাও ছিল, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দিন চারেক পরে তিনি কলিকাতায় রওনা হইয়া গেলেন। গাড়ীতে বসিয়া, সমস্ত পথটুকু পুত্রের কোমল, অতি সুন্দর মুখখানি তাঁহাকে কেমন ব্যাকুল করিয়া তুলিল, এত ছোট বয়সে কার বাপ ছেলেকে এমন করিয়া বিদেশে পাঠায়? আজ যদি ইহার মা থাকিত !—যাক সে কথা, ইহার ভবিতব্য ইহাকে এই ভাবেই টানিতেছে, তিনি কি করিতে পারেন !

পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে, বার বার ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, সহসা তাহার হাতের একটি বড় কাল দাগের উপর চোখ পড়িল, হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইয়া কোমল স্বরে প্রশ্ন করিলেন, এটা কি হয়েছিল পানু ?

—কেটে গিয়েছিল বাবা, রান্না-ঘরের বঁটিতে কেটে গিয়েছিল, এই এ্যা-তো খানি রক্ত পড়েছিল বাবা, কামিনী পিসি বেঁধে দিলে।

—রান্নাঘরের বঁটিতে তুমি কেন হাত দিয়েছিলে বাবা?

—বাঁশ কেটে একটি লাঠি তৈরি করতে গেছলুম বাবা, তখন কেটে গেল, দরোয়ানকে কত বললুম, রমেশ দাকেও বললুম, বাবা, কেউ ওরা তৈরি করে দিলে না,—

ছোকরা চাকর রমেশ সঙ্গেই আসিয়াছিল, সে কি একটি কথা বলিতে যাইতেই সুরেন্দ্রনাথ হাত তুলিয়া তাহাকে বাধা দিলেন, তারপর আবার তেমনি ভাবেই আদর করিয়া কহিলেন, আমার কাছে কেন যাওনি খোকন, আমি তৈরি করে দিতুম।

পানু খুব গম্ভীরভাবে মুহূর্ত্তকাল ভাবিয়া বলিল, না বাবা, তোমার কাছে যাই নি, তুমি তখন কোথায় ছিলে জানতুম না ত !

পিতার চক্ষুদুটি আর্দ্র হইয়া আসিল। পিতার কাছ হইতে আজ যে স্নেহের পরিচয় সে পাইতেছে, কোন দিন ত' তাহা পায় নাই, তাই কোন আব্দার করিবার সময়ও পিতার কথা তাহার মনে হয় নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র শিশু এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে জানে না, হয়ত তেমন করিয়া অনুভব করিতেও পারে না, যদি পারিত তাহা হইলে আজ হয়ত অভিমান করিয়া কাছেই আসিত না !

—এদিকের কনুইটির এখানেও একটু ফোলা বলে মনে হচ্ছে যে, দেখি দেখি।

—হ্যাঁ বাবা, হাইজাম্প দিতে গিয়ে পড়ে গেছলুম। এখনো ব্যথা আছে, উঃ !···উ, হু, ধ'রো না বাবা।

এইরকম ভাবে শরীরের নানা স্থানে নানা আঘাতের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়িল,—এখানে ফোলা, ওখানে ঘা, ওদিকে কাটা,—এই অসহায় অবোধ শিশুটির পানে পিতা করুণ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন,—শাসন করিবার বা সম্বরণ করিবার ইহাকে কেহ নাই, একদিন যে প্রাণে মরে নাই তাই যথেষ্ট !

গভীর রাত্রে যখন গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে পঁহুছিল, পানু তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গের ভৃত্যেরা তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেই, সুরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, ওরে থাক থাক, জাগাস নি, আমি গিয়ে গাড়ীতে বসি, আমার কোলে তোরা ওকে আস্তে আস্তে তুলে দে।

কলিকাতার কর্ম্মচারী পুর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল, প্রভুকে দেখিয়া ট্যাক্সি আনিয়া হাজির করিলে, সুরেন্দ্রনাথ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, রমেশ পানুকে কোলে করিয়া আনিয়া তাঁহার কোলে শোয়াইয়া দিল। কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া সুরেন্দ্রনাথ আদেশ করিলেন—আমায় শিয়ালদ'য় বিনয়ের বাড়ী পৌছে দিয়ে তোমরা বাড়ী যাও, তোমাদের সঙ্গে কাল দেখাশোনা হবে।

[৫]

বিনয় বাবুর আলোকিত প্রাসাদোপম বিশাল ভবনটিতে সেদিন কন্যার জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব ছিল। উৎসব শেষে অভ্যাগত নিমন্ত্রিতের দল যখন স্ব স্ব গাড়ীতে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের মোটর তখনি আসিয়া, রাস্তার গাড়ীর ভিড় সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গোলমালে পানুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, পিতার

কোল হইতে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমরা কোথায় যাচ্ছি বাবা ?

— আমরা এখানে এই বাড়ীটাতেই নামব। দেখেছ কি সুন্দর বাড়ী, কত আলো, কত গাড়ী।

—আমরা কি এখানেই থাকব বাবা ?

—হ্যাঁ বাবা, তিন চার দিন থাকব এখন, তারপর আমি বাড়ী ফিরে যাব, তোমার যদি ভাল লাগে তুমি এইখেনেই থেক।

পানু চুপ করিয়া রহিল, এত আলো, এত গাড়ী সে কখনও দেখে নাই সত্য বটে, কিন্তু তথাপি বাবা ফিরিয়া গেলে সে কেমন করিয়া একা এখানে থাকিবে, সে কথা সে বুঝিতে পারিল না।

—আরে একি, দাদা যে! আপনি হঠাৎ! ও কে? খোকাকেও এনেছেন নাকি? বেশ, বেশ। আজ বেশ ভাল দিনটাতেই এসেছেন, আজ মীরার জন্মদিন।

গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, তাই নাকি! তা দেখ ভায়া, কি সুন্দর দিনটিতেই এসে হাজির হয়েছি, তুমি ত আর আমায় নেমন্তন্ন কর নি, তবু দেখ বাড়ী না গিয়ে কি মনে হল, তোমার এখানেই আগে এলাম।

যিনি কথা বলিতে বলিতে আসিয়া গাড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার সুন্দর সুমার্জ্জিত বেশ ও আনন্দোজ্জ্বল সুন্দর চেহারাখানির পানে তাকাইয়া পানু অবাক হইয়া দেখিতেছিল। দুই হাতে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বিনয়বাবু কহিলেন, বাঃ বাঃ ভারী সুন্দর ছেলেটি ত, একে বুঝি এখানে বেড়াতে নিয়ে এসেছেন দাদা, বাঃ চমৎকার! তোমার নাম কি বাবা ?

—পানু, পান্নালাল।

—পান্নালাল? বেশ নামটি ত'। ওরে মীরু, দেখে যা দেখে যা, আয় এদিকে।

হাসি-হাসি মুখে লাফাইতে লাফাইতে ফ্রক-পরা কুন্দ ফুলের মত সুন্দর বছর পাঁচেকের মেয়ে একটি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার বড় একটি মোমের পুতুল, সুরেন্দ্রনাথ কাছে টানিয়া তাহাকে আদর করিলেন। মেয়েটি জ্যাঠা মহাশয়কে চিনিত, কিন্তু সঙ্গের নূতন ক্ষুদ্র আগন্তুকটির পানে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেই পিতা হাসিয়া কহিলেন, একে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যাও মীরু, দেখত, কোনটি বেশী সুন্দর, তোমার হাতের ডলটা না এই খোকন ?

খোকন হাসিল, মীরাও হাসিল, উভয়ের পিতারাও কাছে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন।

মীরা এক হাতে ডলটিকে বুকে জড়াইয়া অন্য হাতে পানুর হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

বাজে বক্তৃতা

আমরা কি খুব বেশী কথা বলি? অধুনা সকল বাঙ্গালীকেই স্বীকার করিতে হইবে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' ইংরেজ জাতের কথা আলাদা। সেই জাতেরই প্রসিদ্ধ লেখক আর্ণল্ড বেনেট বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক ইংরেজ যেন এক একটা স্বতন্ত্র দ্বীপ, ইহার আর উহার মধ্যে মহাসাগরের ব্যবধান।' ইতালীতে কিন্তু বিপরীত; ইতালীয় মাত্রই বাঙ্গালীর মত 'ব্যাজোর-ব্যাজোর'-এর অনুরাগী। মুসোলিনী ইতালীয়ের এই বদ্ অভ্যাস দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; তিনি একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য 'কম কথা বেশী কাজ।' একবার এক জনসভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া মুসোলিনী মাত্র দশটা কথায় তাঁহার বক্তব্য সাঙ্গ করেন।

বোধ হয়, ভবিষ্যতে আমাদের আর কথা কহিবারও দরকার হইবে না। টেলিপ্যাথির উপর নির্ভর করিলেই চলিবে। কার্লাইল ও ইমার্সনের সম্বন্ধে শোনা যায়, তাঁহারা দুই জন মাঝে মাঝে এক একটা পুরা সন্ধ্যা নিরবচ্ছিন্ন নীরবতায় যাপন করিতেন। একদিন এইরূপ সন্ধ্যাযাপনের পর কার্লাইল উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়াছিলেন, 'সদ্ চিন্তায় সন্ধ্যাটা কাটিল বেশ।' কার্লাইলেরই সেই সুপ্রসিদ্ধ উক্তি—'Silence & Secrecy'—নীরবতা ও মন্ত্রগুপ্তি।

চীনা শ্রমণদের ভারতদর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

কান্যকুব্জ হইতে হিউয়েন ৬০০ লি দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে আসিয়া অযোধ্যা রাজ্যে পৌছিলেন। এই রাজ্যে বহু শত বিহার এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতদের স্মৃতিজড়িত অনেক সঙ্ঘারাম ছিল। অযোধ্যা হইতে হিউয়েন নৌকাযোগে প্রায় আশীজন সহযাত্রীর সঙ্গে গঙ্গাপথে হয়মুখ রাজ্যে রওনা হইলেন।

নদীপথে একটি ঘন অশোকবনের ভিতর প্রায় দশখানি জলদস্যুদের নৌকা লুকাইয়া ছিল, হঠাৎ তাহারা যাত্রীদের নৌকা আক্রামণ করিল। যাত্রীদের অনেকে ভয়ে জলে লাফাইয়া পড়িল এবং দস্যুরা নৌকা তীরে আনিয়া যাত্রীদের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল। এই দস্যুরা প্রতি শরতে একটি সুদর্শন লোককে দুর্গার কাছে বলি দিত, হিউয়েনকে দেখিয়া তাহারা মহানন্দে তাঁহাকে বলি দিবে ঠিক করিল। হিউয়েন বলিলেন, তাঁহার দেহদ্বারা যদি তাহাদের উপকার হয়, তবে তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি তীর্থভ্রমণের যে উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বধ করিলে তাহাদের অকল্যাণ হইতে পারে। যাত্রীরাও সকলে হিউয়েনের মুক্তিপ্রার্থনা করিল এবং কেহ কেহ তাঁহার পরিবর্ত্তে নিজেদের বলি দিতে প্রস্তাব করিল। দস্যুরা কোন কথা না শুনিয়া বেদী প্রস্তুত করিয়া হিউয়েনকে বাঁধিয়া বলির উদ্যোগ করিতে লাগিল। অন্তিম সময় নিকট দেখিয়াও হিউয়েন নির্ব্বিকার চিত্তে দস্যুদের বলিলেন যে, তাহারা চারিপাশে ভীড় না করিয়া তাঁহাকে যেন একটু চিত্ত স্থির করিবার সুযোগ দেয়। তখন হিউয়েন মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, মৃত্যুর পর পরজন্মে যেন তিনি এই দস্যুদের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। মৈত্রেয়ের ধ্যানে হিউয়েনের সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল; তিনি কোথায় আছেন, কি ঘটিতেছে সব বিস্মৃত হইলেন।

এই অবস্থায়, অন্য যাত্রীরা কান্নাকাটি করিতেছে, এমন সময়ে চারিদিক অন্ধকার করিয়া অতি ভীষণ ঝড় উঠিল। ধুলাবালিতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং নদীতে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া নৌকাগুলিকে ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। দস্যুরা সভয়ে যাত্রীদের কাছে তখন হিউয়েনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের উত্তর শুনিয়া পরস্পরকে বুঝাইতে লাগিল যে, তাহাদের অপরাধ হইয়াছে। তাহারা হিউয়েনের পদতলে পড়িয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল। একজন দস্যু হিউয়েনের পায়ে হাত দিলে তিনি চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সময় হইয়াছে কি না; তখন দস্যুরা অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে হিউয়েন তাহাদের সদুপদেশ দিলেন এবং তাহারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র জলে ফেলিয়া দিয়া অপহৃত দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, এখন হইতে তাহারা সৎপথে চলিবে। তখন ঝড় থামিল এবং সকলেই এই অলৌকিক ব্যাপারে আশ্চর্য্য বোধ করিল।

পূর্ব্বদিকে ৩০০ লি গিয়া হয়মুখ রাজ্য ও তারপর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ৭০০ লি গিয়া হিউয়েন প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি অক্ষয়বট ও যমুনাসঙ্গম দেখিয়াছিলেন। প্রয়াগ বহুকাল হইতে মহাপুণ্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, কারণ রাজা ও ধনীরা এখানে বহু ধন বিতরণ করিতেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার রাজকোষের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ, এমন কি গলার হার ও রাজমুকুট পর্য্যন্ত এখানে বিলাইয়া দিতেন, বিতরণের পর হর্ষবর্দ্ধন রিক্ত হস্তে বলিতেন, "ভালই হইল, আমার যত কিছু ছিল সব এখন অক্ষয় ভাণ্ডারে জমা হইল।" ইহার পর অন্য রাজারা নিজের নিজের ধনরত্ন ও পরিচ্ছদাদি হর্ষবর্দ্ধনকে দিতেন, রাজা তাহাও ঐভাবে বিতরণ করিতেন।

প্রয়াগ হইতে হিউয়েন কৌশাম্বীতে আসিলেন, এখানে অনেক সঙ্ঘারাম প্রভৃতি ছিল। কৌশাম্বী হইতে তিনি শ্রাবস্তীতে(শি-লো-ফু-শি-তি) আসিলেন। শ্রাবস্তীতে

শত শত সঙ্ঘারাম ও সহস্র সহস্র ভিক্ষু ছিল এখানে বুদ্ধ-স্মৃতিজড়িত স্থানগুলির প্রত্যেকটিতে এক একটি স্তূপ ছিল, যেমন মহাপ্রজাবতী গৌতমীর বিহার, অনাথ-পিণ্ডদের বাড়ী, জেতবন বিহার প্রভৃতি। এ ছাড়া যেখানে বুদ্ধ দস্যু অঙ্গুলিমালকে জয় করিয়াছিলেন, যেখানে সুন্দরী ও চিঞ্চা নাম্নী স্ত্রীলোকেরা বুদ্ধের নামে অপবাদ দিয়াছিল, যেখানে দেবদত্ত বুদ্ধকে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই সব স্থানেও স্তূপ ছিল। ধনী অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের বাসের জন্য সুপ্রশস্ত ও সুন্দর জেতবন বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং বুদ্ধ প্রায় বিশ বৎসর সেখানে বাস করেন। এইস্থানে আসিয়া ভক্ত ফা-সিয়েন ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রাবস্তী হইতে ৮০০ লি দক্ষিণ-পূর্ব্বে কপিলবাস্তু। এখানে বুদ্ধের জন্ম, প্রথম জীবনের ঘটনাবলী ও মহানিষ্ক্রমণ-সম্পৃক্ত স্থানগুলিতে স্তূপ ছিল। কপিলবাস্তু হইতে হিউয়েন কুশীনগরে গিয়া বুদ্ধের মৃত্যুসম্পৃক্ত স্থানগুলিতে স্তূপ দেখিয়াছিলেন। কপিলবাস্তু ও কুশীনগর উভয় স্থানই সে সময়ে লোকালয়শূন্য জীর্ণদশায় পড়িয়াছিল। কুশীনগর হইতে হিউয়েন বারাণসীতে গিয়া যেখানে বুদ্ধ প্রথমে ধর্ম্মপ্রচার করেন, সেখানে স্তূপ, বিহার প্রভৃতি দেখেন। বারাণসী হইতে হিউয়েন বৈশালী নগরে গিয়া নগরকে জীর্ণদশায় দেখিতে পান। এখানেও বুদ্ধ-জীবনের অনেক ঘটনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বহু স্তূপ ছিল।

বৈশালী হইতে হিউয়েন পাটলিপুত্র নগরে গেলেন। মগধরাজ্যের লোককে তিনি বিদ্বান, সরল ও ধার্ম্মিক বলিয়াছেন। পাটলিপুত্রের পুরাতন নাম কুসুমপুর। এখানেও অনেক স্তূপ ও সঙ্ঘারাম ছিল। মগধরাজ্যের জমি উর্ব্বরা, এখানে নানাবিধ শস্য জন্মিত ও লোকের অবস্থা খুব ভাল ছিল। এখানকার ধনীরা অনেক আতুরাশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলন, সেখানে অনেক অনাথ, আতুর ও দরিদ্র লোক বিনা মূল্যে ঔষধ, ব্যবস্থা, পথ্য প্রভৃতি পাইত। এখানকার রাজপ্রাসাদ ও বৃহৎ স্তূপ ও সঙ্ঘারাম সমূহ দেখিয়া হিউয়েন, ফা-সিয়েন প্রভৃতির এত বিস্ময় বোধ হইয়াছিল যে, তাঁহারা এগুলিকে দানবনির্ম্মিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনেক বড় বড় সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষমাত্র তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। 'কুক্কুটারামে' এক হাজার ভিক্ষু বাস করিত, 'আমলক-স্তূপ' সম্রাট অশোক একবার রোগমুক্তির পর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। 'ঘণ্টা-স্তূপে' ভিক্ষুরা ঘণ্টা বাজাইয়া বিধর্ম্মীদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিত। এই 'ঘণ্টা-স্তূপ' সম্বন্ধে হিউয়েন গল্প শুনিয়াছিলেন যে, একবার ভিক্ষুরা তর্কে পরাস্ত হওয়ায় এখানে ঘণ্টা বাজান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নাগার্জ্জুনের শিষ্য দক্ষিণাপথবাসী দেব নামক আচার্য্য বার বৎসর পরে আবার বিধর্ম্মীদের পরাজিত করেন। আচার্য্য গুণমতির দ্বারা বিখ্যাত পণ্ডিত মাধবের পরাজয়ের স্মৃতিরূপে আর একটি 'আরাম' নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, পাঁচদিন তর্কের পর মাধব মুখে রক্ত উঠিয়া মারা যান এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বিদুষী স্ত্রীকে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে বলেন। স্ত্রীও পরাজিত হইলে রাজা গুণমতিকে অভিনন্দিত করিলেন ও গুণমতির অনুরোধে বিধর্ম্মীদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধের জন্য একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এইখানে তর্কের সময় গুণমতি প্রথমে তাঁহার ভৃত্যকে অন্যদের সঙ্গে তর্ক করিতে বলিতেন; তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার ভৃত্যও প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিল এবং অনেকে নাকি তাহারই কাছে পরাজিত হইত, গুণমতির আর যুদ্ধে নামিবার প্রয়োজন হইত না।

ফা-সিয়েন তিন বৎসর পাটলিপুত্রে বাস করিয়া সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র নকল করিয়াছিলেন।

নালন্দা-মহাবিহারে হিউয়েন-ৎসিয়াং

পাটলিপুত্র হইতে হিউয়েন গয়ায় গিয়া বুদ্ধের তপস্যা, বোধিলাভ প্রভৃতির স্থানগুলি দেখিলেন। এখানে বহু লোকের নির্ম্মিত অসংখ্য স্তূপ, চৈত্য প্রভৃতি ছিল। বোধিদ্রুম দেখিয়া হিউয়েন ভাববিহ্বল চিত্তে অনেকক্ষণ তাহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি অন্য যাত্রীদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। এইখানে দিন দশেক থাকিবার পর হিউয়েন নালন্দায় গেলেন।

নালন্দা রাজগৃহ নগরের উপকণ্ঠে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। বুদ্ধ ও মহাবীরের সময়ে নালন্দা গ্রামে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রসিদ্ধ বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের জন্মস্থান এই নালন্দায়। পরবর্ত্তী যুগে এখানে একটি মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সমগ্র ভারত হইতে, এমন কি ভারতের বাহির হইতে সহস্র সহস্র ছাত্র এখানে পড়িতে

আসিত এবং এখানকার অধ্যাপকেরা দেশবিশ্রুত-কীর্ত্তি পণ্ডিত ছিলেন। হিউয়েনের সময় নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির বা প্রধান আচার্য্যের নাম ছিল শীলভদ্র; ইনি বাঙ্গালী ছিলেন, কারণ সমতটের রাজবংশে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। শীলভদ্রের মত পণ্ডিত বোধ হয় সে সময়ে দেশে আর কেহ ছিলেন না: এই সময়ে ইনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহাকে শুভ-ধর্ম্মাকর এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল এবং ইনি এই নামেই সাধারণতঃ অভিহিত হইতেন।

হিউয়েনের আগমন-সংবাদ পাইয়া মহাবিহারের ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্য হইতে চারজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে নির্ব্বাচন করিয়া হিউয়েনকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পাঠাইলেন। ইঁহারা অগ্রগমন করিয়া মহাবিহার হইতে কয়েক যোজন দূরে হিউয়েনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। পথে মৌদ্‌গল্যায়নের জন্মস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া হিউয়েন মহাবিহারে চলিলেন, দুই শত ভিক্ষু ও কয়েক সহস্র গৃহী ভক্ত ধ্বজা, ছত্র, গন্ধমাল্য হাতে তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে সঙ্গে চলিল। মহাবিহারে পৌঁছিলে সেখানকার সমগ্র সঙ্ঘ একত্র হইয়া হিউয়েনকে অভ্যর্থনা ও কুশল প্রশ্নাদি করতঃ সঙ্ঘ-স্থবিরের পাশে বিশিষ্ট আসনে তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সঙ্ঘের কর্ম্মদানকে (অর্থাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষকে) আদেশ দেওয়া হইল যে, ঘণ্টা বাজাইয়া সমগ্র সঙ্ঘের কাছে ঘোষণা করা হউক যে, হিউয়েন যতদিন মহাবিহারে থাকিবেন ততদিন শ্রমণদের ব্যবহারের সমস্ত জিনিষ ও ধর্ম্মচর্য্যার সমস্ত উপাদান তাঁহার সুবিধার জন্য অন্য সকলের সহিত তিনি সমভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। তারপর সঙ্ঘ বিশ জন মধ্যবয়স্ক গাম্ভীর্য্যশালী সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের—হিউয়েনকে মহাস্থবির শুভধর্ম্মাকর শীলভদ্রের কাছে উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলের সঙ্গে হিউয়েন শীলভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। সঙ্ঘের লোকেরা নতজানু হইয়া শীলভদ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম ও তাঁহার পাদচুম্বন করিলেন। নমস্কার অভিবাদনাদির পর শীলভদ্র আসন আনিবার আজ্ঞা দিয়া হিউয়েন ও অন্য সকলকে বসিতে বলিলেন। আসন গ্রহণের পর হিউয়েন কোন্ দেশ হইতে আসিতেছেন, শীলভদ্র এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে হিউয়েন উত্তর দিলেন, "আমি চীনদেশ হইতে আপনার কাছে 'যোগশাস্ত্র' অধ্যয়ন ও শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।"

এ কথায় শীলভদ্র তাঁহার ছাত্র বুদ্ধভদ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। বুদ্ধভদ্র শীলভদ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মহাপণ্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স হইয়াছিল। শীলভদ্র বুদ্ধভদ্রকে বলিলেন, "তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার যে অসুখ ও কষ্টভোগ হইয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত তুমি অভ্যাগত মণ্ডলীর কাছে বলিতে পার।"

বুদ্ধভদ্র এই অনুরোধ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার উপাধ্যায় (শীলভদ্র) প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া তীব্র শূলবেদনায় কষ্ট পাইয়াছিলেন; যখন বেদনা উঠিত তখন শীলভদ্র মৃত্যুবৎ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তারপর আবার হঠাৎ বেদনা বন্ধ হইত। বৎসর তিনেক আগে রোগের এত বৃদ্ধি হইল যে, শীলভদ্র অনাহারে দেহত্যাগের সংকল্প করিলেন, কিন্তু রাত্রে অবলোকিতেশ্বর, মৈত্রেয় এবং মঞ্জুশ্রী এই তিন জন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে রোগভোগ করিতেছেন, দুঃখভোগের দ্বারা তাঁহার কর্ম্মফল ক্ষয় হইবে। বোধিসত্ত্বেরা আরও বলিলেন যে, শীলভদ্র জ্ঞানপ্রচার দ্বারা ও সত্যশাস্ত্রের চর্চ্চা দ্বারা সংসারের উপকার করুন, ইহাতে তাঁহার রোগনাশ হইবে, বিশেষতঃ চীনদেশ হইতে একজন ধর্ম্মপিপাসু শ্রমণ তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিতে আসিতেছেন, তাঁহাকে যেন শীলভদ্র সযত্নে শিক্ষা দেন। শীলভদ্র বোধিসত্ত্বদের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার শরীর নিরাময় হইল।

এই কাহিনী শুনিয়া উপস্থিত সকলেই চমৎকৃত হইলেন, বিশেষতঃ হিউয়েন ভাবে আত্মহারা হইয়া শীলভদ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, এরূপ ঘটনার পর হিউয়েনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া শীলভদ্রের কাছে অধ্যয়ন করা উচিত। হিউয়েন চীন দেশ হইতে তিন বৎসর আগে রওনা হইয়াছেন শুনিয়া শীলভদ্র তাঁহার স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে আরও নিঃসন্দেহ হইলেন এবং হিউয়েনের সঙ্গে তাঁহার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

এই আলাপ সম্ভাষণের পর হিউয়েন রাজা বালাদিত্যের বিহারে বুদ্ধভদ্রের আবাসের চারতলায় সাতদিন বুদ্ধভদ্রের অতিথি হইয়া বাস করিলেন। তারপর শীলভদ্রের গুরু ও নালন্দার প্রাক্তন মহাস্থবির ধর্ম্মপাল যেখানে বাস করিতেন, তাহার কাছে একটি বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ সঙ্ঘ হইতে তাঁহাকে দেওয়া হইত। তাঁহার পরিচর্যার জন্য লোক নিযুক্ত হইল; তিনি ভ্রমণে বাহির হইলে একজন গৃহী ভক্ত ও একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হস্তী লইয়া চলিতেন। শুধু যে হিউয়েনই এরূপ সমাদর পাইয়াছিলেন তাহা নয়, অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবিরের অতিথি হইয়া আসিতেন এবং তাঁহাদের সকলকেই এইভাবে সমাদর ও সম্মান করা হইত। হিউয়েন বলিয়াছেন যে, নালন্দায় যেমন, এমন সম্মান আচার্য্যগণ পৃথিবীর আর কোথায়ও পাইতেন না।

নালন্দা মহাবিহারে কিছুদিন থাকিবার পর হিউয়েন রাজগৃহনগর দেখিতে গেলেন। পুরাতন নগরের ধ্বংসাবশেষ এবং বহু স্তূপ, চৈত্য প্রভৃতি এখানে ছিল। বুদ্ধ এখানে অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন এবং প্রায়ই আসিতেন; বুদ্ধ-সঙ্ঘের ও বুদ্ধশিষ্যদের অনেক ঘটনা এখানে ঘটিয়াছিল। সেই সব ঘটনার প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে স্তূপাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজগৃহের অদূরে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যেরা প্রায়ই বাস করিতেন, এখানে অনেক গুহা ছিল। যে গুহায় বুদ্ধ থাকিতেন তাহা দেখিয়া ভক্ত ফা-সিয়েন অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। রাজগৃহ হইতে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে যাইবার পথে ফা-সিয়েন বাঘের হাতে পড়িয়াছিলেন।

রাজগৃহ হইতে নালন্দায় ফিরিয়া হিউয়েন শীলভদ্রকে তাঁহাকে 'যোগশাস্ত্র' পড়াইতে অনুরোধ করিলেন। হিউয়েন যখন শীলভদ্রের কাছে অধ্যয়ন করিতেন তখন বহুলোক সেই ব্যাখ্যান শুনিতে আসিত। ব্যাখ্যান শেষ হইলে একদিন একজন ব্রাহ্মণ শ্রোতৃমণ্ডলীর বাহিরে দাঁড়াইয়া হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া তারপর হাসিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি বলিলেন, তিনি পূর্ব্বদেশের লোক; তিনি বোধিসত্ত্বের কাছে মানত করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন পরজন্মে রাজা হইতে পারেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন, অমুক বৎসর অমুক দিনে মহাস্থবির শীলভদ্র চীনদেশের আচার্য্যের কাছে 'যোগশাস্ত্র' ব্যাখ্যা করিবেন, ব্রাহ্মণ যেন গিয়া তাহা শুনেন, শুনিলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, রাজা হইয়া ফল কি? এখন তাঁহার স্বপ্ন সফল হওয়ায় তিনি ক্রন্দন ও হাস্য করিতেছেন। শীলভদ্র একথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে আরও পনর মাস থাকিয়া 'সূত্র'-ব্যাখ্যা শুনিতে বলিলেন এবং তাহা সমাপ্ত হইলে একজন লোক সঙ্গে দিয়া ব্রাহ্মণকে রাজা শিলাদিত্যের কাছে পাঠাইলেন; শিলাদিত্য ব্রাহ্মণকে তিন-খানি গ্রাম দান করেন।

হিউয়েন পাঁচ বৎসর নালন্দায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি 'যোগশাস্ত্র' তিনবার, 'ন্যায়-অনুসার-শাস্ত্র' এক বার, অভিধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি বিখ্যাত গ্রন্থ একবার, 'হেতুবিদ্যা শাস্ত্র, 'শব্দ-বিদ্যাশাস্ত্র' এবং প্রমাণ সংগ্রহ বিষয়ে একটি গ্রন্থ দুইবার এবং 'প্রাণামূল-শাস্ত্রটীকা' এবং 'শতশাস্ত্র' তিনবার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 'কোষশাস্ত্র', 'বিভাষাশাস্ত্র' ও 'ষট্পদাভিধর্ম্মশাস্ত্র' যদিও তিনি কাশ্মীরের বিভিন্নস্থানে বাস করিবার সময় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তবু নালন্দায় তাহা আবার আলোচনা করিয়া ঐ সব শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহার কয়েকটি সন্দেহ নিরাকরণ করিলেন। এ ছাড়া তিনি তন্ন-তন্ন করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বহু ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রও পাঠ করিয়াছিলেন। নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘের পক্ষ হইতে হিউয়েনকে 'ধর্ম্মপাল' উপাধি দান করা হয় এবং পরে তিনি সর্ব্বত্র এই নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন।

— —

রূপদর্শন

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

আধুনিক যুগ একটা নূতন সামাজিকতা সৃষ্টি করে তুলেছে। অজ্ঞাত দেশ ও জাতি আজ পরিচিত হ'তে চলেছে—অজ্ঞাত সভ্যতা ও শীলতা আজ বন্দিত হচ্ছে একটা নব্য ঘনিষ্ঠতার মোহে। দূরের ভূখণ্ড নিকটতর হচ্ছে দ্রুতগামী বাহনের সাহায্যে। তাতে প্রাচ্যে এসে পড়ছে

প্রাচ্য পরিচ্ছদে যীশুখ্রীষ্ট [প্রাচীন] : র‍্যাফেল।

প্রতীচ্যের সমজদারগণ, প্রতীচ্যেও ছুটে যাচ্ছে এ দেশের রসিকজন। মনে হচ্ছে যেন বেশ একটা বোঝাপড়া চলেছে এদেশে ও ওদেশে। বিশ্বমানব-কল্পনা এক একবার যেন একটা বিরাট ঐক্য ও অখণ্ডতার ভিতর আলেয়ার ন্যায় দীপ্ত হচ্ছে। এটা কি আলাদিনের দৈত্যের যাদু, না একটা সত্য বস্তু?

পশ্চিমের রসবিদ্‌গণ জাপানের সাহিত্য পড়ে' আত্মহারা হচ্ছে। • Laofadio Hearnএর মত লোক জাপানী সাহিত্য ও কলারস আস্বাদন করে তৃপ্ত হচ্ছেন। সমজদারগণ হরউইজি মন্দির দেখে উল্লসিত হচ্ছে, কিংবা সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের প্রভাবেও অণুপ্রাণিত হচ্ছেন। চীন দেশের কুকাইচির চিত্রপর্য্যায় ইউরোপে বিভ্রাট উপস্থিত করছে—ভারতের অজন্তা দেখে বিশ্বনর্ত্তকী প্যাভলোভার তাক লেগে গেছে এবং ফরাসী শার্দ্দুল ক্লিমোন্‌সু (Clemenceau) নির্ব্বাক হয়ে গেছেন! প্রতীচ্য দেশের ভাবুকেরাও ইদানীং গ্রীক বা রোমক শীলতার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পুতুল নাচতে প্রস্তুত নন। এই যে একটা আন্তর্জ্জাতিক ভাববিপর্য্যয় দেখা যাচ্ছে, এর ভিতর কি ভবিষ্যতের কোন আশার বাণী আছে?

অপরদিকে এটাও বুঝতে হবে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে এখনও কোন বোঝাপড়া হয়নি। এখনও প্রচ্ছন্ন কুরুক্ষেত্রের আগ্নেয় সঙ্ঘর্ষ নানা ভাবে ও দিকে চলছে। এখনও কেউ কা'কেও সূচ্যগ্র মেদিনী ছেড়ে' দিতে প্রস্তুত নয়। জাপান, চীন, ভারত ও পারস্য সৌন্দর্য্যের কুহকে প্রতীচ্য রসবিদদের মন হরণ করতে উদ্যত হয়েছে বটে—কিন্তু তা' কোন গভীর স্তরে পৌছচ্ছে না, যা'তে ক'রে যথার্থ কোন প্রেমসম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই পশ্চিমের আত্মা আহত হয় না পূর্ব্বের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করে'। কাব্য, কলা প্রভৃতির শুধু সেই রূপই দেখা হচ্ছে যা শৈবালের মত উপরে ভাসছে—তার ভিতরকার গভীরতর মানবত্বের কোন হিসাবনিকাশ হচ্ছে না আধুনিক সভ্যতার পল্লবগ্রাহী আগ্রহে।

এটা সুস্পষ্ট হবে এই উভয় ভূখণ্ডের রূপানুলব্ধি ও রূপদর্শনে। এই উভয় অঞ্চলের দিক্‌দর্শন এখনও বিপরীত-মুখী, কাজেই সম্মিলিত হ'তে গেলেই হবে সঙ্ঘর্ষ—তা ছাড়া উপায় নেই। যারা মনে করে তা' নয়, তারা সাময়িক ভাবে আত্মবঞ্চনা করে মাত্র—কিন্তু সে মায়াবরণ ছিন্ন হ'তে দেরী হয় না। প্রতীচ্যের একজন নগণ্য কবির মুখে এ উক্তি উত্থিত হয়েছিল যে পূর্ব্ব পূর্ব্বই থাকবে—পশ্চিমও পশ্চিমই থাকবে, এ দুটি দিকের মিলন হবে না। এ কবি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী —পূর্ব্বাঞ্চলকে পশ্চিমের পদসেবী করাই যাঁদের মানসিক

রোগ। রোগের প্রলাপে হলেও এ কবিতাতে হয় ত ঠিক কথাই বলা হয়েছে!

আধুনিক আলোচকগণ কতকগুলি লঘু ও সামান্য দিক থেকে কাব্য ও কলা চর্চ্চা করেছেন—তাতে করে' প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শীলতার রূপনির্দ্দেশ স্পষ্ট হয়নি। অনেকে মনে করেন, কালিদাসকে যে ভাবে আলোচনা করা যায়, সেক্ষপীয়রকেও সে ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে; হোগার্থকে যে ভাবে পরখ করা যায়, মোলারামকেও সে ভাবে তারিফ করা যায়। এতে করে' একটা কৃত্রিম ও লঘু আলোচনারও সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প-কলাক্ষেত্রে এ দুটি দেশের দ্বৈততত্ত্ব যেমন ধরা পড়েছে—কাব্যক্ষেত্রে এখনও তা হয় নি।

ইউরোপীয় নাট্যকলা ও ভারতীয় নাট্যকলার প্রতিপাদ্য বিষয়ে মূলতঃ পার্থক্য আছে—এজন্য লঘু ভাবে এ দুটি জায়গার নাট্য-সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা চলে না। অথচ এদেশে কেউ কেউ শকুন্তলা ও মিরান্দার বিচার করেছেন, যেন একই আধারে একই রকম তত্ত্বের দ্যোতক হয়েছে এ দুটি চরিত্র। শকুন্তলাকে একটি কঠোর বর্জ্জননীতির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেতে হয়েছে এবং দাহকরী তপস্যা ও ত্যাগের হোমানল তার একটা নূতন পরিচয় জাগিয়ে তোলে, যা সেক্ষপীয়রীয় নাট্যের ধারণাতীত। এর কারণ অনেক আলোচকই উপলব্ধি করতে পারেন নি।

ইউরোপীয় নাট্যের প্রতিপাদ্য হচ্ছে নায়ক-নায়িকার বহিরঙ্গ বৈচিত্র্য, যাকে ওরা চরিত্রের (character) বৈচিত্র্য বলে। ম্যাক্‌বেথ, হ্যামলেট, ফাউষ্ট প্রভৃতি চরিত্র এক একটা এক এক রকম, কেউ অন্যটির মত নয়। কারণ এদের বিভিন্নতা দেখানই নাট্যকারের লক্ষ্য। অন্য দিকে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে চরিত্রের বৈচিত্র্য দেখানই লক্ষ্য নয়। এখানে নায়কদের যা' তা' করে সৃষ্টি করা চলে না—অর্দ্ধমত্ত বা খাম-খেয়ালীপূর্ণ একটা লোককে জোর করে নায়ক করা চলে না। ভারতীয় নায়ক নায়িকাদের কি ভাবে রচনা করতে হবে, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের নির্দ্দেশ আছে। নায়কের পক্ষে ধীরোদাত্ত প্রভৃতি গুণ থাকতে হবে, এ বিষয়ে নাট্যকারের কোনরূপ স্বেচ্ছাচার সম্ভব নয়। সকল নাটকের নায়কদের এ রকম ধর্ম্ম রক্ষা করতে হবে; কাজেই নায়কদের বহিরঙ্গ বৈচিত্র্য রচনা করা এদেশের নাটকের ধর্ম্মই নয়। তবে ভারতীয় নাটকের প্রতিপাদ্য কি? এদেশের ভাবুকগণ মানুষের মানসিক বৈচিত্র্যকেই রসগত আধারে উপস্থাপিত করেছেন। নাটকের উদ্দেশ্যই হল নানাবিধ রসের বৈচিত্র্য প্রতিফলিত

নিদ্রা: এলবার্ট মুর।

করা, চেহারার নয়। এমন কি একটি রসের বৈচিত্র্য উদ্‌ঘাটনও একটা কৃতিত্বের বিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে। ভবভূতি

কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী

বলে' নিজের নাট্যসৃষ্টিকে দুনিয়ার নিকট সমর্পণ করেন নি। তিনি উত্তর-রামচরিতে তাঁর প্রতিপাদ্য কি একথা ইঙ্গিত করতে ইতস্ততঃ করেন নি। তৃতীয় অঙ্কে তমসার ভিতর দিয়ে তিনি একটি মাত্র করুণ রস আধারভেদে কি রকম বৈচিত্র্য লাভ করে তা' দেখিয়েছেন। তমসা বলছে:

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্
আবর্ত্ত বুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎসমগ্রম্।

কাজেই পরোক্ষভাবে কবি বলেই দিচ্ছেন রসের বৈচিত্র্য, এমন কি একটি রসের বৈচিত্র্যই তাঁর প্রতিপাদ্য। এরূপ

অবস্থায় এ শ্রেণীর রচনা ও ইউরোপীয় রচনা মূলতঃ একেবারে বিভিন্ন। পশ্চিমের আলোচকগণ প্রাচ্য নাটকে নায়কদের ভিতর চরিত্রের কোন অলৌকিকত্ব না পেয়ে বলেন এখানকার রচনা একঘেয়ে। তাঁরা ভুলে যান, এখানকার সাধনা ভেদমূলক (negative) নয়,

মৎস্যেন্দ্রনাথ (উত্তর-ভারত)।

কাজেই নায়কদের ভিতর সাম্যের দিককে মেনে নিতে প্রাচ্যাঞ্চল উৎসাহিত হয়েছে, ভেদের দিক নয়। তার ফলে এ দেশে অন্তরঙ্গ (expressional) সাহিত্যই সৃষ্টি হয়েছে, বহিরঙ্গ নয়। বহিরঙ্গ সাহিত্য মানুষের আচরণের ভিতর বৈষম্য খুঁজে বের করে এবং সাহিত্যে তা' অনুকরণ করে। অন্তরঙ্গ সাহিত্য—বহিরঙ্গ আচরণে বিভ্রাট উপস্থিত না করে' কল্পনার সাহায্যে বিচিত্র রসোৎসাদি সৃষ্টি করে কুশীলবগণের অন্তরঙ্গলীলায়। তা'তে করে ব্যবহারিক জীবনের বস্তুতন্ত্র ঘটনাসমূহের ভিতর প্রকাশিত করা হয় একটা রসহিল্লোলের উচ্ছ্বসিত উর্ম্মিভঙ্গ, যা একান্তভাবে নাটক-কারের মানসিক সৃষ্টি—দুনিয়ার অন্ধ অনুকরণ নয়। এ-রকমের সৃষ্টি অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থাও সৃষ্টি করে, অথচ তা' এমনি সুনিপুণ ভাবে গ্রথিত হয়, যাতে করে' অসীম কালের প্রবাহেও তার প্রয়োগ স্বাভাবিক হয়। দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে ভুলে যাওয়াটি একটা নিষ্ঠুর ব্যাপার, কবি পরোক্ষ-ভাবে একটি অভিশাপের অবতারণা করে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সম্পর্কের রসভঙ্গ করেন নি। জাগতিক সাধারণ অবস্থায় অনেক রাজার পক্ষেই এরকমের কোন নারীর সাহচর্য্যকে সহজভাবে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব নয়—অথচ অন্তরঙ্গ সাহিত্য ওরকমের বস্তুতান্ত্রিক ঘটনার বীভৎসতা নগ্ন করতে প্রস্তুত নয়। কাজেই দেখা যাবে নাটকরচনার দিক, হতে এ দেশের দান একটা অসামান্য আদর্শেই কল্পিত হয়েছে। পশ্চিমে নাট্য-কারগণ নানা পাত্র (character) সৃষ্টি করেছে, এদেশেও তাই হয়েছে, কিন্তু এ উভয় দেশের পাত্রের ভিতর দিয়ে বিপরীত ব্যঞ্জনা ফলিত হয়েছে।

হোগার্থের 'Laughing Gallery' নামক একটা চিত্র আছে, তাতে সব চেহারাই হাসছে দেখান হয়েছে—অথচ একটি চেহারা অপরটির মত নয়। এটার লক্ষ্য হাস্যরস অবতারণা ততটা নয়, যতটা হচ্ছে মুখের বিভিন্নতা ও বিকৃতি দেখান। ভারতীয় চিত্রে এ শ্রেণীর বহিরঙ্গ বিভিন্নতা ও বিরোধ দেখাবার উৎসাহ নেই। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থ এই সকল শ্রেণীর রচনার যথাযোগ্য প্রণালী নির্দ্দেশ করে গেছে, যার ভিতর দিয়ে অজস্র রস-প্রবাহ সঞ্চার করে' ভারতীয় শিল্পী এদেশের চিত্তবিনোদন করেছে।

প্রতীচ্য ভাবাপন্ন আলোচনায় এ দেশের সাহিত্যরস দুর্লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। ভাস্কর্য্য ও কলাক্ষেত্রে যেমন, তেমনি কাব্যক্ষেত্রেও তা অতি দুঃসহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এ দেশের সাহিত্যালোচক দুঃখ করেছেন যে, প্রাচীন বাঙ্গালার কাব্যকারগণ এক বিষয় নিয়েই বার বার কাব্য লিখেছেন—কোন নূতন বিষয়ের অবতারণ করে' নিজেদের স্বাতন্ত্র্য দেখান নি। আলোচক শুনে অবাক হবেন যে, চীন দেশে একই বিষয় নিয়ে হাজার বছর চিত্ররচনা চলেছে এবং পরবর্ত্তী-দের পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুসরণ বা অনুকরণ করা একটা গৌরবজনক অধিকার মনে হয়েছে। তাতে করে' চিত্রকলা আহত হয়নি, সমৃদ্ধই হয়েছে। প্রাচ্য অঞ্চলের প্রতিভা হচ্ছে অন্বয়ী ও সামঞ্জস্যমূলক—যাঁরা অন্তরঙ্গ সাহিত্য ও কলা সৃষ্টির

পথে অগ্রসর হয়েছে তাঁদের পক্ষে ভেদবুদ্ধি বা ব্যতিরেকী প্রথার প্রয়োজনই ছিল না। পূর্ব্বগামীদের বা পূর্ব্বসূরিদের বন্দনা করেই এ দেশের কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ অগ্রসর হয়েছেন—তাতে তাঁদের গৌরব লুপ্ত হয়নি। বহিরঙ্গ সাহিত্য এই সাম্যের পথে চলতে পারে না—বিরোধের ও প্রতিবাদের পথে বৈচিত্র্যকে উপস্থাপিত করে' তাকে বার বার ভঙ্গুর ও অলীক করে' তোলে। এজন্যই এণ্ড্রু ল্যাঙ (Andrew Lang) বলেছেন: "Our latest poet lasts but three months"; অন্যদিকে লরেন্স বিনিয়ন (Lawrence Binyon) কুকাইচি রচিত একখানি চৈনিক চিত্র সম্বন্ধে বলেছেন যে, বিগত কুড়ি বছর থেকে তিনি চিত্রটিকে দেখে এসেছেন ত কিন্তু এখনও তা' পুরান হয়নি, দিন যত এগিয়ে যাচ্ছে ততই তার ভিতর নব নব সৌন্দর্য্যের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। চৈনিক কাব্য ও নাটক সম্বন্ধেও এরকমের কথা বলা চলে। প্রাচ্যাঞ্চলে বিশ্ববিরোধী ব্যক্তিতন্ত্রতা নেই, এখানে আছে ক্রম ও ধারার পথ। যে কবি বা শিল্পী স্বাতন্ত্র্যের উৎসাহে পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কবি ও শিল্পীর সাধনাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে কাব্যলোকের বা রূপসৃষ্টির অসীম ও অবিচ্ছিন্ন ক্রমের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করে না—সে ধারা বা tradition সৃষ্টি করতে পারে না—সে একান্ত সাময়িক হয়ে পড়ে।

কাপড়চোপড়ের ফ্যাসানের মত পশ্চিমের সাহিত্য-ভঙ্গী বদ্‌লাচ্ছে, এর ভিতর দানা বাঁধবার কিছু নেই বলে' ও দেশই স্বীকার করছে। এজন্য ইউরোপীয় সাহিত্যকেও গতিশীল ও ধারাবাহী করার একটা চেষ্টা এ যুগে হয়েছে। হারম্যান বার (Herman Bahr) জার্ম্মানীর সাহিত্যে বিপ্লব এনেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ইউরোপের সাহিত্যে একটা অন্তরঙ্গ (expressionist) যুগ আনয়ন করা প্রয়োজন। ইউরোপের বহিরঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি করছে 'মমি'র মত রচনা, যা' আধুনিক ও প্রাচীনের ভিতর কোন জীবন্ত যোগ সংগঠন করতে পারে না, যা' এক একটা কালেই হাউইয়ের মত পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় গীতিকাব্যে এসেছে একান্তভাবে ব্যক্তিগত তুচ্ছ উচ্ছ্বাসের সংগ্রহ, যা' ইতরতা হ'তে সব সময় আত্মরক্ষা করতে পারে না। একটি লোকের খেয়ালকে সাহিত্য অনুকরণ করে' নিজের বিরাট দিককে ভুলেই যায়। এদেশের বৈষ্ণব কাব্য একটা মহান্ আধারে সুখদুঃখের চিরন্তন রস-শ্রীকে উদ্ঘাটিত করেছে। রাধাকৃষ্ণের মিলন ও বিরহে নিজের অসীম হৃদয়-কম্পকে অনুভব করে' সৃষ্টি করেছে একটা পরা-সাহিত্য যা সকলের মনোরঞ্জন করেছে; এ কাব্যের পরিধি অসীম এবং গভীরতাও অতলস্পর্শী। একটি লোকের সঙ্কীর্ণ অনুভূতির বহুমুখী ক্লেদ ও আবর্জ্জনার পূতিগন্ধে এ

সোয়ানখেলারের ব্যাভেরিয়া মূর্ত্তি।

শ্রেণীর কাব্যসীমান্ত আহত হয় না। বহিরঙ্গ সাহিত্য বৈচিত্র্য খোঁজে বিভিন্নতার মাঝে; কাজেই যত রকমের অশিষ্ট ও অসাধু আচরণ মানুষের গলিত ও নিষ্পেষিত জীবনে স্থান পায় তা' সমস্ত সংগ্রহ করে' কাব্যসাহিত্যের ঝুড়ি ভর্ত্তি করে। বেলজিয়ামের কবি ভেরারহেরেণ (Verhaeren). গিরো

(Giraud) ও গিল্‌কাতে, (Gilka) যত রকমের মত্ততা, সয়তানি ও ইতরতা সম্ভব, সবই ইউরোপীয় অন্তরের প্রতিবিম্ব-রূপে স্থান পেয়েছে। বৈচিত্র্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বহিরঙ্গ সাহিত্য সামাজিক পাপ ও পঙ্ক খুঁজে বের করে সভ্যতার

বিষ্ণু: কোণারক।

অন্ধকার অলিগলির ভিতর এবং সে সব পরম উপাদেয় সম্ভার বলে রসক্ষেত্রে উপস্থাপিত করে। বস্তুতঃ মনের ভিতর রোগের সঞ্চার করে দুনিয়াকে উদ্ভট ভাবে দেখে পশ্চিমের কবি পুলকিত হয়েছেন। ইউরোপের অবনত সাহিত্যে (decadent literature) এ শ্রেণীর অসংখ্য নমুনা পাওয়া যাবে।

ক্ষণভঙ্গুর বলে এ সব পীড়াদায়ক হয়নি, কারণ এ শ্রেণীর সৃষ্টির উপর অহরহ পট পরিবর্ত্তন না হ'লে জীবন তিক্ত ও বিষদগ্ধ হয়ে যায়। ব্যক্তিগত বা বিশিষ্ট স্থান ও কালগত রচনা রসের দিক হ'তেও সাময়িক উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে, কোন গভীর আহ্বান তাতে নেই। মানুষের ইন্দ্রিয়কে প্রলুব্ধ করবার জন্য এ শ্রেণীর সাহিত্য নানা অবান্তর আলম্বনকে গ্রহণ করে। শালীনতাকে পরিহার করে' নির্লজ্জভাবে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করে, যার বর্ব্বর আকর্ষণে কারও কোন কৃতিত্ব প্রস্ফুট হয় না। যৌন সম্বন্ধ ও আকর্ষণের হেরফের স্থান পায় প্রেমের নির্ম্মল ও অফুরন্ত লীলার পরিবর্ত্তে; ত্যাগের মহিমাকে মলিন করা হয় আদিম ভোগের বাহবা দিয়ে, জান্তব জীবনের আকর্ষণকে কৌশলপূর্ব্বক কাব্য ও কবিতার শকটে যুক্ত করা হয়, নচেৎ তা' নির্জ্জীব ও চলৎ-শক্তিহীন হয়ে পড়ে। উপন্যাসের পাতায় পাতায় ইন্দ্রিয়জ যৌন প্রলেপ নিপুণভাবে দেওয়া হয়, যাতে করে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়—আদিম জান্তব প্রেরণা যেন লেখকের সহায় হয়।

কলাতেও এরূপক্ষেত্রে এসে পড়েছে নগ্নতার বহিরঙ্গ উদ্ঘাটন। নগ্নতার ভিতর দিয়ে কোন অন্তরঙ্গ সাধনা বা রূপধ্যানের রসবস্তু দান নয়—নগ্নতার বহু ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে মানুষের একটা শারীরিক রহস্যকে উপস্থিত করা। এটা শুধু অতিরিক্ত পরিচ্ছদপ্রিয় জাতির পক্ষেই লোভনীয় হয়েছে, জগতের নগ্ন জাতিরা রসচর্চ্চা করলে এ শ্রেণীর রচনা তাদের নিকট নিস্ফল হ'ত। বহিরঙ্গ (Impressionist) কলা নিজের উপাদান ও উপায় বদ্‌লাতে বাধ্য হয়, তা' না হলে তা' কারও চিত্তহরণ করতে পারে না। শারীরিক নগ্নতার হেরফের উপস্থাপিত করা হ'ল বহিরঙ্গ উপায়ে, অর্থাৎ সাম্‌নে মডেল বা নমুনা রেখে। বলা হয়েছে এ শ্রেণীর সাহিত্যও বাস্তব জীবনের নানাদিক ঘেঁটে অনুকরণের সাহায্যেই সৃষ্টি করে—এ শ্রেণীর চিত্র বা ভাস্কর্য্যেও সে রকমের প্রণালী অবলম্বিত হয়। নগ্ন দেহ সাম্‌নে রেখে বা নগ্ন ছায়াচিত্র অনুকরণ করে শিল্পীরা এরূপক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। প্রতীচ্যে আবহাওয়ার একটা উৎকট বুদ্ধিবাদ এ রকমের চেষ্টাকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। সাহিত্যে ও কলায় নগ্নতার পূজা করতে গিয়ে ইউরোপের অন্তঃসলিলা ভোগবৃত্তি জীবনেও তাকে অনুকরণ করতে প্রলুব্ধ হয়েছে। যে অঞ্চলের প্রাণকথাই হচ্ছে 'Impression' বা অনুকরণ, সে অঞ্চলে এ রকমের ব্যাপার

ঘটা স্বাভাবিক। প্রাচ্যাঞ্চলের নগ্নতাও যৎসামান্য নয়, কিন্তু তা কোন জাগ্রত বা অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ওদেশের শিল্পীরা নকল করাকেই অর্থাৎ কোন বস্তুকে বাইরে রেখে তাকে অনুসরণ করাকে 'কলা' বলে। অন্তর-সৃষ্ট কোন স্বাধীন রসবস্তুকে বাইরে উপস্থাপিত (Expression) করতে উৎসাহিত হয় না। ইউরোপ এমনি করে জীবনকেও একান্তভাবে বহিরঙ্গ ব্যাপারে পরিণত করেছে। এজন্যই ইউরোপের সভ্যতাকে ম্যাথু আর্ণাল্ড্ প্রমুখ অনেক ভাবুকেরা বলেছেন—"a civilisation of the exterior।"

রূপদর্শনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে ও রূপকলা সৃষ্টিতে দু'রকমের ব্যাপার প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। একটা হচ্ছে অন্তরাত্ম বা Expressional—এটার প্রকাশ অন্তর হতে বাইরের দিকে; অন্যটি হচ্ছে বহিরাত্ম বা Impressional—যা' মানুস বাহির হতে গ্রহণ করে চিত্তে স্থান দেয়। এই রূপভেদে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সৃষ্টির সমগ্র চক্রবাল সংক্রামিত হয়েছে। একথা বলা হচ্ছে না এর ব্যতিক্রম কোথাও হয় নি—ব্যক্তিগত মনন ও সাধনা মানুষকে যে অসীম কালের স্বাধীনতা দেয় তাতে করে রূপাভিযান নানা জায়গায় নূতন বিভবে ঐশ্বর্য্যবান্ হয়ে উঠে। কিন্তু সৃষ্টির গতিবেগ বিশিষ্টভাবে এরকমের দুটি উৎস হতে প্রেরণা লাভ করে' পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নিজের ছন্দকে উন্মুক্ত করেছে।

এটা বলাই বাহুল্য, এই দ্বৈত সৃষ্টির মূলেই আছে দু'টি বিপরীত তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসা।একটা হল ব্যতিরেকী বা ভেদমূলক (antithetic), ও অন্যটি হল অন্বয়ী বা সামঞ্জস্যমূলক (synthetic)। তাতে করে' সৃষ্টির রসানুলেপ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বৈচিত্র্য লাভ করেছে। ইউরোপের পক্ষ হতে বহিরঙ্গ সৃষ্টির সমর্থকগণ বলেন, ভারতের মত প্রাচ্য দেশে বস্তুতন্ত্র সৃষ্টি সফল হয়নি অর্থাৎ হুবহু রচনা বা অনুকরণাত্মক সৃষ্টি এদেশে দেখা যায় না—শুধু দেবতাদের অপ্রাকৃত রচনাই এদেশের সম্পদ। এ উক্তিটি যে একান্ত ভুল, একথা পরোক্ষভাবে প্রতীচ্য লেখকেরাই স্বীকার করেছে। কণারক, মামলপুর প্রভৃতি জায়গার প্রাকৃত জন্তু রচনা এবং নেপাল ও রাজপুত কলার প্রতিকৃতি রচনা জগতের কোন সৃষ্টি হ'তে হীন হওয়া দূরে থাক বরং শ্রেষ্ঠ। অন্তরঙ্গ সাহিত্য, ভাস্কর্য্য বা চিত্রকলার সহিত স্বাভাবিকত্বের বিরোধ নেই; অবস্থা ও অবলম্বন-ভেদে স্বভাববাদিতার সহিত সমতানে তা' অগ্রসর হয়। গ্রান্‌ওয়েডেল বলেছেন যে, ভারতের লতাপাতা ও ফুল প্রভৃতি অঙ্কনের বস্তুতন্ত্রতা জগতের সকল দেশকে হীনপ্রভ করতে

সূর্য্য : কোণারক।

পারে। ইউরোপীয় সাহিত্যিক বা চিত্রকর যখন হাতী আঁকেন, তখন তিনি দেখেন তার বহিরঙ্গ অবয়বের খুঁটিনাটি—সে সব আস্ত নকল করাই হল তাঁর কারিগরী; এদেশের শিল্পী যখন হাতী রচনা করেন, তখন তিনি জানেন একটা আস্ত হাতীর বর্ব্বর শরীরে রসভঙ্গ নেই—তিনি কোন বিশিষ্ট রসের সৃষ্টি করে' তারই আধার করেন—হাতীর নগ্ন শরীরকে; তাতে

করে তা রসের বাহনই হয়—একটি মাংসস্তূপ বা কঙ্কাল-সমষ্টির বাহন হয় না। একাজে হস্তীকে বিকৃত করার কোন প্রয়োজনই হয় না। কাজেই দু' উপায়েই বস্তুতান্ত্রিক সৃষ্টি চলে, কিন্তু বিচার করতে হলে দেখতে হবে দুদিক থেকে।

নটরাজ শিব (উড়িষ্যা)।

চৈনিক বা জাপানী পাখী রচনা জগতে অতুলনীয়, অথচ এসব সামনে নমুনা রেখে বহিরঙ্গ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় রচিত হয় নি।

এই বহিরঙ্গ সৃষ্টি স্বাধীন রসসঞ্চারের ব্যপদেশে নিজকে শৃঙ্খলিত করে নি। চীনদেশে এমনিভাবে পাখাতে বর্ণবিন্যাস করা হয়েছে—যা' দুনিয়ায় কখনও দেখা যায় না। রূপকথার রাজপুত্র যেমন স্বপ্নলোকে বিচরণ করে' হীরামন তোতা, মণিমুক্তার ফল ও সঙ্গীতকারী বৃক্ষাদিতে পুলকিত হয়, তেমনি প্রাচ্য মনোবিহারে ও রসসৃষ্টিতে কল্পনালোকের অনেক মনোরম উড়ো-কথা একটা কুহক সৃষ্ট করে যা বহিরঙ্গ সৃষ্টি কল্পনা করতে পারে না। আরব্যোপন্যাসের উড়ন্ত গালিচা বা হিতোপদেশের বাক্‌পটু শার্দ্দুল ওদেশের আড়ষ্ট ও কঙ্কালিত সীমান্তে রচিত হতে পারে না; অথচ এ সমস্ত ললিত আয়ুধের সাহায্যে বিস্ময় একটা নূতন সামাজিকতা সম্ভব করেছে প্রাচ্য শিল্পী। অতিকায় দৈত্য, বিচিত্র ড্রাগণ প্রভৃতির অবাস্তব রূপসজ্জা অজানার অন্ধকার গহ্বর পরিপূর্ণ করে রসরাজ্যকে উপভোগ্য করে তুলেছে। এসব রচনার সহিত হুবহু বা বস্তুতান্ত্রিক রচনার কোন বিরোধ নেই।

ইদানীং ইউরোপীয় চিত্রকরও অন্তরঙ্গ (Expressional) রচনায় উৎসাহিত হয়েছেন। ফরাসী শিল্পী গোগাঁ (Gauguin) একটি আবণ্য-চিত্রে নদীতীরবর্ত্তী এক অশ্বারোহীর চিত্র এঁকেছেন। তাতে যে বর্ণ প্রয়োগ করেছেন তা' একান্ত ভাবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ; ঘোড়াকে হলদে, নদীকে বাদামী, মানুষকে নীল এ রকমের বর্ণসমন্বয়ে বিকশিত করা হয়েছে। অতি সহজেই প্রতীয়মান হবে শিল্পীর উদ্দেশ্য বহিরঙ্গের যথার্থতা উদ্‌ঘাটন নয়, একটা রস-শ্রী পরিস্ফুরণ, যা' অন্তরঙ্গ রচনাই সার্থক করে' তুলতে পারে। এ সমস্ত শিল্পীরা প্রাচ্য প্রভাবে পুষ্ট হয়েছেন। কোন কোন ইউরোপীয় শিল্পী নিজেকে বহিরঙ্গ আকর্ষণ থেকে মুক্ত করতে শিল্প-চেষ্টার বহিরঙ্গকেই ধ্বংস করেছেন—কেউ বা তাকে বিকৃত করেছেন। **Picasso, Matise** প্রভৃতি শিল্পীরা এজন্য নিগ্রো স্থাপত্যের অপ্রাকৃত সমৃদ্ধিকেই বরণ করতে ইতস্ততঃ করেন নি। শিল্পী **Gandier Brezska**র একখানি চিত্রে দুইটি কুস্তীগিরের সংঘর্ষ দেখা যায়—তাতে কুস্তীগিরদের প্রাতিভাসিক রূপই দেওয়া হয়েছে, বস্তুতান্ত্রিক নয়। মানুষের হুবহু চেহারার কোন অনুকরণ তা'তে নেই, শুধু প্রতিপাদ্য সঙ্ঘর্ষ ব্যাপারকেই মুখ্য করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এ সমস্ত রচনায় ধারাবাহী **(traditional)** সমন্বয়ী শীলতা **(culture)** কাজ করে নি—এর মূলে আছে ব্যক্তিতন্ত্র বিদ্রোহ। সত্যোপেত অন্তরঙ্গ শ্রীও এ সবের ভিতর প্রস্ফুট হয় নি, কারণ নিগ্রো ও প্রাচ্যসৃষ্টিকে অনুকরণই এসব রূপ-সংগ্রহের প্রেরণাস্থানীয় হয়েছে।

ভারতীয় রচনার অন্তরঙ্গ বৈচিত্র্যের এখনও অবগুণ্ঠন হ'তে মুক্তি ঘটে নি। এতকাল বহিরঙ্গ দিক হ'তে ভারতীয় সৃষ্টিকে পরখ করা হয়েছে। ইউরোপীয় আলোচকদের হাতে একটি মাত্র অণুবীক্ষণ (microscope) আছে, যেটা হচ্ছে বহিরঙ্গ দেখবার। সেটা বাইরের রেখা ও গভীরতা সন্ধান ক'রে নিঃশেষিত হয়ে যায়। শুধু বাইরের জড়ত্বের জ্যামিতিক ও গণিতগত আলোচনা করে' তাকে কখনও বা 'monstrous' এবং কখনও বা 'absurd' বলা হয়। এ রকমের আলোচনা হতে কোন পশ্চিমের আলোচক নির্মুক্ত নয়। বস্তুতঃ জগদ্ব্যাপারের কোন সামঞ্জস্যের (synthesis) অনুভূতির উপর পশ্চিমের শীলতা স্থাপিত নয়।

শুধু সৃষ্টিস্থিতিলয়ের তুরীয় কল্পনার সীমায় ভারতীয় অন্তরঙ্গ সৃষ্টি নিবদ্ধ হয়নি, ইহলোকের নানা বস্তুবাদমূলক ঐশ্বর্য্যও তাতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তুরীয় লোকের শিবতাণ্ডবে ফলিত করা হয়েছে প্রলয়ের রম্য তান—কারণ সৃষ্টি লয়ের ক্রোড়েই দীপ্ত হয়; প্রতিমুহূর্ত্তে জগতে প্রলয় চলছে—মৃত্যুর ক্রোড়ে জীবনকে বিকশিত করে সৃষ্টির ধারা চলেছে। এই পরম সত্যের রস-শ্রী উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে শিবতাণ্ডবে। এর ভিতর কি লৌকিক জড়বাদের অবসর আছে? অন্যদিকে ঐহিক প্রকৃতির অসীম ভাণ্ডারকে সঞ্চিত করা হয়েছে দেশকালজয়ী আধারে—অনবদ্য রূপাশ্লেষে। সূর্য্যের প্রখর ও জাগ্রত দানকে, নদনদীর উল্লোল হৃদ্যতাকে একটা ইন্দ্রিয় বা জড়বাদের উপলক্ষ্যরূপে কল্পনা না করে' অন্তরঙ্গ সৃষ্টি একটা পর্য্যাপ্ত রসরূপ দান করেছে। কণারক মন্দিরে সূর্য্যের অস্খলিত ঋজুতা, এবং প্রগল্‌ভ প্রকাশকে মুখর করা হয়েছে মানবীয় আধারে। স্বচ্ছ কালিন্দী, কদম্বছায়ায় শিহরিত এবং বাঁশীর আওয়াজে পুলকিত হয়ে মানুষের হৃদয়ে এক নূতন জন্মলাভ করেছে, যা কণারকের শিল্পী যমুনা দেবীরূপে দান করে ধন্য হয়েছে। সহাস্য মুখশ্রী, যৌবনপুষ্পিত দেহলতা, লীলায়িত অঙ্গ-সন্নিবেশে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অপরূপ রূপমূর্চ্ছনা যা' বহিরঙ্গ শিল্পী কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না। এর ভিতর কাকেও মানুষের জড়পিণ্ডের পরিমাপ করার উৎসাহ দেখলে মনে হয়, ভারতীয় শিল্পী অরসিককে রসের নিবেদন করেছে। Gandier Brzeska র কুস্তীগিরদের যে পরিমাপ করতে যাবে সে বিপ্রলব্ধ হবে কারণ এ শ্রেণীর সৃষ্টির প্রতিপাদ্য বিভিন্ন ব্যাপার। নাগ-রচিত প্রভাতোরণে বেষ্টিত হয়ে নাগরাজ ও মহিষী প্রাণীজগতের আর একটি অধ্যায় উন্মুক্ত করেছে—যা একান্তভাবে ভারতীয় সৃষ্টি। নাগ-দেবতার ভাগবত মহিমা কাব্যে ও কলায় অসীম ভাবে ধ্বনিত হয়েছে—অজন্তার শিল্পী অন্তরঙ্গ দিক দিয়ে এই বিরাট সামাজিকতার নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। একটি মাত্র মূর্ত্তিতে জমাট হয়েছে যুগযুগান্তরের বিক্ষিপ্ত কল্পনা ও আন্তর শিহরণ। ভয় ও ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রতিবাদ অন্বিত হয়েছে নাগরাজ কল্পনায়! বস্তুতঃ এরকমের সৃষ্টি জগতে দুর্লভ।

কুস্তী: গান্দিয়ের ব্রেসকা (Gandier Brzeska)।

বিশ্বের যুগ্মতত্ত্বের দ্যোতক হয়েছে ভারতের যুগল-মূর্ত্তি। শক্তিমানের সহিত শক্তির যে বিভেদ এবং ঐক্য তা' হরগৌরী মূর্ত্তিব্যঞ্জনায় সুস্পষ্ট হয়েছে। জগতের অন্যত্র

কোথাও এই ওতঃপ্রোত ভাগবতী শক্তির অন্তরাত্ম প্রতিফলন হয়নি। ইউরোপীয় বহিরাত্ম চর্চ্চার স্ত্রীশক্তি দুর্ব্বলা, ক্ষীণা ও অবসন্না—স্ত্রী আরাম ও আরামের সৃষ্টি। অন্তরাত্ম কল্পনা তাকে উচ্চতর স্থান দিয়েছে। শিব

বুদ্ধমূর্ত্তি (জাপান)।

অপেক্ষা শিবাণী বড়—মহাকাল অপেক্ষা মহাকালী বড়, এরকমের ভাবরসে পুষ্ট হয়ে ভারতের দেবীমূর্ত্তি রচিত হয়েছে। অপরদিকে লৌকিক নারী-রচনায় অন্তরাত্ম শিল্প লালিত্যের যা ছন্দ দিয়েছে তাতে তা অপরাজেয় হয়ে আছে। শ্রীগৃহের রচিত নারীমূর্ত্তি, চম্পা ও ভুবনেশ্বরে রচিত নর্ত্তকী লীলায়িত শরীরভঙ্গের এমন শাশ্বত শ্রী উদ্‌ঘাটিত করেছে, যা বহিরবয়ব ঘেঁটে কোন পশ্চিমের শিল্পী উপস্থাপিত করতে পারেনি। মাংসল মূর্ত্তি রচনা করলে কিংবা তাকে নগ্নতা-যুক্ত করলেই ছন্দ সৃষ্টি হয় না—তাতে ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণের মাত্র থাকতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের উর্ম্মি-ভঙ্গে তা রসিকগণের তৃপ্তি সাধন করতে পারে না। ইউরোপের রূপক-মূলক সৃষ্টিতেও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বহিরবয়বের অপ্রাসঙ্গিক ভ্রূভঙ্গী; শিল্পীর রচিত দক্ষিণ পবনের ফুলের সহিত প্রেমচর্চ্চা নামক পশ্চিমের ছবিতে একথাটি পরিস্ফুট হবে—দুটি নরনারীর শরীরগঠনকে মুখ্য করার বহিরঙ্গ চেষ্টায় মূর্ত্তিখানি মুখরিত—ভিতরকার রূপকটি একটা বিদ্রূপ মাত্র হয়ে পড়েছে। এ শ্রেণীর রূপকের সাহায্যে উপস্থাপিত সকল চিত্রই এক রকমের। সব কিছুতেই একটা বহিরঙ্গ ভঙ্গী সৃষ্টি করাই হয়েছে মুখ্য।

ভারতবর্ষে রসানুভূতি এক সৌন্দর্য্যের বিদ্রোহ উপস্থাপিত করে' জড়ত্বের ভিতরও এক সংযোগ-সেতু রচনা করেছে। এখানকার গণেশ ও নট-বরাহ মূর্ত্তি প্রভৃতির ভিতর কোন বিরোধমূলক ইঙ্গিত নেই। নরদেহ ও পশুদেহের ভিতরকার অক্ষত প্রাণ-সূত্র শুধু জাগ্রত জগতে নয়—"ওষধি ও বনস্পতিতে"ও উচ্ছ্বসিত; এরূপ অবস্থায় কোন বিরাট রস-বার্ত্তাকে উপস্থাপিত করতে এ রকমের zoomorphic মূর্ত্তি রচনাও বর্জ্জন করেনি। অন্তরঙ্গ কলার বহিরবয়ব উপলক্ষ্য মাত্র, একথা আধুনিক ইউরোপীয় আর্টও স্বীকার করেছে। মিশরের নারীসিংহ মূর্ত্তি ও গ্রীসের সেণ্টর (Centaur) অন্তরের রসসৃষ্টির দ্যোতক হয় নি, তা' একান্তভাবে বিরুদ্ধ শরীরধর্ম্মকে বজায় রেখে অগ্রসর হয়েছে।

জাতির শ্রেষ্ঠতম কল্পনাক্ষেত্রেও ইউরোপের অন্তর ধর্ম্ম বহির্ম্মুখী—এসিয়ার অন্তর্ম্মুখী। পশ্চিম মনে করে, সত্য একটা বাইরের জিনিষ, তাকে অনুসন্ধান করে পেতে হবে, এমন কি স্বর্গরাজ্যও "seek and ye shall find, knock and it shall be given to you"। বাইরে ধাক্কাধাক্কি করে পাওয়াটি ওদেশের মনের কথা—এজন্য ওদের modelকেও যেমন বাইরে রাখতে হয়, 'আদর্শ'ও তেমন একটা বাইরে রাখবার জিনিষ, যার সাহায্যে ওদেশ নিজকে উন্নত করবার আকাঙ্ক্ষা করে। এই বহিরঙ্গ দৃষ্টি ও সাধনা খ্রীষ্টের মূর্ত্তি অঙ্কনেও পশ্চিম প্রস্ফুট করেছে। র‍্যাফেল-রচিত খ্রীষ্টের দৃষ্টি বাইরের দিকে—অন্তরের দিকে নয়; ভারতের বুদ্ধমূর্ত্তির দৃষ্টি অন্তরের দিকে—বাইরের দিকে নয়। রূপকলাগত এই স্বীকৃতি একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। এদেশের লক্ষ্যবস্তু অন্তর্জ্জগৎ—এই অন্তর্জ্জগতেই একটা ভাবাত্মক বিরাট লোক সৃষ্ট হয়েছে। ষটচক্রাদি কল্পনা বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন প্রভৃতি ব্যাপার কোন বাইরের স্থূল জগতের সহিত বোঝাপড়ার নমুনা নয়।

শুধু বাহিরকে নিয়ে চর্চ্চা করলে অন্তরের সত্য মলিন হয়ে যায়। অহরহ বহিরবয়ব দৃষ্টির চাঞ্চল্য অগণিত সমস্যা উপস্থিত করে। সাহিত্যক্ষেত্রে কবিরা তাই পশ্চিমে অসংখ্য চক্রে বিভিন্ন ও ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কোন কিছুতেই স্থায়ীভাবে মনোরঞ্জন সম্ভব হচ্ছে না। কলাক্ষেত্রে বিন্দুপন্থী, ঘনপন্থী, গতিপন্থীরা নিজেদের উত্তরোত্তর বিভিন্নতা বাড়িয়ে তুলছে। একান্তভাবে ব্যক্তিতন্ত্র সমাজ রাজাপ্রজায়, ধনীদরিদ্রে, উচ্চ-নীচে, সর্ব্বত্রই প্রস্ফুট করে তুলছে বিরোধমূলক ব্যাকুলতা। নিজেদের ভিতরকার সংগ্রাম বাইরের সঙ্গেও সঙ্ঘাতকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। ফলে দাঁড়িয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে একটা ধূমায়িত বিরোধ। এই বিরোধ-ব্যসন দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পশ্চিমের আলোচকগণ এদেশের রূপসাহিত্য ও রূপবিদ্যাকে বিচার করতে স্পর্দ্ধা করে। নিজের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে' পরের বাড়ী মেরামতের চেষ্টা একটা উৎকট পরিহাস মাত্র।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইদানীং ভারতের দেবতারা প্রত্নতাত্ত্বিক এঞ্জিনিয়ারদের হাতে এসে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও বায়বীয় অস্ত্রাদিতে পারদর্শীদের হাতে ভারতবর্ষের রসক্ষেত্র আত্মসমর্পণ করায় একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতীচ্য রসিকদের বহিরবয়ব ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অসীম অজ্ঞতা সত্ত্বেও চটুল ধৃষ্টতা দেখে অবাক হতে হয়। তবে এটা ঠিক, অধিকাংশ রসিকরাই প্রাচ্যাঞ্চলের সৃষ্টি বিষয়ে নিজেদের অজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ইতস্ততঃ করেনি। যারা প্রাচ্যসৃষ্টিকে নিন্দা করেছে তারাও পরোক্ষে নিজেদের অকৃতিত্ব ঘোষণা করেছে।

বলা বাহুল্য ইউরোপের নব্য মনীষীরা এটুকু বুঝেছেন যে, বহিরাত্ম (Impressional) সৃষ্টির পরিধি অতি যৎসামান্য ও ভঙ্গুর। প্রাচ্যের বিরাট ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানের হৃদয়মথিত যে রত্নকদম্ব সৃষ্ট হয়েছে তা' অতি মহার্ঘ, এমন কি অপার্থিব। ডুবুরীরা অগাধ জলে নিমজ্জিত হয়ে যেমন মুক্তাসমূহকে আহরণ করে, তেমনি প্রতীচ্য শীলতার খোলস ছেড়ে ডুবতে হবে প্রাচ্যের রসতীর্থে, না হ'লে কিছু পাওয়া যাবে না। অগণ্য তীর্থযাত্রীর আনাগোনা হচ্ছে সর্ব্বত্র, কিন্তু রূপলক্ষ্মীর দর্শন-সৌভাগ্য খুব কম লোকের অদৃষ্টেই সম্ভব হচ্ছে। ইউরোপের প্রত্নশালাগুলি পূর্ণ হচ্ছে দিনের পর দিন চীন ও ভারতের রূপসংগ্রহে। Lawrence Binyon-এর মত ভাবুকেরা সে সব দেখে দিনের পর দিন মুগ্ধ হচ্ছে—অসীম কালের অফুরন্ত সম্পদে যেন সে সব পরিপূর্ণ। একদিকে প্রতীচ্য সভ্যতার সাময়িক সৃষ্টিগুলি ঝরাফুলের মত শীর্ণ ও মলিন হয়ে যাচ্ছে—অন্যদিকে প্রাচ্য শীলতার দানগুলি হীরের টুক্‌রোর মত উত্তরোত্তর অধিকতর দীপ্ত হচ্ছে। অন্তরের সৃষ্টি চিরস্থায়ী, বাহিরের সৃষ্টি সাময়িক।

শনি-রবি-সোম

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

এবারে বর্ষার প্রকোপটা কিছু বেশী। গত শনিবারে বৃষ্টি নামিয়াছে, আর এক শনিবার শেষ হইতে চলিল, কিন্তু বৃষ্টির আর বিরাম নাই। পল্লীগ্রামে কাদা তো আছেই। কিন্তু এই ঝম্ ঝম্ শব্দ যেন আরও পাগল করিয়া তুলিল। মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সোনাটিকুরীর বিলের বান গ্রামের কোল পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছে। দিগন্তপ্রসারী মাঠে যত দুর দৃষ্টি যায়—কেবল জল, জল, জল, বানের গেরুয়া জল। মাঝে মাঝে যে সকল বড় বড় গাছের মাথা জাগিয়া আছে কেবল তাহা দেখিয়াই অনুমান করা চলে, কোন্‌টা নতুন পুকুরের চক আর কোন্‌টা বামুনহাটির মাঠ।

কিন্তু ট্রেণ বর্ষা মানে না। একমাত্র ভূমিকম্প ছাড়া আর কোনো দুর্য্যোগেই বোধ হয় ভয় পায় না। শনিবারের লোকাল ট্রেনখানি ঠিক আটটা পঞ্চান্ন মিনিটের সময় গ্রামের ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

দুর্য্যোগের রাত্রি। যেমন দুর্য্যোগ, তেমনি অন্ধকার। প্লাটফর্ম্মে গোটা কয়েক আলো জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তা এত দূরে দূরে এবং বৃষ্টির ছাঁটে এমন ঝাপসা হইয়া গিয়াছে যে, অন্ধকার খুব সামান্যই কমিয়াছে। এ ট্রেণে চড়িবার জন্য একখানা টিকিটও বিক্রি হয় নাই। রাত্রের অবস্থা দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার আশা করেন, এখানে নামিবার যাত্রীও কেহ নাই। সুতরাং ভারী বর্ষাতিটা গায়ে দিয়া এবং হাতে একটা রেলের বাতি লইয়া কোনো রকমে গাড়ীখানাকে পত্রপাঠ বিদায় করিবার জন্য ভদ্রলোক হন্ হন্ করিয়া ছুটিতেছেন, এমন সময় সামনের থার্ড ক্লাশ হইতে নামিল দুইটি কাপড়ের পুঁটলি, একটি প্রজ্বলিত হারিকেন এবং একটি ভদ্রলোক। পুঁটলী দুইটির অবস্থা মলিন। হারিকেনে এত কালি পড়িয়াছে যে, বড় জোর সেইটাকে দেখা যায়, পার্শ্ববর্ত্তী আর কিছু নয়। এবং সেই স্বল্পালোকে স্পষ্ট করিয়া দেখা না গেলেও বোঝা যায়, ভদ্রলোকের অবস্থাও উক্ত অস্থাবর বস্তু কয়টি অপেক্ষা আশাপ্রদ নয়।

ষ্টেশন-মাষ্টারকে দেখিয়াই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়ে,···আমাদের রতন আসেনি মাষ্টার মশাই?

বলিয়া ছাতাটা মেলিয়া মাথায় ধরিলেন। ছাতার আদিম কাল কাপড়ের উপর আর একটা শাদা কাপড় বসান হইয়াছে। মাঝে মাঝে ফুটা, বোধ হয় বিড়ি-সিগারেটের কাণ্ড। শ্বেতছত্র বর্ষার ধারা নিবারণ করিতে না পারিয়া যেন ক্রোধবশে পর্জ্জন্যদেবকে ভেঙচাইতে লাগিল।

ভদ্রলোকের অনুনাসিক, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে মাষ্টার মশাই প্রথমটা চমকাইয়া গেলেন। কিন্তু হাত-বাতির আলোটা তাঁর মুখের উপর ফেলিয়া তখনই বলিলেন, আরে! দত্ত মশাই যে! বিলক্ষণ! এই দুর্য্যোগেও বেরিয়েছেন?

—দুর্য্যোগ মানুন,···ইয়ে! আমাদের রতন···

কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টারের তখন দাঁড়াইয়া কথা বলিবার সময় নাই। হাত-ইশারায় দত্ত মহাশয়কে ষ্টেশনে উঠিতে বলিয়া তিনি ট্রেণ পাস্ করিবার জন্য গার্ডের গাড়ীর দিকে ছুটিলেন। দত্ত মহাশয় পুঁটলী দুইটা হাতে করিয়া অর্দ্ধসিক্ত অবস্থায় ষ্টেশনে আসিয়া উঠিলেন।

ষ্টেশন-ঘরের উজ্জ্বল আলোয় এতক্ষণে দত্ত মহাশয়কে ভাল করিয়া দেখা গেল। দেখিলে মনেই হয় না, ইনি মাস্মোলিন লিমিটেডের একটা ছোট বিভাগের বড়বাবু। অত্যন্ত শীর্ণ দেহের উপর একটা বর্ত্তুলাকার শীর্ণ মাথা এমন আলগোছে বসান যে, কেহ একটা কথা কহিলেই সেটা ঢেউ-লাগা কলসীর মত দুলিতে থাকে। এইটুকু তো মাথা। তাহারও তিন-চতুর্থাংশ স্থান একটি বিপুল নাসিকা একাই দখল করিতেছে। বাকী এক-চতুর্থ স্থানে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি ঘেঁসাঘেসি করিয়া কোনো প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া নিতান্তই ভগবানের রাজ্য বলিয়া টিঁকিয়া আছে।

প্লাটফর্ম্ম হইতে এইটুকু আসিতেই দত্ত মহাশয় ভিজিয়া গেলেন। গায়ে একটি মাত্র লংক্লথের পাঞ্জাবী। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সেটা গায়ের সঙ্গে ল্যাপটাইয়া গিয়াছে। জোলো হাওয়ায় ভদ্রলোক ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। করিবার মত

কোন কাজ হাতের কাছে না পাইয়া দত্ত মহাশয় বিরলকেশ মাথাতেই হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মাষ্টার মহাশয় দুম্ দাম্ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভারী বর্ষাতিটা ডান দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আর মাথার বর্ষাতি টুপিটা বাঁ দিকে। তারপর একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, তারপরে? দত্ত মশাই? এই দুর্য্যোগেও বেরুলেন?

মাষ্টার মহাশয়ের যেমন কলেবর তেমনি কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে আর সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর কানে প্রবেশ করে না, এত ক্ষীণ মনে হয়। সে ক্ষেত্রে দত্ত মহাশয়ের তো কথাই নাই।

তিনি ঠাণ্ডায় কাঁপিতে কাঁপিতে কোন প্রকারে বলিলেন, ইয়ে···! আর বলেন কেন মশাই! আমার হয়েছে ···হুঁঃ! সবাই বললে, ঘরে চাষ করুন। তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মাণি। সেই ঝঞ্ঝাট!

মাষ্টার মহাশয় অট্টহাস্যে ষ্টেশন-ঘর কাঁপাইয়া বলিলেন, বিলক্ষণ! এই বাজারে ঘরে চাষও করবেন না কি?

সে হাসির দমকে দত্ত মহাশয়ের মাথাটা দুলিয়া উঠিল। টানিয়া টানিয়া বলিলেন, আর বলেন কেন মশাই? ঘরে চাষ, তাও একটিমাত্র মোষ পাওয়া গেছে। আর একটা ···হুঁঃ!

—আর একটা কি হ'ল বললেন?

—হবে আবার কি? সে এখনও হাটে।

মাষ্টার মহাশয় আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

—হাটে কি মশাই! সেটা কি সেইখান থেকেই চাষ করবে না কি? বিলক্ষণ!

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দত্ত মহাশয় বলিলেন, গতিক সেই রকমই। বর্ষা পড়ে গেল। লোকের অৰ্দ্ধেক জমি আবাদ হ'য়ে গেল। আর আমি ওই আধখানা মোষ নিয়ে কি করি বলুন তো!

—মোষ কি আর পাওয়া যাচ্ছে না?

—কি ক'রে বলব মশাই! এক একবার আসি, আর এক এক রকম···হুঁ। কিছুই বুঝি না।

দত্ত মহাশয় হতাশভাবে হাত নাড়িলেন।

টেলিগ্রাফের কলটা বাজিয়া উঠিতেই মাষ্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি উঠিলেন। বলিলেন, যাকগে। ভিজে কাপড়ে আর ব'সে থাকবেন না। ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছেন যে!

দত্ত মহাশয় সর্ব্বাঙ্গ নজর করিয়া দেখিলেন, সত্যই ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন কিনা। দেখিলেন, কাঁপিতেছেন বটে। গল্প করিতে করিতে বাড়ী যাওয়ার কথাটাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। চমক ভাঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রতনের কথাটাও মনে পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিলেন,···ইয়ে। আমাদের রতন আসে নি মাষ্টার মশাই?

মাষ্টার মহাশয় টকাটক্ টেলিগ্রাফটা সারিয়া বলিলেন, রতন? আপনাদের সেই চাকরটা?

—হাঁা? হাঁা? কাল মতন···

—ক্ষেপেছেন মশাই? সে আসবে এই ঝড় বৃষ্টিতে? আপনার যা বাবু চাকর! দিন রাত্রি গায়ে ফুঁ দিচ্ছে।

দত্ত মহাশয় দুই হাতে দুটি পোঁটলা তুলিয়া লইয়া বিব্রত ভাবে বলিলেন, তাইত! আলোটা?

অর্থাৎ দুইটা হাতই বন্ধ, আলোটা কি করিয়া লইয়া যাইবেন? তার উপর একটি ছাতাও আছে।

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, পোঁটলা দুটো বরং রেখে যান। কাল সকালে আপনার রতনকে পাঠিয়ে দেবেন। সে নিয়ে যাবে।

হাঁফ ছাড়িয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন,···ইয়ে, সেই ভাল। সব হয়েছে···হুঁঃ!

শ্বেতছত্র মাথায় দিয়া দত্ত মহাশয় সেই দুর্য্যোগে ষ্টেশন হইতে নামিলেন।

ষ্টেশন হইতে দত্ত মহাশয়ের বাড়ী মিনিট পনেরোর পথ। ষ্টেশন হইতে লাইন ধরিয়া খানিকটা গিয়া বাঁয়ে আল ভাঙিতে হয়। ও দিক দিয়া একটা কাঁচা সড়কও আছে বটে, কিন্তু সে অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়। ওটা গরুর গাড়ীর রাস্তা। সহজ হয় বলিয়া যাহারা হাঁটিয়া যায় তাহারা সাধারণত এই আল-পথ দিয়াই যায়।

সোনাটিকুরীর বিল গ্রামের ওধারে। এ ধারে বান আসে নাই বটে, কিন্তু যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতেই মাঠ ভাসিতেছে। সরু আল। কোথাও দেখা যায়, কোথাও যায় না। ধুম-

মলিন হারিকেনের আলো যে সাহায্য করিতেছে তাহা অতি সামান্য। ও দিকে ভাঙা ছাতা দিয়াও অজস্র ধারায় জল পড়িতেছে। দত্ত মহাশয় কাপড় হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত বেশ সামলাইয়া পরিয়া আন্দাজে আন্দাজে পা টিপিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। চাষীরা জমির জল-নিকাশের জন্য মাঝে মাঝে আল কাটিয়া দিয়াছে। সে দিক দিয়া প্রবল স্রোতে জল নামিতেছে। দত্ত মহাশয় সেই সব জায়গায় একটু থামিয়া হিসাব করিয়া পার হইতেছেন।

মাঝে মাঝে খালে পা পড়িয়া দত্ত মহাশয় উল্টাইয়া পড়িতেছেন। কোথাও বা পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইতেছেন। বড় জোর ছাতাটা ছিটকাইয়া পড়িতেছে। এমনি একটা দুর্ঘটনায় মধ্যপথে আলোটা নিভিয়া গেল। দত্ত মহাশয় কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে নির্ব্বাপিত আলোটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পকেটে দেশলাই ছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজিয়া অকেজো হইয়া গিয়াছে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। চোখের সম্মুখে নিজের হাতখানাই দেখা যায় না। চারিদিকে গ্যাঙোর গ্যাং শব্দে ব্যাং ডাকিতেছে। কিন্তু এই দারুণ দুর্য্যোগে, জনশূন্য প্রান্তরে মত্ত দাদুরী সঙ্গীতে দত্ত মহাশয়ের কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না। বরং দূরে কোথায় একটা গো-সাপ এমন ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে যে, ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। বিষধর সাপের ভয়ও যথেষ্ট, কিন্তু উপায় কি? এই মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া যাওয়াও যা, আগাইয়া যাওয়াও তাই। তাছাড়া দত্ত মহাশয় বাহিরে যেরূপ নির্জ্জীব, ভিতরেও সেইরূপ নিস্পৃহ। জীবন এবং মৃত্যু উভয়ের সম্বন্ধেই সমান উদাসীন।

তথাপি তাঁহার রতনের উপর রাগ হইল। লোকটার আসা উচিত ছিল। অবশ্য এই জল এবং কাদা ভাঙিয়া পথ হাঁটিবার যে দুঃখ, সে তো আছেই। রতন কিছু তাঁহাকে কাঁধে করিয়া পার করিত না। তবু এমন একলা তো চলিতে হইত না! কথা কহিবার একজন লোক তো পাওয়া যাইত!

গো-সাপটা সমানে গর্জ্জন করিতেছে। তাঁহার পায়ের শব্দ পাইয়া কয়েকটা ব্যাং টুপ্ টুপ্ করিয়া নীচের জলে লাফাইয়া পড়িল। বাঁ দিকের লোকাল-বোর্ডের রাস্তার কাল্‌ভার্ট হইতে হুড় হুড় শব্দে জল নামিতেছে। তবে ভরসার কথা এই যে, পনেরো মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা লাগিলেও রাস্তা ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে। গ্রামের কোলে এখানে ওখানে সেখানে প্রায় একশ'টা আলো দেখা যাইতেছে। বেশী দূরে নয়। সেই আলোতে অবশ্য মানুষ গুলিকে চেনা না গেলেও তাহাদের চলাফেরা দেখা যাইতেছে, এবং উল্লাসের চীৎকারও শোনা যাইতেছে।

আর একটু আগাইতেই দত্ত মহাশয় তাহাদের কাছে আসিয়া পড়িলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! দত্ত মহাশয় কবি নন, তবু এক মিনিট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন। মাথায় মাথালি, পরণে একখানা গামছা মালসাট মারিয়া পরা, ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের কৃষ্ণবর্ণ দেহ, এক একখানা পলুই হাতে লইয়া মহানন্দে ব্যাঙের মত লাফাইয়া বেড়াইতেছে। আর মাঠের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত শতখানেক আলোর মালা। লোকগুলা 'পাউষে' মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের মনে হইল, দেরী যা হইবার হইয়াছে। ভিজারও চূড়ান্ত হইল। এই পথে একবার সাত বিঘার বাকুড়িটা ঘুরিয়া নিজের ডহরের বড় আড়াটা দেখিয়া গেলে মন্দ হয় না।

আড়াটা বড়। সব জিপুকুরের জল বাঁধ ছাপাইয়া ডহরে পড়ে। বাঁধের গায়েই আড়া। বেশ ভাল মাছ পড়ে। নিজস্ব আড়া। কড়া-ক্রান্তির অংশীদার নাই। সেজন্য একটা কই, কি দু'টা মাগুর মাছ লইয়া ফৌজদারী বাধে না। ঠুক ঠুক করিয়া দত্ত মহাশয় সেখানে গিয়া দেখেন, রতন লাঠি হাতে সেখানে দাঁড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার দুইটা ছেলে দুই খালুই মাছ লইয়া বাড়ী যাওয়ার উপক্রম করিতেছে। অন্ধকারে দত্ত মহাশয়ের আগমন তাহারা টের পায় নাই। অকস্মাৎ সম্মুখে পড়িয়া ভয়ে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এত কাছে যে, খালুই লুকাইবারও উপায় নাই।

খানিকটা পিছনেই রতন আলোর সামনে বসিয়া আড়া পাহারা দিতেছে। সম্মুখে আলো থাকায় দত্ত মহাশয়কে চিনিতে পারিল না। অন্য কেউ ভাবিয়া গম্ভীর মেজাজে হাঁকিল, কে রে বক্কা? দাঁড়ালি কেন?

বক্কার উত্তর দিবার শক্তি নাই। কিন্তু দত্ত মহাশয় তাহাদের যেন দেখিয়াও দেখিলেন না, এমনি ভাবে পাশ কাটাইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, রতন নাকি?

মনে মনে রতনও শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দত্ত মহাশয়কে তাহার চিনিতে বাকী নাই। লাফাইয়া উঠিয়া সাগ্রহে বলিল, বড় বাবু? অন্ধকারে যে?

অন্ধকারের কথাটা বড় বাবু নিজেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হাতের নির্ব্বাপিত হারিকেনের দিকে চাহিয়া ক্লান্ত কণ্ঠে বলিলেন, হাওয়ায় নিভে গেল।

রতন গড় গড় করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, তাইতো বলছি, বড় বাবু ঠিক আসবেন। মা ঠাকরুণকে বললাম, ষ্টেশনে যাই। তা মা ঠাকরুণ বললেন, হাঁা, এই দুর্জ্জোগে আবার মানুষ আসে। তুই বরং আড়ার কাছে দাঁড়াগে! লোকের তো ধম্মাধম্ম জ্ঞান নেই। আড়ার মাছ শেষ ক'রে ছেঁকে নিয়ে যাবে। তাই এই দিকে এলাম। কিন্তুক, আমার মন বলছিল···আসতে বড় কষ্ট হয়েছে তো! একটা আলোও নেই।

লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানহীনতা, কিংবা পথের কষ্ট সম্বন্ধে দত্ত মহাশয় একটা কথাও বলিলেন না। বক্কা এবং তাহার সহোদর ইতিমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও নিরুত্তর রহিলেন। কেবল রতনের আলোটা লইয়া আড়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সন্তোষ সহকারে বলিলেন,···ইয়ে, মাছ তো নিতান্ত মন্দ পড়ে নি রতন!

হাত কচলাইয়া রতন বলিল, তাই দেখছেন বটে। কিন্তু আমি না এসে পড়লে শালারা এতক্ষণে সাবাড় ক'রে দিত। চিহ্নটি রাখত না।

রতন ভিজা মাটিতে লাঠিটা ঠুকিয়া গর্ব্বের সঙ্গে হাসিল।

– তোমার শরীর তো ভাল দেখছি না। জ্বর-টর···

—আজ্ঞে, জ্বর পেরাই হয়। মালোয়ারী জ্বর কি না।

—আর সব খবর ভাল ত? তোমার পরিবারের···

পরিবারের কথায় রতন বিগলিত হইয়া গেল। হাত জোড় করিয়া সকাতরে বলিল, আজ্ঞে পরশু থেকে মাগী সেই যে দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছে, আর রামও বলে না, গঙ্গাও বলে না।

পরিবারের অমর্যাদা করা রতনের অভিপ্রায় নয়। তাহার এবং তাহার সমশ্রেণীর লোকের কথা বলিবার ধরণই এই।

দত্ত মহাশয় বিচলিত হইয়া বলিলেন, তাই তো! চিকিৎসা কি রকম হচ্ছে? ডাক্তার—কবরেজ···

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে, সিদিকে ত্রুটি নাই। দু' একখানা পেতল-কাঁসা যা ছিল সব বন্ধক দিয়েছি।

দত্ত মহাশয় শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রতনের পারিবারিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই তো! আর···ইয়ে, মোষের ব্যবস্থা কি রকম হ'ল?

রতন মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল, আজ্ঞে, মোষ পাওয়া যাবে বই কি।

—যাবে?

—যাবে না? হাটে গেলেই মেলা মোষ! এই ডাউরিটা যাক্, তারপরে, ক'টা নেবেন?

দত্ত মহাশয় মেঘের দিকে চাহিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন,···ইয়ে,···দিন সাতেক হ'ল লেগেছে, সহজে কি এ ডাউরি যাবে বোধ হচ্ছে?

রতন হাসিয়া বলিল, দেখুন দিকি! যাবে না তো থাকবে? কাল-পরশুর মধ্যে দেখুন তো আকাশ ফটফটে হ'য়ে যাবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, গেলেই ভাল। মোষের জন্যে আমার তো ঘুম বন্ধ। লোকের আবাদ সারা হ'তে চলল, আর আমাদের···হুঁ!

রতন ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ হইলে কি হয়, চালাকিতে তাহার জোড়া নাই। বরং ম্যালেরিয়ায় দেহ যত সূক্ষ্ম হইতেছে, চালাকিও তত সূক্ষ্ম হইতেছে। তাছাড়া দিবার মত কৈফিয়ৎও তাহার ছিল না। সে শুধু মাথাটা দুলাইয়া বলিল, দেখুন তো!

বলিয়া আলোটা তুলিয়া আড়ার স্বল্প জলের মধ্য হইতে অদ্ভুত কৌশলে খপ্ করিয়া একটা বড় মাগুর মাছ তুলিয়া দত্ত মহাশয়কে বলিল, ঠাণ্ডায় আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না বড় বাবু। এই মাছটা নিয়ে যান। মা ঠাকরুণকে দেবেন, গরম গরম হাতাভাজি করে দেবেন।

মুখে ঝোল টানিয়া বলিল,—ভিজে ভাতের সঙ্গে বড্ডাই সোয়াদ লাগে।

দত্ত মহাশয় মাছটিকে সযত্নে ধরিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। রতন আলোটা লইয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বাড়ীতে দত্ত মহাশয়ের আশা সকলে ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। ন'টার গাড়ী কখন চলিয়া গিয়াছে। এখনও যখন আসিলেন না তখন আর আসিবেন বলিয়া মনে হয় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি বাবার আশায় অনেকক্ষণ জাগিয়া বসিয়া ছিল। আর পারিল না। একে একে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। দত্ত-গৃহিণী আপনমনে গজ্‌গজ্ করিয়া দশবার হেঁসেল উঠাইলেন আর দশবার হেঁসেল নামাইলেন। ছেলেগুলা সন্ধ্যা হইতেই আহারে বসে। একটা প্রকাণ্ড উঁচু পাথরের থালায় ভাতে-ডালে দত্ত-গৃহিণী মাখিয়া লন। একটা রেকাবীতে থাকে তরকারী। ছেলেমেয়েরা গোল হইয়া থালার চারিদিকে বসে। আর দত্ত-গৃহিণী রূপকথা বলিতে বলিতে তাহাদের পর্য্যায়ক্রমে খাওয়ান। সে গল্প এত মিষ্টি যে ভোক্তাদের আর ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয় না। ভুলিয়া ভুলিয়া তাহারা এত আহার করে যে, এক একদিন এক একটা উঠিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলে। তেমন করিয়া না খাইলেও উপায় নাই। দত্ত-গৃহিণী মাঝে মাঝে প্রত্যেকটার পেট টিপিয়া টিপিয়া দেখেন কোনটার কোনখানে কোন ফাঁক আছে কিনা।

ছেলেরা ও-বেলার ভাতই খায়। দত্ত-গৃহিণী নিজের জন্য কিছু আর গরম ভাত চড়াইতে পারেন না। ও বেলার শাক-তরকারী যা কিছু পড়িয়া থাকে, না থাকিলে শুধু নুন দিয়াই কাজ সারেন। শনিবারে স্বামী বাড়ী আসেন। সেদিন সকাল হইতেই বাড়ীতে নানা রকম জিনিস কেনার ধুম পড়ে। রাত্রে উনুন জলে। দু'একখানা তরকারীও বিশেষ করিয়া রাঁধা হয়। শনিবার রাত্রে তিনি হাঁড়িতে নিজের জন্যও দুটি চাল লন। একদা, ছেলেপুলে যখন হয় নাই, তখন ঠাণ্ডার অজুহাতে দ্বার বন্ধ করিয়া দু'জনে একই থালায় আহার করিতেন। সে সবের কিছু আর নাই। কেবল এক হাঁড়িতে দু'জনের চাল লওয়ার সনাতন অভ্যাসটুকু আজও আছে।

ও-দিকের বারান্দায় অন্ধকারে বসিয়া দত্ত মহাশয়ের বৃদ্ধা জননী মালা হাতে হরিনাম জপ করিতেছিলেন। ছোট নাতিনীটি তাঁহার আঁচলের একাংশে গুড়িসুড়ি হইয়া শুইয়া ছিল। তিনিও অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন।

বলিলেন, দিবু আজ আর আসবে না বোধ হয়। তুমি খেয়ে নাও বৌমা। কচি ছেলের মা, কতক্ষণ ব'সে থাকবে?

বৌমা কি করিবেন দিশা না পাইয়া আপন মনেই খানিকটা গজ্‌গজ করিলেন। হাঁড়ির গরম ভাত লইলে সমস্ত ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে পারে। যদিই স্বামী আসেন! কিছু বলা তো যায় না! ইতিপূর্ব্বে আরও কতদিন এমনি ঝড় জলের রাত্রে তিনি আসিয়াছেন। ভদ্রমহিলা অবশেষে নানা চিন্তার পর নিজের জন্য ঠাণ্ডা ভাতই বাড়িয়া লইয়া রান্না-ঘরের এক কোণে আহারে বসিলেন। সত্যই তো, কচি ছেলের মা। বেশী রাত্রে খাওয়া ঠিক নয়।

এমন সময় ঝপ্‌ঝপ করিয়া ছাতা মাথায় দত্ত মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক হাতে একটা মাগুর মাছ। সেটাকে এমন করিয়া টিপিয়া ধরিয়াছেন যে, রাস্তাতেই তার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। মাছটা রান্নাঘরের দিকে ছুঁড়িয়া তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে দাওয়ায় উঠিলেন। এতটা পথ ধীরে-সুস্থে ভিজিয়া বাড়ীতে আসিয়া ব্যস্ততা বড় বাড়িল।

বৃদ্ধা জননী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, এই বিষ্টিতেও বার হয়েছিস? ধন্যি ছেলে বাবা! অ বৌমা! দিবুর জন্যে একটা গামছা নিয়ে এস তো! সর্ব্বাঙ্গ ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। কাপড়টা ছেড়ে ফেল্। ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়িয়ে থাকিস নি। একখানা কাপড় দিয়ে যাও বৌমা!

দত্ত-গৃহিণী স্বামীর পায়ের সাড়া পাইয়াই ভাতের থালা ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। পাশেই একটা ভাঙা কড়াই ছিল। সেইটা দিয়া থালাটা ঢাকা দিলেন। হাত মুখ ধুইয়া একটা গামছা আনিয়া স্বামীর কাঁধের উপর ফেলিয়া দিলেন। ও ঘর হইতে একখানা শুকনা কাপড় আনিয়া পাশে রাখিলেন। তারপরে পা ধোয়ার জন্য এক ঘটি জল আনিতে রান্নাঘর গেলেন।

দত্ত মহাশয় মাথা মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ...ইয়ে, আগুন আছে?

—আগুন, কি হবে?

দত্ত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, আড়া থেকে রতন একটা মাগুর মাছ দিলে। হাতাভাজি হয় না?

—আগুন ব'সে আছে এখনও! আর হাতাভাজি খেতে হবে না।

এ কথাটা দত্ত-গৃহিণী বলিলেন অস্ফুট স্বরে। কিন্তু এ-ঘর হইতেও শোনা গেল। বৃদ্ধা জননী তবু যেন শুনিয়াও শুনিলেন না। বলিলেন, তুমুঠো খড় জ্বেলে দিক্ না হাতাভাজি ক'রে! অ বৌমা, মাছটা কুটে দাও তো গা ভেজে। কতক্ষণই বা লাগবে? তুই কাপড় ছেড়ে খেতে খেতে হ'য়ে যাবে।

দত্ত-গৃহিণী ইহার উত্তরে বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন বোঝা গেল না। কিন্তু খড় আনিবার জন্য গোয়াল-ঘরের দিকে যাইতে দেখা গেল।

দত্ত মহাশয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দু'টি টাকা মায়ের পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন। এটি তাঁহার বরাবরের প্রথা। বৃদ্ধা জননীর এ বয়সে আর সংসার-পরিচালনার শক্তি নাই। সেজন্য সংসার-খরচের টাকা দত্ত-মহাশয় মাসকাবারে স্ত্রীর হাতে জমা দেন। আর প্রতি শনিবারে মাকে দুটি টাকা প্রণামী দেন। মা দু'টি টাকা পরম আহ্লাদে তুলিয়া লইয়া পুত্রকে বহু আশীর্ব্বাদ করেন। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

গৃহিণী ও-ঘর হইতে হাঁকিলেন, ভাত দেওয়া হয়েছে।

জননী বলিলেন, যা বাছা। রাত হ'য়েছে, দুটি খেয়ে নিগে। বাবা আসবে, বাবা আসবে ব'লে ছেলেমেয়েগুলো অনেকক্ষণ জেগে ছিল। এই দেখ না, একটা এইখানেই শুয়ে পড়েছে। তুই যা রাত করলি!

—রাত···মানে, যা···ইয়ে···

এইটুকু বলিতে বলিতেই দত্ত মহাশয় রান্না-ঘরে পৌছিয়া গেলেন; বাকীটুকু আর বলা হইল না। একটা 'হুঁঃ' দিয়াই সারিলেন।

স্বামীর জন্য ভাত বাড়িয়া দিয়া দত্ত-গৃহিণী হেঁসেলের পাশে হাঁটুর উপর দুই হাত মেলিয়া বসিলেন। বলিলেন, এত দেরী হ'ল যে!

ভাতের গ্রাস কোঁৎ করিয়া গিলিয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, ···ইয়ে, যা কাদা! যেমন কাদা তেমনি···হুঁঃ!

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, আর একটু দেরী করলেই হয়েছিল।

উদ্বিগ্নভাবে দত্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

—আমি আমার ভাত বাড়তে যাচ্ছিলাম। আর একটু দেরী করলেই হেঁসেল তুলে ওপরে যেতাম।

দত্ত মহাশয়ের উদ্বেগ দূর হইল। টুক্ টুক্ করিয়া মাথা নাড়িয়া হাসিলেন।

—আবার আড়ার দিকে যেতে বললে কে? মাছ না আনলেই চলত না?

দত্ত মহাশয় হাতাভাজি মাছের একটু খানি কোলের দিকে টানিয়া বলিলেন, সব আমাকে দিলে না কি? তোমার জন্যে রাখ নি?

গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিলেন, না, সব তোমাকেই দিয়েছি।

আহারান্তে হাত চাটিতে চাটিতে দত্ত মহাশয় বাহিরে আসিলেন। এটি তাঁহার পরম পরিতোষ সহকারে খাওয়ার লক্ষণ। ছেলেবেলার অভ্যাস প্রৌঢ় বয়সেও যায় নাই।

আচমন সারিয়া তিনি উপরে গেলেন। তিনটি ছেলেতেই অতবড় বিছানায় এমনভাবে শুইয়া আছে যে, আর একটা মানুষের শোয়ার স্থান নাই। দত্ত মহাশয় প্রত্যেকের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। সকলেই ভাল আছে দেখিয়া সন্তোষ সহকারে একটি "হুঁ" ছাড়িলেন। রান্না-ঘরের কাজ শেষ করিয়া ইতিমধ্যে গৃহিণীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকাকড়ি এনেছ?

—টাকা···হুঁঃ!

কিন্তু এই দুটি কথা বলিতে দত্ত মহাশয় যতখানি সময় লইলেন ততক্ষণে গৃহিণী তাঁহার পকেট হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়াছেন।

—মোটে তিনটি? কি হবে এতে? গয়লাকে একটা টাকা দিতেই হবে। ধোপাকে আট আনা না দিলেই হবে না। বাকী রইল দেড়টি টাকা। তা পরাণ মুদি কি দেড় টাকায় ছাড়বে?

দত্ত মহাশয় একটু থামিয়া টানিয়া টানিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, তিনটে মানে···ইয়ে। যাবার ট্রেনভাড়া রইল না আর কি! ও তিনটে···হুঁ!

অর্থাৎ ওই তিনটি টাকাই তাঁহার সম্বল। ও টাকা লইলে তাঁহার ফিরিবার ট্রেনভাড়া পর্যান্ত থাকিবে না।

গৃহিণী টাকা তিনটি বাক্সে তুলিয়া ঝাঁঝের সঙ্গে বলিলেন, ট্রেন ভাড়া রইল না মানে? তুমি কি যাওয়া-আসার টিকিট ক'রে আসনি? আমাকে ন্যাকা বোঝাচ্ছ?

গৃহিণীর উষ্মায় দত্ত মহাশয় ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহার স্বাভাবিক নিম্নস্বর নিম্নতর অনুনাসিকে পরিণত হইল। কোন প্রকারে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, যাওয়া-আসা মানে ...হুঁঃ! মেম সায়েবকে বললাম, তা···

গৃহিণী ধমক দিলেন, থাক্, থাক্।

দত্ত মহাশয় চুপ করিলেন। গৃহিণী ওদিকে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। মিনিট পনেরো পরে দত্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শরীর ভাল আছে তো?

গৃহিণী পিছন ফিরিয়াই বলিলেন, না।

উদ্বেগে দত্ত মহাশয় খাড়া উঠিয়া বসিলেন। শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আবার হ'ল?···ইয়ে, জর?

—ইয়ে, জর, নিউমোনিয়া, কলেরা, বসন্ত, ইয়ে···

দত্ত মহাশয়ের ছোট মাথাটি ঢেউ-লাগা কলসীর মত দুলিতে লাগিল। আশঙ্কায় নয়; গৃহিণী যে পরিহাস করিতেছেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আবার শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, তাই হোক। আমি ভেবেছিলাম,···হুঁ।

গৃহিণী বলিলেন, হুঁ! আর ভাবতে হবে না। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শোও দিকি!

দত্ত মহাশয় উঠিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া স্বস্থানে শুইয়া পড়িলেন। এক মিনিটের মধ্যে তাঁহার নাসিকাধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।

চাটুয্যেদের বড়গিন্নি দিয়াছিলেন এক শিশি 'পাইরেক্স' আনিতে। তাঁহার বড় নাতি ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া কাঁটাখানি সার করিয়াছে। বছর দুই ধরিয়া ভুগিতেছে। বয়স ষোল বৎসরের কম নয়, কিন্তু দেখিলে নয়-দশ বৎসরের বেশী বলিয়া মনে হয় না। সকালেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঘোষেদের ছোট বৌ দিয়াছিল 'উল্' আনিতে। তাহার বছর দশেকের ভাসুরঝি আঁচলে করিয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে হাজির গৃহিণী পুঁটলি খুলিয়া তাহার জিনিষগুলি বাহির করিয়া দিলেন।

একটু পরেই দত্ত মহাশয় ঠুক ঠুক করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহার মা তখন চাটুয্যে-গিন্নির কাছে পুত্রের গুণপনা শতমুখে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। একালে অমন মাতৃভক্ত পুত্র যে নিতান্ত দুর্লভ, এ বিষয়ে চাটুয্যে-গিন্নির অণুমাত্র সংশয় ছিল না। তিনি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেছিলেন, এবং পুত্রের যে সব কাহিনী মা'ও ভুলিয়া যাইতেছিলেন, সে সব স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন।

দত্ত মহাশয় নামিয়া আসিলেন।

চাটুয্যে-গৃহিণী মুখখানি বিকশিত করিয়া বলিলেন, এই যে বাবা, ভাল ছিলে তো? তাই বলছিলাম তোমার মাকে। ধন্যি তোমার কোঁক বোন, অনেক তপিস্যে ক'রে ছেলে পেয়েছিলে! বেঁচে থাক বাবা, আমার মাথায় যত পাকা চুল তত বৎসর পেরমাই হোক। বৌমা আমার জন্ম-এয়োস্ত্রী হ'য়ে স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর করুন।

বৌমার সম্বন্ধে চাটুয্যে-গিন্নির ভয় ছিল। নাতির ঔষধটা আসিয়াছে বটে, কিন্তু টাকাটা দেওয়া হয় নাই। দত্ত মহাশয় হয়ত তাগাদা করিবেন না, কিন্তু গৃহিণী সাতবার লোক পাঠাইয়া টাকাটা আদায় করিয়া লইবেন। সুতরাং তাঁহাকেও খুশী করার প্রয়োজন।

তিনি একখানা চওড়া লালপাড় মটকার শাড়ী পরিয়া ছেলেদের জন্য মুড়ি বাহির করিয়া দিতেছিলেন। সেদিকে একটা কলরব উঠিয়াছে। আজ মুড়ির পরিমাণ অন্যদিন অপেক্ষা বেশী। মিত্র-বাড়ীর ছোটবৌমার একটি পুত্র-সন্তান হইয়াছে। বড় ঘটা করিয়া তাহার অন্নপ্রাশন হইবে। অন্যান্য আরও পাঁচটি স্বজাতীয়া মহিলার সঙ্গে দত্ত-গৃহিণীকেও এখনই রান্না করিতে যাইতে হইবে। পল্লীগ্রামে উড়িয়া ব্রাহ্মণের এখনও অভ্যুদয় হয় নাই। বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ বাড়ীতে তো নয়ই। দত্ত-গৃহিণী ভোরেই স্নান সারিয়া একবার সেখানে দর্শন দিয়া ছেলেমেয়েদের জলখাবার দিবার জন্য আসিয়াছেন। আবার এখনই বাহির হইয়া যাইবেন। তাঁহার বড় তাড়াতাড়ি।

দত্ত মহাশয় নম্রকণ্ঠে চাটুয্যে-গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর সব ভাল তো, খুড়িমা?

—আর ভাল বাবা। নাতিটার জ্বর তো এই দু'বছরের মধ্যে কিছুতে ছাড়ছে না। কত ওষুধ খাওয়ালাম, বাবার থানে কত মানসিক করলাম, কিছুতে কিছু না

দত্ত মহাশয় গাড়ুটা লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। খবর ভাল নয় শুনিয়া বিব্রতভাবে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। বিব্রতভাবে বলিলেন, তাইত।···ইয়ে, রজনী ডাক্তারকে···

—কত ডাক্তার দেখালাম বাবা। ডাক্তার-বদ্যি আর বাকী রাখিনি।

তবু জ্বর ছাড়িল না? দত্ত মহাশয় গাড়ুহাতে অকূল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। অবশেষে জ্বরের কোনোই কিনারা করিতে না পারিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু তখনই ফিরিয়া আসিয়া রান্না-ঘরের ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, একটু তেল দিও তো। এই সঙ্গে একটা,···হুঁঃ!

দত্ত-গৃহিণী তেলের বাটিটা স্বামীর কাছে নামাইয়া রাখিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিলেন, এই সাত-সকালে তেল মেখে কি হবে?

—সাত সকালে মানে···ইয়ে। বিলের জমিটা একবার ···হুঁঃ, সেই সঙ্গে নদীর ঘাটে একটা···হুঁঃ!

দত্ত-গৃহিণী ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, সেই সঙ্গে আমার মাথাতেও একটা···হুঁ। বেশী দেরী ক'রনা যেন, মিত্তি-বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে।

দত্ত মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, না। যাব আর আসব। শুধু বিলের জমিটায়··

দত্ত মহাশয় তেল মাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চাষের সঙ্গে সঙ্গে বিলে বিঘা কয়েক জমি বন্দোবস্ত করার কথাও উঠিয়াছে। কতদূর পর্য্যন্ত বান আসে নিজের চোখে তাহা পরীক্ষা করিয়াই বন্দোবস্ত পাকা করিবেন সকাল বেলায় এইরূপ ইচ্ছা মনে উদয় হইয়াছে। স্থির করিয়াছেন, এই সঙ্গে তেলটা মাখিয়া গেলে আসিবার সময় নদীর ঘাটে একটা ডুব দিয়া আসা যায়, তাহাতে অনেকটা সময় অপব্যয়ের হাত হইতে বাঁচিবে।

দত্ত মহাশয়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া সোজা পূর্ব্বমুখে নদীর দিকে খানিকটা গেলেই বড় অশ্বথ-তলা। গ্রামের লোক চাঁদা তুলিয়া তাহার নীচে বেশ উঁচু করিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছে। গ্রামের যত নিষ্কর্ম্মা মাতব্বর ব্যক্তি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেইখানে বসিয়া তাস-পাশা-দাবা খেলেন, এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খরসান তামাক পুড়ান। দত্ত মহাশয় প্রথমে সেইখানে আটকাইয়া গেলেন। সপ্তাহ পরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা, একটু তামাক ইচ্ছা করিতেই হইল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বিলের জমি লওয়ার সম্বন্ধে দত্ত মহাশয় অভিজ্ঞ বন্ধুদের সঙ্গে কেবল আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় দূরে দেখা গেল একটা লোক কতক-গুলি মহিষ তাড়াইয়া লইয়া আসিতেছে। দত্ত মহাশয় পাশের লোকটিকে টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখতো হে মহিন্দির, পাইকের ব'লে মনে হচ্ছে না?

মহিন্দির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, পাইকেরই বটে। উলোপাড়ার হাটে যাচ্ছে। তোমার একটা মোষ দরকার, না?

উলাপাড়ার হাটে যাইবার এই রাস্তা। পাইকার কাছে আসিতে তাহাকে থামানো হইল। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মহিষের শিং টানিয়া, দাঁত দেখিয়া, এখান-ওখান টিপিয়া মহিষ পছন্দ করিতে লাগিল। দত্ত মহাশয় তাহাদের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চাহিতে লাগিলেন। বিচক্ষণেরা একটা মহিষ পছন্দ করিল। মহিষটা ভাল; সবে চার দাঁত। এটা হইলে দত্ত মহাশয়ের মহিষটার সঙ্গে জোড়া মেলে ভাল।

কলিকাটা হুঁকা হইতে নামাইয়া দিয়া মহিন্দির বলিল, তোমার মোষের দর কি রকম হে, পাইকের? বল দেখি শুনি।

—ঠিক একদর বলব?

দত্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক দর। দরদস্তর আমি পছন্দ করি না।

কলিকাটা হাতে ধরিয়া দু'টা টান দিয়া পাইকার বলিল, ছোটটা নেবেন তো?

—ছোটটাই নোব, কি বল মহিন্দির?—বলিয়া দত্ত মহাশয় মহেন্দ্রের দিকে তাকাইলেন।

মহেন্দ্র পাকা লোক। কোন্‌টা লওয়া হইবে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে চাহিল না। বলিল, সব কটারই দর শুনি। আচ্ছা, ছোটটারই আগে বল

কলিকায় বেশ করিয়া একটা শোঁ-টান দিয়া পাইকার কলিকাটা নামাইয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। একটু পরে বলিল, একদর বলছি,—এক কুড়ি আট টাকা। এক আধলা কমে দোব না।

মহেন্দ্র বিজ্ঞের মত উপেক্ষাভরে হাসিয়া নিঃশব্দে হুঁকায় দম দিল। পাইকারের কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। দত্ত মহাশয় একবার মহেন্দ্রের একবার পাইকারের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেহই কোন কথা কহে না দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে নিজেই আগাইয়া আসিয়া বলিলেন,···ইয়ে! আটাশ—ফাটাশ বুঝি না। ন'টি টাকা ···হুঁঃ!

এবারে মহেন্দ্র এবং পাইকার দুজনেই অবাক হইয়া গেল। মহেন্দ্র অনুমান করিয়াছিল বাইশ টাকায় লওয়া যায়। পাইকারও আঁচিতেছিল চব্বিশ টাকা বলিলে দিয়া দিবে। এবারে মহিষের বাজার নাই। খড়ের অভাবে লোকে মহিষ বিক্রি করিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সে জায়গায় একেবারে নয় টাকা!

পাইকার আর দাঁড়াইল না। বেশ ক'য়েছেন কর্‌তা, বলিয়া মহিষ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। পিছনে পিছনে দত্ত মহাশয়ও গাড়ু হাতে চলেন। নয় হইতে দশ, এগারো, সাড়ে এগারো পর্য্যন্ত উঠিলেন, পিছনে পিছনে মাইল দেড়েক আসাও হইল কিন্তু পাইকারের মন তথাপি দ্রব হইল না। লোকটা মাহিষের পিঠে দুইটা বাড়ি দিয়া বলিল, আর কতদুর আসবেন কর্‌তা? ফিরে যান। এবারে ছাগল দিয়ে চাষ করুন। মোষ কেনা আপনার কম্ম নয়।

নিরাশ হইয়া দত্ত মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গ্রামে নয়, মাঠে মাঠে একেবারে বিলে।

ভাল বান আসিয়াছে। এখনও হু হু করিয়া বাড়িতেছে। যে জায়গাটা দত্ত মহাশয়ের লওয়ার কথা তার অনেকখানি বন্যার গর্ভে। কিন্তু ঠিক সমস্তটা পর্য্যন্ত বান আসে কিনা, না দেখিয়া পাকা বন্দোবস্ত করা কাজের কথা নয়। দত্ত মহাশয় গামছাটা মাথায় দিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক আঙুল বান বাড়ে, তিনি এক আঙুল পিছাইয়া আসেন। আবার এক আঙুল বাড়ে, আবার এক আঙুল পিছান।

এমনি করিয়া যখন বেলা চারটা কি সাড়ে চারটা তখনও দেখা গেল, বিঘা দশেক জমিতে বান আসিতে বাকী আছে।

এমন সময় রতন হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া বলিল, বড় বাবু, আপনি এখানে? আমি পিরথিমীটা খুঁজে এলাম।

বলিয়া হাত ঘুরাইয়া পৃথিবীটা দেখাইয়া দিল।

বলিল, গাঁ যোলো আনা মিত্তিরবাড়ীতে এসেছে। আপনার জন্যে বসতে পারছে না। এখনও চান হয় নি আপনার?

দত্ত মহাশয় তাহার পিছন পিছন নদীর ঘাটের দিকে চলিতে চলিতে বলিলেন, বিলের সবটায় তো বান আসে নি! এখনও বিঘে দশেক, হুঁঃ!

—আজ্ঞে, এই তো আসতে আরম্ভ করেছে। কাল সকাল নাগাদ সবটা ডুববে।

রতন দত্ত মহাশয়কে তিষ্ঠাইতে দিল না! নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্নান করাইয়া নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল, মহিন্দির বললে, পাইকারের পেছু পেছু গেছেন ভাবলাম, হাটে গিয়েই বা উঠলেন হয় তো!

দত্ত মহাশয় চলিতে চলিতে বলিলেন, হাটে মানে···ইয়ে। তা প্রায় হাটের কাছাকাছিই···হুঁঃ! কিছুতে দিলে না রতন!

না দিবার কারণ রতনের অজ্ঞাত নয়। মহেন্দ্রের মুখে মুখে সে ইতিবৃত্ত সমগ্র গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। সে মনে মনে হাসিতে হাসিতে নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল।

একটা সুবিধা হইয়া গেল, দত্ত-গৃহিণী যজ্ঞবাড়ীতে। মা একা বাড়ী আগলাইয়া বসিয়া ছিলেন। দত্ত মহাশয় বাক্য-বাণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেম। তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া যখন তিনি মিত্রবাড়ীতে পৌছিলেন, তখন সকলের আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; মিষ্ট পড়িতেছে। দত্ত মহাশয়কে দেখিয়া সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি সে কথা গায়েই মাখিলেন না। উঠানের একাংশে গোলার এক পাশে বসিয়া পড়িয়া তিনি বলিলেন, তা হোক, তা হোক। আমাকে এই খানেই দুটো···হুঃ! খাওয়া নিয়ে কথা।

বৃদ্ধ মিত্র মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, সে কি হয় বাবা! তোমার জন্যে ঘরের ভেতরে জায়গা ক'রে দিক। ওরে!

কিন্তু দত্ত মহাশয়ের মনে অভিমানেরও স্থান নাই, অহঙ্কারেরও না। তিনি হাসিয়া বলিলেন, ঘরে মানে···ইয়ে। এই বেশ হবে।

সেইখানেই পরিতোষ সহকারে আহার সারিয়া দত্ত মহাশয় হাত চাটিতে চাটিতে উঠিয়া আসিলেন।

কলিকাতা ফিরিবার গাড়ী রাত্রি ছুইটায়। কলিকাতা পৌছায় পৌনে দশটায়। ডাকগাড়ী নয়, প্যাসেঞ্জার। এটায় গেলে দিনের বেলায় দত্ত মহাশয়ের ভাত জোটে না। ষ্টেশন হইতেই আফিস ছুটিতে হয়। ট্রামে গেলে ছুটাছুটি কমে বটে, কিন্তু দত্ত মহাশয় পারৎপক্ষে ট্রামে-বাসে চড়িতে চান না। দিব্যি ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাঁটিয়া চলিয়া যান।

কিন্তু সে যাক, এখন ট্রেনভাড়ার কি করা যায়? মেমসায়েব তো···হুঁ, এদিকে গৃহিণীও···হুঁ। দত্ত মহাশয় জননীর শরণ লইলেন। মাসের মধ্যে অন্তত ছুইবার এই রকম হয়। গৃহিণীর ব্যাঙ্কে যাহা একবার জমা হইয়া যায় তাহা আর বাহির হয় না। মাকে ছুইটা টাকা প্রণামী লইয়া তিনটি টাকা আশীর্ব্বাদী দিতে হয়। সেকেলে মানুষ, হিসাব-নিকাশের জ্ঞান কম। অত ভাবিয়া দেখেন না। শুধু ছেলের হাতে টাকা নাই শুনিয়া ব্যাকুল হন। এবারেও দত্ত মহাশয়কে তিনটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। রাত্রি একটার সময় বাহির হওয়ার কথা থাকিলে দশটার সময় হইতে গৃহিণীকে তাগাদা দিতে হয়। এই প্রকারে দত্ত মহাশয় কোনো প্রকারে যথাসময়ে ষ্টেশনে এবং তারপরে আফিসেও পৌছিলেন।

আফিসে পৌছিয়া একশত আটবার যাবতীয় দেবতার নাম একটা ফাঁস কাগজে লিখিয়া কপালে ঠেকাইলেন। বেয়ারা হইতে বাবু পর্য্যন্ত যে কেহ আসিল তাহারই কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং অবশেষে একখানা চিঠির খসড়া করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিবানিদ্রা বলিয়া নয়, হাঁটিতে হাঁটিতেও ভদ্রলোক ঘুমাইয়া পড়েন। মাঝে মাঝে লোকের ধাক্কা খাইয়া চমক ভাঙে।

এক দফা ঝিমাইয়া লইয়া দত্ত মহাশয় পাশের ঘরের সহকর্ম্মীর খোঁজ লইতে গেলেন। তিনি তো অবাক!

—কি খবর দত্ত? বুড়ো মা···

সহকর্ম্মীর মুখ দেখিয়া দত্ত মহাশয়ের প্রাণ শুকাইয়া গেল। তার উপর বুড়ো মা! তাঁহার মাথা কলসীর মত ছুলিতে লাগিল।

—বুড়ো মা···মানে চিঠিপত্র কিছু এসেছে নাকি?

—কেন? তুমি বাড়ী থেকে আসছ না? ভাল আছেন তো তিনি?

দত্ত মহাশয় জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, ভাল মানে, হাঁ ভালই তো দেখে এলাম।

--তবে তোমার মাথা অমন উস্ক-খুস্ক কেন? পায়ের জুতো কি হ'ল?

দত্ত মহাশয় আশ্বস্ত হইয়া হাসিলেন। বলিলেন, জুতো মানে···ইয়ে। বাড়ী থেকে যখন বেরুলাম, মনে হ'ল জুতোটা হাতেই আছে। ষ্টেশনে এসে পা ধুতে গিয়ে দেখি, হুঁ। তা হ'লে বাড়ীতেই বোধ হয়···তোমার বাড়ীর খবর ভাল? ছেলেপুলে সব···

—হাঁ ভাল।—বলিয়া ভদ্রলোক কলম তুলিয়া লইলেন।

দত্ত মহাশয় খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, তোমার কাছে···ইয়ে, ছুটো টাকা হবে?

—টাকা? কি করবে?

মাথা চুলকাইয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, যাওয়ার পথে···হুঁ, জুতো এক জোড়া···

ভদ্রলোক ছুটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। দত্ত মহাশয় আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন। তারপর আফিসের কাজ আরম্ভ হইল। একটা খসড়া সাতবার কাটেন। অবশেষে সেটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া লেখেন। সেটা পছন্দ না হইলে আবার কাটেন, আবার লেখেন। এমনি করিয়া যখন খান পাঁচেক খসড়া শেষ হইল তখন বেয়ারা আসিয়া জানাইল রাত নয়টা বাজে। বাবুর জন্ত সে বেচারাও বাড়ী ফিরিতে পারিতেছে না। বাবু উঠিলেই আলো নিবাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে পায়।

বাধ্য হইয়া দত্ত মহাশয়কে উঠিতে হইল। কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকী। অগত্যা সে শুলি বাঁধিয়া বাসায় লইয়া

যাওয়া স্থির করিলেন। আফিসে আসিয়া টিফিনের সময় খান দুই পুরী আর একটা সন্দেশ মুখে দিয়া জলযোগ করিয়াছিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে পেটে আর কিছু পড়ে নাই। কিন্তু সেজন্য বিশেষ অসুবিধা হইতেছে না। উপবাসে তিনি 'সিদ্ধ-উদর'। এক আধ বেলা না খাওয়ার কথা মনেও পড়ে না।

আফিসের ফাইল বগলে দাবিয়া ছাতা মাথায় দিয়া দত্ত মহাশয় রাস্তায় নামিলেন। রৌদ্র-বৃষ্টি থাকুক আর না থাকুক, দিনেই হোক অথবা রাত্রেই হোক, ছাতাটি ভদ্রলোকের মাথায় দেওয়াই চাই। এবং এই ছাতাটি-ই। এ তাঁহার বহু কালের অভ্যাস। ছাতাটি মাথায় দিয়া রাস্তায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসা।

বাসায় যখন ফিরিলেন তখন সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। অবশ্য বাসা একটু দূরেই। হাতিবাগানে। সাধারণ মানুষের তিন কোয়ার্টারের বেশী লাগে না। দত্তমহাশয়ের দেড় ঘণ্টা।

বাসার সকলে তখন নিদ্রামগ্ন। উড়িয়া ঠাকুর তখনও বাবুর প্রতীক্ষায় একটা পিড়িতে বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া একটা উড়িয়া গান মক্স করিতেছে। সুমুখে বসিয়া চাকরটা বিড়ি মুখে দিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছে। দত্ত মহাশয় দরজায় উঁকি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর সব ভাল তো ঠাকুর?

চাকরটা বিড়ি পিছনে লুকাইল। ঠাকুর সঙ্গীত বন্ধ করিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া বলিল, আজ্ঞা হঁ বাবু। ঈশ্বর প্রসাদাৎ খবর ভাল। আপনার খবর ভাল? বাড়ীর সব মংগল্?

দত্ত মহাশয় বাড়ীর চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, বাড়ী মানে···হুঁ।

উপরে আসিয়া ছাতাটি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া একটি কোণে ঠেস দিয়া রাখিলেন। জুতা খুলিতে গিয়া মনে পড়িল জুতা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। আসিবার সময় রাস্তায় এক জোড়া কিনিয়া লওয়ার কথা ছিল। তাহাও হয় নাই। ভুল হইয়া গিয়াছে। দত্ত মহাশয় আপন মনেই একটা হুঁ দিলেন।

তাঁহার বড় ছেলে এইখানে থাকিয়া কলিকাতার কলেজে পড়ে। গ্রামের আরও দুইটি ছেলে তাঁহার ঘরেই থাকিয়া কলেজে পড়ে। জামা খুলিয়া আলনায় রাখিয়া দত্ত মহাশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সকলকে একবার দেখিয়া লইলেন। সব কয়টিই আছে, এবং অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। সকলের ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কাহারও জর হয় নাই। ভাল বলিয়াই বোধ হইল।

হাত-মুখ ধুইবার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,··ইয়ে। আমার জন্যে রুটি হয়েছে তো?

—আজ্ঞা হুঁ।

—তবে আর কি?···ইয়ে। আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে তোমরা খেয়ে নাও। আমার···হুঁ। জপ-তপ সেরে খেতে দেরী হবে।

ঠাকুর খাবার বাড়িতে লাগিল। দত্তমহাশয় হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্ত মনে জপে বসিলেন।

অনেক রাত্রে দত্ত মহাশয়ের ছেলে উপেনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া দেখে আলো জ্বলিতেছে। দত্ত মহাশয় কুশাসনে বসিয়া গভীর ধ্যানমগ্ন। অর্থাৎ মাথাটা ধীরে ধীরে নামিতে নামিতে একবার গঙ্গাজলের পাত্র স্পর্শ করিতেছে, আবার উঠিয়া আসিতেছে।

—বাবা, ঘুমুচ্ছেন নাকি?

—উঁ!—দত্ত মহাশয়ের চমক ভাঙিল।

—ঘুমুচ্ছেন না কি?

—ঘুম মানে—একটুখানি হুঁ।···ইয়ে—

কোশার গঙ্গাজল লইয়া দত্ত মহাশয় চোখে দিলেন। বলিলেন, তোমরা সবাই ভাল তো? ক'টা বাজে?

ঘড়ি দেখিয়া উপেন বলিল, তিনটে পাঁচ।

—তা' হলে আর···ইয়ে।--দত্ত মহাশয় তাড়াতাড়ি নীচে ছুটিলেন।

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[২]

কর্ণেন্দ্রিয়

কাণে শোনার সহিত কথা বলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি। আমরা কি করিয়া শুনি, সে বিষয়ে সাধারণ ভাবে লিখিতেছি।

কর্ণেন্দ্রিয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—বহির্কর্ণ, মধ্যকর্ণ, ও অন্তর্কর্ণ।

বহির্কর্ণ—কর্ণের এই অংশকে আমরা বাহির হইতে দেখিতে পাই। ইহা কোমলাস্থিদ্বারা গঠিত; শক্ত হাড় ইহাতে নাই। ইহার মধ্যস্থল হইতে একটি সরু পথ ভিতর দিকে গিয়াছে। এই পথটিকে ডাক্তারি-শাস্ত্রে meatus বলে। ইহা প্রায় ১৷৹ ইঞ্চি লম্বা। ইহা চলিবার পথে প্রথমে একটু উপর দিকে উঠিয়া, পরে আবার নীচের দিকে নামিয়াছে। পথটি অনেকটা খিলানের মত। এই পথের চারি পার্শ্বে অনেক ছোট ছোট গ্রন্থি আছে, যাহা হইতে রস নির্গত হয়। ইহাতেই "কাণের খোলের" উৎপত্তি। কোন পোকা-মাকড় এই পথে প্রবেশ করিলে, এই রসে আটকাইয়া মারা যায়। কিন্তু যদি "খোল" প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে অনেক সময় আংশিক বধিরত্ব ঘটিতে পারে। এই পথের শেষে একটি অতি পাতলা পরদা আছে, যাহাকে আমরা বাঙ্গালায় কর্ণ-পটহ বলি। ইংরাজিতে ইহার নাম tympanic membrane.

মধ্যকর্ণ—কর্ণ-পটহের পশ্চাতে ছোট গহ্বরটি কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যাংশ। ইহার ভিতরের দিকে দুইটি পথ আছে; ইহাদের নাম fenestra rotunda ও fenestra ovalis, এই পথ দিয়া অন্তর্কর্ণের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। মধ্য-কর্ণের ঠিক পশ্চাতে mastoid cells স্থাপিত, এবং উপর দিকে মধ্যকর্ণ ও মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটি পাতলা অস্থি-ঝিল্লির ব্যবধান আছে। গলা হইতে একটি পথ মধ্য-কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাকে eustachian tube বলে, এবং বায়ু এই পথে মধ্যকর্ণে প্রবেশ করে।

মধ্য-কর্ণে তিনটি অতিক্ষুদ্র অস্থি পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে। ইহাদিগের নাম malleus, incus, ও stapes। Malleus কর্ণ-পটহের সহিত সংলগ্ন। মধ্যেরটি incus, এবং stapes—fenestra ovalisএর সহিত সংলগ্ন।

অন্তর্কর্ণ—অন্তর্কর্ণের গঠন অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ছবির সাহায্যে semi-circular canals ও cochlea দেখিয়া লইলেই আমাদের কায চলিবে। মধ্যকর্ণের ঠিক পিছনে অন্তর্কর্ণের অংশকে vestibule বলে।

শব্দের কম্পন meatus দিয়া কর্ণে প্রবেশ করে, এবং কর্ণ-পটহে আঘাত করে। কর্ণ-পটহ এই কম্পন গ্রহণ করিয়া কাঁপিয়া উঠে। Malleus কর্ণ-পটহের সহিত সংলগ্ন থাকায় কাঁপিয়া উঠে, এবং incus ও stapes-এর ভিতর দিয়া কম্পনকে অন্তর্কর্ণে পাঠাইয়া দেয়। এই ভাবে শব্দের কম্পন cochlea-তে পৌছায়। মস্তিষ্কে যে অংশে আমরা শব্দের অনুভূতি পাই, সেই স্থান হইতে কতকগুলি সূক্ষ্ম স্নায়ু cochlea-তে নামিয়া আসিয়াছে। এই স্নায়ুগুলি শব্দের কম্পনকে মস্তিষ্কে লইয়া যায়, এবং
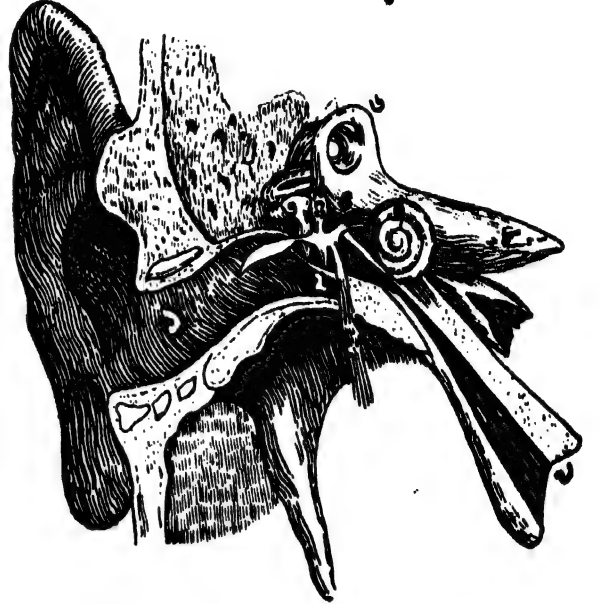
[কলিকাতার মূকবধির বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীআত্মনাথ ঘোষ অঙ্কিত]

(১) External auditory meatus. (২) Tympanic membrane. (৩) Malleus. (৪) Incus. (৫) Vestibule of the labyrinth near Fenestra Ovalis. (৬) Semi-circular canals. (৭) Cochlea, (৮) Apex of the petrous bone. (৯) Eustachian tube.

শব্দ শুনিতে পাই।

Semi-circular canals-এর সহিত শব্দ শোনার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহারা আমাদের দেহের সাম্যাবস্থা (equilibration) রক্ষা করে। যাহাদের এই canal গুলি নষ্ট হইয়া যায়, তাহারা সরলভাবে হাঁটিতে পারে না, দাঁড়াইয়া থাকিলেও দোলে। যে সব ছেলেমেয়ে চলিবার সময় সমান ভাবে পা ফেলিতে পারে না, হেলিয়া দুলিয়া চলে, তাহাদের semi-circular canals গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে জানিতে হইবে।

কাণে খোল জমিয়া যে আংশিক বধিরত্ব হয়, তাহা মারাত্মক নয়।

ডাক্তারের সাহায্যে খোল পরিষ্কার করিয়া দিলেই বধিরত্ব দূর হইয়া যায়। কিন্তু কোন বিষ-ক্রিয়ার জন্য যদি কর্ণ-পথে ঘা বা পুঁজ হয়, তৎক্ষণাৎ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লওয়া উচিত। সাধারণতঃ আমরা ইহা উপেক্ষা করি, এবং ইহার জন্য অনেক শিশুর কাণ চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়। ঘা অগ্রসর হইয়া কর্ণ-পটহ ভেদ করিয়া মধ্য-কর্ণের ছোট হাড়গুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়, এবং চিরদিনের জন্য শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ছোট হাড়গুলি একবার নষ্ট হইয়া গেলে আর কোন উপায়ই থাকে না।

অধিক স্থলেই বধিরত্ব মধ্য-কর্ণের রোগ হইতে উৎপন্ন হয়। Eustachian tube দিয়া নাক ও গলা হইতে, এবং কর্ণ-পটহ ভেদ করিয়া সংক্রামক বিষ-ক্রিয়া মধ্য-কর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়া বধিরত্ব আনয়ন করে। টাইফয়েড, বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগ-জনিত মধ্য-কর্ণে বধিরত্ব এই ভাবে হয়।

Eustachian tube-এর সহিত মধ্য-কর্ণের স্বাস্থ্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মধ্য-কর্ণের গহ্বরে সর্ব্বদাই বাতাস থাকে এবং এই বাতাস eustachian tube দিয়া যাতায়াত করে। কর্ণ-পটহ ও মধ্য-কর্ণে ছোট হাড়গুলির স্বচ্ছন্দ-গতি এই বাতাসের উপর নির্ভর করে। মধ্য-কর্ণের পেশীর সাহায্যে কর্ণ-পটহের কম বেশী দৃঢ়তা (tension) সাধিত হয়। Eustachian tube বন্ধ করিয়া দিলে, কর্ণ-পটহের এই স্বাভাবিক দৃঢ়তার বৈষম্য লক্ষিত হয়। নাসিকাপথ ও ওষ্ঠদ্বয় খুব দৃঢ় করিয়া বন্ধ করিয়া ফুসফুস্ হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিবার চেষ্টা করিলে, মধ্য-কর্ণে বায়ুর চাপ অত্যন্ত বেশী মনে হইবে। ফুসফুস হইতে নিষ্কাশিত বায়ু বাহির হইবার পথ না পাইয়া, eustachian tube দিয়া মধ্য-কর্ণে প্রবেশ করিয়া কর্ণ-পটহকে অত্যধিক চাপের সহিত বাহিরের দিকে ঠেলিয়া রাখে।

নাক ও মুখ পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ রাখিয়া, বাতাস টানিবার চেষ্টা করিলে, মধ্য-কর্ণের গহ্বর বায়ুশূন্য হইয়া যাইবে এবং বাহিরের বায়ুর চাপ কর্ণ-পটহকে ভিতর দিকে চাপিয়া ধরিবে।

উভয় অবস্থাতেই সাময়িক ভাবে আংশিক বধিরত্ব উৎপন্ন হইবে। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, যখন আমাদের খুব ঠাণ্ডা লাগে ও সর্দ্দি হয়, তখন আমরা অপেক্ষাকৃত কম শুনি। ছোট শিশুদের adenoids হইলে বা tonsils খুব বড় হইলে, eustachian tube-এর মুখ চাপিয়া ধরে এবং বধিরত্ব হয়।

উপদংশ প্রভৃতি ব্যাধির জন্য অনেক সময় অন্তর্কর্ণের পূর্ণ গঠন হয় না, এবং জন্মাবধি বধিরত্ব ঘটে। কখন কখন এইরূপ দেখা যায় যে, শিশু উপযুক্ত সময়ে কিছুই শুনিতে পায় না বা কম শোনে; কিন্তু বয়সের বৃদ্ধির সহিত অধিকতর শোনে। এইরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, স্নায়ুর অত্যধিক দুর্ব্বলতার জন্য সে প্রথমে শুনিতে পাইত না; এক্ষণে স্নায়ু ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিবার ফলে সে শুনিতে পাইতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে শিশু অধিকতর স্নায়বিক শক্তি লাভ করিতে পারে, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

কোন কোন পরিবারে বংশপরম্পরাগত বধিরত্ব দেখা যায়। ইহা অনেক সময় দুই তিন পুরুষ ফাঁক দিয়া চলে। ইহা Mendel কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে। এইরূপ বংশগত বধিরত্বের কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক নির্দ্দেশ করা যায় না।

অনেক সময় অতি সামান্য কারণ হইতে বধিরত্বের সৃষ্টি হয়। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের দেশের পিতামাতাদিগকে বলা যে, যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে, বহুসংখ্যক ছেলেমেয়েকেই বধিরত্বের কবল হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। একবার কাণ নষ্ট হইয়া গেলে, তখন আর কোন উপায় থাকে না। কাযেই কাণের অতি সামান্য ব্যাধিকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। (ক্রমশঃ)

মমতা

উড়ে গেলে মন কাঁদে পোষা-পাখী তরে।
ছেড়ে যেতে মায়া হবে কেন-না ধরারে?

সীমাবদ্ধ

আমার অনন্ত আশা তোমারে ঘেরিয়া;
তব প্রেম, তব প্রীতি, তব স্মৃতি নিয়া।

অন্ধস্নেহ

শিশু কহে কত কথা আপনার মনে।
মাতা ভাবে—মোর খোকা কত কি-না জানে;

অভিলাষ

যা'রে সদা প্রাণ চায়, পাই যদি তা'রে।
চঞ্চল এ-মন ধায় অন্য বস্তু পরে॥

—শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীসুকুমার সেন

[৬৪]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথিশালার ২৭৭ সংখ্যক পুঁথির নাম ভা গ ব ত সা র।[১] এই কাব্যখানি মূলতঃ প্রথম মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের সহিত অভিন্ন হইলেও ইহার মধ্যে দ্বিতীয় মাধবের রচনা কিছু কিছু প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রথম মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলখানি ভা গ ব ত সা র নামে বটতলা হইতে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; এই গ্রন্থখানির সহিত পরিষদের ২৭৭ সংখ্যক পুঁথির যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। উভয়ত্রই বিশিষ্ট ভণিতা হইতেছে—

শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
ভাগবতসার দ্বিজ মাধব রচিত॥

এই ভণিতার সহিত আমাদের অনুমিত প্রথম মাধবের ভণিতার সহিত একটুমাত্র তফাৎ হইতেছে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' স্থলে 'ভাগবতসার' নামের প্রয়োগ। এমন হইতে পারে যে, পূর্ব্বাবধি দুইটি নামই প্রচলিত ছিল; উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, মালাধর বসুর কাব্য শ্রী কৃ ষ্ণ বি জ য় এবং গো বি ন্দ বি জ য় এই দুই নামেই প্রচলিত ছিল। তবে আমার মনে হয় যে, ভা গ ব ত সা র নামটি অর্ব্বাচীন কালে কোন কথকের দেওয়া। 'বঙ্গবাসী' সংস্করণে অবলম্বিত প্রাচীন পুঁথির সর্ব্বত্রই শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল নাম পাওয়া যায়।

২৭৭ সংখ্যক পুঁথির প্রারম্ভে এই অংশটুকু অতিরিক্ত আছে। এই অংশটুকু বটতলা এবং 'বঙ্গবাসী' সংস্করণে নাই।

গৌরী রাগ॥

খর্ব্ব স্থূলোদর গজেন্দ্রমুখধর
হেরিতে মোহিত অখিলে।
গলিত মকরন্দ লুবধ অলিবৃন্দ
বিলোল গণ্ডযুগলে॥
বন্দহ অদ্ভুত শৈলসুতাসুত
লম্বোদর গজরায়।
দন্তে বিদারিত বৈরীর শোণিত
সিন্দুরে মণ্ডিত কায়॥

সকল শুভ কাযে অমরপুরী মাঝে
সিদ্ধিদাতা অতিশয়।
শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম রচিত সুখ সদ্ম
দ্বিজ মাধব রস কয়॥

উপর্য্যুপরি দুইবার গণেশবন্দনা থাকায় সন্দেহ হইতেছে যে, উপরি-উদ্ধৃত অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত। হয়ত এইটি দ্বিতীয় মাধবের কাব্যের গণেশবন্দনা ছিল।

'বটতলা' সংস্করণে এবং পরিষদের পুঁথিতে উপক্রমণিকা অংশে কিছু কিছু অতিরিক্ত অংশ আছে। তাহার মধ্যে এই কয় ছত্র উল্লেখযোগ্য—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার। মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণ মাত্র ভরসা আমার। রচিব ভাষায় গ্রন্থ ভাগবত সার॥

পরিষৎ পুঁথির মধ্যে তিন স্থলে উল্লিখিত আছে যে, শম্ভুচন্দ্র বসুর অনুরোধে কাব্যটি রচিত হইয়াছিল—

দ্বিজ শ্রীমাধব কয় হরিলীলা সুধাময়
পান কর সদা ভক্তগণ।
শম্ভুচন্দ্র বসু মতে এই গ্রন্থ প্রকাশিতে
মুল মতে করিল রচন॥

এই অংশটি লিপিকারের প্রক্ষেপ না হইলে দ্বিতীয় মাধবের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

উপক্রমণিকা ভাগে 'বঙ্গবাসী' সংস্করণে যে কিছু অতিরিক্ত অংশ আছে, তাহা প্রাচীনত্বজ্ঞাপক। যথা—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত মধুর সঙ্গীত। নাচাড়ি শিকলি রূপে কহিব বিদিত॥

'পয়ার' অর্থে "শিকলি" শব্দটি কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ডের প্রাচীনতম পুঁথিতেও (১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে) পাই—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালি। রামায়ণ গাইল অদ্ভুত শিকলি॥[২]

'বঙ্গবাসী' সংস্করণে এবং পরিষদের পুঁথিতে যথাক্রমে আছে—

স্বপনে পাইনু মুক্তি কৃষ্ণ উপদেশ। সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥[৩]

রচিতে স্বপনে পাইয়াছি উপদেশ। সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥

১। পুঁথিটির লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

২। পরিষৎ সংস্করণ, পৃঃ ২৮৩ (মুদ্রিত ২৭৫)। ৩। পৃঃ ২।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের অপর একটি পুঁথিতে এইরূপ পাঠ আছে—

বিশেষে পাইল আমি চৈতন্য আদেশ। সেই ভরসায় আর না জানি বিশেষ ॥১

এই পাঠান্তরটি বড়ই মূল্যবান্।

[৬৫]

বঙ্গবাসী সংস্করণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে এই রাগরাগিণীগুলি উল্লিখিত হইয়াছে—মহারাট্টী, শ্রী, পূরবী, গৌরী (=গৌড়ী), সিন্ধুড়া, সুহই, শ্যাম (=সাম), বেলোয়ার, ধানশী, বালা ধানশী, মালশী, পঠমঞ্জরী, কামোদ, গুজ্জরী, মঙ্গল গুজ্জরী, বসন্ত, শ্রীধানশী, করুণ, করুণ মারহাট্টী, রামকিরী, গবড়া (=গৌড়), কৌ (=কহু), গান্ধার, ভৈরবী, পাহিড়া, জাকুড়ি পঠমঞ্জরী, পাহাড়িয়া, মালব মায়ূর, ভাটিয়ারী, দুঃখী, দুঃখ বরাড়ী, কেদার কল্যাণ, আহিরী, বিভাস, পঞ্চম, নট, তুড়ী। ইহা ছাড়া যমক ছন্দ এবং মালিনী ছন্দের উল্লেখ আছে, এগুলি তালের নাম হওয়াই সম্ভব।

[৬৬]

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যাংশে খুব উৎকৃষ্ট নহে। ইহা কবির কাঁচা লেখা বলিয়াই অনুমান হয়। তবুও মাঝে মাঝে বর্ণনা বেশ মনোরম। কতকগুলি ব্রজবুলি পদ ইহার মধ্যে আছে, সেগুলি বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। নিম্নে উদ্ধৃত নৌকাখণ্ডের পদটিকে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের একটি শ্রেষ্ঠ অংশ বলা যাইতে পারে। 'বঙ্গবাসী' সংস্করণ, 'বটতলা' সংস্করণ এবং কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু এই তিন স্থলে উদ্ধৃত পাঠ মিলাইয়া নিম্নের পাঠ স্থির করা হইল।

আমার সুন্দর নায় যে আসিয়া দিবে পায়[২]
হাসিয়া গণিবে[৩] বোল পণ।
তোমার[৪] নিতম্ব কুচ অতি গুরুতর উচ
একেলায়[৫] ভরা দশ জন॥
তেঁঞি বলি যুক্তিসার নহিলে কে করে পার
শুন সব ব্রজগোপীগণ।
আমার বচন ধরি যে আছে ফুরাও কড়ি
তবে পারে করহ গমন ॥[৬]
কাঁখের[৭] পসরা তোর নাএ পার হবে মোর
ইহাতে পাইব আর[৮] কি।
বুঝিয়া উচিত[৯] বল পিছে যেন নহে কল[১০]
এই জীবিকায় আমি জী ॥[১১]
তুমিত যুবতী মায়্যা আমিও[১২] যুবক নায়্যা
হাস[১৩] পরিহাসে গেল দিন।
ও পারে মানুষ[১৪] ডাকে খেয়া নিয়া[১৫] মিছা পাকে
এইক্ষণে হৈত ভরা[১৬] তিন ॥
খীর ননী দুগ্ধ দই[১৭] আগে[১৮] আন কিছু খাই
না বাহিতে গায়ে করি বল।[১৯]
দ্বিজ শ্রীমাধব[২০] কয় রসিক যাদব রায়[২১]
কপটে করয়ে বাক্‌ছল ॥[২২]

[৬৭]

মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বা ভাগবতসারের কোন পদ পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন পদসংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। আধুনিক কালে সঙ্কলিত দুই একটি পদসংগ্রহ গ্রন্থে 'দ্বিজ মাধব', 'মাধব' অথবা 'মাধবদাস' ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণের

১। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ৩০৭।

২। 'যেবা আসি দেয় পা' বঙ্গবাসী; 'যেবা আসিয়া দেয় পায়' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ৩। 'গণয়ে' বঙ্গবাসী, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ৪। 'এ সব' বটতলা। ৫। 'এ নায়ের' বঙ্গবাসী, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু।

৬। এই ত্রিপদীটি কেবল বটতলা সংস্করণে আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে ইহার স্থলে এই বিকৃত ত্রিপদীটি আছে—

হেদেলো গো আলার মায়্যা
বুঝিল বড়ই তুমি চাঁট।
দান ফুরাইয়া হেদেলো গোয়ালিনি
নাএ চড়সিয়া ঝাট॥

৭। 'কাখের' বটতলা। ৮। 'আমি' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ৯। 'আপনি বুঝিয়া' ঐ। ১০। 'ফল' বঙ্গবাসী; 'কলহ' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ১১। 'শোন সব গোয়ালার ঝি' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ১২। 'আমিত' বঙ্গবাসী, কৃষ্ণপদামৃত-সিন্ধু। ১৩। 'হাস্য' বটতলা। ১৪। 'মনুষ্য' ঐ। ১৫। 'কামাই' বটতলা, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ১৬। 'খেয়া' ঐ, ঐ। ১৭। 'ক্ষীর নবনীত চাই' বটতলা। ১৮। 'অগ্রে' ঐ। ১৯। 'নৌকা বাহিতে হউক বল' বঙ্গবাসী; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুতে এই ছত্রের পাঠ—

এখন এক বোল বলুক রাই আগে দেয় কিছু খাই
না বাহিতে গায় হউক বল।

২০। 'মাধব' বঙ্গবাসী, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ২১। 'করুণাময়' বটতলা। ২২। 'মিছা পাকে হারাবে সকল' বঙ্গবাসী; 'নায় কর স্বকাজ সফল' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু।

ব্রজলীলার কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। এগুলির অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে নাই। সেই কারণে অনুমান হয় যে, এই পদগুলি দ্বিতীয় অথবা অপর এক মাধবের রচনা। এই পদগুলির কোন কোনটির মধ্যে, ললিতাদি সখীর উল্লেখ লক্ষণীয়। প্রথম মাধবের কাব্যে ললিতা ও বিশাখার নাম উল্লিখিত হয় নাই, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাধবের রচিত তিনটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারিয়া
নন্দ আদি যত গোপগণ।
নানা উপহার লৈয়া সকলে একত্র হৈয়া
আইলেন যথা গোবর্দ্ধন॥
সহস্র সহস্র জন রান্ধে অন্ন ব্যঞ্জন
একঠাই লইয়া করে রাশি।
দধি দুগ্ধ সরোবর রোটী বাশি পরে থর
হরিষে নাচয়ে১ ব্রজবাসী॥
শ্রীকৃষ্ণের অভিমত পাক কৈল বহুমত
সুপাত্ত পায়স শিখরিণী।
ব্যঞ্জনের মত রূপ পর্ব্বত সমান স্তূপ
অন্ন কোটী করিলা সাজনি॥
নানা বাদ্য বাজে কত নর্ত্তকী নাচয়ে শত
সহস্র সহস্র লোকে গায়।
যত গোপগোপীগণ অলঙ্কৃত সব জন
আনন্দে অবধি নাহি পায়॥
ধেনু বৎস সাজাইয়া কত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া
ব্রাহ্মণেরে দেয় নন্দ রায়।
মহামহোৎসব রোল কে কার শুনয়ে বোল
এ মাধব দেখিয়া বেড়ায়॥২

উপরি-উদ্ধৃত পদটির সহিত প্রথম মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে গোবর্দ্ধন পূজার তুলনা করুন—

নাহি গ্রাম নাহি ভূম নাহি বাড়ী ঘর। পর্ব্বত অরণ্যে বসি কারে মোর ডর॥
যার আশীর্ব্বাদে আছি সর্ব্বত্র অভয়। যথায় নিবসি যেথা জীবন উপায়॥
ব্রাহ্মণ গোধন শৈল এ তিন প্রকার। সকল সম্ভারে যজ্ঞ আরম্ভ তাহার॥
বিবিধ রন্ধন কর আমার পিরীত। হিঙ্গু মরিচ সূপ ঘৃত সম্ভারিত॥
ইত্যাদি।৩

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদটি নৌকালীলার—

ললিতা সখী হসিত মুখী
কহয়ে নায়্যার ঠাঞি।
বোল না কেন তোমার মন
কতেক বেতন চাই॥
আমরা হইয়ে রাজার ঝিয়ারী
যদি মরিযাদা পাই।
ঝাড়িলে হাথ হবে কৃতার্থ
কিসের কাতর রাই॥
কহয়ে নেয়ে বুঝাহ রাইয়ে
কথা কহেন একবার।
পার করি দিব বেতন না লব
এই সে কহিল সার॥
শুনি নায়্যার কথা কহিছে ললিতা
তোমার নাহিক বোধ।
উহার চরণে তোমার পরাণে
দিলে কি পাইবে শোধ॥
রাজার ঝিয়ারী আয়ানের নারী
রাধিকা যাহার নাম।
ঘাটী মাঝি সনে কহিবে কেমনে
তাহারি ঐছন কাম॥
শ্যামা তোমার সাহস বড়।
বাওন হইয়া চাঁদ ধরিবারে
কেমনে সাহস কর॥
না করিহ রোল দিব কিছু গোল
তোমার সোহাগ বড়।
ভুকড়া ভুকড়া করিয়ে তুলিলে
অনেক হইবে জড়॥
শুনিয়া এ বোল হয়ে উতরোল
রাই বিনোদিনী হিয়া।
মাধব বচন পেয়ারীর মন
তোষহ বচন দিয়া॥ ৪

যমুনার মাঝে আসি কাঁপাইল নায়।
কেরোয়াল ছাড়ি কৃষ্ণ মুরলী বাজায়॥
এক ভিত হয়্যা নাচে দেয় করতালী।
বাহ বাহ বলি হাসে দেব বনমালী॥

১। 'না যায়' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ২। কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, ১৩২৯ সাল, পৃঃ ৫১-৫২।

৩। বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৮৪।

৪। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৪৩; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৮৪।

তা দেখিয়া গোপীগণের ভয়ে প্রাণ কাঁপে।
রক্ষা কর রক্ষা কর উচ্চ স্বরে ডাকে॥
আকুল হইয়া দ্বিজ মাধবেতে গায়।
ভাল সময় পায়্যা নায়্যা মুরলী বাজায়॥ ১

[৬৮]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, গ ঙ্গা ম ঙ্গ লে র সহিত দ্বিতীয় শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ লে র ভণিতাংশে আশ্চর্য্য রকম মিল আছে। তাহা ছাড়া শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ লে যে কয়টি ব্রজবুলি পদ আছে, তাহার ভাষার সহিত গ ঙ্গা ম ঙ্গ ল স্থিত ব্রজবুলি পদের ভাষারও যথেষ্ট ঐক্য আছে। সুতরাং এই দুইটি কাব্যের কবি যে অভিন্ন তাহা বলিবার মত অল্পস্বল্প হেতু আছে। এই অনুমানের পরিপোষক আর কিছু যুক্তি বা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে কিনা দেখা যাউক। যাদবনন্দন কৃষ্ণদাস একখানি শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল[২] রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখি যে তিনি শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল-রচয়িতা (মাধব) আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য এবং 'ভৃত্য' ছিলেন। এই যাদবনন্দন কৃষ্ণদাসকে কালিদাসাত্মজ মাধব মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলা হয়। কিন্তু কৃষ্ণদাস কুত্রাপি আচার্য্যকে স্বীয় খুল্লতাত কিংবা জ্যেষ্ঠতাত বলেন নাই। দ্বিতীয়তঃ যাদবমিশ্র এবং মাধবমিশ্র ইঁহারা নবদ্বীপবাসী ছিলেন। অথচ কৃষ্ণদাস বলিতেছেন "জাহ্নবী পশ্চিম কূলে বসতি আমার"।[৩] আবার কৃষ্ণদাস বলিতেছেন—

আমার প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী। দীক্ষামন্ত্র দিলা প্রভু মোর কর্ণ ধরি॥ ৪

এখানে প্রথম চরণে স্পষ্টতই তিন অক্ষর ঘাটতি পড়িতেছে। আমার অনুমান মত প্রথম চরণটি হইবে—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী।

এই পাঠ-কল্পনা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, দ্বিতীয় মাধবাচার্য্য জাহ্নবীদেবীর শিষ্য ছিলেন। এবং এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে, দ্বিতীয় মাধবাচার্য্য আর কেহই নহেন, তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর জামাতা, গঙ্গাদেবীর পতি। এই মাধব গঙ্গার পশ্চিমকূলে জিরাটে বসতি করেন। এই উপলক্ষ্যে আরও একটু কল্পনার বা অনুমানের অবকাশ আছে। দেবকীনন্দন বৈ ষ্ণ ব-ব ন্দ না য় বলিয়াছেন—

প্রেমানন্দময় বন্দো আচার্য্য মাধব। ভক্তি বলে হৈলা গঙ্গা দেবীর বল্লভ॥

এখানে "ভক্তিবলে" এই শব্দের সার্থকতা কি? ইহা কি 'গঙ্গাভক্তিবলে' বুঝাইতেছে? তাহা হইলে কি ইনিই গ ঙ্গা ম ঙ্গ ল লিখিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে?

কৃষ্ণদাসের শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ লে র ভণিতায় এইস্থলে আছে—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণকমল। কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল॥ ৫

ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত ছিল।

শা র দা চ রি ত বা দু র্গা মা হা ত্ম্য রচয়িতা মাধবকে অনেকে গ ঙ্গা ম ঙ্গ ল রচয়িতা মাধবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। শা র দা চ রি ত-কার মাধব আর দ্বিতীয় মাধবের সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। আর গ ঙ্গা-ম ঙ্গ লে র গণেশবন্দনার সহিত শা র দা চ রি তে র গণেশ বন্দনায় যৎকিঞ্চিৎ মিল আছে। ইহা ছাড়া এই অনুমানের আর কোন পোষক-যুক্তি নাই। গ ঙ্গা ম ঙ্গ লে র ভণিতায় অধিকাংশ স্থলেই কবির নাম পাইতেছি মাধবানন্দ। অথচ এই নাম গ ঙ্গা ম ঙ্গ লে পাই না। যাঁহারা দুই কবিকে অভিন্ন মনে করেন, তাঁহারা আশা করি, এই কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন। [ক্রমশঃ]

১। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পৃঃ ১৪৫।

২। এই কাব্যটি পরবর্তী প্রস্তাবে আলোচিত হইবে। কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। পৃঃ ৩৮৫। ৪। পৃঃ ৩৮৪।

৫। পৃঃ ১০৪; পৃঃ ৩৮৭।

পৃথিবীর উর্দ্ধপ্রান্তে

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

পৃথিবীর অধঃপ্রান্তে যে বিরাট মেরুপ্রদেশ সেখানে মানুষ বাস ক'রতে পারে না। পেঙ্গুইন পাখী ও শীল মাছ ব্যতীত আর কোনো জীব-জন্তুর বসবাসও সেখানে অসম্ভব, কারণ সেস্থান চির-তুষারাবৃত, বৃক্ষলতাটি পর্য্যন্ত জন্মায় না। কিন্তু পৃথিবীর উর্দ্ধপ্রান্ত, যেটা উত্তর মেরু নামে প্রসিদ্ধ, সেই উদীচা-ভূমির কতকাংশ বরফাচ্ছন্ন হ'লেও অধিকাংশ স্থলে মনুষ্যের বসবাস আছে। উত্তর মেরু-কেন্দ্রের চারশ' মাইলের মধ্যে জাহাজ যেতে পারে। কিন্তু, সে কেবল অতলান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে—যেদিকে আইস্‌ল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, স্পিট্‌স্‌বার্গেন্, ফ্রান্স জোসেফ প্রভৃতি দ্বীপ আছে, সেই পথে। কিন্তু যদি কেউ প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে আসতে চেষ্টা করেন তাঁকে হাজার মাইল দূর থেকেই ফিরতে হবে, কারণ আলাস্‌কার দিকে অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা বা কানাডার উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্র জমাট বেঁধে বরফের স্তূপ বা হিমভূমিতে পরিণত হয়।
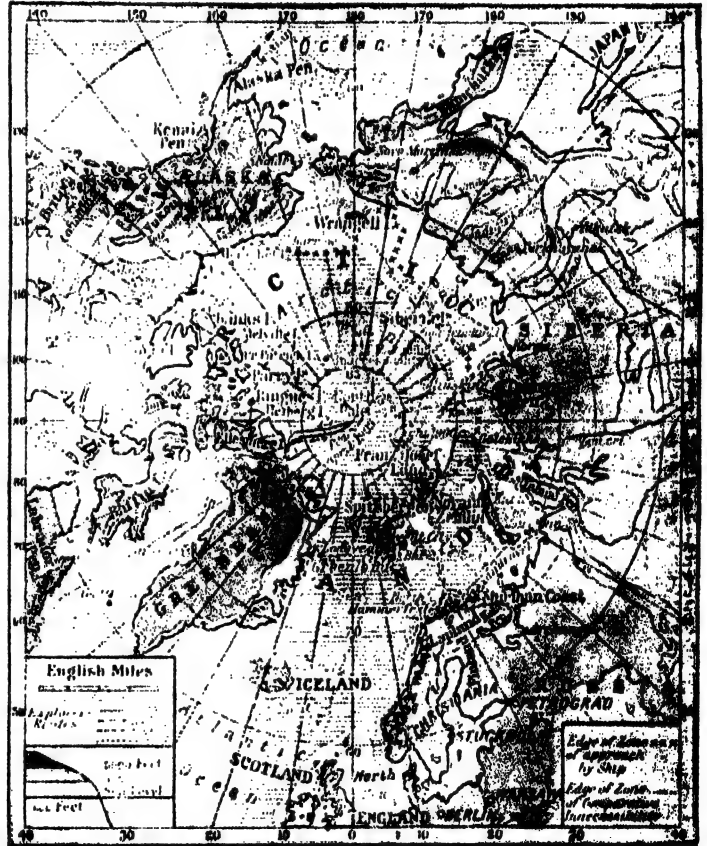
পৃথিবীর উর্দ্ধপ্রান্তের অধিবাসীরা সকলেই প্রায় 'এস্কিমো' জাতির অন্তর্গত। তবে তাদের মধ্যে আবার অনেকরকম শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন ল্যাপ্, স্যাময়েদ, শুক্‌চি, পূবে-এস্কিমো বা এশিয়ার এস্কিমোরা এবং আরও অন্যান্য হরিণজীবী যাযাবর এস্কিমো। এই শেষোক্ত জাতি বরফের দেশে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়ায়, অস্থায়ী বরফের ঘর বেঁধে বাস করে এবং 'রেইন্‌ডিয়ার' নামে এক রকম তুষার-ক্ষেত্রচর হরিণ শিকার করে' জীবন ধারণ করে। এস্কিমোদের সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ডের উত্তরাংশে

পৃথিবীর উর্দ্ধপ্রান্তের মানচিত্র।

লাব্রেডোরের সমুদ্রকূলে, এবং লাব্রেডোর উপদ্বীপে, হাডসান্ উপসাগরের পশ্চিমকূলের উত্তরাংশে, কানাডার মেরু সন্নিহিত

কুসুমিত মেরুভূমি।

উপকূলে, আলাস্কার হিমশৈলমূলে, বেরিং-সাগর-তীরের চতুর্দ্দিকে, এ্যালুশীয়ান উপদ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে এবং কেনাই উপদ্বীপের সন্নিকটস্থ আলাস্কার দক্ষিণ তীরভূমিতে। উত্তর আমেরিকার ঊর্দ্ধভাগের প্রায় সমস্ত দ্বীপেই এস্কিমোদের আধিপত্য চোখে পড়ে, তবে কোনো কোনো দ্বীপ এখনও মনুষ্যবাসের অযোগ্য হ'য়ে রয়েছে। এশিয়ার এস্কিমোরা সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বসবাস করে। অতলান্ত সাগরের দিকে ইংলণ্ডের দক্ষিণ কিনারাতেও এবং প্রশান্ত সাগরের দিকে এ্যালুশীয়ান বিভাগেও এস্কিমোদের দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তর মেরুপ্রদেশের ভূমি অপেক্ষাকৃত অনেক নীচু। আলাস্কা যদিও পর্ব্বতসঙ্কুল স্থান, কিন্তু এস্কিমোরা উচ্চভূমিতে বাস করে না। এ্যাণ্ডিকট পর্ব্বতের উত্তরে যে ত্রিকোণাকার বিশাল নিম্নভূমি পড়ে আছে, আকারে ও পরিমাপে তা' প্রায় ব্রিটীশ দ্বীপের সমতুল্য। এখানকার গিরিরাজি বা শৈলমালার কোনোটাই ৩০।৪০ ফুটের চেয়ে বেশী উচ্চ নয়। মেলভিল দ্বীপ প্রস্তরাকীর্ণ বা পাথুরে দেশ বটে, কিন্তু পর্ব্বতসঙ্কুল নয়। বেঙ্কীন্ দ্বীপও তাই। কানাডার অন্তর্ভুক্ত যে সব দ্বীপ হেবার্গ ও এলিসমিয়ার এবং কানাডার উত্তরাংশ, অর্থাৎ যেখানে যেখানে এস্কিমোরা বাস করে—এ সমস্তই অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি। গ্রীষ্মকালে এ সকল স্থানে একেবারেই বরফ থাকে না।

পৃথিবীর ঊর্দ্ধপ্রান্তস্থ উত্তর মেরুপ্রদেশের মধ্যে গ্রীনল্যাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, কাজেই গ্রীনল্যাণ্ডের শতকরা নব্বই ভাগ চিরতুষারাচ্ছন্ন। তবে উত্তর-মেরুর অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে যে ধারণা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, সেটা একেবারেই ভুল, অর্থাৎ মেরুপ্রদেশ যে মনুষ্যবাসের অযোগ্য এবং বার মাস বরফে ঢাকা থাকে—তা' নয়। উত্তর-মেরুর আবহাওয়া ঋতু অনুসারে পরিবর্ত্তনশীল এবং এখানকার ঠাণ্ডা অধিকাংশ স্থলে এত বেশী তীব্র নয় যে, মানুষের বাস অসম্ভব হ'তে পারে। কেবল মেরু-কেন্দ্রের কাছাকাছি কয়েকটি দ্বীপের আবহাওয়া সারা বৎসরই শীতপ্রধান থেকে যায়। দ্বীপ ও মহাদেশের আবহাওয়ার পার্থক্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। মহাদেশের আবহাওয়া দ্বীপের তুলনায় অপেক্ষাকৃত গরম। গ্রীনল্যাণ্ড ব্যতীত উত্তর-মেরুর অন্যান্য প্রদেশে দ্বীপের শীতল আবহাওয়া অপেক্ষা মহাদেশের শীতোষ্ণ আবহাওয়ার প্রভাবই সমধিক। যেমন, জুলাই মাসে লণ্ডনের আবহাওয়ার অবস্থা যদি তাপমান-যন্ত্রে নব্বই ডিগ্রী থাকে, ক্যানেডার উত্তরে-মেরুপ্রদেশান্তর্গত য়ুকন অঞ্চলে তখন লণ্ডনের চেয়েও বেশী গরম অনুভূত হয়। তেমনি মেরুপ্রদেশভুক্ত লাব্রেডোর অঞ্চলেও জুলাই মাসে স্কটল্যাণ্ডের অপেক্ষা অধিক উত্তাপ পাওয়া যায়।

ট্রাউট্ মৎস্য: এই মাছ উত্তরমেরুপ্রদেশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাওয়া যায়, খেতে সুস্বাদু।

সাইবেরিয়ার উত্তরে মেরু-বর্ত্তী ইয়ানা নদীতীরস্থ প্রদেশের আবহাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। এখানে শীতের দিনে উত্তাপ নেমে যায় একেবারে শূন্য তাপাঙ্কের ৯২° ডিগ্রী নীচে, আবার গ্রীষ্মকালে উঠে আসে শূন্য তাপাঙ্কের ৯৩° ডিগ্রী উপরে! এই অবস্থা রুষের ইয়াকুস্ক প্রদেশেও, অথচ, সেখানে গম, বার্লি, ছোলা ও সরিষা প্রভৃতি বেশ উৎপন্ন হয়।

উত্তর-মেরু বা উদীচ্য সাগরের অপর একটি নাম জমাট-সমুদ্র বা শিলীভূত সাগর। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর ঊর্দ্ধ-প্রান্তস্থ এই মেরু-সাগরের প্রায় এক-চতুর্থাংশ দারুণ শীতেও জমে না, বাকী যে তিনভাগ জমে তা নীরেট বরফ নয়, তুষারের হালকা চাঁই জলের উপর ভেসে বেড়ায়। তবে, তার আকার এক একটা ছোট তক্তাপোষের মাপ থেকে সুরু করে' বড় বড় মাঠ বা ময়দানের মত, এমন কি এক একটা জেলার চেয়েও বিশাল! জলের তরঙ্গবেগে এবং বায়ুর তাড়নায় এই সকল তুষারস্তূপ নিয়ত পরস্পরকে ধাক্কা দিতে দিতে ভেসে চলেছে। গ্রীষ্মকালে বরফের চাঁইগুলি গলে সমুদ্রের তিন ভাগই প্রায় জল হয়ে যায়। কারণ, গ্রীষ্মকালে মেরুপ্রদেশে সূর্য্য আর অস্তমিত হন্ না; চব্বিশ ঘণ্টাই কিরণ বর্ষণ করেন। আবার বর্ষাকালে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। চার ইঞ্চি থেকে বার ইঞ্চি পর্য্যন্ত বছরে বৃষ্টি হ'তে দেখা গেছে। শীতে প্রবল তুষারপাত তো আছেই। দেড়ফুট থেকে তিন ফুট পর্য্যন্ত চারিদিকে বরফ জমে ওঠে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে স্কট-ল্যাণ্ডের স্থানে স্থানে এবং আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে মেরুপ্রদেশের অপেক্ষাও অধিকতর তুষারপাত হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি মেরুপ্রদেশের মধ্যে চিরতুষারাবৃত থাকে একমাত্র গ্রীনল্যাণ্ড, কারণ এ দেশটা প্রায় সবটাই পাহাড়ে ঢাকা এবং উত্তর মেরু-কেন্দ্রের সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী ব'লে এখানকার জমি উঁচু থেকে একেবারে খাড়া নীচু হ'য়ে নেমে গেছে। এছাড়া আরও কতকগুলি পর্ব্বতসঙ্কুল দ্বীপ আছে এই মেরু-কেন্দ্রের আশে-পাশে যেমন, ফ্রাঞ্জ জোসেফ, স্পিটস্‌বার্গেন, এলিসমিয়ার ও হাইবার্গ দ্বীপ, এই সকল দ্বীপের পর্ব্বতরাজি যেন চিরতুষারকিরীটশিরে অনন্তকাল বিরাজ করছে। গ্লেসিয়ার বা হিমবাহিনী খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় আলাস্কার দক্ষিণে, ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় ও বেফীন্ দ্বীপে। পৃথিবীর অধঃপ্রান্ত যেমন এক বিশাল মেরুমহাদেশ, পৃথিবীর ঊর্দ্ধপ্রান্ত ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ, পৃথিবীর এদিকটায়

হিম-বাহিনী (Glacier): এই বরফের স্তূপ জলস্রোতের মত ধীর গতিতে বহমান।

ভাসমান বরফের চাঁই : এই খাড়া উঁচু বিশাল বরফের চাঁই সমুদ্রবক্ষে ভেসে বেড়ায়।

তুষার ঝাউ : সরল বৃক্ষের এক প্রকার দীর্ঘঋজু ঝাউয়ের ঝোপ এই বরফের দেশে আছে। এই ঝাউকাঠ এদেশে অনেক কাজে লাগে।

রয়েছে এক গভীর মেরু মহাসাগর। কাজেই এক গ্রীনল্যাণ্ড ভিন্ন এখানে আর কোনো ভূমিই চিরতুষারাচ্ছন্ন নয়। অথচ, পৃথিবীর অধঃপ্রান্তে যে বিরাট মহাদেশ, সেটা সমস্তই চির-তুষারাচ্ছন্ন। সেখানে এমন কোনো একটু ভূমি নেই যা:

সিন্ধু-ঘোটকের দল।

বরফের আবরণ হ'তে মুক্ত। এ ছাড়া দক্ষিণ-মেরুসাগরে যেমন জীবজন্তু বিরল, উত্তর-মেরুসাগরে তেমনি প্রচুর জীবজন্তুর সমাবেশ রয়েছে। মেরু-যাত্রীর পক্ষে উত্তর-মেরু অভিযান অপেক্ষা দক্ষিণ-মেরু ভ্রমণ অনেকটা সহজ। কারণ, একবার কোনো রকমে এখানকার দুর্ভেদ্য হিমপ্রাচীর লঙ্ঘন করে' প্রবেশ করতে পারলে পথিকের পদদ্বয় তুষারাচ্ছন্ন ভূমির উপর ভর দিয়ে নিরাপদে অগ্রসর হ'তে পারবে। কিন্তু উত্তরে সে সুবিধা নেই। এখানে বরফের চাঁই একস্থানে স্থির হ'য়ে দাঁড়ায় না, নিয়ত সাগরজলতরঙ্গে সরে সরে যাচ্ছে। দক্ষিণে আর একটা প্রধান সুবিধা আছে মেরু-যাত্রীদের পক্ষে—সেখানকার অতিরিক্ত শীতল আবহাওয়ায় কোনো খাদ্যসামগ্রী শীঘ্র নষ্ট হয় না। যে কোনো আহার্য্য বস্তু সেখানে বৎসরাধিক কাল একেবারে সদ্য প্রস্তুতের মত টাট্‌কা অবস্থায় থাকে। কিন্তু উত্তরে তা' হবার উপায় নেই। গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফ যেই গলতে সুরু হবে, খাদ্যসামগ্রীও পচতে আরম্ভ করবে। এখানে কোথাও একটা ঘাঁটি বসিয়ে যাবারও উপায় নেই, কারণ কখন যে তা' ভেসে কোথায় চলে যাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, জীবজন্তু ও মানুষের উপদ্রবও আছে। কিন্তু দক্ষিণে ঘাঁটি বসিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যে কোন দিকে অগ্রসর হওয়া চলে। সেখানে জীবজন্তুর অত্যাচার নেই, মানুষের উৎপাত নেই। দীর্ঘকাল পরে ঘাঁটিতে ফিরে এসে সব কিছু জিনিসই অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাবে। দক্ষিণে যে কোনো সময়ে যাত্রা করা যায়, কিন্তু উত্তরে যেতে হলে শীতকালে যাওয়াই নিরাপদ, অথচ এ সময় দিনের আলো অতি অল্পক্ষণ মাত্র থাকে বলে অন্ধকারে যাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধার কারণ ঘটে। আবার গ্রীষ্ম-সমাগমের আগেই উত্তর-মেরু ভ্রমণ শেষ করতে না পারলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী, দক্ষিণে সে আশঙ্কা নেই। তবে, দক্ষিণের একটা মস্ত অসুবিধা হচ্ছে, পথে কোথাও খাদ্য নিঃশেষিত হলে আর পাবার উপায় নেই। মাংস ও চর্ব্বী—যা মেরু-যাত্রীদের আহার, ইন্ধন ও আলোর জন্য প্রধান সম্বল, উত্তরে তার অভাব নেই কোথাও, এই জন্য অনেকের মতে উত্তর-মেরু অভিযান দক্ষিণ-মেরু যাত্রা অপেক্ষা নিরাপদ।

উত্তর-মেরু প্রদেশের প্রধান অভিশাপ হচ্ছে মশা ও মাছি। গ্রীষ্মকালে এদের অত্যাচারে সেখানে তিষ্ঠতে পারা যায় না। মাস তিনেক এরা মেরুযাত্রীদের জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তোলে। তারপর শীতের সমাগম সুরু হলেই পালায়। তবে সুখের বিষয় এই যে, তারা কোনো রোগের বীজাণু বহন ক'রে আনে না। মেরু-অঞ্চলে ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা, কালাজ্বর প্রভৃতি কোনো দুরন্ত ব্যাধিরই অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীর ঊর্দ্ধপ্রান্তের আবহাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর; সকল মেরু-যাত্রীই বলেন, এখানে অল্প দিনের মধ্যেই বেশ শারীরিক উন্নতি লাভ করতে পারা যায়। উত্তরের আবহাওয়ার আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে

বরফের বাড়ী: উত্তর কানাডার নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহের এস্কিমোরাই কেবল এইরূপ অস্থায়ী বরফের কুঠরি নির্ম্মাণ করে' শীতের দিনে বাস করে। অন্য প্রদেশের এস্কিমোরা এরূপ করে না।

সকল দেশের লোকেরই এ স্থান সহ্য হয়। এখানে স্কটল্যাণ্ডের তিমি-ধর থেকে সুরু করে নরওয়ে, বেডফোর্ড, সান্‌ফ্রান্সিসকো

প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতের ভাগ্যান্বেষীরা আসে যায়। ভালই থাকে সকলে। কেউ কেউ বরাবরের জন্য বসবাস করে এসে। তারা শৃগাল-ধরা ব্যবসা নিয়ে থাকে।
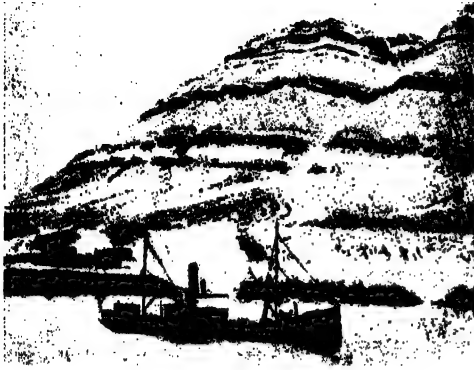
অঙ্গার গিরি: স্পিট্‌সবার্গেন্‌ প্রদেশের বরফাচ্ছন্ন বিরাট পর্ব্বত-গর্ভে কয়লার খনি পাওয়া গেছে। এই পর্ব্বতের কয়লার স্তর বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে।

দুগ্ধ-ধবল মেরু-শৃগালের লোমশ চর্ম্ম ও স্ফুরিত লাঙ্গুল য়ুরোপের ও আমেরিকার সম্ভ্রান্ত এবং সৌখীন মহিলারা শীতের পোষাকের সঙ্গে ব্যবহার করেন ব'লে বহুমূল্যে বিক্রয় হয়।

নানা বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-সৌন্দর্য্যে মেরুলোকে মহা-সমারোহ লেগে যায়। সার ক্লেমেণ্টস্‌ মার্কহাম মেরু-কুসুমের শ্রেণীবিভাগে দেখিয়েছেন—উত্তর-মেরুদেশে আছে ২৮ রকম ফার্ণ, ২৫০ রকম শৈবাল, ৩৩০ রকম ছাতনা এবং ৭৬০ রকমের বিভিন্ন ফুলের গাছ! একজনের অনুসন্ধানের ফলে যদি এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প, লতার সন্ধান মিলে থাকে, না জানি সেখানে প্রকৃতির আরও কত বৈচিত্র্য লুকানো আছে! এখানে বরফের উপরও 'তুন্দ্রা' ব'লে এক রকম ঘাস জন্মায়।

উত্তর-মেরু কেন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম দ্বীপ হচ্ছে গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণের 'এলিস্‌মিয়ার' দ্বীপ। এখানেও প্রায় শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন রকম ফুল গাছ আছে দেখা যায়। ছোটখাটো ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলও চোখে পড়ে। বিস্তৃত অরণ্য এখানে নেই। এদেশে প্রজাপতি প্রভৃতি কীট পতঙ্গও উড়ে বেড়ায়। জন্তুর মধ্যে সব চেয়ে বড় হচ্ছে এখানে 'ক্যারিবো' বা মেরু মৃগ। লক্ষ লক্ষ এই জাতের হরিণ এখানে ঘুরে বেড়ায়। মেরুমৃগের পরই এখানকার বড় জানোয়ার হ'ল 'ওভিবো' বা মেরু-মেষ। আকারে এরা প্রায় গাভীর মত। নেকড়ে আর মানুষ এদের প্রধান শত্রু। এস্কিমোরা 'ওভিবো' পেলে আর কিছু চায় না। কাজেই এদের সংখ্যা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর এক শ্রেণীর বড় জানোয়ার এখানে আছে, তাদের বলে 'গ্রীজলী' বা 'কটা ভল্লুক'। সাধুভাষায় এদের নামকরণ করা যেতে পারে 'হিম-ঋক্ষ'! কারণ, বরফের দেশ ছাড়া আর কোথাও এত বড় বড় কটা ভল্লুক দেখতে পাওয়া যায় না। এই 'ক্যারিবো', 'ওভিবো', 'গ্রীজলী' প্রভৃতি মেরুদেশের বৃহৎ জন্তুরা সবই তৃণপত্র ও লতাগুল্মভোজী। একমাত্র নেকড়ে ছাড়া আর কেউ মাংসাশী নয়।

ছোটখাটো জানোয়ারও এখানে হরেক রকম আছে, যেমন—বেজী, কাঠবিড়াল, ভাম জাতীয় সব জীব। ইঁদুর, ছুঁচো, সাজারু, উদ্বিড়াল, ভোঁদড় প্রভৃতি জীব সমুদ্রকূলে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। দলে দলে ভেড়ার পালও চরে বেড়ায় সেখানে। দু'তিন রকম নেকড়ে বাঘ মেরু দেশের হরিণ ভেড়াদের সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত করে রেখে দেয়। শ্বেত-ভল্লুক ও শ্বেত-শৃগাল একমাত্র মেরুপ্রদেশেরই জীব। এরা শীল মাছ ধ'রে খায়। কাজেই বেশীর ভাগ সময় জলের মধ্যেই অবস্থান করে। উত্তর-মেরুসমুদ্রের মধ্যে অসংখ্য শীলমাছ, তিমিমাছ, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

শীতাবাস: এস্কিমোরা আসন্ন শীতের প্রাক্কালেই গৃহনির্ম্মাণের আয়োজন করেছে। তিমি মাছের কাঁটায় ঘরের কাঠামো তৈরী হয়েছে।

এস্কিমোরা 'ওভিবো' বা মেরুমেষ ছাড়া শীলমাছ ও তিমিমাছও মারে। গ্রীষ্মকালে এখানে প্রায় দু'শো রকম পাখী উড়ে বেড়ায়। চড়াই পাখী থেকে সুরু করে হাঁস, বক, সারস,

প্যাচা, বাজ, শকুন, টিয়া, শালিক প্রভৃতি সবই দৃষ্টিগোচর হয় এস্কিমোরা কিন্তু পাখীর মাংস খায় না।

আজকাল এখানে প্রচুর আলুর চাষ সুরু হয়েছে। গাজর, শালগম, লেটুস্ প্রভৃতি সব্জীও জন্মায়। দাল কড়াইচাষের পরীক্ষাও চলছে। কিন্তু, এখানকার প্রধান ব্যবসা হচ্ছে হরিণ মাংসের। 'রেনডিয়ার' মেরে দেশ-বিদেশে সেই মাংস চালান দেবার জন্য বড় বড় সব কসাইয়ের কারবার বসে গেছে এখানকার নানাস্থানে। কয়লার খনি, তেলের খনি, তামার খনি, সোণার খনি, লোহার খনি প্রভৃতিও একে একে আবিষ্কার হচ্ছে। উত্তর-মেরুর অধিবাসী যারা—অর্থাৎ এস্কিমোরা কিন্তু এসব ব্যবসাবাণিজ্যের ধার ধারে না। কারবার যা কিছু সমস্তই বিদেশীদের হাতে। এস্কিমোরা কারবারী লোক নয়। তারা অল্পে সন্তুষ্ট। মাছ-মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করে। শীলমাছ আর হরিণের মাংস তাদের পয়সা খরচ ক'রে কিনতে হয় না। ধরে নিয়ে এসে কিম্বা মেরে খায়। এদের স্বাস্থ্য খুব ভাল; একেবারে নীরোগ শরীর। অসুখ কাকে বলে এরা জানে না। কিন্তু এস্কিমোদের মধ্যে যারা সুসভ্য য়ুরোপীয়ানদের সংস্পর্শে এসে বিলিতী সভ্যতার অনুকরণ করতে শিখেছে তাদের দুর্দশার আর সীমা নেই। তারা চামড়ার পোষাক ছেড়ে গরম কাপড়ের হ্যাট্‌কোট পরে ঠাণ্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বিলিতী খানা খেতে শিখে উদরাময়ে ভুগছে। সুরাপান করতেও অভ্যস্ত হয়েছে এবং বিদেশীদের সংসর্গে পড়ে তাদের মধ্যে কুৎসিত ব্যাধিও সংক্রামিত হতে সুরু হয়েছে। বিলিতী সভ্যতার আমদানী হবার আগে তারা তুষার-গৃহ, মেটে-বাড়ী, কাঠের বাড়ী, হাড়ের বাড়ী, পাথরের বাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে শীতকালটা যাপন করতো। গ্রীষ্মকালে তারা চামড়ার তাঁবুর মধ্যে থাকতো। আজকাল অনেকে সভ্য হয়ে হাল ফ্যাসানের ইঁটের বাংলোবাড়ী তৈরী করে বাস করছে এবং তার ফলে রোগে ভুগছে।

বিশেষজ্ঞেরা কেউ কেউ বলেন এস্কিমোরা উত্তর-আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের জ্ঞাতি, কিন্তু অপর একদলের মতে ওরা এশিয়ারই প্রাচীন অধিবাসী। এদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উর্ব্বর মস্তিষ্ক দেখে বিস্মিত হতে হয়। এদের মধ্যে যারা এখনো বিলিতী সভ্যতার মোহে আত্মহারা হয়নি তারা অটুট স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি নিয়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বরফের মধ্যে বসবাস ক'রছে।

পৃথিবীতে শান্তি আসিবে কিরূপে ?

এই শীর্ষে শ্রীগৌরীদেবী ইংরেজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া চৈত্র সংখ্যা 'জয়শ্রী'তে দেখাইয়াছেন, গত শতাব্দীতে ইঁহারা রাজ্য-বিস্তার ও রক্ষাকল্পে কয়টা যুদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে সেই তালিকা উদ্ধৃত হইল :

১৮২৪—২৬	প্রথম ব্রহ্ম	যুদ্ধ।	১৮৭০	জুল যুদ্ধ
১৮৩৪—৩৬	প্রথম কাফির	"	১৮৭৭—৮০	দ্বিতীয় আফগান
১৮৩৭—৪১	কেনাডার	"	১৮৭৪—৮৩	দক্ষিণ আফ্রিকার
১৮৩৪—৪২	আফ্‌গান	"	১৮৭৯—৮০	ট্রেনস্‌ভালের
১৮৪০—৪২	চীন	"	১৮৮৪—৮৫	বেচুয়ানাল্যাণ্ডের
১৮৪৬—৫২	দ্বিতীয় কাফির	"	১৮৮৪—৮৯	সুদানের
১৮৫০—৫৩	ব্রহ্ম যুদ্ধ	"	১৮৮৫—৯২	তৃতীয় ব্রহ্ম
১৮৫৭	পারস্যের	"	১৮৯৩—৯৪	মেটিবেলিল্যাণ্ডের
১৮৫৭—৫৮	ভারতের সিপাহি বিদ্রোহ		১৮৯৫—	চিত্রল
১৮৫৬—৬০	দ্বিতীয় চীন	"	১৮৯৬	দ্বিতীয় আসান্টির
১৮৬০—৬৬	মাওরী	"	১৯০০—৩	সোমালিল্যাণ্ডের
১৮৬৭—৬৮	আবিসিনিয়ার	"	১৯০০	চতুর্থ আসান্টির
১৮৭৩—৭৪	প্রথম আসান্টির	"	১৮৯৯—১৯০২	দক্ষিণ আফ্রিকার

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

—শ্রীসত্যসুন্দর দাস

সুরেন্দ্রনাথের কবিতায় বিদেশী কবিতার ভাবসাদৃশ্য যাহা আছে তাহারই দু' একটি উদ্ধৃত করিলাম; ভাবানুসরণ যে নাই তাহা নয়, বরং ইংরাজী কবিতার সুস্পষ্ট অনুবাদ ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। সেকালের কবিগণ এ বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না, রঙ্গলাল হইতে আরম্ভ করিয়া, মাইকেল, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, কেহই ইংরাজ কবির ভাবচিন্তা আহরণ করিয়া স্বকীয় কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে অগৌরব বোধ করিতেন না। ইহা যেন সেকালের একটা ফ্যাশন ছিল। রচনার মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য শিরোদেশে ইংরাজী কাব্য হইতে motto সন্নিবিষ্ট করাও একটা রেওয়াজ হইয়াছিল। আমি এ পর্য্যন্ত * ভাবসাদৃশ্যের উদাহরণ স্বরূপ যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার মধ্যে হয়ত এক-আধটি ভাবসাদৃশ্য না হইয়া, সংস্কৃত অথবা ইংরাজী কবিতার অনুসরণ হইতে পারে; কিন্তু তথাপি আশা করি, আমার ধারণা অধিকাংশ স্থলেই ভ্রান্ত নহে। ভাবসাদৃশ্য ও ভাবানুবাদ এক নয়—রচনার ভঙ্গী ও কল্পনার অনিবার্য্য গতি লক্ষ্য করিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। সুরেন্দ্রনাথ অথবা সে যুগের অন্যান্য কবিগণ, যে সব স্থানে অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা যেন প্রকাশ্যেই করিয়াছেন, পাঠকের নিকট গোপন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সুরেন্দ্রনাথের কাব্য হইতেই এরূপ দৃষ্টান্ত দিব।

হে প্রেম অদ্বৈত জ্ঞান নলিনী-তপন!
*　　*　　*
কাঞ্চন-শৃঙ্খল তুমি
বিপুল এ বিশ্বভূমি
একপ্রান্তে আছে বাঁধা প্রলম্বিত যার—
অপরান্ত কীলে পদপ্রান্তে বিধাতার!

ইহার শেষের কয় ছত্রের উপমাটি স্পষ্টই Tennyson-এর অনুকরণে, যথা—

For so the whole round earth is every way
Bound by gold chains about the feet of God . .

আর একটি, যথা—

হে শোভিতা শ্যামলা সফলা বসুমতী!
বিদরে হৃদয় ভাবি তোমার দুর্গতি;
বনস্পতি ওষধি মধুর ফুল ফল;
মধুময়ী স্রোতস্বতী;
মধুর ঋতুর গতি,—
যত কিছু ধর তুমি মধুর সকল;
অমঙ্গল-মূল মাত্র মানব কেবল!

ইহাতেও Wordsworth-এর কবিতার সুস্পষ্ট ছায়া রহিয়াছে—

Through primrose tufts in that sweet bower,
The periwinkle trailed its wreaths;
And 'tis my faith that every flower
Enjoys the air it breathes.
*　　*
From Heaven if this belief be sent,
If such be Nature's holy plan,
Have I not reason to lament
What man has made of man?

ইহাকে শুধু ছায়া নয়, সজ্ঞান অনুসরণ বলা যাইতে পারে।

অথবা—

প্রেমের বিলাস যথা সঙ্গীত-শ্রবণ—
শুনি যত হৃদে তত কামনা-বন্ধন;

ইহারও মূল যে Shakespeare-এর—

If music be the food of love, play on—

তাহা মনে হইতে পারে, যদিও কল্পনার পার্থক্য আছে।

সেইরূপ নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি—

শ্রী, কান্তি, সৌন্দর্য্য, তুমি ধর যেবা নাম,
কি তুমি, কি প্রকৃতি তোমার?
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধে তব ধাম,—
আকর্ষণী উন্নত আত্মার!

Tennyson-এর এই বচনটির ভাবানুবাদ বলিয়া সন্দেহ হয়—

To look on noble forms
Makes noble through the sensuous organism
That which is higher.

* গত কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এইরূপ আর একটি স্থান উদ্ধৃত করিব, যথা—

পূর্ব্বে নয়-নেত্র যাহা, এবে ফুল্ল ফুল তাহা,
এই যে শ্রীফল লম্বমান—
হ'তে পারে তরুণীর স্তন-উপাদান।

ইহাও ওমার খৈয়ামের মূল, অথবা ইংরাজী অনুবাদের ছায়া হওয়াই সম্ভব। **Fitzgerald**-এর অনুবাদ এইরূপ—

I sometimes think that never blows so red
The rose as where some buried Caeser bled:
That every hyacinth the garden wears
Dropt in its lap from some once lovely hhead.

*   *   *

And this delightful herb whose tender green
Fledges the river's lip on which we lean—
Ah, lean upon it lightly! For who knows
From what once lovely lip it springs unseen!

তথাপি, উপরিউদ্ধৃত উদাহরণের সবগুলিকেই নিঃসংশয়ে অনুকরণ বলা যায় না। এইরূপ আর একটি মাত্র স্থল উদ্ধৃত করিব; ম হি লা কা ব্যে জায়াকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

সে জ্ঞান কি এই যাহা লভেছি তোমায়—
মূসা-উক্তি মানব পতিত হ'ল যা'য়!
এই কি প্রলোভ-ফল আদিম-জায়ার!
সত্য বটে আস্বাদনে
নব মতি উঠে মনে,
এ জনমে ভুলিব না সে বিকার আর—
ক্ষতি নাই যায় স্বর্গ বিনিময়ে তার।

বায়রণের এই কয়টি পংক্তি ইহার মূলে আছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার ভার পাঠকের উপরেই দিলাম—

But sweeter still than this, than these, than all,
Is first and passionate love—it stands alone,
Like Adam's recollection of his fall,
The tree of knowledge has been plucked
—all's known
And life yields nothing further to recall
Worthy of this ambrosial sin,—

বিদেশী কাব্যের প্রসঙ্গ এই পর্য্যন্ত। এইবার আমি পরবর্ত্তী বাংলা কাব্য হইতে কয়েকটি ভাবসাদৃশ্যের উদাহরণ দিব—কেহ যে জ্ঞাতসারে অনুসরণ বা অনুকরণ করিয়াছেন, এমন কথা অবশ্যই বলি না, কিন্তু এই ভাবসাদৃশ্য হইতে সুরেন্দ্রনাথের ভাবুকতার প্রসার ও অগ্রগামিতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইতিপূর্ব্বে আমি এইরূপ দু' একটি স্থল অন্য প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি, এক্ষণে আরও কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় দিব।

সুরেন্দ্রনাথ—

বেশ ভূষা অলঙ্কার
গন্ধ মাল্য উপহার—
ইথে কি নারীর শোভা বাড়ায় তেমন?
যথা ধৃত অঙ্কোপর
কিশলয়-কলেবর
শিশু, ফুল্ল-কপোল স-কজ্জল নয়ন!

দেবেন্দ্রনাথ সেন—

খোঁপায় গোলাপ চাঁপা দিলাম বসায়ে,
গলে পরাইয়া দিনু মালতীর মালা,
সিঁথিটি অশোক-পুষ্পে দিলাম সাজায়ে,
দু' করে পরায়ে দিনু অতসীর বালা;
উরস-কলস যুগে নাগেশ্বর হার
হেসে হেসে সযতনে দিলাম জড়ায়ে

*   *   *

দুইটি কদম্ব দিয়ে কর্ণে দিনু দুল,
তারপর ধীরে ধীরে থোকা-পুষ্প দিয়া
সুন্দরীর চারু অঙ্গ দিনু সাজাইয়া
লোচন-ভ্রমর যুগে করিয়া আকুল!
আমার এ রূপতৃষ্ণা হইয়ে মালিনী
মালঞ্চের মধ্যভাগে বসিল, ভামিনী!

সুরেন্দ্রনাথ—

আছে যে বারিতে পারে মদনের পরে,
নাই যে না বাসে রূপ-প্রভাব অন্তরে;
হের হর-দৃষ্টি ভরে
মদন পুড়িয়া মরে,
স্মরারি সৌন্দর্য্যে তবু উদাসীন নয়!
পরিচয় হিমাচল-সুতা-পরিণয়!

আধুনিক কবির—

নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি'!
উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রু-চোখ ম্লান ছল ছল—
ফুল গুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন উপরে;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্বফল!
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধূর মুকুলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা মরি মরি!

সুরেন্দ্রনাথ বিগত-যৌবনা প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

নাই সে বিবাহ-নিশা বাসর-আগার,
নাই সে উদয়-মুখ যৌবন তোমার ?
* * *
কি পরম রূপ তবু করি বিলোকন !
কাল তব গণ্ডরাগ করেছে হরণ,
মোর হৃদি-রাগ করে সে ক্ষয় পূরণ !

দেবেন্দ্রনাথ—

জানি আমি হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না ঘৃণা—
পতি-চক্ষে, প্রাণনাথ, প্রবীণা যে সুচির-নবীনা !

সুরেন্দ্রনাথের প্রেম-স্তোত্রমূলক কয়েকটি পংক্তি—

হে প্রেম পরম রবি সংসার-রঞ্জন,
নরহৃদি-কন্দর-তিমির-নিরসন !
বিনাশিয়া অন্তরের আদিম আঁধার,
কি প্রভাত পূর্ব্বরাগ প্রচার তোমার !—
স্বপন ছাড়িয়া লভি' পরম চেতন ;
* * *
যদি কভু চোখে পড়ে সংসার বিস্তার,
যা' দেখি, দেখি নি শোভা পূর্ব্বে হেন আর !

ইহার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের এই কয় পংক্তির ব্যবধান খুব বেশী নহে—

তুমি কে ? আঁধার চিত্তে মশাল জ্বালিয়ে
কে তুমি খেদায়ে দিলে আঁধার-দৈত্যেরে ?
* * *
গৃহের জানালাগুলি, প্রাঙ্গন ও ছাদ
সহসা আমার চক্ষে বিদ্যুত আকৃতি
ধরিল, যেন রে কোন মন্ত্রের প্রভাবে !
যেন কোন্ বিশ্বকর্ম্মা করিল প্রসার
গবাক্ষে ; পড়িল মরি চক্ষুর নিমেষে
অপরূপ সিংহদ্বার হৃদয়-তোরণে !

সুরেন্দ্রনাথ—

শশি-বিভাসিতা নিশা মধুর পবন,
সৌধশিরে পরিপাটী পাটীর আসন।
গাঁথি প্রিয়া অন্ন-ফুল্ল মল্লিকার হার,
সিক্তিয়া চন্দন-জলে
থরে থরে দেয় গলে—
হেন মতে যার গ্রাম্য-যামিনী বিহার—
স্বর্গবাসী ঈর্ষাভরে হেরে সুখ তার !

অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গে জলদ-গর্জ্জন,
জেগে শুনি অবিরাম বর্ষণ-নিস্বন,
দামিনীর দ্যুতি করে গবাক্ষ-রঞ্জন—
প্রণয়িনী শঙ্কাভরে
গাঢ় আলিঙ্গন করে,—
পরস্পর দুই অঙ্গ মিলিত যখন,
কে না জানে অঙ্গ পায় অনঙ্গ তখন !

এই দুইটি স্তবকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' শীর্ষক অপূর্ব্ব কবিতার কয়েক পংক্তির সাদৃশ্য আছে—

…দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্নসম যবে কোনো অর্দ্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি' নির্ম্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি'
গ্রন্থি সরমের ;—মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিতে জাগি' উঠে, গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর—

এবং আরও আশ্চর্য্য ও অধিকতর সাদৃশ্য নিম্নোদ্ধৃত স্তবক দুইটি পড়িলেই বুঝা যাইবে—এ যেন রবীন্দ্রনাথের উক্ত কবিতাটির সার-সঙ্কলন !

চাই না সে স্বর্গ, যথা না পাই তোমায় !
ভুলে কি আমার মন অমর-বালায় ?
কোথায় পাইব প্রেম করুণ এমন !
নাই দুঃখ লেশ যথা,
করুণা না বসে তথা—
বেদনা বিহনে কোথা প্রেম-আস্বাদন ?
অপ্রেমের ভোগ সে ব্যঞ্জন অলবণ !

হে মাত ধরণি ! বসি' হৃদয়ে তোমার
সুখে দুখে কিশোরায় আহার আমার ;
পরলোক পায়সায় নাহি চায় প্রাণ ;
তব ভাল মন্দ যাহা
আমার অভ্যাস তাহা,
পরলোক,—পরলোক সংশয় নিদান,
বিশেষ তোমার মম প্রিয়া বিদ্যমান !

এ যেন রবীন্দ্রনাথের পূর্ণবিকশিত কবিতা-পুষ্পের ভাব-বীজ।

রবীন্দ্রনাথের—

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজল ধারা,……
স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা,……
ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোন এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থচ্ছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে,……

—প্রভৃতির মূল কল্পনা সুরেন্দ্রনাথের কবিমানসেও বিদ্যমান, নাই কেবল তার পুষ্পিত রূপটি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনামূলে যদি কাহারও সাক্ষাৎ প্রভাব থাকে তবে অবশ্য তাহা সুরেন্দ্রনাথের নহে; কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে যাহার প্রভাব বিশেষ করিয়া পড়িয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক সেই অপর শ্রেষ্ঠতর কবি বিহারীলাল এই ভাবের ভাবুক ছিলেন—মর্ত্ত্যের প্রেমকে, বিশেষ করিয়া করুণার অশ্রুজলধারাকে তিনিই স্বর্গের অমৃত অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা দিয়াছেন। কল্পনার স্বর্গ-ভ্রমণ করিয়া তিনি বলিতেছেন—

অমরের অপরূপ স্বপ্নসুখ নাহি চাই
*	*	*
কেবল পরমানন্দ
কি যেন বিষম ধন্দ,
বিকল্পবিহীন দশা না জানি কেমন?
*	*
অনন্ত সুখের কথা
শুনে প্রাণে পাই ব্যথা,
অন্-অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই।

সেখানকার পথে এক মর্ত্ত্যবাসিনীকে দেখিয়া কবির উক্তি এইরূপ—

স্বর্গেতে অমৃত-সিন্ধু;
পাই নাই এক বিন্দু;
সাধ্বী পতিব্রতা সতী!
সুখেতে যা কয় গতি;
তব অশ্রুকণাটুকু অমৃত-অধিক ধন
পেয়ে এ অদ্ভুত লোকে জুড়াল তৃষিত মন।

এই ভাবের কবিতা-প্রসঙ্গে একটা কথা বলিব। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক, এবং বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রীয় যুগে, যে মন্ত্রে কবি-কল্পনার পুনরুজ্জীবন হইয়াছে তাহা এই মর্ত্ত্য-প্রীতি। ইহজীবন ও মানবের মানবীয় মহিমার প্রতি এই শ্রদ্ধা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের চিত্তে যে পরিমাণে জাগিয়াছিল, তাহাতেই সাহিত্যে আমাদের নব-জন্ম হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এই উক্তি এ-যুগের বাঙ্গালীর প্রবুদ্ধ-আত্মার বাণী। ইহারই অজ্ঞান এবং পরে সজ্ঞান প্রেরণায়, মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ হইতে আধুনিক কবি পর্য্যন্ত, বঙ্গ-সরস্বতীকে নব নব সৃষ্টি-সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন। যাঁহার প্রাণে এই প্রেরণা জাগে নাই, যিনি এই জীবন ও জগৎকে পরম-বিস্ময়ের চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, যিনি ইহলোকের মধ্যেই লোকাতীতকে উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহার কাব্যপ্রেরণা নিষ্ফল হইয়াছে। বাঙ্গালীর ভাবসাধনায়, নর-দেবতার পূজায়, এই যে মর্ত্ত্যমাধুরীর আরতি আদিকবি হইতে রবীন্দ্রনাথের গান অবধি অপূর্ব্ব রসমূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালী জাতীর প্রাণ-মনের গূঢ় প্রবৃত্তি; "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই," কোন্ আদি কবি-সাধক সর্ব্বপ্রথমে মানব-বেদের এই ঋক-মন্ত্রটির দ্রষ্টা হইয়াছিলেন, ইহার পশ্চাতে কতকালের গুরুপরম্পরাগত সাধনার ইতিহাস রহিয়াছে তাহা আজ নির্ণয় করা দুরূহ, কিন্তু বাঙ্গালীর সাহিত্যগত এবং বোধহয় ধর্ম্মগত সংস্কৃতির মূলে এই বাণী যে ভাবে পরিস্ফুট হইয়া আছে তাহা তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়াই মনে হয়। ইহাই বাঙ্গালীর প্রতিভা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাণের এই প্রবৃত্তিই তাহার শক্তি ও অশক্তির কারণ হইয়াছে ও থাকিবে। আমাদের নব্য সাহিত্য যে অল্পকালের মধ্যে এমন একটা সুপরিণত আকার লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব সেই সুপ্ত মনোবীজকে অঙ্কুরিত করিবার মত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল; মাটী ও বীজ উভয়ই এ-দেশী, রস ও সার যোগাইয়াছে বিদেশী মালাকর।

সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-পরিচয় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ভাব-

সাদৃশ্যের উদাহরণ, আর একটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করিব। জায়াকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন—

এ সংসারে আশাভঙ্গ অরির পীড়ন
খলের খলতা, নাহি ভোগে কোন জন?—
সব-দুখ ভুলি, দেখে বদন তোমার!
বাঁচে মরে মম তরে
আছে হেন ধরা 'পরে—
এ হ'তে কি আছে আর ক্ষোভ প্রতিকার!
আছে হৃদি- নির্ভরিতে হৃদয় আমার!

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের—

কোথা হ'তে দুই চক্ষে ভরে নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার!
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি গাব গান
কোন সান্ত্বনার?
* * *
কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখী!
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,
কোথা তোরে রাখি?
* * *
রুদ্ধকণ্ঠ, গীতহারা! কহিয়ো না কোন কথা.
কিছু শুধাব না!
নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হতে
নীরব বেদনা।

অথবা—

নিশি দু'পহর পঁহুছিনু ঘর
দুহাত রিক্ত করি'।
তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখী সম এলে মোর বুকে—
আছে আছে, বিঁধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকী,
আমারও ভাগ্যে ঘটেনি ঘটেনি
সকলই ফাঁকি।

—পড়িয়া কেবল ইহাই মনে হয়, সুরেন্দ্রনাথে যাহা নিছক ভাব বা ভাবনা রূপে দেখা দিয়াছে সুসম্পূর্ণ কাব্যপ্রেরণার মুখে তাহাই এখানে রস-কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া অনবদ্য কবিতায় রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে।

এই কথাটিই সুরেন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ কালে বার বার মনে হইয়াছে পরবর্ত্তী যুগের কবিগণের কাব্যপ্রেরণায় যে সকল ভাব রসোচ্ছল গীতি-কবিতার বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার যে কত সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট আভাস সুরেন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। হেম-নবীনের ভাবনা ইহা হইতে স্বতন্ত্র,—আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবধারার ক্রমানুবন্ধ অনুসরণ করিলে, সে পথে হেম-নবীনকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু মাইকেল ও বিহারীলালের মত, সুরেন্দ্রনাথকেও পাওয়া যাইবে। জ্ঞান-গবেষণার অত্যধিক উৎসাহে যুগোচিত প্রতিভার অপর প্রতিনিধি এই কবি বিশুদ্ধ কাব্য সাধনা হইতে যে কতটা দূরে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা ও তাঁহার ভাবসম্পদ ও রচনারীতির তুলনা করিলে, সহজেই চোখে পড়ে। ভাবুকতা ও রসিকতার অসামান্য পরিচয় সত্ত্বেও তিনি যুক্তি ও চিন্তা, নীতি ও উপদেশকে তাঁহার রচনায় মুখ্য স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা হইতেই তাঁহার কবিমানসের এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব অনুমিত হয়—যুগপ্রভাব ও সেই সঙ্গে তাঁহার নিজ জীবনের গুরুতর অবস্থা-বিপর্য্যয়, ইহার জন্য কতকটা দায়ী বটে। তথাপি শব্দ-যোজনার নিপুণ ও মৌলিক ভঙ্গী, নবতর শব্দঝঙ্কার ও উপমা-প্রয়োগের অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিলে সুরেন্দ্রনাথের কবি-শক্তি—অর্থাৎ, ভাবুকতার সঙ্গে ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা বা বাণী-প্রতিভা স্বীকার করিতেই হয়। আমি তাঁহার ভাবুকতার নিদর্শনই অধিক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহার কাব্যের বহুস্থানে প্রকাশ-ভঙ্গীর যে অতর্কিত চমক আছে, তাহা উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যেও কাব্য-রসিক পাঠকের চোখে পড়িবে। এইরূপ একটি মাত্র স্থল আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ এইখানেই পুনরুদ্ধৃত করিব।

অর্দ্ধ রাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গে জলদ-গর্জ্জন,
জেগে শুনি অবিরাম বর্ষণ-নিস্বন,
দামিনীর দ্যুতি করে গবাক্ষ রঞ্জন—

ইহার শেষ পংক্তিটিতে বর্ণনার যে বর্ণযোজনা আছে তাহা উৎকৃষ্ট কবিশক্তির নিদর্শন—'দামিনীর দ্যুতি করে গবাক্ষ-রঞ্জন'—বিশেষ ঐ 'রঞ্জন' শব্দটি, বর্ণনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। বর্ষারাত্রির মধ্যযামে মেঘের ডাকে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, অনবরত বৃষ্টির শব্দ ও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-চমক ইহার মধ্যে বর্ণনার অসাধারণত্ব কিছুই নাই; কিন্তু বিদ্যুতের আলোকে জানালার গায়ে যেন রঙের প্রলেপ লাগিতেছে—বর্ণনার এই ভঙ্গী বিদ্যুৎ চমকের মতই চমকপ্রদ—যেন অক্ষরগুলার মধ্যেই বিদ্যুৎকে ধরিয়া দিয়াছে। অথচ ভাষার কি সংক্ষিপ্ত ও অতর্কিত ভঙ্গী! —যেন আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, কবির কোন খেয়ালই নাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যথা সময়ে ছায়ার পাঠকক্ষের দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইয়া বিমল বলিল, আমি আসব?—কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলে, ছায়ার 'কাজিন' সমীর আসিয়া পর্দ্দাটা একটু ফাঁক করিয়া ইংরাজীতে কহিল, আমি বড় দুঃখিত; ছায়া অত্যন্ত অসুস্থ।

বিমল প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে?

এই সময়ে, কক্ষমধ্যে ছায়া কাহাকে বলিল, না, না, ওঁকে ডাক।

সমীরের সমবয়সী, সমবেশী একটি যুবক পর্দ্দার আর একটা দিক ফাঁক করিয়া বলিল, আপনি আসুন, ছায়া ডাকছে।

বিমল কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কক্ষটির জানালাগুলি বন্ধ—অন্ধকার; লম্বা কৌচটার উপরে ছায়া এলায়িতভাবে শুইয়া; তাহার মাথায় একটা জলপটি; ঘরখানি ল্যাবেণ্ডারের গন্ধে আমোদিত। ছায়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া ছিল, পদশব্দে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিল, গুড-আফটারনুন, আসুন। বসুন। বড্ড মাথা ধরেছে মিষ্টার রায়। সকাল থেকেই—

সমীর ও অপর যুবকটি ছায়ার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল; সমীর বলিয়া উঠিল, কিন্তু তুমি কথা ক'য়ো না ছায়া!

—কেন, কথা কইলে কি হবে! কাল অনেক রাত্রে প্রণয় মামা এসে ড্রাইভিঙে নিয়ে গেলেন, ফিরতে প্রায় বারটা বেজে গেছল, এসে ঘুম হ'ল না, ভোর বেলা বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে দেখি, মাথাটা ধরে গেছে। তাই থেকে বেড়েই চলেছে।

বিমল শুনিতেছিল কি না তাহা বলা যায় না; ছায়া থামিলে বলিল, তা হলে আজ আর পড়তে পারবে না?

সমীর ও তাহার বন্ধু সমস্বরে বলিয়া উঠিল, একেবারে অসম্ভব।

ছায়া কোন কথা বলিল না দেখিয়া বিমল বলিল, তা হ'লে আমি যাই।

—কিন্তু আপনি চা খাবেন না?

—বাড়ী গিয়ে খাব।

—না, বয় চা আনুক। সমীর, বল না ভাই বয়কে চা আনতে।

—বলছি, বলিয়া সমীর বাহির হইয়া গেল।

বিমল চা-জলখাবার এখানেই খাইত। গৃহকর্ত্রী মিসেস্ ঘোষ স্বয়ং সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিমলের আপত্তি তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার ব্যবস্থায় কন্যার জন্য যে সমস্ত আহার্য্য আসিত, শিক্ষকের জন্য অবিকল তাহাই আসিত; কোন পার্থক্য থাকিত না। বিমল ইহাতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইত কিন্তু গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই।

সমীরের সঙ্গে চা ও আহার্য্যের ট্রে লইয়া বয় ও তৎসঙ্গে মিসেস্ ঘোষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কন্যার কৌচের ধারে বসিয়া পড়িয়া মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, মাথাটা ছাড়ল ছায়া?

এবারও সমীর ও অপর যুবাই উত্তর করিল, না মাসিমা! ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।

জননী কঠিন স্বরে কহিলেন, নিজের দোষে কষ্ট পাচ্ছে। কি দরকার ছিল বাবু অতো রাত পর্য্যন্ত ড্রাইভিঙে! তার ওপর সকালেই বললুম, একটা প্যারগেটিভ নিতে, তাও নিলে না। নাও, ভোগ এখন। পড়া-শুনো চুলোয় যাক্।

সমীর বলিল, একদিনে কি এমন ক্ষতি হবে মাসিমা!

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, যাদের কিছু কিছুও তৈরী থাকে, একদিনে তাদের ক্ষতি নাও হতে পারে, ছায়ার মত বিদ্বান মেয়ের একদিনেই যথেষ্ট ক্ষতি!

সমীর বলিল, কেন মাসিমা, ছায়া ত এদানী খুব প্রোগ্রেস্ করছে।

মিসেস্ ঘোষ যেন শুনেন নাই, এই ভাবে বলিতে লাগিলেন, যেমন শরীরের দিকে, তেমনি লেখাপড়ায় সমান নেগলিজেন্স! কি দরকার ছিল বাপু, অতো রাত্রে বেরুবার! বেরুলেই যদি, একটুখানি বেড়িয়ে ফিরে এলেই হোত! তা নয়, ভোগ এখন সাতদিন। পড়াশুনো বন্ধ থাক।

ছায়ার মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ করিতেছিল, কিন্তু এতগুলি লোকের সামনে বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে তাহার লজ্জা হইতেছিল। অন্ততঃ মিঃ রায় না থাকিলে মা'কে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিত; এবং যে কথাটা তাহার ওষ্ঠাধরে নৃত্য করিতেছিল, সে কথা অনেকবারই সে বলিয়াছে। পড়াশুনা যখন বিবাহের জন্য এবং যেমন হউক বিবাহ একটা হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় বার হওয়া সম্ভব নয়, তখন লেখাপড়া লেখাপড়া করিয়া অত হট্টগোল করিবার কোন সার্থকতাই ছায়া দেখিতে পায় না। এই কথাগুলাই আজ কড়া করিয়া মা'কে শুনাইয়া দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। এই মেয়েরই মা ত! মেয়ের মুখ দিয়া তাহার মনের ভাব কতকটা অনুমান করিতে তিনি বোধ করি পারিয়াছিলেন, ভাব ও ভাষা নরম ও মোলায়েম করিয়া লইতে বিলম্ব হইল না, মা বলিলেন, ও শুয়ে থেকে কিছু হবে না। ওঠ, আমি বালিগঞ্জের লেকের দিকে যাচ্ছি, চল আমার সঙ্গে। মাথায় খানিক ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে মাথা সেরে যাবে'খন। - তারপর মেয়ের কাপড় জামার পানে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, চেঞ্জ করবি নাকি!—আবার নিজেই বলিলেন, ভালই আছে, চেঞ্জের দরকার নেই। নে, ওঠ!—বলিয়া বিমলকে বলিলেন, আপনিও চলুন না মিষ্টার রায়। বালিগঞ্জে একটু বেড়িয়ে, আপনাকে আমরা ড্রপ ক'রে আসব'খন। আমি গাড়ী বার করতে বলছি—বলিয়া তিনি আর কাহারও পানে না চাহিয়া, কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সমীর ও তাহার সঙ্গী যুবকটির মুখ দু'খানি কালো হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মনের ভাব অনুমান করা কঠিন ছিল না। ছায়ার মাথাধরা উপলক্ষ্য করিয়া সন্ধ্যার আসরটি আজ যে ভাবে জমাইবার কল্পনা করিয়া তাহারা উৎফুল্ল হইয়াছিল, তাহা সমাধিস্থ হইতে দেখিয়া দুঃখ অবশ্য হইবারই কথা; কিন্তু দুঃখ আরও অধিক হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে মাসীমা তাহাদিগকে নেগলেক্ট করিয়া বেতনভোগী মাষ্টার মশায়টিকে সঙ্গী হইতে আহ্বান করিতে দ্বিধা করিলেন না।

মাথার জলপটিটা খুলিতে খুলিতে ছায়া বলিল, সমীর, তোমরা ঘুরে আসছ ত?

সমীর মুখখানা প্যাঁচার মত করিয়া বলিল, বলতে পারি না, দেখি!

অপরজন কহিল, তুমি ত এসেই শুয়ে পড়বে! আমরা এসে কি আর করব বল?

কিছুক্ষণ আগে ঘটা করিয়া শিরঃপীড়ার সেবায় এই ব্যক্তিই তনুমন সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

গাড়ী-বারান্দায় মোটরগাড়ী থামার সুগম্ভীর শব্দ হইল। ছায়া বিমলের দিকে চাহিয়া বলিল, চলুন মিঃ রায়!

বিমল ড্রাইভারের পাশে বসিতে যাইতেছিল, মিসেস্ ঘোষ নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দেখাইয়া বলিলেন, আপনি এইখানে আসুন। বিমল সসঙ্কোচে যতটুকু না হইলে নয়, ততটুকু স্থানে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। ছায়া জননীর বামদিকে অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া।

সমীরের বেবি-অষ্টিনখানা ফটকের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিয়া মিসেস্ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা আছে বুঝি?

হাঁ না কেহই কিছু বলিল না।

ফাঁকা রাস্তায় পড়িয়া গাড়ী আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। মিসেস্ ঘোষ কথা সুরু করিলেন, ছায়া অঙ্ক পারছে?

বিমল একটু মুস্কিলে পড়িল। সত্য কথা বলিলে বলিতে হয়, না। মিথ্যাভাষণে সে অনভ্যস্ত। বলিল, মনে হচ্ছে পারবেন।

পুনশ্চ প্রশ্ন—ক'দিনে কিছু এগিয়েছে?

প্রশ্ন অত্যন্ত অসুবিধাকর। বিমল পূর্ব্বের মত 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' রূপ জবাব দিল, চেষ্টা করছেন বৈকি!

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন, আপনি ওকে ম্যাট্রিকটা এ-বছরে পাস করিয়ে দিতে পারলে, আপনাকে রিওয়ার্ড দোব।

বিমল কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, রিওয়ার্ডের কথা কেন বলছেন, ওঁকে পড়াবার জন্যেই ত আমাকে রেখেছেন।

—রিওয়ার্ডের কথা কেন বলছি তা'ও আপনাকে বলি। কোন কারণে আমি চাই, ছায়া এই বছরই ম্যাট্রিক পাস ক'রে ফেলে। সময় পেলে আই-এও পড়াব, আর যদি এর মধ্যে—কথাটা তিনি শেষ করিলেন না। করিলেন না, কেন না, বাহিরের লোকের কাছে সব কথা বলা সাজে না। তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, আর যদি এর মধ্যে সেই বানরটা ফিরিয়া আসে, তখন দায় তাহার—তাঁহার নয়। বিমল যে সবই জানে, তিনি তাহা জানিতেন না।

বিমল বলিল, পরিশ্রম করতে পারলে এই ক'মাস সময়ই যথেষ্ট। তবে ওঁর শরীরও ত তেমন ভাল নয়।

ছায়া মোটরের ভাঁজবদ্ধ হুডের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ছিল, বিমল তাহা দেখিয়া আবার বলিল, আজও যে রকম কষ্ট উনি পাচ্ছেন, দু'-একদিনে সেরে উঠতে পারবেন ব'লে মনে হয় না।

—সেই ত হয়েছে আরও মুস্কিল! কাল আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে একটা চিলড্রেন্স থিয়েট্রিক্যাল শো আছে, যিনি অথার, তিনি ছায়াকে একখানা গান গাইবার জন্য ধ'রে পড়েছেন। ছায়া স্বীকারও পেয়েছে, এখন এই মুস্কিল। আর এই ইলেভেন্থ আওয়ার লাষ্ট মোমেণ্টে গাইব না বলা মানে সমস্ত শো'টাকে নষ্ট করা।

বিমল কোন কথা বলিল না। কেনই বা বলিবে? সীমার বাহিরে চলা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ।

আকাশে রঙের লীলাখেলা চলিতেছিল। পশ্চিম আকাশ ধূসর বর্ণের হাল্কা মেঘে আচ্ছন্ন, দিনান্তের শ্রান্ত রবি মেঘান্তরাল হইতে যেন অতীব করুণ নয়নে ধরিত্রীর নিকটে বিদায় মাগিতেছেন। পশ্চিম আকাশ লালে লাল হইয়া গিয়াছে, খণ্ড খণ্ড ধূসর মেঘগুলি লাল রঙ মাখিয়া গোলাটে দেহে দাঁড়াইয়া আছে। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ লোককে আবীরে চর্চ্চিত করিলে যেমন দেখায়, মেঘখণ্ডগুলিকেও তেমনই দেখাইতেছে। আকাশের রক্তিমাভা আকাশ ছাড়াইয়া, নিখিল ভুবনে, স্থলে জলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মিসেস্ ঘোষ সোল্লাসে বলিলেন, আকাশের দিকে দেখ্ ছায়া।

—ভারি সুন্দর ত! গাড়ীটা একধারে রাখতে বল না মা!

হঠাৎ ছায়াকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাগুলি বলিতে শুনিয়া তাহার মা যেমন, বিমলও তেমন প্রফুল্ল হইলেন। বিমল তাহার পানে চাহিতে দেখিল, পশ্চিম আকাশের আভা পড়িয়া ছায়ার মুখখানিকে অতীব সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

ছায়া মেয়েটি সুন্দর। আজকাল গল্প-উপন্যাসে রূপ-বর্ণনার রেওয়াজ নাই। বোধ হয় রূপ নাই বলিয়া বর্ণনার প্রথাও রহিত হইয়াছে। এখনকার দিনে রূপের আদর্শ ব্যক্তিগত ভাবে লোকের মনে আবদ্ধ। তুমি যাহাকে ভাল বাস, তোমার কাছে সে সুন্দর; আমি যাহার প্রেমাভিলাষী, আমি তাহার রূপমুগ্ধ; তেমনই সে যাহাকে চায়, সে তাহার রূপে মজিয়াছে, ডুবিয়াছে, হয়ত বা মরিয়াছে। আজকাল বোধ হয় এমনই চলিতেছে। তবুও, এই ব্যক্তিগত রূপাদর্শের গণ্ডীর বাহিরেও রূপের প্রভাব কখনও কখনও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আজ এই মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে বিমলের মনে ছায়ার রূপের কোন রেখাপাতই হয় নাই; আজ এইক্ষণে পশ্চিমাকাশের রঙে রাঙা সুগৌর মুখের পানে চাহিয়া বিমলের মনে হইল, মেয়েটি সুন্দরী। যে অশোককে সে জানে না, চেনে না, যাহার নাম ও কীর্ত্তিমাত্র সে জানিয়াছে, সে যদি বিলাতের মোহ পরিহার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে, রূপতৃষা তাহার অতৃপ্ত থাকিবে না।

বিমল যখন ঐ কথাগুলি চিন্তা করিতেছিল, তখন আর একখানি গৌরবর্ণ আনন তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। হয়ত সে'ও এই সময়ে তাহাদের অট্টালিকার পশ্চিমমুখী কাশ্মীরি বারান্দায় বসিয়া আছে, পশ্চিমাকাশের ঐ রাঙা রঙ তাহার মুখেও আসিয়া পড়িয়াছে! সে মুখ বড় পরিচিত, প্রত্যেকটি রেখার সঙ্গে বিমলের নিবিড়তম পরিচয়।

গাড়ী থামিয়াছিল। মাতাপুত্রী মুগ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের বর্ণলীলা দেখিতেছিল, বিমল বলিল, ছায়া আজ আর পড়তে পারবেন না; যদি অনুমতি করেন, মা, আমি যাই।—'মা' বলিতে তাহার বড় বাধিতেছিল। এই বিলাতী চালচলন ও নব্যসমাজান্তর্ভুক্ত রমণীদের মাতৃসম্বোধন করিতে সত্যই বাধে; বিমলেরও বাধিয়াছিল, কিন্তু বিমল সে বাধা অতিক্রম করিল।

ঐ শ্রেণীর অন্য রমণীরা কি ভাবিতেন, কি বলিতেন, কি করিতেন জানি না, মিসেস্ ঘোষের হৃদয়ে স্নেহ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, বাড়ী যাবে ত? চল না বাবা, আমরা তোমাকে ড্রপ্ ক'রে দিয়ে যাই।

—আমি বাড়ী যাব না, আমার এক বিশেষ আত্মীয়দের—

—বেশ ত! চল, সেইখানেই দিয়ে যাই। সে কোথায়?

—ভবানীপুর।

—সে ত আমাদের পথেই পড়বে। চল, তোমায় সেই-খানে নামিয়ে দিয়ে আমরা যাই। বিশ্বনাথ, ষ্টার্ট দেও।

লেক রোড ছাড়িয়া রসা রোড় দিয়া গাড়ী যখন ভবানী-পুরের দিকে ছুটিতেছিল, বিমল বলিল, থাকৃগে, যাব না।

মিসেস্ ঘোষ হাসিলেন, বলিলেন, তবে চল, আমাদের ওখানেই।

—না, মা, আমি বাড়ীই যাই। গাড়ীটা একবার থামাতে বলুন।

—চল, তোমার বাড়ী দেখে আসি।

বিমল অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, না, না, সে বাড়ী আপনার দেখবার যোগ্য নয়। আমি এইখানেই নামি।

মিসেস্ ঘোষ কথা কাটাকাটি করিবার লোক নহেন; ড্রাইভারকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন।

নামিয়া বিমল নমস্কার করিতে, কহিলেন, কালও ওর পড়া হবে না, প্রণয়দের থিয়েটারে যেতে হবে। পরশু থেকে ভাল ক'রে পড়া আরম্ভ করিয়ে দিন। দেখ বাবা, তোমাকে তুমিই বলি! আমাদের আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে আছে, সকলকার মেয়েই ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পাস করেছে, তাদের কাছে আমার বড় লজ্জা হয়। ছায়া যাতে পাসটি করতে পারে, তুমি তাই কর বাবা! আমি ওঁকে ব'লে তোমার ভাল চাকরী করিয়ে দোব।

বিমল গদগদচিত্তে বলিল, চেষ্টার ত্রুটী করব না মা।

আচ্ছা বাবা, এসো। কাল আর তোমায় কষ্ট করতে হবে না—

ছায়া বলিয়া উঠিল, না, না, উনি আসবেন, প্রণয় মামা ওঁকেও ইন্‌ভাইট্ করেছেন, আপনি যেমন আসেন, তেমনই আসবেন মিঃ রায়, সব একসঙ্গে যাব।

তাই ভালো!—বলিয়া মিসেস্ ঘোষ গাড়ী চালাইতে আদেশ দিলেন।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। এখন গেলেও, অন্ধকারে ইন্দুকে দেখিতে পাইবে না। বিমলের মনটি বিষণ্ণতায় ভরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রণয় বাবু গাড়ী থামাইয়া, প্যান্টের পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন, ঠিক সময়ে এসেছি, কালকের চেয়ে একটি মিনিট দেরী।

ইন্দু হাসিল। এ হাসি কেমন জান? শুকনো ফুলে বাতাস লাগিলে সে যেমন হাসি হাসে, এ তেমন হাসি। সারাটি দিন আজ কি কষ্টেই না তাহার কাটিয়াছে; কতবার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে; কত কাজে আজ তাহার ভুলত্রুটী হইয়াছে, ধরা পড়ায় বার বার কতই না অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে। আজিকার দিনটি বড় কষ্টে কাটিয়াছে। সংসারের যে সমস্ত কাজে মগ্ন হইয়া সে মস্ত পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, আজ সে সকল কাজ তাহার নিকট অত্যন্ত নীরস বলিয়া বোধ হইয়াছে; আজ সমস্ত দিন, সমস্ত কাজের মধ্যে সে কেবলই একজনের পরিচিত পদশব্দ, পরিচিত কণ্ঠস্বর কামনা করিয়াছে, যত বার ব্যর্থতা আসিয়া আঘাত করিয়াছে, ততবার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছে। সারাদিনের সঞ্চিত দুঃখের রাশি যে বুকে যে মুখে ভরিয়া ছিল, সেই মুখের হাসি কত করুণ, তাহা যে না দেখিয়াছে সে বুঝিবে না।

প্রণয় বাবু গাড়ীর চাবি খুলিয়া পকেটজাত করিয়া, নামিয়া বলিলেন, আজ যাবে ত?

ইন্দু বলিল, যাব।

প্রণয় সানন্দে ও সোৎসাহে কহিলেন, চল তোমার মা'কে বলে আসি।

দেখা গেল, কণা ও তাহার মাতা খিড়কীর দিক হইতে বাগানেই আসিতেছেন, ইন্দু বলিল, ঐ যে মা আসছেন।

মাতার আপত্তি হইবার কথা নয়; বলিলেন, বেশ ত, বেড়িয়ে আসুক না। ফিরে, আপনি এখানে খেয়ে যাবেন।

ধন্যবাদ!—বলিয়া প্রণয় গাড়ীর দুইদিকের দ্বার খুলিয়া দিলেন। ইন্দুর ইচ্ছা ছিল সামনের আসনে তিনজনই বসে; কিন্তু প্রণয় ফ্রক-পরা কণাকে আগেভাগে আদর করিয়া পিছনের আসনে বসাইয়া দিয়া ইন্দুকে বলিলেন, তুমি ঐ দিক দিয়ে ওঠ।

ইন্দু উঠিলে নিজে উঠিয়া বসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া ফটক পার হইয়া গেলেন। বাগান তেমনই ফুলে ফুলে ফুলময়। ফ্লাওয়ার-বেডে এমন একটি তরু নাই যাহার সর্বাঙ্গ না পুষ্পিত হইয়া শোভার সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই বৃত্তাকার 'পুষ্পশয্যার' মধ্যস্থলে একটি কনকচাঁপার নাতি-বৃহৎ গাছ ছিল, সেইটির মাথায় নীলরঙের একটি বিদ্যুৎবাতি বিমল এমন সুকৌশলে বসাইয়া দিয়াছিল যে, সে আলোকটি জ্বলিলে স্থানটুকুর সৌন্দর্য্যের সীমা থাকিত না। গৃহস্বামিনী বা তাঁহার কন্যাকে সন্ধ্যার পর বাগানে আসিতে দেখিলে,

দ্বারবান বাতির সুইচটা টিপিয়া দিত, আজও দিয়াছিল। গৃহিণী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে অন্তঃপুরে যাইতেছিলেন, হঠাৎ কাহার আহ্বানে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

—কাকিমা।

গৃহিণীর প্রসন্ন মন অকস্মাৎ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইল। আগন্তুক, বিমল।

বিমল নত হইয়া পায়ের ধূলা লইল। বলিল, আমি একটা ছোট্ট কাজ পেয়েছি, তাই আপনাকে বলতে এলুম।

—কি কাজ?

—টিউসনি।

গৃহিণী তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন, টিউসনি? ক'টাকা ক'রে পাও?

তাচ্ছিল্য সহ্য করিবার শক্তি বোধ করি ভগবানই দরিদ্রদের দিয়া থাকেন। বিমল সহজভাবেই বলিল, পঞ্চাশ টাকা।

—তা বেশ। পঞ্চাশ টাকায় তোমাদের দু'জনের বেশ চলে যাবে।—একটু থামিয়া আবার বলিলেন, তোমার মা ভাল আছেন ত?

—হ্যাঁ, মা ভালই আছেন।

এখন কি করা যায়?—এ সমস্যা উভয়ের মনেই উদিত হইয়াছিল। গৃহিণী ভাবিতেছিলেন, মেয়েদের ফিরিতে বিলম্ব আছে, এখন ইহাকে উপরে লইয়া দুই পাঁচটা কথা কহিয়া বিদায় দিলে কোন ক্ষতি নাই। তবে কর্ত্তাটি আসিয়া পড়িলে, মুস্কিল আছে! তাঁহার হয়ত এখনই 'কথা দেওয়ার' কথা মনে পড়িয়া যাইবে ও একটা কাণ্ড করিয়া বসিবেন। বিমল এখান হইতে যদি আপনা-আপনি চলিয়া যায়, সেই ভাল হয়। বিমল ভাবিতেছিল, ইন্দু কি একবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবে না! একটিবার চোখের দেখা, কতদিন দেখা হয় নাই, আজও কি হইবে না? ইন্দু আগে প্রায়ই এসময় ফুলবাগানটিতে ফুলরাণীর মত বেড়াইত—কোন ফুলের গন্ধ লইত, কোন লতাটিকে আদর করিত, কোন পুষ্পিত তরু-শাখে আদর করিয়া হাত বুলাইত, আজ কি একবার আসিবে না? বাগানটি তেমনই আছে, কিন্তু ইন্দু কি তাহার সাধের বাগানটিকে পরিত্যাগ করিয়াছে? ইন্দু যদি না-ই আসে, দেখা যদি না-ই হয়, তাহা হইলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি হইবে?

অবাঞ্ছিত পরিচিত লোককে অল্প কথায় বিদায় দেওয়া বড় শক্ত। গৃহিণীর বড় বিপদ। তবে তিনি নাকি নিজকে খুবই শক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই বিমলকে ধূলাপায়ে বিদায় দিতেও পারিলেন। বলিলেন, তুমি কি বসবে?

একথার কি উত্তর, বিমল তাহাই ভাবিতেছিল।

গৃহিণী পুনরপি কহিলেন, মেয়েরা সব প্রণয়ের সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গেছে; কর্ত্তাও আসেন নি, ফিরতে দেরী হবে বোধ হয়।

বিমল উত্তর ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল, বলিল, আমি যাচ্ছি কাকিমা।—বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া বিমল বাহির হইয়া গেল। কাশ্মীরি বারান্দা অন্ধকার, বোধ হয় জন-প্রাণীশূণ্য!

প্রণয়! প্রণয়! প্রণয়! বিশ্বভুবনে ছড়ানো ঐ একটি নাম—প্রণয়! প্রণয়! প্রণয়! এই প্রণয় যেন প্রজাপতির মত বিচিত্র বর্ণবহুল পাখা উড়াইয়া চারিধারে উড়িয়া বেড়াই-তেছে। এই প্রণয়কে সে ছায়াদের ওখানে দেখিয়াছে, এখানেও এই প্রণয়! অথচ এই গৃহে কোনদিন কোন প্রণয়ের প্রণয়বিস্তার যে হয় নাই, সেদিন পর্য্যন্ত বিমল তাহাই জানিত।

আসিবে না ইহাই ঠিক ছিল, মিসেস্ ঘোষের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ীর পথই সে ধরিয়াছিল, কিন্তু ভবানীপুরের সেই রাস্তাটার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় তাহার মন বিশ্বাসঘাতকতা করিল, চরণদ্বয় সেই দুষ্কর্ম্মে সহায় হইল; চক্ষুর্দ্বয় শাসন ভুলিয়া গিয়া বিদ্রোহ করিল। অল্প সময়ের মধ্যে কত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। না ঘটিলে ভাল হইত, এই অনুশোচনা যত বৃথাই হউক, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিবার সাধ্য অনেকেরই নাই, বিমলেরও ছিল না।

গড়ের মাঠের বক্ষভেদ করিয়া মাঝে মাঝে যে সমস্ত রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহারই একটায় পড়িয়া, প্রণয়কুমার বলিলেন, এইবার তুমি ষ্টিয়ারিঙে এস, ইন্দু! ধর।

ইন্দু চাকাখানা ধরিল, প্রণয় তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া, চাকাখানাকে কখনও দক্ষিণে, কখনও বামদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ইন্দুকে কলকব্জা, তাহাদের কার্য্যকারণ

সমস্তই বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। ইন্দু একেবারে আনাড়ী নয়, কলকব্জা চিনিত, একটু-আধটু চালাইতেও জানিত; কিন্তু সে ভাব একেবারেই প্রকাশ করিল না। প্রণয়কুমারের কথাগুলা সে-যে শুনিতেছিল, এমনও মনে হয় না। হাত দু'খানাকে নিজের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া সে নিস্পৃহ উদাসীনের মত বসিয়া রহিল।

প্রণয়কুমার অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন, এক সময়ে কেবল ইন্দুর করপল্লবে একটু চাপ দিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তুমি বুঝি কিছুই শুনছ না?

ইন্দুর যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। হাত দু'খানাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে কহিল, ও আমি পারব না।

প্রণয় হাত দিয়া, চাকার উপর ইন্দুর হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, খুব পারবে।

—না থাক্, বলিয়া সে এক রকম জোর করিয়াই হাত দু'খানা টানিয়া লইল।

প্রণয় রাস্তার এক পার্শ্বে গাড়ী থামাইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রাগ করলে ইন্দু?

ইন্দু বলিল, না। একটু থামিয়া আবার বলিল, আমার দ্বারা হবে না। আর শিখে লাভই বা কি!—কথাগুলার মধ্যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক এমন একটি করুণ সুর ধ্বনিত হইল যে, তাহার নিজের কাণেও তাহা খারাপ লাগিল। সংশোধন করিয়া লইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আমি ঐদিকে বসি, ক্ষণাকে দিন, চমৎকার ড্রাইভ করবে। - বলিয়া বামহস্তে টানিয়া দরজাটা খুলিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

ক্ষণা সোল্লাসে নামিতে নামিতে বলিল, প্রণয় দা আপনি কিন্তু পাশে থাকবেন।

প্রণয় ক্ষণাকে ষ্টিয়ারিং ছাড়িয়া দিলেন কিম্বা ক্ষণাই তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া ষ্টিয়ারিং ধরিয়া বসিল ঠিক বলা যায় না, তবে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। গাড়ীর ভিতরে ইন্দু নীরবে বসিয়া রহিল, স্তম্ভিত ও বাক্‌হীন প্রণয়ের দক্ষিণে বসিয়া ক্ষণা বেগে গাড়ী চালাইয়া দিল।

মিনিট দশেক পরে প্রণয় ইন্দুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ দিকে যাবে বল?

ইন্দু নির্লিপ্তের মত বলিল, বাড়ীই চলুন, ভাল লাগছে না আমার!

সত্যই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল, না আসিলেই ভাল হইত। কিন্তু কি ভাল হইত, কেন ভাল হইত, সে তর্ক উঠিল না, মনে হইতেছিল, না আসিলেই ভাল হইত।

এবং সারা রাত জাগিয়া এই কথাটাই সে ভাবিল, না গেলেই ভাল হইত। বিমল যে আসিয়াছিল, ইন্দুর মা সে কথা কাহাকেও বলেন নাই। শুনিলে ইন্দু বুঝিত, কেন তাহার মন বলিয়াছিল, না গেলেই ভাল হইত।

সে রাত্রে ভাল করিয়া বিমলের খাওয়া হইল না, সুপ্তি তাহার নয়নমন স্পর্শ করিল না। সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অনুশোচনা, যুক্তিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ প্রভৃতি যা-কিছু এবং যত-কিছুর অবসান ঘটিয়া যে সমস্যাটি ভোরের আকাশের শুকতারাটির মত বিমলের চিত্তাকাশে জাগিয়া রহিল, তাহা এই যে, ইন্দুও প্রণয়জালে জড়াইয়া পড়িল নাকি?

তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তরুণ অরুণের আলোকধারা কক্ষময় লুটাইতেছে, খুব দৃঢ়কণ্ঠে একটি 'নাঃ, কিছুতেই নাঃ' বলিয়া বিমল শয্যাত্যাগ করিল।

পল্লীর লাইব্রেরীতে গিয়া, সংবাদপত্রে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া এবং অন্যান্য সংবাদগুলিতে চোখ বুলাইয়া বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া নিত্য নিয়মিত ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন করিতে গেল। মা'কে বলিয়া গেল, আজ এক জায়গায় থিয়েটার দেখিতে যাইবার কথা আছে, ফিরিতে বিলম্ব হইবে।

মা যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন। থিয়েটার বায়স্কোপ বিমল কখনও দেখিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতে পারেন না। পাড়ার কত ছেলে কত মেয়ে যায়, কত গল্প করে, কত তর্ক চলে, আশ্চর্য্য তাঁহার ছেলেটি, কোনদিন কোথায়ও যায় না। তিনি কত সময়ে, কত বলিয়াছেন, পোড়া ছেলের মুখে সেই এক কথা—গরীবের ছেলের ঘোড়া-রোগ সাজে না মা! এখন বলিতে-নাই একটি কাজ হইয়াছে, পঞ্চাশ টাকা মাহিনা হইয়াছে, এখন বুঝি ছেলের মন সখের দিকে একটু ঝুঁকিয়াছে, ভাবিয়া সন্তানের জননীর চিত্তে সন্তোষ জাগিল।

খুব একটা বড় গোছের উচ্চাশা বিমলের মা'র মনে কোন দিন স্থান পায় নই। তাঁহার স্বামীর শেষ বয়সে সত্তরটি টাকা মাহিনা হইয়াছিল, এই সত্তর টাকাতেই তাঁহাদের স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যাইত, ছেলে যদি প্রথমেই পঞ্চাশ টাকা পাইল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া সত্তরের বেশী হইতেও পারে, তখন তাহার দিনও স্বচ্ছলভাবে চলিতে পারিবে, এই চিন্তাই এই বিধবা নারীটিকে পরম পরিতুষ্ট রাখিত। কেবল একটি সাধ, এইবার বিমলের বিবাহটি হইয়া গেলেই তিনি নিশ্চিন্তে মরিতে পারেন।

বিমলের জামাগুলা যেন কেমন! মাহিনার টাকাটা আসিলে তাহাকে গুটি কত ভাল জামা করাইতে বলিবেন, মাতার এইরূপ ইচ্ছা আছে। কত রঙ-বেরঙের, কত সুন্দর সুন্দর জামা পরিয়া কত ছেলে ঐ বিমলের কাছেই আসে, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যায়, তাঁহার ছেলেটির না আছে সখ, না আছে পছন্দ! এবার তিনি কোন কথা শুনিবেন না। মোড়ের মাথার খলিলকে ডাকাইয়া জামা করিতে নিশ্চয়ই দিবেন। যে বয়সের যা, তা না করিলে কি ভাল দেখায়? আর ভগবান যখন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন তখন না করিবেই বা কেন?

এই যে আজ থিয়েটারটি দেখিতে গেল, মার মনে যে কত আনন্দ হইয়াছে, মা'ই তাহা জানেন! ভগবান যেন বিমলের এই সুবুদ্ধিটি বজায় রাখেন, আর যেন সে সৃষ্টি-ছাড়া ছন্নছাড়া বাউণ্ডেলের মত ঘুরিয়া না বেড়ায়! হাসিবে, খেলিবে, সাজিবে, গুজিবে, রঙ-তামাসা দেখিয়া বেড়াইবে, তবে না যোয়ান ছেলেকে মানাইবে! ভাবিয়া ভাবিয়া বাছা যেন দিনের দিন বুড়া হইয়া পড়িতেছে। আহা, আজিকার এই সুবুদ্ধিটি যেন তাহার বজায় থাকে!

কিন্তু হঠাৎ রঙ-তামাসায় কে বাছার মন ফিরাইল? হেরম্ব ঠাকুরপোদের সঙ্গেই যাইবে বোধহয়! বোধ হয় ইন্দুই বিমলের বন্য মহিষের গোঁ ছাড়াইতে পারিয়াছে। মেয়েটি বড় লক্ষ্মী! মেয়ে ত নয়' যেন ভগবতী! কিন্তু তাহার কথা আজকাল বিমলের মুখে শোনা যায় না। কাকাবাবুর, কাকিমার কথাও সে বলে না। হয়ত তাঁহাদের বাড়ী যায় না। তবে বোধ হয় আজ জজ সাহেবদের সঙ্গে যাইতেছে। জজ সাহেবের বাঙ্গালী মেম্ বিমলকে খুব ভালবাসেন, হয়ত তিনিই ডাকিয়াছেন, তাই যাইতেছে। যে মেয়েটিকে পড়ায়, সেই হয়ত মাষ্টার মশাইকে ধরিয়া পড়িয়াছে। আহা মেয়েটা বড় দুঃখী! স্বামী যাহার অমন, তাহার দুঃখের কি অন্ত আছে? মেয়েটা যদি পাস করে, বিমলের একটি ভাল চাকরী হইবে। কিন্তু মেয়েটা যে পড়ে না, পাস্ কি অমনি অমনি হয়? আর সেই ছেলেগুলাই বা কেবল গল্প করিতে আসে কেন? মেয়ের মা এটা বন্ধ করিতে পারে না? মেয়ের বিয়ে হইয়াছে, তাহার স্বামী বিলাতে, মেয়েকে চোখে চোখে রাখাই ত তাঁহার উচিত। মা যদি ইহাও না পারেন, তবে কিসের মা? সে যাই হোক্, আমার বাছা যেন তাহাদের সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে।

মা যখন নিজের মনে ভাঙ্গা-গড়া করিতেছিলেন, বিমল তখন জজ সাহেবের বাড়ীতে ছায়ার পাঠকক্ষে বসিয়া ছায়ার গানের খাতার পাতা উল্টাইতেছিল। "অদৃষ্টের পরিহাস" নাটকের অভিনয়ে একখানি গান তাহাকে গাহিতে হইবে। ব্যবস্থা হইয়াছে, গান খানি সে অন্তরাল হইতে গাহিবে। আজ সারা দিন সে গানখানি অভ্যাস করিয়াছে। বিমল আসিবামাত্র গানখানি তাহাকে শুনাইয়া দিল।

শুনিতে ভাল লাগিলে যদি গান ভাল হয়, তাহা হইলে ছায়ার গান ভাল হইয়াছে, বিমল এই কথাই বলিয়াছে। সে সুর বোঝে না, তান লয়ের সহিত তাহার পরিচয় নাই, কাণে তাহার মিষ্ট লাগিয়াছে এই কথাটা মাত্র সে বলিতে পারিল।

ছায়া ও মিসেস্ ঘোষ সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া বিমলকে লইয়া যাত্রা করিলেন; জজ সাহেব কোন্ ক্লাবে চা খাইতে গিয়াছেন, সেখান হইতে সোজা যাইবেন এইরূপ স্থির আছে।

প্রণয়কুমার মহাসম্মদরে অভ্যর্থনা করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডপটি, বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত নরনারী সমাকীর্ণ, অগণিত বিদ্যুতালোকে প্রোজ্জ্বল, লতাপাতা পুষ্পমাল্যে সুশোভিত। মণ্ডপের এক কোণে, বৃত্তাকারে বসিয়া একদল যন্ত্রী তারের যন্ত্রে মৃদু আলাপ করিতেছে; ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাজিয়া গুজিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেহ রৌপ্যপাত্র হাতে লইয়া অভ্যাগতদের পুষ্পস্তবক দিতেছে, কেহ পান, কেহ সিগারেট বিতরণ করিতেছে। অভিনয়-মঞ্চে যবনিকা

পড়িয়া রহিয়াছে, পাদপ্রদীপ জ্বলিয়া যবনিকার ছবিখানি জ্বল-জ্বলায়মান।

প্রণয়কুমার ও মিসেস্ ঘোষ এবং বিমল ও ছায়া যখন কথা কহিতে কহিতে মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে অন্যদিকের ঝালরের পর্দা সরাইয়া আবুদি, ইন্দু ও ইন্দুর মা'ও মণ্ডপে আসিলেন।

আবুদি একটি ছোট ছেলের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর সেজকাকা কোথায় রে?

ঐ যে—বলিয়া ছেলেটি প্রণয়কে দেখাইয়া দিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেদিকে চাহিতে দেখা গেল, প্রণয় মিসেস্ ঘোষের সহিত কথা বলিতেছে। আবুদি বালিকাটিকে বলিলেন, ওদিকে গিয়ে সেজকাকাকে একবার পাঠিয়ে দে ত!

দিচ্ছি জ্যেঠাইমা, বলিয়া বালক ভিড় ঠেলিয়া প্রণয়কে ধৃত করিল। আবুদি হাত নাড়িয়া প্রণয়কে ডাকিলেন। বিমল মুখ তুলিয়া সেদিকে চাহিল, আবুদির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুও এদিকে চাহিল। বিদ্যুতালোক যেন সহস্রগুণ তেজবৃদ্ধি করিল। ওপারে ইন্দু, এপারে বিমল—উভয়ে উভয়কে দেখিল।

আবুদির সহিত কথা কহিতে কহিতে ইন্দুর মা একটু সরিয়া যাইবা মাত্র ইন্দু বেঞ্চের সারির সরু পথ ধরিয়া এদিকে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ছায়া বিমলের হাত ধরিয়া বলিতেছিল, আপনিও ভেতরে আসুন না, মিঃ রায়! আপনি, মা দু'জন কাছে থাকলে আমার নার্ভাসনেস্ কেটে যেতে পারে।

চলুন, বলিয়া মুখ তুলিতেই বিমল দেখিল, সম্মুখে ইন্দু।

বিমল আনন্দে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কোথা হইতে প্রণয় আসিয়া ইন্দুর সামনে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি ইন্দু। চল, বসবে চল।

তারপর ছায়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি যাও ছায়া, প্রথম দৃশ্যেই তোমার গান, তুমি না গেলে ওরা ড্রপ তুলতে পারছে না।

আসুন মিঃ রায়—পাইলট-ইঞ্জিন যেমন অবলীলাক্রমে ওয়াগন টানিয়া লইয়া যায়, লরী যেমন স্বচ্ছন্দে ট্রেলারখানাকে টানিয়া লইয়া যায়, ছায়া সেইভাবে বিমলকে টানিয়া লইয়া গেল।

—চল ইন্দু, আমরা বসিগে।

ইন্দুর দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল: অতিকষ্টে কহিল, চলুন।

ছায়ার দেহসংলগ্ন বিমল তখনও দৃষ্টিবহির্ভূত হয় নাই। বিমলের না আসিবার, খবর না দিবার জাজ্জ্বল্যমান হেতু ইন্দুর চোখে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে দৃশ্য চোখে আগুন জ্বালে, অন্তরে তাহাই আবার বর্ষা আনে কেন?

প্রণয় ডাকিলেন, এস ইন্দু।

—চলুন।

ইন্দু সিল্কের ক্ষুদ্র রুমাল দিয়া চোখ দু'টি, কপোল দু'খানি মার্জ্জনা করিয়া লইল। (ক্রমশঃ)

আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি

সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বরোগহর, জীবের অশেষ কল্যাণকর, জীবের জীবন। বুঝি, এই জন্যই প্রাচীন হিন্দুর সন্ধ্যা-বন্দনাদি সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া রচিত, কল্পিত! 'জবাকুসুমসঙ্কাশং মহাদ্যুতিং,—এই মহাদ্যুতির যে বর্ণ, জবাকুসুমের মত—তাহা বিশ্লেষণ করিলে ultra-violet ray বা পিঙ্গলোত্তর রশ্মি পাই।

* * *

মৎস্য সূক্তে দেখিতে পাই,—সুরথ রাজার ভ্রাতা ধবল রোগে আক্রান্ত ছিলেন—তাঁর এ রোগ সারে সূর্য্যরশ্মিধারায় নিত্য নিয়মিত স্নানে। *

সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিলে সপ্তবর্ণ আমরা লক্ষ্য করি। বেগুনে বা পিঙ্গল, পীত, নীল, সবুজ, কমলা ও লাল, এই কয়টি বর্ণের মধ্যে বেগুনের বা violet রশ্মিরই রোগ অপনোদনের শক্তি অসাধারণ।

* *

ইহার সাহায্যে বিবিধ মূল্যবান মণিমুক্তা বাছিয়া লওয়া যায়। কারণ বিশিষ্ট মূল্যবান ধাতুপ্রস্তর হইতে বিবিধ বর্ণ বিচ্ছুরিত হয়—রেশম ও তুলা একত্রে মিশিয়া গেলে—সে দুই বস্তুকে পৃথক করা চলে এই রশ্মির সাহায্যে। হাতের লেখা খাঁটি কি জাল—তাহারো নির্ণয় চলে এই রশ্মির সাহায্যে, পরীক্ষায়।

* * *

এই ultra-violet ray বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রখর জ্যোতিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক আলোক ভিন্ন অপর কিছু নহে। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নিউটন প্রথম এই রশ্মি বিশ্লেষণের দ্বারা আবিষ্কার করেন। এই রশ্মির বিশিষ্ট গুণ এই যে, দ্রব্য বিশেষের দ্বারা প্রতিফলিত হইলে ইহার শক্তি বা তেজ বহুগুণ বাড়িয়া যায়। বরফে প্রতিফলিত নীল রশ্মির কিরণ বহুগুণ বিচ্ছুরিত হয়। সাধারণ কাচে—এ রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় না। যে কাচে চশমা তৈয়ারী হয়—তাহার মধ্য দিয়া এ রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। তবে চশমার কাচ বেশী পুরাণো হইলে তদ্বারা কাজ হয় না। কাজেই এ রশ্মি সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে পারদবাষ্প হইতে রশ্মি-যন্ত্র তৈয়ার হইয়েছে।

* *

দেহের ও রক্তের উপর এই রশ্মির শক্তি অসাধারণ। এই রশ্মি রক্তহীনতা রোগে বা এনিমিয়ায়—রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা রক্তে সঞ্চালিত হইয়া রক্তকণিকার মাত্রার পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে।

* *

স্ত্রীরোগে এই রশ্মি বিশেষ উপকারী। ডায়াবিটিসে এই রশ্মি চলে না—যক্ষ্মবিকারে চলে না—গেঁটেবাতে উপকারী। *

চিকিৎসকগণ আশা করেন, একদিন এই রশ্মিই সকল রোগ আরোগ্য করিবে। (ধন্বন্তরী)

চোখের তারা

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি।

কিন্তু তার পূর্ব্বে পাঠক-পাঠিকাকে দু'চারিটা কথা বলিয়া রাখিতে চাই। যথা:

১। এখনকার মত অলিতে-গলিতে এত বেশী চা ও ঠাণ্ডা শরবতের দোকান তখন ছিল না।

২। যে কয়টি দোকান ছিল, সেগুলির মধ্যে সিমলা ষ্ট্রীটে নিধিরাজ চক্রবর্ত্তীর দোকান বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

৩। নিধিরাজের দোকান ছিল খোলার ঘরে। সে ঘরে বিজলী-বাতি ছিল না; চেয়ার ছিল না। ছিল কয়খানা বেঞ্চ। চা-ও-শরবৎ-পিয়াসী বহু লোক সে-দোকানে আসিয়া চা ও শরবৎ পান করিত—করিয়া দাম দিত। নিধিরাজ ধারে কারবার করিত না।

৪। বাঙলা কবিতায় তখন সবে মাত্র রক্ত-মাংস জাগিয়া তাকে সজীব করিয়া তুলিতেছে।

৫। কলিকাতার দক্ষিণে তখন লেক বা লেক রোডের কল্পনা কলিকাতা-বাসীর ছিল সম্পূর্ণ অবিদিত।

৬। কলিকাতায় তখন মাদ্রাজী স্যাণ্ডালের আমদানী হয় নাই।

৭। এবং আনুষঙ্গিক বহু ব্যাপারে কলিকাতা তখন অনেকখানি পিছাইয়া ছিল।

নিধিরাজের দোকানে নিত্য বহু লোক আসিত, চা ও শরবৎ পান করিতে। তাদের পরিচয় এতকাল পরে সংগ্রহ-করা কঠিন। তবে একজন আসিত, তাকে আমরা জানি। সে ছিল বয়সে তরুণ; তার নাম আদীশ্বর। আমরা সেই আদীশ্বরের কথা বলিতেছি।

হাঁ, আপনারা যাহা ভাবিয়াছেন, ঠিক! কবি আদীশ্বরই। যিনি একখানি মাত্র কবিতার বই ছাপাইয়া বাঙলার কাব্য-জগতে রাজার আসন পাতিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এ আসন পাইলেও সশরীরে তাহাতে বসিবার সৌভাগ্য তাঁর ঘটে নাই! কি করিয়া বাঙালী তাঁর প্রতিভায় পরিচয় পাইল, সে কথা বলিব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—এখন তাঁর সাধনার কথা বলি।

আদীশ্বর থাকিত এক আত্মীয়ের বাড়ীতে; কলেজে পড়িত। দু'একটা টুইশনি ছিল; এবং সে কবিতা লিখিত। প্রত্যহ সে আসিত নিধিরাজের দোকানে; শীতকালে খাইত চা; শীতান্তে এক-ভাঁড় শরবৎ! দাম নগদ দিত।

দোকানের বেঞ্চে বসিয়া কত কবিতা সে লিখিয়াছে—তার আর সংখ্যা নাই।

নিত্যকার মত সেদিনও বসিয়া সে কবিতা লিখিতেছিল। রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে। নিধিরাজ দোকানের সামনে পথে একটা টুল পাতিয়া বসিয়া কার সঙ্গে গল্প করিতেছিল, সহসা ডাকিল,—তোর হলো রে তারা?

—যাই বাবা। বলিয়া দোকানের ওদিকে অন্দর হইতে তারা সাড়া দিল এবং অচিরে কলিকা-হাতে বাপের কাছে আসিল।

আদীশ্বর তখন কবিতার মিল লইয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে। তারাকে দেখিয়া সে তার পানে চাহিল।

বাপের হুঁকায় কলিকা চাপাইয়া তারা ফিরিতেছিল, আদীশ্বর ডাকিল,—শুনছ তারা?

তারা দাঁড়াইল।

তারার বয়স তখন তেরো বৎসর। সে পাড়ার স্কুলে পড়িতে যায়; খরিদদারদের জন্য পান-তামাকও প্রয়োজন-মত সাজিয়া দেয়।

আদীশ্বর কহিল—একটা মিল বলতে পার? এ লাইনটা কিছুতে মেলাতে পারছি না···

আদীশ্বর কবিতা-লেখা কাগজখানা আম-কাঠের ময়লা সরু টেবিলের উপর বিছাইয়া ধরিল, ধরিয়া পড়িল,—

তোমারে মোর দেখিতে আশা শুধু:
দেখিলে প্রাণ জুড়ায় কত, ওগো!
যেটুকু সময় জুড়েতে করি বাস···

এই অবধি পড়িয়া তারার পানে চাহিয়া কহিল—এই ওগোর সঙ্গে মিল হয়…এমন একটা কথা বল তো। মোদ্দা মানে হওয়া চাই। না হলে—'ভোগো'-কথা ছিল!

তারা কুতূহলী দৃষ্টিতে আদীশ্বরের পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল; পরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

আদীশ্বর বলিল—'ওগো' কথাটা বাদ দিলে মিল পাওয়া সহজ হয়। কিন্তু আমি 'ওগো' কথাটি রাখতে চাই। ওতে আমার মানসীকে একেবারে নাগালের মধ্যে পাই কি না…

আদীশ্বর তারার পানে চাহিয়া রহিল—একাগ্র দৃষ্টিতে। বুঝি, সে 'ওগো'র মিল খুঁজিতেছিল…

মিল মিলিল না…তার পরিবর্ত্তে যা মিলিল…

আদীশ্বর দেখিল, অন্ধকারে কোথায় কাহার উদ্দেশে গান বাঁধিয়া কাহাকে খুঁজিতেছে…সামনে রহিয়াছে তারা। পরণে আধ-ময়লা ডুরে-শাড়ী, মাথার খোঁপা যেন তালের জুটী! তা হোক…এই তারা…

সেদিন হইতে কবিতা যেন তাকে পাইয়া বসিল। সে এই তারার উদ্দেশে কল্পনার রথ ছুটাইয়া দিল। যে কথা যখন মনে জাগে, তাহাই লেখে। ভাবের কোথাও বাঁধন নাই—নিষেধ নাই। সে একেবারে মুক্ত মনের অকপট অবাধ প্রকাশ!

তিন মাসে অনেক কবিতা লিখিয়া ফেলিল এবং টুইশনি করিয়া যা কিছু সঞ্চয় রাখিছিল, ইউনিভার্সিটির ফী জমা দিবার উদ্দেশ্যে—ছাপাখানায় ধরিয়া দিয়া কবিতার বই ছাপাইল; বইয়ের নাম—'চোখের তারা।'

বই ছাপাইয়া কিন্তু ভারী ব্যথা পাইল। একখানিও বিক্রয় হইল না। কবিতার রস উপভোগ করিবার মত বাঙালীর মন তখনকার দিনে পাকে নাই। কাজেই নৈরাশ্যে জ্বলিয়া এবং ছাপাখানার বিলের তাগাদায় বিরক্ত হইয়া সহসা একদিন সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, তার আর কোনো পাত্তা রহিল না।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর বিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখনকার স্বর্ণযুগের কথা বলিতেছি…যে-যুগ বাঙলা কবিতার আদর করিতে শিখিয়াছে—প্রেমের কদর বুঝিয়াছে।

বেলা প্রায় পাঁচটা। "যুগবার্ত্তা" দৈনিকের সম্পাদক মকরাক্ষ দত্ত কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাথে হকারদের কুড়াইয়া-জড়ো-করা গলিত-জীর্ণ পুরানো বহির গাদা ঘাঁটিতে ছিলেন। সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সাধিতে বা সারিতে দু'কলম করিয়া লেখা তাঁকে নিত্য দিতে হয়। লেখা চাই। অথচ কি লিখিবেন? সমস্যা ক্রমে ঘনায়িত হইতেছে। না লিখিলে চাকরি রাখা দায়! কাজেই এই সব জায়গায় তিনি নিত্য ভাব সংগ্রহ করিয়া বেড়ান। আজ জীর্ণ কেতাবের গাদায় তিনি পাইলেন এক কাপি "চোখের তারা"। দু'চারি পাতা উল্টাইয়া মলাটে কবির নাম দেখিলেন, "শ্রীআদীশ্বর হালদার!"

এ নাম? কৈ, শোনেন নাই তো। পাঁচ মাস "যুগবার্ত্তা" সম্পাদনা করিতেছেন, হাজার হাজার কবিতা নিত্য আসিতেছে—কত অজানা কবির সঙ্গেই না পরিচয় হইল! কিন্তু শ্রীআদীশ্বর হালদারের লেখা কোনো কবিতা কখনো পান নাই। অথচ 'চোখের তারা'র কবিতা…

অপূর্ব্ব! ভাবগুলা রক্তে-মাংসে গড়া জীবন্ত। বইয়ের ছাপা ছত্রগুলা যেন মনের পচা যত সংস্কারের গোড়ায় সবলে কোদাল মারিতেছে! এই তো প্রথম কবিতা…

> প্রাচীরেরি অন্তরালে রাখবে তোমায় মা ও বাবা?
> মানবো না তা! আনবো তোমায় প্রাচীর ফুঁড়ে বাড়িয়ে থাবা।
> মানুষ মোরা, কানুষ নহি। এমন করে রাখবে তাকে?
> মানুষ এবার জ্বলবে। জ্বলে জাগিয়ে দেব মানুষটাকে!

ইস্, যেন অগ্নিচক্র! আজকাল এমন কবিতা অনেকে লিখিতেছে বটে। সে লেখা সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ বই ছাপা হইয়াছে…১৩২০ সালে! তখনকার দিনে এমন কবিতা লেখায় যে সাহস, যে অকুতোভয়তা, লাজ-মান-ভয়ে যে ঔদাস্য…

কবি আদীশ্বরের কাব্য-পরিচয় বাঙালীকে দেওয়া চাই। মকরাক্ষ এক কাপি 'চোখের তারা' কিনিলেন—তিন পয়সা মূল্যে; এবং পরের দিন "যুগবার্ত্তা"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে বাঙালী জাতিকে বহু কটূকাটব্য করিয়া তিনি লিখিলেন,—

> তোমরা চাহ স্বরাজ? কবির আদর করিতে জানো না—তাঁর নাম জান না! ধিক তোমাদের

এই যে কবি আদীশ্বর দীর্ঘকাল পূর্ব্বে প্রাণের গান গাহিয়া গিয়াছেন—এই যে অক্ষয় মন্ত্র তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে···ইত্যাদি, ইত্যাদি

'যুগবার্ত্তা'য় এ লেখা ছাপা হইবামাত্র সহরে হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। শাঁখারিটোলা সবুজ সভা, ঝামাপুকুর প্রগতি সঙ্ঘ, নিকারীপাড়া পদ্মা-ফাঁশিনী বাসর প্রভৃতিতে কবি আদীশ্বরের জয় গাহিয়া বহু অধিবেশন হইয়া গেল। তালতলা বক্কেশ্বর সভায় "হরবোলা"-মাসিকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অশ্বত্থামা রায় সভাপতির তক্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলেন,—

আপনারা আজ যে কবিকে সম্মানিত করছেন, আজ সগৌরবে জানাচ্ছি, তিনি ছিলেন আমার যৌবনের সাথী! তাঁর মন ছিল অগ্নির কুণ্ড! তিনি সেই বিশ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চাশ বৎসরকার পরের বাঙালার স্বপ্ন দেখতেন! সংস্কারবদ্ধ, সংশয়াতুর হীন বাঙালীর পরিবর্ত্তে তাঁর মনে বিরাজ করতো পঞ্চাশ বৎসর পরের এই সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত আদিম যুগের সর্ব্বভয়-লজ্জা-হারা বাঙালী নর-নারী। তাই তাঁর মত্ত চিত্ত হতে দেখি সহস্র ধারে বয়ে চলেছে শুধু মুক্তি · মুক্তি...মুক্তি!

এমনি বিবিধ আলোচনার ফলে কোথা হইতে একদিন একটা সত্য প্রচারিত হইয়া পড়িল—যে, কবি আদীশ্বর সিমলা ষ্ট্রীটের নিধিরাজ চক্রবর্ত্তীর দোকানে নিত্য আসিয়া চা ও শরবৎ পান করিতেন।

সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাত্মক প্রবন্ধের নীচে ফুটনোটের মত এ সংবাদটুকুও ছাপার অক্ষরে রটিয়া গেল—

নির্ভীক সংস্কারমুক্ত-চিত্ত কবি আদীশ্বরের কবিতার উৎস ছিলেন শ্রীমতী তারা—রূপসী কিশোরী। তারা সে যুগে প্রণয়ের মাহাত্ম্য জানিত না, বুঝিত না; তার উপেক্ষা কবির প্রাণে তীরের মত বিঁধিয়াছিল। সে যাতনা সহিতে না পারিয়া প্রেমহীন বাঙালীকে ধিক্কার দিয়া কবি আদীশ্বর হাওড়ার পুল হইতে নদীর বুকে ঝাঁপ খাইয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া বাঙালী জাতিকে চুর-পনেয় কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

নিধিরাজের দোকান আজ আর সে দোকান নাই। নিধিরাজ নাই,—তার জায়গায় দোকানের মালিক নিধিরাজের জামাই আপাল ঘোষাল।

মাথায় খোলার ছাউনি থাকিলেও দোকান এ বিশ বৎসরে মাথা উঁচু করিয়াছে; অর্থাৎ তার চাল বড় হইয়াছে। দোকান-ঘরে বিজলী-বাতি আসিয়াছে এবং বেঞ্চের পরিবর্ত্তে টিনের কতকগুলা চেয়ার সেখানে স্থান পাইয়াছে।

প্রগতির যুগে দোকানের পশার কমিয়াছে। শুধু পুরানো কজন খরিদদার এখনো শরবতের স্বাদে টিকিয়া আছে। নিধিরাজের শরবতের ফর্ম্মুলা ভালো। তবু কয়জন মাত্র খরিদ্দারের উপর নির্ভর করিয়া সংসার তো চালানো যায় না; তাই আপালকে দিনে একটা ছাপাখানায় কম্পোজিটরি করিতে হয়।

তারা এখন আপালের স্ত্রী। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ত্রয়োদশী কিশোরীর দেহ ছিল ক্ষীণ, এখন প্রগতির যুগে সে দেহে অনেকখানি মাংস জমিয়াছে।

তারার তাহাতে কোনো অনিষ্ট হয় নাই। স্বামী আপাল ঠিক তাহারই আছে।

সেদিন রবিবার। বেলা প্রায় আটটা। দু' চারিজন খরিদদার বসিয়া চা পান করিতেছে; আপাল গিয়াছে বাজারে; এমন সময় একজন কিশোরী আসিয়া দোকানের সামনে দাঁড়াইল। পরণে টকটকে লালপাড় খদ্দরের শাড়ী, পায়ে মাদ্রাজী স্যাণ্ডাল।

কিশোরী প্রশ্ন করিল—এটা কি নিধিরাজ চক্রবর্ত্তীর শরবতের দোকান?

খরিদদারদের মধ্যে একজন ছিল প্রাচীন। সে কহিল,—হাঁ।

কিশোরী কহিল—নিধিরাজ বাড়ী আছে?

প্রাচীন কহিল—না। সে মারা গেছে। তার জামাই এখন দোকান দেখে।

জামাই! কিশোরী কহিল,—নিধিরাজের কটি মেয়ে?

প্রাচীন। একটি।

কিশোরী। তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?

প্রাচীন। ভিতরে যান।

কিশোরী অন্দরে গেল, কহিল—কে আছেন?

অন্দরে ছোট উঠান। ছেলেমেয়েরা দাওয়ায় বসিয়া গুড় মাখাইয়া বাসি রুটি খাইতেছে; তারা কলতলায় চায়ের পেয়ালা ধুইতেছে।

তারা কহিল—কে গা?

সে উঠিয়া আসিল। কিশোরী কহিল—নিধিরাজ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে আপনি?

তারা কহিল,—হাঁা।

তার চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়!

কিশোরী কহিল—আপনি এক মেয়ে? না, আপনার আরো বোন আছে?

তারা কহিল, -না বোন-টোন নেই।

বটে! কিশোরী তারার পানে চাহিয়া রহিল। তার দৃষ্টিতে সম্ভ্রম।

তারা কহিল—কি চাই? চা? না, শরবৎ?

কিশোরী কহিল—চা-শরবৎ কিছু চাই না।

—তবে?

—আপনাকে দেখতে এসেছি।

তারার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

কিশোরী কহিল—কবি আদীশ্বর···

কিশোরী চক্ষু মুদিয়া কাহাকে প্রণতি জানাইল; পরে আবার কহিল—আমি তাঁকে পূজা করি। তিনি মুক্তি-মন্ত্রের পুরোহিত। শুনেছি, আপনাদের এই দোকানে বসেই তিনি কবিতা লিখতেন।

তারা অবাক! কিশোরী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—আপনাকে ভালবেসে তিনি আপনার সাধনায় নিজের প্রাণকে ধূপের মত জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে গেছেন—তাই আপনাকে দেখতে এসেছি।

কিশোরী আবার নিঃশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—এ দোকান আজ আমাদের তীর্থ!

বিস্ময়ে তারা কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। তার মুখে কথা সরিল না। কিশোরী কহিল,—আপনারই নাম তারা?

তারা কথা কহিল, বলিল—হাঁা।

কিশোরী কহিল—আদীশ্বর বাবুকে আপনি খুব জানতেন, নিশ্চয়? এখানে তিনি চা খেতেন আর কবিতা লিখতেন।

তারা কহিল—আদীশ্বর! না। এখানে ও-নামের কোনো লোক থাকে না তো! এ বাড়ীতে কোনো ঘরে ভাড়াটে নেই।

কিশোরী বলিল—তা জানি। তিনি মারা গেছেন আজ বিশ বৎসর। বিশ বৎসর আগকার কথা আমি বলছি। তখন আসতেন।

ও! তারার মনে পড়িল,—আদীশ্বর?···ঠিক! সেই যে মাথায় রুক্ষ কেশ, পাগলাটে চেহারা! হাঁা হাঁা, পদ্য লিখিত! তারা কহিল—বাবার খদ্দের ছিল। তা—কি হয়েছে? মারা গেছে বলছ! আমাকে টাকা-কড়ি কিছু দিয়ে গেছে?

কিশোরী নিঃশ্বাস ফেলিল। হায় মূঢ় নারী! সেকালে জন্মিয়াছ বলিয়া শুধু পয়সাই চিনিয়াছ! অমন মুক্তির কবিতা! তার দাম জান না?

কিশোরী কহিল,—তা নয়। আমি এসেছিলুম এ-সব দেখতে। এ আমাদের তীর্থ! কবিতীর্থ!

কিশোরী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তার চোখের দৃষ্টি সম্ভ্রমে ভরা। তারা হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তারার সঙ্গে আপালের কথা হইতেছিল।

আপাল কহিল—কে গা এই আদীশ্বর বাবু? আমাদের ছাপাখানায় তাঁর বই 'চোখের তারা' ছাপা হচ্ছে। দ্বিতীয় সংস্করণ। বলছে···

তারা কহিল—হাঁা। সেদিন এক পাশ-করা মেয়ে এসে বলছিল বটে ঐ কথা।

আপাল কহিল,—আমাদের ছাপাখানার পটলা, কাশী সকলে বলছিল—তোর পরিবারে সঙ্গে ছিল তার ভালবাসা। ও বই তোর নামে লেখা। সত্যি?

সগর্ব্বে তারা কহিল,—সত্যি বই কি! লোকে যখন বলছে···

আপাল স্থির দৃষ্টিতে তারার পানে চাহিয়া রহিল। তারা হাসিল; হাসিয়া কহিল,—হাঁ ক'রে কি দেখছ?

আপাল নিঃশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—এ ভাল-বাসার মানে কি জানিস?

তারা কহিল—কি আবার মানে?

আপাল কহিল—আমি তো বুঝি। ছাপাখানায় এই সব ভালবাসার বই আমার হাত দিয়ে কত ছাপা হচ্ছে···

আপালের দুই চোখ মলিন হইয়া আসিল।

হাসিয়া তারা কহিল—হিংসে হচ্ছে? কিন্তু সে তো মরে গেছে।

আপাল কহিল—তুই তাকে ভালবাসতিস্?

তারা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল,—মরণ! তখন আমার কি বয়স!

আপালের বুকের উপর হইতে যেন ভারী পাথর সরিয়া গেল। ছাপাখানার এ্যাপ্রেন্‌টিশ কম্পোজিটর বন্ধু আবার কবিতা লেখে। কি একখানা সাপ্তাহিক কাগজে তার লেখা কবিতা ছাপা হয়। সে হালের ছোকরা। সে আপালকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিল,—খবর নিয়ো আপালদা······বৌদি আদিকবিকে ভালবেসেছিল কি না···

কথাটা শুনিয়া অবধি সে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল ···এখন তারার কথায় আস্বস্তি কাটিল। আপাল কহিল,—বাঁচলুম।

তারা বলিল,—যদি বেসেই থাকি, তোমার ভাবনা কিসের? সে তো বেঁচে নেই

আপাল ভাবিল, তা বটে!

অবশেষে ব্যাপার যা দাঁড়াইল···

অর্থাৎ দোকানের পশার বাড়িল; বিশেষ করিয়া ছোকরা-মহলে। তাদের কথায় আপাল দোকানের সামনে কাঠের ফলক ঝুলাইয়া দিল। তাহাতে দোকানের নাম,—

প্রগতি-নিবাস

এবং খরিদদারদের কথায় চপ্-কাটলেট আমদানি হইল। ছেলেরা নাম দিল, 'প্রগতি চপ,' 'আদীশ্বর কাটলেট'।

প্রগতির অগ্রদুত আদীশ্বরের ভক্ত কিশোর-কিশোরী জুটিয়া গিয়াছিল অনেক। কলিকাতা সহর! একটা কোনো হুজুগ বাধিলে তার প্রসার কি ভাবে বাড়িয়া চলে, সে কথা কাহারো অবিদিত নয়। আপালেরও অবিদিত ছিল না।

এবং একদিন আপাল আসিয়া তারাকে বলিল,—একটা কাজ করতে হবে।

গোবর ও কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া তারা গুল পাকাইতে-ছিল। আপালের কথায় মুখ তুলিয়া তার পানে চাহিল; কহিল,—কি কাজ?

আপাল কহিল—ঐ গৌরী বাবু বলেছিল, তোর সঙ্গে দেখা করে আদীশ্বরের কি সব কথা জানবে।

তারা কহিল—আমি তার কি কথা জানি! আসতো—চা খেতো—শরবং খেতো—দাম দিত, মাঝে মাঝে পদ্য লিখতো—আমাকে থেকে থেকে মিল জিজ্ঞাসা করতো। আর সে কি আজকের কথা গা!

আপাল কি ভাবিল। সে ছাপাখানায় কাজ করে এবং এ ছাপাখানা 'বার্ত্তাবহ' ছাপে না যে, নীলামী-ইস্তাহার ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো খবর আপাল জানিবে না! তার প্রেসে একালের মাসিক কাগজ ছাপা হয়; কবিতা, গল্প, উপন্যাস বাহির হয়। সে-সকল সেই কম্পোজ করে; সুতরাং সাহিত্যে, কাব্যে আপালের বেশ অধিকার আছে। এই সব সাহিত্যের সে পূরাদস্তর সমালোচনাও করে।

চমকিয়া সে কহিল,—ঐ যে কথা রটেছে—আদীশ্বর তোকে ভালবেসেছিল, আর তুই তার পানে তাকাতিস না,—তার জন্য বেচারী হাবড়ার পোল থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ খেয়ে মরেছে—এ কথাটা তুই মেনে নিস্। খদ্দেররা যদি তাতে খুশী থাকে—বুঝলি?

তারা কহিল—আমি তা পারব না। কি বলতে কি বলবো? আমি কি তেমন লেখাপড়া শিখেছি!

আপাল কহিল—ওরা আয়োজন করবে শুনছি, এখানে কবির মরবার তারিখে অনেক লোক এসে তোকে ফুলটুল দেবে।

তারার গায়ে কাঁটা দিল! সে কহিল,—ও মা! আমাকে অত লোকের সামনে বেরুতে হবে না কি? সে আমি পারব না—আমাকে কেটে ফেললেও নয়!···আমি গেরস্ত-ঘরের বৌ···

আপাল কহিল—যে কালে যেমন! একালে এই হয়েছে দস্তর! তাতে দু'পয়সা আসবে। লক্ষ্মীটি, কথা শোন্?

তারা চুপ করিয়া রহিল।

দু'পয়সা সত্যই আসিতেছিল। বহু কিশোর-কিশোরী আসিয়া দোকানে বসিয়া শুধু চা আর শরবৎই পান করিত না—তারাকে সহস্র প্রশ্নে বিঁধিয়া কবি আদীশ্বরের প্রেম-কাহিনীর রস নিঃসারিত করিতে কার্পণ্য করিত না।

সেদিন এক তরুণ কবি আসিয়াছিল। কথায় কথায় সে বলিল,—আপনি যদি একটু সু-নয়নে চাইতেন, তাহলে গুরু-দেবকে আমরা অকালে হারাতুম না।

তারা বলিল,—আমার তখন বয়স কম। তাছাড়া একালের মেয়েদের মত লেখাপড়া শিখিনি। অত বড় মানুষের দরদ বুঝবো কি করে বল বাবা ?

এদিকে ব্যাপার যখন এমন জমিয়াছে, পরলোকগত দরদী কবি আদীশ্বর হালদারের স্মৃতিপূজায় কিশোর-কিশোরী মশগুল, তখন কলিকাতা সহর হইতে বহুদূরে দিনাজপুরের প্রান্তে ভগবানচন্দ্র-আদীশ্বরের চালের আড়তে বসিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক মোটা খাতা খুলিয়া হিসাব দেখিতেছিল।

ভদ্রলোক এ আড়তের অংশীদার। নাম আদীশ্বর। আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত কবি আদীশ্বর; যুগান্তকারী কাব্য 'চোখের তারা'র কবি।

কবিতা ছাপাইয়া এককাপি বিক্রয় হয় নাই দেখিয়া গভীর যাতনায় সে বেলিয়াঘাটায় তার ছাত্রের বাসায় গিয়া উপস্থিত হয়। ছাত্রটির বাপ মারা যাওয়ায় সে দেশে যাইতেছিল; আদীশ্বর তার সঙ্গে চলিল। ছাত্রের নাম শিবচন্দ্র—প্রসিদ্ধ চাউল-বিক্রেতা ভগবানচন্দ্র সাহার পুত্র।

পিতৃবিয়োগে শিবচন্দ্র লেখাপড়া ছাড়িয়া কারবারে মন দিল। মাষ্টার মহাশয় আদীশ্বর সঙ্গে রহিল।

ক্রমে ব্যবসায়-সূত্রে আদীশ্বর রহিল দিনাজপুরের আড়তে এবং শিবচন্দ্র আসিল বেলিয়াঘাটায়। ভাগ্যগুণে কারবারে লক্ষ্মী আসিয়া দেখা দিলেন। শিবচন্দ্র লোকটি ভাল। মাষ্টার-আদীশ্বরকে সে চার আনার বখরাদার করিয়া লইল।

আদীশ্বর বিবাহ করিয়াছে। গৃহিণী শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী সুগৃহিণী। কয় বৎসরে সাতটি পুত্রকন্যা প্রসব করিয়া শ্রীযুত আদীশ্বরকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

আদীশ্বর পুরাদস্তুর কারবারী। কবিতার মিলের সন্ধান এই বিশ বৎসরে একদিনও করে নাই। সন্ধান করিয়াছে শুধু নানা দরের চাউলের।

ছেলেমেয়েরা ডাগর হইয়াছে। বড় ছেলে শ্রীপতি ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে; তাহাকে আর পড়ার নাই। সে আড়তে বাহির হইতেছে; বাপের কাছে হাতে-কলমে ব্যবসা শিখিতে।

বড় মেয়ে ভগবতীর বয়স বারো পার হইয়া তেরোয় পড়িতে চলিয়াছে; গৃহিণী তাগিদ দিতেছে—বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায় না। শিবচন্দ্র তার জন্য একটি পাত্রের সন্ধান করিয়াছে; উল্টাডিঙ্গিতে পাত্রের বাপের পাটের গদি আছে। পাত্রটিকে দেখা প্রয়োজন; তাই একদা শুভদিন দেখিয়া আদীশ্বর সপরিবারে আসিয়া দিনাজপুর ষ্টেশনে ট্রেণে চাপিয়া বসিল এবং পার্ব্বতীপুরে ট্রেণ বদল করিয়া মেল্ ধরিয়া নামিল শিয়ালদহ ষ্টেশনে; সেখান হইতে সোজা গেল বেলিয়াঘাটায় শিবচন্দ্রের গৃহে।

৪

পাত্র-পাত্রী দেখাশুনা এবং তদানুষঙ্গিক কাজ চুকিলে গৃহিণী বলিল—ফেরবার আগে এখানকার সব দেখে শুনে যাব।

আদীশ্বর কহিল,—বেশ!

আলিপুরের চিড়িয়াখানা হইতে সুরু করিয়া বালীব্রিজ, বালিগঞ্জ লেক্, চিত্রা, কাট্যমন্দির, রঙমহল—কোনো জায়গা দেখা বাকী রহিল না।

সেদিন শিবচন্দ্রের স্ত্রী বলিল—হেদোয় কে না কি তিনদিন ধরে জলে পড়ে সাঁতার কাটছে, সত্যি? জল থেকে এক দণ্ড ওঠে নি! তাকে একবার দেখতে যাব। নিয়ে যাবে? সত্যি মানুষ? না, সেই চারুপাঠে-পড়া জলহস্তী কি সিন্ধু-ঘোটক? দেখতে ইচ্ছে করে।

আদীশ্বরের আপত্তি নাই। সদলে সকলে আসিল হেদুয়ার ধারে।

লাল শালুর নিশান তুলিয়া পথে তখন একদল কিশোর-কিশোরী চলিয়াছে গান গাহিয়া দু'ধারে সকলের হাতে ছাপানো গানের কাগজ বিলি করিতেছিল। ভগবতী ঝঙ্কার দিয়া আদীশ্বরকে কহিল—একখানা কাগজ নাও না! অমনি দিচ্ছে···হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? আচ্ছা মানুষ ত!

আদীশ্বর অন্যমনস্ক ছিল। ঝঙ্কারে চেতনা হইল। সে কাগজ লইল। পড়িয়া তার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! কাগজে গানের লাইন ছাপা রহিয়াছে—

হে আদীশ্বর হালদার-বর, ঢালিলে মুক্তি-ধারা!
মুক্ত প্রেমের উৎস বহালে ছাপায়ে "চোখের তারা"!
ভাল বেসে নিজে জলে হলে ছাই বক্ষের অনলে হে!
প্রেমের প্রদীপ জেলে দিয়ে গেলে বাঙালী-বঙ্গ-গেহে!

কয় ছত্র পড়িয়া সে গায়ক-দলের পানে চাহিল। ওরা এই কথাই গাহিয়া চলিয়াছে বটে! ঐ যে···"ছাপায়ে 'চোখের তারা!"' আর ঐ নাম—"হে আদীশ্বর হালদার-বর!"···এ তবে···

দীর্ঘ বিশ বৎসরের পর্দ্দা ঠেলিয়া স্মৃতির মঞ্চে আসিয়া দেখা দিল সেই নিধিরাজের দোকান—নিধিরাজ-কন্যা সেই তারা—আর সেই বেঞ্চে বসিয়া হৃতভাগার মূর্ত্তিতে কবি আদীশ্বর!

আদীশ্বরের সারা দেহে চকিতে রোমাঞ্চ...

সে ছুটিল দলের পিছনে; একজনকে ডাকিয়া কহিল—শুনছেন?

লোকটা বড় ব্যস্ত, বিরক্তভাবে কহিল—কি?

আদীশ্বর কহিল—এ আপনাদের কিসের দল বেরিয়েছে? এখনো চড়কের দেরী আছে। আজ সবে ৫ই চোৎ।

লোকটা কহিল—আপনি বাঙালী?

আদীশ্বর কহিল—নিশ্চয়।

—থাকেন কোথায়?

—দিনাজপুরে।

—ও!

লোকটির মমতা হইল। কহিল,—তাই জানেন না! আপনাকে ক্ষমা করলুম।···আমরা পরলোকগত কবিবর আদীশ্বর হালদারের মৃত্যু-বার্ষিকীর আয়োজন করেছি···

আদীশ্বর কহিল—এই রাস্তায়?

—না। যত সবুজ সভা, পর্দ্দা-নাশিনী সমিতি আছে, সব মেম্বররা মিলে প্রোসেসন বার করেছি। যাচ্ছি সিমলা ষ্ট্রীটে।

—সিমলা ষ্ট্রীট্?

আদীশ্বর ছাড়িল না। লোকটিকে খুঁটাইয়া সব সংবাদ গ্রহণ করিল। আদীশ্বর কহিল—এ বই কিনতে পাওয়া যায়?

সে কহিল—থার্ড এডিশন বেরিয়ে গেছে। দাম এক টাকা। এই একখানি বই লিখে কবিবর অমর হয়ে আছেন।

সে আর দাঁড়াইল না। দল ওদিকে গাহিতে গাহিতে মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মধ্যে ঢুকিতেছে। সে গিয়া দলে মিশিল।

আদীশ্বর ক্ষণেক স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কি ভাবিল; পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর গাড়ীর কাছে আসিয়া কহিল,—ওগো···

'ওগো' এক-মনে জনতা ভেদ করিয়া পার্কের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দিয়াছিল। কলিকাতায় আসিলেও দিনাজপুরী পর্দ্দা ফাঁসাইতে পারে নাই। ছোট মেয়ে পুঁটী বলিল,—বাবা ডাকছে মা।

গৃহিণী গাড়ীর ফিরকির মধ্য দিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল,—কি?

আদীশ্বর কহিল, তোমরা সাঁতার ছাখো। দেখে শিবুর সঙ্গে বাড়ী ফিরো। আমার একটু কাজ আছে।

আদীশ্বর চলিয়া গেল···

একেবারে আহিরীটোলায় কন্দর্পচন্দ্র সাহার দোকানে। এই কন্দর্প সাহাই তার 'চোখের তারা' বই প্রথমে ছাপাইয়াছিল।

দোকান মিলিল। কন্দর্পকে পাওয়া গেল না। সে মরিয়া প্রথমে ছাই এখন ভূত হইয়া গিয়াছে। তার পুত্র গোবর্দ্ধন এখন দোকানের মালিক। একরাশ ধারাপাত লইয়া সে গণিয়া থাক্ দিয়া তুলিতেছিল।

আদীশ্বর কহিল—'চোখের তারা' বই আছে?

গোবর্দ্ধন কহিল—আছে। চাই?

আদীশ্বর কহিল—হ্যাঁ।

এক টাকায় একখানা বই কিনিয়া খুলিয়া দেখে, হ্যাঁ, তাহারই কীর্ত্তি বটে! বইয়ের গোড়ার দিকে ভূমিকায় শুধু প্রসিদ্ধ সমালোচক 'অষ্টবজ্র'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরাণচন্দ্র মৌলিক লিখিত "কবি-চরিত" যোগ হইয়াছে।

'কবি-চরিত' পড়িয়া আদীশ্বর জানিল—নিধিরাজের শরবতের দোকানে ছিল কবিপ্রিয়া কিশোরী তারা! তার প্রেমে কবির চিত্ত-সরোবরে প্রেমের মরাল ভাসিল। এবং সেই প্রাচীন-যুগের চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামীর গল্পের হুবহু নকল! শুধু বাসুলীর মন্দিরের স্থলে নিধিরাজের দোকান, এবং রামীর ফুল তোলার জায়গায় তারার চা আর শরবৎ জোগানো! এবং বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙলা দেশের তরুণ হিয়া ছিল মুদ্রিত, কাজেই কবির ঘটিল প্রেম-নৈরাশ্য এবং

নিরুপায় কবি অবশেষে হাওড়ার পুল হইতে গঙ্গার বুকে ঝাঁপ খাইয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি!

চরিত-কথা পড়িয়া আদীশ্বরের সারা শরীর শিহরিয়া উঠিল। আদীশ্বর সত্যই মরিয়াছে? সে তবে আদীশ্বর নয়?

একটু পরে চেতনা জাগিল। মনে পড়িল, নিধিরাজের দোকান···সিমলা ষ্ট্রীট···নিধিরাজের সেই মেয়ে তারা··· মাথায় জবজবে তেল মাখিত···এবং···

আদীশ্বর বসিল না; দাঁড়াইল না; সোজা চলিল সিমলা ষ্ট্রীটে। সে দোকান দেখিল···নব-কলেবরে অপূর্ব্ব শ্রী! আম্র-পল্লবের ঝালর ঝুলাইয়া যে বেশে সাজিয়াছে···

পূজারীর দল চলিয়া গিয়াছিল। আপালকে পাওয়া গেল। আদীশ্বর কহিল—এ সব মিথ্যা কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আমার নাম আদীশ্বর হালদার। জান, আমি মানহানির মামলা করতে পারি? আমার ছেলেমেয়ে আছে, স্ত্রী আছে—এ সব কথা তাদের কানে গেলে আমার পক্ষে লোকালয়ে বাস করা দায় হবে। বাজারে কারবারী বলে আমার সুনাম আছে···

আপাল প্রথমে হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল; তারপর আদীশ্বর যখন খুলিয়া বলিল, 'চোখের তারা' ছেলেবেলায় সে ছাপাইয়াছিল! ও একটা পাগলামি···এবং এ দোকানে নিধিরাজের আমলে সে চা ও শরবৎ পান করিতে আসিলেও তারার প্রেমে সে এমন কাবু হয় নাই যে, সেজন্য হাওড়ার পুল হইতে গঙ্গার জলে জীবনের বোঝা ফেলিয়া দিবে ইত্যাদি—তখন আপালের মুখ একেবারে চূণ হইয়া গেল। সে কহিল—কিন্তু বাবু, আমি তো এ-সব কিছু জানি নে।

আদীশ্বর কহিল—আমি এখানে থাকি না, তাই। তবু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি কলকাতায়। তারা যদি শোনে, ভদ্দর লোকের মেয়েকে রামী ভেবে চণ্ডীদাসের মত ভালবেসে কবিতে লিখেছি, তাহলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারব না। সকলে আমার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে খুলে নেবে। বন্ধ কর এ সব। সকলকে বল, এ-সব কথা মিথ্যা - স্রেফ বানানো!

আপাল কহিল - আজ্ঞে, আমি এ সবের কিছু জানি না মশায়! তাছাড়া আমি সামান্য লোক—ছাপাখানায় কাজ করি। আমার কথার কি-বা দাম! কে শুনবে?

আদীশ্বর বুঝিল; বুঝিয়া গমনোদ্যত হইল; সহসা কি মনে করিয়া ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—তুমি নিধিরাজের জামাই?

—আজ্ঞে।

—তারা তোমার স্ত্রী?

—আজ্ঞে।

—তারা বাড়ীতে আছে?

—আজ্ঞে।

—তার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

—আজ্ঞে।

দেখা হইল।

আদীশ্বর কহিল,—তোমার নাম তারা?

তারা এ কয় মাসে আলাপে বেশ কুশলী হইয়াছে। জবাব দিল,—হ্যাঁ।

—তুমি এই আদীশ্বরকে চিনতে? যে এই পদ্যের বই ছাপিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—সে মরে গেছে···না? হাওড়ার পুল থেকে জলে ঝাঁপ খেয়ে?

—হ্যাঁ।

আদীশ্বর রাগিয়া উঠিল, কহিল—না। সে মরেনি। মিথ্যা কথা। আমার নাম আদীশ্বর। এ সব মিছে কথা যদি ফের শুনি, তাহলে তোমাদের নামে নালিশ করে সকলকে জেলে পাঠাব। সাবধান!···

আদীশ্বরের কাণ, মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। সে গমনোদ্যত হইল।

আপাল বলিল—একটা কথা বলবো?

—কি?

আপাল বলিল—আমাদের উপর মিছে রাগ করছেন। ঐ "যুগবার্ত্তা" কাগজ এ কথা প্রথম রটায়। তাদের নামে একখানা উকিলের চিঠি দিন। নয়তো ঐ কাগজে একখানা মফঃস্বলের পত্র লিখে ছাপিয়ে দিন—সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে; আর কোনো গোল থাকবে না।

আদীশ্বর সে কথার জবাব দিল না। অত্যন্ত শ্রান্তি

বোধ করিতেছিল; ট্রামে চড়িয়া শিয়ালদায় আসিল এবং মোড় হইতে একখানা রিক্স লইয়া একেবারে শিবচন্দ্রের গৃহে।

রাত্রি প্রায় আটটা। গৃহিনী সদলে বহু পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়াছে।

পরের দিন সকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া আদীশ্বর ছুটিল আহিরীটোলার গোবর্দ্ধন সাহার কাছে।

গোবর্দ্ধন তখন বাড়ীর সামনে পথে এক ঘুঁটেওয়ালীর সঙ্গে মহা তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। সাত দিন পূর্ব্বে পাঁচ গণ্ডার জায়গায় আঠারোখানা ঘুঁটে দিয়া ঠকাইয়া গিয়াছে, মাগী আর এ পথ মাড়ায় নাই! এখন তাকে ধরিয়াছে!...

আদীশ্বর বলিল—আমার হুকুম না নিয়ে আমার বই ছাপিয়েছ যে! জানো, বেআইনী কাজ! এর জন্য ফৌজদারী-দাওয়ানী—দু'রকম মকর্দ্দমা করতে পারি তোমার নামে।

গোবর্দ্ধনের মুখ শুকাইল; মুখে কোনো কথা সরিল না।

আদীশ্বর কহিল—বইগুলি মানে-মানে আমার হাতে তুলে দাও। ছাপাতে যা দাম পড়েছে, তা দিতে আমি রাজী আছি। খবর্দ্দার, এ বই আর ছাপাবে না। বুঝলে?

কোথায় আদালত! তার জায়গায় ছাপার খরচ! প্রথম সংস্করণে লোকশান হইলেও এ দুটা সংস্করণ বেচিয়া বেশ দু' পয়সা হাতে আসিয়াছে। এ সংস্করণের সাতশো কপি বেচিয়াছে। তবে বাজারে বইখানার এখনো যা নাম...

গোবর্দ্ধন গণিয়া বই বাহির করিয়া দিল। গাড়ী ডাকিয়া দিল; শেষে একবার শেষ-চেষ্টা ছাড়িল না; বলিল,—একটা নিবেদন ছিল...

আদীশ্বর কহিল—গৌরচন্দ্রিকা ভূমিকা রেখে আসল কথা-টুকু বলে ফেলো।

গোবর্দ্ধন কহিল—বইখানা খুব বিক্রী হচ্ছে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে ফেলবেন?

আদীশ্বর কহিল,—আমার ঘর-সংসার আছে—ছেলেমেয়ে আছে, বাপু। ডাগর ছেলে। তাকে ব্যবসা করে খেতে হবে। বাপকে দেখছে, দাঁতে দড়ি দিয়ে খাটে। সে ছেলে যদি জানতে পারে, বাপ পদ্য লিখেছে, তা হলে আর রক্ষা থাকবে? তার মানে, বদ দৃষ্টান্ত দেখানো। কাজ-কর্ম্ম রেখে দুদিন পরে সে হয়তো 'বুকের বীণা' পদ্য লিখতে বসবে।...তাহলে হাড়ে লক্ষ্মী থাকবে না। এ বাঙলা দেশ। 'কবিতে' লেখা ঘাড়ে চাপলে পেটে খেতে পাবে না; পাঁচ দোরে ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে। পুরুষ মানুষের চাই পয়সা রোজগার। পদ্যে পয়সা হয় না বাপু! পয়সা আছে ধানে, চালে, পাটে—বুঝলে!

গোবর্দ্ধন ঘাড় নাড়িল, বোধ হয় বুঝিল।

মাসিমা

-শ্রীঅপরাজিতা দেবী

ওকে, অমিয়েশ?...আয় বাবা আয়!
—কেমন আছিস্ বল্!
থাক্ থাক্ ওরে!—পায়ে হাত নয়,—হয়েছে।
—ওপরে চল্!
এতদিন কেন আসিস্নি অমু?...দেখিনি যে মাস চার!
বড়ো হ'য়ে বুঝি মাসিমাকে তোর
মনেই পড়ে না আর?
আমি তো তোদের কথা বলি প্রায়ই,
ভাবি মনে কতো কি যে!

দিদি মারা গিয়ে জামাইবাবু তো খবর নেন্ না নিজে।
থাক্গে সে কথা।—কেমন আছেরে
বুদ্ধু, বুল্টু, বিভা?—
শুন্লুম নাকি যাজপুর থেকে কটকে এসেছে নিভা?...
কটকে যদু কি হয়েছে বদ্লী?...
মাইনে বারো শো হোলো?
আহা হোক্ হোক্ বেঁচে থাক্ ওরা!
—দিদিটা না দেখে মোলো।

সুহাসিনী কোথা ?…শ্বশুর-বাড়ীতে ?…
জামাই কেমন আছে ?…
'চেঞ্জে' গিয়েছে সিমলে পাহাড়ে ?…
ছোটো দেওরের কাছে ?…
ভালই হয়েছে, শরীরটা তার এবার সারতে পারে !
রোগে ভুগে ভুগে মরতে বসেছে
মেয়েটা তো একেবারে।
…ওমা! সত্যি কি ? তোর সৎমার
আবার হয়েছে মেয়ে ?
বড় মেয়ে তাঁর ছোটো তো আমার কোলের
খুকীর চেয়ে !!
তোর বাবা বাপু এ বুড়ো বয়সে
গোলাম হ'য়েছে তাঁর !
—না, না, থাক্ থাক্—যাস্‌নিকো উঠে,
বোল্‌বো না ওটা আর।

হ্যাঁরে অমু! তুই পাটনা কলেজে
এবার পড়বি নাকি ?…
—তা' হোলে তো খুবি সুবিধাই,—
তোকে আমাদেরই কাছে রাখি।
তোর ছোট মেসো কত সুখ্যাতি
করে যে আমার কাছে,—
বলেন—'অমুর মতন ছেলে কি
এদেশে কোথাও আছে ?'—
সব রকমেই ভাল হবে, তুই আমার কথাটা রাখ্।—
…ও সব বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে শোন্,
এখানে এসেই থাক্ !
কি বল্‌লি ? তোর বাবার অমত ?
সে ভাবে যে তাঁরি ছেলে !
পাটনায় আমি থাকতেও, ছি ছি,
তুই যাবি হষ্টেলে ?…
এও কি কখনো হতে পারে হ্যাঁরে ?…
দিদি আজ নেই,—তাই
আমরা তোদের এই অপমান হেঁট মুখে স'য়ে যাই !!

…তাই যাস্। তোর বাবার ইচ্ছে,—
আমরা তো কেউ নই !
—বোনই নেই যার, বোন্‌পোকে তার
ধরে রাখা চলে কই !!
…মায়েতে মাসীতে তফাৎ কি এত ?
নিয়েছি যে কত কোলে।
…কাঁদবো না অমু ?…কাঁদালি যে তুই !—
আজ দিদি নেই বোলে
জোর চলে গেছে তোদের উপর…?—
এ যে কি দুঃখু ওরে !
মেয়েমানুষেই বোঝে শুধু,—
তোকে বোঝাব কেমন করে ?…

হষ্টেলে থেকে পড়বি তা' হলে ?—
স্থির হ'য়ে গেছে তাই ? ..
.. মিছে কথা ?…ওরে তাই বল্,
শুনে একটু আরাম পাই।…
—চিরদিনই তোরা সব ভাইবোন্
ছোট মাসিমাকে কতো
ভাল যে বাসিস্ তা'তো আমি জানি।—
নিজের মায়েরি মতো।
হ্যাঁরে অমি! সেই হুগলীর কথা,
সেদিনটা মনে পড়ে ?…
…নৌকোয় সেই ডুকরে কান্না কাল-বোশেখীর ঝড়ে ?
দুপুরে লুকিয়ে তুই আমি আর সেজদি নোটন পুঁটে—
ঘুড়ী ওড়াবার সেকি ঘটা ছিল চিলের ছাদেতে উঠে।
বুদ্ধু তখন খুব কচি ছেলে,—বছর সাতেক তুই !
আমার বয়েস দশ কি এগারো,—
বিশুটা বছর-দুই। ..
—সাগরেদ ছিলি তোরা তো আমার,
মনে আছে কুলচুরি।—
কাঁচা আম খেতে বাগানে পালানো
হাতে নিয়ে নুন ছুরী !
ছোটবেলাকার কথা মনে হ'লে এত আনন্দ হয় !!
কেমন মজায় দিন যেতো কেটে,—
না অমু, সত্যি নয় ?
রক্তের টান্ শক্ত এমন, মানি বা না মানি ওরে—
তোদের দেখলে এত খুশী লাগে—
মন যেন ওঠে ভ'রে।

বিজ্ঞান জগৎ

—কাজী মোতাহার হোসেন

সর্পের গতি কি বিষম দ্রুত ?

সর্ব্বসাধারণের ধারণা এই যে সর্প বায়ু-বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না। সুখের বিষয়, এ সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক ডাঃ ওয়ালটার মুসায়ার (Dr. Walter Mosaur) আমেরিকার "বিজ্ঞান-হিতৈষিণী সভায়" যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পড়িয়া কতকটা আশ্বস্ত হওয়া যায়।

ডাঃ মুসায়ার ছুট-বন্ধ ঘড়ি (stop-watch) ব্যবহার করিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী সর্পের চেয়েও মানুষ অধিক বেগে হাঁটিতে পারে। তিনি দেখিয়াছেন যে, একশত মিটার দৌড়াইতে এই সাপের প্রায় ৬৭ সেকেণ্ড সময় লাগে, ইহাতে ঘণ্টায় ৩½ মাইলের অধিক বেগ হয় না।

সর্প দৌড়াইবার সময় তরঙ্গায়িত গতিতে দৌড়ায় বলিয়া উহার চাকচিক্যময় গতিভঙ্গী দ্বারা মানুষের চক্ষু বিভ্রান্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহার গতি তেমন সাঙ্ঘাতিক রকম দ্রুত নহে।

উত্তর আমেরিকায় সাত প্রকার সাপ লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে দেখা গেল red-racer বা লাল-ধাবকই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, আর ক্যালিফোর্নিয়ার বোয়া বা বোড়া সর্ব্বাপেক্ষা মন্দগামী। এই বোয়া সাপ ঘণ্টায় সিকি মাইলের অধিক দৌড়াইতে পারে না।

ডাঃ মুসায়ার স্বীকার করিলেন যে তেজস্বী সর্প উত্তেজিত হইলে হয়ত ইহা অপেক্ষা অধিক বেগেও দৌড়াইতে পারে; এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কোন কোন জাতীয় সর্প হয়ত আমেরিকার সর্পের চেয়ে তিন চার গুণ অধিক বেগেও দৌড়াইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও, তাঁহার দৃঢ় অভিমত এই যে মানুষে আমেরিকার,—হয়ত বা সমগ্র পৃথিবীর—যে কোন সর্পের চেয়ে অধিক বেগে দৌড়াইতে পারে।

শূন্যমণ্ডল কি সত্য সত্যই পদার্থ-শূন্য ?

"মাউণ্ট উইলসন" বিমান-বীক্ষণ মন্দিরের (observatory) * জ্যোতির্ব্বিদ ডাঃ জে, এ, এণ্ডারসন বলেন, আমরা সৌরজগতে যে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে পাই, তাহার সংখ্যা সহস্র কোটিরও অধিক হইবে। এই সমুদয়কে একটি নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়া ধরিলে, সমগ্র নভোমণ্ডলে এইরূপ দশকোটি নক্ষত্র-পুঞ্জ বিদ্যমান আছে। ইহা কেবল কল্পনা বা অনুমান মাত্র নহে—বর্ত্তমান বৃহৎ টেলিস্কোপের সাহায্যে এই সব নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। বলা বাহুল্য, আমাদের সূর্য্য একটি নক্ষত্রপুঞ্জের দশকোটি নক্ষত্রের একটি নক্ষত্র মাত্র। গড়ে কোন নক্ষত্র হইতে উহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র পর্য্যন্ত দূরত্ব কত, তাহা তুলনার সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে। নক্ষত্রগুলিকে এক ইঞ্চির আট ভাগের একভাগ ব্যাস-বিশিষ্ট জলের ফোঁটা মনে করিলে, এই ফোঁটাগুলির মধ্যেকার দূরত্ব গড়ে ৫ মাইল হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, নভোমণ্ডলের অতি অল্পপরিমাণ স্থানই নক্ষত্র দ্বারা অধিকৃত। ইহার অবশিষ্ট অংশ কি সত্য সত্যই পদার্থশূন্য? ডাঃ এণ্ডারসন বলেন, "না, তাহা নয়।" আমাদের সৌরজগতের আন্তর্নাক্ষত্রিক স্থান (inter-stellar space) এক প্রকার সূক্ষ্ম উপাদানে পরিপূর্ণ, এ সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সোডিয়ামের নিরপেক্ষ (neutral) অণু এবং ক্যাল-শিয়ামের যোগাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন বিশ্লিষ্ট অণু (ionised molecules) লইয়া এই উপাদান গঠিত। ডাঃ এণ্ডারসনের কোন কোন হিসাব মতে এই সূক্ষ্ম উপাদানের জড়তা (বা ভার আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের যাবতীয় (১০ কোটি) নক্ষত্রের জড়তার সমান হইবে।

তিনি আরও বলেন কিরণ (radiation) রূপে যাবতীয় নক্ষত্র হইতে নির্গত বিপুল শক্তিপুঞ্জ (energy) নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করিতেছে। ইহার কিয়দংশ মাত্র আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে; অবশিষ্ট সমুদয় অংশই মানব-চক্ষুর অগোচর।

বিদ্যুৎ-পাত ও এরোপ্লেন

বিদ্যুৎপাত হইতে বৈমানিকের কোন বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ কেহ বলেন, এরোপ্লেন যখন মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া থাকে না, তখন আর ভয় কি? মৃত্তিকার সহিত বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকিলে, অবশ্য ভয়ের কারণ থাকিত। আবার কেহ কেহ বলেন, করকা-পাতের পথে এরোপ্লেন পড়িলে তৎক্ষণাৎ উহা প্রবল বিদ্যুৎ-প্রবাহের

* Observatory-র অনুবাদ "মান-মন্দির"-এর স্থলে "বিমান-বীক্ষণ-মন্দির" করা গেল।

ফলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে কিংবা উহাতে আগুন লাগিয়া যাইবে। প্রকৃত তথ্য বোধ হয় এই দু'য়ের মাঝামাঝি।
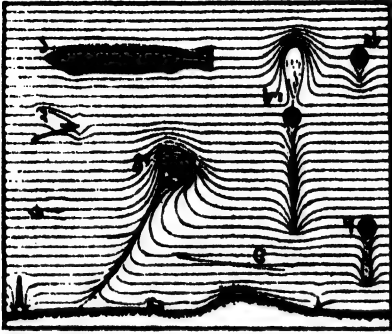
বিভিন্ন প্রকারের উড়োজাহাজের দ্বারা উর্দ্ধাকাশের বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র কি ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়।

[১] মৎস্যাকার উড়োজাহাজ [২] আকাশ-তার সমন্বিত এরোপ্লেন [৩] আকাশ-তারহীন এরোপ্লেন [৪] গুণটানা বায়ু জাহাজ (glider) [৫] ভূসংলগ্ন বেলুন [৬] ভূ-সম্পর্কহীন বেলুন [৭] ভূসম্পর্কহীন বেলুন (ভার নামাইবার অবস্থায়) [৮] ভূসম্পর্কহীন বেলুন (ভিজা দড়ির লেজ যুক্ত)।

হেনরিক্ কপ্ (Heinrich Koppe) নামক একজন জার্মান বায়ু-মণ্ডল-বিশারদ (meteorologist) এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন।

পৃথিবী উত্তম বিদ্যুৎ-সঞ্চালক ; আর বায়ুমণ্ডল ৫০ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত মন্দ সঞ্চালক হইলেও ইহার উর্দ্ধতর প্রদেশে আবার উত্তম সঞ্চালক। অতএব পৃথিবী ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডল মিলিয়া অতিশয় বৃহৎ একটি বিদ্যুৎ পুঞ্জক (Condenser)-এর কাজ করে। পৃথিবী ও অত্যুর্দ্ধ বায়ু যেন এই বিদ্যুৎ-পুঞ্জকের দুইটি ফলক (plates) এবং মধ্যস্থ বায়ুমণ্ডল ইহাদের মধ্যস্থ বিদ্যুৎ অবরোধক (dielectric); কিন্তু এই মধ্যস্থ বায়ু-মণ্ডল বিদ্যুতের অবরোধক হইলেও, ইহার ভিতর দিয়া সামান্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিয়া থাকে। তাহার কারণ, ইহার কতক কতক বায়ুকণিকা বা অণু উভয় পার্শ্বস্থ বৈদ্যুতিক চাপের ফলে ভাঙ্গিয়া দুইভাগে বিভক্ত হয় ; তখন ইহার একভাগ যোগাত্মক ও অন্যভাগ বিয়োগাত্মক বিদ্যুৎ ভাবাপন্ন হয়। ইহাদের নাম বিশ্লিষ্ট অণু (ion) বা বৈদ্যুতিক পরিব্রাজক। এই পরিব্রাজকোৎপন্ন তড়িৎপ্রবাহের পরিমাণ সমগ্র পৃথিবীতে মোট ১৩৬০ আম্পিয়ার (ampere) ; কস্‌মিক আলোর প্রবর্ত্তনায় (induction) এই বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

এই বিদ্যুত-প্রবাহ যখন আছে, তখন অবশ্যই জানা যাইতেছে পৃথিবী ও অত্যুর্দ্ধ বায়ু মণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুৎ-বাহিকাশক্তি (অর্থাৎ প্রবাহক-বল) রহিয়াছে। ভূপৃষ্ঠ ও উর্দ্ধ আকাশের মধ্যে প্রবাহক বলের পার্থক্য মোট ২০০,০০০ ভোল্ট। ইহা শুনিতে অধিক হইলেও, প্রকৃত পক্ষে ফুট প্রতি বা মিটার প্রতি প্রবাহক বলের পার্থক্য বা ঢালুতা অধিক নহে। কোন প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা না হইলে, সচরাচর বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল স্তরগুলিতে প্রবাহক বল প্রায় সমান থাকে।

কিন্তু বায়ু মণ্ডলের ভিতর দিয়া কোন উড়ন্ত পদার্থ সঞ্চরণ করিতে থাকিলে চিত্রে প্রদর্শিত মত সমপ্রবাহক বল বা সমচাপ রেখাগুলি বক্রীভূত হইয়া যায়। বিমানপোতের মধ্যে যে-গুলির দৈর্ঘ্য চলিবার সময় সমচাপ রেখার সহিত (বা ভূপৃষ্ঠের সহিত) সমান্তরাল থাকে, সেগুলি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে অধিক বিপর্য্যয় উৎপাদন করে না ; কিন্তু যে গুলি চলিবার সময় উহাদের দৈর্ঘ্য সমচাপ রেখা ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে, সেগুলি অনেক অধিক বিপর্য্যয় উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই কারণে, শুধু এরোপ্লেন দ্বারা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র যতটা বিপর্য্যস্ত হয়, উহার সহিত লম্বমান দীর্ঘ আকাশ-তার বা (antenna) আন্‌টেনা থাকিলে তদপেক্ষা অনেক অধিক বিপর্য্যস্ত হয়।

সমচাপ-রেখা বিপর্য্যস্ত হইলে বৈদ্যুতিক চাপ অনেক বেশী হইয়া পড়ে। এমন কি, আকাশতার যুক্ত হইলে এই চাপ বা প্রবাহক-বলের পার্থক্য ১০ গুণ বা ২০ গুণ হইয়া যাইতে পারে।

বৃষ্টকণা প্রবল বাত্যা বিঘর্ষিত হইয়া চূর্ণীকৃত হইলে উহা বিশ্লিষ্ট জলীয় অণু (ion) বা বৈদ্যুতিক পরিব্রাজকে পরিণত হইতে পারে। যোগাত্মক কণিকাগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী হওয়াতে উহারা নিম্নাভিমুখে পড়িতে থাকে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত হালকা বিয়োগাত্মক কণিকাগুলি বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের ফলে উচ্চাভিমুখে উঠিতে থাকে। এই কারণে, বিদ্যুৎ-চাপের স্বাভাবিক ঢালুতা অনেক অধিক বৃদ্ধি পায়।

এক সেন্টিমিটারের মধ্যেই ৩০,০০০ ভোল্ট বা তদপেক্ষা অধিক বৈদ্যুতিক চাপ হইলে করকা নিঃসরণ (discharge) হয়। স্বাভাবিক করকা-নিঃসরণের পথিমধ্যে এরোপ্লেন গিয়া উপস্থিত হইবে, এমন বড় একটা হয় না। কারণ, যে উন্নত মার্গে বৈদ্যুতিক ঝড় বা উপপ্লব হয়, ততটা উর্দ্ধে সাধারণতঃ এরোপ্লেনের গমনাগমন হয় না। বায়ু-মণ্ডল-সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান না থাকিলেও সামান্য জ্ঞানেই চালক এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইতে পারে। তাহা ছাড়া, বৈদ্যুতিক ঝড়ের আশঙ্কা দেখিলে, বেতার বার্ত্তার সাহায্যেও বৈমানিককে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু বিপদ্ যে একেবারে নাই তাহা নহে। এমন হইতে পারে যে, জলবিন্দু বা নীহারবিন্দুর সহিত বায়ুর সংঘর্ষে বৈদ্যুতিক চাপ প্রতি সেন্টি-মিটারে ৩০০০ ভোল্ট মাত্র হইল। এ অবস্থায় নৈসর্গিক করকা-নিঃসরণ হয় না। কিন্তু যদি এরোপ্লেনের দরুণ বিপর্য্যয়ে ঐ চাপ ১০ গুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলেই প্রবাহক বল প্রতি সেন্টিমিটারে ৩০,০০০ ভোল্ট হইয়া করকা-নিঃসরণ হইবে। এই নিঃসরণের ফলে বহমান বিলম্বিত আকাশ-তার বা আন্‌টেনা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, রেডিওর তারগুলি পুড়িয়া যাইতে পারে, গ্যাসোলিনের ট্যাঁকিগুলি (tanks) নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি এরোপ্লেনে আগুনও লাগিয়া যাইতে পারে। যে প্রকার গঠনই হউক না কেন কোন এরোপ্লেনই বৈদ্যুতিক বিপদ্ হইতে একেবারে মুক্ত নহে। আগাগোড়া ধাতুনির্ম্মিত এরোপ্লেন সম্বন্ধে যেরূপ ভীষণ ক্ষতির বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, শুধু

ধাতুর কাঠাম ও তারওয়ালা এরোপ্লেন সম্বন্ধেও সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।
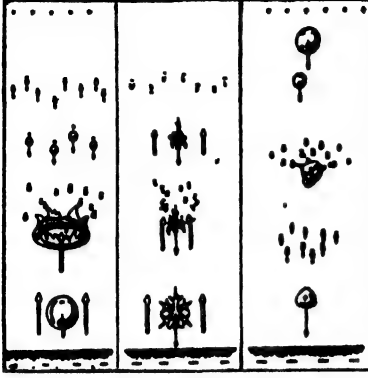
তুষারবিন্দু বা বৃষ্টির ফোঁটা বিচূর্ণ হইয়া উর্দ্ধাকাশে এইরূপে শক্তিশালী বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে।

সে যাহা হউক, করকা-নিঃসরণের বিপদকে অনেক অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এই নিঃসরণ আকাশ-তারের প্রান্ত বা তদনুরূপ কোন স্থান হইতে গুরুভার ধাতুময় ইঞ্জিনের অগ্রভাগ পর্যন্ত গমন করিতে চেষ্টা করে। এরোপ্লেনটি আগাগোড়া ধাতুময় হইলে, ধাতুর বহিঃপৃষ্ঠই আরোহীদের রক্ষক হয়; এমন কি, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এরোপ্লেনগুলিতেও সর্ব্বদাই তার এবং অন্যান্য বিদ্যুৎ সঞ্চালক থাকাতে, এ গুলির ভিতর দিয়াই করকা-নিঃসরণ হয়—আরোহীদের তেমন ক্ষতি হয় না।

সে যাহাই হউক, নৈসর্গিক কারণে যেখানে নিঃসরণ হইত না, সে সব স্থলেও এরোপ্লেন স্বকীয় প্রভাবে নিঃসরণের সৃষ্টি করে, এ কথা চিন্তা করিলে মনে একটু বিষাদ উপস্থিত হয়। সাবধানতার মধ্যে প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডলের
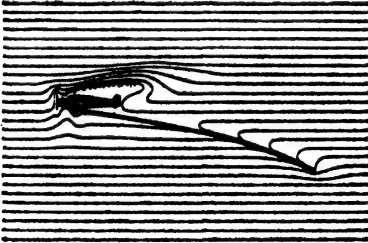
এরোপ্লেন দোদুল্যমান আকাশ-তার সঙ্গে লইয়া উড়িলে বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের এইরূপ পরিবর্তন হয়।

অবস্থা পর্য্যবেক্ষকগণের এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আকাশমার্গে আশঙ্কাজনক করকাপাতের লক্ষণ দেখা না গেলেও, এরোপ্লেনে করকা-নিঃসরণ হওয়া বিচিত্র নয়। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চাদ্ভাগ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ধাতুময় আবরণ কিংবা ধাতব-বন্ধন বা সংযোগ রাখিতে হইবে, তাহা হইলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ নিঃসৃত হইবার এরূপ সহজ পথ ছাড়িয়া অন্যপথে যাইবে না; অবশ্য বিদ্যুৎ-নিঃসরণের এই সহজ পথ যাহাতে আরোহীদের গাত্র স্পর্শ করিয়া না যায়, কিংবা গ্যাসোলিনের ট্যাঁকির সন্নিকট দিয়া না যায়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, হয় দোদুল্যমান আকাশ-তার একেবারে বাদ দিতে হইবে, না হয় তাহাকে যথোপযুক্ত রূপে বিদ্যুৎ-প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। এমন কি, যে সব ক্ষেত্রে আকাশ-তার এরোপ্লেনের উপরিভাগে সংলগ্ন থাকে, সে সব স্থলেও, ইহার সহিত এরোপ্লেনের অন্য অংশের ধাতুময় বন্ধন বা সংযোগ রাখিতে হইবে।

এই বিবরণ হয়ত একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু এরোপ্লেন রাজ্যে যে সব বা আষাঢ়ে-গল্প প্রচলিত আছে, সেই সব অন্ধভাবে বিশ্বাস না করিয়া প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়াই ভাল।

উড়োজাহাজে ভারসহন পরীক্ষা

উড়োজাহাজের মজবুতি সম্বন্ধে কয়েকটি সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। ইঞ্জিনিয়ারেরা অতীব সতর্কতার সহিত সূক্ষ্মভাবে হিসাব করিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তথাপি, কোন কোন স্থানে ইহাতে সামান্য অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। তখন, উড়োজাহাজখানি যতই মূল্যবান হউক না কেন, ইহার বিশেষ বিশেষ স্থানে সীসকপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ বস্তা স্থাপন করিয়া ইহার ভার সহন-শক্তির পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। অনেক সময় ইহার ফলে জাহাজখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়।

চিত্রের প্লেন খানির উপর স্থাপিত বস্তা দেখান হইয়াছে। সর্ব্বত্র সমান ওজন চাপান হয় না। আকাশে উড়িবার সময় যেখানে যে পরিমাণ চাপ অনুভূত হইবার কথা, সেখানে সেই পরিমাণ ওজন চাপাইয়া

উড়োজাহাজের ভারসহন পরীক্ষা।

পরীক্ষা করা হয়। চিত্রে জাহাজখানি, নিম্নতম প্রয়োজন অপেক্ষা শতকরা ২০ ভাগ অধিক ভার সহ্য করিয়াছিল। ইহার গঠনের দৃঢ়তা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

আকাশ হইতে স্বর্ণ-প্রাপ্তি

আকাশ হইতে বারি-পতন ও বজ্রপতনের কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু আকাশ হইতে যে স্বর্ণও পৃথিবীতে পতিত হয়, এ সংবাদ বড়ই অদ্ভুত। যাহা হউক, সম্প্রতি ডিন্‌ভার নগরের ডিন্ জিলেপ্‌সী নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক আমেরিকার 'বিজ্ঞান-হিতৈষিণী-সভা'য় (American Association for the Advancement of Science) এইরূপ একটি ঘোষণা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

নয়া-মেক্সিকোতে একটি কঙ্করময় উল্কাপাত হইয়াছিল। ডিনভার নগরের নাইনিজার লেবরেটরীর বৈজ্ঞানিক এইচ জি. হলি উহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পান যে উহাতে সামান্য পরিমাণে স্বর্ণরেণু বর্ত্তমান আছে। তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের সত্যতা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত আমেরিকার একজন খনিজ বিশ্লেষণ-বিশারদও উহা নানাবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাহাতে হলি সাহেবের অভিমত সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার কথা

—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

[৩]

মেলা ও তদনুরূপ অনুষ্ঠানে ভাবের আদান-প্রদান ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে হইয়া আসিয়াছে। তীর্থস্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেলা বসিত, তাহাতে কেবল যে দেশের নানা স্থান হইতে শিল্পীরা পণ্য আনিয়া বিক্রয় করিত—ক্রেতা-বিক্রেতা অর্থাৎ উৎপাদক ও ব্যবহারকারীর মধ্যে যোগ স্থাপিত হইত তাহাই নহে, পরন্তু সেই সব সময় ধর্ম্মপ্রচারকারীরা ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন—ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, ভাবের আদান-প্রদান হইত। এখন সভাসমিতি—কংগ্রেস কন্ফারেন্স ও প্রদর্শনী সেই স্থান অধিকার করিয়াছে—এসব মেলারই নূতন—'হয়ত বা কালোপযোগী' সংস্করণ বলা যাইতে পারে। এই সব মেলার নানা দিক ছিল। প্রথমে আমরা শিল্পব্যবসার দিকের কথা বলিব। মেলায় নানা স্থানের নানা পণ্য আসিত এক স্থানের শিল্পী অন্যান্য স্থানের পণ্যের আদর্শ লইত, উৎপাদন-পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিয়া উপকৃত হইত। এক একস্থানের পণ্য উৎকর্ষহেতু অধিক বিক্রয় হইত। আমাদিগের ব্যবহার্য্য কোন কোন দ্রব্যের নাম আজও মেলার স্থানের নামের সহিত বিজড়িত। পৌষসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে মেলা হয়। সেই মেলায় এক প্রকার তৈজস বিক্রয় হয়, তাহা "সাগরী" নামেই পরিচিত। বলা বাহুল্য, তাহা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে প্রস্তুত হয় না: কারণ, তথায় লোকের বসতি নাই; তাহা কলিকাতাতেই প্রস্তুত হয়—কেবল পৌষসংক্রান্তির মেলায় গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বিক্রীত হইয়া থাকে। বহুকাল পূর্ব্বে যাঁহারা মেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহারা লোকচরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন। তখন লোক তিথি-নক্ষত্র লক্ষ্য করিত, সেইজন্য কুম্ভমেলা হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ মেলাই তিথি-নক্ষত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হইত। প্রয়াগের মাঘমেলা, গয়ার পিতৃপক্ষমেলা প্রভৃতি আজও পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আজ ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস বিরাট মেলার আকারই ধারণ করিতেছিল। এখন তাহাতে কৃষাণ-প্রতিনিধি সংগ্রহ করিবার আগ্রহও পরিলক্ষিত হইতেছে, দেশের জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেসের কায ইংরাজীতে নির্ব্বাহ না করিয়া হিন্দীতে নির্ব্বাহ করিবার প্রবল চেষ্টাও চলিতেছে। হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় মেলা প্রভৃতির কার্য্য পরিচালিত হইত। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে "বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়" বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজীতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতের এক-পরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়; কেননা, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজী বলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না।"

বহুদিন পরে এই প্রবন্ধটি প্রবন্ধসংগ্রহে পুনঃ প্রকাশকালে তিনি ইহার টীকায় লিখিয়াছিলেন—"এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।"

কিন্তু বাঙ্গালীর মত ছিল—"যতদূর ইংরাজী বলা আবশ্যক, ততদূর চলুক"—তাহার পর আর নহে। তাই পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে বাঙ্গালায় হিন্দুমেলা ও চৈত্রমেলায় পুরাতনের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের লোকের পরিচিত উপায়ে মত প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সব মেলার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ আজ আর সহজসাধ্য নহে, কিন্তু যে সব বিবরণ আমরা সমসাময়িক সাহিত্যে লাভ করি, তাহাতে নির্ভর

করিয়া বলা যাইতে পারে, সে সকল জাতীয় প্রথায় জাতীয় ভাবের প্রচারোপায় করাই অনুষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গদেশে চৈত্রমেলা ও হিন্দুমেলার যুগ শেষ হইবার পর একবার বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাহার অনুষ্ঠাতা—'অমৃত বাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার ভ্রাতা মতিলাল ঘোষ। তাঁহাদিগের সহায়—দ্বারবঙ্গের মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিরা। তাহার অনুষ্ঠান-স্থান যশোহর জিলার কপোতাক্ষী তীরে ঝিকরগাছা। সেও প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা—তাহা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের অনুষ্ঠান।

চৈত্রমেলা ও হিন্দুমেলার সাহায্যে দেশে জাতীয় ভাব—দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইত, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পে উৎসাহ প্রদান ও লোককে ব্যায়াম-চর্চ্চায় প্ররোচিত করা হইত। সন ১২৮০ সালে বারুইপুরে হিন্দুমেলার অধ্যক্ষদিগের অনুরোধে কবি মনোমোহন বসু যে গানটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই সুসজ্জিত ও সংস্কৃত করিয়া তিনি পরে—

"দিনে দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন"

গানটি রচনা করিয়াছিলেন। তখন রাজপুরুষেরা এদেশের লোকের রচনায় রাজদ্রোহের সন্ধানে ব্যস্ত হইতেন না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ, কবি নবীনচন্দ্র সেন ইঁহারা সরকারের চাকরীয়া ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গানটি মনোমোহনের 'হরিশচন্দ্র' নাটকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাত্রার আসরে প্রায় ২৫ বৎসর কাল বাঙ্গালায় সুপরিচিত থাকিবার সুযোগ লাভের পর তাহার প্রচার নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু দেশের যে অর্থনীতিক দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া মনোমোহন ঐ গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অবসান হয় নাই!—

"তাঁতী কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সুতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন!"

সেই অবস্থা কি আজও বিদ্যমান বলা যাইতে পারে না? আমরা কিরূপে পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি, তাহার পরিচয় এইরূপ—

"ছুঁই সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে;
দিয়াসলাই কাটি, তাও আসে পোতে;
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে—
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।"

এই যে স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতা—ইহা অর্থনীতিক স্বাধীনতা। ইহার বহুদিন পরে অর্থনীতিবিদ্ মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে বুঝাইয়াছিলেন—অর্থনীতিক পরাধীনতা রাজনীতিক পরাধীনতা অপেক্ষা ভয়াবহ। মনোমোহনের গানে অর্থনীতিক পরাধীনতার কুফল বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহা সেই পুরাতন কথার পুনরুক্তি—আত্মবশ্যতাতেই সুখ—পরবশ্যতা দুঃখের কারণ। এদেশের লোক যে করভারগ্রস্ত, তাহা যে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থার তুলনায় অধিক, সে কথা কংগ্রেস বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন। সে কথাও মনোমোহন আর একটি গানে বলিয়াছিলেন। তিনি আয়কর, পথকর ও লবণের শুল্ক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

"আয়কর শুনে গায় আসে জ্বর,
অস্থিভেদী রথ্যাকর কি দুষ্কর!
লবণটুকু পা'ব তা'তেও লাগে কর!"

তখন এই করত্রয়ই নূতন এবং সে জন্যও লোকের নিকট বিশেষ অপ্রিয়। বহুদিন পরে মার্কিণের রাজনীতিক মিষ্টার ব্রায়েন বলিয়াছিলেন—ভারতে লবণের শুল্ক **"is not only a heavy rate when compared with the original cost of the salt, but it is especially burdensome to the poor."**

এই সব মেলায় বহু সারগর্ভ রচনা পঠিত এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কার্য্য অগ্রসর হইত। মেলায় রচনা ও বক্তৃতা বাঙ্গালা ভাষায় পঠিত ও উক্ত হইত বলিয়া সে সকল সর্ব্বজনবোধ্য হইত। ইহা যে দেশের পক্ষে সামান্য লাভ ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য।

৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট দাইগো (Daigo) সিংহাসনে আরোহণ করিলে জাপানে যে ফুজিয়ারা বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়, সেই বংশের রাজত্বকালে যেমন জাপান, ভারতবর্ষ হইতে লব্ধ জ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া, নবোৎসাহে জাতির জীবনে ও আদর্শে আপনার স্বতন্ত্র ভাবের বিকাশসাধন করিয়াছিল, বিস্মৃত গ্রীক সাহিত্য ফিরিয়া পাইয়া য়ুরোপ যেমন অভ্যুদয়ের পথারূঢ় হইয়াছিল, তেমনই প্রতীচীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান আত্মসাৎ করিয়া ভারতবর্ষ নবোদ্যমে আপনার ধাতুর সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন আদর্শ ও ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। বাঙ্গালায় তাহার উৎপত্তি। বাঙ্গালায় আর একবার এই

দিন আসিয়াছিল সে পাঠান শাসনকালে। তখন "নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়"; তাহার পর রূপ সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত। এদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্যের পূর্ব্বগামী কিন্তু তাহার পরে, চৈতন্যের পরবর্ত্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া।" তাহার পর মুসলমান শাসনের শেষ দশায় যখন নাম-শেষ দিল্লীর সম্রাটের দুর্ব্বল হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল—যে বাবর সন্তরণে সেনাদলসহ নদী পার হইয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধর ঔরঙ্গজেবের আমীরওমরাহগণ নরবাহ্য যানে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া বিলাসীর পরিণাম লাভ করিতেছিলেন এবং বাঙ্গালায় বর্গীরা আসিয়া চৌথ আদায় করিতেছিল, তখন দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে বাঙ্গালীর প্রতিভা স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার অবসর পায় নাই। তখন ভাস্কর্য্যে যেমন, স্থাপত্যে ও সাহিত্যেও তেমনই অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য—অলঙ্কারের বাহুল্যে শিল্পের মৌলিকতা ও স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি প্রহত হইয়াছিল। তাহার দৃষ্টান্ত তৎকালীন দেবদেবীর মূর্ত্তির সজ্জা, একুশরত্ন মন্দির আর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' মত কাব্য, সুন্দর ও মধুর কিন্তু, তাহাতে মৌলিকতার অভাব। কাব্যে প্রবাহবেগ নাই, তাহা বর্ষাবারিপাতপুষ্টা পদ্মার প্রবাহ নহে—তাহা উদ্যানশোভা শতদলদলে সুন্দর সরোবর। সে সময় বাঙ্গালী প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেষ্টন পায় নাই। ইংরাজশাসনে সেই পরিবেষ্টন—সেই অনুকূল অবস্থা পাইয়া সেই প্রতিভা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কাশ্মীরে যে বৎসর অধিক তুষারপাত হয়, সে বৎসর যেমন তুষারাস্তরণ বিগলিত হইবার পরই কুসুম-সুষমা বিকাশ পায়, বাঙ্গালায় মনীষার ক্ষেত্র তেমনই হইয়াছিল।

বাঙ্গালীর বিদ্যার্জ্জনস্পৃহা এই সময় বিশেষ বলবতী হয়। প্রতীচীর জ্ঞানবিজ্ঞানে অধিকারলাভের জন্য তাহার আগ্রহ রামমোহন রায়ের পত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী বিদ্যার্থীরা তাহাতে প্রবেশ করেন। যাঁহারা প্রথম বিশ্ব-উপাধি লাভ করেন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদিগের একজন; বি-এ পরীক্ষায় "অনার্স" প্রবর্ত্তিত হইলে প্রথম তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ইংরাজীতে "অনার্সে" বি-এ। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনেও অর্থাৎ প্রতীচীর জ্ঞানবিজ্ঞান স্ত্রীলোকের অধিকারগত করিবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা হইতে থাকে। সে জন্য সেকালের প্রথার সন্ধান করা হয়; কারণ যাঁহারা সে সময় সমাজে পরিবর্ত্তন-সাধনের দায়িত্বগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা করিতেন না। মিষ্টার ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যে বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তাহাতে বালিকাদিগকে গৃহ হইতে বিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার ও ফিরাইয়া দিয়া যাইবার জন্য যে অশ্ববাহিত যান ব্যবহৃত হইত, তাহার গাত্রে লিখিত ছিল—"কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুপরিচিত উমেশচন্দ্র দত্ত প্রবর্ত্তিত মাসিক-পত্রিকা 'বামাবোধিনী পত্রিকা' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে 'বামাবোধিনী'র জন্ম হয়। ১২৮৬ সালের কার্ত্তিক মাসে দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভে ইহার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—

"বামাবোধিনী যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করেন, তখন এদেশের নারীগণের শিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল এবং তাঁহাদিগের উন্নতি ও কল্যাণসাধন জন্য অতি অল্প লোকই যত্নবান ছিলেন। আমরা কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখিয়া সুখী হইয়াছি, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানোন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে আরও কয়েকখানি সাময়িক পত্র প্রচারিত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, কয়েকটী বঙ্গরমণী লেখিকা গ্রন্থকর্ত্রীরূপে পরিচিত হইয়াছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই, স্ত্রীজাতির কল্যানসাধণের সহকারিতা করিতে কোন কোন ভগিনীও উৎসাহসহকারে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।"

স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের মধ্যে আমরা একখানির উল্লেখ করিব। নন্দকৃষ্ণ বসু পরে ষ্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিসে ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন পাটনা কলেজে শিক্ষক, তখন তাঁহার 'বামাবোধ' প্রকাশিত হয়। তাহার ভূমিকায় লিখিত ছিল :—

"এই প্রবন্ধগুলি বঙ্গবামাদিগের নিমিত্ত 'বঙ্গমহিলা' নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়া প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ বিজ্ঞানবিষয়ক। বিজ্ঞানপাঠে বঙ্গমহিলাদিগের অভিরুচি জন্মানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আধিক্য হইলে রচনা নিতান্ত নীরস হইবে বলিয়া অন্যান্য বিষয়ে অবতারণা করা হইয়াছে।"

এই সময় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' নামক একখানি কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা কোন মহিলার রচনা কিনা সন্দেহ ও তখন তাহা স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া পরিচিত হয়। সেই জন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন :—

দেবি !

এত দিনে বুঝি বিধি হইয়া সদয়,
পাষাণরাশির মাঝে একটি হৃদয়,
সৃজিলেন বঙ্গদেশে,
তুমি মহাশক্তিবেশে
আবির্ভাব, কর বঙ্গে জীবন-সঞ্চার।
করি' মহাশাক্তোৎসব
পূজিব আমরা সব
হৃদয়ের রক্তজবা দিয়া উপহার,
ভুবনমোহিনী ওই প্রতিভা তোমার।

কবিতাটি যখন 'অবকাশরঞ্জিনী'তে (দ্বিতীয় ভাগ) সংগ্রহ মধ্যে পুনঃপ্রচারিত হয়, তখন কবি টীকায় লিখিয়াছিলেন —"শুনিয়াছি, 'ভুবনমোহিনী' জাল। হউক, আজ বঙ্গদেশে ভুবনমোহিনী প্রতিভার অভাব নাই।"

ইহার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন বঙ্গ-রমণী (শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু ও শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়) উপাধিলাভ করিলে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

এতদিনে জাগিল যে জীবনে বিশ্বাস,
ঘুচিল হৃদয় হ'তে কালের হুতাশ।
বাঙ্গালীর কামিনীর হৃদয় কমলে
পাশ্চাত্য সাহিত্যরূপ দিনমণি জ্বলে।
সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গ-নয়নী,
ছুটেছে যুবক সঙ্গে যুবতী রমণী।
পরেছে উপাধি-হার—সুনীল বসন
সেজেছে অঙ্গেতে কিবা চারু-দরশন !—
ধন্য বঙ্গ নারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ-ভেলা কালের জুয়ারে।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র প্রবর্ত্তক স্ত্রীশিক্ষা পুরুষের শিক্ষার অনুরূপই করিতে চাহেন নাই। হেমচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত কবিতায় যে উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়, তাহাও কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। সেই জন্যই শ্রীমতী রমাবাঈ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তিনি শিক্ষার পরিণতি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন :—

হায় কি হলো দেশের দশা—বিলেত গেলে রমা,
তিন দিন না যেতে যেতে খৃষ্ট ভজে ওমা !
পুরুষ পাছে মেয়ে আগে, সুফল তাতে ফলবে না,
চাই এদেশে আর কিছু দিন এদেশী জাগনা।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী মহিলারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষদিগের জন্য কল্পিত শিক্ষালাভ না করিয়া—যে সব গদ্য ও পদ্য-রচনা প্রকাশ করেন, সে সকল আজও সমাদৃত। বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু এই শিক্ষাই সমাজের উপযোগী কিনা তাহা লইয়া মতভেদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রাজনীতিক বিষয়ে বাঙ্গালী যাহা পাইয়াছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিবার প্রবল আগ্রহ তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে যাহা পায় নাই তাহার জন্য আক্ষেপ ও তাহা লাভ করিবার আগ্রহও প্রকাশ পাইয়াছিল। তৎকালীন সাহিত্যে রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য ব্যাকুলতা নানা প্রকারেই আত্মপ্রকাশ করিয়া-

ছিল। তাহাতে আমাদিগের পরমুখাপেক্ষিতার জন্য আক্ষেপ কোথাও আত্মগোপন করিতে পারে নাই। "চীন, ব্রহ্মদেশ, 'অসভ্য জাপান" যে অধিকার সম্ভোগ করে, সভ্যতার উদ্ভব-

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষেত্র ভারতবর্ষ তাহাতে বঞ্চিত বলিয়া হেমচন্দ্র পূর্ব্বকালের কথা স্মরণ করিয়া গাহিয়াছিলেন :—

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম
হিন্দু বীর-দর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম—
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম
গান্ধার অবধি জলধিসীমা ?
সকলি ত আছে, সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা।

হেমচন্দ্রের মত নবীনচন্দ্রও এই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল তাঁহাদিগের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের মধ্যে এই ভাবের প্রাবল্য উল্লেখ করাই বাহুল্য।

ভারতবাসীকে বিস্তৃত রাজনীতিক অধিকার প্রদানের প্রস্তাব হইলে ইংরাজেরা তাহাতে যেমন আপত্তি করিয়াছেন, ভারতবাসীরা তেমনই তাহার সমর্থন করিয়াছেন। এদেশে সংবাদপত্রের মতপ্রচারস্বাধীনতা-সঙ্কোচক ব্যবস্থায় রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিরা আপত্তি করিয়া আদালতে সে ব্যবস্থা বাতিল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে মিষ্টার টমসনকে এদেশে আনিয়া এ দেশে রাজনীতিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। বাগ্মী রামগোপাল ঘোষকে মিষ্টার টমসনের শিষ্য বলা যাইতে পারে।

রাজনীতিক আন্দোলন প্রথমে অবশ্য প্রাদেশিক প্রয়োজনে প্রদেশে প্রদেশে হইত। যখন কোন বিশেষ কারণ ঘটিত, তখন আন্দোলন প্রবল হইত। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যখন দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের সম্বন্ধে আইন প্রণীত হয়, তখনও কলিকাতার টাউন-হলে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা হইয়াছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সে সভায় সভাপতি ছিলেন। বক্তাগণের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, রাসবিহারী ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্রের মতপ্রকাশ-স্বাধীনতার মূল্য বাঙ্গালার জননায়কগণ বিশেষরূপ বুঝিতেন। সেই জন্যই রামমোহন প্রমুখ ব্যক্তিরা যেমন তাহার সঙ্কোচ-চেষ্টায় বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন, তেমনই মেটকাফ বড়লাট হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিলে বাঙ্গালার জননায়কগণ

লালমোহন ঘোষ।

কেবল যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন' তাহাই নহে, পরন্তু সেই কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া, কলিকাতার একটি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে একটি সাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট

পুস্তকাগার করেন। সেই পুস্তকসংগ্রহ সরকার এখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীভুক্ত করিয়া লইয়াছেন এবং সাধারণের অর্থে রচিত "মেটকাফ্ হল" গৃহ আজ সরকারের কার্য্যে ব্যবহৃত

রাজনারায়ণ বসু।

হইতেছে। লালমোহন ঘোষ ইহার পরই এদেশে ইংরাজীতে সর্ব্বপ্রধান বক্তা বলিয়া বিবেচিত হয়েন।

রাজনীতিক অধিকারলাভের বলবতী বাসনাই ভারতবাসীকে নূতন জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। ইংরাজ লেখকদিগের রচনা যে ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া সমবেত ভাবে অধিকারলাভে প্ররোচিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজনারায়ণ বসু "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক বক্তৃতার উপসংহারে ইংরাজ কবি মিল্টনের স্বজাতির উন্নতি সম্বন্ধীয় আশার বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্ত্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।"

এই আশার পরিণতি জাতীয় মহাসমিতিতে। কংগ্রেস হিন্দুপ্রধান হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সমগ্র ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বক্তৃতাশেষে রাজনারায়ণবাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "জয় ভারতের জয়" গানটি পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে ছিল;—

"কেন ডর, ভীরু? কর সাহস আশ্রয়;
যতোধর্ম্ম স্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল;
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?"

যাহারা ছিন্ন ভিন্ন তাহারাই হীনবল। লর্ড রিপনের শাসনকালে যখন ভারতীয় বিচারকদিগকে কোন কোন অপরাধে য়ুরোপীয় অভিযুক্তের বিচারাধিকার প্রদানের প্রস্তাব করিয়া "ইলবার্ট বিল" রচিত হয়, তখন তাহাতে ইংরাজদিগের বিরোধ ভারতবাসীর আত্মসম্মানে আঘাত প্রদান করে। সেই আঘাত—হুতাশন যেমন ধাতুপিণ্ড সকলকে বিগলিত করিয়া একীভূত করে—এই আঘাত তেমনই অপমানের তাপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করিয়াছিল। সেই জন্যই

রাজেন্দ্র দত্ত।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে হেমচন্দ্র যে কবিতা ('রাখী-বন্ধন') রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছিল:—

পূরব, বাঙ্গলা, অউধ, বিহার,
দূর বঙ্গদেশ, হিমাদ্রির ধার,
তৈলঙ্গ, মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
মরাঠী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্র ভাই
মা ব'লে ভারতে ডাকিল।

সেই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সুধী রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছিলেন—"আমার এই জাতির বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় সমূহ যে একত্রিত হইবে এবং আমরা সম্প্রদায় না থাকিয়া জাতিতে পরিণত হইব, ইহা আমার জীবনের স্বপ্ন। এই সম্মিলনে আমি সেই স্বপ্নের সাফল্য প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের লক্ষ্য তখনও "স্বরাজ" নহে বটে, কিন্তু যে শিক্ষার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, তাহাতে ভারতবাসীর মনে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব অনিবার্য্য। কারণ, ইংরাজ মনীষী মিলই বুঝাইয়াছেন—"কোন জাতি যখন আপনার শাসনকার্য্য পরিচালিত করে, তখন তাহার অর্থ ও যাথার্থ্য থাকে; কিন্তু এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির শাসন হইতেই পারে না। এক জাতি অপর জাতিকে তাহার নিজ প্রয়োজনে—অর্থার্জ্জনের জন্য—লাভের জন্য—পশুক্ষেত্ররূপে রক্ষা করিতে পারে মাত্র।" স্বায়ত্ত-শাসনের মহিমা আর কেহ ইহা অপেক্ষা দৃঢ় ভাবে কীর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যিনি ইহা লিখিয়াছিলেন, তিনি ইংরাজ এবং সমসাময়িক সমাজে তাঁহার মত বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে গৃহীত হইয়াছিল এবং আজও তাঁহার মত খণ্ডিত হয় নাই—শ্রদ্ধাও হারায় নাই।

মোগল, পাঠান, মার্হাট্টা কিরূপে বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যলোভে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার বিষয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। প্রদেশব্যাপী অশান্তির মধ্যে সমাজে নানা ত্রুটিসঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, সমাজে প্রথার সংস্কার বিবেচনা-সাপেক্ষ—সে জন্য সময়ের প্রয়োজন। এদেশে, বিশেষ হিন্দু-সমাজে রক্ষণশীলতা কখনও সংস্কারের অন্তরায় হয় নাই। মনু-সংহিতার ব্যবস্থার সহিত পরাশর-সংহিতার ব্যবস্থার তুলনা করিলে তাহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না। বাঙ্গালা কখনও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত থাকে নাই। বাঙ্গালার সমাজ-বিন্যাস লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অল্প ছিল না। পুনরুত্থিত উদার হিন্দু মত যখন বিস্তার লাভ করে, তখন যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা সমাজের ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনফলে। কোন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের আচার দীর্ঘকাল-স্থিতির পর পবনহিল্লোলের মত নিশ্চিহ্ন হয় না। সেই জন্য বৌদ্ধগণ হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের অনেক আচারাদি এই সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর পীতবাস আজও বৈরাগীর অঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দেশব্যাপী অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে সামাজিক-গণ—শাস্ত্রের বিধানে নির্ভর করিয়া সমাজে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন করিবার অবসর লাভ করেন নাই। সেই জন্য সমাজে নানা সংস্কার কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। এই সময় সেদিকেও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি পতিত হয় এবং তাঁহারা সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। নানাদিকে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় যেমন এদেশের লোকের মধ্যে প্রতীচ্য চিকিৎসাপদ্ধতির আদর বর্দ্ধিত হয়, তেমনি আবার কিছুদিনের মধ্যেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতি আদর লাভ করে। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম এই চিকিৎসা-পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কলিকাতা বহুবাজারের দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রণী। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার পরবর্ত্তী।

সংস্কার বিষয়ে ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় প্রথমে আগ্রহা-তিশয্যে সমাজে বিশৃঙ্খলা আনিয়াছিলেন। নূতন ইংরাজী শিক্ষিত যে সম্প্রদায় "ইয়াং-বেঙ্গল" নামে পরিচিত ছিল, সে সম্প্রদায়ের যুবকরা প্রথমে সর্ব্ববিধ সংস্কারকে কুসংস্কার মনে করিয়া যে উগ্রভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর ধাতুসহ ছিল না বলিয়াই হয় নাই। তাঁহাদিগের এই উচ্ছৃঙ্খল চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ সমূহের মধ্যে হিন্দু-পরিবারে মহিলাদিগের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যিনি রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের পরিবেষ্টন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সমাজসংস্কারে অবহিত ছিলেন, সেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পরিণত বয়সে সমাজে নারীপ্রগতির পদ্ধতির প্রতিবাদ করিয়া হিন্দু মহিলাদিগের স্বাভাবিক ধীর, শান্ত, শুদ্ধ ভাবের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। হিন্দু-পরিবারে মহিলা-

দিগের প্রভাব কিরূপ প্রবল ছিল, তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—হিন্দু-পরিবারে পুরুষদিগের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সময় সময় নিন্দার অবসর

রামগোপাল ঘোষ।

পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু হিন্দু মহিলাদিগের সম্বন্ধে কেহ কখনও সেরূপ কোন ইঙ্গিত করিতে পারিতেন না। হিন্দু-পরিবারে স্বভাবতঃ রক্ষণশীল মহিলাদিগের এই প্রভাব যে পুরুষদিগের সংস্কারের আগ্রহজনিত উগ্রতা শান্ত করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

ইহার পর হিন্দু-সমাজ কালোপযোগী সংস্কারের জন্য শাস্ত্রের অনুমোদন সন্ধান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদন পাইয়া বিধবা-বিবাহ বিধিসম্মত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—তাহার পূর্ব্বে নহে। তিনি যেমন, যিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারকের পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সেই সার রমেশ চন্দ্র মিত্রও তেমনই শাস্ত্রানুমোদিত নহে বলিয়া সহবাস-সম্মতি আইন-প্রণয়নের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহারা কেহই সংস্কারবিরোধী ছিলেন না; কেবল সমাজের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সংস্কার-প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সেই অধ্যায় নব্য বঙ্গের গৌরবগরিমায় সমুজ্জ্বল। তখন বাঙ্গালীর প্রতিভা দিগ্বিজয় করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার পূর্ব্বে 'শব্দকল্পদ্রুম'-সঙ্কলনকারী রাজা রাধাকান্ত দেব কর্ম্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে প্রাচীন হিন্দুর আদর্শানুকরণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া যাইয়া বৃন্দাবনের রজে দেহরক্ষা করিয়াছেন, (১৯শে এপ্রিল, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ)। ব্যবসায়ী ও বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ তখন মৃত; (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে)। যে বৎসর রামগোপালের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরই প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব প্রসন্নকুমার ঠাকুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। বিচারকরূপে অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় প্রকট করিয়া দ্বারকানাথ মিত্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সার রমেশচন্দ্র মিত্র যোগ্যতা সহকারে তাঁহার স্থানে অবস্থিত। সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে (১৪ই জুন তারিখে) লোকান্তরিত হইয়াছেন—কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া জীবন শেষ করিয়াছেন। মধুসূদন দত্ত তাঁহার অমর অবদানে বাঙ্গালা সাহিত্যকে ধন্য করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তারিখে দুর্ভাগ্য দাবানলদগ্ধ জীবনের অবসানে শান্তিলাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্যে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার পূর্ব্বেই তিরোহিত হইয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর তখনও জীবিত, কিন্তু তখন তিনি দিকচক্রবালে দিনান্ত তপনের মত অবস্থান করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধেও প্রায় তাহাই বলা যায়। দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ও রামমোহন রায় বহুদিন পূর্ব্বেই লোকান্তরিত। কেশবচন্দ্র সেনও তখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ প্রচারকদিগের ধর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া স্বয়ং তিরোহিত (৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ)। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখন জরাজীর্ণ। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও জীবিত, কিন্তু বার্দ্ধক্য হেতু জীবন্মৃত বলিলেও বলা যায়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা এই সকল মনীষীর কার্য্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগেরই রচিত পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

তাঁহারা যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য অসাধারণ কিন্তু মুসলমান শাসনের শেষ দশায় দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা এবং ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তনের পর দেশে শান্তিস্থাপন—ইহার মধ্যবর্ত্তী কালে, বিশেষ ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার নূতনত্বের মোহে—এই সময়ে তাঁহারা যাহা হারাইয়াছিলেন, তাহাও উপেক্ষা করা যায় না।

সে সকলের মধ্যে "বৈষ্ণব পদের" উল্লেখ করিতে হয়। মহারাজা নন্দকুমারের গুরুদেবকে বাঙ্গালার শেষ পদকর্ত্তা বলিলে বলা যায়। যে বঙ্গদেশের কথা—"কানু বিনা গীত নাই", যে বঙ্গদেশ একদিন জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলী আদর করিয়া লইয়াছিল ও নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে তাহা শুনাইয়াছিল, যে বঙ্গদেশে চৈতন্যের সময় হইতে কীর্ত্তনের সুরে বাঙ্গালী তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাঁধিয়াছিল—সেই বঙ্গদেশে আর উল্লেখযোগ্য নূতন পদাবলী রচিত হয় না; আজ বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব বিদেশেও আদৃত এবং বাঙ্গালায় কীর্ত্তনের আদর ফিরিয়া আসিয়াছে—কিন্তু পদাবলী আর রচিত হয় না। দীর্ঘকাল অবজ্ঞাত থাকায় এবং পরীক্ষার ও গবেষণার অভাবে বৈষ্ণশাস্ত্রের উন্নতির গতি প্রহত হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি—বাঙ্গালার ভাববৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। আজ যে আর "পদ" রচিত হয় না—এই ভাববৈশিষ্ট্যহীনতাই তাহার কারণ। এই ভাববৈশিষ্ট্য কি, স্বল্প কথায় তাহা বুঝান যায় না—তাহা অনুভব করিতে হয়। যে বাঙ্গালীকে তাহা বুঝাইতে হয়, তিনি কি তাহা বুঝিতে পারিবেন? মনীষীরা তাহা অনুভব করিয়াছেন। সেই জন্যই পরিণত বয়সে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন,—

"এক দিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকাল প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীথিবিক্ষেপশালিনী মৃদু পবন হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গিচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়া ছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরাজী কবিতায় তাহা হইল না—ইংরাজীর সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না! কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

"মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

'সাধো আছে, মা, মনে—
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী জীবনে।'

"তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

"সেইরূপ আজিকার দিনের অভিনব-উন্নতির পথে সদারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধহয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালা কথায় খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি।"

যাহা যায় তাহা কালোপযোগী নহে বলিয়াই যায়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি

জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্ব্বণ' চাই না!"

কিন্তু না চাহিলেও পরিচিত পুরাতনের প্রতি যে আকর্ষণ, যে মমত্ববোধ—তাহা কি ত্যাগ করা যায়? রাজনীতিক্ষেত্রে যে কুশাগ্রবুদ্ধি ভূপেন্দ্রনাথ বসু বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, যিনি রাজনীতিক কারণে পরিণত বয়সে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিদেশে গিয়াছিলেন, তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেই লণ্ডন হইতে

মতিলাল ঘোষ।

আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—"আমার পক্ষে এই অসংখ্য লোকসমাকীর্ণ নাট্যশালার মত সতত উজ্জ্বলিত আমোদ-পূর্ণ দেশে বাস বনবাস হইতে অধিক দূরে নহে।" তিনি সেই বিদেশ হইতে লিখিয়াছিলেন—"যদি অধ্যাত্ম প্রাণ থাকে, তবে আমি দেশেই আছি।" আর সেই জন্যই "আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষ পার্ব্বণ' চাহি না"—বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন;—

"কিন্তু তবুও বাঙ্গালীর মনে 'পৌষ-পার্ব্বণে' যে একটা সুখ আছে, 'বৃত্র-সংহারে' তাহা নাই; পিঠা-পুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধরপ্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না, দেশশুদ্ধ জোন্স গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে হইবে। যাহা মা'র প্রসাদ তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে।"

সেই জন্যই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের পরিবেষ্টনে পুষ্ট মনোভাব লইয়া যাহা গিয়াছে তাহার জন্য যদি আক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে, আশা করি, সেজন্য বিদ্রূপের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইব না। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে অনাচারে ক্লৈব্য সঞ্চার করিয়া পার্থসারথী যেমন অর্জ্জুনের রথ-চালনা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর মনীষা ভারতের উন্নতির জয়-রথে সারথী হইয়া তেমনই সে রথ পরিচালিত করুক। যাহার অবসান অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, তাহার জন্য মমত্ববোধ যদি সেই রথচক্রের আবর্ত্তনে পিষ্ট ও নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যেন সেই উন্নতি-রথের অশ্ববল্গা ত্যাগ করিয়া তাহা অন্যের হস্তে প্রদান না করেন। যদি কোন দিন আপনার হস্ত দুর্ব্বল বলিয়া বাঙ্গালীর সন্দেহ হয়, তবে যেন তিনি পঞ্চাশ বৎসরেরও পূর্ব্বে বাঙ্গালীর রচনা মাতৃপূজার মন্ত্র উচ্চারণ করেন—যে জননী "বহুবলধারিণী" ও "রিপুদলবারিণী" তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ভক্তিভরে যুক্তকরে বলেন:

বাহুতে তুমি, মা, শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা', ভক্তি;
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমলদল বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম অমলাং অতুলাম
সুজলাম সুফলাম মাতরম
বন্দে মাতরম।"

মানুষের পূর্ব্বপুরুষ

ঃ বন-মানুষের কথা

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

চিড়িয়াখানায় গেলে ছেলেদের সব চেয়ে ভীড় বোধহয় দেখা যায় ওরাংওটাং-এর আস্তানার কাছে। এমন মজার জানোয়ার আর নেই। সার্কাসের পেশাদার ভাঁড়কেও তারা দু'চারটে কায়দা বোধহয় শিখিয়ে দিতে পারে। বুড়ো মানুষের মত গম্ভীর মুখে তারা সারাদিন যে সব মজার কাণ্ড করে, তাতে হাসি চেপে রাখা অত্যন্ত শক্ত। মানুষের চেহারার সঙ্গে তাদের মিল আছে বলেই তাদের খেলায় এত বেশী আমোদ পাওয়া যায়। বাঁকা বাঁকা পায়ে টলমল করে ঘুরে ফিরে তারা যখন নানা অদ্ভুত মজা করে, তখন মনে হয় কোন মানুষই যেন এমনি করে সেজে সকলকে হাসাবার চেষ্টা করছে।

মানুষের সঙ্গে তাদের এই মিলের জন্যই ওরাংওটাং-এর নাম বন-মানুষ দেওয়া হয়েছে। বন-মানুষকে সাধারণতঃ বানর বলে মনে হলেও তারা সগোত্র নয়। বন-মানুষ আর বানরে যে তফাৎ আছে তা একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যায়। বন-মানুষের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাদের লেজ নেই, বানরের মত। শুধু লেজের অভাব নয়, আরো অনেক পার্থক্য আছে। মানুষের মত আকার হলেও বানরেরা সাধারণতঃ চার হাত-পায়ে চলা-ফেরা করে। কিন্তু বন-মানুষ চলা-ফেরার জন্যে এক সঙ্গে হাত-পা ব্যবহার করে না; তারা শুধু পায়ের উপর ভর দিয়ে চলতে পারে।

যাদের 'উকু' বলা হয় চিড়িয়াখানায় সেই 'গীবন' জাতীয় বন-মানুষের খাঁচার কাছে গেলেই তাদের এই বিশেষত্ব বুঝতে পারা যাবে।

'উকু' আর ওরাংওটাং ছাড়া পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত আরও দু'জাতের বন-মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। শিম্পাঞ্জি এবং গরিলা; এরাও বন-মানুষেরই দুটি শ্রেণী।

উকু বা গীবন আর ওরাংওটাং আমাদের এদিকেরই বাসিন্দা। বর্ম্মা ও মালয়ের জঙ্গলে, বোর্ণিওতে, জাভায় ও সুমাত্রায় গীবন দেখা যায়। বন-মানুষদের ভিতর এরাই সব চেয়ে আকারে ছোট। সব চেয়ে বড় জাতের গীবনও ওজনে পোনেরো সেরের বেশী হয় না। কিন্তু ছোট হলেও সমস্ত বন-মানুষের ভিতর সাধারণতঃ সোজা হয়ে এই জাতির বন-মানুষই হাঁটে। ছোট বড় প্রায় দশ রকমের গীবনের খবর পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় জাতের নাম হল সিয়ামাং। মালয়ের দক্ষিণ আর সুমাত্রায় এদের বাস। গীবনের মত এমন চটপটে চঞ্চল জানোয়ার আর কিছু নেই। জঙ্গলের ঘন গাছপালার মধ্যে বিদ্যুতের মত তারা ডাল থেকে ডালে দোল খেয়ে লাফিয়ে বেড়াতে পারে। হাতগুলি এদের অসম্ভব রকম লম্বা, আর জোরও অসাধারণ। জঙ্গলের

বামপার্শ্ব হইতে পর পর গীবন, ওরাং, শিম্পাঞ্জি, গরিলা ও মানুষের কঙ্কাল।

তারা সব চেয়ে ওস্তাদ খেলোয়াড়, একলাফে ২৬, ২৭ হাত পার হয়ে যাওয়া তাদের কাছে এমন কিছু একটা শক্ত কাজ নয়

যবদ্বীপের রজতবর্ণ গীবন।

গীবন যেমন চটপটে ও চঞ্চল, ওরাংওটাং তেমনি গম্ভীর। চেহারায় যেমন বুড়ো মানুষের মত, কাজেও তারা তেমনি। দৌড়-ঝাঁপ ছুটাছুটি তাদের ধাতে নেই। তারা বেশীর ভাগ গাছে থাকে, মাটিতে নামে কদাচিৎ। বন-মানুষের ভিতর ওরাংরাই সব চেয়ে নিরীহ শান্ত।

বোর্ণিওর পশ্চিমে আর সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিমের ঘন জঙ্গলেই ওরাংওটাং-এর বাস। সবশুদ্ধ এই দুই জঙ্গলে হাজার চল্লিশ ওরাং আছে কিনা তাও সন্দেহ। এ সংখ্যাও ক্রমশঃ কমে আসছে।

জন্মাবার সময় ওরাং-এর বাচ্চার ওজন মানবশিশুর ওজনের তিন ভাগের এক ভাগ থাকে মাত্র, কিন্তু ধাড়ী ওরাং ওজনে আড়াই মণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। চোদ্দ বৎসরে ওরাং জোয়ান হয়ে ওঠে, বাঁচে চল্লিশের কিছু বেশী। বুড়ো মদ্দা ওরাং দেখলেই চেনা যায়। তাদের গলার দুধারে থলির মত মাংসের এক রকম পুঁটুলি হয়।

ওরাংরা গাছের উপর ডাল-পালা দিয়ে মাচা তৈয়ারী করে শোয়ার জন্যে। শিম্পাঞ্জি ও গরিলার মত এদের শোয়ার অভ্যাস মানুষের মত। দাঁড়িয়ে বা বসে অন্য জানোয়ারের মত এরা ঘুমোতে পারে না।

মাচা তৈরীতে ওরাংরা অত্যন্ত পটু। একবার লণ্ডনের চিড়িয়াখানা থেকে একটি ধাড়ী ওরাং কোন রকমে পালিয়ে যায়। আধ ঘণ্টা বাদে তার খোঁজ যখন পাওয়া গেল তখন দেখা গেল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই কাছের একটি গাছে সে বেশ একটি মজবুত মাচা তৈরী করে তার উপর বসে আছে।

গীবন এবং ওরাং ছাড়া পৃথিবীর আর দু'জাতের বন-মানুষের বাস আফ্রিকায়। বিষুব-রেখাকে অনুসরণ করে পশ্চিমের সিয়েরা লিয়োন থেকে পূর্ব্বের হ্রদ-প্রদেশ পর্য্যন্ত আফ্রিকায় একটি গহন দুর্ভেদ্য অরণ্য বিস্তৃত। এ অরণ্য প্রায় তিন হাজার মাইল লম্বা ও স্থান-বিশেষে তিন শত থেকে আট শত মাইল চওড়া। সভ্য মানুষ এই গভীর অরণ্যের সব রহস্য এখনও জানতে পারে নি। এই অরণ্যই গরিলা ও শিম্পাঞ্জির বাস-স্থান। আয়তনে এই অরণ্য সমস্ত ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী হলেও তাতে সবশুদ্ধ সওয়া লক্ষের বেশী শিম্পাঞ্জি নেই বলে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন।

শিম্পাঞ্জির অবসর-যাপনের সঙ্গী।

শিম্পাঞ্জিরা এক একটি পরিবার একত্র হয়ে এক সঙ্গে বাস করে। নানা বয়সের পুরুষ মেয়ে মিলিয়ে বারো থেকে চল্লিশটি শিম্পাঞ্জিকে এক পরিবারে দেখা যায়।

শিম্পাঞ্জিকে বন-মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান বলা হয়। অত্যন্ত সহজে মানুষের পোষ মেনে মানুষের চাল-চলনের অনুকরণ করতে তার জুড়ি নেই। শিক্ষিত শিম্পাঞ্জিদের মানুষের মত নানা বুদ্ধির কাজ করার কথা আমরা জানি।

মস্তিষ্কের ওজন থেকে শিম্পাঞ্জির এ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। গরিলা ও ওরাং-এর আকার ও মস্তিষ্কের ওজন শিম্পাঞ্জির চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু সে যাই হোক, শিম্পাঞ্জির মত এমন আমুদে স্ফূর্তিবাজ জানোয়ার আর নেই। ওরাং-এর তুলনায় সে ঢের বেশী চটপটে ও মিশুক বলে মানুষের কাছে তার আদর অনেক বেশী।

শিম্পাঞ্জি ওজনে প্রায় মানুষেরই সমান। দেড় মণ থেকে সওয়া দু' মণ সাধারণতঃ তাদের ভার। মাথায় কিন্তু সাড়ে চার ফুটের উঁচু তারা হয় না। শরীরের উপরের অংশের তুলনায় তাদের পায়ের দিক বেশ হ্রস্ব।

শিম্পাঞ্জির ছানাও ওরাং-এর মত জন্মাবস্থায় অত্যন্ত ছোট থাকে। প্রথম বছরখানেক মাতৃস্তন্যই তাদের একমাত্র আহার। মানুষের শিশুর মত তাদের ছ' মাসে প্রথম দাঁত ওঠে না, ওঠে দুই মাসেরই ভিতর। দুধে-দাঁত পড়ে গিয়ে মানুষের শিশুর আসল দাঁত উঠতে আরম্ভ হয় প্রায় দু' বছর বয়সে, কিন্তু শিম্পাঞ্জির নতুন দাঁত চার বছরেই উঠতে থাকে। শিম্পাঞ্জি ও মানুষের দাঁত সংখ্যায় ও বৈশিষ্ট্যে এক।

শিম্পাঞ্জি-বাচ্ছাকে বছর চারেকের হলেই স্বাধীনভাবে নিজের দায় নিজেকে সামলাতে হয়। পোনেরো বছর বয়সে সে জোয়ান হয়। ওরাং-এর মত চল্লিশ বছরেই সে বেশ বুড়ো হয়ে পড়ে, প্রায় সত্তর বছরের মানুষের সমান।

। হিসাবে পুরুষ-গরিলার তীক্ষ্ণ দাঁত ভয়ঙ্কর, এবং তাহার ক্রোধ পৈশাচিক।

বন-মানুষের ভিতর সব চেয়ে বৃহত্তম ও রহস্যময় হল গরিলা। অন্যান্য বন-মানুষের কথা সভ্য জগতে অনেক দিন আগেই কিছু কিছু জানা ছিল। কিন্তু গরিলা সেদিন পর্যান্ত একেবারে অজ্ঞাত ছিল। আফ্রিকার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের বিশাল বিভীষিকা রূপে এই প্রাণীটি অনেক আজগুবি গল্পের খেয়াল জুগিয়েছে। সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে গরিলা সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক কাহিনী শিকারী-রাও প্রচার করেছেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ স্যাভেজ নামে একজন মার্কিন পাদ্রী ফরাসীদের শাসনাধীন আফ্রিকায় গাবুন প্রদেশে পর্য্যটনের সময় গরিলার অস্তিত্ব প্রথম সভ্য জগতের গোচর করেন, কিন্তু গরিলা তখনও আজগুবি জানোয়ার বিশেষ। বিশাল আকার, তার বাসস্থানের দুর্গমতা সমস্ত মিলে তার চারিধারে এমন রহস্যজাল বিস্তার করে দিল যে, বন্দুক নিয়ে যে সমস্ত শিকারী তার সম্মুখীন হবার সাহস করে-ছিলেন তাঁরা প্রত্যক্ষ দেখবার সুযোগ পেয়েও তার সঠিক সংবাদ আনতে পারেন নি। নিজেদের অজ্ঞাতে তাঁদের বিবরণ সাধারণ কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে।

অবশ্য এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলবার আছে। বন্দুক হাতে লক্ষ্যভেদই করা সম্ভব, কিন্তু কোন প্রাণীর জীবন-

যাপনের রহস্য ভেদ তার দ্বারা করা যায় না। তার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজন।

ধীরে ধীরে আধুনিক কালের জীব-বিজ্ঞানবিদেরা সেই পদ্ধতির সার্থকতা উপলব্ধি করেছেন। নিরীহ বা হিংস্র কোন জানোয়ারকে আজকাল তাঁরা শুধু শীকার করতে বার হন না। দুর্ভেদ্য অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে সেই প্রাণী নিজের আবেষ্টনে কি ভাবে জীবনযাপন করে, তাই লক্ষ্য করাই এখন তাঁদের উদ্দেশ্য। এই ভাবেই তাঁরা আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের অনেক বিস্ময়কর তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গরিলাকে দেখবার চেষ্টা করেন প্রথম ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্যু চাইল্যু। তারপর অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নিজেদের জীবন নানাভাবে বিপন্ন করে বৈজ্ঞানিকেরা এই রহস্যময় অতিকায় প্রাণীটির সাধারণ অরণ্য-জীবন-যাত্রার অনেক কথা জানতে পেরেছেন।

গরিলা সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহের প্রধান বাধা এই যে, আফ্রিকার বিষুব-রেখার দুধারের অরণ্যের যে যে অংশে তারা বিচরণ করে, সে অংশের চেয়ে দুর্গম, অস্বাস্থ্যকর ভয়ঙ্কর স্থান পৃথিবীতে আর নেই বললেই হয়। আফ্রিকার অসভ্য অধিবাসীরাও সে সমস্ত স্থান এড়িয়ে চলে।

দেখতে যত ভীষণই হোক গরিলা কিন্তু সাধারণতঃ হিংস্র নয়। নেহাত উত্যক্ত না হলে সে আক্রমণ করে না। কিন্তু একবার সে ক্ষেপে গেলে আর রক্ষা নেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর চেয়ে সে তখন ভয়ঙ্কর। কি যে শক্তি তার বিশাল দেহে, অস্ত্র হিসাবে তার তীক্ষ্ণ দাঁত যে কি ভয়ঙ্কর, তার ক্রোধ যে কি পৈশাচিক তার পরিচয় তখনই পাওয়া যায়। তার পরিবারের কেউ বিপন্ন হলে গরিলা পালাতে জানে না। এ সময় তার প্রাণের ভয় একেবারেই থাকে না।

শিম্পাঞ্জির মত গরিলাও সপরিবারে বাস করে। কিন্তু তাদের পরিবারের লোকের সংখ্যা বেশী নয়। এক একটি পরিবারে আট দশটির বেশী থাকে না। বিশালকায় প্রবীণ একটি গরিলার নেতৃত্বেই সমস্ত পরিবার চলা-ফেরা করে। দু'একটি জোয়ান গরিলা এই নেতার সাকরেদী করে। ছোট ছোট বাচ্চা, তিন চারটি মেয়ে-গরিলা সমস্ত দলেই দেখা যায়। সারাদিন তারা আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় দল বেঁধে। বাঁশের নরম কোঁড়, নানারকম রসাল মূলই তাদের প্রধান খাদ্য। আহার সম্বন্ধে তাদের কোন রকম সৌখীনতা নেই। তাদের প্রয়োজন শুধু প্রচুর খাদ্যের। তারা আফ্রিকার অসভ্যদের চাষের জমিতেও

পৃথিবীর বৃহত্তম গরিলা : ইহার ওজন পাঁচ মণের বেশী। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মাঝে মাঝে হানা দেয় আহারের সন্ধানে। কলাগাছের কচি চারা ও আখ তাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। রাত্রে কোন গাছের তলায় ডাল-পালা বিছিয়ে ধাড়ী গরিলা তার শয্যা তৈয়ারী করে। পরিবারের অন্যান্য গরিলারা

বন্দী গরিলা স্বীয় অবস্থা বিষয়ে পূর্ণ সচেতন।

কাছাকাছি গাছের উপর মাচা তৈরী করে ঘুমোবার আয়োজন করে। অন্যান্য গরিলারা সে জায়গা থেকে বেশী দূরে কখনও যায় না।

বিশালতায় গরিলার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। সাধারণ একটি গরিলা ওজনে আড়াই থেকে তিন মণ পর্য্যন্ত হয়। বিখ্যাত শিকারী মিঃ বার্নস্ কিভু হ্রদের কাছে আগ্নেয়-পর্ব্বতের অরণ্যে সব চেয়ে বিশালকায় একটি পুরুষ গরিলা শীকার করেন। দশ জন বলিষ্ঠ, অসভ্য কাফ্রী সেটাকে বয়ে আনতে হায়রাণ হয়ে গিয়েছিল। তার ওজন ছিল পাঁচ মণের বেশী।

গরিলার দৈর্ঘ্য কিন্তু ওজনের তুলনায় খুব বেশী হয় না। পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ফুটই সাধারণতঃ তাদের দৈর্ঘ্যের সীমা। ছ' ফুট লম্বা গরিলা একরকম বিরল।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, গরিলা ও শিম্পাঞ্জি প্রাণী-জগতের একই মূল ধারার দুইটি শাখা। কোন সুদূর অতীতে এক ধারা থেকে বার হলেও তারা এখন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শরীরের বিশালতা ও শক্তিবৃদ্ধির দিকেই গরিলার বিবর্ত্তন হয়েছে। জোয়ান, পরিণতবয়স্ক একটি গরিলার কাছে আমাদের সব চেয়ে বড় পালোয়ানও নগণ্য। সাধারণ একটি গরিলা পাঁচজন বলিষ্ঠ মানুষকে কাবু করতে পারে।

শরীর বিশাল হয়ে পড়ার জন্যেই গরিলাকে গাছের ডালের স্বাভাবিক আশ্রয় ত্যাগ করে বেশীর ভাগ মাটির উপর কাল কাটাতে হয়। বড় বড় ধাড়ী গরিলার চলাফেরার পক্ষে কোন গাছের ডালই বিশেষ নিরাপদ নয়।

অন্যান্য বন-মানুষের মত গরিলা-শিশু জন্মায় অত্যন্ত ছোট হয়ে। মানুষের শিশুর প্রায় অর্দ্ধেক তার ওজন। শিশু গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে পার্থক্য বোঝা কঠিন। শুধু নাক আর দাঁতের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তাদের তফাৎ করা যায়। গরিলার নাকের ছিদ্র একটু বড়, নাকের ছিদ্রের ধারগুলিও অপেক্ষাকৃত উঁচু। নাকের সেই উঁচু-কাণা উপরের ঠোঁটের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। সেই গরিলার দাঁত কিন্তু সমস্ত বন-মানুষ থেকে একেবারে আলাদা। নীচের ও উপরের কুকুর-দাঁতগুলি তাদের যেমন বড়, তেমনি তীক্ষ্ণ। শিম্পাঞ্জির চেয়ে গরিলার কাণ অনেক ছোট, সেগুলি ছড়ানও নয়।

শিম্পাঞ্জির ছানার সঙ্গে গরিলার ছানার একই সময়ে দাঁত ওঠে, তারা সাবালকও একই বয়সে হয়। কিন্তু গরিলা বেড়ে ওঠে অনেক তাড়াতাড়ি। সাধারণতঃ গরিলার গায়ের লোম কালো, তাতে লালের আভাষ একটু পাওয়া যায়। বুড়ো গরিলার চুল মানুষের মত শাদা হতে দেখা যায়।

গরিলার সঙ্গে শিম্পাঞ্জির আর একটি তফাৎ প্রকৃতির দিক দিয়ে। শিম্পাঞ্জি যেমন আমুদে, গরিলা তেমনি গম্ভীর। বাচ্ছা গরিলাকে ধরে রেখেও দেখা গিয়েছে, তাদের ভিতর চঞ্চলতা নেই বললেই হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাদের চাল-চলন র, আত্মস্থ। সহজে সে মিশতে চায় না কারুর সঙ্গে।

গরিলাকে বুদ্ধিতে শিম্পাঞ্জির চেয়ে হীন বলে যে ধারণা করা হয়েছে অনেক বৈজ্ঞানিক তার প্রতিবাদ করেন এই বলে যে, শিম্পাঞ্জি মিশুক, সুতরাং তার বুদ্ধিবৃত্তি নিরূপণ করবার যে

সুবিধা আছে গরিলার বেলায় তা নেই। গরিলা বন্দী অবস্থায় যেন অপমানে একেবারে মুষড়ে থাকে। সহজে মানুষের অনুসন্ধানে সাড়া দেয় না। সেই জন্যেই তার বুদ্ধি সম্বন্ধে ভুল ধারণা গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। তা ছাড়া বন্দী অবস্থায় গরিলাকে বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত শক্ত। সভ্যতার সংস্পর্শে এলেই হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেশীর ভাগ যে রোগ তাদের কাল হয়ে দাঁড়ায় সে হল যক্ষ্মা।

তার নিজের দেশেও গরিলা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। সমস্ত আফ্রিকায় বর্ত্তমানে চল্লিশ হাজার গরিলাও আছে কি না সন্দেহ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্যু চাইল্যু চার বৎসর ধরে প্রায় আট হাজার মাইল গরিলার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু সে সময়েও সতেরোটির বেশী প্রাণী তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। তার পর থেকে তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছে ও হচ্ছে। মানুষের বসতি-বিস্তারের সঙ্গে জঙ্গল চারিধার দিয়ে যত সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে গরিলা প্রভৃতি প্রাণীর পক্ষে জীবন-সংগ্রামে টিঁকে থাকা ততই কঠিন হয়ে পড়ছে।

এখন বেলজিয়ান কঙ্গোতে গরিলা-শীকার আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। তাদের বিচরণক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট, সীমাবদ্ধ ও সুরক্ষিত। সেখানে বৈজ্ঞানিকেরাও এখন সরকারী অনুমতি ছাড়া যেতে পারেন না। কিন্তু তবু তাদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করা যাবে কি না সন্দেহ।

যুগান্তকাল ধরে যারা গহন অরণ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর ছিল লাঞ্ছিত হয়ে মানুষের অনুগ্রহে তারা যেন আর বাঁচতে চায় না।

শুধু গরিলা নয় বন-মানুষের সমস্ত জাতিই আজ নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছে। জীবজগতে মানুষের পূর্ব্বের ধাপের এই প্রাণীগুলি লুপ্ত হবার পর আমাদের সুদূর রহস্যময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার কোন সাক্ষী আর থাকবে না।

নববর্ষে জয়যাত্রা

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বন্দি তোরে নববর্ষে সৃজন-কল্যাণি,
আয় দেবজন্মে জ্বালি' স্বর্গদীপ খানি।
নরকের সূচীভেদ্য পাপ অন্ধকারে,
মগ্ন এই ধরাতল কাঁদে হাহাকারে—
যন্ত্রণায় নরনারী। হেথা সয়তান
রচিয়াছে নিজ ধাম, করি' অপমান
দেবতার সিংহাসনে ফেলি দিয়া দূরে,
দম্ভ দিয়া সম্ভোগের কামরাজ্য-পুরে
ঘুরাইছে দণ্ড তার। হোথা নারায়ণ
অনন্তশয্যায় র'ল নিদ্রায় মগন।
ভাঙ্গা তুই লীলাঘুম, জাগা নারায়ণে
তুই যে মা অনশ্বরা তোর পরশনে—
এ নশ্বরা ধরা হোক গোলোকের পথ,
আবার মানুষ মাগো হোক ভাগবত।

কবি আর ঋষিদল যুগ যুগ ধরি,
সেধেছিল তোরে দেবী এই মর্ত্ত 'পরি,
এনে দিতে মৃত্যুঞ্জয়ী নন্দনের সুধা,
তারা চেয়েছিল—হোক অমৃত বসুধা।

সাধনা ও সিদ্ধি দিয়া তোরে বশ করি'
এ নশ্বর জীবনের পানপাত্র ভরি'—
তারা পেয়েছিল সুধা। রোগজরা-হীন
অমৃতত্ব করি লাভ, বাঁচি দীর্ঘ দিন
স্বর্গরাজ্য রচেছিল এই মর্ত্ত-তলে,
কিন্তু মাগো পারে নাই মৃত্যুর কবলে—
রোধিতে এ জীবনের আনন্দ-উৎসব,
ঠেলি' তাই দু'দিনের হর্ষ কলরব,
আবার আসিল পাপ এল সয়তান,
রোগ-বিষে মৃত্যুসহ হল মূর্ত্তিমান।
তাই আজ ডাকি দেবি, এবার তা' নয়,
নাহি মাগি মিথ্যা দীর্ঘ জীবনের জয়।
চাহি না ক্ষণিক সুখ আনন্দ-কল্লোল,
একদা সমাপ্তি যার ভেঙ্গে দিবে দোল।
তাই যে মাগি না শুধু দেবজন্ম আর
ক্ষণিকে ফুরায়ে যায় যাহা বারবার।
চল দূরে—আরো দূরে—দেবজন্ম ছাড়ি,'
ঐশ্বর্য্যে দলিয়া দিই ভোগ-সিন্ধু পাড়ি।
রহিবে না যোগ আর বিয়োগের ভয়,
নবজন্ম-ভাগবত হবে সর্ব্বজয়।

বঙ্গ-রমণীর শরীরচর্চ্চা

—শ্রীকাঞ্চনমালিকা দেবী

দাদারা আর তাঁহাদের বন্ধুরা আমাদের বাড়ীর পিছন দিকের খোলা জায়গাটা বাঁশ ও দরমা দিয়া ঘিরিয়া খেলার মাঠ করিয়া লইয়াছিলেন। দাদাদের যেদিন খেলা থাকিত না, সেদিন পাড়ার মেয়েরা একত্র হইয়া এইখানে ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি করিত, আমি ছিলাম এই দলে। যেদিন দাদারা খেলিতেন, সেদিন খেলার মাঠে আমাদের ঢুকিতে তাঁহারা দিতেন না। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ঢুকিয়া পড়িত, গাঁট্টা বা থাবড়া খাইয়া কাঁদিয়া ফিরিতে হইত।

আমার বয়স তখন দশ। ছোটদাদা হঠাৎ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তুই আমাদের সঙ্গে মাঠে আসিস—খেলবি।

আমি, পাশের বাড়ীর অনিলা—দুইজনে আসিলাম। ছোটদাদা আমাদের দুই জনকে দুইটা নিকার-বোকার পরিতে দিলেন। মাঠের এক কোণে গোলপাতার একখানি কুঁড়ে-ঘর ছিল। ভোরবেলা দাদার দল ইহার মধ্যে লেংটি পরিয়া 'দঙ্গল' করিতেন; এই কুঁড়ে-ঘরটির ভিতরকার জমিটি খুঁড়িয়া, পাট করিয়া নরম করিয়া রাখা হইত; পা দিলে মনে হইত, তুলার উপরে পা দেওয়া হইয়াছে। এই ঘরে একটি বাঁশের আলনা ছিল। দাদারা জামা-কাপড় রাখিতেন। আমরা এই ঘরে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ পাইলাম।

আমাদের দুই জনের হাতে দুইখানি ছোট লাঠি দিয়া, ছোটদাদা নিজে একখানি বড় লাঠি লইলেন। আমাদের লাঠি খেলা শিখাইবেন। আমাদের খুব আনন্দ হইল, ভয়ও হইতেছিল। ভয় কম, আনন্দ বেশী। ছোটদাদা কৌশলগুলি একটির পর একটি দেখাইতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লাঠিগুলিকে ঘুরাইতে বলিলেন।

ঠিক মনে হইতেছে না, বোধ হয় পনেরো দিন পরে আমরা ছোটদাদার 'মার' ঠেকাইতে পারি। আরও কয়েকদিন গেল, ছোটদাদা আমাদের তৈরী করিয়া লইয়া বড়দাদাকে বলিলেন, এইবার তুমি এদের সঙ্গে খেল।

বড়দাদা পরখ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সেইদিন হইতে আমরা দাদাদের ক্লাবের মেম্বার হইলাম। খেলার পর, দাদারা যেমন পেস্তা-বাদামের সরবৎ খাইতেন, আমরা দু'জনেও রোজ এক গ্লাস সরবৎ পাইতে লাগিলাম। ছোট দাদা আমার ও অনিলার বাহুর পেশী এই সময় রোজ দু' তিনবার টিপিয়া টিপিয়া দেখিতেন বলিয়া মনে পড়ে।

একদিন দাদার এক বন্ধুর লাঠির ঘা আমার মাথায় পড়িল। দোষ আমার, ঠেকাইতে পারি নাই, মাথা কাটিয়া রক্তের নদী বহিয়া গেল। বড়দাদা, ছোটদাদা ও দাদার বন্ধুরা ঘরের জমির উপর শোয়াইয়া আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। একজন ছুটিয়া গিয়া ডাক্তার আনিলেন। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল। রক্ত বন্ধ আর হয় না। ডাক্তার ইঞ্জেকসান দিল, বলিল, কোন ভয় নাই।

ভয় নাই-ই বটে? দাদারা যেমন, আমিও তেমন তাহা বেশই বুঝিতেছিলাম। খানিক রাত্রি করিয়া অদ্ভুত মূর্ত্তিতে গৃহে ফিরিলাম। পরামর্শ হইল, সানে পড়িয়া যাওয়ার মাথায় চোট লাগিয়াছে বলিলে বিপদ অনেকখানি কম হইতে পারে। দাদারা সাক্ষ্য দিবেন, কাজেই এই কথা সকলেরই বিশ্বাস হইবে।

আমার পিতামহী তখন জীবিতা ছিলেন। আমার মাথায় রক্তমাখা পটি দেখিয়া তিনি "হাউ মাউ খাউ" করিয়া উঠিলেন। মা আসিয়া খানিকক্ষণ 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর কোন কথা না বলিয়া গুম্ গুম্ শব্দে আমার পৃষ্ঠে কিল-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঠাকুরমা আবার 'হাউ মাউ খাউ' করিয়া উঠিলেন। আগের বারে আমাকে 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' গালাগাল করিয়াছিলেন, এবারে মা'র শতেক-খোয়ার করিতে লাগিলেন। মেয়েটা মরিলে মা বাঁচেন, 'খেতে দিতে হয় না, পরতে দিতে হয় না, বিয়ের খরচ বেঁচে যায়' এই সব। প্রথম দফায় ঐ সব অনুযোগ, দ্বিতীয় দফায় যে অভিযোগ তাহা বিশেষ গুরুতর। ঠাকুরমা বাড়ীর কর্ত্রী, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পৌত্রীকে তাঁহার বিনা হুকুমে 'নির্দ্দয়' মারিবার স্পর্দ্ধা পরের মেয়ের কিরূপে হইতে পারে? পুনরায় এইরূপ ঘটনা ঘটিলে ঠাকুরমা সংসার ত্যাগ করিয়া যেদিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকে চলিয়া যাইবেন বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে টানিয়া লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন। মা যে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলেন নিঃশব্দে সেই ঘরে ঢুকিলেন। মা ভাল মানুষ বলিয়াও বটে, ঠাকুরমার অসীম প্রতাপ, আমার বাবা 'মা' বলিতে অজ্ঞান বলিয়াও বটে, মা'র মুখ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইল না। কেন বাহির হইল না, কোন দিন কেন বাহির হইত না, সে কথা আমি পরে বলিব।

ঠাকুরমা আঁচল দিয়া আমার মুখ, ঘাড়, হাত মুছাইয়া দেন আর কেবল বুকে পিঠে কপালে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করেন, জ্বর হইয়াছে কি না। জ্বর হয় নাই। জ্বর হইলে, অঘোর অচেতন হইয়া পড়িলে খুব ভাল হইত।

তাহা হইলে ভায়েদেরও বিপদ হইত না, আমার লাঞ্ছনারও একটা সীমা থাকিত। ঠাকুরমা আমাকে তাঁহার বিছানায় শুইতে বলিয়া নিজেও শুইলেন। শুইয়া সে কত আদর, কত যত্ন। হরিনামের ঝুলি হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দান করিলেন। আঘাতটা এমন কিছু নয়, দুই তিন দিনে সারিয়া যাইবে এই সব প্রবোধবাক্যে আমাকে ভুলাইয়া বলিলেন, বল ত দিদি, কি করে লাগল? আমি কাউকে বলব না! আর দেখ না, নসু বাড়ী আসুক, বেদম মারার মজাটা তোর মাকে দেখাচ্ছি আমি। নসু আমার বাবার নাম, নরেশ আদরে নসু হইয়া পড়িয়াছে।

আমার বয়স দশ, আমার ঠাকুরমার বয়স আশী। আট গুণ বেশী। বুদ্ধিও তিনি যে আট গুণ অধিক ধরিতেন, তা কি ছাই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম? দাদাদের পরামর্শ ভুলিয়া গেলাম। মা'র হাতের কিল ও চাপড়ের জ্বালায় পিঠ তখনও জ্বলিতেছিল; সেই মা'র শাস্তি হইবে, কাজেই ঠাকুরমার কাছে সত্য কথা বাহির করিয়া ফেলিলাম।

খানিক বাদে বাবা বাড়ী আসিয়া, শশব্যস্তভাবে ঠাকুরমার ঘরে ঢুকিলেন। ঠাকুরমা ধমক দিলেন, বলিলেন, যা যা তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুই মুখ হাত ধুয়ে খেতে যা।

বাবা সকাল দশটায় আফিস যান, ফিরিতে রাত ন'টা বাজে। আফিসে যে লোকটিকে দশ এগারো ঘণ্টা খাটিতে হয়, বাড়ীর কোন কাজে তাঁহাকে ব্যস্ত বা বিরক্ত করিতে ঠাকুরমার কড়া নিষেধ। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, আমাদের দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে মা' যদি বাবাকে কোন কথা বলিতেন আর তাই ঠাকুরমার কানে উঠিত, ঠাকুরমা অনর্থ করিতেন। তিনি মাকে বলিতেন, কাল থেকে বৌমা তুমি আফিস করতে বেরিও, নসু বাড়ীর কাজ দেখা-শুনো করবে। ঠাকুরমার কড়া শাসন এমন ছিল যে, ছেলেমেয়ের অসুখের সময় গভীর রাত্রে ঠাকুরমা না জানিতে পারেন, এই ভাবে বাবা চুপে-চুপে ছেলেমেয়ের খবর লইয়া যাইতেন। ডাক্তার ডাকাইতেন ঠাকুরমা; ঔষধ আনানো, খাওয়ানো, পথ্য দেওয়া সব কাজ ঠাকুরমা করিতেন ও করাইতেন। বাজার-হাট, চাকর-বাকরের মাহিনা, কুটুম-বাড়ীর তত্ত্বতালাস, বড় ও ছোট, দরকারী এবং অদরকারী সমস্ত কাজে ঠাকুরমা। বাড়ীতে কবে মিস্ত্রী লাগিবে, কজন লাগিবে, কত মণ চুণ, কতটা বিলাতী মাটী দরকার সে-সব হিসাব করিবেন ঠাকুরমা। আমার দিদির বিয়ের সময়ও মা বা বাবা একটি কথা বলিতে পারেন নাই। ঠাকুরমা কাহারও কথা সহিতে পারিতেন না, তাই ভয়ে কেহ কথা বলিতে আসিতে সাহসও করিত না। তারপর প্রায় কুড়ি বছর চলিয়া গিয়াছে, ঠাকুরমা অনেকদিন স্বর্গে গিয়াছেন। পৃথিবীর অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। এখন আমার বাপের বাড়ীতে বাবা, মা, দাদাদের বৌয়েরা সবাই কর্ত্তা ও কর্ত্রী। আমি কখনও কখনও চিন্তা করি, যদি আজও ঠাকুরমা বাঁচিয়া থাকিতেন, এই সব কুচো কর্ত্তা-কর্ত্রীদের কর্ত্তৃত্ব চলিত কেমন করিয়া? আমরা মেয়েরা, মাঝে-মিশালে বাপের বাড়ী গিয়া, আমরাও কর্ত্রী হইয়া দাঁড়াই, বাবা মা ভালমানুষ, দাদারা বৌদিদিরাও তাই, আমাদের কর্ত্তাগিরিতে কেহ বাধা দেন না। ঠাকুরমা থাকিলে, আমাদের দশাই বা কি হইত? চুরি না করিয়াও সকলকে চোর হইয়া থাকিতে হইত। আমার সমবয়স্কা ও আধুনিকা বধূরা কি দিদি-শাশুড়ীর এহেন প্রতাপ সহ্য করিতে পারেন? আমার বয়াত-গুণে দিদিশাশুড়ী, শাশুড়ী ছিলেন না, তাই, আমার মনের কথা আমার অজানাই রহিয়া গেল।

ঠাকুরমা পরের দিন দাদাদের লইয়া পড়িলেন। দাদারা নাতি, ঠাকুরমার সঙ্গে খিটিমিটি করিতে একটুও ভয় পায় না। বড়দাদা তখন এম-এ ও ল পড়িতেছে, ছোটদাদা বি-এতে গোল্ড-মেডালিষ্ট, ঠাকুরমার আদুরে। তাঁহারা বলিলেন, যে দিনকাল পড়েছে ঠাক্‌মা, শরীরচর্চ্চা করতেই হবে। দেহে বল থাকলে অনেক উপকার।

আমি চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। তর্ক চলিতে লাগিল।

—কি উপকার শুনি?

—নারীদের গায়ে জোর থাকলে নারীহরণ হবে না।

—হরণ গাছের ফল কি-না, হরণ অমনি হলেই হল আর কি!

—স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তাদের ছেলে-মেয়েরা হৃষ্টপুষ্ট হবে।

—থাম থাম। যা জানিসনে তাই নিয়ে কথা কসনে, মেয়েরা লাঠি খেললে, কুস্তি করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, কোন্ মুখপোড়া অলপ্পেয়ে বরাপুরে মাষ্টার একথা তোদের শিখিয়েছে? মুখে আগুন, তার মুখে আগুন।

—সব স্কুল-কলেজে মেয়েদের তবে শেখানো হচ্ছে কেন?

—মরণদশা আর কি! যেমন ছিরি-ছাঁদের ইস্কুল, তেমনি শেখানো! পোড়ারমুখোদের দেখা পাই ত, মুড়ো খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে দিই। খবর্দ্দার অনু, বিনু, ফের যদি ওসব কথা মুখে আনবি, ভাল হবে না বলে রাখছি।

এই 'ভাল হবে না' কথাগুলাই যথেষ্ট। দাদারা যত বিদ্বান, যত তার্কিক হোন না কেন, ইহার পরে কথা কহিতে সাহস কাহারও হইল না।

ঠাকুরমা বলিলেন, আবার যদি কোন দিন মেয়েদের নিয়ে যাবি ত মজা দেখতে পাবি। তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোকেও বলে রাখছি, মেয়ে-মদ্দানী করতে যাবি ত গলা টিপে শেষ ক'রে দোব। বামুন বদ্দির ঘরের মেয়ে, বনে কাঠ কুড়ুতেও যাবে না, মাঠে কোদাল পাড়তেও হবে না, মাথায় মোট নিয়ে হাটবাজারও করতে হবে না, গায়ে জোর করতে হবে বেটাছেলের মত কুস্তি করে, লাঠি খেলে? নিকুচি করেছে অমন জোরের!

এই ঘটনার পর অনেক দিন সব থমথমে হইয়া রহিল। আমি বেশ সারিয়া উঠিয়াছি, দুপুর বেলা স্কুলে যাই, বিকালে ছাদের উপর জল ডিঙ্গাডিঙ্গী খেলি, মাঠের পানে তাকাইবার হুকুম নাই, সে সাহসও আমার হয় না।

ঠাকুরমা অনেক দিন হইতে স্কুল ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত উদ্‌যাপনের দুইদিন আগে আমার স্কুল যাওয়া বন্ধ করিলেন। আমি কাঁদিয়া ভাসাইলাম। মা'র হাতে-পায়ে ধরিলাম। বাবার কাছেও কাঁদিলাম। দাদাদের কত করিয়া সাধিলাম। কিন্তু হুকুম নড়িল না।

কলিকাতার এই নিয়ম নাই,—আমাদের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে—পাড়াগাঁয়ে এই নিয়মটা খুব চলিত ছিল, এখনও একটু একটু আছে। তবে ক্রমেই

করিতেছে। বামুন বাড়ীতে কোন ভোজের আয়োজন হইলে গ্রামের ব্রাহ্মণীরা রান্না-বান্নার কাজ করিয়া থাকেন। বর্ষিয়সী, বিধবা ও ঝাড়া-হাত-পা (যাহাদের কোলে কচি-বাচা নাই) বধূরা পাকশালার অন্নপূর্ণা হন। এক একটি কাজে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না হয়, পায়স, পিঠা মিষ্টান্ন কত কি! গ্রাম্য ব্রাহ্মণ বধূরাই সমস্ত করেন। ঠাকুরমার সাবিত্রী-ব্রত উদ্‌যাপন হইয়া গেলে, ব্রাহ্মণভোজনের বিরাট আয়োজন হইয়াছে। আগের দিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে বসিয়া তরকারী কুটিয়াছি, পিঠে কোমরে বেদনা হইয়া রহিয়াছে, সকাল হইবামাত্র বাসি কাপড় ছাড়াইয়া ঠাকুরমা আমাকে শিলে বসাইয়া দিলেন। অনেক বাড়ীর বধূ শিলে বসিয়া বাটনা বাটিতে ছিলেন, তাঁহাদের অভ্যাস ছিল, নোড়া উঠাইতে আমার কান্না আসিয়া পড়িল। ঠাকুরমা সামনে বাঘের মত বসিয়া আছেন। বাবা সামনে দিয়া দুই একবার আনাগোনা করিলেন, কাতর চোখে তাঁহার পানে চাহিলাম, ঠাকুরমার মুখের দিকে চাহিয়া বাবা চোখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। মাও আসিলেন, কিন্তু আমার পানে চাহিলেনও না।

নির্য্যাতনের শেষ এই খানেই নয়। তৃতীয় প্রহর বেলায় গ্রামের মেয়েরা যখন খাইতে বসিলেন, ডাল-তরকারী পরিবেশনের ভার আমার উপরে পড়িল। এইবার মা খুব ভয়ে ভয়ে আর খুব আস্তে আস্তে প্রতিবাদ করিলেন, বলিলেন, মা, ছেলেমানুষ, ও কি পারবে? কাউকে দেবে, কাউকে দেবে না, কেউ পাবে কেউ পাবে না, কারও খাওয়া নষ্ট করে দেবে, কাজ নেই মা।

ঠাকুরমা খুব গম্ভীর হইয়া গেলেন। আমার সামনেই কথা হইতেছিল।

ঠাকুরমার সে সময়ের মুখ আষাঢ়ের আকাশের মত। সে মুখ দেখিয়া আমার যত না ভয় হইল, মা খুব ভয় পাইলেন। আর একটি কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, হুকুম নড়িবে না। ভয়ে আমার গা কাঁপিতে লাগিল। হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

বীণা মাসী অন্ন পরিবেশন করিতেছিলেন, ঠাকুরমা সুক্তর জামবাটি আমার হাতে তুলিয়া দিয়া আদর করিয়া বলিলেন, যাও ত দিদি, ভাতের কোলের কাছে একটু করে সুক্ত দিয়ে এস ত! বেশী নয়, সুক্ত লোকে বেশী খায় না, একটু একটু করে দেবে। সুক্তর বড়ি, ডাঁটা, কাঁচকলা সবই যেন পড়ে, তবে সামান্য সামান্য, বুঝলে ত?

মনে সাহস পাইয়াছিলাম, কিন্তু হাত পা কাঁপিতেছিল। তবু গেলাম। খুব সাবধানে, পা টিপিয়া টিপিয়া চলিলাম। যে দিকে চোখ পড়ে, কেবল শাদা মাথা (সকলের মাথাতেই শাড়ী) দেখি, আর মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দ হয়, ভয় হয় বুঝি পড়িয়া যাইব। ঠাকুরমা সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন, দাও দিদি দাও।

ভোক্তাদের বলিতেছেন, আমার দিদি কচি ছেলে, পরিবেশন করতে এসেছে, বৌমায়া দেখে-শুনে চেয়ে-চিন্তে নিও বাছা।

—ওকি দিদি, অতখানি তেতো কি কেউ খেতে পারে? কম করে দিতে হয় ভাই।

খুব কম করিলাম।

—তা বলে অত কম নয় দিদি! আর একটু দাও। এইবার ঠিক হয়েছে। ওগো তোমরা বাছারা আস্তে আস্তে খাও, নইলে দিদি আমার পেরে উঠবে না। এই যে, এইবার ঠিক হচ্ছে—এইত চাই।

ঠাকুরমা বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। মেয়েমানুষের এর চেয়ে পরিশ্রম, এর চেয়ে বড় শিক্ষা কি কিছু আছে? হাত পা মন সব বশ করতে হয়, এক করতে হয়, একটু অন্যমনস্ক হবার যো নেই। এতে দেহের মনের কতটা সংযম শিক্ষার দরকার হয় তা আজকালকার এল-এ, বি-এ পাশ করা মুখ-পোড়ারা কি জানবে?

সুক্ত পরিবেশন হইয়া গিয়াছিল, ঠাকুরমা আমাকে লইয়া আবার পাক-শালে চলিলেন। বড়ী ভাজা, পটল ভাজা, শাক ভাজা নন্দ দিদি দিয়া আসিয়াছেন, এই বার মোচার ঘণ্ট। মোচার ঘণ্টর মস্ত থালা আমার হাতে তুলিয়া দিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, যাও দিদি দিয়ে এস। আমি ততক্ষণ বালতীতে তোমার জন্যে ডাল তুলে রাখি।

এইরূপে একটির পর একটি করিয়া আমি ডাল, ডালনা, মাছভাজা, শেষকালে দধি পরিবেশন করিলাম। দুইদিন গা হাতে এমন ব্যথা হইয়া-ছিল, উঠিতে পারি নাই। এখন হইতে রোজ বাবার, ভায়েদের খাবার সময় ভাত হইতে দুধ মিষ্টি সমস্ত পরিবেশন আমাকে করিতে হয়।

পরিবেশনে হাত পাকিলে (কথাটা ঠাকুরমার) রান্নাঘরে আমার একাধিপত্য আসিয়া পড়িল। মা যদি লুকাইয়া-চুরাইয়া কোনদিন আসিয়া কিছুতে হাত দিয়াছেন, ঠাকুরমা চিলের মত আসিয়া হাজির। কিন্তু সত্য কথা একটা বলি। রান্না ভাল হইলে যখন কেহ প্রশংসা করিত, আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইতাম। বাবা আফিস্ হইতে আসিয়া রাত্রে পড়াইতেন, পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। ঠাকুরমা সারারাত বুকে চাপিয়া শুইয়া থাকিতেন। বলিতেন, সারাদিন খাটে খোটে, ঘুম আসবে না! মেয়েদের অন্ন পরিশ্রমে কি দরকার ভাই! সংসারের সব কাজ করলে শরীরে কখনো রোগ আসে? কথাটা সত্য!

বড় অসুখ, কৈ মনে পড়ে না ত!

[সমালোচনার্থে দুইখানি করিয়া পুস্তক প্রেরিতব্য]

মালিক অম্বর—(ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত)—[লেখ]কোর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, পি-এইচ-ডি; স্যর যদুনাথ সরকার, কে-টি, সি-আই-ই, এম-এ, পি-আর-এস, এম-আর-এ-এস, লিখিত ভূমিকাসহ, আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, প্রায় ২০০ পৃঃ। মূল্য ২৲ টাকা। প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা।

আলোচ্য পুস্তকখানি লেখকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পি. এচ. ডি'র থিসিস। মালিক অম্বর সম্বন্ধে সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে যত তথ্য পাওয়া যায় তৎসমূহ ও অন্যান্য অনেক আয়াসলব্ধ উপাদান সংগ্রহে এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত। তন্মধ্যে স্যর যদুনাথের পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত উপাদানই অধিক। গ্রন্থে সম্যক্ বিব্লিয়োগ্রাফী দেওয়া নাই। পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "চাঁদ বিবি" নাটকে ইহার মধ্যস্থ অনেক তথ্যই ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝা গেল, সুতরাং ১৫।২০ বৎসর পরে গ্রন্থকার যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যে-ভাবে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট আয়াস স্বীকারের প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে এবং স্যর যদুনাথ, পরলোকগত রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নিকট পরবর্ত্তী গবেষকগণকে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী থাকিতে হইবে। আকার হিসাবে পুস্তকের মূল্য অত্যধিক হইয়াছে বলিতে হইবে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধা চলনসই বলা যায়।

যে শাখে ফুল ফোটেনা—বাঙ্গালা উপন্যাস, ডঃ ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৩৯ পৃঃ। স্মল-পাইকা টাইপে ছাপা। কাপড়ে বাঁধাই। কাগজের জ্যাকেট আঁটা। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

উপন্যাসখানি অতি-আধুনিক শ্রেণীর। যে সমাজের চিত্র গ্রন্থকার আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সহিত উহাঁর কতটা ঘনিষ্ঠতা আছে জানি না, তবে সে সমাজে এমনধারা ব্যাপার কচিৎ ঘটে, নিত্য-নৈমিত্তিক নহে। ভাষার মধ্যে প্রাদেশিকতার প্রাদুর্ভাব—উহা ব্যাকরণানুগও নহে। অধিকন্তু আধুনিক ভঙ্গীতে অত্যধিক ফেনায়িত। বর্ত্তমান স্ত্রী-স্বাধীনতা ও প্রেমের আদর্শবাদের উপর পুস্তকের ঘটনার ভিত্তি, কিন্তু বাস্তব জগতের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কতটুকু? এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করিয়া সাহিত্যকে কোনদিন সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও গ্রন্থের মূল্য খুব বেশী নহে। গ্রন্থকারের ক্ষমতা আছে এবং তিনি উহার সদ্ব্যবহার করিলে একদিন হয়তো সাহিত্যকে দিবার মত কিছু পাইবেন, নতুবা এ শ্রেণীর উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই।

রোগ ও পথ্য—কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, কবি-শেখর প্রণীত এবং ১৯৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

পুস্তকখানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বহু রোগেরই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ, পরিচয় ও পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে উপদেশ থাকায়, ইহা নবীন চিকিৎসক ও গৃহস্থের যথেষ্ট উপকারে লাগিবে। এখন, প্রতিপদেই বিদেশজাত বোতলে-ভরা পথ্যের প্রচলন অত্যন্ত অধিক হইয়াছে এবং নবীন চিকিৎসকগণ এদেশের লোককে দেশীয় পথ্য ব্যবস্থা দিতে না জানায়, বহু অর্থ অকারণ বিদেশে যাইতেছে। এই পুস্তকের সহায়ে একটা বড় সমস্যার সমাধান হইবে। পুস্তকে (ক) ও (খ) পরিশিষ্ট অধ্যায় দুইটী চমৎকার। ইহা দেখিয়া নারীরাও রোগীর অবস্থানুযায়ী তাহার উপযোগী পথ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। আমাদের মনে হয়, এই পুস্তকে সর্ব্বপ্রকার পথ্য-রন্ধন প্রণালী একটু বিশদভাবে পৃথক অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিলে ইহার উপকারিতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে, কবিরাজ মহাশয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

পোড়ো জমি—আইভ্যান টুর্গেনিভ লিখিত Virgin Soil নামক বিখ্যাত উপন্যাসের বাঙ্গালা অনুবাদ। ডিমাই ১২ পেজী ২০৭ পৃঃ মূল্য ১।০। অনুবাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

প্রথমেই গ্রন্থকারের বন্ধু শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র লাল ধর ১২পৃঃ কবিতায় আইভান টুর্গেনিভের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানি কথাভাষায় লিখিত। তবে তাহাতে অতি-আধুনিক প্যাঁচ নাই, কাজেই ভাষা বেশ স্বচ্ছন্দ ও রচনাভঙ্গী সাবলীল বলা যাইতে পারে। অনুবাদে মূলের রস ক্ষুণ্ণ

হয় নাই। ছাপা কাগজ ও বাঁধাই চলনসই। একজন মুসলমান সাহিত্যিকের বাংলা সাহিত্যে এই দানটুকু বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগের গভীরত্বই প্রকাশ করে। আমাদের মনে হয়, লেখক ভবিষ্যতে কিছু নিজস্ব রচনা দান করিয়া বাংলা ভাষার উন্নতি সাধন করিবেন।

মৃত্যুর পশ্চাতে—কিশোরদের জন্য লিখিত উপন্যাস।

ইহাতে 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার' যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, সুতরাং কিশোরদের উন্মেষোন্মুখ মনের কৌতূহল নিবারণের উপযোগী। বাঙালীর ছেলেরা এখন পূর্ব্বের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে—আগে একমাত্র স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত যাহা কিছু সবই ছিল অপাঠ্য—এখন সে ভাবটা আর নাই। কাজেই শিশু ও কিশোরদের পাঠ্যপুস্তক বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হইতেছে, যদিচ তার সবগুলাই তাহাদের উপযোগী নহে—তন্মধ্যে অধিকাংশই "বুড়ো গাই শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে প্রবেশ করিয়াছে" বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য পুস্তকখানি ঠিক সে শ্রেণীভুক্ত নহে। পাছে আমরা বুড়ো মন ও চোখ দিয়া তাহার উপর কোন অবিচার করিয়া বসি, সেই জন্যই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া একটী সাহিত্যানুরাগী কিশোরকে পাঠ করিতে দিই। বালকটি মেধাবী এবং স্কুলের পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে বলিয়াই তাহার মত জানিবার কৌতূহল হয়। তাহার প্রদত্ত মন্তব্য নিম্নে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম। "ইহা ছোটদের পড়িবার পক্ষে একটি বেশ সুন্দর রোমাঞ্চকর পুস্তক। ইহাতে দুইটি তরুণ বাঙ্গালীর অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদেশীয়দের নিকট বাঙালীর ভীরুতার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই পুস্তকপাঠে মন হইতে সে অপবাদের দাগ মুছিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, কারণ এই গল্পের ভিতর দিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, এই জীবন্মৃত জাতির মধ্যেও বীর, সাহসী ও অকুতোভয় যুবকের অভাব নাই। পাঠকালীন ইহাতে মন এমনি নিবিষ্ট হইয়া পড়ে যে, ইহা সম্পূর্ণ শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। ইহার ভাষা সুললিত, সরল ও ছন্দায়িত।" যাহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত, তাহাদের এই মতের সমর্থন সর্ব্বান্তঃকরণে আমরাও করি।

স্বপ্নের মোহ—তিনটি বড় গল্পের সংগ্রহ। আকার ডবল ক্রাউন, ১৬২ পৃঃ। মোটা এ্যান্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা—বোর্ডে বাঁধান মূল্য ১৲ টাকা। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা। লেখক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু।

গল্প তিনটিই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। লেখকের ভাষা বেশ সহজ সরল অথচ গতিবিশিষ্ট—বক্তব্যকে কোথাও ভারাক্রান্ত করে নাই; ভাবকে ভাষার পাঁচে আচ্ছন্ন করে নাই। যে সমাজ ও স্থানের চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন সে সকলের সম্বন্ধে তাঁহার যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে তাহার বহু চিহ্ন রচনায় বিদ্যমান। গল্পের মধ্যে নিরাশ প্রেমের এমন একটি করুণ সুর বাজিয়া গিয়াছে যে, দরদী লোকমাত্রেই ইহার ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা সত্যকার প্রেমকাহিনীর অবস্থিতি অনুভব করিতে পারিবেন। নারী-প্রগতির উপরই রচিত এই গল্পগুলি বাংলা দেশের আধুনিক প্রগতিশালিনী তরুণীদের প্রেমের গল্পের চেয়ে যে কত স্বচ্ছন্দ ও শুদ্ধ, তাহা বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। বাঙলার নারীপ্রগতির গল্পে বিদেশী স্বৈরাচারের ছায়া চারিদিক দিয়া ফুটিয়া উঠে। প্রেমকে তাঁহারা পঙ্কে টানিয়া লইয়া যান এবং সেই পঙ্ক পাত্র-পাত্রীর গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া নিজেরা মুগ্ধ হইয়া যান। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ বোম্বাই নগরীর এই চিত্রে স্বাধীনা স্ত্রীর আচারব্যবহার যে কেমন মর্য্যাদাসম্পন্ন—(dignified) হয়, তাহা লেখক সুন্দরভাবে ফুটাইয়াছেন। বাঙালা সাহিত্যে তাঁহার মত লেখকের যথেষ্ট স্কোপ থাকা উচিত।

সনাতন ধর্ম্ম—অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। ৮৪নং বেচু চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৸০ দেড় টাকা।

গ্রন্থকার সূচনায় ধর্ম্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকৃতি ও প্রামাণ্য বিচার করিয়াছেন। উপক্রমণিকায় "সনাতন ধর্ম্ম" বলিতে গ্রন্থকার কি বুঝিয়াছেন তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা হিন্দু ধর্ম্মকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়াছেন। অতঃপর কয়েকটী পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম, বিশ্ব, কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, মুক্তি, চাতুর্ব্বর্ণ্য, চতুরাশ্রম, দশ সংস্কার, শ্রাদ্ধ, শৌচ, আচার, নারীধর্ম্ম এবং সাধনা ও উপাসনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। গ্রন্থখানি সুলিখিত। এরূপ গ্রন্থের বিচার-আলোচনা সম্বন্ধে মতভেদ স্বাভাবিক, তথাপি পাঠে আনন্দ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই ভাল। কিন্তু মূল্য একটু বেশী হইয়াছে। 'চাটার্জ্জী'তে আমাদের আপত্তি আছে। চাটুজ্জে কি দোষ করিল?

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও তাঁহার ধর্ম্মমত—শ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম, এ, পোঃ আঃ রাজনগর, গ্রাম মহাসহস্র, জিলা শ্রীহট্ট। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা আছে, কিন্তু তিনি সন্ধানী নহেন। আজিকালিকার দিনে যেরূপ বহুজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের ফলে এইরূপ একটী ধর্ম্মমতের আলোচনা চলিতে পারে, লেখকের তাহার বিশেষ অভাব। পল্লবগ্রাহীতা কি প্রশংসার কথা? তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহাও গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। লেখক ঋণ স্বীকার না করিয়াই কোন কোন গ্রন্থ হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল। একখানি শ' দেড়েক পাতার আ-বাঁধা বইএর দাম দেড় টাকা—অত্যন্ত অতিরিক্ত হইয়াছে।

—হরিচন্দন।

ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুঃখ কোন্ শ্রেণীর ও তাহার কারণ কি ?

মানুষের দুঃখের কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে দুঃখ কাহাকে বলে তাহা আগে স্থির করিয়া লইতে হয়।

মোটামুটি হিসাবে মানুষ যখন যাহা চাহে তাহা না পাইলেই দুঃখানুভব করে। মানুষ সাধারণতঃ যে যে বস্তু চাহে তাহা তিনটী কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে—যথা (১) দীর্ঘ জীবন, (২) দীর্ঘ যৌবন, এবং (৩) সর্ব্ব বিষয়ে অপরের তুলনায় স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব। এই তিনটীর কোন একটীর অভাব হইলেই মানুষ দুঃখানুভব করে।*

মানুষের এই ত্রিবিধ দুঃখকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—"কাল্পনিক" ও "বাস্তব"। সুস্থ ও সবল জীবনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াও অপরের তুলনায় কোন বিষয়ে কিছু কম আছে—এবংবিধ তুলনামূলক অভাবের জন্য মানুষ যে দুঃখানুভব করে, সেই দুঃখকে "কাল্পনিক" বলা যাইতে পারে। জীবনহানি স্বাস্থ্যনাশজনিত জন্য যে দুঃখ তাহা "বাস্তব"।

যখন দেশে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য জিনিষ প্রস্তুত করিবা উপযোগী জমিজাত দ্রব্য অপ্রচুর হয়, কোন্ দ্রব্য আহা ও ব্যবহার্য্য, তাহা নির্ব্বাচনে যখন ভ্রান্তি উপস্থিত হ কি করিয়া জমিজাত দ্রব্য হইতে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য জিনি প্রস্তুত করিতে হয় তৎসম্বন্ধীয় সহজ উপায় যখন মানুষে অপরিজ্ঞাত থাকে, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য জিনিষ আদান প্রদানের স্বাভাবিক সুব্যবস্থার পরিবর্ত্তে যখন অব্যব অবলম্বিত হয় এবং দেশের জল-হাওয়া যখন অস্বাস্থ্যক হয়—তখন সাধারণতঃ জাতির "বাস্তব" দুঃখের উদ্ভব হয় ব যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, নিজের দেশে জমিজাত দ্রব্য অপ্রচুর হইলে, অপরের দেশ হইতে আনয় করিয়া তাহার অভাব মোচন করা যায়, কিন্তু এই জাতীয় ধারণ ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃতির এমন নিয়ম যে, তিনি 'যেখানে য সাজে, তাই দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন। অপরের দেশে জমিজাত দ্রব্য জীবন-রক্ষায় আংশিক সহায়তা করিতে পা সত্য, কিন্তু নিজ জন্মভূমিজাত দ্রব্য মানুষের স্বাস্থ্যে পক্ষে যেরূপ সুসমঞ্জস এবং যৌবনের ও জীবনের যে পরিমা দৈর্ঘ্য-সম্পাদক, অন্য দেশোৎপন্ন দ্রব্য কখনও তদ্রূপ হইতে পারে না।

ইহার দৃষ্টান্ত, বর্ত্তমান জগতের সাধারণ মানুষের পরমায়ু দৈর্ঘ্য। বর্ত্তমান জগতে মানুষ ৭০।৮০ বৎসর পরমায়ু লাভ করিতে পারিলে যথেষ্ট আয়ু লব্ধ হইয়াছে মনে করেন, কিন্তু মানুষ কে মরে এই তত্ত্ব যখন উদ্ঘাটিত হইবে, তখন মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, ৭০।৮০ বৎসরের পরমায়ু মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে

---

* ভারতীয় ঋষিদিগের ভাষায় এই তিনটী অভাবজনিত দুঃখকে মানুষের "দ্রব্যজাত দুঃখ", "কর্ম্মজাত দুঃখ" এবং "গুণজাত দুঃখ" বলা যাইতে পারে।

সাংখ্যদর্শনে এই তিনটী দুঃখের উল্লেখ আছে; কিন্তু মূল দর্শনে উহাদের নাম নাই। ভাষ্যকারগণ এই তিনটী দুঃখের নাম করিয়াছিলেন—'আধ্যাত্মিক', 'আধিভৌতিক' এবং 'আধিদৈবিক'। 'আধ্যাত্মিক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে "আধ্যাত্মিক মানুষ" হইতে পারে বটে, কিন্তু "আধ্যাত্মিক দুঃখ" হইতে পারে না। পাণিনির মহাভাষ্যকারের নির্দ্দেশানুসারে "আধ্যাত্মিক দুঃখ" একটি অপশব্দ এবং আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। জগতের প্রত্যেক বস্তুর সত্তায় 'দ্রব্য', 'গুণ' এবং 'কর্ম্ম' এই তিনটী পদার্থ আছে। প্রত্যেক বস্তুর সুখদুঃখ যে এই তিনটী পদার্থজাত, তাহা নিজ নিজ জীবন পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুভব করা যায়।

এবং বিসদৃশ দ্রব্যের খাদ্য ও ব্যবহার্য্যরূপে ব্যবহারই অল্পায়ুর অন্যতম কারণ।

"কাল্পনিক দুঃখের" উদ্ভব হয় মানুষের নিজ অজ্ঞানতা হইতে।

প্রকৃত খাদ্য ও ব্যবহার্য্য কি কি, তাহা কি করিয়া উপার্জ্জন করিতে ও ব্যবহার করিতে হয় এই শিক্ষা এবং খাদ্য ও ব্যবহার্য্য উৎপন্ন করিবার ও তাহা আদান-প্রদান করিবার সুব্যবস্থা থাকিলে মানুষের "বাস্তব দুঃখের" কোন কারণ থাকে না। এক কথায় শিক্ষা ও অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা থাকিলে মানুষ "বাস্তব দুঃখের" হাত এড়াইতে পারে।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এবং স্ব স্ব জীবন লক্ষ্য করিলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বলিতে হয় যে, "বাস্তব দুঃখ" অপেক্ষা মানুষের "কাল্পনিক দুঃখই" বেশী। "বাস্তব দুঃখ" না থাকিলেও মানুষ "কাল্পনিক দুঃখের" যাতনা অনুভব করে; আবার "বাস্তব দুঃখ" থাকিলেও তাহার জন্য সমধিক যাতনা অনুভব না করিয়া "কাল্পনিক দুঃখের" জন্য অধিকতর যন্ত্রণা অনুভব করে। প্রায়শঃই দেখা যায় যে, হয়ত তিল তিল করিয়া মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াও কি করিয়া অপরের তুলনায় স্বীয় 'বড়'-ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার জন্যই মানুষ অহরহ বিব্রত। 'ছোট'-ত্বের জন্য এই যে দুঃখ ইহারই নাম "কাল্পনিক দুঃখ"। "কাল্পনিক দুঃখের" হাত এড়াইবার উপায়ও এক জাতীয় শিক্ষা, তাহা "বাস্তব দুঃখ" দূর করিবার শিক্ষা হইতে পৃথক্।

"কাল্পনিক দুঃখের" দায়িত্ব মানুষের নিজের আর "বাস্তব দুঃখের" দায়িত্ব নিজের ছাড়া সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার।

মানুষের তিনটী দুঃখ কি কি, কাল্পনিক ও বাস্তব দুঃখ কাহাকে বলে, দুই শ্রেণীর দুঃখের উদ্ভব হয় কেন, দুঃখ দূর করিবার উপায় কি কি, বিবিধ দুঃখের জন্য নিজ নিজ দায়িত্ব কতখানি—এই পাঁচটী তত্ত্ব জানা থাকিলে জাতীয় দুঃখের কারণ কি তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুঃখ কোন্ শ্রেণীর এবং দুঃখের কারণ কি তাহার অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে দেখা যাক, ভারতবাসীর দুঃখ "কাল্পনিক" কিংবা "বাস্তব"। এই উদ্দেশ্যে আমরা ভারতবর্ষের গত একশত বৎসরের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিব।

গত ৩০ বৎসরের লোক-গণনার হিসাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবাসীর যৌবন এবং পরমায়ুর দৈর্ঘ্য ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। এই ৩০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবাসীর জীবন ও যৌবনের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ভারতের লোকের পরমায়ু ও কার্য্যশক্তি যে এক সময়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল এবং ক্রমেই তাহা কমিয়া আসিতেছে, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কতদিন হইতে এই হ্রাস আরম্ভ হইয়াছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব না হইলেও, গত একশত বৎসরের মধ্যে যে ইহার কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই, পক্ষান্তরে গত ৩০ বৎসর হইতে পতন যে অতি দ্রুতগতিতে চলিতেছে, তাহা নিশ্চিত ভাবে অনুমান করা যাইতে পারে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, ভারতে "বাস্তব দুঃখ" বর্ত্তমান, তাহার উদ্ভব হইয়াছে বহুদিন পূর্ব্বে, অন্ততঃ গত একশত বৎসর কাল পূর্ণভাবে তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোন জাতির "কাল্পনিক দুঃখ" আছে কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ঐ জাতি শিক্ষা ও অন্নসংস্থানোদ্দেশ্যমূলক কার্য্য ছাড়া অপরের তুলনায় স্বকীয় 'বড়'-ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কার্য্য করিতেছে কিনা তাহা পর্য্যালোচনা করিতে হয়। কাজেই আমাদিগকে গত একশত বৎসর ভারতবাসী জাতি হিসাবে কি কার্য্য করিয়া আসিতেছে তাহারও আলোচনা করিতে হইবে।

১৮২৩ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত কিছু আন্দোলন হইয়াছে, তাহা চারি ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা,—

(১) সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলন,
(২) স্বাধীনতা লাভ করিবার আন্দোলন,
(৩) শিল্প-বাণিজ্যোদ্ধার করিবার ও টাকার অভাব দূর করিবার আন্দোলন,
(৪) লোকাধিক্য নিবারণ করিবার আন্দোলন।

সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন আমাদের ভক্তিভাজন রাজা রামমোহন রায়। এই আন্দোলনের মূলে ভারতবাসীর জীবন ও যৌবনের দৈর্ঘ্যের পতন

অবরোধ করিবার কোন চেষ্টা ছিল কি না তাহা সঠিক জানিবার উপায় না থাকিলেও, কার্য্যতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসীর জীবন ও যৌবনের হ্রাস হইতেছে, তখন বলা যাইতে পারে যে, এই আন্দোলন ভারতবাসীর "বাস্তব দুঃখ" নিবারণে কোন সহায়তা করিতে পারে নাই। এই আন্দোলনের ফলে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার, বাল্যবিবাহ প্রথার পরিবর্ত্তন, বিধবাবিবাহের প্রচলন, স্ত্রীজাতির অবরোধ-প্রথার পরিবর্ত্তন, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা যায়। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যে এই পরিবর্ত্তনগুলি সাধন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা সঠিক বুঝা যায় না। কেবল মাত্র বলিতে হয় যে, ইংরাজের অনুকরণে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। অথচ যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংরাজদিগের নিজেদিগের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে "বাস্তব দুঃখ" বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন বলিতে হইবে, ভারতবাসী ইংরাজের একটা "কাল্পনিক" 'বড়'-ত্বের তুলনায় নিজদিগকে 'ছোট' কল্পনা করিয়া "কাল্পনিক দুঃখ" অনুভব করিতে এবং তাহারই নিবারণের জন্য পরিশ্রম আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখনকার ভারতবাসী তাঁহাদের "বাস্তব দুঃখের" অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারেন নাই এবং তাহা নিবারণ করিবার জন্য কোন কার্য্যই করেন নাই।

এই সমাজসংস্কারের কার্য্য এখনও মহাত্মা গান্ধী 'অস্পৃশ্যতা নিবারণের আন্দোলন' নামে চালাইতেছেন। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে অস্পৃশ্যতা নাই সেই সমস্ত দেশে যখন "বাস্তব দুঃখ" পূর্ণভাবে বিরাজিত দেখা যায়, তখন অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে পারিলে ভারতবাসীর "বাস্তব দুঃখ" দূরীভূত হইবে ইহা বলাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অস্পৃশ্যতানিবারণের আন্দোলনকেও "কাল্পনিক দুঃখ" দূর করিবার প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে।

স্বাধীনতা লাভ করিবার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে। বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, ভারতের অর্থনৈতিক অভাব দূর করা কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান আন্দোলনও "কাল্পনিক" দুঃখানুভূতির অন্যতম পরিচয়। 'স্বাধীন জাতি পরাধীন জাতির উপর প্রভুত্ব করে', 'পরাধীন থাকিলে স্বাধীন জাতির তুলনায় ছোট হইতে হয়' এবংবিধ চিন্তার ফলে ভারতবাসী নিজেদিগকে "ছোট" মনে করিতে আরম্ভ করিয়া দুঃখানুভব করিতেছে, অথচ যে সমস্ত দেশ স্বাধীন সে সমস্ত দেশেও "বাস্তব দুঃখ" বিদ্যমান, ইহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছেন না। স্বাধীনতা লাভ করিলেও যে বেকার ও অন্নাভাব থাকিতে পারে তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না।

মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, অন্য কোন জাতির সাহায্য ব্যতিরেকে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের ব্যবস্থা অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনয়ন করে না তাহা কখনই আকাঙ্ক্ষণীয় হইতে পারে না। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিগুলি ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের সকলেরই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কাহারও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই। তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে কোন জাতির আকাঙ্ক্ষণীয় নহে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা প্রত্যেকেই এসিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার মোহাচ্ছন্নতার সহায়তা লইয়া নিজেদের অভাব পূরণ করিয়া আসিতেছিলেন—ইউনাইটেড ষ্টেটস-এর এবং জাপানের সামান্য মাত্র জাগরণে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। যদি সত্য সত্যই সমস্ত এসিয়া খণ্ডে এবং আমেরিকা খণ্ডে জাগরণ সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইউরোপের কি অবস্থা হইতে পারে তাহা আমাদের পাঠকগণ চিন্তা করিতে চেষ্টা করিবেন কি?

কাজেই, ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকেও "বাস্তব দুঃখ" দূরীভূত করিবার আন্দোলন বলা যাইতে পারে না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের কিছুদিন পরেই শিল্প-বাণিজ্যোদ্ধার করিবার ও টাকার অভাব দূর করিবার আন্দোলন সূচিত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের যতকিছু পরিকল্পনা তাহা সমস্তই ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে। অথচ ইউরোপীয়গণ শিল্প-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদের বাস্তব দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। ইউরোপীয়দিগের অর্থনীতির মূলসূত্র ধাতু-নির্ম্মিত "টাকা"-র বৃদ্ধি করা। তদুদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কি করিয়া

বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট। বিক্রেতা হিসাবে সর্ব্বদাই তাঁহারা দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিবার জন্য আগ্রহান্বিত। অথচ ক্রেতা হিসাবে যাহাতে সমস্ত আহার্য্য এবং ব্যবহার্য্য সুলভ হয়, মানুষ সর্ব্বদাই তাহা কামনা করেন। একই মানুষ বিক্রেতা হিসাবে দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধি যাচ্ঞা করেন, আবার ক্রেতা হিসাবে দ্রব্যের মূল্যহ্রাস কামনা করেন। ইহার ফলে সংঘর্ষ এবং অশান্তি হওয়া কি অস্বাভাবিক? প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয় যে, কি করিয়া মানুষের জীবন সহজ ও সরল হইতে পারে তদ্বিষয়ে প্রকৃতিদেবী সর্ব্বদা সচেষ্ট ও সজাগ। শিল্প ও বাণিজ্যের নামে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি করা এবং মানুষের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য অসুলভ করিয়া তোলা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য নহে? যদি ইউরোপে কখনও প্রকৃতির খেলা বুঝিবার উপযোগী কোন মনীষীর আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, শিল্প-বাণিজ্য দ্বারা অর্থো-পার্জ্জনের নামে মানুষের আহার্য্য এবং ব্যবহার্য্যকে অ-সুলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টাই ইউরোপের বর্ত্তমান অশান্তির একমাত্র কারণ। যে মুহূর্ত্তে ইউরোপ তাহার বর্ত্তমান অর্থনীতির পরি-বর্ত্তন করিয়া জিনিষের মূল্য হ্রাস করিবার প্রয়াসী হইবেন, সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের নিজের অশান্তি ত' দূর হইবেই, পরন্তু সমগ্র জগৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিবে।

এই জাতীয় সমৃদ্ধি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে কখনও "বাস্তব দুঃখ" দূর করিবার চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। পরন্তু তাহাকে "কাল্পনিক" দুঃখানুভূতির অন্যতম পরিচয় বলিতে হইবে।

লোকাধিক্য নিবারণ করিবার আন্দোলন ভারতবর্ষে অতীব আধুনিক। লোকজনন-নিরোধ-প্রথা প্রচলনের প্রচেষ্টা ইহার পরিচায়ক। কি উদ্দেশ্যে, কে এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। তবে এই আন্দোলনও যে ইউরোপীয়দিগের অনুকরণে আরম্ভ হইয়াছে এবং অত্যন্ত ভ্রান্ত হইয়া সার্ ফিরোজ শেথনা প্রমুখ চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ পর্য্যন্ত ইহাতে যোগদান করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। জনন প্রকৃতির নিয়ম। তাহার নিরোধ-চেষ্টা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য। প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য কখনও মঙ্গলজনক হয় না, ইহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সত্য। "ধনবল ও জনবল" ভারতবাসীর চিরন্তন সমৃদ্ধিবাচক বাক্য। স্মরণাতীত কাল হইতে কাহারও সমৃদ্ধির কথা বলিতে হইলে ভারতবাসী ধনবল ও জনবলের কথা বলিয়া আসিতেছে। কি উপায়ে "ধনবল" বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা আজ ভারতবাসী বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়া, "জনবল" ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে কখনও "বাস্তব দুঃখ" দূরীভূত হইবে না।

এই আন্দোলনকেও "কাল্পনিক" দুঃখানুভূতির অভিব্যক্তি বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষের গত একশত বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা হইতে বলিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষে "বাস্তব দুঃখ" পূর্ণভাবে বিরাজিত থাকা সত্ত্বেও এই একশত বৎসর ভারতবাসী যাহা কিছু করিয়াছে তাহা সমস্তই "কাল্পনিক দুঃখ" নিবারণের জন্য।

কাজেই ভারতবাসীর বর্ত্তমান দুঃখের কারণ কি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, এতাবৎ ভারতবাসী তাহার "বাস্তব দুঃখ" সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারে নাই এবং তাহা মোচন করিবার জন্য প্রকৃত কোন চেষ্টাই করেন নাই। অধিকন্তু "কাল্পনিক দুঃখ" মোচন করিবার জন্য সময়ক্ষেপ করিয়াছেন। তাহারই ফলে আজ ভারতবাসীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান শাসননীতি ও তাহার সম্ভাবিত পরিণাম

দেশের মানুষ এবং অন্যান্য জীব, জমি ও জল-হাওয়া লইয়া একটা পুরা দেশ গঠিত হয়। যখন দেশের সমস্ত লোক পরমুখাপেক্ষী না হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে শান্তিপূর্ণভাবে দিনাতিপাত করিতে পারেন এবং দীর্ঘ জীবন ও যৌবনসম্পন্ন হন, অধিকাংশ জমি ফসলবান এবং জল-হাওয়া স্বাস্থ্যকর হয়, তখনই দেশের অবস্থাকে সাধারণতঃ ভাল বলা যাইতে পারে। দেশীয় লোকের দেশের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে দেশের অবস্থার উন্নতি-সাধন কখনও সম্ভব নহে। দেশের প্রতি দেশীয় লোকের কর্ত্তব্য দুই রকম—ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিত। দেশের লোক সম্মিলিত হইয়া দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য

যে প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, তাহাকে গভর্ণমেণ্ট বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে দেশের প্রত্যেক লোক নিজ নিজ উন্নতি-সাধনের চেষ্টা না করিলে গভর্ণমেণ্টের অসীম চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের উন্নতি সাধিত হয় না। আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিলেও গভর্ণমেণ্টের সহায়তা ব্যতীত দেশের সম্যক্ উন্নতিসাধন সম্ভব হয় না।

দেশের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে যে সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা, জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা, শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, জমির উর্ব্বরা-শক্তি রক্ষার ব্যবস্থা, অপরাধীকে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা এবং বৈদেশিকের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে কোনটীই কাহারও ব্যক্তিগত চেষ্টায় পূর্ণভাবে সাধন করা যায় না। আবার দেশের লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞান না থাকিলে গভর্ণমেণ্টও একক চেষ্টায় ইহার কোনটী সাধন করিতে পারেন না।

কাজেই দেশের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের ও অধিবাসিবৃন্দের সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন—ইহা বলা যাইতে পারে।

দেশের অধিবাসিবৃন্দ আপন আপন কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিলে এবং গভর্ণমেণ্ট সুচিন্তিত বিধি অনুসারে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিলে কোন দেশ কখনও অনুন্নত থাকিতে পারে না।

ব্যক্তিগত জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে-মানুষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত (অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়-প্রবণ) তাঁহার জীবন বিশৃঙ্খলাময় হইয়া উঠে, আর যিনি নিজ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত (অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিপ্রবণ) তিনি ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালনায় কখনও কাহারও সুফল হয় না ইহাও যেরূপ ধ্রুব সত্য, সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালনায় কখনও কাহারও অমঙ্গল হয় না—ইহাও বাস্তব সত্য। কাজেই রাজ্যপরিচালনা-কার্য্য যাহাতে বুদ্ধিমান্ লোকের হাতে ন্যস্ত হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের দায়িত্ব বর্ত্তমানে প্রকৃত পক্ষে ইংরাজের হাতে। তাঁহারা দেশীয় লোকের সহায়তায় শাসনকার্য্য চালাইতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের শাসন-কার্য্য ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে ইহা সত্য হইলেও, তাঁহারা যে ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহা নিঃসন্দেহ তাঁহারা বিদেশীয় হইলেও যখন ভারতের শাসন-প্রণালী তাঁহাদিগের হাতে, তখন তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ ভারতবাসী বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের সুখ-দুঃখের সহিত ভারতবাসীর সুখ-দুঃখ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে ইহাও বলা যায়।

ভারতের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীতে দুইটী জিনিষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) প্রজাতন্ত্র (Democracy); (২) ভেদ-নীতি (policy of divide and rule)। এই দুইটী জিনিষ লক্ষ্য করিলে ভারতের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর কিরূপ পরিণাম হওয়া সম্ভব তাহা স্থির করা যায়।

প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী দুই শ্রেণীর হইতে পারে। দেশে যখন প্রকৃত শিক্ষা বিস্তৃত থাকে, তখন—প্রকৃতির নিয়ম কি, কোন্ কোন্ জিনিস এবং কর্ম্মপদ্ধতি মানুষের অবলম্বনীয়, কোন কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিলে প্রয়োজনীয় জিনিস লব্ধ হইতে পারে এবং প্রকৃত কর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষা করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে জ্ঞান সহজ ও সুলভ হয়। তখন কে ঐ জ্ঞানসম্পন্ন এবং কর্ম্মশক্তিবিশিষ্ট তাহা অধিবাসিবৃন্দ সহজেই বুঝিতে পারেন এবং নিজেদের মধ্যে যাঁহারা সাধারণের হিতকার্য্যে প্রবৃত্তিযুক্ত, তাঁহাদিগকে প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। এবংবিধ প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া যখন শাসন-কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়।

কিন্তু দেশে শিক্ষার অভাব থাকিলে সাধারণের হিতকারী জিনিস কি কি এবং অবলম্বনীয় কর্ম্মপদ্ধতি কি তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব লক্ষিত হয় এবং অধিবাসিবৃন্দের মধ্যেও প্রকৃত সামর্থ্যসম্পন্ন লোক নির্ব্বাচন করিবার শক্তিও হ্রাস হইয়া পড়ে। ফলে যথোপযুক্ত প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন অসম্ভব হয়। এই অবস্থায় কৌশল-প্রিয় চতুর লোকেরা অধিবাসীদের নানা রকমে প্রলুব্ধ করিয়া প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থ হন। এবংবিধ কৌশল-প্রিয় চতুর প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া যখন শাসনকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন দেশের উন্নতি অসাধ্য হইয়া পড়ে এবং দেশ নানারূপে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়।

আমাদের ভারতবর্ষের সাধারণ অধিবাসিগণের মধ্যে শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ ভাবে বিস্তার লাভ করে নাই, তাহা আমাদের

ইংরাজ বন্ধুগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন এবং যে শিক্ষা বর্ত্তমানে প্রসার লাভ করিতেছে, আমাদের মতে তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে; পরন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে যে অশিক্ষা ও কুশিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ।

এই অবস্থায় বর্ত্তমান নির্ব্বাচন-প্রণালীতে কিছুতেই যথাযোগ্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্ভব নহে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন তুলিয়া দিলেও সর্ব্বত্র যথোপযুক্ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্ভব হইবে না। যে জাতীয় প্রতিনিধি এই অবস্থায় নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া যে শাসনকার্য্য চালাইবেন, তাহাতে দেশের ক্রমিক অবনতির যথেষ্ট আশঙ্কা আছে

অবশ্য ইহার জন্য আমরা আমাদের ইংরাজ বন্ধুগণকে দায়ী করিতে পারি না, কারণ আমরাই প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী বাঞ্ছা করিয়াছি।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি যখন দেশে শিক্ষার অভাব হয় তখন দেশীয় লোকের দ্বারা দেশের শাসন অবাঞ্ছনীয়?

তাহার উত্তরে আমরা বলিব, দেশীয় লোকের দ্বারা দেশের শাসন কোনও অবস্থাতেই অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু সুশাসন কখনও অজ্ঞানী লোকের দ্বারা সম্ভব নহে। দেশের সাধারণ অধিবাসিগণের মধ্যে যখন শিক্ষার অভাব হয়, তখন প্রজাতন্ত্রের সাধারণ নির্ব্বাচন-প্রণালী গ্রহণ না করিয়া যাহাতে দেশের জ্ঞানীলোক প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তদনুরূপ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে জ্ঞানহীন লোকের শাসনকার্য্য কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রকৃতির এই নিয়মবশতঃ অজ্ঞানী লোকের সম্মিলিত শাসন-কার্য্য বার বার পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং দেশে নির্ব্বাচনের উন্মাদনা অধিকতর স্থান পায়। তাহার ফলে দেশের প্রকৃত হিতকর কার্য্যের এবং জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। প্রতিনিধিগণ ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনে সাফল্যলাভ করিবার জন্য সময় সময় দেশহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান অপূর্ণ থাকায় প্রকৃতপক্ষে দেশের কোন হিতকর কার্য্য হয় না। যাহা হয় তাহা হিতকর কার্য্যের অভিনয় মাত্র। এইরূপে অনুপযুক্ত প্রতিনিধিগণের হাতে দেশের অবনতি সাধন সূচিত হয় এবং ক্রমশঃ দেশে আপামর সকলের অন্নাভাব পর্য্যন্ত আসিবার আশঙ্কা জন্মে।

ভেদনীতির পরিণামও অতীব বিষময়। ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করিলে মানুষ কিয়ৎ পরিমাণে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সংগ্রহ করিতে পারে তাহা সত্য, কিন্তু দেশের জমি উর্ব্বরাশক্তি-সম্পন্ন না হইলে জমিজাত দ্রব্য কি করিয়া মানুষের প্রয়োজনোপযোগী করিতে হয়, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে, বিবিধ পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা না থাকিলে, দেশের জল-হাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ করিয়া তুলিতে না পারিলে, মানুষ ব্যক্তিগতভাবে অসাধারণ চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ পরিমাণে নিজ প্রয়োজনীয় সংগ্রহ করিতে পারে না। দেশের লোকের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতীত জমির উর্ব্বরতা সাধন প্রভৃতি উপরোক্ত কার্য্যগুলির ব্যবস্থা করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। ফলে যে-দেশের লোক আত্মকলহে নিরত, সে-দেশের জল-বায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়ার এবং প্রত্যেকের অন্নাভাব উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা ঘটে।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে ভেদনীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা মনে করিবার কারণ আছে। অবশ্য এখনও অন্নাভাব সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয় নাই এবং দেশের জল-বায়ুও সম্পূর্ণরূপে অস্বাস্থ্যকর হয় নাই। কিন্তু শাসনকার্য্যে ভেদনীতি অনতিবিলম্বে পরিত্যক্ত না হইলে দেশের লোকের অন্নাভাব এবং অস্বাস্থ্য অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মনে হয় তাহার চিহ্ন এখনই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যুবকগণের মধ্যে বেকার, রক্তের চাপে আকস্মিক মৃত্যু, বেরি-বেরি, ক্ষয় প্রভৃতি রোগসমূহ অন্নাভাব ও অস্বাস্থ্যের প্রাথমিক লক্ষণ। ভারতবর্ষে বেকারের যে দুশ্চিন্তা বাস্তবিকপক্ষে তাহা অন্নাভাবের দুশ্চিন্তা। ৩০ বৎসর আগেও ভারতের পল্লীতে পল্লীতে বেকার যুবকের সংখ্যা যাহা ছিল, তদপেক্ষা বর্ত্তমানে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। পার্থক্য এই যে, তখন মানুষ বেকার অবস্থাতেও অন্নাভাব অনুভব করে নাই, আর এখন কর্ম্মরত থাকিয়াও তাহাকে অর্দ্ধাশনের ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কাজেই বর্ত্তমানের বেকার অবস্থাকে আংশিকভাবে অন্নাভাবের অবস্থা বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে যে ভেদনীতির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা আমাদের ইংরাজ বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ স্পষ্ট ভাবেই অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান শাসনকার্য্যে ভেদনীতি যে কতকটা স্থায়ীভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

যে সমস্ত আইনানুসারে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়, সেগুলি পর্য্যালোচনা করিলে শাসনকার্য্যের মূল নীতি কি তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের আইন সাধারণতঃ তিন স্থানে গঠিত হয়—(১) বৃটিশ পালিয়ামেণ্টে, (২) বড়লাট সাহেবের আইন-সভায় এবং (৩) প্রাদেশিক লাটগণের আইন-সভায়। বৃটিশ পালিয়ামেণ্ট হইতে যে সমস্ত আইন পাশ হইয়া আসে, ঐগুলি ভারত-শাসন-কার্য্যের স্থায়ী মূল নীতি-প্রকাশক। যে আইনগুলি বড়লাট সাহেবের এবং প্রাদেশিক লাটগণের আইন-সভায় গঠিত হয়, সেগুলি সাধারণতঃ শাসনকার্য্যের সাময়িক নীতি-প্রকাশক।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের জন্য বৃটিশ পালিয়ামেণ্টে যে সমস্ত আইন গঠিত হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ সেগুলি এই—

(১) ১৭৭৩ সালের রেগুলেসন অ্যাক্ট
(২) ১৭৮৪ সালের পিট্‌স ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট
(৩) ১৭৯৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট
(৪) ১৮১৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট
(৫) ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট
(৬) ১৮৫৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট
(৭) ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণাবাণী
(৮) ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল অ্যাক্ট
(৯) ১৮৭৪ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল অ্যাক্ট
(১০) ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল অ্যাক্ট
(১১) ১৯০৯ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল অ্যাক্ট
(১২) ১৯১৯ সালের রিফর্ম্মস্ অ্যাক্ট
(১৩) ১৯২৪ সালের গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট
(১৪) ১৯২৭ সালের গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট

উপরোক্ত আইনগুলির মধ্যে ১৭৭৩ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত আইন গঠিত হইয়াছে, সেগুলিতে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোন বিশেষ ব্যবস্থার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কি করিয়া জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমগ্র ভারতবর্ষ সুশাসিত হইবে, তাহার চিন্তার চিহ্ন ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত গঠিত প্রত্যেক আইনের মধ্যে সুপরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯০৯ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিল অ্যাক্ট সম্পূর্ণ পৃথক্। ১৯০৯ সালের এই আইনে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা সূচিত হইয়াছে এবং তাহা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে ১৯১৯ সালের রিফর্ম্মস্ অ্যাক্টে।

সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচনমূলক আইন কেন গঠিত হইয়াছিল এবং কাহারা তাহার জন্য দায়ী তাহা স্থির করিতে হইলে, ১৯০৭ সালের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের সার্কুলার এবং ১৯০৮ সালের ভারত-সচিবের (Secretary of State) নিকট ভারত গবর্ণমেণ্টের ডেস্‌প্যাচ্ এবং দেশের তৎকালীন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হয়।

তাহাতে আমাদের দেশের লোকদিগকেও দায়ী করা যায়, আবার গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বও অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না।

"তখন হিন্দু মুসলমানের ভিতর কলহ অত্যন্ত প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই এই জাতীয় আইন ব্যতীত দুই পক্ষকে শান্ত করিবার আর কোন উপায় ছিল না"—আইনের উদ্দেশ্যের এই জাতীয় ব্যাখ্যায়, আত্মকলহের জন্য দেশের লোক দায়ী হইয়া পড়েন।

অন্যপক্ষে, "হিন্দুদিগের মধ্যে তখন সেল্‌ফ্-গভর্ণমেণ্টের যাচ্ঞা অত্যন্ত প্রকট হইয়াছিল। মুসলমান এই যাচ্ঞায় যোগদান করিলে সম্মিলিত যাচ্ঞার বিরোধিতা কষ্টকর হইতে পারে, কাজেই যাহাতে কখনও সম্মিলিত যাচ্ঞা না হইতে পারে, তাহার জন্য আইন দ্বারা সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল"—এই জাতীয় ব্যাখ্যায় ভেদনীতি প্রবর্ত্তনের দায়িত্ব আরোপিত হয় গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধে।

এই দুইটী ব্যাখ্যার ভিতর কোন্‌টী সঙ্গত তাহা শাসন ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিলে সঠিক নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। কাজেই আমরা তাহা স্থির করিতে পারি না। দায়িত্ব যাহারই

হউক, ১৯০৯ সাল হইতে যে, শাসনকার্য্যের মূল নীতিতে স্থায়ীভাবে "ভেদনীতি"র প্রবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন তাঁহারা খুব সম্ভব শাসননীতি বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন না।

১৯০৯ সালের আগেও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট সময় সময় হয়ত সাম্প্রদায়িক স্বার্থগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাসমূহ সাধারণতঃ অস্থায়ী এবং তাহা সাময়িক বিশৃঙ্খলা নিবারণের প্রয়োজন-জ্ঞাপক। কোন লোকসমষ্টি শাসন করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়প্রবণ, মনঃপ্রবণ লোকদিগকে দমন করিবার জন্য ভেদনীতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে; তাহাতে দেশের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু স্থায়ীভাবে দেশ-শাসনের জন্য ভেদনীতি অবলম্বিত হইলে দেশবাসিগণের মধ্যে মিলন সম্ভব হয় না এবং তাহার ফলে ক্রমে ক্রমে কিরূপে অন্নাভাব ও অস্বাস্থ্য আসিয়া পড়ে তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

কাজেই ভারতের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর পরিণাম যে অতীব ভয়াবহ তাহা বলা যাইতে পারে।

শিক্ষা

বেতনভোগী ভাইস-চ্যান্সেলার ও শিক্ষাবিভাগের পরিচালনা

গত ২৬শে মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষামন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক শিক্ষা-বিভাগের বরাদ্দ ব্যয় ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা গৃহীত হইবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। এই উপলক্ষে যে কয়েকটি ছাঁটাই-প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মৌলবী আবুল কাসেমের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বেতনভোগী ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ-প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচ্য—

[১] ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাঠ্য তালিকার পরিবর্ত্তন,
[২] উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির সংখ্যাহ্রাস,
[৩] দশটি জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন,
[৪] রাজসাহী কলেজে কৃষি-ক্লাস খুলিবার পরিকল্পনা,
[৫] বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগ,
[৬] ওয়াকফ আইনটিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিয়োগ,
[৭] ঢাকা ইডেন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্কার ব্যবস্থা,
[৮] ভূতত্ত্ব ও শরীরতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষা সৌকর্য্যবিধান,
[৯] অনুন্নত শ্রেণীর জন্য গবর্ণমেণ্ট কমার্সিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটে ২টি ৩০৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন শ্রীযুক্ত এস, এম, বসু, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু। প্রস্তাব সমর্থন করেন রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খাঁ বাহাদুর আবদুল মমিন্ এবং মৌলবী তমিজুদ্দিন খাঁ। ভাইস-চ্যান্সেলার বেতনভোগী করিবার স্বপক্ষে মৌলবী আবুল কাসেম একাধিক যুক্তি প্রদান করেন। যথা (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংখ্যা হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, (৩) ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ অতি দায়িত্বপূর্ণ, (৪) প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা যদি তাঁহার সমস্ত সময় উহার জন্য ব্যয় না করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সমস্ত কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব, (৫) অবৈতনিক ভাইস-চ্যান্সেলার নিজের কাজ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অতি সামান্য সময় ব্যয় করিতে পারেন, (৬) ভাইস-চ্যান্সেলারকে শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে, একনিষ্ঠভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেই লিপ্ত থাকিতে হইবে, ইত্যাদি।

ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধ যুক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদ বহুকাল অবধি অবৈতনিক, (২) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অবৈতনিক হইয়াও একনিষ্ঠতার সহিত এই কাজ করিয়া গিয়াছেন, (৩) ভাইস-চ্যান্সেলার বেতনভোগী হইলে তাঁহার নিয়োগকার্য্যে জটিলতার আশঙ্কা আছে, (৪) গবর্ণমেণ্ট নিয়োগকর্ত্তা হইলে পদটিতে রাজনৈতিক মতপ্রাধান্যের আশঙ্কা থাকিতে পারে, (৫) এই জাতীয় জটিল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পরামর্শ না করিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারেন না।

আমাদের মনে হয়, ভাইস-চ্যান্সেলারের পদের দায়িত্ব সম্বন্ধে মৌলভী আবুল কাসেম সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সঙ্গত। সমস্ত সময় একনিষ্ঠ ভাবে অসাধারণ চিন্তাশক্তি লইয়া কার্য্য না করিলে ভাইস-চ্যান্সেলারের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ করা সম্ভব নহে। যথারীতি সংসারনির্ব্বাহের ব্যবস্থা না থাকিলে কোন কার্য্য কাহারও পক্ষে একনিষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করা অতীব দুরূহ। কাজেই ভাইস্-চ্যান্সেলারের বেতনের ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত সঙ্গত। তবে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করিলেই বেতন লইতে হইবে, এইরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাও সমীচীন নহে। যদি কোন

দেশপ্রাণ ব্যক্তি জীবিকার্জ্জনের কার্য্য হইতে অবসর লইয়া প্রৌঢ়াবস্থায় কর্ত্তব্যবোধে দেশের শিক্ষাকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বেতন ব্যতীত কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে যাহাতে তাঁহার কার্য্য পাইবার কোন বাধা উপস্থিত না হয় তাহার ব্যবস্থা থাকাও সঙ্গত।

গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কর্ম্মচারীর বেতন যাহাতে হ্রাস করিয়া গভর্ণমেণ্টের খরচ কমান সম্ভব হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু নূতন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলেই গভর্ণমেণ্টের খরচ বাড়িয়া যায় এবং অর্থাভাব উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, গভর্ণমেণ্ট অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

উচ্চতম সামর্থ্যযুক্ত লোক উচ্চতম বেতন ছাড়া পাওয়া যায় না। একদিকে যেমন গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারীর বেতন স্বরূপ অনেক টাকা খরচ করিতে বাধ্য হইয়া অর্থাভাবগ্রস্ত হইতেছেন এবং ফলে দেশহিতকর কার্য্যসকল বন্ধ থাকিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে আবার সর্ব্বোচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণও চারি হাজার, পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া ক্রমশঃই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ, প্রয়োজনীয় আহার্য্যের ও ব্যবহার্য্যের অসমঞ্জসীভূত মূল্য এবং বর্ত্তমান অর্থনীতির মূল সূত্রের ভ্রান্তি। অর্থনৈতিকগণ সর্ব্বদা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহা না করিয়া যদি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করিবার চেষ্টা করেন এবং গভর্ণমেণ্ট ও দেশের জনসাধারণ মিলিত হইয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় আহার্য্যের ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য যাহাতে কমিয়া যায় তাহার আয়োজন করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের বিবিধ বিষয়ে যে ব্যয়ের বরাদ্দ আছে, তাহার অনেক কম টাকায় দেশহিতকর সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হইতে পারে এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ ও দেশবাসী-সর্ব্বসাধারণ ঋণজাল ও অদ্ধাশনের ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। এই ব্যবস্থা যদি কোন দিন সম্ভব হয়, তখন অপেক্ষাকৃত অনেক কম বেতনেও ভাইস্-চ্যান্সেলার নিয়োগ সম্ভব হইতে পারে।

কিন্তু কেবল ভাইস-চ্যান্সেলার বেতনভোগী হইলেই কি শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইবে ?

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ও শিক্ষাবিভাগের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ অনেক। অভিভাবকেরা কষ্টার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করিয়া ছেলেদের শিক্ষিত করেন। অথচ ছেলেরা শিক্ষার ছাপ পাইয়াও স্ব স্ব জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় না। ইহার জন্য যদি গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগকে দায়ী করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষা-বিভাগকে দায়ী করাই যুক্তিসঙ্গত। আমাদের মনে হয়, শিক্ষাবিভাগের আমূল সংস্কার অচিরাৎ প্রয়োজন।

আমাদের গত সংখ্যায় আমরা শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার মূল সূত্র কি হওয়া উচিত তাহা দেখাইয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় শিক্ষা-পরিচালনার কার্য্য আমাদের মতে কিরূপে নির্ব্বাহিত হওয়া উচিত তাহার প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-পরিচালনার কার্য্য চারিটী শাখায় বিভক্ত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি ; (১) শিক্ষার বিষয়-নির্ব্বাচন-শাখা, (২) শিক্ষা-বিস্তার-শাখা, (৩) পরীক্ষা-গ্রহণ শাখা (৪) শিক্ষাবিভাগের হিসাব-রক্ষা শাখা। ছাত্রগণের শিক্ষাকে সুফলপ্রদ করিয়া দেশকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে ঐ চারিটী শাখা আবার বহু প্রশাখাদিতে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন আছে। শিক্ষাবিভাগের পরিচালনা-কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হওয়া সঙ্গত তাহা নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত নক্সায় প্রকাশ করা যাইতে পারে :—
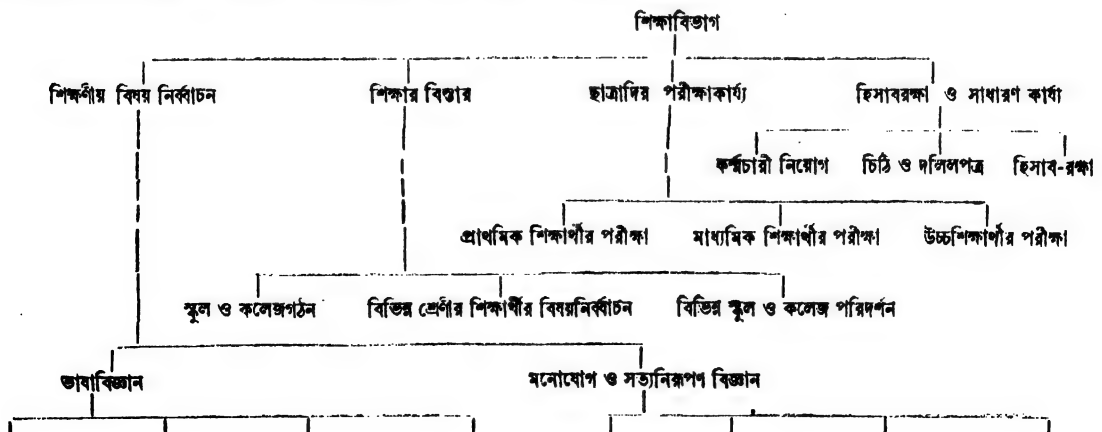
শিক্ষণীয় বিষয়-নির্ব্বাচন শাখায় "ভাষা"-বিজ্ঞান এবং "মনোযোগ ও সত্যনিরূপণ"-বিজ্ঞান ছাড়া আরও আটটী বিভাগের প্রয়োজন আছে,—(১) "কালের ব্যক্তরূপ-" বিজ্ঞান [যাহা সাধারণতঃ ইতিহাস আখ্যায় আখ্যাত] (২) "স্থানের ব্যক্তরূপ"-বিজ্ঞান [যাহা সাধারণতঃ ভূগোল নামে অভিহিত] (৩) "শক্তিশীলতা" ও "পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা"-বিজ্ঞান (৪) "ব্যবস্থাতত্ত্ব" (৫) "বস্তুগুণবিচার তত্ত্ব" (৬) "বস্তুতত্ত্ব" (৭) "জ্ঞানতত্ত্ব" (৮) "মনুষ্যতত্ত্ব"। এই আটটী বিভাগের প্রত্যেকটী আবার চারি অংশে বিভক্ত হওয়া উচিত, যথা, তত্ত্বানুসন্ধান, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, অধ্যাপনা-বিধি-প্রণয়ন এবং অধ্যাপক গঠন। এই সকল বিভাগের পরিচালনা-কার্য্যের জন্য সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং শিক্ষা-বিষয়ে চিন্তাশীল একজন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। চারিটী প্রধান বিভাগের কার্য্যের সহায়তার জন্য চারিটী বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আবশ্যক। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত প্রত্যেক শাখা ও প্রশাখাগুলির দায়িত্বও একজন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত হওয়া সঙ্গত। সমস্ত শাখাপ্রশাখার কার্য্যের প্রসার ও উন্নতির জন্য যাহাতে এক একজন কর্ম্মচারীকে দায়ী করা যায়, তদুপরি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

বর্ত্তমানে শিক্ষাবিভাগ পরিচালিত হইতেছে শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিদ্বারা। তাহা ছাড়া শিক্ষাকার্য্যের জন্য আরও দুই জন কর্ম্মচারী আছেন—ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকসন এবং ভাইস্‌-চ্যান্সেলার। ইহার মধ্যে ভাইস্‌-চ্যান্সেলার বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বতোভাবে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রীর নিয়মানুগ হইতে বাধ্য নহেন। তাহার ফলে শিক্ষাকার্য্যের কতকাংশ রহিয়াছে মন্ত্রীর হস্তে, কতকাংশ রহিয়াছে ভাইস্‌-চ্যান্সেলারের হস্তে। ইহাতে মূল কার্য্য পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। কার্য্যতঃ হইতেছেও তাই। এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা জনসাধারণের অধিক। কারণ ইউনিভারসিটির স্বাধীনতার নামে আমরাই এইরূপ বিভাগ যাচ্ঞা করিয়া আসিতেছি। "গভর্ণমেণ্ট আমাদের", "গভর্ণমেণ্ট দ্বারা পর্য্যবেক্ষিত হইলেই আমাদিগের দ্বারা পর্য্যবেক্ষিত হইবে", "শিক্ষা যাহাতে আমাদের ছেলেদের হিতকারী হয় আমরা আমাদের গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে তাহা করিতে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিব" এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া গভর্ণমেণ্টের অধীনে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাবিভাগ গঠন করিতে পারিলে, তবেই আমাদের ছেলেদের অ-শিক্ষার ও কু-শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টকে যুক্তিযুক্তরূপে সর্ব্বতোভাবে দায়ী করা যাইতে পারে।

নতুবা 'ইউনিভারসিটির স্বাধীনতা' নামে একটা অযথা তৃপ্তি অনুভব সম্ভব বটে, কিন্তু তিল তিল করিয়া আমরা যে ধ্বংসাভিমুখী হইতেছি তাহার গতি রুদ্ধ হইবে না।

বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে পরীক্ষার কার্য্য, শিক্ষকতার কার্য্য, পাঠ্য পুস্তক-প্রণয়ন ও নির্ব্বাচনের কার্য্য বস্তুত একই পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত। পরীক্ষার কার্য্য ও শিক্ষকতার কার্য্য এক পরিচালনাধীন থাকিলে, প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত না হইয়াও শিক্ষাপ্রাপ্তির ছাপ পাওয়ার সম্ভাবনা ঘটে। অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত জগতের অন্যান্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জাতীয় ব্যবস্থার নজীর দেখান যাইতে পারে। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সমস্ত ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বাহির হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা কয়জন মনুষ্যের জীবন ও যৌবন সম্বন্ধীয় কতটুকু হিতসাধন করিতে সমর্থ হইতেছেন তাহা লক্ষ্য করিলে, তাঁহাদের শিক্ষার প্রকৃত রূপ বুঝা যাইতে পারে। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার কার্য্য ও অধ্যাপনার কার্য্য এক পরিচালনাধীন থাকে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায়ই প্রয়োজনানুরূপ ফল লাভ হয় না।

সারা জগতে যে সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন বিপর্য্যয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহার কারণ শিক্ষার এই ব্যভিচার কিনা তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তার বিষয়। পরীক্ষার কার্য্য এবং অধ্যাপনার কার্য্য এক হস্তে ন্যস্ত করিবার উপযোগী কর্ত্তব্য-জ্ঞানসম্পন্ন সাধু ব্যক্তির অভাব নাও হইতে পারে তাহা সত্য, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে মানুষ 'মানুষ' এবং স্মৃতিশক্তি ও মনোভাব ব্যক্ত করিবার কার্য্য এইরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, তাহার অপ্রত্যক্ষ ভাবে ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্যসমূহও সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ছাত্রকে পড়াইবার জন্য দায়ী শিক্ষক, ছাত্র নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করিয়াছে কিনা তাহার জন্য তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল হইতে অধ্যাপকের অধ্যাপনার

বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। কাজেই এক হিসাবে ছাত্রের পরীক্ষায় অধ্যাপকের অধ্যাপনার পরীক্ষা। যাহার পরীক্ষা তাহাকেই অথবা তাঁহার সমশ্রেণীস্থ কাহাকেও পরীক্ষকভাবে নিযুক্ত করার যৌক্তিকতা আমরা বুঝিতে পারি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ক বর্ত্তমান পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখিলে তাহা যে কোন বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লিখিত হয় না, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিবিধ তত্ত্বের পরিপুষ্টির জন্য কোন শৃঙ্খলিত চেষ্টার দায়িত্ব বণ্টনের কোন পরিচয়ও আমরা অবগত নহি। কোন কোন বিষয়ে কেহ কেহ তত্ত্বানুসন্ধান (অর্থাৎ research) করিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু যাহাতে প্রতিনিয়ত বিষয়বিশেষের তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় পরিপুষ্টির সাধন হয় এইরূপ কোন ব্যবস্থা আছে কি? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ বিভাগ সৃষ্টি অবধি অনেক থিসিস্ (thesis) বাহির হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার কোন থিসিসে মানুষের কর্ম্ম-নির্দ্দেশক গ্রহণযোগ্য কোন প্রস্তাব অদ্যাবধি উপস্থাপিত হইয়া থাকিলে অবশ্য আমাদের মন্তব্য ভ্রমযুক্ত হইবে। কিন্তু কোন থিসিসে কোন বিষয়ে মানুষের কর্ম্ম-নির্দ্দেশক গ্রহণযোগ্য কোন কথা কথিত হইয়াছে কি? "প্রকৃতির নিয়ম—পরিবর্ত্তন," "পরিবর্ত্তন কর্ম্মাত্মক," ইহা যখন প্রতিনিয়ত পরিস্ফুট তখন যে শিক্ষা (culture) কর্ম্ম-নির্দ্দেশক নহে, তাহা কি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অথবা "অকেজো" (leading to no work) নহে? এই জাতীয় শিক্ষা কবির কল্পনায় সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু মানুষের মনুষ্যজীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আছে? যখন এই জাতীয় শিক্ষা 'শিক্ষা' বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহা শিখিয়া মানুষ শিক্ষিতাভিমানযুক্ত হয়, তখন অনশন ও অর্দ্ধাশন অবশ্যম্ভাবী হওয়া কি অস্বাভাবিক? আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষা-সম্বন্ধে এই ভ্রমের জন্য সোনার ভারতের আজ এই অবস্থা। এখনও ভ্রম সংশোধন করিবার সময় আছে। বিলম্বে দুর্গতি অপরিসীম।

আমাদের প্রস্তাব পরিস্ফুট করিবার জন্য ভবিষ্যতে আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার পরিবর্ত্তন ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া শিক্ষার উন্নতির একটা অভিনয় হইতেছে সত্য, কিন্তু যে ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যপুস্তক যেরূপ ভাবে নির্ব্বাচিত হইতেছে, তাহাতে উন্নতি অপেক্ষা অবনতির আশঙ্কাই অধিক। বাঙ্গালীকে এই বিপদ হইতে কে রক্ষা করিবে তাহা আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে একমাত্র চ্যান্সেলার সাহেবের সে সামর্থ্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কাজেই শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের পরামর্শের প্রতি যাহাতে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য বাঙ্গালার জনসাধারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্টি, বিজ্ঞান ও পেশা

গত ২০শে মার্চ্চ ঢাকা জগন্নাথ কলেজের স্বর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় মহাশয় 'শিক্ষা ও ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। রাজা সাহেব তাঁহার বক্তৃতার একস্থানে বলিয়াছেন—"What, in my opinion is needed is simultaneous expansion of cultural, scientific and vocational education." অর্থাৎ কৃষ্টি, বিজ্ঞান ও পেশা-শিক্ষা তাঁহার মতে এক সঙ্গেই করিতে হইবে। রাজা সাহেব আরও বলিয়াছেন—"Commercial education and industrial studies can alone solve the much-vexed question of unemployment." অর্থাৎ, শিল্প ও বাণিজ্য করিতে শিখিলেই বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

বক্তা যে বাঙ্গালার যুবকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাহা তাঁহার বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। কাজেই তিনি সাধারণ বাঙ্গালীর ধন্যবাদার্হ।

বর্ত্তমান ইংরাজী ভাব অনুসারে Culture, Science এবং Vocation সম্বন্ধীয় শিক্ষা তিনটী পরস্পর পৃথক্। তদনুসারে রাজা সাহেবের কথায় কোন ত্রুটী ধরা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কৃষ্টি-শিক্ষা, বিজ্ঞান-শিক্ষা ও পেশা-শিক্ষায় কি পার্থক্য আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ইহার যে কোন একটী সম্পূর্ণরূপে শিখিতে হইলে অপর দুইটী শিক্ষার প্রয়োজন হয়। আমাদের মনে হয়, ভারতের ভট্ট, আচার্য্য এবং মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক আধ্যাত্মিক শিক্ষা-নামে প্রাচীন ঋষিগণের অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার কতকগুলি কথার ঝঙ্কারে (chatter box) পরিণত করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমানে

যে ভাষায় প্রাচীন ঋষিগণের সূত্রগুলি লিখিত, সেই ভাষাও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ফলে যে ভারত এতাবৎ সারা জগতের অন্ন যোগাইয়া আসিতেছে, তাহার যুবকগণ কর্ম্মনিয়োগ না পাইলে আজ অর্দ্ধাশন-ক্লেশ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও কৃষ্টি-শিক্ষার (cultural education) নামে কতকগুলি কথার ঝঙ্কার বিলাইতেছেন। আমরা যে-কোন কথা বলি না কেন, তাহার তিনটী মাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যথা—(১) দ্রব্যের বর্ণনা, (২) গুণের বর্ণনা, এবং (৩) কর্ম্মের বর্ণনা। আমাদের প্রচলিত ভাষায়ও 'কেজো' ও 'অকেজো শব্দের ব্যবহার আছে। যে কথায় কোন কাজ নির্দ্দেশ না করে, তাহারই নাম 'অকেজো' কথা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত ইংরাজী সাহিত্যে 'অকেজো' কথা তাঁহাদের আধুনিক সাহিত্যের তুলনায় খুব কম ছিল। বর্ত্তমান ইংরাজ দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণের সাহিত্যে 'অকেজো' কথা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। আমরাও তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের ভাষায় অনেক 'অকেজো' কথার স্থান দিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের যুবকগণের পক্ষে তাহা বুঝা খুব সহজ নহে। দেশবাসীর মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ এবং বরেণ্য, তাঁহাদের এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি।

"শিল্প ও বাণিজ্য করিতে শিখিলেই বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে" - এই যে মন্তব্য, ইহাও আমাদের মতে সমীচীন নহে। শিল্প ও বাণিজ্য শিখিতে পারিলেই যদি বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে সারা ইউরোপে ও আমেরিকায় বেকারের জন্য এত হৈ-চৈ কেন ? জমিজাত দ্রব্য ব্যতিরেকে কোন শিল্প ও বাণিজ্য হয় কি ?

গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সংস্কার

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদানুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-সংস্কারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সংস্কার কার্য্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার (Central Advisory Board) পুনরুজ্জীবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারত গবর্ণমেণ্টের এই সংস্কার-কার্য্যের সম্পূর্ণ খসড়া (plan) আমরা জানিতে পারি নাই। কাজেই ভারত গভর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত আগ্রহের সহিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন কিনা তাহা বুঝা যায় না। আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষের এখন যে অবস্থা, তাহাতে ভারতে ইংরাজ জাতির স্বার্থ পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিতে হইলে ভারতবাসীর শিক্ষা-সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ভারতের শিক্ষা-সমস্যা

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হ্যালিফাক্স (তখনকার লর্ড আরুইন) বিলাতের এক সভায় বলিয়াছেন যে, "The trouble with India's education is that it has progressed too fast." অর্থাৎ, ভারতের শিক্ষা-ব্যাপারের মূল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে যে, এই শিক্ষা অতিমাত্র দ্রুত গতিতে অগ্রসর লাভ করিয়াছে।

এ শিক্ষার মাপকাঠি কি? যে শিক্ষায় পরমুখাপেক্ষী করিয়া দেয়, অসন্তুষ্টি ও অশান্তি জীবনের নিত্য-সহচর হয়, তাহাকে শিক্ষা নামে অভিহিত করা কি 'শিক্ষা' শব্দের অবমাননা নয় ?

কৃষি

কৃষি ও সেচ-বিভাগ

গত ১৮ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনারেবল্ স্যর খাজা নাজিমুদ্দিন আগামী বৎসরের সেচ-বিভাগের ব্যয়ের জন্য ২৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর-প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। মৌলবী সৈয়দ মজিদ বক্স ঐ প্রস্তাব প্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গা-সংস্কার নামক একটী ছাঁটাই-প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের রক্ষা, এবং যশোহর ও নদীয়া জিলার কতকগুলি পতিত জমির উন্নতি সাধন উপরোক্ত ছাঁটাই-প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত যুক্তি। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু, মৌলবী আবদুল কাসেম, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী উপরোক্ত ছাঁটাই-প্রস্তাব সমর্থন করেন। ইহার উত্তরে অনারেবল খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন গবর্ণমেণ্টের মতলব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :—

(১) মাথাভাঙ্গার মুখের প্রসার সাধন করিলে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং তাহাতে নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি প্লাবিত হইবার আশঙ্কা আছে।

(২) স্যর উইলিয়াম উইলকক্সের প্রস্তাবানুসারে গঙ্গার একটী বাঁধ বাঁধিবার প্রয়োজন, কিন্তু তাহা ৮ কোটী হইতে ১৬ কোটী টাকা খরচ-সাপেক্ষ বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

ছাঁটাই-প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। খরচের মঞ্জুর-প্রস্তাব যথাযথ-ভাবে গৃহীত হইয়াছে।

মাথাভাঙ্গার সংস্কার সম্বন্ধে সদস্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই ঠিক। কিন্তু বাঙ্গালার ও সারা ভারতের জমির উর্ব্বরা-শক্তি যে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। ১৮৮৪ সালের গবর্ণমেণ্ট রেকর্ডে যাহা দেখা যায়, তাহাতে তখনও প্রতি বিঘায় ৭ মণ করিয়া ধান্য উৎপন্ন হইত। ১৯৩২ সালে যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে বিঘা-প্রতি ফসল কিঞ্চিদূর্দ্ধ চার মণে দাঁড়াইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন নহেন, তাহা তাঁহাদের কার্য্য লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গবর্ণমেণ্ট উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যাহাতে কমিয়া না যায়, তাহার জন্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রতি বৎসরেই বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং জমিকে সরস রাখিবার জন্য বহু স্থানে আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী সেচ-ব্যবস্থাও করিতেছেন।

কিন্তু কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও সেচ-বিভাগের প্রসার বৃদ্ধি করিলেও সর্ব্বত্র কৃষকের হিতসাধন এবং জমির উর্ব্বরতা রক্ষা নাও হইতে পারে।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ভারতীয় কৃষক তাহার হস্তপদাদি দ্বারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। সে যতই পরিশ্রম করুক না কেন, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি অপেক্ষা বেশী চাষ সে করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার জীবিকার জন্য ন্যূনপক্ষে কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন। যে জমির উর্ব্বরা-শক্তি কম, তাহাতে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিলেও কৃষক তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ফলে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াও কৃষকের অর্দ্ধাশন-ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কাজেই যে সমস্ত জমির উর্ব্বরা-শক্তি কম, তাহা চাষ করিলে কৃষকের হিত সাধিত হয় না।

যে সে জল সেচন করিলেও জমির উর্ব্বরা-শক্তি রক্ষিত হয় না। বৃষ্টির জল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বরাশক্তি-বর্দ্ধক। নোনা জল এবং টিউব-ওয়েলের জল বহু স্থানেই কৃষিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করা যায়। কৃত্রিম সারদ্বারা উৎপন্ন ফসল পরিমাণে অধিক হইলেও স্বাস্থ্যপ্রদ না হইবার আশঙ্কা থাকে। বৃষ্টির জলের সঞ্চয়-স্থান পর্ব্বত, এবং পর্ব্বত হইতে নামিয়া সেই জল নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়।

আমাদের মনে হয়, ভারতের নদীগুলিতে যাহাতে সারা বৎসর জল থাকে; তজ্জন্য উৎপত্তিস্থান হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত গভীরভাবে কাটিয়া ফেলিতে পারিলে সমস্ত দেশ সরস এবং সমগ্র জমি উর্ব্বর রাখিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। বর্ত্তমানে নদীগর্ভগুলি প্রায়শঃ মজিয়া যাওয়ায় তাহাদের স্রোত অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ফলে গ্রীষ্মের সময় সমস্ত দেশ শুকাইয়া যায় এবং সাধারণতঃ উর্ব্বরা-শক্তির হ্রাস হয়। নদীর স্রোত কম হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই বর্ষার সময় দুইধার প্লাবিত হইয়া যাহা কিছু শস্য জন্মে, তাহারও বহুলাংশ নষ্ট হইয়া যায়।

আপাতদৃষ্টিতে নদীখনন-কার্য্য বহু ব্যয়সাপেক্ষ বটে, কিন্তু দেশের পণ্য-দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস সাধন করিতে পারিলে মজুরী অনেকাংশে কমিয়া যাইবে এবং তখন নদীখনন-কার্য্য অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ হইবে।

ভারতবাসীর প্রতি এবং ইংরাজ জাতির প্রতি যুগপৎ কর্ত্তব্য সাধনের জন্য জমির উর্ব্বরা-শক্তির হ্রাস নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের জমির উর্ব্বরা-শক্তি কমিয়া গেলে ভারতের রাজস্ব কোন জাতির পক্ষেই লাভজনক হইতে পারে না।

নদীখনন-কার্য্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা তাহা আমারা বলিতে পারি না। বাঙ্গালার গবর্ণর বড়লাট সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে বাঙ্গালার নদীখনন-কার্য্যের ব্যবস্থা করেন, তাহার জন্য আমাদের সদস্য মহোদয় চেষ্টা করিবেন কি?

ভারতবাসী ও ইংরাজ

গত ২৭শে মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নবাব কে. জি. এম্. ফারোকি কৃষি-বিভাগের খরচের জন্য ২১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মঞ্জুর-প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তৃতায় নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রকাশ পাইয়াছে :—

(১) পাটের চাস কমাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন,
(২) পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য শস্যোৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে,
(৩) পশু-চিকিৎসা বিভাগ ও পশু-রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট সবিশেষ চেষ্টিত আছেন,
(৪) উৎপন্ন শস্যের যাহাতে মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে,
(৫) লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে।

কৃষি-বিভাগ তাঁহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি মত যে কৃষকের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা নবাব বাহাদুরের বক্তৃতায় সুপ্রকাশ হইয়াছে। অথচ যখন দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলার কৃষকের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন তাহাতে নিশ্চয়ই কোন না কোন ভ্রম আছে। আমাদের মনে হয়, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাই একটী প্রকাণ্ড ভ্রম। অবশ্য ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করা যায় না, কারণ বর্ত্তমান অর্থ নৈতিকের ইহাই মূল মন্ত্র।

কৃষক ও দেশের জনসাধারণ চাহে প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য। মানুষের খাদ্য ও পরিধেয় প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য মূলতঃ জমিজাত। জমিজাত দ্রব্য শিল্পীর হাতে শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য রূপে ব্যবহৃত হয়। দেশের সমস্ত কৃষক ও শিল্পী যাহাতে তাঁহাদের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, তদনুরূপ ব্যবস্থা হইলে তাঁহাদের সকলেরই প্রয়োজনীয় দ্রব্য সুলভ হইয়া পড়ে। কৃষক ও শিল্পী বিক্রেতা-হিসাবে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিলে, ক্রেতা-হিসাবেও তাঁহারা সুলভ মূল্যে ক্রয় করিতে পারিবেন। তখন আর ভারতবর্ষের মধ্যে কাহারও খাদ্যের এবং পরিধেয়ের অভাব থাকিতে পারে না।

অবশ্য এমন কতকগুলি শিল্পজাত পদার্থ ভারতবাসী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যাহা তাঁহারা দেশের ভিতর প্রস্তুত করিতে শিখেন নাই এবং পারেন না। এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি আমাদের ইংরাজ বন্ধুগণ প্রস্তুত করিতে জানেন। যদি ভারতবাসী ভারতের উদ্বৃত্ত কৃষিজাত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ইংরাজ শিল্পীদিগের নিকট হইতে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যগুলি আমদানী করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ভারতবাসী তাঁহাদের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যগুলি অতি সুলভ মূল্যে পাইতে পারেন এবং ইংরাজ শিল্পী-গণেরও অতি সুলভ মূল্যে কাঁচা মাল পাইবার ব্যবস্থা হয়। এবংবিধ সুলভ মূল্যের কাঁচামাল হইতে যে শিল্পজাত পদার্থ ইংরাজ শিল্পীগণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার মূল্য অতি সুলভ হইবে এবং তাহা লইয়া জগতের যে কোন বাজারে উপস্থিত হইয়া ইংরাজ বাজার দখল করিতে পারিবেন। তখন ইংরাজ ও ভারতবাসী মিলিত হইয়া কেবলমাত্র যে নিজ নিজ দেশের অভাব ও বেকারের দুঃখ মোচন করিতে পারিবেন তাহা নহে, সমস্ত জগতের বাজার তাঁহাদের করায়ত্ত হইবে।

দুইটী জাতির মনোমালিন্যে উভয়েই যে দুরবস্থার উদ্ভব হয় তাহা আমরা আংশিক ভাবে এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। যদি ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে এই মনোমালিন্য চলিতে থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড, উভয় দেশেরই যে ভীষণ অবস্থা আগামী ২০।২৫ বৎসরের ভিতর সংঘটিত হইতে পারে, তাহা খুব সম্ভব আমাদের রাজপুরুষগণ সম্যক্ ভাবে কল্পনা করিতে পারিতেছেন না। অথচ দুইটী জাতি অকৃত্রিম ভাবে মিলিত হইতে পারিলে তাঁহারা সারা জগতের বাজার দখল করিয়া বসিতে পারেন। তখন কোন বাণিজ্যশক্তি তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিবে না। ইংরাজ এবং ভারতবাসী মিলিত হইলে কোন পশুশক্তিও তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে পারিবে না। দুই জাতির বন্ধুত্বে যখন এত সুফল ফলিতে পারে এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, দুইটী জাতিই বিপন্ন, তখনও কি সেই অকৃত্রিম মিলন এতই অসম্ভব? ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে কি এমন কেহই নাই যাঁহারা এই সম্বন্ধে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দুইটী দেশের সাধারণ লোকদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন?

প্রকৃতি পশুপক্ষী প্রভৃতিরও আহার যোগাইতেছেন, অথচ মানুষ আহারের জন্য এত ক্লেশ অনুভব করে—ইহা কি বাস্তবিক পক্ষে একটা রহস্য নহে? ইহার মূলে মানুষের যে কোন না কোন ভুল আছে, এইরূপ মনে করা কি অযৌক্তিক? আমরা আমাদের গভর্ণর ও মন্ত্রী মহোদয়কে এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

শিল্প ও সম্পদ

> গত ১৮ই মার্চ্চ পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় শিল্প-বিভাগের মন্ত্রী স্যার গোকুলচাঁদ নারাং প্রকাশ করিয়াছেন যে, শীঘ্রই পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট ব্যাপক ভাবে শিল্পোন্নতির কার্য্য আরম্ভ করিবেন, কারণ শিল্পোন্নতি ব্যতীত দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নহে।

সারা ইয়োরোপ যে আজ বিপন্ন তাহার একমাত্র কারণ তাহার বর্ত্তমান অর্থনীতির মূল সূত্র, যথা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা এবং তাহার পশ্চাতে আছে 'শিল্পোন্নতি

ব্যতীত দেশের উন্নতি হইতে পারে না—' এই ধারণা। শিল্পজ্ঞান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু শিল্প দ্বারা দেশের জনসাধারণের অন্নাভাব দূর করিবার বা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় সুফল ফলিতে পারে না। স্যর গোকুলচাঁদ আমাদের কথা চিন্তা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন কি?

শিল্প ও শ্রমিক সমস্যা

গত ২২শে মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে ভারতীয় এমপ্লয়ারস্ ফেডারেশনের (Employers Federation of India) দ্বিতীয় বাৎসরিক সাধারণ সভায় সভাপতির অভিভাষণে মিঃ এইচ. পি. মোদী বলিয়াছেন যে, ভারতে নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বেই বিভিন্ন প্রদেশ, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে 'শিল্প ও শ্রমিক সমস্যা' সম্বন্ধে একটা সমন্বয় সাধিত হওয়া উচিত।

কৃষক প্রভৃতি শ্রমিকদিগের মধ্যে যে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন পরিলক্ষিত হয়, তাহা শিল্প-শ্রমিকদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। যতদিন আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পের উন্নতি-সাধনকল্পে কল-কারখানা সংস্থাপিত থাকিবে, ততদিন কোন উপায়ে শিল্প-শ্রমিকদিগের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করা সম্ভব হইবে কিনা, তদ্বিষয়ে চিন্তা না করিয়া শ্রমিক-সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা সুফলপ্রদ হইবে না।

শিল্প-পুনরুজ্জীবন

যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় শিল্প-বিভাগের বর্ত্তমান বৎসরের খরচ বাবদ ১১ লক্ষ ৫৮ হাজার ১ শত ৪৪ টাকা মঞ্জুরের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় মন্ত্রী স্যর জে. পি. শ্রীবাস্তব যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) পণ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুত্থান সূচিত করে।

(২) শিল্প-পুনর্গঠন সমিতির অনুমোদনে গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে তিনটী কার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন, যথা—চিনি, তেল ও কাচ-শিল্পের সমধিক উন্নতি বিধান, শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারের সুব্যবস্থা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগের জন্য শিল্প বা বাণিজ্য, অথবা চাকুরীর ব্যবস্থা।

(৩) উপযুক্ত প্রচারকার্য্য দ্বারা কুটীর-শিল্পীদিগকে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিতে গবর্ণমেণ্ট চেষ্টিত হইবেন।

পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন লাভ হয় ইহা আমরা মনে করি বটে, কিন্তু তাহা অতি সাময়িক। জগতের বাজারে কতবার পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা গত ত্রিশ বৎসরের বাজার-দরের হিসাব অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায়। যদি কেহ স্মৃতিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া এই বাজার-দরের হিসাব অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, যখনই বাজার-দর বাড়িয়াছে, তখনই বণিকগণের উৎফুল্ল চেহারা পরিলক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই সাধারণ লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে এবং কিছু দিন পরে বণিকগণও বিপন্ন হইয়াছেন। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" ইহা কোন ভারতীয় ঋষির বাণী নহে। প্রাচীন ভারতে যে একটা খুব বড় উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল তাহা মনে করিবার অনেক কারণ এখনও বিদ্যমান। অবশ্য ঐ কারণগুলি একটু চিন্তা করিয়া অনুধাবন করিতে হয়। ভারতীয় ঋষিগণের যে সংগঠন দ্বারা সেই উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল, তাহার বিনাশ-সাধন ন্যূনকল্পে প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে—তাঁহাদের দ্বারা, যাঁহারা "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" এবংবিধ বাক্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা বড়লোকের সন্তান ছিলেন এবং বড়লোকের সন্তানগণের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য, আলস্য ও চিন্তাশূন্যতার ফলে সর্ব্বত্রই অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাই ভারতে সংঘটিত হইয়াছে। স্যার শ্রীবাস্তবের ও যুক্ত-প্রদেশের জনসাধারণের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

কৃষক ও পণ্যদ্রব্য

গত ২৮শে মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রী নবাব কে. জি. এম. ফরোকি শিল্প-বিভাগের খরচ বাবদ ১৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা মঞ্জুরী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ এন. আর. নর্টন ও মিঃ নরেন্দ্রকুমার বসু দুইটী ছাঁটাই-প্রস্তাব আনয়ন করিয়া বঙ্গীয় ষ্টেট্ এইড টু ইনডাষ্ট্রিজ (State Aid to Industries Act) এ্যাক্টের নিন্দাবাদ করেন। তাঁহাদের অভিযোগ এই যে, ঐ ফাণ্ড হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান একটা পয়সাও সাহায্য পায় নাই, কেবল বিজ্ঞাপনের জন্যই ১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে, অতএব এই এ্যাক্ট না থাকাই ভাল। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, মিঃ পি. ব্যানার্জ্জি, মিঃ কে. সি. রায় চৌধুরী প্রভৃতি এই ছাঁটাই-প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

মন্ত্রী মহোদয় ইহার উত্তরে বলেন যে, বোর্ড অফ ইনডাষ্ট্রিজ এ যাবৎ যে সকল সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে বিভাগীয় অনুসন্ধানের জন্য টাকা দিতে একটু বিলম্ব হইতেছে।

ছাঁটাই-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায় এবং ব্যয় সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। মন্ত্রী মহোদয় শিল্প-বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথার উল্লেখ করেন :—

(১) গত বৎসর বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে ২৮টি ডিমনষ্ট্রেশন-পার্টি শিল্পকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল এবং ইহাতে প্রায় ৮০০ ভদ্র শ্রেণীর বেকার যুবকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে।

(২) এইরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে প্রায় ১৫০ জন ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রায় ৯০ জন চাকুরী পাইয়াছেন।

(৩) বর্ত্তমান বৎসরে কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে ক্রয়-বিক্রয়ের সুব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে।

(৪) ভারত গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালার রেশম-শিল্পের জন্য যে অর্থসাহায্য করিবেন, উহা বাঙ্গালার রেশম-শিল্পের পূর্ব্বসমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

ভারতের বাজারে যে সমস্ত শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য বিক্রীত হয় তাহার অধিকাংশের ক্রেতার ভাগ্যবিধাতা, ভারতীয় কৃষক। ক্রেতার দারিদ্র্যমোচন না করিতে পারিলে ক্রয়শক্তি কখনও বর্দ্ধিত হইবে না। ধাতুজাত কৃত্রিম টাকা-পয়সা দ্বারা যে ক্রয়শক্তি বর্দ্ধিত হয় তাহা অতীব ক্ষণস্থায়ী। এই কৃত্রিম ক্রয়শক্তি গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার দ্বারা কিছু দিনের জন্য সংঘটিত হইতে পারে সত্য এবং হয়ত তাহার ফলে নবাব বাহাদুরের শিল্প সম্বন্ধীয় পরিকল্পনাগুলি কিছু দিনের জন্য বাস্তব বলিয়া পরিগণিতও হইবে; কিন্তু কৃষকের দারিদ্র্য মোচন না হইলে কোন চেষ্টাই স্থায়ীভাবে ফলবান্ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ভারতীয় পণ্য

বিগত ২০শে মার্চ্চ করাচীতে ভারতীয় বণিক সমিতির (Indian Merchants' Association) বাৎসরিক সাধারণ সভায় সভাপতির অভিভাষণে রাও বাহাদুর শিবরতন মেটা ভারতীয় পণ্যের আভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধিকরিবার পক্ষে সুপারিশ করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

তাঁহার মতে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া কৃষকদের উপরই ভারতের সম্পদ নির্ভর করে; সুতরাং কৃষকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা একান্ত প্রয়োজন। কৃষকের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রয়োজন হয় :—

(১) টাকার অবাধ মুদ্রণ দ্বারা বহুল প্রচারের জন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা (Providing abundant money for circulation by free coinage of the rupee)।

(২) ষ্টারলিং-এর মূল্য হ্রাস করিয়া এবং প্রচলিত দর বৃদ্ধি করিয়া টাকার মূল্য হ্রাস করা (Depreciating the rupee by lowering sterling exchange and inflating currency)।

(৩) জমির কর, মাল চালানের ভাড়া ও অন্যান্য শুল্কাদি হ্রাস করা (Reducing land tax, transport and other charges)।

(৪) ব্যবসায় সম্বন্ধীয় (আইন, ডাক্তারী, শিক্ষা প্রভৃতি) দাবী নিয়মিত করা (Regulating professional charges)।

(৫) দৈনিক ব্যবহার্য্য জিনিষ সস্তায় প্রস্তুত করা (Cheaper production of manufactured articles of daily use)।

রাও বাহাদুর শিবরতন মেটার কর্ম্মজীবনের ইতিহাস আমরা পরিজ্ঞাত নহি। তিনি যখন একটা বণিক-সমিতির সভাপতিত্ব পাইয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই, হয় একজন "কৃতকার্য্য বণিক", নতুবা একজন "অর্থনৈতিক"। দুইই আমাদের বরেণ্য। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহার বক্তৃতার কথাগুলি নানারূপে পরস্পর-বিরোধী। ভারতীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষকের অবস্থার উন্নতি এক সঙ্গে সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। বহুবার ভারতীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় বণিক ও ভারতীয় কৃষকের অবস্থা উন্নতির পরিবর্ত্তে ক্রমেই অবনত হইয়া আসিতেছে। কতখানি অবনতি সাধিত হইয়াছে রাও বাহাদুর তাহা দেখিয়াও দেখেন না কেন? শুধু ভারতের কেন, জগতের বণিক, কৃষক, আইন-ব্যবসায়ী ও ডাক্তারের কি অবস্থা হইতে চলিয়াছে, তাহা আমাদের বরণ্যে বন্ধুগণ কবে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতে শিখিবেন?

ভারতের কাঁচামাল

ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের অষ্টম বাৎসরিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে মিঃ কস্তুর ভাই লালভাই বলিয়াছেন যে, ভারতে যথেষ্ট কাঁচামাল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কাঁচামাল বিক্রয়ের জন্য ভারতকে কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাজারের (Empire market) উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না। ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তানুসারে বিভিন্ন দেশীয় ক্রেতাদের সহিত বিভিন্ন বাণিজ্য-চুক্তি করাই ভারতের পক্ষে সুফলপ্রদ হইবে।

জগতের বাজারে ভারতের জমিজাত উদ্বৃত্ত দ্রব্য কাঁচামালরূপে বিক্রয় না করিয়া তাহা ভারতের দ্বারা অথবা ইংলণ্ডের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাহাতে শিল্পজাত দ্রব্য-

রূপে জগতের বাজারে বিক্রীত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলেই ভারতের বেশী লাভ, না ঐ সকল কাঁচামাল ভিন্নদেশীয় ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিলে বেশী লাভ হইতে পারে, তাহা মিঃ লালভাই চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? আমরা অধুনা যে বিপদের সম্মুখীন, তাহাতে বর্ত্তমানে জীবিকার উপায় সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা যে সতর্কতার সহিত আদান-প্রদান করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, আমরা সেই সতর্কতা কবে অবলম্বন করিব?

স্বর্ণ রপ্তানী

ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর হইতে এযাবৎ (গত ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত) ভারত হইতে মোট ২২৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ২ শত ১৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

যাঁহারা এই স্বর্ণের ক্রেতা তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বর্ণের প্রয়োজনীয়তার উপর অতীব শ্রদ্ধাশীল এবং জগৎ যাহাতে স্বর্ণের উপর শ্রদ্ধাযুক্ত হয় তাহার চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমান জগৎ স্বর্ণকে আহার্য্য ও পরিধেয় অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে ধাতুজাত মুদ্রাগুলি প্রচলিত হইয়াছিল আহার্য্য ও পরিধেয়ের আদান-প্রদানের সহায়তার জন্য। কিন্তু বর্ত্তমানে মুদ্রার জন্য প্রয়োজনীয় (খালি উদ্বৃত্ত নহে) আহার্য্য ও পরিধেয় পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা কি প্রকৃতির বিরোধিতা নহে? প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাবে চলিলে যে অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা, আজ জগতের কি সেই অবস্থাই হয় নাই? জগৎ কবে প্রকৃতিকে বুঝিয়া তাঁহাকে মানিতে শিখিবে?

ইংলণ্ডের অবস্থা

ইংলণ্ডের বাণিজ্য-সভার প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়াল্টার রান্সিম্যান (Mr. Walter Runciman) বিগত ১৪ই মার্চ্চ লণ্ডনে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে দুইটী কথার উপরই জোর দিয়াছেন:—

(১) তিন বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের যে অবস্থা ছিল তাহার তুলনায় উহার বর্ত্তমান অবস্থা অনেক ভাল এবং তিনি আশা করেন যে, ঐ অবস্থা ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

(২) ইংলণ্ডবাসীদিগকে বিশেষভাবে উদ্যোগী (enterprising) ও সুচতুর (ingenious) হইতে হইবে এবং নূতন প্রণালীতে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যে-কোন প্রকার বাধা-বিঘ্নের প্রতিরোধার্থ সম্মুখীন হইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ইংলণ্ডের অবস্থার কি প্রকার উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কোন্ অবস্থা ইষ্টপ্রদ তৎসম্বন্ধে বৃটিশ অর্থনৈতিকগণ যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে অনেক ভ্রম আছে বলিয়া আমরা মনে করি। যে অর্থনীতি অবলম্বনে ইংলণ্ডের ব্যবসা ও বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে, সেই নীতিই যে তাঁহাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ এবং তাহা পরিবর্ত্তন না করিলে যে তাঁহাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে না বৃটিশ অর্থনৈতিকগণ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। তাহার ফলে আজ ইংলণ্ডের এবং ভারতের অবস্থা শঙ্কাপ্রদ। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যেরূপ শৃঙ্খলাযুক্ত এবং নিয়মানুগ, তাহাতে তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে জনসাধারণের বিপত্তির আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবেই। আমাদের মনে হয়, ইংলণ্ডের বণিক ও অর্থনৈতিকগণ অপেক্ষা শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ দেশের অবস্থা অপেক্ষাকৃত গভীর-ভাবে দেখিবার সুযোগ পান। ঐ সকল কর্ম্মচারীগণের মধ্যে যাঁহারা যৌবনের উত্তেজনা অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অর্থনৈতিকগণের ভ্রান্ত সংস্কার দূরীকরণে যত্নবান হইলে, ইংলণ্ড আবার প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বতোভাবে জগতের প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবেন।

বিবিধ

যুক্ত-নির্ব্বাচন

ঢাকার নবাবের সভাপতিত্বে কিছুদিন পূর্ব্বে নয়াদিল্লীতে একটী নিখিল ভারত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় যুক্ত-নির্ব্বাচন মুসলমানদের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন এবং ইহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বদলের গ্রহণযোগ্য কোনরূপ সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বজায় থাকা উচিত—সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আমাদের মুসলমান বন্ধুগণ যখন মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রয়োজন আছে, তখন নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে বলিতে হইবে। কিন্তু দেশে বাঁটোয়ারার যোগ্য আসল জিনিস যাহাতে বৃদ্ধি পায় ও দেশের সমস্ত অধিবাসী যাহাতে সেই জিনিষের ভাগ পায়, সে বিষয়ে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক আছে কি না, সেই সম্বন্ধে নবাব সাহেব চিন্তা করিয়াছেন কি? এবং সেইরূপ সমবেত

চেষ্টার পথে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কতখানি অন্তরায় তাহা আমাদের মুসলমান বন্ধুগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ?

স্বাধীনতা

আগামী ১৫ই নভেম্বর ফিলিপাইন্‌-দ্বীপবাসীগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেন। প্রেসিডেন্ট্‌ রুজভেল্ট তাঁহাদের স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধীয় শাসন-বিধি অনুমোদন করিয়াছেন।

স্বাধীনতা পাওয়ার সংবাদ নিশ্চয়ই ভারতবাসীর মুখ-রোচক হইবে। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

ব্যক্তিগত

মহাত্মা গান্ধী

বিগত ২০শে মার্চ্চ হইতে মহাত্মা গান্ধী ২৫ দিনের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আগামী ১৯শে এপ্রিল প্রত্যুষে তিনি এই ব্রত ভঙ্গ করিবেন। যে সকল চিঠিপত্র জমিয়া রহিয়াছে তিনি এই সময়ের মধ্যে তাহা শেষ করিবেন এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় লেখাপাড়ার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। ইহা ছাড়া তাঁহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।

দৈনিক সংবাদপত্রে আরও প্রকাশ যে, গ্রাম্য শিল্পের পুনরুজ্জীবন সংশ্লিষ্ট কার্য্যের জন্য মহাত্মা গান্ধী শীঘ্রই সমগ্র ভারত পরিভ্রমণে বাহির হইবেন। গুজরাট হইতে তিনি ভ্রমণ আরম্ভ করিবেন; এই ভ্রমণের বিস্তৃত তালিকা মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রস্তুত হইতেছে।

আমরা এখনও মহাত্মার এই 'গ্রাম্য শিল্পের পুনরুজ্জীবন' সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। গ্রাম্য শিল্পের পুনরুজ্জীবন চেষ্টা সফল হইবে কি না, তদ্দ্বারা দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার মোচন সম্ভব কি না, তাহা গভীর চিন্তার বিষয়।

শোকসংবাদ

টি. এ. কে. শেরওয়ানি

বিগত ২২শে মার্চ্চ প্রত্যুষে নয়াদিল্লীতে বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা মিঃ টি. এ. কে. শেরওয়ানি পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আলিগড়ের বিখ্যাত শেরওয়ানি বংশে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯০৩ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০৯ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৯১২ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আলিগড় কোর্টে প্রাকৃটিস্‌ আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করেন।

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি মুসলিম লিগের সেক্রেটারী ছিলেন এবং যুক্ত-প্রদেশের প্রতিনিধিস্বরূপ মিঃ মণ্টেগুর নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন।

১৯১৫ সালে কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন। ১৯২০ সালে আইন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে শেরওয়ানি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

কারামুক্ত হইয়া তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের নির্দ্দেশে ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। এই সময়েই আবার তাঁহাকে কারাবাস করিতে হয়। ১৯৩১ সালে তিনি তৃতীয়বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

অতঃপর ১৯৩৪ সালে, তিনি পুনরায় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫১ বৎসর হইয়াছিল।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলন

আগামী গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশে (১৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হইতে) তালতলা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। মূল সভাপতি শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। শাখা-সভাপতিগণের নাম নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল।

(ক) সাহিত্য-শাখা—সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।
(খ) বিজ্ঞান-শাখা— " শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
(গ) বৃহত্তর বঙ্গ শাখা—" শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি।
(ঘ) ইতিহাস শাখা— শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
(ঙ) ধনবিজ্ঞান শাখা— শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সিংহ।
(চ) চারুকলা শাখা— শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
(ছ) শিশু সাহিত্য—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী।
(জ) মহিলা শাখা—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা সেনগুপ্তা।

শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—জনৈক "অর্থনীতির ছাত্র"

আমরা আগেই বলিয়াছি 'দেশ' বলিতে মোটামুটি বুঝায় জমি, জীব ও জলহাওয়ার সমষ্টি। 'দেশ' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে মানুষের উপাদান ও কর্ম্মশক্তি কাহাকে বলে এবং তাহার উন্নতি ও অবনতির কারণ কি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার প্রয়োজন হয়। ইহারই জন্য মানুষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি আমরা এতাবৎ বলিয়াছি—

(১) মানুষ বলিতে কি বুঝায়।
(২) মানুষের মধ্যে তারতম্যের কারণ ও তাহার রূপ।
(৩) মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য।
(৪) মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ।
(৫) বিভিন্ন কার্য্যানুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ।
(৬) চালচলনানুযায়ী মানুষ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা নির্ণয় করিবার উপায়।
(৭) মানুষের 'কার্য্য' ব্যাপারটী কি?
(৮) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকম কার্য্য করে কেন?
(৯) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের পদার্থ চায় কেন?
(১০) বিভিন্ন মানুষ যে বিভিন্ন রকম কার্য্য করে তাহাতে তাহার পরিণাম কি হয়।

মানুষের উন্নতি ও অবনতি কেন হয় তাহা বিশদরূপে জানিতে হইলে যে সমস্ত বিষয় জ্ঞাতব্য, তাহার সকল কথা আমাদের এখনও বলা হয় নাই। একই উদ্দেশ্যে একই কার্য্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের হাতে কিরূপে বিভিন্ন প্রণালীর হইয়া পড়ে তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান সংখ্যার বক্তব্য।

মানুষ সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা এতাবৎ বলিয়াছি এবং ভবিষ্যতে বলিব তাহার মূল উদ্দেশ্য—জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করা।

'জাতি' বলিতে দেশের লোকের সমষ্টি বুঝায় তাহাও আমরা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু কেবলমাত্র 'জাতি' বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা থাকিলেই 'জাতীয় সমস্যা' কি তাহা জানা হয় না। দেশে কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, 'সমস্যা' শব্দটী বিশদরূপে বুঝিতে হইবে।

যতক্ষণ নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের মনে কোন 'সমস্যা'র কথা উপস্থিত হয় না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মানুষের মনে কোন অভাবের কথা জাগ্রত হয় তখনই সে 'সমস্যা' অনুভব করিতে আরম্ভ করে। মানুষের অভাব-বোধ সাধারণতঃ দুই কারণে উপস্থিত হয়:— (১) যাহা নাই তাহা পাইবার ইচ্ছা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত, তজ্জনিত 'অভাব' এবং (২) যাহা ছিল তাহা হারাইয়া গেলে যখন অনুভূতি হয় যে তাহার একটী প্রয়োজনীয় বস্তু হারাইয়া গিয়াছে, তখন তাহার জন্য অভাব। প্রথমোক্ত 'অভাব'টী সাধারণ গরীব লোকের যে অভাব তৎসদৃশ। আর দ্বিতীয় অভাবটী ধনবান মানুষ যখন দরিদ্র দশায় নিপতিত হইতে থাকে তখন তাহার যে প্রকারের অভাব হয় তদনুরূপ। দুই রকমের অভাবের অবস্থাতেই মানুষের স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি জন্মে এবং অভাবের পূরণ না হইলে নিজ অবস্থার সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয়। নিজ অবস্থার সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তাহারই নাম 'সমস্যা'। *

জাতীয় সমস্যা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর:—(১) একটী উত্থানশীল জাতি যখন তাহার উন্নতির জন্য নানাবিধ বস্তুর

---

* সমস্যা শব্দটী বিশ্লেষণ করিলে ইহার ভিতর পাওয়া যায় (১) 'সম্' একটী উপসর্গ—তাহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে (২) 'অস্' ধাতু—তাহার অর্থ বর্ত্তমান থাকা (৩) 'য' একটী ভাববাচক কৃদন্ত প্রত্যয়, এবং (৪) 'আ'—বৈয়াকরণিকগণের প্রচলিত ধারণানুসারে ইহা একটী স্ত্রী প্রত্যয়। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে ইহাকে প্রশ্নার্থক বলা যাইতে পারে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে "সমস্যা" শব্দের অর্থ হয়, সম্পূর্ণ অস্তিত্বের সম্বন্ধে প্রশ্ন।

কামনা করে এবং অপূর্ণতা অনুভব করিয়া নিজ অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই উত্থানশীল জাতির যে সমস্যা হয় তাহা এক শ্রেণীর। (২) আর কোন উন্নত জাতির যখন পতন আরম্ভ হয়, তখন তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে একটীর পর একটী বস্তু হারাইতে আরম্ভ করে এবং ঐ জাতি নষ্ট বস্তুর জন্য অভাব অনুভব করিয়া নিজ অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্নের আলোচনা আরম্ভ করে। পতনশীল জাতির নিজ অবস্থা সম্বন্ধে এই যে প্রশ্ন, ইহা আর এক শ্রেণীর জাতীয় সমস্যা।

জমি, জীব ও জলহাওয়া সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য এবং ভারতবর্ষের জমি, জীব ও জলহাওয়া কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সুপরিষ্কার জ্ঞান না থাকিলে ভারতবর্ষের সমস্যা কোন্ শ্রেণীর এবং কোন্ বিষয়ক, তাহা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। ইহারই জন্য আমরা ভারতবর্ষের সমস্যা কোন্ শ্রেণীর এবং কি কি বিষয়ক, তৎসম্বন্ধীয় কোন আলোচনা উত্থাপন করিবার আগে জমি, জীব ও জলহাওয়ার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই কথাগুলি প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু নীরস। মানুষের মন সাধারণতঃ নীরস বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে চায় না। কিন্তু প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলে মানুষ স্বীয় প্রযত্ন দ্বারা নীরস বিষয়েও অভিনিবিষ্ট হয়।

আমরা এতাবৎ কেবলই নীরস বিষয়ের আলোচনা করিয়া আসিতেছি। তাহাতে হয়ত আমাদের পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া ভারতবর্ষের সমস্যার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য ইহার জমি, জীব ও জলহাওয়া কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় একটী বিবৃতি প্রদান করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

ভারতবর্ষের জমিগুলির উর্ব্বরাশক্তি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে, জলহাওয়া ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে, ভারতীয় মানুষগুলির পরমায়ু ও যৌবন ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। যে জমির প্রতিবিঘায় বর্ত্তমানে ৪ মণ ফসল হয়, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেই জমিতে ৭ মণ ফসল হইত; যে গ্রামগুলি আজ ম্যালেরিয়ার জন্য বাসের অনুপযুক্ত এবং জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, সে সমস্ত গ্রাম একদিন স্বাস্থ্যকর ও বহু অধিবাসী পরিপূর্ণ ছিল; যে সমস্ত পরিবারে এখন আর ৫০ বৎসরের অধিকবয়স্ক লোক একজনও দেখা যায় না, সেই সমস্ত পরিবারে কিছুদিন আগেও ৭০।৮০ বৎসর ও তদূর্দ্ধবয়স্ক একাধিক লোক দেখা যাইত। ভারতবর্ষের গত ২৫০০ হাজার বৎসরের ইতিহাস প্রতি দশ বৎসরে এক একটি ভাগে বিভাগ করিয়া লইলে প্রত্যেক পরবর্ত্তী দশ বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের তুলনায় তাহার জমি, মানুষ ও জলহাওয়ার অবনতি ঘটিতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ত্তমান ভারতের জমির উর্ব্বরাশক্তি, জলহাওয়ার স্বাস্থ্য, মানুষের পরমায়ু ও কর্ম্মশক্তি যে দ্রুতগতিতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার অবরোধ অনতিবিলম্বে সংঘটিত না হইলে আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ বাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িতে পারে। অথচ জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ এখনও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শস্যশালী এবং ভারতের কৃষক অন্যান্য দেশের কৃষকের তুলনায় কম পরমুখাপেক্ষী। পূর্ব্বাপর সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, ভারতে ২৫০০ হাজার বৎসর আগে—অবশ্য কতদিন আগে তাহা সঠিক বলা যায় না—এমন একটী সময় ছিল, যখন মানুষের যাহা কিছু অভীষ্ট তাহা পাওয়া যাইত।

ভারত যে মাত্র ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে তাহা নহে। জগতে অন্যান্য দেশের অধিবাসীবৃন্দও ভারত হইতে তাঁহাদের বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ চিরদিন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। গত ২৫০০ হাজার বৎসরের জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবাসী তাহার অন্নসংস্থানের জন্য কোন দেশান্তরে যায় নাই, অথচ যখন যে দেশবাসী ভারতবাসীর সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছেন, তখনই তাঁহারা জগতে তাঁহাদের প্রাধান্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রীকগণের, রোমকগণের এবং আরবগণের প্রাধান্য-সময়ে তাঁহাদের যে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল তাহা অনুমান করা খুব কষ্টসাধ্য নহে। বর্ত্তমান ইংরাজগণেরও জগতের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে তখনই, যখন তাঁহারা ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ দৃঢ়মূল করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যে দেশ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের অধিবাসীবৃন্দের প্রয়োজন সংগ্রহ করিতে সক্ষম এবং অধিকন্তু তাহার সহিত

সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ জাতিগুলির প্রাধান্যস্থাপনের সহায়তা করিতে সমর্থ, তাহাকে দেশহিসাবে স্বাধীনতাসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। কাজেই ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন ও সম্পূর্ণ ছিল। **যে শ্রেণীর স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণতা ভারতবর্ষ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, জগতের অপর কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত সেই শ্রেণীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অর্জ্জন করিতে পারে নাই তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।** কারণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও আজও পর্য্যন্ত কোনও জাতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কোন্ বিদ্যায় সেই স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সমস্ত জগৎ এখনও অপরিজ্ঞাত। ভারতবাসীগণও সেই বিদ্যা ন্যূনকল্পে চারি হাজার বৎসর আগে বিস্মৃত হইয়াছেন এবং ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ও সম্পূর্ণ ছিল, অথচ অদূরভবিষ্যতে তাহা বাসোপযোগী থাকিবে কিনা তৎসম্বন্ধে পর্য্যন্ত প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষের সমস্যা যে অতীব গুরুতর তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে ইহাকে আর ছোট-স্তরের অথবা বড়-স্তরের সমস্যা বলা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে ইহা এখন ভারতবাসীর ও ভারতবর্ষের জীবন-মরণের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জমি, জীব ও জলহাওয়া সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলা না হইলে, এই সমস্যার পূর্ণবিবৃতি ও ইহার পূরণের উপায় বিবৃত করা সম্ভব নহে। কাজেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য নীরস হইলেও মানুষের কথা, জমির কথা ও জলহাওয়ার কথা আরও কিছুদূর বলিতে হইবে।

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কার্য্যের স্বরূপ ও তাহার পরিণাম

"বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণামের" কথাপ্রসঙ্গে ইন্দ্রিয়প্রবণ, মনঃপ্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য, কার্য্যপ্রণালী, কার্য্যশক্তি ও প্রত্যেকটীর উদ্দেশ্যের প্রণালী ও শক্তির পরিণাম কিরূপ হয়, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কার্য্যের উদ্দেশ্য ও প্রণালীতে কিরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা অনুধাবন করিলে, একই কার্য্য ও তাহার ফলাফল বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের হাতে কিরূপ বিভিন্ন হইয়া পড়ে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তথাপি আমাদের বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য কয়েকটি কার্য্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিচালনায় কিরূপ বিভিন্ন হয় তাহা উদাহরণ স্বরূপ দেখাইবার চেষ্টা করিব।

যে সমস্ত কার্য্য আমাদের পর্য্যালোচ্য, তাহাদের নাম—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সাহিত্য-রচনা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, দেশহিতৈষণা ও গবেষণা। ইহার মধ্যে সাহিত্য-রচনার ও চাকুরীতে উন্নতি লাভ করিবার কার্য্য যে তিন শ্রেণীর মানুষের হাতে তিন রকমের হয় তাহা আমরা আগেই বিভিন্ন কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়াছি। ঐ প্রসঙ্গে একই কার্য্য যে প্রণালীভেদে বিভিন্ন রকমের হইতে পারে তাহা দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন্ শ্রেণীর মানুষের হাতে কিরূপ বিভিন্ন হয় এবং তাহার ফলাফল কি তাহা পরিষ্কার দেখান হয় নাই। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাহা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

অধ্যয়ন

ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যয়ন

স্বরূপ :—কোন্ বিষয়ক এবং কোন্ গ্রন্থকারের লিখিত পুস্তক অধ্যয়ন করা উচিত তৎসম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া যে কোন পুস্তক পাইবা মাত্র তাহাই যখন পড়িতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকর আখ্যান না পাইলে পাঠ বন্ধ করা হয়, তখন তাহাকে ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যয়ন বলা যাইতে পারে। কোন কিছু চিন্তা না করিয়া অবয়বের উপভোগ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করার উদ্দেশ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া ইন্দ্রিয়-প্রাধান্যের লক্ষণ তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। অধ্যয়ন-কার্য্যে যাঁহারা ইন্দ্রিয়প্রবণ তাঁহারা পুস্তকের ছবিগুলিতে যতখানি আকৃষ্ট হন, পুস্তকের লিখিত বিষয়ে ততখানি আকৃষ্ট হন না। অশ্লীল এবং কুৎসিত ছবিগুলিতে আকৃষ্ট হওয়া অধ্যয়নবিষয়ে ইন্দ্রিয়প্রাধান্যের লক্ষণ।

প্রণালী :—সমস্ত ইন্দ্রিয়প্রধান কার্য্যের মত অধ্যয়ন বিষয়ে যাঁহারা ইন্দ্রিয়প্রবণ তাঁহারা পুস্তকলিখিত বিষয় ইন্দ্রিয়-

তৃপ্তিকর হইলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িতে থাকেন বটে, কিন্তু কোন্ বিষয় পড়িতেছেন, পঠিত বিষয়ে শিক্ষণীয় কিছু আছে কিনা তাহা একবারও চিন্তা করেন না।

পরিণাম :—কোন্ বিষয় কেন অধ্যয়ন করা উচিত তাহা চিন্তা না করিয়া পাঠ করিবার ফলে ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যয়ন-কার্য্যে পাঠকের কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় না। অধিকন্তু ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বিষয়ের পাঠকার্য্যে মত্ততার ফলে বহু অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা লক্ষিত হয়। তাহাতে পাঠকের জীবনযাত্রায় অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

মনঃপ্রধান অধ্যয়ন

স্বরূপ :- কোন্ বিষয় অধ্যয়ন করিলে নিজ সামর্থ্যের উন্নতি সাধন হইতে পারে, অথবা কোন্ গ্রন্থকারের দ্বারা কোন্ বিষয় যথাযথ ভাবে লিখিত হওয়া সম্ভব তাহা চিন্তা না করিয়া যখন কেবল মাত্র অনুকরণবশে পণ্ডিত নাম অর্জ্জন করিবার জন্য পড়াশুনার কার্য্য করা হয়, তখন তাহাকে মনঃপ্রধান অধ্যয়ন-কার্য্য বলা যাইতে পারে। পুস্তকখানি পড়িয়া নিজ সামর্থ্য-বৃদ্ধিকর কোন কার্য্যে উপদেশ পাওয়া যাইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য না করিয়া অমুক পণ্ডিত যখন এই পুস্তকখানি পড়িয়াছেন, আমারও তখন উহা নিশ্চয়ই পড়িতে হইবে - এবংবিধ মনোবৃত্তির সহিত যে অধ্যয়ন তাহা মনঃপ্রধান।

প্রণালী :—যাঁহারা মনঃপ্রধান পাঠক, তাঁহারা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িতে থাকিলেও কি বিষয় পড়িতেছেন, বিষয়ের বিবৃতিতে কোন অসামঞ্জস্য আছে কিনা তাহা সম্যক্ ভাবে পর্য্যালোচনা করেন না। পাণ্ডিত্যের অভিনয় করিবার জন্য প্রচলিত সমালোচনার অনুকরণে পঠিত বিষয়ের সমালোচনা করিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমালোচনা কথনও সমীচীন হইতে পারে না। মনঃপ্রধান অধ্যয়ন-কার্য্যে কথনও শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় না, অপরের কথা বিনা বিশ্লেষণে স্মরণ রাখিয়া উদ্ধৃত করিতে পারা পাণ্ডিত্য-পরিচয় বলিয়া বিবেচিত হয়। পঠিত বিষয়ের সারাংশ খুঁজিয়া বাহির করিবার চিন্তাশীলতা অর্জ্জিত না হওয়ায়, যে বিষয় অল্প সময়ে ও অল্প কথায় প্রকাশিত হইতে পারে তাহা বিস্তৃত করিয়া লওয়া হয়। ফলে মনঃপ্রধান অধ্যয়নশীলগণ এক একটী বিষয়ে অযথা বহু সময় ক্ষেপণ করিয়া "কথার ঝুড়ি"তে পরিণত হন এবং তাঁহাদের অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু বিষয় অপরিজ্ঞাত থাকে। এক একটী বিষয়ে অনেকের অনেক কথা সংগ্রহ করার ফলে তাঁহারা নিজদিগকে পণ্ডিত মনে করিতে থাকেন, অথচ জ্ঞাতব্য অধিকাংশ বিষয়েই যে তাঁহাদের অজ্ঞতা থাকে তাহাও বিস্মৃত হন।

পরিণাম :--পঠিত বিষয় স্বীয় সামর্থ্যের উন্নতি-সাধনের উপদেশসম্বলিত কিনা তদ্বিষয়ে কোন চিন্তা না করিয়া অধ্যয়নের ফলে মনঃপ্রধান অধ্যয়ন-কার্য্যে কোন হিতকর জ্ঞান লাভ হয় না। পরন্তু অনেক পড়া হইয়াছে এই জাতীয় ধারণা বশতঃ বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান উপস্থিত হইয়া মনঃপ্রধান অধ্যয়ন স্বীয় অবনতিকর বিকৃত জ্ঞান উৎপন্ন করে। কিঞ্চিন্মাত্র অধ্যয়ন না করিয়া নিরক্ষর থাকিলে মানুষের যে পরিমাণ অনিষ্ট হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্টের সম্ভাবনা—মনঃপ্রধান অধ্যয়নের ফলে; কারণ যাঁহারা মনঃপ্রধান অধ্যয়নরত তাঁহারা জ্ঞানের নামে কুজ্ঞানময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে থাকেন এবং সমাজের সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাদের অনুকরণে বিপথগামী হন।

বুদ্ধিপ্রধান-অধ্যয়ন

স্বরূপ :—কোন পুস্তক চোখের সম্মুখে আসিলেই সেই পুস্তক কোন্ বিষয়ে রচিত হইয়াছে, পুস্তকের বিষয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পুষ্টিকর কিনা, গ্রন্থকার তাঁহার রচনাপ্রণালীতে স্বাভাবিক, সহজ ও সরল শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা, গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত গ্রন্থে লিখিত বিষয়ের সামঞ্জস্য আছে কিনা এবংবিধ চিন্তা করিয়া যাঁহারা অধ্যয়নের পুস্তক ও গ্রন্থকার নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদের অধ্যয়ন 'বুদ্ধিপ্রধান'।

প্রণালী :—পঠিত বিষয়ের সারাংশ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা, পুস্তকের বিভিন্নাংশ প্রধান প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কিনা তাহার বিচার করা, বক্তব্য বিষয় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অথবা আত্মার কোন কর্ম্ম-নির্দ্দেশক অথবা কর্ম্মোদ্ভূত অবস্থার জ্ঞাপক কিনা তাহার পরীক্ষা করা—বুদ্ধিপ্রধান অধ্যয়নের প্রধান লক্ষণ। বুদ্ধিপ্রধান পাঠকগণ সর্ব্বদা পুস্তকে অধীত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে এবং ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা

করেন। তাঁহাদের অধ্যয়ন কখনও পুস্তকে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রেও প্রকৃতির মধ্যেই অধ্যয়নযোগ্য বহু বিষয় দেখিতে পান এবং সেই সমস্ত বিষয় অধ্যয়ন করিতে তাঁহাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। বুদ্ধিপ্রধান অধ্যয়ন-কার্য্য সর্ব্বদা শৃঙ্খলাময়। *

পরিণাম :—পঠিত বিষয়ের সারাংশ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টার জন্য বুদ্ধিপ্রধান অধ্যয়নে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অতি অল্প কথায় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এবং তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বুদ্ধিপ্রধান পাঠকগণ প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন।

পঠিত বিষয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য কিনা এবং তৎসম্ভূত জ্ঞান প্রকৃতির সমঞ্জসীভূত কিনা তাহার পর্য্যালোচনার ফলে বুদ্ধিপ্রধান অধ্যয়ন হইতে কখনও বিকৃত জ্ঞান লাভ হইবার আশঙ্কা থাকে না। জ্ঞান বিকৃত না হইলে কখনও পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি পাইতে সমর্থ হন, তাঁহারা যে কোন কার্য্যক্ষেত্রে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজ জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হন। আর যাঁহাদের জীবিকার জন্য কাহারও অযথা তোষামোদ করিয়া চাকুরী সংগ্রহ অথবা উন্নতি সাধন করিতে হয়, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী হইলেও বিকৃত জ্ঞানসম্পন্ন বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিপ্রধান অধ্যয়নকারীগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের নিজের এবং পারিপার্শ্বিকগণের হিত সাধন করিয়া সামর্থ্যশালী হইয়া থাকেন।

আধ্যাত্মিক অধ্যয়ন

স্বরূপ :- দুনিয়ার সমস্ত বস্তুগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর নাম **লৌকিক** এবং অন্য শ্রেণীর নাম **বৈদিক**।

প্রত্যেক বস্তুর তিনটী অবস্থা আছে, যথা—কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। বস্তুর কঠিন এবং তরল অবস্থা (ভারতীয় ঋষিদিগের ভাষায় 'প্রকৃতির বিকার' অবস্থা) সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। কিন্তু বস্তুর বায়বীয় অবস্থা (ভারতীয় ঋষিদিগের ভাষায় 'প্রকৃতির বিকৃতি' অবস্থা) সর্ব্বদা মানুষের পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিযোগ্য নহে। কোন কোন বায়বীয় অবস্থা চারিটী ইন্দ্রিয়ের, কোন কোন বায়বীয় অবস্থা তিনটী ইন্দ্রিয়ের, কোন কোন বায়বীয় অবস্থা দুইটী ইন্দ্রিয়ের, কোন কোন বায়বীয় অবস্থা একটী মাত্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিযোগ্য। আবার কোন বায়বীয় অবস্থা কোন ইন্দ্রিয়েরই অনুভূতিযোগ্য নহে, কেবলমাত্র আত্মার অনুভূতিযোগ্য।

বস্তুর যে যে অবস্থা পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিযোগ্য তাহা 'লৌকিক', আর যে অবস্থা কোন ইন্দ্রিয়েরই অনুভূতিযোগ্য নহে তাহা 'বৈদিক'। বস্তুর কেবল সেই অবস্থাই মানুষের বুদ্ধি অধ্যয়ন করিতে পারে, যে অবস্থা ন্যূনকল্পে একটী মাত্র ইন্দ্রিয়েরও অনুভূতিযোগ্য। কিন্তু যে অবস্থা একটী মাত্র ইন্দ্রিয়েরও অনুভূতিযোগ্য নহে মানুষের বুদ্ধি তাহা অধ্যয়ন করিতে পারে না। বস্তুর সেই অবস্থা অধ্যয়ন করিতে পারে মানুষের আত্মা; মানুষের আত্মাকে অধ্যয়নযোগ্য করিতে হইলে বস্তুর বৈদিক অবস্থা হইতে আরম্ভ করিতে হয়। বৈদিক অবস্থার অধ্যয়নের নাম "আধ্যাত্মিক অধ্যয়ন"।

প্রণালী : আমরা আধ্যাত্মিক অধ্যয়নের প্রণালী সম্যক্ পরিজ্ঞাত নহি। যে প্রণালী "আধ্যাত্মিক অধ্যয়নের প্রণালী" বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। কাজেই তৎসম্বন্ধে এখন কোন আলোচনা করিব না।

পরিণাম :—আধ্যাত্মিক অধ্যয়নের ফলে দেশের জমি কি করিয়া অসীম উর্ব্বরাশক্তি সম্পন্ন হইতে পারে, জলহাওয়া কি করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে স্বাস্থ্যকর থাকিতে পারে এবং মানুষ কি করিয়া সর্ব্বদা স্বাধীন, সন্তুষ্ট, শান্তিপূর্ণ, দীর্ঘ যৌবন ও পরমায়ুসম্পন্ন থাকিতে পারে তাহা জানা যায় - ইহা আমাদের অনুমান।

অধ্যাপনা

ছাত্রগণ যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইয়া একটী সম্পূর্ণ মনুষ্যে পরিণত হইতে পারে তাহার বিধান করাই অধ্যাপনার উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা লইয়া মানুষের পূর্ণাঙ্গতা। পূর্ণাঙ্গতা এবং নিজের প্রতি ও নিজ সমাজ ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনের সামর্থ্য লইয়া মানুষের সম্পূর্ণতা।

* অধ্যয়নকার্য্যের শৃঙ্খলা বলিতে আমরা বুঝি—প্রথমতঃ, যে বিষয় সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হয় তৎসম্বন্ধে কি কি নূতন সংবাদ জানা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা;—দ্বিতীয়তঃ, ঐ সমস্ত সংবাদ পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের পোষক অথবা বিরোধী তাহা পরীক্ষা করা।

কাজেই অধ্যাপনার উদ্দেশ্য :—(১) ছাত্রগণের ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপুষ্টিসাধন, (২) তাহাদের মনের পরিপুষ্টি-সাধন, (৩) বুদ্ধির পরিপুষ্টিসাধন, (৪) আত্মার পরিপুষ্টি-সাধন, (৫) নিজের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন, (৬) সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন, এবং (৭) জাতির প্রতি কর্ত্তব্যসাধন। ইন্দ্রিয়াদির পরিপুষ্টি সাধিত হইলে এবং নিজের, সমাজের ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে শিক্ষা করিলে ছাত্রগণ স্বাবলম্বী, শান্তিপূর্ণ, সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে। কাজেই ছাত্রগণের ইন্দ্রিয়াদির পরিপুষ্টি সাধন এবং তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান বিধানকেই অধ্যাপনার উদ্দেশ্য বলা যায়। ছাত্রগণের শিক্ষা যথাযথ হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রানির্ব্বাহে।

ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যাপনা

স্বরূপ :—কি উদ্দেশ্যে অধ্যাপনা করা হইতেছে তাহা না জানিয়া অথবা তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া অধ্যাপক যখন তাঁহার খেয়ালানুযায়ী ছাত্রদিগকে পড়াইয়া যান এবং বস্তুতঃ-পক্ষে অধ্যাপনার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে কি না তৎসম্বন্ধে যথাযথ পরীক্ষা না করিয়া বেশ ভাল পড়ান হইতেছে বলিয়া ভাবিয়া তৃপ্তি লাভ করেন—তখন অধ্যাপনার কার্য্য ইন্দ্রিয়-প্রধান বলিয়া মনে করিতে হইবে।

প্রণালী :—ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যাপনায় কোন উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত না থাকায় অধ্যাপনার প্রণালীতেও কোন শৃঙ্খলা থাকে না। কখনও গল্প করিয়া, কখনও বক্তৃতা দিয়া, কখনও লিখিত পরীক্ষা করিয়া, কখনও মৌখিক পরীক্ষা করিয়া এবং কখনও ছাত্রদিগের দ্বারা মুখস্থ করাইয়া অধ্যাপনা নির্ব্বাহ করা হয়। ছাত্রদিগের বয়স ও সামর্থ্যের অনুপাতে কোন্ প্রণালীতে শিক্ষা দিলে ছাত্রগণ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবংবিধ কোন চিন্তাই ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যাপনায় পরিলক্ষিত হয় না।

পরিণাম :—ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যাপনার ফলে ছাত্রগণের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, অবনতিই ঘটিয়া থাকে। ছাত্রদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ইন্দ্রিয়প্রবণতা এবংবিধ অধ্যাপনা-কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহাতে কুশিক্ষার বিস্তৃতি সংঘটিত হয়। অধ্যাপকগণের ও অধ্যাপনার কার্য্যে সামর্থ্যের কোনরূপ উন্নতি সংঘটিত হয় না এবং তাঁহাদেরও ক্রমশঃ অবনতি ঘটে।

মনঃপ্রধান অধ্যাপনা

স্বরূপ :—মনঃপ্রধান অধ্যাপনা-কার্য্যেও কি করিয়া ছাত্র-দিগের বাস্তব উন্নতি হইবে, অথবা বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের কোন উন্নতি হইতেছে কি না তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য থাকে না। অমুক অমুক বিদ্যালয়ে অথবা অমুক অমুক অধ্যাপক যখন অমুক অমুক বিষয় অধ্যাপনার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন, অতএব আমাদিগকেও ঐ ঐ বিষয় অধ্যাপনা করিতে হইবে এবংবিধ যুক্তি মনঃপ্রধান অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য। দুইটী স্থানের ছাত্রগণের শিক্ষাগ্রহণের সামর্থ্যে যে বহুবিধ পার্থক্য থাকিতে পারে সেদিকে আদৌ লক্ষ্য থাকে না। ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যানুরূপ গঠিত হউক আর নাই হউক, তৎপ্রতি অধ্যাপকদিগের যথেষ্ট দৃষ্টি না থাকিলেও তাঁহারা কি করিয়া অধ্যাপকসম্প্রদায়ের অথবা ছাত্রসম্প্রদায়ের 'বাহবা' অর্জ্জন করিবেন—তদ্বিষয়ে আগ্রহযুক্ত হওয়া মনঃপ্রধান অধ্যাপনার আর একটী লক্ষণ।

প্রণালী :—মনঃপ্রধান অধ্যাপনায়ও কোন শৃঙ্খলা থাকে না। ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যাপনার মত মনঃপ্রধান অধ্যাপকগণও কখনও গল্প করিয়া, কখনও বক্তৃতা করিয়া, কখনও লিখিত পরীক্ষা করিয়া, কখনও মৌখিক পরীক্ষা করিয়া, কখনও ছাত্র-দিগের দ্বারা মুখস্থ করাইয়া অধ্যাপনা-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শুধু পার্থক্য এই যে, ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যাপকগণের প্রায়শঃ খেয়ালের উপরই ছাত্রদিগের পাঠনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, আর মনঃপ্রধান অধ্যাপনা-কার্য্যে 'বাহবা' লইবার 'অতিরিক্ত' একটা ইচ্ছা জাগ্রত থাকে।

পরিণাম :—মনঃপ্রধান অধ্যাপনা-কার্য্যে, ছাত্রদিগের যথা-যথ গঠনের দিকে লক্ষ্যের অভাব বশতঃ ছাত্রগণ যথোপযুক্ত শিক্ষাতে শিক্ষিত হয় না, অধিকন্তু অধ্যাপকগণের বাহবা লইবার ইচ্ছা প্রকট থাকায় যথোপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়াও ছাত্রগণের শিক্ষিত তালিকান্তর্ভুক্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। মনঃপ্রধান অধ্যাপনার কুশিক্ষার বিস্তৃতি সংঘটিত হয় (কুশিক্ষা অশিক্ষা হইতেও ভয়াবহ)। মনঃপ্রধান অধ্যাপকগণের অধ্যাপনা-কার্য্যে কখনও উন্নতি সাধিত হয় না এবং তাঁহারা সর্ব্বদা অযথা অভিমানান্ধ হইয়া থাকেন।

বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনা

স্বরূপ :—অধ্যাপনা-কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ ছাত্রগণ যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইয়া একটী সম্পূর্ণ মনুষ্য হইতে পারে তদুপযোগী শিক্ষা বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনায় পরিলক্ষিত হয়।

প্রণালী :—বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনায় ছাত্রদিগের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষিত হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি প্রকৃতি অনুসারে বালকের শিক্ষা আরম্ভ হয়। কেহ কিছুই না শিখাইলেও প্রকৃতি স্বয়ং প্রথমতঃ বালকের পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ইচ্ছাশক্তি, তাহার পর পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ইচ্ছাশক্তি, তাহার পর দশটী ইন্দ্রিয়ের প্রযত্নশক্তি যাহাতে প্রস্ফুট হয় সে বিষয়ে সহায়তা করেন। দশটী ইন্দ্রিয়ের প্রযত্নশক্তি সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাইলে বালক যুবকরূপে পরিণত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের প্রযত্নশক্তি সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়া সঙ্কল্প গঠন করিবার ইচ্ছা ও প্রযত্নশক্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। কর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিয়া সঙ্কল্প গঠন করিবার শক্তির নাম "মননশক্তি"। যৌবনে পদার্পণ না করিলে "মননশক্তি" কিছুতেই পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। আবার "মননশক্তি" পরিপুষ্টি লাভ না করিলে "বুদ্ধিশক্তি" পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। কিছু না শিখাইলেও ইন্দ্রিয়ের প্রযত্নশক্তি, মনের মননশক্তি এবং বুদ্ধির বিচারশক্তি প্রকৃতির নিয়মবশতঃ আপনা হইতেই বালক যথা সময়ে আংশিক ভাবে অর্জ্জন করে। কিন্তু কেবল প্রকৃতির উপর নির্ভর করিলে, বালকের ইন্দ্রিয়ের প্রযত্নশক্তি এত অধিক হইয়া পড়িতে পারে যে, বালক যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন ইন্দ্রিয়ের প্রযত্নশক্তির ব্যবহার লইয়াই সে উন্মত্ত হয় এবং তাহার মননশক্তি আংশিক পরিমাণে পরিপুষ্ট হইলেও পূর্ণরূপে পরিপুষ্ট হয় না, ফলে তাহার বিচারশক্তিরও পরিপুষ্টি লাভ ঘটে না। ইহার জন্য বালককে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হয়। যে বয়সে যে শক্তি অর্জ্জন করা প্রকৃতিসম্মত নহে সেই বয়সে তাহা শিখাইতে চেষ্টা করা, অথবা যে শক্তি অর্জ্জিত না হইলে তৎপরবর্ত্তী শক্তি অর্জ্জিত হয় না, পূর্ব্ববর্ত্তী সেই শক্তি অর্জ্জন করিবার সহায়তা না করিয়া পরবর্ত্তী শক্তি অর্জ্জন করাইবার চেষ্টা করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য। বুদ্ধিমান্ অধ্যাপক প্রকৃতির এই নিয়মগুলি পরিজ্ঞাত হইয়া বালককে যে বয়সে যাহা শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা শিখাইবার চেষ্টা করেন এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে তাহা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় সেই উপায় অবলম্বন করেন। বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনায় কখনও বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় না।

পরিণাম :—ইন্দ্রিয়প্রধান অধ্যাপনার লক্ষ্য থাকে শিক্ষকদিগের স্বীয় বেতনের প্রতি। ফলে অধ্যাপনা বিকৃত হয় এবং ছাত্রগণ ইন্দ্রিয়প্রবণ হইয়া পড়ে। তাহাতে দেশে কোন শিক্ষারই বিস্তৃতি সম্ভব হয় না।

মনঃপ্রধান অধ্যাপনায় লক্ষ্য থাকে শিক্ষকদিগের স্বীয় বেতন এবং উপাধির প্রতি। ছাত্রগণেরও উপাধির প্রতি লক্ষ্য থাকে। ইহার ফলে ছাত্রগণ মনঃপ্রবণ হইয়া পড়ে। শিক্ষক ও ছাত্রগণের শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ও বিষয়ের উৎকর্ষের প্রতি কোন লক্ষ্য থাকে না। ঐ বিষয় সম্বন্ধে জগতের আর কে কি বলিয়াছেন তাহা বুঝিবার জন্য সমধিক চেষ্টা না করিয়া তাহা উদ্ধৃত করিতে এবং পাণ্ডিত্য দেখাইতে বিশেষ উদ্গ্রীব হইয়া পড়েন। তাহাতে দেশে শিক্ষার নামে কুশিক্ষার বিস্তার হয়। এই অবস্থা অতীব ভীষণ। অশিক্ষিত মানুষ প্রকৃতির নিয়ম জানিতে পারিলে এবং কোন্ বস্তু প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় তাহার সম্যক্ অনুসন্ধান পায় না বলিয়া দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে তাহা সত্য, কিন্তু তাহাদের নিজেদের অজ্ঞাতসারে আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির নিয়মানুগ হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং দুঃখ-কষ্টের সহিত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন লাভ করিতেও সমর্থ হয়। কুশিক্ষিত মানুষ কুজ্ঞানবশতঃ প্রায়শঃ প্রকৃতির বিরোধিতা করিতে করিতে ক্রমশঃ এতদূর অসার হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের দ্বারা দেশের ও আপন আপন সন্তান-সন্ততির কতদূর অনিষ্ট হয় তাহাও বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা অভিমানে মত্ত থাকেন, অথচ যৌবনের নিম্নতম সীমা অতিক্রম করিবার আগেই তাঁহাদের দেহ বিবিধ অসুস্থতার আকর হইয়া তাঁহারা অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যুর কবলে পতিত হন। যে দেশে মনঃপ্রধান অধ্যাপনা চলিতে থাকে সে দেশের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই ধ্বংসের মাত্রাও খুব বেশী। কলম্বস যখন আমেরিকায় উপনীত হইয়া তাহার আবিষ্কার (বর্ত্তমান ভাষানুসারে) করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন একটা প্রাচীন দেশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তত্রত্য লোকসংখ্যা অত্যন্ত অল্প দৃষ্ট

হইয়াছিল কেন, যদি কেহ তৎসম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাহা হইলে কুজ্ঞান প্রচারের ফলে দেশের ধ্বংসের মাত্রা কত অধিক হইতে পারে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনার লক্ষ্য থাকে বালককে মানুষ প্রস্তুত করা। যাঁহারা অধ্যাপনা-কার্য্যে বুদ্ধিপ্রধান তাঁহাদের স্বীয় বেতনের প্রতি অথবা উপাধির প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তাঁহাদের কার্য্যের ফলে প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধীয় পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আবিষ্কৃত হয় এবং দেশের সাধারণ অধিবাসীরাও প্রকৃতি-সম্মত উপায়ে চলিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, ফলে দেশ সর্ব্বতোভাবে সুখের আগার হয়।

আপন আপন ছাত্রগণ যাহাতে তাহাদের স্বীয় অভীষ্টলাভ করিতে পারে তাহা শিখাইবার জন্য কি করিয়া স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও সামর্থ্য বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা-কার্য্য গ্রহণ করিবার আগেই অর্জ্জন করিয়া থাকেন। প্রকৃতির সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বকালীন নিয়ম না জানা থাকিলে কখনও স্বীয় অভীষ্ট সর্ব্বতোভাবে লাভ করা যায় না। যাঁহারা বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনায় রত, তাঁহারা প্রকৃতির সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বকালীন নিয়ম অভ্রান্ত ভাবে পরিজ্ঞাত থাকেন। ফলে জগতের সমস্ত মনুষ্যসমাজ তাঁহাদের জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করিয়া তাহার অনুধাবন করে এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সমস্ত কলহ এবং যুদ্ধ বিদূরিত হয়।

আধ্যাত্মিক অধ্যাপনা

যে অধ্যাপনায় বস্তুর আত্মাসম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক অধ্যাপনা বলা যাইতে পারে। তাহা বস্তুতঃপক্ষে বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনার অন্যতম স্তর। কাজেই এতৎসম্বন্ধে আমরা আর পৃথক কোন আলোচনা করিব না। জগতে আধ্যাত্মিক মানুষ না থাকিলে প্রকৃতির সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বকালীন নিয়মে পূর্ণ জ্ঞান অভ্রান্তভাবে লাভ করা সম্ভব নয়। পূর্ণজ্ঞান অভ্রান্তভাবে লাভ করিতে পারিলে তাহার প্রয়োগ দ্বারা জগৎ সর্ব্বতোভাবে সুখের আগার হয়। তখন আর জানিবার কিছু বাকী থাকে না। এই সময়ে যাহাতে আধ্যাত্মিক আলোচনা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে, আধ্যাত্মিক মানুষের সংখ্যার লোপ হইবার সম্ভাবনা ঘটে এবং পূর্ণ জ্ঞানেরও বিকৃতি আসিয়া পড়ে। ফলে মনুষ্যসমাজে আবার ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কলহ ও যুদ্ধাদির সম্ভাবনা দেখা যায়। জগতের মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ অবনত হইয়া দুঃখক্লিষ্ট হইতে থাকে বটে, তবে যে দেশ পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তির উপর রচিত, সেই দেশের অবনতির চরম হইতে সহস্র সহস্র বৎসর লাগে।

বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনার উদাহরণ

আমরা বলিয়াছি—"যাঁহারা বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনায় রত তাঁহাদের জ্ঞানের নিকট জগতের সমস্ত মনুষ্যসমাজ মস্তক অবনত করিয়া তাহার অনুধাবন করে এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সমস্ত কলহ এবং যুদ্ধ বিদূরিত হয়।" যে জাতীয় বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপকগণ জ্ঞানের এতাদৃশ উন্নতি সাধন করিতে পারেন আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের অস্তিত্ব কাল্পনিক, কারণ বর্ত্তমান জগতে এমন কেহ নাই যাঁহার নিকট সমস্ত জগতের মনুষ্য-সমাজ মস্তক অবনত করেন। পরন্তু ধর্ম্ম লইয়া সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগুলির পরস্পরের মানোমালিন্য এবং যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ২৫০০ হাজার বৎসর আগে বর্ত্তমান জগতে যেরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, মনোমালিন্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ বর্ত্তমান আছে, ঐ রূপ ছিল কিনা তাহা সন্দেহ করিতে হয়। ২৫০০ হাজার বৎসর আগে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব। তাহার পর খৃষ্টধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব হইবার আগে জগতে একমাত্র ভারতীয় বেদোক্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারকগণ জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে যে স্থানে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানে অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে পুতুল, অগ্নি, জল প্রভৃতির পূজার প্রচার এবং জাতিভেদ দেখিতে পাইয়াছেন। খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকগণ পুতুল, অগ্নি এবং জল প্রভৃতির উপাসক ছাড়া, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাইয়াছেন এবং মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারকগণ এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী লোকও দেখিতে পাইয়াছেন। বর্ত্তমান জগতে ধর্ম্ম লইয়া বহু সাম্প্রদায়িকতা আছে বটে, কিন্তু যত কিছু সাম্প্রদায়িকতা দেখা

যায়, তাহার মূলে হয় বৈদিক বিজ্ঞান, নয় বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান এই কয়টী ধর্ম্মের কোন একটী যে বিদ্যমান তাহা সহজেই বোঝা যায়। এই কয়টীর মধ্যে বৈদিক প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং জগতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইবার আগে ইহার প্রভাব ছাড়া আর কোন প্রভাবের পরিচয় লক্ষিত হয় না। সকল ধর্ম্ম-প্রচারকগণ সর্ব্বত্রই, এমন কি গ্রীকগণের মধ্যেও—পুতুল, অগ্নি, জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক এক একটী শক্তির পূজার প্রচলন দেখিতে পাইয়াছেন। বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মেও দেবদেবীবোধে পুতুলের পূজা এবং জল, অগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির পূজা প্রচলিত আছে। কাজেই একথা বলা চলে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব হইবার আগে জগতের অন্যত্র যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহা বহুলাংশে হিন্দু ধর্ম্মের অনুরূপ। ঐ ধর্ম্মগুলি সর্ব্বতোভাবে হিন্দু ধর্ম্মের অনুরূপ তাহা বলা যায় না, কারণ বিভিন্ন জাতির আচার-পদ্ধতিতে ছোট বড় পার্থক্য যে ছিল তাহা অনুমিত হয়। এই জাতীয় পার্থক্য ভারতীয় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ঠিক প্রাচীন বৈদিক বিজ্ঞান কিনা তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, হিন্দু ধর্ম্ম যে প্রাচীন বৈদিক বিজ্ঞান হইতেই উদ্ভূত তাহা লইয়া মতভেদ নাই। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, **বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইবার আগে সারা জগতে ধর্ম্ম বলিয়া যাহা বিদ্যমান ছিল তাহার সমস্তই প্রাচীন বৈদিক বিজ্ঞান সম্ভূত।** ধর্ম্ম লইয়া এই সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য বাদবিসম্বাদের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। গ্রীক জাতির অভ্যুত্থানের পর হইতে জগতের ইতিহাস যে শ্রেণীর যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় প্লাবিত, গ্রীকজাতির অভ্যুত্থানের আগে জগতের ইতিহাসে সেই শ্রেণীর যুদ্ধবিগ্রহের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান জগতের জাতিগুলির পরস্পরের ভিতর যে রূপ ঈর্ষা, দ্বেষ এবং মনোমালিন্য পরিলক্ষিত হয়, গ্রীকগণের অভ্যুত্থানের আগে যে সমস্ত জাতি ছিল তাহাদের মধ্যে এইরূপ ঈর্ষা, দ্বেষ এবং মনোমালিন্য বিদ্যমান ছিল না ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান জগতের লোকের বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে, সামাজিক চালচলনে, গৃহনির্ম্মাণ প্রণালীতে যে পরিমাণ পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়, গ্রীকগণের অভ্যুত্থানের আগে জগতের সর্ব্বত্র ঐ পরিমাণ পার্থক্য যে বিদ্যমান ছিল না তাহাও সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ত্তমান জগতের পঞ্চাশ বৎসরের লোকসংখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে প্রত্যেক জাতির ৭০ বৎসর বয়সোর্দ্ধ লোকের সংখ্যা যে পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে দেখা যায়, তাহা হইতে অনুমান হয়, প্রাচীন জগতে সর্ব্বত্রই অপেক্ষাকৃত অধিক পরমায়ু-সম্পন্ন লোকের সংখ্যাধিক্য ছিল।

এইরূপে পূর্ব্বাপর সমস্ত চিন্তা করিলে লক্ষিত হয় যে, গ্রীকজাতির অভ্যুত্থানের আগে সারা জগতে সমস্ত মানুষের ভিতর বাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধবিগ্রহ, ঈর্ষা, দ্বেষ এবং মনোমালিন্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল; বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে, সামাজিক চালচলনে, গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালীতে বৈসাদৃশ্যের মাত্রাও বর্ত্তমান জগতের মত এত প্রকট ছিল না; মানুষের পরমায়ু ও স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল; তখন অপেক্ষাকৃত অত্যল্প পরিশ্রমে মনুষ্যসাধারণ নিজ নিজ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে পারিতেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর পাইতেন। এই সময়ে সারা জগতের সমস্ত মানুষ স্বীয় অভীষ্ট বর্ত্তমান জগতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অত্যধিক পরিমাণে লাভ করিতেন এবং তাঁহাদের সকলেরই আচার-পদ্ধতিতে ভারতীয় বেদোক্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রভাব দেখা যাইত।

সারা জগতের উপরোক্ত চিত্র সম্মুখে রাখিয়া, বর্ত্তমান পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, মনস্তত্ত্ব, দর্শন, শারীর বিজ্ঞান ও অর্থনীতিশাস্ত্রের তুলনা করিয়া—ভারতীয় পাণিনি ব্যাকরণ, গৌতম সূত্র, বৈশেষিক সূত্র, চারিটী বেদ, দুইটী মীমাংসা, সাংখ্যসূত্র ও পাতঞ্জলসূত্র অধ্যয়ন করিলে, অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়। যে প্রকৃতি-বিজ্ঞান সারা জগতের লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইয়া এবংবিধ সাদৃশ্য আনয়ন করিতে পারে, সে প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিশেষ 'অধ্যবসায়'-সম্ভূত। ঐ প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ভ্রান্তিশূন্য না হইলে, কোন না কোন জাতি নিশ্চয়ই তাহার বিরোধিতা করিতেন। "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ"—অর্থাৎ বিশেষ রকমের গভীর বিশ্লেষণক্ষম বুদ্ধি একটী। আর "বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িণাং"—অর্থাৎ যাঁহারা বিশেষ রকমের গভীর বিশ্লেষণে অক্ষম তাঁহাদের বুদ্ধি বহু রকমের, বহু শাখাযুক্ত এবং অনন্ত। গীতার এই

অমূল্য বাক্যটীর ভাবার্থানুসারে, "মানুষ প্রকৃত বুদ্ধিমান হইলে সমস্ত বস্তু যথাযথ বুঝিতে সক্ষম হয়। প্রকৃত বুদ্ধির উদ্ভব হইলে সকলেই তদনুবর্ত্তী হয় এবং সর্ব্বত্র ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত বুদ্ধির কেহ বিরোধিতা করিতে পারে না। বুদ্ধিতে কোনরূপ ভ্রান্তি থাকিলে কেহ না কেহ তাহার বিরোধিতা করিবেই। ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা বহু ডালপালা উদ্গত হয় বটে, কিন্তু বস্তুর মূল তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যায়। ভ্রান্ত বুদ্ধির পরিচালনায় দলাদলি অবশ্যম্ভাবী।" আমাদের বাস্তব জীবন লক্ষ্য করিলেও ব্যাসদেবের বাক্যটীর সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। আমরা নির্ভুলভাবে যে বিষয়টী বুঝিতে পারি তাহা যখন বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আলোচিত হয়, তখন কোন বিরোধ হয় না। যে বিষয় লইয়া বিরোধ হয় প্রায়শঃ দেখা যায়, যাঁহাদের মধ্যে বিরোধ, তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ বিষয়টী বুঝিতে কোন না কোন ভুল করিয়াছেন।

এইরূপ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে "বেদের" অভ্রান্ততা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। "বেদ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুসারে "বেদ" বলিতে বুঝায় এমন শাস্ত্র, "যদ্দারা সমস্ত বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও অনুভূতির সামর্থ্য লাভ করা যায়", অথবা সংক্ষেপতঃ "প্রকৃতি বিজ্ঞান"। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান জগৎ বেদের মূল ভাষা বুঝিতে অক্ষম। তাই বেদ বলিয়া বর্ত্তমানে যাহা প্রচলিত, তাহা কতকগুলি কথার ঝুড়ি মাত্র এবং তাহাতে সম্ভবযোগ্য কোন কার্য্যের উপদেশ পাওয়া যায় না; যদি কখনও বেদের আসল ভাষা উদ্ধার সম্ভব হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, এখন যাহা বেদ বলিয়া প্রচলিত, তাহা আসল বেদ নহে। আসল বেদ সম্পূর্ণ অপর কিছু; এবং তাহাতে যে "প্রকৃতি বিজ্ঞান" আছে, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ঐ বিজ্ঞান বর্ত্তমান জগতের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। ভারতীয় ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসরের অপরিসীম প্রযত্নের ফলে প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতি কি তাহা অভ্রান্ত ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহার অভ্রান্ত জ্ঞান তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। মানুষের জীবন কি, মরণ কি, কি করিলে মানুষের স্বাস্থ্য প্রকৃতপক্ষে রক্ষিত হয়, দেশের জলহাওয়া কি করিয়া সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর করিতে হয়, দেশের জমির উর্ব্বরাশক্তির চরম উন্নতি কি করিয়া সাধন করিতে হয়, তাহা ভারতীয় ঋষিগণ যেরূপ ভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরে সেইরূপ ভাবে আর কেহই জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা এই সমস্ত বিজ্ঞান অভ্রান্তভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ভারতীয় জমিগুলির উর্ব্বরতা এত অধিকমাত্রায় সাধন করিতে পারিয়াছিলেন যে, সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইলেও জমিগুলি আজও পর্য্যন্ত যে পরিমাণ স্বাস্থ্যকর ফসল প্রদান করে, জগতের অন্য কোন দেশের জমি সেই পরিমাণ স্বাস্থ্যকর ফসল দান করে না। দেশের জলহাওয়া কি করিয়া স্বাস্থ্যপ্রদ করিতে হয় তাহা তাঁহারা জানিতেন বলিয়া মানুষের পরমায়ুর এত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহাদের জ্ঞান অভ্রান্ত ছিল বলিয়া যাঁহারা তাঁহাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতেন, তাঁহারা নিজ নিজ অভীষ্ট, অর্থাৎ স্বাবলম্বী, সন্তুষ্ট, শান্তিপূর্ণ এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিতেন। তাঁহাদের উপদেশ পালন করিলে অভীষ্ট লাভ হইত বলিয়াই সমস্ত জগৎ তাঁহাদের জ্ঞানের অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং এক সময়ে সারা জগৎ ভারতীয় বেদোক্ত আচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এক সময়ে সারা জগৎ সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং বহুদিন পর্য্যন্ত জগতের তথাকথিত নিম্ন স্তরের লোকও কি করিলে মানুষের অভীষ্ট লাভ হয়, সে সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। ভারতীয় ঋষিদিগের এই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জ্ঞানের ফলে সারা জগৎ সুখের আগার হইয়াছিল এবং সমস্ত মনুষ্য জাতি বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়াছিল। সমস্ত মনুষ্যজাতি আপন আপন বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া সম্পূর্ণ শান্তিময় নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, যেন, গ্রীকজাতির অভ্যুদয়ের আগে জগতে মানুষই ছিল না এবং তাঁহাদের কোন ইতিহাসও ছিল না। কিন্তু গ্রীক জাতির অভ্যুদয়ের আগে জগৎ ছিল এবং তাহার ইতিহাসও ছিল তাহা আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে।

যাহাতে মনুষ্যসমাজ চিরদিন সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতে পারে, তাহার জন্য ভারতীয় ঋষিগণ ভারতবর্ষের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া চারি শ্রেণীর

লোকের হাতে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই চারি শ্রেণীর লোকের নাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র।

ঋষিদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার রক্ষার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল ব্রাহ্মণের উপর, মনুষ্যের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ব্যবহার্য্য জিনিষের স্বহস্তে উৎপন্ন করিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল শূদ্রের উপর। 'শূদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শ্রমজীবী। তাঁহারা আজও বহুলাংশে ঋষিদিগের নিয়ন্ত্রিত পথে চলিতেছেন। তাঁহারা যথাযথভাবে চলিয়া আসিতেছেন বলিয়া বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছিল, এবং বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় ঋষিদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডারে কি রত্ন রক্ষিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিবার কোনই প্রয়োজন হয় নাই। অপিচ জ্ঞান-ভাণ্ডারে কি জ্ঞান রক্ষিত আছে তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া, যাঁহাদের উপর জ্ঞান-ভাণ্ডার রক্ষার ভার ছিল তাঁহারা উহা পুরুষানুক্রমে বহন করিয়া লইয়া আসিলেও বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জ্ঞানালোচনার প্রয়োজনই হয় নাই। ফলে ঐ পুঁথিগুলি রক্ষিত হইলেও তাহাদের প্রকৃত মর্ম্ম ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে বিস্মৃত হইয়া পড়েন। বিস্মৃতির মাত্রা এত অধিক যে, যে ভাষায় ঐ পুঁথিগুলি লিখিত সেই ভাষাও সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণগণ স্মরণ রাখিতে পারেন নাই।

শূদ্র অর্থাৎ শ্রমজীবীগণ ঋষিদিগের নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত হইয়া বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম বশতঃ যখন জমির উৎপাদিকা শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল এবং দেশের জলহাওয়ার স্বাস্থ্যেরও কিছু অবনতি দেখা গিয়াছিল, তখন পুনরায় তাহার উন্নতি-সাধন জন্য ঋষিদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ঋষিদিগের ভাষা বিস্মৃত হওয়ায় শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম আর উদ্‌ঘাটিত হইল না। ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তির আর উন্নতি সাধন হয় নাই। তাহা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল এবং জলহাওয়াও ক্রমেই অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িতেছিল। অবশ্য তখনও যাহা ছিল তাহা বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অনেক বেশী। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় উপদেশ না পাওয়ায় এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণগণ স্বীয় আধিপত্যের সহায়তা লইয়া শূদ্রগণকে সমাজের অস্পৃশ্য করিয়া দিয়াছিলেন। যে শাস্ত্রে ঋষিদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার রক্ষিত, তাহার ভাষার বিস্মৃতির ফলে ব্রাহ্মণগণ তাহাদের প্রকৃত মর্ম্ম আর উদ্ধার করিতে পারেন নাই এবং শাস্ত্রগুলি কতকগুলি অসংলগ্ন কথার ঝুড়িতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ফলে জগৎ হইতে ভারতীয় বেদোক্ত খাঁটি প্রকৃতি-বিজ্ঞান লোপ পায় এবং সর্ব্বত্র তাহার বিকৃতিযুক্ত কতকগুলি আচার-পদ্ধতি স্থান পাইয়াছিল।* বেদোক্ত প্রকৃতি-বিজ্ঞান সারা জগতের সমস্ত লোককে যে পরিমাণে অভীষ্ট প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এই বিকৃত আচার-পদ্ধতিগুলি সেই পরিমাণ সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য জগৎকে দিতে পারে নাই। তাহারই জন্য বহু সহস্র বৎসরের অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া বিকৃত বৈদিক বিজ্ঞান সম্ভূত আচার-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ভারতে যখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, ইউরোপে তখন গ্রীকদিগের অভ্যুত্থান। গ্রীকগণের আচার পদ্ধতিতে তখনও বিকৃত বৈদিক বিজ্ঞানের অনুরূপতা পরিলক্ষিত হয়। গ্রীকদিগের অভ্যুদয়-কালেই ইউরোপে খৃষ্টদেবের আবির্ভাব হয় এবং গ্রীকগণ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার পর হইতে সারা ইউরোপ নানা উপায়ে মানুষ কি করিয়া তাহার অভীষ্ট লাভ করিবে তাহার অনুসন্ধান করিতেছে বটে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ইউরোপীয়গণের সে চেষ্টা সাফল্য লাভ করে নাই, বরং মানুষের অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্য এবং যৌবন ও জীবনের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। এসিয়া খণ্ডেরও ঠিক একই রূপ অবস্থা। এখানেও মানুষের ক্লেশ ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে।

জগতের এই ইতিহাস যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপকগণ যে জ্ঞানের অভ্রান্ত উন্নতি সাধন করিয়া সমস্ত জগতের ঐক্যসাধন করিতে পারেন ও জগৎ হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিদূরিত করা সম্ভব হয় তাহাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ভারতের ঋষিগণের অধ্যাপনা প্রকৃত বুদ্ধিপ্রধান

---

* ইহারই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারকগণ, খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ও মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারকগণ জগতের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বত্র বৈদিক ধর্ম্মের অনুরূপ বিকৃতভাবে দেবদেবীবোধে পুতুল পূজা, অগ্নি, জল প্রভৃতি বিবিধ প্রকৃতি-শক্তির পূজা প্রচলিত দেখিতে পাইয়াছিলেন।

অধ্যাপনার উদাহরণ বলিয়া গ্রহণ করিতেও দ্বিধাযুক্ত হইতে হয় না।

আমরা জগতের ইতিহাসের যে অংশ আমাদের পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, তাহা এতই সংক্ষিপ্ত যে, আপাতত তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া আমাদের উক্তিকে অতীব দুঃসাহসিক (bold) বলা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে, 'স্বাধ্যায়ী' হইয়া, গ্রীকগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সারা জগতের অবস্থা চিন্তা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমাদিগের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অথবা যদি আবার কখনও ভারতীয় ঋষিগণের ঐ প্রকৃতি-বিজ্ঞান যথাযথ অর্থে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে আর আমাদের কথা দুঃসাহসিক বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনার বিকৃতির পরিণাম

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যে ভাষায় ঋষিদিগের গৌতম সূত্র, বৈশেষিক সূত্র, চারিটী বেদ, দুইটী মীমাংসা, সাংখ্যসূত্র ও পাতঞ্জলসূত্র লিখিত, তাহা আমরা এখন বিস্মৃত। তাই যে জ্ঞান-ভাণ্ডার সারা জগতের সমস্ত মানুষকে সুখ-সমৃদ্ধিদানে সমর্থ হইয়াছিল তাহা এখন থাকিয়াও নাই। ঐ সূত্রগুলি যে ব্যাখ্যায় প্রচলিত তাহাতে ঐ জ্ঞান-ভাণ্ডার এখন কথার ঝুড়ি মাত্র। উহা হইতে এখন আর কোন সম্ভবপর কর্ম্মনির্দ্দেশক উপদেশ পাওয়া যায় না এবং প্রকৃতির কোন অবস্থা নিখুঁৎ ভাবে কোন মানুষের বোধগম্য হয় না। ঐ জ্ঞান-ভাণ্ডার এতাদৃশ বিকৃত হইয়াছিল বলিয়াই, যে মানুষ উহার এত পূজা করিত সেই মানুষ উহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ পর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়াছিল। ইতিহাস অনুসারে বুদ্ধদেব প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহী। তাঁহার আবির্ভাব না হইলে হয়ত ঐ বিকৃতির ফলে ভারতবর্ষ অনেক আগেই সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে নাই। যদিও ভারতের অবনতি অবরুদ্ধ হয় নাই, তথাপি তাহার অস্তিত্ব এখনও বজায় রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর খৃষ্টদেব ও নবী মহম্মদের আবির্ভাব না হইলে হয়ত ভারতীয় ঋষির প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকৃতির ফলে জগতের অন্যান্য স্থানেরও সম্পূর্ণ ধ্বংস অনেক আগেই সংঘটিত হইত, কিন্তু তাঁহাদের আবির্ভাবের ফলে জগৎ তখনকার মত রক্ষা পাইয়াছে।

ভারতের ঋষিদিগের ঐ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিকৃত হইলেও উহার মাধুর্য্য নষ্ট হয় না। বিকৃত বিজ্ঞানের মাধুর্য্য সর্ব্বদা অতীব ভয়াবহ। বিকৃত বিজ্ঞানের এই মাধুর্য্য ভারতবাসীর ধ্বংস সাধন করিয়াছে এবং এখনও সতর্ক না হইলে হয়ত ভারতবর্ষেরও ধ্বংস সম্পূর্ণ হইবে।

ঋষিদিগের বিকৃত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মাধুর্য্য বর্ত্তমান ইউরোপেরও অনিষ্ট সাধন করিতেছে বলিয়াই মনে করিবার কারণ আছে।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় ঋষিদিগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকৃতির ফলে মানুষের চালচলনে বিকৃতি উপস্থিত হওয়ায় মানুষ আর পূর্ব্বানুরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারে নাই। ফলে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে হইতে প্রকাশ্য বিদ্রোহের উদ্ভব হইয়াছিল। এই সময় বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর খৃষ্টদেবের আবির্ভাব হয়, খৃষ্টদেবের আবির্ভাবের ছয় শত বৎসরের মধ্যে নবী মহম্মদের আবির্ভাব। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে মহম্মদের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত, জগতের ইতিহাসে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মনোমালিন্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিল। খৃষ্ট জন্মাইবার পরবর্ত্তী নবম শতাব্দীতে ইউরোপীয় কোন কোন জাতির ভিতর অর্থনৈতিক চিন্তার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর আগে এই চিন্তার বিশেষ পরিব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয় না। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবার শৃঙ্খলিত চিন্তা পুনরায় পরোক্ষ ভাবে প্রকট হইয়াছে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের কার্য্যে—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। ভারতীয় ঋষিগণ জগতের যে জাতীয় সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এমন কথা আমরা বলি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতীয় ঋষিগণ যেরূপ বাস্তব জগতের বাস্তব ঘটনার বাস্তবতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণও সেইরূপ কিছুদিন ধরিয়া বাস্তব ঘটনার বাস্তবতাগুলি লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে হয়ত কয়েক সহস্র

বৎসর পরে আবার জগতে সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য উপভোগ করিবার সুযোগ জুটত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের স্পিরিচুয়ালিজমের (Spiritualism) প্রতি যে আকর্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা হইতে আমাদের মনে হয় যে, বৈজ্ঞানিকগণের উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা-পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি এক শত বৎসরের মধ্যেই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকগণের নিকট হইতে প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণের এই স্পিরিচুয়ালিজম্ কতক অংশে ভারতীয় ঋষির বিকৃত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুরূপ, এবং বর্ত্তমান ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে তাহা স্থান পাইয়াছে ঠিক সেই সময়ে, যখন বর্ত্তমান ইউরোপীয়গণ ভারতীয় ঋষির এই বিকৃত বিজ্ঞানের পর্য্যালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারই জন্য আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় যে, ভারতীয় ঋষিদিগের বিকৃত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মাধুর্য্য বর্ত্তমান ইউরোপেরও অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনা দ্বারা মানুষের ইষ্টসাধন যে পরিমাণে সম্ভব, সেই পরিমাণে ইষ্টসাধন বোধ হয় আর কোন উপায় দ্বারা হয় না। কিন্তু এই বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনা বিকৃত হইলে ততোধিক অনিষ্টপ্রদ ও ভয়াবহ হয়। বিকৃত বুদ্ধিপ্রধান অধ্যাপনা যে ভারতবাসীকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দগ্ধ করিয়াছে তাহা সহজেই বোধগম্য এবং সতর্ক না হইলে ইউরোপেরও যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিবে তাহা অনুমান করা যায়।

বুদ্ধিপ্রধান অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানের সীমানা ও পরিমাণ

"অধ্যয়ন" ও "অধ্যাপনা" সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া আমাদের চারিশ্রেণীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্বরূপ, প্রণালী এবং পরিণাম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্বরূপ, প্রণালী এবং পরিণাম সম্বন্ধে সুপরিষ্কার জ্ঞান না থাকিলে ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় জীবন কখনও সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করিতেছেন। পণ্ডিতেরা যাঁহাদিগকে মূর্খ বলিয়া থাকেন, আপাতদৃষ্টিতে তাঁহারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা না করিলেও তাঁহারা একেবারে অনধ্যায়ী নহেন। কেহ বা পুস্তকের সাহায্যে, কেহ বা আচার ও প্রয়োগের সাহায্যে এবং কেহ বা পুস্তক, আচার ও প্রয়োগ—এই ত্রিবিধ উপায়েই অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে যাঁহারা নিরক্ষর মূর্খ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদের বাল্যকালের বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান যে যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে পরিবর্দ্ধিত হয় তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। নিরক্ষর ব্যক্তিরও জ্ঞানলাভ হয় আচার ও প্রয়োগের সাহায্যে। বস্তুতঃ যত কিছু নিখুঁত জ্ঞান জগৎ এতাবৎ লাভ করিতে পারিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে আচার ও প্রয়োগ। এক পুরুষের আচার ও প্রয়োগলব্ধ জ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা যাহাতে সহজেই জানিতে পারিয়া পরবর্ত্তী পুরুষ তাহার অধিকতর বিস্তার সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য বিজ্ঞানসম্ভূত ভাষা ও তল্লিখিত পুস্তকের সহায়তা লওয়া হয়। আচার ও প্রয়োগলব্ধ জ্ঞান ব্যতীত কোন বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক লেখা সম্ভব নহে। পরন্তু আচার ও প্রয়োগের সহিত তুলনা না করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র পুস্তকের সহায়তায় জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদের জ্ঞান কার্য্যকরী হয় না; বরং তদ্দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই সকলেই যে আচার ও প্রয়োগের আকারে অধ্যয়নকার্য্য করিতেছেন তাহা বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপনাও মানুষ মাত্রেরই করিতে হয়। নিরক্ষর ব্যক্তিরাও ছোট ভ্রাতা-ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও শিষ্যগণকে আচার ও প্রয়োগের শিক্ষা দিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান জগতের সাধারণ ধারণা পড়াশুনা করিলেই নিরক্ষর মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায়। তাহা যে সত্য নহে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বুদ্ধিপ্রধান না হইলে তাহা যে নিজের ও নিজ সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য আমরা চারিশ্রেণীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্বরূপ, প্রণালী এবং পরিণাম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকের নিজ নিজ জ্ঞান সম্বন্ধে একটা অভিমান পরিলক্ষিত হয়। এক একটা বিষয়ে কতখানি জ্ঞান হইলে যে সেই বিষয়ে জানা সম্পূর্ণ হয়

এবং জ্ঞানের সীমা ও পরিমাণ কত অপরিসীম হইতে পারে, তাহা না জানা থাকিলে নিজ নিজ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ মনে করা অথবা তৎসম্বন্ধে অভিমান পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞান পূর্ণ জ্ঞানের তুলনায় সামান্ত ভগ্নাংশ মাত্র হইলেও তাঁহারা ছাত্রভাব পোষণ করিয়া প্রকৃতির বাস্তবতা আংশিক পরিমাণে নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফলে জগৎ "তেজের" (steam ; electric power) কতকগুলি প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছে, অথচ "তেজ" কি বস্তু, তাহা এখনও সম্যক্‌ ভাবে জানা হয় নাই এবং তেজের যে প্রয়োগগুলি সাধারণ মনুষ্য নিজ নিজ ব্যবহারে গ্রহণ করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা তাহাদের কল্যাণপ্রদ কিনা তাহা অকাট্য ভাবে জানা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণের ছাত্রত্ব এবং বাস্তবতা-নিরীক্ষণ-শক্তি পরিরক্ষিত হইলে এখন যাহা অজ্ঞাত আছে তাহা জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা ছিল। বিংশ শতাব্দীর কোন কোন বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজেই মানুষের জ্ঞানের সীমা ও পরিমাণ কতখানি হইতে পারে এবং বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানের পরিমাণ কতটুকু, কি করিয়া অধ্যয়ন বুদ্ধিপ্রধান করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা না করিলে "অধ্যয়ন" ও "অধ্যাপনা" সম্বন্ধীয় আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় স্থানাভাববশতঃ আগামী সংখ্যায় পুনরায় ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

[ক্রমশঃ

স্বাধীন

—রবার্ট নিকল্‌

বিদ্যুৎ যেন উঠিল ঝলকি',—
পড়িনু আমরা শত্রু 'পরে ;
করি' গর্জ্জন করিনু বিলোপ
শত্রু-মহিমা ক্ষিপ্র করে !
যেন পর্ব্বত-প্রবাহী উৎস
পড়িনু ঝরিয়া শত্রু-মাথে ;
যেন প্রচণ্ড প্রবল পবন
ছুটিনু বিষম ক্ষিপ্রতাতে।
সিন্ধুর বুকে বাত্যা যেমন
আসিনু রুষিয়া ধৈর্য্যহীন ;
বাজাই বিষাণ, করি চীৎকার—
স্বাধীন আমরা, মোরা স্বাধীন।

লড়িনু আমরা বিধাতার নামে,
লড়িনু জীবন-রক্ষা তরে।
লড়িনু রাখিতে আপন প্রভুরে,
লড়িনু বাঁচাতে স্ত্রীপুত্রেরে !
লড়িলাম মোরা গৃহ রাখিবারে,
লড়িনু আমরা বাঁচাতে দেশে ;
লড়িনু জিয়াতে তাদের সবারে
রয়েছে যাহারা দাসের ক্লেশে।
লড়িনু ভাঙিতে দাস-বন্ধন,
আনিতে মুক্তি মহিমালীন ;
দূরে যাক্‌ ক্লেশ, বলিব ফুকারি'—
স্বাধীন আমরা, মোরা স্বাধীন।

ন্যায়-রণে যেবা হত তার তরে
ফেল শ্বাস, ফেল অশ্রুজল।
ধিক্‌ ধিক্‌ তারা দ্বিধা-শঙ্কায়
কেঁপেছে যাদের চিত্ততল।
পড়েছে শত্রু, এসেছে শান্তি
যাপো দিন এবে শান্তিসুখে ;
অত্যাচারীর ঘটেছে পতন
দম্ভ ও বল নাহি সে বুকে ;
দর্প-প্রতাপ বিগত তাহার ;
আজি মোরা দাস-দুঃখহীন।
কোথা হ'তে ঐ শুনি যেন স্বর—
স্বাধীন আমরা, মোরা স্বাধীন।

অনুবাদক—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মন্ত্রের বন্ধন
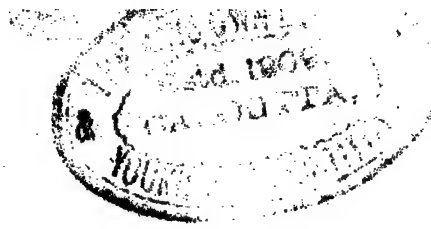
—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

গৌরীর বয়স তখন তিন বৎসর, পিতামহ হরগোবিন্দ তাহার মায়ায় এতটা জড়াইয়া পড়িলেন যে, তাহাকে ছাড়িয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল, অথচ না ফিরিলেও নয়। পুত্র ও পুত্রবধূকে বহু সাধ্যসাধনা করিয়া গৌরীকে সঙ্গে লইয়া তিনি দেশে ফিরিলেন।

গৌরীর পিতা শিবরাম গাঙ্গুলী মোটা মাহিনার রাজ-কর্ম্মচারী। বিহার তাঁহার কর্ম্মস্থান। বিলাত যাওয়াটা যদিও এখন সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি সে সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। নাই বা হইল, সাহেবিয়ানায় তিনি বিলাত-ফেরতকেও হার মানাইয়া দিয়াছিলেন। সাজে, পোষাকে, আহারে, বিহারে তিনি পুরাদস্তর 'বাঙ্গালী সাব'। শুধু বাহিরে নহে, অন্তরটাকেও তিনি 'কুসংস্কার'মুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। গৌরীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বলিতেন, "বাবা হয় ত মেয়েটাকে কিম্ভূত-কিমাকার করে গড়ে তুলছেন। তখন না যেতে দিলেই হ'ত।" পত্নী বলিতেন, "কি করব, তুমি রাজি হলে, না হ'লে পাড়াগাঁয়ে পাঠাতে আমার একেবারে ইচ্ছে ছিল না।" শিবরাম বলিতেন, "আর কিছুদিন বাদেই তাকে নিয়ে আসব, বাবাও বুড়ো হয়েছেন।"

ক্রমে গৌরী নবম বৎসরে পদার্পণ করিল। তখন শর্দা আইন লইয়া চারিদিকে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। গেল, গেল, হিন্দুধর্ম্ম বুঝি রসাতলে গেল। ছেলেমেয়ের বিবাহে পিতামাতার কোন স্বাধীনতা থাকিবে না, আইনের নাগপাশে স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হইবে। অথচ এই আইনের খসড়া দেশের হিন্দু নেতারাই পেশ করিয়াছেন! এই আইন পাশ হইলে, কি যে ব্যাপার হইবে তাহাও অনেকে সঠিক উপলব্ধি করিতে পারিল না। সমাজের মধ্যে এক বিভীষিকার সঞ্চার হইল। চারিদিকে বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল! যেমন তেমন পাত্র দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিবাহকার্য্য সমাধা হইতে লাগিল। বুঝি বা আইন পাশ হইলে, আর পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়াই ঘটিবে না। তখন কি লোকে বুঝিয়াছিল, যে এই আইন অমান্য করিলে জেলে যাইতে হয় না, এমন কি পুলিসের কবলেও পড়িতে হয় না। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া যদিচ্ছা পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া চলে। জুজুর ভয় দেখাইবার জন্য যে এ আইন পাশ করা, তাই বা ক'জন তখন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল?

বৃদ্ধ হরগোবিন্দর মনেও বিভীষিকার সঞ্চার হইল। আর ত' গৌরীকে অবিবাহিতা রাখা চলে না। তাঁহার বংশে নয় বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সকল মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহারা ত বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করিতেছে, কোথাও কিছু বাধে নাই। আর গৌরীকে কিনা চৌদ্দ বৎসর পার করিয়া তবে বিবাহ দিতে হইবে! না, না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। তিনি গোপনে পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এ গোপনতার কারণও অবশ্য ছিল। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে বিবাহ হইয়া গেলে তাঁহার পুত্রকে সংবাদ দিবেন। তখন না হয় পুত্র তাঁহার উপর রাগই করিবে, বিবাহ ত বন্ধ করিতে পারিবে না। বরপণের জন্যও পুত্রের মুখাপেক্ষী হইবার প্রয়োজন তাঁহার ছিল না।

পাত্রের সন্ধান মিলিতে বিলম্ব হইল না। পাত্রপক্ষের ভিতরেও যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই তাহা নহে। বিশেষ ব্যস্ত হইলেও যেমন তেমন পাত্রের হাতে কি তিনি গৌরীকে দিতে পারেন! পাত্রটি অল্পবয়স্ক, এখনও ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নাই, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। বাড়ীর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। পাকা বাড়ী। বাগান পুকুর ধান চাল কিছুরই অভাব নাই। স্থির হইল বরপণ বাবদ দেড় হাজার টাকা দিতে হইবে। —পাঁচশ' এক টাকা নগদ, আট শত টাকার গহনা, দুই শত টাকার বরাভরণ! হরগোবিন্দ পুত্রকে কোন সংবাদ দিলেন না, বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন।

তিনি সংবাদ না দিলেও, সংবাদ দিবার লোকের অভাব হইল না। তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহের সংবাদ শিবরামের নিকট গিয়া পৌছিল। শিবরাম অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু, তিনি যখন পৌছিলেন, তখন কন্যা-সম্প্রদান শেষ হইয়া গিয়াছে, বর-কনে বাসরে বসিয়াছে।

কিছুক্ষণ বচসা হইবার পর শিবরাম কহিলেন, "আমি কোন কথা শুনব না, কাল ভোরের গাড়ীতেই আমার মেয়েকে নিয়ে চলে যাব।"

হরগোবিন্দ কহিলেন, "সে কি হয়! এখনও যে আসল কাজ বাকি। শ্বশুরবাড়ী থেকে ঘুরে আসুক, তারপর তাকে তুমি নিয়ে যেও।"

শিবরাম তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "কিসের শ্বশুরবাড়ী, এ বিয়ে-বিয়েই নয়, আমি আর একটা দিনও মেয়েকে এখানে রাখব না। আপনার যে ভীমরতি হয়েছে তা কে জানত।"

হরগোবিন্দ পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু পুত্র তাঁহার সঙ্কল্পে অচল, অটল।

অবশেষে ব্যথিতকণ্ঠে হরগোবিন্দ কহিলেন, "তোমার মেয়ে, তুমি যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু তোমার যে এতটা অধঃপতন হয়েছে তা আমি ভাবতেও পারি নি। নারায়ণ সাক্ষী করে সম্প্রদান করা হল, আর তুমি হিন্দুর ছেলে হয়ে সেই বিয়ে অস্বীকার করছ? তোমায় বলবার কিছু নেই। তবে একটা কথা বলে রাখি, নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ কর না।"

শিবরাম কহিলেন, "যা সর্ব্বনাশ করবার তা ত আপনিই করেছেন। এখন সেই সর্ব্বনাশের হাত থেকে আমি মেয়েকে রক্ষা করতে চাই। আপনার কাছে মেয়েকে রেখে কি ভুলই করেছি!"

তাঁহার পুত্র যে এমন কাণ্ড করিবে, এ কথা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। পাত্রপক্ষকে তিনি কি বলিবেন? সমাজকেই বা কি কৈফিয়ৎ দিবার রহিল? কেন তিনি এ কাজ করিতে গেলেন? অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, আজ রাতটা ত কাটুক, পরদিন যাহা হয় করা যাইবে। কিন্তু রাত কাটিবার পথও বন্ধ হইয়া গেল। শিবরাম বাসর-ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন, "গৌরী, উঠে এস ওখান থেকে। যত অসভ্য বর্ব্বরের দল।"

গৌরী তখন চেলিতে আপাদমস্তক ঢাকিয়া জড়সড় হইয়া বরের পার্শ্বে বসিয়া ছিল। পিতার কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই সে চমকিয়া উঠিল। অপর সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

শিবরাম আবার হাঁকিলেন, "উঠে আয় ওখান থেকে।"

গৌরী চেলিতে বাধিয়া পড়িতে পড়িতে কোনরকমে পিতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

শিবরাম কহিলেন, "যা ফেলে দিয়ে আয় ও-কাপড়—সং সাজা হয়েছে! একটা ফ্রক পরে চলে আয় এখনি।"

হরগোবিন্দ কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পুত্রের একখানি হাত দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "শিবু, এবারকার মত আমায় মাপ কর বাবা। সমাজে আমি মুখ দেখাতে পারব না।"

শিবরাম এবার কতকটা শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ও সব কি বলছ বাবা—তুমি না বুঝে কাজটা করে ফেলেছ তা আমি বুঝি কিন্তু আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে। মেয়েটাকে ত আমি ভাসিয়ে দিতে পারি না। সমাজের কথা বলছ, আমাকেও ত সমাজে বাস করতে হয়। সে সমাজে আমারও যে মাথা হেঁট হবে। আমার ওপরওয়ালা সাহেবরাই বা কি বলবে,—আর আমি যাঁদের সঙ্গে কাজ করি তাঁরাই বা কি বলবেন। সে কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি—আমার চোখের ওপর মেয়েটার এত বড় সর্ব্বনাশ হবে, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখব। তা আমার দ্বারা হবে না।"

হরগোবিন্দ অভিমানক্ষুব্ধ কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আর তোমার বাবা পাঁচজনের সামনে দাঁড়িয়ে অপমানিত হবে, তা তুমি সহ্য করতে পারবে?"

শিবরাম কহিলেন," এ ত বড় মুস্কিলের কথা।" তারপর একটু থামিয়া কি ভাবিয়া লইয়া আবার কহিলেন, "মেয়ে আমি এখন কিছুতেই তাদের বাড়ী পাঠাব না,—তবে এই পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি, মেয়ে যখন সাবালিকা হবে, সে যদি শ্বশুর-বাড়ী যেতে চায়, আমি তাতে বাধা দেব না। আর কোন অনুরোধ আপনি আমায় করবেন না।"

হরগোবিন্দ পুত্রের হাত ছাড়িয়া দিয়া রোষকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "তোমার যা খুসী কর, আমি আর কোন কথা

তোমায় বলব না।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

বরের পিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপারটা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। বাড়ীময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তিনি বরের পিতা, নীরবে এ অপমান সহ্য করিবেন কেন! শিবরামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "খুব আস্ফালন করছেন শুনতে পাচ্ছি, মেয়ের কি অবস্থা হবে সেটা কি ভেবে দেখেছেন বেয়াই মশায়?"

শিবরাম ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেয়াই মশায়, নন্‌সেন্স"—

বরের পিতাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, কহিলেন, "ছোট-লোকের মত গালাগালি দিতে আরম্ভ করেছেন দেখছি—সরকারী চাকরী কেউ আর করে না, দু' চারশ রোজগারও কেউ করে না! এটা মনে রাখবেন, আপনার তাঁবে-দার আমি নই যে, আপনার গালাগালি চোখরাঙানি সহ্য করব! আপনার মত ম্লেচ্ছ অভদ্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতেও আমি চাই না। আমি এই মাসের মধ্যে ছেলের আবার বিয়ে দেব। মেয়ে নিয়ে তখন মজাটা বুঝতে পারবেন।"

শিবরাম কহিলেন, "আমার মেয়ের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।—আপনাদের মত কতকগুলো অশিক্ষিত বর্ব্বরের জন্যে শর্দা আইনের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে।"

বরের পিতা কহিলেন, "তোমার মত পিতৃদ্রোহী, ম্লেচ্ছদের জন্যও একটা আইন করা দরকার। তোমার মুখ দর্শন করা পাপ! চল হে চল, এ পাপ-পুরীতে আর একদণ্ড থাকা নয়। দু'দিন পরে মজাটা টের পাবে, যখন ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি ওর হাতে গিয়ে পড়বে।"

* * *

দিন দশ বার পরের কথা। গৌরী তাহার পিতার সহিত তাহার কর্ম্মস্থলে আসিয়াছে। সে এখন উরু-বাহির-করা ফ্রক পরিয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া বেড়াইতেছে। নূতন আবেষ্টনের মধ্যে প্রথম দু' একদিন তাহার একটু অসুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু অন্য ভাই-বোনদের সঙ্গে মিশিয়া সে নিজেকে তাহাদের সঙ্গে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে। তাহার ফুর্ত্তি দেখে কে! তাহার জননী তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহার ঠাকুরদাদা তাহাকে লইয়া পুতুল খেলিয়াছিলেন,—পুতুলের বিয়ে ত ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার বিবাহও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সিন্দুরের চিহ্নও তাহার সীঁথিতে ছিল না। কাজেই বাহিরের পাঁচজনের কাছে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজনও তাহার হইল না।

সেদিন প্রাতঃকালে গৌরী ফ্রক পরিয়া ভাই-বোনদের সহিত ছুটাছুটি করিতেছিল, শিবরাম একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার চাপরাশি আসিয়া কয়েকখানি পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। একখানি খাম ছিঁড়িতেই বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির হইয়া পড়িল! সেখানি গৌরীর বরের বিবাহের পত্র। শেষে গৌরীর শ্বশুর লিখিয়াছেন,—"এইবার এক ভদ্রঘরে পুত্রের বিবাহ দিয়াছি। তোমার মত ইতরের মেয়ের স্থান তুমিই নির্দ্দেশ করিয়া দিও। তোমাকে সংবাদটি দিবার জন্যই নিমন্ত্রণ-পত্রখানি পাঠাইলাম।"

শিবরাম পত্রখানি কুটিকুটি করিয়া মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া জুতার তলায় তাহা পিষ্ট করিতে করিতে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিলেন। মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন, গৌরী বড় হউক, তাহার আবার বিবাহ দিয়া সেই বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ঐ বর্ব্বরটার নিকট পাঠাইয়া ইহার প্রতিশোধ লইবেন। ততদিন তাঁহাকে মুখ বুঁজিয়া এ অপমান সহ্য করিতেই হইবে।

* * *

তারপর দীর্ঘ আট বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। নয় বৎসরের গৌরী এখন সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। বৎসর দুই পূর্ব্বেও সে উরু-বাহির-করা ফ্রক পরিয়া লাফালাফি করিয়া বেড়াইয়াছে—এখন সে ফ্রক ছাড়িয়া শাড়ী ধরিয়াছে এবং এমন কায়দায় সে শাড়ী পরে যে দূর হইতে দেখিলে মনে হয়—যেন ঘাগ্‌রা পরিয়া কোন মেম সাহেব আসিতেছেন। কৃশাঙ্গী, ছিপছিপে লম্বা গড়ন, দেহে মেদমাংসের অপ্রতুলতা-বশতঃ সর্ব্বত্রই হাড়গুলাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—বিশেষ করিয়া চোয়ালের হাড় দু'খানা। মাথায় তৈলবিহীন এক রাশ চুল অবিন্যস্ত,—সর্ব্বদা ফাঁপাইয়া ফোলাইয়া রাখা হয়, পিছনে একটি বড় রকমের আল্‌গা খোঁপা, কোন রকমে মাথার পিছনে জড় হইয়া থাকে। গহনার মধ্যে হাতে দুইগাছি

করিয়া সরু চুড়ি, অন্য কিছু নাই। তবে এই রকম সাজে তাহাকে মন্দ দেখাইত না, আল্‌গা চটক তাহার ছিল।

যাক্, সেবার গৌরী ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে যখন উত্তীর্ণ হইল, শিবরাম স্থির করিলেন, তাহাকে কলিকাতার কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। গৌরীরও সেই ইচ্ছা। সে পিতাকে আরও জানাইল যে, যে-সব কলেজে সহ-শিক্ষার প্রবর্ত্তন আছে, তাহারই যে কোন এক কলেজে সে ভর্ত্তি হইবে। শিবরাম প্রফুল্লচিত্তে সায় দিয়া কহিলেন, "আমিও তাই স্থির করেছি।"

শিবরামের শ্বশুর কেশববাবু কলিকাতায় থাকেন। তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। তাঁহার দুই পুত্র, বিদেশে চাকুরী করে। তিনি বিপত্নীক, একাকীই থাকেন। গৌরী তাঁহার নিকট থাকিয়া কলেজে পড়িবে, তাহাই স্থির হইল। কেশববাবুই এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে গৌরী তাহার মাতার সঙ্গে আসিয়া কয়েকবার মাতামহের বাড়ী বেড়াইয়া গিয়াছে, আধুনিকভাবে সুসজ্জিত গৃহ, কাজেই এখানে থাকিতে গৌরীর কোন আপত্তি হইল না, বরং সে আনন্দ অনুভবই করিল।

যথাসময়ে গৌরী মাতামহের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন গৌরী কথায় কথায় বলিল, "দাদু, তুমি ত বেশ আপ-টু-ডেট, সেই পাড়াগেঁয়ে গ্র্যাণ্ড ফাদারের মত নও।"

বহুদিন পরে আজ হঠাৎ পিতামহের কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের বাড়ীতে ভুলিয়াও তাঁহার নাম কেহ করিত না। পিতামহের সহিত সম্পর্কটা তাহারা একেবারে তুলিয়া দিয়াছিল। আজ হঠাৎ সেই দাদুর কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ায়, অনেকগু[illegible]চিত্র একসঙ্গে গৌরীর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—তাহ[illegible]বিবাহের চিত্রও বাদ গেল না। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য, ছায়াচিত্রের মত তাহা সহসা আবার কোথায় মিলাইয়া গেল।

হাসিয়া কেশব কহিলেন, "তা হ'লে আমাকে তোর খুব পছন্দ হয়েছে বল? আমার বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে।"

গৌরী কহিল, "না তুমি বড় 'সিলি' দাদু।"

কেশব কহিলেন, "তার মানে? সে আশা করাটা ঠিক হয় নি।"

গৌরী কহিল, "এ রাইট অর্ রঙের কথা হচ্ছে না। তুমি এদিকে বেশ আপ-টু-ডেট, কিন্তু তোমার ভাষাটা রাষ্টিকের মত, ডিসেণ্ট নয়

কেশব কহিলেন, "সে কথা তোর আমি মানি। তা যখন মেনে নিলাম, তখন অমনই ধরণের আর একটা কথা বলে ফেলি,—তোর মুখে দিদি বাঙলার সঙ্গে ঐ ইংরেজি কথাগুলা কেমন যেন বেসুরো লাগে।"

গৌরী শ্লেষ দিয়া কহিল, "তা ত লাগবেই দাদু,—আমরা যে মেয়ে মানুষ,—"

কেশব কহিলেন, "ঠিক তাই,—দেখতে পাই, ইংরেজী জানা মেয়েদের মুখ দিয়ে বাঙলার সঙ্গে ইংরেজী কথাটা বেশী বেরোয়—যেখানে রুচি নেই বললে চলে, সেখানে তারা বলবে অ্যাপিটাইটের ওয়াণ্ট, 'দুর্ব্বল ঠেকে' জায়গায় বলবে বড্ড 'উইক ফিল' করি, এমন কত কি। মেয়েছেলের মুখে সিগারেট আর ইংরেজি বুকনি—দুটোই বড্ড যেন কেমন লাগে। সিগারেটটা আরও খারাপ।"

গৌরী কহিল, "পুরুষদের বেলায় কোন দোষ নেই, যত দোষ সব গার্লদের বেলায়! সেকেলের লোকের ধরণটা দেখছি একই রকমের,—দি সেম। আমার কলেজে পড়াটা তুমি তা হলে লাইক কর না দেখছি—এমন জানলে তোমার এখানে আসতুম না, হোষ্টেলে থাকবার ব্যবস্থা করতুম—'আনওয়েলকাম গেষ্ট' হয়ে থাকাটা আমি লাইক করি না।"

কেশব দেখিলেন, তাঁহার দৌহিত্রী বেজায় চটিয়া গিয়াছে। এ রকম রাগিবার অবশ্য কারণও ছিল। কেননা কলেজে প্রবেশ করিয়া গৌরী উন্নতির আর এক ধাপে উঠিয়াছে। এক বান্ধবীর দেখাদেখি সে সিগারেট ধরিয়াছে। তবে সেটা প্রকাশ্যে নহে,—প্রকাশ্যে না হইলেও কেশববাবুর সতর্ক দৃষ্টি সে এড়াইতে পারে নাই। এই সুযোগে কেশববাবু তাহা জানাইয়া দিলেন। আপাততঃ এ প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য তিনি কহিলেন, "হ্যাঁ রে দিদি তোর সঙ্গে কি আমার সেই সম্বন্ধ। তুই আমার কত আদরের তা জানিস? দাদুর ওপর রাগ করে কি এমন সব কথা বলতে হয়! তোর কলেজে পড়াটা পছন্দ না করলে কি আর তোর জন্যে মাষ্টার ঠিক করি। যাতে ভাল করে পাশ করতে পারিস তারই জন্যে বাড়ীতে মাষ্টার রাখার ব্যবস্থা করিছি।"

গৌরী লজ্জিতা হইয়া কহিল, "তোমার ওপর রাগ করব কেন দাদু। হ্যাঁ দাদু, মাষ্টার মশায় কবে থেকে আসবেন?

এম-এ-তে বুঝি তিনি ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েছেন ইংরেজিতে ?"

কেশব কহিলেন, "হ্যাঁ সব দিক দিয়ে খুব ভাল ছেলে। যাকে তাকে ত রাখতে পারি না, ভাল করে সন্ধান নিয়ে তবে তাকে আসতে বলেছি,—হ্যাঁ আজ পাচটার সময় তার আসবার কথা,—কটা বাজল ?"

গৌরীর হাতে ঘড়ি বাঁধা ছিল। সেই দিকে চাহিয়া কহিল, "পাচটা বাজে, মিনিট পনর বাকি আছে দাদু। তুমি সে কথা ভুলে গেছলে বুঝি ?"

কেশব কহিলেন, "না দিদি ভুলি নি। সেই কথা বলবার জন্তেই তোকে ডেকে পাঠালুম,—অথচ কতকগুলো বাজে কথা বলা হয়ে গেল। তোর ত আজ কোন জায়গায় যাবার দরকার নেই দিদি ?"

গৌরী কহিল, "না দাদু,—তোমাকে না বলে কি আমি কোথাও যাই।"

এমন সময় বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, অজিত বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন। কেশব কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গিয়া একটি যুবককে সঙ্গে লইয়া কক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "দিদি ইনিই তোমার মাষ্টার মশায়, —আর ভায়া ইনি তোমার ছাত্রী।"

প্রায় একই সঙ্গে একজন আর একজনকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সেই সঙ্গে উভয়ের চোখোচোখি হইয়া গেল। হঠাৎ তাহাদের মনে হইল, যেন তাহারা কতদিনের পরিচিত। অথচ এই যে তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ এ বিষয়েও তাহাদের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।

কেশব কহিলেন, "বোস ভায়া !"

অজিত উপবেশন করিলে কেশব গৌরীর দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "মাষ্টার মশায়কে পছন্দ হল ?"

গৌরী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল, মনে মনে কহিল, না দাদু ভারি অসভ্য। এ কি প্রশ্ন ? ইহার কি উত্তর দেওয়া যায়।

কেশব হাসিয়া কহিলেন, "তোরা হচ্ছিস এ-কালের কলেজে-পড়া মেয়ে,—আমাদের পছন্দে ত তোদের চলবে না দিদি,—তাই জেনে নিলুম। যাক—আমার একটা দুর্ভাবনা কেটে গেল—বুঝলুম তোর পছন্দ হয়েছে, মৌনং সম্মতি লক্ষণং।" তার পর অজিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তা হলে তোমার চাকরী পাকা হয়ে গেল—কাল থেকে নিয়মিত আসবে।"

অজিতও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, এইবার কহিল, "আজ্ঞে তাই আসব।"

কেশব কহিলেন, "তোমরা আলাপ পরিচয় কর। দু'জনে মুখ বুঁজে বসে থাকলে ত চলবে না—মাষ্টার আর ছাত্রী—একজনকে পড়া বুঝিয়ে দিতে হবে, বুঝতে না পারলে আর একজনকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।"

কুণ্ঠা দূর করিয়া অজিত গৌরীকে প্রশ্ন করিল, "আপনাকে কি খালি ইংরাজি পড়াতে হবে ?"

গৌরী নতমুখে কহিল, "ইংরাজিটাই আমার বেশী দরকার।"

অজিত কহিল, "বেশ, অন্য বিষয় যখন যা দরকার হবে তাও জেনে নেবেন।"

গৌরী কহিল, "নেব।"

কেশব কহিলেন, "তোমার ছাত্রীটি খুব বুদ্ধিমতী, তোমার বেশী খাটতে হবে না। দু'দিন পড়ালেই বুঝতে পারবে।"

অজিত কহিল, "বেশ ইন্‌টেলিজেণ্ট তা দেখলেই বোঝা যায়।"

গৌরী মাথা হেঁট করিল, তাহার কান লাল হইয়া উঠিল।

কেশব হাসিয়া কহিলেন, "তাহ'লে তুমি পড়াবে ভাল, তা বুঝতে পারছি।"

অজিত কহিল, "ভাল করে পড়াবারই চেষ্টা করব, অবশ্য আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে যতটা কুলোয়। তবে যিনি পড়বেন, তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। হ্যাঁ দেখুন ক'টার সময় আসলে চলবে ? আমি খুব ভোরে উঠি।"

গৌরী মুখ নীচু করিয়াই কহিল, "আমরাও ভোরে উঠি।"

অজিত কহিল, "তা হ'লে আমি ছ'টার সময় আসব—এই ঘরেই পড়বেন ?"

কেশব কহিলেন, "না, এ ঘরটায় আমি বসি—ঠিক পাশেই দিদির পড়বার ঘর, এস ভায়া দেখিয়ে আনি !"

তিনজনে পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। অজিত দৃষ্টি বুলাইয়া দেখিয়া লইল, ঘরটি ছোটখাট লাইব্রেরী বিশেষ—ঘরের চারিদিকে ভাল ভাল আলমারি, তাকে তাকে বই সাজান। হাঁ, পড়িবার এবং পড়াইবার উপযুক্ত ঘর !

কেশব কহিলেন, "তুমি ছ'টায়ই এস, তার আগেই দিদি তৈরী হ'য়ে বসে থাকবে। কি বলিস দিদি ?"

গৌরী কহিল, "হাঁ৷ আমি তৈরী হয়ে থাকব।"

আর কোন কথা হইল না। অজিত বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন অজিত যখন কেশববাবুর গৃহে আসিয়া পৌছিল, তখন ছয়টা বাজিতে মিনিট পাঁচেক বাকি। নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৌরী প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া গৌরী আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপনি উঠিলেন কেন বসুন।"

গৌরী কহিল, "আপনি আগে বসুন।"

অজিত সম্মুখের চেয়ারখানিতে উপবেশন করিল। গৌরীও তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিল। অন্য কোন কথা হইল না। কোন্ বইখানি গৌরী আগে পড়িতে চায় সেই বইখানি চাহিয়া লইয়া অজিত পড়াইতে আরম্ভ করিল। গৌরী একাগ্রমনে পাঠ শুনিতে লাগিল।

খানিক পরে বই হইতে মুখ তুলিয়া অজিত কহিল, "বোঝবার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ?"

গৌরী কহিল, "না বেশ বুঝতে পারছি।"

অজিত কহিল, "যদি এতটুকু অসুবিধে হয় একবারের জায়গায় আপনি পাঁচবার জিজ্ঞেস করবেন।" এই বলিয়া সে আবার পড়াইতে আরম্ভ করিল। উচ্চারণ-ভঙ্গী তাহার যেমন সুন্দর, বুঝাইবার শক্তিও তাহার তেমনই অসাধারণ। গৌরী তন্ময়চিত্তে তাহা শুনিতে লাগিল। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও তাহার হইল না।

এইবার অজিত তাহাকে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা যেটুকু পড়ালুম, আপনি সেইটুকু আমায় বুঝিয়ে দিন দিকি।"

গৌরী প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর ধীরে ধীরে পাঠ বলিতে আরম্ভ করিল।

পাঠ শেষ হইলে অজিত উচ্ছ্বসিতভাবে কহিল, "খুব ভাল বলেছেন। আমার পড়ান সত্যই সার্থক হয়েছে। আমি আরও দু' চারজনকে ত পড়িয়েছি, এত শীগগির এমন সুন্দর-ভাবে কেউ কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি।"

তাহার এই প্রশংসায় গৌরীর মাথা আপনি নত হইয়া আসিল।

অজিত কহিল, "আপনার মত ছাত্রীকে পড়াতে খুব আনন্দ পাওয়া যায়।"

গৌরী তেমনই নতমুখে কহিল, "আমি কিন্তু অতটা প্রশংসার যোগ্য নই।"

অজিত হাসিয়া কহিল, "যোগ্য কি অযোগ্য সে বিচারের ভার শিক্ষকের, ছাত্রীর নয়। আচ্ছা তা হ'লে উঠি!" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কেশববাবু পাশের ঘরে ফরাসের উপর বসিয়া এতক্ষণ তামাক সেবন করিতেছিলেন। এইবার তিনি গৌরীর পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ের দিকে এক একবার চাহিয়া লইয়া কহিলেন, "ছাত্রীটিকে কি রকম দেখলে ?"

অজিত কহিল, "বেশ মেধাবী, একবার বুঝিয়ে দিলে বেশ বুঝে নেন। দ্বিতীয়বার আর বলতে হয় না।"

কেশববাবু স্মিতমুখে কহিলেন, "তা হ'লে তোমার কাজটা হাল্কা হয়ে যাবে কি বল ?"

অজিত কহিল, "তা ত হবেই। আমি সেই কথা ওঁকে বলছিলুম।"

কেশববাবু কহিলেন, "ওর মাথায় আবার চন্দ্রবিন্দু কেন হে? কাল অবধি না হয় চলেছিল, কিন্তু আজ থেকে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে—গুরু এবং শিষ্যা,—আপনি মশায় বলে কথা ভাল দেখায় না।"

অজিত কহিল, "উনি যদি তুমি বলাটা পছন্দ না করেন ? তা ছাড়া উনি কলেজে "

কুণ্ঠিতভাবে গৌরী কহিল, "আমি ত আপনার ছাত্রী।"

কেশববাবু হাসিয়া কহিলেন, "কলেজে-পড়া মেয়েদের একটু সমীহ করে চলতে হয় বৈ কি ; আর তোমরা তা আমার মত বুড়োর চেয়ে ভাল করেই জান। তবে আমার দিদির যখন আপত্তি নেই, তখন তোমার এত সমীহ করে চলবার আর প্রয়োজন হবে না। থাক্ মাষ্টার ত ছাত্রীর পরীক্ষা নিয়ে খুসী হয়েছেন, এখন ছাত্রী কি বলেন সেটাও শোনা দরকার ? হাঁ৷ দিদি মাষ্টারমশায় কি রকম পড়ালেন, ভাল ?"

গৌরী নতমুখে নিম্নস্বরে কহিল, "খুব ভাল, কলেজে প্রফেসারেরা এত ভাল করে বুঝিয়ে দেন না ত।"

কেশববাবু আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "ঠিক বলেছিস দিদি। তবে বাহবা আমায় দিতে হবে কিন্তু, কি রকম মাষ্টার খুঁজে বার করেছি—"

"আমার কাজ আছে, চললুম।" এই বলিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া দ্রুতপদে অজিত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

কেশববাবু যেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "ভারি চমৎকার ছেলে।"

গৌরীর মুখ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল, "সত্যি দাদু।". কথাটা বলিয়া ফেলিয়া লজ্জায় সে রাঙা হইয়া উঠিল।

কেশববাবু চকিতদৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া হাসি চাপিবার জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

মাস দুই পরের কথা। অজিত প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আসে, নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া যায়। পাঠ্য-পুস্তকের আলোচনা ছাড়া আর কোন আলোচনাই গৌরীর সঙ্গে তাহার হয় না। গৌরীকে সে 'তুমি' বলিয়াই সম্বোধন করে এবং শিক্ষকের মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াই চলে। তবে মাঝে মাঝে সে উপদেশছলে গৌরীকে শুনাইয়া বলে, মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল হওয়া উচিত নহে,— অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী সে একেবারেই নহে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। গৌরী তাহা শুনিয়া যায়, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে না। তাহার অন্তর অজিতের সমস্ত কথা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়া লয়। কেশববাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করেন। তবে অজিতের সম্বন্ধে গৌরীর সঙ্গে কোন আলোচনাই আর তিনি করেন না।

সেদিন সাড়ে ছয়টা বাজিয়া গেল, অজিত আসিল না। গৌরী পুস্তকগুলা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, নিজে যে কোন একখানা পুস্তক খুলিয়া পড়িবে, সে উৎসাহ তাহার দেখা গেল না। কাহার পদশব্দ শুনিবার জন্য যেন সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল। এমনই ভাবে আরও আধঘণ্টা অতি-বাহিত হইয়া গেল। গৌরী বুঝিল, মাষ্টার মহাশয় আজ আর আসিবেন না। সে একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিল, দুই চারি ছত্র পড়িয়া গেল, কিন্তু তাহার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। পুস্তক বন্ধ করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অজিত যে আসনখানিতে বসিত, সেই আসনখানিতে তাহার ব্যথাতুর দৃষ্টি যেন আপনা-আপনি নিবদ্ধ হইয়া গেল। তাহার দাদু যে কখন আসিয়া তাহার আসনের পিছনে দাঁড়াইয়াছেন, তাহাও সে জানিতে পারিল না।

"দিদি, কি হচ্ছে?"

দাদুর কণ্ঠস্বরে গৌরী চমকিয়া উঠিল!

"একলা পড়তে ভাল লাগছে না?"

তাড়াতাড়ি গৌরী কহিল, "ভাল লাগবে না কেন, পড়ছিলুম ত?"

কেশববাবু যথাসম্ভব গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "ও, পড়ছিলে, আমার দেখবার ভুল হয়েছে। কিন্তু মাষ্টার মশায়ের এ রকম কামাই করা ভারি অন্যায়।"

গৌরী কহিল, "তাঁর ত অসুখ হ'তে পারে।"

কেশববাবু কহিলেন, "কাউকে দিয়ে খবর দেওয়া ত উচিত।"

গৌরী কহিল, "হয়ত হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়েছে, তাই খবর দিতে পারেন নি।"

কেশববাবু কহিলেন, "তা না হয় ধরে নিলুম, কিন্তু তোর এই ক্ষতিটা যে হ'ল সেটা পূরণ করবে কে?"

গৌরী কহিল, "একদিন না পড়লে কি এমন ক্ষতি হবে দাদু?"

কেশববাবু জোর দিয়া কহিলেন, "হয় রে দিদি, হয়, তবে এ ক্ষতি আমি পূরণ করিয়ে নেব, ক'দিন কামাই করবে তার ঠিক কি, যে ক'দিনই করুক, গুণে সে ক'দিন দুবেলা পড়িয়ে যেতে হবে, সে ব্যবস্থা কিন্তু আমি করব।"

গৌরী এবার আর কোন প্রতিবাদ করিল না, শুধু বলিল, "সে যা হয় ক'র দাদু, আমি তার কি জানি।" দেয়াল-ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "সাড়ে আটটা বাজে, আজ আবার সকাল সকাল কলেজ যেতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন গৌরী দল বাঁধিয়া বায়স্কোপ দেখিতে যাইত। সে দলে তাহার সমবয়সী যুবতী ছাড়া দুই একজন যুবকও থাকিত। কিন্তু অজিত আসিবার পর হইতে বায়স্কোপ যাওয়াটা সে একেবারে কমাইয়া দিয়াছে। কোন সপ্তাহে হয় ত একটা দিন যাইত, কোন সপ্তাহে একেবারেই যাইত না। তাহার দলের সাথীরা আসিয়া পীড়াপীড়ি করিলে, সে একটা না একটা ছুতা করিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিত। এই দুই মাসে গৌরী যেন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছিল। সিগারেট খাওয়াটা যে অন্যায় তাহাও সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

অপরাহ্নে কেশববাবু কহিলেন, "মাষ্টার মশায়ের একবার খোঁজ নেওয়া দরকার, কি বলিস দিদি? হয় ত অসুখই করেছে।"

গৌরী কহিল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

কেশব কহিলেন, "একবার দেখে আসি, তুই যাবি আমার সঙ্গে?"

গৌরী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তাই চল দাদু।"

কেশব কহিলেন, "বেশ চল, ঘুরে আসি।"

গৌরীর পড়ার ঘরে বসিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বাহিরে পদশব্দ হইতেই গৌরী সচকিত হইয়া উঠিল। কেশববাবু দ্বারের দিকে চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অজিত পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গৌরী একবার চকিতে অজিতের দিকে চাহিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কেশববাবু প্রফুল্লমুখে কহিলেন, "এই যে অজিত! এস ভায়া, আমাদের বড্ড ভাবনা হয়েছিল, বুঝি বা তোমার অসুখ হয়েছে। ভাল ছিলে ত ভায়া?"

অজিত কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। পড়াতে বেরুচ্ছি এমন সময় খবর পেলুম, আমার এক বন্ধুর কলেরা হয়েছে। তাকে দেখতে গেলুম—গিয়ে দেখলুম, অবস্থা ভাল নয়। বেলা তিনটে অবধি সেখানে কেটে গেল। অনেকটা ভাল দেখে তবে বাড়ী ফিরে গেলুম।"

গৌরী সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "জীবনের আর কোন আশঙ্কা নেই ত?"

অজিত কহিল, "হ্যাঁ ডাক্তাররা তাই বললেন। ভয়টা কেটে গেছে বলেই মনে হয়। সকালবেলা তোমার পড়া হয় নি, তাই এলুম এ বেলা, তোমায় পড়িয়ে আবার সেখানে যাব।"

"আজ আর পড়াবার দরকার নেই—আপনি সেখানে যান।" এই কথা গৌরী বলিতে গেল—কিন্তু পারিল না।

কেশববাবু তাহার মনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন, "আজ পড়া থাক, সারাদিন যে রকম ভাবনায় কেটেছে—"

অজিত কহিল, "এখন তাড়াতাড়ি যাবার কোন দরকার হবে না। লোকজন সেখানে যথেষ্ট আছে। পড়িয়েই যাব। আজ যে বইখানা পড়াবার কথা ছিল, সেই বইখানা দাও ত গৌরী"

গৌরী একখানি পুস্তক অজিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল

কেশববাবু কহিলেন, "আমি ও ঘরে গিয়ে বসি এই বলিয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অজিত তখনও পড়াইতেছে। কেশববাবু পাশের ঘরে বসিয়া যথারীতি তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় বেহারার সহিত এক চশমাধারী গৌরবর্ণ সুশ্রী যুবক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

দুই হাত জোড় করিয়া কপালের কাছে লইয়া যুবকটি কহিল, "আপনার পরিচয় আমি পূর্ব্বেই পেয়েছি। আমার পরিচয় এই চিঠিতে আছে।" এই বলিয়া পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া দিল।

খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানি পড়িয়া কেশববাবু আর একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর বলিলেন, "তা বেশ বেশ এম-এ পড়ছ, আসছে বার পরীক্ষা দেবে—ভাল কথা। তুমি শিবরামের বন্ধুর ছেলে, তুমি তা হলে ত আমাদের আপনার লোক। এখানে কোথায় থাকা হয় সরোজনাথ?"

সরোজ কহিল, "আমি হোষ্টেলে থাকি। বাবা হঠাৎ কি জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই দু' দিনের জন্যে সেখানে গেলুম, আজ বিকেলে ফিরেছি। আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছি—কাল হোষ্টেলে যাব।

কেশব কহিলেন, "বেশ বেশ,—গৌরীদিদির সঙ্গে আলাপ করতে এসেছ। সে এখন মাষ্টারের কাছে পড়ছে। বোধ হয় পড়া শেষ হয়ে এল।"

সরোজ কহিল, "আমার তাড়াতাড়ি নেই, আমি বসছি।"

কেশব কহিলেন, "কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করে দি?"

সরোজ কহিল, "বন্ধুর বাড়ী আমি জলযোগ সেরে এসেছি। এখন থেকে রোজই আসব, খেলেই হ'ল।"

এমন সময় পড়া শেষ করিয়া গৌরী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং অপরিচিত যুবকটীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনি গৌরী দেবী। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। আপনার বাবা, মা, দাদা ও অন্যান্য ভাইবোনরা সবাই ভাল আছেন—আমি সেখান থেকেই আসছি।"

কেশব কহিলেন, "ওঁর বাবা সেখানে চাকরী করেন।"

সরোজ কহিল, "বাবা ছ মাস হ'ল সেখানে বদলি হয়ে গেছেন।"

গৌরী শুধু বলিল, "ও।"

সরোজ একবার চকিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া কহিল, "আপনার বাবার কাছে শুনলুম, আপনি খুব ফরওয়ার্ড। আপনাকে সেইভাবেই আপনার বাবা তৈরী করেছেন। আমি এই রকম ফরওয়ার্ড মেয়েই পছন্দ করি। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে এখন সাড়া পড়েছে—অনেককে এখন বেশ ফরওয়ার্ড দেখতে পাওয়া যায়। এই ত চাই।"

কেশব কহিলেন, "তোমরা ত তা চাইবেই। গৌরী দিদি এখনকার মেয়েদের মত শুধু ফরওয়ার্ড নয়, একটু বেশী ফরওয়ার্ড হয়েই পড়েছিলেন—কিন্তু কিছুদিন থেকে দেখছি দিদি যেন পিছু হাঁটতে আরম্ভ করেছেন।"

সরোজ হাসিয়া কহিল "পিছু হাঁটা কি রকম?"

গৌরী কহিল, "আমার একটু কাজ আছে—আমি যাচ্ছি।"

গমনোদ্যতা গৌরীর দিকে চাহিয়া সরোজ কহিল, "আজ বায়স্কোপ যেতে হবে, অবশ্য সেই ন'টায় শো'তে—তার এখনও দেরী আছে—আসবার পথে আমি একটা বক্সের টিকিট কিনে এনেছি।"

গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল, "টিকিট কিনতে কে আপনাকে বলছে—আপনাকে চিনি না, জানি না, আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আর আপনার সঙ্গে রাত্রের শো'তে আমি বায়স্কোপ দেখতে যাব?"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "দাদামশায়ের কথাই দেখছি ঠিক, আপনি পিছু হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে আপনার কোন বাধা নেই। আপনাকে নিয়ে যাবার জোর আমার আছে।"

ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিয়া গৌরী কহিল, "তার মানে?"

সরোজ কহিল, "মানে একটা কিছু আছে বৈকি! আপনার বাবার অনুমতি পেয়েছি বলেই না আমি আগে থেকে টিকিট কিনে এনেছি। কোন দোষ হবে না, আপনি তৈরী হয়ে আসুন।"

গৌরী কহিল, "বাবা হয় ত অনুমতি দিতে পারেন, কিন্তু আমার নিজেরও ত একটা মতামত আছে। আমি বায়স্কোপে যাই নে।"

সরোজ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "সে কথা আপনি অবশ্য বলতে পারেন।—আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারুর জোর খাটাবার অধিকার নেই। আমিও তা চাই না। তবে আপনি যদি ভেতরের খবর জানতেন তা হ'লে আপনার কোন আপত্তি থাকত না, বরং যাবার জন্য আপনার আগ্রহই হ'ত।"

গৌরী এ-কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। ভিতরের খবর ইহারই বা অর্থ কি? ইহাকে ত ইতিপূর্ব্বে সে কোনদিন দেখে নাই, পরিচয় থাকা ত দূরের কথা। সে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দাদুর মুখের দিকে চাহিল।

কেশববাবু কহিলেন, "আরে দিদি, ও যে শিবুর বন্ধুর ছেলে—শিবু যে ওঁর সম্বন্ধে অনেক কথা আমায় লিখেছেন। সে সব কথা আপাততঃ তোকে জানাতে বারণ আছে।

গৌরী কতকটা ঔদাসীন্যের সহিত বলিল, "জানাবার আমায় কোন দরকার নেই দাদু।" কিন্তু এই বলিয়াই সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সরোজ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর মনে মনে কহিল, বিয়েটা একবার হয়ে যাক, তারপর তোমার এ তেজ কোথায় থাকে তা আমি দেখে নেব।

কেশববাবু কহিলেন, "কি করবে ভায়া, কলেজে-পড়া মেয়েদের ধরণই এই!"

সে ব্যবস্থা যথাসময়ে হবে। সে জন্য আপনি ভাবিবেন না। মনে মনে এই বলিয়া সরোজ দাঁড়াইয়া উঠিল, দু'হাত তুলিয়া একটা শুষ্ক নমস্কার করিয়া গম্ভীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

কেশববাবু শুধু একটু হাসিলেন।

* * *

দিন সাতেক পরের কথা। সরোজ আর এ বাড়ীতে আসে নাই। অজিত যথাসময়ে গৌরীকে পড়াইয়া যাইতেছে। এমন সময় শিবরামের একখানি পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে লেখা ছিল, তিনি সরোজের সহিত গৌরীর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। এই মাসেই বিবাহ হইবে। ছুটি মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যে তিনি সপরিবারে

কলিকাতায় আসিতেছেন—পত্র পড়িয়া কেশববাবু হাসিলেন।

গৌরীর সহিত দেখা হইলে তিনি তেমনই হাসিমুখে কহিলেন, "দিদি, তোর যে বিয়ে।"

গৌরী হাসিয়া কহিল, "তাই নাকি ! কার সঙ্গে দাদু ?"

কেশব কহিলেন, "ধর যদি বলি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে ?"

গৌরী কহিল, "যাও, কি যে বল তার ঠিক নেই। অমন কথা বল ত আর আমি পড়ব না।"

কেশববাবু কহিলেন, "সেই ভাল দিদি—ক'দিনই বা পড়বি। শিবুর চিঠি পেলুম—এই মাসেই তোর বিয়ে দেবে। পাত্র কে জানিস ? সরোজ।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে গৌরী কহিল, "তুমি লিখে দাও দাদু, বিয়ে আমি করব না। আগে আমি এম-এ পাশ করি, তার পর ও-কথা, তার আগে নয়। তুমি এখনই লিখে দাও দাদু।"

কেশববাবু কহিলেন, "লিখে আর কোন লাভ নেই দিদি। চিঠি পাবার আগেই তারা সবাই এসে পড়ছে। সব পাকাপাকি হয়ে গেছে।"

গৌরী কহিল, "পাকাপাকি অমনি হ'লেই হ'ল।" এই বলিয়াই সে দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিল এবং নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে আরও চারিটা দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। শিবরাম সপরিবারে কেশববাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই শ্বশুরমহাশয়কে জানাইলেন, সরোজের পিতা কালই গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবেন, তাঁহারাও পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিবেন। মাঝে একটা দিন—তার পরদিন বিবাহ।

গৌরীর মেজো বোন লালিমা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া আসিয়া কেশবের পাশে দাঁড়াইয়া কহিল, "দিদি কোথায় গেল দাদু।"

কেশববাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "শ্বশুরবাড়ী।"

লালিমা হাসিতে হাসিতে দাদুর গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িয়া কহিল, "বারে, দাদুর যেমন কথা। বিয়ে হ'ল না, বিয়ের আগেই শ্বশুরবাড়ী।"

কেশববাবুর কন্যা, অর্থাৎ শিবরামের স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা বাড়ীময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল।

গৌরীর জননী হাসিয়া কহিলেন, "গৌরীর খুব লজ্জা হয়েছে দেখছি—কোথায় লুকিয়ে আছে, আমাদের সামনে আসছে না। অন্য সময় হ'লে কখন্ সে ছুটে আসত।"

লালিমা কহিল, "আমি যাচ্ছি, দিদিকে খুঁজে ধরে নিয়ে আসছি।" এই বলিয়া লাফাইতে লাফাইতে সে আবার চলিয়া গেল !

কেশববাবু শিবরামের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ শিবু, গৌরী দিদি কাল এখান থেকে চলে গেছে। সে কথা তোমাদের এখনও বলা হয় নি।"

গভীর বিস্ময়ে শিবরাম বলিয়া উঠিলেন, "চলে গেছে ! তার মানে ? কোথায় ? কার সঙ্গে ?"

কেশববাবু কহিলেন, "তার স্বামীর সঙ্গে তোমাদের দেশের বাড়ীতে।"

শিবরাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তার মানে, গৌরীর স্বামী, দেশের বাড়ী, আপনি এ সব কি বলছেন ?"

কেশববাবু ধীরভাবে কহিলেন, "বিচলিত হবার কোন কারণ নেই শিবু, আগে ধীরে সুস্থে সব কথা শোন। তোমার বাবা ন' বছর আগে যার হাতে গৌরী দিদিকে সম্প্রদান করে-ছিলেন, সে ছেলেটি এবার এম-এ'তে ফার্ষ্ট হয়েছে। চমৎকার ছেলে। খোঁজ ক'রে তাকেই আমি গৌরী দিদির মাষ্টার রেখেছিলাম। কাল তারা তোমার বাবার পায়ের ধুলো নিতে তোমাদের দেশের বাড়ীতে চলে গেছে।" তারপর কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা, হিঁদুর মেয়ের কি দু'বার বিয়ে হয় ! এ ভালই হয়েছে। সতীনের ভয় ক'র না মা। গৌরী দিদির সতীন নেই, বিয়ের কিছুদিন পরেই সে মারা গেছে। জামাইকে ত' তুমি দেখ নি। রূপে গুণে সমান। সত্যই একটি রত্ন। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।"

সব কথা হয় ত শিবরামের কানে গেল না। তিনি নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।
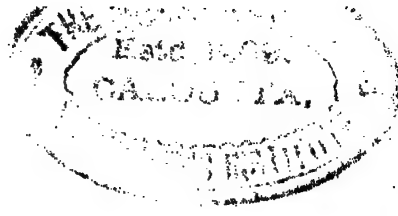
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

—শ্রীসুকুমার সেন

[৬৯]

শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল-কার কৃষ্ণদাস নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

মাতা অতি পতিব্রতা পদ্মাবতী নাম।
পিতা সে বাসবানন্দ অতি গুণবান॥
তর্ক বর্ক পিতা মোর কিছুই না জানে।
সন্তানে উত্তম জানে দাস অভিমানে॥
জাহ্নবী পশ্চিম-কূলে বসতি আমার।
বর্ণিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব নহে অধিকার॥
আচার্য্য গোসাঞির স্থানে করি ভৃত্য কার্য্য।
দেখিঞা করিল দয়া মাধব আচার্য্য॥
না পড়িল না শুনিল হিয়া পরকাশ।
বুঝিয়া রাখিল মোর নাম কৃষ্ণদাস॥ ১

ইহা হইতে জানা যায় যে 'কৃষ্ণদাস' কবির গুরুদত্ত নাম। গুরুসূত্রে কবি নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত ছিলেন তাহা অনুমান করিবার কিঞ্চিৎ হেতু আছে। বন্দনায় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর একত্র উল্লেখ আছে—

নবদ্বীপ চন্দ্র বন্দ নিতাই চৈতন্ত। কৃতপাপী তরাইতে আর কেবা অন্ত॥ ২

ভণিতার দুই স্থলে শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দের উল্লেখ আছে—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণকমল। কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ ৩
শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ পদ(যুগ) করি আশ। মাধবচরিত-গান গায় কৃষ্ণদাস॥ ৪

আমার অনুমান যথার্থ হইলে বলিতে হইবে, কবির গুরু মাধব-আচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন—

আমার [প্রভুর] প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী। দীক্ষা মন্ত্র দিলা প্রভু মোর কর্ণ ধরি॥৫

কবির গুরু মাধব-আচার্য্য একখানি শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল রচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

মাধব-আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল।
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ ৬
পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছে আচার্য্য গোসাঞি।
মনে অনুমানি সেই অনুসারে গাই॥
লিখিতে না পারি মনে সদাই তরাস।
না জানি আচার্য্য মোর করে সর্ব্বনাশ॥
আচার্য্য দেখিয়া গ্রন্থ করিল বাখান।
রস পাইয়া গান করে৭ অমৃত সমান॥
দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
এথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার॥ ৮

প্রথম মাধবের শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ লে নিত্যানন্দ প্রভুর উল্লেখ নাই, সুতরাং এই মাধব-আচার্য্য দ্বিতীয় মাধব হইবেন। দ্বিতীয় মাধবের বিশিষ্ট ভণিতার অনুরূপ ভণিতা কৃষ্ণদাসের কাব্যে দুই এক স্থলে দেখা যায়।

চিন্তিঞা চৈতন্যচান্দের চরণকমল।
কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ ৯

ভণিতায় কবি অনেক স্থলেই দ্ব্যর্থের সাহায্যে গুরু এবং গোবিন্দের বন্দনা একসঙ্গে করিয়াছেন। যথা—

পূজএ কুমারী কাত্যায়নীর চরণ। মাধবচরণে গায় যাদব নন্দন॥১০

মাধবচরণে করি নিবেদনে
বিরচিল কৃষ্ণদাস॥১১

কৃষ্ণদাসের শ্রী কৃ ষ্ণ ম ঙ্গ ল ষোড়শ শতকের শেষ পাদের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। কবির উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে তখন বৃন্দাবনে গোস্বামিগণের পূর্ণ প্রতিপত্তি। কবি বন্দনায় রূপ এবং রঘুনাথ গোস্বামীর নাম করিয়াছেন; অন্যত্র রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডের উল্লেখ আছে।

অদ্বৈত স্বরূপ বন্দ রায় রামানন্দ। রূপ রঘুনাথ বন্দ করিয়া আনন্দ॥১২
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শোভে মনোহর। কুণ্ডতীরে কৃষ্ণগণ দেখিতে সুন্দর॥১৩

১। পৃঃ ৬৮৫ ২। পৃঃ ৫ ৩। পৃঃ ১৫৩ ৪। পৃঃ ৬৮৭ ৫। পৃঃ ৬৮৩

৬। এই পয়ারটি দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনা হইতে গৃহীত হইয়াছে
৭। 'শুনি' মুদ্রিত পুস্তক, 'করে' রতন-লাইব্রেরী পুঁথি সংখ্যা ১৫৪
৮। পৃঃ ৫-৬ ৯। পৃঃ ১২৮ ১০। পৃঃ ১১৯ ১১। পৃঃ ১০০ ১২। পৃঃ ৫ ১৩। পৃঃ ১৭৭

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের মধ্যে কেবল বৃন্দাবনদাস এবং স্বীয় গুরু মাধব-আচার্য্যের উল্লেখ আছে।

বৃন্দাবনদাস বন্দ হইঞা সম্প্রত। জাহার রচিত গীত চৈতন্ত ভাগবত॥
মাধব-আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল। যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥১

[৭০]

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত কৃষ্ণায়ণ কাব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে নাই এমন কিছু কিছু কাহিনী ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, বংশীচৌর্য্য প্রভৃতি লীলাকাহিনী কোন পুরাণে বর্ণিত হয় নাই। তাহাও ইহাতে আছে। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে। অন্ত নহি২ কিছু কহি হরিবংশ মতে॥৩
আর অপরূপ কথা অমৃতের ভাণ্ড। না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখণ্ড॥
হরিবংশে লিখিঞাছে করিয়া বিস্তার॥৪

খিল হরিবংশে এই কাহিনীগুলি নাই। কৃষ্ণদাসের উক্তি যদি অজ্ঞতাপ্রসূত না হয় তবে অপর এক ভাষা (?) হরিবংশ ছিল বলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ভবানন্দের কাব্যের নামও হরিবংশ এই কথাও স্মর্ত্তব্য।

রাজা জিজ্ঞাসএ কথা কহে মহামুনি। পারিজাতহরণ কথা কহ দেখি শুনি॥৫

পারিজাতহরণ কাহিনী অবশ্য হরিবংশে আছে। কবি মহাভারত হইতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও সুভদ্রাহরণ কাহিনী এবং উঞ্ছবৃত্তিকথা লইয়াছেন।

এবে শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন। জেন মতে দ্রৌপদীর হরিল বসন॥
এসব রসের কথা নাহি ভাগবতে। বিস্তারি কহিল কিছু ভারতের মতে॥৬
কথার প্রসঙ্গে কথা হয় সেই কালে। কহিল ভারতকথা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে॥৭

মহাভারত হইতে গৃহীত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং সুভদ্রাহরণ কাহিনীতে কিছু কিছু নূতন কথাও পাওয়া যায়। দ্রৌপদীকে ধৃতরাষ্ট্রের বরদানের পর দুর্য্যোধনের গৃহে অগ্নি লাগায় দুর্য্যোধনের অন্তঃপুরস্থমহিলারা অগ্নিভয়ে বিবস্ত্র হইয়া সভামধ্য দিয়া পলাইয়াছিলেন এই সংবাদ কৃষ্ণদাস দিয়াছেন

বর পাইঞা ঘর গেলা দ্রুপদনন্দিনী। দুর্য্যোধনের ঘরে উঠিল আগুনি॥
খাট পাট পোড়ে আর রত্নসিংহাসন। অবশেষে পোড়ে রাজরাণীর বসন
ছাড়িল বসন সভে অগ্নির জ্বালায়। নগ্ন হইঞা সভা দিঞা রমণী পলায়॥
কর্ণ ভীষ্ম আদি বীর আছিল সভাতে। বিবস্ত্র রমণী দেখি রহে হেট মাথে॥৮

কৃষ্ণদাসের মতে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া প্রথমে পছন্দ করেন নাই, সুভদ্রাই অর্জ্জুনের প্রেমে পড়িয়াছিলেন। তাহাতে সত্যভামা তুকতাকের সাহায্যে অর্জ্জুনকে সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট করেন।

দেবী বোলে মায়াবতি শুনহ বচন। ভুলিল সুভদ্রা দেবী দেখিঞা অর্জ্জুন॥
বিভা দিতে গিঞাছিলাও অর্জ্জুনের ঘরে। না করিল বিভা সেই অর্জ্জুন নৃপবরে॥
এত শুনি মায়াবতী জপে ব্রহ্মজ্ঞান। সিন্দূর কজ্জল দিল করিঞা নির্ম্মাণ॥
ভয় না করিহ দেবি দেখিঞা অর্জ্জুন। পরশ করিলে তার খসিবে অখন॥
মায়ার বচনে দেবী সুভদ্রা আসিঞা। মন্দিরে প্রবেশ করে দ্বার ঘুচাইঞা॥
ভরত হইল বীর হাতে খড়্গ করি। উঠিতে দেখিল দেবী সুভদ্রা সুন্দরী॥
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র দেখিঞা বদন। কন্দর্প জিনিল তনু বাড়িল মদন॥
দেখিঞা অর্জ্জুন বীর পড়ি গেল ভোলে। ছটপট করে দেবী অর্জ্জুনের কোলে॥
দেবী বোলে আইজ মোর কৈল সর্ব্বনাশ। করিলা আমার এবে জাইত কুল নাশ॥
দেবী আস্ফালন করে অর্জ্জুনের পাশে। মুখে বস্ত্র দিঞা দেবী সত্যভামা হাসে॥৯

মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে কৃষ্ণদাসের কাব্যের আকার কিছু ছোট। যাহাতে গ্রন্থবাহুল্য না হয় সে দিকে কবির সজাগ দৃষ্টি ছিল

নাম নিতে লাগে ডর গ্রন্থ বাড়ে বহুতর
তেঞি ইহা না কৈল বিস্তার॥১০
অন্য অন্য গ্রন্থে ইহা বিস্তারি কহিল। কহিতে পুস্তক বাড়ে সংক্ষেপে রচিল॥১১

কৃষ্ণদাসের কাব্য মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও ইহার বিশেষ কিছু প্রসার হয় নাই। এই কারণেই কাব্যটির পুঁথি বেশি পাওয়া যায় না। মুদ্রিত পুস্তকে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ প্রায়ই নাই, কেবল ছয় স্থলে মাত্র আছে—কর্ণাট, গৌরী (=গোড়ী), বড়ারি, শ্রী, সারঙ্গ, করুণা। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে গোবিন্দদাসের পদ একটি রহিয়া গিয়াছে[১২]। গ্রন্থের শেষে কবি একটি 'অনুবাদ' অর্থাৎ সূচি দিয়াছেন। ব্রজবুলি পদ দুই একটির অধিক নাই। এই সকল সখী এবং লীলাসহায়িকার উল্লেখ আছে[১৩]—চন্দ্রাবলী, মঞ্জুলালী, ললিতা, বিশাখা, কুন্দলতা, ইন্দুমুখী, বিন্দুমুখী, মাধবী, কমলা, সুদেবী, রঙ্গদেবী, সুচিত্রা, সুশীলা, হেমা, ক্ষেমা,

১। পৃঃ ৫ ২। 'মুক্তি' হইবে কি? ৩। পৃঃ ১৩৭ ৪। পৃঃ ১৫০
৫। পৃঃ ৩২৭ ৬। পৃঃ ৩৫৩ ৭। পৃঃ ৩৫২ ৮। পৃঃ ৩৫১-৩৫২।
৯। পৃঃ ৩৬০-৩৬১ ১০। পৃঃ ২৮৩ ১১। পৃঃ ৩৬৫
১২। পৃঃ ২০০-২০১ ১৩। পৃঃ ১৬৮, ১৭৭

ধী, শ্যামা, রঞ্জনা, খঞ্জনা, রূপমুঞ্জি, রসপুঞ্জি, সুলোচনা, রঙ্গা, নস্থয়া, হরিপ্রিয়া, তুলসী, মল্লিকা, তারা, উমা, সত্যভামা, বর্ণ কলিকা, পূর্ণমাসী, বীরা, বৃন্দা।

[৭১]

কাব্য হিসাবে কৃষ্ণদাসের **শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল** একখানি ৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কবির চলিত ভাষার উপর দখল অসাধারণ ছল। কাব্যটির মধ্যে অর্থান্তরন্যাস হিসাবে ব্যবহৃত প্রবচন সূক্তি পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দেয়। কতিপয় উদাহরণ াতেছি—

কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে যশোদা রোহিণী।
ডুমুর হারাইয়া যেন ফুকরে বাঘিনী ॥১
ধাইঞা জাইঞা নন্দরাণী কোলে নিল পুত্র।
ঘটভরা ধন জেন পাইল দরিদ্র ॥২
নিরখএ চান্দমুখ বালকের ভানে৩।
কল্পতরু ফল মাগে সাকোটের স্থানে ॥৪
নলিনীর বন জেন উড়াইল ঝড়ে।
কাটিল কদলী জেন আছাড়িঞা পড়ে ॥৫
কাটিল কদলি জেন ডালে মূলে পড়ে।
আছাড় খাইঞা জেন পড়এ পাথারে ॥৬
এতেক বলিঞা কৃষ্ণ দিলেন বিদায়।
শুকাইল আশানদী গ্রীষ্মের৭ বাএ ॥৮
অক্রুর গাঁথিয়া দিল বিরহের মালা ৯।
কত না জপিবে গোপী বিরহের মালা ॥১০
অন্তরে দুখিত দেবী সয়াস্ত না পায়।
মন-বন পোড়ে জেন উথলিল বায় ॥১১

কৃষ্ণদাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় হিসাবে নবজাত কৃষ্ণের পবর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চেতন পাইঞা রাণী কোলে দেখে পুত্রখানি
আনন্দ-সাগর মাঝে ভাসে।
দেখিল বালক তনু নীল সে কমল জনু
তিমিরে তিমিরপুঞ্জ নাশে।
জিনি রাঙা উৎপল শোভে কর পদতল
উদিত কমল মুখচান্দে।
হেরিঞা বালক পানে ধারা বহে দুনয়ানে
কি জানি কি লাগি প্রাণ কান্দে।
ও চান্দবদন দেখি পালটিতে নারি আঁখি
নিরখি ধৈরজ নাহি মানে।
তোমরা দেখহ আসি উদয় কৈয়াছে শশী
নন্দকে ডাকএ হাত সানে।
জনম সাফল কর বালক দেখহ তোর
নিরমল বদন কমল।
জিনি পাকা বিম্বফল আঁখি কর পদতল
আঁধারে করিছে ঝলমল।
জিনিঞা বান্ধুলি ফুল অধরের দুটি কুল
রহে জেন অন্তরে লাগিঞা।
রসে ঢর ঢর আঁখি জারক ভ্রমর পাখি
প্রাণ হরি লইল চাহিঞা॥
তড়িত বিজুরী কিবা নব মেঘে জেন শোভা
ভুরুযুগ কামের কামান।
জিনি ইন্দ্রনীল মণি মাজিঞাছে মুখখানি
বিরলে করিল নিরমান॥ ১২

কৃষ্ণদাস মালঝাঁপ পয়ারের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দানখণ্ড অংশ হইতে মালঝাঁপের উদাহরণ দিতেছি।

পাকা চুলে নানা ফুলে বাঁধিল কবরী।
দোবসন পীন স্তন বাঁধে উচ্চ করি॥
হাতে নড়ি যায় বুড়ী যুবতীর আগে।
গজপতি জিনি গতি চলে মহাবেগে॥
আইস পথে মোর সাথে হেট করি মাথা।
কারু সনে কোন জনে না কহিহ কথা॥
তো সভাকে জদি দেখে আসি নন্দলাল।
পথে পাঞা সভা লৈঞা পড়িবে জঞ্জাল॥
রাধা বোলে তরুতলে কিবা দেখি সখি।
হাতে বাঁশী মুখে হাসি রাঙ্গা দুটি আঁখি॥
নীপতটে মেঘ বটে নামিয়াছে জেন।
বরিষণে গোপীগণে ভাসাইবে হেন॥ ১

[৭২]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচয়িতা রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের এক শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত রামকান্ত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া একটি শ্রীকৃষ্ণচরিত কাব্য রচনা

১। পৃঃ ৫২ ২। পৃঃ ৫৩ ৩। 'ভালে' মুদ্রিত পুস্তক। পৃঃ ৭৯ ৫। পৃঃ ১০৪ ৬। পৃঃ ১১৭ ৭। 'গিরিষের' হওয়া উচিত ৮। পৃঃ ১৩৫ ৯। 'শলা'? ১০। পৃঃ ২০৫ ১। পৃঃ ২৫৩

১২। পৃঃ ৩১-৩২ ১৩। পৃঃ ১৩৮—১৩৯

করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন এই কাব্যের একটি মাত্র পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১] রামকান্ত রাজসাহী জেলার গুড়নই গ্রামস্থ মৈত্রকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরে ইনি রঙ্গপুর জেলার ব্রাহ্মণীপুণ্ডা গ্রামে বাস করেন।[২] রামকান্তের লিখিত বলিয়া কথিত কাব্যের অল্প কিছু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ফুল ফলে নম্র হৈয়া কৈলা পরণাম।
সাধু সাধু বলি হরি কৈলা কি বাখান॥
কৃষ্ণ দরশন চিহ্ন দেখিল বিদিতে।
কলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেলা এহি পথে॥
অভাগিনী গোপনারী করিয়ে জিজ্ঞাসে।
স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ উপদেশে॥
এহি মতে তরুলতা পুছিয়া বেড়ায়।
বৃন্দাবনে ফিরে গোপী পাগলিনী প্রায়॥
ধরিতে না পারে চিত্ত না রহে জীবন।
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কত জন॥
কত কত কর্ম্ম কৃষ্ণ কৈল অবতারে।
গোপীগণ যেই যেই লীলারূপ ধরে॥
রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল রসময়।
শুনিলে দুরিত খণ্ডে হবে ভব-ভয়॥

১। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, ১৯১৪, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮০৬।

গুরু পদে করি মতি দীন হীন ভ্রান্ত।
বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকান্ত॥২

ভণিতার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারটি শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর ভণিতারই অনুরূপ। যথা—

ভাগবত-আচার্য্য রচিত রসময়। শুনিলে দুরিত হরে-খণ্ডে-ভবভয়॥ ৩

বস্তুতঃ বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ে রামকান্তের কাব্যের নিদর্শনরূপে যেটুকু অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা ভাগবতাচার্য্যের কাব্যেরই অংশ মাত্র, স্বতন্ত্র রচনা নহে। কৌতুহলী পাঠক বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের ৮০৬-৮০৮ পৃষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর ত্রিংশ অধ্যায় মিলাইয়া দেখিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে রামকান্ত ভাগবতাচার্য্যের কাব্যের একটি পুঁথির লিপিকার মাত্র।

গুরুপদ্মদ করি মতি দীন হীন ভ্রান্ত। বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকান্ত॥

এখানে 'বিংশতি' শব্দটি 'ত্রিংশ' বা 'ত্রিংশতি' শব্দের ভ্রান্ত পাঠ মাত্র। উদ্ধৃত অংশটি রাসলীলার বটে এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর ত্রিংশ অধ্যায়ও বটে। লিপিকার কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত পয়ারটি হইতে রামকান্ত যে ভাগবতাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন এরূপ অনুমানও যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

[ক্রমশঃ

২। ঐ, পৃঃ ৮০৮। ৩। বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ২৪৩।

আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতা

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন 'প্রাচীন ভারতের শিক্ষা' আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

ব-দ্বীপ যেমন স্তরে স্তরে পলিমাটিতে গড়িয়া উঠে, ভারতের সভ্যতা তেমন বহু জাতির সাধনায় গঠিত। এখানে বৈদিক আর্য্যদের আসিবার পূর্ব্বে ছিল আর্য্যপূর্ব্ব অতিশয় সভ্য দ্রাবিড় জাতি, তাহাদেরও পূর্ব্বে ছিল আরও বহু বহু জাতির সাধনা। এখানে কেহই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়াতে উপনিবিষ্ট য়ুরোপীয়দের মত আপন সমস্তা সরল করিয়া ফেলে নাই। উচ্ছেদ করা হয় তো সম্ভবও ছিল না, সে প্রবৃত্তিও ছিল না।

এখন দেখা যাইতেছে, আমাদের সভ্যতায় বহু সম্পত্তি আর্য্যপূর্ব্ব সব সভ্যতার ধন।………
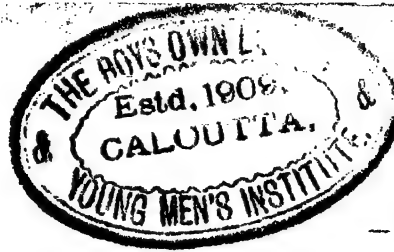
প্রাচীন ভারতে নৃত্যকলা

— শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের মতে বিশ্বের আদি নটগুরু স্বয়ং নটরাজ পরমশিব। অবশ্য পরমশিব স্বরূপতঃ গুণাতীত-কূটস্থ। কিন্তু কেবলমাত্র লীলাবশে এই নিরাকার চৈতন্যও বিবিধ বিগ্রহ ধারণ করেন। কখনও তিনি রজোগুণের উদ্রেকে সৃষ্টিকর্ত্তা, কখনও বা তমঃপ্রাধান্যবশতঃ সংহারমূর্ত্তি, আবার কখনও বা সত্ত্বগুণের বিকাশে পালনরত। শাস্ত্রকারগণ[১] এই সাত্ত্বিক শিবের যে নটরাজমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই অতি সুন্দর। পরিদৃশ্যমান ভুবন তাঁহার আঙ্গিক বিক্ষেপের প্রতীক, সমগ্র বাঙ্ময় তাঁহার বাচিক ও চন্দ্রতারকাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল তাঁহার আহার্য্য অভিনয়ের অভিব্যক্তি[২]। (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নটরাজমূর্ত্তির এইরূপ উদাত্ত কল্পনা বিশ্ব-সাহিত্যে দুর্ল্লভ।

প্রসিদ্ধি আছে যে, পুরাকালে পিতামহ ব্রহ্মা ভরতমুনিকে নাট্যবেদ শিক্ষা প্রদান করেন। তাহার পর মহর্ষি ভরত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সহ ভগবান্ শম্ভুর সম্মুখে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্তের প্রয়োগ করিয়াছিলেন[৩]। ভরতকৃত প্রয়োগ দর্শনে হর নিজ উদ্ধত প্রয়োগের কথা স্মরণ করিলেন, ও সঙ্গে সঙ্গে গণাগ্রণী তণ্ডুকে[৪] দিয়া ভরতকে উহার উপদেশ প্রদান করাইলেন। ভরতের প্রতি দেবাধিদেবের এতই প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, তিনি মহর্ষির সম্মুখে স্বয়ং দেবী পার্ব্বতীকে দিয়া লাস্যের উপদেশ পর্য্যন্ত দেওয়াইয়াছিলেন। তণ্ডুর নিকট হইতে তাণ্ডবের জ্ঞান লাভ করিয়া ভরত ও তাঁহার সহকারী মুনিগণ মর্ত্তের মানবগণকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। আর দেবী পার্ব্বতী পরম শিবভক্ত বাণাসুরের দুহিতা উষাকে লাস্যের উপদেশ দিয়াছিলেন। দ্বারবতীর (দ্বারকার) গোপীগণ উষার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সৌরাষ্ট্রদেশের[৫] নারীগণের মধ্যে উহার প্রচার করেন। আর ইঁহাদিগের নিকট হইতেই ভারতের অন্যান্য জনপদের রমণীগণ লাস্য-শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এইরূপে নর্ত্তন-কলা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব্বে যে নাট্যবেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা চতুর্ব্বেদের সারসম্ভূত, অতএব অনাদি। পদ্মযোনি ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ হইতে যথাক্রমে পাঠ্য, অভিনয়, গীত ও রস সংগ্রহ করিয়া নাট্যবেদ সঙ্কলন করেন। ঋগ্বেদ মন্ত্রাত্মক, অতএব শব্দপ্রধান; তাই উহা হইতে পাঠ্যাংশ গৃহীত হয়। এই পাঠ্যই বাচিক অভিনয়। যজুর্ব্বেদ যজ্ঞাত্মক, অতএব ক্রিয়াপ্রধান। এ কারণ, উহা হইতে অভিনয়ের গ্রহণ। অভিনয় বলিতে অবশ্য আঙ্গিক অভিনয়ের কথাই এখানে ধরিতে হইবে। সামবেদ গানাত্মক—নাদপ্রধান। সেই জন্য উহা হইতে গীতের সংগ্রহ। গীতের আনুষঙ্গিকরূপে শরীরের শোভাবর্দ্ধক বেশভূষা (আহার্য্য অভিনয়) প্রভৃতিরও ইহারই মধ্যে সন্নিবেশ বুঝিতে হইবে। আর অথর্ব্ববেদ মারণ-মোহন প্রভৃতি অভিচার কর্ম্মের প্রতিপাদক—অতএব

---

(১) নন্দিকেশ্বরকৃত অভিনয়দর্পণ, শার্ঙ্গদেবরচিত সঙ্গীতরত্নাকর ইত্যাদি।

(২) অভিনয় মূলতঃ চতুর্ব্বিধ—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। ইহাদিগের লক্ষণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

(৩) নর্ত্তন-কলা শাস্ত্রমতে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। ইহাদিগের স্বরূপভেদ যথাস্থানে বলা হইবে। নাট্যবেদ বা গান্ধর্ব্ববেদ একই শাস্ত্র—সামবেদের একখানি উপবেদ। গীতপ্রাধান্যবিবক্ষায় উহাকে 'গান্ধর্ব্ববেদ' বলা চলে; আর অভিনয়ের প্রাধান্য বিবক্ষিত হইলে উহাই 'নাট্যবেদ' নামে খ্যাত হয়।

(৪) নাট্যশাস্ত্র দর্শনে বুঝা যায় যে, নন্দীর অপর নাম 'তণ্ডু' ও ভরতের নাম 'মুনি'। মহাদেব-প্রযুক্ত উদ্ধত প্রয়োগের উপদেশ তণ্ডু প্রথম মুনিকে দিয়াছিলেন বলিয়া এই প্রয়োগের নাম হইল 'তাণ্ডব'। ভরত ব্যতীত দেবরাজ ইন্দ্রও তণ্ডুর নিকট নর্ত্তন-কলার উপদেশ লাভ করেন বলিয়া শুনা যায়। সুপ্রসিদ্ধ দৈত্যনর্ত্তক "নটশেখরের" সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র নন্দিকেশ্বরের নিকট নর্ত্তন-কলা শিক্ষার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় নন্দী স্বরচিত চতুঃসহস্রশ্লোকাত্মক "ভরতার্ণব" গ্রন্থ তাঁহাকে শ্রবণ করান। এইরূপ বিশালগ্রন্থ শ্রবণে ইন্দ্র ভীত হইয়া পড়িলে নন্দিকেশ্বর "ভরতার্ণবে"র সংক্ষিপ্তসার "অভিনয়দর্পণ" ইন্দ্রকে অধ্যাপনা করেন। এই "ভরতার্ণব" গ্রন্থ বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

(৫) সৌরাষ্ট্র বা সুরাষ্ট্র, বর্ত্তমান সুরাট—গুজরাটের কাথিয়াবাড় পেনিন্‌সুলার উত্তরাংশ।

রসপ্রধান। তাই ইহা হইতে রসের গ্রহণ। আর এই রসাভিব্যক্তিই সাত্ত্বিক অভিনয়।

পূর্ব্বোক্ত নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ প্রদানে সমর্থ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্ততঃ ইহার আলোচনায় কীর্ত্তি, প্রগল্‌ভতা, সৌভাগ্য, বৈদগ্ধ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; ঔদার্য্য, স্থৈর্য্য ও বিলাস (শোভা) উৎপন্ন হইয়া থাকে; দুঃখ, আর্ত্তি, শোক, নির্ব্বেদ ও খেদ ইহার দ্বারা দূরীভূত হয়[৬]। নাট্যশাস্ত্রকারগণ এই নাট্য, নৃত্য ও নৃত্তের প্রশংসায় এতদূর আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহারা এই কলাটিকে ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দদায়ক বলিয়া বর্ণনা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। যুক্তিদানের ছলে তাঁহারা বলিয়াছেন—ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা এই আনন্দ নিশ্চয়ই অধিক; অন্যথা নারদাদি ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও চিত্ত কেন ইহাতে আকৃষ্ট হয়? বস্তুতঃ এই রম্য-কলাটির অপেক্ষা অধিক রমণীয় দৃশ্য বা শ্রব্য বস্তু জগতে আর নাই। তাই কেবল বিষয়াসক্তচিত্ত বদ্ধজীব ব্যতীত মুমুক্ষুগণের পক্ষেও নর্ত্তন-কলা অবশ্য দর্শনীয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা কৃতকৃত্য (—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের দ্বারা ঋষিঋণ—বেদোক্ত যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা দেবঋণ—ও অপত্যোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছেন—অতএব কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাঁহাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই)—তাঁহাদের পক্ষেও নাট্য ও নৃত্য অবশ্য দ্রষ্টব্য—বিশেষতঃ পর্ব্বকালে। কারণ, নাট্য ও নৃত্য মোক্ষদায়ক। নাট্য ও নৃত্য অনুকরণাত্মক বলিয়া অলীক; ইহাদের দৃষ্টান্তে লোকব্যবহারেরও মিথ্যাত্ববিষয়ে জ্ঞান চিত্তে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় বলিয়াই নাট্য ও নৃত্যকে মোক্ষদায়ক বলা হইয়াছে। ইহা ত গেল নাট্য ও নৃত্যের কথা[৭]। নৃত্তের প্রয়োগ-সময় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,—রাজাভিষেক, যে কোনরূপ মহোৎসব, যাত্রা, দেবযাত্রা, বিবাহ, প্রিয়জনের সহিত মিলন, নূতন নগরে বা গৃহে প্রবেশ, পুত্রজন্ম প্রভৃতি উপলক্ষে নৃত্ত[৮] প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কারণ, নৃত্ত সর্ব্বকর্ম্মে মঙ্গলকর

নটরাজ শিব: [("সম" শিরঃ; উত্থিত বামহস্ত 'অর্দ্ধচন্দ্র') মান্দ্রাজ মিউজিয়মস্থিত সুপ্রসিদ্ধ ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি হইতে] (পূর্ব্বপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

(৬) কীর্ত্তি—সুনাম। প্রগল্‌ভতা—শাস্ত্রে প্রাবীণ্য। বৈদগ্ধ্য—লৌকিক বিষয়ে চাতুর্য্য। স্থৈর্য্য—প্রবৃত্ত বিষয় হইতে অস্খলন। ধৈর্য্য—শোকে ও হর্ষে বুদ্ধির একভাব। দুঃখ—বহিরিন্দ্রিয়ের পরিতাপ। আর্ত্তি—বাচিক পরিতাপ। শোক—মনের সন্তাপ। নির্ব্বেদ—চিত্তের শূন্যতা। খেদ—কায়িক সন্তাপ।

(৭) কোন কোন পুঁথিতে "নৃত্য" শব্দের স্থানে "নৃত্ত" এই পাঠ আছে।

(৮) পাঠান্তর—"নৃত্য"।

নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—এই শব্দ তিনটির উল্লেখ ত বহু-বারই করা হইয়াছে। এখন ইহাদের স্বরূপ কি, তাহা বুঝা প্রয়োজন।

"নাট্য" শব্দ রসেরই মুখ্য বাচক। কিন্তু মুখ্যার্থ primary meaning) রস ত আর নর্ত্তনের অবান্তর ভেদরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। তাই এস্থলে নাট্য-লক্ষ্যার্থ (secondary meaning) গ্রহণ করিতে হইবে। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক—এই বধ অভিনয়োপেত নর্ত্তনবিশেষ রসব্যঞ্জনার অনুকূল বলিয়া উহা "নাট্য" নামে খ্যাত। অর্থাৎ "নাট্য" শব্দের অভিধামূলক অর্থ "রস" হইলেও উহার লাক্ষণিক অর্থ চতুর্ব্বিধ-অভিনয়াত্মক নর্ত্তনবিশেষ। এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—অভিনয় কি পদার্থ? অভিনয় বলিতে বুঝায়, দৃশ্যকাব্যে র্ণিত চরিত্রগণের বিভিন্ন অবস্থার অনুকরণ। দৃশ্যকাব্যে বকর্ত্তৃক নিবদ্ধ বিভাবাদি[৯] অভিব্যক্ত করতঃ সামাজিক-গণের নির্ব্বিঘ্ন (নিরন্তর) রসানন্দানুভূতির জনক নটস্থিত বস্তুবিশেষের নাম অভিনয়। অর্থাৎ অভিনয়রূপ অর্থটি নট-গত। রসস্ফূর্ত্তির অনুকূল বিভাব অনুভাব প্রভৃতি যে সকল বিষয় দৃশ্যকাব্যে কবিকর্ত্তৃক উপনিবদ্ধ থাকে, নট তাহারই অভিব্যক্তি করেন অভিনয়ের দ্বারা। আর এইরূপ অভিনয়-দর্শনে প্রেক্ষকগণের হৃদয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে রস বা আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। অবশ্য বিভাবাদি সংযোগে কিরূপে রসনিষ্পত্তি হয় তাহা সামান্য দুই এক কথায় বুঝান যায় না। প্রক্রিয়াটি অতি জটিল। প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণও এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। আর বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। কেবল মোটামুটি ইহা মনে রাখিলেই চলিবে যে, রসাভিব্যক্তির কারণস্বরূপ চতুর্ব্বিধ অভিনয়োপেত নর্ত্তনবিশেষের নামই নাট্য।[১০]

এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের মধ্যে আঙ্গিক অভিনয় বলিতে বুঝায়—অনুকারক নটগণ কর্ত্তৃক স্বীয় করচরণাদি অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা বুদ্ধিবিদিত পদ ও পদার্থের দর্শকসমাজে প্রদর্শন। বাক্যের দ্বারা বিরচিত কাব্যনাটকাদিগত শব্দোচ্চারণই বাচিক অভিনয়। কাব্যনাটকাদিগত শব্দের উচ্চারণ না করিয়া লোকব্যবহারার্থ সাধারণ শব্দমাত্রের উচ্চারণ বাচিক অভিনয় বলিয়া গণ্য হয় না। আহার্য্য অভিনয় বলিতে বুঝায়—অনুকার্য্য নায়কনায়িকাদির অনুকরণে অনুকারক নটাদিকর্ত্তৃক রত্নহার, কেয়ূর, কিরীট প্রভৃতি ভূষণ ও বেশ প্রভৃতি ধারণ। অস্ত্রশস্ত্র, রথ, অশ্ব, পতাকা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ নাট্যোপকরণই আহার্য্য অভিনয়ের অন্তর্গত। বেশভূষার দ্বারা যাহার আহরণ করা হয়, তাহাই আহার্য্য। সাত্ত্বিক অভিনয় অর্থে অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাবের বিভাবন। এই অষ্টবিধ সাত্ত্বিক-ভাব প্রায় সর্ব্বরসেরই উপকারক; অতএব, কোন্ রসে উহাদের কোন্‌টির প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন। কেবল ভাবুক নট ও দর্শকেরই এই বিচারশক্তি থাকে। রসাভিব্যক্তির অনুকূলভাবে সাত্ত্বিকভাবগুলির যথাযথ প্রকাশের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় (মূর্চ্ছা)—এই আটটি সাত্ত্বিক-ভাব।

এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা বা প্রকারনিয়ম মূলতঃ দ্বিবিধ—(১) লোকধর্ম্মী, ও (২) নাট্যধর্ম্মী। তন্মধ্যে লোকধর্ম্মীর দুই প্রকার ভেদ—(ক) চিত্তবৃত্ত্যর্পিকা—চিত্তবৃত্তিতে অর্পিত বিষয়ের প্রদর্শনপ্রকার—ইহার দ্বারা চিত্ত-বৃত্তিতে অবস্থিত আন্তর-ভাবের বহিঃপ্রকাশ করা হয়; (খ) বাহ্যবস্ত্বনুকারিণী—হস্তাদির বিশেষ সংস্থান দ্বারা বহিঃস্থিত পদ্মাদিবস্তুর অনুকরণ ইহাতে সম্ভব হয়। এইরূপ নাট্যধর্ম্মীরও দুই প্রকার ভেদ (১) নাট্যোপযোগিনী কৈশিকী[১১]

---

(৯) বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী (সঞ্চারী) ও সাত্ত্বিক ভাবের সংযোগে স্থায়ী ভাব হইতে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। স্থায়ী ভাব—রসের মূলস্বরূপ—ইহা কখনও তিরোহিত হয় না। স্থায়ী ভাব মোট আটটি—মতান্তরে নয়টি। বিভাব—রত্যাদি স্থায়ী ভাবের উদ্বোধক। বিভাব দুই প্রকার :—(১) আলম্বন—নায়ক, নায়িকা প্রভৃতি, (২) উদ্দীপন—রসের উদ্দীপক—আলম্বনের চেষ্টা, রূপ, ভূষণ, অনুকূল দেশ, কাল, চন্দ্র, চন্দন, কোকিলালাপ, ভ্রমরগুঞ্জন প্রভৃতি। অনুভাব—আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের দ্বারা অন্তরে উদ্বুদ্ধ রত্যাদি স্থায়ী ভাবের বহিঃপ্রকাশ বা কার্য্যের নাম অনুভাব। সত্ত্ব—আন্তর-ধর্ম্মবিশেষ। সাত্ত্বিকভাব মোট আটটি। ব্যভিচারী—আবির্ভাব ও তিরোভাব দ্বারা রসাভিব্যক্তির অনুকূল ৩৩টি র ভাব।

(১০) অভিনয়দর্পণের মতে নাট্য অথবা নাটক কোনরূপ পূজার্হ প্রাচীন কথা-প্রতিপাদক। অর্থাৎ নাট্যবস্তু সর্ব্বজনমান্য ও পুরাতন-কথোদ্ভূত হওয়া প্রয়োজন।

(১১) ভারতী, সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী—এই চারিটি বৃত্তি

বৃত্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক নাট্যযোগ্য লৌকিকী শোভার সম্পাদন। নাট্যে অবস্থার অনুকরণে মৃদুত্বের বিশেষ প্রয়োজন শুধু স্ত্রীলোক নহে—পুরুষের অভিনয়েও অনুকরণকালে মার্দ্দব যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। প্রহার প্রভৃতি কঠোর ব্যাপারের অনুকরণ করিতে হইলে পুরুষ অভিনেতাকেও মৃদু-ভাবে উহার প্রয়োগ করিতে হয়। এই মৃদুত্বের মূলই কৈশিকী। এই জন্যই সুকুমার কৈশিকী বৃত্তিকে নাট্যোপ-যোগিনী বলা হইয়াছে। কোন কোন লৌকিক ব্যাপারকে নাট্যযোগ্য করিয়া শোভনভাবে রঙ্গে প্রয়োগ করিতে হইলে নাট্যোপযোগিনী এই কৈশিকী বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয়। ইহাই প্রথম প্রকার নাট্যধর্ম্মী। (২) আর এক প্রকার নাট্যধর্ম্মী আছে—যাহা আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, ব্যাবর্ত্তিত ও পরি-বর্ত্তিত নামক চতুর্ব্বিধ কর-করণের দ্বারা উপলক্ষিত[১২]; ও আংশিকভাবে লৌকিক ব্যবহারের উপর ইহা নির্ভর করে—অনুকরণ ও তাহার আনুষঙ্গিক মৃদুত্বের অপেক্ষা রাখে না। এই দ্বিতীয় প্রকার নাট্যধর্ম্মী সম্পূর্ণরূপে লোকায়ত্ত-স্বভাব।

অষ্টভুজ শিব: [(দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয় যথাক্রমে ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ—কপিথ, ভ্রমর, কর্ত্তরীমুখ, ও পতাক। বামহস্ত চতুষ্টয় ঐ ক্রমে- -পতাক, কাঙ্গুল, অর্দ্ধচন্দ্র ও অলপদ্ম) কাঞ্চীর কৈলাসনাথ স্বামীর মন্দির হইতে]

আঙ্গিক অভিনয়ের যেমন এইরূপ ভেদ—বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক অভি-নয়েরও ঠিক সেইরূপ ভেদ বলা হই-য়াছে। বাচিকাভিনয়ে কেবল বাক্য উচ্চারণ লোকধর্ম্মী। অনুরাগযুক্ত বাক্যোচ্চারণ নাট্যধর্ম্মী। হারকেয়ূরাদি-ভূষণ আহার্য্যাভিনয়ে লোকধর্ম্মী। ধ্বজ যান প্রভৃতি নাট্যধর্ম্মী। সাত্ত্বিকাভিনয়ে ভাবুক নটকর্ত্তৃক যথাযথভাবে স্তম্ভ-স্বেদাদির প্রকাশ লোকধর্ম্মী। আর হস্তাভিনয় প্রভৃতির দ্বারা উহা দর্শকগণের নিকট প্রকাশ করাইবার প্রয়াস নাট্য-ধর্ম্মী। মোট কথা এই যে, যাহা স্বাভাবিক (natural)

সর্ব্ববিধ নাট্যের মাতৃকাস্বরূপিণী। বিলাসবিন্যাসক্রমই বৃত্তি। কৈশিকী—সৌন্দর্য্যোপযোগী ব্যাপার। কেশ সৌন্দর্য্যের পরিপোষক। কেশ-সম্পর্কিত সৌন্দর্য্য ইহার প্রাণস্বরূপ বলিয়া ইহার নাম "কৈশিকী"। বাগঙ্গাভিনয়ের সুকুমার অংশে ইহা নির্ম্মিত। নৃত্য ও গীতে ইহা পরিপুষ্ট। শৃঙ্গার রস ইহাতে প্রচুর বর্ত্তমান। ইহাতে শ্লক্ষ্ণ নেপথ্য (ঢিলা পোষাক) ব্যবহার্য্য।

(১২) করণ ও তাহার নানাবিধ প্রকারভেদ যথাস্থানে উক্ত হইবে।

তাহাই লোকধর্ম্মী ; আর যাহা অনুকরণাত্মক ও কৃত্রিম (stagy), তাহাই নাট্যধর্ম্মী।

এইবার নৃত্যের কথা। চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের মধ্যে আহার্য্যাভিনয় বর্জ্জনপূর্ব্বক আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্ত্তনের নামই নৃত্য। বাচিক অভিনয় আঙ্গিকের উপজীব্য। আবার সাত্ত্বিক অভিনয় আঙ্গিকের অতি অন্তরঙ্গ। অতএব আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক—এই ত্রিবিধ অভিনয়ই নৃত্যে প্রয়োজনীয়। কিন্তু আহার্য্য অভিনয় বহিরঙ্গ বলিয়া উহা বাদ দেওয়া চলে। নৃত্যবিদ্‌গণ এই নৃত্যকে "মার্গ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।[১৩] নৃত্যে কেবল ভাবেরই (mood) অভিব্যক্তি হয় মাত্র ; রস বা রসাভাসের ব্যঞ্জনা ইহাতে হয় না। রসের অভিব্যক্তি হয় নাট্যে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

পক্ষান্তরে নৃত্ত এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়বর্জ্জিত। তবে আঙ্গিকাভিনয়ে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহ যে প্রকারে চালনা করিতে হয় সেই প্রকারে কেবল গাত্রবিক্ষেপের নামই নৃত্ত।[১৪]

"দশরূপক"কার বলেন যে, নৃত্য ভাবাশ্রয়—উহাতে পদার্থাভিনয় বর্ত্তমান। উহা 'মার্গ' নামে প্রসিদ্ধ। আর তাললয়াশ্রিত নৃত্তের নাম 'দেশী'। নৃত্য ও নৃত্ত—উভয়ই দ্বিবিধ—মধুর ও উদ্ধত। মধুর প্রয়োগের নাম 'লাস্য', ও উদ্ধতের নাম 'তাণ্ডব'। অতএব, পরস্পর-ভেদ নিম্নোক্ত প্রকারে দেখান যাইতে পারে :—

নাট্য—রসাশ্রয় ; নৃত্য—ভাবাশ্রয় ; ও নৃত্ত—তাললয়াশ্রয়।

অবশ্য শারদাতনয় প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দশরূপকের এই বিশ্লেষণ যে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত, তাহা সুধী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

নৃত্য ও নৃত্তের অবান্তর-ভেদ মুখ্যতঃ দুইটি—'তাণ্ডব' ও 'লাস্য'—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বর্দ্ধমানক, আসারিত প্রভৃতি গীতি, প্রবেশিকা প্রভৃতি 'ধ্রুবা', তলপুষ্পপুট প্রভৃতি 'করণ', ও স্থিরহস্তাদি 'অঙ্গহার'-যুক্ত তণ্ডু কর্ত্তৃক কথিত উদ্ধতপ্রায় প্রয়োগের নাম 'তাণ্ডব'। এই 'তণ্ডু' শব্দ হইতেই 'তাণ্ডব' শব্দের ব্যুৎপত্তি।[১৫]

পক্ষান্তরে 'লাস্য' অতি সুকুমার ও কামবর্দ্ধক।

আবার নৃত্তের ত্রিবিধ ভেদ—বিষম, বিকট ও লঘু। রজ্জুভ্রমণাদির নাম বিষম। বিরূপ বেশ ও অবয়ব ব্যাপারের নাম বিকট। ক্রিয়াবৈচিত্র্যের অভাববশতঃ অল্প 'করণ' প্রয়োগের নাম লঘু।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাক্যার্থাভিনয়ে রসস্ফূর্ত্তি ও

---

(১৩) কিন্তু অভিনয়দর্পণের মতে নৃত্য রসভাবব্যঞ্জনাযুক্ত।

(১৪) ভাবাভিনয়হীন নর্ত্তনের নাম নৃত্ত—ইহাই অভিনয়দর্পণের সিদ্ধান্ত। The Mirror of Gestures গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, রসভাববর্জ্জিত নর্ত্তনের নাম নৃত্ত। কিন্তু সঙ্গীতরত্নাকরের মতে—নাট্য রসস্ফূর্ত্তির অনুকূল, নৃত্য ভাবের অভিব্যঞ্জক, আর নৃত্ত রস ও ভাব উভয়বর্জ্জিত গাত্রবিক্ষেপ মাত্র। শারদাতনয় তাঁহার "ভাবপ্রকাশন" গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।—যাহা ভাবাশ্রয়, তাহাই পদার্থাভিনয়াত্মক। যাহা রসাত্মক, তাহাই বাক্যার্থাভিনয়প্রধান। নৃত্য ভাবাশ্রয় ও নৃত্ত রসাশ্রয়। এ উভয়ই নাট্যের উপকারক। শারদাতনয় ত্রিংশৎ প্রকার দৃশ্যকাব্য বা রূপকের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে নাটকাদি দশটি রূপক রসাশ্রিত ও বাক্যার্থাভিনয়প্রধান। অবশিষ্ট ডোম্বী প্রভৃতি বিংশতি রূপক ভাবাত্মক ও পদার্থাভিনয়প্রধান। এই ত্রিংশৎ প্রকার দৃশ্যকাব্য শারদাতনয় ব্যতীত আর কেহ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে নটের কর্ম্ম নাট্য ও নর্ত্তককর্ম্ম পদার্থমাত্রাভিনয়। নটকর্ম্ম ও নর্ত্তককর্ম্ম—এ উভয়ই নৃত্য-নৃত্তভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে ভাবাশ্রয় (অর্থাৎ নৃত্য) "মার্গ" নামে প্রসিদ্ধ, ও তদ্রহিত (অর্থাৎ নৃত্ত) "দেশী" নামে খ্যাত। ডোম্বী, শ্রীগদিত প্রভৃতি বিংশতি রূপকে পদার্থাভিনয়ের প্রাধান্য বলিয়া ঐ বিংশতি রূপককে শারদাতনয় "নৃত্য"র প্রকারভেদ বলিয়াছেন। এই নৃত্যের স্বরূপ—গীতের মাত্রানুসারে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ-সমূহের দ্বারা পদার্থাভিনয়। আর নাটকাদি দশবিধ রূপকে যে নৃত্ত প্রযুক্ত হয়, তাহার স্বরূপ—লয়তালসমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপ মাত্র। পক্ষান্তরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপশূন্য যে অভিনয় তাহাই প্রকৃত "নাট্য"। মোটের উপর নৃত্য ভাবাভিনেয় ও নর্ত্তকাশ্রিত ব্যাপার ; আর নৃত্ত নটাশ্রিত রসপ্রধান অভিনয়। নৃত্য ও নৃত্ত—উভয়ই মধুর ও উদ্ধতভেদে দ্বিবিধ। মধুর "লাস্য" ও "তাণ্ডব" উদ্ধত। নটনর্ত্তক মিলিয়া রসভাবযুক্ত যে অঙ্গচালন করেন, যাহাতে মার্গ (নৃত্য) ও দেশী (নৃত্ত) মিশ্রিত, যাহার অঙ্গহার ও লয়গুলি ললিত, কৈশিকী বৃত্তি ও গীতের যাহাতে প্রাধান্য—তাহাই লাস্য। আর যাহার করণ ও অঙ্গহারগুলি উদ্ধত, বৃত্তি আরভটী—তাহাই তাণ্ডব। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—নৃত্তই তাণ্ডব, নৃত্য লাস্য। এ সকল উক্তির সামঞ্জস্যবিধান অতি দুরূহ।

(১৫) গীতি, ধ্রুবা প্রভৃতি সঙ্গীতকলার অঙ্গ—সঙ্গীতরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হইয়াছে। করণ ও অঙ্গহারের লক্ষণ পরে বলা হইবে।

পদার্থাভিনয়ে ভাবাভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। দৃশ্যকাব্যে এই দুই প্রকার অভিনয়ই বর্ত্তমান। আবার অভিনয়ের চারি প্রকার ভেদের কথাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শার্ঙ্গদেবের মতে—এই চতুর্ব্বিধ অভিনয়ের অন্তর্গত আঙ্গিক অভিনয়ের তিনটি প্রধান ভেদ—শাখা, অঙ্কুর ও নৃত্ত। বিচিত্র করবিক্ষেপের নাম 'শাখা'। অতীত বাক্যার্থ অবলম্বনে কৃত অঙ্গবিক্ষেপের নাম 'অঙ্কুর'। আবার ভাবী বাক্যার্থ অবলম্বনে অঙ্গবিক্ষেপের নাম "সূচী"। আর 'নৃত্ত' করণ ও অঙ্গহার দ্বারা সাধনীয়।[১৬]

এইবার নর্ত্তনের পক্ষে উপযোগী অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গগুলির নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

মস্তক, হস্তদ্বয়, বক্ষোদেশ, দুই পার্শ্ব, কটীতট, পদদ্বয়—এই ছয়টি অঙ্গ। কেহ কেহ স্কন্ধকেও অঙ্গের মধ্যে গণনা করেন।

গ্রীবা, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুযুগল, জঙ্ঘাদ্বয়—এই ছয়টি প্রত্যঙ্গ। মতান্তরে—মণিবন্ধদ্বয়, জানুদ্বয় ও ভূষণসমূহও প্রত্যঙ্গের মধ্যে।

দৃষ্টি (নেত্র), ভ্রূদ্বয়, অক্ষিপুট, (চোখের পাতা) অক্ষি-তারকা, গণ্ডদেশ, নাসিকা, নিঃশ্বাস, অধর, দন্ত, জিহ্বা, চিবুক, বদন—এইগুলি উপাঙ্গ। শিরঃস্থিত উপাঙ্গের সংখ্যা দ্বাদশ। অঙ্গান্তরে পার্ষ্ণি (গোড়ালি), গুল্ফ

নর্ত্তকী : [("সুন্দরী" গ্রীবা, "পরিবাহিত" শিরঃ) অজন্তার গুহাচিত্র হইতে ; ১ম গুহা]

(১৬) পূর্ব্বে যে আঙ্গিকাভিনয়ের অনুকরণে গাত্রবিক্ষেপ-রূপ "নৃত্তে"র কথা বলা হইয়াছে, তাহা পৃথক্ বস্তু। এ নৃত্ত আঙ্গিকাভিনয়ের অঙ্গমাত্র।

(পায়ের গাঁট) পাদাঙ্গুলী, করাঙ্গুলী, পাদতল—এ পাঁচটিও উপাঙ্গ।[১৭]

নর্ত্তন বলিতে বুঝায় এই সকল অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের সবিলাস বিচিত্র বিক্ষেপ। এই বিক্ষেপ কত বিভিন্ন প্রকারে হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্রকারগণ শুধু কতকগুলি অতি প্রসিদ্ধ ভঙ্গীর লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্যই শাস্ত্রোক্ত অঙ্গভঙ্গীগুলির একটি অতি সংক্ষিপ্ত সূচী নিয়ে দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র।

শিরঃ-কর্ম্ম চতুর্দ্দশবিধ, মতান্তরে ঊনবিংশতি প্রকার। হস্ত-কর্ম্ম সপ্তষষ্টি প্রকার, মতান্তরে সপ্তিত প্রকার। বক্ষঃ পঞ্চধা। পার্শ্বও পঞ্চবিধ। কটী পঞ্চবিধ। চরণ ত্রয়োদশ প্রকার ও স্কন্ধ পাচ প্রকার।

গ্রীবা-ভেদ নয় প্রকার। বাহু-বিক্ষেপ ষোড়শ প্রকার। পৃষ্ঠ ও উদর-কর্ম্ম একইরূপ—চারি প্রকার। উরু পঞ্চবিধ। জঙ্ঘা দশবিধ, মণিবন্ধ পঞ্চবিধ, জানু সপ্তবিধ। ভ্রূমণের ভেদ অনন্ত।

রসদৃষ্টি আট প্রকার। স্থায়িভাব-দৃষ্টিও আট প্রকার। ব্যভিচারিভাবদৃষ্টি বিংশতি প্রকার। মোট দৃষ্টিভেদ ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। ভ্রূবিক্রিয়া সপ্তবিধ। অক্ষিপুটচালনা নববিধ। স্বনিষ্ঠ অক্ষিতারকাকর্ম্ম নববিধ। বিষয়াভিমুখ তারাকর্ম্ম অষ্টবিধ। কপোলভেদ ষড়্‌বিধ। নাসিকাভেদ ষড়্‌বিধ। শ্বাসভেদ নববিধ, মতান্তরে দশবিধ। অধরচালনা দশবিধ। দন্তকর্ম্ম অষ্টবিধ। জিহ্বাকর্ম্ম ষড়্‌বিধ। চিবুক-সঞ্চালন অষ্টবিধ। আর বদনকর্ম্ম ষড়্‌বিধ। পার্ষ্ণিভেদ অষ্টবিধ। গুল্‌ফভেদ পঞ্চবিধ। করাঙ্গুলীচালনা সপ্তবিধ। পদাঙ্গুলী-সঞ্চালন পঞ্চবিধ। পাদতলন্যাস ষড়্‌বিধ।

এই সকল বিচিত্র অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ বিক্ষেপ ব্যতীত চতুর্ব্বিধ "মুখরাগ" ও পঞ্চদশ প্রকার "হস্তপ্রসারের" উপযোগিতাও নর্ত্তনশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রসাত্মিকা মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক মুখরাগ অঙ্গশোভা উৎপাদন করে। রসবৈচিত্র্য জননে ইহার উপযোগ বড় কম নহে। করপ্রচার ভরতের মতে ত্রিধা। মতান্তরে পঞ্চবিধ। কিন্তু শার্ঙ্গদেব পঞ্চদশ প্রকার হস্তপ্রচারের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া হস্তের আবর্ত্তনাক্রিয়া বা "হস্তকরণে"রও উল্লেখ আছে। আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, ব্যাবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিতভেদে "করকরণ" চতুর্ব্বিধ। "করকর্ম্ম" (করকরণ হইতে ভিন্ন হস্তক্রিয়াবিশেষ) বিংশতিপ্রকার। "হস্তক্ষেত্র" ত্রয়োদশ বা মতান্তরে চতুর্দ্দশ প্রকার। করকরণ, করকর্ম্ম ও পাণিক্ষেত্র ব্যতীত শাস্ত্রে অষ্টোত্তরশত "নৃত্তকরণে"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। করকরণ ও নৃত্তকরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। বিলাস সহকারে কর, পাদ, শিরঃ, বক্ষঃ, পার্শ্ব, কটী, বাহু, জঙ্ঘা প্রভৃতির রসাভিব্যক্তির অনুকূলভাবে সঞ্চালনক্রিয়ার নাম নৃত্তকরণ। সংক্ষেপে ইহাকে কেবল "করণ" নামও দেওয়া হইয়া থাকে। তলপুষ্পপুট প্রভৃতি ইহার ১০৮ প্রকার ভেদ নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

এতদ্ব্যতীত ষট্‌ত্রিংশৎ উৎপ্লুতিকরণের নাম সঙ্গীতরত্নাকরে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভরত ইহাদিগের পৃথক্ নির্দ্দেশ করেন নাই।

নর্ত্তনের আর একটি বিশিষ্ট অঙ্গ "অঙ্গহার"। করণদ্বয়ের দ্বারা নিষ্পাদ্য ক্রিয়ার নাম "মাতৃকা" (বা "নাট্যমাতৃকা")। অঙ্গহার আবার মাতৃকাসমূহের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ পাণিক্ষেত্রে অথবা সমুচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিলাসসহকারে যথাযথভাবে অঙ্গসমূহের হরণের (অর্থাৎ প্রাপণের) নাম 'অঙ্গহার'। কেহ বা বলেন, হরকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'হার'। আর অঙ্গদ্বারা নির্ব্বর্ত্তিত হইয়াছিল, তাই ইহা 'অঙ্গহার' নামে খ্যাত। দুইটি করণে এক 'মাতৃকা', তিন করণে 'কলাপ', চার করণে 'খণ্ডক' ও পাঁচ করণে এক 'সঙ্ঘাত' নিষ্পাদিত হয়। অঙ্গহারে করণসংখ্যা স্থির করা নাই—কোনটিতে কম, কোনটিতে বা বেশী। অঙ্গহারের সংখ্যা মোট ৩২টি। স্থিরহস্ত প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গহারের লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

(১৭) The Mirror of Gesture "বক্ষঃ" স্থলে "কক্ষ" পাঠ করেন। নাট্যশাস্ত্রে ঠিক এই পাঠই আছে। অভিনয়দর্পণে 'গ্রীবা'কে মতান্তরে অঙ্গ বলা হইয়াছে, আবার প্রত্যঙ্গের মধ্যেও ধরা হইয়াছে। ইঁহার মতে 'স্কন্ধ' অঙ্গ নহে, প্রত্যঙ্গ। অভিনয়দর্পণ প্রত্যঙ্গগণনায় 'ভূষণ' স্থলে "কূর্পর" (কনুই) পাঠ ধরিয়াছেন। উহা বেশ সমীচীন মনে হয়। নাট্যশাস্ত্রের মতে নেত্র, ভ্রূ, নাসা, অধর, কপোল ও চিবুক—উপাঙ্গ। অভিনয়দর্পণে 'নাসিকানিলে'র পরিবর্ত্তে 'নাসিকা' ও 'হনু' উপাঙ্গমধ্যে গণিত হইয়াছে।

এই অঙ্গহারের মধ্যেই "রেচকে"র অন্তর্ভাব। রেচক চতুর্ব্বিধ—পাদরেচক, কররেচক, কটীরেচক ও গ্রীবারেচক।

নর্ত্তকী : [(উদ্বাহিত শিরঃ, একপাদ ভ্রমরী) যবদ্বীপ হইতে]

রেচকের পর "চারী"। অঙ্ঘ্রি, জঙ্ঘা, উরু ও কটীর যুগপৎ বিচিত্র কর্ম্মের নাম 'চারি' বা 'চারী'। ভৌমচারী ষোড়শ প্রকার। আকাশচারীও ষোড়শ-বিধ। মোট চারীর সংখ্যা দ্বাত্রিংশৎ। কিন্তু ইহা শুদ্ধচারী—"মার্গ" নামে খ্যাত। ইহা ছাড়া পঞ্চত্রিংশৎ দেশী ভৌমচারী ও একোনবিংশ দেশী আকাশ-চারী আছে। অতএব "দেশী" চারীর সংখ্যা মোট চতুষ্পঞ্চাশৎ। সর্ব্বশুদ্ধ মার্গ ও দেশী চারীর সংখ্যা ষড়শীতি (৮৬)।

'চারী' গতিরই নামান্তর। স্থিতির নাম "স্থানক"। গতির পরে স্থিতির বর্ণনা প্রয়োজন। তাই ষড়্বিধ পুরুষ-স্থানক, সপ্তবিধ স্ত্রীস্থানক, ত্রয়োবিংশতি দেশীস্থান, নববিধ উপবিষ্টস্থান, ষড়্বিধ সুপ্তস্থান—এই একপঞ্চাশৎ স্থানকের কথা বলা হইয়াছে।

তাহার পর "বৃত্তি"। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থের উপযোগী—বাক্য, মন ও কায় হইতে সঞ্জাত চেষ্টার নাম বৃত্তি। বৃত্তি চতুর্ব্বিধ—ভারতী, সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী। ভারতী—ঋগ্বেদ হইতে জাত, সংস্কৃতবাক্যবহুল, বাগ্‌বৃত্তি। ইহা পুরুষপ্রযোজ্য। ভরত (নট)-গণকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়া ইহার নাম ভারতী। সাত্বতী—যজুর্ব্বেদোৎপন্ন মনোবৃত্তি। সত্ত্ব শব্দের অর্থ মন। মন হইতে উদ্ভূত হর্ষ, শৌর্য্য, ত্যাগ প্রভৃতির নামান্তর সাত্বত। সাত্বত-প্রধান বলিয়া ইহার নাম সাত্বতী। বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস ইহাতে বর্ত্তমান। শৃঙ্গার, করুণ বা নির্ব্বেদ ইহাতে নাই। আরভটী—অথর্ব্ববেদোৎপন্ন কায়বৃত্তি। যে সকল/

ভট (সৈন্য) উৎসাহী, তাহাদের কায়সম্ভূত চেষ্টা হইতে সম্ভূত বলিয়া ইহার নাম আরভটী। রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস রসে ইহা ব্যবহার্য্য। মায়া, ইন্দ্রজাল, বিচিত্র যুদ্ধ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণনীয়। কৈশিকী—সামবেদোৎপন্ন সৌন্দর্য্যবৃত্তি। বাগ্, অঙ্গ ও আভরণের সুকুমার অংশ অবলম্বনে এই বৃত্তি নির্ম্মিত। সুকুমারতা ও সৌন্দর্য্যই ইহার প্রাণস্বরূপ। নৃত্য গীতের প্রাচুর্য্যে ও শৃঙ্গার রসে ইহা ভরপুর। প্রায়ই শ্লক্ষনেপথ্য পরিধানপূর্ব্বক ইহার প্রয়োগ করিতে হয়। আর ইহাতে স্ত্রীবাহুল্য যে থাকিবেই তাহা বলা বাহুল্য। এই বৃত্তি-চতুষ্টয়ের আবার নানা অবান্তর-ভেদ আছে।

রঙ্গমঞ্চে কৃত্রিম যুদ্ধাদি প্রদর্শনের কৌশল বর্ণনাবসরে 'ন্যায়' ও 'প্রবিচারে'র কথা বলা হইয়াছে। যাহাতে প্রহার আঘাত প্রভৃতি বাস্তবে পরিণত না হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই সকল বিধান। ইহার পর দশবিধ ভৌমমণ্ডল ও দশবিধ আকাশ মণ্ডলের বর্ণনা। 'মণ্ডল' ও 'চারী' প্রায় একজাতীয়। কতিপয় চারীর সংযোগে একটি "মণ্ডল" রচিত হয় ইহাই মাত্র পার্থক্য। চারী বাম বা দক্ষিণ একটি মাত্র পাদদ্বারা নিষ্পাদ্য। ইহারই অপর নাম "ব্যায়াম"। পাদদ্বয়নিষ্পাদ্য "করণ" (ইহা "করকরণ" ও নৃত্তকরণ" হইতে ভিন্ন ; কারণ, করকরণ কেবল হস্তসম্পাদ্য ; নৃত্তকরণ হস্তপাদাদিক্রিয়া-নিষ্পাদ্য ; আর ব্যায়ামের অবান্তর-ভেদ এই করণ কেবল চরণনিষ্পাদ্য)। তিনটি করণে নিষ্পাদ্য হয় "খণ্ড"। আর ত্র্যস্র তালে তিনটি খণ্ডকের দ্বারা বা চতুরস্রতালে চারিটি খণ্ডকের দ্বারা একটি 'মণ্ডলের' নিষ্পত্তি হয়।

ইহার পর "লাস্য"। ইহার অঙ্গ দশটি। এই দশটি লাস্যাঙ্গই 'দেশী'রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

শিরঃ, নেত্র, কর প্রভৃতি অঙ্গের মেলনে যে কায়স্থিতি দৃষ্ট হয়, সেই মনোহর দেহস্থিতিবিশেষের নাম "রেখা"। তাহার পর শুভলগ্নে রঙ্গদেবতা ও আচার্য্যাদির পূজাপূর্ব্বক নর্ত্তন-শিক্ষারম্ভের কথা বলা হইয়াছে। এই নর্ত্তনশিক্ষা-ভ্যাসের পারিভাষিক সংজ্ঞা "শ্রম" (কসরৎ)।

বিঘ্নেশ গজানন, ভারতী দেবী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও রঙ্গদেবতাগণের পূজান্তে উপাধ্যায়কে বন্দনাপূর্ব্বক শুভলগ্নে শ্রমারম্ভ কর্ত্তব্য। আপনার হৃদয়পরিমিত উচ্চ স্তম্ভদ্বয়ের উপর হস্তগ্রাহ্য একটি ক্ষুদ্র দণ্ড আড়াআড়িভাবে (horisontally) স্থাপন করা প্রয়োজন। উহার পর ভর দিয়া শ্রম করিতে হইবে। শ্রমকালে শুভ্র বসন ও দৃঢ় কঞ্চুক পরিধান করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত দণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক নর্ত্তনশিক্ষার্থিনী কন্যা (পাত্র) অঙ্গবিবর্ত্তন অভ্যাস করিবে। অঙ্গাদির চলন, বলন, স্থাপন, রেখা, তালসাম্য, লয় ও পূর্ব্বোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপাঙ্গকর্ম্মের যাবতীয় অবান্তর-ভেদ, সর্ব্ববিধ লাস্যাঙ্গ প্রভৃতি গীতবাদ্যানুসরণে শিক্ষা করিলে নর্ত্তন-কলা পূর্ণভাবে আয়ত্ত হইতে পারে। নতুবা শুধু অজন্তা ইলোরার কয়েকটি মূর্ত্তির অন্ধ অনুকরণে লীলায়িত তনুভঙ্গিমা দেখাইতে শিখিলেই ভারতীয় নৃত্যকলা আয়ত্ত হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় ভারতীয় নাট্য ও নৃত্য একমাত্র কঠোর সাধনার দ্বারাই আয়ত্ত হইয়া থাকে। *

কৃতী বাঙ্গালী

ফরিদপুর জেলা ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন :—

বাঙ্গালী জাতটা কি কেবল পরীক্ষায় পাশ করা আর চাকরি করবার জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে? ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে দেখেছি, খুব প্রতিভাবান ছেলেদিগকেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হয়—আমাদের দেশের সকল ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় পাশের জন্য ছুটোছুটী করছে। বার বার ফেল করলেও আবার ঘুরে ফিরে পাশ করবার চেষ্টা করে। এই ফেল করাটা যেন একটা ভয়ানক আক্ষেপের কথা, অনেক ছেলে ফেল করে আত্মহত্যা করেছে, কাগজে প্রায়ই দেখা যায়। আর অন্যান্য দেশে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেল করে, জগতে কর্ম্মাধীন জীবনে তারাই সবচেয়ে বেশী সফলতা লাভ করে। যাঁরা কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হননি, এমন কি এণ্ট্রান্স স্কুলেও ঢুকেননি, তাঁরাই জগতে অদ্বিতীয় হয়েছেন। আমাদের দেশেও এরকম উদাহরণ আছে…

* প্রবন্ধান্তর্গত ব্লকগুলি কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীমনোমোহন ঘোষ সম্পাদিত অ ভি ন য় দ র্প ণে মুদ্রিত হইয়াছে। ব্লক-গুলির জন্য ঐ পুস্তক-প্রকাশক ও সম্পাদক উভয়ের নিকটই আমরা ঋণী।—বঃ সঃ।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

—সত্যসুন্দর দাস

সুরেন্দ্রনাথের ভাষার অতিশয় স্বল্পাক্ষর-ভঙ্গী অনেক সময়ে তাঁহার রচনাকে দুর্বোধ এবং ছন্দপ্রবাহকে পীড়িত করিলেও, উহা তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছে—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই স্বল্পাক্ষরতা এবং তাহারই মধ্যে যমক ও অনুপ্রাসের সন্নিবেশ, অনেক স্থলে তাঁহার বাগ্‌বিন্যাসকে—ইংরাজীতে যাহাকে বলে epigrammatic—সেই অলঙ্কার-শোভায় শোভিত করিয়াছে। যথা,—'সমজাতি শিলা হীরা পুরুষ অঙ্গনা', 'না দিয়া পীরিতে কবে কে পায় কোথায়?' 'না পিয়ে না বুঝি সুরা, পিয়ে জ্ঞান যায়', 'রসনা না, ললনা নয়নে কথা কয়', 'নরকে না ডরে, ডরে নরের কথায়'। কিন্তু অতিরিক্ত সমাস-প্রিয়তাই তাঁহার রচনা-রীতির দোষ ও গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একদিকে ইহা দ্বারা যেমন বাক্যের মিতাক্ষর-গাঢ়তা ঘটিয়াছে, তেমনই এই রীতির অত্যধিক অনুশীলনে ছন্দ-পীড়া ও দুর্বোধ্যতা-দোষ জন্মিয়াছে। তথাপি, ইহারই গুণে সুরেন্দ্রনাথের রচনায় এমন একটি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে—এমন একটা স্বাতন্ত্র্য ও দৃঢ়তার পরিচয় পাই যে, সেকালের সেই সংকীর্ণ সারস্বত চত্বরে তাঁহার অধিকৃত স্থানটি সহজেই চোখে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার আদর্শ সমসাময়িক সাহিত্য-সমাজের পক্ষে কিছু উদ্ধত ছিল—নিজের উন্নত আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার একটা অভিমান ছিল। সম্ভবতঃ তিনি যাহা রচনা করিতেন তাহাও তাঁহার আদর্শ-অনুযায়ী উৎকৃষ্ট মনে করিতেন না বলিয়া সেগুলি প্রকাশ করিতে এত অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার ভাষা ও রচনা-রীতি তাঁহার ভাব-চিন্তার মতই ভ্রূক্ষেপহীন; হেম-নবীনের মত তিনি সাধারণ পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া পরের ও নিজের আত্মপ্রসাদ সম্পাদন করিয়া সুলভ খ্যাতি লাভের প্রয়াসী ছিলেন না। লেখকোচিত আত্মমর্য্যাদাবোধ তাঁহার কিছু বেশি মাত্রায় ছিল। এই জন্যই ভাষায় যথেষ্ট অধিকার সত্ত্বেও খুব অনায়াস-বোধ্য বাক্যরীতি অবলম্বন করেন নাই। ইহা তাঁহার রচনার দোষ হইলেও অক্ষমতাই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচনা-রীতির কয়েকটি নির্দ্দোষ অথচ স্বকীয় ভঙ্গিমাযুক্ত নিদর্শন উদ্ধৃত করিলে আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইবে।

ফুটেছে অতুল ফুল উদ্যান ধরায়—
নরম্ব বিখ্যাত নাম তার;
বৃন্তদল, কলেবর,—পুরুষের ন্যায়,
নারী—বর্ণ, মধু, গন্ধ যার!
আছে কাঁটা অগণিত,
তবু অতি সুশোভিত,
সুধু এই শোক তার তরে—
কাল-অলি-মধুপানে-অবসানে ঝরে!

*   *   *

সংসারে যেদিকে চাই—করি বিলোকন,
বিপরীত দুই ভাব মেলা—
বাহে দোঁহে অরি, মনে মধুর মিলন,
কোমলে কঠিনে কিবা খেলা!
একে শোষে, অন্যে পোষে,
একে রোষে, অন্যে তোষে,
একে মূঢ়, অন্যে অতিকৃতী—
হরগৌরী-রূপ বিশ্ব পুরুষ-প্রকৃতি!

*   *   *

ত্রাসে, ক্ষোভে শোকে দুখে
আগে নাম উঠে মুখে—
কিবা একাক্ষরী মন্ত্র—মানব-তারণ!
যার শব্দে যমচরে
নিকটে আসিতে ডরে—
এ ভব-অশুভ-ঘন-দক্ষিণ-পবন!

*   *   *

প্রদীপ লইয়া করে, সমীর-শঙ্কায়
এলো বালা মৃদুমন্দ-গমনে,
দীপ্ত মুখ, দীর্ঘ রক্ত প্রদীপ-শিখায়,
চুম্বিত চঞ্চল সমীরণে।

[এই চৌপদী stanza-টিতে যুক্তাক্ষর-বিন্যাসের দ্বারা যে-rythm বা ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনবদ্য—অতি আধুনিক কালের কোনও কবিতার পক্ষেও এরূপ ছন্দ-সৌষ্ঠব প্রশংসনীয়।]

বিলোল-লহরী ছিল সাগর যথায়,
　　এবে যেন লহরী স্তম্ভিত,
ক্রম-সোপানিত তথা হিমাদ্রির কায়
　　ভিমি-রাজে লক্ষ্মী বিরাজিত!
জমে, গিরি গলে,　　জলে স্থল, স্থল জলে –
　　কাল কি কর্ম্মিষ্ঠ কুম্ভকার!
করে পৃথ্বী পিণ্ড পৃথী-পিণ্ডের প্রকার!

*　　*　　*

আশা কি করেছ প্রেম রাখিবে গোপনে,
　　কহিবে না অতি মিত্র জনে?—
পরিচয় নীরবে জানাবে প্রতিজনে
　　সরস সজীব দুনয়নে!
হাস্তাননে আঁখি করে নিরশ্রু রোদন,
　　কপট অশ্রুতে ভরে হাসে;
বিশেষতঃ বাতুলের প্রেমিকের মন
　　সদাই চোখের 'পরে ভাসে।

*　　*　　*

অপনি করেন ধাতা যে হৃদে আঘাত,
বেদনা কি হরে, নরে বুলাইলে হাত?

*　　*　　*

দিবা-নিশি, রবি-শশী, আঁলোক-আঁধার,
　　সিতাসিত পক্ষ সঙ্কলন,
উত্তর-দক্ষিণায়ন, সৃজন-সংহার,
　　মাতা-পিতা, নন্দিনী-নন্দন,
　　সব্য বাম্য কলেবর,
　　দুই পদ, দুই কর,
　　দু'নয়ন-শ্রবণ-ভূষিত—
দ্বিদল চণক, ধরা মিথুন-মিলিত।

উপরি উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে আমি সুরেন্দ্রনাথের রচনা-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতে বলি, শব্দগ্রন্থনের ও প্রয়োগের যে রীতি তাঁহার নিজস্ব, তাহাই প্রদর্শন করা আমার অভিপ্রায়। শব্দসংক্ষেপের জন্য কবির যে একটি বিশেষ যত্ন দেখা যায়, তাহারই ফলে ভাষায় অতিরিক্ত সংস্কৃত প্রভাব ঘটিয়াছে—বাক্যগুলিকে গাঢ়-বদ্ধ করিবার জন্য এত সমাসের ছড়াছড়ি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতে ও সন্ধি-সমাসের প্রতি এত পক্ষপাত এই কারণেই। উপরি-উদ্ধৃত সর্ব্বশেষের স্তবকটিতে একটি ক্রিয়াপদও নাই। ঈশ্বরগুপ্তের যুগের কবিওয়ালা টপ্পা ও পাঁচালীর ভাষা এমনই করিয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল—ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনিভাবে নব্য সাহিত্যের প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইয়াছিল। ভাষার এই আদর্শ এখনও আছে—বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল রীতি কখনও লুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না—ভাব-গাম্ভীর্য্য, অর্থগৌরব এবং পুরুষোচিত প্রজ্ঞা যেখানেই কবিমানসের সাধন-বস্তু হইবে, সেখানেই ভাষার এই রীতি সুমার্জ্জিত ও সুষমাযুক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই পরবর্ত্তী যুগের একজন শক্তিশালী কবির কাব্যে সুরেন্দ্রনাথের রচনা-রীতির এই আদর্শই পূর্ণতর ঝঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখি—

জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর—
প্রকৃতির অসংবৃত বক্ষঃ নীলাম্বর!
　　সুমেরু-চুচুক-পাশে
　　সুকুমারী উষা হাসে;
বিসর্পী হোমাগ্নি-ধূমে মরুত কাতর।
　　তুষার, নীবার দলি'
　　ঋষিকন্যা যায় চলি,
চরে সরস্বতী তটে কপিলা নধর।
　　আহরি' সমিধ-ভার
　　আসে শিশু সুকুমার;
যজ্ঞকুণ্ডে ঢালে হবিঃ ঋত্বিক ভাস্বর।
　　সোমগন্ধে সামচ্ছন্দে
　　নামিছেন কি আনন্দে
অরুণ বরুণ ইন্দ্র উজ্জ্বলি' অম্বর!—
জীবনের এ সঙ্গীত পবিত্র সুন্দর!

[অক্ষয়কুমার বড়াল]

সুরেন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ-ধ্বনি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার কিছু নাই—ভাব-অর্থ-প্রধান গম্ভময় স্তবকগুলিতে ছন্দঃস্রোত অধিকাংশ স্থলেই ব্যাহত হইয়াছে; কিন্তু যেখানে কবি ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন সেখানেই পয়ার-ছন্দের নবতর ধ্বনি-সঙ্গীত ধরা দিয়াছে—যুক্তাক্ষর ও যতি-বিন্যাসের কারিগরী পুরাতন পয়ারছন্দকে লীলায়িত করিয়াছে। উদ্ধৃত কবিতাগুলিতে বহুস্থলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তথাপি এস্থলে সুরেন্দ্রনাথের ছন্দ-সঙ্গীতের একটা নিয়ম উল্লেখযোগ্য। পয়ারের চৌদ্দমাত্রার একঘেয়ে যতিবিন্যাস ভাঙ্গিয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথও পয়ারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—যাহাকে শাস্ত্রমতে যতিভঙ্গ বলা যায়, মাইকেলের মত, তাহাকেই তিনি ছন্দের স্বাধীন সাবলীল গতির একান্ত

প্রয়োজনীয় উপায় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন—তাঁহার কাব্যে যে ছন্দের এই গূঢ়তর প্রকৃতি ধরা পড়িয়াছিল তাহা সেকালের অন্যান্য কবিগণের তুলনায় কম গৌরবের কথা নয়। উদাহরণ-স্বরূপ আমি এখানে কয়েকটি মাত্র চরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যতিবিন্যাসের দুইটি রীতি সুরেন্দ্রনাথের বড় প্রিয় ছিল—আট-ছয়ের পরিবর্তে ছয়-আট ও সাত-সাত ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ইন্দুকুন্দ-বিনিন্দিত বরণ বিমল,
সিত কণ্ঠহার সিত বাস,
সারদে! চরণারুণে চিত্ত-শতদল
বিকাশি আসিয়া কর বাস।
*　　*　　*
নর-হৃদ মোহিনী-মূরতি-বিমোহিত!
*　　*　　*
রসনা না, ললনা নয়নে কথা কয়।
*　　*　　*
নিরখি যুগল লোল লোচন প্রিয়ার।
*　　*　　*
বসনে ভূষণে রূপ আবরি' বাড়ায়—
যথা কাচ-কলস প্রদীপ-কলিকায়!
*　　*　　*
নিমীলিত নয়ন সঘন বিকম্পিত—
অমল পল্লবে মণি-নীলিমা লক্ষিত।
*　　*　　*
চিরদৃষ্ট সে সুষমা হেরিব তোমার—
বেশভূষা দলিত, গলিত বেণীভার!
*　　*　　*
ফল-ফুল-পল্লবে পরম বিভূষিত,
সুবিশাল শাখার প্রসার,
বাসনার পাখীদলে বসে' গায় গীত—
নর হেন তরুর প্রকার:
কাল-নদ তট-পরে হেন রূপে শোভা করে,
প্রতিক্ষণ মূল ক্ষত তার:
সে কি জানে পতন আসন্ন আপনার?
তরুপত্র-প্রান্তভাগে লম্বিত নীহার,
কামিনীর কটাক্ষ-ইঙ্গিত,
সুচিত্রিত, চারু ইন্দ্রচাপ বরিষার,
উড্ডীন পাখীর কলগীত,
সন্ধ্যার রক্তিম ঘটা　　পতিত তারার ছটা,
সরোজল-হিল্লোল-নর্তন,—
এ হতে ভঙ্গুর রম্য মানব জীবন।

সুরেন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠ এইখানেই শেষ করিলাম। পাঠকালে এবং প্রসঙ্গের অবতরণিকায় সুরেন্দ্রনাথের কবিমানস ও কাব্য-কীর্ত্তির সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, আশা করি তাহাতেই কবি-পরিচয় যথেষ্ট হইয়াছে। তথাপি সর্ব্বশেষে সমগ্র ভাবে আরও দুই চারি কথা বলিয়া আমি এই দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত করিব।

সুরেন্দ্রনাথের ম হি লা কা ব্য ই সমধিক প্রসিদ্ধ—ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাব্যখানির শেষ-ভাগ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে; মাতা, জায়া ও ভগ্নী এই তিন অংশে—মহিলার এই তিন রূপের বন্দনাই কবির অভিপ্রেত ছিল, 'ভগ্নী' অংশ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। ম হি লা-কা ব্যে র বিষয়টি সেকালের কবি-প্রেরণার একটা সাধারণ উপজীব্য বলিয়া মনে হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বাঙ্গালী কবি—প্রতিভার প্রকৃতিনির্ব্বিশেষে নারীমহিমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গীতি-কাব্যের ত কথাই নাই। মহাকাব্য ও কাহিনীকাব্যেও কবিগণের প্রাণময় উচ্ছ্বাস নারীকে ঘেরিয়াই চরিতার্থ হইয়াছে। রঙ্গলালের তিনখানি উপাখ্যান-কাব্যই নারীর নাম বহন করিতেছে; মাইকেলের বী রা ঙ্গ না প্রেমিকা নারীগণের চরিত্র ও হৃদয়-রহস্য-উদ্ঘাটনে সার্থক হইয়াছে; মে ঘ না দ ব ধে ও কবি প্রমীলা ও সীতা চরিত্র আঁকিতে বসিয়া তাঁহার বর্ণ-ভাণ্ডের সকল রং নিঃশেষ করিয়াছেন—'প্রমীলা'র চরিত্র একটি প্রকৃত সৃষ্টি—দেশী ও বিদেশী আদর্শের এমন নিপুণ মিশ্রণ সেকালের কবি-কল্পনার আর কোথাও নাই; মনে হয় কবি-মানসের আদর্শ-নারী কাব্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বিহারী লাল 'বঙ্গসুন্দরী'তে নারীর মহিমা গান করিয়াছেন। সুরেন্দ্র-নাথ ম হি লা কা ব্য লিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের গীতি-কাব্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'নারী মঙ্গল' প্রভৃতি সেই সুরেরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার কবি-জীবনের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত নারীস্তোত্র রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরূপ বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার কিছু নাই। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রহরে বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া তাহার গৃহলক্ষ্মীর সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিল—নিজের পুরুষ-মহিমা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পায় নাই, কিন্তু নিজ গৃহের

সর্ব্বংসহা স্নেহশালিনী নারীর দিকে চাহিয়া সহসা তাহার বিস্ময়বোধ হইল। অক্ষম অকৃতী পুরুষের পাশে সহচরীবেশে এই শক্তিরূপিণীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া সে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত হইল। নারীর মধ্যেই সে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এমন কি পৌরুষ-বোধেরও পরিতৃপ্তি চাহিয়াছে—নারীর শক্তি হইতে সে নিজেও শক্তিসঞ্চয় করিতে চাহিয়াছে; নিজের আত্মগ্লানি ও অক্ষমতার ঊর্দ্ধে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছে। ইহাই আমার মনে হয়, নবযুগের বাংলাকাব্যে কবিগণের এই নারীস্তুতির প্রধান প্রেরণা। পরবর্ত্তী যুগের যুগ-নায়ক রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'মাভৈঃ' শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙ্গালী নারীর প্রতি বাঙ্গালী পুরুষের এই প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধার কথা স্পষ্টাক্ষরে কবুল করিয়াছেন। মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রের অতি উর্দ্ধগ রোমান্টিক কল্পনার মূলে ছিল নারী সম্বন্ধে এই বিস্ময়-বোধ, তাঁহার কল্পনা বিশেষ করিয়া উদ্রিক্ত হইয়াছিল দুই বস্তুর দ্বারা: এক, জাতির অতীত সাধনার স্বরূপ বা বিস্মৃত ইতিহাস; অপর, এই নারী-চরিত্র। পুরুষের সহধর্ম্মিণী, জায়া বা প্রণয়িনী রূপেই নারীচরিত্র রহস্যময় হইয়া উঠিল—বঙ্কিমচন্দ্র সে রহস্যের শেষ পান নাই। মাইকেলের 'প্রমীলা'ই এই রহস্যরসের আদিসৃষ্টি। শরৎচন্দ্রের—শেষ প্রশ্নের 'কমলা' নয়—শ্রীকান্তের 'অন্নদাদিদি'তে এখনও তাহার জের চলিতেছে। সে যুগ ছিল নারী-বন্দনার যুগ—প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়ই তখন প্রবল। এই বিস্ময়ই নারীচরিত্র-সৃষ্টির প্রেরণা হইয়াছিল একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভায়। কবিগণের মধ্যে এই বিস্ময়বোধ ব্যর্থ হইয়াছিল হেমচন্দ্রের অতিশয় সমতল-প্রবাহিনী কল্পনায়—নবীনচন্দ্রেও যে আবেগ-চাঞ্চল্য আছে, হেমচন্দ্রের তাহা নাই; বৃত্রসংহারের নারী-চরিত্রগুলির মত অক্ষম সৃষ্টি, এমন স্থবির ও স্থাবর বাঙ্গালীয়ানা, সে যুগের কোনও খ্যাতনামা কবির রচনায় নাই;

সুরেন্দ্রনাথের মহিলা কাব্য ও নারীস্তোত্রমূলক বটে, কিন্তু তাহাতে বিস্ময় অপেক্ষা সজ্ঞান শ্রদ্ধা, কল্পনার রসাবেশ অপেক্ষা বাস্তবের বস্তু-পরীক্ষাই অধিক। সুরেন্দ্রনাথ নারী-চরিত্রের গূঢ় রহস্য চিন্তা না করিয়া সংসারে ও সমাজে, ইতিহাসে ও লোকব্যবহারে নারীর নানা গুণের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই সবিস্তারে নানা দৃষ্টান্ত, উপমা ও অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনার ভঙ্গিই মহিলা-কাব্যের প্রধান কাব্য-গুণ। মোহিনী ও মহীয়সী মহিলার গুণবর্ণনায় তাঁহার যে উৎসাহ, তাহার অধিকাংশ ওকালতী করিতেই ব্যয় হইয়াছে বটে, তথাপি সেই ওকালতীর মধ্যে অতিশয় নীরস গদ্যময় তর্কযুক্তি ও তত্ত্বালোচনার ফাঁকে ফাঁকে—যে সহানুভূতি, চিত্তের প্রদীপ্তি ও বাস্তবদৃষ্টির পরিচয় আছে তাহা অনন্যসুলভ। এই জন্যই মহিলা কাব্য এক-কালে সুরেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। আমিও মহিলা কাব্য প্রসঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও কিছু বলিয়া কবিপরিচয় শেষ করিব। তৎপূর্ব্বে কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি; সুরেন্দ্রনাথের আর একখানি খণ্ডকাব্য বর্ষবর্ত্তন পাঠ না করিলে সুরেন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; আমার মনে হয়, মহিলা কাব্য অপেক্ষা এই ক্ষুদ্রতর কাব্যখানিতে সুরেন্দ্রনাথের কবি-মানসের—তাঁহার স্বচ্ছন্দ-ভাবুকতার আরও বিশিষ্ট পরিচয় আছে। কিন্তু 'অলমতি-বিস্তরেণ' বলিবার সময় আসিয়াছে। আমি মহিলা কাব্য হইতেই বিদায় লইব।

এ পর্য্যন্ত, এই বিস্মৃতপ্রায় কবির পরিচয়-সাধন-মানসে আমি যে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে আশা করি, আমার উদ্দেশ্য কতক পরিমাণেও সফল হইবে। সুরেন্দ্রনাথের জন্য আমি বাংলা কবিসমাজে কোনও অত্যুচ্চ আসন দাবী করি নাই—সুরেন্দ্রনাথ যে সে যুগের একজন শক্তিশালী সাহিত্যসেবী এবং সে যুগের অপরাপর কবিগণের মধ্যে তিনি যে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী—ইহাই আমি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে রুচিভেদ ও মতভেদ আছে—এদেশেও যেমন আছে, বিদেশেও তেমনই আছে, পূর্ব্বেও ছিল, আজিও আছে; সুরেন্দ্রনাথের আদর্শও একটা আদর্শ; যাঁহারা নিছক রসবাদী তাঁহারা সে আদর্শ স্বীকার করিবেন না। সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> সারঙ্গীর সুর সনে সঙ্গীত যোজন,
> বিদ্যা আর কবিতার মিলন যেমন।

—এ আদর্শ সকলের নহে। বিদ্যার সঙ্গে কবিতার মিলন ঘটিতে পারিলেও সুরেন্দ্রনাথে তাহা ঘটিয়াছে কিনা, তাহাও আর এক প্রশ্ন। আমার মনে হয়, কাব্যের কোনও বহির্গত আদর্শ না ধরিয়া, প্রত্যেক কবির কাব্যে তাঁহারই

আদর্শ কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাই দ্রষ্টব্য। সে সাফল্যের প্রমাণ আর কিছুই নয়, লেখকের শক্তির প্রমাণ। তাহাতে দেখা যাইবে, আদর্শ যেমনই হৌক, লেখকের শক্তি তাহাকে সার্থক করিয়াছে—রচনা ভাবে ও অর্থে একটা পরিস্ফুট বাণী-রূপ লাভ করিয়াছে। কোনও একটা ধ্রুব আদর্শ খাড়া না করিয়া এইরূপে রচনার মূল্য নির্ণয় করিলে প্রত্যেক শক্তিমান কবির রচনাই একটা বিশিষ্ট ও বিচিত্র রসের আস্বাদন করাইবে। চিন্তা-প্রধানই হৌক ভাব-প্রধানই হৌক, কিম্বা রস-প্রধানই হৌক—প্রত্যেক কবিতাই কোনও না কোনও দিক দিয়া সার্থক হইতে পারে। সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাবত্তাকেই বিশ্বের দৃঢ়ভিত্তি বলিয়া মনে করিতেন—জ্ঞানের আনন্দই তাহাকে কাব্যরচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। তাঁহার কাব্যগুলিতে তাহার প্রমাণ কিছু অতিরিক্তই আছে। কিন্তু তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়াও তিনি বাস্তবকে পরিহার করেন নাই—বরং সংসারকে স্বীকার করিয়াই আশ্বস্ত হইতে চাহিয়াছিলেন। বহুকালাগত ভারতীয় হিন্দু-মনের সংস্কারকে দমন করিয়া জীবন ও জগৎকে এমনভাবে স্বীকার করিবার এই প্রবৃত্তি সেকালের পক্ষে নূতন ও মৌলিক; সুরেন্দ্রনাথের কাব্যে—বিশেষ করিয়া তাঁহার ম হি লা কা ব্যে—এই প্রবৃত্তির সম্যক্ পরিচয় আছে—কবিত্ব অপেক্ষা কবি-মানসের এই যে পরিচয় ইহাই ম হি লা কা ব্যে র গৌরব। ইহাই সুরেন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যের একজন যুগ-প্রতিনিধিরূপে চিহ্নিত করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের প্রেমের আদর্শে, ও তথা নারী-পূজায়, পূর্ব্বতন কবিগণের আদিরস বা দেহসম্ভোগের নীতি পূরামাত্রায় আছে। ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্তের কাল পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যে যে স্থূল ইন্দ্রিয়-লালসার ঝাঁজ দেখা যায়, গুপ্তকবি তাহাকে নিজ কাব্য হইতে তিরস্কৃত করিয়া, নারীমাত্রের প্রতিই একটা সঘৃণ উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেই অতিশয় প্রাকৃত প্রেমের সংস্কারকেই অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহাকে শোভন ও বুদ্ধিসম্মত করিয়া তুলিয়াছেন। যে subjective বা লিরিক কল্পনা, য়ুরোপীয় কাব্যের প্রভাবে, অতঃপর বাংলা গীতিকাব্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের ভাবনায় তাহার চিহ্ন নাই; পূর্ব্বরাগ প্রভৃতির বর্ণনায় তিনি গভীরতর আবেগের পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রেম সর্ব্বত্রই অতিশয় বাস্তব রক্তমাংসের সম্বন্ধযুক্ত। এজন্য তাঁহার 'মহিলা' অর্থে আমরা আজকাল 'নারী' বলিতে যাহা বুঝি তাহা নয়—সত্যকার সামাজিক সম্বন্ধযুক্ত পত্নী, মাতা ও ভগ্নী প্রভৃতি। ম হি লা কা ব্যে র 'জায়া'-খণ্ডে তিনি নর-নারীর যৌন-সম্বন্ধকেই, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শের উচ্চ চিন্তায় মণ্ডিত করিয়া, মহিমান্বিত করিয়াছেন। এজন্য, স্থানে স্থানে প্রেম সম্বন্ধে অতি উচ্চ ও গভীর কবিত্ব প্রকাশ পাইলেও, বৈষ্ণব কবির মত ভাবগভীর আধ্যাত্মিকতা অথবা পাশ্চাত্য কবিগণের মত, নরনারীর অপূর্ব্ব হৃদয়-বেদনার অসীম রহস্যের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন নাই। যাহা অতি সাধারণ, প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষিত সত্য, প্রেমকে তিনি তাহা দ্বারাই যাচাই করিয়া তাহার মূল্য প্রমাণ করিয়াছেন।

প্রেমকে এইভাবে গ্রহণ করিয়া, নারীকে উচ্চতর ভোগের সহায়রূপে বর্ণনা করিয়া, তিনি কোনও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন নাই সত্য; কিন্তু সে যুগে তাঁহার এইরূপ নারী-বন্দনার প্রয়োজন ছিল; হয় ত' আজিও আছে। ভোগের বস্তু বলিয়াই নারীর প্রতি যে একটা অবজ্ঞার ভাব, ভক্তি-বৈরাগ্যের আবরণে তদানীন্তন গানে ও কবিতায় প্রকট হইয়াছিল, তিনি তাহারই বিরুদ্ধে নারীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় এই যুক্তিবাদ, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উন্নতিবাদ এবং ভোগ ও সংযমের সমন্বয়-চিন্তা লক্ষিত হয়। এজন্য সে যুগের মনীষিগণের মধ্যেও তাঁহার একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে।

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, ১ জুন (১২৪২ বঙ্গাব্দে, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার) দিবসে কলিকাতায় মেডিক্যাল-কলেজ স্থাপিত হয়। এই সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে এদেশে রোগ-নিবারণের নানাবিধ উপায় প্রচলিত ছিল। হাকিমী-চিকিৎসা, কবিরাজী-চিকিৎসা, বমন, রক্ত-মোক্ষণ, অন্তর্ধাবন, খোলাপুড়ী-পাচন, শুল-বসান, ওঝাগিরি ইত্যাদি উপায়ে সেকালের লোকের রোগ সারিত। সেকালের কোন কোন কবিরাজ মহাপণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারা চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া ও তাহাতে কৃতবিদ্য হইয়া চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাদের নাড়ীজ্ঞান এরূপ তীক্ষ্ণ ছিল যে, তাঁহারা নাড়ী টিপিয়াই রোগ-নির্ণয় করিতে পারিতেন। গুডিভ চক্রবর্ত্তী (ডাক্তার সূর্য্য-কুমার চক্রবর্ত্তী) শতমুখে কবিরাজ-মহাশয়-গণের ও এদেশীয় ঔষধ সকলের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব ও তথাকথিত পিতৃদেব ডাক্তার এচ্-এচ্ গুডিভ সাহেব, চক্রবর্ত্তী সাহেব মহাশয়ের বিপরীত কথা বলিয়া গিয়াছেন। একবার ইংরাজ গুডিভ সাহেব শোভাবাজার-নিবাসী একটি রোগীর ৬ মাস চিকিৎসা করিয়াও তাঁহার রোগ সারাইতে পারেন নাই। কিন্তু কুমারটুলী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পিতা নীলাম্বর সেন মহাশয় এই রোগীর চিকিৎসা করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ-রূপে সুস্থ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া ইংরাজ গুডিভ বিস্মিত হইয়াছিলেন। তৎকালে কৃতবিদ্য কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। সুতরাং অধিকাংশ রোগীকে হাতুড়ে চিকিৎসক-গণই চিকিৎসা করিত। তাহাতে কখনও সুফল ফলিত, কখনও বা কুফল ফলিত। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতার জলবায়ু ও লোকদিগের স্বাস্থ্য অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাবাসি-গণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-প্রণালী কিরূপ শোচনীয় ছিল, তাহা স্বর্গত মহাত্মা রামকমল সেন মহাশয় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে বিশেষ-রূপে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

* * * * *

মেডিক্যাল-কলেজ-স্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সময়ে কলিকাতায় দুইটী স্ত্রীলোক-চিকিৎসকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়,—একজনের নাম যদুর মা[১] ও অন্য জনের নাম রাজুর মা[২]। দুই জনেই চিকিৎসা করিতেন। যদুর মা অতি মহাত্মা ছিলেন। তিনি আপনার পাল্কীতে যাইয়া বিনা ভিজিটে আত্মীয়-স্বজনের চিকিৎসা করিতেন। রাজুর মা তন্তুবায়-পত্নী। তিনি লোকের বাড়ীতে গিয়া ও কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া নরগণের সাহায্যে অস্ত্র করিতেন। একবার মেডিক্যাল কলেজের একজন সাহেব (বোধ হয়, ডাক্তার ব্রামলি) কুমারটুলীতে একটী লোকের অস্ত্র করেন, কিন্তু তাহার ঘা সারাইয়া দিতে পারেন নাই। তখন যদুর মা দেশীয় গাছ-গাছড়ার সাহায্যে সে ঘা সারাইয়া দেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সুরসিক ও স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। তিনি যদুর মা'র অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া লিখিলেন :—

"ডাক্তার কবিরাজ রূপে যারে হারে।
যদুর জননী গিয়া জয় করে তারে।
সাবাস্ সাবাস্ বাছা যদুর জননী।
গঙ্গার নিকটে হার মানে কালাপানি।"

উক্ত সাহেব আর একবার দর্জ্জিপাড়ায় একটী লোকের অস্ত্র করেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য না হওয়ায় রাজুর মা

১। হাটখোলার দত্ত-বংশ অতি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও সদাশয়। মহাত্মা মদনমোহন দত্ত মহাশয় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সুপ্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকার মহাশয় ইঁহারই নিকটে চাকরী করিয়া পরিশেষে ক্রোরপতি হইয়াছিলেন। স্বর্গত এটর্নী, বন্ধুবর সুপণ্ডিত কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় হাটখোলার দত্ত বংশীয়। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, যদুর মা তাঁহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন এবং স্বীয় মাহাত্ম্য-বশতঃ বিনামূল্যে অনেকের অনেক উৎকট ব্যাধির উপশম করিয়াছিলেন।—লেখক

২। রাজুর মা দর্জ্জিপাড়ায় বাস করিতেন। তিনি তন্তুবায়-বংশীয়া ছিলেন। ভদ্রলোকের বাটীতে গিয়া তিনি স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা এবং নরগণের সাহায্যে অস্ত্র করিতেন। তবে সামান্য অবস্থার লোক বলিয়া তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ লইতেন।—লেখক

তাহার পুনর্ব্বার অস্ত্র করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। রসিক রাজ ঈশ্বর গুপ্ত লিখিলেন :—

"তরুণ অরুণ সম নরুণের গুণ।
খাড়া হ'য়ে বসে রোগী বাহিরিলে পুন॥
নরুণের কারিকুরী, যাই বলিহারী।
নরুণ হারায়ে দিল সাহেবের ছুরী॥
নরুণ ত নয়, যেন মদনের শর।
শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার মোহে হন্ জর-জর॥

তারকনাথ ঘোষ, দ্বারকানাথ চন্দ্র, ডেভিড্ হেয়ার।

দিশী থান-কেঁড়া সাড়ী, বিলাতী পা-জামা।
হারিল সাড়ীর কাছে পাজামা-মহিমা॥
সাবাস্ রাজুর মার নরুণের খোঁচা।
মেয়ে হ'য়ে পুরুষেরে বানাইল বোঁচা॥"১

১৮২২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় এক সম্প্রদায় ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাদের নাম "নেটিভ ডাক্তার"। উঁহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী। তৎকালে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারি-গণ বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় ভাল ভাল কৃতবিদ্য ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিতেন। সাহেবদিগের চিকিৎসার নিমিত্তই তাঁহারা আনীত হইতেন। এদেশীয় লোকেরা তাঁহাদের নিকটে ইংরাজী পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করিতেন। এখন আমরা যাহাকে 'এলোপ্যাথিক ঔষধ' বলি, পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল, 'ইংলিস্ মেডিসিন্'।

১। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেন নিবাসী স্বর্গত প্রতাপচন্দ্র বসু মহাশয়, শ্যামবাজারে আমাদের বাটীর নিকটে একটী ডিস্পেন্সারীতে কম্পাউণ্ডার ছিলেন। তাঁহার নিকটে বসিয়া কলিকাতার অনেক প্রাচীন কথা শুনিতাম। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। ১৫ বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অতএব আজ বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার বয়স ১০২ বৎসর হইত। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের পাড়ার লোক ছিলেন। আমরা বাল্যকালে তাঁহার বাটীতে গিয়া খেলা করিতাম। তখন তিনি দর্জ্জিপাড়ায় যোড়া-মন্দিরের বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার ডান-চক্ষুর নিকটে একটী কাল-রঙের 'আব' ছিল। এই হেতু, আমরা (পাড়ার ছেলেরা) তাঁহাকে 'আব দাদা' বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার খাওয়া অতি সৌখীন ছিল। পাঁঠা, আনারস ও এণ্ডা-ওয়ালা তপ্‌সে মাছ তাঁহার অতি প্রিয় খাদ্য-সামগ্রী ছিল। তিনি স্বয়ং যেরূপ খাইতে ভালবাসিতেন, অপরকেও সেইরূপ খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। আনারসের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি বৈকালে স্বহস্তে আনারসের রকমারি খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার বাটীর কিছুদূরে রাজুর মা'র বাড়ী ছিল। আমি তাঁহাকে দেখি নাই। যখন আমি পূর্ণবয়স্ক, তখনও ঈশ্বর গুপ্তের বাটীতে যাতায়াত করিতাম। তিনি কথাচ্ছলে একদিন যদুর মা ও রাজুর মার কথা তুলিয়া উক্ত ছড়াগুলি আমাকে শুনাইয়াছিলেন। আরও অনেকটা ছড়া ছিল, কিন্তু তাহা আর আমার মনে নাই। ঈশ্বর গুপ্তের মুখে শুনিয়াছি, রাজুর মা সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক রায় বাহাদুর রামনারায়ণ দাসের বিমাতা ছিলেন।" প্রতাপ বাবুর নিকটে উক্ত ছড়াগুলি শুনিয়া আমি লিখিয়া লইয়া ছিলাম। প্রতাপ বাবুর কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমি রামনারায়ণ বাবুকে দেখিয়াছি, তবে তাঁহার সহিত আলাপ হয় নাই। রামনারায়ণ বাবুর পিতার নাম সাফল্যনারায়ণ। সাফল্যনারায়ণের দুই পুত্র,—রাজনারায়ণ (প্রথম পক্ষে) এবং রামনারায়ণ (দ্বিতীয় পক্ষে)। এই রাজনারায়ণের মাতাকে লোকে 'রাজুর মা' বলিত। রামনারায়ণ বাবু ষ্টোন্ (পাথুরী) কাটিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি যে সকল বড় বড় পাথুরী কাটিয়া বাহির করিয়া ছিলেন, তাহা অদ্যাপি মেডিক্যাল-কলেজের "মিউজিয়াম গৃহে" সুরক্ষিত রহিয়াছে। রাজুর মা নরুণ দিয়া অস্ত্র করিতেন। তাঁহারই আদেশে রামনারায়ণ বাবু মেডিক্যাল-কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। রামনারায়ণ বাবু ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি তারিখে চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। রামনারায়ণ বাবুর প্রপৌত্র শ্রীবেচারাম নারায়ণ এম-বি ও শ্রীসুধীরনারায়ণ এটর্নী এখনও প্রপিতামহের সুনাম রক্ষা করিতেছেন।—লেখক

হানিম্যান সাহেব 'এলোপ্যাথিক' ও 'হোমিওপ্যাথিক' নাম দিয়াছেন। উক্ত নেটিভ ডাক্তার-গণ তাঁহাদের শিক্ষাদাতা সাহেবদিগের নিকটে ঔষধ কম্পাউণ্ড করিতে ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে শিক্ষা করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা রোগ-নির্ণয় করিতে এবং এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিতে শিখিতেন। তবে তাঁহাদের শিক্ষা ও চিকিৎসা-কার্য্য পূর্ণত্ব লাভ করিতে না পারিলেও, হাকিম, বৈদ্য, নাপিত ও ঝাড়নদার-গণের অপেক্ষা তাঁহারা অনেকটা কৃতকর্ম্মা হইতেন। কিছুকাল পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা "নেটিভ-ডাক্তার" উপাধি পাইতেন। তৎপরে তাঁহারা চাকরী পাইয়া যুদ্ধস্থলে আহত সৈন্যগণের চিকিৎসা করিতেন, অথবা 'সিভিল-হাসপাতালে' নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা ছিল। এই সকল ডাক্তার, সাহেব ডাক্তারদিগের নিকটে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে বহুদর্শী হইয়া উঠিতেন এবং ভাল-রূপ চিকিৎসা করিতেও পারিতেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা জ্বর, বিসূচিকা ও বসন্ত রোগীর চিকিৎসায় সাহেবদিগকে সাহায্য করিতেন।

ক্রমে ক্রমে "নেটিভ ডাক্তারের" নিতান্ত প্রয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি না হইলে কার্য্যের সুবিধা হইবার আশা অতি অল্প। ইংরাজ বাহাদুরের রাজ্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সৈন্য সংখ্যারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাতায় যে দুই একটী হাসপাতাল ছিল, তাহাও উঠিয়া গেল। এই হাসপাতাল গুলিতে গিয়া নেটিভ-ডাক্তারেরা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে ও ঔষধ প্রস্তুত করিতে শিখিতেন। তবে তাঁহারা তত পাকা লোক হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের হস্তে রোগীর জীবন-ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলিত না।

তখন কলিকাতায় একটী "মেডিক্যাল-বোর্ড" ছিল। তাহার মেম্বরগণ দেখিলেন, নেটিভ-ডাক্তার-গণের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাঁহারা যখন স্বয়ং স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিতে পারিবেন না, তখন একটী "মেডিক্যাল-স্কুল" স্থাপন করিয়া এদেশীয় লোকদিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে যথারীতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। তৎকালে কর্ণেল উইলিয়ম কেসমেণ্ট (Colonel William Casement) ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সৈনিক-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে, ২৪ মে, শুক্রবার দিবসে মেডিক্যাল-বোর্ডের মেম্বরগণ তাঁহার নিকটে তাৎকালিক চিকিৎসা-প্রণালীর দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত একখানি আবেদনপত্র (নং ৩৬২) পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা বিশেষ করিয়া লেখেন যে, শিক্ষিত নেটিভ-ডাক্তারের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। যে সকল নেটিভ-ডাক্তার আছেন, তাঁহারা শিক্ষিত নহেন। তাঁহারা হাস-

দেওয়ান রামকমল সেন।

পাতালে গিয়া কতকটা শিক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহাদের হস্তে মানুষের জীবন অর্পণ করা চলে না। সুতরাং একটী "মেডিক্যাল-স্কুল" স্থাপন করিয়া ইউরোপীয়প্রণালীতে শিক্ষা দান করিলে দেশের বিশেষ উপকার করা হয়। চিকিৎসা-ব্যাপারে এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট "মেডিক্যাল-বোর্ডের" প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন-পূর্ব্বক কলিকাতায় একটী "মেডিক্যাল-স্কুল" স্থাপন করিবার কল্পনা করেন। দেখিতে দেখিতে ইহা কার্য্যে পরিণত হইল।

"দি স্কুল্ ফর্ নেটিভ্-ডক্টার্স্"

(The School for Native Doctors)

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২১ জুন (১২২৯ বঙ্গাব্দে, ৮ আষাঢ়, শুক্রবার) তারিখে উক্ত চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহাই সমগ্র ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত সর্ব্ব-প্রথম চিকিৎসা-বিদ্যালয়। তখন লর্ড ময়রা ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারল। সার্জ্জন জেম্‌স্ জেমিসন্ (Surgeon James Jameson) তৎকালে মেডিক্যাল-বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহাকেই এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক (superintendent) নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার মাসিক বেতন ৮০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। তাঁহার অধীনতায় একজন মুন্সী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার মাসিক বেতন ৬০৲ টাকা। এতদ্ভিন্ন একজন কেরাণী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার মাসিক বেতন ৫৲ টাকা।[১]

উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম হইল, তাহা এই :—

১। এই স্কুলের নাম হইল "দি স্কুল ফর্ নেটিভ্ ডক্টার্স"।

২। ২০ জন ছাত্রের অধিক ছাত্র লওয়া যাইবে না।

৩। ছাত্রগণের চরিত্র যেন ভাল হয়।

৪। ছাত্রগণের বয়স্ যেন ১৮ বৎসরের কম ও ২০ বৎসরের বেশী না হয়।

৫। হিন্দু ও মুসলমান, সমস্ত ছাত্রই ভর্ত্তি হইতে পারিবে। হিন্দু ছাত্রগণের জাতি-নির্দ্দেশ করা চাই।

৬। যাঁহারা পূর্ব্বে নেটিভ-ডাক্তার ছিলেন, তাঁহাদিগেরই পুত্রগণের আবেদন-পত্র সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে।

৭। যদি কোন সৈনিক-পুরুষ মেডিক্যাল-বোর্ডের সার্টিফিকেট লইয়া ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি গ্রহণ করিয়া এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে চায়, তবে তাহাকেও ভর্ত্তি করা যাইবে।

৮। ছাত্রগণ যতদিন এই স্কুলে পড়িবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের প্রত্যেকে মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবে।

৯। ছাত্রগণ যেন দেবনাগর-অক্ষরে লিখিত হিন্দী-ভাষা অথবা পারসী-অক্ষরে লিখিত পারসী-ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে।

১০। যখন ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "নেটিভ ডাক্তার" হইবেন, তখন তাঁহারা "সিভিল হাসপাতালে" থাকিলে মাসিক ২০৲ টাকা, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইলে ২৫৲ টাকা বেতন পাইবেন। ৭ বৎসর কার্য্য করিলে তাঁহারা যথাক্রমে ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইবেন। ৭ বৎসর কার্য্য করিবার পরে শরীর দুর্ব্বল হইলে তাঁহারা মাসিক ৭৲ টাকা হিসাবে এবং ১৫ বৎসরের পরে তাঁহারা ১০৲ টাকা করিয়া মাসিক পেন্‌সান্ পাইবেন। ২২ বৎসর কার্য্য করিলে কিংবা ১৫ বৎসর পরে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া কোন-রূপে আহত হইলে তাঁহারা নিজ নিজ বেতনের অর্দ্ধেক টাকা পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হইবেন।

নিয়ম-পত্র ঘোষণা করা হইল, কিন্তু ছাত্র-সংখ্যা আশানুরূপ হইল না। ১৮২২ সালের সেপ্টেম্বর-মাসে মেডিক্যাল-বোর্ড, গভর্ণমেণ্টকে লিখিলেন, "ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না। সুতরাং আপনারা যে নিয়ম-পত্র বাহির করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা-ভাষায় ছাপাইয়া সাধারণ লোকের হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।" তদনুসারে গভর্ণমেণ্ট, নিয়ম-পত্র মুদ্রিত করিয়া তাহা বিতরণ করিবার নিমিত্ত মেডিক্যাল-বোর্ডকে আদেশ করেন।

স্কুলের কার্য্যারম্ভ হইল। ডাক্তার জেমিসন্ কখনও উর্দ্দু-ভাষায়, কখনও বা হিন্দী-ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। এনাটমী, মেডিসিন্ ও সার্জ্জারি সম্বন্ধে দুই একখানি উর্দ্দু-ভাষায় বা হিন্দী-ভাষায় লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি অধ্যয়ন করাইতেন। জেমিসন্ সাহেব স্বয়ং এই সকল গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্রথম দুই তিন বৎসর কোন জীব-জন্তুর দেহচ্ছেদ করিয়া ছাত্রগণকে দেখান হয় নাই। এইরূপে বহু-ক্লেশে স্কুলের কাজ চালান হইত।

সার্জ্জন জেম্‌স্ জেমিসন্, সাত মাসমাত্র উক্ত চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, ২০ জানুয়ারি, সোমবার দিবসে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে

১। কোন্ স্থানে উক্ত স্কুলটী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এখন নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। "কলিকাতা-রিভিউ" এর একখণ্ডে পড়িয়াছি যে, ইহা সুপ্রসিদ্ধ ৺শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীর নিকটেই অবস্থিত ছিল। মনে হয়, মহাত্মা রামকমল সেনের বাটীতেই (পুরাতন এলবার্ট-কলেজের গৃহেই) এই স্কুল বসিয়াছিল। লর্ড মেকলে, রামকমল সেনের বাটী ভাড়া লইবার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা "মেডিকাল-কলেজের" ইতিহাস লিখিবার সময়ে আলোচিত হইবে।—লেখক

দেহত্যাগ করেন। সাউথ্ পার্ক ষ্ট্রীট্ সিমেটারিতে তাঁহার কবরের উপর এইরূপ লিখিত আছে :—

"সার্জ্জন জেম্‌স্ জেমিসন্ মেডিক্যাল-বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, ২০ জানুয়ারী তারিখে ৩৫ বৎসর তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিকতার জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।"[১] ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি-মাসে মেডিক্যাল-বোর্ড, গভর্ণমেণ্টের নিকটে এইরূপ রিপোর্ট করেন :—

"আমাদের চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে যত ছাত্র লইবার আদেশ ছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছাত্র ভর্ত্তি হইতে আসিয়াছিল। আমরা কেবল ২০ জন বুদ্ধিমান্ ছাত্রকে ভর্ত্তি করিয়াছি। অবশিষ্ট ছাত্রগণকে বলিয়া রাখিয়াছি যে, খালি হইলেই তোমাদিগকে ভর্ত্তি করা যাইবে। আমরা আরও বলি যে, সার্জ্জন জেম্‌স্ জেমিসন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পদে যিনি নিযুক্ত হইবেন, বাঙ্গালা, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিশেষতঃ তাঁহাকে এই সকল ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে।"

তৎকালে সার্জ্জন জন বৃটন (Surgeon John Breton) নামক একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার কলিকাতায় ছিলেন। বাঙ্গালা, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। মেডিক্যাল-বোর্ডের সুপারিসে তিনি ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মে-মাসে জেমিসনের পদে নিযুক্ত হইলেন। জুন-মাসে তাঁহার চাকরী পাকা হইল। তাঁহার মাসিক বেতন ১০০০৲ নির্দ্ধারিত হইল। মেডিক্যাল-বোর্ড, তাঁহার বেতন ১৬০০৲ হইবার নিমিত্ত সুপারিস করিলেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিলেন না।

"দি নেটিভ্ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন্"
(The Native Medical Institution)

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর-মাসে "দি স্কুল ফর্ নেটিভ্ ডক্টার্স্ (The School for Native Doctors) এই নামের পরিবর্ত্তে ইহার নাম হইল "দি নেটিভ্ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন্" (The Native Medical Institution)[১]

ডাক্তার উমাচরণ শেঠ

(১) To the Memory of James Jameson, Esqr. Surgeon, Secretary to the Medical Board, who died 20th January, 1823, aged 35 years. Universally respected for his talents and acquirements as well as esteemed for every social virtue.

Here lie the loving husband's dear remains
The tender father and the generous friend.

(১) বর্ত্তমান ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, ২৮ জানুয়ারি, সোমবার দিবসে কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজের "শত-বার্ষিক উৎসব" হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে এই কলেজ হইতে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার নাম "The Centenary of the Medical College, Bengal." আমরা বড়ই আশা করিয়াছিলাম যে, এই পুস্তকে মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস দেখিতে পাইব। কিন্তু সে বিষয়ে আমরা হতাশ হইলাম। স্থানে স্থানে সাল, তারিখ ও ঘটনা সম্বন্ধে অনেক সাংঘাতিক ভুল দেখিতে পাইলাম। সাহেবদিগের নামের বানানেও যথেষ্ট ভুল আছে। Jameson না লিখিয়া Jamieson, এবং Breton না লিখিয়া Bretton লিখিত হইয়াছে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে, ২১ জুন তারিখে যে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহার প্রকৃত নাম The School for Native Doctors, দুই বৎসর পরে ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং ইহার নাম হইল, The Native Medical Institution. Centenary পুস্তকে এ-কথার বিন্দু-বিসর্গও লিখিত হয় নাই। বোধ হয়, এই গ্রন্থের লেখক-গণ পুরাতন কাগজ-পত্র দেখেন নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই যে, নিম্ন-লিখিত কয়েকজন সুবিখ্যাত চিকিৎসকের ফটো দেখিলাম না। মেডিক্যাল-কলেজের সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্ব-

মেডিক্যাল-বোর্ডের সেক্রেটারী হইলে যত টাকা বাড়ী-ভাড়া পাওয়া যাইত, গত ফেব্রুয়ারি-মাসে (১৮২৪ খৃষ্টাব্দে) ডাক্তার বৃটনকেও গভর্ণমেণ্ট তত টাকা বাড়ীভাড়া মঞ্জুর করিয়াছিলেন। যে বাড়ীখানি ভাড়া করা হইল, তাহাতে ডাক্তার বৃটন রহিলেন, এবং মেডিক্যাল-বোর্ড ও স্কুল বসিতে লাগিল।

ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্ত (D. Gupta)।

যে সকল হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী ছাত্র ছিল, তাহারা চিকিৎসা-সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক ইংরাজী শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না। বৃটন সাহেব মহা-বিপদে পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ কতকগুলি শব্দ রোমান্, পারসী ও হিন্দী অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল-মাসে গভর্ণমেণ্ট আদেশ দেন যে, এই সকল শব্দ শীঘ্রই মুদ্রিত করা হউক। তৎকালে গভর্ণমেণ্টের একটী লিথো-প্রেস ছিল। সেই প্রেসেই ইহা ছাপা হইতে লাগিল। ঐ কার্য্যে ডাক্তার বৃটনকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত একজন এদেশীয় পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১৯ এপ্রিল তারিখে বৃটনের বেতন ১৬০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। তিনি ১০০০৲ টাকা বেতনে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড আমহার্ষ্ট আদেশ দিলেন যে, ডাক্তার বৃটন, ভর্ত্তি হইবার দিন হইতেই ১৬০০৲ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ১০ জুন তারিখে গভর্ণ-মেণ্ট আদেশ করিলেন যে, শীঘ্রই দুইটি নর-কঙ্কাল (human skeleton) ক্রয় করিয়া আনা হউক। তদনুসারে বাথগেট্ কোম্পানী (Bathgate & Co.) ৭০৯৶১৫ মূল্য লইয়া দুইটী নর-কঙ্কাল আনাইয়া দেন।

তৎকালে কলিকাতায় কয়েকটী হাসপাতাল ছিল। উক্ত স্কুলের ছাত্রগণ সেখানে গিয়া রোগ-নির্ণয় ও ব্যাণ্ডেজ করিতে শিখিত। কোন্ হাসপাতালে কোন্ ছাত্র শিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা বৃটন-সাহেব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে, ২৭ জানুয়ারি তারিখের কাগজ-পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, এই তারিখে ২৪ জন ছাত্র উক্ত স্কুলে পড়িত।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে, মার্চ মাসে "লণ্ডন-ফারমাকোপিয়া" (London Pharmacopea) বৃটন-সাহেব-কর্ত্তৃক পারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় অনূদিত হইল। এতদ্ভিন্ন বৃটন-সাহেব, শারীর-স্থান-বিষয়ক কতকগুলি প্লেট (Anatomical

প্রধান ছাত্র উমাচরণ শেঠের ফটো দেওয়া হয় নাই। তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে, ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ১০০৲ টাকা বেতনে আগরা-ডিস্পেনসারীতে চাকরী করিতে যান। তিনিই গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত সর্ব্ব-প্রথম ডাক্তার। শেঠ মহাশয়ের পৌত্র, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সেট মহাশয় মেডিক্যাল কলেজে পিতামহের স্মৃতিরক্ষা করিবার নিমিত্ত একখানি সুন্দর তৈলচিত্র (Oil painting) উপহার দিয়াছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১ জুলাই তারিখে এই চিত্র উন্মোচিত হইয়াছিল। অথচ উমাচরণবাবুর ফটো দেওয়া হইল না। ভারত-বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্ত, নবীনচন্দ্র মিত্র, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ নবীনচন্দ্র পাল, চিকিৎসা-গ্রন্থ-লেখক দুর্গাদাস কর, তীক্ষ্ণ-মনীষী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্ম্মদাস বসুর ফটো নাই। ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে (প্রথম এম-ডি, ১৮৬২), জগবন্ধু বসু ও গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ফটো দেওয়া হয় নাই। ইঁহারা সেকালের লব্ধনামা চিকিৎসক ছিলেন। আরও এই কয়েকজন বড় বড় ডাক্তারের ফটো দেখিলাম না ; যথা, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, সুন্দরীমোহন দাস, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, গণেন্দ্রনাথ মিত্র, বিপিনবিহারী ঘোষ, ইন্দুভূষণ বসু, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। যে রামকমল সেন মহাশয়

lates) লিথোগ্রাফ্ করাইয়া লইয়াছিলেন। মেডিক্যাল-বোর্ড এই পুস্তকখানি ও প্লেটগুলি ৮ মার্চ তারিখে গভর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইয়া দেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের কোর্ট-অব্-ডিরেক্টর্স্ ভারত-গভর্ণমেণ্টকে পত্র লেখেন যে, "নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন্" তুলিয়া দেওয়া হউক। তাৎকালিক ভারত-গভর্ণমেণ্টের সৈনিক-বিভাগের সেক্রেটারী কর্ণেল উইলিয়াম্ কেসমেণ্ট (Colonel William Casement) এই পত্রখানি মেডিক্যাল-বোর্ডে পাঠাইয়া দেন। স্কুলটী তুলিয়া দিবার কারণ এই:—

১। আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দ আছে যে, এদেশীয় ছাত্রগণ তাহাদের অর্থ ও ভাব সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না।

২। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার অনুচর-গণের বেতন-দান করা ব্যয়-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ হাসপাতালের কর্ত্তা-দিগের সহিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা।

৩। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজী ছাত্রগণ 'জেনারল হাসপাতালে' গিয়া যেরূপ শিক্ষিত হইত, 'নেটিভ মেডিক্যাল-ইন্‌ষ্টিটিউসনের' ছাত্রগণ সেরূপ শিক্ষিত হয় না। অতএব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ তুলিয়া দেওয়া হউক।

উক্ত আপত্তি-সূচক পত্র পাইয়া ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে, ৪ মে তারিখে মেডিক্যাল-বোর্ড উত্তর দিলেন:—

"মান্দ্রাজী ছাত্রগণ বিলাতী রেজিমেণ্টের ও জেনারল-হাসপাতালের অধীনতায় কার্য্য করে, কিন্তু 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনের' ছাত্রগণ নেটিভ-হাসপাতালের ও নেটিভ রেজিমেণ্টের সঙ্গে থাকিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। মান্দ্রাজী ছাত্রগণ হাফ্-কাষ্ট (half-caste)। সুতরাং নেটিভ রেজিমেণ্ট ও নেটিভ হাসপাতালের পক্ষে তাহারা সম্পূর্ণরূপে

ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র।

অযোগ্য। মেডিক্যাল-বোর্ড আরও লিখিলেন যে, নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন দ্বারা এদেশীয় লোকের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে ও হইতেছে।"

হিন্দু-কলেজ ও মেডিক্যাল-কলেজের উন্নতিকল্পে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন,—যে রামগোপাল ঘোষ মহাশয় মেডিক্যাল কলেজের একজন [illegible]তা-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং লর্ড মেকলে ও ট্রিভিলিয়ান্ যাঁহার বদান্যতার [illegible] প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন,—যে রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী মহাশয় মেডিক্যাল-কলেজের ছাত্রগণকে মুক্তহস্তে উৎসাহিত করিতে কিছুমাত্র কাতর হন নাই, তাঁহাদের ফটো দেওয়া হইল না কেন? মনে করিলেই অবচ্ছন্দে তাঁহাদের ফটো পাওয়া যাইত। আমি গত ১২ বৎসর ধরিয়া মেডিক্যাল-কলেজের ইতিহাস লিখিবার নিমিত্ত উপাদান-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিলে উক্ত বড় বড় লোকদিগের ফটো সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিতাম। এমন কি অনেক নূতন সংবাদও বলিয়া দিতে সমর্থ হইতাম। কলিকাতায় প্রবাদ আছে এবং Centenary পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত বৈদ্যরত্ন মহাশয় সর্ব্ব-প্রথমে মড়া চেরেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রাজকৃষ্ণ দে মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে মড়া চিরিয়াছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১০ই জানুয়ারী প্রথম মড়া চেরা হইয়াছিল, একথা Centenary পুস্তকে দেখা যায়। কিন্তু ইহা সাংঘাতিক ভুল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৮ অক্টোবর (১২৪৩ সালে, ১৩ই কার্ত্তিক, শুক্রবার) দিবসে রাজকৃষ্ণ দে সর্ব্ব প্রথম মড়া চিরিয়াছিলেন। মধুসূদন গুপ্তের উপাধি ছিল 'বৈদ্যরত্ন', কিন্তু Centenary পুস্তকে লিখিত হইয়াছে 'বিদ্যারত্ন'। মেডিক্যাল-কলেজের ইতিহাস লিখিবার সময় এ বিষয় সবিস্তর আলোচিত হইবে। মেডিক্যাল-কলেজের বাঙ্গালী পাণ্ডা-মহাশয়-গণ দুই এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিলে Centenary গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। বড়ই দুঃখ রহিল যে, পুস্তকখানি পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হইল না।—লেখক

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর-মাসে বৃটন সাহেব মেডিক্যাল বোর্ডে জানাইলেন যে, হিন্দুস্থানী ছাত্রগণ সহজে স্কুলে ভর্ত্তি হইতে চাহে না। স্কুলের উন্নতি-সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন যে, প্রথমতঃ, স্কুলে ভর্ত্তি হইবার যে বয়স্ নির্দ্ধারিত আছে, তাহা অপেক্ষা কিছু কম করা হউক। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রগণকে যত টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহা অপেক্ষা আরও যেন কিছু বেশী দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, যাহাতে ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার দিকে সবিশেষ লক্ষ রাখা উচিত। চতুর্থতঃ আমার ছাত্রগণের মধ্যে যে ৪টী ছাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমি তাহাদিগকে 'মণিটর' (সর্দ্দার প'ড়ো) বলিয়া গ্রহণ করিব। তাহাদের মধ্যে প্রথম জন "জেনারল হাসপাতালে" গিয়া এনাটমী শিক্ষা করিয়া আসিবে। দ্বিতীয় জন "কোম্পানীর ডিস্পেন্সারীতে" গিয়া ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা শিখিয়া আসিবে। তৃতীয় জন নেটিভ হাসপাতালে রোগীর শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ও তাহার অবস্থা জানিয়া ঔষধ-প্রয়োগ করিতে শিখিবে। চতুর্থ জন আমাদের স্কুলের যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবে।

ডাক্তার বৃটন উপরিভাগে যে সকল কথা লিখিলেন, মেডিক্যাল-বোর্ড তাহার সম্পূর্ণরূপ সমর্থন করিলেন। মেডিক্যাল বোর্ড আরও জানাইলেন যে, আমাদের স্কুল ভাল-রূপ চলিতেছে। বিশেষতঃ আমরা ৮ জন নেটিভ ডাক্তার নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমরা আরাকানে পাঠাইব, এবং কলিকাতায় এখন কলেরার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বাকী কয়েকজনকে এইস্থানেই রাখিব। তাঁহারা আরও জানাইলেন যে, ছাত্রগণের ভর্ত্তি হইবার বয়স্ কিছু কম করিয়া দেওয়া উচিত। এখন ১৮ হইতে ২৬ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত আছে। ইহার পরিবর্ত্তে ১৪ হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ নির্দ্ধারিত করা হউক। প্রত্যেক ছাত্রকে এখন আমরা ৮৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি দিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অল্প বলিয়া বোধ হয়। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রথম দুই বৎসর প্রত্যেক ছাত্রকে ১০৲ টাকা এবং তৃতীয় বৎসরে ১২৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হউক। ছাত্র-সংখ্যা ৫০ করিলেই ভাল হয়। এতদ্ভিন্ন ৪ জন 'মণিটর' থাকুক। তাহাদের মধ্যে ২ জন হিন্দু ও ২ জন মুসলমান। মেডিক্যাল-বোর্ডের এই সকল প্রস্তাব ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মঞ্জুর করা হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

ভ্র

— শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চারিদিকে ছিল আলো, জানি নাকো কে নিভালো,
নিভিয়া গিয়াছে।
অতি দূর ভবিষ্যতে, না জানি এ দীর্ঘ পথে, কোথায় কি আছে!
শান্তি-হীন, শ্রান্তি-হীন, ব্যর্থ রাত্রি ব্যর্থ দিন, কোথা এর শেষ?
কে আমারে সঙ্গে ল'বে—কি মোরে করিতে হবে—
কে দিবে উদ্দেশ?

কিছু হ'ল নাকো দেওয়া, কিছু হ'ল নাকো নেওয়া,
সবি প'ড়ে বাকী;
অকস্মাৎ দ্বিপ্রহরে, শূন্য হাটে আছি প'ড়ে, একান্ত একাকী।
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ, আমি হেথা স্থানুবৎ, অবশ চরণ;
না ছাড়াতে পুর-দ্বার, চতুর্দ্দিকে হাহাকার,—চৌদিকে মরণ।
ভেঙ্গে দিতে ক্ষুদ্র মন, এ বিপুল আয়োজন, কা'র উপহাস?
ক্ষুদ্র মোর শক্তিটি সে, নিঃশেষে ফেলিতে পিষে,
কেন এ প্রয়াস?

অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাস, মাগিতেছে পূর্ব্বাকাশ, আলোকের লেশ।
জড়তায়-হীনতায়,—মূঢ়তায়,—দীনতায়—ডুবে যায় দেশ!
আঁধার অতলকূপে, ধীরে ধীরে চুপে চুপে, কে নামায়ে চলে?
শূন্য এই কুম্ভখানি, ভরি কি তুলিবে টানি, তৃষ্ণাহরা জলে?
একদিন রাত্রিশেষে, পারিব মিটাতে এসে, তাহার পিপাসা?
অথবা আকণ্ঠ পঙ্কে, নিঃশব্দে মৃত্যুর অঙ্কে, ফুরা'বে দুরাশা?

কে জানে সে কি যে চায়—আমি যে সহিতে হায়,
পারিনেকো আর!
সীমাহীন অন্ধকারে, হারাইয়া আপনারে, ডাকি বার বার।
বলে' দিক ত্বরা করি, কোথা ল'ব তার তরী—অবোধ নাবিক।
হয় লুপ্তি—নয় দীপ্তি,—হয় সুপ্তি—নয় তৃপ্তি,—
যাহা দিবে দিক।

চীনা-শ্রমণদের ভারতদর্শন

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

নালন্দা মহাবিহার সেই যুগে ভারতে জ্ঞানচর্চ্চার অতি প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ছিল। ইহার সম্বন্ধে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে কোনই খবর পাওয়া যায় না; চীনদেশের ও তিব্বতের পরিব্রাজকরা ইহার যে বিবরণ নিজেদের ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা নালন্দার গৌরবের কথা জানিতে পারি। চীন ও তিব্বতের পণ্ডিতেরা যেমন নালন্দায় আসিতেন, তেমনি নালন্দা হইতেও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত চীনা ও তিব্বতী পণ্ডিতদের অনুরোধে চীনদেশ ও তিব্বতে গিয়া জ্ঞানপ্রচার করিতেন। হিউয়েনের পর প্রায় এগার জন চীনা ভিক্ষু সংস্কৃত শিখিয়া নালন্দায় প্রবেশ করিয়া সেখানে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও চীনাভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। হিউয়েন-তা নামক একজন উচ্চবংশীয় চীনা পণ্ডিত অনেকদিন এবং ই-টুসিং দশ বৎসর নালন্দায় ছিলেন। চীনদেশের পরিব্রাজকরা নালন্দা সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার কিছু বিবরণ দিব।

মহাবিহারের দক্ষিণে আমবাগানের ভিতর একটি পুষ্করিণী ছিল, তাহাতে নালন্দা নামে এক নাগ বাস করিত, তাহারই নামানুসারে মহাবিহারের নালন্দা নাম হয়। কেহ বলেন, বোধিসত্ত্ব এক পূর্ব্বজন্মে এখানকার রাজা ছিলেন এবং দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া সর্ব্বস্ব দান করেন বলিয়া এ-স্থানের নাম নালন্দা (ন + অলম্ + দা = নিঃশেষ দান) হইয়াছে। আবার অনেকে বলেন, এখানে পূর্ব্বে একটি আমবন ছিল, শ্রেষ্ঠীরা বহুমূল্যে তাহা কিনিয়া বুদ্ধকে দান করেন।

যাহা হউক, বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর শক্রাদিত্য নামক মগধের একজন রাজা প্রথমে এখানে বিহার নির্ম্মাণ করান, তাঁহার পুত্র রাজা বুদ্ধগুপ্ত তাহা পরিবর্দ্ধিত করেন। বুদ্ধগুপ্তের পর রাজা তথাগত আরও একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করান। রাজা তথাগতের পুত্র বালাদিত্য এখানে আরও একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বালাদিত্যের পুত্র বজ্র আরও একটি সঙ্ঘারাম দান করেন এবং ইহার পাশে মধ্য-ভারতের একজন রাজা আরও একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করান। এই ছয়জন রাজার সহায়তায় মহাবিহার স্থাপিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

সমগ্র মহাবিহার পরিবেষ্টন করিয়া ইঁটের প্রাচীর ছিল, ফলে মহাবিহারের সহিত বহির্জ্জগতের কোন সম্বন্ধই ছিল না। বিহারের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে সঙ্ঘারামের সভাগৃহে ও তাহার পর আটটি বিহারে যাওয়া যাইত। বিহারগুলির চূড়া পর্ব্বত-শিখরের মত দেখাইত, বাড়ীগুলি এত উচ্চ ছিল যে, চূড়াগুলি মেঘরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হইত। মহাবিহারের চারিদিকে গভীর ও স্বচ্ছ সরোবরগুলিতে নীলপদ্ম ও লাল কনক ফুল ফুটিয়া থাকিত এবং মধ্যে মধ্যে সুচ্ছায় আমের বন ছিল। প্রত্যেক বাড়ীর ছাদ, থাম, আলিসা প্রভৃতি বহু বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ও অদ্ভুত কারুকার্য্যমণ্ডিত ছিল। দূর হইতে দেখিলে মহাবিহারকে একটি নগরীর মত মনে হইত। শীলভদ্র বহুদিন এখানকার মহাস্থবির ছিলেন, বয়স, বিদ্যা ও চরিত্রের জন্য তিনি বহু-জন-মান্য ছিলেন। বিহারের কর্ম্মব্যবস্থার অধিনায়ককে কর্ম্মদান বা বিহারস্বামী অথবা বিহারপাল বলা হইত, এবং তাঁহাকেও মহা সম্মান দেখান হইত।

এখানে আচার্য্য, ছাত্র ও অতিথি মিলিয়া প্রায় দশ হাজার লোক বাস করিতেন। এখানকার অধ্যাপকেরা দেশে সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন। সারাদিন ধরিয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলিত, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইত, অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিতেন। যাহারা এখানকার এই জ্ঞান-জীবনের সঙ্গে যোগ রাখিতে না পারিত, তাহাদের এখানে কোন স্থানই ছিল না। বিদেশ হইতে পণ্ডিতেরা এখানে নিজেদের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য আসিতেন। অনেকে নালন্দার ছাত্র না হইলেও বিদেশে গিয়া "নালন্দায় অধ্যয়ন করিয়াছি" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া লোকের কাছে সম্মান লাভ করিত। মহাবিহারের প্রবেশ-দ্বারে একজন পণ্ডিত থাকিতেন, তিনি প্রবেশপ্রার্থী প্রত্যেক ছাত্রকে প্রশ্নদ্বারা পরীক্ষা করিয়া তবে বিহারে প্রবেশ করিতে

দিতেন। যাহারা তাঁহার প্রশ্ন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইত, বহু-দূরদেশ হইতে আসিয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইত; প্রতি দশজন প্রবেশপ্রার্থীর মধ্যে দুই জন, বড় জোর তিন জন প্রবেশলাভ করিতে পারিত।

সাধারণতঃ মহাবিহারে মহাযান-শাস্ত্রাদিই পড়ান হইত। কিন্তু ইহা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম্মের আঠারটি শাখার গ্রন্থাদি, এমন কি বেদাদি ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র, হেতু বিদ্যা, শব্দ-বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অথর্ব্ববেদ, সাংখ্য প্রভৃতি সাধারণ বিষয়েও অধ্যাপনা হইত। ইহার মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়জ্ঞ অনেক পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কেবলমাত্র মহাস্থবির শীলভদ্রই সর্ব্ব বিষয়ে এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন। প্রতিদিন প্রায় একশতটি 'ক্লাসে' বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রেরা কখনও এক মিনিটের জন্যও 'ক্লাস' কামাই করিত না। এখানে যাহারা বাস করিত তাহারা স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি ও ধীর ছিল; মহাবিহার স্থাপনার পর হইতে সে পর্য্যন্ত সঙ্ঘের কোন নিয়মের গুরুতর ব্যতিক্রম কোন ছাত্র করে নাই। রাজা বিহারের ভিক্ষুদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন এবং বিহারের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য শতাধিক গ্রাম নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন। এই গ্রামগুলির প্রায় দুইশত গৃহস্থ প্রত্যহ এখানে কয়েকশত মণ চাল ও কয়েকশত মণ ঘৃত ও দুগ্ধ সরবরাহ করিত।

হিউয়েন-ৎসিয়াংএর ভারত-পরিক্রমা

নালন্দার অধ্যয়ন শেষ করিয়া হিউয়েন হিরণ্যদেশে গেলেন। পথে তিনি 'কাপোতিক সঙ্ঘারাম' দেখিলেন। সেখানে একটি প্রকাণ্ড বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি ছিল, তাহার সামনে ভক্তেরা মানৎ করিয়া পড়িয়া থাকিত, এখানে এত ভীড় হইত যে মূর্ত্তি রক্ষার জন্য তাহার চারিদিকে কাঠ ও লোহার বেড়া দিতে হইয়াছিল। এখানে তথাগতগুপ্ত ও ক্ষান্তিসিংহ নামক দুইজন আচার্য্য-ভ্রাতার কাছে হিউয়েন এক বৎসর থাকিয়া 'বিভাষা', 'ন্যায়-অনুসার', 'অভিধর্ম্ম' প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

তাহার পর গঙ্গার দক্ষিণ কূল দিয়া পূর্ব্বমুখে ৩০০ লি যাইবার পর হিউয়েন চম্পারাজ্যে (বর্ত্তমান ভাগলপুর) পৌছিলেন। চম্পানগরী সেই সময়ে অতি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। তারপর কাজুঙ্গীর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনি সমতট রাজ্যে (দক্ষিণ বাঙ্গালা) আসিলেন। চম্পা ও পথের এই রাজ্যগুলিতেও শত শত স্তূপ ও সঙ্ঘারাম ছিল।

সমতট রাজ্যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। এখানকার লোকের স্বভাব মধুর ছিল। অধিবাসীরা হ্রস্বাকার, পরিশ্রমী, কৃষ্ণবর্ণ ও জ্ঞানপ্রিয় ছিল এবং জ্ঞানচর্চার জন্য যত্ন ও কষ্ট-স্বীকার করিত। সমতট হইতে ৯০০ লি পশ্চিমে সমুদ্রের একটি খাড়ির তীরে তাম্রলিপ্তি নগর (বর্ত্তমান তমলুক); এখানকার অধিবাসীরা চঞ্চলপ্রকৃতি ও চটপটে। তাম্রলিপ্তিতে খুব বড় বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল, নানাদেশ হইতে এখানে অনেক পণ্যদ্রব্য ও বহুমূল্য রত্নাদি বিক্রয়ের জন্য আসিত, এবং এই বাণিজ্যের ফলে এখানকার লোকের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। সমতট ও তাম্রলিপ্তি দুই রাজ্যেই অনেক সঙ্ঘারাম ছিল। ফা-সিয়েন তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর বাস করিয়া শাস্ত্রের ও বুদ্ধমূর্ত্তির নকল সংগ্রহ করেন।

হিউয়েন উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে বিহার, স্তূপ, চৈত্য, সঙ্ঘারাম ছাড়া সর্ব্বত্র সম্রাট অশোকনির্ম্মিত স্তম্ভাদিও দেখিয়াছিলেন।

তাম্রলিপ্তিতে থাকিবার সময় সিংহল দেশের কথা শুনিতে পাইয়া হিউয়েন সেখানে যাওয়া মনস্থ করেন। ফা-সিয়েন স্থলপথ বিপদসঙ্কুল বলিয়া একটি বাণিজ্যপোতে সমুদ্রপথে চৌদ্দদিনে তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহলে পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের একজন ভিক্ষুর পরামর্শে সমুদ্র-পথের কষ্ট এড়াইবার জন্য হিউয়েন স্থলপথে সিংহলের দিকে রওনা হইলেন।

উড়িষ্যায় হিউয়েন একশত সঙ্ঘারাম, দশ হাজার হীনযানী ভিক্ষু ও দশটি অশোক-স্তূপ দেখিয়াছিলেন। কলিঙ্গরাজ্যে দশটি সঙ্ঘারাম ছিল; কলিঙ্গের লোককে হিউয়েন তীব্রস্বভাব ও উগ্রপ্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা অনেক পরিমাণে বর্ব্বর ও অশিক্ষিত হইলেও সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ছিল।

কলিঙ্গ হইতে প্রায় ১৮০০ লি উত্তর-পশ্চিমে দক্ষিণ-কোশল রাজ্য, এখানে একশত সঙ্ঘারাম ও দশ হাজার ভিক্ষু ছিল। একমাস কাল এখানে থাকিয়া হিউয়েন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তারপর

অন্ধ্র হইয়া ধনকটক রাজ্যে আসিয়া সুভূতি ও সূর্য্য নামক আচার্য্যদ্বয়ের কাছে কয়েক মাস থাকিয়া মহাসঙ্ঘিক মতানুসারে 'মূলাভিধর্ম্ম' প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ধনকটক হইতে চোল ও দ্রাবিড় রাজ্য হইয়া হিউয়েন আচার্য্যদ্বয়ের সঙ্গে কাঞ্চী রাজ্যে আসিলেন। কাঞ্চীর পণ্ডিতরা হিউয়েনদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হিউয়েন দেখিলেন, শীলভদ্রের মত 'যোগশাস্ত্রে' জ্ঞান এই পণ্ডিতদের কাহারও নাই।

দক্ষিণ-ভারতের মলয় পর্ব্বতের কথা হিউয়েন বলিয়াছেন যে, এখানে শ্বেতচন্দন ও কর্পূরগাছ পাওয়া যায়। শ্বেতচন্দনের মত ঠিক দেখিতে আর একরকম গাছ আছে, তাহাকে 'চন্দনেব' (অর্থাৎ চন্দনের মত) বলে। এই দুই গাছে ভুল যাহাতে না হয়, সেজন্য যাহারা চন্দনের ব্যবসা করে তাহারা এক উপায় অবলম্বন করে—গ্রীষ্মকালে শ্বেতচন্দনের শৈত্যগুণবশতঃ গাছে অনেক সাপ জড়াইয়া থাকে, চন্দনব্যবসায়ীরা কোন উচ্চস্থানে দাঁড়াইলে দূর হইতে কোন্ গাছে সাপ আছে কোন্ গাছে নাই, তাহা দেখিয়া কোন্‌টি শ্বেতচন্দন এবং কোন্‌টি চন্দনের গাছ তাহা বুঝিতে পারে। যে গাছে সাপ জড়াইয়া থাকে তাহাতে তাহারা দূর হইতে তীর মারিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে এবং শীতকালে সাপগুলি চলিয়া গেলে তাহা কাটিয়া আনে। কর্পূরগাছ যখন কাটা হয় তখন তাহার রসে কোন গন্ধ থাকে না, কিন্তু গাছ শুখাইবার পর চিরিলে তাহার মধ্যে কর্পূর পাওয়া যায়। কর্পূরকে চীনা ভাষায় 'ড্রাগনের ঘিলু' (লোং-নাও-হিয়ান) বলে।

সিংহলদেশে বহু শস্য জন্মে ও দেশটি জনবহুল। সেখানকার লোকের প্রকৃতি হঠকারী, গায়ের রং কাল এবং শরীরের আকার ছোট। সিংহল বহুদূরে ও সমুদ্র পার হইয়া যাইতে হয় বলিয়া হিউয়েন সেখানে যান নাই, লোকের মুখে শুনিয়া সেখানকার বর্ণনা লিখিয়াছেন। ফা-সিয়েন এখানে দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সিংহলে রাজার বাড়ীর পাশে 'বুদ্ধের দন্তবিহার'; ইহা অতি উচ্চ এবং বিহারের শিখরের শীর্ষদেশে একটি প্রকাণ্ড পদ্মরাগমণি লাগান আছে। এ-ছাড়া এখানে কয়েক শত সমৃদ্ধ সঙ্ঘারাম ও দশ হাজার ভিক্ষু ছিল। এখানকার সঙ্ঘারামগুলি বহু মণিমাণিক্যমণ্ডিত, বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি অসংখ্য রত্নখচিত এবং ভিক্ষুদের আচার প্রশংসনীয় ও প্রকৃতি ধীর ও গম্ভীর। ফা-সিয়েন সিংহল হইতে বাণিজ্যপোতযোগে সমুদ্রপথে যবদ্বীপ হইয়া চীনদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। যবদ্বীপে তিনি হিন্দু সভ্যতার আধিপত্য দেখিয়াছিলেন।

দ্রাবিড়দেশ হইতে হিউয়েন প্রায় সত্তরজন সিংহলী ভিক্ষুর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমে গিয়া বৌদ্ধতীর্থগুলি দেখিলেন এবং তারপর কোঙ্কানরাজ্য হইয়া মহারাষ্ট্রে আসিলেন। কোঙ্কানেও বৌদ্ধধর্ম্মের খুব প্রভাব ছিল। রাজপ্রাসাদের কাছে একটি বড় সঙ্ঘারামে সিদ্ধার্থের একটি শিরোভূষণ রক্ষিত ছিল।

মহারাষ্ট্রের লোকে সত্যপ্রিয় ছিল ও মৃত্যুকে ভয় করিত না। এখানকার রাজা খুব সমরোৎসাহী এবং সমরনীতির খুব চর্চ্চা এদেশে ছিল। কোন সেনাপতি যদি যুদ্ধযাত্রা করিয়া পরাজিত হইয়া আসিতেন তবে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হইত না বটে, কিন্তু সৈনিকের বেশ ছাড়াইয়া স্ত্রীলোকের কাপড় পরাইয়া দেওয়া হইত। অনেকে ইহার চেয়ে মৃত্যু ভাল মনে করিত। এখানকার রাজা বিশাল সৈনিকবাহিনী পোষণ করিতেন; যুদ্ধের সময় হস্তীদের মদ্যপান করাইয়া শত্রুর উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। হিউয়েনের সময় পুলকেশী মহারাষ্ট্রের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে হর্ষবৰ্দ্ধনের মত বীর ও ক্ষমতাশালী লোকও পরাজিত হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র হইতে বোচ রাজ্য হইয়া হিউয়েন মালব রাজ্যে আসিলেন। এখানকার লোকের সৌজন্য প্রসিদ্ধ ছিল ও তাহারা কলানুরাগী ছিল। হিউয়েন বলিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে মালব এবং উত্তর-পূর্ব্বে মগধ—এই দুই দেশের কেবল বিদ্যানুরাগ, ধর্ম্মবুদ্ধি, মার্জ্জিত ভাষা ও বাগবৈদগ্ধ্যের খ্যাতি ছিল। শিলাদিত্য (ইনি কান্যকুব্জের শিলাদিত্য হর্ষবৰ্দ্ধন হইতে ভিন্ন লোক) নামক মালবদেশের একজন ধার্ম্মিক রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের জন্য অনেক কাজ করিয়াছিলেন।

মালব হইতে বল্লভী, সুরাষ্ট্র, মুলতান, সিন্ধু প্রভৃতি রাজ্য হইয়া হিউয়েন পর্ব্বতরাজ্যে আসিলেন। পারস্যরাজ্যের সম্বন্ধে তিনি শুনিয়াছিলেন যে সেখানে দুই তিনটি সঙ্ঘারাম ও কয়েক শত ভিক্ষু আছে; বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র সে সময়ে পারস্যের রাজপ্রাসাদে রক্ষিত ছিল। হিউয়েন পর্ব্বতরাজ্যে দুই বৎসর বাস করিয়া সে দেশের কয়েকজন আচার্য্যের কাছে সম্মতীয় মতানুসারে 'মূলাভিধর্ম্মশাস্ত্র', 'সদ্ধর্ম্ম-সম্পরিগ্রহ-শাস্ত্র,' 'পরীক্ষা-সত্য-শাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তারপর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব পথে মগধে ফিরিয়া আবার নালন্দা মহাবিহারে প্রবেশ করিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের পূর্ব্বোক্ত ঐ রাজ্যগুলিতেও তিনি সর্ব্বত্র বহু সঙ্ঘারাম, বিহার ও অশোকস্তম্ভাদি দেখিয়াছিলেন।

[ক্রমশঃ

নবযুগ-সূচনায়

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জয়যাত্রা-পথে শুধু আয়োজন আরম্ভ সেদিন
অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘ পথ অজানিত সম্মুখে বিস্তৃত,
প্রতীক্ষা-অধীর সবে, প্রত্যাসন্ন আগমন কা'র ?
শঙ্খধ্বনি মুহুর্মুহু কেন ওঠে বাণীর মন্দিরে ?

গ্রন্থিল বাক্যের জাল, দুর্বলতা ভাব-বিন্যাসের,
সাবলীল নহে ভাষা, অপটু ভঙ্গিমা লিপিকার :
বাণীর পূজার মন্ত্র বাণীহীন আড়ষ্ট অস্ফুট,
কল্পনা গুমরি মরে প্রকাশের অসহ্য ব্যথায় ;—

তবু যে বলিতে হ'বে, তবু যে চলিতে হবে পথ
পদাতিক সৈন্যসহ,— জয়-রথে সারথী কোথায় !
—পথের নিশানা দিবে গতিবেগে নিশান উড়ায়ে
বাণীর সে সেবাধর্ম্মী কোথায় আস্তিক পুরোহিত ?

—দাঁড়াইল পুরোহিত জয়-যাত্রিকের পুরোভাগে
অমোঘ নির্ঘোষে তা'র সচকিতে জাগি পুরবাসী,
অলস শয়ান ত্যজি' বাহিরিয়া এল একে একে,
প্রশস্ত মণ্ডপতলে সংগৃহীত রয়েছে সমিধ।

স্বস্তিক-অঙ্কিত কুম্ভে শোভে চ্যুত-পল্লবের শাখা
কদলী-তোরণতলে শুভান্বিত শুভ্র আলিম্পন,
"সুগন্ধ মন্দারদাম গাঁথি আনে কেহ" বা যতনে
"ত্রিদিব-বাদিত্রে" বাজে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।

বাণীর আসন পাতা, বেদী 'পরে কোথা মহাদেবী ?
পদ্মাসনে সমাসীনা অন্ধদৃষ্টি দেখিতে না পাই ;
জ্ঞানাঞ্জন কে পরাবে সমাগত স্নাতক সবারে
এ, উহার পানে চাই,—অগ্নিহোত্রী পাশে দাঁড়াইয়া !

সহসা মণ্ডপতলে সমুত্থিত এ বাণী কাহার,
কাহার ফুৎকারে শঙ্খ জয়যাত্রা করিল ঘোষণা,
চরণ-নির্ম্মাল্য মা'র কে করে শ্রদ্ধায় বিতরণ
অপ্রবুদ্ধ প্রতিভায় শান্তিজলে জাগিল চেতনা !

'ভৈরব হুঙ্কার' কা'র স্পন্দিত করিল কবিকুল,
পরম বিস্ময়ে শোনে এত নহে 'মেঘের গর্জ্জন',
নহে ইহা সিংহনাদ, 'জলধির কল্লোল' এ নহে
'দ্রুত ইরম্মদ' সম গতি তা'র ভীষণ দুর্ব্বার।

'মহারথী'-কবি সেই 'মহাক্রান্ত' কবীন্দ্র 'কেশরী'
জয়মালা শোভে গলে, লভিতেছে অনন্ত বিশ্রাম,
'পরমাদ' ঘটে নাই, মনোসাধ রেখেছেন দেবী
অমৃতনিস্যন্দী 'মন-কোকনদ' নহে 'মধুহীন'।

'মধুকরী' কবি সেই 'চিত্ত-ফুল-বন মধু' লয়ে,
'মধুচক্র' রচিয়াছে 'গৌড়জন যাহে নিরবধি'
আনন্দে করিবে পান অফুরন্ত সুধার নির্ঝর
'অনন্ত বসন্ত বায়ু' 'মনোহর কাকলী লহরী' !

'নিশার স্বপন সম' 'নহে স্থির' মানুষের আয়ু
জানি মোরা, আরো জানি 'মায়াময় এ ভবমণ্ডল',
জেনে শুনে তবু কাঁদে শোকাতুর অবোধ পরাণ
'হৃদয়-বৃন্তের ফুল' ছিঁড়ে কাল নির্ম্মম হেলায় !

'পুড়ি' ধূপদানে হায়' 'গন্ধরস সুগন্ধে' যেমন
'আমোদিয়া' দশদিশি ধূপজন্ম সার্থক তাহার,
আপনারে রিক্ত করি মণিরত্নে সাজায়ে বাণীরে
নবযুগ-সূচনায় মহাকবি মহান্ গৌরবে।

দারিদ্র্য দিল যে দুঃখ, দুঃখ দিল মৃত্যু-বিড়ম্বনা
অমর হইলে তবু বাঙ্গালীর স্মৃতিতীর্থপথে,
"প্রভাতের জ্যোতির্ম্ময়ী প্রত্যাশা"রে সফল করিয়া
কবি মাইকেল ধন্য চিরঞ্জীব কবির সভায়।*

* খিদিরপুর "মধু-মিলন" সভায় পঠিত, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ৩৫।
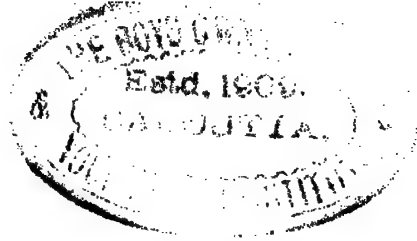
শম্ভুনাথ পণ্ডিত

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

উপক্রমণিকা

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পুণ্যশীলা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার উদার ঘোষণাপত্রে বিঘোষিত হইয়াছিল যে তাঁহার প্রজাগণ জাতি ধর্ম্ম-বর্ণনির্ব্বিশেষে এতদ্দেশে

শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত ঘোষণার কয়েক বৎসরের মধ্যে কোনও চিহ্নিত উচ্চপদে ভারতবাসী নিযুক্ত হন নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পূর্ব্বে প্রস্তাবিত প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে ভারতবাসীকে অন্যতম বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার যোগ্যতা পরীক্ষা করা হউক, দেশবাসী এই প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইলে যে প্রতিভাশালী বঙ্গবাসী স্বীয় মনীষাবলে সর্ব্বপ্রথমে এই পদ অধিকৃত করিয়া ভারতবাসীর যোগ্যতা প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন এবং উক্ত পদে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ নিয়োগের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, সেই উদার নিষ্কলঙ্কচরিত্র, পরোপকারী ধর্ম্মভীরু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নাম বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভে চিরদিন সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেশের মুখোজ্জলকারী সেই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে মনঃস্থ করিয়াছি।

জন্ম ও বংশবিবরণ

১৮২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে এক কাশ্মীরীয় প্রধান ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সদাশিব পণ্ডিত তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান লক্ষ্ণৌ নগরী পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় আগমন করেন এবং পারস্যভাষায় পারদর্শিতার জন্য সদর আদালতে পেস্কারের পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। তিনি অতি মিষ্টভাষী সদালাপী ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং তাদৃশ সম্পত্তিশালী না হইলেও চরিত্রমাধুর্য্যে সকলের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

শিক্ষা

শৈশবে শম্ভুনাথের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। সেইজন্য তিনি লক্ষ্ণৌ নগরীতে তাঁহার মাতুলালয়ে প্রেরিত হন এবং এই স্থানেই মাতুলের তত্ত্বাবধানে তিনি উর্দ্দু ও পারস্যভাষায় শিক্ষালাভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি ইংরাজী

ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ।

ভাষায় শিক্ষালাভার্থ বারাণসীধামে প্রেরিত হন। এইস্থানে কিছুকাল অধ্যয়নের পরে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শম্ভুনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

হিন্দু কলেজের ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রগণ এই সময়ে মদ্যপান ও অখাদ্য-ভোজনদ্বারা, এবং মিশনরীগণদ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ খৃষ্ট

শ্রীনাথ ঘোষ।

ধর্ম্মানুরক্তি প্রদর্শন করিয়া যে ভাবে হিন্দু আচার ও ধর্ম্ম পদদলিত করত অভিভাবকগণের বক্ষে শেলাঘাত করিতেছিলেন তাহাতে হিন্দু অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শোভা-বাজারের ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব ও রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, নড়াইলের জমিদার (রায়) রতন রায়, সিমুলিয়ার কাশীনাথ ঘোষ এবং নিমতলার দত্তবংশীয়গণ প্রভৃতির সহযোগিতায় গৌরমোহন আঢ্য ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ দিবসে নিমতলা মাণিক বসু ঘাট ষ্ট্রীটের এক বাটীতে 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া উচ্চতম প্রতীচ্যশিক্ষার সহিত হিন্দু বালকগণের হৃদয়ে স্বধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করিবার প্রয়াস পান। আমরা স্থানান্তরে এই বিদ্যালয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং যে বিদ্যালয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের ন্যায় অকৃত্রিম দেশসেবক, কৃষ্ণদাস পালের ন্যায় রাজনীতিবিশারদ, কৈলাসচন্দ্র বসু ও শম্ভুচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের ন্যায় ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুলেখক এবং বর্ত্তমান প্রস্তাবের বিষয়ীভূত হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ন্যায় ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দুসমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই বিদ্যালয়ের এখন আর কোনও পরিচয় দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

শম্ভুনাথের পিতা ধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিত সদাশিব পুত্রকে গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়েই প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ইহার পূর্ব্বে অল্পকাল শম্ভুনাথ হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে।

যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারে সেইদিকে গৌরমোহনের প্রথম দৃষ্টি ছিল। শৈশব হইতে ইংরাজী শব্দের যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষা দিবার জন্য এবং বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি শিক্ষার জন্য তিনি নিম্নতর শ্রেণী হইতেই সুদক্ষ অথচ কৃতবিদ্য যুরোপীয় শিক্ষক দ্বারা ছাত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে সময়ে শম্ভুনাথ সেমিনারীতে প্রবেশ করেন সেই সময়ে হার্ম্মান জেফ্রয় নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত উহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং য়ুরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় ইঁহার প্রভূত ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রথমে ব্যারিষ্টার হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন কিন্তু অত্যধিক পানদোষের জন্য ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন না, এবং অত্যন্ত দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। গৌরমোহন মাত্র একশত মুদ্রা বেতনে ইঁহাকে স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন।

শম্ভুনাথের সতীর্থগণের মধ্যে 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র এবং নিমতলার দত্তবংশোদ্ভব ভবানীচরণ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নিম্নশ্রেণীতে গিরিশচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ (পরে কিছুকাল কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান) শ্রীনাথ ঘোষ এবং আরও নিম্নশ্রেণীতে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি পড়িতেন।

হার্ম্মান জেফ্রয় অত্যন্ত যত্নসহকারে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড।

অন্যতম প্রিয় ছাত্র ক্ষেত্রচন্দ্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এক এক দিন তিনি প্রমত্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে সুন্দর সুন্দর অংশের এরূপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে তদ্দ্বারা ছাত্রগণ যথেষ্ট উপকৃত হইত।

হার্মান জেফ্রয় বিদ্যালয়ে একটী তর্কসভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি উহার সভাপতি ছিলেন। এই সভায় ক্ষেত্রচন্দ্র, শম্ভুনাথ, গিরিশচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র প্রভৃতি বিখ্যাত ছাত্রগণ ছাত্রাবস্থাতে প্রতি সপ্তাহে একবার বিচার ও তর্ক করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতেন। ক্ষেত্রচন্দ্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এই বিতর্ক-সভায় জেফ্রয় ক্ষেত্রচন্দ্রকে তাঁহার বাগ্মিতার জন্য বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে সভার 'ডিমস্থিনীস' নামে অভিহিত করিতেন। শম্ভুনাথ ক্ষেত্রচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও ক্লাসে তাঁহার নিম্নে ছিলেন। ইনি ক্ষেত্রচন্দ্রের ন্যায় বক্তৃতাশক্তির অধিকারী না হইলেও ইঁহার যুক্তিসমন্বিত তর্কশক্তি প্রবলতর ছিল এবং সেই জন্য হার্মান জেফ্রয় ইঁহাকে সভার 'ফোশিয়ন' নাম দিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রচন্দ্র ও ভবানীচরণ দত্ত তাঁহাদের শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। একবার রামগোপাল ঘোষ ভারতবর্ষের ইতিহাস, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র, প্রবন্ধ-রচনা ও গণিতের জন্য কতকগুলি মোহর ও পারিতোষিক দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ডাক্তার ডফের স্কুলের একজন ছাত্র শেষোক্ত বিষয়ে পুরস্কার লাভ করে, বাকী সমস্ত পুরস্কার ক্ষেত্রচন্দ্র ও ভবানীচরণ উভয়ে লাভ করেন। ক্ষেত্রচন্দ্র ৫টী মোহর পাইয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী পরিদর্শন করিতে আসেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া ক্ষেত্রচন্দ্রকে একটি রৌপ্য-পাত্র পুরস্কার দেন।

শম্ভুনাথ গণিতশাস্ত্রের মোটেই অনুরাগী ছিলেন না। তিনি 'পুস্তকের কীট' ছিলেন না কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনন্যসাধারণ ছিল। ক্ষেত্রচন্দ্র তদীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে "হার্মান জেফ্রয় প্রায়ই বলিতেন যে ক্ষেত্রচন্দ্র ও শম্ভুনাথ এই দুইজন ছাত্র জগতে যশোলাভ করিবেন। শম্ভুনাথের বিষয়ে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

শম্ভুনাথ তাঁহার সুন্দর আকৃতি, মধুর চরিত্র এবং শিষ্ট ব্যবহারদ্বারা শিক্ষক ও সতীর্থগণের প্রীতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র একস্থানে শম্ভুনাথের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক ছাত্রাবস্থার দুইটি গল্প এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

টিফিনের সময় ছাত্রেরা মাঠে খেলা করিতেছে এমন সময় একজন মাতাল সাহেব উলঙ্গ তরবারি হস্তে তথায় আগমন করিল; মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল; প্রাণভয়ে শিক্ষক ও ছাত্রেরা চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল; শম্ভুনাথের ধৈর্য্য ও সাহস একটি দুর্ঘটনা নিবারণ করিল। তিনি সাহসপূর্ব্বক মাতাল ব্যক্তির সম্মুখীন হইলেন এবং তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া কৌশলে তাহাকে নিরস্ত্র করিলেন। আর একবার এক তীমদর্শন ফকীর একটি ছাত্রকে অবমাননা করায়, শম্ভুনাথ একদল ছাত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অপরাধীকে ধৃত করতঃ বিদ্যালয়-সংলগ্ন মাঠে আনিয়া তাহার অপরাধের সমুচিত শাস্তি বিধান করেন।

সেকালে বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষাসমূহ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণদ্বারা গৃহীত হইত। শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ও বিখ্যাত লেখক কাপ্তেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন প্রভৃতি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতেন।
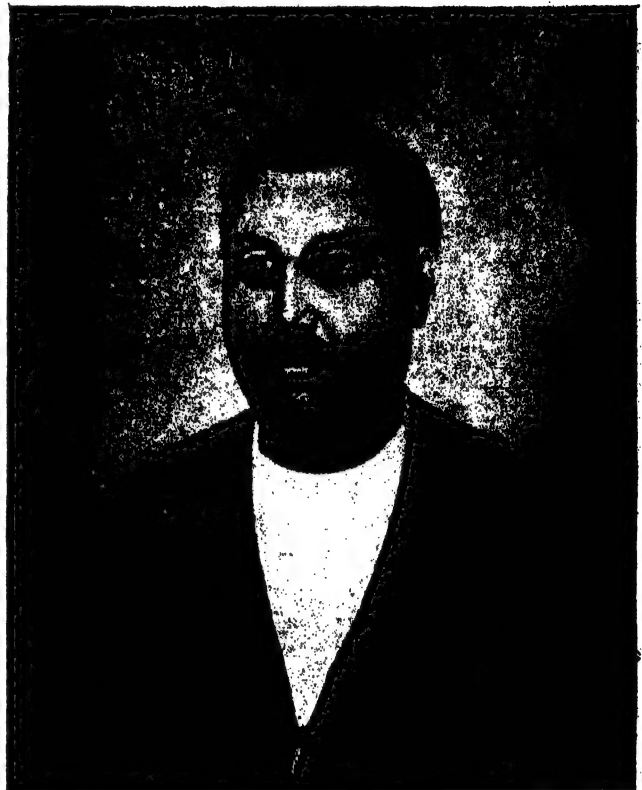
আর্থিক অসচ্ছলতানিবন্ধন ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার বিদ্যালয় পরিত্যাগকালে গৌরমোহন তাঁহার চরিত্রের উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ একখানি পত্র দেন এবং অধ্যক্ষ হার্মান জেফ্রয় তাঁহার প্রতিষ্ঠাপত্রে লিখিয়াছিলেন :–

"শম্ভুনাথ পণ্ডিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রথম শ্রেণীর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, কাপ্তেন রিচার্ডসন এবং অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ উঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং উঁহার ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট জ্ঞান জন্মিয়াছে স্বীকার করেন। তিনি পারস্যভাষায় বেশ

ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন তাহাও আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি। স্বভাব ও চরিত্র সর্ব্বদাই তাঁহার শিক্ষকবর্গের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

হরচন্দ্র ঘোষ।

সহকারী মহাফেজ

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর শম্ভুনাথ কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে সদর আদালতে মহাফেজের সহকারী (Asstt. Record Keeper) নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে বাঙ্গালা ও পারস্য-ভাষায় লিখিত দলিলাদির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া তিনি বেতনাধিক কিছু উপার্জ্জন করিতেন। এই অনুবাদগুলি য়ুরোপীয়গণের প্রশংসা লাভ করিত। তাঁহার পরিশ্রম-শীলতা ও কর্ম্মদক্ষতাগুণে প্রীত হইয়া স্যর রবার্ট বার্লো তাঁহাকে তাঁহার অধীনে ডিক্রীজারী মুহুরীর পদে নিযুক্ত করেন।

"ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ"

এই সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সদর আদালতের ধর্ম্মভীরু উকীল অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে "ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ" সম্বন্ধে তাঁহার একখানি সুযুক্তি-পূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পরে শম্ভুনাথ ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি হন, হরিশ্চন্দ্র ও অন্নদাপ্রসাদ উহার উৎসাহশীল অধ্যক্ষ ছিলেন।

"বেকন-সন্দর্ভের টীকা"

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথ তাঁহার সতীর্থ ভবানীচরণ দত্তের সহযোগিতায় বেকনের প্রবন্ধাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া মেজর ডি, এল, রিচার্ডসন লিখিয়াছিলেন—"বেকনের টীকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ- উহা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। তুমি টাউনহলে যে চমৎকার পরীক্ষা দিয়াছিলে তাহার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে।"

এই টীকার সেকালে খুব আদর হইয়াছিল এবং কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন যে এই গ্রন্থ প্রকাশের পরে গ্রন্থকারদ্বয় বাঙ্গালায় 'বোমণ্ট ও ফ্লেচার' নামে অভিহিত হইতেন।

"ডিক্রীজারীর আইন"

ইহার কিছুদিন পরে তিনি ডিক্রীজারীর আইন সম্বন্ধে একটি ইংরাজী পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। এই পুস্তিকা সদর কোর্টের বিচারপতিগণের ও গবর্ণমেণ্টের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্যর রবার্ট বার্লো তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর কৃতিত্ব দর্শনে সবিশেষ আনন্দিত হন।

ওকালতী

এই সময়ে সদর আদালতে মিসিলখাঁর (reader) পদ শূন্য হয় এবং শম্ভুনাথ উক্ত পদের প্রার্থী হন। কিন্তু এই কর্ম্ম অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং শম্ভুনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা আছে বলিয়া পিতৃপ্রতিম স্যর রবার্ট বার্লো তাঁহাকে উক্ত কর্ম্মের প্রার্থনা করিতে নিষেধ করেন। চব্বিশ পরগণার তৎ-কালীন সদর আমীন হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট শম্ভুনাথ এই বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করায় ঘোষ মহাশয় শম্ভুনাথকে আইন অধ্যয়ন করিয়া সদর আদালতে ওকালতী করিবার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শানুসারে শম্ভুনাথ কঠোর পরিশ্রম সহকারে আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতী

মেজর ডি-এল্-রিচার্ডসন্।

পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে চরিত্র সম্বন্ধে একটি সুপারিশ-পত্র দাখিল করিতে হইত। সদর কোর্টের রেজিষ্ট্রার মিষ্টার কার্ক পেট্রিক ১১শে জুলাই ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথকে নিম্নলিখিত প্রশংসাপত্র দেন—

"এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাইতেছে যে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সদর আদালতের অফিসে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের নিয়োগাবধি আমি তাঁহার চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইয়াছি। তিনি ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং প্রধান প্রধান প্রাচ্য ভাষাগুলিতেও তাঁহার সমধিক অধিকার আছে। তাঁহার নীতিজ্ঞানও প্রশংসনীয় এবং ইংরাজী শিক্ষার অনুযায়ী এবং তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র নির্দ্দোষ, এই কারণে যাঁহারা জানেন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার সকল বিষয়েই বেশ জ্ঞান আছে—আইন প্রভৃতির জ্ঞান কিছু কম নহে।"

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর শম্ভুনাথ সদর কোর্টে ওকালতীর সনন্দ প্রাপ্ত হন। অতি শীঘ্রই শম্ভুনাথ ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করেন। ইহার কারণ এই যে যখন তিনি অল্প বেতনে মুহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন হইতেই সযত্নে ব্যবহারশাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং নিজ বাটীতে স্বনামধন্য হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বন্ধুগণের সহিত জটিল মোকদ্দমা-সংক্রান্ত বিষয় লইয়া আইনের কূট তর্ক-বিতর্কদ্বারা স্বাভাবিকী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মার্জ্জিত করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের অতিরহস্যময় সুহৃদ গিরিশচন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের জীবনচরিত বিষয়ক এক প্রস্তাবে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"সে সময়ে এক্ষণকার সুপ্রসিদ্ধ সরকারী উকীল শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদর কোর্টের একজন মুহরীমাত্র ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কক্ষে তাঁহার সদ্গুণে মুগ্ধ ও অবাধে বিতরিত চাটুনীলুব্ধ একদল যুবক শীঘ্রই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হরিশ উক্ত দলের নেতা ছিলেন। শম্ভুনাথ বা হরিশ কেহই অনর্থক গল্পগুজবে কালক্ষেপ করিতে ভালবাসিতেন না। উভয়েই কর্ম্মপ্রিয় ছিলেন, এবং তাহার ফলে শীঘ্রই একটি আইন-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আইন সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হইত তাহা অতি উচ্চদরের। কোন অপরিচিত ব্যক্তি সহসা সে গৃহে প্রবেশ করিলে তাহা ব্যবহারাজীব-দিগের শিক্ষাস্থান বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন। আইনের বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থাদি পরস্পরের প্রতি নবশিক্ষার্থীর উৎসাহ এবং প্রধান ব্যবহারাজীবের নিপুণতার সহিত নিক্ষিপ্ত ও প্রতিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। তর্ক-বিতর্কের স্রোত এরূপ বেগে প্রবাহিত হইতেছে যে অবিশেষজ্ঞের পক্ষে তাহার গতি নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য, মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। প্রথম আদালত যে রায় দিয়াছেন, আপীল আদালতে তাহা রহিত হইয়াছে, তাহার পর সদর আদালতে তাহার আলোচনা হইয়া পুনর্বিচারের আদেশ হইয়াছে। শম্ভুনাথের বাড়ীতে যে কাল্পনিক আদালত বসিয়াছে তাহাতে সমস্ত মোকদ্দমা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পুনরালোচিত হইল, উভয় পক্ষেই কৌন্সিলী নিযুক্ত হইয়া যেরূপ উৎসাহের সহিত বাক্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা প্রকৃত বিচারালয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। যে সকল অভিমত প্রকাশিত হইল তাহা সারবত্তা ও মৌলিকতায় সদর আদালতের বিজ্ঞতম বিচারকের অভিমতের সমতুল্য। তাহার পর এক অত্যুগ্র বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। অমুক আইনের অমুক বিধান এই মতের অনুকূল, কিন্তু অমুক আইনের অমুক বিশেষ বিধান ইহার প্রতিকূল। উক্ত বিশেষ বিধানের মূল বিশ্লেষিত হইল। উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে উদ্ঘাটিত হইল। হরিশ্চন্দ্রের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এই সকল সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠস্বর অপর সকলের কণ্ঠস্বর অতিক্রম করিয়া উঠিল। তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তি তর্কে এবং শেষ মীমাংসায় সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল।"

প্রতিভাশালী বন্ধুগণের সহিত তর্ক-বিতর্ক দ্বারা শম্ভুনাথ তাঁহার তর্ক-শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৰ্দ্ধিত করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সোশ্যালিজম, কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম

—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাযুদ্ধের পর তিনটি মতবাদ ইওরোপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—সোশ্যালিজম, কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম। ইওরোপের মধ্যে বর্ত্তমানে রাশিয়া ও ইটালীকে এই মতবাদগুলির লীলাক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই মতবাদগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং অল্পবিস্তর শিষ্যও করিয়াছে, কিন্তু রাশিয়া ও ইটালীর শাসক-সম্প্রদায় উক্ত মতাবলম্বী হওয়ায় দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই রাষ্ট্রপোষিত মতবাদ গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে। উক্ত তিনটি মতবাদকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে ফেলিতে পারি—কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম ; কারণ

বিজ্ঞানসম্মত সোশ্যালিজম ও কমিউ-নিজমের প্রথম প্রচারক কার্ল মার্ক্স।

কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মূলসূত্র প্রায় একই—ধনী ও পরশ্রমফলভোগীগণের ধ্বংস এবং দেশের শ্রমিক ও কৃষক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দেশ-শাসন (Dictatorship of the Proletariat)।

কমিউনিজম বলে রাষ্ট্রের প্রত্যেকে তাহার শক্তি ও সামর্থ্য রাষ্ট্রকে দিবে, তাহার পরিবর্ত্তে তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন রাষ্ট্র তাহা মিটাইবে। শ্রমিক বা কৃষক তাহাদের পরিশ্রমজাত সমস্ত জিনিষই রাষ্ট্রকে দিবে, পরিবর্ত্তে পারিশ্রমিক বা শস্য পাইবে না, রাষ্ট্র তাহার বিনিময়ে দিবে আহার্য্য, পরিধেয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, আনন্দ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছু।

কমিউনিজম ও সোশ্যালিজম উভয় মতই বলে যে দেশের সমস্ত কারখানা, শিল্প-বাণিজ্য, কৃষিক্ষেত্র, জঙ্গল ইত্যাদি যাবতীয় ধন-উৎপাদনের উৎস রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে, কেহ ব্যক্তিগত ভাবে কোন ধন উৎপাদন করিতে পারিবে না। দেশের প্রত্যেককে রাষ্ট্রের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে, বিনা পরিশ্রমে বা পরের শ্রমার্জ্জিত অর্থে কেহ জীবন ধারণ করিতে পারিবে না ; কিন্তু এই শ্রমের বদলে সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্র কমিউনিজমের আদর্শমত কৃষক ও শ্রমিকদিগকে তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি না যোগাইয়া, তাহার পারিশ্রমিক দিবে এবং এই পারিশ্রমিকের হার সকলের পক্ষে সমান নহে। কাজের গুরুত্ব ও নৈপুণ্য অনুসারে পারিশ্রমিকের হার ধার্য্য হয়। অবশ্য রাশিয়াতেও পুরাপুরি এই নীতি প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই, কমিউনিজম আরও সুদূরপরাহত। সে যাহাই হউক এই মতবাদগুলির বস্তু-তান্ত্রিক দিক আলোচনা করা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে ; শুধু মতবাদগুলির আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা মোটামুটি দেখিলাম এই দুইটি মতবাদ মূলতঃ প্রায় একই—ব্যক্তিগত সম্পত্তি উভয়েই অস্বীকার করে। উভয় মতবাদের পার্থক্য শুধু এই যে, কমিউনিজম শ্রেণী-সংঘর্ষ প্রচারের সঙ্গে রক্তাক্ত বিপ্লবের সমর্থক, কিন্তু সোশ্যালিজম নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা নিজ দলের পরিচালনাধীনে আনার পক্ষপাতী। কার্ল মার্ক্স স্বপ্নবিলাসীর সোশ্যালিজমের পরিবর্ত্তে ইহাকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম কমিউনিজম মতবাদের প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গ রাশিয়ায় কমিউনিজম দূরে থাক পুরাপুরি সোশ্যালিজমও প্রবর্ত্তন করিতে পারে নাই ; তবুও রাশিয়া যে গতিতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-সম্পদে এবং সামরিক

শক্তিতে এই নূতন মতবাদের অনুপ্রেরণায় আগাইয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া সমগ্র বিশ্ব আজ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

ঠিক এমনি বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ফ্যাসিষ্ট ইটালী। ফ্যাসিজম সাধারণতঃ কমিউনিজমের ঘোর বিরোধী মতবাদ বলিয়াই পরিগণিত। প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিষ্ট দলের সৃষ্টি সোশ্যালিষ্ট দলের একটা শাখা হইতে। মুসোলিনী প্রমুখ কয়েকজনের কড়া সোশ্যালিজম বা কমিউনিজম পুরাপুরি পছন্দ না হওয়ায় তাঁহারাই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রথম ফ্যাসিষ্ট-দলের সৃষ্টি করেন এবং শক্তি সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মম হস্তে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করেন। সেই প্রথম বিরোধের ফলস্বরূপ আজও কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট-সম্প্রদায় জাতশত্রু রহিয়া গিয়াছে। এই দুই মতবাদের মধ্যে মূলতঃ অনেক বৈষম্যও যেমন আছে তেমনি ঐক্যও আছে। ফ্যাসিষ্ট মতবাদ প্রধানতঃ সিণ্ডিক্যালিজিমের বা সমিতি-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত: এই জন্য ইটালীর বর্ত্তমান রাষ্ট্র কর্পোরেটিভ-ষ্টেট (Corporativo State) নামে অভিহিত হয়। ফ্যাসিজম ধনী-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শ্রমিকদের শোষণ এবং কাহারও বিনাশ্রমে অলসভাবে জীবিকানির্ব্বাহ অনুমোদন করে না, কিন্তু ব্যক্তিগত ধনবাদ স্বীকার করে। এই খানেই কমিউনিজমের সহিত ফ্যাসিজমের মূলগত পার্থক্য। এই অভিনব ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে সিণ্ডিকেট বা সমিতি-সৃষ্টির ফলে। দেশের যে সমস্ত সম্প্রদায় একই ধরণের শ্রমে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত তাহাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব ব্যবসায়-সমিতির অথবা ট্রেড-ইউনিয়নের সভ্য হইতে হয়। এই সভ্য হওয়া বাধ্যতামূলক নহে, কিন্তু এই সব সমিতির সভ্যদের জন্য রাষ্ট্র যে সব বিশেষ সুবিধা দিয়া থাকে, সেইগুলির প্রলোভনে দেশের অধিকাংশ লোকই নিজের নিজের ব্যবসায়-সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। শুধু যে শ্রমিক বা চাকুরে শ্রেণীই সমিতিবদ্ধ তাহা নহে, এক এক শ্রেণীর কারখানার মালিকগণও সমিতিবদ্ধ। দেশের কোনো সম্প্রদায়ই এখন সমিতির বাহিরে থাকিতে চাহে না, এমন কি নাপিত, ধোপা, কুটীর-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী সকলেই এখন নিজের নিজের সমিতির সঙ্গে যুক্ত। মুসোলিনি পূর্ব্বের সার্ব্বজনীন ভোট দিবার প্রথা রহিত করিয়া বিভিন্ন স্বার্থযুক্ত সমিতিদের ভোট দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার ফলে মালিক ও শ্রমিক, ক্রেতা ও ব্যবসায়ী সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ সমানভাবে বজায় রাখিবার সুযোগ পান।

লেনিন।

মুসোলিনী রাষ্ট্র-পরিষদের পূর্ব্ব-গঠন-ব্যবস্থা (rappresentativo) ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ১৯২৮ সালের মধ্যে নিজে অপ্রতিহত ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তগত করেন। পূর্ব্বের শাসন-পরিষদ 'চেম্বার অব ডেপুটী' এখন শক্তিহীন, তাহার পরিবর্ত্তে শাসনক্ষমতা গিয়াছে 'গ্র্যাণ্ড ফ্যাসিষ্ট কাউন্সিলের' হাতে। ইটালীর রাজনৈতিক কর্ণধার প্রকৃতপক্ষে এই গ্র্যাণ্ড ফ্যাসিষ্ট কাউন্সিল ও তাহার 'ডিউস' (নেতা) বেনিটো মুসোলিনি। এখন পূর্ব্বের চেম্বার অব ডেপুটী শুধু পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত। ইহার উপরে আর একটি 'সিনেট' আছে; দেশের শুভানুধ্যায়ী ও বিখ্যাত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া ইহার সভ্য হন, কিন্তু ইহাও কার্য্যকরী-শক্তি শূন্য। গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের শক্তি অপরিসীম, দেশের যাবতীয় শাসন ও আইনঘটিত ব্যাপারে ইহার সম্মতি

প্রয়োজন, এমন কি রাজার উত্তরাধিকারীদের সিংহাসন আরোহণও এই কাউন্সিলের মতসাপেক্ষ, কাজেই রাজার উপরেও ইহার ক্ষমতা।

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মত প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থাও একটি কেন্দ্র হইতে পরিচালিত, গণতান্ত্রিক মতে নহে। ৮৫টি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা গ্র্যাণ্ড ফ্যাসিষ্ট কাউন্সিল মনোনীত করে, ভোটে নির্ব্বাচন হয় না। ইঁহাদের অধীনে স্থানীয় 'পোডেষ্টা' বা মেয়রেরাও কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। ফ্যাসিষ্ট দলের মূলনীতি "শক্তি কেন্দ্র হইতে পরিধিতে ব্যাপ্ত হইবে,পরিধি হইতে কেন্দ্রে নহে,"কাজেই শাসন-পরিষদের সদস্তেরা দেশবাসীদ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া আসেন না; প্রথমে গ্র্যাণ্ড ফ্যাসিষ্ট কাউন্সিল দেশের বিভিন্ন সমিতিদ্বারা নির্ব্বাচিত অনেকগুলি সদস্যদের মধ্যে কতকগুলিকে মনোনীত করে, পরে ঐ নামগুলিকে দেশবাসীর কাছে ভোট দিবার জন্য উপস্থিত করা হয় এবং বর্ত্তমান ফ্যাসিষ্ট-প্রভাবের ফলে দেশের অধিকাংশ লোকই ঐ সকল লোককে সমর্থন করেন। গত নির্ব্বাচনে নব্বই লক্ষ ভোটারের মধ্যে মাত্র ১,৩৬,০০০ জন গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের নির্ব্বাচিত সদস্যদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। বিভিন্ন সমিতি 'চেম্বার অব ডেপুটী'র জন্য এক হাজার সদস্য মনোনীত করে, তাহার মধ্য হইতে গ্র্যাণ্ড ফ্যাসিষ্ট কাউন্সিল চারিশত সদস্য বাছিয়া লন (চেম্বারের আসন চারিশত)। বড় বড় সহরে একটি করিয়া পরামর্শদাতা 'কাউন্সিল' আছে, কিন্তু এগুলিরও কোনো কার্য্যকরী ক্ষমতা নাই; সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্র-মনোনীত মেয়রের উপর ন্যস্ত।

ফ্যাসিষ্ট-নীতি হইল রাশিয়ার মতই—দেশের অর্থকরী উৎপাদন-ব্যবস্থা কেন্দ্র হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবে, কিন্তু রাশিয়ার মত রাষ্ট্র উৎপাদনের ভার নিজে না লইয়া ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদনের ভার দিবে। দেশের বিভিন্ন সমিতিগুলি ক্রমশঃ স্ব স্ব কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয় ও সর্ব্বশেষে দেশের সমস্ত সমিতি মাত্র তেরটি সমিতিতে মিলিত হয়—যথা শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, যানবাহন ইত্যাদি। কোনো ব্যবসা বা শিল্প বিষয়ে নূতন আইন প্রণয়ন বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সেই শিল্প-ব্যবসার সঙ্গে স্বার্থযুক্ত শ্রমিক ও মালিক উভয় সমিতিরই মতামত গ্রহণ করা হয় এবং যদি কোনো কারণে তাঁহারা একমত হইতে না পারেন তবে ঐ বিষয়টি সরকারী সালিশী দ্বারা মীমাংসা করা হয়। বর্ত্তমানে শ্রমিক-ধর্ম্মঘট যেমন বে-আইনী, তেমনি অপরপক্ষে মালিকেরা শ্রমিকদিগকে তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না; শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে তাঁহারা বাধ্য হন; অর্থাৎ অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশের মত শ্রমিককে যথাসম্ভব কম দিয়া মালিক ব্যবসার লাভের ষোলো আনা ব্যাঙ্কে জমা দিতে পান না, ঐ লাভের অনেকখানি অংশ শ্রমিকদিগকে দিতে হয় ও তাহাদের উন্নতির জন্য খরচ করিতে হয়, কাজেই শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ ঘটে না। রাষ্ট্র উভয়ের স্বার্থ নিরপেক্ষভাবে দেখায় স্বার্থ-সংঘাত জন্য দেশে বিশৃঙ্খলা বাধিতে পারে না; অন্য দিকে কমিউনিজমে শ্রমিকদলই শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করায় ধনীরা নির্ম্মমভাবে পিষ্ট হয়। ফ্যাসিজমের মূলনীতি, the nation is not to be disowned, but conquered (La naziona non sj nega, si conquista)।

কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য এই যে প্রথমটি ধর্ম্মবিরোধী, দ্বিতীয়টি ধর্ম্মপরিপোষক। ফ্যাসিজমের আবির্ভাবের আগে যখন ইটালী কমিউনিষ্টদের ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময় ধর্ম্মবিরোধী মনোবৃত্তি ইটালীতেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু ফ্যাসিজমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, বিচারালয়ে ও সরকারী কার্য্যালয়-সমূহে আবার ক্রুশচিহ্ন শোভা পাইতে সুরু করিয়াছে। খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রধান গুরু পোপের সঙ্গে এখন ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের সদ্ভাব হইয়াছে।

মূলতঃ কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। এখন দেখা যাক এই দুই আধুনিকতম মতবাদের মিল কোথায় কোথায়।

কমিউনিজমের মত ফ্যাসিজমও তাহার অনুচরবর্গের নিকট হইতে নিয়মানুবর্ত্তিতা, কর্ম্মকুশলতা, সহিষ্ণুতা, নির্ব্বিচারে ব্যক্তিগত সুখসুবিধার, এমন কি প্রাণবিনিময়েও নেতার আদেশপালন দাবী করে। (ফ্যাসিজিমে কথার উৎপত্তিই হইল 'fasces' হইতে। পূর্ব্বে রোম্যান লিকটোরস (lictors) বা শান্তি ও শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধায়কগণ যে নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতীক ব্যবহার করিতেন তাহারই নাম fasces।

কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম উভয় মতবাদই রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত করার পক্ষপাতী ও গণতন্ত্রের বিরোধী। এজন্য উভয় মতবাদই বিরুদ্ধ মতবাদকে নির্ম্মমভাবে দমন করে ও সংবাদপত্র, বক্তৃতা ইত্যাদিতে রাজনৈতিক মতবাদের স্বাধীনতা দেয় না।

কমিউনিষ্ট রাশিয়ার 'সেণ্ট্রাল এক্‌সিকিউটিভ কমিটি' ও ফ্যাসিষ্ট ইটালীর 'গ্র্যাণ্ড ফ্যাসিষ্ট কাউন্সিল' প্রায় একই রকমের প্রতিষ্ঠান; উভয় সমিতিই আইনতঃ রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে পৃথক প্রতিষ্ঠান হইয়াও শক্তিশালী নেতার প্রভাবে রাষ্ট্র-পরিচালন করে। বরং রাশিয়ার সেণ্ট্রাল-কমিটি ইটালীর গ্র্যাণ্ড-কাউন্সিল অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক।

রাশিয়ার কমিউনিষ্ট দল যেমন বর্ত্তমানে অভিজাত-সম্প্রদায়, ইটালীর ফ্যাসিষ্ট দলও তেমনি। উভয় দলের সভ্যসংখ্যা প্রায় একই।

রাশিয়া যেমন কমিউনিষ্ট দলে ভর্ত্তি হইবার আগে দেশের জনসাধারণকে শৈশব হইতে 'অক্টোবর চিলড্রেন,' 'পাইওনিয়ার,' 'ইয়ং কমিউনিষ্ট' প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নিজেদের মতবাদ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিখাইয়া তবে কমিউনিষ্ট দলে গ্রহণ করে, ফ্যাসিষ্ট দলও তেমনি সাত হইতে চৌদ্দবৎসরের বালকদের জন্য 'ব্যালিলা' (balilla) চৌদ্দ হইতে আঠার বয়স্ক কিশোরদের জন্য 'এ্যাভাঙ্গারডিসতি' (avangurdisti) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে যাহারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারে কেবল তাহাদিগকেই ফ্যাসিষ্ট দলের তক্‌মা ও রাইফেল দিয়া 'ফ্যাসিষ্ট' করিয়া লওয়া হয়।

রাশিয়ার সঙ্গে পার্থক্য এই যে, রাশিয়া দেশের নারী-দিগকেও পুরুষের সমান অধিকার দিয়াছে ও নারী এবং পুরুষেরা একই কমিউনিষ্ট দলের সভ্য হইতে পারে; কিন্তু ইটালী নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত একজনও নারী-ফ্যাসিষ্ট নাই।

রাশিয়া যেমন এই সব নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেশে সামরিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতেছে ও আবালবৃদ্ধবনিতাকে সামরিক শিক্ষা দিতেছে, ইটালীও তেমনি দেশকে সামরিক-ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে।

কমিউনিজম মতবাদ প্রথম প্রচারের সময় ইহার মোহে পড়িয়া পৃথিবীর বহুদেশ, অন্ধভাবে, নিজেদের দেশ, কাল ও সমাজ বিবেচনা না করিয়াই এই মতবাদ গ্রহণের চেষ্টা করে, কিন্তু পরে অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসে সেই সমস্ত দেশের অধিকাংশই কমিউনিজমের জাতশত্রু ফ্যাসিজমকে বরণ করিয়াছে। জার্ম্মানী, হাঙ্গেরী, স্পেন প্রভৃতির নাম এ সম্পর্কে করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে হাঙ্গেরী, তুরস্ক, পারস্য, জুগোশ্লাভিয়া, পোলাণ্ড ও জার্ম্মানী প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিষ্ট-

মুসোলিনী।

মতাবলম্বী, যদিও ইহারা কেহই নিজেদিগকে ফ্যাসিষ্ট বলে না। ফ্যাসিষ্ট মতবাদ নির্ব্বিচারে অন্ধভাবে ইহারা গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ফ্যাসিজমের মূলনীতি ইহারা গ্রহণ করিয়াছে। কমিউনিজমের বহু পরে জন্ম লইয়াও ফ্যাসিজম কমিউনিজম অপেক্ষা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যদিও কমিউনিজম মতবাদের স্বপ্নে অনেকে মশগুল, তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে ফ্যাসিজমই সাফল্যলাভ করিয়াছে বেশী।

দুইটি মতবাদই ধনী-সম্প্রদায়ের অন্যায় লুণ্ঠন প্রতিরোধের মনোবৃত্তি হইতে জাত, তথাপি দুইটিই পরস্পরের ঘোর বিরোধী; কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট যেন সাপ ও বেজী।

মীরা
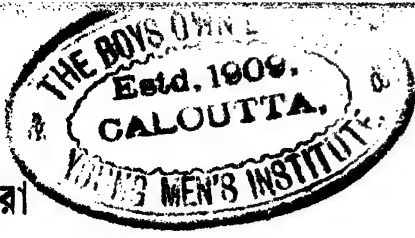
—শ্রীসুরুচিবালা রায়

[৫]

দিন দশেক পরে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। এবারে আর ট্রেনের পথে নয়, গঙ্গার বুকে বজরা ভাসাইয়া সঙ্গে দুই এক জন আমলা কর্ম্মচারী লইয়া, নদীর পারের মহালগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। মহাল পরিদর্শনের সময় এ নয়, এবং প্রত্যেক মহালই যে ভাল করিয়া পরিদর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন তাহাও নয়, কেবল গৃহে ফিরিতে দিনকয়েক বিলম্ব করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য, এবং এই জলপথে যাত্রা শুধু সেই জন্যই। কোথাও বজরা দুই একদিনের জন্য থামে, কোথাও বা ঘন্টা দুইতিনের বেশী থামে না; খবর পাইয়া কাছারীর নায়েব গোমস্তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ভদ্রলোকরা আসিয়া সসম্মানে ঘাটের পাশে দাঁড়ান, জমিদারের সঙ্গে দুই চারিটি কথামাত্র তাঁহাদের হয়, তাঁহাদের সসম্মান নিমন্ত্রণ সসম্মানেই প্রত্যাখান করিয়া, জমিদার আবার অগ্রসর হইতে থাকেন।

সমস্ত চিন্তা এবং সমস্ত কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে, বিদায়কালীন পানুর সেই মুখখানি অহরহ বুকে কাঁটার মত ফুটিতে থাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ছেলে, একটু কাঁদিল না! এই ক'দিনের স্বল্প পরিচয়ের ফলে, পুত্রের সম্বন্ধে তিনি যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দই হইয়াছে। সে যত দুর্দ্দান্ত এবং জঙ্গলীই হৌক না কেন, ছিঁচকাঁদুনে নয়। এই বয়সের ছেলেরা সামান্য কারণেই যেমন কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির করিয়া তোলে, এই ছেলেটি সে রকম নয়, নিতান্ত দেহে ব্যথা না পাইলে, চোখে তাহার জল সহজে আসে না, কাহারও সম্মুখে কাঁদিতে তাহার দারুণ লজ্জা!

পিতার আসিবার দিনে, তাঁহার দেওয়া ব্যাট এবং বলগুলি বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়া সমস্তক্ষণ সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে। মুখখানি গম্ভীর এবং করুণ, ছেলেটিকে বুকে টানিয়া পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, পানু সোনা, তোমার আর কি চাই বলত বাবা!

জ্যাঠামশায়ের দেওয়া ফ্রকপরা বড় একটি ডলি পুতুল বুকে লইয়া, মীরাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল, সে বলিল, আমার মত এরকম একটি ডল পানুদাকে দিন জ্যাঠামশায়, দুজনের বেশ একরকম হবে।

পানু ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, ধ্যোৎ।

—তবে তোমার আর কি চাই বাবা?

ব্যাট-বল ছাড়াও পুরুষোচিত আর কি যে চাহিবার আছে, পানু বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও তাহা ভাবিয়া পাইল না।

মীরার একটি স্বভাব, সে চলিতে ফিরিতে দাঁড়াইতে এবং কথা বলিতে বলিতেও অনবরত কেবল নাচিতেই থাকে, তেমনই ভাবে নাচিতে নাচিতেই সে কহিল, পানুদাকে মা ঘুড়ি আর লাটাই কিনে দেবেন বলেছেন, জ্যাঠামশায়।

—তাই না কি পানু?

পানু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

—পানুদাকে মা কি বলেছেন জানেন জ্যাঠামশায়? মাকে 'মা' বলে ডাকতে বলেছেন, তিনি যে পানুদারও মা হন, বলেছেন।

পিতা শুধু পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

পানু আপনা হইতেই ঘাড় নাড়িল। উচ্ছ্বসিত আনন্দে সুরেন্দ্রনাথ ছেলেমেয়ে দুটিকেই বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, চক্ষু মুদিলেন।

বেশীক্ষণ কাহারো আদরের অত্যাচার মীরার সহ্য হয় না, মুহূর্ত্তকাল পরেই সে জোর করিয়া সরিয়া পড়িল, পানু আরও নিবিড়ভাবে, একেবারে পিতার বুকের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া স্থির হইয়া রহিল।

রওনা হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, যখন চাকর-বাকর, মুটে এবং জিনিষপত্র লইয়া একটা হৈ চৈ ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে, পানুকে তখন কোথাও পাওয়া গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, হোল্ডঅলে বাঁধা বিছানাটার উপর, ব্যাট-বলগুলি বুকের কাছে রাখিয়া পানু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত অসহায়ভাবে মুহূর্ত্তকাল তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া মীরার মা আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

বিদায়ের সময় হইয়া আসিলে পিতা কহিলেন, পান্নু, বাবা এখন আসি তা হলে? ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইতে গিয়া, পান্নু মীরার মার ঘাড়ে মুখ লুকাইল।

ছবির মত এইরূপে একটির পর আর একটি দৃশ্য ব্যথিত পিতার বুকের পটে কেবলই ফুটিয়া উঠে। তবুও ছেলেটি আদরে যত্নে সুখেই থাকিবে, মনে করিতে গিয়া অতর্কিতে আবার কেমন একটা নিশ্বাস আপনি বাহির হইয়া আসে।

দীর্ঘদিন ধরিয়া নানা চিন্তার অবকাশে পত্নীর উপর হইতেও অভিমানটা দূর হইয়া আসিতেছিল।—ব্রীড়াবনতা কিশোরী মেয়েটিকে, প্রথম যখন স্বামী বিবাহ করিয়া গৃহে আনে, তখন তার মনে আশার আনন্দে জড়ানো কত আকাঙ্ক্ষা, কত কামনা! সে কি তখনই তৈরী একটি সংসারে আসিয়া মা হইয়া বসিতে পারে! বৃথা তাহাকে দোষ দেওয়া। নির্ম্মলা মায়ের মতন করিয়া, মা হইতে পারে নাই, সত্য বটে, কিন্তু সাধারণতঃ যেমন শোনা যায়, সপত্নী-পুত্রের অমঙ্গল কামনা করা—তাহাও ত সে কখনও করে নাই। তিনি নিজেই যেখানে পুত্রকে ভুলিয়াছিলেন, সেখানে অন্যের উপর অভিমান করা তাঁহার সাজে কি?

এমনি করিয়া চিন্তার ধারার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেই মনটা গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার না হয় চিন্তা করিবার মত নানা দিক আছে, নানা কথা আছে, কিন্তু ঐ যে সেবাপরায়ণ, একান্ত তাঁহারই প্রতি উন্মুখ নারীটির আর কি আছে!

বজরা এইবারে আর কোথাও না থামিয়া, দ্রুতগতিতে গৃহে ফিরিয়া চলিল।

ফাল্গুনের শেষ, শীতের হাওয়া গায়ে এখন আর তেমন তীব্রভাবে ফোটে না। সন্ধ্যার পর বাহিরে একটা চেয়ার পাতিয়া সুরেন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়া আছেন; গায়ে একটা পাতলা চাদর, পায়ের উপর দিয়া গিয়া নীচে লুটাইয়া পড়িয়াছে। নদীতে বাঁক ঘুরিয়া বজরা এখন আসিয়া সোনামুখীর খালে বাঁধা পড়িয়াছে। একটু দূরে চাকরদের নৌকায় রান্না চড়িয়াছে। খাওয়া-দাওয়ার পর আজই রাত্রে পাল তুলিয়া বজরা আবার খালের বুকে ভাসিয়া চলিবে; সারা রাত পাল তুলিয়া চলিলে গৃহে পৌঁছিতে আর বিলম্ব হইবে না, কাল দ্বিপ্রহরের আগেই গিয়া বাড়ীর ঘাটে বজরা থামিবে।

সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া জলের উপর জ্যোৎস্নার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। ভিতরে একজন কর্ম্মচারী আলো সম্মুখে লইয়া বসিয়া প্রকাণ্ড খাতা খুলিয়া কতকগুলি হিসাব মিলাইতে মিলাইতে মাঝে মাঝে রান্নার নৌকার পানে তাকাইতেছিল। বিকাল বেলা জেলেদের নৌকা ধরিয়া যে বিশালকায় রোহিত মৎস্যটি কেনা হইয়াছে, তাহারই রান্নার সুগন্ধে কাজ আর ভাল লাগিতেছে না।

কুড়ের বাদশা চক্রবর্ত্তী মশাই রান্না চড়াইয়া হুঁকা হাতে লইয়াই এত ব্যস্ত থাকেন যে, চুল্লীর আগুন নিভিয়া গেলেও তাঁহার হুঁস হয় না, রান্না শেষ হইতে যে কত রাত্রি লাগিবে কে জানে!

হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, মল্লিক মশাই, দেখুন ত আলো হাতে কারা যেন এদিকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে না?

পাড়ের দিকে তাকাইয়া মল্লিক কহিলেন, আজ্ঞে এদিকেই ত আসছে বটে। উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিতভাবে সেই দিকেই তাকাইয়া রহিলেন। যাহারা আসিতেছিল, কিছুদূর হইতেই তাহাদের একজন ডাকিয়া বলিল, ওহে মাঝি, কোথাকার নৌকো তোমাদের? ফুলপুরের বাবুর না কি? মাঝিরা হাঁকিয়া কহিল,—আমরা ফুলপুরেই যাচ্ছি কর্ত্তারা, তোমরা কে?

মিনিট দুয়ের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু রমেশ আসিয়া বজরায় উঠিলেন। সুরেন হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করে খবর পেলে রমেশ, আমি ত' চুপ-চাপ আসছি, এত রাত্রে কে খবর দিলে তোমায়?

রমেশ পাশের একটা চেয়ারে বসিয়া অনুযোগ করিয়া কহিলেন, তুমি ত' চুপ-চাপ যাবেই, কবে আর মনে করে একটি খবর নাও? আজ চার পাঁচ দিন থেকে আমিই খোঁজ করছি তোমার; তোমার বাড়ীতে লোক পাঠিয়েছিলুম, শুনলুম তুমি কলকাতায় আছ, সেখানে খোঁজ নিয়ে জানলুম নৌকোয় বেরিয়েছ,—সেই থেকে সন্ধান রাখছি; একটু আগে একটি লোক গিয়ে খবর দিলে, তাইত' খোঁজ পেয়ে এলুম।

—ব্যাপার কি রমেশ ?

—দরকার আছে ভাই, আমার ছেলের উপনয়ন, বাবার ধারণা এইটেই তাঁর শেষ কাজ, এবং সেই জন্যই একটু ধুমধাম করেই কাজটা হচ্ছে,—তারপর একটু হাসিয়া কহিলেন, বলতে গেলে আমারও জীবনে এইটেই প্রথম কাজ, তাই তোমায় না হলে চলবে না ভাই, তোমায় যেতেই হবে, চল দিন দু'তিন থেকে ট্রেণের পথেই বাড়ী যেয়ো, বজরা বিদেয় করে দাও।

সুরেন্দ্র একটু বিব্রত হইয়া কহিলেন। কিন্তু আমার অনেক কাজ রয়েছে ভাই, এখন বাড়ী না ফিরলে যে মুস্কিল হবে।

—মুস্কিল কিছুই নয়, মুস্কিল যা, তা আমি জানি ; আপত্তি না থাকে যদি, কাল ভোরের ট্রেণে সুরেশকে পাঠিয়ে বৌদিকে শুদ্ধ আনিয়ে নিই,—কি বল ?

—সে সম্ভব হবে না ভাই, ছোট মেয়েটির জ্বর দেখে এসেছিলাম, তার আসা সুবিধে হবে না।

—সে ভাবনা তোমার নেই, বাড়ীর সবাই ভালই আছেন খবর পেয়েছি। বৌদি নিজে ডেকে সুরেশকে আদর করে' [illegible]ইয়ে দিলেন। সুরেশ তাঁকে আনবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তুমি বাড়ী নেই বলে এলেন না। যাক, তাঁকে আনার কথা পরে হবে, এখন তুমি চল ত'—রাতও হ'ল। হ্যাঁ রাত ত হ'লই, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধ হয় ?

রমেশ হাসিয়া কহিলেন, এখনই খাওয়া-দাওয়া কি ? বাড়ীতে অনেক লোক ; খাওয়া-দাওয়া একটু বেশী রাতেই হয় আজকাল।

—তা হলে এক কাজ কর রমেশ, খাওয়াটা এখানেই আজ সেরে যাও সবাই, বড় একটি মাছ রেখেছিল, রান্নাও বোধ-করি হয়ে গেল। আজ রাত্রিটা আমি আর যাব না ভাই, নিতান্তই যখন ছাড়বে না কাল ভোরেই যাব'খন।

গভীর রাত্রে শয্যা ছাড়িয়া সুরেন আসিয়া আবার বাহিরে বসিলেন। বাহিরে, চারিদিকে প্রকৃতির কেমন যেন একটি বেদনাময় নীরব শোভা, ঘন পাতায় ঘেরা বড় বড় গাছে ঢাকা পাড়টি আলোছায়ায় রহস্যময় হইয়া আছে। তারই নীচে দিয়া মৃদু স্রোতে, সোনামুখীর রূপালী জল, বজরার গায় ঘা দিয়া দিয়া ছল ছল করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে।—প্রকৃতির এই ভাবটা মনে কেন যে এমন করিয়া ব্যথা জাগায় কে জানে। মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের শুকনো পাতা নীচে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে, তার একটা করুণ শব্দ কানে আসিয়া আঘাত দিয়া যায়—কখনও বা রাত্রি-জাগা স্থানচ্যুত পাখীর এ-গাছ হইতে ও-গাছে, এ-পার হইতে ও-পারে উড়িয়া যাওয়ার একটা শব্দ ও ব্যাকুল একটা ডাক।

নির্ম্মলা মনের ভিতর যত বড় জায়গাই জুড়িয়া থাক না, এমনি এক একটি দিনে সুধাকেই কেবল মনে পড়ে—সুধার চিন্তায় হঠাৎ দেহে মনে কেমন একটা শিহরণ বহিয়া যায়, জীবনের প্রথম জাগরণের দিনে, সুধাই প্রথম আসিয়া তাহার সোনার কাঠিটি ছোঁয়াইয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিল,—যতদিনই যাক, সে স্মৃতি কি ভুলিবার ?

দূরে, বহুদূরে নদীর বুকে ঢেউ তুলিয়া একটা নৌকা চলিয়া গেল, তার অস্পষ্ট আলোর রেখা চোখে পড়িয়া মিলাইয়া যাইতে যাইতে মাঝির তীক্ষ্নস্বরের গানের একটি মাত্র লাইন শোনা গেল,—

সুন্দর কানাইয়া রে আর কত দূর—

ভোরে উঠিয়া স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইতেই রমেশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার মুখে গৃহের সকল সংবাদ লইতে লইতে, বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ে চা পান করিলেন। রাত্রির জাগরণক্লিষ্ট দেহ-মন আগেই শান্ত হইয়াছিল ; সুরেশের মুখে নির্ম্মলার কথা, মেয়েদের কথা শুনিতে শুনিতে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। চা-পানান্তে উভয়ে পাড়ে উঠিলে মৃদু হাসিয়া সুরেন কহিলেন, তোমার দাদা আমায় আটকালে সুরেশ। কিন্তু বাড়ীতে আমার অনেক কাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সুরেশও মৃদু হাসিয়া কহিল, কিছু না দাদা, আজ কাল দুটো দিন থেকে পরশুই ত বাড়ী গিয়ে পৌছুবেন। বজরা বিদেয় করে দিলে ত' ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই বাড়ী গিয়ে পৌছুতেন দাদা, বজরায় পুরো একটা দিন বেশী লেগে যাবে।

—তা হক ভাই, জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করার বড্ড অসুবিধে।

প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের নীচে পণ্ডিতদের বিচারসভা বসিয়াছে। গ্রামের প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা সবাই সেখানে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া পণ্ডিতদের তর্ক-বিতর্ক উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন, সুরেন্দ্রনাথ একপাশে গিয়া বসিলেন। তর্ক হইতেছিল—আত্মা এবং পরমাত্মায় পার্থক্য কি, এই বিষয় লইয়া। রমেশ আসিয়া সুরেন্দ্রনাথের গায়ে হাত দিয়া ডাকিয়া কহিলেন, উঠে এস, এ-তর্ক শুনে কি হবে, এঁরা সবাই বক্তৃতায় জয়লাভ করতেই চান, আসল যা কথা, এ তর্ক শুনে তা পাওয়া যাবে না—তার জন্য মনের আলাদা জ্ঞান আর অনুভূতি চাই। চল আমরা ওদিকে যাই—মার সঙ্গে দেখা করবে না? বাবা ত' এখন এখানে ব্যস্ত, উঠে এসে তপন দেখা ক'র, এস এখন ভিতরে।

এক পাশের কতকগুলি রুদ্ধদ্বার ঘরের ভিতর হইতে গানের শব্দ আসিতেছিল। রমেশ হাসিয়া কহিলেন, পাড়ার ছেলেরা থিয়েটার করবে, তারই রিহার্সাল চলছে, দেখতে ত' এখন দেবে না আমাদের, ওদিকটায় ঘুরে গিয়ে বসলে গান শুনতে পাব, এস,—তারপর রমেশ আবার হাসিয়া কহিলেন, থিয়েটার হবে, 'শ্রীচৈতন্য'। পুরানো যাত্রার বই কতকগুলো খুঁজে খুঁজে সুরেশ কতকগুলো গান বের করেছে, তারপর ঐ পালাটা নিজে তৈরি করে, তার ভেতরে সে গানগুলো সব বসিয়ে দিয়েছে, নেহাৎ মন্দ হয় নি।

ঘরখানির চারপাশে ঘেরাও-করা চওড়া বারান্দাটি ফুলের টবে ভর্তি, একজন চাকর আসিয়া তারই মাঝখানে একটি সতরঞ্চি পাতিয়া দিল। দুই বন্ধু সেখানে বসিয়া মৃদুস্বরে কথা বলিতে বলিতে গান শুনিতে লাগিলেন; পালা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, মন্দিরের পুরোহিত বহুরকমে নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া নানা ভাবের শিক্ষা পাইতে পাইতে, অবশেষে তাঁহার ভেদাভেদ-জ্ঞান এবার দূর হইয়াছে,—চণ্ডালকে আলিঙ্গন দিয়া তিনিই গাহিতেছেন—

> এ্যায়সা প্রেমধন ক্যায়সে মিলে, বলরে চণ্ডাল বন্ধু ভাই,
> হাম আশী লক্ষ জনম ঘুরলেম, এমন প্রেম ত পেলাম নাই,
> যদি চণ্ডাল হলে এ প্রেম মিলে বলরে চণ্ডাল দাদা ভাই,
> আমি মনে প্রাণে ধ্যানে বসিয়ে বসিয়ে, চণ্ডাল জনম মাগিয়ে যাই।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বন্যায় বাংলা দেশ ভাসিয়া যাইতেছে, পরস্পরের অকল্যাণ-অমঙ্গল চোখের জলে ধুইয়া, বুক পাতিয়া দিয়া তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে মানুষের কি আগ্রহ! বিবাদ, বিসম্বাদ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, প্রত্যেকে কেবল পরেরই হিতকামনায় ব্যস্ত—দেশের যখন এই অবস্থা, মন্দিরের পুরোহিত তখন তাঁহার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, যে দেশের ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এক ধর্মে মাতিয়া এক হইয়া গিয়াছে, সে দেশের নরনারীর সংস্পর্শ হইতে মন্দিরের বিগ্রহকে বাঁচাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন, এবং অহোরাত্র যে তীক্ষ্ণ তীব্র অভিশাপ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল, সে অভিশাপ বিদ্ধ হইল তাঁহারই বুকে; তাহার পর আরও নানা ঘটনার ভিতর দিয়া গিয়া নাটকটি শেষ হইয়াছে। এই সময়ে অন্দর হইতে আহ্বান আসিতেই উভয় বন্ধু উঠিয়া গেলেন।

তাহার পর আরও দুইদিন এখানে কাটাইয়া তৃতীয় দিনের দিন উৎসবান্তে, অপরাহ্নেই সুরেন্দ্রনাথের বজরা আবার জলে ভাসিয়া চলিল। গৃহ তাঁহার মনকে এবারে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল, অসীম বিস্তৃত বারিবক্ষের সীমাহীন সৌন্দর্য্য এবারে আর তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিল না

[৬]

চৈত্রের নিস্তব্ধ দুপুর। কলিকাতার কোন এক বড় রাস্তার পাশেই শুভ্র প্রাচীর-ঘেরা বাগানখানির মাঝখানে বিনয়বাবুর প্রাসাদোপম বিশাল বাড়ীখানি প্রখর রৌদ্রতাপে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দ্বিতলের রুদ্ধদ্বার জানালাগুলির পানে তাকাইয়া প্রাণের কোন স্পন্দনই অনুভূত হইতেছে না, চতুষ্পার্শ্বের শুভ্র খরদীপ্তির মাঝখানে দিবাসুপ্ত বাড়ীখানির উপর যেন কোন মায়া-পরী তাহার মায়ার কাঠিটি ছোঁয়াইয়া দিয়া গিয়াছে। রাস্তার পাশের বড় একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের দোদুল ছায়া, বাড়ীখানির উপর একটা রহস্যজাল বুনিয়া চলিয়াছে

এক তলায় বৈঠকখানা-ঘরের এক পাশে বাগানের দিকের একটা জানালা খুলিয়া দিয়া একটি ছোট মেয়ে বসিয়া অঙ্ক কসিতেছে। কপালে তাহার মৃদু মৃদু স্বেদবিন্দু জমিয়া উঠিয়া, মৃদু হাওয়ায় আবার তাহা শুখাইয়া যাইতেছে, এলো চুলগুলি তাহার মাথার চারিপার্শ্বে কপালে ঘাড়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে, অজ্ঞাতে মেয়েটি নিজেই হাত দিয়া সেগুলি সরাইয়া

দিয়া আবার অঙ্ক কসিতেছে—দারুণ গ্রীষ্ম, কিংবা বাহিরের কোন কিছুই, তাহার এই একাগ্রতা ভঙ্গ করিতে পারিতেছে না। রাস্তার ও-পাশে বাগানের কতকগুলি রক্ত-করবীর গাছ; ফুলের ভারে রাস্তার উপরই নত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে দাঁড়াইয়া এক ফিরিওয়ালা 'চুড়ি চাই, চুড়ি চাই'—বারকতক হাঁকিয়া নিরাশ হইয়া গেল, তবুও মেয়েটির ধ্যান ভাঙ্গিল না। সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন এই মেয়েটির যে চুড়ি পরার দরকার হয়, সে নিজের জন্য এবং বন্ধুদের জন্য চুড়ি-ওয়ালার চুড়ি প্রায় উজাড় করিয়া চুড়ি বাছিয়া নেয়, চুড়ি-ওয়ালা তাহা জানে, তাই আজ আশাভঙ্গে দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া চলিল।

ঢং ঢং করিয়া দেওয়ালের ঘড়িটায় তিনটা বাজিয়া গেল, চৌবাচ্চার উপর কলের জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝির বাসন মাজার শব্দ আসিতে লাগিল। চাকরদের ঘরেও জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এখনই চা হইয়া যাইবে। খাবার খাইতে মা এখনই ডাকিবেন, তার আগে আরও একটি অঙ্ক শেষ করিতে হইবে, মীরার হস্ত এবং মন দ্রুত চলিল।

বাগানের এক কোণে, একটি বড়, চারপাশে শাখা-প্রশাখা মেলিয়া বিস্তৃত ঘুঁইগাছকে একটি মাচানের উপর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহারই নীচের ছায়াচ্ছন্ন পরিষ্কার জায়গাটিতে বসিয়া পানু তাহার লাটাই ও সুতায় নিবিষ্টচিত্ত। এমন সময় বৈঠকখানা ঘরের দ্বারপ্রান্ত হইতে একটি সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের সুমিষ্ট আহ্বান আসিল, পানুদা।

পানু একবার সেই দিকে তাকাইয়া, আর একটু ভিতরে ঢুকিয়া বসিল।

—পানুদা, ও পানুদা

বেণী দোলাইতে দোলাইতে মীরা ছুটিয়া আসিয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে কহিল, কই, কোথায়,—ওমা, তুমি এইখেনে পানুদা? বেশ ত'—অঙ্ক কস'নি, কিচ্ছু করনি, তুমি বসে বসে লাটাইয়ে সুতো জড়াচ্ছ?

—বেশ করছি—

—বেশ করছ? আচ্ছা। মাষ্টার মশাই এলে তখন তোমার বেশ করা বেরিয়ে যাবেখন দেখো।

—আচ্ছা আচ্ছা তুমি যাও।

—আমিত যাচ্ছিই, মা তোমায় খাবার খেতে ডাকছেন এস, তখন থেকে সবাই তোমায় খুঁজছে, এস শীগগীর।

পানু মীরার কথার কোন উত্তর না দিয়া ঘুড়ি উড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে দূরে সরিয়া চলিল। মীরা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া কহিল, কি ভূতের মত তোমায় দেখাচ্ছে পানুদা, আরসি দিয়ে একবার দেখবে এস।

পানু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, ভূতের মত দেখাচ্ছে? কে আমায় ওরকম করে দিয়েছে? মাকে বলব না আমি! দেখো তখন, মা তোমাকে কি করেন?

মায়ের কাছে এত বড় একটা নালিশের পর কি শাস্তি যে হইতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র আশঙ্কা প্রকাশ না করিয়া, তেমনই করিয়াই হাসিতে হাসিতে মীরা পানুর আরও কাছে আসিয়া কহিল, রাগ করেছ পানুদা? তা তুমি ওরকম করলে কেন? আমার বইএর ডেস্ক ঘেঁটে সব নষ্ট করে দিলে কেন? তাইতেই ত' আমার রাগ হল, আর রাগ হল বলেই ত' তোমার গালে কালী মাখিয়ে দিলাম।

—তুমি কেন আমার খাতা টেনে নিয়ে দেখে ফেললে? আমার বুঝি তাতে রাগ হয় না?

পানুর কালী-মাখা মুখের অদ্ভুত দৃশ্যের পানে তাকাইয়া মীরা ক্রমাগতই হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতেই কহিল, তুমি অঙ্ক কসছ, না ছবি আঁকছ—দেখবার জন্য খাতা নিয়েছিলাম—কি রকম মজার মত তোমায় দেখাচ্ছে পানুদা, হি হি হি হি।

ত্বরিতে পানু অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, এইবারে এই লাটাইটা দিয়ে এমন মেরে দেব মুখে, তখন আর হাসতে হবে না।

দুই তিন লাফে মীরা খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়া, পানুর মুখের পানে তাকাইতে তাকাইতে পেটে হাত দিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িয়া ক্রমাগতই হাসিতে লাগিল—হি, হি, হি, হি।

পানু তাহার লাটাই-ধরা উদ্যত হাতটি কি ভাবিয়া সম্বরণ করিয়া লইয়া আবার পশ্চাতে ফিরিয়া চলিল, কিন্তু তীক্ষ্ণ শরের মত মীরার তীক্ষ্ণ হাসি তখনো তাহাকে বিঁধিতে বিঁধিতেই চলিল।

বৈঠকখানার বারান্দা হইতে আহ্বান আসিল, পানু, মীরু; মীরা তাকাইয়া দেখিল, মা। মা কাছে আসিয়া কহিলেন, কি হয়েছে, পাগলের মত হয়েছিস কেন? মীরা পানুর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল, মা পানুর কাছে গিয়া দেখিলেন নাকে মুখে কপালে তাহার কালীর অপূর্ব্ব ছাপ।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল, দোতলার সুন্দর সুসজ্জিত একটি ঘরে, চেয়ারে বসিয়া মা মেয়ের একটি লাল সিল্কের ফ্রকে সাদা সুতার ফুল তুলিতেছেন, আর পানু মেঝেয় পাতা কার্পেটের উপর, নতজানু হইয়া বসিয়া মার হাঁটু দুটিতে হাত দুটি রাখিয়া, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কথা কহিতেছে। তাহার সেই 'ভূতের মত' বিচিত্র চেহারা আর নাই, পরণে শুভ্র কোঁচানো পাতলা একটি ধুতির উপর গোলাপী রংএর সিল্কের একটি পাঞ্জাবী, মুখের সেই বিচিত্র কালীর বর্ণ উঠিয়া গিয়া, গৌরবর্ণ মুখখানিতে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা সেলায়ের ফাঁকে ফাঁকে এক একবার তাকাইয়া দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, মা দুর্গার পাশের কার্ত্তিকটি কি এত সুন্দর! এই শিশু বয়স হইতেই কি সুন্দর হইয়াই বাড়িয়া উঠিতেছে—কিন্তু কি হতভাগা! পরের মাকেই মা বলিয়া আদরের কাঙ্গাল, নিজের মা আজ কোথায়!

তাঁহার নিজের মেয়েটি যদিও এখনো ফ্রকই পরে এবং ফ্রকেই তাহাকে মানায় ভাল, কিন্তু সারাদিন ধূলিমাটি মাখার পর, পানুর বৈকালিক সজ্জায় মা এই ধুতি পরার ব্যবস্থাই করিয়াছেন, পানুকে এই বেশে দেখিতে এবং সকলকে দেখাইতে তাঁহার বড় আনন্দ,—বিনয়বাবু এক একদিন হাসিয়া পত্নীকে কহেন, একেবারে যে কার্ত্তিক করেই তুললে গো, বিয়েও যেন ও রকমই না হয় দেখো।

কিন্তু এই দিক দিয়াই বিনয়বাবুর স্ত্রীর একটা ভয়ানক ভাবনা ছিল, পানু পড়ায় কিছুতেই মন বসাইতে পারে না। মাতাপুত্রে এখন সেই কথাই হইতেছিল।

মাতা কহিতেছিলেন, তুমি লেখাপড়া না করলে, লোকে যে আমাকেই নিন্দে করে পানু,—

—আমি লেখাপড়া না করলে লোকে তোমার নিন্দে কেন করবে মা?

মা কহিলেন, বলবে না? লোকে বলবে মা মূর্খ বলেই ত' ছেলেটিও মূর্খ হয়েছে।

মুখখানি একটু বিষণ্ণ করিয়া, পানু মায়ের শাড়ীর উপর কেবলই হাত বুলাইতে লাগিল।

মা পানুর মুখের পানে একবার তাকাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, মাষ্টার মশাই কাল বললেন, পানু কিছু পড়ে না, অঙ্ক করতে দিলে লুকিয়ে বসে ছবি আঁকে, পড়া জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে।

পানু উত্তেজিত হইয়া কহিল, তা না মা, তুমি ত জান না, কি করে ওরা, শুনলে তখন বুঝবে তুমি।

মা বাধা দিয়া কহিলেন, ও কি বলছ? মাষ্টার মশাইকে কি, 'করে' বলতে হয়, 'করেন' বলবে', তুমি কিছু জান না পানু। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পানু আবার আরম্ভ করিল, শোন না মা, আমি যদি অঙ্কের খাতা মাষ্টার মশাইকে দেখাতে যাই, মীরু ঝুঁকে পড়ে সেটা দেখতে থাকে, মাষ্টার মশাই হাসেন, আর খাতাটা মীরুকেই দেখতে দেন। তা ছাড়া, কাল আমার গ্রামারটা একটু ভুল হয়েছিল বলে, মাষ্টার মশাই মীরুকে বললেন—আমাকে কোণে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মীরুকেই সেটা শুধরে দিতে। ওর কাছে আমি কেন পড়ব মা, মীরু কি আমার মাষ্টার?

মা মনে মনে হাসিয়া একটু পরে কহিলেন, আচ্ছা মাষ্টার মশাইকে আমি বলে দেব, কিন্তু তুমিও এবার থেকে পড়তে বসে ফাঁকি দেবে না ত'? মাষ্টার মশায়ের কথা সব শুনবে ত' ঠিক?

মীরুর অপমানজনক ব্যবহারের কথা বলিতে গিয়া পানুর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মাকে সেই দুর্ব্বলতাটুকু দেখাইতে ইচ্ছা নাই, তাই, অত্যন্ত সাবধানে হাতটি তুলিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল, যদিও বহু সাবধানতা সত্ত্বেও, মায়ের চোখে কিছুই এড়াইল না। কিন্তু এসব বিষয়ে সান্ত্বনা দিতে গেলে যে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়, মা তাহা জানিতেন, তাই দেখিয়াও না দেখিবারই ভাণ করিয়া, আপন মনে সেলাই করিতেই লাগিলেন।

নীচে একটা মোটর আসিয়া থামিল, কার মোটর দেখিতে পানু জানালায় গিয়া দাঁড়াইল; মা কহিলেন, যাও পানু, নীচে

গিয়া দুজনে খেলা করগে। যাও, ঝগড়া আর ক'র না, বুঝলে।

পানু ঘাড় নাড়িয়া লাফাইতে লাফাইতে নীচে চলিয়া গেল। সিঁড়িতে বিনয়বাবুর সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি একটু হাসিয়া তাঁহার গালদুটি একটু টিপিয়া দিলেন, পানু হাসিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, শয়নগৃহের সম্মুখে বিস্তীর্ণ খোলা ছাদটিতে, রেলিংএর পাশে চেয়ারে বসিয়া পতি-পত্নী মৃদুস্বরে গল্প করিতেছেন, উপরে আকাশ ভরিয়া তারার মেলা, আর নীচে তাঁহাদের পাশে টবে টবে সাজানো চন্দ্রমার রজতধারায় স্নাত রজনীগন্ধা, বেলী, যুঁই, গোলাপ, হাস্নাহানা। গানের সুরে উভয়েই আকৃষ্ট হইয়া নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, বাগানের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ছুটিয়া যাইতে যাইতে মীরা গাহিতেছে,—

আজকে মোরা খেলব খালি ঘরে যাব না,
গাছের পিছে লুকিয়ে রব, খুঁজতে এলে মা,—

বিনয়বাবু হাসিয়া কহিলেন, মেয়েটার মুখে দিন রাত খালি হাসি আর গান,—কিন্তু, তোমার ছেলেটি কই?

বাগানের এক কোণে আঙুল দেখাইয়া পত্নী কহিলেন, ঐ যে দেখছ না, কতকগুলি চারাগাছ নিয়ে বসে মাটি খুঁড়ছে?

উভয়েই তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, পানু মাটি খুঁড়িতেছে, মীরা গাহিতে গাহিতেই এক ঘটি জল লইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল, এবং পানুর নির্দ্দেশক্রমে সেই মাটিতে জল ঢালিতে লাগিল—কিছু দূরে দাঁড়াইয়া মালীটা হাসিতেছে। উপরে বসিয়া ইঁহারাও হাসিতে লাগিলেন।

পানু কহিল, দেখ মীরু, এর ফুলগুলি কি রকম মস্ত বড় বড় হবে।

—কি করে' পানুদা?

মুখখানাকে পরম বিজ্ঞের মত করিয়া পানু কহিল, দেখছ না, তখন থেকে যে কেবল মাটিই খুঁড়ছি, তারপর কত জল দেওয়া হল।

মীরা হাততালি দিয়া পরম উৎসাহে কহিল, বেশ হবে পানুদা। আমি রোজ রোজ কতকগুলো করে ক্লিপে গুঁজব, আর তুমি পানুদা?

—আমি? আমি বাটন-হোলে, তা ছাড়া মা যদি চাদর গায়ে দিতে দেন আমায়, তাহলে চাদরেও বেঁধে নিতে পারি, ও-বাড়ীর নির্ম্মল দা যে রকম চাদরে ফুল বেঁধে ঘুরে বেড়ান।

মীরা হাসিয়া কহিল, সে ত বেলফুল পানুদা, তুমি কি বোকা।

বোকা বলাতে এবং ভুল বলার জন্য একটু অপ্রস্তুত হইয়া পানুর একটু রাগ হইয়াছিল, কিন্তু মাথা তুলিতেই অদূরে গেটের কাছে হঠাৎ যাঁহাকে চোখে পড়িল, তাঁহাকে দেখিয়া পানুর পূর্ব্বের উৎসাহ এবং বর্ত্তমানের রাগ সমস্তই নিমেষে মিলাইয়া গেল।

মাষ্টার মশাই—বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে মীরা সেদিকে অগ্রসর হইয়া গেল, আর পানু উঠিয়া গিয়া বাগানের কলের জলে হাত ধুইয়া, আস্তে আস্তে পড়িবার ঘরের দিকে চলিল।

মাষ্টার মশাই সেদিন অবাক হইয়া দেখিলেন, দুরন্ত অবাধ্য পানু খাতা লুকাইয়া আজ আর ছবি আঁকিতেছে না, কিন্তু একটি অঙ্ক করিতে না করিতেই মাথা তাহার খাতার উপরেই ঢুলিয়া পড়িল। বারান্দায় একটি ভৃত্য কি কাজে এ-দিক হইতে ও-দিকে যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া, পানুর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য বাহিরে লইয়া তাহার চোখে মুখে জল দিয়া আনিতে বলিলেন। সিক্ত মুখখানি জামার হাতায় মুছিতে মুছিতে পানু আবার আসিয়া বসিল—কিন্তু বৃথা—পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে, খোলা বইএর পাতায় মাথা রাখিয়া পানু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মাষ্টার মশাই ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই হতাশ হইয়া ছিলেন, এখন প্রকাশ্যেই বলিলেন, না এর কিচ্ছু হবে না, জানলে মীরু—তোমার মাকে ব'লো, এর হয় দস্যুবৃত্তি, নয়—

মীরা বইএর উপর হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, জাগিয়ে দেব মাষ্টার মশাই?

মুখ বিকৃত করিয়া মাষ্টার কহিলেন, নাঃ, কি হবে! একে ত' মাথাখানি গোবরে ভর্ত্তি, তায় এখন ঢুকেছে তাতে ঘুম. কি হবে জাগিয়ে? তোমার মাকে ব'লো, বুঝলে? যা বললুম ব'লো।

মীরা চুপ করিয়া রহিল। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে সে হাসে, গল্প করে সত্য, কিন্তু তাঁহার এ রকম ধরণের কথা শুনিলে সে ভয় পায়।

—বাগানে ও কি কচ্ছিল বসে, আসবার সময় দেখছিলুম?

মীরা একটু ভয়ে ভয়ে কহিল, আমরা গাছ পুঁতছিলুম, পান্নুদাই মাটি খুঁড়ছিল।

—হাঁ, ওই বেশ, ও-কাজ ও ভালই পারবে, তোমার মাকে ব'লো, মালী ছাড়িয়ে দিয়ে ওকেই যেন সে কাজে লাগিয়ে দেন, টাকাও বাঁচবে, তাছাড়া পরের ছেলের জন্য, বৃথা অনেক কষ্ট করলেন ত'—

মীরা চুপ করিয়া রহিল।

ছেলেমেয়ের পড়া দেখিতে এবং মষ্টার মশায়কে কোনো কোনো বিষয়ে অনুরোধ করিবার জন্য, বিনয়বাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে, মাষ্টার মশায়ের শেষের দিকের কথাগুলি শুনিয়া সেইখানেই একটু দাঁড়াইলেন এবং গৃহে আর প্রবেশ না করিয়া সেইখান হইতেই ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পরদিনই, যদিও তখন মাসের চব্বিশ পঁচিশ দিন বাকী, পুরো মাসের মাহিনা দিয়া এই মাষ্টারটিকে বিদায় করা হইল। বিদায় করিবার আগে বিনয়বাবুর স্ত্রী বিনয়বাবুকে কহিলেন, ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসে, যে মাষ্টার পড়ানোর চেয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপই বেশী করে, সে মাষ্টারের কাছে পড়লে ছেলেমেয়েরা উল্টে আরো খারাপ হয়ে যায় না? তুমি কি বল?

বিনয়বাবু হাসিয়া কহিলেন, সে তুমি যা ভাল বোঝ, আমি আর কি বলব

—না, সত্যি, তুমিও ভেবে দেখো, আমি অন্যায় করে এঁকে ছাড়াচ্ছি না, ছেলেটি ত অমনোযোগী আছেই, মেয়েটিরও মন এর পর খারাপ হয়ে যাবে।

বেশ।

সুতরাং নতুন মাষ্টার আসিলেন, কিন্তু পান্নুর শিক্ষা পূর্ব্বেও যেমন চলিতেছিল, পরেও তেমনই চলিতে লাগিল। মা ভাবিয়া কোন উপায় বাহির করিতে পারিলেন না।

পরের সন্তান মানুষ করা বড় কষ্ট, বিশেষতঃ যখন সে সমস্ত শাসন এবং যত্ন প্রতিহত করিয়া, উদ্দাম বেগে ঝড়ের মুখে ছুটিতে থাকে। পান্নুর দৌরাত্ম্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইয়াই চলিতেছিল, এবং সে উপদ্রব অসংখ্য প্রকারের; কখনও সে বাগান হইতে রাশীকৃত ফুল আনিয়া, আলমারীতে সজ্জিত ফুলদানীগুলি অসঙ্কোচে এবং অবাধে খুলিয়া ফেলিত। ইতিপূর্ব্বে মীরাও কখনও সেগুলিকে হাত দিতে সাহস পায় নাই,—কিন্তু অতিরিক্ত চঞ্চলতাবশতঃ ফুল সাজানো ত' হইতই না, পরন্তু ফুলদানীগুলি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া যাইত; কখনও টুলের উপর অন্য কোন উচ্চ আসন তুলিয়া দেয়ালের ছবিগুলি পরিষ্কার করিতে উঠিত, এবং কখনও বা আপনি পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিত, কখনও বা ছবিগুলি উল্টাইয়া সশব্দে মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইত। এরূপ ঘটনা প্রায় নিত্যই ঘটিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মীরার হাততালি সহ উচ্চ হাস্যধ্বনিতে তাহার রাগ হইত অনেক বেশী।

মা কখনও শাসন করিতেন, কখনও আদর করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, পান্নু সবই বুঝিত, কিন্তু দুইদিন পরে সমস্তই ভুলিয়া যাইত।

বিনয়বাবু মাঝে মাঝে হাসিয়া, বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন, কি গো, ছেলেটিকে সামলাতে পারছ না কিছুতেই?

দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া মীরার মা চুপ করিয়া থাকিতেন।

বিনয়বাবু কহিতেন, নিজের মেয়েটির জন্য ত' কখনও তোমায় কিচ্ছু ভাবতে হয় নি, কিন্তু পরের ছেলেটিই ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, মা হওয়ার সুখ কি!

এইবারে বিনয়বাবুর স্ত্রী রাগ করিয়া কহিতেন, দেখ, পরের ছেলে বলে নয়, নিজের ছেলে হলেও, এই রকমই হত, ছেলেরা দুরন্ত বেশী হয়েই থাকে। মীরা মেয়ে, সে এত দৌরাত্ম্যপনা শিখতে পারে কখনও? আমার ভাইদের আমি দেখিনি? ওরা যত দুষ্টুমী করত, তার অর্দ্ধেকও আমরা পারতাম না।

বিনয়বাবু হাসিয়া কহিতেন, বেশ, বেশ, তা হলে আর মন খারাপ ক'র না।

যাহা হউক, বহু ঐক্য এবং অনৈক্য, ভাব এবং অভাবের ভিতর দিয়া, এই দুটি কিশোরজীবন ক্রমে বড় হইয়া উঠিল, এবং উভয়েই একদিন সম্মুখে আগত ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

[ক্রমশঃ

আমাদের ব্যাঘ্র-হত্যা

—শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ কাল দেখা যায় মোটরে দেশভ্রমণে যাইলে অথবা কোন জঙ্গলে বা মাঠে ঘাটে আগ্নেয়াস্ত্রের (অবশ্য চীনা পটকা নয়!) ব্যবহার করিলেই (শীকারের অভিপ্রায়ে) মাসিক-পত্রে তাহার বিবরণী প্রকাশ করা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "মহাজনঃ যেন গত স পন্থা"—যখন অনেক মহারথী পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন নগণ্য হইলেও আমার সে পথ হওয়া আশ্চর্য্য নহে; অধিকন্তু যখন আমরা এক যাত্রায় "রথও দেখিয়াছি এবং কলাও বেচিয়াছি", অর্থাৎ দেশভ্রমণ ও শীকার একাধারে সম্পাদন করা গিয়াছে, তখন আমাদের কাহিনীপ্রকাশের ইচ্ছা হওয়া ন্যায়সঙ্গত। সব অগ্রাহ্য হইতে পারে, নজির হটাইবার শক্তি কাহারও নাই। কাজেই আমাদের ব্যাঘ্র-শিকারের চেষ্টা কিরূপে বেচারী ব্যাঘ্রের দারুণ ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইয়াছিল, আজ তাহাই বলিব।

"গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল", আমার যে শিকারী আখ্যা তাহাও তদ্রূপ। কর্ম্মক্ষেত্রে গুটিকয়েক চিতাবাঘ ও কয়েকটি ভল্লুক বধ করিয়া এবং "বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ার" মত একটি বড় বাঘের উপর সাফল্যের সহিত গুলি চালাইবার সুযোগ পাওয়ায় পরিচিত মহলে আমি মস্ত শিকারী। যে সব বন্ধুদের ভাগ্যদোষে শিকা অটুট রহিয়া গিয়াছে, তাঁহারা মনে করেন আমার সাহায্য পাইলে তাঁহারাও এই "দিল্লীকা লাড্ডু" না খাইয়া পস্তানর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুরাদস্তুর শিকারী আখ্যালাভে ধন্য হইবেন,—নচেৎ জীবনই যে বৃথা। বাঘ না মারিলে নাকি শিকারী হওয়া যায় না।

বন্ধুবর "ন"-বাবু, (নাম আর করিব না, তাঁহাকে 'প্রচার' করা ইচ্ছা নহে) বড় জমিদার ও বাঘ-পাগল। মটর-লঞ্চে চড়িয়া চারি বৎসর কাল "সুন্দর বন" তোলপাড় করিয়াছেন; রাঁচি, হাজারিবাগে কঠোর তপস্যার মতই বাঘের আশায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া সকল কষ্টকে সমাদরে বরণ করিয়াছেন, বনের বাঘ কিন্তু এমনই "নেমকহারাম"—তাঁহার এত শ্রম, এত যত্ন, এত অর্থব্যয়, এত কষ্ট সার্থক হইতে দেয় নাই; বনের বাঘ নিশ্চিন্ত মনে বনেই ঘুমাইয়াছে, "ন"-বাবুর হস্তে ব্যাঘ্র-লীলা সম্বরণ করিতে সম্মত হয় নাই। আমারও গত তিন বৎসর-কাল শিকারের নেশা নানা বাধায় "ধামা চাপা" ছিল, হঠাৎ মনে পড়িল, তাইত, বহুদিন শিকার করা হয় নাই, কি জানি যদি শিকারী-তালিকা হইতে চ্যুত হইয়া পড়ি। "ন"- বাবুর সহিত দেখা করিয়া প্রস্তাব করিতেই আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কোথায় যাওয়া যায়? বহু গবেষণার পর স্থির হইল মধ্যপ্রদেশে যাইতে হইবে। শুনা গিয়াছে বাঘ নাকি সেখানে প্রতি ঘাসের আড়ালে লুকাইয়া থাকে। তখন কে জানিত "অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়"; আমাদের ভাগ্যক্রমে সি-পির বাঘের প্রাচুর্য্য, হাজারিবাগের হাজার হাজার বাঘের মতই মায়ায় পরিণত হইবে।

ঝালদার প্রবীণ জমিদার আমাদের যথেষ্ট স্নেহ করেন। শিকারে তিনিই আমার গুরু। আমার শিকারের কৃতিত্ব হইতে যেন আমার গুরুর ধারণা কেহ না করিয়া বসেন। ভাগ্যগুণে বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামা শিকারীর সহিত শিকার-দলে যোগ দিয়া তাঁহাদের শিকার-কুশলতা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে, কিন্তু ঝালদার সিংহ মহাশয়ের মত ধীরতা, সাহস, তৎপরতা ও অব্যর্থ লক্ষ্য আমি দেখি নাই বলিলেই হয়। আমার দশা "গুরুমারা বিদ্যার" মতই হইয়াছে; গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করি সে শক্তি আমার নাই, অথচ কি অযথা তালিম তিনি আমাকে দিয়া থাকেন! যদিও জানি সেটা স্নেহবশে তথাপি আমি তাহারও যোগ্য নহি। শিকার, তাহাতে ব্যাঘ্র শিকার, তাও অজানা স্থানে, ভরসায় কুলাইল না; গুরুর শরণাপন্ন হইলাম; তিনি সঙ্গে থাকিলে আমি "গণ্ডারে না ডরি, তুচ্ছ সে বাঘ"। এক কথাতেই যাইতে সম্মত হই-লেন, তবে বলিলেন, আরও কিছু পরে, এখনও জঙ্গল বড় ঘন আছে, শিকারের সুবিধা হইবে না। তাঁহার উপর কথা কহিতে সাহস হইল না, তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপাততঃ অভিযান স্থগিত রাখা হইল। "ন"-বাবু চুনারে বেড়াইতে

গেলেন এবং যেহেতু আমার জমিদারি নাই, আমি "অন্ন-চিন্তার চমৎকারিত্বে" বিভোর হইয়া পড়িলাম। গত ডিসেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি খবর আসিল যাইবার সময় হইয়াছে, প্রস্তুত হইতে হইবে। সাজ, সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। "ন"-বাবুকে পত্র লিখিলাম, তিনি আসিলেন, যাত্রার সব আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। আমরা কলিকাতা হইতে রওনা হইব ২৯শে জানুয়ারী এবং "নওয়াগড়ে" সিংহ মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া দুইখানি মোটরযোগে প্রথম জব্বলপুর যাওয়া যাইবে। সেখানে পৌঁছিয়া শিকারের স্থান নির্ব্বাচন করা যাইবে। যথা সময়ে নওয়াগড়ে যাইয়া জানা গেল সিংহ মহাশয় জুরী নির্ব্বাচিত হওয়ায় এবং বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অব্যাহতি না পাওয়ায় তাঁহার যাওয়া হইবে না। প্রথমেই এই বাধায় মন বড়ই দমিয়া গেল।

অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে আমরা চারি বন্ধু ("চার ইয়ার" বলিয়া ভ্রম না হয়),—"ন"-বাবু, চারুবাবু, ডাক্তার ও আমি,—"গড়মান্দারণের" ব্যাঘ্রকুলের বিরুদ্ধে অভিযান করিলাম; "যুদ্ধং দেহি" হুঙ্কারে মোটর ছুটিল। পূর্ব্বেই স্থির ছিল কোডারমা হইয়া পাটনার ভিতর দিয়া পুনরায় সাসারামে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরা হইবে; তাহাতে শোণ নদী পারের জন্য ট্রাকের আবশ্যকতা হইবে না, এবং ট্রাকে পার হইতে যে সময় নষ্ট হয় তাহাও হইবে না, আর নূতন রাস্তাও দেখা হইবে। কোডারমা পৌঁছান গেল ঠিক মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়। "ন"-বাবু আমাদের সদাশিব লোক। নিজ ব্যবহারে পরকে আপন করিবার ক্ষমতা তাঁর অদ্বিতীয়। যে একবার তাঁর সংশ্রবে আসিয়াছে সেই মজিয়াছে। পূর্ব্বে কোডারমায় ব্যাঘ্র-বধের চেষ্টার এক পর্ব্ব হইয়া গিয়াছে এবং সেই সময় একটি "মামা" সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাওয়া গেল। অতি অমায়িক ভদ্রলোক, যথেষ্ট আদর-আপ্যায়নের মধ্যে স্নানাহার সমাধা হইল, বেলা ১২টায় আবার রাস্তা ধরিলাম। আমিই চালক, ড্রাইভার লওয়া হয় নাই। আমাদের "খামখেয়ালির" মধ্যে পড়িয়া বেতন-ভোগী সে-বেচারা কেন মারা যায়! "কষ্ট না করিলে কেষ্ট (কৃষ্ণ) নাকি সহজপ্রাপ্য হন না"। যা কিছু কষ্ট সবই সহ্য করার উদ্দেশ্যের ভিতরে হয়ত মনের মধ্যে গোপনে, অন্ততঃ কৃষ্ণের জীব ব্যাঘ্র-লাভের আশা যে উঁকি দিতেছিল না তাহা হলপ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত নহি; কি জানি কিসে যে কি হয় বলা যায় না। স্থির করিলাম এই অভিযানে আমি সারথ্য মাত্র করিব। অস্ত্র ধরিব না; আমার শিকারী নামের মহিমা তাহাতে আরও উজ্জ্বল হইবে। এতই অহঙ্কার, অস্ত্রধারণ করিলে সব বাঘ যেন আমার হাতেই মরিবে, বন্ধুরা শুধু হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবেন! ফল কি হইয়াছিল পরে শুনিবেন।

যাত্রারম্ভ।

কোডারমা হইতে রজৌলী পর্য্যন্ত রাস্তার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। যাঁহাদের সুযোগ আছে একবার ঘুরিয়া আসিবেন। আমি মোটরে প্রায় অর্দ্ধ-ভারত ভ্রমণ করিয়াছি তথাপি এই স্থানটি বড়ই রমণীয় লাগে। একবার দেখিয়া আশ মিটে না; বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ বর্ণের সমন্বয়, এরূপ নয়নানন্দদায়ক দৃশ্যাবলী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। স্বভাবের সৌন্দর্য্য দুই রকম;—এক উজ্জ্বল, যাহা দেখিলে একটা আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু তার প্রভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; আর একরূপ সৌন্দর্য্য স্বর্গীয়, যাহাতে বিস্ময় আসে না, তথাও

নাই, শুধু আনন্দ, শুধু তৃপ্তি, শুধু শান্তি, যার ছাপ আমরণ মনে আঁকা হইয়া যায় এবং বার বার টানিয়া আনিতে চায়, 'ডেবোর-রজৌলী ঘাট' এই শেষোক্ত শ্রেণীর। শোনা আছে শ্রীভগবানের রূপ অনুচ্ছিষ্ট, যে উপলব্ধি করিয়াছে তার আর প্রকাশ করিবার উপায় নাই, এও যেন তাই। কবি হয়ত তাঁর ছন্দে তার রূপ দিবেন, শিল্পী তাঁর তুলিকায় তাহাকে আঁকিয়া তুলিবেন, কিন্তু সে প্রাণ, সে সজীবতা কি আসে! এ রূপও তাঁরই স্বরূপের মত অনুচ্ছিষ্ট, বর্ণনার অতীত। আমি এত দম্ভ রাখি না যে ব্যর্থপ্রয়াস করিব, তাই ছবিও তুলি নাই, বর্ণনার চেষ্টাও করিলাম না।

যথাসময়ে পাটনা পৌঁছান গেল। গাড়ীতে পেট্রোল ভরিয়া লইয়া পুনরায় ছুটিলাম, ইচ্ছা যত আগাইয়া যাইতে পারি। মনের একটি নাতিবৃহৎ গ্রাম, পাটনা হইতে চৌদ্দ মাইল; এখানে মকদুম্ শার কবর একটি দ্রষ্টব্য স্থান। সুন্দর ডাকবাংলো আছে। এখান হইতে আরা "ওয়াটার ওয়ার্কস" পর্য্যন্ত দশ মাইল রাস্তা অত্যন্ত খারাপ, যাইতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিল। কোয়েলওয়ারে রেলের পুলের উপর দিয়া শোণ নদী পার হইলাম। দোতলা পুল, উপরে রেল, নীচে রাস্তা। আরায় পৌঁছিয়া এক দোকানে বসিয়া গরম পুরি-তরকারির সদ্ব্যবহার করিয়া পুনরায় রওনা হইয়া রাত্রি দশটা আন্দাজ সাসারামে আবার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরা হইল। মাঝ-রাস্তার উপর একটি নীলগাই পাওয়া গিয়াছিল। মোটরের তীব্র আলোকপাতে রাস্তার ধারেই তাহাকে আটক করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু বন্দুক সব কেসের মধ্যে বন্ধ। অনর্থক এত বড় একটা প্রাণীবধে কোনও ফল নাই। "ন"-বাবু বলিলেন, "মেরে কি হবে? মারার চেয়ে দেখাই ভাল।" একটা সুপ্ত পুরাতন স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল, আজও চক্ষের উপর ভাসিতেছে। রাঁচী, হাজারিবাগ অঞ্চলে শিকারী মহলে বিজয়বাবুকে চেনে না এমন লোক খুব অল্পই আছেন। এদিকেরও অনেকেই তাঁহাকে জানেন। একবার আমি ও "লাল মোটরের" স্রষ্টা ৺যতীন গাঙ্গুলী ভালুক শিকার দেখিতে "বিজয়দার" সহিত হাজারিবাগের বিয়ুন-গড়ে যাই। অনেক টুঙ্গরি (hillocks) ঠেঙাইয়া ভালুক মিলিল ও বিজয়দা' গুলি করিলেন। আহত ভালুক "চার্জ্জ" করিল, সে কি ভীষণ মূর্ত্তি! রক্তবর্ণ চক্ষু ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, দুই পায়ে ভর করিয়া চীৎকারে বন কাঁপাইয়া আমাদের দিকে ছুটিল, যেন বলিতে চাহে, "ওরে কাপুরুষ, দাঁড়া, একবার হাতের কাছে পাই তবে দূর হইতে ভীরুর মত আঘাত করিবার ফল দেখাইব।" কিন্তু তাহা হইল না, বিজয়দার অব্যর্থ লক্ষ্য পুনরায় তাহার বক্ষভেদ করিল, ভালুক মুখ গুঁজিয়া ভূমিশয্যা লইল। তারপর, বিজয়দার কি কান্না! দরবিগলিত অশ্রুধারায় ভালুকের তর্পণ এবং ছুটিয়া গিয়া মৃত ভালুকের কর্ণে ৺তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন, জীবনে ভুলিব না। যতীন বলিল, "দাদা, যখন এত কষ্ট পান, আপনার পক্ষে মারার চেয়ে দেখাই ভাল।" পরম সাত্ত্বিক দাদা আমার মাছ, মাংস স্পর্শ করেন না, প্রাণীবধে এত যাতনা পাইতেন যে বলিবার নহে, কিন্তু শিকার এমনি সর্ব্বনেশে নেশা, ছাড়িতেও পারিতেন না। শুনিয়াছি আজকাল নাকি বন্দুকে হাত দেন না। আজ কোথায় যতীন, অকালে সে কর্ম্মী মহাপ্রাণ মহাপ্রয়াণ করিয়াছে।

সাসারামে শের শা-র কবর দ্রষ্টব্য। শের নিজের মৃত্যুর পূর্ব্বে মহাবিশ্রামের আশ্রয় তৈয়ার করাইয়া গিয়াছিলেন। জলের মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত হল, যাহার অতি বিশাল গম্বুজ ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের গম্বুজের চেয়ে অনেক বড়। বাহ্যাড়ম্বর নাই, শুধু এক বিরাট 'মর্ম্মর মন্দির'। ভিতরে দাঁড়াইয়া অতি মৃদুস্বরে কথা বলিলেও তার ঘাত-প্রতিঘাতের সুরের রেশ বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। অনেকগুলি কবরের ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে শেরের কবর। উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। উপর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং বিন্ধ্যগিরির নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণী বড়ই মনোরম দেখায়।

সাসারাম হইতে ভাবুয়া রোড, সেখান হইতে চুনার—তারপর মির্জ্জাপুর; আবার সেখানকার ভাসমান সেতুর উপর দিয়া ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া রাত্রে লালগঞ্জের সেচ্-বাংলায় পৌঁছিয়া, সেদিনের মত ক্যাম্প করা গেল।

পরদিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া "চা পার্টি" সমাধানান্তে আবার দৌড়, লেডিস্ ব্যাপলপুর পৌঁছিতেই হইবে। বিখ্যাত ডেকান্ রোড ধরিয়া ক্রমশ বিন্ধ্যগিরির সমীপবর্ত্তী হইলাম এবং মির্জ্জাপুর হইতে ছত্রিশ মাইল দূর Gangetic plain হইতে সরাসর Deccan plateau প্রায় 'এক লক্ষে' উঠা গেল। প্রায় ২০০০ হাজার ফুট উচ্চ মাত্র ৩ মাইল রাস্তায় তুলিয়া

দিয়াছে; রাস্তার অবস্থা খুবই ভাল কিন্তু বড় খাড়াই এবং বাঁক-চরগুলা বড় সূক্ষ্ম ও বিপদাত্মক। উপর হইতে সমতল ভূমির দৃশ্য মনোহর, বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। এইবার রেওয়া ষ্টেটের ভিতর দিয়া গাড়ী ছুটিল। এখানে রাস্তার মালিক রেওয়া ষ্টেট। এই প্রথম "রিয়াসৎ" (state) এবং রাজাকে "শ্রীমান" নামে অভিহিত হইতে শুনিলাম, আরও শুনিলাম আমরা নাকি ইংরাজ রাজের প্রজা হওয়ায় সেখানে বিদেশী, আমাদের লাইসেন্স, ছাড়পত্র ইত্যাদি যাহা কিছু ইংরাজ-শাসিত ভারতবর্ষেই সচল, সেখানে কার্য্যকরী নহে। যাহা হউক তাহার জন্ম আমাদের কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। "খোস্ করতা তো শের্ মারতা"—কিন্তু সচল-অচলের সমস্যা বিশ্লেষণ করিবার "খোস্" বোধ হয় "রিয়াসতের" কখনও হয় নাই।

এক ডাকবাংলায় "রিয়াসতের" এক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহিত ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয়। অনেক কথা হইল, বেশীর ভাগই শিকারের কথা। ভদ্রতা যথেষ্ট পাইলাম, কিন্তু একটু যেন কেমন-কেমন ভাব, একটু পার্থক্যের গণ্ডী কোথায় রহিয়া গেল।

যাক্, তারপর রেওয়া সহরে পৌছিলাম। মনে আশা ছিল না জানি কি দেখিব, কিন্তু সত্য বলিতে গেলে একটু নিরাশ হইলাম। "শ্রীমানের" প্রাসাদ ছাড়া একটি অতি সাধারণ ক্ষুদ্র সহর, সহর না বলিয়া গণ্ডগ্রাম বলিলেও চলে। আমরা পেট্রোল-আদি সংগ্রহে গেলাম, "ন"-বাবু বাঙ্গালীর "ভাতের" চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন। পেট্রোল লইতে লইতে খবর পাইলাম, ভাতের জোগাড় হইয়াছে;—ভাত, ডাল ছ কিসিমকা "শাস্" (তরকারি), গোস্ (মাংস), ফুল্‌কা (রুটি) সব জিনিসই মিলিবে—হোটেল আছে। সদলবলে যাওয়া গেল; "ন"-বাবু আহারে বসিয়া গিয়াছেন, বলিলেন, "মাংসটা ভাল, একটু বেশী করে নেবেন।" "ন"-বাবুকে বিশেষ জানি বলিয়াই সন্দেহ হইল, জানিলাম মাংস আর নাই। আমরা হঠাৎ আসিয়া পড়িব—হোটেলের ম্যানেজারের জানা না থাকায় এই ত্রুটী, তবে এখনই উৎকৃষ্ট আণ্ডার "মামলিট্" বলিতে পারে। তথাস্তু, "মামলিটই" বহুক। ডিম আসিল, এক কামড় দিলাম, দাঁত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বাঁচিয়া গেল আণ্ডার "মামলিটে" একি ভীষণ হাড়? এ কোন্ দেশে আসিলাম! বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আবিষ্কৃত হইল "মাম্‌লিটের" মধ্যে একটি নগদ পয়সা ও তাহাতেই কামড় বসিয়াছে। মহা হাঁকডাক আরম্ভ হওয়ায় ম্যানেজার আসিয় দন্ত বাহির করিয়া বলিলেন, আমারই নাকি জিৎ হইয়াছে; মামলেট পাইয়াছি সঙ্গে একটি পয়সাও পাইলাম,

সমারোহ—উদ্যোগ পর্ব্ব: নীচে বিন্ধ্যগিরি।

যাহার জন্য দয়া করিয়া তিনি "ইক্‌স্ট্রা" (extra) "চারিজ" (charge) করিবেন না। কথায় বলে "ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে", আমাদের "ন"-বাবুও বোধ হয় হাসিয়াছিলেন, তাই মুখে মুখে হিসাব দিয়া ম্যানেজার যখন তাঁহার "চামচ তোড়নেকা" এক সুবৃহৎ "চারিজ" পেশ করিলেন, "ন"-বাবু রাগিয়া আগুন। এক পয়সা দামের একটা ঘাড় বাঁকা টিনের চামচ হাতে করিতেই যাহা খসিয়া গেল, তাহার জন্য "চারিজ" দিতে হইবে শুনিয়া তিনি মহাতর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু ম্যানেজার অটল, সব পারেন "রুল ও কায়দা" ছাড়িতে পারেন না, "চারিজ" দিতেই হইবে। দণ্ড দিয়া বিদায় লইলাম, "ন"-বাবু বলিলেন, "না খাইতে পাইলেও ফিরিবার সময় রেওয়ার নাম মুখে আনা "রুল ও কায়দার খিলাপ" হইবে।

রেওয়া হইতে বাহির হইয়া আর কোথাও দাঁড়ান হইবে না; গাড়ী অনবরত ছুটিয়াছে। ক্রমে সটনা, নাগোদ, অমরপাটন, মাইহার, কাটনী, সিহোরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এবং সন্ধ্যার পরেই জব্বলপুর পৌছিলাম। সেখানে আমার পরম আত্মীয়ের আতিথ্যগ্রহণ করা হইবে স্থির ছিল বাসা খুঁজিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হইল না এবং সদলবলে তাঁহার অতিথি হইলাম। লোকে সাধারণতঃ "জামাই আদরের" কথাই বলে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে অনেক বেশী লাভ হইয়াছিল, তবে কি "শ্বশুর আদর" "জামাই আদরকে" ছাড়াইয়া যায়? বুকে অদম্য উৎসাহ, মনে অতুল আনন্দ, কালই হয়ত দুই-দশটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়া ফেলিব।

পরদিন হইতে নানারূপ শিকারীর আবির্ভাব হইতে লাগিল। মিষ্টার "রব্‌সন্", "ক্রিপার", "ক্লডিয়াস্", "গুসি" "ম্বায়াৎ আলি" (নামগুলি সব কাল্পনিক) ইত্যাদি আসিয়া অযাচিত ও যাচিত নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। আচমকা আলোকই বাঘ পাইবার একমাত্র উপায়, কেহ বলিলেন, জাড়ি পাতিতে (poaching) হইবে; হিতৈষী বন্ধুরও অভাব নাই, তাঁহারা বলিলেন, ওরূপ কর্ম্ম করিবেন না, সন্ধ ধরিয়া "তুড়ুম" ঠোকার ব্যবস্থা করিবে। কেহ বলিলেন, "রিজার্ভ ফরেষ্টের ব্লকে লাইসেন্স লউন"; কোন বিজ্ঞ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বৃথা চেষ্টা, মিলিবে না, যেহেতু আপনারা সি-পি-বাসী নহেন।" "আবাদী" ও "মালগুজার" (আমাদের দেশের জমিদারি ও জমিদার-এর তুল্য) "বোদে" এবং "পাড়া" ও সঙ্গে সঙ্গে "গারা" (মহিষের শাবক, যাহা টোপের মত ব্যবহার হয় ও তার kill) শুনিতে শুনিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিন দিন ধরিয়া খোসামোদ, অনুযোগ, খাতির, "আবাদী ও মালগুজারীতে" ছুটাছুটি করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারা গেল না; "যথা পূর্ব্বম তথা পরম্", মনে বুঝিলাম বহু তপস্যার বল না থাকিলে সি-পি-তে লোকে বাঘ মারিতে পারে না এবং বহু কর্ম্মফলের ভোগ না থাকিলে সি-পি-তে লোকে বাঘ মারিতে আসে না।

মনের দুঃখে নর্ম্মদার জলপ্রপাত ও মর্ম্মরশৈল দেখিতে গেলাম। বেশ আনন্দ হইল; বোটে চড়িয়া মর্ম্মরশৈলমালার মধ্য দিয়া ভ্রমণ বড় তৃপ্তিকর, বিশেষতঃ চাঁদনী রাত্রে। অনেকেই মর্ম্মরশৈলসমূহ দেখিয়াছেন এবং বহু বর্ণনা পড়িয়াছেন, বাহুল্যের ভয়ে বেশী লিখিলাম না; তবে সন্ধ্যার দিকে যে বালু-ঝড় উঠিল তাহার বিষয় জলপ্রপাতের সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা মনে অধিককাল স্থায়ী হইবে। কি সে ধূলার ঘটা, সি-পির ধূলা যিনি না দেখিয়াছেন তাঁর পক্ষে বুঝা শক্ত হইবে। যে পরিমাণ ধূলা চোখে, মুখে, নাকে এবং উদরে প্রবেশ করিল তাহার ফলে সকলেরই অল্প-বিস্তর সর্দ্দি হইয়া পড়িল।

চতুর্থ দিবসে স্থির করিলাম, নিজেরাই যাহা হয় একটা কিছু করিব আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিব না। সন্ধান লইয়া চুয়াম মাইল দূরে বনবিভাগের কর্ত্তার সহিত তাঁহার ক্যাম্পে সাক্ষাৎ করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাহেব সবেমাত্র গাছে 'তার' টাঙ্গাইয়া 'পাইপ' মুখে 'বেতার' উপভোগের বন্দোবস্ত করিতেছেন, আমি আমার 'আর্জ্জি' লইয়া উপস্থিত হইলাম। সাহেব সহৃদয়, আমাদের দুঃখ বুঝিলেন; বলিলেন স্থান নির্ব্বাচন কর, খালি থাকে পাইবে। মহা বিপদে পড়িলাম, ব্লকের খবর যে কিছুই জানি না। সাহেবের শরণাপন্ন হইলাম, পরদেশী আমরা, যদি দয়া করিয়া উপযুক্ত ব্লক তিনি পছন্দ করিয়া দেন, শুধু বাঘ চাই আর কিছুরই আবশ্যকতা নাই। অনেক কথা হইল। মোটরে যাইব, রাস্তা থাকা চাই, হাঁটিতে নারাজ, জঙ্গলের মধ্যে মোটর চলা চাই, জঙ্গলের ভিতর থাকিবার স্থান থাকা আবশ্যক ইত্যাদি অনেক ন্যায় ও অন্যায় আব্দার করা গেল। সাহেব ম্যাপ ও কাগজপত্র বাহির করিয়া অনেক ভাবিলেন। শেষে বলিলেন,

একটু দূর হইবে। তবে ব্লকটি বড়ই আশাপ্রদ। দূর হউক ক্ষতি নাই, কলিকাতা হইতে জব্বলপুর আসিয়াছি, জব্বলপুরের ভিতর আর কতদূর পাঠাইবে? সাহেব তিলগাঁওয়া শিকার-কেন্দ্রটি ধার্য্য করিলেন। দর্শনী দিয়া তৎক্ষণাৎ 'ছাড়' পাইলাম। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া জব্বলপুর ফিরিলাম। জঙ্গল মিলিয়াছে, এইবার সোনার চাঁদ বাঘ, তুমি কোথায় যাইবে?

আমরা মোটরে যাইব স্থির হইল। রাস্তার অবস্থা অজ্ঞাত, কাজেই বোঝা কমান হইল। পরদিন যথাসময়ে সলাইয়া বাংলায় পৌঁছিলাম এবং বৈকালে আমাদের ব্লক দেখিতে যাওয়া গেল। নাগওয়া, সলাইয়া হইতে তের মাইল, ফরেষ্ট রোড,—পাহাড় ভাঙ্গিয়া, জঙ্গল কাটিয়া নামে মাত্র রাস্তা, তবে মোটর চলে। নাগওয়াতে বন-বিভাগের কুঁড়ে আছে, সেখানে বন-প্রহরী থাকে। ডেপুটী সাহেবের ইচ্ছা আমরা

নর্ম্মদা জলপ্রপাত : জব্বলপুর।

তার পরদিন শিকারী মিষ্টার "র—"র সাহায্য গ্রহণ করা হইল। তাঁহার কার্য্য, ব্যাঘ্র-শিকারে যাহা কিছু প্রয়োজন সব বন্দোবস্ত করা। আর একজনকে সংগ্রহ হইল, সেটি দো কর্ম্মা, একাধারে ভৃত্য ও পাচক, আচ্ছালাল। কাটনি যাত্রা করিলাম সাহেব ও আচ্ছালাল সঙ্গে।

কাটনিতে দত্ত মহাশয় সবিশেষ সাহায্য করিলেন। তাঁহার আন্তরিকতা চিরদিন মনে থাকিবে। শুভক্ষণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং আশা আছে এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হইবে। ডেপুটী-রেঞ্জার আমাদের সঙ্গে লইয়া শিকার-কেন্দ্র পর্য্যন্ত গিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন স্থির হইল। পরদিন প্রাতে যাত্রা করা হইবে, পথে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও রসদপত্র যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে সব সংগ্রহ করা হইল। সাহেব ও আচ্ছালাল মালপত্র লইয়া রেলে "সলাইয়া" ষ্টেশনে যাইবে ও

সেইখানেই ক্যাম্প করি, কারণ নাগওয়া ঠিক ব্লকের মধ্যস্থলে, সেখান হইতেই শিকারের সুবিধা হইবে। একখানি ঘর ও একটি বারান্দা পাইলাম। "ন"-বাবু জঙ্গলের অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইলেন, সাহেবও বিশেষ ভরসা দিলেন না। ব্লকের নাম শিকারী-মহলে জানা নাই, খবর লইয়া জানা গেল কদাচ কখনও ছোট শিকারের জন্য "রিজার্ভ" হয়, এখানে বাঘ আসিবে কোথা হইতে? শুনিলাম যে কয়বারই শিকারী আসিয়াছে, বাঘ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যু কামনা করে নাই। সবই শুনিলাম, কিন্তু সাহেবের ব্যবহারের সহিত এই জ্ঞানকৃত ধাপ্পাবাজি কিছুতেই খাপ খাইতেছিল না। নিজের মনে কেমন একটা বিশ্বাস ছিল বাঘ নিশ্চয়ই আছে, সাহেব ফাঁকি দেন নাই। সলাইয়া ফিরিয়া আসিলাম, কয়েকদিন আগে ডাকবাংলার মাঠে নাকি গরু মারিয়াছিল। কখনও আশা কখনও নিরাশা, মনের অবস্থা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

খাওয়া-দাওয়া করিয়া শোওয়া গেল। বাঘ যেন সকলের জপমালা হইয়াছে। রাত্রি বারটার সময় একটা কুকুর দারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। "Fall in"—সবাই তটস্থ হইলাম। ডাক্তার টর্চ্চ লইয়া দরজা খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন। হঠাৎ ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "বা—বা—বা", আর কথা বাহির হয় না। বীরের দল দরজায় গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইলাম, টর্চ্চের আলো চালনা করা গেল, তাই ত, প্রকাণ্ড বাঘ, চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলিতেছে, এক একবার মাথা নীচু করিয়া বোধ হয় মৃত কুকুরটিকে ছিঁড়িয়া খাইতেছে। আর দেরী কেন? চলুক গুলি। "ন"-বাবু প্রস্তুত, রাইফেল ছোটে আর কি! এমন সময় সাহেব আসিয়া বলিল, দাঁড়াও দাঁড়াও, ঠিক করিয়া দেখিয়া লওয়া যাক। বারান্দার পাশেই মোটর-গাড়ী ছিল। লাফাইয়া গিয়া বিন্দু-নির্দ্দেশক বাতি জ্বালিয়া ঘুরাইয়া বাঘের উপর দিলাম, কি সর্ব্বনাশ! কপাল-দোষে বিগতজীবন সারমেয়ভক্ষণরত প্রকাণ্ড শার্দ্দুল, বিচালী-ভোজনে তন্ময় এক বৃহৎ বলদে পরিণত হইল। গাড়োয়ান রাত্রে গাড়ী খুলিয়া পাশেই শুইয়া বিশ্রাম করিতেছে এবং একটি বলদ দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্তমনে বিচালী চিবাইতেছে। ভগবান রক্ষাকর্ত্তা, এখনই হয়ত বলদ-বধ বা আরও গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিত। দারুণ অবসাদে সকলে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম; এখন এ নিদারুণ ব্যাঘ্রাতঙ্কের হাত হইতে নিস্তার পাই কিরূপে?

পরদিন নাগওয়ায় ডেরা তুলিয়া লওয়া হইল। এখন প্রথম আবশ্যক "বোদা"। চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল, "বোদা" মিলিল না। কেহ দিতে বা বেচিতে চাহে না। পরদিন নিজেরাই দশ মাইল গেলাম "বোদা" সংগ্রহে। মস্ত বড় বড় কথা শুনিলাম। যাহাকে পুত্রবৎ স্নেহে পালন করিয়া এত বড় ক[illegible] কোন্ প্রাণে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য তাহাকে দিব, গাঁয়ে রুটি বন্ধ করিবে। বাবুজি! ক্ষমা করিবেন, এ কার্য্য পারিব না। যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। একটি ব্যাঘ্র বৎসরে কত গরু, মহিষ নষ্ট করে, যদি মারা পড়ে তাহাতে বরং নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদেরই যথেষ্ট লাভ ইত্যাদি। কিছুতেই কিছু হইল না। বোদার অভাবে বুঝি সব নষ্ট হয়। তারপর সকল যুক্তি সকল তর্কের সার "রৌপ্যচক্রের" শরণ লওয়া গেল। চার টাকার জিনিষের যেই দশ টাকা মূল্য দিতে চাহিলাম, স্নেহ, মমতা, ধর্ম্ম, সমাজের ভয় সব ভাসিয়া গেল। কত চাই? হুড় হুড় করিয়া "বোদা" বাহির হইতে লাগিল। হে টাকা! ধন্য তোমার মহিমা! তোমার নামে ও দর্শনে অসাধ্য সাধন হয়। পরদিন হইতে স্থানে অস্থানে বোদা বাঁধা হইতে লাগিল। দুই দিন কোনও "কিল্" হইল না। সাহেব বলে, জঙ্গলে বাঘ নাই, "ন"-বাবুরও সেই মত। সমস্ত দিন জঙ্গল তাড়াইয়া শিকারের চেষ্টা হইল। কয়েকটি বানর ছাড়া মাচার কাছে কেহ আসিল না।

ডাক্তারের অনেক রকম 'বিটকেলমি', তিনি সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ অনেক জিনিস খান না এবং ছোঁয়া-ছুতের বড় বিচার করেন। সকলে ধরিয়া বসিলাম, ডাক্তার মুরগী না খাইলে বাঘ মরিবে না, তাঁর কিন্তু ধনুকভাঙ্গা পণ, কিছুতেই রাজী হন না, শেষ কিন্তু আচ্ছালাল গোপনে তাঁহার জাতি মারিয়া দিল। পরদিন প্রাতেই খবর আসিল "গারা" (kill) হইয়াছে।

"ন"-বাবু বলিলেন, "বাঘ এখানে নাই; চিতাবাঘের 'কিল্' —কেন কষ্ট করিতে যাইবেন? শুনিলাম না, সাহেব, আমি ও চারুবাবু ছুটিলাম। সাহেব "গারা" দেখিয়াই বলিল, "panther kill." মাচা বাঁধিয়া বৈকাল চারটার সময় বসা হইল, সাড়ে পাঁচটার সময় kill-এর নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চিতা বাঘ মরিল। যাক্, তবু আশার অর্দ্ধেক ফল হইল।

Fire line-এর ধারেই মাচা ছিল। সঙ্গের লোকেরা আড়াই মাইল দূরে গ্রামে গিয়াছে, কথা ছিল বন্দুকের আওয়াজ হইলেই আসিবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হইল, কেহই আসে না, সাহেব তখন তাহাদের খোঁজে গেল, আমরা দুইজনে fire line-এ আসিয়া গল্পগুজব করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইয়া, ঘোর হইয়া আসিল, আমরা চেঁচাইয়া সাহেবকে ডাকিতে লাগিলাম, কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। হঠাৎ দূরে "ফেউ" ডাকিতে আরম্ভ করিল, একটু সতর্ক হইলাম। তার পরই ভীষণ ব্যাঘ্র-গর্জ্জন fire line ধরিয়া দ্রুত আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। প্রথম ফাঁকা আওয়াজ করিব মনে করিলাম, পরে চারুবাবুর পরামর্শমত তাড়াতাড়ি গিয়া পুনরায় মাচায় উঠিয়া বসিলাম। গর্জ্জন ক্রমশঃ অতি নিকটে আসিল এবং ভারি পায়ের নীচে শুষ্ক পত্র ও ডালপালা ভাঙ্গার আওয়াজ হইতে লাগিল। আর দু'তিন মিনিটের মধ্যেই টর্চ্চের আলোয় লক্ষ্য করিতে চেষ্টা

করিব, এমন সময় মহা সোরগোল করিতে করিতে সাহেব গ্রাম হইতে কুড়ি পঁচিশ জন লোক লইয়া পৌছিল, এবং বাঘও নিঃশব্দে বাসায় প্রয়াণ করিল। চারুবাবু ও আমি উভয়েই একটি করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলাম। নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল এটা ঠিক; তবে স্থির হইল জঙ্গলে বাঘ আছে। চিতাবাঘ-কাঁধে ক্যাম্পে ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতে খবর আসিল পুনরায় "গারা" হইয়াছে এবং আগের দিনের দুই শত গজের মধ্যে। আচ্ছালালকে বলা হইল খানা সকাল সকাল তৈয়ার কর, মাচায় বসিতে হইবে। "ন"-বাবু, আমি ও সাহেব যাইব। প্রস্তুত হইয়া ডাকিলাম "আচ্ছালাল"—সঙ্গে সঙ্গে জবাব মিলিল "বাবুজি", "খানা জল্‌দি লাও।" আর কোনও সাড়াশব্দ নাই, বোধ হয় "খানা" আসিতেছে। আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, এ করে কি? গম্ভীর হুঙ্কার ছাড়িয়া আবার ডাকিলাম "আচ্ছালাল"! "বাবুজি!" উত্তর আসিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না, কিন্তু আচ্ছালালের দর্শন নাই। সাহেব আসিয়া জানাইল, এখনও খানা তৈয়ার আরম্ভ পর্য্যন্ত হয় নাই। নিজেই গেলাম আচ্ছালালের সন্ধানে। তিনটি মৃত "ঘুঘু" আমার মুখের সামনে ধরিয়া আচ্ছালাল বলিল, "বাবুজি, গুলেল্‌সে মারা।" সে যেন বলিতে চাহে "মনিবরা (হইলই বা অস্থায়ী) এত বন্দুক, কার্ত্তুস্ লইয়া একটা বাঘ মারিতে পারে না, আর আমি "গুলেল্‌সে" "কাক্‌তা" মারিলাম, বল ত' "গুলেলেই" একটা বাঘ মারিয়া তোমাদের উপহার দিই। তার মিষ্ট "বাবুজি" সম্বোধনই তাহাকে সেদিন রক্ষা করিল, নয়ত আচ্ছালালই খুব সম্ভব শিকার হইয়া পড়িত।

মাচায় গিয়া বসা হইল। বোদা প্রায় সমস্তই ভুক্ত, অবশিষ্ট যাহা ছিল শকুনির দল শেষ করিয়াছে; হাড় মাত্র পড়িয়া আছে। কিছুই আসিল না; বোধ হয় মাচায় শব্দ হওয়ায় ভয়ে কিল্-এর নিকট আসে নাই। স্থির করা গেল, পরদিন প্রাতে ঐ জঙ্গল "বিট্" করা হইবে; সব বন্দোবস্ত করিয়া ক্যাম্পে ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতে দলবলে beat-এ যাওয়া গেল; সারাদিন ধরিয়া জঙ্গল তাড়ান হইল। অন্যান্য জানোয়ার কিছু কিছু বাহির হইল, বাঘ যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনই রহিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবার পথে ময়ূর মারা হইল। "ন"-বাবু বলিলেন, "এইবার বরাত ফিরিল এবং ডাক্তার যদি ময়ূর খান, তবে বাঘ অব্যর্থ মিলিবে।" অনেক সাধ্যসাধনার পর ডাক্তার রাজী হইল। তাঁবুতে ফিরিয়াই শুনিলাম, দেড় মাইল দূরে বেলা চারটার সময় "গারা" হইয়াছে; শুধু মারিয়া জলের ধারে
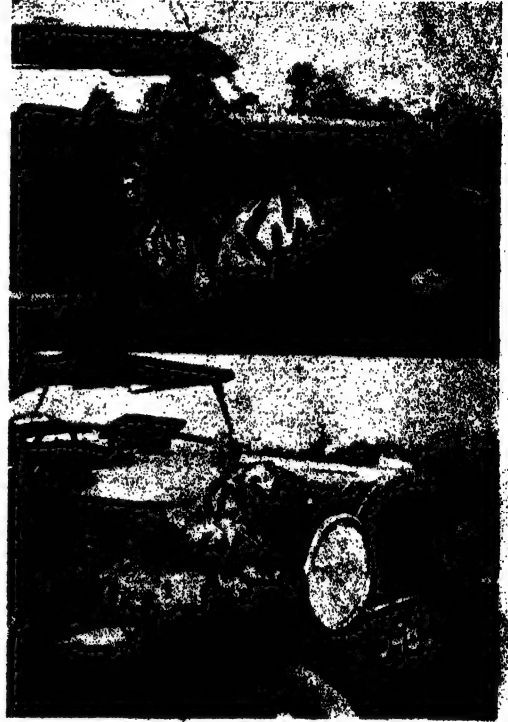
চিরনিদ্রা।

টানিয়া লইয়া গিয়াছে, কিছুই খায় নাই; মাচা প্রস্তুত। "ন"-বাবু বলিলেন, "চিতা! সারাদিন পরিশ্রমের পর সারা-রাত কেন মাচায় কাটাইবেন? কাল সকালে যাহা হয় করা যাইবে।" তাঁর কথা নাকচ করিয়া দিলাম। সুযোগ যখন আসিয়াছে, লইতেই হইবে; ভাগ্য কখন ফলে বলা যায় না। প্রস্তুত হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করা হইল। সন্ধ্যার গাঢ়তা নামিয়া আসিতেছিল, রাত্রে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। মাচার নিকট গিয়া দেখিলাম, একটি আন্দাজ ত্রিশ গজ প্রশস্ত নালা, জল আছে, পাড় খুব উঁচু। এপারে এক গাছে মাচা হইয়াছে, ওপারে, মাচা হইতে আন্দাজ ষাট গজ দূরে শিকার পড়িয়া আছে। শুধু ঘাড় ভাঙ্গিয়া, মারিয়া টানিয়া আনিয়াছে, কিছুই খায় নাই। কিল-এর পাশেই আর একটি শুষ্ক নালা নদীর

দিকে নামিয়া আসিয়াছে। আশে-পাশে বড় বড় ঘাস। সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলিল, "very big tiger, বহুৎ ভারি বাঘ!" আনন্দে (ভয়ে ভাবিবেন না যেন) হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। সত্বর যাইয়া মাচায় বসিলাম

এখানে চিতাবাঘ ও বড় বাঘের থাবার পার্থক্য সম্বন্ধে একটু বলা বোধ হয় অবান্তর হইবে না। চিতা ধরে নীচের দিক হইতে টুঁটি এবং শ্বাস-নলী টিপিয়া বা ছিঁড়িয়া মারে। দাঁতের দাগ ঠিক শ্বাস-নলীর দুই পাশে হয় এবং ছিদ্র অতি অল্প-পরিসর হইয়া থাকে, অঙ্গুলি প্রবেশ করে না। বড় বাঘ উপর দিক হইতে ঘাড়ে ধরে এবং ঠিক jagular vein ছেদ করিয়া দেয়। ঝটকা মারিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলে ও দাঁতের ছিদ্র খুব বড় হয় এবং বাঘের আকারের অনুপাতে দুইটি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ছিদ্রে প্রবেশ করে। একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই চিতা ও বাঘের কিল্-এর তারতম্য ধরা পড়ে।

চুপচাপ বসিয়া সময় আর কাটে না; গভীর জঙ্গলের নীরবতার মধ্যে ক্বচিৎ কোনও ভীত পশুর আর্ত্তস্বর বড়ই কর্কশ শুনাইতেছিল ও হঠাৎ নিকটেই "স্বাম্বর" ডাকিয়া উঠায় সকলেই চমকাইয়া গেল। সাহেব ইসারায় জানাইল, আসিতেছে। সব চুপচাপ, নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত জোরে ফেলিবার উপায় নাই; কিন্তু কই আসে না তো? রাত্রি প্রায় এগারটার সময় হঠাৎ কিল্-এর নিকট হইতে "সোঁ, সোঁ" শব্দে শোষণের আওয়াজ উঠিল। ওই যে বাঘ কিল্-এর উপর! এত নিঃশব্দে আসিয়াছে কেহই জানিতে পারে নাই। ফিস্ ফিস্ করিয়া কানের কাছে সাহেব বলিল, "Wait, let it settle down to feed, সবুর, উহাকে মনঃস্থির করিয়া খাইতে দাও!" কিন্তু "A bird in hand, হাতের পাঁচের নীতি"র অনুসরণে, বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল "গুড়ুম।" তারপর—তারপর খণ্ড প্রলয়ের সূচনা নাকি? বন যেন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং একটা প্রকাণ্ড ভারী জিনিষ গড়াইয়া শুষ্ক নালায় পড়িল। ব্যাঘ্রের ভীষণ হুঙ্কারে বনের সমস্ত পশুপক্ষী এক সঙ্গে চেঁচাইতে আরম্ভ করিল, সে যেন নরক-কাণ্ড, সাহেব বলিল "vitally hit, এখনই মরিবে"। কিন্তু মরে কই? গর্জ্জন সমভাবেই চলিতে লাগিল, এদিকে মাচা হইতে নালার ভিতর কিছুই দেখা যায় না। ওই মাথা তুলিয়াছে, ঘন ঘন বন্দুক গর্জ্জিতে লাগিল, সময় সময় নল গরম হইয়া পড়িল, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপে মহাসমর চলিল। গুলি-বর্ষণের কামাই নাই, গর্জ্জনেরও বিরাম নাই, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। ভোরের হাওয়া গাছের পাতা নাড়াইয়া দিয়া গেল, পূর্ব্বদিক আলোকিত হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে প্রভাত নামিয়া আসিল, উত্তেজনা ও অবসাদে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সাহেব বলিল, "সাবধানে নামিয়া যবনিকাপাত করা ছাড়া উপায় নাই।" কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় টোটার দিকে খেয়াল হইল। মাত্র একটি গুলি ও তিন নম্বর দুইটি ছররার টোটা ছাড়া গুলি-থাপ একেবারে খালি, রাইফেল্ কার্ত্তুজ ত একেবারেই নাই। এইবার গোলা-গুলির অভাবে ঘায়েল বাঘের হাতে আমরাই বা ভবলীলা সাঙ্গ করি! সবে আলো হইয়াছে, একটি গুলি বন্দুকে ভরিয়া বসিয়া থাকা গিয়াছে, এমন সময় বাঘ গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া নদীর জলে পড়িল, একেবারে আমাদের চোখের সামনে, প্রকাণ্ড মাথা জলের উপর তুলিয়া মাচার দিকে চাহিয়া কি ভীষণ তার চীৎকার! সবে ধন "নীলমণি" গুলিটি মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল, ঠিক দুই চোখের মাঝখানে, বাঘ জলের মধ্যে শুইয়া পড়িল, দুইবার কাঁপিয়া উঠিল, তারপর সব স্থির, বাঘ মরিল।

মাচা হইতে নামিয়া পড়িলাম, বাঘের নিকট গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা না বলাই ভাল, অথচ যখন বলিতে বসিয়াছি তখন না বলিলেও নয়। বাঘের ঠিক "ভীষ্মের শরশয্যার" অবস্থা। তফাৎ শুধু শর বিঁধিয়া নাই, তার স্থানে গুলির বড় বড় ছিদ্র। প্রথম গুলি বাঘের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়! খ্যাতনামা শিকারী হইলে "তাহাই আমার লক্ষ্য ছিল" অনায়াসে বলা চলিত কিন্তু আমাদের মত আনাড়ী শিকারীদের সবই 'বরাতগুণে' হয়; মাথা, ঘাড়, হৃদয় লক্ষ্য করিয়াছিলাম বলা শুধু হাস্যাস্পদ হইবার জন্য। ভগ্ন-মেরুদণ্ড বাঘ গড়াইয়া নালায় পড়ে, চতুষ্পদ উর্দ্ধমুখে। বোধ হয় মাঝে মাঝে কর যোড়ে (অর্থাৎ থাবা জুড়িয়া) বিধাতাকে জানাইতে গিয়াছিল "হে দেব! কোন্ পাপে এ হেন লোভী শিকারীর হাতে মৃত্যু দিলে; খাইতে দিল না শুধু গুলিই মারিল"।

অনেক লোক আসিল, বাঘ উঠাইয়া তাঁবুতে আসিলাম। বেচারী বাঘ একেবারে কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রচুর জল আসিল, সাবান আসিল, বেশ করিয়া স্নান করাইয়া পরিষ্কার করা হইল। সাবান মাখিয়া স্নান-কার্য্য জীবনে

তার ঘটে নাই, মরিয়া সে সৌভাগ্য তাহার হইল। দুঃখের কিছুই নাই, অনেকের ভাগ্যেই তাই হয়। স্থির হইল জব্বলপুরে গিয়া বিশেষজ্ঞের দ্বারা ছাল ছাড়ান হইবে। রওনা হইবার ঠিক পূর্ব্বে খবর আসিল, আর একটি ব্যাঘ্র, ইহার চেয়েও বড় (জলের মাছের মত বনের পশুও না মরা পর্য্যন্ত প্রকাণ্ডই হইয়া থাকে) ২ মাইল দূরে বাহির হইয়াছে। "খোদা যব্ দেতা ছপ্পর ফোঁড়কে দেতা" বাক্যের সার্থকতা বেশ বুঝিলাম, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। Bettar Luck next time বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম। কথা হইল শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিব। বাঘ মাপা হইল ১০ ফিট ৬ ইঞ্চি। বাঘের আয়তন হিসাবে বখসিস্ আদি বিতরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ক্যামেরার ফিল্ম ছিল না। কাটনিতে ফিল্ম খরিদ করিয়া রাস্তায় ছবি তুলিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জব্বলপুর পৌছান গেল। বাঘ দেখিতে লোকের কি ভীড়! কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ-অন্ত! "ভাগ্যবান কুকুর", "সৌভাগ্যবান ভিক্ষুক" ইত্যাদি আখ্যা অনেক শুনিতে হইল এবং মাত্র সাত দিনে একটি চিতা এবং একটি আস্ত বাঘ মারা হইয়াছে শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। বোঝা গেল মৃত হইলেও বাঘ এখানে একটা "আজব চিজ" এবং প্রতি ঘাসের আড়ালে বসিয়া থাকে না। পরম আত্মীয়টি বাঘ দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সাধারণতঃ লোকে মুখেই বাঘ মারে, কার্য্যতঃ বাঘ মারার অভিজ্ঞতা বোধ হয় এই তাঁর প্রথম। এক সময় খেয়ালের বশে, অভিধানে ব্যাঘ্র লাভ না হইলে, সার্কাসের বাঘ ধরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি—যাহা ব্যক্তিবিশেষের নিকট দিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার হাত হইতে অব্যাহতিলাভে তাঁর যে কি পরিমাণ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বেশ বোঝা গেল। এখন সমস্যা দাঁড়াইল সেই বিরাট শব লইয়া কি করা যায়। মোটরের পিছনে তার দিয়া বাঁধিয়া টানিয়া এক মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম। আমরা ছিলাম সরকারের খাস তালুকের মধ্যে, প্রাতেই পরম আত্মীয় স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে এক তাগিদ পাইলেন, "Kindly arrange for immediate disposal of the carcass of the tiger killed by your relation—মহাশয়, আপনার আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক নিহত ব্যাঘ্রটির বিরাট শব দেহ স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে বাধিত করুন।" জবাবে তিনি লিখিলেন, "It is being arranged—তথাস্তু, করিতেছি" কিন্তু তাঁহাকে আর বন্দোবস্ত করিতে হইল না। অতি প্রত্যুষ হইতেই কাতারে কাতারে লোক নানারূপ অস্ত্র লইয়া হাজির। ব্যাঘ্রমাংস কাটিয়া সংগ্রহ করিবার জন্য বিষম কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। বাঘের দেশে থাকিয়া, বাঘের মাংস খাইলে বাঘে ধরিবে না এই আশায় কি এই আগ্রহ? শেষে শুনিলাম ঔষধের জন্য সংগ্রহ করিতেছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে সেই বিশাল দেহের সব মাংস অন্তর্হিত হইল। অবশিষ্টাংশ অতি অল্প সময়ে শকুনীর দল পরিষ্কার করিয়া দিল, পড়িয়া রহিল কতকগুলি শুভ্র অস্থিমাত্র। বাঘটির কি গতি লাভ হইল কে জানে!

সূর্য্যের কলঙ্ক

একজন ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসের সহিত সূর্য্যের কলঙ্কবিন্দুর আধিক্য ও অল্পতার তুলনা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, এই সকল বিন্দুর সংখ্যাধিক্য হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাতের আধিক্য হয়, এবং অল্প হইলে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করে।
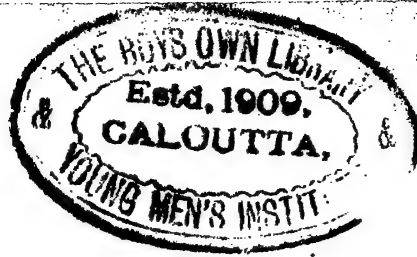
নীল আকাশ

—শ্রীবিমল মিত্র

আমাদের মাথার উপর এই আকাশ—বিষের মত নীল ; সকালের সোনালি আলোয় ইহার অন্য রূপ—সন্ধ্যা-তারার আবির্ভাবে এই আকাশই আবার রহস্যময় হইয়া উঠে, ধূসর গোধূলির বিবর্ণতা কেমন করিয়া সারা আকাশখানিতে ভরিয়া আসে—মন ক্লান্তিতে উদাস হইয়া যায়। যে-আকাশ বর্ষায় মমতাময়ী নারীর মত করুণায় সজল—সেই আকাশ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে পৃথিবীতে যেন আগুন ঢালিয়া দিতে থাকে। একবার মনে হয় ইহাকে যেন চিনি, পরম পরিচিত আত্মীয়ার মত আপনার জন—অথচ আবার যেন দূর বুধগ্রহের মত চির-রহস্যময়! ইহাকে বিশ্বাস নাই—যেমন রক্ষা করিতে পারে, তেমনি করিতে পারে সর্ব্বনাশ। এই আকাশ হইতেই বাজ পড়ে আমাদের মাথার উপর—সে যেমন আকস্মিক তেমনই অস্বাভাবিক···

সেই কথাই বলিতেছি :

রোজ সকালবেলা মটরটা একবার করিয়া গলির ভিতর দিয়া যায়। ঘড়ির কাঁটার মত এতটুকু এদিক-ওদিক হয় না। প্রিয়নাথ আগে হইতেই ঠিক স্থানে প্রস্তুত ছিল ; মটরটা আসিতেই প্রিয়নাথ একেবারে সামনে গিয়া দাঁড়াইল। সামনে দাঁড়াইতেই মটরটা থামিল।

প্রিয়নাথ কাছে গিয়া বলিল, একবার বাড়ীর ভেতর আসবেন ?

আরোহী ডাক্তার রায় বলিলেন, কারুর অসুখ ?

প্রিয়নাথ বলিল, আজ্ঞে অসুখ নয়, তবে—

কথাটা কেমন করিয়া বলিবে তাহা ভাবিয়া উঠিতে না পারিয়া প্রিয়নাথ ঘাবড়াইয়া গেল। বোবার মত তাহার মুখের কথা মুখেই বন্ধ হইয়া রহিল।

অসুখ নয়, অথচ ডাক্তারকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া লইয়া যাইবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে, ডাক্তার রায় বুঝিতে পারিলেন না।

বলিলেন, দরকার বলুন, আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি।

বড় যে ব্যস্ত তাহা প্রিয়নাথ জানিত। ডাক্তার রায়ের তো নাম-ডাকের অভাব নাই। সারা সহর ওই একটি ডাক্তারের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। সেই ডাক্তার রায়ের সময় যে কত অমূল্য তাহা প্রিয়নাথ জানিত বৈকি! জানিত বলিয়াই জিভে তাহার সমস্ত কথা আটকাইয়া গেল। হাতে বেশী সময় থাকিলে ধীরে-সুস্থে প্রিয়নাথ হয়ত সমস্ত বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিত।

ডাক্তার রায় তাহার দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া আছেন ও সোফার ষ্টিয়ারিং-হুইল ধরিয়া আছে। ছাড়িয়া দিবে···

সব ভাবনা একত্রে প্রিয়নাথকে যেন চারিদিক হইতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিল।

সেইখানে সেই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া প্রিয়নাথের মনে হইল যেন সে সব কিছু ভুলিয়া গিয়াছে—তাহার আর কিছু মনে নাই। এক বর্ণ, এক অক্ষরও নয়। বাড়ীর ভিতর হইতে মায়া তাহাকে যাহা কিছু শিখাইয়া পড়াইয়া মুখস্থ করাইয়া দিয়াছিল—ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া যাহা সে বলিবে বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—সব গোলমাল হইয়া গেল।

তাহার দেহ বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে···

মটর যে কখন ষ্টার্ট দিয়া চলিয়া গিয়াছে প্রিয়নাথের সে জ্ঞান নাই।

ঝি আসিয়া ডাকিতে তবে তাহার চৈতন্য হইল। চারিদিকে চাহিয়া প্রিয়নাথ দেখে : মটরের নামগন্ধ কোথাও নাই ; রুক্ষ পাড়াটি চোখের সম্মুখে তেমনি বিবর্ণ বাস্তব রূপ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রিয়নাথ বাড়ী ঢুকিল।

বাড়ীর ভিতর সিঁড়ীর কাছে প্রখর প্রতীক্ষায় মায়া দাঁড়াইয়া ছিল।

প্রিয়নাথ আসিতেই বলিল, কই ? কি বললে ? অতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা হচ্ছিল গো ? চিনতে পারলে তো ? পারবেই তো, তা' বাড়ীর ভেতর নিয়ে আসতে পারলে না ?

প্রিয়নাথ একটা কথারও জবাব দিতে পারিল না। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মায়ার দিকে কেবল চাহিয়া রহিল।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, যা' যা' বলতে বলেছিলাম সব বলেছিলে? শুনে কি বললে?

প্রিয়নাথ বলিল, ভুল হয়ে গেল মায়া।

মায়া আশ্চর্য্য হইয়া গালে হাত দিল, ওমা! অতক্ষণ বোবার মত দাঁড়িয়ে ছিলে না কি?···আমি মনে করছি তুমি কত কথা বলছ! তবু কি কি বললে, শুনি—

প্রিয়নাথ বলিল, আমি বললাম, ভিতরে আসবেন একবার? ডাক্তার জিগ্যেস করলে, কি দরকার? আমি তখন কি বলবো, চুপ্ করে' রইলাম—

মায়া রাগিয়া উঠিল, চুপ করে রইলে কেন? বললে না কেন, আমার স্ত্রী ডাকছে, তারপর বাড়ির ভেতর এলে আমি বুঝতুম। খোকাদা'র সঙ্গে কি আমার আজকের চেনা? এই এতটুকু বেলা থেকে দু'জনে একসঙ্গে খেলা করেছি: একবার বাড়ীর ভেতর নিয়ে এলেই দেখতে ডাক্তার রায় আমায় চেনে কি না—:···না বাপু, সাত জন্মে তোমার মত মুখচোরা মানুষ আমি দেখিনি—তুমি কি?

প্রিয়নাথ চুপ করিয়া রহিল।

মায়া আবার বলিতে লাগিল, আমার যে সেই সোনার মিনে-করা ঝুমকো আছে, দেখনি? সেটা তো ওই খোকা-দা'রই দেওয়া। তখন ওর এত পয়সা ছিল না তো, আমাদেরই বাড়ী খেত, আমাদের বাড়ী থেকে লেখাপড়া করতো, তখন কে জানতো ওই খোকাদা'ই একদিন এত বড় হবে—নাঃ, আচ্ছা লাজুক নিয়ে আমার সংসার—তোমায় দিয়ে কি একটা কাজও—

যা হোক, প্রিয়নাথের অফিস যাইবার সময় হইল।

মায়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গিয়াছে; আজ তাহার কাজ করিতে বিরক্তি নাই। আনন্দের আতিশয্যে হাত হইতে ঘটিটা পড়িয়া গেল; কাপড়টা ফ্যাঁস্ করিয়া খানিকটা ছিঁড়িয়া গেল। ঝিকে অকারণ খানিকটা বকিল, প্রিয়নাথকে রোজ দু'টা করিয়া পান সাজিয়া দিত, আজ ডিবে ভরিয়া গেল এবং প্রিয়নাথকে আফিস হইতে তাড়াতাড়ি ফিরিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিল।

*   *   *

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আজ আর মায়ার কোনও কাজ নাই। অন্যদিন আচারের শিশি, বড়ির হাঁড়ি রৌদ্রে দিবার প্রয়োজন হয়, অন্যদিন সংসারের মধ্যে মায়া জড়াইয়া থাকে—মাকড়সার জালের মত তাহার চিন্তা আর গতিবিধি তাহার ভিতরই আবদ্ধ থাকে—সুদূর অতীতের ফেলিয়া-আসা নীড়ের কথা খাঁচায় বন্ধ পাখীর মত সে ভুলিয়াই গিয়াছিল; নিজের চারিদিকে ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু আয়ু দিয়া মায়া তাহার পরিমিত সাধের স্বপ্ন গড়িয়া তুলিয়াছিল; দৈনন্দিন বিস্মৃতির ধূলি-তলে গত জীবনের সমস্ত স্মৃতি প্রায় অবলুপ্ত হইয়াছিল—তাই নিজের আর প্রিয়নাথের মধ্যে সে সমস্ত পার্থক্য জোর করিয়াই ভুলিয়াই গিয়াছিল—কিন্তু এই দু'একদিন হইল নিজের সুপ্ত চেতনা যেন আবার জাগিয়া উঠিতেছে···

ছোটবেলার একটা ঘটনা মায়ার মনে পড়িল।

তখন মায়ার বিয়ে হয় নাই। তাহাদের বাড়ীর এক-কোণে একটা ছোট ঘরে খোকাদা' শুইত। ঘরটায় এককালে চুণ-সুরকী থাকিত—আরশুলা আর ইঁদুরের রাজ্য; শীতকালের সকালবেলা মায়া ঘরে গিয়া দেখে খোকাদা' লেপ চাপা দিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। টিপি-টিপি পায় ঘরে ঢুকিয়া মায়া খোকাদা'কে একটা মজা দেখাইবে! আস্তে আস্তে লেপটা খুলিতেই মায়া দেখে খোকাদা' নাই—পাশ-বালিশটা লেপ দিয়া ঢাকা রহিয়াছে।···দস্তুর মতন ঠকিয়াছে।

কিন্তু বালিশের তলায়ই ছিল একখানি খাতা—রংচঙে মলাট, বাঁধানো খাতা—

পাতাখানি খুলিয়া মায়া দেখে আগাগোড়া কেবল পদ্য-ভরা। সে-পদ্যের এক অক্ষরও মায়া তখন বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু আশ্চর্য্য—খাতাখানির আষ্টেপৃষ্ঠে 'মায়া'র নাম লেখা! ব্যাপারটা আর কোনও ক্রমেই সরল বলা চলে না। উপেক্ষা করাও যায় না—

খাতাটি লইয়া মায়া চলিয়াই আসিতেছিল—কিন্তু ধরা পড়িল; ধরিল স্বয়ং খোকাদা'—পথ আগলাইয়া বলিল, দেখি, হাত দেখি, কি নিয়েছিস—দেখি—

মায়া বলিল, কিছু না—

—কিছু না, মিথ্যে কথা আবার, আমার কলেজের খাতা নেওয়া হয়েছে, দে, নইলে—জ্যাঠামশাইকে বলে দেবো।

মায়া বলিল—বল গে' না, আমিও বুঝি বলতে জানিনে ?···

—কি বলবি তুই ?

—বলবো কলেজের বই না পড়ে' কেবল পদ্য লেখা হয় বাবুর—আর—আর—বলবো—? খাতাময় আমার নাম লেখা হয়েছে কেন শুনি ? এগ্‌জামিনে বুঝি পড়বে ?··· ছাড়, ছাড়, পথ ছাড়, খাতাতে আমার নাম লেখার ফল দেখাচ্ছি। সকলকে দেখাবো—তবে ছাড়বো—

সত্যসত্যই খাতায় অপরাধজনক অনেক কিছুই লেখা ছিল।

মায়া বলিল, জ্যাঠামশাইকে বলবো—কলেজের খাতায় খোকাদা' লিখেছে 'মায়াকে আমার ভাল লাগে'···আমার নামে কেন লিখবে শুনি ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি ··

কিন্তু খোকাদা' এতটুকু অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নয়। বলিল, কখ্‌খনো নয়, মিথ্যে কথা, মিথ্যের জাহাজ কোথাকার, কই কোথায় লিখেছি, দেখাতে পারিস ?···

কিন্তু মায়া যেমন নিঃসন্দেহে খাতাটি খোকাদা'কে দেখাইতে গিয়াছে, অমনি খোকাদা' হঠাৎ ছোঁ মারিয়া কোথায় যে খাতাটি লুকাইয়া ফেলিল হাজার চেষ্টা করিয়াও মায়া তাহা টের পায় নাই।

সে-সব অনেকদিনের কথা। খোকাদা'র এখনও মনে আছে নিশ্চয়ই। মনে যদি না-ই থাকে, মনে করাইয়া দিলে খুব হাসিবে যা'হোক! ছোটবেলায় খোকাদা'র যা হাসি ছিল! হাসির চোটে ঘর ফাটিয়া যাইত। একবার এখানে আসিলে হয়, খাতার কথাটা তুলিয়া তাহাকে হাসাইবে, বহুদিন পরে মায়া তাহার হাসি শুনিয়া পেট ভরাইবে।

তিনটা বাজিয়া গেল, তবু ঝি আর আসে না।

এই ঝি-ই যে কতবার বদলানো হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই ; যে বাড়ীতে ঝি চাকর নাই তাহারাই সুখী ! কেন বাপু ! মাইনা লইয়া কাজ করিবে, যদি না পোষায় স্পষ্টাস্পষ্টি বলিলেই হয়, জবাব দিই···

শেষ পর্য্যন্ত ঝি আসিল। আসিল সন্ধ্যা করিয়া।

ততক্ষণে মায়াই সব করিতে নামিয়াছে, কাজ করা কোনও কালে অভ্যাস ছিল না ; এই বাড়ীতে আসিয়াই তাহাকে সব শিখিতে হইয়াছে। সে-সব দিনের কথা মনে পড়িলে মায়ার বেশ লাগে। দিগন্তবিসারী মাঠ—আর তাহারই উপর দিয়া বিসর্পিত মেঠোপথ, দু'পাশে বৈঁচি, খেজুর আর আকন্দের ঝাড়। মায়ার চোখে সেই সব দিনের ছবি ভাসিয়া উঠে।

আগের দিন রথের মেলা হইয়া গিয়াছে—নাগরদোলা, মাটির পুতুল আর পাপর ভাজা।

পরের দিন বারোয়ারীতলায় থিয়েটার হইবে। সকাল-বেলাই খোকাদা' ঘুম হইতে উঠিয়া জামা-কাপড়ে সাবান লাগাইতে বসিয়াছে। থিয়েটার আরম্ভ হইবে রাত্রিবেলা। বিকালবেলায় মেয়েদের সাজা-গোজা আরম্ভ হইয়া গেল।

গাড়ী আসিয়া হাজির। খোকাদা' ফরসা জামা-কাপড় পরিয়া খুব হৈ চৈ করিয়া বেড়াইতেছে—কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল।

জ্যাঠামশাই হুকুম দিলেন, খোকাদা'র যাওয়া হইবে না। সকলে চলিয়া গেলে বাড়ী পাহারা দিবে কে ? সুতরাং একজনের থাকা দরকার। সে একজন এই খোকাদা'।

অত হৈ-চৈ, অত অম্বি-তম্বি এক নিমেষে ঠাণ্ডা! জ্যাঠামশায়ের কথার উপর কথা নাই। সে মুখ এখনও মায়ার মনে পড়ে ; কাঁদো-কাঁদো চোখ-মুখের ভাব—কোথায় গেল দুষ্টামি, হাসি, চীৎকার! আর সেই খোকাদা'রই চোখের উপর দিয়া পরিতৃপ্তির, বিজয়গর্ব্বের হাসি হাসিতে হাসিতে মায়া জুতা পায়ে দিয়া মস্ মস্ শব্দ করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

সেদিন তো গেল—কিন্তু পরদিন খোকাদা'র সে কি অভিমান!

সেই যে ঘরে খিল দিয়া পড়িয়া রহিল—সাড়া নাই, শব্দ নাই ; উঠিবে না, কথা কহিবে না—উপরন্তু ভাতও খাইবে না। অমন রাগ কখনও মায়া দেখে নাই। মা সাধিয়া গেল, জ্যাঠাইমা সাধিয়া গেল, কাকীমা সাধিয়া গেল, তবু উঠিবে না, বেলা বাড়িতেছে—দুপুর গড়াইয়া গেল—সকলে তখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। জ্যাঠামশাই বাড়ী নাই—নহিলে কি যে হইত ঠিক বলা যায় না! শেষে মায়ার যেন কেমন মন কেমন করিতে লাগিল। আর সকলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইয়াছে—কেবল একটি ঘরে এক কোনে একজন উপবাসী পড়িয়া আছে—ভাবিতেই মায়ার কেমন মনে হইল। সে-ও

একবার দরজার বাহির হইতে ডাকিল, খোকাদা' ও খোকাদা'—

আশ্চর্য্য কাণ্ড বৈকি ! হাজার ডাকাডাকিতেও যে লোক সাড়াটি দেয় নাই, মায়ার একটি মাত্র ডাকেই সে উঠিয়া দরজার খিল খুলিয়া দিয়াছে।

তারপর সেই খোকাদা' লক্ষ্মী ছেলেটির মত একটি কথা না বলিয়া খাওয়া-দাওয়া করিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মায়া হাসিয়া বলিয়াছিল, সেই তো খেলে, তবে আগে কেন…?

সেদিন খোকাদা' হঠাৎ যেন বারুদের মত জলিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, কেন খাব আগে ? তুই খেতে বলেছিলি যে খাব ?…তোর একটুও বুঝি মায়া-দয়া নেই—এই যে আমি না খেয়ে—

মায়ার মুখের কথার যে অত মূল্য আছে তা' মায়া কেমন করিয়া জানিবে !

সন্ধ্যাবেলা প্রিয়নাথ আফিস হইতে ফিরিল।

প্রিয়নাথকে সামনের একটা চেয়ারে বসাইয়া মায়া মুখোমুখি বসিল।

বলিল, আমার দিকে চাও দেখি—চাও—ভাল করে'—

প্রিয়নাথ সসঙ্কোচে স্ত্রীর মুখের উপর চোখ রাখিল।

মায়া বলিল, যা' বলি মন দিয়ে শুনে যাও—মুখস্থ করে নাও—

মন দিয়া শুনিবার জন্য এবং মুখস্থ করিবার জন্য প্রিয়নাথ আর একবার স্থির হইয়া বসিল।

মায়া বলিতে লাগিল, কাল যখন খোকাদা' যা'বে গাড়ী করে, তুমি গিয়ে কি বলবে বল তো ?

প্রিয়নাথ খানিকক্ষণ ভাবিল, তারপর বলিল, কি বলবো বলে' দাও—

—বলবে আমার মাথা আর মুণ্ডু !

রাগে আর দুঃখে মায়া বিমর্ষ হইয়া উঠিল।

তারপর হতাশ হইয়া মায়া নিজেই বলিয়া দিল, বলবে যে আমার স্ত্রী আপনাকে ডাকছেন। বুঝলে, বলবে এই কথা। বলতে পারবে তো, না বোবার মত হাঁ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ? আচ্ছা লাজুক নিয়ে আমার সংসার—বল তো এবার কি বলবে ?

প্রিয়নাথ সমস্ত মুখস্থ করিয়া লইল। আর ভুল নয়, এবার ঠিক ঠিক গিয়া বলিতে হইবে। এবার আর লজ্জা নয়…প্রিয়নাথ এবার বুক ফুলাইয়া মাথা উঁচু করিয়া কথা বলিবে !

মায়া ততক্ষণে ঘরটা গুছাইতে লাগিয়া গিয়াছে। যত রাজ্যের ধুলা জমিয়াছে ঘরটিতে, আলমারীর মাথায় সব আসিয়া জড় হইয়াছে; হারিকেনের ভাঙা চিম্‌নি, জুতার খালি বাক্স, বিস্কুটের টিন, ভাঙা তালপাতার পাখা, কিছু আর বাদ নাই। সারা ঘরটিতে যেন নূতন শ্রী ফিরিয়া আসিল। সব পরিষ্কার করিতে করিতে অনেকদিন আগের হারানো একটা সিঁদুর-কৌটাই মিলিয়া গেল। কাল সকালে একজন গণ্যমান্য লোক এ-ঘরে আসিবে—জঞ্জাল দেখিলে ভাবিবে কি !

রান্না করিতে করিতে মায়া ভাবিতেছিল—খোকাদা' যে এত বড় হইবে, তখন কে সে-কথা ভাবিতে পারিয়াছিল ? চাল নাই, চুলো নাই, ময়লা জামা পরিয়া তাহাদেরই বাড়ীর কাজকর্ম্ম দেখিত শুনিত—আর কাজের মধ্যে কাজ, বছর বছর একজামিনে ফেল করিত।

ঝি আসিয়া বলিল, আজ একটু সকাল সকাল যাব মা, ছেলেটার অসুখ দেখে আসছি, ক'দিন হল বড্ড বেড়েছে মা।

মায়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি অসুখ রে ?

কি অসুখ ঝি তাহা জানে না, বলিল—তা' কি জানি মা, কেঁপে জ্বর আসে, আবার ছেড়ে যায়, সে কি কাঁপুনি মা, লেপ কাঁথায় সানায় না—

মায়া বলিল, তা' আগে বলিস নি কেন, কাল সকালে তোর ছেলেকে আনিস দিকিনি, মস্ত বড় ডাক্তার আসবে, দেখিয়ে দেব'খন, একটি পয়সাও তোর লাগবে না—

ঝি চলিয়া গেল।

মায়ার তখন বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সেই সব দিনের কথা !

মহেশপুরের ঘোষ পরিবারের ছোট সরিক ইহারা। আয়োজন, চেষ্টা, কর্ত্তব্যের ত্রুটি নাই, মেয়ে দেখিতে ভাল, লেখাপড়া জানা; এমন মেয়ের জন্য বেশী ভাবিতে হয় না। আত্মীয় কুটুম্ব—চারিদিক হইতে সম্বন্ধ করা হইতেছে; একটি মেয়ের জন্য এতগুলি লোক চিন্তায় পরিশ্রমে কাতর। সেকটা দিন মায়ার বেশ লাগিত, রাত্রে শুইয়া শুইয়া বিবাহের

ভাবনায় কত রকম স্বপ্ন দেখিত ; একটি স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী পুরুষের বাহুবেষ্টনের মাঝে নিজেকে কল্পনা করিয়া লজ্জায় আনন্দে মনে মনে শিহরিয়া ওঠা…সে এক রোমাঞ্চকর অপরূপ ইতিহাস !

সেই সময়ে একবার—ঠিক মনে নাই কবে—ওই খোকাদা'র সঙ্গেই কে বুঝি তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। শুধু কথাই মাত্র ; সে-কথা লইয়া কেহ কোনওদিন মাথাও ঘামায় নাই। কিন্তু কথাটা শুনিয়াছিল দু'জনেই—

আজ মায়ার মনে হইল যদি খোকাদা'র সঙ্গে তাহার বিবাহ হইত ! হয় নাই বটে, কিন্তু যদি হইত, হইতেও তো পারিত ! নীল আকাশের সীমাহীন বিস্তৃতিতে মায়ার এই গোপন সমস্যাটি পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। আকাশ ভরিয়া সমস্ত মানুষের সমস্ত কামনা, বাসনা অসংখ্য তারকায় প্রকট হইয়া আছে ; মানুষের দৃষ্টি-শিখা উহাদের লক্ষ্য করিয়া ঊর্দ্ধ গতিতে জাজ্বল্যমান। কত দীর্ঘনিশ্বাস, কত আর্ত্তনাদ, কত অশ্রু উহাদের ঘেরিয়া নিত্যকার অভিযোগ উত্থাপন করিতেছে, শ্রান্তি নাই, বিরতি নাই, কে কার খোঁজ রাখে ! কোথায় একটি তারা খসিয়া পড়ে—কোথায় একটি তৃণখণ্ড শুকাইয়া যায়, কোথায় একটি দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া যায়—পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার বিবরণ থাকে না। বাহিরে তেমনি উৎসব চলে—হাসি গান আর কথার ফোয়ারা—অন্দর-মহলের এক কোনে মুমূর্ষু প্রাণীর শেষ নিঃশ্বাস নীরবে বাতাসে মিশিয়া যায়।

কাকা বলিয়াছিল—হ্যাঁ, ওই ছেলের সঙ্গে দিচ্ছে বিয়ে,—কেন ? দেশে কি ছেলের অভাব আছে নাকি ? কলকাতায় বাড়ী আছে, সদাগরী আপিসে চাকরী করে, এমন ছেলে চান ? দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, সোনার চাঁদ ছেলে, গুরু-জনের মুখের ওপর মুখ তুলে কথা বলে না…

শেষে কাকারই চেষ্টায় "সোনার চাঁদ" এই প্রিয়নাথের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল।

মটর চড়িয়া বর আসিল। হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড, বাজনা, ধুমধাম সেদিনটা যেন একটা স্বপ্নের মত কাটিয়া গিয়াছে। খোকাদা'র সেদিন কি অমানুষিক পরিশ্রম !

প্রিয়নাথ খাইতে আসিল।

সে নিজেই সঙ্গে করিয়া বসিবার আসন, আর এক গ্লাস জল আনিয়াছে ; মায়াকে মিছামিছি খাটাইতে চায় না।

ভাত বাড়িয়া দিয়া মায়া বলিল, এই দেখ না, একবার শুধু জানলে হয় যে এই আমাদের বাড়ী। তারপর কি রকম রোজ মোটর নিয়ে যাওয়া-আসা করে দেখ না। আর দেখ, তুমি একটু কথা বলতে শেখো দিকিনি, লোকের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় শেখো, লোকে কি ভাবে বল তো ? অত লাজুক আর মুখচোরা হ'লে চলে।

ভাত খাইতে খাইতে স্ত্রীর কথায় প্রিয়নাথের মাথাটা লজ্জায় আরো নীচু হইয়া গেল।

মায়া বলিতে থাকে, ও এমন ছেলে না, এই রান্নাঘরেই হয়ত বসে পড়ে বলবে, ভাত খাব, ও এমন ছটফটে আর এত হাসাতে পারে, এই তো তুমি এত গম্ভীর মানুষ, তোমাকেই কত হাসাবে দেখে নিও—

গল্প করিতে করিতে মায়ার হঠাৎ মনে পড়িল প্রিয়নাথকে মাছের তরকারী দেওয়া হয় নাই।

—ওই দেখ, গল্প করতে করতে ভুলে গেছি, তা' তোমারও তো বলতে হয় ?

ও-দোষ প্রিয়নাথকে কেহ দিতে পারিবে না। কোনও জিনিষ চাহিয়া কোনও দিন প্রিয়নাথ নেয় নাই।

মায়া বলিল, আর খোকাদা' হ'লে এতক্ষণ হাঁড়ি-হেঁসেলে কি আছে দেখে চেয়েচিন্তে কেড়েকুড়ে নিয়ে খেয়ে তবে ছাড়তো !

বিনা আপত্তিতে বিনা অভিযোগে প্রিয়নাথ খাইতে লাগিল। নুন না হইলেও কোনও দিন বলিবে না যে তরকারীতে নুন হয় নাই ; ঝালে গাল পুড়িয়া গেলেও কথাটি বলিবে না যে, ঝাল হইয়াছে খাইতে পারা গেল না—এমনি প্রিয়নাথ !

মায়া বলিল, তোমার ও-জামাটা ছেড়ে ফেলো দিকিনি, আমিই কেচে দেব কাল। বাক্স থেকে জুটো জামা না বের করলে তো আর চলছে না। তোমার তো সেদিকে নজরই নেই—বেশ নির্ব্বিবাদে প'রে যাচ্ছ, যেটি আমি না দেখবো, সেটি তো আর কিছুতেই হবে না। আর খোকাদা' ছোট-বেলা থেকেই ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড় দেখতে পারে না। জামা ছিঁড়লেই লুকিয়ে ফেলে দেবে, তারপর বলবে জামা নেই

কিনে দাও—ছোটবেলা থেকেই চালাক খুব—তোমার মতন মুখচোরা হ'লে আর এত বড় হ'তে পারত না ও—

খাওয়া শেষ হইলে মায়া আলোটা উঁচু করিয়া ধরিল।

বলিল, দেখো, আবার অন্ধকারে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গো-না যেন, তা' হ'লেই চিত্তির, টেবিলের ওপর সুপুরী কাটা আছে নিয়ে শুয়ে পড়ো গে—আমি যাচ্ছি।

হুঁ হাঁ কিছু শব্দ না করিয়া প্রিয়নাথ কলিকাতায় চলিয়া গেল। প্রিয়নাথ যেন পুতুল; সারাটা দিন মায়া ধরিয়া বসাইয়া স্নান করাইয়া খাওয়াইয়া দেয়। মায়া না হইলে প্রিয়নাথের জীবন যেন অচল হইয়া যাইবে।

রান্নাঘর ধুইতে ধুইতে মায়া ভাবিতেছিল—সময় পাইলেই খোকাদা' একবার করিয়া রোজ আসিবে। হয়ত বিকাল বেলাই হুট করিয়া একদিন আসিয়া হাজির; তাহার গা ধোওয়া হয় নাই, কাপড় কাচা হয় নাই! বলিয়া বসিবে, চল মায়া ঘুরে আসি—

জ্বালাতন আর কি!

খোকাদা'র সঙ্গে বড় বড় জায়গায়, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশিতে হইবে। তখন কি আর এমনি করিয়া এই বাড়ীতে থাকিলে চলিবে? খরচও কিছু বাড়িবে—তা' বাড়ুক, খোকাদা'কে বলিয়া ওঁর একটা ভাল আফিসে বেশী মাহিনার চাকরী জোগাড় করিয়া লইতে কতক্ষণ? তবে হাঁ। সেই একটা কথা! উনি কি তেমন চটপটে—উনি যদি তেমন হইতেন তবে আর তাহার ভাবনা কি ছিল!

মায়া চটপট করিয়া কাজ সারিয়া ভাঁড়ারে তালা লাগাইল।

এই সময় হয়ত কাজ সারা হইয়া যাইবে। এই রোয়াকে বসিয়া চাঁদের আলোয় কত গল্প জমিবে। রাত একটা দু'টা বাজিয়া যাইবে—গল্প আর তাহাদের শেষ হইবে না।

ঘরে ঢুকিয়া মায়া বলিল, শুয়েছ নাকি?

মশারির ভিতর হইতে উত্তর আসিল—হুঁ—

—তা শোবে বৈকি! খেয়ে উঠেই শোয়া! খেয়ে উঠেই শুলে কি শরীর ভাল থাকে! একটু নড়ে চড়ে বেড়াতে হয়! তবুও তো সকালে উঠবে দেরী করে, ভোরে উঠে একটু চারদিকে বেড়িয়ে এসো দিকিনি—তোমার ও অম্বল টম্বল কোথায় চলে যাবে—

তারপর খানিক থামিয়া বলিল, হাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, খোকাদা'কেই কাল বলবোখন, অম্বল হ'য়ে বুক জ্বালা করে, না?...বললেই একটা ওষুধ দেবেখন; তা' তুমি তো কিছু মুখ ফুটে বলবে না, মুখচোরা হ'য়ে থাকবে, তুমি যদি কথা বলতে পারবে, তবে আর আমার দুঃখুটা কি!

রাত্রি অনেক হইয়াছে; মায়ার চোখে ঘুম নাই। কত বছর আগেকার এক উড়িয়া-যাওয়া পাখী আজ আবার খাঁচায় ফিরিয়া আসিতেছে; পাখার সাঁই সাঁই শব্দ—আকাশের বুকে কালো অদৃষ্ট অস্ফুট দাগ ফেলিয়া সে হারাপাখী আজ ফিরিয়া আসিবে—বাণীহীন বাতাস যেন তাহারই আগমন-বার্ত্তায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে! টপ টপ করিয়া ছাদের উপর শিশির পড়িতেছে, এই নিঃসঙ্গ পৃথিবী, কেবল দুইটি প্রাণীর কলকাকলীতে জগৎ বাঙ্ময় হইয়া উঠিল।

—চিনতে পার খোকাদা'?...

—কে রে, মায়া?.. তুই এখানে? খুব বড় হ'য়ে গেছিস—চিনতে পারিনি—

পট পরিবর্ত্তন! বহুদিন আগের একটি ঘটনা:

পরীক্ষার দু'দিন বাকী—হঠাৎ কোঁ কোঁ করিয়া কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

খোকাদা' ডাকিল, ও মায়া, কাউকে বলিসনে, বস্, পুকুরে সাঁতার কেটে জ্বর হয়েছে, বড্ড শীত করছে, লেপটা এনে গায়ে চাপা দে তো—

পরীক্ষার আগের দিন প্রত্যেকবারই খোকাদা'র জ্বর আসিত আর পরীক্ষা দিতে হইত না; সেই খোকাদা'ই যে কেমন করিয়া এমন বড় হইয়া গেল, মায়া তাহা ভাবিয়া কিনারা করিতে পারে না!

মায়া আবার ডাকিল, ঘুমুলে নাকি?

প্রিয়নাথ বলিল, হুঁ—

—তা' তো ঘুমুবেই, ঘুমিয়েই তোমার কুলোয় না, এই তো সারাদিন সংসারের ধকল্ সইছি, আমার তো কই ঘুম আসে না? তোমারই কেবল ঘুম আর ঘুম—এত ঘুম যে তোমার কোথা থেকে আসে তা' তো বুঝি না, দু'টো পরামর্শ

করবো এমন লোকও নেই—এমন মানুষের হাতেও পড়েছিলুম···

প্রিয়নাথ বুঝিতে পারিল—মায়া ফুঁপাইতেছে; নিজেরই অজ্ঞাতসারে প্রিয়নাথ একখানা হাত মায়ার মাথার উপর রাখিল—কিন্তু প্রিয়নাথের হাতে কি বিষ আছে কে জানে, এক ধাক্কায় হাতখানিকে দূরে সরাইয়া দিয়া মায়া বিছানার একধারে গিয়া শুইয়া রহিল।

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে কাজ চলে না; বাড়ীর বাহিরে এতটুকু কোনও কাজ করিতে হইলে প্রিয়নাথ ছাড়া গত্যন্তর নাই।

মায়া আবার বলিল, কাল সকালের কি ব্যবস্থা করেছ!

—তুমি বলে' দাও -

—সবই বলবো আমি? তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই—তুমি একটা জোয়ান পুরুষ মানুষ—মেয়ে মানুষে বুদ্ধি দেবে তবেই তুমি কাজ করবে? নাঃ, একটা কাজ যদি তোমায় দিয়ে হয়···

রাগ করিয়া মায়া আর কথা কহিল না। প্রিয়নাথও চুপ করিয়া রহিল।

এখন রাত কত কে জানে! এই মুহূর্ত্তে যদি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া যাইত! এ বাড়ী যেন মায়ার কাছে বিষ! এর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাহার কাছে এখন চক্ষুশূল! কেন? কেন তাহার উপর এই অবিচার? নিজের শ্রেষ্ঠতম আকাঙ্ক্ষা দিয়া মায়া এই সংসারকে সৃষ্টি করিয়াছে—ওই খাট, আলমারী, এমন কি দেয়ালের গায়ে ছোট পেরেকটি পর্য্যন্ত মায়ার কত যত্নের সামগ্রী! একখণ্ড কাঠ সে অনাবশ্যক নষ্ট করে না—এক ফোঁটা কলের জল বিনা কাজে ব্যয় করে না—একটি পয়সা বাজে খরচ সে করে নাই—এই সংসারকে লইয়া সে-ই নিজের পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে; তবু আজ এই রাত্রিবেলা তাহার কি জানি কেন মনে হইল তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নিতান্ত অবান্তর তাহার এই সংসার! এতদিন সে কেবল ভূতের বেগার খাটিয়াছে। তাহার কেহ নাই—যাহার উপর সে নির্ভর করিতে পারে, যাহাকে সে ভালবাসিতে পারে—এমন কেহ নাই! শুধু বিড়ম্বনা;—বাঁচিয়া থাকিয়া—ভালবাসিয়া—সংসার করিয়া।

মায়া আবার ডাকিল, ঘুমুলে নাকি?

বালিশের উপর হইতে উত্তর আসিল, না—

—ওমা, এখনও ঘুমোও নি? শেষে কি একটা অসুখ বিসুখ ঘটাবে নাকি? অসুখ হ'লে সেই তো আমারই ভোগান্তি—ঘুমিয়ে পড়—না বুড়ো বয়েসে তোমায় আবার আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব-

প্রিয়নাথ কথা বলিল না; কেবল মাথাটা আরো নীচু করিয়া লজ্জায় একেবারে বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

মশারির ভিতর কি জানি কেমন করিয়া গোটাকতক মশা ঢুকিয়াছে। আর মশারিরই বা দোষ কি! তালি দিয়া দিয়া কতদিন আর অক্ষত রাখা যায়? একদিক সেলাই করিতে গেলে টান পড়িয়া ওদিকে হাঁ করিয়া উঠে!

কাল খোকাদা'র আসিবার আগে এ-মশারিটা খুলিয়া ফেলিতে হইবে। সে যা ছেলে, আসিয়াই হয়ত বিছানায় গড়াগড়ি দিবে।—এ-ঘর ও-ঘর সব ঘুরিয়া জিনিস-পত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবে। ভাঁড়ারে কোথায় আচার আছে, কোথায় নতুন গুড়ের পাটালী, কোথায় আমসত্ব, কিছু কি আর তাহার জ্বালায় থাকিবে!

এ-পাশ ও-পাশ করিয়া কখন মায়ার চোখে ঘুম জড়াইয়া আসিয়াছে টের পায় নাই। প্রিয়নাথ সন্তর্পণে কাছে আসিয়া দেখিল মৃদুগতিতে মায়ার নিঃশ্বাস পড়িতেছে—জাগিয়া থাকিবার কোনও লক্ষণ নাই—তখন, কেবলমাত্র তখন—মায়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অতি সতর্কতায় প্রিয়নাথ শুইয়া রহিল। এখন আর প্রিয়নাথের লজ্জা কি, এখন তো মায়া ঘুমাইতেছে। অপ্রত্যাশিত আনন্দে প্রিয়নাথ কৃতার্থ হইয়া গেল।

রাত থাকিতে থাকিতে মায়া উঠিয়া পড়িয়াছে। বেলা যেন দেখিতে দেখিতে যায়। সকালবেলা বিশেষ কোন কাজই হয় নাই। এটা নাড়িতেছে—ওটা সরাইতেছে—এই সব! বাক্স হইতে একটা ভাল শাড়ী বাহির করিয়া মায়া পরিয়াছে—পরিয়া বারবার আয়নার সামনে গিয়া দেখিয়াছে, আবার হয়ত পছন্দ হয় নাই বলিয়া অন্য একটা পরিয়াছে।

প্রিয়নাথের আজ আর মাথার ঠিক নাই। বারে বারে যেন সব গোলমাল হইয়া যায়। সকালে উঠিয়া প্রিয়নাথ ভবানীপুর হইতে ভাল দেখিয়া দামী দামী খাবার কিনিয়া আনিয়াছে। নিজে তেমন খাবার প্রিয়নাথ জীবনে স্পর্শ করে নাই। খাবার আনিয়া দিয়া প্রিয়নাথ রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কোন্ ফাঁক দিয়া যে গাড়ী আসিয়া পড়ে, ঠিক নাই তো!

আজ আর ভুল নয়—মায়া যাহা শিখাইয়া পড়াইয়া দিয়াছে তাহা ঠিক ঠিক বলিতে হইবে! এতটুকু ভুল নয় আজ। প্রিয়নাথ কথাগুলি মনে মনে মুখস্থ করিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ যেন প্রিয়নাথের মাথার ভিতর সব ঘুরিতে লাগিল। পৃথিবী ঘুরিতেছে—আকাশ ঘুরিতেছে—প্রিয়নাথ টলিতে টলিতে বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে।—এখুনি যেন শুইয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে।

মায়া দেখিতে পাইয়াই বলিল, একি, চলে এলে যে? ওকি, কি হল তোমার?

মায়ার কথার একটা জবাবও প্রিয়নাথ দিতে পারে না—যেন তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে।

—অসুখ করলো নাকি? মায়া কাছে আসিয়া প্রিয়নাথের কপালে হাত দিল: ওমা, জরই তো হয়েছে—নাও ভোগ এখন, আমাকেও ভোগাও—

তারপর হঠাৎ মুখের কাছে হাত নাড়িয়া রাগিয়া বলিয়া উঠিল, হাঁগো, তোমার জন্য কি আমি পাগল হব—পাগল হ'তে বল আমাকে?···মায়ার কথার সুরে যেন কান্নার আভাসও ছিল একটু!

তবু প্রিয়নাথ এতটুকু প্রতিবাদ করিল না—যেন এ অসুখের জন্য সেই দায়ী। অসুখ হওয়াও যেন তাহার অপরাধ! সত্যিই তো, আজ এই এমন দিনে কেন তাহার অসুখ হয়? অসুখের অপরাধ নাই—কাহারও অপরাধ নাই, অপরাধ তাহার নিজের! প্রিয়নাথ নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল, কেন তাহার অসুখ হয়--কেন অসুখ হয় তাহার?

প্রিয়নাথ টলিতে টলিতে আবার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল!···সামান্য জ্বর হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা তা' বলিয়া করা যায় না।

ভিতরে শেষবারের মত মায়া ঘরখানা দেখিয়া লইতেছিল। কোন ত্রুটি নাই—ঘরের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। তা' খোকাদা' যে লোক, আসিয়াই হয়ত সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে! হয়ত বলিবে এখানেই আজ খাব;—বলিলেই হইল —খোকাদা'র কথা এড়াইবার সাধ্য মায়ার নাই।

বাহিরে মটরের আওয়াজ হইল!

জানালার কাছে গিয়া মায়া দাঁড়াইয়াছে। বুক তাহার কাঁপিতেছে! খোকাদা' গাড়ী হইতে নামিল।

এখনও হয়ত চিনিতে পারে নাই: মজা হইবে মন্দ নয়। মায়া একটা ফন্দী করিল। প্রথমেই দেখা দেওয়া নয়—পিছন হইতে হঠাৎ গিয়া একেবারে তাক লাগাইয়া দিতে হইবে! পাশের একটা ঘরে লুকাইয়া মায়া ডাক্তারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মায়ার বুকের স্পন্দন যেন এখনি থামিয়া যাইবে। এত আনন্দ—এত রোমাঞ্চ—এত স্পন্দন, মায়া জীবনে কখনও অনুভব করে নাই! দশ বছর বয়স যেন এক বৈঠার আঘাতে পিছনে হটিয়া গিয়াছে! সেই গ্রামের পূর্ব্ব-পরিচিত আবহাওয়ার একটু আভাস যেন এত বছর পরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। দক্ষিণের রুদ্ধ বাতাস বহু যুগ পরে ছাড়া পাইয়া আবার শীতের জড়তাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে!···মায়া কান পাতিয়া মুহূর্ত্তের পদধ্বনি শুনিতে পায়··

সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ হইতেছে···

গট গট করিতে করিতে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে ঢুকিয়া ডাক্তার রায় বলিলেন, কই, অসুখ কার—?

কথাটা বলা হইল প্রিয়নাথকে। প্রিয়নাথ তখন লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে, এমন অপদস্থ সে জীবনে হয় নাই। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না তাহার। সারা দেহে ঘাম ঝরিতেছে, দুই হাতে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কিছুই বাহির হইল না।

আর বেশীক্ষণ লুকাইয়া থাকা যায় না!

হাসিতে হাসিতে মায়া বাহির হইয়া বলিল, চিনতে পারছ খোকাদা'?

ডাক্তার রায় ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন!···

—ওঃ, একদম বদলে গেছে তোমার চেহারা; লোকে বলে 'ডাক্তার রায়', 'ডাক্তার রায়', তুমি যে আমাদের সেই খোকাদা' তা' কে জানতো?···অনেক দিন পরে দেখা—কত বছর হবে বল তো?

ডাক্তার রায় মায়ার দিকে চাহিলেন; চোখে তাঁহার সবিস্ময় কৌতূহল! চিনিতে পারিবার কোনও লক্ষণই সে-মুখে দেখা গেল না। একবার নিজের পায়ের জুতার দিকে চাহিলেন, একবার অবিচল স্তব্ধ প্রিয়নাথের মুখের দিকে, তারপর একবার ঘরের প্রাণহীন নির্ব্বাক কড়িকাঠের দিকে—

মায়ার কিন্তু বেশ মজা লাগিতেছে।

—তুমি যে সত্যি সত্যিই চিনতে পারছ না খোকাদা—কিন্তু আমি তোমায় ঠিক চিনেছি! ছোট বেলায় এক সঙ্গে কত···সেই গাবতলীর শ্মশানে, বোস-পুকুর—বারোয়ারী-তলার যাত্রা! হ্যাঁ তোমার আবার নাকি মনে নেই—যে দুষ্টু ছিলে তুমি!···তোমার জ্বালায় কারো গাছে একটা ফল-পাকোড় থাকবার জো ছিল?···বাবা বলতেন—ওটার কিস্সু হবে না;—কিন্তু আশ্চর্য্য, সেই খোকাদা' এখন—

এখন যে কি তাহা আর মায়া মুখ ফুটিয়া বলিল না।

ডাক্তার রায় আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমি তো ঠিক—

মায়ার মনে হইল খোকাদা' নিশ্চয় ঠাট্টা করিতেছে! মনেও পড়িয়াছে—চিনিতেও পারিয়াছে—তবু চালাকি; এই এখুনি হয়ত ঘর ফাটাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবে!

মায়া বলিল, না না, ঠাট্টা রাখ খোকাদা'! সত্যি বল তো, মহেশপুরের মায়াকে তুমি চেন না? আমিই তো মায়া! উঃ, এই বুঝি তোমার স্মরণ-শক্তি! সত্যি বল তো—চিনতেই পারছ না আমাকে? সত্যি বল না—মায়াকে তুমি চেন না?

ডাক্তার রায় যেন মায়াকে বাঁচাইবার জন্তই বলিলেন, তা হবে, কিন্তু···আজ বরং···

মায়া বোমার মত ফাটিয়া উঠিল, না না, ওসব শুনছিনে, ওই চেয়ারটাতে ব'স, এখনি হয়েছে কি, কত গল্প তোমার সঙ্গে করবার আছে···হ্যাঁ ভাল কথা, চা করব—খাবে? ডাক্তার রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, না না, আপনি বসুন, অন্য দিন বরং···বড্ড ব্যস্ত আজ...বড্ড ব্যস্ত···আজ উঠি···

'উঠি' বলিয়াই তিনি উঠিলেন এবং একেবারে সোজা গিয়া নীচে নামিলেন। গিয়া মটরে উঠিলেন। মটর ছাড়িয়া দিবার শব্দ হইল। সে শব্দও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসে।

মায়া পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া বসিয়া সমস্ত শুনিল। তাহার যেন সত্য সত্যই বিশ্বাস হইতেছিল না। এতক্ষণ যে কথা কহিতেছিল, সে কি তাহার সেই খোকাদা' নয়?

আগাগোড়া ব্যাপারটা যেন স্বপ্ন!

মায়ার ইচ্ছা হইল সামনের কাচের গ্লাসটিকে সে আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলে! সবই তো ভঙ্গুর! কাচের বাসনের মত ভঙ্গুর। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা···সব···সব! এতটুকু আঘাত সহিতে পারে না কেহ! মায়ার চোখে শেষ পর্য্যন্ত জল আসিবে নাকি? শেষে ওই খোকাদা'ই তাহাকে কাঁদাইল? অনেকক্ষণ ধরিয়া মুখ গুঁজিয়া কান্না তাহার আর ফুরাইতে চাহে না!

মায়া যখন বিছানা ছাড়িয়া উঠিল—দেখিল, প্রিয়নাথ পাশের ঘরেই জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে, কপাল যেন পুড়িয়া যাইতেছে! পাছে মায়া বিরক্ত হয় বলিয়া তাহাকে একবার ডাকেও নাই। ওই লাজুক মুখচোরা লোকটির জন্ম আজ মায়ার বড় বেশী করিয়া দুঃখ হইতে লাগিল! প্রিয়-নাথের কপালের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে মায়ার দুই চোখ আবার ছল ছল করিয়া উঠিল কেহ নাই তাহার—কেহ নাই! মায়ার মনে হইল—পৃথিবীতে সে আজ বড় নিঃসঙ্গ, বড় একাকী, বড় পরিত্যক্ত!

রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি যায় মায়া চাহিয়া থাকে, আকাশ, দিগন্ত ব্যাপিয়া ছাদের তরঙ্গ চলিয়াছে—দু'একটা দেবদারু গাছ, টিনের চালা, চালার উপর পায়রার ঝাঁক, একটা বাড়ীর ছাদে কাকের সভা বসিয়াছে, কোন একটা ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হইতেছে, তার ওপাশে জেলেদের বস্তি—তারও ওপাশে কালিঘাটের পুল, ওপাশে ধানকলের চোঙ, জেলখানা, তারপর কোন বাড়ীতে রাজমিস্ত্রী খাটিতেছে, একজোড়া চিল—তারপর সুরু হইল অগণিত ছাদ—ছাদের পর ছাদ—শেষ নাই—সীমা নাই—আর তাহাদেরই মাথার উপর আকাশ—মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল আকাশ—বিষের মত নীল। মায়া সেই আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল একদৃষ্টে—হায় নীল আকাশের দেবতা! তোমার বুকে এত তারা—এত তারার মালা—তাহার মাঝে কোথায় কেমন করিয়া লুকাইয়া থাকে বজ্র! কে জানে।

অনাবিষ্কৃত নিউ গিনী

ঃ প্রস্তর-যুগের বর্বর জাতি

—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

দুর্ভেদ্য, গহন জঙ্গল—অনাবিষ্কৃত, বিপদ-সঙ্কুল দেশ—আদিম আরণ্য অসভ্য জাতির কথা ভাবতে গেলে আমাদের আফ্রিকার কথাই মনে পড়ে। কিন্তু উৎসাহী শিকারী ও দুঃসাহসী পর্য্যটকের কল্যাণে আফ্রিকা আর এখন তেমন অজানা নেই। বড় বড় বহু বৈজ্ঞানিক অভিযান তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চষে ফেলেছে বলতে পারা যায়। তার অধিকাংশ নদী, পর্ব্বত ও হ্রদের রহস্য এখন উদ্ঘাটিত। সেখানকার নানা অসভ্য জাতির নাড়ীনক্ষত্র, বলতে গেলে জানা হয়ে গেছে। আফ্রিকা বিশাল বলেই মানুষের কৌতূহলকে বেশী করে আকৃষ্ট করেছে।

পৃথিবীতে আফ্রিকার চেয়ে ছোট অনেক জায়গা এখনো আছে, আফ্রিকার তুলনায় যা একেবারে অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিউ গিনীর নাম করা যেতে পারে।

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুব-রেখার কিছু দক্ষিণে এই দ্বীপটির অস্তিত্বের কথা কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষ জানতে পেরেছে। ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দরে যাতায়াত করার পথে জাহাজগুলি নিত্য এই দ্বীপের কোল ঘেঁসে যায়। নিউ গিনীর সমস্ত প্রান্তে চাষবাসের জন্যে, খনিজ দ্রব্যের লোভে ও ব্যবসায়ের প্রয়োজনে সভ্য মানুষের দু' একটি আস্তানাও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিউ-গিনীর দুর্গম অন্তঃপ্রদেশ, পাঁচ শতাব্দী আগে ওলন্দাজ ও পোর্ত্তুগীজ নাবিকদের কাছে যেমন অজ্ঞাত ও রহস্যময় ছিল, এখনও তেমনি আছে। সেখানকার যবনিকা অপসারিত হয়নি।

যাদুঘরে আমরা বিবর্ত্তনের নিম্নতম ধাপের প্রস্তর-যুগের মানুষের জীবনযাত্রার নিদর্শন দেখি। মানুষের বিবর্ত্তনের ইতিহাস পড়বার সময় আমরা জানতে পারি, সুদূর প্রাগান্ধকার অতীত যুগে পশুত্বের গণ্ডী পার হয়ে মানুষ কি অবস্থায় এসে পৌছেছিল। কোন ধাতুর ব্যবহার তারা জানত না। প্রস্তর-খণ্ডই ছিল তাদের একমাত্র অস্ত্র ও সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজের একমাত্র যন্ত্র। পশু-জগতের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল শুধু ওই প্রস্তরখণ্ড ব্যবহারের বিশেষত্বে। তারপর অতিকায় হস্তী
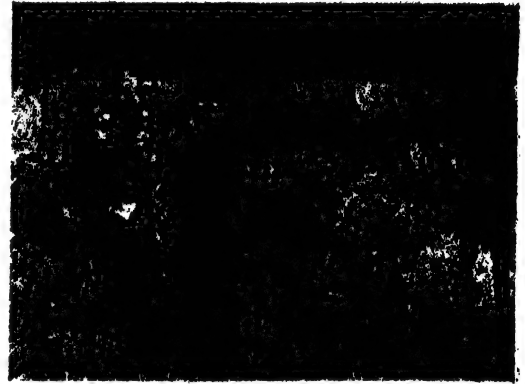
আকাশ হইতে নিউ-গিনী অভিযানের অবতরণ-দৃশ্যে বিস্মিত ও আশঙ্কিত নিউ-গিনীবাসী।

ও অসি-দন্তী বিশাল ব্যাঘ্রের সঙ্গে তারা লোপ পেয়েছে বলে আমরা জানি।

তাই এই বিংশ শতাব্দীতে হঠাৎ সেই প্রস্তর যুগের উলঙ্গ বর্ব্বর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া বিস্ময়কর নয় কি!

নিউ-গিনীর রহস্যময় অনাবিষ্কৃত অভ্যন্তরে এই আদিম প্রস্তরযুগের মানুষেরই সন্ধান আশ্চর্য্য ভাবে পাওয়া গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির বিবর্ত্তনের ধারা তাদের স্পর্শও করে

নি। পিরামিড যখন নির্ম্মিত হচ্ছে প্রাচীন মিশরে—তখনও তারা যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। সমুদ্রপথে যেখানে আধুনিক জাহাজের ধোঁয়া আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে, তারই কিছু দূরে সুদূর অতীতের এই জীবন্ত সাক্ষী—সভ্য মানুষের অজ্ঞাতে বাস করছে কে জানত!

আমেরিকার একদল বৈজ্ঞানিক দেশের আখের চাষের উন্নতির জন্য সবল নীরোগ নূতন জাতের ইক্ষুর খোঁজে নিউ গিনীতে অভিযান করেছিলেন। সেই অভিযানে ইক্ষুচারা সংগ্রহ ছাড়া তাঁরা আরো অনেক কিছু করেন। নিউ গি মান-চিত্রের শূন্য স্থান তাঁরা অনেকখানি পূর্ণ করে দিয়েছেন। পুরাতন মান-চিত্রের অনেক রেখা মুছে গেছে তাঁদের আবিষ্কারে, অনেক নতুন হ্রদ, অরণ্য, পর্ব্বত স্থান পেয়েছে স্পষ্ট ভাবে। এই অভিযানের মধ্যেই দৈবাৎ প্রস্তরযুগের এই প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়।

নিউ গিনী অভিযানের নেতা মিঃ ই. ডব্লিউ, ব্র্যাণ্ডেস্ লিখছেন,—"আকাশ থেকে হঠাৎ আদিম বর্ব্বর নর-খাদকদের মাঝে নেমে আকাশের দেবতারূপে গণ্য হওয়ার কথা গল্পের বইয়েই পড়া যায়। সে ব্যাপার কিন্তু আমাদের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছে।"

নিউ-গিনী দ্বীপটি আয়তনে বড় কম নয়। এক প্রান্ত থেকে তার আর এক প্রান্ত পোনেরো শত মাইল হবে। অষ্ট্রেলিয়াকে দ্বীপের তালিকা থেকে বাদ দিলে গ্রীনল্যাণ্ড ছাড়া এত বড় দ্বীপ পৃথিবীতে আর নেই।

এই বিশাল দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে মোরেসবি বন্দরকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে মিঃ ব্র্যাণ্ডেস ও তাঁর দলের লোকেরা এরোপ্লেনে করে যতখানি সম্ভব অনাবিষ্কৃত প্রদেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন

নিউ গিনীর অধিবাসীরা সকলেই ঠিক এক জাতির নয়, তাদের মধ্যে নানা বিভাগ আছে। অধিকাংশই মেলানেশির জাতিভুক্ত হলেও পলিনেশীয় রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রণের পরিচয়ও পাওয়া যায়—বিশেষ করে সমুদ্রতীরে যারা বাস করে তাদের মধ্যে। অভ্যন্তরের অধিবাসীদের তুলনায় তীরবর্ত্তী জাতিরা অনেকটা সভ্য। নিউ-গিনীর অভ্যন্তরে বামনাকৃতি নেগ্রিটো জাতিও দেখা যায়। জীবন-সংগ্রামে তারা বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না ধীরে ধীরে তারা লোপ পেয়ে আসছে।

বড় বড় নদীর মোহনার কাছে জলা দেশে যারা বাস করে সাগুই তাদের প্রধান খাদ্য। সাগু গাছ বেশীর ভাগই বনে আপনা থেকে জন্মায়; যত্ন করে রোপণ খুব কম লোকেই করে। সাগুর দরকার হলে একটা গাছ বেছে নিয়ে এখানকার অধিবাসীরা তার গুঁড়ি কেটে জলে ভাসিয়ে গ্রামে নিয়ে আসে। তারপর তা থেকে আহার্য্য-সংগ্রহের কাজ মেয়েদের। আখ, তামাক, নারকেল, রাঙা আলুও এদেশে জন্মায়। আমাদের ধারণা যে তামাক আমেরিকা আবিষ্কারের পর পৃথিবীতে প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু নিউ গিনীর লোকেরা তামাকের ব্যবহার বোধ হয় তারও আগে থেকে জানত। তামাক নিউ-গিনীর নিজস্ব জিনিষ। আমেরিকার আর নিউ-গিনীর তামাকে প্রভেদ আছে। শীকার করে ও মাছ ধরে এদেশের লোক আহার সংগ্রহ করে। সনাতন তীর-ধনুকই তাদের অস্ত্র। জঙ্গলের বন্য শূয়ার ও বৃহৎ ক্যাসোয়ারী পাখীই তাদের শীকার। মাছ সাধারণতঃ মেয়েরাই ধরে। পুরুষেরা তীর ছুঁড়ে ও বর্শার দ্বারা কখনও কখনও মাছ শীকার করে। রাত্রে মশাল জ্বেলেই সাধারণতঃ এরকম মৎস্য-শীকার হয়।

পোষাকের বালাই এদের নেই বললেই হয়। সেপিক নদীর তীরে একটি অসভ্য জাতির স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সম্পূর্ণ ভাবে উলঙ্গ থাকে। আর এক জাতের লজ্জা নিবারণ হয় শুধু বড় বড় ঝিনুকের দ্বারা। বুড়ো মানুষ ও অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েরা সব জায়গায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে।

মেয়েরা বিবাহের আগে পর্য্যন্ত লম্বা চুল রাখে। বিয়ে হলেই মাথা কামিয়ে ফেলে বা ছোট ছোট কয়েকগুচ্ছি চুল রাখে।

সরকারের কড়া শাসন সত্ত্বেও এখানকার অধিবাসীরা পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি এখনও পরিত্যাগ করেনি। শত্রুকে ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক হত্যা করে তার মাথা সংগ্রহ করা এদের কাছে মস্ত বড় কীর্ত্তি। নিহত শত্রুর মাথা এরা যত্ন করে ঘরে সাজিয়ে রাখে।

সাধারণতঃ মানুষের মাথা সংগ্রহের জন্যেই এরা পরস্পরের গ্রাম আক্রমণ করে। নরমাংস ভোজনের প্রথাও এখনো

একেবারে লোপ পায়নি। নিউ গিনীর আবিষ্কৃত অভ্যন্তরে এখনো অনেক নর-খাদক সম্প্রদায় আছে।

মিঃ ব্র্যাণ্ডেসকে তাদের একজন প্রতিনিধি আকারে-ইঙ্গিতে নরমাংসের স্বাদ যে চমৎকার তা বোঝাবার চেষ্টাও একবার করেছিল। এরাই বর্ব্বরতার নিম্নতম স্তরের প্রস্তর-যুগের মানুষ। ফ্লাই নদীর উৎসের কাছে মারে হ্রদের ধারে এদের সঙ্গে অভিযানকারীদের দেখা হয়।

হ্রদটি প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা। নানাদিকে অক্টোপাসের মত তার অনেকগুলি বাহু ছড়ান।

মিঃ ব্র্যাণ্ডেস লিখছেন—"এরোপ্লেন করে এই হ্রদটি পরি-দর্শন করবার সময় জলের ওপর থেকে অসংখ্য বন্য হাঁস ও সারসের ঝাঁক আমাদের মোটরের শব্দে ভয় পেয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তাদের সার বেঁধে ওড়ার সে দৃশ্য অপরূপ। আমরা এরোপ্লেন থেকেই তাদের গুলি করবার চেষ্টা করি। আসলে একটি পাখীও শিকার করতে না পারলেও হংস-বলাকাকে আকাশে অনুসরণ করবার আনন্দ আমরা বিশেষ উপভোগ করেছিলাম।

মারে হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অসীম। হ্রদের জলে নানারকম সুন্দর জলজ জন্মায়। এক জাতীয় বৃহৎ পদ্ম বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন তার রাঙা পাপড়ির সৌন্দর্য্য, তেমনি সুমিষ্ট তার গন্ধ।

হ্রদের ধারে আমরা কয়েকটা বসতি দেখেছিলাম। কিন্তু এরোপ্লেন থেকে নেমে কাছে এসে কোন অধিবাসীর সাড়াশব্দ পেলাম না। নারিকেল ও অন্যান্য গাছের ঝোপের ভেতর প্রকাণ্ড লম্বা একটা পাতার ঘর। লম্বা ইউলেইয়া ঘাসের ভেতর দিয়ে সরু একটা পথ সে দিকে গেছে। কিন্তু সাহস করে আমরা প্রথমটা এগুতে পারলাম না। কি ধরণের অভ্যর্থনা যে এই অজ্ঞাত জাতির লোকের কাছে পাওয়া যাবে তার কোন ঠিক নেই।

আশেপাশে কাউকে না দেখলেও মনে হচ্ছিল লম্বা ঘাসের ভেতর থেকে কারা যেন আমাদের লক্ষ্য করছে। আমরা নানারকম শব্দ করে আমাদের বন্ধুত্বের বাসনা জ্ঞাপন করবার চেষ্টা করছিলাম। সে সমস্ত শব্দের অর্থ কি ভাবে গৃহীত হচ্ছিল কে জানে?

অসভ্যদের আশ্বস্ত করবার জন্যে আমরা খালি হাতেই নেমেছিলাম। আমাদের কোমরে অবশ্য পিস্তল ছিল, কিন্তু পিস্তল এদের কাছে শরীরের অলঙ্কার মাত্র; বন্দুকের কথা আলাদা। তার মূল্য জানুক বা না জানুক লাঠি হিসাবে তা এদের কাছে শত্রুতার অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করে।

চীৎকার করে, দাঁত বার করে হেসে, অনেক রকম অঙ্গ-ভঙ্গী করেও আমরা এখানকার অধিবাসীর গোপন সন্দেহ দূর করতে পারলাম না। হতাশ হয়ে শেষে ফেরবার উপক্রম
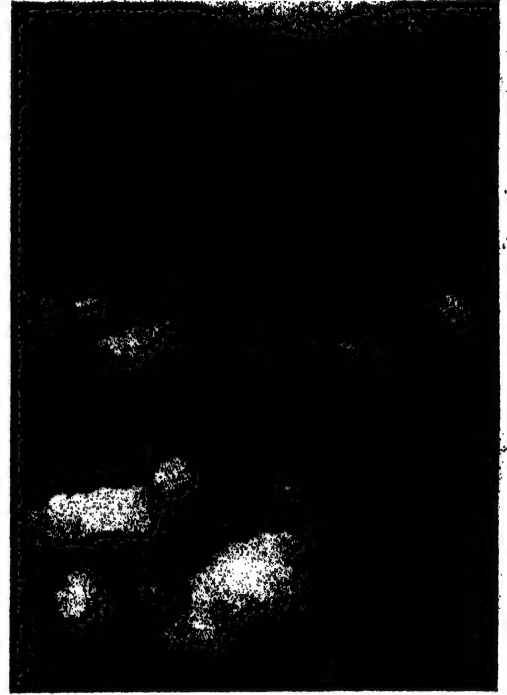
উপর হইতে সর্পিল সেপিক নদীর দৃশ্য।

করছি এমন সময়ে হঠাৎ লম্বা ঘাসের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা গেল। তার পরমুহূর্ত্তেই ধুপ করে সামনে এসে লাফিয়ে পড়ল সর্ব্বাঙ্গে রঙ মাখা, কোমরে বস্ত্রের বদলে একটি বড় ঝিনুক বাঁধা, ঘুনসি-জড়ান এক অদ্ভুত মূর্ত্তি। হাত পা নেড়ে অদ্ভুত সব শব্দ করে সে কি বোঝাতে চাইছিল কে জানে!

প্রথম তার সঙ্গে ভাব করা দেখলাম বেশ কঠিন ব্যাপার। একটা রাঙা বনাতের টুকরা উপহার হিসাবে কিছুতে তাকে নেওয়াতে পারলাম না। আমরা এগুলে সে পেছোয়। তার সঙ্গে এবার সাহস করে আরও কয়েকজন এসে যোগ

দিলে। বিড় বিড় করে তারা নিজেদের মধ্যে কি বকে এবং মাঝে মাঝে লম্বা শিস্ দেয়। তারা যে বেশ উত্তেজিত হয়েছে

নিউ-গিনী : উচ্চ বৃক্ষশীর্ষস্থ গৃহাভ্যন্তর।

এটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। আকাশ থেকে আমাদের নামা, আমাদের শাদা রঙ, আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ সবই তাদের কাছে একেবারে কল্পনাতীত জিনিষ। আধঘণ্টা ধরে অনেক কসরৎ করার পর দাড়িওয়ালা এক বুড়োর হাতে কোন রকমে রাঙা বনাতের টুকরোটা গুঁজে দিলাম। দিয়ে তার একটু পিঠ চাপড়াতেই সে একেবারে ভয়ে জড়সড় হয়ে সরে পড়ল। পথের ওপর কি ভাগ্যি এক টুকরো আখ পড়ে ছিল। সেইটে তুলে নিয়ে নানারকম ইঙ্গিত করে অবশেষে আমাদের অভিপ্রায় তাদের বোঝান গেল। এইবার তারা উৎসাহভরে বিস্তর ইক্ষুদণ্ড নিয়ে এল অল্পক্ষণের মধ্যে। ছয় রকম নতুন জাতের আখ তার ভেতর পাওয়া গেল।

আখের বদলে সিগারেটের খালি টিন, মাছ ধরবার বঁড়শী, রঙীন কাপড় পেয়ে তাদের খুশী আর ধরে না। লেন-দেন করার ফলে তাদের সাহসও গেল বেড়ে। এখন প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন আমাদের চারিধারে জড় হয়েছে দেখা গেল। তাদের ভেতর একজন ভরসা করে এসে আমাদের পোষাকটা ছুঁয়ে দেখলে। সেটা পোষাক, না শরীরেরই অংশ এবিষয়ে সন্দেহভঞ্জনই হয়ত তার উদ্দেশ্য ছিল। এক জনের কৌতূহল তার ভয়কেও ছাপিয়ে উঠেছিল। হঠাৎ এক সময়ে আমার পায়ের মাংসে সে একটা চিম্‌টি কেটে ফেললে। সাদা রঙটা খাঁটি কিনা দেখতে হবে ত।

বিপদ হ'ল আখ নেওয়ার পর। আখের বদলে যদি এত ভালো জিনিষ পাওয়া যায়, তাহলে তার চেয়ে মূল্যবান জিনিষের বদলে না জানি কি পাওয়া যাবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই বোধ হয় কয়েকজন উৎসাহী অধিবাসী, যে জিনিষগুলি এনে হাজির করলে তা দেখে ত আমাদের চক্ষুস্থির।

তাদের মূল্যবান সম্পদ হল মানুষের ছিন্নমুণ্ড, নারিকেলের ছোবড়া—কাদা দিয়ে ঠাসা।

এক বীর পুরুষ কেমন করে মুণ্ডগুলি সংগ্রহ করা হয় মূক-অভিনয়ের দ্বারা তাও আমাদের বুঝিয়ে দিলে।

পাথরের তৈরী কুড়ুল ও বাঁশের তীর-ধনুক এদের অস্ত্র। তীরনির্ম্মাণে এদের বাহাদুরী আছে। ক্যাসোয়ারি পাখীর পায়ের নখ, ওয়ালাবি বা বুনো শূয়রের হাড় বা মাছের কাঁটা দিয়ে এরা তীরের ফলা তৈরী করে। পচা মাংসে সে ফলা ডুবিয়ে নিয়ে তারা বিষাক্ত করে তোলে। সে ফলা যার গায়ে

আকাশ হইতে নিউ-গিনীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি পল্লীর দৃশ্য।

একবার বিঁধবে, আঘাত যদি তার গুরুতর নাও হয় তাহলেও রক্ত বিষাক্ত হয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত। এদের ভেতর জোয়ান

যোদ্ধারা ধনুক থেকে দুইশত গজ দূরে পর্য্যন্ত তীর নিক্ষেপ করতে পারে।"

এই অসভ্য নর-খাদকদের দেশ ছাড়িয়ে মিঃ ব্রাণ্ডেসের দল শ' দুয়েক মাইল দূরে বামনাকার নেগ্রিটো জাতির সন্ধান পান। নেগ্রিটোরা বহু প্রাচীন কোন জাতির বংশধর। নিউ গিনী শুধু নয়, আফ্রিকায়, ফিলিপাইন দ্বীপেও তাদের দেখা যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা যে লোপ পাচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্ত্তমান জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মত বুদ্ধি বা শক্তি কিছুই তাদের নেই। শক্তিমান জাতিরা ধীরে ধীরে তাদের হটিয়ে দিচ্ছে পৃথিবী থেকে।

নিউ গিনীর বামনাকার জাতিরা যে অঞ্চলে বাস করে, সে অঞ্চল বড় বড় গাছের জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গলের ভেতর বড় বড় গাছের ওপরে তারা ঘর বেঁধে থাকে। মাটি থেকে তাদের ঘরগুলি খুব উঁচুতেই তৈরী হয়—প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত। জঙ্গলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এই রকম বৃক্ষচূড়াবস্থিত নেগ্রিটোদের গ্রাম নানাভাবে শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখবার ব্যবস্থা আছে।

প্রথমতঃ, ঘন অরণ্যের মধ্যে পথগুলি এত সঙ্কীর্ণ যে ক্ষুদ্রাকার নেগ্রিটো ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে সে পথে চলা দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামের চারিধারে মাইল দুয়েক পর্য্যন্ত প্রত্যেক পথে তারা ডালপালা দিয়ে এক হাত দু হাত অন্তর অসংখ্য ছোট বেড়া বেঁধে রাখে।

মিঃ ব্রাণ্ডেস্ লিখেছেন—"বামনেরা ঠিক কাঠবিড়ালীর মত সে সমস্ত বেড়া অনায়াসে টপকে চলে যায়। কিন্তু মাইল দুএক সেইভাবে যাবার পর আমার মনে হল আমার দুটো পায়ে মণ দশেক করে লোহা বাঁধা আছে। বামন জাতিরা তাদের বৃহদাকার আততায়ীদের এই উপায়ে যে রীতিমত কাবু করে ফেলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

শুধু তাই নয় পথগুলি দিয়ে গ্রামে পৌছোবার আগে আর এক বাধা উত্তীর্ণ হতে হয়। পথগুলি যেখানে শেষ হয়েছে তার পরেই প্রায় সিকি মাইল স্থানে বড় বড় কাঁটাবহুল গাছের ডালপালা ও গুঁড়ি স্তূপাকার করে ছড়ান। জায়গায় জায়গায় সে গাছের দেওয়াল দশহাত পর্য্যন্ত উঁচু। এই গাছের দুর্গপ্রাকার অতি সন্তর্পণে পার হয়ে তবে বামনদের পল্লীতে পৌছোতে হয়। এবং সেখানেও তাদের নাগাল পেতে হলে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু বৃক্ষশীর্ষের ঘরে উঠতে হবে।

নিউ-গিনীর বামনাকার জাতিদের বাসগৃহ; মাটি হইতে প্রায় চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাত উচ্চে বড় বড় গাছের উপর নির্ম্মিত।

কিন্তু এতরকম সাবধানতা অবলম্বন করেও নিরীহ মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্রাকার এই প্রাচীন নেগ্রিটো জাতি কতদিন আর বিলুপ্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে বলা কঠিন!

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[৩]

প্রাথমিক শিক্ষা

ছেলের পাঁচ বৎসর বয়স হইলে, মাঙ্গলিক-অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের কাছে পাঠানো হয় "হাতে খড়ির" জন্য। আমাদের এতদিন ধারণা ছিল যে, তখন হইতেই তাহার শিক্ষার আরম্ভ হইল। পাঁচ বৎসরের ছোট শিশুর মন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানিতাম না। কিন্তু শিশু-মন লইয়া নাড়াচাড়া করিবার ফলে এত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইতেছে।

শিশুর শিক্ষা তাহার মাতৃ-গর্ভে প্রথম দিন হইতেই আরম্ভ হয়। এই জন্যই যাহাতে প্রসূতি সর্বদা প্রফুল্ল মনে থাকেন, কোনরকম ভয় না পান, তাহার জন্য আমরা সর্বদাই ব্যস্ত থাকি। আমাদের দেশে ঋষিগণ "পঞ্চামৃত", "সপ্তামৃত" প্রভৃতি মাঙ্গলিক সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রসূতির প্রফুল্লতাবিধানের জন্য যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা খেয়ালের বশবর্তী হইয়া করেন নাই। কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার অনুসরণে আমরা সামাজিক রীতিনীতিগুলি কুসংস্কার হিসাবে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছি। "শিশু নারায়ণ"—এই কথা পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণ আজ বলিতেছেন; আমাদের দেশে ঋষিগণ বহুপূর্বে সে কথা বলিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার এক ভদ্রলোকের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, তিনি মাতার আদেশানুযায়ী নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার তিনটি সন্তান হয়, প্রত্যেকটিই বধির। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সন্তানগুলির বধিরত্বের কারণ বাহির করিতে পারি নাই। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর সহিত বাক্যালাপ নাই, একদিনের জন্যও তাঁহারা কথা বলেন নাই। কে বলিতে পারে যে, এই অস্বাভাবিক অবস্থাই তাঁহাদের সন্তানদিগের বধিরত্বের কারণ নহে?

আমাদের শিক্ষা প্রধানতঃ কথিত-ভাষার সাহায্যে হয়। সাধারণ শিশু শুনিয়া শুনিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। যখন সে প্রথম স্কুলে যায়, তখন সে অনেক কিছু জিনিস জানে। কিন্তু বধির শিশু যখন প্রথম স্কুলে যায়, তখন তাহার মানসিক শক্তির প্রসারতা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। কাজেই তাহাকে গৃহে ভাষার দিক দিয়া কিছু শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গৃহে তাহাকে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া চলে না, কারণ ইহার জন্য "বিশেষ শিক্ষার" দরকার। এই কারণে আমেরিকায়, ইউরোপে অতি-শিশুদিগের জন্য "হোম" আছে। এইগুলিকে ঠিক স্কুল বলা যায় না; এই সব "হোমে" বাড়ীর আবহাওয়াই বেশী। দুই বৎসর বয়স্ক শিশুদেরও এই সব প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষয়িত্রীগণ মাতার ন্যায় তাহাদিগকে লালন-পালন করেন। তাঁহারা সর্বদাই তাহাদের সহিত কথা বলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা কানে শোনে না, তাহাদের সহিত কথা বলিবার সার্থকতা কি? কানে-শোনা শিশুদের সহিত আমরা সর্বদাই কথা বলি। তাহারা প্রথম প্রথম কিছুই বুঝিতে পারে না, তথাপি আমরা তাহাদের সহিত "আবোল্ তাবোল্" বকিয়া যাই। ধীরে ধীরে তাহারা কথিত-ভাষার শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বুঝিতে শেখে। বধির শিশুও প্রথম কিছুই বোঝে না; কিন্তু কথা বলিবার সময় ওষ্ঠ-দ্বয়ের গতি দেখিতে দেখিতে তাহারাও ধীরে ধীরে কথিত-ভাষার ওষ্ঠ-গতির সহিত ভাষার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে শেখে। এইভাবে ভাষার সহিত পরিচয় হইলে, তাহার সর্ববিধ মানসিক বৃত্তির ক্রমবিকাশ হয়।

"হোম"গুলির নানারকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও একটা বিশেষ দোষ আছে, যাহার জন্য আমি কোন শিশুকেই "হোমে" পাঠাইবার পক্ষপাতী নহি। অতি শৈশবেই তাহাদের বাড়ীর সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, যাহা কখনই শুভ হইতে পারে না। শিক্ষয়িত্রীগণ যতই স্নেহময়ী হউন না কেন, তাঁহারা 'মায়ের মতন" হইতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই "মা" হইতে পারেন না। মায়ের আঁচলের আওতার বাহিরে গিয়া যে ছেলেকে "মানুষ" হইতে হয়, তাহার মত দুর্ভাগা আর কে?

দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া, পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা দিয়া গৃহে গৃহে লোক পাঠাইয়া, বধির শিশুর মাতাপিতাকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিশু বুঝুক বা না বুঝুক, তাহার সহিত সর্বদা কথা বলা উচিত। ঠিক সাধারণ শিশুর ন্যায় তাহার সহিত ব্যবহার করা উচিত। বধির বলিয়া তাহাকে বেশী আহ্লাদ দিলে, সে মাথায় চড়িয়া বসিবে, ফল বিষময় হইতে পারে। অন্যদিকে বধির বলিয়া তাহাকে তাচ্ছিল্য করাও উচিত নয়। ইহাতে সে সমস্ত জিনিষের উপরই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে, এবং তাহার নিজের স্বাভাবিক শক্তির উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিবে।

সাধারণতঃ ছয় বৎসর হইতে আট বৎসরের মধ্যে বধির শিশু স্কুলে যায়। প্রথমেই তাহাকে কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রথম কয়েক মাস তাহাকে কেবল দৃষ্টি ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুশীলনী, ওষ্ঠ-পাঠ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলনী দেওয়া হয়।

কথা বলিতে ও ওষ্ঠ-পাঠের সময় বাক্-যন্ত্রের অবস্থান ও গতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিবার দৃষ্টিশক্তির অনুশীলনীর বিশেষ প্রয়োজন। রঙীন পশম, ক্ষেত্রতত্ত্বঘটিত নানাপ্রকার কাষ্ঠখণ্ড (geometrical solids) নানা

রং-এর ছবি প্রভৃতির সাহায্যে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি পশম বা কাষ্ঠ-খণ্ডকে একবার দেখাইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ অন্যান্য পশম বা কাষ্ঠখণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়, এবং বধির শিশুকে তাহা বাহির করিতে বলা হয়। প্রথমে কেবল একটি বিশেষ পার্থক্যবিশিষ্ট জিনিষ দিয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। ক্রমে একসঙ্গে তিন চারিটি ও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মপার্থক্যবিশিষ্ট জিনিষ লইয়া অনুশীলনী হয়। অনুশীলনীর সময়, শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এই ভাব দেখানো হয় না ; খেলার ছলে শিক্ষা দেওয়াই রীতি। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দেওয়া হয় ; উদ্দেশ্যবিহীন হইলে কোন সুফল হয় না। কিন্তু একটি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দু' চার মিনিট পরে পরেই শিক্ষাপ্রদ জিনিষগুলিকে (didactic materials) বদলাইতে হয়। নতুবা অনুশীলনী একঘেয়ে হইয়া যায়, শিশু তাহার স্ফূর্ত্তি হারায় এবং কাজ যন্ত্রচালিত পুতুলের মত অর্থহীন হয়।

আমরা শব্দের কম্পন শুধু যে শুনিতে পাই তাহা নয়, স্পর্শ দ্বারাও অনুভব করিতে পারি। মূক-বধিরকে কথা বলিতে শিক্ষা দিবার প্রণালী স্পর্শেন্দ্রিয়ের শব্দ-কম্পনের অনুভূতির উপর নির্ভর করে। শিক্ষকের বুক ও চিবুক স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ স্বরহীন না স্বরযুক্ত, স্বরের গ্রাম ও পূর্ণতা (pitch and volume) অনুভব করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজেই বধির শিশুর স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভূতিশক্তির তীক্ষ্ণতা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য বিশেষ অনুশীলনীর প্রয়োজন।

ক্ষেত্রতন্ত্রঘটিত কাষ্ঠখণ্ড, বেহালা, পিয়ানো প্রভৃতি শব্দের কম্পনাবহ বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে এই অনুশীলনী দেওয়া হয়। চোখ বন্ধ করিয়া, শিশু কোন কাষ্ঠখণ্ড ভাল করিয়া স্পর্শ করিয়া দেখে, কাষ্ঠখণ্ডটিকে অন্যান্য কাষ্ঠ-খণ্ডের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় এবং শিশু স্পর্শ করিয়া পুনরায় সেই কাষ্ঠখণ্ডটিকে বাহির করে। বেহালায় কোন্ তারে ঝঙ্কার দেওয়া হয় শিশু চক্ষু বুঁজিয়া স্পর্শদ্বারা ঝঙ্কারের গ্রাম ও পূর্ণতা অনুভব করে। অনু-শীলনী প্রথমে যাহাতে খুব সহজে অনুভূত হইতে পারে সেইভাবে দেওয়া হয় : ধীরে ধীরে অনুভূতির সূক্ষ্মতা বাড়ানো হয়।

মাদাম মন্তেসরির প্রণালী অনুযায়ী আজকাল শিশু-শিক্ষায় ইন্দ্রিয়ানু-শীলনী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি মূক-বধির ও অন্ধ-বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ইন্দ্রিয়ানুশীলনীকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, সাধারণ শিশুর শিক্ষাকল্পে ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছেন। আমাদের দেশেও বিদ্যালয়গুলিতে, বিশেষভাবে বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে, শিশু-শ্রেণীতে মাদাম মন্তেসরির প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ইহার সাফল্যের প্রধান তিনটি প্রতিবন্ধক আছে,– (১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম, (২) আমাদের দেশে তিন চার বৎসরের শিশুরা বিদ্যালয়ে যায় না, এবং (৩) অর্থের অভাব।

শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর কথা নির্ভর করে। নিঃশ্বাসের সহিত যে বাতাস আমরা ফুসফুস হইতে বাহির করিয়া দিই, তাহাই স্বরযন্ত্র ও মুখ-গহ্বরে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া কথায় পরিণত হয়। কাজেই বধির শিশু যাহাতে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তাহার জন্য নানাবিধ অনুশীলনী দেওয়া হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে, উচ্চারণ ও স্বর বিকৃত হয়। যাঁহারা তোতলা, তাঁহাদের তোতলামি বহুক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের অভাবের জন্য হয়।

তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিবার আগে সাধারণ শিশু ভাষা বুঝিতে শেখে। বধির শিশুর পক্ষেও সেই একই নিয়ম। কথা বলিতে শিখিবার আগে সে অনেক কথা বুঝিতে শেখে। এই জন্যই তাহাকে কথা বলিতে শিক্ষা দিবার আগে ওষ্ঠ-পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়। ওষ্ঠ-পাঠ-শিক্ষা সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে বলিব।

জিহ্বা একটি প্রধান বাক্ যন্ত্র। বধির শিশু জন্মাবধি তাহার ইচ্ছানুযায়ী ইহাকে চালিত করিতে না পারার জন্য, অনেক সময় ইহা তাহার শাসনের বাহিরে চলিয়া যায়। এইজন্য কথা বলিতে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে, যাহাতে সে তাহার জিহ্বাকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চালিত করিতে পারে, সে বিষয়ে অনুশীলনী দেওয়া হয়। জিহ্বাকে মুখ-গহ্বরে স্থিরভাবে রাখা, জিহ্বাগ্রকে কঠিন তালুর সহিত সংস্পর্শ করা, জিহ্বাগ্রকে সরু ও তৎক্ষণাৎ চওড়া করা, জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া কোমলতালুর সহিত সংস্পর্শ করা, জিহ্বাগ্রকে আদেশানুযায়ী চালিত করা প্রভৃতি নানারকম অনুশীলনী দেওয়া হয়।

[ক্রমশঃ

প্রাচীন ভারত

……ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও মানবের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনে অর্থাৎ 'ম্যানুফ্যাক্‌চারে' ভারতবর্ষ একদা অদ্বিতীয় ছিল বলিয়াই শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারেও পৃথিবীর অন্য সকল দেশ অবনত মস্তকে ভারতের প্রাধান্য স্বীকার করিত ; ভারতবর্ষই একমাত্র ভূখণ্ড ছিল, নিজের প্রয়ো-জনের জন্য যাহাকে অন্য কোনও দেশের নিকট হাত পাতিতে হইত না। সে আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ থাকিয়া স্বীয় প্রতিভা, কলাকৌশল ও ক্ষমতার প্রাচুর্য্যে অন্যান্য দেশেরও কল্যাণ সাধন করিত।

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

দশম পরিচ্ছেদ

রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখে, প্রথম সারিতে আবুদি ইন্দুর মাতাকে লইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পার্শ্বে দুইখানি আসন খালি ছিল—খালি রাখা হইয়াছিল। প্রণয়ের সঙ্গে ইন্দু যখন সেই পথে যাইতেছিল, ইন্দুর মাতা ডাকিলেন, আয় ইন্দু, বোস্।

ইন্দু সে কথা শুনিল কিনা বলা যায় না, তবে বসিল না, [illegible] দেখিয়াও যেন দেখিল না। প্রণয় এক মুহূর্ত্ত মাত্র থামিয়া, [illegible] গিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। প্রথম সারি অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় সারির শেষ প্রান্তে দুইখানি [illegible] আসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ইন্দুকে বসাইয়া নিজে তাহার [illegible] দিকে বসিলেন। আবুদি ঘাড় বাঁকাইয়া একবার ইহাদের দেখিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিলেন।

মা'র আহ্বান ইন্দু শুনিয়াছিল; কিন্তু এই মুহূর্ত্তে মা'র উপরও হইতে তাহার মন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল। বিমল যে এইমাত্র তাহারই চোখের সামনে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই সেই সুবেশিনীর সঙ্গে চলিয়া গেল, একটিবার ফিরিয়াও চাহিল না, এই ঘটনা-বিপর্য্যয়ের মূলে কে? ইন্দুর মনে হইতেছিল আর কোন দিনই সে মা'র মুখের পানে চাহিবে না, চাহিতে পারিবে না, তাঁহার সঙ্গে কথাও বলিবে না! যেখানে তাহারা বসিয়াছিল, সেখান হইতে মা'কে দেখা যায়, চেনা যায়; ইন্দুর মন, আরও দূরে—দেখা না যায় এমন দূরে বসিতে চাহিতেছিল।

যবনিকা উঠিয়া গিয়াছে। নদীমাতৃক বাঙলা দেশের শ্যামল শস্যক্ষেত্রের দৃশ্যাবলী পরিদৃশ্যমান। মাঠ হরিদ্বর্ণের ধান্যে ভরিয়া গিয়াছে; দূরে খড়ের ঘর অনেকগুলি দেখা যায়—যেন একটি গ্রাম; গ্রামের পিছনে আম জাম কাঁঠাল তাল নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী, তাহারই পাশ দিয়া ছোট একটি নদী বা খাল আঁকিয়া বাঁকিয়া নীল আকাশের কোলের কাছে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই বর্ণছটা জলের উপরে পড়িয়াছে।

দুইদিক হইতে দুইটি ছেলে আসিয়া কথা বলিতেছে, কত হাসিতেছে; আর একটি ছেলে আসিল। মাথায় তাহার কোঁকড়া কালো চুলের রাশি, কালো চুলের নীচে ফর্সা টুকটুকে ঢল ঢল কচি মুখখানি, বাসন্তী রঙের কাপড় পরা খালি গায়ের উপরে বাসন্তী রঙে রাঙা চাদরখানি পড়িয়া আছে, পায়ে তাহার জুতা নাই, ছোট ছোট ফর্সা পা দুখানি বিদ্যুতালোকে কি সুন্দর যে দেখাইতেছে! হাতে তাহার বাঁশের একটি বাঁশী! সে আঙুল দিয়া সেই শস্যশ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র দেখাইল, জল-ভরা নদী দেখাইল, ফলভারানত নারিকেল বৃক্ষ দেখাইল, ঘর দেখাইল, দিকচক্রবালে বিলীয়মান সূর্য্যরশ্মি দেখাইল—কত কথাই বলিল!

আমরা জানি, তাহার প্রত্যেকটি কথা দর্শকদের অঙ্গে রোমাঞ্চ আনিয়া দিয়েছিল, বাঙলার যে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা রূপ তাহার কথায় ফুটিয়া উঠিতেছিল, দর্শক মাত্রেই তাহা যেন চাক্ষুষ করিতেছিলেন; সকলেরই মনে হইতেছিল—এই আমার দেশ! এই আমার বাঙলা! এই আমার মা, জননী, জন্মভূমি!

ছেলেটি কথা বন্ধ করিয়া একপাশে গিয়া বসিল। চক্ষু মুদিয়া যেন ধ্যানেও সে বঙ্গমাতার পরিপূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছিল। তারপর আস্তে আস্তে বাঁশীতে ফুঁ দিল।

প্রণয় বলিলেন, এইবার ছায়ার গান!

ইন্দুর চমক ভাঙিল! এতক্ষণ একটি শব্দও তাহার কানে যায় নাই, একটি কথাও সে শুনিতে পায় নাই।

রঙ্গমঞ্চের ভিতরে হার্মোনিয়াম বাজিয়া উঠিল।

প্রণয় আবার বলিলেন, এই গানটাই তোমায় গাইতে বলেছিলুম, তুমি গাইলে না, ছায়া—

অনেকক্ষণ হইতে ঐ নামটা ইন্দুর প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছিল। অভিভূত ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, ছায়া কে?

প্রণয় বলিলেন, ঐ যে, যাদের আমি ভেতরে পাঠিয়ে দিলুম, ওদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল, সেই-ই ছায়া!

ইন্দু আর কোন কথা কহিল না। তাহা হইলে সেই মেয়েটিরই নাম ছায়া! যেমন সুন্দর চেহারাটি, তেমনই মিষ্ট ঐ নামটি—ছায়া!

গান আরম্ভ এবং শেষ হইয়া গেল। মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের ঘন করতালি-ধ্বনিতে প্রেক্ষামণ্ডপ ভরিয়া উঠিল। করতালি-ধ্বনি থামিলে, প্রথামত গানখানি পুনরায় গীত হইল।

নীল ফ্রকপরা একটি মেয়ে আসিয়া প্রণয়কে কি বলিল; প্রণয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ইন্দু দেখিল, তাহাদের বয়সী একটি মেয়ে মণ্ডপের পর্দ্দার ফাঁক হইতে হাতছানি দিয়া প্রণয়কে ডাকিতেছে,—'এক মিনিট, ইন্দু' বলিয়া প্রণয় উঠিয়া গেলেন।

গান শেষ হইবামাত্র আবুদি আসন ছাড়িয়া, ইন্দুর পাশ দিয়াই বাহিরে যাইতেছিলেন, ইন্দুর পানে চক্ষু পড়িতেই বলিলেন, প্রণয় ঠাকুরপো কোথায় গেল?

ইন্দু চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বয়স্কাদের সঙ্গে কথা কহিবার সময়, বয়স্কা দাঁড়াইয়া থাকিলে, অল্পবয়স্কাদের দাঁড়াইবার নিয়ম সভ্য সমাজে প্রচলিত।

—এই ত ছিলেন! আপনি কোথায় যাচ্ছেন মাসিমা?

—ভেতরে; আমার ছোট ছেলেটাই মেছুড়ে সাজছে, তাকে একটু দেখে আসি।

—আমি যেতে পারি মাসিমা?

—যাবি, তা আর না।

গান শেষ হইয়া গিয়াছিল। 'উইংয়ে'র পাশে সেই মেয়েটি—ছায়া যাহার নাম—তখনও টেবিল-হার্মোনিয়ামে বসিয়া, ঘাঘরাপরা দু'টি ছোট মেয়ে তালপাতার পাখায় তাহাকে বাতাস করিতেছে; তাহার পার্শ্বে চশমা-ধারিণী একটি বর্ষিয়সী মহিলা বসিয়া আছেন—ইন্দু বুঝিল, তিনিই ছায়ার মা।

কিন্তু বিমল সেখানে নাই।

পরের উইং অতিক্রম করিবার সময় দেখা গেল, বিমল একটি ছোট্ট ছেলের মাথায় মস্ত একটা পাগড়ী বাঁধিয়া দিতেছে। এই ছেলেটিই মেছুড়ে সাজে—আবুদি'র ছোট ছেলে। আবুদি তাহারই দিকে চলিলেন; আর ইন্দু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহারই অনুসরণ করিল।

বিমল সানন্দহাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ইন্দুর পানে চাহিল। সেই চাহনি! কোন পরিবর্ত্তন নাই। সেই দু'টি উজ্জ্বল চক্ষু হইতে চিরদিন যেমন স্নেহ ঝরিত, ভালবাসা ঝরিত, অগাধ আত্মীয়তা প্রকাশ পাইত, আজ কোন ব্যতিক্রমই ছিল না; ঠিক সেই। ইন্দুর দু'টি চোখ, সেই সঙ্গে মনখানি, হৃদয়খানি ভরিয়া গেল। কত দিনের শুষ্ক নদী, বক্ষে কত ফাটা-চটা, কত বালি কত কাঁকর—এই মুহূর্ত্তে কোন্ পাহাড় হইতে একটি ঢল্ নামিয়া তাহাকে ভরিয়া দিল—পাড়ে পাড়ে কূলে কূলে প্লাবন বহিয়া গেল।

বিমল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; হাসিমুখে স্নেহস্বরে বলিল, কাল তোমাদের বাড়ী গেছলুম ইন্দু। তুমি ছিলে না।

এ ত সেই স্বর! যে স্বরে ইন্দুর কাণ জুড়ায়, বুক জুড়ায়—এ ত সেই স্বর! আবিলতা নাই, আবিলতার ছায়া-লেশও নাই। ইন্দু সাগ্রহে বলিল, কখন্?

—সন্ধ্যার ঠিক পরেই।

ইন্দুর মাথা খুঁড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল।

বিমল বলিল, তুমি বাড়ী ছিলে না, না?

—না, না, না। বাড়ীতে ছিল না, সত্য; কিন্তু কোথায় ছিল? সেই সময় গড়ের মাঠের দিকে প্রণয়ের মোটর ছুটিতেছিল।

বিমল বলিল, বেশীক্ষণ থাকি নি বটে—

—কারও সঙ্গে দেখা হয় নি?—সে জানিতে চাহিতেছিল, মা'র সঙ্গে দেখা হইয়াছিল কি-না কিন্তু মধুর পবিত্র 'মা' কথাটা তাহার জিহ্বা যেন উচ্চারণ করিতে চাহিতেছিল না।

বিমল বলিল, তোমার মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ইন্দু আপনার মনেই শেষ শব্দটা উচ্চারণ করিল,—হয়েছিল!

হ্যাঁ। তুমি বুঝি প্রণয়বাবুর সঙ্গে—

হ্যাঁ!—এই একটি কথা উচ্চারণ করিতে কতখানি কষ্ট তাহার হইল, সে শুধু সেই জানে।

—তুমি মোটরে বেড়াতে গেছ, ফিরতে অনেক দেরী হবে শুনে আমি চলে এলুম।

মোটরে বেড়াইতে গিয়াছিল সত্য; কিন্তু সে যে কত অনিচ্ছায়, সে সংবাদ কি কেহ রাখে? কাল রাত্রের স্মৃতি আজও শতবৃশ্চিক দংশনের জ্বালা দিতেছে, এ কথাই বা কে বুঝিবে? মোটর-চালনা শিখাইবার ছলে একজন যে তাহার

হাতের উপর হাত চাপিয়া ধরিয়াছিল, ইহা মনে করিতেও তাহার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছে।

আবুদি তাঁহার ছেলেটিকে সব বুঝাইয়া-পড়াইয়া আদর করিয়া, চুমা খাইয়া ছাড়িয়া দিয়া, এদিকে আসিয়া বলিলেন, চল ইন্দু।

ইন্দু বলিল, আপনি যান মাসিমা, আমি আসছি।

আচ্ছা, বলিয়া আবুদি প্রস্থান করিলেন।

ইন্দু বলিল, যে মেয়েটি গাইল, ও কে?

বিমল কহিল, আমার ছাত্রী, ছায়া—মিসেস বোস্! আমি ওঁকেই পড়াচ্ছি। সেই কথা বলতেই কাল গেছলুম। পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাই, মেয়েটি যদি পাস করতে পারেন, ওঁর বাবা আমাকে একটা ভাল কাজ ক'রে দেবেন, ছায়ার মা সেই ভরসা দিয়েছেন। ছায়ার বাবা জজ।

মিসেস বোস বললেন যে, ওঁর বিয়ে হয়েছে নাকি?

—হাঁা, ওর স্বামী বিলেতে।

ছায়ার শ্রান্তি দূর হইয়াছিল। সরিয়া আসিয়া বিমলের উদ্দেশে কহিল, চলুন মিষ্টার রায়, বাইরে যাওয়া যাক।

—চল। কিন্তু তুমি ইন্দুকে দেখতে চেয়েছিলে—

—কে ইন্দু? ওঃ, যিনি ফার্ষ্ট ডিভিসনে—ওঃ, ইনিই? নমস্কার!

ইন্দু প্রতি-নমস্কার করিলে, ছায়া বলিল, আজ আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করা হবে না। ঐ যে, মা'র শুভাগমন হচ্ছে। মা যদি শোনেন বয়সে এত ছোট হয়েও আপনি ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস ক'রে ফেলেছেন, খোঁটা শুনতে শুনতে আমার প্রাণান্ত হবে! তার চেয়ে পরে বরং একদিন—

—ছায়া!

—এই যে মা।

—বিমল চল বাবা, বাইরে বসি গে, চমৎকার প্লে করছে এরা।

—চলুন।

ছায়ার মা ও ছায়া অগ্রে অগ্রে, বিমল ও ইন্দু তাঁহাদের অনুগমন করিয়া চলিলেন।

ইন্দু নিম্নস্বরে বলিল, আবার কবে আসবে বল?—মনে পড়িল, আমার প্রতিবন্ধকতা আছে। আবার বলিল, দেখা না হলে আমার যে বড় কষ্ট হয়।

—আর আমার বুঝি কষ্ট হয় না?

ইন্দুর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়া যবনিকা পতন হইল। বাহিরে একসঙ্গে অনেক লোক কথা কহিয়া উঠিল। হঠাৎ যেন একটা হট্টগোল পড়িয়া গেল।

ইন্দু কৈ—বলিতে বলিতে ইন্দুর মা ও প্রণয় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।

ইন্দু বলিতেছিল, তুমি যদি না আস, আমি যাব। বাবা কখনই 'না' করবেন না, আমি তাঁর সঙ্গে—

কথা বন্ধ হইয়া গেল। সম্মুখে প্রণয়, তাঁহার সঙ্গে ইন্দুর মা!

মা ডাকিলেন—ইন্দু!

ইন্দু নিঃশব্দ।

মা গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, এখানে কি করছ? চলে এস।

যে যেখানে ছিল, সকলে সেই দিকে চাহিল। যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

ছায়া, ছায়ার মা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বিমলের মাথাটা তাহার বুকের উপরেই ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

ইন্দুর কাণ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। একটা কড়া জবাব দিতে না পারিলে যেন সে ফাটিয়া পড়িবে, এমনই তাহার অবস্থা।

এই সময়ে প্রণয় তাহার পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন—চল ইন্দু, এখানে বড় গরম, বাইরে যাই।

ইন্দু নিঃশব্দে তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। এই লোকটির সঙ্গ যতই অবাঞ্ছনীয় হউক না কেন, এ সময় সেখান হইতে বাহির হইতে পারিলেই যেন সে বাঁচে!

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে!

হেরম্বনাথ 'তাস পাশা পাচালী' শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, কাহারও জাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও দেখিলেন, গৃহিণী খাটের মধ্যে শুইয়া হাত-পাখা নাড়িতেছেন —অর্থাৎ জাগিয়া আছেন। পাছে ঘুম আসে, ঘুমাইয়া পড়েন, তাই এই কৃচ্ছ্রসাধন। হেরম্বনাথ বলিলেন, পাখা বন্ধ কেন?

খারাপ হল নাকি? কখন খারাপ হল? মিস্ত্রীকে ডেকে বল নি কেন, আমি ডাকছি, র'স—ইত্যাদি।

গৃহিণী শশব্যস্তে বলিলেন, না, না পাখার কিছু হয় নি। কাউকে ডাকতে হবে না।

হেরম্বনাথ উদ্বেগমুক্ত হইয়া কহিলেন, তা'হলে পাখাটা খুলে দিই, কি বল?

গৃহিণী কিছু বলিলেন না।

হেরম্বনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা সব শুয়েছে?

—হ্যাঁ।

হেরম্বনাথ অধিকতর আশ্বস্ত হইয়া আলোটি নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তিনি যে মুহূর্ত্তে শয়ন করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গৃহিণী উঠিয়া বসিলেন এবং পরমুহূর্ত্তে নিজের খাট ছাড়িয়া এ খাটের ধারটিতে আসিয়া বসিবার উদ্যোগ করিলেন। হেরম্বনাথ তাহা বুঝিলেন, একগাল হাসিয়া হাত বাড়াইয়া গৃহিণীকে ধরিয়া বসাইয়া দিয়া, বলিলেন, কি গো, কি খবর?—বলিয়াই হাসি। অনেক দিন পরে যেন অনেকখানি রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছেন।

গৃহিণী তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, সরে শোও।

হেরম্বনাথ সাহ্লাদে সরিয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, এখানে শোবে? এস এস, আয়াহি বরদে দেবি।

—খুব রসিকতা হয়েছে! থাম।—বলিয়া গৃহিণী আস্তে আস্তে পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন।

হেরম্বনাথ বলিলেন, ওদের ঘরের দরজাটা—

তার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, বন্ধ আছে।

বেশ বেশ, বলিয়া হেরম্বনাথ এমন কতকগুলি ভাবভঙ্গী অভিব্যক্ত করিলেন যাহা প্রকাশ করা শুধুই অসঙ্গত নহে, অশোভনও বটে।

গৃহিণী বলিলেন, এই ফাল্গুন মাসেই আমি ইন্দুর বিয়ে দোব।

—ফাল্গুন মাসেই! ভাল দিন আছে, পাঁজী দেখিয়েছ? আজ কত তারিখ?

—চোদ্দই। কাল তুমি পুরুত মশাইকে ডেকে দিন দেখাও।

—তা বেশ।

—স্যাকরাকেও খবর দিও।

—তা দোব।

কথা ফুরাইয়া গেল। কিন্তু এত শীঘ্র ফুরাইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে বুঝিয়া গৃহিণী বলিলেন, ইন্দুকে নিয়ে তুমি একদিন সাহেব স্যাকরাদের বাড়ী ঘুরে এস-না। নতুন নতুন কত সব গহনা বেরিয়েছে, দেখে পছন্দ করে নিতে পারবে।

হেরম্বনাথ বলিলেন, তার আর কি, কালই নিয়ে যাব।

গৃহিণী বলিলেন, আবুদি'র সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, ওরা কিছুই চায় না, বরং প্রণয়ের প্রথম বউয়ের দশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়নাগাটী ইন্দুই সব—

হেরম্বনাথ বলিলেন, কার গয়নাগাটী বলছ?

—আহা, প্রণয়ের প্রথম বউ গো! সে বউ বিয়ের পরই মারা গেছে না!

—প্রণয়! প্রণয় কে?

গৃহিণী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া, রাগত স্বরে বলিলেন, প্রণয় কে, তুমি জান না? ন্যাকা আর কি!

হেরম্বনাথ ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত!

এই ন্যাকা, পদার্থহীন লোকটার উপর গৃহিণী হাড়ে চটিয়া গেলেন। কিন্তু চটিয়া থাকিলে কার্য্য উদ্ধার হয় না, তাই আবার নরমও হইলেন, বলিলেন, তোমার মতো ভুলো লোক যদি আর একটি থাকে! প্রণয়কে এরই মধ্যে ভুলে গেলে? প্রণয় গো প্রণয়! আবুদি'র সেজ দেওর। ডেপুটী।

ঘরে যদি আলো থাকিত, গৃহিণী দেখিতেন, বিছানার মধ্যে হেরম্বনাথ আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি কর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন না, কর্ত্তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটুকুও যে লয় পাইয়াছে ইহাও বুঝিতে পারিলেন না। ভাবগদগদ-চিত্তে বলিলেন, তার সঙ্গে ইন্দুর আমার খুব ভাব হয়েছে যে! ইন্দুকে বেড়াতে নিয়ে যায়, মোটর চালান শেখায়, কাল রাত্রে গড়ের মাঠে নিয়ে গেছল।

হেরম্বনাথ আরও আড়ষ্ট হইলেন।

—আমরা ত একটু আগে ওদের ওখান থেকেই আসছি কিনা, প্রণয় নিজে ইন্দুকে পাশে বসিয়ে ডিনার না-কি-বলে-যে তাই খেলে। কি রকম ক'রে কাঁটা ধরতে হয়, চামচ ধরতে হয়, খাওয়া শেষ হ'লে কাঁটা চামচ কি ভাবে রাখতে হয় সব বোঝাচ্ছিল! মাগো, এতও আছে সব।

হেরম্বনাথ বলিলেন, ইন্দু কাঁটা চামচ ধরে খেতে পারলে ?

কেন পারবে না, প্রণয় সব দেখিয়ে দিতে লাগল !

—বল কি ! ইন্দুর বাবা, তার বাবা, তাঁর বাবা, তাঁরও বাবা যা পারেন নি, ইন্দু তাই পারলে ?

দেখলেই পারা যায়। তুমি চেষ্টা করলে বুঝি পার না ?

হেরম্বনাথ বলিলেন, এ জন্মটা ত কেটেই গেল, ফিরে জন্মে চেষ্টা করা যাবে। সে যাক্, ইন্দু কি বলে ?

গৃহিণী মনে মনে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, কিসের কি বলে ?

—এই বিয়ের ?

—কি আবার বলবে ? চুপ করে থাকে।

—কেন, চুপ করে থাকে কেন ?

—চুপ ক'রে থাকবে না ত লাফালাফি ক'রে বেড়াবে নাকি ? অমন ঘর বর, হাকিমের বউ হবে, কে না চায় ? তবে যদি বল, দোজ পক্ষ ! তা সে নামেই দোজ পক্ষ ! বউটা রোগে রোগে একদিনের জন্যে ঘর করতে পায় নি। ইন্দুর খুব ইচ্ছে আছে, বুঝেছ ?

হেরম্বনাথ কথা কহিলেন না।

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, প্রণয় কাল বিকেলে আসবে বলেছে, তার আগে তুমি পুরুত মশাইকে ডাকিয়ে আশীর্ব্বাদের সময় কখন্ আছে জেনে নিও, কালই আশীর্ব্বাদ করব। বুঝলে ত ?

বোধহয় হেরম্বনাথের নিদ্রাবেশ আসিতেছিল, জড়িতমৃদু-কণ্ঠে কহিলেন, হুঁ।

গৃহিণী অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রণয়দের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা, তাহার উচ্চপদ, মোটা মাহিনার কথা, তাহার সৌখীনতার কথা, তাহার মোটর গাড়ীর কথা বিনাইয়া বিনাইয়া নানা ছাঁদে বলিয়া চলিলেন। হেরম্বনাথ কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না – সাড়া দিলেন না। তিনি নিদ্রিত মনে করিয়া গৃহিণী ধাক্কাধাক্কি করিয়াও যখন সাড়া আদায়ে অক্ষম হইলেন, তখন পাস ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হেরম্বনাথের সারারাত্রি ঘুম হইল না। ঘুম না হইবার এমন কোন্ গুরুতর কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। ইন্দু যদি প্রণয়কে বরমাল্যদানে সম্মত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত সমস্ত সমস্যাই সমাধান হইয়া গিয়াছে। প্রণয়ের ঐশ্বর্য্য, উচ্চপদ, বিলাস-ব্যসন যদি তাহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে, তাহা হইলে ত আর কোন কথাই নাই, কিন্তু ইন্দু কি সেই মেয়ে ?

হেরম্বনাথ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অন্ধকারে অনেক ভাবিলেন এবং শেষ এই মীমাংসায় উপনীত হইলেন যে ভগবান যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্য।

এতবড় একটা সান্ত্বনা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়া তিনি আর শয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। নিঃশব্দে উঠিয়া নীচে গিয়া ফুলবাগানের একটি বেঞ্চে বসিয়া তামাকের ফরমায়েস করিলেন। তখনও সকাল হয় নাই। তামাক পুড়িয়া ছাই হইবার পূর্ব্বেই সকাল হইয়া পড়িল।

গৃহিণী আসিয়া হাসিমুখে সোহাগ-স্বরে বলিলেন, কখন্ চুপি চুপি পালিয়ে এলে বল ত ?

হেরম্বনাথ রসিকতা করিয়া বলিলেন, পালাব না ত কি ভয় করব ?

গৃহিণী অভিমানভরা গলায় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, তা নয় ত কি ! আমি যে বাঘ, একদিন যদি বা কাছে এলুম, বাবু পালিয়ে এলেন বিছানা ছেড়ে।

হেরম্বনাথ বলিলেন, শ্লোকটা বলব নাকি ?

—কি আবার শ্লোক ?

সেই যে—

দিনকা মোহিনী
রাতকা বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে
দুনিয়া সব বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।

গৃহিণী বক্রকটাক্ষসহকারে বলিলেন, থাক্ থাক্, খুব শ্লোক পড়েছ। শোন, পুরুত মশাইকে আনতে গাড়ীটা পাঠিয়ে দাও-না।

— গাড়ী পাঠাতে হবে ? এখনি ?

—গাড়ী পাঠালে এখনই চলে আসতে পারেন, নইলে কখন্ তাঁর ফুর্সৎ হবে, বুড়ো মানুষ শরীর যদি ভাল না-ই থাকে, হয়ত আসতেই পারবেন না, তার চেয়ে গাড়ীটা পাঠিয়ে আনানই ভাল।

—আচ্ছা, দিচ্ছি পাঠিয়ে।

ভৃত্যকে ডাকিয়া তদনুযায়ী আদেশ দেওয়া হইলে, গৃহিণী কহিলেন, শোন তুমি যেন ইন্দুকে এখনি কিছু বলে বসো না।

হেরম্বনাথ বলিলেন, বলবো না?

গৃহিণী কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, বলতে চাও বলো। তবে আমি বলছিলুম কি, একেবারে আশীর্ব্বাদের সময় বললেই হবে।

হেরম্বনাথ তাহাই মানিয়া লইয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। এই সময়ে টুথব্রাশে দাঁত ঘষিতে ঘষিতে এক মুখ ফেনা লইয়া ক্ষণা সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর দিদি ওঠে নি রে?

—উঠেছে। অ-নে-ক-খো-ন।

—কোথায়?

—ওদিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে।

হেরম্বনাথ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—শুয়ে কেন? অসুখ-বিসুখ নয় ত?

ক্ষণা শুনিতে না পায় এমন ভাবে কর্ত্তাকে ছোটখাট একটি ধমক দিয়া গৃহিণী বলিলেন, থাম, থাম! অসুখ হতে যাবে কেন!—ক্ষণাকে বলিলেন, এক মুখ ফ্যানা ক'রে দাঁড়িয়ে কি করছিস, যা মুখ ধুগে।

ক্ষণা চলিয়া গেল।

গৃহিণী রুক্ষস্বরে কহিলেন, সারা সকাল ভড়াৎ ভড়াৎ করে তামাকই টানবে? চা-টা খেতে হবে না? বলিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন।

পুরোহিত মহাশয় আসিলে সাবধানতা সহকারে গৃহিণী তাঁহাকে লইয়া কর্ত্তার বৈঠকখানায় বসাইলেন। সন্ধ্যার পরে আশীর্ব্বাদের লগ্ন পাওয়া গেল এবং দেখা গেল ফাল্গুন মাসের ২৯ তারিখে গোধূলিক্ষণে বিবাহের লগ্নও আছে।

হেরম্বনাথ তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। গৃহিণী যতই নিঃসন্দেহ হউন না কেন, তাঁহার সন্দেহের অভাব ছিল না। স্ত্রী-চরিত্রের দৃঢ়তা যতই ক্ষণভঙ্গুর হউক না কেন, ইন্দুর সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল এবং এই আশঙ্কা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই যে সারা সকাল ইন্দু উপরেই থাকিয়া গেল, একটি বারও নীচে আসিল না, সম্ভাবিত পরিণয়জনিত লজ্জাই যে ইহার একমাত্র কারণ নহে, তাহা এই ভোলাভোলা লোকটিরও অজানা ছিল না। বিবাহের কথায় মেয়েরা লজ্জা পায় সত্য; কিন্তু সে লজ্জা তাহাদিগকে লোকচক্ষুর অন্তরালে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। ঊষার তরুণালোকের মত রক্তরাগে তাহা প্রকাশই মাগে।

গৃহিণী বারম্বার বলিয়া দিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিতে। কাজকর্ম্ম অনেক আগেই চুকিয়া গিয়াছিল কিন্তু গৃহে ফিরিতে হেরম্বনাথের মন সরিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল, সন্ধ্যায় যাহা হইবার, হইয়া যাক্, তারপর বাড়ী ফিরিলেই হইবে। ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ? ভাবী জামাতাকে আশীর্ব্বাদ?—তাহার জন্য দিন-ক্ষণ-লগ্ন খুঁজিতে হইবে না। সমস্ত দিনই সুদিন, সমস্ত ক্ষণই মাহেন্দ্রক্ষণ।

এদিকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রণয়কুমার আসিয়া বসিলেন। ঘটনাচক্রে ইন্দুর স্কুল-সহপাঠী কয়েকটি কিশোরী অপরাহ্নে আসিয়া পড়িয়াছে, ইন্দু তাহাদের লইয়া খুবই ব্যস্ত। গৃহিণীর পক্ষে ইহা শাপে বর হইয়া দাঁড়াইল।

প্রণয়কে একাকী পাইয়া কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া তিনি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষেই আমরা দিন ঠিক করেছি।

প্রণয় সাশ্চর্য্যে কহিলেন, কিসের দিন?

গৃহিণী বলিলেন, কেন আবুদি কিছু বলে নি তোমায়?

'তোমায়' শব্দটি প্রণয়ের কাণে ও মনে খট্‌কা ধরাইয়া দিয়াছিল। অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, বৌদি? কৈ—কিছু ত—

—তাহ'লে বোধ হয় ভুলে গেছে। তা'তে আর কি হয়েছে। আমিই বলি।—বলিয়া গৃহিণী একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। দূরে কোন ঘরে মেয়েরা হুল্লোড় করিতেছে, গানের শব্দও মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে, উচ্চ হাসির রোলও ভাসিয়া আসিতেছে। গৃহিণী মনে মনে বক্তব্যটি গুছাইয়া লইলেও বলিবার সময় বেশ গুছাইয়া বলিতে পারিলেন না।

বলিলেন—ইন্দুকে ত তুমি ভালবাস বাবা! তাই বলছিলুম কি, ফাল্গুনেই যাতে দু' হাত এক হয়, তাই করতে হবে।

প্রণয় বিস্ময়-বিস্ফারিতের মত চাহিয়া বলিল, আপনি বিয়ের কথা বলছেন?

ইহার পরে গৃহিণী অনেক কিছুই বলিয়া চলিলেন, সে সকলের একটি কথাও প্রণয়ের কাণের মধ্যে প্রবেশ করিল না।

ইন্দুর মা ইদানীং আধুনিক পদবাচ্যা হইবার চেষ্টা করিতেছেন সত্য ; কিন্তু আধুনিকতার কোন গুণই তাঁহার ছিল না। প্রণয়ের মনের ভাব তাহার নিকট সম্পূর্ণই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। তিনি সেকাল ও একালের মধ্যে তাঁতির মাকুর মত ঘোরাফেরা করিতেছেন, কোথাও স্থির হইতে পারিতেছেন না। প্রণয়কে নির্ব্বাক নিরুত্তর দেখিয়া তিনি ভাবিলেন এই সময়ে একবার ইন্দুকে আনা দরকার। যেমন মনে হওয়া, অমনি আসন ত্যাগ।

—একটুখানি বস বাবা, ইন্দুকে বলি তোমার চা জলখাবার আনতে।—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

ইন্দুদের ঘরে ঢুকিয়া আদর করিয়া বলিলেন, ইন্দু, একটু তাড়াতাড়ি নে মা, কাজ আছে।

মা বাহির হইবামাত্র মেয়েরা বিদায় লইবার জন্য উদগ্রীব হইলে ইন্দু সকাতরে বলিল—না ভাই, এখনই না।

—তোমার মা যে ভাই—

—তা হোক্!

প্রণয় আসিয়াছে এবং ইহারা বিদায় লইলে ছাগশিশুর মত তাহাকে যূপকাষ্ঠের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা মনে করিতেও ইন্দুর দেহ মন অবশ হইয়া আসিতেছিল।

গৃহিণী প্রণয়কুমারের চা জলখাবারের বন্দোবস্ত করিয়া হল ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, প্রণয় কক্ষের মধ্যস্থলে অবনতশিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণয় বলিল,—আজ আমি চললুম।

গৃহিণীর মাথায় যেন বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার কণ্ঠ দিয়া একটি শব্দও বাহির হইতে চাহিল না। কিন্তু না বলিলেও নয়। প্রণয় যে পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

—তোমার চা খাবার—

—আজ থাক। বিশেষ কাজ আছে—বলিয়াই প্রণয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

গৃহিণী অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলেন। মেয়েদের হাস্যকলরোল তাঁহার কাছে ভূতের অট্টহাস্য বলিয়া বোধ হইতেছিল।

প্রণয়ের বিদায়বার্ত্তা ইন্দু জানিতে পারে নাই। মেয়েদের সে কিছুতেই ছাড়িবে না। কিন্তু গৃহিণীর পক্ষে রঙ্গ-তামাসা সহ্য করা এখন অসম্ভব। তিনি কণাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন, দিদিকে বল, এইখানে আসতে।

কণা মায়ের কণ্ঠ ও ভাব অনুকরণ করিয়া সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিতে মেয়েদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি আরম্ভ হইয়া গেল। ইন্দু তাহাদের সামনে আর একটি মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

অথচ ঠিক এই মুহূর্ত্তে এই সভা ভঙ্গ করা সহজ নহে : সভা ভাঙ্গিয়া দিলে বন্ধুদের মধ্যে নানারূপ আলোচনার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সব দিক ভাবিয়া ইন্দু বিহ্বল হইয়া পড়িল। ইহারই মধ্যে তাহার একটি বন্ধু কণাকে ধরিয়া কতকটা রহস্য বাহির করিয়া লইয়াছিল, সেই অগ্রসর হইয়া ইন্দুকে শুনাইয়া অন্য সকলকে কহিল, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে ভাই! ছিঃ ছিঃ, তিনি এতক্ষণ ধরে বসে আছেন আর আমরা ইন্দুকে আটকে রেখেছি! ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়। চল, চল।

'চলিতে' কাহারও আপত্তি ছিল না, কিন্তু যিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছেন সেই তিনিটি কে, তাহা না জানিয়া চলাও যায় না। এক সঙ্গে অনেকেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল, কে বসে আছেন ভাই?—তাহারা ইন্দুকে ধরিয়া পড়িল, বলবি নে ত? আচ্ছা ভাই, দেখা গেল! বুঝলুম! বেশ ভাই বেশ!

কণা এক পাশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল, একজন গিয়া তাহাকে ধরিল, কে বসে আছেন, কণা?

কণা বলিল, কৈ, কেউ বসে নেই ত!

যিনি গোপনীয় তথ্য আবিষ্কার করিয়া কলম্বাস-সুলভ গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, সকলে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি পুনরায় কণার আশ্রয় লইলেন। কণার কাণে কাণে কি বলিলেন, কণা তাহার উত্তর বেশ মোটা করিয়াই দিল ; বলিল—প্রণয়দা ত! তিনি ত চলে গেছেন।

প্রণয় দা কে, প্রণয়ের সঙ্গে পরিণয়ের নিকট সম্বন্ধ আছে কি না, তিনি কবে হইতে আসিতেছেন, কি করেন, দেখিতে কেমন?—প্রশ্নশরজালে কণা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল।

বরং মাথের পানে চাহিয়া ক্ষণা হতভম্ব হইয়া গেল। মুখখানা ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে।

পরিদিদির বন্ধুরা তবুও ছাড়ে না। প্রণয় রোজ আসেন কি না, দিদির সঙ্গে গল্প করেন কি না ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ক্ষণা বলিল, প্রণয়দা দিদিকে বিয়ে করতে চায়! বলিয়াই সে ছুট দিল।

—হ্যাঁ ভাই ইন্দু, আমাদের বলবি নে ভাই?

ইন্দু বলিল, কি বলব?

একটি মেয়ে ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, নেকু খুকু আমার! কিছু জানেন না, ভাজা মাছটি উল্টে খেতেও জানেন না গো!

ইন্দু কথা বলিল না।

সখীরা বলিলেন—আমাদের দেখাবি নে?

—কি দেখাব?

—বর।

ইন্দু আস্তে আস্তে অথচ প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া কহিল, আমার বরকে তোরা সবাই দেখেছিস।

—যাঃ, মিথ্যে কথা! কেন ভাই আমাদের ঠকাও। আমরা ত ভাই চিল নই যে ছোঁ মারব! তোমার বরটিও পান্তুয়া নয় যে আমরা খপ্ করে ধরে টপ্ ক'রে পেটে পুরে ফেলব! এই বুঝি আমরা বন্ধু তোমার!—অভিযোগের আর অন্ত নাই।

ইন্দু বলিল, আমি ত বলেছি ভাই, তোমরা দেখেছ তাঁকে।

—কবে দেখলুম বল?

—কতদিন, কতবার দেখেছ! আজ ক'দিন এ বাড়ীতে আসেন না তাই, নইলে যখনই তোমরা এসেছ, তাঁকে দেখেছ—

একজন বলিল, ওঃ, সেই বিমলবাবু?

ইন্দু নতচক্ষু।

তবে যে ক্ষণা বললে, কে প্রণয়—

—বিয়ে ত একবারই হয় ভাই। আমার বিয়ে তাঁর সঙ্গে হয়ে গেছে। আবার যদি বিয়ে করতে হয় তাহ'লে যমকেই করব।

ক্ষণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, বাবা এসেছেন, তোমায় ডাকছেন। ছুটটে!

আঃ! ইন্দু বাঁচিয়া গেল। প্রবল গ্রীষ্মের পর বারিধারায় ধরিত্রী যেমন শীতল হয়, পিতার আগমন-সংবাদে ইন্দুর মনও শান্তি লাভ করিয়া বাঁচিল।

—বাবা কোথা রে?

—নীচে, বাগানে।

—মা?

—ওপরে, শুয়ে আছেন। বাবা তোমায় চুপি-চুপি ডেকে আনতে বললেন। এস!

ইন্দুর বিরস মুখে হাসির রেখা ফুটিল। [ক্রমশঃ

আমাদের আদর্শ

……প্রাচীন আদর্শে ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া এই দুর্ভাগা জাতির আর মুক্তি নাই; পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া আদর্শচ্যুত আমরা, বিলাস-বাসনার বিকারে ও ভারে যে ভাবে পীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছি, অচিরাৎ প্রাচীন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই সকল বাহুল্য বর্জ্জন না করিলে আমরা বাঁচিব না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের সাধনা যদি আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে নূতন শ্রীকেও প্রতিষ্ঠা দিতে পারিব—

বিজ্ঞান জগৎ

বৈজ্ঞানিকের ভবিষ্যদ্বাণী

—কাজী মোতাহার হোসেন

বিগত ২১ বৎসরের মধ্যে জগতে উদ্ভাবনা-ক্ষেত্রে যে বিপুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে টমাস এডিসন, কর্ণেল ম্যাটর, হাডসন-ম্যাক্সিম প্রভৃতি স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি আশ্চর্য্যজনক, অথচ সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন।

এডিসন বলিয়াছিলেন, "আমরা শীঘ্রই যে পরিমাণ ব্যোম-বিহার দেখিতে পাইব, এখন পর্য্যন্ত তাহার কল্পনাও করিতে পারি না।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "ডাক লইয়া ছোট ছোট এরোপ্লেন ঘণ্টায় একশত মাইল বা তদপেক্ষাও অধিক দ্রুত গমন করিবে।"—১৯৩৪ সালে একখানি এরোপ্লেন ঘণ্টায় ৪০০ শত মাইলেরও অধিক দ্রুত উড়িয়াছিল।

১৯১০ সালে হাডসন-ম্যাক্সিম বলিয়াছিলেন ছাদের উপর এরোপ্লেনের অবতরণভূমি এবং আকাশ-পোতাশ্রয় হইবে। এই পৃষ্ঠায় তাঁহার কল্পনা চিত্রিত হইয়াছে।

তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠিক কেমন করিয়া ঘটিবে বলা যায় না, তবে ইহা নিশ্চিত যে বিনা তারে পৃথিবী হইতেই উড়ন্ত জাহাজাদির মোটর-যন্ত্রে বৈদ্যুতিক-শক্তি চালনা করা যাইবে। এইরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।"—এই ভবিষ্যদ্বাণী এখনও সফল হয় নাই বটে, কিন্তু বহু বৈজ্ঞানিক এখন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন।

রেলপথ-নির্ম্মাতা জেম্‌স্ জে. হিল (James J. Hill) লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "১৯৩০ সালে যুক্ত প্রদেশের লোকসংখ্যা ১২,৫০,০০,০০০ হইবে, এবং এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় এই দেশকে ২০,০০,০০,০০০ লোকের ভরণ-পোষণ ও কর্ম্ম-নিয়োগ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।" বাস্তবের সঙ্গে এই কথা হুবহু মিলিয়া যাইতেছে।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিশারদ লুথার বারব্যাঙ্ক (Luther Burbank) মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—"মানুষ এখনও তাহার পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত যোগ্যতম লোক টিঁকিয়া থাকে। বাছাই হইতে হইতে দুর্ব্বলেরা লোপ পাইবে; অতীতে যাহারা যোগ্যতম ছিল, ভবিষ্যতে আর তাহারা যোগ্যতম থাকিবে না। ভবিষ্যতের মানুষ বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক বিষয়ে পৃথক রকমের জীব হইবে। আজকাল আমরা আমাদের

ঐ বৎসর, অর্থাৎ প্রথম এরোপ্লেন-যাত্রার মাত্র সাত বৎসর পরে, এডিসন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তখনকার দিনে লোকের নিকট উদ্ভট ও দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাব-সূচক বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু অদ্য সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

বরং বা... বেদিগের যে দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি, ভবিষ্যতের মানুষ অনেকটা সেই দৃষ্টিতে দেখিবে।"
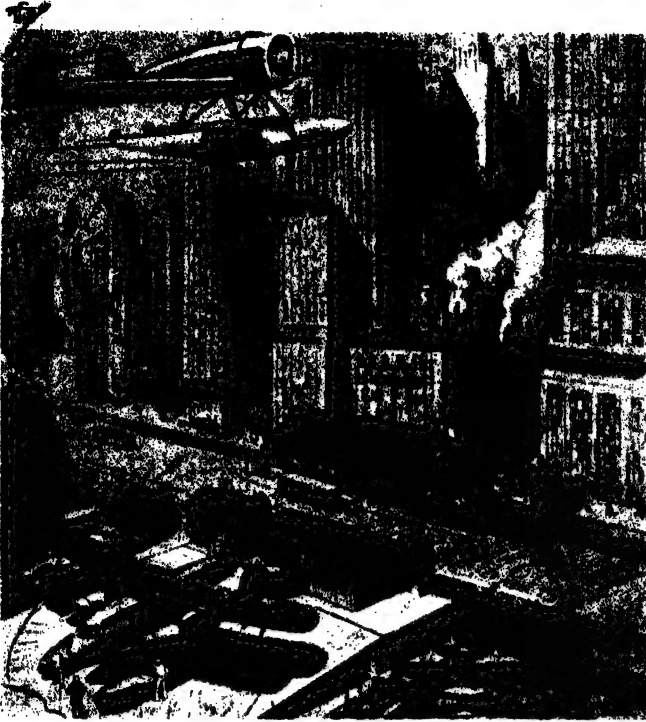
বাস্তবিক পক্ষে হাডসন-ম্যাক্সিমের কল্পনার যে আংশিক সফলতা হইয়াছে, এই ছবিতে তাহাই দেখান হইয়াছে। (পূর্ব্বপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

স্বয়ং-যান সম্বন্ধে আরভিং টুয়োম্বলি (W. Irving Twombly) বলিয়াছিলেন, "এখন (১৯১০ সালে) মোটরগাড়ী দেখিতে দুগ্ধবাহী গো-যানের মত বটে; কিন্তু ভবিষ্যতে ক্রমশঃ ইহাতে উৎকৃষ্ট ও টেঁকসই সাজসরঞ্জাম ব্যবহৃত হইবে; চলিষ্ণু অংশের ওজন ও আয়তন হ্রাস পাইবে, এবং ঐ সমুদয় অংশ আয়তনে এবং অন্যান্য ব্যাপারে এমন হইবে যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে ঐ সমুদয় অংশ নষ্ট হইয়া গেলেও সহজে ও অল্পমূল্যে প্রস্তুত করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।" * * * * "প্রমোদ-যানের সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইবে, এবং মোটরে চড়িবার আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে। এখন আমরা গতি-উৎপাদক মোটরাদি বলিতে যাহা বুঝি, তদপেক্ষা অনেক ঘাতসহ, দীর্ঘস্থায়ী এবং কর্ম্মক্ষম মোটর ব্যবহারে আসিবে, অথচ ওজনে অত্যন্ত কম হইবে।...আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৩০ সালের মধ্যে) মাত্র ৫০০ ডলার মূল্যে ২০ অশ্ববলের মোটর কিনিতে পাওয়া যাইবে, এবং বর্ত্তমানে যেগুলি ২০০০ হইতে ৫০০০ ডলার মূল্যে বিক্রীত হয়, তদপেক্ষা সেই ৫০০ ডলারের গাড়ী অধিক টেঁকসই এবং আরামপ্রদ হইবে।"—

বাস্তবিকই আজকাল আমেরিকায় ৫০০ ডলারে ২০ অশ্ববলের চেয়েও অধিক শক্তিশালী মোটর গাড়ী পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের টি. ব্যারণ রাসেল (T. Baron Russell) ১৯১০ সালে যাহা যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহার অধিকাংশই ফলিয়াছে; সামান্য সামান্য কাজ করিতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ধূলা-ময়লা ঘাঁটিয়া যে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"নব যুগ পরিচ্ছন্নতার যুগ হইবে। রন্ধনকার্য্য এখন অপেক্ষা অনেক অল্প বিরক্তিকর হইবে। কোন রাঁধুনীকে জ্বলন্ত অগ্নির সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাজ করিতে হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।......

"তাপ বিকীরণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইলে, দেখা যাইবে যে শক্তিপুঞ্জের উৎস-স্বরূপ সূর্য্যদেব অনবরত সর্ব্বপ্রকার রোগের বীজাণু-নাশক কিরণ আমাদের উপর বর্ষণ করিতেছেন।"—রক্তহীনতা, সবুজ জ্বর ব্যাধি, ক্ষয় রোগ প্রভৃতিতে রৌদ্র-স্নানের মূল্য সম্বন্ধে এখন আলোচনা চলিতেছে।

বিখ্যাত উদ্ভাবক হাড্‌সন-ম্যাক্সিম বলিয়াছিলেন "পৃথিবীর সহিত আকাশকে সংযুক্ত করিবার দিন আসিয়াছে। আমাদের সময়ে আকাশযানের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহার ফলে ভবিষ্যৎ স্থাপত্য-শিল্পের অশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। শীঘ্রই যে সব অগণ্য এরোপ্লেন প্রান্তরাকাশ ও নগরাকাশে

আকাশমুখী নগর (আদি যুগ): ১৮৮৪ সালে নিউইয়র্ক।

ভিড় জমাইবে, সেগুলির অবতরণ-ভূমি ও অবস্থান সম্বন্ধে আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। আকাশের সহিত মিলিত হইবার জন্য সহর ঊর্দ্ধমুখে বৃদ্ধি

পাইবে। ছাদের উপরেই বৃহৎ বৃহৎ সেতু এবং প্রবেশ-দ্বার, বাগান, খেলিবার মাঠ, হোটেল প্রভৃতি পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়া সমগ্র সহরকে এক বিরাট ভবনে পরিণত করিবে।"

১৯১০ সালের নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ১০০০ ফিট লম্বা জাহাজের কল্পনাও ছিল। ১৯৩৫ সালেই ইহা পূর্ণ হইবে, বিগত ৩২৫ বৎসরে আমেরিকার উপকূলে যে সব জাহাজ সংলগ্ন হইয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য ৬০ ফিট হইতে বাড়িয়া ১০২৭ ফিট পর্য্যন্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে মহাসাগর অতিক্রম করিতে ৫৯ দিন বা ১৪..৩ ঘণ্টা লাগিত, তাহা অতিক্রম করিতে এখন মাত্র ৪ দিন বা ৯৬ ঘণ্টা লাগিবে। ১৯১০ সালে "অলিম্পিক" ও "টাইটানিক" নামক জাহাজদ্বয় নির্ম্মিত হইতেছিল। কিছুকাল পরে সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় "টাইটানিক" জলমগ্ন হওয়াতে, ৮৮০ ফিট লম্বা 'অলিম্পিক'ই তখন পৃথিবীতে বৃহত্তম জাহাজ ছিল; ইহা ঘণ্টায় প্রায় ২৬ মাইল চলিতে পারিত। "টাইটানিক"-দুর্ঘটনা না হইলে ১৯৩৫ সালের অনেক পূর্ব্বেই ১০০০ ফিট লম্বা জাহাজ অবশ্যই নির্ম্মিত হইত।

আকাশমুখী নগর (মধ্য যুগ) : বর্ত্তমান নিউইয়র্ক।

এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর কতকগুলি এখন বাস্তব ইতিহাসের অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিকের ভবিষ্যদ্বাণী কি পরিমাণে মানব-প্রগতির দ্বারা অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বিবিধ

২। মেয়েদের

-তামাসা

ক্যামেরায় দড়িবাজীর ছবি

ভারতীয় যাদুকরেরা যে দড়িবাজীর জন্য বিখ্যাত, তাহা কি ...মা কেহ দেখাইতে পারিয়াছে? ইংলণ্ড হইতে প্রকাশিত এই ফটোগ্রাফ-দৃষ্টে

দড়িবাজীর ফটো।

বোধ হয়, যেন একজন ফকির রজ্জু-কৌশল দেখাইতে উদ্যত হইয়াছে। রজ্জু-কৌশলের কাহিনী এইরূপ :—"একখণ্ড রজ্জু বায়ুমধ্যে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়; আর তখনই উহা এতদূর শক্ত হইয়া যায় যে একটি বালক উহা বাহিয়া উপরে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।" সন্দিগ্ধ লোকেরা এই চমৎকার ছবিখানা পরীক্ষা করিয়া হয়ত বলিবেন যে, রজ্জুগাছি রজ্জু নহে, লৌহনির্ম্মিত দণ্ড মাত্র; বালকটি ইহার উপর উঠিয়া, ফটো তুলিতে যতক্ষণ লাগে অন্ততঃ ততক্ষণ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। ব্যবসায়ী যাদুকরেরা কিন্তু যে-কোন ব্যক্তিকে এই কৌশল দেখাইবে বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে।

জোনাকি পোকার সমবেত প্রজ্জ্বলন

ঠিক কি কারণে, বলা যায় না, কিন্তু সময় সময় হাজার হাজার জোনাকি পোকা অকস্মাৎ একযোগে জ্বলিয়া উঠে, আবার একযোগে নিভিয়া যায়;—

বরং যাও যেন কোন ঐক্যতান-বাদকের ইঙ্গিত অনুসারে উহাদের দীপ্তি মুর্চ্ছনাশিত ও অপহৃত হয়। ওহিও নগর হইতে সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকার একজন পাঠক এই বিষয়ে নিম্নলিখিত রূপ বিবৃতি দিয়াছেন :—

"নদী তীরে প্রায় দুই শত গজব্যাপী উচ্চ বৃক্ষের শ্রেণীর মধ্যে আমি জোনাকি-পুঞ্জের আলোর খেলা দেখিতেছিলাম। হঠাৎ একটি বিষয়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ আলোক-বিন্দু অন্ধকারের পটে যদৃচ্ছাক্রমে জ্বলিতেছিল, নিভিতেছিল; তারপর উহাদের প্রজ্জ্বলন ও আলোক-সম্বরণ ক্রমশঃ নিয়মিত হইতে লাগিল। অবশেষে, কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর উহারা একযোগে দীপ্যমান হইতে লাগিল। এক দীপ্তি হইতে অন্য দীপ্তির মধ্যে কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ অন্ধকার হওয়াতে, দৃশ্যটি বড়ই মনোরম দেখাইতে লাগিল। এই সময়ে জোনাকিগুলি সর্ব্বত্র প্রায় সমভাবে বিস্তৃত ছিল।

তারপর ঐ বৃক্ষ-শ্রেণীর উভয় প্রান্তে মাত্র আলোক প্রকাশিত হইল। এই আলোক-শ্রেণীদ্বয় উভয় পার্শ্ব হইতে পরস্পরের সন্নিহিত হইতে হইতে মধ্যস্থলে আসিয়া মিলিত হইয়া আবার প্রান্তের দিকে প্রত্যাগত হইতে লাগিল। কয়েকবার আলোকপুঞ্জের এইরূপ গমন প্রত্যাগমন হইবার পর, আলোকবিন্দুগুলি এক প্রান্তে একত্র হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে দুইবার একদিক হইতে অন্যদিক পর্য্যন্ত যাতায়াত করিল; ইহার পর আবার পূর্ব্ববৎ এলোমেলো ভাবে প্রজ্জ্বলন সুরু হইল। আমি ইহাতে অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি; কিন্তু এরূপ যে ঘটিয়াছে তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রাণীতত্ত্ব-সংগ্রহে এরূপ ঘটনার আর কোন উল্লেখ আছে কি?"
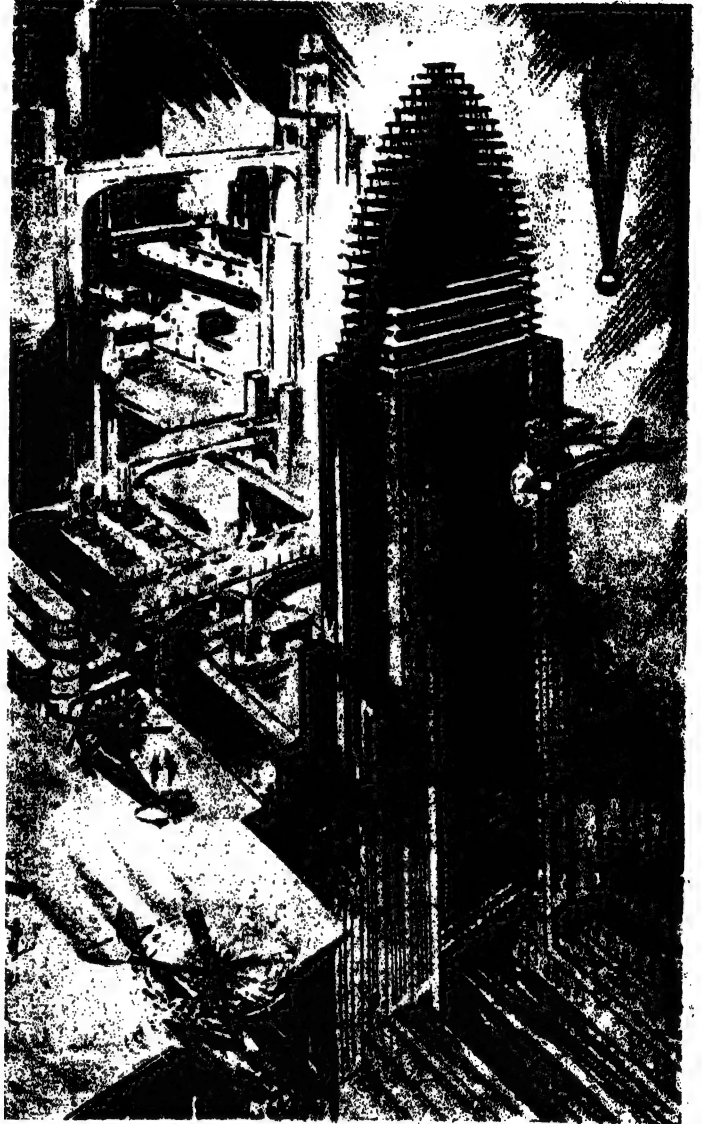
বৈজ্ঞানিকেরা বহুবার এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; বিশেষতঃ আমেরিকার প্রাণীতত্ত্ব-বিষয়ক মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডাঃ ই. ডব্লিউ. গাজার (E. W Gudger) এরূপ বহু ঘটনা লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, এরূপ বৃত্তান্তের অভাব নাই—অভাব ইহার কারণ উদ্ঘাটনের; অর্থাৎ, অনুমানের অতিরিক্ত প্রমাণের অভাব। যতদূর মনে হয়, জোনাকিদের এইরূপ এককালীন প্রজ্জ্বলনের কারণ সম্ভবতঃ এপর্য্যন্ত কেহই সঠিক নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

আকাশমুখী নগর : স্থাপত্য-শিল্পী ২৫ বৎসর পরে নিউইয়র্কের যে রূপ কল্পনা করেন। (৬৩০ পৃষ্ঠা)

যমজের কথা

যাঁহারা যমজ নহেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই যমজদিগের সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক হইয়া থাকেন। যমজ সম্বন্ধে যমজের মত আরও প্রামাণিক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

ডাঃ আলান ফ্রাঙ্ক গাটামেচার (Dr. Allan Frank Guttamacher) যমজ ভ্রাতার মধ্যে একজন। তিনি তাঁহার নব-প্রকাশিত "Life in the Making" (বা "জীব-জীবনের উন্মেষ") নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়ে এ-বিষয়ে অনেকগুলি কথা বলিয়াছেন। একজনকে অপর বলিয়া ভ্রম-প্রসঙ্গে তিনি আত্মজীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা

মার্ক-টোয়েনের প্রসিদ্ধ গল্প হইতেও কম কৌতুকাবহ নহে। তিনি লিখিয়াছেন,

আটলান্টিক অতিক্রমকারী জাহাজের ক্রমবিকাশ। ১৬০: সালে ৬৩ ফুট লম্বা "হাফ মুন" আটলান্টিক অতিক্রম করিয়াছিল। ১৯৩৫ সালে ১০০০ ফু লম্বা 'লাইনার' জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে। আর ৩০০ বৎসর পরে কি হইবে? (৬৩০ পৃষ্ঠা

"আমার ভাই এবং আমি যমজ। সারা জীবন ভরিয়া আমাদের যে-সব অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা যেমন কৌতুকপ্রদ তেমনই অপ্রস্তুত-কারক। অন্য লোকে আমাদের এক জনকে অন্যজন বলিয়া মনে করিবার ফলে এরূপ ঘটনা বহুবার হইয়াছে বলিতে কি, কয়েক স্থলে আমাদের নিজেদের মনেই সন্দেহ লাগিয়াছে,—আমি 'আমি' কিনা।

এই সে দিনের কথা, বৎসর খানেক আগে আমার ভাই আর আমি ছোট একটি পল্লীর হোটেলে অবকাশ-যাপন করিতেছিলাম। একদিন আমরা সন্তরণ-বস্ত্র পরিধান করিতেছি, তখন ভাইকে ডাকিয়া মেয়েদের "নদীতে কি বেশী কাঁটাগাছ আছে ব'লে মনে কর?" কথার কোন ৬... নাই। ইহা বড় অদ্ভুত মনে হইল। ভাইটি সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অথচ জবাব দিতেছে না, ইহাতে আমি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "কালা হ'য়েছ নাকি?" তখন হল-কামরার ওদিককার আর একটি ঘর হইতে পরিচিত কণ্ঠে উত্তর আসিল, "না, কালা হব কেন? কিন্তু এত রাগ কিসের?" আসল ব্যাপার এই, আমি আমার সম্মুখস্থ আয়নার ভিতরকার প্রতিবিম্বকে সম্বোধন করিতেছিলাম।"

গাল্টন (Galton) সাহেব কোন যমজ ভ্রাতৃযুগলের বিষয় এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সন্তানগুলি পাঁচ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতা ও কাকার মধ্যে সর্ব্বদা ভুল করিত। কিন্তু গাটামেচার ভ্রাতৃযুগলের সন্তানেরা প্রথম হইতেই পিতা ও কাকা ঠিক ঠিক চিনিয়াছিল, কখনও ভুল করে নাই।

গালটন বলিয়াছেন, যেসব যমজ-ভ্রাতা পরস্পর অতিশয় সদৃশ, তাঁহাদের কুকুর গন্ধ দ্বারা তাঁহাদিগকে ঠিক ঠিক চিনিতে পারে কিনা, এবিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বেশ হয়।

গাটামেচার লিখিয়াছেন—"আমরা কখনও নিখুঁত ভাবে এরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, কিন্তু আমরা পৃথক্ পৃথক্ বাড়ীতে যে সব কুকুর পুষিয়াছি, তাহার কোনটাই কোন দিন আমাদিগকে চিনিতে ভুল করে নাই। বিড়ালের সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না; কারণ আমাদের পারস্য-

মাঞ্চুরিয়ার দ্রুতগামী ইঞ্জিন। (পর পৃষ্ঠা)

বরং যাহাঁ যেন আমাদিগকে সর্ব্বদা ঠিক ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারে বলিয়া মর্য্যাদ হয় না।"

ডাঃ পাটামেচার বলেন, "যমজ দুই ভাই একই বাড়ীতে থাকিলে, তাহাদের অস্তিত্ব পরস্পর এরূপ জড়াইয়া পড়ে যে, তাহাদের পক্ষে নিজের সম্পূর্ণ সত্ত্বার অস্তিত্ব-বান হওয়া কদাচিৎ ঘটিয়া উঠে—বরং তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজেকে যেন দুই ব্যক্তির অর্দ্ধাংশ মাত্র বলিয়া মনে হয়।

"আমার ভ্রাতা ও আমার বেলায়, এইরূপ ব্যক্তিত্ব-সংমিশ্রণের বহু ঘটনার কথাই মনে পড়ে। আমার খুব মনে আছে, আমাদের দুই জনের মধ্যে এক জনের কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে, আমরা উভয়েই কাপড় বদল করিতে যাইতাম। এই সব লইয়া আমাদের খেলার সাথীরা আমাদিগকে ক্ষেপাইবার জন্য অনেক হাসি-তামাসা করিত।

"যমজেরা যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে, 'আমার' এই আত্ম-বোধক কথাটা তাহাদের জীবনে পরিস্ফুট হয় না—এজন্য তাহারা কতকটা কৃপার পাত্র।

মাঞ্চুরিয়ার দ্রুতগামী ইঞ্জিন

পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় জাপানও স্রোত-রেখানুসারী (stream-lined) দ্রুতগামী যান নির্ম্মাণে মনোযোগ দিয়াছেন। পূর্ব্বপৃষ্ঠার ছবিতে জাপানী ইঞ্জিনিয়ারদের নির্ম্মিত একটি মসৃণ ইঞ্জিন দেখান হইয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত ডাইরেন ও ছিসিং কিং পর্য্যন্ত ৪৪০ মাইল স্থানে এই ইঞ্জিনে ৮॥০ ঘণ্টায় একখানি ট্রেণ চালিত করে। (সুতরাং ঐ গাড়ী গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ৫২ মাইল চলে।) পূর্ব্বে ঐ পথটুকু চলিতে আরও ২ ঘণ্টা অধিক সময় লাগিত। আরোহীদের সুবিধার জন্য যাত্রী-বাহী গাড়ীগুলিতে শীতল বায়ু সঞ্চালিত করা হয়।

জল, বায়ু বা অন্য কোন পদার্থের ভিতর দিয়া কোন বস্তু দ্রুতবেগে চলিলে জল বা বায়ুর কিয়দংশ ঐ বস্তুটির সহিত বাহিত হয়; এবং সন্নিহিত স্থানেও স্রোত বা গতি উৎপন্ন হয়। এই স্রোত নির্দ্দিষ্ট রেখায় প্রবাহিত হয়। উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, মোটরগাড়ী, রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতির আকৃতি স্রোত-রেখার অনুরূপ হইলে উহাদের গমনকালে ঘর্ষণোৎপন্ন বাধা সবচেয়ে কম হয়। ইহাকেই স্রোতরেখানুযায়ী বলা হয়।

গৃহ-নির্ম্মিত আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শী টেলিস্কোপ

শিকাগো সহরের জনৈক সৌখীন জ্যোতির্ব্বিদ স্বহস্তে এক বৃহৎ টেলিস্কোপ প্রস্তুত করিয়াছেন; তিনি বলেন, ইহা এত সূক্ষ্মদর্শী যে, ইহার সাহায্যে দুই মাইল দূর হইতে একটি পকেট-ঘড়ির সময় পর্য্যন্ত দেখা যাইতে পারে। ইহার নির্ম্মাতা ছাপাখানার একজন কর্ম্মচারী। বৃহৎ টেলিস্কোপের প্রত্যাবর্ত্তক (reflector) কাচ বা আয়না নির্ম্মাণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা

গৃহ-নির্ম্মিত আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শী টেলিস্কোপ।

কঠিন। আয়না ঘষিয়া ঘষিয়া এ-কার্য্যও তিনি স্বহস্তে করিয়াছেন। টেলিস্কোপের চোঙাটি পরস্পরসংযুক্ত নল দ্বারা প্রস্তুত। সংযোগ-স্থলের স্ক্রু খুলিয়া চোঙার উপরার্দ্ধ ভাঁজ করিয়া অল্প স্থানের মধ্যেই টেলিস্কোপটি রাখিয়া দেওয়া যায়। ইহার ওজন সওয়া ছয় মণেরও অধিক; তথাপি অবলম্বন-দণ্ডের সহিত চাকা সংলগ্ন থাকাতে অপেক্ষাকৃত সহজে ইহাকে নাড়িয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়। ছবিতে নির্ম্মাতা স্বয়ং টেলিস্কোপের পার্শ্বে প্রত্যাবর্ত্তক-হস্তে দণ্ডায়মান।

অন্তঃপুর

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

[১]

দুপুরের আলো ক্রমে বিলীন হইয়া আসিতেছিল; পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছিল ধীরে ধীরে মৃদু অন্ধকার।

পাখীরা গান গাহিয়া অনেকক্ষণ আগে ফিরিয়া গিয়াছে, এখনও কুলায়ে তাহাদের উসখুস শব্দ শুনা যায়।

আকাশে দুই একটী তারা ইহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে।

সুভা চুপ করিয়া বারান্দার একধারে বসিয়াছিল। ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া খানিক আগে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘরের ভিতর মেঝের উপর সে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে তুলিয়া বিছানা করিয়া শোয়াইয়া দিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত সুভার যেন ছিল না।

প্রবোধ সেই ভোরবেলায় বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনও ফেরে নাই। কাল সারাদিন স্বামী স্ত্রী কাহারও অদৃষ্টে আহার জুটে নাই। আজই সকালবেলা সুভার দাদা ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছিল; এবং সে খোকার হাতে একটা টাকা দিয়া গিয়াছিল, সেই টাকাটাই সুভা চাল, লবণ, তৈল প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিবার জন্য স্বামীর হাতে দিয়াছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছিল, সকালের পর দুপুর, দুপুরের পর বৈকাল এবং অবশেষে বৈকালের পরে রাত্রিও আসিয়া পড়িল, প্রবোধ বাড়ী ফিরে নাই, বাজারও আসে নাই।

স্বামীর প্রকৃতি সুভা বেশই জানে, নেহাৎ কেবল উপায় নাই বলিয়া গোটা টাকাটা তাহার হাতে দিয়াছিল।

একদিন না ছিল কি? যেদিন সুভা কল্যাণী বধূরূপে এ গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল সে দিনের কথা আজও মনে পড়ে। অদূরে ঐ যে ত্রিতল অট্টালিকাটী গর্ব্বোন্নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে, ঐ অট্টালিকার অঙ্গনেই দুধের পাথরে পা দিয়া তাহার দুধে-আলতা হইয়াছিল।

শাশুড়ী ছিলেন না, বৃদ্ধ শ্বশুর প্রথম শুভাশীষ তাহার মাথায় বর্ষণ করিয়াছিলেন, সজল নেত্রে বলিয়াছিলেন, "এসো মা রাজলক্ষ্মী, আমার শূন্য ঘর তুমি পূর্ণ করে রাখ, আমার ঘরে লক্ষ্মীকে অচলা করে বেঁধে রেখো।"

শ্বশুরের আশীর্ব্বাণী মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, অট্টালিকা ছাড়িয়া সুভাকে আসিতে হইয়াছে এই পর্ণকুটীরে!

উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি পুত্রকে ঘরে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পিতা যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, প্রবোধ ঘরের দিকে তাকাইতে সেদিনও যেমন উদাসীন ছিল, আজও তেমনই নির্লিপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

একে একে সমস্তই সে ঘুচাইয়া দিয়াছে। বিবাহের পর এই ছয় বৎসরের মধ্যে সুভা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দারিদ্র্যের সর্ব্বনিম্ন ধাপে, কোন দিকে তাকাইয়া যেখান হইতে কোন উপায় দেখা যায় না।

নিজের জন্য নয়—দেড় বৎসরের শিশুর জন্য সুভা আজ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, মনে হয় যদি কোন উপায় থাকিত, খোকাকে যদি সে পেট পুরিয়া খাইতে দিতে পারিত!

[২]

প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খোকা জাগিয়া উঠিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। এবার কান্নার সুর জোরে নয়, বড় আস্তে—বুঝা যায় সে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

পুত্রকে বক্ষে লইয়া সুভা পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এতদিন তবু সে আশার আশায় দিন কাটাইয়াছে,—আজ তাহার সকল আশাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেমন করিয়া হোক খোকাকে তাহার বাঁচানো চাই—ভিক্ষা যদি করিতেই হয়, বাছার জন্যই তাহাও সে করিবে।

পিত্রালয়ে ভাই ও ভ্রাতৃজায়া রহিয়াছে, তাহাদের অবস্থা তত ভালো নয়, সেই জন্যই সুভা ভাইয়ের সঙ্গে যায় নাই, তাহার মনে সেই আত্মমর্য্যাদাটুকু জাগিয়া উঠিয়াছিল—সে কেন ভাইয়ের বাড়ী যাইবে? পিতামাতা বর্ত্তমান থাকিলে

বরং যাওয়া যাইত, ভ্রাতৃবধূর সংসারে যাইতে তাহার আত্মমর্য্যাদায় বাধে।

উপবাসে দেহ ক্ষীণ হইলেও আজ পর্য্যন্ত সুভা কাহারও দুয়ারে হাত পাতে নাই। স্বামী এক একবার এমনই করিয়া চলিয়া যায়, কখনও কখনও একমাস পর্য্যন্ত কোথায় কাটাইয়া ফিরিয়া আসে,—সে ফেরাও স্ত্রীর জন্য নয়, খোকার জন্য। খোকার প্রতি আকর্ষণ সে মাঝে মাঝে অনুভব করে, তখন আর কোথাও থাকিতে পারে না, একবার আসিয়া পুত্রকে দেখিয়া যায়।

সুভা স্বামীকে চেনে। আগে অনেক অনুনয় বিনয়, কান্নাকাটি করিয়াছে, এতটুকু ফল না পাইয়া সে এখন স্বামীর আশাভরসা ছাড়িয়া দিয়াছে।

এই শিশুটিকে তাহার মানুষ করিতে হইবে, শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, কিন্তু কেমন করিয়া ইহাকে মানুষ করিবে, কেমন করিয়া শিক্ষা দিবে, নিঃসম্বল নারী সে, মাথার উপরে স্বামী, হায়, সে যে থাকিতেও নাই!

মায়ের কর্ত্তব্য তাহার সম্মুখে। আজ সে কন্যা নয়, পত্নী নয়, আজ সে মা। সন্তানের জীবন রক্ষাই কেবল তাহার উদ্দেশ্য নয়, সন্তানকে মানুষ করা তাহার চাই-ই।

আজ আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া জীর্ণ কুটিরের ভগ্ন দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া পথে বাহির হইয়া সে ভাবিতেছিল কোথায় যাইবে, কাহার কাছে হাত পাতিবে। নিজে সে অনাহারক্লিষ্ট হইলেও সহজে মরিবে না, কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশু আজ আহার না পাইলে বাঁচিবে না।

মাসখানেক পূর্ব্বে পাড়ার নীলরতন মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যদি সুভা দুইবেলা তাঁহার বাড়ীতে রন্ধনের কাজ লইতে পারে, তিনি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে আশ্রয় দিবেন ও দুইবেলা আহার্য্য ছাড়াও হাত-খরচা কিছু করিয়া দিবেন।

কষ্টের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়াও সুভার অন্তরে যে তেজ ছিল তাহাতে সে মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিল। প্রৌঢ় নীলরতন মিত্রের চোখের লালসাময় দৃষ্টি সে দেখিয়াছে। দুইবেলা রন্ধন করিয়া আহার্য্য ক্রোড়ের নিকট ধরিয়া দেওয়ার মূলে যে কতখানি কদর্থ লুকানো ছিল তাহা তাহার অবিদিত নাই।

আজও সে পথে দাঁড়াইয়া ওই বাড়ীটার পানেই তাকাইত না, যদি না খানিক আগে সুদামের মুখে শুনিতে পাইত তাহার স্বামী ধনী জমিদার হিমাচল সাধুখাঁর সহিত মাস দুয়েকের মত বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে। পথে সুদামের সহিত দেখা হওয়ায় এই সংবাদটা সে সুভাকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছে এবং আরও বলিয়াছে বোম্বাই পৌঁছাইয়া সে ঠিকানা দিবে। এই তাহার স্বামী! এই ক্ষুদ্র শিশুর এই পিতা!

দুঃখে, ক্ষোভে অভিমানে সুভার দুইটী চোখে ভরিয়া জল আসে, সে খোকার পানে তাকাইয়া চোখের জল মুছে।

[৩]

সুভার যাত্রাপথে বাধা দিল মাধবী। যে নৃপেন্দ্র বোস সুভার শ্বশুরের ত্রিতলা অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছেন, মাধবী তাঁহারই কন্যা। সুভারই সমবয়স্কা—বালবিধবা। একদিন সুভার সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়তম, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, নিষ্ঠুর ভাগ্য তাহাদের উভয়কে বহুদূরে সরাইয়া দিয়াছে।

মাধবী এখানে থাকে না, স্বামী না থাকিলেও সে শ্বশুরালয়ে থাকে। বহুকাল পরে সে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আসিয়াই আগে সুভার খোঁজ লইয়াছে।

ঘাটের পথে দেখা হইয়া গেল। সুভা একবার মাত্র তাহার পানে তাকাইয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, মাধবী তাহার পথরোধ করিল।

"সামনা-সামনি এসেও তুমি পাশ কাটাতে চাচ্ছো সু, আমি কিন্তু তোমার কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি।"

সুভা চোখ তুলিয়া তাহার পানে তাকাইল। মাধবী তেমনই আছে, একটুও বদলায় নাই। তাহার চোখে শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, মুখের উপর শান্ত সৌম্যতা।

মাধবী সুভার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, বলিল, "অনেককাল পরে দেখা সু। আমি এসেই তোমার খোঁজ নিয়েছিলুম, তোমার সব কথা শুনে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, কিন্তু তোমার দেখা পাইনি। আজ যদি হঠাৎই তোমার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল তোমায় সহজে

ছাড়ব না। কিন্তু তুমি এ-সব কি নিয়ে যাচ্ছো, বাসন মেজে নিয়ে যাচ্ছো—বাসন কার?

সুভা স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল "আমি মিত্র মহাশয়ের বাড়ী কাজ করি মাধবী, বাসন তাঁদেরই।"

মাধবী নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কাজ কর, মানে তুমি চাকরী কর?"

সুভা একটু হাসিল, বলিল, "চাকরী করি বই কি। এতে তো দুঃখ করবার কিছু নেই মাধবী, স্বামীর অপরিণামদর্শিতায় পরের দুয়ারে কাজ করতে গেছি—কেবল ছেলের জন্যে, তাকে খাওয়াতে পারছি নে বলেই তো। একদিন আমারই ঝি চাকর ছিল সেই কথা ভেবে আজ আত্ম-অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে থাকলে তো চলবে না ভাই। তবুও ছিলুম, তবুও ঘরের বার হইনি। সামনে ছেলেটা দেড়দিন না খেয়ে যখন নেতিয়ে পড়ল, দেখলুম ওকে বাঁচাতে হবে আমাকেই, তখন ছেলেকে বাঁচানোর আর কোনও উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে আমার চাকরী নিতেই হল। আজ আমি ওঁদের বাড়ী রাঁধি, বাসন মাজি, সব কাজ করি, অপমান আমায় আর বিঁধতে পারে না মাধবী—কারণ আমি মা, এবং যে কোনরকমেই হোক আমার ছেলেকে বাঁচাতে হবে, তাকে মানুষ করতেই হবে।"

মাধবী নিঃশব্দে সুভার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু সু, ও লোকটার নানা বদনাম! ও রকম চরিত্রহীন লোকের বাড়ীতে কাজ নেওয়ার চেয়ে খোকাকে বাঁচানোর আর কি কোনও উপায় পেলে না ভাই?"

সুভা বলিল, "কোন উপায় নেই মাধবী। এ গ্রামের মধ্যে আর কারও অবস্থা এমন নয় যে আমায় আর খোকাকে তার নিজের বাড়ীতে স্থান দিতে পারবে; সবাই গরীব, কোন রকমে নিজেদের জীবিকাই তারা চালায়; নিজেদের আহার্য্য সংগ্রহ করে। তাঁর দুর্নাম আছে জানি কিন্তু তিনি আমায় আর খোকাকে খেতে পরতে দিয়েছেন মাধবী, যতদিন কাজ করব, দেবেন।"

মাধবী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—বলিল, "বাংলা দেশের মেয়েদের অদৃষ্টের অভিশাপ, তাই তারাই মরে অনাহারে শুকিয়ে, তাদেরই চোখের সামনে তাদের সন্তান না খেয়ে মরে যায়, তারা আহার্য্য দিয়ে সন্তানকে বাঁচাতে পারে না। এদের জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি, এদেরই বাঁচাতে আমি চেষ্টা করছি, অবশ্য পারব কিনা তা জানি নে। আমার একটি কথা রাখবে সু—একটীবার আমাদের বাড়ী আসবে?"

সুভা মাথা নাড়িল—"না—"

মাধবী বলিল, "বুঝেছি, ও-বাড়ীতে তুমি আসবে না। আমি যদি দুপুরে তোমাদের বাড়ীতে যাই, দেখা করতে পারবে কি? মিত্র মহাশয়ের মত লোকের বাড়ী আমি যাব না, আমি তোমার বাড়ীতেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

সুভা বলিল, "দুপুর বেলা আমি বাড়ী আসতে পারি নে মাধবী, বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়।"

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রতিদিন এমনই করে অনেক রাতে বাড়ী ফিরে এসো?"

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া সুভা শুধু হাসিল, তাহার হাসিতেই ঝরিয়া পড়িল তাহার বুকের বেদনা। সে যেন হাসি নয়, হাসিটা কান্নারই রূপান্তর মাত্র।

"যাই, খোকা একা রয়েছে—" আস্তে আস্তে সুভা চলিয়া গেল।

মাধবী নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

এই বাংলার মেয়ে! যাহারা চিরদিন গৃহের কোনে লতার মত জড়াইয়া বর্দ্ধিত হয়, কতখানি কষ্ট কতখানি দুঃখ পাইয়া ইহারা যে পথে বাহির হয় তাহা কেহ জানে না—জানিবার চেষ্টাও করে না। এমনই ভাবে চক্রতলে নিষ্পেষিত হইয়া বাংলার কত মেয়ে মরে, কত যে সোজা পথ ছাড়িয়া বিপথে যায়, তাহাও কেহ দেখে না, দেখিতে চায় না।

মাধবী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

[৪]

সুভা ও মাধবীতে কথা হইতেছিল।

সুভা বলিল, "আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি নে মাধবী, আমি কি করে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াব?"

মাধবী বলিল, "কি করে আবার, যেমন করে সবাই দাঁড়ায় তুমিও তেমনি করে দাঁড়াবে। কোনও উপায় না পেয়ে তুমি লোকের বাড়ী চাকরী করতে গেছ, কিন্তু এ দীনতাই বা তুমি চাইলে কেন? আমি জানি তুমি অনেক কাজ জানো, তার

যে কোন একটি কাজ জীবিকার্জ্জনের উপায়রূপে তুমি যদি নিতে তা হলে তোমার এতখানি মাথা নীচু করতে হতো না।"

সুভা বলিল, "আমি যে কাজ জানি তাতে কি লাভ হবে মাধবী? সামান্য সেলাই-বোনায় তো দিন চলতে পারে না।"

উত্তেজিত হইয়া মাধবী বলিল, "কেন চলতে পারে না? তোমার মত মনের ভাব সবারই বলেই আজ এদেশের মেয়েরা এতখানি পেছিয়ে পড়ে অপমান সয়। অনেক কিছু জানা থাকলেও কার্য্যকালে তোমরা সব ভুলে যাও—তখন সোজা উপায় দেখ, সামনে চাকরীর দরজা খোলা রয়েছে। মতি ঠাকুরমাকে দেখেছ, ঘরে বসে কি সুন্দর পৈতে কাটেন, সে পৈতে তাঁর বেশ বেশী দামে বিক্রী হয়, এতে তাঁর নিজের খাওয়ার ভাবনা করতে হয় না, বরং তাঁর হাতে আরো দুচার পয়সাও থাকে যাতে তিনি তীর্থভ্রমণ করতে পারেন। রামা তাঁতির বউকে দেখেছ তো? সংসারের সমস্ত কাজ সেরে অবসরকালে সে চরকা কাটে, সেই সুতোয় রামা তাঁতে কাপড় তৈরী করে। নিঃসহায় হয়ে পড়ে বিশেষ করে তোমার মত ভদ্র ঘরের মেয়েরাই,—অনেক কিছু জানা থাকলেও সে সব পেরে ওঠে না, ফলে নিতে হয় চাকরী, নয় করতে হয় আত্মহত্যা, চলতে হয় বিপথে, নয় কি?

সুভা ভাবিতেছিল।

মাধবী বলিল, "জানো সু—একদিন আমাদের এদেশের মেয়েরাই এদেশের শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছিল? হ্যাঁ, তারা যে কেবল চরকায় সুতো আর টেকোয় পৈতে তৈরী করতো, তা নয়। তারা মাটি দিয়ে কত জিনিস তৈরী করতো, তারা ঝুড়ি চুপড়ী কত বিচিত্র রকমের তৈরী করতো, তারা অনেক সময় তাঁতে কাঁপড়ও বুনতো। আজকাল আমাদের দেশে বিদেশী কুটির-শিল্প হিসাবে এসেছে কাঁটা, উল, সুতা ইত্যাদি। সে সব দিয়ে তৈরী জিনিস বিলাসিতার প্রাচুর্য্য যেখানে, সেখানেই স্থান পায়, গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে নয়। তুমি আঁকতে পার জানি—কিন্তু বিনা চর্চ্চায় বোধ হয় সব নষ্ট করে ফেলেছ।"

সুভা হাসিল, বলিল, "তুমি কি বলছ মাধবী, এই সব করে আমার সংসারের নষ্টশ্রী আমি ফেরাতে পারব?"

মাধবী বলিল, "পারবে। কেবল তুমি নও সুভা, বাংলার সব মেয়েই পারবে। আমি এমনই ভাবে সব মেয়েদের তুলবার চেষ্টা করব, ওদের জানাব কতখানি শক্তি ওদের মধ্যে থাকতেও ওরা ঘুমিয়ে থাকে। অনেক সংসারে দেখেছি পুরুষ যদি উপার্জ্জনে অক্ষম হয়, সে সংসারে হাহাকার পড়ে যায়। সেদিন কাগজে পড়েছিলুম একটী মেয়ে কাপড় অভাবে ঘরের বাইরে আসতে পারে নি, অবশেষে আত্মহত্যা করেছে। আজকাল আমাদের দেশে যে দিন এসেছে তাতে কোনক্রমে দুবেলা অন্নের সংস্থান করাই দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে, দেশের লোক করবে কি? দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সব পরের হাতে এরা তুলে দিয়েছে, উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার ফলে নীচ কাজ করতে ওদের মাথা নুইয়ে পড়ে, তাই আজ দেশের জমী অনুর্ব্বর, বেকার শিক্ষিতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ অবস্থায় মেয়েরা তাদের গলগ্রহ হয়ে না থেকে ঘরে বসেই যে কোনরকমে যদি সংসারের অভাব কতকটা দুর করতে পারে, তা না করবেই বা কেন?"

সুভা বলিল, "ধর আমার হাতে কিছু নেই, যে কোন কাজে হাত দিতে অন্ততঃ পক্ষে কিছু টাকা পয়সার দরকার, সেটা পাওয়া যাবে কেমন করে?"

মাধবী বলিল, "আমি প্রথম দিচ্ছি, তারই উপর ভর দিয়ে দাঁড়াও। বাস্তবিক সু, আমাদের এদেশের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আমার বড় দুঃখ হয়। এমন ক্ষীণ দেহ, এমন পরের উপর নির্ভরশীল প্রকৃতি আর কোন দেশের মেয়েদের দেখা যায় না। কলকাতায় থাকতে কদাচিত কোন স্বাস্থ্যবতী মেয়ে চোখে পড়েছে। প্রায়ই দেখতে পেয়েছি—মেয়েরা স্বাবলম্বিনী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট লেখাপড়া করতে গিয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলেছে; তারা সামনের দিকে কুঁজো হয়ে পড়ে, চশমা ছাড়া দেখতে পায় না। যথেষ্ট লেখাপড়া যারা শিখেছে, সমস্ত মেয়ের তুলনায় তাদের সংখ্যা নেহাৎ কম; তবু যারা শিখেছে তারা কি কাজ করবে, আর কোথায় করবে? অনেক পথের মধ্যে মাত্র দুই একটী পথ বেয়ে তারা চলতে পারে মাত্র। কিন্তু সেই কয়টী মেয়ে নিয়েই ত বাংলার নারী সমাজ নয়, তাদের দুঃখ অভাব ওই

কয়টী মেয়ের দুঃখ অভাব মোচনেই ঘুচবে না। সেই জন্যেই চাই আমাদের দেশের সব মেয়েকে পথ দেখিয়ে দিতে, বাংলার ঘরের মধ্যে থেকেও অনেক কাজ করা যায়, অভাব মোচন করা যায়, সেইটাই বুঝিয়ে দিতে। আমার পথে তুমি প্রথম এসো সু, আরও অনেক মেয়েকে আমি ক্রমে ক্রমে পাব।"

[৫]

মিসেস দাস এই গ্রামেরই বধূ। বিবাহের পরই তিনি দেশত্যাগ করিয়া যান, বহুকাল পরে তিনি এবার গ্রামে ফিরিয়াছেন। তিনি "নারী উন্নতি-বিধায়িনী সভা"র প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন, দেশের মেয়েদের দুঃখকষ্টে তাঁহার প্রাণ বিগলিত হইয়াছে, সেই জন্য তিনি মেয়েদের দুঃখ দূর করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন।

প্রথম অধিবেশন হইল তাঁহারই গৃহে।

গ্রামের অনেক মেয়ে আসিয়াছিল, সুভাও তাহাদের সঙ্গে ছিল, আসে নাই কেবল মাধবী। কি কাজে সে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল, সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মিসেস দাস প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন এ দেশের মেয়েরা কত কষ্ট পায়। জলন্ত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোমরা সব ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এসো। কিসের স্বামী, কিসের ঘর সংসার। চেয়ে দেখ আমেরিকার দিকে- চেয়ে দেখ ইউরোপের দিকে, দেখ সেখানকার মেয়েরা কি রকম কাজ করে পুরুষকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নিজের স্থান গড়ে নেয়। আর আমাদের এই দেশের মেয়ে তোমরা, পুরুষে তোমাদের কত রকমেই না নির্য্যাতিত করছে, তোমাদের খেতে দেয় না, পরতে দেয় না। তোমাদের তারা বার হওয়ার সুযোগ না দেওয়ার ফলে তোমরা একেবারে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছ, আজ ওদের সাহায্য না পেলে তোমাদের এক পা চলবার ক্ষমতা নেই। তোমরা বার হয়ে এসো, নিজেদের জায়গা দখল কর, পুরুষদের বুঝিয়ে দাও তোমাদের শক্তি আছে, তোমরা বাইরে বার হয়ে নিজেদের জীবিকা তোমরা নিজেরাই উপার্জ্জন করতে পারো।"

মেয়েরা তন্ময় চিত্তে তাঁহার কথা শুনিল, কেহ হাসিল, কেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। মিসেস দাস অনেক উপদেশ দিলেন, রাত্রি প্রায় ন'টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

পরদিন প্রভাতে মাধবী তাহার অন্তঃপুরকেন্দ্রে প্রতি দিনের মত উপস্থিত হইল। কয়েকটী মেয়েকে লইয়া সে এই কেন্দ্রটী স্থাপিত করিয়াছিল; এখানে সে চরকা, তাঁত প্রভৃতি আনিয়াছিল, সেলাইয়ের কল, রাশীকৃত মাটি রং সবই যোগাড় হইয়াছিল।

বালবিধবা মাধবী তাহার সমস্ত জীবনটা উৎসর্গ করিয়াছিল মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য। সকল মেয়েই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারিবে না, সকলকেই সংসারের বোঝা মাথায় লইতেই হইবে, সে জন্য সংসারের উন্নতির জন্য যে যতটুকু পারে তাহার ততটুকু কাজ করা দরকার, এইদিকেই ছিল তাহার লক্ষ্য।

এই উদ্দেশ্য লইয়া সে অনেক কাজ শিখিয়াছে, অনেক পড়িয়াছে, অনেক শুনিয়াছে। এ-দেশের মেয়েরা ক্ষমতা থাকিতেও কি রকমভাবে শুকাইয়া মরে তাহা ভাবিয়া কতদিন গোপনে চোখের জল ফেলিয়াছে।

স্নেহময় পিতা তাহার কোন কাজে বাধা দেন নাই, একমাত্র কন্যার আব্দার তাঁহাকে রাখিতে হয়। মাটির কাজ, তাঁতের কাজ, সেলাই, মোজা-বোনা প্রভৃতি শিখাইবার জন্য মাধবী বেতন দিয়া লোক নিযুক্ত করিয়াছে, নিজে সর্ব্বদা কেন্দ্রে থাকিয়া রীতিমত কাজ চলিতেছে কি না সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখে।

মেয়েদের আনন্দ দিবার জন্য সে মাসে দুই একদিন করিয়া ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে নানা রকম উপদেশমূলক চিত্র দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছে, কথকতা, রামায়ণ, পাঁচালী প্রভৃতিও মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।

মিসেস দাস আসিয়া মেয়েদের মধ্যে যে ঘর-ভাঙ্গার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিবেন তাহা সে আগে স্বপ্নেও জানিতে পারে নাই।

কেন্দ্রে মেয়েরা সকলেই আসিয়াছিল অথচ কাজে কেহই হাত দেয় নাই।

মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি সু, তোমরা কেউই যে কাজ করছ না?"

সুভা বলিল, "ওরা কাল মিসেস দাসের কথা শুনে তাঁর নারী-উন্নতি-বিধায়িনীরা কাজে যোগ দিতে চায় মাধবী।"

মাধবী একটু হাসিল, বলিল, "সোজা কথায় ঘর ছেড়ে বার হতে চায়, অন্ধকার হতে আলোয় যেতে চায়—এই তো? কথাটা মন্দ নয়। চিরদিন কে আর অন্ধকারে থাকতে চায় বল? কিন্তু আমিও কি তোমাদের এই জন্যেই এই সব শিক্ষা দিচ্ছি নে? তোমরা কি জানো বাইরে চলবার মত কতখানি শক্তি তোমাদের মধ্যে আছে? এই অন্ধকার হতে হঠাৎ তীব্র আলোয় গিয়ে পড়ে পথ হারাবে, সেই আলোয় পুড়ে মরবে। আমি তোমাদের গড়ে তুলতে চাই, একদিন তোমরা নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে অসঙ্কোচে বাইরে দাঁড়াতে পারবে, নিজেদের স্থান নিজেরাই করে নেবে, কিন্তু তার আগে তোমরা উপযুক্ত হও। আমি তোমাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছি, যাতে তোমরা বই পড়ে অন্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে তোমাদের পার্থক্য তোমরা বুঝতে পারো, ঘরের শিল্পশিক্ষা দিচ্ছি যাতে তোমরা নিজেদের জীবনের জন্যে কারো গলগ্রহ না হও। আর ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়াটাই যে মেয়েদের জীবনে চরম সার্থকতা তা তো নয় ভাই। পুরুষ ও স্ত্রী দুজনে বেঁধে তোলে সোনার ঘর, পুরুষ বার হতে দরকারী জিনিস নিয়ে আসে, মেয়েরা সাজায়। দুজনেই দুজনকে সাহায্য করবে, যার যেটুকু ত্রুটি থাকবে অপরে নিজেকে দিয়ে সে ত্রুটী ঘুচাবে। আমাদের এ গরীব দেশে পুরুষ আর মেয়ে দুজনেই যদি পথে ঘোরে ভেতরের কাজ করবে কে? হৈ হৈ করে বেড়ালেই যে অর্থ মিলবে, শান্তি মিলবে, তা তো নয়। আমার কথা শোন, পথটাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য নয়, মানুষের লক্ষ্য ঘর-গড়া, শান্তি সুখে বাস করা। আমেরিকা আজ ভেসে চলেছে, ইউরোপ টলমল করছে। তোমরা তোমাদের পথ-প্রদর্শিকার কথায় কেবল প্রদীপের আলোটাই দেখো না, ওর তলায় আর পেছনে যে জমাট বাঁধা অন্ধকার রয়েছে সে দিকে তাকিয়ে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করে নাও।"

সুভা রুদ্ধশ্বাসে ডাকিল, "মাধবী"।

মাধবী বলিল, "তোমার সন্তান আছে সুভা, স্বামী আছে, ঘর ভেঙ্গো না, ঘর গড়ে তোল। নিজেকে ভাসিয়ো না, ওদের ভাসিও না, পিছন পানে ফিরে তাকিয়ো।"

[৬]

ছই মাসের স্থানে দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে প্রবোধ বাড়ী ফিরিয়া আসিল একখানা ভগ্ন কঙ্কালসার দেহ লইয়া।

সুসময়ে যে সব বন্ধুরা কাছে ছিল, দুঃসময়ে তাহাকে হাসপাতালে ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছিল।

প্রকৃত বন্ধুর কথা প্রবোধের মনে হইয়াছে, ঘরের ছবি চোখে ফুটিয়াছে, পত্নী-পুত্রের কথা মনে জাগিয়াছে।

কোন রকমে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া সে দেশে সেই কুটিরের সামনে পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু কোথায় তাহার কুটির, প্রকাণ্ড বড় একটা বাড়ী সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা "নারীকল্যাণ কেন্দ্র।"

প্রবোধ দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল।

কোথায় গেল তাহার খোকা, কোথায় গেল তাহার সুভা? সেদিনকার কথা মনে পড়ে, একদিন একটি মাত্র টাকা সুভা চাল আনিবার জন্য তাহার হাতে দিয়াছিল, সে সেই টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

"আপনাকে মামণি ডাকছেন"।

প্রবোধ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ছোট একটি মেয়ে।

বিস্মিত হইয়া সে বলিল, "কাকে ডাকছ খুকি? মামণি কে?"

মেয়েটি বলিল, "মামণি ওই বাড়ীতে আছেন, আপনাকেই ডাকছেন, চলুন।"

দেনার দায়ে প্রবোধের যে বাড়ী গিয়াছে এ সেই বাড়ী। এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে গিয়া প্রবোধের পা কাঁপে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই দেখা গেল সুভাকে, পার্শ্বে তাহারই খোকা। প্রবোধ প্রবেশ করিতেই সুভা প্রণাম করিল, দেখাদেখি খোকাও প্রণাম করিল।

খোকা বদলাইয়া গেছে; দেড় বৎসরের খোকা এখন তিন বৎসরের সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশু। সুভাও আর শীর্ণকায়া নয়, স্বাস্থ্যসম্পদে তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

প্রবোধ বলিল, "একি সুভা—তোমরা এখানে?"

সুভা স্বামীকে বসাইল, বলিল, "সবই শুনতে পাবে। একটু বিশ্রাম নাও, তারপর সব বলছি।"

প্রবোধ বলিল, "কিন্তু আমি আগেই শুনতে চাই সুভা।"

সুভা এক এক করিয়া দীর্ঘ দেড় বৎসরের কাহিনী বিবৃত করিল। কখনও কাঁদিল, কখনও হাসিল, কখনও অভিমানে কণ্ঠরুদ্ধ হইল, আবার কখনও আনন্দে বাক্‌শক্তি লোপ পাইল। সব কথা বলিয়া বলিল, "এইবারে হাত মুখ ধোও, জল খাও।"

প্রবোধ বলিল, "এ বাড়ীতে—"

সুভা হাসিয়া বলিল, "এ যে এখন তোমার ছেলের বাড়ী। ছেলের বাড়ীতে বাপের খেতে দোষ নেই গো, দোষ নেই। মাধবী খোকাকে এই বাড়ী জমি জিরাৎ সব দিয়েছে। আমার খোকা ওরও খোকা কি-না। নিজের ত এক ফোঁটাও কিছু নেই, বিয়ের পরই কপাল পুড়ল, তাই আমাদের খোকাকেই বুকে ধরে জুড়িয়েছে।"

প্রবোধ একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

[৭]

দুপুর বেলা।

নারী-কেন্দ্রে গ্রামের সব মেয়েরাই আসিয়াছে, মাধবী এখানে তাহাদের কার্য্য দেখিতেছে।

এবারে যেখানে যত প্রদর্শনী হইয়াছে মাধবী এখানকার জিনিষপত্র পাঠাইয়াছিল, এবার এখানকার অন্তঃপুর-কেন্দ্র সকল স্থানে পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

মাধবী ত্রস্তভাবে কি কাজে যাইতেছিল, সুভার সঙ্গে প্রবোধকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

"কি রকম, প্রবোধবাবু, দেখতে এসেছেন বুঝি ?"

সুভা বলিল, "হ্যাঁ, ওঁকে দেখাতে এনেছি আমাদের কাজগুলো।"

মাধবী অত্যন্ত খুসি হইয়া বলিল, "বেশ বেশ আসুন, আমাদের কাজ দেখুন। এখানে মেয়েরা নিজেরা সুতো কেটে তাঁতে কাপড় বোনে, নিজেরাই পাড় তৈরী করে, রং দেয়। ওদিকে দেখুন মেয়েরা সাবান তৈরী করা শেখে, বাড়ীতে তারা এ কাজ সহজে করতে পারে। ওদিকে ছাঁট-কাট হয়, মেসিনে জামা তৈরী হয়, মেয়েরাই তাতে ফুল তোলে। এখানে মোজা বোনা শেখানো হয়, এতে যথেষ্ট লাভ আছে। ওদিকে দেখুন মাটি দিয়ে কত জিনিস তৈরী হচ্ছে, রং করাও হচ্ছে। এ ছাড়া বাসনে, কাঁচে ফুল তোলা, নানা রকম ছবি তৈরী সবই এখানে শেখানো হয়, মেয়েদের চলবার উপযুক্ত ইংরাজি, বাংলা শিক্ষা দেওয়া হয়, অবশ্য ওদের জীবনে যেটুকু দরকার হবে ঠিক সেই টুকুরই মত। বাংলার সব মেয়েই ডিগ্রি লাভ করবে না, চাকরী করতেও যাবে না, এই রকম চলার মত শিক্ষাই ওদের যথেষ্ট বলে মনে করি।"

প্রবোধ বলিল, "এ সবই তো কাজের দিক, ওদের মধ্যে আনন্দের জন্য গান ইত্যাদি—"

মাধবী বলিল, "গান সব মেয়েরাই শেখে, ছোট মেয়েরা শারীরিক শক্তি বাড়াবার জন্যে প্রকাশ্যভাবে ব্যায়াম করে, সাঁতারও কাটে, কিন্তু তাদের মা'দের পক্ষে ব্যায়াম আর শিখতে হয় না, এই সব কাজের মধ্য দিয়েই তাঁদের শারীরিক শক্তি চর্চ্চা হয়ে থাকে।"

প্রবোধ বলিল, "আপনার অন্তঃপুর-শিক্ষায় নাচটাকে বাদ দিলেন কেন মাধবী দেবী, আজকাল সকল দেশেই নাচের উৎকর্ষ হচ্ছে দেখতে পাই। আর সেকালে শুনেছি অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে নাচের প্রথাও ছিল।"

মাধবী গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "উপস্থিত নাচে আমাদের দরকার নেই, কারণ তাতে হয়তো বিপরীত ফলই হবে। দেশ আগে উপযুক্ত হোক, দেশের ছেলেরা মানুষ হোক, তখন মেয়েরা যেন নাচের অনুশীলন করে, তার আগে নয়। তবে যদি এ কল-কৌশল কেবল অন্তঃপুরের জন্যই হয় তা হোক, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। ওকথা এখন যাক প্রবোধ বাবু, আসল কথা হোক। এই অন্তঃপুর-শিক্ষার উপকারিতা কি বুঝলেন বলুন দেখি ?"

প্রবোধ হাসিল, বলিল, "আমাদের সাহায্য।"

মাধবী বলিল, "স্বাবলম্বন বলুন।"

"দেড় বৎসরের মধ্যে অনেক মেয়ে এখান হতে শিখে মানুষ হয়ে গেছে। দেড় বৎসর আগে তাদের মুখ ছিল বড় ম্লান, গাধার মত তারা সংসারে খাটত, দিন রাত তারা মৃত্যু প্রার্থনা করত। আজ দেখুন গিয়ে তাদের মুখ দৃপ্ত, অন্তর আশার আলোয় উদ্ভাসিত। তারা আজ জেনেছে তারা মিথ্যে নয়—তারা ব্যর্থ নয়, তারাও কাজ করতে পারবে, তারাও সমাজের উপকার করতে পারে। বিশ্বাস করুন—আমরা আমাদের এই অন্তঃপুর-শিক্ষা সমস্ত বাংলা দেশে বিস্তৃত করে তুলব, সারা বাংলার মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তুলব।"

প্রবোধ রুদ্ধকণ্ঠে কেবল বলিল, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক মাধবী দেবী।"

মাধবী বলিল, "এ আমার ইচ্ছা নয়, মায়ের ইচ্ছা। জগজ্জননীর প্রাণ অভাগিনী বাংলার মেয়ের দুঃখে কষ্টে কেঁদেছে প্রবোধ বাবু, তিনিই এই শক্তি—এই সন্ধান নারীর মনে জাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি নারীকে আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি নারীকে শক্তি দিন, যেন সমস্ত বাংলাদেশের মেয়েদের জাগিয়ে তুলতে পারি।"

সে দুই হাত কপালে ঠেকাইল।

ইংরাজ শাসনে ভারতবাসীর অসুবিধা

ইংরাজকে জাতি হিসাবে শোষক ও দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া নিন্দা করিবার একটা মনোবৃত্তি কোন কোন ভারতবাসীর ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের শাসক হিসাবে ইংরাজের ভুল-ভ্রান্তি বহু তাহা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু মানুষ হিসাবে ইংরাজকে নিন্দা করিবার খুব সারবান যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। মানুষ হিসাবে ইংরাজ জাতি যদি বাস্তবিকই নিন্দনীয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব হইত না এবং ভারতবর্ষের রাজ্যভার লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের ঘটিত না। ১৭৫৭ সাল হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত ইংরাজের ভারত-শাসনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি করা যায়, ইংরাজ তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি মত ভারতবাসীর উপকার সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজের কার্য্যে বিন্দুমাত্রও কিছু নিন্দনীয় পাওয়া যায় না আমরা এমন কথা বলি না। আপাতদৃষ্টিতে নিন্দনীয় যাহা কিছু দেখা যায় তাহা ইংরাজের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না বলিয়া ভ্রান্তিবশতঃ বলা যাইতে পারে

অথচ ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তনাবধি ভারতবর্ষের ক্রমিক অবনতি ঘটিয়া আসিতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ এই সত্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় নাই। প্রচলিত অর্থনীতির নজীরে তাঁহারা তাঁহাদের বক্তব্য প্রতিপন্নও করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় যে—ত্রিশ বৎসর আগেও ভারতবর্ষের অসংখ্য লোক কোন রকম চাকুরী না করিয়াও অন্নকষ্ট অনুভব করিতেন না, আর বর্ত্তমানে মোটা বেতনে চাকুরী করিয়াও লোক কেবলই ঋণগ্রস্ত হন এবং চাকুরী না করিলে প্রায় কাহারও অন্নের ব্যবস্থা হয় না,—শ্রমজীবীর ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে,—যে সমস্ত গ্রাম এক সময়ে স্বাস্থ্যকর ছিল সেই সমস্ত গ্রাম এখন ম্যালেরিয়া-প্রধান হইয়া পড়িয়াছে,—যে সমস্ত পরিবারে একাধিক সুস্থ ও সবল পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়স্ক লোক দেখা যাইত, সেই সমস্ত পরিবারে এখন আর একজনও নীরোগ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক লোক দেখা যায় না,—যে শ্রেণীর ফৌজদারী অপরাধ লোকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, সেই শ্রেণীর ফৌজদারী অপরাধ অহরহ ঘটিতেছে,—তখন ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষের অবনতি ঘটে নাই একথা যুক্তি-সঙ্গত ভাবে বলা যায় না।

ইংরাজের আমলে ভারতবর্ষের যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহা ধ্রুব সত্য বটে, কিন্তু এই অবনতি ইংরাজ ইচ্ছা করিয়া সাধন করেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইংরাজ ভারতবর্ষ লুঠিয়া লইতেছেন বলিয়া ভারতবর্ষের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। তাহাও সত্য নহে। যদি ইংরাজের লুণ্ঠনের জন্যই ভারতবাসীর দারিদ্র্য সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইংরাজের ধনবল-বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইত। অবশ্য যে অর্থ-নীতি অনুসারে ভারতবাসীর ধনশালিতা প্রমাণিত হয়, সেই অর্থনীতি অনুসারে ইংলণ্ডকেও ধনশালী বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ড ধনশালী হয় নাই। ধনশালী হইলে এতগুলি ইংরাজ নিজ দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া অন্নের জন্য বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন কি? তাঁহাদের হয়ত ক্রোড় ক্রোড় টাকা আছে, কিন্তু তাহা

কিসের টাকা এবং আন্তর্জ্জাতিক সদ্ভাব না থাকিলে ঐ টাকার মূল্য কি, তাহা আমাদের পাঠকগণ ভাবিয়া দেখিবেন কি?

বস্তুতঃ পক্ষে ভারতবর্ষের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে ইংরাজ আগমনের বহু পূর্ব্বে, এমন কি মুসলমানদিগের রাজ্যাধিকারেরও কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এবং তাহার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়িত্ব ভারতবাসীর নিজের। ইংরাজের একমাত্র ক্রটী তাঁহারা ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেও এই অবনতির গতিরোধ করিতে পারেন নাই।

ইংরাজ ভারতবর্ষের অবনতির গতিরোধ করিতে না পারিলেও তাহার জন্য ইংরাজ চেষ্টা করেন নাই ইহা বলা যায় না। বরং ইংরাজ তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন বলিতে পারা যায়। ইংরাজ অর্থনৈতিকের ধারণা, দেশে ধাতুনির্ম্মিত টাকা বৃদ্ধি পাইলে দেশ ধনশালী হয় এবং জিনিষের মূল্য বাড়াইতে পারিলেই দেশে টাকা বৃদ্ধি পায়। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যাহাতে দেশজাত জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তদ্রূপ চেষ্টা বরাবর করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ অর্থনৈতিকের ধারণা, শিল্প ও বাণিজ্য জীবিকার্জ্জনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তদনুসারে ভারতবাসী যাহাতে শিল্প ও বাণিজ্যের বিদ্যালাভ করিতে পারে এবং সে সকলের বহুল প্রসার সাধিত হয়, তজ্জন্য ব্যাঙ্ক, মিল, টেকনিকাল স্কুল প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জমির উর্ব্বরাশক্তি রক্ষা ও ফসল বৃদ্ধি করিবার জন্য ইংরাজ কৃষিবিদগণের বুদ্ধিমত বৈজ্ঞানিক জলসেচনের ব্যবস্থা, শিল্পজ সারের প্রচার এবং বাষ্পীয় শক্তি চালিত লাঙ্গলের প্রয়োগ যাহাতে প্রসার লাভ করে, তাহার যথেষ্ট আয়োজনের কোন ক্রটী রাখিয়াছেন এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

কাজেই ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনার্থে চেষ্টার কোন ক্রটি ইংরাজ করেন নাই। ইংরাজ যে ভারতবাসীর অবনতির গতি রুদ্ধ করিতে পারেন নাই তাহার জন্য একমাত্র তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধিকেই দায়ী করা যাইতে পারে।

কোন একটা উন্নত জাতির অবনতি রোধ করিতে হইলে এই জাতির উন্নতির প্রসার ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার উপযোগী জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন হয়।

দুইটী জাতি সমান উন্নতিশীল হইলে একটীর পক্ষে অপরটীর উন্নতির স্বরূপ ও ধারা বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু জগতে ভারতবর্ষের সমান উন্নত আর একটী জাতির কথাও ইতিহাসে পড়া যায় না এবং বর্ত্তমানেও দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রীয় হিসাবে অনেক স্বাধীন জাতি দেখিতে পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাসম্পন্ন কোন জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, যুদ্ধনৈপুণ্যে সমস্ত জাতি নিজ নিজ প্রাধান্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেও নিজ নিজ অন্নসংস্থানের জন্য প্রত্যেক জাতিকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিলেও এখন পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ইংরাজ এখনও পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার উপায়ও তাঁহার জানা নাই। কাজেই ইংরাজের রাজত্বে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অসুবিধা ভোগ করিতেই হইবে। কোন্ জ্ঞানবলে ভারতবর্ষের সেই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসী তাহা সম্যক্ বুঝিয়া তাহাকে পুনর্লাভ করিবার প্রস্তাব ইংরাজের সমক্ষে উপস্থিত করিতে অসমর্থ থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইংরাজকে ভারতের অবনতির জন্য দায়ী করা সমীচীন হইবে না।

স্বাধীন ও বৈদেশিক শাসনাধীন জাতীয় জীবনের পার্থক্য

মানুষ স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য একাকী যে সমস্ত কার্য্য করে সেগুলি তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কার্য্য। আর স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে সমস্ত কার্য্য সে করে—সেগুলিকে তাহার জাতীয় জীবন অথবা সামাজিক জীবনের কার্য্য বলা যাইতে পারে। উভয়তঃই উদ্দেশ্য থাকে স্বীয় অভীষ্ট লাভ। একাকী কার্য্য করিয়া যদি অভীষ্ট লাভ সম্ভব হইত, তাহা হইলে মানুষের সামাজিক অথবা জাতীয় জীবনের কোন প্রয়োজনই হইত না। কিন্তু তাহা সম্ভব নয় বলিয়াই প্রত্যেক মানুষের পক্ষে জাতীয় জীবন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রথমতঃ, অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা করিতে হইলে মানুষ যাহাতে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু দ্বারা অথবা চোর-ডাকাত প্রভৃতি হিংস্র

মনুষ্য দ্বারা, অথবা পরশ্রীকাতর, লোভপরায়ণ বৈদেশিকগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উদ্বাস্তু না হয় তাহার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবশ্যক। কোন মানুষ একাকী তাহা করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা ও আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা না থাকিলে মানুষের পক্ষে কোন অভীষ্ট লাভ করাই সম্ভব হয় না—এবং ঐ ব্যবস্থা করা একাকী কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

এক দেশে এবং এক জলহাওয়ায় যাঁহারা জন্ম লাভ করেন, তাঁহাদের মনোভিলাষে যত সমতা থাকে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জলহাওয়ায় জন্মলাভ করিলে ততটা সাম্য থাকে না—ইহা স্বভাবের নিয়ম।

কাজেই গভর্ণমেণ্ট যখন সম্পূর্ণ ভাবে দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীবৃন্দ আপন আপন ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কার্য্য করিলে পরোক্ষভাবে দেশীয় লোকেরই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। আর গভর্ণমেণ্ট যখন বৈদেশিক পরিচালনাধীন হয়, তখন কর্ম্মচারীবৃন্দ খুব সুসংযত ও শৃঙ্খলাযুক্ত হইলেও গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধতা অনুপ্রবিষ্ট হইবার অধিকতর আশঙ্কা থাকে।

এই কারণে দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত গভর্ণমেণ্টের ভ্রম সংশোধন করা প্রজাবৃন্দের পক্ষে যত সহজ, বৈদেশিক পরিচালিত গভর্ণমেণ্টের ভ্রম সংশোধন করা তত সহজ নহে। ফলে স্বাধীন দেশে, গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ গ্রহণ করিলেই জাতীয় জীবনের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করা হয়। আর বৈদেশিক শাসনাধীন দেশে অভীষ্ট লাভ করিতে হইলে সময় সময় দেশীয় লোকের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন হয়। এই পৃথক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কর্ত্তব্য দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশীয় সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষিত করা। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়।

কাজেই স্বাধীন দেশের জাতীয় জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য—গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠানগুলির অংশীরূপে তাহার ভুল ভ্রান্তি প্রদর্শন। আর পরাধীন দেশের জাতীয় জীবনের কর্ত্তব্য দুইটী—

(১) গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠানগুলির অংশীরূপে তাহার ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া দেওয়া,

(২) জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লোকশিক্ষাবিধানকল্পে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন করা।

শিক্ষা

বঙ্গ-সরকারের মধ্যশিক্ষা-বিবরণী

বাঙ্গালা দেশের মধ্য শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবরণী বঙ্গদেশীয় সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে—

(১) মধ্য-শিক্ষার তিনটি স্তর—(ক) মধ্য বাঙ্গলা (খ) মধ্য-ইংরাজী ও (গ) উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়।

(২) ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে মধ্য-শিক্ষা বিস্তারের জন্য অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় আছে।

(৩) মধ্য-শিক্ষা-বিস্তারে উচ্চাদর্শ গৃহীত না হইবার কারণসমূহের মধ্যে: (ক) বে-সরকারী স্কুলের সংখ্যাধিক্য। এই সকল স্কুলের উপর সরকারী কর্তৃত্ব বিস্তারের উপায় নাই। (খ) সরকারী সাহায্য-ব্যতীত স্কুল-সমূহের জন্য অর্থের অভাব। (গ) বে-সরকারী স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অসদ্ভাব।

(৪) কার্য্যকরী শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে নাই, তাহার দুইটি কারণ: (ক) শিল্প-শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রদেশের লোকের আগ্রহের অভাব (খ) শিল্প-শিক্ষার কোন সুনিশ্চিত ও সুচিন্তিত আদর্শ অদ্যাপি উপস্থাপিত হয় নাই।

(৫) বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কার্য্যকরী বিদ্যা শিখাইবার চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। টেকনিক্যাল স্কুল সমূহের পাঠ্যতালিকায় কিছু কিছু রদবদল করিয়া সাধারণ শিক্ষার কতক ব্যবস্থাও ঐ তালিকা-ভুক্ত করিতে হইবে।

সরকারী বিদ্যালয়গুলির বিলোপ সাধন করিয়া, তদ্দ্বারা যে অর্থ বাঁচিবে তাহা হইতে সমস্ত বে-সরকারী বিদ্যালয়ে মাসিক ২০৲ টাকা সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

(৭) যাবতীয় বিদ্যালয়গুলির অর্থসাচ্ছল্য ঘটাইতে হইলে বৎসরে ৪০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সম্প্রতি বা ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট এত অধিক অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

(৮) মধ্য-শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে প্রদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

চিরন্তন প্রথানুসারে লিখিত গভর্ণমেণ্টের এই জাতীয় বিবরণগুলি প্রায়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকে। কি উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ছাত্রদিগকে কোন্ গুণসম্পন্ন করিবার জন্য, গভর্ণমেণ্ট

নানাবিধ শিক্ষার আয়োজন করিয়াছেন তাহার যে কোনরূপ স্থিরতা নাই, এই জাতীয় বিবরণী পাঠ করিলেই তাহা মনে উদিত হয়। বাঙ্গালা দেশে যে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক মধ্যশিক্ষার স্কুল আছে, তাহা কি বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বোধের পরিচায়ক নহে? মধ্যশিক্ষা-বিস্তারের উচ্চাদর্শ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কোন সুচিন্তিত ধারণা আছে কি না তাহা আমরা জানি না। কি করিয়া ছাত্রদিগকে 'কাজের মানুষ' করিয়া তোলা যায় তৎ-সম্বন্ধীয় শিক্ষার পরিষ্কার কোন ধারণা থাকিলে এবং তাহা বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালকদিগকে জানান হইলে, কেন যে শিক্ষার উচ্চাদর্শ গৃহীত হইতে পারে না তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের অস্তিত্ব ছিল এবং তখনও ভারতবর্ষে লোক-হিতকর কার্য্য সাধিত হইত। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নত অবস্থা তাহার অন্যতম পরিচয়। জগতে এখনও কোন সভ্যজাতি ভারতবর্ষের মত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষের কৃষকসংখ্যা অগণিত। তাহারা নিরক্ষর বটে, কিন্তু তাহাদের চরিত্র ও কর্ম্মপটুত্ব কোন দেশের সাধারণ লোকের তুলনায় হীন নহে। নিশ্চয়ই কোন না কোনরূপ শিক্ষার ফলেই তাহারা ঐ জাতীয় চরিত্র ও কর্ম্মপটুত্ব লাভ করিয়াছিল এবং আজও সে শিক্ষা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। আমরা কৃষকদিগকে অশিক্ষিত বলিয়া থাকি সত্য, কিন্তু তাহাদের কার্য্যক্ষমতাই সমগ্র ভারতবর্ষের তথা জগতের বহুলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা অদ্যাবধি করিতেছে। যে শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষের কৃষকের এবংবিধ কার্য্যক্ষমতা অর্জ্জন সম্ভব হইয়াছিল সে শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয় নাই। কাজেই অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় কার্য্য করা যাইতেছে না, এইরূপ যুক্তি সমীচীন নহে। ইহা বর্ত্তমান ভ্রান্ত অর্থনীতির এবং কার্য্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক।

মানুষের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপযোগী কোন শিল্পজ্ঞানের অভাব এদেশে ছিল কি? ভারতবর্ষের লোকের অবস্থায় বর্ত্তমানে কতকগুলি বিকৃতি আসিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু তথাপি কয়েক বৎসর আগেও এদেশের সাধারণ মানুষ যেরূপ স্বাবলম্বী, সন্তুষ্ট, নিরপরাধ, কার্য্যক্ষম ও দীর্ঘায়ু ছিল, বর্ত্তমান জগতের বিজ্ঞান-পরিচালিত, শিল্পানুবর্ত্তী দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐরূপ স্বাবলম্বন, সন্তুষ্টি, নিরপরাধ-প্রবৃত্তি ও দীর্ঘায়ুসম্পন্নতা দেখা যায় না। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বিজ্ঞান মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় উপরোক্ত গুণগুলির ব্যবস্থা না করিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শিল্পজ্ঞানের উৎকর্ষ স্বীকার করিবার যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না।

লিখিতে ও পড়িতে জানিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু কার্য্যক্ষমতা, স্বাবলম্বন, সন্তুষ্টি, নিরপরাধ-প্রবৃত্তি এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা কম প্রয়োজনীয় নহে। লিখিতে পড়িতে না জানিয়াও যদি মানুষ কার্য্যক্ষম ও স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহা বরং ভাল, কিন্তু লিখিতে পড়িতে জানিয়া যদি মানুষকে রুগ্ন, অলস এবং পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়, তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমাদের শিক্ষিত লোকের মধ্যে অশিক্ষিত লোকের তুলনায় যে পরিমাণ আলস্য, রুগ্নতা এবং চাকুরী আশ্রয় করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে গভীরতর চিন্তা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

লিখিতে পড়িতে জানা এবং সেই সঙ্গে কার্য্যক্ষমতা ও স্বাবলম্বন প্রভৃতি গুণ অর্জ্জন করিতে পারা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। তদুপযোগী শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, "বুদ্ধিশক্তি কাহাকে বলে এবং কি উপায়ে তাহার পরিপুষ্টি সাধন করিতে হয়" তাহা ছাত্রদিগকে বোঝান। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া যতদিন পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তক লিখিত ও শিক্ষার স্তর নির্দ্দিষ্ট না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা হইতে কোন সুফলের আশা করা বৃথা এবং ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষার দ্বারা মানুষের প্রকৃত সন্তুষ্টি বিধান সম্ভব কিনা তাহাও বিশেষ সন্দেহজনক।

ভাষা সংস্কার

ভাষাবিদ ডক্টর ফ্রাঙ্ক লবাক্ কোডাইকানাল (মাদ্রাজ) অঞ্চলে এক জন-সভায় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কে তাঁহার কার্য্যকরী প্রস্তাব সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ডক্টর লবাক্ বলিয়াছেন—

(১) তিনি ফিলিপাইনে প্রচলিত ১০টি দেশী ভাষাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এমন একটি শব্দগত সহজ ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন যে, অল্প কয়েক সপ্তাহের চেষ্টাতেই সেখানকার লোক সেই ভাষায় লেখাপড়া শিখিতে পারে।

(২) তাঁহার নবাবিষ্কৃত এই ভাষায় মাত্র পাঁচটি স্বর ও অষ্টাদশটি ব্যঞ্জন বর্ণের স্থান আছে।

ডক্টর লবাকের বিশ্বাস, ফিলিপাইনে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারতবর্ষেও তাহা সম্ভব হইতে পারে; ইতোমধ্যেই তিনি 'হিন্দী'কে সহজ-শিক্ষণীয় করিবার জন্য যে প্রস্তাব দিয়াছেন তাহাতে পাঁচটি স্বর ও নয়টি ব্যঞ্জন বর্ণ রক্ষার কথা আছে। তামিল, তেলেগু, মারাঠি ও উর্দ্দু সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ প্রস্তাব গঠন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে যে গতিতে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষের শুদ্ধমাত্র আক্ষরিক হইতেই ৯২০ বৎসর লাগিবে, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে অক্ষর-জ্ঞান সম্পূর্ণ হইতে ২০ বৎসরের অধিক লাগিবে না।

ডক্টর লবাকের আবিষ্কার নূতন বটে! স্বর ও ব্যঞ্জন সম্বন্ধে তাঁহার সংজ্ঞা কি তাহা আমরা জানি না। তবে ভারতীয় ঋষিগণ আমাদিগকে এইটুক শিখাইয়াছেন যে, চলনশীল জীব জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রাকৃত ভাষা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কেহ না শিখাইলেও মানুষ তাহা স্বতঃই শিক্ষা করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা মানুষ তাহার নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু এই প্রাকৃত ভাষার দ্বারা একজন মানুষ অন্য মানুষের মনোভাব নিখুঁত ও নিশ্চিত ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। তজ্জন্য শব্দের মূল কোথায়, মৌলিক শব্দের আকার কি, মৌলিক মিশ্রিত শব্দের আকার কি ইত্যাদির জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্ভূত ভাষার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানসম্ভূত ভাষা জানা থাকিলে পশুপক্ষী প্রভৃতির ভাষাও বুঝিবার সামর্থ্য জন্মে। বিজ্ঞানসম্ভূত ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিলে কাহারও কথার দুইটী অর্থ হওয়া সম্ভব নহে।

উচ্চারণ দ্বারা শব্দের "প্রত্যাহার" অভ্যাস করা বিজ্ঞান-সম্ভূত ভাষাশিক্ষার প্রথম উপায়। এই শ্রেণীর বিজ্ঞান-সম্ভূত ভাষা বর্ত্তমান জ্ঞানানুসারে কথার কথা মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কারণ বর্ত্তমান জগতে এমন কোন ভাষা নাই যাহাতে কোন মনোভাব প্রকাশ করিলে তাহার একাধিক অর্থ করা সম্ভব নহে। অথচ মানুষ যখন যে কথা কহে তাহাতে কখনও একাধিক মনোভাব ব্যক্ত করে না। কাজেই বর্ত্তমান কোন ভাষায় কাহারও মনোভাব নিখুঁত ও নিশ্চিত ভাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না। সমস্ত ভাষাকেই প্রাকৃত ভাষা বলা যাইতে পারে। প্রাকৃত ভাষায় যে, কোন তত্ত্বজ্ঞান আমূল প্রকাশ করা যায় না—তাহা মানুষ কবে বুঝিতে পারিয়া বর্ত্তমান ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যজ্ঞানের আস্ফালন ত্যাগ করিবে?

বাঙ্গালীর কৃষ্টি

গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার দ্বাবিংশ বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডক্টর কালিদাস নাগ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। জেলা জজ মিষ্টার এস. কে. হালদার আই-সি-এস সভার উদ্বোধন-বক্তৃতায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও উচ্চারণ-সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলি অসুবিধার কথা বলিয়াছেন। সভাপতি নাগ মহাশয় বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর কৃষ্টির ইতিহাসের সংবাদ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সাহিত্য-গৌরবে পৃথিবীর যে কোন দেশ গৌরব অনুভব করিতে পারে।

নাগ মহাশয় কলিকাতার ছাত্র-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি যে তাঁহার জাতীয় সাহিত্যকে ঐকান্তিকতার সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন তাহাও তাঁহার বক্তৃতায় সুপরিস্ফুট। খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৬০০০ বৎসর আগে, বাঙ্গালীর উল্লেখযোগ্য কৃষ্টির কোন নিদর্শন আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। আমাদের নজরে যাহা পড়িয়াছে তাহাতে বুদ্ধদেবের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর আগে ভারতীয় ঋষির প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা অভ্রান্ত এবং নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রকৃতি-বিজ্ঞান ভারতবাসীর, তাহাতে কোন প্রাদেশিকতার আরোপ করা যায় না। ঐ প্রকৃতি-বিজ্ঞান এত নিখুঁত ও অভ্রান্ত যে, তাৎকালিক জগতের সমস্ত লোক তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল এবং কেহই তাহার বিরোধিতা করিবার কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু বুদ্ধদেবের জন্মের অন্ততঃ পক্ষে আঠারশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় চারি হাজার বৎসর আগে এই প্রকৃতি বিজ্ঞানের ভাষা মানুষ আংশিক রূপে ভুলিয়া গিয়াছে; তাহারই ফলে, ঐ বিজ্ঞান অন্ততঃ পক্ষে চারি হাজার বৎসর হইতে বিকৃতভাবে প্রচারিত হইতেছে। সেই জন্যই আজ ভারতবাসী তাহার গৌরবের যাহা কিছু ছিল, সমস্তই হারাইয়া জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কৃষ্টির কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নাগ মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন কি?

বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালীকে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যকে ভালবাসা প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ভালবাসারও একটা অত্যাচার আছে। আমি আমার

ছেলেটিকে ভালবাসি, অতএব ছেলেটির যাহা কিছু নিন্দনীয়, তাহা লুক্কায়িত রাখিয়া তাহার প্রশংসাবাদ করিতে হইবে এবংবিধ ধারণা লইয়া কার্য্য করিলে ছেলেটির উপকার অপেক্ষা অপকারই সংসাধিত হইয়া থাকে। ইহাকে "ভালবাসার অত্যাচার" বলা যাইতে পারে।

"বাঙ্গালার সাহিত্য-গৌরবে পৃথিবীর যে কোন দেশ গৌরব অনুভব করিতে পারে" এবংবিধ মতবাদ অতিরঞ্জিত এবং ইহাকে "ভালবাসার অত্যাচার" বলা যাইতে পারে। আমাদের দোষ আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে আমরা আমাদের দুঃখের হাত এড়াইতে পারিব না। দুঃখ দূর করিবার প্রথম উপায়, মিথ্যাজ্ঞান দূরীকরণ। দ্বিতীয় উপায়, আচার ও প্রয়োগের দোষ দূরীকরণ। তৃতীয় উপায়, দুষ্ট আচার ও প্রয়োগ ত্যাগ। চতুর্থ উপায়, 'অনাসৃষ্টি' না করা। অনাসৃষ্টি না করিলে মানুষের দুঃখ উপস্থিত হয় না।

বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে নানারূপ অনাসৃষ্টি চলিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় কি? বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রীতি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই অনাসৃষ্টিগুলি দেখানও নাগ-মহাশয়ের ন্যায় সাহিত্যামোদীর উচিত ছিল না কি?

হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়

গত ২০এ এপ্রিল মধ্যভারতের ইন্দোরে নিখিল ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্বিংশ বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে ইন্দোরের শ্রীমন্মহারাজ যশোবন্ত রাও হোলকার সভা উদ্বোধন করেন; মহাত্মা গান্ধী সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

হিন্দীকে নিখিল ভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য মহাত্মাজী জনসাধারণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করেন, হিন্দী ভাষার শিক্ষকদিগকে লইয়া একটি কলেজ গঠিত হউক এবং সেই কলেজ হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে হিন্দী প্রচারের উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রেরিত হউক।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডক্টর সরযূপ্রসাদ ইন্দোরে একটি হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞাপিত করিয়া বলেন, হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে।

যখন "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়," "মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়" হইতে পারিয়াছে, তখন "হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়" হইতে যে কোন দোষ আছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের মনে যে অপ্রত্যক্ষভাবে সমগ্র ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার একটা প্রবৃত্তি জাগিয়াছে, "হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়" সৃষ্টির প্রচেষ্টা তাহার অন্যতম নিদর্শন বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমাদের দুঃখ এই যে, স্বয়ং মহাত্মাজী ইহার উদ্যোক্তা।

নিখিল ভারতের জন্য একটি ভাষা যদি প্রকৃতিসম্মত হইত, তাহা হইলে ছেলেরা জন্মাবধি সেই ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিত। কিন্তু তাহা হয় না। একই হিন্দী ভাষা-ভাষী বালক, যুবক ও বৃদ্ধের বর্ণ-সংযোজনে এবং উচ্চারণ-ভঙ্গীতেও পার্থক্য দেখা যায়। কাল ও স্থানের ব্যবধানানুসারে মানুষের উচ্চারণভঙ্গীতে পার্থক্য প্রকৃতির নিয়ম। তাহার অন্যথা করিতে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হওয়া সম্ভব কিনা তাহা চিন্তার যোগ্য। ইংরাজীকে নিখিল ভারতের ভাষা করিবার চেষ্টা সফল হইয়াছে কি?

শুধু মানুষের কেন, সমস্ত জীবের ভাষার মূলে যে শব্দ আছে তাহার মধ্যে সমতা লক্ষিত হয়। এই সমতা উপলব্ধি করিয়া ভাষা-জ্ঞান লাভ করিলে এবং ঐ জ্ঞানসম্ভূত ভাষা ব্যবহার করিলে সমস্ত মানুষের ভাষা পরস্পরের বোধগম্য হইতে পারে কিনা তাহা কি চিন্তার বিষয় নহে? প্রকৃতি-সম্মত ঐ ভাষাজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া একটা কৃত্রিম ভাষাকে সার্ব্বজনীন করিবার চেষ্টা করা শোভন ও সঙ্গত কি?

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন

গত ১৯এ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ এ. এফ. রহমানের সভাপতিত্বে ঢাকায় নিখিল-বঙ্গ শিক্ষকদিগের এক সম্মেলন বসিয়াছিল। রহমান সাহেবের বক্তৃতায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য:

(১) কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদিগের শিক্ষার ভার যাঁহাদের উপরে ন্যস্ত, তাঁহাদিগকে সমাজের গঠয়িতা বলা যায়। কাজেই বাহিরের কর্তৃপক্ষ-নির্দ্ধারিত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ কেবলমাত্র শিখাইয়া যাওয়াই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে - শিক্ষণীয় বিষয় কি কি এবং কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিবার অধিকার তাঁহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

(২) দেশীয় ভাষায় পাঠন ও পরীক্ষার প্রস্তাব উত্তম, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইংরাজী ভাষার আবশ্যকতাও অল্প নহে; কারণ (ক) ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই ভারতবর্ষ শাসিত ও পরিচালিত, (খ) দেশগঠন-কার্য্যে তাঁহারাই সবিশেষ কার্য্য করিতে পারিয়াছেন, ইংরাজী ভাষায় যাঁহাদের অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল, (গ) ভারতবর্ষের প্রদেশ সমূহে এবং ভারতের বাহিরে এই ভাষার সাহায্যেই যোগাযোগ

স্থাপন করা সম্ভব। ইংরাজী ভাষা চর্চ্চা ত রাখিতেই হইবে, উপরন্তু অধিকতর উন্নতভাবে ইংরাজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

৬) বর্ত্তমানে যে শিক্ষা প্রচলিত, তাহা দোষমুক্ত নহে। রহমান সাহেব যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান: (ক) উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত। প্রাথমিক শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার সোপান বলিয়া গ্রহণ করা হয়। (খ) কার্য্যকরী প্রস্তাবের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া দ্রুতগতিতে শিক্ষার প্রসার করা হইয়াছে। (গ) শিক্ষিত শিক্ষকের অভাব। (ঘ) স্কুল কলেজে ছাত্রাধিক্য। (ঙ) ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাব। (চ) বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা।

) প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিলোপসাধন না করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধিত হইলে উপকার দর্শিতে পারে।

) প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, আক্ষরিক জ্ঞান। আক্ষরিক জ্ঞানলাভ করিয়া ছাত্রগণ জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার পর, অল্পকালস্থায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়া ছাত্রেরা শিল্প বা হাতে-কলমে কাজ করিতে যাইতে পারে। ইহার পর, উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা উচ্চতর শিল্পশিক্ষায় অগ্রসর হইতে পারে।

) নারীদিগের শিক্ষার প্রসারতা দেশের সমৃদ্ধি ও কৃষ্টি আনয়ন করিতে এবং কর্ম্মশক্তিবৃদ্ধির সহায় হইতে পারে।

) প্রাথমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার সময়ে সহ-শিক্ষা এবং নব-যৌবনকালে আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থাই বিধেয়;

) সহ-শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে মিঃ রহমান বলেন, দুই শ্রেণীর বিদ্যালয় থাকাই বাঞ্ছনীয়। এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ছাত্রীরাই পড়িবে; দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে। যে সকল বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত, সেই সকল বিদ্যালয়ে নারী-শিক্ষয়িত্রী থাকা বাঞ্ছনীয় এবং ছাত্রীরা যাহাতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নারীজনোচিত অবস্থার মধ্যে শিক্ষা পাইতে পারে, তৎপ্রতি অবহিত হওয়া বিধেয়।

রহমান সাহেবের কথাগুলির মধ্যে অনেক চিন্তার খাদ্য আছে। তাঁহার মতে কার্য্যকরী প্রস্তাবের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া দ্রুতগতিতে শিক্ষার প্রসার করা হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমানে যে শিক্ষা প্রচলিত তাহা দোষমুক্ত নহে। তাঁহার এই কথায় আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা সোজা কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, শিক্ষা কাহাকে বলে এবং কি উপায়ে তাহা লাভ হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ না করিয়া শিক্ষাপ্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলে শিক্ষার নামে কুশিক্ষার উদ্ভব হয় এবং তাহা মানুষকে অমানুষ করিয়া তোলে। এতগুলি কথা রহমান সাহেবের মনের ভিতর আছে কিনা তাহা আমরা জানি না। তবে যে দিন কোন ভাইসচ্যান্সেলারের মুখ হইতে এই জাতীয় কথা শোনা যাইবে, সেইদিন হইতে যে আবার ভারতে একটী নবযুগের অভ্যুদয় হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমানে শিক্ষার নামে যাহা চলিতেছে তাহাকে লিখিতে ও পড়িতে জানা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বস্তুতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষকে মানুষ করিয়া তোলা। মানুষের পশুত্ব ঘুচাইতে পারিলে মানুষকে মানুষ করিয়া তোলা যায়। বুদ্ধির ব্যবহারের তারতম্য লইয়া মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য। কাজেই বুদ্ধির ব্যবহার কি করিয়া করিতে হয় এবং বুদ্ধি কাহাকে বলে তাহা না শিখিয়া কেবল লিখিতে ও পড়িতে শিখাইলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। রহমান সাহেবের কথায় তাহার ইঙ্গিত আছে ইহা বুঝিতে পারা যায় না কি?

নারীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, ছাত্রীরা যাহাতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে নারী-জনোচিত অবস্থার মধ্যে শিক্ষা পাইতে পারে তৎপ্রতি অবহিত হওয়া বিধেয়। খুব সত্যকথা।

ছাত্রীদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে সম্পূর্ণ নারীজনোচিত অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ নারীজনোচিত শিক্ষা দিতে হইলে তাহা-দিগকে অন্দরমহল হইতে কোন স্কুলে প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা থাকে কি? কোন স্কুলে সম্পূর্ণ নারীজনোচিত অবস্থা রক্ষা করা সম্ভব কি?

বর্ত্তমান জগতের স্ত্রীশিক্ষায় নারীজনোচিত অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না থাকায় এবং সহ-শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় বর্ত্তমান জগতের নারীদিগের মধ্যে পুরুষোচিত গুণের এবং পুরুষদিগের মধ্যে নারীজনোচিত গুণের প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে তাহা বলা যায় না কি?

আমরা রহমান সাহেবকে এই সুচিন্তিত অভিভাষণের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সভ্যতার জন্মভূমি

বিলাতের শেলী ওক্ ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে জনৈক ভারত-বাসী সৈয়দ আবদুল হক্ প্রচার করিয়াছেন—ভারতবর্ষই সভ্যতার জন্মভূমি। ভারতের সভ্যতা ন্যূনপক্ষে ছয় বা সাত হাজার বৎসরের

পুরাতন। আজিকার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সমূহের উৎপত্তি এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল।

কি দেখিয়া সৈয়দ আব্দুল হক ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা সম্বন্ধে এতখানি বলিতে সাহস করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। তবে তিনি যে ভারতীয় বেদ ও দর্শনের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি হয়ত জানেন না যে, ভারতীয় বেদের মন্ত্র এবং দর্শন ও ব্যাকরণের সূত্রগুলির যে অর্থ প্রচলিত, তাহা হইতে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তৃতি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। সেই সকলের প্রকৃত ভাষ্য উদ্ধার করিতে পারিলে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতা যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। প্রচলিত মন্ত্রার্থ ও সূত্রার্থ হইতে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতা কথঞ্চিৎ পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারিলেও বর্ত্তমানে মানুষ বিজ্ঞানের নামে বিপর্য্যস্ত জ্ঞানের প্রচার করিয়া স্বীয় পরমায়ু ও কার্য্যক্ষমতার হ্রাস সাধন করিতেছে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অকৃত্রিম সেবকও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। অথচ সেদিন পর্য্যন্তও ভারতের গ্রাম সমূহে দীর্ঘায়ু ও দীর্ঘযৌবনসম্পন্ন লোকের অভাব ছিল না। শুধু তাহা নহে, ভারতের গ্রামগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলেও ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতা বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায়। প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান সমূহের উৎপত্তি ও উৎকর্ষ যে ভারতেই হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কাজেই সৈয়দ আব্দুল হকের কথা অতীব সত্য। আমরা তাঁহাকে আমাদের নমস্কার জানাইতেছি।

অবনত সম্প্রদায়ের শিক্ষা

অবনত সম্প্রদায় মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যুক্ত প্রদেশের শিক্ষা বিভাগ একটি প্রাদেশিক পরামর্শ-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার এই সমিতির সভাপতি হইবেন এবং সমিতিতে পাঁচ জন সদস্য থাকিবে।

সমিতির লক্ষ্য হইবে—

(১) অবনত সম্প্রদায়ের লোকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা, ও
(২) তাহারা যাহাতে তাহাদের শিক্ষা বিষয়ে মতামত সরাসরি সরকারকে জানাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।

সমিতি অবনত সম্প্রদায় মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবেন।

এক্ষণে শিক্ষার নামে যাহা চলিতেছে তদ্দ্বারা উন্নত সম্প্রদায়ের এবং অবনত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা কামনাযোগ্য কিনা ইহা চিন্তা করিয়া অবনত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করা সঙ্গত নয় কি?

শিক্ষা ব্যবস্থায় অবস্থার সমতা

মধ্যশিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার মিষ্টার ভি. এন. চন্দ্রাভরকর বলিয়াছেন —

(১) ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-পরীক্ষা বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত।

(২) ছাত্রগণের সম্মুখে তিনটি পথ বিস্তৃত আছে। যথা, (ক) উচ্চ শিক্ষার ফলে শাসনকার্য্যে বা উন্নত শ্রেণীর ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ। উন্নততর ব্যবসায় বলিতে, ওকালতী, ডাক্তারী, অধ্যাপনা ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। (খ) উচ্চতর শিল্প শিক্ষা। (গ) গবর্ণমেণ্টে বা ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে কেরাণীগিরি।

(৩) এমন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা বাঞ্ছনীয়, যে সময়ে ঐ তিনটি পথের কোন্‌টিতে কোন্ ছাত্র অগ্রসর হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে।

(৪) ছাত্রের অভিভাবক বা শিক্ষক ছাত্রের সামর্থ্য বা মানসিক গতি নিরীক্ষণ করিয়া পথ নির্দ্দেশ করিবেন, ইহাই সঙ্গত।

জার্ম্মানীতে হের হিটলার প্রবর্ত্তিত শিক্ষার ব্যবস্থার সংবাদ যাহারা রাখেন, তাহারা মিঃ চন্দ্রাভরকরের প্ল্যানে সেই শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণের আভাস দেখিতে পাইবেন। অবস্থার সমতা না থাকিলে ব্যবস্থার সমতা কখনও হিতকারী হয় না। আমরা এই কথাটা কবে বুঝিব?

ব্যবসা-বাণিজ্য

ভারতের আমদানী রপ্তানী

ফরাসী সরকারের হিসাব মত, ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষ ফরাসী দেশে ৫২৩,০০৯,০০০ ফ্রাঙ্ক মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে।

১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষ ফরাসীদেশে ৬৯১,৭৭৩,০০০ ফ্রাঙ্ক মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল।

আর ফরাসীরা ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষে ৯০,২৭৬,০০০ ফ্রাঙ্ক মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী করিয়াছে।

১৯৩৩ সালের রপ্তানীর পরিমাণ ১৫৫,৩২৬,০০০ ফ্রাঙ্ক।

[এক ফ্রাঙ্ক আমাদের প্রায় ছয় আনার সমান।]

এই হিসাবের ফ্রাঙ্কের পরিমাণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ফ্রান্স হইতে ভারতের আমদানী অপেক্ষা ফ্রান্সে ভারতের রপ্তানী অনেক বেশী। কাজেই বর্ত্তমান অর্থনীতির সূত্রানুসারে বলিতে হইবে ফ্রান্সের সহিত ভারতবর্ষের ব্যবসা ভারতবর্ষের পক্ষে লাভজনক। অর্থনীতির ছাত্রগণ ইহাতে কোন ভ্রান্তির নিদর্শন আছে কিনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল করিবেন।

অর্থনীতির ভ্রান্তি

> বৃটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যা পরীক্ষা করিবার জন্য লণ্ডনের বৃটিশ বণিক সমিতিতে স্থায়ীভাবে একটি অর্থনৈতিক সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বণিক সমিতি মনে করেন, এইরূপ একটি সমিতি গঠিত হইলে সাম্রাজ্যমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার ফলে বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান অর্থনীতি বিজ্ঞানের মূলে যে বিষম ভ্রম রহিয়াছে তাহা বিদূরিত করিবার উপযোগী বুদ্ধির উদ্ভব না হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যা স্থায়ী ভাবে দূর করা সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মানুষ স্বভাবতঃ চাহে সুলভ জিনিষ। আর বর্ত্তমান অর্থনৈতিক চাহেন, মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া জিনিসের চাহিদা সৃষ্টি করিতে এবং জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি করিতে। স্বভাবের বিরোধিতার সূত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া সভা-সমিতির দ্বারা উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব কি?

বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি

ফরিদপুর জেলার ব্যবসায়-সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি-রূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলিয়াছেন—

> দেশের সমৃদ্ধির ফলে দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যের বৃদ্ধি হয়।
>
> আমাদের দেশের অর্থ যাহাতে আমাদের দেশের সীমা পার না হয়, তৎপ্রতি আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আবার সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে অন্য দেশের টাকা যাহাতে আমাদের দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আসে ও আমাদের ব্যবসায়গুলিকে সমৃদ্ধ করে। এই সকল বিষয়ে আমরা যাহাতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারি এমন ভাবে আমাদিগকে তৈয়ার হইতে হইবে।

দেশের কৃষকগণের উদ্দেশে আচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপঃ—

> কৃষকগণ যেন মনে রাখেন তাঁহারাই বাঙ্গালার মেরুদণ্ড; তাঁহারাই ৫ কোটী লোকের অন্ন জোগাইতেছেন, লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। তাঁহাদেরই উপর বাঙ্গালার উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের নিকট আমার এই নিবেদন, তাঁহারা যেন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবেত চেষ্টার দ্বারা চাহিদা-অনুযায়ী পাট-চাষ নিয়ন্ত্রিত করেন। পাট-চাষ কমাইলে কৃষকেরা মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। চীনা বাদাম, তামাক, তিসি, আলু প্রভৃতির চাষ বাড়াইয়া তাঁহারা অনেক বেশী টাকা রোজগার করিতে পারিবেন। পাটের জমিতে আখের চাষ করিয়াও লাভবান হওয়া যায়।

আচার্য্যদেব আমাদের সকলের নমস্য। কি করিয়া বাঙ্গালীর উন্নতি সাধিত হইবে তাহার চিন্তা লইয়াই তিনি তাঁহার সারাজীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন। রসায়ন শাস্ত্রের বিবিধ গবেষণা এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠা তাঁহার প্রতিভার অসাধারণত্বের পরিচয়। তাঁহার কথা ও কার্য্য আমাদের সর্ব্বদা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার কথায় আমরা যাহা বুঝিয়াছি এবং কার্য্যে যাহা দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে তাঁহার মতে শিল্প ও বাণিজ্য অন্নসমস্যা পূরণ করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। তিনি যাহা বলেন তাহাতে বুঝিতে হয়, বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুসারে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে দেশের সমৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। তাঁহার এই কথা বর্ত্তমান অর্থনৈতিকগণের মতানুবর্ত্তী। বর্ত্তমান জগতের সমস্ত দেশেই বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইয়াছে—গত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। ইংলণ্ড প্রভৃতি কোন কোন দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে সাফল্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে আমাদের ভারতবর্ষে সাফল্যের পরাকাষ্ঠা না হইলেও প্রতি বৎসর যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার লাভ ঘটিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অথচ অন্নসমস্যা-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে কোন লোকের অবস্থা যে বিশেষ উন্নতি-লাভ করিয়াছে তাহাও বলা যায় না। ত্রিশ বছর আগে ঘরে বসিয়া থাকিলেও অনেক ভারতবাসীর মোটা ভাতের সংস্থান ছিল। আর শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঘরে চাকুরীর জন্য হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। এখন কাহারও ঘরে মোটা ভাতের সংস্থান থাকা তো দূরের কথা, চাকুরীর জন্য ছুটাছুটী করিয়াও চাকুরী জুটিতেছে না। শিল্প ও বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিলে দায়গ্রস্ত হইতে হয়। জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই যে সাধারণ লোকের মধ্যে একই রকমের

হাহাকার উঠিয়াছে তাহা আচার্য্যদেব আমাদের অপেক্ষা ভালরূপই জানেন। এই অবস্থাটী বিশ্লেষণ করিয়া সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক শিল্প ও বাণিজ্যকে জীবিকার্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারন লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়াও কি আচার্য্যদেব শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে উৎসাহবাণী আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্ববৎ প্রচার করিবেন ?

মানুষের বাঁচিবার প্রধান উপকরণ "জমিজাত দ্রব্য"। শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা তাহা মানুষের ব্যবহারযোগ্য হইয়া থাকে। কাজেই মানুষের জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায় জমিজাত দ্রব্যোৎপাদন অথবা "কৃষি" এবং "খনিজ পদার্থে"র উৎপাদন। এই খনিজ পদার্থের উৎপাদন সীমাবদ্ধ না হইলে জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়। কৃষিকে সফল করিবার জন্যই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজন। জগৎ এক সময়ে এই তত্ত্বটী অতি সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল, সেদিন সারা জগত সুখের আগার হইয়া উঠিয়াছিল। এই তত্ত্বটী ভুলিয়া যাইবার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার প্রয়োগ মানুষ ভুলিয়া যায় নাই। তখনও মানুষের মধ্যে নানারূপ কল্পিত দুঃখের উদ্ভব হইলেও প্রকৃত অন্নাভাব উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যেদিন হইতে বর্ত্তমান অর্থনীতির সূচনা হইয়াছে এবং মানুষ কৃষিকে উপেক্ষা করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়াছে, সেই দিন হইতে সাধারণ মানুষের অন্নাভাব আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষের কৃষির অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে তাহা সত্য, কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহাতে আমাদের ভারতবাসীর কাহারও অর্দ্ধাশন অথবা অনশন-জনিত কষ্টভোগ সঙ্গত নহে। অথচ ভারত-বাসীর মধ্যে কাহারও কাহারও যে প্রকৃতপক্ষে অর্দ্ধাশন এবং অনশন-ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। আমাদের মতে তাহার কারণ বর্ত্তমান অর্থনীতির ভ্রান্তি। বর্ত্তমান অর্থনীতির নিয়মানুসারে জিনিষের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মানুষ সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহা না করিয়া, যাহাতে সমস্ত কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য সুলভে বিক্রয় হইতে পারে, বিধিবদ্ধভাবে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে মানুষের অন্নাভাব দূরীভূত হওয়া সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারিলে কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয় তাহা সত্য। কিন্তু কার্য্যতঃ যাহা দেখা যায়, তাহাতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও কৃষকের অবস্থার কোন উন্নতিই হয় না। বরং কৃষক অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহার কারণ জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি করিলে বিদেশীয় জিনিষের আমদানী সহজ হয় এবং কৃষক তাহার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আপাততঃ কিছু বেশী টাকা পাইলেও তাহার প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে সমস্তই খরচ হইয়া যায়। কিন্তু যদি শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য কম থাকে, তাহা হইলে কৃষক তাহার কৃষিজাত দ্রব্য অল্পমূল্যে বিক্রয় করিলেও অভাবগ্রস্ত হয় না। আবার কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কম থাকিলে শিল্পীর পক্ষে শিল্পজাত দ্রব্য কমমূল্যে বিক্রয় করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না—কারণ শিল্পজাত দ্রব্যের মূল উপকরণ—কৃষিজাত দ্রব্য।

আমাদের এই কথা কয়টি আচার্য্যদেব ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের চতুর্দ্দশ বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ উল্লেখযোগ্য :–

(১) একটি দীর্ঘ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, (১) ভারতে শোষণ নীতি অবলম্বিত হওয়ার ফলে ভারতীয় জনগণ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। (২) স্বাধীনতাই ভারতীয় জনগণের উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিবে। এই স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট হইতে দানস্বরূপ পাওয়া যাইবে না। (৩) বিলাতে বর্ত্তমানে যে শাসনতন্ত্র গঠিত হইতেছে, তাহাতে, অথবা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসেও ভারতের শ্রমিক অথবা নির্য্যাতিত শ্রেণীর লোকদিগকে অর্থনৈতিক শোষণ বা রাজ-নৈতিক বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। কংগ্রেস মনে করেন যে, সত্যকারের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে জনগণের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিতে হইবে।

(২) কংগ্রেস মনে করেন যে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের ভারতীয় বন্ধুগণ যে শাসনতন্ত্র গঠন করিবেন, ভারতীয় জনগণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। (২) কংগ্রেস বলেন ভারতীয় শাসনতন্ত্র গঠনের অধিকার একমাত্র ভারতীয় জনগণেরই আছে এবং নির্য্যাতিত জনগণের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান "জাতীয় গণ-পরিষদ"ই স্বাধীন ভারতের মৌলিক আইন সমূহ তৈয়ারী করিতে অধিকারী।...

ইতঃপূর্ব্বে কানপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে যে মূলনীতিসমূহ গৃহীত হইয়াছিল, এই কংগ্রেস তাহার প্রতি আস্থাবান। মূলনীতিগুলি এই :—

(ক) সমস্ত শাসনক্ষমতা নির্য্যাতিত এবং শোষিত (exploited) জনগণের হস্তে অর্পণ।

(খ) দেশীয় রাজ্য এবং জমিদারী প্রথার বিলোপ।

(গ) সকল প্রকার শাসন হইতে কৃষককে মুক্তিদান, যাহাতে কৃষক তাহার জমির উৎপন্ন ফসল নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পারে।

(ঘ) দেশের জমি, জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য, খনিজ পদার্থসমূহ, ব্যাঙ্ক বা দেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের অধিকারে আনয়ন।

(ঙ) বিদেশী সরকার যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, বিনা সর্ত্তে সে সমস্ত অস্বীকার।

(চ) ন্যূনতম বেতন নির্দ্ধারণ, শ্রমের সময় নির্দ্দেশ, বেকার, বার্দ্ধক্য, প্রভৃতি এবং ব্যাধি-সম্পর্কিত বীমা ; শ্রমিকদিগের সুখ ও সুবিধাজনক আইন গঠন করিয়া তাহাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন।

(ছ) যাহাতে স্বাধীনতার দ্বারা কয়েকজন জোগাড়ে, ভাগ্যবান লোকই লাভবান না হইতে পারে, তজ্জন্য নির্য্যাতিত জনগণের হস্তে দেশের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দান।

(জ) পরোক্ষভাবে ট্যাক্স আদায় প্রথার লোপ এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন।

(ঝ) সংবাদপত্রের, বক্তৃতার স্বাধীনতা রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি গঠনের অধিকার দান।

(ঞ) কৃষকদের ইউনিটারী কর ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কর প্রত্যাহার।

উপরোক্ত প্রস্তাব ও নীতিগুলির মধ্যে একটা প্রকাণ্ড উত্তপ্ত হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করা যায়। উত্তাপ বস্তুকে দ্রবীভূত করিতে পারে বটে, কিন্তু সংমিশ্রিত করিতে পারে না। বরং সংমিশ্রিত করিবার জন্য প্রয়োজন হয় উত্তাপের অভাব এবং শৈত্য। ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, দেশের সম্প্রদায় বিশেষের এই শ্রেণীর উত্তাপ বিদেশীয়ের রাজত্বের সূচনা করিয়াছে।

কোন কার্য্য করিতে হইলে দুই শ্রেণীর বস্তুর প্রয়োজন হয়, (১) হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং (২) মস্তিষ্ক অথবা বুদ্ধি। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি সাক্ষাৎভাবে কার্য্য করিয়া থাকে এবং মস্তিষ্ক অদৃশ্যভাবে তাহার পরিচালনা করে। মস্তিষ্কের সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে কার্য্যের সাফল্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মস্তিষ্কের উত্তাপ শারীরিক অস্বাস্থ্যের পরিচায়ক এবং তাহার ফল কার্য্যের অসাফল্য।

কাজেই আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বন্ধুদিগকে প্রকৃতিস্থ হইতে অনুরোধ করিতে ইচ্ছা হয়।

কৃষি

সেচ-বিভাগ

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেচ-বিভাগের ১৯৩৩-৩৪ সালের কার্য্য বিবরণী ও সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। মর্ম্মার্থ এইরূপ—

আলোচ্য বর্ষে খাল খনন কার্য্যে মোট ৯,১২,০১৯ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ; আজ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে মোট ৫,২০,০৬,৪৯০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগ পরিচালনায় ২৭,৮৫,৬৯৯ টাকা খরচ ; এই বৎসরে ১২,৯৯,৪২৩ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে সেচ-বিভাগের আয় অপেক্ষা ১৪,৮৬,২৭৬ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে দামোদর খাল খনন একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য। ১৯৩৩ সালে ২রা সেপ্টেম্বর গবর্ণর ইহার উদ্বোধন করেন। এই খালের খননকার্য্য শেষ হইলে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার ২০০০০০ একর জমিতে জল-সেচের সুব্যবস্থা হইবে। এই বৎসরে বাঁকুড়া জেলার বক্রেশ্বর খালের খননকার্য্য শেষ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগে কিছু ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছেন। এই বিভাগে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের ৩০ জন কর্ম্মচারী রাখিবার মঞ্জুরী আছে ; ব্যয়-সঙ্কোচ জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৯ জন লোক দ্বারাই কার্য্য চালাইতেছেন।

এ বৎসরে নূতন কোন কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় নাই, অর্থাভাবই ইহার প্রধান হেতু।

ম্যালেরিয়ার প্রতিবিধান হিসাবে কোন কোন স্থান খালের জল দ্বারা বিধৌত করা হইয়াছে। ইডেন খালের জল দিয়া ১৪ বর্গ মাইল স্থান, মেদিনীপুর খালের জল দিয়া নারায়ণগড় ও পিঙ্গলা থানার ৪৯০০ একর স্থান ধৌত করা হইয়াছে। এইরূপে ধৌত করায় সুফল দেখা যাইতেছে।

আলোচ্য বৎসরে সেচ-বিভাগ ১২৯৩ মাইল বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। যে অঞ্চলে বাঁধ আছে, সেই অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ কমিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আরও অনেক বাঁধ নির্ম্মাণ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্টের সেচ-বিভাগ তাহার কর্ত্তব্য যথাযথ নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছেন, জমির উৎপাদিকা শক্তিও বাড়িতেছে

বলিতেছেন, অথচ প্রজার দারিদ্র্য ঠিকই বজায় রহিয়াছে। ইহা একটি বিষম রহস্য বটে।

কৃষিসঙ্ঘ

দীর্ঘকাল বিলাত প্রবাস করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর দেশে ফিরিয়া আসিয়া, নানা স্থানে, নানা সভাসমিতিতে অভ্যর্থিত হইতেছেন। অভিনন্দন সমূহের উত্তরে মহারাজাধিরাজ যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম্ম এই—

> অতঃপর একটি কৃষি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জমিদার ও প্রজা এই সঙ্ঘের সভ্য হইবেন।
>
> এই সঙ্ঘ জমিদার ও প্রজার মধ্যে সৌহার্দ্দ্যকর সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিবে; একটি উন্নতিকর কৃষি-প্রস্তাব উত্থাপিত করিবেন এবং বঙ্গের মৃতপ্রায় পল্লীকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।

মহারাজাধিরাজের শুভচেষ্টা সফল হউক। তাঁহার প্রস্তাবিত কৃষি-সঙ্ঘ স্থাপিত হইলে বঙ্গের পুনরুজ্জীবিত পল্লীগ্রামে যাইয়া বাস করিবার আশায় অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, বেকার বাঙ্গালী তাঁহার কার্য্যের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিবে।

সমবায় প্রথায় কৃষি

> মাদ্রাজের চিংলিপুট জেলায় ভগলানছেড়িতে সরকারী কৃষি বিভাগ সমবায় প্রথায় কৃষি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যেক এক শত একর জলা-জমির মালিকগণ একটি সমবায় সমিতি গঠন করিয়া সরকারী কৃষি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমির উন্নতিকর প্রস্তাব সমূহের জন্য আবেদন করেন। সরকারী কৃষি-বিভাগের উপদেশ মত জমিগুলিতে কৃষিকার্য্য পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক একর ভূমির অধিকারী তিন টাকার একটি অংশ ক্রয় করিলে, কৃষিকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে পনেরো টাকা ঋণ পাইবেন। দুই তিন বৎসর পরে যদি ভূমিজাত শস্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে অধিকতর উন্নতিকর প্রণালীসমূহ পরীক্ষা করা হইবে।

ভারতবর্ষে ইহা একটা নূতন রকমের চেষ্টা বটে! দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা অপেক্ষা যাহা করা যায় তাহাই ভাল।

বিশেষজ্ঞ জ্ঞান

> হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকার সেচ-বিভাগের একটি বিরাট প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ৩০ কোটী টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা। এই সেচ খনন কার্য্য সমাপ্ত হইলে মাদ্রাজ প্রদেশের প্রায় ৭ লক্ষ একর ভূমিতে সর্ব্বদাই জল সরবরাহ হইতে পারিবে। ইহার ফলে মাদ্রাজের ভূমি সমূহে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ গুণ অধিক ফসল উৎপন্ন হইবে।

সেচ-বিভাগের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচিত হওয়া সঙ্গত। ভারতবর্ষে যে একটা সেচন প্রণালী ছিল তাহা বুঝিতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। যদি সেচন প্রণালী না থাকিত, তাহা হইলে জমিগুলির এত উর্ব্বরাশক্তি হইতে পারিত না। জগতের অন্য কোন দেশের জমির উর্ব্বরাশক্তির তুলনায় ভারতের জমির উর্ব্বরাশক্তি কিছুদিন আগেও কম ছিল না। প্রাচীন ভারতের সেচন প্রণালী যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সেচন প্রণালীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ এবং প্রকৃতির সহায়ক ছিল, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সেচ-বিভাগ কেন যে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির বোধগম্য নহে। প্রচলিত বিধান অনুসারে বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যে সাধারণের কোন কথা কওয়া রীতিবিরুদ্ধ। এই বিশেষজ্ঞগণের ভিতর সেচ-বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার, ফাইন্যানস্ বিভাগের অর্থনৈতিক, রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার এবং স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাক্তারগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ নজর করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সব ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ প্রজা-সাধারণের সমালোচনার পাত্র হন, তাহার অধিকাংশের মূলে উপরোক্ত বিশেষজ্ঞগণের কার্য্য থাকে। আমাদের মনে হয়, জগতের বিশেষজ্ঞগণ অপেক্ষাকৃত উপেক্ষার সহিত পরিলক্ষিত হইলে জগতের দুঃখ-কষ্ট অনেক কমিয়া যাইত।

কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর আনুষঙ্গিক কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ:—

(১) ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও, চিরদিন এমন ছিল না।

(২) ভারতের দারিদ্র্য ও কৃষি-বিজ্ঞানে ভারতবাসীর অজ্ঞতা ভারতের কৃষির অবনতির মূল কারণ।

(৩) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কৃষিবিষয়ক গবেষণা জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

(৪) পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পাটের চাহিদা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব লওয়া উচিত। প্রসঙ্গতঃ ময়মনসিংহের উৎকৃষ্ট পাটের কথা বলা যায় - এত সুন্দর পাট আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। জলপাইগুড়ীর পাট অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর। কাজেই ময়মনসিংহ ও জলপাইগুড়ী সম্বন্ধে এক রকম ব্যবস্থা হইতে পারে না।

ডাক্তার ঘোষ কৃষির উন্নতিকল্পে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহা মূলতঃ এই—

(১) মানুষের মল জমির সাররূপে ব্যবহার করিবার জন্য কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। মরা জানোয়ারের হাড় গুঁড়া করিয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) গ্রামবাসীর মধ্যে অল্প খরচে অধিক লাভবান ফসল উৎপাদন তথ্য-সংবাদ প্রচার করিতে হইবে।

(৩) উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য্য পরিচালিত হইলে সুফল অবশ্যম্ভাবী, ইহাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালার ত্যাগীপুরুষদিগের অন্যতম। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু আমরা তাঁহার বর্ত্তমান অভিভাষণের সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষে যে এক সময়ে কৃষিপ্রাধান্য ছিল না তাহা কিরূপে তিনি জানিলেন, ডাঃ ঘোষ আমাদিগকে তাহা বলিয়া দিবেন কি? জমি জীব ও জলহাওয়া লইয়া একটী দেশ, এবং জমি ও জলহাওয়া অবলম্বন, ইহা ভারতের ঋষিগণ যে পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, জগতের আর কোন জাতি তাহা বুঝিতে পারে নাই, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভারতীয় ঋষিগণ জমি, জীব ও জলহাওয়ার প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছিল জগতের অন্য কোন জাতি আজও পর্য্যন্ত সে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। ঐ জ্ঞানের ফলে তাঁহারা যে কেবল নিজ দেশের অভাবই পূরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, জগতের অন্যান্য দেশবাসীগণও তাঁহাদের অনুকরণে স্বীয় অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা মনে করিবারও কারণ আছে। ভারতের বেদ ও দর্শনগুলির প্রকৃত পাঠোদ্ধার যেদিন হইবে, সেইদিন ভারতের জ্ঞানের প্রসারতার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হইতে পারিবে এবং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস যে কত বিকৃত তাহাও বোধগম্য হইবে

ভারতবাসী দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে সত্য এবং ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কমিয়া গিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু আজও ভারতবর্ষ দেশ হিসাবে অন্য কোন দেশের অপেক্ষা দরিদ্র নহে। জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশ নাই, যে দেশের লোক অন্য কোন দেশে না গিয়া স্বীয় অন্নের সংস্থান করিতে পারে। ভারতের সমৃদ্ধির ইহাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কাজেই অন্য কোন দেশের কৃষিবিজ্ঞান ভারতবর্ষের অনুকরণযোগ্য কি না তাহা বিশেষ চিন্তা-সাপেক্ষ।

ভারতবাসীর দারিদ্র্যের মূল কারণ তাহার নিজস্ব প্রকৃতিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি।

যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, জগতের কোন দেশ আজও পর্য্যন্ত তাহার নিজ জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে নিজ দেশবাসীর অভাবই পূরণ করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু ভারতবর্ষ চিরদিনই তাহার সন্তানগণের অভাব সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ করিয়াও অন্যান্য দেশের সন্তানগণকে পর্য্যন্ত খাদ্য ও সম্ভোগের জিনিষ বিতরণ করিতেছে, তখন ভারতবাসীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান না করিয়া অন্য কোন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুকরণ চেষ্টা কি যুক্তিসঙ্গত?

ডাঃ ঘোষ বাঙ্গালার কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার সকলের মূলে অপ্রত্যক্ষভাবে আছে —পাশ্চাত্য কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতির আদর্শের অনুকরণ। এই তিনটার আমরা অনুসরণ করিয়াছি আমাদের দারিদ্র্য দূর করিবার আশায় এবং এখনও ঐ তিনটী আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু অতীতের দিকে একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই দেখা যাইবে, যেদিন হইতে ভারতবর্ষে ঐ তিনটী আদর্শ সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ভারতবাসীর মধ্যে দারিদ্র্য প্রকট হইয়াছে। কিছুদিন আগেও জনসাধারণের যে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা ছিল এখন আর তাহা নাই। ঐ তিনটী আদর্শ কোন পাশ্চাত্য জাতিরও হিতসাধন করিতে পারিয়াছে কি না তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে, কাজেই ঐ তিনটী আদর্শ প্রচারের ফলে বিশেষ কোন উপকার হইবে কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়।

ভ্রমাত্মক পাশ্চাত্য অর্থনীতির ও শিল্পনীতির যতখানি প্রভাব আমাদের উপর বিস্তারিত হইয়াছে, কি উপায়ে তাহা হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় এক্ষণে তাহাই সর্বাগ্রে চিন্তনীয় হওয়া উচিত।

ডাঃ ঘোষ আমাদের এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবেন কি?

কৃষাণ সম্মিলনী

গত ২৭ এ এপ্রিল হইতে তিন দিন, এলাহাবাদে যুক্ত প্রদেশের কৃষাণ সম্মিলনের অধিবেশন বসিয়াছিল। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতি ও শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রসিদ্ধ জননেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নায়ডু সভায় এক আবেগময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সভাপতি প্যাটেল মহাশয়ের অভিভাষণের নিম্নলিখিত মন্তব্য কয়েকটি অনুধাবনযোগ্য :—

(১) আত্মরক্ষার ক্ষমতা না থাকিলে কেহ কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না।

(২) মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে ; ভয় ত্যাগ করিতে হইবে এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

(৩) কৃষকগণই দেশের পালনকর্ত্তা—কারণ তাহারাই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে।

(৪) কৃষকদের আজ দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত নাই। সেই দুর্দ্দশার কবল হইতে কেবল মাত্র তাহারাই (কৃষকরাই) তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ।

(৫) কলকব্জা প্রবর্ত্তনের ফলে কৃষাণদিগকে বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ে কর্ম্মহীন থাকিতে হইতেছে।

(৬) কৃষকগণকে আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে এবং দৃঢ় ভাবে সংগঠন করিতে হইবে।

সর্দ্দার প্যাটেলের উপরোক্ত অভিভাষণে কর্ম্মনির্দ্দেশ আছে দুইটী ; যথা—(১) ভয় ত্যাগ করিতে হইবে এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, (২) আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে এবং দৃঢ়ভাবে সংগঠন করিতে হইবে। ভয় এবং আলস্য ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ যে একটা প্রকাণ্ড কিছু হইয়া উঠিতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ঐ দুইটীর একটীও ত্যাগ করা যায় না। তাহার উপায় কি?

শিল্প

কানাডা প্রদর্শনী

বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে কানাডায় একটি জাতীয় (national) প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণমেন্ট যুক্ত প্রদেশের কুটীরশিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কানাডা প্রদর্শনীতে শিল্প প্রদর্শনের সুযোগ দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে ১০,০০০৲ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই টাকা মাল পাঠানর খরচা, বীমা, বিজ্ঞাপন, বিক্রয়-ব্যবস্থা প্রভৃতি বাবদ খরচ হইবে। যুক্ত-প্রদেশের শিল্প-বিভাগের কর্ত্তা প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন।

কাশ্মীর সিল্ক ও মোরাদাবাদের পিত্তল তৈজসপত্র, আগ্রার পশমী কার্পেট, লক্ষ্ণৌয়ের ছাপা কাপড়, পুরুয়ার মৃৎশিল্প প্রভৃতি দ্রব্য সংগৃহীত হইতেছে। যুক্ত-প্রদেশের সরকারী চিত্র-বিদ্যালয় চারু-শিল্পের বহু নিদর্শন প্রেরণ করিবেন। ইহা ছাড়া ভারতের কতকগুলি বন্য জন্তুও প্রেরিত হইবে। প্রদর্শনীর পর জন্তুগুলিকে টোরোণ্টোর (কানাডা) চিড়িয়াখানাতেই রাখা হইবে।

আনন্দের সংবাদ নয় কি?

কুটীর-শিল্প

আসামের তাঁত শিল্পের পুষ্টিসাধনার্থে ভারত সরকার আসাম প্রদেশকে ১৭ হাজার টাকা দান করিতেছেন। আসাম সরকার, ঐ প্রদেশের সূতী, মুগা, এণ্ডি ও সিল্কের তাঁতের উন্নতিকল্পে একটি সমিতি গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ভারত সরকারের এই দানের জন্য আসাম প্রদেশের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতীয় অর্থসাহায্যে কুটীর-শিল্পের প্রকৃত সহায়তা হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ মজুরী পাইলে শিল্পীর উদরান্নের সংস্থান হয়, কুটীর-শিল্প হইতে তাহা অর্জ্জন করিতে হইলে—শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য যাহা হইয়া পড়ে, ঐ মূল্যে উহা যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় না। ফলে যতদিন টাকার অথবা ভাবের দানখয়রাৎ পাওয়া যায়, কেবলমাত্র ততদিনই কুটীর-শিল্পানুষ্ঠানগুলি টিঁকিয়া থাকে। দানখয়রাৎ বন্ধ হইয়া গেলে কুটীর-শিল্পানুষ্ঠানগুলিও বন্ধ হইয়া যায়। এই বিপদ হইতে কুটীর-শিল্পীগণকে রক্ষা করিবার উপায় তিনটী—

(১) প্রধানতঃ কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের উদ্বৃত্ত সময়ে কুটীর-শিল্প অবলম্বন করে তাহার ব্যবস্থা করা।

(২) কৃষকদিগের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলি যাহাতে নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করা সম্ভব হয় এবং কৃষকগণ যাহাতে নামমাত্র মূল্যে তাঁহাদের কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা।

(৩) কৃষকগণ যাহাতে অনুর্ব্বর জমি চাষ না করে তাহার ব্যবস্থা করা।

কি যাদুমন্ত্রবলে কোন্ মহাপুরুষ ঐ তিনটী ব্যবস্থা করিবেন তাহা আমরা জানি না। তবে ঐ তিনটী ব্যবস্থা না হইলে কুটীর-শিল্প যে আত্মনিভরশীল হইবে না তাহা নিঃসন্দেহ।

জুতার কাজ

বঙ্গদেশীয় সরকারের শিল্প-বিভাগ স্থির করিয়াছেন, চর্ম্ম-পাদুকা নির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য একদল ছাত্র তাঁহারা গ্রহণ করিবেন।

পুরাপুরি জুতা তৈয়ারীর কাজ শিখিতে ছয় মাস লাগিবে। বর্ত্তমান মে মাস হইতেই কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ হইবে। যে সকল বেকার যুবক শিল্প-শিক্ষা করিয়া প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আগ্রহশীল, তাঁহাদেরই জন্য সরকার এই ব্যবস্থা করিতেছেন।

সরকার যে বেকার সমস্যা পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন। ইহার জন্য সাধারণের গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। গভর্ণমেণ্টের শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারীগণ যে, দেশের জন্য চিন্তান্বিত হইয়াছেন তাহা গভর্ণমেণ্টের বহু কার্য্যেই পরিলক্ষিত হয়, আর বিশেষজ্ঞগণ যে দেশ লইয়া খেলা করিতেছেন তাহাও একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। জুতা তৈয়ারীর কার্য্য শিখাইয়া বেকার সমস্যা পূরণের এই চেষ্টাকে দেশ লইয়া খেলা করিবার একটা উদাহরণ বলা যাইতে পারে।

দুই রকমের পরিশ্রমের দ্বারা সাধারণতঃ মানুষ তাহার জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে; যথা (১) হস্তপদাদির পরিশ্রম, এবং (২) মস্তিষ্কের পরিশ্রম। যাঁহারা হস্তপদাদির পরিশ্রম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "শ্রমজীবী" বলা হইয়া থাকে। আর যাঁহারা মস্তিষ্কের পরিশ্রম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "মস্তিষ্কজীবী" অথবা "তত্ত্বাবধায়ক" বলা হয়। মানুষ লিখিতে পড়িতে শেখে সাধারণতঃ "মস্তিষ্কজীবী" হইবার জন্য। "শ্রমজীবী"কে "মস্তিষ্কজীবী" তৈয়ারী করার নাম দেশের উন্নতি, আর "মস্তিষ্কজীবী"কে "শ্রমজীবী" পরিণত করা দেশের অবনতি। বিশেষজ্ঞগণকে গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন হয়, দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য। যাঁহারা দেশের অবনতি সাধন করেন, তাঁহারা বিশেষজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়াও প্রকৃত পক্ষে ঐ নামের কলঙ্ক বলিতে হইবে।

বর্ত্তমানে আমাদের যে সমস্ত যুবক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। তাঁহারা শ্রমজীবী হইবার জন্য লেখা-পড়া শেখেন নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, কারণ শ্রমজীবী হইবার জন্য কেহ লেখা-পড়া শেখে না। দেশে জীবিকার্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক সংগঠন-বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া যদি এই সমস্ত শিক্ষিত যুবকের "শ্রমজীবী" রূপে দিনাতিপাত করিতে হয়, তাহা কি দেশের অবনতির পরিচয় নহে? এবং তাহার জন্য কি বিশেষজ্ঞগণই দায়ী নহেন? দেশের সঙ্কটের সময়ে গবর্ণমেণ্টের শাসন-বিভাগ যতখানি কর্ত্তব্যচিন্তা লইয়া যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়েন, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণের চিন্তা শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ, সেচ বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করিলে বোধ হয় দেশে কখনও এইরূপ সঙ্কট আসিতেই পারে না।

'নামকো ওয়াস্তে'

যুক্তপ্রদেশের শিল্প-সংক্রান্ত রাজস্ব সমিতি নির্দ্ধারণ দিতেছেন—

(১) যুক্তপ্রদেশের শিল্প-সমূহে অগ্রিম অর্থ সাহায্য দিবার জন্য একটি শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।

(২) ছোটখাট শিল্প সমূহ বিক্রয়ের সুবিধার জন্য একটি সমিতি গঠন করা বাঞ্ছনীয়। কোন্ শিল্পের চাহিদা কোথায়, কোন্ দেশে কোন্ শিল্প আদর পায়, সমিতি এইরূপ তথ্যসমূহ সংগ্রহে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে শিল্পীগণকে উপদেশ দিবেন।

(৩) কানপুরে একটি ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

এক একটী প্রদেশের অথবা সমগ্র দেশের সমুদয় লোকের সর্ব্ব রকমের শিল্পজাত দ্রব্য কি পরিমাণ লাগিতে পারে এবং তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ বিদেশ হইতে আমদানী হওয়া অনিবার্য্য, তাহা স্থির করিলে, কোন্ কোন্ প্রদেশে অথবা সমগ্র দেশে কোন্ কোন্ শিল্পজাত দ্রব্য কি পরিমাণ প্রস্তুত হওয়া উচিত তাহা নির্দ্ধারিত হয়। কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং তাহাতে কত মস্তিষ্কজীবী ও শ্রমজীবী লাগিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী শিল্পের ব্যবস্থা ও তাহার

সহায়তা করিলে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সহায়তা করা হয়। তাহা না করিয়া খালি "নামকো ওয়াস্তে" কতকগুলি কার্য্য করিলে আপাততঃ নাম হয় বটে, কিন্তু পরিণামে আবার অখ্যাতি অর্জ্জন করিতে হয়।

যুক্ত প্রদেশের রাজস্ব-সমিতির এই কাগ্যগুলি কেবল "নামকো ওয়াস্তে" কার্য্য হইতেছে না তো?

বিবিধ

রাস্তা-নির্ম্মাণ

আসাম সরকার, ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত তিন লক্ষ টাকা আসামের পল্লীসমূহে পাকা কূপসমূহ খনন করিয়া পানীয় জল সরবরাহ ও রাস্তা-নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয় করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন।

খুব ভাল কার্য্য। আসাম প্রদেশটী যে ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্য পরায়ণ এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিচালিত হস্তে ন্যস্ত আছে, ইহা তাহারই পরিচয়।

গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগ (public works deptt.) যখন রাস্তাগুলির লাইন (alignment) নির্দ্ধারণ করেন, তখন প্রায়শঃ তত্রত্য জমিগুলির জলনিকাশের স্বাভাবিক গতির দিকে যথোপযুক্ত নজর রাখেন না। তাহাতে রাস্তা নির্ম্মাণের ফলে দুইটী অপকার সাধিত হয়, (১) জমি গুলির উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যায়, এবং (২) ঐ প্রদেশ অস্বাস্থ্যকর হইবার সম্ভাবনা থাকে। রাস্তাটা কি পরিমাণ জমির জলনিকাশ অবরোধ করিতে পারে তাহা সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া প্রচুর জলনিকাশের ব্যবস্থা করতঃ রাস্তার লাইন, পুলের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলে রাস্তা-নির্ম্মাণ কার্য্যে দেশের উপকার সাধিত হয়। আশা করি, আসামের রাস্তা-নির্ম্মাণ কার্য্য যাঁহাদের হাতে আছে তাঁহারা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অবহিত হইবেন।

কৃষাণ ও কেরাণী

যুক্তপ্রদেশের সরকার, যুক্তপ্রদেশের শিক্ষিত বেকারদিগকে কর্ম্মের সন্ধান দিবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। যুক্ত-প্রদেশ-সরকারের কর্ম্মচারী মিঃ দুর্গাপ্রসাদ ঐ প্রদেশের নানাস্থানে সফর করিয়া আবাদযোগ্য বহু জমির সন্ধান করিয়া আসিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে শিক্ষিত বেকার যুবকদিগকে ঐ সমস্ত জমি দিলে তাহারা চাষবাস করিয়া জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম হইবে। মিঃ দুর্গাপ্রসাদের প্রস্তাব সম্পর্কে শীঘ্রই সরকারী আলোচনা আরম্ভ হইবে।

ইহাও জুতা প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া শিক্ষিত যুবকের বেকার সমস্যা সমাধানের অনুরূপ ব্যবস্থা। একদিকে কৃষক-সন্তানগণ শিক্ষিত হইয়া কেরাণীগিরি গ্রহণ করিতেছেন এবং প্রায়শঃ অসামর্থ্যের জন্য কর্ম্মকর্ত্তার ভ্রূকুটী সন্দর্শন করিতেছেন, অন্যদিকে কেরাণী-সন্তান কেরাণী গিরি না পাইয়া কখনও বা কৃষির জন্য মাঠে যাইতেছেন, আর কখনও বা শিল্পের জন্য ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিতে-ছেন। উভয়েই পেটের দায়ে অনভ্যস্ত কার্য্য গ্রহণ করিয়া অশান্তি এবং অস্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন। ইহার কি কোনই প্রতীকার নাই?

কলিকাতার মেয়র

মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক ১৯৩৫-৩৬ সালের জন্য কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত বৎসরও মৌলভী সাহেব মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কর্পোরেশনের সভার আইনসংক্রান্ত দোষক্রটীর জন্য সে নির্ব্বাচন নাকচ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মুসলমানও হিন্দুর দেশের লোক এবং উপযুক্ত হইলে তাঁহাদেরও মেয়রপদ পাইবার অধিকার আছে, ইহা মনে করিয়া যাঁহারা মৌলভী সাহেবকে মেয়র নির্ব্বাচন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

হিন্দু মহাসভা

গত ইষ্টারের ছুটীর সময় কানপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। ভিক্ষু উত্তম সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ভিক্ষু উত্তমের অভিভাষণের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আমি হিন্দু মহাসভার কোন কাজ করিয়াছি বলিয়াই যে আপনারা আমাকে নেতৃত্ব করিতে আহ্বান দিয়াছেন, তাহা আমার মনে হয় না। ব্রহ্মদেশে যে এক কোটী হিন্দু আছে, তাহারা যে হিন্দু সমাজেরই অংশ, তাহা স্বীকার করিবার জন্যই বোধ হয় আপনারা আমাকে সভাপতির আসন দিয়াছেন।

ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের মধ্যে কৃষ্টিগত ঘনিষ্ঠতা আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে উভয় দেশের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক সম্পর্কও রহিয়াছে। এই দুইটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা বদ্ধপরিকর। আপনারা ভারতের কানপুরের হিন্দুসভায় সুদূর ব্রহ্মের হিন্দু ভিক্ষুকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়া দেখাইয়াছেন যে আপনারা ব্রহ্ম বিচ্ছেদ-বিরোধী।

হিন্দু ও বৌদ্ধ কৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য আছে, এই যুক্তিতে যাঁহারা ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অবগতির জন্যই বলিতে হইতেছে যে, ভগবান বুদ্ধ পরম হিন্দু ছিলেন। বুদ্ধদেব কখনও হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করেন নাই, তিনি হিন্দুধর্মের ভিত্তি প্রসারিত করিয়াছিলেন মাত্র। ব্রহ্মদেশের লোকেরা ভগবান বুদ্ধকে হৃদয়-দেবতা মনে করে, তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলে, তাঁহার জন্মস্থান ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ মনে করে। ব্রহ্মবাসীরা সকলেই হিন্দু। আমি মনে করি, ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য বিরাট হিন্দু জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করা। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যেরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, হিন্দু-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে সেইরূপ আন্দোলন চালাইতে হইবে।

ভিক্ষু উত্তমের কথাগুলি খুব সারবান। তবে মনে রাখিতে হইবে, উত্তেজনায় কোন সৎকার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। উত্তেজনা-সম্ভূত কার্য্যগুলি প্রায়শঃ "হুজুগ" রূপে পরিচালিত হয়। ভিক্ষু উত্তমের কথায় যে কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে, শিক্ষা দ্বারা সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের মধ্যে জাগ্রত করিতে পারিলে দুইটী নামে বিচ্ছিন্ন হইলেও দেশ কোন অবস্থাতেই প্রকৃত পক্ষে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

ব্যক্তিগত

মহাত্মা গান্ধী

গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে মহাত্মাজী তাঁহার চার সপ্তাহের মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন। মৌনী থাকাকালীন স্বীয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে তাঁহার ন্যায় সত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে ইহা সবিশেষ উপকারী ইহা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। মৌনী অবস্থায় আত্মা কর্ত্তব্যপথ স্পষ্টতররূপে দেখিতে পায়; যাহা মোহাচ্ছন্ন ও ভ্রমাত্মক, মৌনী অবস্থায় তাহাও স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। সারা জীবন সত্যের অনুসন্ধানেই আমরা রত আছি। আত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য তাহারও বিশ্রাম প্রয়োজন।

মহাত্মাজী আরও বলিয়াছেন, এতদিন পর্য্যন্ত তিনি সপ্তাহে এক দিন মৌনব্রত পালন করিতেন এখন হইতে মাঝে মাঝে তিনি দীর্ঘ দিবস মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন, ইহাতে শান্তি পাওয়া যায়। ক্রোধ-নিয়ন্ত্রণে মৌনতা বিশেষভাবে কার্য্যকর।

মৌনাবস্থায় গান্ধীজী যে সকল স্তূপাকার চিঠিপত্র জমা হইয়াছিল, সে সকলের উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কৃষি-সংবাদ

নাগপুরের কমলা লেবু কত কাল টাটকা রাখা যায় তৎসম্পর্কে পুনার কির্কী কৃষি গবেষণাগারে গবেষণা চালাইতেছেন। প্রকাশ, মধ্য প্রদেশের সরকারী কৃষিবিভাগ কোন্ শ্রেণীর কমলা ইউরোপে চালান দেওয়া যাইবে তাহা স্থির করিয়াছেন।

পুণার কৃষি-বিশেষজ্ঞের নিকট উক্ত বিষয়ের গবেষণার জন্য নাগপুর হইতে সুপক্ক, অর্দ্ধপক্ক, কাঁচা কমলা লেবু পাঠান হইয়াছে।

এই গবেষণা-কার্য্যের সকল ব্যয় ইম্পীরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার বহন করিতেছেন। গবেষণা শেষ হইতে ৬ মাস লাগিবে। ইউরোপে চালান দিবার পক্ষে এই গবেষণা বিশেষ কার্য্যকরী হইবে।

যুক্ত-প্রদেশের কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টার তাঁহার সাম্বৎসরিক বিবরণীতে বলিয়াছেন, কৃষি ও উদ্যান বিভাগের কার্য্যাবলী তিন জন উদ্ভিদ-বেত্তা, একজন বৃক্ষ-ব্যাধি-বিশেষজ্ঞ, একজন কীটবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ ও একজন কৃষি-রসায়নজ্ঞ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। শীঘ্রই একজন কৃষি-ব্যয়-বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত হইবেন।

ভারতসম্রাটের রজত-জয়ন্তী

কোন রাজার পক্ষে পঁচিশ বৎসর কাল রাজ্যপরিচালনা করা অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। ভারতসম্রাজ্ঞী রাণী ভিক্টোরিয়া ষষ্টি বৎসরেরও অধিক কাল রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন; সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সে সৌভাগ্য হয় নাই। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকালের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ৬ই মে, বৃটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে রজত-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষও সে উৎসবে যোগদান করিয়াছিল।

ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশ রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজ-হৃদয়ের পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। যুবরাজ-বেশে ভারতবর্ষে আসিয়া বঙ্গ-ভঙ্গ-জনিত বিক্ষোভ তিনি চাক্ষুষ করিয়া গিয়াছিলেন; তাই সিংহাসনারোহণ করিয়া যখন তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার আদেশে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়াছিল। যে রাজা প্রজার দুঃখ বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তিনি আদর্শ রাজা। আমরা রাজদম্পতীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ওরিয়েণ্টাল লাইফ এ্যাসিয়োরেন্স কোম্পানী

আমরা সমালোচনার্থ এই কোম্পানীর ১৯৩৪ সালের কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। এই বৎসরে কোম্পানী ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা মূল্যের ৪১ হাজার ৩ শত ৭৮টি বীমা-পত্র দাখিল করিয়াছেন। গত বৎসরের তুলনায় এই কাজ ৫৮ লক্ষ টাকার অধিক।

আলোচ্য বৎসরে চাঁদা আদায় বাবদ কোম্পানীর ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, অ্যানুইটি বাবদ ৩৭ হাজার টাকা এবং সুদ, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবদ ৭১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। কোম্পানীর ব্যয়ের অনুপাত মাত্র শতকরা ২৩।

এই বৎসর কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুজনিত ৪৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা এবং বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ ৫৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা—একুনে ১ কোটি ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা কোম্পানীকে দিতে হইয়াছে।

বৎসরের শেষে ওরিয়েণ্টালের মোট সম্পত্তির পরিমাণ দেখিতেছি ১৬ কোটী ১২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। উহার মধ্যে ১৩ কোটী ১৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসিপ্যাল, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ও পোর্ট ট্রাষ্টের ডিবেঞ্চার প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সিকিউরিটিতে দাদন করা আছে। সুতরাং কোম্পানীর তহবিল যে সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে সংরক্ষিত তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী তাঁহাদের দাদনী তহবিলের উপর গড়-পড়তা বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ অর্জ্জন করিয়াছেন। সুতরাং তহবিল যে লাভজনক উপায়ে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত হিসাব না জানিলেও সকলেই জানেন, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে 'ওরিয়েণ্টাল' এদেশের গৌরব, বীমা-বিষয়ে সামান্য সংবাদও যাহারা জানেন, তাঁহারাই এ তথ্য জ্ঞাত আছেন সুতরাং নূতন করিয়া 'ওরিয়েণ্টালে'র পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়ার আধিপত্য ও মৃত্যুর হার ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বিভিন্ন রোগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী একথা অস্বীকার করিবার নহে; প্রতি বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ এই ম্যালেরিয়া জ্বর। এমন একদিন ছিল যখন বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য, ধনসম্পদ, আমোদ-প্রমোদ, আশা-ভরসা, সুখশান্তি ও স্বাস্থ্যবল সকলই বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে, প্রতি সহরে বিরাজমান ছিল। কিন্তু আজ ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে দিনে দিনে পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য ক্রমশঃ নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এ ধ্বংসের পথ রোধ না করিলে বাঙ্গালী জাতির আর উন্নতি নাই। ম্যালেরিয়া আজ যে কেবল এই প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে। বরং ইহা বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবে পল্লীর কুটীরগুলি শূন্যপ্রায়, পল্লীর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এখন পরিত্যক্ত। দেশের স্বাস্থ্যের আবহাওয়া এখন এত দূষিত যে, পুনরায় শীঘ্র ইহাকে বিশুদ্ধ না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার আর উপায় নাই।

ম্যালেরিয়া এদেশে এখন সাধারণভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে; এমন কি নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত ইহার সহিত সুপরিচিত। ধনী প্রাসাদের মধ্যে ইহার আক্রমণ হইতে নিস্তার পান না। এনোফিলিস মশক কোন ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর রক্ত শোষণ করিয়া ঐ বিষ যদি কোন সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয় তখন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ঐ রোগ প্রকাশ পায়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, যে স্থলে এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে, সেখানে ভুগিতেছে অন্ততঃ বিশ জন। এই কালব্যাধিতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি যে কত নষ্ট হইতেছে তাহার পরিমাণ হয় না। শীর্ণ দেহে, প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত উদরে, পাংশুমুখে, কত শত উপার্জ্জনক্ষম যুবক গৃহের কোণে নিরুপায় হইয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া অনেক মাতার স্তন্যদুগ্ধও শুষ্ক হইয়া যায়; ক্ষুধাতুর শিশু ক্ষীণ ও দুর্বল অবস্থায় মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া বিষ রক্তস্থ লাল কণিকাগুলিকে আশ্রয় করিয়া বা ক্রমে তাহাদের ধ্বংসসাধন করিয়া রক্তাল্পতা উপসর্গ আনয়ন করে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর ক্ষীণ দেহ রক্তের অভাব হেতু পাংশুবর্ণ হইয়া যায়। খাদ্যে অরুচি জন্মে, পেটজোড়া পিলে হয় ও দেহ কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া পড়ে। তখন এ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। বহু বৎসর গবেষণার পর ইহা বিশেষজ্ঞগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সুইজারল্যাণ্ডের আবিষ্কৃত রচিটোন ম্যালেরিয়া রোগীর কর্ম্মশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ। ইহার নিয়মিত ব্যবহার ম্যালেরিয়ার পুনঃআক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করে। রচিটোনের মূল্যবান উপাদানগুলি স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ-সংমিশ্রণ বলিয়া অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহার গুণ ও কার্য্যকারিতা অনেক বেশী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিকিৎসক মণ্ডলী ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর হইতে রচিটোন ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা রক্তস্থিত ম্যালেরিয়া বীজাণু ধ্বংসসাধন করিয়া, শরীরে নূতন রক্তকণিকা সৃষ্টি করিয়া রক্তকে সতেজ করে। ইহা সেবনে দুর্ব্বলতা দ্রুত দূর হইয়া দেহে যথেষ্ট নববল ও জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়; উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

—ডাক্তার এম. জি. বসাক

শ্রীসুরেশচন্দ্র ... কর্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৫৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
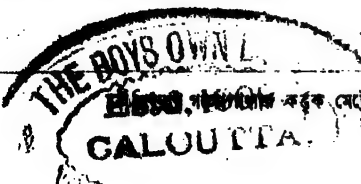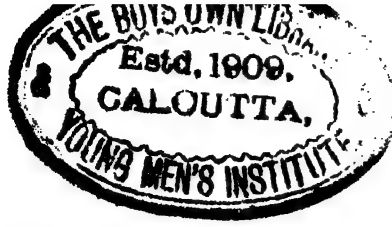
ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—জনৈক "অর্থনীতির ছাত্র"

বুদ্ধিপ্রধান অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানের সীমা ও পরিমাণ কতখানি হইতে পারে তাহা কল্পনা করিতে হইলে প্রথমতঃ 'জ্ঞান' কাহাকে বলে; তাহার একটা ধারণা করিয়া লইতে হয়।

জ্ঞাতভাবেই হউক অথবা অজ্ঞাতভাবেই হউক, মানুষ সর্ব্বদা কোন না কোন ইচ্ছার বশীভূত। প্রকাশ্য ভাবে মানুষ যে কার্য্য করে তাহার লক্ষ্য—অভীষ্ট বস্তু এবং কার্য্যের যন্ত্র—মানুষের ইন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয় ব্যতীত মানুষের কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হয় না। মাতালের মদ খাওয়া, ছাত্রের অধ্যয়ন, যোগীর যোগ—সমস্ত রকমের কার্য্যেই ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার আবশ্যক হয়।

ইন্দ্রিয় যখন মানুষের অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার জন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তখন যদি মানুষ, ঐ বস্তুটি কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত অথবা উহা কোন্ মৌলিক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে মানুষ ঐ বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিতে পারে।

প্রত্যেক প্রার্থনীয় বস্তুকে লইয়া মানুষের ইন্দ্রিয় তিন রকমের খেলা খেলিয়া থাকে। কোন বস্তুকে দেখিবামাত্র হয় সেই বস্তুর রূপ, রস প্রভৃতি কেন তাদৃশ হইল এইরূপ চিন্তার উদয় হয়, নতুবা সেই বস্তুটিকে উপভোগ করিবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়। উপভোগ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইবা মাত্র, হয় উপভোগ আরম্ভ হয়, নতুবা বস্তুটিকে কি ভাবে ব্যবহার করিলে উপভোগের চূড়ান্ত হইবে তাহার গবেষণা উপস্থিত হয়।

বস্তুর উপভোগ আরম্ভ হইলে অথবা কোন্ রকমের ব্যবহারে উপভোগের চূড়ান্ত হইতে পারে তাহার গবেষণা উপস্থিত হইলে, বস্তুটি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয় না। জ্ঞানলাভ হয় কেবল মাত্র তখন, যখন বস্তুটি কেন তাদৃশ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও কার্য্যশক্তিসম্পন্ন হইল তৎসম্বন্ধে বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়। বস্তুর এতাদৃশ বিশ্লেষণের নাম "বস্তুটিকে বুঝিবার প্রযত্ন" এবং এই প্রযত্নের ফলে বস্তুর রূপাদি সম্বন্ধে যে ধারণা হয় তাহাকে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান বলা যায়। বুঝিবার প্রযত্ন আরম্ভ হইলেই যে বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্যক্ ভাবে লব্ধ হয় তাহা নহে। বুঝিবার প্রযত্ন আরম্ভ হইলেও বুঝিতে ভুল হইতে পারে এবং তাহার ফলে বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভ্রমাত্মক হইবারও আশঙ্কা থাকে। প্রথম প্রথম জ্ঞান ভ্রমাত্মক হইলেও, যতদিন পর্য্যন্ত বস্তুসম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বুঝিবার প্রযত্ন নিরবচ্ছিন্ন এবং অটুট থাকিলে কোন না কোন দিন ভ্রম বিদূরিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হইবেই হইবে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, "জ্ঞান" বলিতে বুঝিতে হয়, বস্তুসম্বন্ধীয় ধারণা বিশেষ এবং তাহা লাভ হয় বুঝিবার প্রযত্নের ফলে। বুঝিবার প্রযত্ন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন জ্ঞান লাভ হয় না।

জ্ঞান সসীম অথবা অসীম তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা সুকঠিন। জ্ঞান সসীম হউক অথবা অসীম হউক—জ্ঞাতব্য বস্তু যে অসংখ্য তাহা সুনিশ্চিত। জল, স্থল, আকাশ,—যে দিকে চাওয়া যায়, সেই সকলই অগণিত বস্তুতে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেকটি বস্তু মানুষের জ্ঞাতব্য। কিন্তু মানুষের নিকট তাহাদের অধিকাংশের নামও অপরিজ্ঞাত। আকাশে ঐ যে অসংখ্য তারকারাজি বিরাজিত, তাহাদের রহস্য জানা ত' দূরের কথা, তাহাদের কয়টির নাম আমাদের জানা আছে? তারকা ও ভূমণ্ডলের মধ্যে যে কত ব্যবধান এবং তাহা যে কত বিবিধ বস্তুতে পরিপূর্ণ আমরা তাহার ইয়ত্তাও করিতে

পারি না। জলের প্রত্যেক অণু ও পরমাণু যে কত অসংখ্য গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের আবাসস্থল আমরা তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। দুইটি পুকুরের জল, দুইটি কূপের জল, পুকুরের জল ও কূপের জল, একটি পুকুরের দুই স্থানের জল—কিয়ৎ পরিমাণে সমগুণবিশিষ্ট হইলেও সর্ব্বতোভাবে সমগুণবিশিষ্ট হয় না। জলের ন্যায় মৃত্তিকারও প্রত্যেক অণু এবং পরমাণু সংখ্যাতীত গুণাশ্রয়ী।

এক দিকে যেমন জ্ঞাতব্য বস্তু অসংখ্য, অন্যদিকে আবার প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বস্তুতে জ্ঞাতব্য বিষয়ও অসংখ্য।

প্রত্যেক বস্তুটির তিনটি ভাব। একটি তাহার 'বাহির', দ্বিতীয়টি তাহার 'অন্তর', তৃতীয়টি তাহার 'আদি'। জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহার ঐ তিনটি ভাব নাই। বালুকণা, কীট, পতঙ্গ, হস্তী, ব্যাঘ্র, বট, অশ্বত্থ যে কোন বস্তুর কথা ধরা যাক না কেন, প্রত্যেকেরই 'বাহির' আছে, 'অন্তর' আছে এবং 'আদি' আছে। 'আদি'তে তাহার জন্ম অথবা উদ্ভব, 'অন্তরে' তাহার কর্ম্মশক্তি, 'বাহিরে' তাহার বিকাশ।

আকাশে ঐ পাখীটি উড়িতেছে। বায়ুতরঙ্গের সহিত মিলিত তাহার পাখা দুইটির কত অসংখ্য অঙ্গভঙ্গী মানুষের দৃষ্টিগোচর হইতেছে; আবার কখনও পাখীটি অসংখ্য রকমের সুশ্রাব্য ও অশ্রাব্য আওয়াজ করিতেছে। পাখীর অঙ্গভঙ্গী ও আওয়াজ তাহার 'বাহির'। যে কারণে তাহার অঙ্গভঙ্গীর ও আওয়াজের উদ্ভব হয় তাহা তাহার 'অন্তর'। পাখীর 'অন্তর' ক্রিয়া-শক্তিসম্পন্ন হইয়া উহাতে অঙ্গভঙ্গী ও আওয়াজের উদ্ভব হয় এবং সমস্ত পক্ষীর অঙ্গভঙ্গী ও আওয়াজে একদিকে যেমন একটা সমতা পরিলক্ষিত হয়, আবার অন্যদিকে প্রত্যেকটি পাখীর অপর পক্ষী হইতে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যে কারণে ইহা সম্ভব হয় তাহাই উহার 'আদি'

এই যে বালুকণাটি দেখা যাইতেছে, উহারও কর্ম্মশক্তি আছে, স্পর্শ আছে, রূপ আছে, রস আছে এবং গন্ধ আছে। এক মুষ্টি বালুকা দ্বারা কোন ধাতুনির্ম্মিত বস্তু ঘর্ষিত হইলে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই ঔজ্জ্বল্য-সাধন বালুকণার কর্ম্মশক্তি। বালুকণার স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ সহজেই উপলব্ধিযোগ্য। বালুকণার কর্ম্মশক্তি, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ তাহার 'বাহির'। যে উপাদানের জন্য বালুকণার তাদৃশ কর্ম্মশক্তি ও রূপরসাদির উদ্ভব, তাহা তাহার 'অন্তর' এবং যাহার জন্য তাহার উপাদানের সমবায় সংঘটিত হয় এবং সমস্ত বালুকণার মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য এবং প্রত্যেক বালুকণাটির অপর একটি বালুকণার সহিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা তাহার 'আদি'। প্রত্যেক বস্তুটির এই তিনটি ভাবের প্রত্যেকটি আবার অসংখ্য ভাবে পরিপূর্ণ।

এক মুষ্টি বালুকণা লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, যে কোন দুইটি বালুকণার 'বাহির' সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। প্রত্যেকটি অপরটি হইতে পৃথক, অথচ সমস্ত বালুকণার ভিতর আংশিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। অসংখ্য বালুকণার 'বাহির' অসংখ্য। যদি উপাদান পরীক্ষা করিবার সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে দেখা যাইবে, দুইটি বালুকণার উপাদানও সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। আবার বিভিন্ন উপাদানের কারণও বিভিন্ন এবং অসংখ্য।

দুইটি মানুষের 'বাহির' একরূপ নহে, 'অন্তর' একরূপ নহে এবং 'আদি'ও একরূপ নহে। সমস্ত মানুষের কথা চিন্তা করিলে মানুষের 'বাহির', 'অন্তর' এবং 'আদি' যে অসংখ্য তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

প্রত্যেক বস্তুর 'আদি'র আবার 'আদি' আছে। এই "আদির আদি" অসংখ্য না হইলেও, **তাঁহা** হইতে অসংখ্য উৎপন্ন হয় বলিয়া অসংখ্যকে না বুঝিলে **তাঁহাকে** বুঝা যায় না।

কোন একটি বস্তুকে পুরাপুরি বুঝিতে হইলে, বস্তুটির 'বাহির', 'অন্তর', 'আদি' এই তিনটি ভাব এবং তাহার "আদির আদিকে" বুঝিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ একে একে বস্তুটির ঐ তিনটি ভাবকে এবং তাহার "আদির আদিকে" সর্ব্বান্তঃকরণে এবং সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুটি বোধগম্য হইয়াছে ইহা মনে করা অলীক ও অসার।

আমরা আগেই বলিয়াছি, যাঁহারা উপভোগ অথবা উপভোগের গবেষণা লইয়া ব্যস্ত, তাঁহাদের বস্তু সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞাতব্য বস্তুর সংখ্যা যে অসীম এবং প্রত্যেক বস্তুর দ্রষ্টব্য বিষয় যে অসংখ্য, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এক কথায় তাঁহাদের বস্তু-জ্ঞান অত্যন্ত অপরিসর এবং অল্প।

কোন একটা বস্তুর তিনটি ভাব এবং তাহার আদির আদিকে সর্ব্বতোভাবে না বুঝিয়া ঘটনা-চক্রে বস্তুটির কতকগুলি প্রয়োগ শিক্ষা করিতে পারিলে বস্তুটি বোধগম্য হইয়াছে মনে করা অল্পবুদ্ধির পরিচয়। বস্তুটিকে পুরাপুরি না বুঝিয়া আকস্মিক লব্ধ তাহার কোন প্রয়োগ গ্রহণ করিলে, তাহা আপাততঃ মানুষের মনোহারী এবং হিতকারী বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ঐ প্রয়োগ বিষম অহিত সাধনও করিতে পারে।

বুঝিবার প্রযত্নের ফলে মানুষ যখন জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমতঃ এক এক শ্রেণীর বস্তুর 'বাহির' কত রকমের হয় তাহা তাহার নজরে পড়ে। তাহার পরই প্রশ্ন আসে যে, এক একশ্রেণীর বস্তুর এত সমতার মধ্যে এত অসংখ্য বৈষম্য কেন! এই প্রশ্নের ফলেই বস্তুর 'অন্তর' দেখিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। তখন মানুষ বস্তুর 'অন্তর' সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই 'অন্তরে'র জ্ঞানেও তাহার পরিতৃপ্তি হয় না। তখন আবার প্রশ্ন হয় যে একই শ্রেণীর বস্তুর অন্তরে এত সমতা অথচ এত বৈষম্য কেন! এই প্রশ্নের ফলে বস্তুর 'আদি' সম্বন্ধে জ্ঞাত হইবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইতে থাকে। বস্তুর 'আদি' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তির উদয় হইলে মৌলিক নয়টি দ্রব্যের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সময়ে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং মৌলিক নয়টি দ্রব্যের তত্ত্ব-জ্ঞান সম্পূর্ণ করিবার প্রবৃত্তি জাগে। সমস্ত বস্তুর "আদির আদি" সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত না হইলে নয়টি দ্রব্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। কাজেই মৌলিক নয়টি দ্রব্যের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সমস্ত বস্তুর "আদির আদি" সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। তখন প্রত্যেক বস্তুর 'বাহিরে' 'অন্তরে' এবং 'আদিতে' এত সমতার মধ্যে অসংখ্য বৈষম্য কেন তাহা জানা যায় এবং যিনি বস্তুর "আদির আদি"কে জানিতে পারেন, তাঁহার চোখে বিভিন্ন বস্তুর অসংখ্য বৈষম্যের মধ্যেও সমতা প্রতিভাত হয়। এবম্বিধ মানুষ আপাতবৈষম্য পূর্ণ মনুষ্য জাতিকে কি করিয়া এক ভাবাপন্ন করিতে পারা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন এবং কি ব্যবস্থা করিলে সমস্ত মানুষ সন্তুষ্টির ও সততার সহিত স্বাবলম্বী, স্বাস্থ্যপূর্ণ, দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। যাঁহারা বস্তুর "আদির আদি" সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ, তাঁহাদের কাছে "ঈশ্বর" "ভগবান" "ব্রহ্ম" প্রভৃতি শব্দ শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত হয় না। টিয়া পাখীর রাম নামের মত "ঈশ্বর" "ভগবান" এবং "ব্রহ্ম" প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না। যাঁহার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ এই সব শব্দ প্রযুক্ত, তাঁহারা তাঁহার প্রতীতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

কাজেই দেখা যাইতেছে, বস্তুর উপভোগ উপেক্ষা করিয়া বুঝিবার প্রযত্ন আরম্ভ হইলে, মানুষ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং জগৎ সুখের আগার করিয়া তুলিতে পারে। যাহাতে সমস্ত মানুষের সন্তুষ্টি, সততা, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু সাধন হইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা সকলেরই অভীষ্ট, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যাহাতে মানুষের সকল রকমের অভীষ্ট লাভ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা মানুষের মন চাহে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান বাস্তব জগতে বহুদিন হইতে দুঃখ কষ্ট মানুষের এমনই নিত্যসঙ্গী হইয়াছে যে, এখন আর ঐরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে মানুষ তাহা বিশ্বাস করিতেই চাহে না।

ভারতবর্ষে এখনও যাহা আছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া অনুধাবন করিলে, এখানে একদিন যে ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল এবং আজও যে অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, একথা আমরা একাধিকবার বলিয়াছি। দৃঢ়তার সহিত ও বারম্বার বলিবার মত কারণ আমাদের আছে।

মানুষের অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হয় দুই কারণে। প্রথমতঃ, আহার্য্যের ও ব্যবহার্য্যের অনটনের জন্য মানুষ অসন্তুষ্টি অনুভব করিয়া থাকে। আর দ্বিতীয়তঃ, যখন মান-সম্ভ্রমের অভাব মনে হয় তখনও অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হয়। অপরের তুলনায় নিজেকে যখন কোন বিষয়ে ছোট বলিয়া সন্দেহ হয়, তখনই মান-সম্ভ্রমের অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মানুষের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য উপার্জ্জনের ব্যবস্থা সহজ হইলে মানুষ সর্ব্বদা কোন না কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। একবার কোন বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইলে, মানুষ ঐ বস্তুটিকে লইয়া এত

অধিক সংখ্যক কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হয় যে, তখন আর মানুষের অপর কাহারও সহিত নিজের তুলনা করিবার অবসরই জুটিয়া উঠে না। তাহার জ্ঞাতব্য বস্তুটির জ্ঞান সমাধান করিতে একটির পর একটি করিয়া ঐ বস্তুটিকে লইয়া এত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে, মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদা ঐ বস্তুর প্রতি নিযুক্ত থাকে। তখন অপরের জ্ঞানের সহিত নিজের জ্ঞানেরও কোন তুলনা করিবার সময় হয় না।

অন্য দিকে, যদি আহার্য্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত পরিশ্রম-সাধ্য হয়, তাহা হইলে জীবিকার্জ্জনের কার্য্য সর্ব্বদা মানুষকে ব্যস্ত রাখে।

কেহ কেহ হয়ত সর্ব্বদা পরিশ্রম করিয়াও একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিও উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন না। এই অবস্থায় কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করিবার কথা মানুষের মনে উদিত হওয়া সম্ভব নহে। বরং অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যাদির অভাব বশতঃ নিজ হীনতার কথা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিজের মনে জাগ্রত হয়। ফলে সর্ব্বদা অপরের সঙ্গে নিজের সামর্থ্যের তুলনা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে।

গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের সমস্ত অসন্তুষ্টির মূলে রহিয়াছে খাদ্যাদির অভাব অথবা তদুপার্জ্জনে ক্লেশ। এই দুইটির কোনটি বিদ্যমান না থাকিলে মানুষ অসন্তুষ্ট হইতে পারে না। ভারতবাসী যাহা খাদ্য এবং ব্যবহার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, একদিন ভারতবর্ষে তাহার অভাব ছিল না এবং তাহা উপার্জ্জন করিতেও ক্লেশ হইত না।

অভাব যে ছিল না তাহার প্রমাণ ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা এবং তাহার জমির ফসলের পরিমাণ। ভারতবাসী যে কখনও অন্নের জন্য তাহার প্রাণের পুত্র ও দুহিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্যদেশে গিয়াছে তাহার কোনরূপ আভাস ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এখনও ভারতবর্ষের আর্থিক স্বাধীনতা বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষের জমিতে এখনও প্রতি বৎসর যে সমস্ত ফসল যে পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহা সমগ্র ভারতবাসীর সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সম্পূরণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। খাদ্যাদি উপার্জ্জন করিতেও যাহাতে ক্লেশ না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা যে এখানে একদিন ছিল, তাহার প্রমাণ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামের অবস্থা। তখনও বহু পরিবার নিজগ্রামে বসিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় বিকৃত আনন্দে যাপন করিয়া নিজ নিজ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিত; তখনও অনেক মধ্যবিত্ত সংসারে 'বার মাসে তের পার্ব্বণে'র ব্যবস্থা ছিল; তখনও গ্রামের কৃষক ঋণভারে এত জর্জ্জরিত হয় নাই; তখনও "অতিথি" বাড়ীতে আসিলে তাহাকে আদর করিয়া খাইতে দিতে ক্লেশানুভব করিতে হইত না।

কাজেই ভারতবর্ষে যে একদিন অন্নাভাব ছিল না, অন্নোপার্জ্জনের কার্য্যে ভারতবাসীকে যে সারাদিন ব্যাপৃত থাকিতে হইত না এবং অসন্তুষ্টি যে কি বস্তু তাহা এদেশের লোকের প্রায়শঃ অজানা ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এখনও ভারতবর্ষে যে ফসল হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বের তুলনায় কমিয়া আসিয়াছে এবং সতর্ক না হইলে অন্নাভাব আসন্ন তাহা সত্য, কিন্তু এখনও অন্নাভাব উপস্থিত হয় নাই।

দেশে দেশবাসীর আহারোপযোগী প্রচুর শস্যের উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও কেন যে ভারতবাসীর অন্নোপার্জ্জনের এত ক্লেশ হইতেছে তাহার কারণ বহু। আমরা সাধারণতঃ ইংরাজকে ইহার জন্য দায়ী করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত নহে। আমাদের অব্যবস্থার জন্য দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমাদের নিজেদের। তাহার আলোচনা আমরা যথা সময়ে এই প্রবন্ধেই করিব।

একদিন ছিল যখন ভারতবর্ষের লোকে অসততাও অনেক কম জানিত।

কোন কামনার বস্তু অর্জ্জন করিতে অসমর্থ হইয়া অসন্তুষ্টি অনুভব না করিলে অথবা অভাবগ্রস্ত না হইলে মানুষ সাধারণতঃ অসৎ হয় না। অসততার মূলেও থাকে অসন্তুষ্টির ঐ কারণ—যথা, খাদ্যাদির অভাব অথবা তদুপার্জ্জনে ক্লেশ। খাদ্যের অভাব ও তদুপার্জ্জনে ক্লেশ না থাকিলে মানুষ জ্ঞান অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিলে মানুষ সচরাচর অসৎ হইতে পারে না। অধুনা যে সমস্ত অপরাধের কথা শোনা যায়, কিছুদিন আগেও ভারতবাসীর অনেকেই সেই সমস্ত অপরাধের কল্পনাও করিতে পারিতেন না। আজ যাহা যে পরিমাণে আছে, "গত কল্য তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে ছিল," "পরশ্ব তাহা তদপেক্ষাও কম

পরিমাণে ছিল।" ইহা হইতে, একদিন একেবারে ছিল না এইরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে।

ভারতবাসী যে প্রায়শঃ স্বাবলম্বী ছিল তাহার প্রমাণ, এখানকার আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য উপার্জ্জনের ও তাহার আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা।

বর্ত্তমান জগতে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণের নির্দ্দেশানুসারে জীবিকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ব্যবস্থা শিল্প ও বাণিজ্য। ভারতবর্ষে জীবিকার প্রধান ব্যবস্থা কৃষি।* তাহার পরিচয় কৃষকের সংখ্যা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

শিল্প ও বাণিজ্যকে জীবিকার পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিলে সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী হইতেই হইবে, কারণ কাঁচা মাল না হইলে কোন শিল্প হয় না এবং জমি হইতে উৎপাদন না করিলে কোন কাঁচা মালও হয় না। কাজেই শিল্পীকে সর্ব্বদা কৃষকের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। কৃষি না হইলে শিল্প যেরূপ হয় না, আবার কৃষি ও শিল্প না হইলে সেইরূপ বাণিজ্যও হয় না। কাজেই বণিকও কৃষকের উপর নির্ভরশীল। অতএব দেশে কৃষির ব্যবস্থা না থাকিলে কিছুতেই আর্থিক স্বাবলম্বন রক্ষিত হইতে পারে না। অবশ্য মাত্র কৃষির দ্বারা উপার্জ্জনে কখন পূর্ণ স্বাবলম্বন হয় না। কারণ কৃষিজাত দ্রব্য মানুষের ব্যবহারোপযোগী করিয়া না লইলে মানুষ তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। কৃষিজাত দ্রব্যকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত করার নাম "শিল্প"।

কৃষিতে দেশের যত লোক নিযুক্ত হইতে পারে, শিল্পে তত লোক কিছুতেই নিযুক্ত হইতে পারে না। এক একটি লোক নিজ নিজ জীবন-যাত্রায় যে সমস্ত বস্তু সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার উৎপাদনে কয়জন কৃষক লাগিতেছে এবং কয়জন শিল্পী লাগিতেছে, তাহার হিসাব করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে। মানুষের ব্যবহারে ন্যূনপক্ষে লাগে একখানি গৃহ, কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু গৃহ-সজ্জা, কিছু বিশ্রাম-সজ্জা, কিছু পানীয় দ্রব্য এবং কিছু খাদ্য ইত্যাদি। ইহার সকলই আংশিক পরিমাণে কৃষিজাত এবং আংশিক পরিমাণে শিল্পজাত। ঘর প্রস্তুত করিতে খুঁটি, বাঁশ, দড়ি, খড় এবং ঘরামীর প্রয়োজন হয়। হিসাব করিলে প্রায়শঃ দেখা যাইবে যে, ঘর প্রস্তুত করিতে যাহা যাহা লাগে তাহার মধ্যে যাহা যাহা কৃষিজাত তাহা উৎপাদন করিতে যদি ৭টি কৃষকের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শিল্পী লাগিবে ১টি। মানুষের সারা বৎসরের প্রয়োজনে যাহা লাগে তাহা যদি একটি মানুষের এক বৎসরের পরিশ্রমে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে একটি মানুষের প্রয়োজনে প্রায়শঃ ৯/১২ ভাগ লাগে কৃষকের পরিশ্রম, ২/১২ ভাগ লাগে শিল্পীর পরিশ্রম এবং বাকী ১/১২ ভাগ লাগে বণিক, ডাক্তার, শিক্ষক এবং আইনজ্ঞ প্রভৃতির পরিশ্রম। জমির উৎপাদিকা শক্তি, কৃষক, শিল্পী, বণিক, ডাক্তার, শিক্ষক এবং আইনজ্ঞ প্রভৃতির নৈপুণ্যের তারতম্যানুসারে উপরোক্ত ভাগের তারতম্য হইয়া থাকে। ভাগের তারতম্য যতই হউক, মানুষের ব্যবহারে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন হয় কৃষকের পরিশ্রম এবং তাহার পর শিল্পীর পরিশ্রম, ইহা সুনিশ্চিত। দেশে কৃষী এবং শিল্পীর সমান নৈপুণ্য থাকিলে দেশের সমস্ত লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে যদি কৃষকের প্রয়োজন হয় ৯/১২ ভাগ, মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে শিল্পীর প্রয়োজন হয় ২/১২ ভাগ। দেশের কৃষক এবং শিল্পীর সংখ্যায় এই অনুপাতের ব্যতিক্রম থাকিলে বুঝিতে হইবে, স্বাবলম্বনের অসুবিধা ঘটিয়াছে। উপযুক্ত সংখ্যক কৃষক যদি দেশে কৃষির কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া তদপেক্ষা কম নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর ব্যবহার্য্য কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়; আর শিল্পীর সংখ্যা যদি বেশী হয়, তাহা হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য অপর দেশবাসীর মুখাপেক্ষার প্রয়োজন হয়। উভয়তঃই স্বাবলম্বনের অভাব ঘটে।

জীবিকার জন্য ব্যবস্থা সহজ ও সরল না হইলে তাহা শিখিবার জন্য মানুষের পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়।

জমি ও জলহাওয়া মানুষের সহজাত। ভগবান যেখানে মানুষ দিয়াছেন, সেইখানেই জমি ও জলহাওয়া দিয়াছেন। জমির কার্য্য মানুষ যত সহজে শিখিতে পারে, শিল্পের কার্য্য তত সহজে শিখিতে পারে না।

কাজেই দেখা যাইতেছে, মানুষের স্বাবলম্বী হইতে হইলে কৃষিকে জীবিকার সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়

* জমিকে কর্ষণ করিয়া উৎপাদনের কার্য্যকে আমরা "কৃষি" শব্দে অভিহিত করিতেছি। কাজেই "কৃষি" বলিতে "যাবতীয় জমিজাত দ্রব্যের উৎপত্তির কার্য্য" বুঝিতে হইবে।

এবং দেশে যাহাতে কৃষকের সংখ্যা শিল্পীর সংখ্যার ছয় গুণ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন আছে।

আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা না থাকিলে দেশে উপরোক্ত ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নহে। আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা করিতে হইলে আদান-প্রদান করিবার জন্য যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহা যাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণ আপন আপন পরিশ্রমানুযায়ী যথোপযুক্ত পরিমাণে পাইতে পারেন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। দেশের সর্ব্বসাধারণের যাহাতে আপন আপন সামর্থ্যানুযায়ী উপার্জ্জন হইতে পারে এবং ঐ উপার্জ্জন যাহাতে নিজ নিজ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের জন্য যথেষ্ট হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, প্রথমতঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন কার্য্যের নির্দ্ধারিত মূল্যবিরুদ্ধ উপার্জ্জন যাহাতে কেহ না করিতে পারেন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, তৃতীয়তঃ, সমস্ত পণ্যদ্রব্য যাহাতে এত সুলভ হয় যে, অন্য কোন দেশবাসী তদপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ না হন তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, এবং চতুর্থতঃ, দেশের প্রয়োজনীয় বস্তু যাহাতে রপ্তানী না হয় এবং নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তুও যাহাতে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রীত না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হয়। এই চারিটি ব্যবস্থাকে আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা বলা যাইতে পারে।

পণ্য দ্রব্য আদান-প্রদানের জন্য মুদ্রা দুই রকমের হইতে পারে—(১) কৃত্রিম, যাহা মানুষ প্রস্তুত করিতে পারে, যথা ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা; এবং (২) স্বাভাবিক, অর্থাৎ যাহা মানুষ প্রস্তুত করিতে পারে না, যথা কড়ি অথবা ঐ জাতীয় পদার্থ।

কৃত্রিম মুদ্রার বহুল প্রচার থাকিলে মুদ্রার অসমান প্রচলন এবং কাহারও কাহারও সামর্থ্যাতিরিক্ত উপার্জ্জন সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা কখনও সম্ভব হয় না।

যে মুদ্রা মানুষের দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা জিনিষপত্রের আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হইলে, যাঁহারা মুদ্রা প্রস্তুত করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন তাঁহারা যত মুদ্রার অধীশ্বর হইতে পারেন, তত মুদ্রা আর কাহারও পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে মুদ্রার অসমান বিতরণ (irregular distribution) অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ দেশের মধ্যে কেহ কেহ ক্রোড়পতিত্ব লাভ করেন, আবার কেহ কেহ ভিখারী হইয়া পড়েন। এমন কি অবশেষে মুদ্রা আসল "ধন" বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে এবং খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন উপেক্ষা করিয়া মানুষ মুদ্রার উপার্জ্জনে অবহিত হইয়া পড়ে। তখন মুদ্রা থাকিলেও খাদ্যের অভাবের আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং সমস্ত দেশবাসী পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে।

সহজলভ্য, সহজে বহনীয় অথচ অসংখ্য নহে, এমন কোন প্রকৃতিজাত বস্তুকে জিনিষপত্রের আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করিলে মুদ্রাসংখ্যার গণনায় মানুষ দরিদ্র হইলেও, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সকলেরই সহজলভ্য হয় এবং দেশের আপামর সকলেই নিজ নিজ চেষ্টায় অন্নসংগ্রহের সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারে। এইরূপে দেশ হইতে সকলেরই অন্নাভাব দূরীভূত হইতে পারে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইলে কার্য্য কয় শ্রেণীর তাহা স্মরণ করিতে হয়। আমরা আগেই বলিয়াছি, কার্য্য চারি শ্রেণীর, যথা; (১) ইন্দ্রিয়-প্রধান, (২) মনঃ প্রধান, (৩) বুদ্ধিপ্রধান ও (৪) আধ্যাত্মিক। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিপ্রবণ তাঁহাদের কার্য্য দেশের প্রত্যেকের পক্ষে মূল্যাতীত। মূল্য পাইবার জন্য তাঁহারা কার্য্য করেন না। তাঁহারা জানেন যে, দেশের কোন লোকের দুঃখ-যন্ত্রণা থাকিলে তাঁহারা নিজেরা সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারেন না। কাজেই তাঁহারা কর্ত্তব্যবোধে দেশের ও দশের কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রকৃত আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিপ্রবণ লোকের কার্য্যের মূল্য সাধারণতঃ দেশবাসী দিতে পারে না এবং দিবার প্রয়োজনও হয় না।

ইন্দ্রিয়-প্রবণ লোক নিজে স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দ্বারা স্বাধীন ভাবে নিজ অন্নোপার্জ্জন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় না। শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের সামর্থ্য যাহাতে উন্নীত হয়, সর্ব্বদা তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাঁহাদের পারিশ্রমিক দ্বারা যাহাতে নিজ পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে তদনুরূপ তাঁহাদের কার্য্যের মূল্য নির্দ্ধারিত রাখা উচিত।

মনঃপ্রবণ লোক সাধারণতঃ বুদ্ধিপ্রবণ লোকের নির্দ্দেশানুসারে ইন্দ্রিয়প্রবণ লোকের দ্বারা দেশের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এক এক জনের দ্বারা

দেশের যত লোকের কার্য্য সাধিত হয়, তদনুরূপ তাঁহাদের কার্য্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া সঙ্গত।

দেশের ভিতর জুয়াখেলা এবং কৃত্রিম মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইলে এবং উপযোগিতা অনুসারে পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা হইলে কাহারও পক্ষে স্বীয় পরিশ্রমের মূল্যাতিরিক্ত উপার্জ্জন করা সম্ভব হয় না।

আপাতদৃষ্টিতে পণ্যদ্রব্য সুলভ হইলে কৃষক ও শিল্পিগণের দারিদ্র্য-সম্ভাবনা হয়। প্রতি জনের উপার্জ্জিত টাকার সংখ্যা ধরিলে তাঁহাদের উপার্জ্জন কম হয় তাহা সত্য, কিন্তু প্রত্যেক কৃষক ও শিল্পী যেরূপ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ আবার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়াও থাকে। যে জিনিস কিনিতে হয় তাহা সুলভ হইলে, বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য সস্তায় বিক্রয় করিলেও কৃষকের ও শিল্পীর কোনরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না। অধিকন্তু বাহিরের প্রতিযোগিতার হাত এড়ান যাইতে পারে। দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিবার নীতিতে দেশের সকলের অভাব অনিবার্য্য।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, স্বাবলম্বী হইতে হইলে মানুষকে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হয় :—

১। কৃষিকে জীবিকার প্রধান পন্থা বলিয়া গ্রহণ করা,

২। দেশে যাহাতে দেশীয় লোকের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের উপযোগী যথেষ্ট পণ্য উৎপন্ন হয়, জমিকে তদনুরূপ ফসলবান্ করিবার ব্যবস্থা করা,

৩। শিল্প ও বাণিজ্যজ্ঞান লাভ করা,

৪। দেশে শিল্পী ও বণিক প্রভৃতির সংখ্যা যাহাতে কৃষক-সংখ্যার ছয় ভাগের একভাগ অপেক্ষা অধিক না হয় তাহার ব্যবস্থা করা,

৫। দেশে যাহাতে কৃত্রিম মুদ্রার বহুল প্রচলন না হইয়া স্বাভাবিক মুদ্রা দ্বারা সাধারণ পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয় তাহার ব্যবস্থা করা,

৬। বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা,

৭। দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যাহাতে রপ্তানী না হয় তাহার ব্যবস্থা করা,

৮। বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের মূল্যানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা,

৯। দেশে যাহাতে সমস্ত পণ্যদ্রব্য সুলভ হয় তাহার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ, কোনও পণ্যদ্রব্য যাহাতে নির্দ্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রীত না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া।

ভারতবর্ষ যে কৃষিকেই জীবিকার প্রধান পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহা তাহার কৃষকের সংখ্যার প্রতি নজর করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের জমির ফসলের পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে তাহা সত্য, কিন্তু একদিন যে এখানে যথেষ্ট ফসল হইত এবং এখনও যাহা হয় তাহা কোন দেশের তুলনায় কম নহে, ইহাও সহজেই অনুমান করা যায়।

দেশের তাঁতী, জোলা, কামার, কুমার, ছুতার এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বেণিয়ার দিকে নজর করিলে এখানে যে প্রয়োজনীয় শিল্প ও বাণিজ্য জ্ঞানের অভাব ছিল না, তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

আজকাল যাদৃশ কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার সাহায্যে মানুষের আহার্য্যের ও ব্যবহার্য্যের আদান-প্রদান করা হইয়া থাকে, কিছুদিন আগেও এই মুদ্রার প্রচলন যে এত অধিক ছিল না, তাহা সরকারী কাগজপত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কয়েকশত বৎসর আগেও ভারতবর্ষে কাগজের মুদ্রার প্রচলনের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা বহুদিন হইতেই প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু কিছুদিন আগেও তাহার প্রচলন এত অধিক ছিল না। এক সময়ে এ দেশের অনেক স্থানে যে 'কড়ি'র বহুল প্রচলন ছিল, তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এখানে সমস্ত পণ্যদ্রব্যও অত্যন্ত সুলভ ছিল। তাহার পরিচয় দেড়শত বৎসরের আগেকার ইতিহাস খুঁজিলেই পাওয়া যায়।

একটা দেশের স্বাবলম্বী হইতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার সমস্তই ভারতবর্ষে ছিল, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণিত হইতে পারে।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ভারত-বাসী কি করিয়া জমিকে যথোপযুক্ত ফসলপ্রদ করিতে হয়

তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া সমস্ত দেশটিকে এক সময়ে অতুলনীয় রূপে ফলপ্রদ করিতে পারিয়াছিল এবং কড়িকে মুদ্রারূপে প্রচলন করিয়া সমস্ত আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সকল মানুষের সহজলভ্য করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাতে মুদ্রাগণনায় ভারতবাসী দরিদ্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমগ্র দেশবাসী স্বাবলম্বী ও অন্নাভাবশূন্য হইতে পারিয়াছিল।

ভারতবর্ষ যে এক সময়ে স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘজীবী লোকে পরিপূর্ণ ছিল তাহার প্রমাণ, ভারতীয় গ্রামের অবস্থা এবং ভারতবাসীর বসবাস-পদ্ধতি। বর্ত্তমানে যে সমস্ত গ্রাম ম্যালেরিয়া-প্রধান ও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে তাহার প্রত্যেকটি এক সময়ে স্বাস্থ্যকর ও জন-পরিপূর্ণ ছিল, যে সমস্ত পরিবারে এখন আর ৪০।৪৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক অভিভাবক দেখা যায় না, সেই সমস্ত পরিবারে এক সময়ে একাধিক ৭০।৮০ বৎসর বয়স্ক লোক দেখা যাইত—এবম্বিধ তথ্যগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে ভারতবর্ষ যে স্বাস্থ্যবান্ দীর্ঘায়ুলোকে পরিপূর্ণ ছিল তাহা অনুমান করা যায়।

বায়ু মানুষের জীবন এবং বিশুদ্ধ বায়ু তাহার স্বাস্থ্যের প্রধান উপকরণ। যে স্থানে বহুলোক প্রতিনিয়ত বাস করিয়া থাকে সেই স্থানের বায়ু কখনও সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত সহর সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের জন্য সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সেই সমস্ত সহর, তাহাদের নির্ম্মাতা বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞগণের গৌরবের বস্তু বটে, কিন্তু তাহাদের কোন সহরই মানুষের বাসের পক্ষে প্রাচীন পল্লীগ্রামের তুলনায় স্বাস্থ্যকর নহে।

ভারতবর্ষে অধুনা প্রতি জেলায় এবং মহকুমায় সহর প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানুষের স্বাস্থ্যও ক্রমশঃই খারাপ হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং পরমায়ুর পরিমাণও কমিয়া আসিতেছে। এখন যে সমস্ত সহর ভারতবর্ষে দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই ১৫০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ভূগর্ভের মধ্যে যে সমস্ত সহরের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারও কোনটি তাঁহাদের মতে তিন হাজার বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। কিন্তু ভারতবর্ষ যে তিন হাজার বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ। কাজেই বলিতে হয় যে, তিন হাজার বৎসর আগে কি করিয়া সহর প্রস্তুত করিতে হয় তাহা ভারতবাসী জানিত না। কিন্তু ভারতবাসী যে সহর প্রস্তুত করে নাই তাহা অজ্ঞতাবশতঃ অথবা স্বাস্থ্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান বশতঃ, তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতের ঋষিগণ কি জানিতেন অথবা কি জানিতেন না, তাহার সম্পূর্ণ বিচার করিবার সময় এখনও হয় নাই তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের রচিত ভারতবর্ষে সমস্ত মানুষ যে একদিন সন্তুষ্টি, সততা, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুসম্পন্ন ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কোন্ মন্ত্রবলে একটা সমগ্র জাতির অভীষ্ট লাভ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা লইয়া বিরোধ করা যায় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভারতবাসীর প্রাচীন আচার-পদ্ধতির দিকে নজর করিলে এই ব্যবস্থা যে সাধিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। এখনও চেষ্টা করিলে ঐ অবস্থা ফিরাইয়া পাওয়া সম্ভব।

একদিন যাহা মানুষের ছিল এখন কেন তাহা নাই, একদিন মানুষ যাহা পারিয়াছিল এখন তাহা কেন পারে না, ইহার কারণ বহু। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি—(১) বস্তু বুঝিবার প্রযত্নের অভাব এবং মানুষের বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান—(২) জগতের ক্রমাবনতিকে ক্রমোন্নতি বলিয়া মনে করা।

ভারতবর্ষের পতন যে কবে আরম্ভ হইয়াছে তাহা বলা সুকঠিন। ভারতীয় ঋষির যে ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার মূলে ভাষা-তত্ত্ব ও বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান অথবা প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ জ্ঞান বর্ত্তমান ছিল। ঐ ভাষাতত্ত্ব ও বস্তু-তত্ত্ব জ্ঞান যে অন্ততঃ পক্ষে আড়াই হাজার বৎসর মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে এবং ঐ জ্ঞান যে ক্রমেই বিপর্য্যস্ত হইতেছে তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। মানুষ ঐ ভাষাতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই এখন আর বেদের "মন্ত্র" অথবা দর্শনের এবং পাণিনির "সূত্র" পড়িয়া তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না। যাহা "বৃত্তি ও ভাষ্য" বলিয়া প্রচলিত, তাহা "মন্ত্রের" ও "সূত্রের" সমঞ্জসীভূত কিনা তাহার পরীক্ষা হয় না। মানুষ আসল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই আর কেহ সর্ব্বতোভাবে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। আসল কথা অপরিজ্ঞাত বলিয়াই কতকগুলি অপ্রতীত এবং অবাস্তব কথা মুখস্থ করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানের

উদ্ভব হইয়াছে এবং মানুষ দম্ভের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া একের পর একটি করিয়া সম্প্রদায় গঠন করিতেছে। যে ভারতীয় ঋষি জীবের মমতা উপলব্ধি করিয়া সারা জগৎকে একসূত্রে বদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ভারতীয় ঋষির পাণ্ডিত্যাভিমানী সন্তানগণ ভারতবর্ষকে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে। যাঁহাদের উপর বিবিধ তত্ত্বজ্ঞান রক্ষার ভার ছিল, যাঁহাদিগকে কি করিয়া মানুষকে বুদ্ধিপ্রবণ করিতে হয় তাহার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের সন্তানেরা বহু সহস্র বৎসর হইতে "বুদ্ধি" কাহাকে বলে তাহা বিস্মৃত হইয়া ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে—এবং সারা জগৎও তাহাদের অনুকরণে বুদ্ধিমত্তার নামে ইন্দ্রিয়প্রবণতা ও মনঃপ্রবণতা অবাধে চালাইয়া দিয়াছে।

জগৎ হইতে যে বুদ্ধিপ্রবণতা লোপ পাইয়াছে তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান প্রগতি। বর্ত্তমান জগতে আজও পর্য্যন্ত বিজ্ঞান কাহাকে বলা উচিত তাহার সমুচিত, সম্পূর্ণ এবং সর্ব্ববাদী-সম্মত 'সংজ্ঞা' প্রস্তুত হয় নাই। অথচ বিজ্ঞানের নামে যাহা সাধিত হইয়াছে তাহা মানুষের হিতকারী কিনা তাহার পরীক্ষা না করিয়াই অবাধে এবং অবনত মস্তকে মানুষ তাহার বহু প্রয়োগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান জগৎ বস্তুকে বুঝিবার প্রযত্ন ছাড়িয়া দিয়া উপভোগের গবেষণা এবং উপভোগ লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে শিক্ষায় মানুষের প্রকৃত অভীষ্টগুলি প্রদান করিতে পারে, সেই শিক্ষা সারা জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সারা জগতে হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে। মানুষের উপভোগের বস্তু ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে, অথচ যাহার দ্বারা মানুষ উপভোগ করিবে তাহার শক্তি যে ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে, মানুষ তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না। চক্ষুর উপভোগের জন্য কত রং-বেরংএর পোষাক, গৃহ-সজ্জা, চিত্র, আলোক প্রভৃতি বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু মানুষের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হীনতাপ্রাপ্ত হইতেছে। কর্ণের তৃপ্তির জন্য কলের গান, রেডিওর গান প্রভৃতি কত রকম-বেরকমের নব নব গান ও বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু মানুষের কাণের রোগের সংখ্যাও তৎসঙ্গে বাড়িয়া যাইতেছে। নাসিকার তৃপ্তির জন্য নূতন নূতন গন্ধ-দ্রব্যের সৃষ্টি হইতেছে, আর মানুষের নাকের চিকিৎসার জন্যও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন বাড়িয়া চলিতেছে। জিহ্বার তৃপ্তির জন্য চপ, কাটলেট, সরবৎ, সরাব প্রভৃতি নূতন নূতন ঢংএর খাদ্যের ও পানীয়ের সৃষ্টি হইতেছে,আর অজীর্ণ রোগীর সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছে। ত্বকের সৌন্দর্য্য ও উপভোগের জন্য নানারকম স্নো, পাউডার, সুকোমল প্রসাধন-সজ্জার সৃষ্টি হইতেছে, আর মানুষের শীত, গ্রীষ্মাতুরতা বৃদ্ধি পাইয়া কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মাবসর কমিয়া আসিতেছে।

দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, ধারকশক্তি, কর্ম্মপ্রবণতা, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি যাহা লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব, তাহার সমস্তই কমিয়া আসিতেছে, অথচ মানুষ বর্ত্তমান যুগকে ক্রমোন্নতির যুগ বলিয়া থাকে।

গত তিন হাজার বৎসর হইতে যে, জগতের ক্রমিক অবনতি হইতেছে, তাহা তাহার ইতিহাসের প্রতি মনোযোগ দিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের আগে জগতে একটির বেশী দুইটি ধর্ম্মের কথা শোনা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারাবধি দুইটি ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারাবধি তিনটি। মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারাবধি চারিটি এবং বর্ত্তমানে এই চারিটি ধর্ম্মের শাখা-প্রশাখার কথা চিন্তা করিলে দেখা যায়, অসংখ্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে।

সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলিতে বুঝায় চালচলনের পদ্ধতি (Religion অথবা Rules of Conduct)। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ ধর্ম্ম বলিতে বুঝিতেন, যাহা হইতে মানুষের অভ্যুদয় এবং নিশ্চিতরূপে কল্যাণসাধন হয়; অর্থাৎ যে কারণে মানুষ অন্য জীব হইতে পৃথক হইয়া মানুষ রূপে প্রতিভাত হয় এবং আপন কল্যাণ সুনিশ্চিত করিয়া তুলিতে পারে, তাঁহারা মানুষের আভ্যন্তরীণ সেই শক্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত করিতেন। এই শক্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয় মানুষের কর্ম্মপ্রেরণায়। এই জন্য কোন কোন ঋষি, কর্ম্মপ্রেরণা যাহার চিহ্ন এবং লক্ষ্য, তাহাকেও ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, ঋষিদিগের ধর্ম্মের দুইটি সংজ্ঞাই একই বস্তু-প্রকাশক। কারণ, যাহার জন্য মানুষ মানুষ বলিয়া প্রতিভাত, তাহাই মানুষের কর্ম্মপ্রেরণা যোগাইয়া দেয়।

ধর্ম্ম বলিতে মানুষের চাল-চলনের পদ্ধতিই বুঝা যাউক, অথবা মানুষের মনুষ্যত্বের কারণকেই বুঝা যাউক, অথবা মানুষের কর্ম্মপ্রেরণাদাতাকেই বুঝা যাউক, জগতে ধর্ম্মহীন মানুষ থাকিতে পারে না। কারণ চালচলন, মনুষ্যত্ব এবং কর্ম্মপ্রেরণা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা প্রত্যেক মানুষেরই চিরদিন ছিল, এখনও আছে এবং চিরদিন থাকিবে। কোন কোন মানুষ আভ্যন্তরীণ সেই শক্তিকে অনুভব করিয়া তাহার সমঞ্জসীভূত চাল-চলন অবলম্বন করেন। সকলের সেই আভ্যন্তরীণ শক্তিকে অনুভব করিবার সৌভাগ্য হয় না। অধিকাংশ লোকই, যাঁহারা ধর্ম্মকে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের উপদিষ্ট চালচলন অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাঁহারা আভ্যন্তরীণ শক্তিকে অনুভব করিয়া যথাযথভাবে তাহার সমঞ্জসীভূত চালচলন অবলম্বন করেন, তাঁহাদের কখনও কোন ইষ্টপ্রদ বস্তুর অভাব হইতে পারে না—কারণ আভ্যন্তরীণ শক্তির সমঞ্জসীভূত চালচলন অবলম্বন করা আর প্রকৃতির সহায়তা করা একই কথা। যতদিন পর্য্যন্ত ইষ্টপ্রদ বস্তু পাইতে কোন বিঘ্নের উদ্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের ভিতর ধর্ম্ম লইয়া কোন বাদ-বিসম্বাদ অথবা মতদ্বৈধতা উপস্থিত হইতে পারে না এবং ততদিন পর্য্যন্ত সমস্ত মানুষ, তাহাদের চালচলনে একই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া থাকে। সমস্ত মানুষ যখন একই চালচলনের পদ্ধতি অথবা 'ধর্ম্ম' মানিয়া চলে, তখন বুঝিতে হইবে, মানুষের অভাব অভিযোগের কোন কারণ বর্ত্তমান নাই।

চালচলনের পদ্ধতি দুই রকম হয় তখন, যখন মানুষের অভীষ্ট অর্জ্জন করিতে ক্লেশ উপস্থিত হয়। আর মানুষের অভীষ্ট অর্জ্জন করিতে ক্লেশ উপস্থিত হয় তখন, যখন মানুষ তাঁহার আভ্যন্তরীণ শক্তির সমঞ্জসীভূত চালচলন কি তাহা বিস্মৃত হয় এবং তাহার বিরুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করে। মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তির সমঞ্জসীভূত চালচলন কি তৎসম্বন্ধীয় বিস্মৃতি যত অধিক হইতে আরম্ভ করে, ততই মানুষের অভীষ্ট অর্জ্জন করিতে ক্লেশের মাত্রা বাড়িতে থাকে এবং মানুষ ততই বিভিন্ন রকমের চালচলনের পদ্ধতি অথবা 'ধর্ম্ম' অবলম্বন করিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের আগে জগতে যে একাধিক ধর্ম্মের কথা শোনা যায় না তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, এক সময়ে মানুষ তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তির সমঞ্জসীভূত চালচলন কি তাহা সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং মানুষের অভীষ্ট অর্জ্জন করিতে কোন ক্লেশ পাইতে হইত না। তাহার পর যে একটির পর একটি করিয়া ধর্ম্মের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে এবং বর্ত্তমানে যে মানুষের ভিতর অসংখ্য ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তির সমঞ্জসীভূত চালচলন কি তাহা এখন আর কোন মানুষ সঠিকভাবে বুঝিতে পারে না এবং ক্রমশঃই তাহা বুঝিবার ভ্রমের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। কাজেই মানুষের 'ধর্ম্মে'র সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, অথবা চালচলনের নূতন নূতন 'পদ্ধতি' অবলম্বিত হইতেছে—কেবলমাত্র ইহার দিকে লক্ষ্য করিলেই মানুষের জ্ঞান যে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং মানুষ যে ক্রমশঃ অবনত হইয়া পড়িতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

জগতের ইতিহাসও এই সিদ্ধান্তেরই সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু সহস্র বৎসর আগে—অবশ্য কত সহস্র বৎসর আগে তাহা সঠিক বলা যায় না—জগতের মানুষের অভীষ্ট অর্জ্জন করিতে কোন ক্লেশ পাইতে হইত না। মানুষ তখন প্রকৃতিসম্মত উপায়ে চলিতে ফিরিতে জানিত এবং সমস্ত মানুষেরই 'ধর্ম্ম' এক ছিল। মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রকমের কার্য্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল এবং প্রথম প্রথম সমস্ত শ্রেণীর লোক নিজ নিজ কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পাদন করিত। জগতের মানুষ প্রকৃত সম্পদের শিখরদেশে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সারা জগতে শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিস্তৃতি এত অধিক পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল যে, একমাত্র শ্রমজীবিগণের পরিশ্রমেই এবং পরিচালনায় সমস্ত শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যের ও ব্যবহার্য্যের উৎপাদন সম্ভব হইয়াছিল। আদান-প্রদানের ব্যবস্থা অত্যন্ত সুনিপুণ এবং সুচিন্তিত ছিল বলিয়া কোন শ্রেণীর লোকেরই খাদ্য এবং ব্যবহার্য্য পাইতে কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। একমাত্র শ্রমজীবিগণের পরিশ্রমেই সকল শ্রেণীর লোকের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সহজলভ্য হইয়াছিল বলিয়া আর কোন নূতন জ্ঞান পর্য্যালোচনার প্রয়োজন হয় নাই।

ফলে যাঁহাদের উপর জ্ঞান-পর্য্যালোচনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা অলস হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত যে জ্ঞান মানুষের যথাযথ চালচলনের ব্যবস্থাপক, সেই জ্ঞানের পর্য্যালোচনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। জ্ঞান-পর্য্যালোচনার বিলোপ হইলেও যাঁহাদের উপর জ্ঞান-পর্য্যালোচনার ভার ন্যস্ত ছিল, তাঁহাদের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের কোনরূপ ক্লেশ হয় নাই এবং শ্রমজীবী প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর লোকের নিকট তাঁহাদের সম্মানেরও কোনরূপ লঘুত্ব ঘটে নাই, কারণ সকল শ্রেণীর লোকেরই খাদ্য ও ব্যবহার্য্য প্রচুর পরিমাণে পাইতে কোনরূপ ক্লেশ হয় নাই। এই সমস্তই যে সম্ভব হইয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ মানুষ তখনও কোন্ চালচলন প্রকৃতিসম্মত, তাহা নিখুঁত ভাবে জানিত।

ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুর প্রকৃতি সাক্ষাৎভাবে পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থানের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থান ছাড়া অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ এবং তারকাগণের অবস্থানের সহিতও ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুর প্রকৃতির সম্বন্ধ আছে। কিন্তু পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থানের সহিত ভূমণ্ডলের প্রকৃতির যত নিকট সম্বন্ধ, অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ এবং তারকাগণের অবস্থানের সহিত ইহার সম্বন্ধ তত নিকট নহে। ইহারই জন্য আমরা ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুর প্রকৃতি পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থানের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে সন্নিবদ্ধ এই কথা বলিয়াছি।

পৃথিবী ও সূর্য্য সর্ব্বদা ভ্রমণশীল এবং তাঁহাদের পরস্পরের অবস্থান সর্ব্বদা অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহাদের অবস্থানের পরিবর্ত্তনের জন্যই জগতে দিন, রাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। দিন, রাত্রি ও ঋতু—পৃথিবী ও সূর্য্যের তলদেশ এবং উপরিদেশ এবং দুইটি গ্রহের কোন্‌টি কোন্ দিকে আছে, তাহার জ্ঞাপক। ইহা ছাড়া পৃথিবী ও সূর্য্যের অবস্থানের আর একটি পরিবর্ত্তন প্রতিনিয়ত অতি ধীরভাবে সম্পন্ন হইতেছে। তাহা দুইটি গ্রহের মধ্যস্থিত ব্যবধানের দূরত্ব। এই দূরত্ব কখনও হ্রাস পাইতে পাইতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দূরত্বে পরিবর্ত্তিত হয়। আবার কখনও বৃদ্ধি পাইতে পাইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব সংঘটিত হয়। ইহার ফলে অত্যন্ত অপ্রত্যক্ষ ভাবে সর্ব্বদাই ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুর প্রকৃতির অল্পাধিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকট হয় তখন, যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থিত ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া পড়ে। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থিত ব্যবধান যখন সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়, তখন যে নিয়মে চলিলে মানুষ তাহার অভীষ্ট অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, যখন ঐ ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তখন আর ঐ নিয়মে চলিলে, মানুষ তাহার অভীষ্ট অর্জ্জন করিতে পারে না। তখন আবার মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে অনুভব করিয়া মানুষের ঐ শক্তির সমঞ্জসীভূত চালচলন কি তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হয়। মানুষের চালচলন আপন আভ্যন্তরীণ শক্তির সমঞ্জসীভূত না হইলে আবার মানুষের দুঃখদৈন্য আরম্ভ হয়।

পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধানে পূর্ব্বকথিত পরিবর্ত্তন বশতঃ ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুর প্রকৃতি যখন আবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন এই পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের চালচলন কিরূপ পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত, কেহ আর তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করেন নাই। যে উপায় দ্বারা এই পরিবর্ত্তনগুলি নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহার জ্ঞান-রক্ষার ভার যাঁহাদের উপর ছিল, তাঁহারা জ্ঞানের পর্য্যালোচনা ছাড়িয়া দেওয়ায় ঐ সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পর মানুষ তাহার চলাফেরার পদ্ধতির জন্য যে সমস্ত নির্দ্দেশ পাইয়াছে, সেই সমস্ত নির্দ্দেশ আর ভ্রান্তিশূন্য হয় নাই এবং মানুষও আর তাহার অভীষ্ট পুরাপুরি উপার্জ্জন করিতে পারে নাই।

প্রথমেই মানুষের সন্তুষ্টি বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও মানুষের সততা, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু ছিল। কারণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বশতঃ আহার্য্যের এবং ব্যবহার্য্যের উৎপত্তির পরিমাণ কমিয়া গেলেও, তখনও যাহা ছিল, তাহার দ্বারা মানুষ নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পূরণ করিতে পারিত। এই সময়ে সন্তুষ্টি বিপর্য্যস্ত হইয়া অসন্তুষ্টির আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও মানুষের বহু বিষয়েই সন্তুষ্টি ছিল।

তাহার পর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হেতু মানুষের আহার্য্যের এবং ব্যবহার্য্যের উৎপত্তির পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মানুষের অসন্তুষ্টিও বাড়িয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্র সততা, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর স্থলে কোন কোন মানুষ অসৎ, পরমুখাপেক্ষী, অসুস্থ এবং অল্পায়ু

হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি তখনও আদর্শ মানুষের সংখ্যাই বেশী ছিল।

অসততা, পরমুখাপেক্ষিতা, অস্বাস্থ্য এবং অন্যায় প্রবেশ লাভ করায়, মানুষের চালচলন কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া প্রথম প্রথম সামান্য সামান্য মতদ্বৈধতা আরম্ভ হইয়াছিল।

ইহা ভয়ানক রূপে প্রকট হইতে কতদিন সময় লাগিয়াছিল তাহা সঠিক ভাবে বলা সুকঠিন হইলেও, চালচলন সম্বন্ধে মত-দ্বৈধতা বহুদিন হইতেই যে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব মানুষের চালচলনের পদ্ধতি সম্বন্ধীয় মতদ্বৈধতার প্রকটতার পরিচয়। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পর প্রায় ১৮ শত বৎসর, জগৎ মানুষের চালচলনের পদ্ধতি সম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পর, খৃষ্টদেবের জন্মগ্রহণ করিবার আগে, তৎকালীন জগতের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার এবং বিরোধীগণের সহিত সংঘর্ষ। বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের প্রায় ছয়শত বৎসর পরে খৃষ্টদেবের জন্ম। এবং তাহার প্রায় ছয়শত বৎসর পরে নবী মহম্মদের জন্ম। খৃষ্ট জন্মাইবার পরবর্ত্তী ছয় শত বৎসর খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের এবং তাহার বিরোধিগণের সহিত সংঘর্ষের আখ্যায়িকায় জগতের ইতিহাস পরিপূর্ণ। আর নবী মহম্মদ জন্মাইবার পরবর্ত্তী ছয়শত বৎসরের ইতিহাসে প্রধান ঘটনা, মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার এবং তাহার বিরোধিগণের সহিত সংঘর্ষ।

কাজেই খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মানুষ তাহার চালচলনের পদ্ধতি লইয়াই বিব্রত ছিল বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই ১৮ শত বৎসর ব্যাপী 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধীয় বাদ বিসম্বাদ করিয়াও প্রকৃতিসম্মত চালচলন কি তাহা মানুষ আগেকার ন্যায় সঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই। যদি পারিত, তাহা হইলে আবার আগেকার ন্যায় সমস্ত জগতের লোকের চালচলন একরূপ হইয়া যাইত এবং সকলেই এক 'ধর্ম্ম' মানিয়া চলিতে পারিত।

জগতের ইতিহাসের উপরোক্ত চিত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধদেব জন্ম পরিগ্রহ করিবার বহুদিন আগে জগতে এমন একটা সময় ছিল, যখন মানুষের ভিতর কোন বাদ-বিসম্বাদ ছিল না এবং সমস্ত মানুষ আপন আপন অভীষ্ট অর্জ্জন করিতে পারিত। তাহার পর সামান্য সামান্য বাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়াছিল এবং মানুষের অভীষ্ট অর্জ্জনের সামর্থ্যও অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের জন্মের পর হইতে এই বাদ-বিসম্বাদ অত্যন্ত প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল এবং খৃঃ অঃ একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মানুষ 'ধর্ম্ম' লইয়া নানা রকম কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও মানুষের আহার্য্যের ও ব্যবহার্য্যের অভাবের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে ইয়োরোপীয় জাতিগুলির ভারতবর্ষে আসিবার একটি প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীতে, ইয়োরোপীয় জাতিগুলি বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য সারা জগৎ পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদের স্থলে কে কোন্ দিক দিয়া জগৎ পরিভ্রমণ করিবে তাহা লইয়া কলহের উদ্ভব হইয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে যে ইয়োরোপে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের অভাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই সময়ের ইতিহাস। পেটের যাতনার আশঙ্কা না হইলে কেহ আপন স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথে অন্য দেশে জীবিকার্জ্জনের জন্য যাইতে পারে না—ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত জাতি সামাজিক ও আর্থিক কলহে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জগতের বহুস্থান ইয়োরোপীয় জাতিগুলির অধিকারভুক্ত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক বৎসর ইয়োরোপে যুদ্ধ-বিগ্রহের কিছু বিরতি দেখা যায়।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় যে, এই সময়ে ইয়োরোপে আহার্য্য এবং ব্যবহার্য্যের অভাব অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া গিয়াছিল এবং এই অভাব মোচনের জন্য ইয়োরোপীয়গণ নিজ দেশে যাহাতে প্রকৃত "ধনের" বৃদ্ধি হয় তাহার কোন চেষ্টাই করেন নাই। অন্যান্য দেশ হইতে তাহাদের উৎপন্ন "ধন" আনিয়া আপন আপন দেশ বোঝাই করিতে পারিলে অভাব দূরীভূত হয়—ইহা তাঁহাদের কার্য্যের মূল সূত্র হইয়াছিল। এসিয়াখণ্ডের লোকগুলি সম্পূর্ণ অমানুষ হইয়া অমানুষের খেলায় নিমগ্ন ছিল বলিয়া ইয়োরোপীয়গণ সাময়িক ভাবে তাঁহাদের অভীষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে এসিয়াখণ্ডেও আহার্য্য এবং ব্যবহার্য্যের প্রকৃত অভাব না হইলেও ক্রমশঃই তাহা কমিয়া আসিতেছিল। ইয়োরোপীয়গণ তাঁহাদের নিজ অভাব মোচনের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারাও ইহা বুঝিতে পারেন নাই এবং জগতে প্রকৃত ধনোৎপত্তি হ্রাসের গতি আর অবরুদ্ধ হয় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে জগতের বর্ত্তমান বিজ্ঞানগুলি এক এক করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূল শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি এবং তাহার কারণ ইয়োরোপীয়গণের আপন আপন অভাবমোচনের চেষ্টা। তাহাতে জগতের প্রকৃত "ধনের" বৃদ্ধির কোন কথা নাই। প্রকৃত "ধন" বলিতে তাহাকেই বুঝায়, যাহা জমী হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহা খাইয়া এবং ব্যবহার করিয়া মানুষ আপন আপন স্বাস্থ্য, সামর্থ্য এবং

পরমায়ুর বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। ইয়োরোপীয়গণ এখনও কোথায়ও উপরোক্ত প্রকৃত ধনোৎপত্তি সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে প্রকৃত "ধন" কাহাকে বলে তাহা জানেন না, তাহার প্রমাণ জগতের বর্ত্তমান অবস্থা। প্রত্যেক দেশের আমদানীর ও রপ্তানীর হিসাবে মুদ্রার সংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা দেখাইয়া অর্থনৈতিকগণ জগতের অবস্থার উন্নতি প্রমাণিত করিতে পারেন তাহা সত্য, কিন্তু আপন আপন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের অবস্থা যে ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে কি?

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কার্য্যে উপভোগ বাড়িয়া যাওয়ায় মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, জারকশক্তি, কর্ম্ম-প্রবণতা, চিন্তাশীলতা ক্রমশঃ কিরূপে হ্রাস পাইতেছে তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি।

যে আহার্য্যের এবং ব্যবহার্য্যের অভাবের পরিচয় একদিন জগতের কুত্রাপি পাওয়া যাইত না, যে জগতের মানুষ আপন আপন স্ত্রীপুত্র লইয়া আপন আপন দেশে সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিত, সেই জগতে যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক মানুষকে স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া সর্ব্বদা আহার্য্যের ও ব্যবহার্য্যের জন্য যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইতে হইতেছে এবং তথাপি কোন স্থান আর আহার্য্যের ও ব্যবহার্য্যের অভাব শূন্য হইতেছে না, তখনও কি মানুষ তাহার জ্ঞানের ও অবস্থার ক্রমাবনতি সম্বন্ধে অন্ধ ও উদাসীন হইয়া থাকিবে?

আমরা এই সংখ্যায় যাহা যাহা বলিয়াছি, সেগুলি সংক্ষেপতঃ এই :-

(১) অধ্যয়ন বুদ্ধিপ্রধান হইলে প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব জানা যায়।

(২) ভারতবাসী একদিন প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিল এবং সারা জগৎকে তাহা বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে জগতের সর্ব্বত্র মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে সততার সহিত নিজ নিজ পরিশ্রম দ্বারা সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

(৩) ভারতবাসী তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল হইতে ভারতীয় ঋষির ঐ বস্তুতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।

(৪) গত তিন হাজার বৎসর হইতে জগতের সর্ব্বত্রই পতন আরম্ভ হইয়াছে। এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে কোন কোন জাতি আংশিক ভাবে আপন আপন অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে এবং তাহাতে আংশিক পরিমাণ সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কেহই প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব জানিয়া সারা জগতের যাহাতে অভাব দূরীভূত হয় তাহার চেষ্টা করেন নাই।

(৫) আপন স্ত্রীপুত্রের এবং প্রতিবেশী ও বন্ধুগণের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতা সাধিত না হইলে যেমন স্বীয় স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতা সম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ সারা জগতের স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতার আয়োজন না হইলে কোন জাতি সম্পূর্ণ ভাবে ও নিরুপদ্রবে আপন স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতার বিধান করিতে সমর্থ হয় না।

(৬) ইয়োরোপীয়গণ উপরোক্ত সত্যটি কখনও সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। ফলে তাঁহাদের মধ্যে আর্থিক অভাব, পরস্পরের মধ্যে চাতুরী এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে।

(৭) ভারতীয় অবনতি রোধ করিবার প্রাথমিক কার্য্য :—

(ক) জগতের যে ক্রমোন্নতি হইতেছে এই ভ্রমাত্মক ধারণা অচিরে বিদূরিত করা এবং ইহার ক্রমাবনতির ভীষণতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করা।

(খ) পাণ্ডিত্যাভিমান সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত প্রত্যেক বিজ্ঞানে কোন বস্তুর যে আমূল তত্ত্ব নাই এবং যাহাও আছে তাহাও প্রায়শঃ ভ্রমাত্মক ইহা বুঝিবার প্রযত্ন করা।

(গ) ভগবানের দেওয়া জল, রৌদ্র এবং বায়ুর আমূল তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা এবং তদ্দ্বারা ভারতের জমির সর্ব্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ উন্নতি কিরূপে হইতে পারে—তাহার উপায় উদ্ভাবন করা।

ইহা ছাড়া জাতীয় স্বাবলম্বন অর্জ্জন ও রক্ষা করিবার উপায় সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হইয়াছে।

আগামীবারে "সাহিত্য-রচনা"র বিবিধ রকম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। [ক্রমশঃ

ত্রিপুরা আগরতলায় গীত-চন্দ্রোদয়

—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রায় বৎসর চারেক পূর্ব্বের কথা, চণ্ডীদাস সম্পাদনের কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় পদাবলীর পুঁথির খোঁজে দ্বিতীয়বার ঢাকায় যাই। প্রথমবার গিয়া জগন্নাথ হলে ছিলাম। আমাদের মত লোকের সেখানে থাকার অসুবিধা, পরিষদের পয়সা খরচ, নানা দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইতস্তত করিতেছি। এমন সময় ঢাকা যাদুঘরের অধ্যক্ষ প্রথিতযশা ঐতিহাসিক পণ্ডিত (তখন ডক্টর হন নাই) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় চিঠি লিখিলেন, এবার আমার বাড়ীতে আসিয়া উঠিবেন। সুতরাং ভট্টশালী মহাশয়ের অতিথি হিসাবে ঢাকায় গিয়া পুঁথি খোজার কাজ আরম্ভ হইল। ঢাকা পুঁথিশালার উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম-এ পূর্ব্ব-বারের মত এবারও অক্লান্ত ভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববারে যে সব পুঁথি দেখা হইয়াছিল সেগুলি বাদ দিয়া নূতন পুঁথি—কতকগুলি পূর্ব্বে সংগৃহীত, কতকগুলি হালেই পাওয়া গিয়াছে—বাছিয়া বাছিয়া পদাবলীর পুঁথি—দেখিতে লাগিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদাবলীর পুঁথির সংখ্যা নিতান্ত কম হইবে না। এক একটি পুঁথিতে বহু পদকর্ত্তার পদ রহিয়াছে, একজনের পদের এক একখানা গোটা পুঁথিও আছে। সংগ্রহ করিতে পারিলে এক একজন পদকর্ত্তার অনেক পদ পাওয়া যাইতে পারে। অনেক নূতন পদ, নূতন পদকর্ত্তারও সন্ধান মিলিতে পারে। আমরা কেবল চণ্ডীদাসের পদই খুঁজিতেছিলাম। নূতন পদ পাইলে লিখিয়া লইতেছিলাম, পুরানো পদের নূতন পাঠ জোগাড় করিতেছিলাম। সে দিক দিয়াও ঢাকা পুঁথিশালার নিকট আমাদের ঋণ অনেক।

ভট্টশালী মহাশয় মাত্র ঐতিহাসিক নন, তিনি একজন উচুদরের সাহিত্যিকও। পুরানো ইট কাঠ, পাথর, মূর্ত্তি, মুদ্রা, শিলালেখ, তাম্রপট্ট ইত্যাদির সঙ্গে তিনি কিছু পুরানো পুঁথিও যাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি দশটা চারিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় যাইতাম। সকাল সন্ধ্যা যাদুঘরের পুঁথি দেখিতাম। কথায় কথায় নরহরি চক্রবর্ত্তীর গীত-চন্দ্রোদয়ের কথা উঠিল। ভট্টশালী মহাশয় বলিলেন, "পুঁথি ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে আছে। 'অষ্টকাল' অংশটা ছাপা হইয়াছিল, আজকাল আর পাওয়া যায় না। আমি ছাপা পুঁথি একখানা সংগ্রহ করিয়া আগাগোড়া নকল করাইয়া রাখিয়াছি, আর প্রকাশিত পদগুলির একটি অকারাদি ক্রমে সূচীও করিয়া ফেলিয়াছি।" আমি অবাক হইয়া গেলাম। ভদ্রলোকের অনুরাগ তো বড় কম নয়। গীত চন্দ্রোদয়ের নামই শুনিয়া আসিতেছি, সম্পূর্ণরূপে বা অংশবিশেষ কখনো চোখেও দেখি নাই। ভট্টশালী মহাশয় নকলটা দেখাইলেন, ব্যবহার করিতে দিলেন। অধিকন্তু সমস্ত পুঁথিখানা দেখিতে ত্রিপুরা যাইবার জন্য বিশেষ জেদ করিতে লাগিলেন। কথাটা কলিকাতায় বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিলাম এবং সম্পাদক মহাশয়কেও জানাইলাম। সুনীতিবাবুকে লিখিলাম—কারণ তিনি এবং আমি একযোগে চণ্ডীদাস সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আর সম্পাদককে লিখিয়াছিলাম অনুমতি ও অর্থের প্রার্থনায়। সুনীতিবাবু এবং সম্পাদকের চেষ্টায় গুটি দশ টাকা মঞ্জুর হইল, স্থির করিলাম ঢাকার কাজ শেষ করিয়া ত্রিপুরা ঘুরিয়া কলিকাতায় যাইব।

ইত্যবসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় একখানা পুঁথি পাওয়া গেল,—সংখ্যা ২৬৪৮, পুথিখানার কোন নাম নাই। ১৪৪ পত্রাঙ্ক, দুই পৃষ্ঠায় গড়ে নয়সারি হিসাবে লেখা, পদাবলীর পুথি, পুঁথিখানা খণ্ডিত। অনেক পদে ভণিতা নাই। অনেক পদের পাঠের কথা ছাড় পড়িয়াছে। অনেক শব্দের অক্ষর পড়িয়া গিয়াছে। পুঁথিখানা দেখিয়া সন্দেহ হইল। পদকল্পতরু প্রভৃতির নকল নয়, একখানা স্বতন্ত্র সংগ্রহ। পরে বুঝিলাম এ খানা গীত-চন্দ্রোদয়েরই একটা অংশ। ত্রিপুরার গীত-চন্দ্রোদয় দেখিয়া তবে এই বোধোদয় হইয়াছিল।

ঢাকার পুথি দেখার কাজ শেষ হইয়া আসিল, ত্রিপুরা রওনা হইব, এমন সময় একদিন হরিবর্ম্মা দেবের তাম্রশাসনের

এক ভগ্নাংশ ভট্টশালী মহাশয়ের হস্তগত হওয়ায় সব ওলট-পালট হইয়া গেল। হরিবর্ম্মা দেবের নাম ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বর্ম্ম-বংশের ভোজ ও জাত বর্ম্মার সম্বন্ধটা আজিও ঠিক হয় নাই। তাঁর কোন লিপি মুদ্রাও পাওয়া যায় নাই। এমতাবস্থায় ঐ দুর্লভ টুকরাটি পাইয়া ভট্টশালী মহাশয় মাতিয়া উঠিলেন। যে লোক ঐ লেখ-খণ্ড আনিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া গেলেন বজ্রযোগিনাতে একটা পুকুরের পাশে উহা পাওয়া গিয়াছে। এক স্কুল মাষ্টার উহা পাইয়াছিলেন। ভট্টশালী মহাশয় বজ্রযোগিনীর সেই স্থানটা দেখিবার জন্য, তার আশেপাশে খোঁজ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বজ্রযোগিনী যাওয়ার দিন স্থির হইয়া গেল। বজ্রযোগিনী ঘুরিয়া ত্রিপুরা রওনা হইলাম।

আগরতলার মহারাজার ভারতীয় অতিথিশালায় কয়েক দিন বেশ কাটিয়াছিল। যিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তাঁর ভদ্রতা ও আদর যত্নের কথা আজও মনে আছে। মূল পুঁথিখানি (দেখিয়া পদসূচী প্রস্তুতের জন্য) অতিথিশালায় আনিতে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কে একজন কলিকাতার সাহিত্যিক কতকগুলি দলিল, প্রাচীন মুদ্রা আদির কি সব গোলমাল করিয়াছিলেন, তাই এই অবিশ্বাস। বুঝাইতে সময় লাগিল যে, আমি ঐতিহাসিক নই এবং সে দলেরও নই, আমরা মফঃস্বলের মানুষ, কলিকাতায় আমাদের কোন দল নাই। কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের চেষ্টায় এবং রাজমালা-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বিদ্যাভূষণের অনুগ্রহে অবশেষে দুইদিন পরে পুঁথিখানি পাওয়া গেল। আমি অতিথিশালায় আছি এবং ষ্টেশন অনেক দূর, বোধ হয় এ কথাটিও কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন। কলিকাতার সাহিত্যিকদের সুনামই শুনিয়াছি, তবে এসব আবার কি?

"গীত-চন্দ্রোদয়" দেখিলাম, এতদিন নামই শুনিতেছিলাম, আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পুঁথিখানি খণ্ডিত। বাঙ্গলায় আর কোথাও এ পুঁথি আছে বলিয়া শুনি নাই, আজ পর্য্যন্ত অনেকেই এ পুঁথি চোখেও দেখেন নাই। আর এই পুঁথির কিনা সম্পূর্ণাংশ পাওয়া গেল না! ত্রিপুরা রাজবাড়ীতে সম্পূর্ণ পুঁথিই ছিল বলিয়া মনে হইল। যত্ন নাই, তাই, মাঝে মাঝে পাতাগুলি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। যে অবস্থা দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে বাকীটুকুও শীঘ্রই লোপ পাইবে এইরূপই মনে হইল। মহারাজা স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রী মাণিক্য বাহাদুরের নিজের ছাপাখানা আছে, কাগজের দামও হাজার দুহাজার লাগিবে না। তবুও পুঁথিখানা তিনি কেন যে না ছাপাইয়া ঐ রকম অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়াছেন বুঝিলাম না। মহারাজা বাহাদুর আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আমি মাত্র একটি ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম—"গীত-চন্দ্রোদয় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের ব্যবস্থা।" মহারাজা তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আদেশও দিয়াছিলেন, পরে শিক্ষা-সচিবকেও এ বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছিলাম। অবশ্য তাহাতে কোন ফল হয় নাই, পুঁথিখানি তুলট কাগজের হাত হইতে মুক্তিলাভ করে নাই। অথচ এই মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ কত বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী কমলাবাবু শুনিয়াছি ৺কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদের পুত্র। কেদার বাবুর অপর পুত্র মিত্রাপুরের প্রতিষ্ঠাতা বিমলবাবু তো অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি কি তাঁর সহোদরকে বলিয়া গীতচন্দ্রোদয়খানা ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না? অথবা কমলাবাবু এই বইখানার একটা নকল বিমলা বাবুকে দিতে পারেন না? বইখানা বাজারে বাহির করা দরকার।

"ভক্তিরত্নাকর"-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ নরহরি চক্রবর্ত্তী ওরফে ঘনশ্যাম "গীত-চন্দ্রোদয়" রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকরে ইহার পরিচয় এইরূপ—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রদিন॥

ইহার অধিক আর কিছু জানা যায় না। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সারার্থ-দর্শিনী নাম্নী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা শেষ হয়। অনুমান হয় ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছা-

কাছি সময়ে বিশ্বনাথ "ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি" নাম দিয়া একখানি পদ-সংগ্রহের গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থ দেখিয়াই নরহরি গীতচন্দ্রোদয় রচনা করিয়াছিলেন। তিনি গীতচন্দ্রোদয়ে লিখিয়াছেন—

সামান্ত প্রকারে গীত চিন্তামণি প্রায়।
মনের উল্লাসে দাস নরহরি গায়॥

নরহরি কাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন জানা যায় না। আমাদের অনুমান, গীত-চিন্তামণি সংকলনের অব্যবহিত পরেই গীত-চন্দ্রোদয় সংকলিত হইয়াছিল। এই হিসাবে নরহরি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরু এমন কি রাধামোহনের পদামৃত সমুদ্রের পূর্ব্বে গীতচন্দ্রোদয় রচিত হইয়াছিল।

নরহরি সংক্ষেপে গীতচন্দ্রোদয়ের পরিচয় দিয়াছেন—

শুন শুন শ্রোতাগণ পুনঃ পুনঃ নিবেদি পড়িয়া চরণ তলে।
রসজ্ঞানহীন ক্রম না বুঝিয়ে তথাপিহ যেন মন না টলে॥
পূর্ব্ব কবিকৃত গীত নিরুপম আস্বাদিতে সাধ আনন্দ ভরে।
এ হেতু একত্র করি এই গীত চন্দ্রোদয়ে সুধা সদাই ঝরে॥
প্রথমেতে ১ গৌর কৃষ্ণ রসামৃত গীতক্রম কিছু উজ্জ্বল মতে।
তা পরে ২ গৌর কৃষ্ণ ভাবনামৃত অষ্টকালক্রম বিবিধ যাতে॥
তা পরে ৩ গৌর কৃষ্ণ চরিতামৃত জন্মাদিক ক্রম সুচারু রীতি।
তা পরে ৪ গৌর কৃষ্ণ বিলাসামৃত রাগার্ণব গ্রন্থ সঙ্গতি তথি॥
তা পরে ৫ গৌর কৃষ্ণ লীলামৃত তানার্ণব তাহে সঙ্গত ক্রমে।
৬ নিত্য সেবামৃত ৭ নামামৃত গীত ৮ প্রার্থনামৃত ভণে ঘনশ্যামে॥

গীতচন্দ্রোদয় নাম গ্রন্থ রসধাম।
অষ্টামৃতাভিধায় শোভে অনুপাম॥

গ্রন্থখানি আটভাগে বিভক্ত ছিল। (১) গৌরকৃষ্ণ রসামৃত (২) গৌরকৃষ্ণ ভাবনামৃত (এই অংশই মুদ্রিত হইয়াছিল) (৩) গৌরকৃষ্ণ চরিতামৃত (৪) গৌরকৃষ্ণ বিলাসামৃত (এই অংশে রাগার্ণব নামে একটি গ্রন্থ সংযুক্ত ছিল। বোধ হয় রাগার্ণবেরই উদাহরণ স্বরূপ গৌর কৃষ্ণ বিলাসের পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছিল) (৫) গৌরকৃষ্ণ লীলামৃত বা তানার্ণব (৬) নিত্য সেবামৃত (৭) নামামৃত (৮) প্রার্থনামৃত। গ্রন্থের এক এক ভাগের পরিচ্ছেদগুলি আস্বাদ নামে পরিচিত। আন্দাজ করিলে ভুল হইবে না যে, গীত-চন্দ্রোদয় গ্রন্থখানি পদ-কল্পতরু অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ছিল। খুব কম করিয়া ধরিলেও গীত-চন্দ্রোদয়ের আট ভাগে অন্ততঃ চারি হাজার পদ ছিল বলিয়া মনে হয়।

যাঁহারা ছন্দতত্ত্ব লইয়া কসরৎ ভাঁজেন, গীতচন্দ্রোদয় প্রকাশিত হইলে তাঁহাদের কিছুদিনের খোরাক জুটিত। সামান্য উদাহরণ দিলাম।

বিপদীছন্দ। নিজ পরিচয় কত দেশব শ্রীমৎ গৌড়দেশ সুর-সরিত
তটে বিনিবাস বিপ্রকুল জাত, সুজনক জগন্নাথ প্রিয়
বৈষ্ণব দত্ত নাম যুগ নরহরি ঘনশ্যাম ইতি প্রথিত
কিন্তু মম বন্ধুবর্গ উপদেশ নিত্য ব্রজভূমি কৃতাশ্রয়
পূর্ণ কপট কূট ছুটন কদা।
অরু কি কহব কটু হৃদয় কাষ্ঠ সম হিংসাক্লিষ্ট
পুষ্টমতি সৌষ্ঠব অজ্ঞন জুষ্ট নষ্ট পটু ধৃষ্ট অপরাধ
নিষ্ঠ পাপিষ্ঠ নষ্ট শঠ হৃষ্ট প্রকৃষ্ট ভ্রষ্ট চেষ্টাতি
লঘিষ্ট নিকৃষ্ট কৃষ্ট রিপু ষড়রসাধিক শিষ্ট কষ্ট
প্রদ নিষ্ঠুর দুষ্ট দুষ্বিষয়াবিষ্ট সদা॥

ওঃ—কোথায় 'কদা' আর কোথায় 'সদা'! মাঝখানে ঐ সুস্পষ্ট 'ষ্ট' গুলি দেখিলে রোমহর্ষ উপস্থিত হয়। আর একটা উদাহরণ—হেমলতা ঠাকুরাণীর বন্দনা—"কুমুদ চট্ট রাজানুজ রামকৃষ্ণ তৎপুত্র গোপীজন বল্লভ যৎপতি পরম পূজ্য যচ্ছু ভক্তি নিরখি সুরভুরি কৃত্য কুরু গে।

গুণমণি শ্রীচৈতন্যদাস, গতিগোবিন্দাখ্য ভ্রাত, যদ্ ভ্রাতুষ্পুত্র সুকৃষ্ণপ্রসাদ, সুবলচন্দ্র, শ্রীরাধামাধব, সুন্দর, হরি ইহপঞ্চ প্রচার জগতমধি অধিক কি কব নরহরি মুরুখে"॥

এগুলি প্রাচীন গদ্যের নমুনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া চলে না কি? নরহরি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, গীতবাদ্যে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। কবিত্ব, কল্পনা এবং বর্ণনা-শক্তিতে তিনি তাঁহার সম-সাময়িক পদকর্ত্তাগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। নরহরির ভক্তিরত্নাকর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ত্রিপুরা রাজবাটীতে ইহাঁর গৌর চরিত্র চিন্তামণি নামক আরও একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। গ্রন্থের ১৬শ কিরণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ। ইহার পর আরো কয়েক পত্র (৭৯ ক) পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু সপ্তদশ কিরণ শেষ হইল কিনা বুঝিতে পারা যায় না। এই গ্রন্থে রঙ্গিনী, মালতী, বল্লবী, কুন্দবল্লী, মধুমতী, হেমদণ্ড প্রভৃতি ছন্দের উদাহরণ স্বরূপ কবিতায় গৌরলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

অনেকে নরহরি সরকারের সঙ্গে ইহাঁর নরহরি ভণিতার পদের গোলযোগ করিয়া বসেন। আমরা এই গোলের কোন

কারণ দেখি না। তবে কবিরাজ গোবিন্দের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের সঙ্গে ইহার ঘনশ্যাম ভণিতাযুক্ত পদের জট পাকাইয়া গিয়াছে। কবিরাজ ঘনশ্যামের "গোবিন্দ রতি-মঞ্জরীর" সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেলে অনেকগুলি পদের কিনারা হইতে পারে। আমরা গীত-চন্দ্রোদয় হইতে একটি পদ তুলিয়া দিলাম। নরহরি কীর্ত্তন গানে পাঁচটি ভাগ করিয়াছেন—উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা, আভোগ। ইহারই উদাহরণে তিনি নীচের পদটি রচনা করিয়াছেন—

উদ্‌গ্রাহক { শারদ সুধাকর নিন্দিত নিন্দিমুখ মঞ্জুমিলিত মৃদুহাস অমিয়া ঝরু।
ভাঙ মদন ধনু সঘনে ধুনাওত লোচন কোণে নিখিল শর সঙ্করু॥

মেলাপক { শিরে শিখিপিচ্ছ খচিত কুসুমাবলী সৌরভে ভ্রমত ভ্রমরগণ ঝঙ্কৃত।
কুণ্ডল শ্রুতিভিতি কম্বুকণ্ঠমণি হার রুচির কর বলয় অলঙ্কৃত॥

ধ্রুব॥ বিলসত কুঞ্জ ভবনে নট নাগর॥

অন্তরা { ব্রজ-নব-রমণী কঞ্জ-বন-কুঞ্জর।
কেলি সুনিপুণ পিরীতি রস সাগর॥

আভোগ { ললিত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ জনু জলধর পহিরল বসন তড়িৎসম শোহত।
বাওত মুরলি মধুর গরজন ঘন-শ্যাম নিছনি ধুনি ভুবন বিমোহত॥

গীত-চন্দ্রোদয় হইতে কয়েকজন নূতন বাঙ্গালী কবির নাম পাওয়া যায়। পদের মধ্যে কবি-কণ্ঠহার ভণিতার কয়েকটি বাঙ্গালা পদ, নৃপ-বৈদ্যনাথের একটি বাঙ্গালা ব্রজবুলি মিশ্রিত পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি-কণ্ঠহারকে বহুপূর্ব্বে নগেন গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির নামে দখল করিয়া রাখিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস মিলনের পদে পদ-কল্পতরুর "বৈদ্যনাথ শিবসিংহ"কে মিথিলার রাজা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। পদাবলী-সাহিত্য যেন বেওয়ারিশ মাল,—যাহা খুসী করিলেই হইল। এইরূপ অপকর্ম্মের কি প্রায়শ্চিত্ত জানি না। আমার ধারণা এই সব রাজার দলকে বিষ্ণুপুরে, ছাতনায় ও পঞ্চকোটে পাওয়া যাইবে। গীত-চন্দ্রোদয়ে বন্দনার পদে অনেক পদকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। সংকলয়িতা যে সেই সব কবির পদই উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহাই সম্ভব। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পদের ভাষার ও ভণিতার বিচার করিতে হইবে, তারপর বিষয়বস্তু, বর্ণনভঙ্গী ও ছন্দ প্রভৃতি। গীত-চন্দ্রোদয় ছাপানো হইলে এই সব বিচারের সুবিধা হইবে।

ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ নাই। কিন্তু গীত-চন্দ্রোদয়ে চণ্ডীদাস ভণিতার কয়েকটি পদ দেখিলাম। সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেলে হয়তো আরো পদ পাওয়া যাইত। শ্রীপাদ রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রে চণ্ডীদাস ভণিতার যে কয়েকটি পদ তুলিয়াছেন, তাহার সব কয়টিই গীত-চন্দ্রোদয়ে আছে। পদকল্পতরুতে বৈষ্ণবদাস পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে চণ্ডীদাসের যে পদগুলি দিয়াছেন, তাহারও প্রায় সমস্ত পদই নরহরি সংকলন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের কোন পদ আছে বলিয়া মনে হয় না। নরহরি তাহা হইলে কোন্ চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধার করিয়াছেন? তিনি দুইটি পদে রামী ধোপানী ও কবি চণ্ডীদাসের বন্দনা গাহিয়াছেন। "অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে চণ্ডীদাস ভণিতার কোন পদ না থাকা, গীত-চন্দ্রোদয়ে চণ্ডীদাসের বন্দনা ও সেই পদে নান্নুরের, রামীর উল্লেখ, গীত-চন্দ্রোদয়ে সংগৃহীত চণ্ডীদাস ভণিতার কতকগুলি পদ"—সমস্যাটি বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য।

আমরা নৃপ বৈদ্যনাথের ও কবি ঠাকুরের এক একটি পদ তুলিয়া দিলাম।

হাম নব নাগরী মাধাই। বলে যদি পরশহ মদন দোহাই॥
হঠ যদি করহ হামায়। আরতি ন পরধন কবহুঁ না পায়॥
অতি রসে না হইহ ভোরা হাম কমলিনী তুঁহু ভুখিল ভোঁরা॥
ভোঁরা নায়র দুঁহু তুলে। মুকুলিত কুসুমে কেহ নাহি তুলে॥
শুন শুন বিনতি হমারা। সহজে তুঁ ত্রব রতি হাম নারী অবলা॥
লহু লহু পরশিহ মোরে। ভাগে না মিলয়ে দুলহ পিয়ারে॥
এবে নব উথল যৌবন। কাঁচ কনয়া ফল বদরী সমান॥
বিনতি করত তুয়া পায়। অবলারে বল করিতে না যুয়ায়॥
তুহুঁ বিদগধ শিরোমণি। মিনতি করিয়া বোলো হামসে নবিনী।
নৃপ বৈদ্যনাথ কহ ভাবি বালা রমণী নতুন পূণে পাবি॥

--)•(--

সই প্রেম অপরূপ।
কিশোর কিশোরী পসরা পসারি
রভস রসের কূপ॥
নলিনী কিরণে মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে॥
যমুনা তরঙ্গে অরুণ উদিত

তারার পসায় তথা।
চপল ঝাঁপিয়া তিমির উদয়
কিবা অদভুত কথা।
কনক লতায়ে মুকুতা ফলিল
কেনা পরতীত যায়।
অনুভবি জন ভাবে মনে মন
কবি-কণ্ঠহার গায়।

আগরতলা রাজবাটীতে বহু মূল্যবান দুর্লভ জিনিসের সংগ্রহ আছে। সেকালের নানান্ ধরণের অস্ত্র, অতি সুন্দর সুন্দর গালিচা, বহু রকমের বাদ্যযন্ত্র, হাতীর দাঁতের তৈরী রকমারি জিনিস, উৎকৃষ্ট ছবি,—কত সব—তার নামও জানি না। কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের এক বন্ধু প্রতি কক্ষে লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাইয়া আনিলেন। অভিষেকের দিনে মহারাজাকে যে সিংহাসনে বসিয়া মঙ্গলস্নান করিতে হয় সে সিংহাসনখানি দেখিলাম। সিংহাসন রাজবংশের আদিকাল হইতে আছে। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের শ্বশুর মহাশয় একদিন নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে তাঁহার চা-বাগান দেখাইয়া আনিলেন। কেমন করিয়া চায়ের গাছের চাষ হয়, পাতা তোলা হয়, শুকাইয়া ভাজিয়া চা পাতাকে বিক্রয়ের উপযুক্ত করা হয়, কর্ম্মচারীগণ খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখাইলেন, বুঝাইলেন। জায়গাটি ভারী মনোরম, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম।

ত্রিপুরার তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহার পিতৃদেব প্রবীণ পণ্ডিত (কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন) শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভে কৃতার্থ হইলাম। ভূপেন্দ্রনাথের উদ্যোগে একটি ছোট-খাট সভায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইয়াছিল। পরে তিনি অতিথিশালায় আসিয়া মহাপ্রভুর পুণ্যজীবন-কথা ও পদাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ গীতা, উপনিষদ, প্রভৃতি সম্বন্ধেই প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী গভীর এবং রচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

রাজমালার সম্পাদক পণ্ডিত কালীচরণ সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং তাঁহার সহকারী মহেন্দ্র বাবু আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সে সময় পর্য্যন্ত প্রকাশিত দুইখণ্ড রাজমালা উপহার দিয়া ধন্য করিয়াছেন এবং প্রত্যহ আসিয়া সংবাদ লইয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবুর দ্বারা পুঁথির পদ-সূচী প্রস্তুতে সাহায্য হইয়াছিল। তাঁহারা থাকিতে কেন যে গীত-চন্দ্রোদয় আজিও অমুদ্রিত পড়িয়া আছে,—এ যেন একটা রহস্য বলিয়া মনে হয়। রাজমালার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুঁথিখানিও তো অনায়াসেই ছাপানো চলিতে পারে। আগরতলায় কি এমন কেহ নাই, যিনি এ বিষয়ে মহারাজা বাহাদুরের আদেশ আদায় করিতে পারেন? প্রাইভেট সেক্রেটারীর বাসায় গীত-চন্দ্রোদয়ের জন্য দরবার করিতে দুইদিন গিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কোনদিন অতিথিশালায় পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং মনে হয় বই সম্বন্ধে মহারাজকে কোন কথা বলিতে তিনি নারাজ। সহৃদয় শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয় কিন্তু খুব ভরসা দিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কিম্বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি বইখানার একটা নকল সংগ্রহ করিতে পারেন এবং মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন, বাঙ্গালা-সাহিত্যের মহদুপকার সাধিত হইবে।

দেশের অভাব

……এদেশের মানুষ যদি ঠিক মানুষ হইয়া সকল প্রকার অভাব দূর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে এ দেশীয় মানুষের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর চিন্তার উদ্ভব হওয়ার প্রয়োজন, যাহাতে (১) দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন আকাঙ্ক্ষা কি কি (২) ওই আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে নিজেদের আয়ত্তাধীন উপায়ে পূর্ণ হইতে পারে এবং (৩) এই উপায়গুলি কি করিয়া উত্তরোত্তর বিস্তৃততর এবং কার্য্যকরী করা যায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে।

ইঙ্গিত

—শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

বার তের বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'ইঙ্গিত' লিখিবার পর লেখা বন্ধ করি। তৎপূর্ব্বে চার পাচ বৎসর ধরিয়া প্রায় প্রতি মাসেই একটা করিয়া 'ইঙ্গিত' লিখিয়াছিলাম। সে লেখার ফলে দেশের মধ্যে বেশ একটু সাড়া পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল; কারণ ইঙ্গিতের প্রথম কিস্তী বাহির হইবার পর হইতে প্রত্যহ বহুসংখ্যক পত্র আসিতে আরম্ভ করিল। অনেকে স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎও করিয়া যাইতে লাগিলেন। অনেকে আফিসে পত্র লিখিয়া ঠিকানা জানিয়া লইয়া বাড়ীতে পত্র লিখিতে বা সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর যথাসম্ভব ইঙ্গিতের মধ্যে মৌখিক এবং পত্রসংযোগে দিয়াছি। 'ইঙ্গিত' পড়িয়া ব্যবসায়ে নামিয়া উপকৃত হইয়াছেন বলিয়াও অনেকে জানাইয়াছিলেন। 'ইঙ্গিত' লেখা সার্থক হইতে দেখিয়া আমার আনন্দের সীমা ছিল না।

তাহার পর 'ইঙ্গিত' লেখা বন্ধ হইল। বন্ধ হইবার কোনই হেতু ছিল না। যে সময়ে বন্ধ হয়, সেই সময়ে আমি আমার এক কন্যার বিবাহে কিছু ব্যস্ত ছিলাম। দু'এক মাস বন্ধ থাকিলেও আবার লিখিলেই হইত। কিন্তু আর লিখিতে ইচ্ছা হইল না। এটা শুধু খেয়াল মাত্র।

তাহার পর এই বার তের বৎসর আমার অজ্ঞাতবাস। এখন আবার হেলির ধূমকেতুর মত 'বঙ্গশ্রী'র আকাশে শ্রীবিশ্বকর্ম্মার পুনরাবির্ভাব। কিন্তু অজ্ঞাতবাস কালের মধ্যেও আমি সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞাত থাকিতে পারি নাই। পূর্ব্ব-পরিচিতগণ ত' নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেনই—অনেক অপরিচিত ও অ-পূর্ব্ব-পরিচিত ব্যক্তিও কোন রকমে সন্ধান লইয়া পত্রব্যবহার ও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং এখনও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন। এখনও দুই ভদ্রলোক আমার নির্দ্দেশ মত দুইটি নূতন বিষয় লইয়া পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন। কেহ কেহ শিল্প-শিক্ষার জন্য মফস্বল হইতে আসিয়া আমার নিকট থাকিতে চান। তাঁহাদিগকে যদি স্থান দিয়া হাতে ধরিয়া শিখাইতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁহাদের যেমন সুবিধা হইত, আমারও তেমনি অসীম আনন্দ হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সে সুবিধা আপাততঃ নাই। সেই জন্য আমার জীবনের একটা প্রধান আনন্দে আমাকে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, 'ইঙ্গিতে'র প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। এই কয় বৎসর বন্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে আমার অপরাধী বলিয়া মনে হইতেছে। সে যাহা হউক, গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন হইতে আবার নিয়মিতভাবে 'ইঙ্গিত' লিখিয়া অপরাধের যথাসম্ভব প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করা যাউক।

ক্যেজীন

বাঙ্গালা দেশের অনেক জনবিরল স্থানে গোরু-মহিষের সংখ্যা প্রচুর। সেই সকল গোরু-মহিষের যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা খাইবার লোকের সেই সকল স্থানে বড়ই অভাব। যাহারা গো-মহিষ পালন করে, তাহারা ও গ্রামের লোকদের মধ্যে যাহাদের সংস্থান আছে তাহারা যাহা পারে খায়। অবশিষ্ট দুধ হইতে মাখন বাহির করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করা হয়। এই ঘৃত কতক গ্রামবাসীরা নিজেরা খায়। বাকী ঘৃত স্থানান্তরে চালান যায়। কিন্তু অবশিষ্ট দুধটা আর কোনই কাজে লাগে না। সেই সব জায়গা এমন দুর্গম যে, পথ-ঘাট নাই বলিলেই চলে। সে দুধ জনবহুল স্থানে চালান দিবার কোনই সুবিধা করিতে পারা যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী জনস্থান এত দূরে অবস্থিত যে, সেখানে দুধ নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই মাটা-তোলা দুধটা (skimmed milk) ফেলা যায়।

বঙ্গোপসাগরের নিকটে সন্দ্বীপের এক ভদ্রলোকের অনেক গোরু-মহিষ আছে, প্রচুর দুধ উৎপন্ন হয়। সেই দুধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তিনি রেঙ্গুনে চালান দেন, এবং দুধটা লোকসান দেন। তাহারই প্রতিকারের জন্য তিনি আমাকে পত্রও লিখিয়াছিলেন এবং কয়েকবার আমার অফিসে ও বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জমাট দুগ্ধ (condensed milk—skimmed milk বা মাটাতোলা

দুধ হইতেই জমাট দুধ প্রস্তুত হয়) তৈয়ার করিবার পরামর্শ দিয়াছিলাম। Condensed milkএর কারখানা খুলিতে কিছু যন্ত্রতন্ত্র আবশ্যক, মূলধন কাজেই কিছু বেশী দরকার—কারখানাও বড় রকমের না করিলে লাভ হয় না। এতখানি করিবার তাঁহার সামর্থ্যাভাব এবং অন্যান্য বাধাবিঘ্ন অসুবিধার জন্য তিনি সে প্রস্তাব বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তখন আমি বলিলাম, ঢাকা হইতে মাটাতোলা দুধে ক্ষীর তৈয়ার করিয়া সময় সময় কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। এই ঢাকাই ক্ষীর এখানে সস্তায় বিক্রয়ও মন্দ হয় না। তিনি বলিলেন, সন্দীপ হইতে সরাসরি কলিকাতায় ষ্টীমার আসে না—চট্টগ্রাম হইয়া আসে। ততদিনে ক্ষীরও পচিয়া যাইবে। তখন স্থির হইল, তিনি মাটাতোলা দুধ হইতে কেজীন (casein) প্রস্তুত করিয়া চালান দিবেন।

সন্দীপের ন্যায় বাঙ্গালায় আরও অনেক দুর্গম স্থানে দুধ যেমন প্রচুর—ব্যবহারের অভাবে অপচয়ও তাহার তেমনি বেশী পরিমাণে ঘটে। মাটা-তোলা দুধ হইতে condensed milk, পাত-ক্ষীর, খোয়া-ক্ষীর, টোফি, চোকোলেট এবং নানারকম শুষ্ক মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতে পারে। আর হইতে পারে casein। এই জিনিষটা ঠিকমত তৈয়ার করিতে পারিলে দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। Casein নানা রকম শিল্পকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়। বাজারে উহার চাহিদাও মন্দ নয়।

Casein জিনিসটা আর কিছু নয়—আমাদের স্বদেশী ছানার বিশুদ্ধ বিলাতী সংস্করণ। যার নাম ভাজা চাল, তার নাম মুড়ি। প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়ায় তারতম্যে ইহার গুণের ও ব্যবহারের সামান্যই ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে বেশী গরমের সময় কোন কোন দিন আপনা আপনি দুধের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হইয়া গিয়া দুধটা ছানা কটিয়া যায়। এই দুধ প্রায় কোন কাজে লাগে না—ফেলা যায়। যদিও উহা ছানা, কিন্তু বিস্বাদ। তাই খাওয়া চলে না।

মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার জন্য ময়রারা ও গোয়ালারা কুসুম-কুসুম গরম দুধে ছানার জল মিশাইয়া ছানা কাটাইয়া লয়। এই ছানা সুস্বাদ। টাটকা ছানায় প্রস্তুত মিষ্টান্নও অতি উপাদেয়। ইহাতে কিন্তু কেজীনের কাজ হয় না। কেজীন তৈয়ার করিবার জন্য বিলাতী গোয়ালারা ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। এই প্রক্রিয়াও অনেক রকম আছে। দুই একটা এইরূপ :—

বিলাতী কেজীন অতি বিশুদ্ধ ছানা। কেজীন তৈয়ার করিতে হইলে দুধ হইতে এমন নিঃশেষে মাখন তুলিয়া লইতে হয় যে, তাহাতে লেশমাত্র মাখনের অংশ যেন না থাকে। এই মাটাতোলা দুধ একটা গরম জায়গায় কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে দুধটা জমিয়া কেজীনে পরিণত হয়। কিন্তু ইহা এখন বিশুদ্ধ নয়। এই জিনিষটা কাগজের ফিলটারে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। কেজীন ফিলটারে থাকিতে থাকিতেই বৃষ্টির জলে উহাকে ধুইতে হইবে। ফিলটারের উপর বৃষ্টির জল ঢালিতে থাকিলে কেজীনের মধ্যে অবস্থিত জলের দ্রবনীয় অংশ জলের সঙ্গে মিশিয়া বাহির হইয়া যাইতে থাকিবে। ইহারই নাম ধৌত করা। যতক্ষণ না কেজীনের মধ্যস্থ সমস্ত অম্লরস নিঃশেষে ধুইয়া বাহির হইয়া যাইবে, ততক্ষণ জল ঢালা দরকার। কেজীনের মধ্যে লেশমাত্র অম্ল-রস থাকিবে না, থাকিলে কেজীন বিশুদ্ধ হইবে না—উহাতে কোন কাজই হইবে না। দেখা যাইতেছে, সম্পূর্ণরূপে অম্লরস বিমুক্ত করাই কেজীন প্রস্তুতের প্রধান অঙ্গ। অতএব ইহা একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার।

ফিলটারে কেজীনের উপর যতটা জল ধরে ঢালিয়া দিন। ফিলটারের নীচে একটা পাত্র রাখুন। কেজীনের ভিতর দিয়া জলটা চুয়াইয়া তলার পাত্রে জমা হইবে। লিটমাস পেপার ঐ জলে ডুবাইয়া তুলিলে দেখা যাইবে জলে এ্যাসিড রহিয়াছে। কেজীনের উপর আর একবার জল ঢালুন। সেটা চুঁয়াইয়া পড়িলে আবার লিটমাস পেপার দিয়া পরীক্ষা করুন। এইভাবে পরীক্ষা করিতে করিতে যখন দেখা যাইবে কেজীন-ধোয়া জলে আর এ্যাসিড পাওয়া যাইতেছে না, অর্থাৎ জলটাও বিশুদ্ধ অবস্থায় নামিয়া আসিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে ধোয়া শেষ হইয়াছে।

রসায়নের ক্ষেত্রে কেজীনের বহুল প্রয়োগ আছে। এই জন্য কেজীন বিশুদ্ধ না হইলে কোন কাজই হয় না।

কেজীনের ব্যবহার

কেজীন হইতে অনেক রকম সিমেণ্ট (দ্রব্যাদি জুড়িবার আঠা) প্রস্তুত হয়। কেজীন বিশুদ্ধ হইলে এই আঠা খুব শক্তিশালী ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ধোওয়া কেজীনও সম্পূর্ণ

বিশুদ্ধ নহে। ইহাকে একখণ্ড কাপড়ে বাঁধিয়া কিছুক্ষণ গরম জলে সিদ্ধ করিলে উহাতে যে স্নেহাংশ থাকে, তাহা ভাসিয়া উঠিবে। সেটা বাদ দিলে তবে কেজীন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইবে।

সিদ্ধ করিবার পর জল ঝরাইয়া কেজীনটা ব্লটিং কাগজের উপর বিছাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ মাঝারি রকম গরম স্থানে রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। তখন উহা গুটাইয়া যাইবে।

কিছু ঠাণ্ডা জলে কিছু সোহাগা ভিজাইয়া সোহাগার জল প্রস্তুত করুন। জলটা যেন বেশ ঘন হয়। এই জলে কিছু কেজীন সিদ্ধ করিয়া লইলে যে আঠা প্রস্তুত হইবে, তাহা অতি শক্তিশালী আঠা।

কেজীন চূর্ণ—৫ এভর্ডুপইজ আউন্স, চূণ—এক এভর্ডুপইজ আউন্স, কর্পূর চূর্ণ—১২০ গ্রেণ। এই তিনটি জিনিষ মিশাইয়া রাখুন। ব্যবহারের সময় ইহাতে যথামাত্রায় জল মিশাইয়া কাদার মত করিয়া লইবেন। চমৎকার আঠা।

কেজীন চূর্ণ—২ ভাগ, সোহাগা চূর্ণ—১ ভাগ মিশান। ব্যবহারের সময় অল্প জলে গুলিয়া লইবেন।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অনুপান সহযোগে কেজীন হইতে নানা রকম আঠা প্রস্তুত হইয়া নানা কাজে লাগে। কোন কোনটা এত শক্ত হয় যে, তদ্দ্বারা পোসিলেনের বাসন পর্যন্ত জোড়া যায়।

ফটোগ্রাফ কার্ডে মাউণ্ট করিবার (জুড়িবার) জন্য কেজীনের আঠা উৎকৃষ্ট। দুধে একটু টাটারিক এ্যাসিড দিয়া গরম করিলে দুধ ছিঁড়িয়া গিয়া ছানা কাটিবে। ১০ ভাগ জলে ৬ ভাগ সোহাগা গলাইয়া সেই জলে ভিজা ছানা দিয়া উনুনে চড়াইয়া নাড়িতে হইবে। ফলে কেজীন গলিয়া আঠা প্রস্তুত হইবে। কেজীনের পরিমাণ বুঝিয়া এই পরিমাণ সোহাগায় জল দিতে হইবে, যেন কেজীনের অতি সামান্য অংশই অদ্রবীভূত থাকে। দুই চারিবার করিতে করিতেই ঠিক ভাগটা বুঝা যাইবে।

প্রসাধনের উপকরণরূপে ব্যবহার করিতে হইলে মাটা-তোলা দুধ গরম জায়গায় রাখিয়া কিম্বা এসেটিক এসিড বা ভিনিগার মিশাইয়া ছানা কাটাইয়া লইতে হয়। পরে ঠাণ্ডা জলে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া অম্লবিরহিত করিতে হয়।

রাসায়নিক ভাবে বিশুদ্ধ কেজীন হইতে কয়েক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। কাজেই ডাক্তারখানায় উহার আদর আছে।

কেজীন যখন ছানা ছাড়া আর কিছু নয়, তখন উহা হইতে চেষ্টা করিলে নানা রকম খাবার জিনিষও যে তৈয়ার করা যায় না এমন নহে।

দুধ যেখানে প্রচুর এবং সস্তা, অথচ খাইবার লোক কম এবং চালান দিবারও সুবিধা নাই, সেখানে দুধ হইতে টোফি, চোকোলেট প্রভৃতি শিশুরঞ্জন খাদ্য প্রস্তুত করিয়া চালান দেওয়া যাইতে পারে।

মাঝামাঝি রকমের ঝুনা নারিকেল (বেশী ঝুনা হইলে দুধ ভাল হয় না) কুরিয়া কাপড়ে নিঙড়াইয়া দুধ বাহির করিয়া লইতে হইবে। একবার দুধ বাহির করিবার পর নারিকেল-কুরায় অল্প গরম জল মিশাইয়া আর একবার কাপড়ে নিঙড়াইয়া লইলে আরও কিছু দুধ বাহির হইবে। নারিকেল দুধের সমপরিমাণ গোরু বা মহিষের দুধ ও চিনি একত্র মিলিত করিয়া এনামেলের বা এলুমিনিয়ামের কড়ায় পাকে চড়াইতে হইবে। পাকের সময় ঘন ঘন হাতা দিয়া নাড়িতে হইবে, যেন আঁটিয়া বা ধরিয়া না যায়, কারণ তাহা হইলে দুর্গন্ধ ও অখাদ্য হইয়া যাইবে। রস মরিয়া ঘন হইয়া আসিলে জিনিষটার রং বাদামী হইয়া যাইবে। বেশ ঘন হইলে আঁচ হইতে কড়া নামাইয়া একটা পাথরের থালায় অল্প ঘি হাত বুলাইয়া তাহাতে ঢালিয়া রাখিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলে উহা বরফির মত জমিয়া যাইবে। তখন টোফির মতন ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া সম্পূর্ণ রূপে শুকাইয়া লইতে হইবে। থালায় ঢালিবার সময় ইচ্ছা হইলে বাদাম পেস্তার কুঁচা উহার সহিত মিলাইতে পারা যায়। তাহাতে উহার স্বাদ আরও উত্তম হইবে।

ইহাই টোফি। ইহাকে রঞ্জিত রাংতার পাতে মুড়িয়া লইলেই বিক্রয়োপযোগী হইল। সম্পূর্ণ রূপে শুষ্ক হওয়াতে ইহা সহজে খারাপ হইবে না।

দুধ ও নারিকেল সহযোগে এইরূপ শুষ্ক ভাবে চন্দ্রপুলি প্রভৃতি নানা রকম খাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এক একটা সুন্দর নাম দিয়া সুদৃশ্য আধারে বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠাইলে পড়িতে পাইবে না—ছেলে বুড়ো সকলেরই রসনা সমান ভাবে তৃপ্ত করিতে পারিবে। একটু বুদ্ধি খাটাইয়া অধ্যবসায় সহকারে তৈয়ার করিলে অর্থাগম, অপচয় নিবারণ দুইই হইতে পারে।

লণ্ডন-প্রবাসীর ডায়েরী

ইংলণ্ডের আভিজাত্য

—পরিব্রাজক

ইংলণ্ডের আভিজাত্য সম্বন্ধে দু'চারিটা কথা বলিব। আভিজাত্যের গর্ব্ব সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে কোন রকমে, আমরা সকলেই কখনও না কখনও করিয়া থাকি—এ

সূর্য্যাস্ত : টর্কে হার্বার।

আমাদের স্বভাবগত। নামে, সাধারণ-তন্ত্র হিসাবে ইংলণ্ডের শাসন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বটে, কিন্তু খুঁজিয়া পরখ করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, এই বাহ্যিক সাধারণ-তন্ত্রের পিছনে বাস্তবিক পক্ষে, আভিজাত্যের বিপুল ও প্রবল প্রভাব। রাষ্ট্রতন্ত্র এ দেশে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে অভিজাত বংশীয় কয়েক-জনের অঙ্গুলিসঙ্কেতে। এদেশের রাজনীতির 'কাঠামো'তে রাজার আসন শীর্ষদেশে—শুধু নামে নয়, কাজেও। এদেশের সর্ব্ব-সাধারণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিবার মত ক্ষমতা যদি কোন এক ব্যক্তির থাকে, তবে তাহা রাজার। শুধু রাজা নয়, রাজবংশীয় সকলের নামে এদেশের সকলের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়। ইউরোপে অন্যত্র রাজতন্ত্র মুছিয়া যাইতে পারে, কিন্তু আভিজাত্য-গর্ব্বী পুরাতনপন্থী এই ব্রিটিশ দ্বীপে রাজতন্ত্র বা আভিজাত্য-শাসনের অবসানের আশা, আশঙ্কা বা চেষ্টা যে সুদূরপরাহত একথা সুনিশ্চিত। রাজপরিবারের সকলেই লোকপ্রিয়, তাঁহাদের ব্যবহার চমৎকার। সামান্য একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিগত ২৮শে এপ্রিল (১৯৩৪) শনিবার এক বন্ধুর সঙ্গে লণ্ডনের কিউ গার্ডেনে (Kew Gardens) বেড়াইতে গিয়াছিলাম। শুক্রবার দিন টাইমস্ পত্রিকায় "কিউয়ের বর্ণসম্ভার" নামে (Colour at Kew) একটি চমৎকার প্রবন্ধ (leading article) বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটি পড়িয়াই 'কিউ' দেখিতে ছুটিয়াছিলাম।

প্রধান তোরণ দিয়া ঢুকিয়া মিনিট দশেক পথ চলার পরে আমার বন্ধু সহসা আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "Look, there's the Queen" (রাণী যে!)। প্রথমটায় আমি বন্ধুর বিস্ময়মিশ্রিত উল্লাসবাণী বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাহার কারণ ঘণ্টাখানেক আগেই লণ্ডনের সান্ধ্য খবরের কাগজের প্লাকার্ডে বড় অক্ষরে ছাপান খবর দেখিয়া আসিয়াছি—"The King and the Queen at the Cup Final" (রাজা ও রাণী কাপ-ফাইন্যালে গিয়াছেন)। কিন্তু দেখিলাম, রাণীরই মত মূর্ত্তি, সেই ধরণেরই লম্বা বাঁটের ছাতা হাতে, সেই ধরণেরই শির-আবরণ, সঙ্গে দুই জন সহচরী (ladies in waiting) ও একজন সহচর, আমাদের সম্মুখের পথে আমাদের দিকেই আসিতেছেন। তখন ভাবিলাম, হয়ত বা বন্ধুর কথাই ঠিক! সন্দেহের অবসান হইল তখন, যখন দেখিলাম, পথচারিণী এক মহিলা নত হইয়া সম্ভ্রম জানাইলেন, আমার বন্ধুও মাথা হইতে টুপি নামাইয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন। আমিও সবিনয় নমস্কার জ্ঞাপন করিলাম। রাণী তখন আমাদের এক হাত দূরে—পাশাপাশি পথে।

তিনি অতি মিষ্ট মধুর কোমল হাসি হাসিয়া মাথা নোয়াইয়া প্রত্যেকের নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন; আর একবার করিয়া ফিরিয়া চাহিয়া সৌজন্য জানাইলেন। হঠাৎ মনে

ডার্ট নদীর তীর।

হইতে পারে যে, সুদূর ভারত সাম্রাজ্যের একজন প্রজাকে দেখিয়া সম্রাজ্ঞী মেরীর এই অতিরিক্ত সৌজন্য প্রকাশ, কিন্তু দেখিলাম, না, সর্ব্বজনে সম-সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াই তিনি বাগান হইতে চলিয়াছেন। ইংলণ্ডের আভিজাত্যের, বিশেষ করিয়া রাজবংশীদের ব্যবহারে চমৎকারিত্ব, বিনয়, সৌজন্য ও নমনীয়তা কতদূর, তাহা এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতেই উপলব্ধি হইবে।

আমি বলিতেছিলাম যে, এদেশের শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে আভিজাত্যের অঙ্গুলিসঙ্কেতে। কন্‌সারভেটিভ্, লিবারেল্, লেবার বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট-ন্যশনাল, যে কোন পার্টির গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হউক না কেন, কতকগুলি বিষয়, যথা সৈন্যবিভাগ, নৌবিভাগ, সাম্রাজ্য ব্যাপার, জাগতিক সম্বন্ধ—এ সমস্ত বিষয়ের মামুলি কতকগুলি নীতির অনুকরণ বরাবর চলিয়া আসিতেছে; আর সে সমস্ত নীতির মূলাধার কয়েকটি অভিজাত পরিবার বা সেই সব পরিবারের ব্যক্তি বিশেষ। যুগে যুগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটনের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নায়ক ও শাসক উৎপাদন করিতেছে, আভিজাত্যের বংশগৌরব, অক্সফোর্ডের শিক্ষাপ্রণালী আর ভূসম্পত্তি ও সামাজিক এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধ-সংস্থান, এই তিনে মিলিয়া (heredity, education & environment) ব্রিটনের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন, সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের ব্যবস্থা করিতেছে। দেশের জনসাধারণ জানে, তাহারা স্বাধীন জাতি, তাহাদের পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার (vote) আছে; তাহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট, ইহার বেশী তলাইয়া দেখিতে তাহাদের আগ্রহ নাই, উৎসাহ নাই, অবসরও নাই, অনেকের তদুপযুক্ত চিন্তাশক্তিও নাই। নিজের, স্ত্রীর ও ছেলেমেয়েদের অন্ন ও গৃহ-সংস্থান ইহাই তাহার সংসারের কাম্য; অন্য ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসর কোথায়? খবরের কাগজে রোজ সকাল সন্ধ্যায় সকল ভাবনা তাহার জন্য ভাবিয়া দেওয়া আছে, ভাবিবার ভার খবরের কাগজের সংবাদ-সংগ্রাহক ও লেখকের উপর; খাবার ব্যাপারেও যেমন tinned food (টিনে বন্ধ খাবার) দিয়া সে তাহার সময় ও পরিশ্রমের সংক্ষেপ করে, চিন্তাক্ষেত্রেও খবরের কাগজে tinned thoughtsএর (মামুলী চিন্তা) ও লেখার বিপুল প্রচার ও অতুল আদর; তাই এ বিষয়েও তাহার সুবিধার অভাব নাই। পার্লামেণ্টের সদস্য যাঁহারা মনোনীত হন, তাঁহাদের বাহাদুরী বাগ্মিতায়—The House of Commons is a Debating Society. অক্সফোর্ড, লণ্ডন এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের Students' Union হইতে এ Debating Society আর একটু বড় scaleএর—এই মাত্র প্রভেদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ "ছাত্রত্বের" অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়—ইহাকে বাহাল রাখিবার সুযোগ পার্লামেণ্টের ডিবেটিং সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ার উপর নির্ভর করে। পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন সদস্যগণের ভোটের উপর নির্ভর করে নিঃসন্দেহ; কিন্তু তাতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে গেলে

ডার্ট নদীর অপর পার।

দেখিতে পাই যে, প্রায়ই সে সব আইন কন্‌সারভেটিভ ধরণের বা পুরাতনপন্থী। প্রশ্ন উঠিতে পারে, "কেন, unemployment insurance, health insurance, old age

pension, housing schemes, compulsory free elementary education, এ সবই ত' সনাতন পন্থার বিরুদ্ধে নব্যপন্থা—Socialism এর সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে!" তাহার উত্তর কিছুদিন আগে স্বনামধন্য এক ইংরাজ রাজনৈতিক বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছিলেন:— "We are all Socialists now!" আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখিতে পাই—জগতে আজ শুধু দুইটি পন্থার ভিতরে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে—এই পন্থা নির্বাচন এক এক করিয়া আজ বা কাল সকল দেশেই হইতেছে বা হইবে। সে দুটি পন্থা, কম্যুনিজম্ বা সোসালিজম্ এবং ফ্যাসিজম্। ইংলণ্ডে ডিক্টেটরসিপ বা ফ্যাসিজমের প্রভাব হওয়া শক্ত ব্যাপার; তবে ইংলণ্ডের আভিজাত্য 'সময়ের ডাক' শুনিয়াছে, দুই পথের ভিতরে এক পথ আজ হোক বা কাল হোক তাহাকে যে বাছিয়া লইতেই হইবে, তাহাও সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। তাই যতটা সম্ভব আভিজাত্যের প্রভাব বজায় রাখিয়া সোসালিজমের প্রচার করিতেছে। ইংলণ্ড সুনিয়ন্ত্রিত দেশ, সেখানকার সাধারণ লোক স্বাস্থ্যবান, শান্ত, সুখী, 'স্বদেশী মনোভাবাপন্ন'। আভিজাত্য যে সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চিন্তাশীল ও ব্যগ্র, একথা তাহারা জানে। একের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য ও শক্তির উপর অপরের সমস্ত জীবন নির্ভর করে, এ সার তথ্য ইংলণ্ডে আভিজাত্য ও সাধারণ সমাজ উভয়েই বুঝিয়াছিল—তাই কন্‌সারভেটিভ আভিজাত্যও সোসালিষ্টিক্ জনসাধারণের সুবিধাত্মক আইন প্রণয়নে দ্বিধা করে নাই।

ব্রিক্সহাম: বার্গে ফিশকুম ও চার্সটন কোভ্।

বঙ্গ

—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সুন্দর অম্বর নীলঘননির্ম্মল চুম্বিত দিক্‌রেখা প্রান্তে,
সুন্দর দিনমণি রঞ্জিত করি শ্যামে বন্দনা করে শিবসান্তে।
সুন্দর চন্দ্রমা সুন্দর তারাদল ঝলমল করে নভঃশীর্ষে,
সুন্দর শিবদেহে দক্ষিণা-কামদেব ছাড়ে মধুমলয়ার তীর সে।
সুন্দর শ্যাম-গেহে শিব-হৃদি' চঞ্চল ধ্যান ভাঙ্গি সুন্দরী বঙ্গে,
সুন্দর বাহু দিয়া দিল প্রেমালিঙ্গন সুন্দর নটরাজ রঙ্গে।
সুন্দর নদনদী সুন্দর কান্তার প্রান্তর করে উঠে নৃত্য,
সুন্দর শ্যামশোভা-সৃষ্টির ব্রহ্মার গলে' পড়ে সুন্দর চিত্ত।
সুন্দর বিলখাল সুন্দর মধুমাঠ কল্যাণী করে রসনর্ত্তন,
সুন্দর রূপরাঙ্গা শস্যের বুকভাঙ্গা হর্ষের উঠে রসাবর্ত্তন।
সুন্দর শৈলের গৈরিক ভরা দেহে ঝর্ণার মধু কলহাস্য,
সুন্দর অম্বুধি ছন্দের নাচে ওঠে কাব্যের ফুলফোটা ভাষ্য।
সুন্দর বনদেহ-মন্দির কোলে কোলে দিক্‌বধূ নেচে ওঠে ছন্দে,
সুন্দর ফুলবনে বিশ্বের নর-নারী-যৌবন ভরে' ওঠে গন্ধে
সুন্দর মেঘমালা দলভাঙা চঞ্চল কুন্তলে গেঁথে দেয় মাল্য,
সুন্দর ফুলদল গন্ধের দোলনায় দোল খায় রস-নির্ম্মাল্য।
সুন্দর ছয়ঋতু গায় ঘন জয়গীতি মধু মধু বন্দনা গৌরব।
সুন্দর মাধবের চন্দন-তনু ভরা ভেসে আসে নন্দন-সৌরভ।
সুন্দর বরষার ঝর্ঝর ঝম্ ঝম্ দেবতার আশীষের বৃষ্টি,
সুন্দর মধুমাসে মাধবের মধুরাস বুকে বুকে করে রস সৃষ্টি।
সুন্দর ঘরে ঘরে লাজভরা বধূমুখ আধফোটা সুন্দর যৌবন,
সুন্দর সংসার নন্দন-রং যার রংদার মিলনের মৌ-বন।
সুন্দর ফুল ফল সুন্দর মাটীজল সুন্দর নীল মহাশূন্য,
সুন্দর গেহে গেহে সুন্দর নরনারী ভুবনের লীলা ঝরে পুণ্য।
সুন্দর মর্ত্তের উৎসব ঘিরে ঘিরে ঝরে মধু জীবনের বেদগান,
সুন্দর অম্বরে মহাকাল ডম্বরু-সঙ্গীতে খুলে যায় দেবযান।
সুন্দর মধুপথ ভাগবত ধূলিভরা কীর্ত্তনভরা হরিছন্দ;
সুন্দর জনমের মৃত্যুঞ্জয় দ্বারে যমপথ করে দেয় বন্ধ।
সুন্দর মিলনের চুম্বন ছোঁয়াছুয়ি দম্পতি ঘনভুজবন্ধন,
সুন্দর মর্ম্মের কর্ম্মের উৎসবে ঝরে' পড়ে হরিভক্তচন্দন।
সুন্দর শুকশ্যামা গায় পিকচন্দনা তাল দেয় ছন্দের বুল্ বুল্,
সুন্দরী বঙ্গের হিন্দোল্ তলে আজ মন্ দোলে দোল্ দোল্
দুল্ দুল্।

চীনা-শ্রমণদের ভারতদর্শন

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

নালন্দায় প্রত্যাগমন

নালন্দায় ফিরিয়া হিউয়েন মহাস্থবির শুভধর্ম্মাকরকে অভিবাদন করিলেন। নালন্দা হইতে প্রায় তিন যোজন দূরে তিলভক সঙ্ঘারামে প্রজ্ঞভদ্র নামক একজন পণ্ডিত আচার্য্য আছেন শুনিয়া হিউয়েন সেখানে গিয়া তিন মাস তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিলেন। সেখান হইতে যষ্টিবন পাহাড়ে গিয়া জয়সেন নামক একজন সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় পণ্ডিতের কাছে "বিদ্যামাত্র-সিদ্ধি-শাস্ত্র" প্রভৃতি বহুগ্রন্থ দুই বৎসর ধরিয়া চর্চ্চা করিলেন। ক্ষত্রিয় জয়সেনের পাণ্ডিত্য-গৌরবের কথা শুনিয়া মগধের রাজা পূর্ণবর্ম্ম তাঁহাকে বিশখানি ও কান্যকুব্জের হর্ষবর্দ্ধন উড়িষ্যার আশীখানি নিষ্কর গ্রাম দান করিয়া নিজ নিজ রাজ্যের রাজপণ্ডিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়সেন ঐহিক ধনের অসারতা ও বিপদ জানাইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সামান্যভাবে যষ্টিবনে বাস করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন।

এক রাত্রে হিউয়েন স্বপ্ন দেখিলেন যে, নালন্দা মহাবিহার ধ্বংস হইয়া বিজন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে এবং স্বর্ণবর্ণদেহ মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মহাবিহারের চূড়ায় দাঁড়াইয়া বলিতেছেন যে, দশ বৎসর পরে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইবে এবং সমগ্র ভারতে বিদ্রোহ, সংগ্রাম ও নরহত্যার দাবানল জ্বলিয়া উঠিবে, অতএব হিউয়েন যেন শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যান। জয়সেনকে একথা জানাইলে জয়সেন বলিলেন যে, পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কিছুই অসম্ভব নহে, হিউয়েন বিচার করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করুন। শীলভদ্রকে স্বপ্নের কথা জানান হইলে তিনি হিউয়েনকে আরও কিছু দিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। বাস্তবিকই হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতে ঘোর দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতা ঘটিয়াছিল।

জয়সেনের সঙ্গে হিউয়েন বুদ্ধগয়ায় বোধিবিহারে বুদ্ধের শরীরাবশেষ-প্রদর্শন-উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। এই সময় অনেক অস্থি ও মাংসখণ্ড বুদ্ধের দেহাবশেষ বলিয়া দেখান হইত। আকৃতি দেখিয়া সেগুলি বাস্তবিকই বুদ্ধ-শরীরের কি না, সে বিষয়ে জয়সেন ও হিউয়েন উভয়েই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উৎসবের সময় নাকি রাত্রে বিহারের চূড়ায় অদ্ভুত আলোক প্রকাশ হইয়া নৈশগগন উদ্ভাসিত করিত। ইহাতে বোধ হয় পাণ্ডাদের কিছু হাত ছিল! আট দিন গয়ায় থাকিয়া হিউয়েন আবার নালন্দায় ফিরিয়া আসিলেন। মহাস্থবির শুভধর্ম্মাকর শীলভদ্র হিউয়েনকে সঙ্ঘের কাছে "মহাযান সম্পরিগ্রহ-শাস্ত্র" ও বিদ্যামাত্র-সিদ্ধি-শাস্ত্র"-এর টীকার জটিলতা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ভার দিয়াছিলেন। এই সময় সিংহরশ্মি নামক একজন আচার্য্য সঙ্ঘের কাছে "যোগশাস্ত্র"-এর ভ্রান্তি প্রদর্শন করাইয়া "প্রাণামূল-শাস্ত্র" ও "শতশাস্ত্র"-এর নূতন ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। হিউয়েন "যোগশাস্ত্র"এর মত মানিতেন এবং তাঁহার অভিমত এই ছিল যে, অন্য আচার্য্যেরা এক এক দিক হইতে একই সত্য উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মত পরস্পরবিরোধী নয় এবং তাহা লইয়া বিবাদ করা পরবর্ত্তীকালের লোকের দোষ। হিউয়েন মধ্যে মধ্যে সিংহরশ্মির অধ্যাপনার সময়ে গিয়া তাঁহাকে প্রশ্নাদি করিতেন, কিন্তু সিংহরশ্মি উত্তর দিতেন না; ইহাতে সিংহরশ্মির ছাত্রেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া হিউয়েনের কাছে পড়িত। হিউয়েন সিংহরশ্মির ভ্রম বার বার দেখাইয়া দিলেও সিংহরশ্মি নিজ মত ছাড়িলেন না, তখন সিংহরশ্মির মত নিরাকরণের জন্য হিউয়েন তিন সহস্র শ্লোক সংযুক্ত একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া শীলভদ্র ও সঙ্ঘকে দিলেন। এই গ্রন্থের খুব সমাদর হইয়াছিল এবং ইহা সাধারণপাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। সিংহরশ্মি তখন গয়ায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন একবার যখন উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন, তখন সেখানকার ভিক্ষুরা (ইঁহারা হীনযানী ছিলেন), সম্রাট নালন্দায় ধাতুমণ্ডিত একটি অতি সুন্দর বিহার বানাইয়াছেন শুনিয়া রহস্য করিয়া সম্রাটকে বলিলেন যে, তিনি কাপালিকদের জন্য একটি মন্দির বানাইয়া দিলেও তো পারিতেন, কারণ

মহাযানীরা পরিদৃশ্যমান জগৎকে আকাশ-কুসুমের মত অধ্রুব বলিতেন) বিশেষ প্রভেদ নাই ! উড়িষ্যার ভিক্ষুরা সম্মতীয় মতানুসারী একজন ব্রাহ্মণ প্রণীত মহাযানের বিরুদ্ধে লিখিত সাতশত শ্লোক সংযুক্ত একখানি গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া মানিতেন। সেই গ্রন্থখানি হর্ষকে দেখাইয়া তাঁহারা বলিলেন, ইহার একটি শব্দের প্রতিবাদ করিতে পারে এমন লোক কে আছে ? হর্ষ বলিলেন, তাঁহারা মহাযানী বড় পণ্ডিতদের দেখেন নাই তাই ঐরূপ বলিতে ভরসা পাইয়াছেন, গল্পই আছে যে সিংহের অসাক্ষাতে শিয়াল মাঠের ইঁদুরদের কাছে বড়াই করিয়াছিল যে, সে সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু সিংহ দেখিয়াই পলায়ন করিয়াছিল !

ভিক্ষুরা তাহাতে বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে সভা ডাকিয়া রাজা সত্য মিথ্যা বিচার করুন। এই কথায় শিলাদিত্য নালন্দায় দূত পাঠাইয়া শুভধর্ম্মাকরের কাছে পত্র লিখিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, শীলভদ্র যেন বিহারের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্য হইতে বাছিয়া চারজন পণ্ডিতকে হীনযান মত খণ্ডন করিবার জন্য উড়িষ্যায় পাঠান। পত্র পাইয়া শীলভদ্র সাগরমতি, প্রজ্ঞারশ্মি, সিংহরশ্মি ও হিউয়েন এই চারজনকে মনোনীত করিলেন। কিন্তু শিলাদিত্য আবার এই মর্ম্মে পত্র পাঠাইলেন যে, তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই, পরে আসিলেই চলিবে।

এই সময় লোকায়ত মতের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নালন্দার পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি চল্লিশটি প্রবন্ধ লিখিয়া মন্দিরের দরজায় লট্‌কাইয়া প্রচার করিলেন, যে এগুলি খণ্ডন করিতে পারিবে তাহার কাছে পরাজয়ের নিদর্শনস্বরূপ তিনি তাঁহার মস্তক দান করিবেন। কয়েক দিন গেল, কেহ এ কথার প্রত্যুত্তর দিল না, তখন হিউয়েন তাঁহার আবাস হইতে একজন লোক পাঠাইয়া ঐ প্রবন্ধগুলি ছিঁড়িয়া তাহা পদদলিত করিতে বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এ সংবাদে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতিবাদীর খবর লইয়া যখন শুনিলেন যে, তিনি স্বয়ং হিউয়েন তখন আর তর্কে নামিতে তাঁহার সাহস হইল না। হিউয়েন কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি ব্রাহ্মণকে আসিতে আহ্বান করিয়া শীলভদ্রের সম্মুখে সঙ্ঘকে অনুরোধ করিলেন যে, সঙ্ঘ যেন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার তর্কের বিচার করেন। তারপর হিউয়েন ক্রমান্বয়ে ভূতমত, নির্গ্রন্থমত, কাপালিকমত, জটিলমত, সাংখ্যমত, বৈশেষিকমত প্রভৃতির তন্ন তন্ন বিচার করিয়া উহাদের ভ্রম-প্রদর্শন ও খণ্ডন করিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ নিরুত্তর ও নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। শেষে ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্মানে বলিলেন, "আমার পরাজয় হইয়াছে ; আমি আমার অঙ্গীকারপালনে প্রস্তুত আছি।"

হিউয়েন বলিলেন, "আমরা শাক্যপুত্র, লোকের প্রাণনাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় ; আমি আদেশ করিতেছি যে, আপনি আমার দাস হইয়া আমার আজ্ঞা পালন করুন !" ব্রাহ্মণ সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং লোকে এই ব্যাপারের কথা শুনিয়া খুব আনন্দ লাভ করিল।

হিউয়েন উড়িষ্যায় যাইবার অভিপ্রায়ে মহাযান-বিরোধীদের প্রামাণ্য সেই সপ্তশতশ্লোকী হীনযান গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ লক্ষ্য করিয়া বিজিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্রাহ্মণ ঐ গ্রন্থের বিষয়গুলি অবগত আছেন কি না। ব্রাহ্মণ বলিলেন, তিনি পাঁচবার ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। তখন হিউয়েন তাঁহাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, হিউয়েনের দাস হইয়া তিনি কেমন করিয়া হিউয়েনকে শিখাইবেন ? হিউয়েন বলিলেন, "এগুলি অন্য দলের মত, আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না ; তুমি নির্ভয়ে বলিতে পার।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তবে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাউক, নতুবা লোকে মনে করিবে আপনারও আমার কাছে শিক্ষা করিবার আছে, তাহাতে আপনার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাহানি হইবে।" তাই গভীর রাত্রে লোকজন বিদায় করিয়া হিউয়েন ব্রাহ্মণের সঙ্গে সমগ্র গ্রন্থখানি আলোচনা করিয়া তাহার ভ্রমগুলি বুঝিলেন ও এগুলি খণ্ডন করিয়া একখানি ষোল শত শ্লোকের গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা শীলভদ্রকে দিলেন। হিউয়েনের গ্রন্থখানি পড়িয়া ছাত্রেরা সকলেই নিঃসন্দেহ হইল।

এই গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্রাহ্মণের কাছে তাঁহার ঋণ হিউয়েন বিস্মৃত হন নাই ; তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "তর্কে পরাজয়ের ফলে আমার দাসত্ব করাই তোমার যথেষ্ট অপমানের কারণ হইয়াছে, এখন আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম, তুমি যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পার।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত মনে পূর্ব্ব-ভারতের কামরূপ রাজ্যে গিয়া সেখানকার অধিপতি ভাস্করবর্ম্মণ বা কুমার রাজকে হিউয়েনের গুণগ্রামের কথা জানাইলেন। শুনিয়া কুমাররাজ মহোৎসাহে হিউয়েনকে তাঁহার রাজ্যে আসিতে লিখিয়া দূত পাঠাইলেন।

কুমাররাজার দূত পৌছিবার পূর্ব্বে একদিন একজন নগ্ন নির্গ্রন্থ শ্রমণ (জৈন সন্ন্যাসী) হঠাৎ হিউয়েনের ঘরে প্রবেশ করিল। হিউয়েন শুনিয়াছিলেন, নির্গ্রন্থরা ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। তিনি নগ্ন শ্রমণকে গণনা করিতে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার দেশে ফিরিবার সুবিধা হইবে কিনা এবং তিনি কতদিন বাঁচিবেন। শ্রমণ বলিলেন, হিউয়েনের ফিরিবার সুবিধাই হইবে এবং তিনি আরও দশ বৎসর বাঁচিবেন। হিউয়েন বলিলেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক গ্রন্থ ও প্রতিমা আছে, তিনি জানেন না সেগুলি লইয়া নিরাপদে পৌছিতে পারিবেন কি না। নগ্ন শ্রমণ বলিলেন, "উদ্বিগ্ন হইবেন না; শিলাদিত্য ও কুমাররাজা আপনার সঙ্গে লোক দিবেন, আপনি নির্ব্বিঘ্নে দেশে পৌছিবেন।"

হিউয়েন বলিলেন, "এই দুইজন রাজার সঙ্গে আমার দেখাই হয় নাই, কেমন করিয়া আমার প্রতি তাঁহাদের এই দয়া সম্ভব হইতে পারে?"

শ্রমণ বলিলেন, "কুমাররাজার দূত আগেই রওনা হইয়াছে, দুই তিন দিনের মধ্যে এখানে পৌছিবে; কুমাররাজার সঙ্গে দেখা হইবার পর শিলাদিত্যের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হইবে।"

এই কথা বলিয়া শ্রমণ চলিয়া গেল। হিউয়েনও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া গ্রন্থ ও প্রতিমাগুলি গোছগাছ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া বিহারের সমস্ত ভিক্ষু আসিয়া হিউয়েনকে বুদ্ধের জন্মভূমি, জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্র ভারত ছাড়িয়া বর্ব্বর ও ধর্ম্মরহিত চীন দেশে ফিরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। হিউয়েন বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ বুদ্ধ সব দেশেরই জন্য তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কাজেই যাহারা সত্য ধর্ম্মের আলোক লাভ করিয়াছে তাহাদের উচিত অন্যত্রও তাহা প্রচার করা। চীন দেশের লোকও ধর্ম্মপরায়ণ, সেখানেও পিতার প্রতি পুত্রের, পুত্রের প্রতি পিতার প্রেম আছে; সেখানেও ন্যায়পরায়ণ রাজা ও সাধু মন্ত্রীগণ আছেন; চীনদেশের লোকও কলা ও বিজ্ঞানচর্চ্চায় দক্ষ।" এইরূপ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর ভিক্ষুরা যখন দেখিলেন যে, হিউয়েন ফিরিতে কৃতসংকল্প, তখন তাঁহারা তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে শুভধর্ম্মাকরের কাছে যাইতে অনুরোধ করিল। শীলভদ্রের কাছে গেলে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে হিউয়েন বলিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি শীলভদ্রের কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, পবিত্র তীর্থস্থানগুলিতে পূজা ও দর্শন করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতগুলি অনুসন্ধান করিয়াছেন; তাঁহার চিত্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে; এখন তিনি দেশে ফিরিয়া শাস্ত্রগ্রন্থাদি চীনাভাষায় অনুবাদ ও নিজে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, অন্য সকলকে তাহা দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

শীলভদ্রের খুবই ইচ্ছা ছিল যে, হিউয়েন নালন্দায় অবস্থিতি করেন কিন্তু হিউয়েনকে কৃতসংকল্প দেখিয়া, "আপনার অভিপ্রায় বোধিসত্ত্বেরই উপযুক্ত!" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাকে আনন্দে অনুমতি দিলেন এবং তাঁহার যাত্রার উদ্যোগের আদেশ প্রচার করিলেন। শীলভদ্র সকলকে এই অনুরোধ করিলেন যে, কেহ যেন হিউয়েনকে দেরী করাইয়া না দেন। এই কথা বলিয়াই শীলভদ্র ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

দুই দিন পরে কুমাররাজার দূত আসিয়া শীলভদ্রকে কুমাররাজার পত্র দিল। কুমাররাজা লিখিয়াছিলেন, "আপনার শিষ্য চীনদেশ হইতে আগত মহাশ্রমণকে দেখিতে চাহেন; মহাশয় তাঁহাকে পাঠাইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই রাজ-ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

শীলভদ্র পত্র পাইয়া সঙ্ঘকে জানাইলেন যে, কুমাররাজা হিউয়েনকে আহ্বান করিয়াছেন বটে, কিন্তু হিউয়েনকে শিলাদিত্যের কাছে পাঠান হইবে এই কথা পূর্ব্বেই দেওয়া আছে; কামরূপে গেলে, হিউয়েন শিলাদিত্য আহ্বান করিলে কেমন করিয়া যাইবেন? অতএব হিউয়েনকে কামরূপে পাঠান উচিত হইবে না। শীলভদ্র কুমাররাজার দূতকে বলিলেন যে, চীনদেশীয় শ্রমণ দেশে ফিরিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, সুতরাং রাজার অনুরোধ রক্ষায় তিনি অক্ষম।

দূত কামরূপ পৌঁছিলে কুমাররাজা আবার হিউয়েনকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র পাঠাইলেন যে, হিউয়েন যেন অল্পদিনের জন্য আসেন, তাঁহার দেশে ফিরিতে কোন বাধা যাহাতে না হয় রাজা সে চেষ্টা করিবেন। শীলভদ্র ইহাতে সম্মত না হওয়ায় রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আবার দূত পাঠাইলেন এবং শীলভদ্রের নামে স্বতন্ত্র পত্র দিয়া অনুরোধ করিলেন যে, রাজার ধর্ম্মশিক্ষার জন্য যেন হিউয়েনকে পাঠান হয়, নতুবা তিনি তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিবেন, তাঁহার সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া নালন্দার মহাবিহার ধূলিসাৎ করিবেন। শীলভদ্র এই পত্র পাইয়া হিউয়েনকে বলিলেন যে, কামরূপে বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই, রাজার মনও তমসাচ্ছন্ন; রাজার যখন হিউয়েনের প্রতি এত আকর্ষণ হইয়াছে তখন হিউয়েন একটু কষ্টস্বীকার করিয়া পরোপকারের জন্য একবার সেখানে গেলে ভাল হয়।

[ক্রমশঃ

আমরা মরিয়া আছি

—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

এই কথা সর্ব্বদেশে সর্ব্বলোকে আজি প্রতিষ্ঠিত,
কেহ কহে অহঙ্কারে, শ্লেষ করি কেহ বা কহিছে
আমরা মরিয়া আছি;—দেশ, জাতি আজিকে নিন্দিত,
গঙ্গোত্তরী হ'তে সিন্ধু সেই নিন্দা-প্রবাহ বহিছে।

অন্তরের ফল্গুধারা পঙ্কিল আবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান,
গলিত দুর্গন্ধ শব, কবন্ধ নিঃশ্বাস রুধি কাঁদে,
পূতিগন্ধ বায়ুবেগ মৃত্যুদূতে করিছে আহ্বান
উলঙ্গ প্রেতের নৃত্য রাজপথে চলিছে অবাধে।

শ্মশান হইতে টানে রাশীকৃত মৃতের কঙ্কাল
অভিচার মন্ত্র পড়ি প্রাণ-সঞ্চারের বৃথা আশে
সদ্য ছিন্ন নাড়ী লয়ে উপবীত পরিল চণ্ডাল
পিঙ্গলা গ্রহের বহ্নি জ্বলে ওঠে আশু সর্ব্বনাশে।

লোকালয়ে দাঁড়াইয়া মানুষের খোলস পরিয়া
অন্ত্যজ পিশাচদল জুগুপ্সায় লোলুপ রসনা,
লালসার পানপাত্র কামায়ন রেখেছে ধরিয়া
কুক্কুরে লেলা'তে কাম আজি হ'ল বিশ্লথ-বসনা।

ন্যায়ের মুখোস পরি ছাগপাল ভ্রমে সকৌতুকে
মানুষ হইয়া মোরা তবু তার পাই না সন্ধান
কামায়ন-রসায়নে গোঁজা ওঠে সকলের মুখে
পতিতার প্রেমগর্ব্বে মোরা রাখি সতীত্বের মান।

আমরা মরিয়া আছি,—পচিতেছি তিল তিল করি'
খসিয়া পড়িছে দেহ ছিন্নভিন্ন ধরণীর কোলে
দুর্গন্ধ বিষাক্ত বায়ু নিস্তব্ধ ঝড়ের পথ ধরি;
ঘন মেঘ সঞ্চারিত, ঈশানে ও কা'র ছায়া দোলে?

মৃতের কঙ্কালবাহী শোভাযাত্রা অবিরাম চলে,
ময়-দানবের হাতে লক্ষ বলি নিত্য হেথা হয়,
আকাশ-কুসুম অর্ঘ্যে দেশ-দেবতার পূজা-ফলে
নির্ম্মাল্য জাগে না তার মৃত্যু হ'তে মুক্তির অভয়।

আমরা মরিয়া আছি—হেন সত্য মোদের জীবন
কলঙ্কিত করিয়াছে—সহি তাই নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা;
মানুষের দেহ আছে, মনুষ্যত্বে দিয়া নির্ব্বাসন
ঘৃণিত লজ্জায় শুধু করিতেছি আত্ম-প্রবঞ্চনা।

এ মরণ সত্য হ'লে—জন্মান্তরে নবজন্ম লভি'
আত্মার এ অধোগতি হয় ত বা হ'ত নিবারণ,
এ মৃত্যু মরণাধিক, চিররাত্রি-সমাবৃত রবি,
পঙ্কিল পল্বলে তাই কীটজন্মে করি বিচরণ।

চিরান্ধ মৃত্যুর পথে অনন্ত জীবন-দীপাবলী
যুগে যুগে জ্বলিয়াছে মুক্তিপুণ্য দেয়ালী উৎসবে,
কোন দূর ভবিষ্যতে জীর্ণ শবাধার পায়ে দলি'
আমরা বাঁচিয়া রব মানুষের সকল গৌরবে?

মূক-বধিরদিগের শিক্ষা

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[৪]

ওষ্ঠ-পাঠ

বর্ণের মূল উচ্চারণ এবং ইহাদের শিক্ষা দিবার প্রণালী বলিবার আগে ওষ্ঠ-পাঠ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কথা বলিতে বাগযন্ত্রের অবস্থান ও গতির সমষ্টিকে লক্ষ্য করিয়া কথা বুঝিবার চেষ্টাকে ওষ্ঠ-পাঠ বলে। বাগযন্ত্র বলিতে কেবল ওষ্ঠদ্বয়কে বুঝায় না; জিহ্বা, দন্ত, তালু প্রভৃতিকেও বুঝায়। ওষ্ঠ-পাঠে কেবল ওষ্ঠদ্বয়ের গতি লক্ষ্য করিলে চলে না; কথা বলিতে মুখের যে সমস্ত ভাব হয়, তাহা দেখিতে হয়। এইজন্য কথা বুঝিবার এই প্রণালীকে ওষ্ঠ পাঠ না বলিয়া, কথা-পাঠ বলা অধিক যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ওষ্ঠ-পাঠ করিবার সময় ওষ্ঠদ্বয়ের গতি চোখে বেশী ধরা পড়ে বলিয়া এবং নামটি বহুদিন যাবত চলিয়া আসিতেছে বলিয়া, ওষ্ঠ-পাঠস্থলে কথা-পাঠ কেহ বলিতে চাহেন না।

কথা বলিতে বাগযন্ত্রের যে প্রচেষ্টা হয়, তাহার একটা ছবি মুখের উপরে পড়ে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, কথা বলিতে বাগযন্ত্রের গতি দেখিয়া বক্তার বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারা যায়। এই স্বীকৃত সত্যের উপর ওষ্ঠ-পাঠের ভিত্তি স্থাপিত।

ওষ্ঠ পাঠ করিবার সময় ওষ্ঠদ্বয় ও জিহ্বার অগ্রভাগের গতি খুব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগের গতি ভাল দেখা যায় না। প্রশ্ন হইতে পারে, যখন বাগযন্ত্রের সমস্ত প্রচেষ্টা সমানভাবে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ওষ্ঠ-পাঠ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে?

আমরা কথা শুনিবার সময়, কথার প্রত্যেকটি শব্দকে পৃথক ভাবে বিচার করিয়া শুনি না; সমস্ত শব্দগুলির সমষ্টিকে শুনি। ওষ্ঠ-পাঠ করিবার সময়ও বাগযন্ত্রের প্রচেষ্টাগুলি পৃথক ভাবে দেখিবার প্রয়োজন হয় না; উহাদের গতির সমষ্টিকে দেখিতে হয়। ওষ্ঠ পাঠ বাগযন্ত্রের স্থিতির উপর নির্ভর করে না; ইহা সম্পূর্ণভাবে বাগযন্ত্রের গতির উপর নির্ভর করে। "কয়লা" এই কথাটিকে ওষ্ঠ পাঠ করিয়া বুঝিবার সময়, এই কথাটির বর্ণগুলির মূল উচ্চারণ করিতে জিহ্বা ও ওষ্ঠ যে যে স্থান গ্রহণ করে, তাহা দেখা হয় না; জিহ্বা ও ওষ্ঠের স্থান হইতে স্থানান্তরে যে সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন গতি হয়, তাহা লক্ষ্য করা হয়। ইহাকে আর একভাবে বলা যাইতে পারে। ওষ্ঠ-পাঠ বর্ণের মূল উচ্চারণের উপর নির্ভর করে না; ইহা এককালে উচ্চারিত পদাংশের উপর এবং বড় বড় বাক্যের বাক্যাংশের উপর নির্ভর করে। বধির বর্ণের মূল উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, সম্পূর্ণ পদাংশ বা বাক্যাংশের উপর তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

পদের অংশগুলি ও বাক্যের অংশগুলির মধ্যে কয়েকটির উপর, কথা বলিবার সময়, অপেক্ষাকৃত জোর দেওয়া হয়। কথা শুনিবার সময়, এই অপেক্ষাকৃত জোর দেওয়া পদাংশ ও বাক্যাংশগুলি আমাদের কানে বেশী বাজে এবং তাহার দ্বারাই আমরা সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি। ওষ্ঠ-পাঠেও কতকগুলি পদাংশ ও বাক্যাংশ চোখে বেশী স্পষ্ট ধরা পড়ে এবং তাহা দ্বারাই সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের দৈনিক জীবনে কতকগুলি পদ, বাক্যাংশ, এমন কি ছোট ছোট পূর্ণবাক্য আমরা ব্যবহার করি। প্রত্যহ অভ্যাসের ফলে, ইহাদের অতি সূক্ষ্ম, পৃথক পৃথক, বাগযন্ত্রের বিভিন্ন গতি জনিত সম্পূর্ণ চেহারা মুখের উপরে ধরা পড়ে। 'তুমি কেমন আছ?'—এই বাক্যটি বলিতে বাগযন্ত্রের গতি-জনিত মুখের উপরে যে ভাব হয়, তাহা এত বেশী বার দেখা যায় যে, এই বাক্যটি বলিতে মুখের মাংসপেশীর একটি সম্পূর্ণ ছবি চোখে লাগিয়া থাকে; কাজেই এইরূপ সর্বদা ব্যবহৃত বাক্যগুলি সম্পূর্ণভাবে বলিতে না বলিতেই চোখে ধরা পড়িয়া যায়। এই কারণে অতি দ্রুত কথাও ওষ্ঠ-পাঠ করিয়া বুঝিতে অসুবিধা হয় না। যদি কথিত ভাষার প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ-স্থল দেখার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে বধিরের পক্ষে ওষ্ঠ পাঠদ্বারা অপরের কথা বুঝিতে পারা অসম্ভব হইত।

ভাষার দখলের উপরও ভাল ওষ্ঠ-পাঠ অনেকটা নির্ভর করে। যাহার ভাষার উপর দখল ভাল হয় নাই, সে কখনও ভাল ওষ্ঠ-পাঠ করিতে পারে না। অর্দ্ধেকটা বুঝিতে পারিলে, বাকীটা ভাষা-জ্ঞানের সাহায্যে পূর্ণ করিয়া লইতে হয়। এই জন্য দেখা যায় যে, কি বিষয়ে ও কি ভাবে বলা হইতেছে বুঝিতে পারিলে, একজন শিক্ষিত বধির দীর্ঘ কাহিনীও অতি সহজে বুঝিতে পারে; অথচ হয়ত সে একটা হঠাৎ খাপ-ছাড়া কথা বুঝিতে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইতে পারে।

অনেক কথা আছে, যাহাদের উচ্চারণ চোখে প্রায় এক রকম দেখায়। ইহাদিগকে আমি 'সমদৃষ্ট পদ' বলিলাম। 'আতা, আদা,'—কেবল চোখ দিয়া দেখিয়া ইহাদের উচ্চারণ-পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। প্রথম শ্রেণীতে যখন ওষ্ঠ-পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন বধির শিশু 'আতা' স্থলে 'আদা' দেখাইলে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীতে যখন ভাষাশিক্ষা আরম্ভ হয়, তখন যদি সে 'আতা খাইতে মিষ্টি' স্থলে 'আদা খাইতে মিষ্টি' বোঝে, তাহা গ্রহণ করা হয় না। কারণ ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে কোথায় 'আতা' বলা হইতেছে এবং কোথায় 'আদা' বলা হইতেছে, তাহা তাহার বুঝিতে পারা উচিত। যাহারা খুব ভাল ওষ্ঠ-পাঠ করিতে পারে, তাহারা কণ্ঠমূল দেখিয়াই অনেক সময় বুঝিতে পারে, কোন্ উচ্চারণটি স্বরহীন, কোনটি স্বরযুক্ত। এইরূপ সমদৃষ্ট পদ লইয়া নানা প্রকার বাক্যের

ভিতর দিয়া অনুশীলনীর ফলে, প্রথমতঃ যাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহাও পরে সম্ভবপর হইয়া উঠে।

ওষ্ঠ-পাঠ শিক্ষা দেওয়া এবং কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া ঠিক এক জিনিষ নয়। মূক বধির শিশুকে ভাল কথা বলিতে শিক্ষা দেওয়া অনেকটা সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষকের শিক্ষা দিবার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে পড়িলে, প্রায় অধিকাংশ ছেলেই পরিষ্কার করিয়া কথা বলিতে শিখিতে পারে। যে সব ছেলেদের কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও বুঝিতে কষ্ট হয়, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের অনভিজ্ঞতা বা পরিশ্রম কাতরতা ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু ভাল ওষ্ঠ পাঠ করিতে পারা অনেকটা ছেলের নিজের চেষ্টা ও শক্তির উপর নির্ভর করে। শিক্ষক মহাশয় কেবল নানা প্রকার অনুশীলনী দিয়া, তাহাকে ওষ্ঠ পাঠ করিতে হইলে কি ভাবে করা উচিত, তাহা দেখাইয়া দিতে পারেন। অবশ্য তাঁহার নিজের কার্য্য সম্বন্ধে যদি তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কোন ছেলেকেই কোন বিষয়ে সুশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।

কোন কোন ছেলের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে সব জিনিষকেই খুঁটিনাটি করিয়া দেখা। তাহারা ওষ্ঠ-পাঠ করিবার সময়ও কথার প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ-স্থল দেখিতে চেষ্টা করে। কাজেই তাহারা তাড়াতাড়ি কথিত ভাষার অনুসরণ করিতে পারে না। ইহারা কোনদিনই ভাল ওষ্ঠ-পাঠ করিতে পারে না। কথা বলিবার সময়, ইহাদের সহিত অতি ধীরে কথা বলিতে হয় এবং দীর্ঘ বাক্যকে বাক্যাংশে ভাগ করিয়া, আলাদা আলাদা করিয়া বলিতে হয়; বাক্যটিকে বুঝাইবার জন্য বহুবার পুনরাবৃত্তি করিতেও হয়।

আবার কোন কোন ছেলের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেছে সব জিনিষকেই মোটামুটি সমষ্টিবদ্ধ ভাবে দেখা। ইহারা ওষ্ঠ-পাঠ করিবার সময় প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ-স্থল দেখিবার চেষ্টা না করিয়া, বাগযন্ত্রের গতির সমষ্টিকে দেখিবার চেষ্টা করে। ইহারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, অতি দ্রুত কথিত ভাষাও সহজে বুঝিতে পারে। ওষ্ঠ-পাঠ ইহাদের কাছে খুব কষ্টকর কাজ বলিয়া মনে হয় না; আমোদ পায় বলিয়া, ইহারা সর্ব্বদাই সকলের ওষ্ঠ-পাঠ করিতে চেষ্টা করে।

ওষ্ঠ-পাঠ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত বটে, তথাপি শ্রবণের স্থান সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। কাণে শুনিয়া কথা বুঝিতে বক্তার ব্যক্তিত্ব বিশেষ বাধা দেয় না। বক্তা যতই দ্রুত, যতই অপরিষ্কার ও ভুল উচ্চারণ করিয়া কথা বলুন না কেন, তাঁহার কথা বুঝিতে কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু একেবারে অবোধ্য হইবে না। ওষ্ঠ-পাঠের বেলায় ইহা খাটে না। ওষ্ঠ-পাঠ করিতে পারা, না পারা, বক্তার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। অনেকে এত দ্রুত, এত অপরিষ্কার করিয়া কথা বলেন যে, তাঁহাদের কথা ওষ্ঠ-পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বধিরদের সহিত কথা বলিতে হইলে "বড় বড় হাঁ" করিয়া কথা বলিতে হইবে,—এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য অনেকে কথা বলিবার সময় অত্যন্ত মুখ বিকৃতি করেন। ইহাঁদের কথা ওষ্ঠ-পাঠ দ্বারা বুঝা অসম্ভব। স্বাভাবিক উচ্চারণ ও স্বাভাবিক গতিতে কথা বলিলে, ওষ্ঠ-পাঠ করা সহজসাধ্য হয়।

বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ রীতিমত ওষ্ঠ-পাঠের অনুশীলনী দেওয়া হয়।

আমরা আমাদের দৈনিক জীবনে যে সমস্ত জন্তু, গাছ-পালা, জিনিস দেখি, তাহাদের ছবি বা মডেল ক্লাসে আনা হয়। শিক্ষক একটি একটি করিয়া উহাদের নাম বলেন এবং জিনিষগুলির ছবি বা মডেল দেখান। ছাত্র শিক্ষকের মুখের দিকে তাকাইয়া, কথাগুলি বলিতে বাগযন্ত্রের যে গতি হয়, তাহার সহিত জিনিষগুলির সম্বন্ধ বুঝিতে শেখে। তাহার পর শিক্ষক নামগুলি উচ্চারণ করেন এবং ছাত্র তাঁহার ওষ্ঠ পাঠ করিয়া জিনিষগুলির ছবি বা মডেল দেখায়। সম্ভবপর হইলে, ছবি বা মডেল না আনিয়া, আসল জিনিষগুলিকে আনিলে ভাল হয়।

এইভাবে, "দাঁড়াও, লাফাও, হাততালি দাও, জানালা বন্ধ কর" প্রভৃতি ছোট ছোট আদেশগুলিও শেখানো হয়।

প্রথমে অতি সাধারণ জিনিষ ও আদেশ, একটি একটি করিয়া শেখানো হয়। কিছুদিন অভ্যাসের পর, শিক্ষক দুইটি, তিনটি, চারটি জিনিষের নাম, বা তিন চারটি আদেশ এক সঙ্গে করেন; ছাত্র বলিবার ধারা বজায় রাখিয়া সমস্ত জিনিষগুলির ছবি দেখায় এবং আদেশগুলি পালন করে।

শিশুর ভাষাশিক্ষার সহিত ওষ্ঠ-পাঠের অধিকতর জটিল অনুশীলনী দেওয়া হয়। ছোট ছোট বাক্যে তাহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় এবং কথিত ভাষায় সে তাহার উত্তর দেয়। সে যেরূপ ভাষা বোঝে সেই রকম ভাষায় ছোট ছোট গল্প তাহাকে বলা হয় এবং সেই গল্পের ভিতর হইতে যত রকম সম্ভব প্রশ্ন করা হয়। এতদিন ভাবের আদান-প্রদানের জন্য প্রায়ই ইসারার সাহায্য লওয়া প্রয়োজন হইত। কিন্তু সামান্য ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইসারা কমিয়া যায়; শিক্ষক সর্ব্বদাই ছাত্রের সহিত কথা বলেন, ছাত্র তাঁহার ওষ্ঠ-পাঠ করে এবং যাহা বলিবার তাহা কথিত ভাষায় বলে। দৈনিক জীবনের ভাষা বলিতে শেখার সঙ্গে ইসারা করা একদম বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

যখন শিক্ষক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তখন ছাত্রকে তাঁহার সহিত প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করিতে দেওয়া হয় না। কোন প্রশ্নের পুনরুক্তি করাকে Echolalia বলে। কেহ আমাদিগকে কোন প্রশ্ন করিলে, আমরা চুপ করিয়া শুনি এবং উত্তর দিই। বধির শিশুকেও চুপ করিয়া ওষ্ঠ-পাঠ করিয়া উত্তর দিতে হয়। শিক্ষকের সহিত প্রশ্নের পুনরুক্তি করা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। ইহাতে ভাল ওষ্ঠ-পাঠ শিক্ষা হয় না এবং মানসিক শক্তির বিকাশেও বাধা জন্মে। এই অভ্যাস একবার বদ্ধমূল হইয়া গেলে, পরে ছাড়ান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

কোন কথা যদি সে একবারে বুঝিতে না পারে, যতক্ষণ সে বুঝিতে না পারে ততক্ষণ কথাটি বারবার বলিতে হয়। তাড়াতাড়ি করিবার জন্য, কথাটিকে পদাংশে ভাগ করিয়া, আলাদা আলাদা ভাবে কিছুতেই বলা হয় না। কারণ, ইহাতে সমস্ত বাক্যকে সমষ্টিগতভাবে দেখিবার শক্তি তাহার হয় না। যদি একান্তই দরকার হয়, সম্পূর্ণ কথাটিকে লিখিয়া দেওয়া ভাল, তথাপি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বলা উচিত নয়।

মীরা

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

[৭]
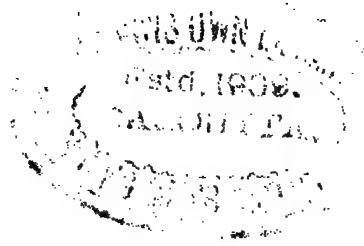
স্কুলে যাইবার পর হইতে, পানুর স্বভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইলেও, আগেকার সেই চঞ্চলতাটুকু একেবারে দূর হয় নাই। এখন আর বাগান উজাড় করিয়া ফুল তুলিয়া, আলমারীতে সাজানো মায়ের তোলা ফুলদানীগুলি বিনা-অনুমতিতে স্বহস্তে বাহির করিতে গিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করে না, কিম্বা টুলের উপর টুল তুলিয়া, দেয়ালের ছবিগুলি পরিষ্কার করিতে গিয়া, সেগুলিকে উল্টাইয়া ফেলিয়া, নিজেও ডিগবাজী খাইয়া পড়ে না, কিন্তু বই খাতা কাগজ কলম, বা গায়ের কাপড় চোপড়ও, যে কোথায় কোনটা কখন ফেলিয়া রাখে, হয়ত দুইদিন ধরিয়া ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতে করিতেও সেগুলির আর শীঘ্র খোঁজই মেলে না।

পড়িতে বসিবার জন্য এখন আর তাহাকে আগের মত খোসামোদ করিতে হয় না সত্য, কিন্তু পড়িতে বসিলেই আস্তে আস্তে কখন যে মনটা তাহার অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে, সে নিজেই তাহা বুঝিতে পারে না, কোন একটা বইএর একটি পাতাও যতক্ষণে সে শেষ করিতে পারে না, মীরার ততক্ষণে তিন চারিখানা বই শেষ হইয়া যায়। পড়িতে বসিলে মীরার সমস্ত চেতনা এমন ভাবে একত্রীভূত হইয়া তাহার বহির উপরে গিয়া পড়ে যে, বাহিরের সহস্র কোলাহল বা কোন কিছুর আকর্ষণই তাহাকে টানিতে পারে না। হঠাৎ পানুর দিকে চোখ পড়িলে, হাসিয়া বলে, ওকি পানু দা, কি ভাবছ, পড়।

পানু জানালার পথ দিয়া, যেন বহুদূর হইতে তাহার আবেশমাখা চক্ষুদুটির দৃষ্টি ফিরাইয়া আস্তে আস্তে বলে, মীরু, তুমি শুনতে পাচ্ছ না? কি সুন্দর বাজছে শুনতে পাচ্ছ না?

হাসিয়া মীরু কহে, কই, কি বাজছে, কি শুনব?

—ওই যে, বাঁশী গো বাঁশী, কি সুন্দর বাজছে, শুনতে পাচ্ছ না তুমি? কি অদ্ভুত তোমার কান!

এইবারে মীরা একটু চেষ্টা করিয়া একটু কান পাতিয়া শুনিল, বহুদূর হইতে কাহার বাঁশীর কোন্ একটা সুর অতি মৃদুভাবে এদিকে ভাসিয়া আসিতেছে। বাহিরের সহস্র কোলাহলের ভিতর দিয়া কানে তাহা ভাল করিয়া প্রবেশ করিতেও পায় না, কিন্তু একনিবিষ্ট পানু জগৎ সংসার, পড়া এবং সমস্ত কিছুই ভুলিয়া গিয়া তাহাই মন দিয়া শুনিতেছে। মীরা হাসিয়া কহে, "তা বাজছে ত বাজুক না, এমন কিই বা বাজছে যে এত মন দিয়ে শুনছ, আজ স্কুলে তোমাদের মান্থলী পরীক্ষা না? রেডী হয়েছ তার জন্যে? পানু সশব্দে বইএর পাতা বন্ধ করিয়া বলে, বাজে—বাজে—কি হবে এই সব বই পড়ে? পড়লেই যে লোকে জ্ঞানী হয়, আর তা না নইলে হয় না, আমি তা মানি না।

মীরা খিল খিল করিয়া হাসিতে থাকে, হাসিতে হাসিতেই কহে, পড়লে জ্ঞানী না হোক্, অন্ততঃ পাস করাটা হয় এবং আপাততঃ সেইটিই দরকার।

বন্ধ বইএর উপর হাত রাখিয়া পানু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, চোখে মুখে তার গভীর বিরক্তির ভাব। মীরা দুই এক লাইন পড়িয়া আবার পানুর দিকে মুখ তুলিয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, এক কাজ কর না পানু দা, স্কুল টুল গুলোকে বয়কট করে দেবার জন্য সব পিকেটিং আরম্ভ করে দাও না, তোমার জুড়িদার ছেলে তোমাদের ক্লাসে নিশ্চয়ই আরও আছে।

- হেসো না মীরু, জান, পৃথিবীতে যে কোন দুই জনেরই আকৃতি যেমন এক রকম কখনো হয় না, সেই রকম জীবনের উদ্দেশ্যও কখনও এক রকম হতে পারে না, অথচ আমাদের সবাইকে ছেলেবেলা থেকে একই ভাবে চালিয়ে চালিয়ে কত জনকে হয়ত সারাজীবনের জন্য একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়।

মীরা মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পানুর বক্তৃতা শুনিল, তাহার পর আবার হাসিতে লাগিল।

পানু রাগ করিয়া বলিল, হাসছ কি? না বুঝে সুঝে অমনি হাসলেই হল? মুখস্থ করবার শক্তিটা ভগবান দিয়েছিলেন, তাই বোঝ আর নাই বোঝ কতগুলো মুখস্থ করে' গিয়ে বিদ্যে ফলাও বই ত' নয়, গাদা গাদা বইএর চাপে জীবনটাকে নষ্ট করে দেওয়া বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়,

আমার জীবন আমি ও রকম করে নষ্ট করব না, কিছুতেই না।

হাসি থামাইয়া মীরা পান্নুর গলার স্বর অনুকরণ করিয়া কহিতে লাগিল, না, কিছুতেই না, তাহার পর গানের সুরে টান দিল, 'আমি করেছি এক ধনুর্ভঙ্গ পণ, পড়ব না বই পড়ব না।' পান্নু রাগ করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

এমনি করিয়া সরস্বতীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে করিতেই পান্নু সেকেণ্ড ক্লাস পার হইয়া অবশেষে ম্যাট্রিকে গিয়া উঠিল। এক সঙ্গে একই মাষ্টারের কাছে পড়িয়া, মীরা তাহার স্কুলে টিচারদের কাছে যে ভাবে আদর সম্মান ও বিপুল যশ উপার্জ্জন করিয়া চলিতেছিল, ঠিক সেই ভাবেই পান্নু পাইত তাহার স্কুলের শিক্ষকদের উপহাস বিদ্রূপ। মীরার স্কুলে টিচাররা নিজেরা চেয়ারে বসিয়া থাকিয়া, মীরাকে দিয়াই বোর্ডে নূতন নূতন অঙ্ক কসাইয়া, বা পড়ার বই হইতে নতুন নতুন ব্যাখ্যা শোনাইয়া, অন্য ছাত্রীদের বোঝাইয়া দিতেন।

টিচারদের আদরের পাত্রী হইয়া মীরা অবলীলাক্রমে আনন্দে তাহার ক্লাসের পড়া করিয়া যাইত। আর পান্নু,—বেচারা পান্নুকে শিক্ষকেরা কেহ ডাকিতেন কার্ত্তিক, কেহ শিমুল ফুল এবং সকলের চেয়ে অত্যন্ত মধুর ভাবে কেমন একটু সুর করিয়া পণ্ডিত মহাশয় ডাকিতেন পলাশচন্দ্র বাবু। অন্য শিক্ষকেরা প্রায়ই পান্নুকে পড়া দিবার জন্য ডাকিতেন না, কচিৎ কখনও ডাকিলেও এক-আধটু বিদ্রূপ করিয়াই ছাড়িয়া দিতেন, কিন্তু বেঁটেখাটো পণ্ডিত মহাশয়টি ক্লাসে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে পশ্চাতের বেঞ্চের পানে উঁকি মারিয়া চাহিয়া কহিতেন, কি হে পলাশচন্দ্র বাবু, পড়াশুনো কিছু হ'ল ? একটু দেখাবে টেখাবে ?

সপ্রতিভ পান্নালাল তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া কহিত, আজ্ঞে না।

ক্ষণকাল তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া পণ্ডিত মহাশয় কহিতেন, বেঁচে থাক বাবা, বিদ্যের আর দরকার কি, যে চেহারাখানি আছে, তাতেই দিক জয় করে যাবে—

—ওরে রেধো, তোর বাপু বিদ্যের দরকার আছে, নিয়ে আয় দিকি উপক্রমণিকা, কতটা মুখস্থ হয়েছে দেখি, আজ।

কালো কুৎসিত রেধোর চেহারাখানি লইয়া এই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গটুকুতে, রেধো অপমান বোধ করিত, এবং অন্য ছেলেরা হাসিয়া উঠিত। তাহার পর যতক্ষণ ধরিয়া ছেলেরা, অনর্গল ভাবে উপক্রমণিকার ছয় সাত পাতা একেবারে মুখস্থ বলিতে থাকিত এবং একখানি পাখা হাতে লইয়া পণ্ডিত মহাশয়, চক্ষুদুটি মুদিয়া চেয়ারের উপর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পান্নু পশ্চাতের বেঞ্চে বসিয়া, নিবিষ্টমনে তাহার অসমাপ্ত রচনা 'ইটালীর মুসোলিনী' লিখিয়া যাইত। মীরার ভাষায়, পান্নুর 'জুড়িদার' ছেলে ক্লাসে আরও দু'চারটি ছিল, রচনাটি তাহারাই বুঝিত, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে নির্ভুল মুখস্থকারী ভাল ভাল ছেলেরা রচনাটির নামটি দেখিয়াই সসঙ্কোচে খাতাখানি সরাইয়া রাখিয়া দিত। পান্নুর এখনও মনে করিয়া হাসি পায়, একদিন তাহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি দেখিয়া, এই সব ভাল ছেলেদের একজন কহিয়াছিল, নাম শুনেছি ভাই, কিন্তু এখনও ওঁর লেখা পড়িনি কিছু। পান্নু কহিয়াছিল, তা কেন পড়বে, 'রামস্য' 'রামভ্য' মুখস্থ কর গে।

—সত্যি ভাই, ক্লাসের এত পড়া পড়ে বাইরের কিছু পড়তে সময় পাই না, বাবা বলেছিলেন 'জর্জ্জ ওয়াশিংটন'টা পড়তে, পরীক্ষার সময় দরকার হতে পারে, তাও ভাই সময় পাই নি।

—তা সময় পাবে কেন, খালি বই মুখস্থ কর,—তা হলেই হয়ে যাবে—

ছেলেটি দুঃখিত হইয়া বলিত, আমরা ত ভাই তোমার মত সবাই জমিদারের ছেলে নই, আমাদের কেরাণী হতেই হবে, আর এ দেশে যখন বিদ্যা না থাকলে ঐ কেরাণীগিরিটুকুও জোটে না, তখন আমাদের মুখস্থ করে বিদ্যাও লাভ করতে হবে ভাই।

—ভুল তোদের, কতগুলো বাঁধা গৎ পড়ে পড়ে বা মুখস্থ করে কেউ বিদ্বান হতে পারে না, বিদ্বান হতে হলে অন্য রকম চেষ্টাও চাই, বিদেশের ছেলেদের কথা কিছু জানিস ? কি করে জানবি তোরা, খবর ত আর রাখিস না কিছুর ! তারা সবাই আমাদের মত, একটার পর একটা, কেবল পাস করে যাবার চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে না, তাই বলে ওদের দেশে বিদ্বান নাই, না ? এই যে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড, হিটলার, মুসোলিনী এক কথায় যারা সারা পৃথিবীটাকেই শাসন করে' চলছে, তারা ক'টা করে স্কুল কলেজের পরীক্ষা

পাশ করেছে, বল ত' ? খালি মুখস্ত করে' করে' পাশ করে গেলেই হয় না ভাই, জ্ঞান অন্য রকমেও লাভ করা যায়। আর কেরাণীগিরিই করতে হবে, এই দাস-মনোবৃত্তিতেই ত' গোলাম আমরা। আর, ভাই, জমিদারের ছেলে বলে ত' বড্ডো খোঁচা দিলি, কিন্তু দেখিস, জানতঃ আমি পেটের ভাত কাপড়ের জন্য, বাপের একটি পয়সাও ছোঁব না কখনো, নিজে রোজগার করে খাব, কিন্তু কেরাণীগিরিও ক'রব না।

ছেলেটি দুঃখিত হইয়া বলিল, বলা সহজ ভাই, সেও তুমি জমিদারের ছেলে বলেই বলতে পারছ, নিজের জন্য না হয় বাপের টাকা নাই নিলে ভাই, কিন্তু বাপমাকে খাওয়াবার জন্যই যখন টাকার দরকার হয়, তখন সম্মুখের ঐ কেরাণী-গিরিটাই আমাদের চোখে পড়ে ভাই, নিজে না হয়, না খেয়ে উপোস করেই রইলাম, কিন্তু, বাপ মা ভাই বোন যখন, দুমুঠো ভাতের জন্য, আমার দিকেই তাকিয়ে থাকবে, তখন ও রকম গর্ব্ব করা, গরীবদের চলে না ভাই, তখন চোখে সর্ষেফুল দেখতে হয়, গরীবের সংসারে জন্মে, এখন থেকেই বুঝতে হচ্ছে, গরীবের কত দুঃখ, তুমি কি জানবে ভাই।

ইহার পর পান্নুর আর বলিবার কিছু রহিল না, সত্যই ত' এ গরীব দেশে, কেরাণীগিরিতে সম্মানলাভ না হোক, আভিজাত্য-গৌরব যত হীনতরই হইতে থাক, অন্ততঃ দুবেলা দুমুঠো ভাত ত' খাওয়া যায়! কিন্তু এ কেরাণীগিরিই বা জোটে কোথায় অত?—ছেলেটি একটু থামিয়া, মুখখানা আরও একটু ম্লান করিয়া কহিল,—আমাদের দুঃখ,—আমাদের মানে, আমি গরীবদের কথা বলছি, তুমি কি করে জানবে ভাই, স্কুলের এক মাসের মাইনে দিয়ে, আর এক মাসের যে কোত্থেকে জুটবে, তখন থেকেই তা ভাবতে থাকি, মাইনে দেবার সময় হলে, একবার যাই মার কাছে, একবার যাই বাবার কাছে,—মাসের পয়লা থেকেই পাওনাদারদের কাছ থেকে, তাড়া পেয়ে পেয়ে তাঁদের মুখের ভাব যা' হয়ে থাকে, মাইনে চাইতে আর সাহস হয় না ভাই, এদিকে স্কুলের কেরাণী ভবেনবাবু, প্রতিদিন খোঁচা দিয়ে যে ভাবে মাইনে চাইতে থাকেন, সে আর বলবার নয়, মনে হয় কি জান পান্নালাল? মনে হয় আর পড়ে কাজ নেই, এখনই যদি একটা ২০৲।২৫৲ টাকার চাকরী পেয়ে যেতাম, তা হলে, বাবার ৬০৲ মাইনের সঙ্গে যোগ দিয়ে আরও কিছু বাড়ত ত'—কিন্তু এখন কে আমায় চাকরী দেবে, তাই মুখস্ত করেই হোক, বা যে করেই হোক, পাস করাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা টাকা চাই ভাই, বাপ মা ভাই বোনকে খেতে দিতে চাই, জ্ঞান চাইবার অবসর আমাদের কই?

সেদিন পান্নুর হঠাৎ যেন একটা স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেল, হঠাৎ মনে হইল, স্কুলে আসিয়া যে সে এত লাফালাফি করে, এত হাসে, ছেলেদের সঙ্গে এত রহস্যালাপ করে, এটা বোধ হয় উচিত হয় না, এইসব ছেলেরা, মনের মধ্যে যাহারা এখন হইতেই এত অভাবের দুঃখ পুষিয়া রাখিয়াছে, তাহারা মন খুলিয়া তাহার এ হাসিতে যোগ দিতে পারে কি? সে যখন টিফিন খায়, কতক কাককে, পাখীকে দিয়া, কতক দরোয়ানের বিড়ালটাকে দিয়া চারিধারে ছড়াইয়া ফেলে, এই সব ছেলেরা হয়ত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পাঠের ক্লান্তির পর, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সেদিকে তাকাইয়া সরিয়া যায়। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাইত' কত ছেলেকেই ত' সে স্কুলে টিফিন খাইতে দেখে না, হয়ত দুই বেলার দুই মুঠো ভাতই ইহাদের কত কষ্টে জোটে,—তা আবার টিফিন! ফ্লাস্ক হইতে ঢালিয়া সে যখন গরম চা খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে থাকে, তখন ইহারা স্কুলের কল খুলিয়া অঞ্জলি পুরিয়া জল পান করে, স্বচক্ষে সে কতদিনই ত' ইহা দেখিয়াছে, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান ত' কখনো করে নাই। আজ তাহারই সমবয়সী একটি ছেলের মুখে এসব শুনিয়া ধীরে ধীরে কত কথাই মনে হইতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে, গাড়ী হইতে পথের কোলাহলময় জনতার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া সত্যই তাহার আজ প্রথম মনে হইল, হেলা-ফেলা করিয়া কাটাইবার জন্য এ জীবন নয়, জীবন দায়িত্বপূর্ণ। ওইটুকু ছেলে এখন হইতেই বাপমার জন্য ভাবিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু তাহার ত' বাপমার জন্য ভাবিবার প্রয়োজন নাই, সে ভাবিবে কাহার জন্য?

[৮]

নানা কারণে দুই তিনবার পিছাইয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষার তারিখ সেবারে চৈত্রের শেষের দিকে পড়িয়া গেল। অসহ্য গরমে পরীক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এক সঙ্গে হইয়া গেলে এক রকম হইয়া যায়, কিন্তু বাধা পড়িয়া পড়িয়া মনটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল বেশি, না হয় ভাল করিয়া খাওয়া—না হয় পড়া, এ যেন কি একটা ভীষণ দুর্ব্বিষহ চাপে, দিন রাত কাটে।

অবশেষে সত্যই একদিন পরীক্ষার দিন আসিয়া পড়িল।

পরীক্ষার আগের দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বইগুলি নাড়া-চাড়া করিয়া, পান্নু মীরার শয়নকক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে ডাকিল, মীরু—

—কে? পান্নু দা? এস, দোর ভেজানই আছে।

মীরা জাগিয়া টেবিলের কাছেই বসিয়া ছিল, পরীক্ষার ভাবনা বড় ভাবনা, এই রাতটুকুই যা সময়, আজ রাতে কি আর ঘুম আসে? পড়াও হয় না, ঘুমানোও চলে না।

স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে মীরা কহিল, কি চাই পান্নু দা?

—চাই নে কিছু, শুধু দেখতে এলাম—

মীরা হাসিয়া কহিল, দেখতে? পাগল, দেখা কি সারা-দিনে আজ হয়নি নাকি?

পান্নু কহিল, তবু এলাম, আজকের পর থেকেই ত' এ

দেখা অন্য ভাবে হবে। আজও আমরা সমান আছি, তারপর তুমি কত উঁচুতে, আর আমি কো-থা-য়—

মীরা অন্তরে অন্তরে পূর্ণ সহানুভূতি অনুভব করিয়া, প্রকাশ্যে হাসিয়া কহিল, পাগল! কি যে বলে তার ঠিক নেই। আজও সমান আছি, কাল আর থাকব না, তার মানে? কাল কি হঠাৎ আমি আরো হাত তিনেক লম্বা হয়ে উঠব নাকি?

পানু মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিল, সত্যি মীরু অনেক চেষ্টাই করলাম শেষটায়, কিন্তু কিচ্ছু হল না, ভেবে দেখলাম, পাস হওয়াটা আর এ কপালে নেই, তুমি এবারে পাস করবে, তারপরে আই-এ পড়বে, বি-এ পড়বে, হয়ত বা বিলেতেও যাবে, আর আমি? আমি মীরু, তোমার কত তলায় পড়ে থাকব—

—এখন থেকেই অত নিরাশ তুমি কেন হচ্ছ পানু দা, আর আমি যে পাস করবই, তাই বা কে জানে!

পানু হাসিল—কতক্ষণ কাটিয়া গেল—

মীরা করুণ সুরে কহিল, রাত হয়ে যাচ্ছে, কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে, ঘুমোও গে পানু দা'।

পানু একবার যেন কিছু বলিতে চাহিল, একবার একটু মাথাটি তুলিয়া আবার নত করিল, তারপর উঠিয়া, ধীরে ধীরে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মীরা চেয়ারে বসিয়াই ছিল, কহিল, পানু দা কি কিছু বলবে?

পানু সরিয়া আসিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইল, একটা বই তুলিয়া, পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, যদি এরপরে আর কখনো দেখা আমাদের না হয় মীরু।

মীরা তিরস্কার করিয়া কহিল, কি যে আজ তোমার হয়েছে পানু দা, মাথার তোমার ঠিক নেই।

—ঠিক নেই সত্যি, কিন্তু মীরু তোমার পানু দাকে, ভাই, ভুলে যেয়ো না।

—কেন এমন করে বলছ পানু দা, একবার ফেল হলে কি মানুষ পড়ে না?

—পড়বে না কেন? কিন্তু আমি আর পড়ব না।

—পড়বে না? কি করবে? কোথা যাবে?

—কি করব, কোথা যাব জানি না, হয়ত কলকাতাতেই থাকব, কিন্তু এ বাড়ীতে আর নয়।

মিনিট কয়েক চুপচাপ কাটিয়া গেল, তারপর হঠাৎ মীরা মৃদুস্বরে কহিল, জানি পানু দা, কেন তুমি আর এ বাড়াতে থাকবে না? একসঙ্গে দু'জনে পড়তুম তারপর আমি হঠাৎ পাসটাস করে'—অন্ততঃ তোমার মনের এই ধারণা,—খানিকটা এগিয়ে যাব, আর তুমি ফেল যদি হওই,—তাই আর এ বাড়ী থাকবে না, কেমন তাই না? কিন্তু সত্যি যদি পানু দা, সত্যি যদি তাইই হয়, তবু তুমি কি করে মনে করবে যে আমি ভুলে যাব?

পানু চুপ করিয়া রহিল।

—যাও পানু দা, রাত সত্যি কিছু কম হয় নি, ঘুমোও গে যাও।

পানু দ্বারের পানে অগ্রসর হইতেই, মীরা উঠিয়া আসিয়া ধীর কণ্ঠে কহিল, কে জানে বলা ত' যায় না,—তবে কখন কোথায় গিয়ে কে পড়ি, যদিই বা ভুলে যেতে হয়,—তার চেয়ে পানু দা, এই এইটেতেই আমার চিহ্ন তুমি রেখো,—মীরা ধীর শান্ত ভাবে, আঙ্গুল হইতে জন্মদিনে পাওয়া নতুন আংটীটি খুলিয়া ধীরে ধীরে আনতনেত্রে পানুর আঙুলে পরাইয়া দিল।

পানু চমকিয়া বলিয়া উঠিল, একি করলে মীরা?

সহজ স্বাভাবিক স্বরে মীরা কহিল, কেন কি করেছি?

—বকুনি খাবে যে, এ তোমার জন্মদিনের আংটী।

মৃদু হাসিয়া মীরা কহিল, হ'লই বা জন্মদিনের, একটা বিশেষ দিনের বলেই ত' দিলাম, বিশেষ ভাবেই মনে থাকবে, তা ছাড়া বকুনী আমি খাই কখনো দেখেছ?

পানু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মন তাহার এমনিতেই খারাপ, এখন যেন চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চাহে—মীরা আবার হাসিয়া কহিল,—কেন ভাবছ পানু দা, এমনি একটা যা' তা' ত' দিতে পারতাম, কিন্তু তার কি আর দাম হ'ত? আমার জন্মদিনের বলে, আমার অত আদরের বলেই, তোমার চিরকাল এটাকে মনে থাকবে,—যাও পানু দা, ঘুমোও গে, রাত যে ফুরিয়ে এল ভাই।

—আমি তোমায় কি দেব মীরু? আমার ত' কিছু নেই।

মীরা হাসিয়া কহিল, পাগল, তুমি আবার কি দেবে? কিছু না পানু দা, কিচ্ছু না,—আমাদের মেয়েদের এমনিতেই মনে

থাকে, তোমরা ছেলেরা কিনা, তোমাদেরই তাই দরকার। শোন একটা কথা পান্নু দা, আমি যদি পড়ায় আর একটু মন্দ হতুম ত' বেশ হত, না? আমারও ভাই এক একবার তাই মনে হয়, ও কি, কি হয়েছে পান্নু দা? অমন করছ কেন? মাথা ঘুরছে?

দণ্ডায়মান পান্নু চেয়ারের একটা হাতল ধরিয়া হঠাৎ চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তাহার বিশুষ্ক মুখ, উস্কোখুস্কো চুলের পানে তাকাইয়া মীরা কহিল, যাও, আর বসে থেক না, চোখ মুখ ধুয়ে, মাথাটাও একটু ধুয়ে নিয়ো বরঞ্চ। তারপর ঘুমিয়ে পড় গে যাও।

পান্নু বাহিরে আসিলে, সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া, মুহূর্ত্তকাল মীরা সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, টেবিলের উপরটা চারপাশে ছড়ানো বহিতে এলোমেলো হইয়া আছে, সেগুলি গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তারপর কুঁজো হইতে ঢালিয়া এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়া, আলো নিবাইয়া দিয়া, জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে রাস্তায় লোকজন কেহ নাই, কেবল দুই একটা ছ্যাকড়া গাড়ী খানিক বাদে বাদে, যেন নিদ্রাতুর অবশ চোখেই কোন মতে রাস্তা পার হইয়া চলিয়াছে, আর ঊর্দ্ধে, অসীম গাঢ় কৃষ্ণ আকাশে, তারাগুলি যেন নীল ভেল-ভেটের উপর চুম্‌কির ন্যায় জ্বলিতেছে। খানিকক্ষণ শান্ত ভাবে ঘরের নিবিড় অন্ধকারে জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, মীরা আর এক গেলাস ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া, মুখ চোখ ধুইয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

আর পান্নু? বেচারা পান্নু, সমস্ত বৎসর যে বহির পাতায় চক্ষু মেলিয়া তাকায় নাই, আজ টেবিলের উপর সমস্ত বহিগুলির পাতা খুলিয়া রাখিয়া সে একবার একখানিতে আর একবার আর একখানিতে চক্ষু বুলাইয়া চলিল। তারপর রাত্রিশেষে ক্লান্তি যখন অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন টেবিলের উপরের স্তূপীকৃত বইএর ভিতর হইতে বাঁশীটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া পান্নু ছাদে উঠিয়া গেল।

[৯]

সকাল বেলা চা পানান্তে মীরা ডাকিল, পান্নু দা, এস একসঙ্গে পড়ি,—

পান্নু বহিগুলি সামনে লইয়া চেয়ারে বসিয়া ছিল, মৃদু হাসিয়া কহিল, কি আর পড়ব, মরণকালে হরিনাম!

—তাই করতে হয়! এস না বইগুলো একবার করে পাতা উল্‌টিয়ে দেখে নিই গে। পান্নু উঠিয়া আসিল, মীরা একটা বই টানিয়া, তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, পান্নু দা কাল ঘুম হয়েছিল?

—হয়েছিল।

—আচ্ছা, পান্নু দা। এই বইটার কোন কোনগুলো 'ইম্পরটেণ্ট' তা মনে আছে ত? মাষ্টার মশাই কিন্তু অনেকবার করে ও-গুলো আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পান্নু ম্লান হাসিয়া বলিল, কি জানি ভাই, এতদিন পর্য্যন্ত ত' সব মনে ছিল, কিন্তু এখন যেন সব গুলিয়ে গেছে।

মীরা একটা খাতা খুলিয়া পান্নুর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, এইটেতে কতকগুলো নোট করা রয়েছে চট্ করে একবার চোখ বুলিয়ে নাও।

পান্নু খাতাটা সম্মুখে টানিয়া লইল, মীরা আর একখানা বই খুলিতে খুলিতে কহিল, কাল শেষরাত্রে বাঁশী শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল,—উঠে ঘড়াতে দেখলাম চারটে। তুমি শুনেছিলে?

পান্নু সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, কোন্ গানটা শুনলে?

—মনে হ'ল যেন—"ঝড় এসেছে, ওরে ওরে ঝড় এসেছে ঝড়কে পেলেম সাথী"—

মা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, উঠে আয় দিকি পান্নু, আজ আর পড়তে হবে না, কাল সারারাত আলো জ্বেলে পড়া হল, আবার এক্ষুনি বই নিয়ে বসেছিস্, মাথা গরম হবে যে। উঠে আয় দিকি, স্নান করে' খেয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে থাক্।

মীরা অবাক হইয়া কহিল, কাল সারারাত পান্নু দা পড়েছে নাকি? ঘুমোয় নি?

মীরার মা ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন, না, সাধে কি আর আমি বকি? সারা বছরটি কেবল মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়ে আর মিটিং মিটিং করে', আর সাইকেল নিয়ে ঘুরেই দিন কাটালে, এখন এই একবেলা আর দু' বেলাতে কি বছরের পড়া হয় কখনো? উঠে আয়। মীরু, চুল শুকুলে

চুলটা আগে বেঁধে নে মা, এরপরে আর সময় হবে না, আমি তোদের ভাত দিতে বলি গে।

মা চলিয়া গেলেন, মীরা গম্ভীর স্বরে বলিল, অন্যায় করেছ পান্নু দা, কাল সারারাত জাগলে, আজ সারাদিন জেগে বসে লিখতে পারবে তুমি?

পান্নু চুপ করিয়া রহিল।

মীরা কহিল, সারারাত আলোর কাছে জেগে বসে রইলে, পড়েছ যে কত তা'ত আমি জানিই, শেষ রাতটা আবার ছাদে বসে বাঁশী বাজালে, তাহলে আর ঘুমোলে কখন? কি যে হবে তোমার, জানিনে পান্নু দা।

ভিতর হইতে মা ডাকিলেন, পান্নু, মীরু,—উভয়ে উঠিয়া গেল। বেলা নয়টার সময় বাড়ীর গাড়ী তৈরি হইয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মীরা কলম পেন্সিলগুলি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া পান্নুর ঘরে ঢুকিল।

আয়সির সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান্নু তখন চুল আঁচড়াইতেছিল, আরসিতে আর একখানি মুখ দেখিয়া, ফিরিয়া চাহিয়া মৃদু হাসিল; মীরা কহিল, এস পান্নু দা, গাড়ী এসেছে। তারপর আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, ভয় পেয়ো না পান্নু দা, একটুও ঘাবড়িও না, বুঝলে?

মা আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইলেন, উভয়ে বাহির হইয়া, মাকে প্রণাম করিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল, মা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন।

গাড়ীতে উভয়ে নীরবেই চলিল, মিনিট কয়েক কাটিয়া গেলে, সম্মুখে বেথুন কলেজের বিশাল অট্টালিকা চোখে পড়িতেই, উভয়েই উভয়ের পানে তাকাইল; এইবারে মীরাকে নামিতে হইবে। তারপরে পান্নুর রাস্তা আরো কতখানি,—যেটুকু সাহস লইয়া পান্নু বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, এবারে যেন সহসা তাহা কর্পূরের মত উবিয়া গেল, মীরা হাসিয়া পান্নুর হাতখানি তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, উঃ এত ঠাণ্ডা কেন?

গাছপালা ঘেরা, বেথুনের প্রকাণ্ড রাস্তার মধ্যে, গাড়ীখানি ঢুকিয়া, মিনিটখানেক ঘুরিয়া থামিয়া পড়িল। মীরা কহিল, চললুম তবে পান্নু দা,—আবার সেই পাঁচটা।

তারপর চার চারটা দিন, দীর্ঘ চারটা দিন কি ভাবে পান্নুর কাটিল, পান্নু নিজেও তা বুঝিল না; কোন মতে যেন নেশার ঘোরে, মাতালের মত পরীক্ষাটা শেষ করিয়া, পরদিনই পান্নু তাহার সেই কোন্ কালের চেনা, কোন্ কালের দেখা, কোন্ সেই বাঙ্গালা পল্লীর উদ্দেশে রওনা হইয়া গেল, কোন বাধা বিপত্তি, কারো কোন আপত্তি বা কোনও কিছুই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, শ্রীমতী মীরা বোস স্কলারসিপ এবং উচ্চ সম্মানসহ, সমগ্র ইউনিভারসিটির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পাস করিয়াছে এবং বহু খোঁজাখুঁজির পর শ্রীমান পান্নালাল মিত্রের নাম তৃতীয় বিভাগে সমস্ত নামের পিছনে পাওয়া গেল।

[১০]

পুকুরটির নাম আয়নাদীঘি, স্বচ্ছ শীতল জল দিনরাত তাহাতে টলটল করিতেছে। তাহারই একপাশে জমিদার-বাটীর অন্দরমহল, একপাশে লাইন করিয়া কতকগুলি কাছারী ঘর এবং অন্য দু'পাশ ব্যাপিয়া, নানা রকমের দেশী ফুলে সাজানো সুন্দর একটি বাগান, বাগানটির মাঝখানে আধুনিক প্যাটার্ণে গঠিত, দ্বিতল একখানি গৃহ। দ্বিতলের গৃহখানি বহুমূল্য চেয়ার টেবিল এবং নানাপ্রকার দেশী বিদেশী মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত। জেলার বড় কর্ম্মচারীরা, কখনোও সরকারী কাজে কখনোও শিকারের উদ্দেশ্যে প্রায়ই এখানে আসিয়া থাকেন এবং তখন জমিদার বাবুর অতিথিরূপে এই গৃহখানিতেই তাঁহারা বাস করেন ও গৃহসংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ বারাণ্ডাটিতে নানা দেশী নানা ফুলে সজ্জিত টবগুলির মাঝে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া, নীচে বাগানের ও লাল শাপলায় ভরা আয়নাদীঘির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পানে তাকাইয়া থাকেন।

এই গৃহেরই নীচের তলায় ফরাসঢাকা সুপ্রশস্ত কক্ষখানি জমিদার বাবুর নিজের বৈঠকখানা গৃহ, বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধব লইয়া এই ঘরে বসিয়াই তিনি গল্পগুজব করিয়া থাকেন। ঘরখানির জানালায় দরজায় খদ্দরের নূতন ফ্যাসানের পর্দ্দা, চুনকামকরা শুভ্র দেয়ালখানি জমিদারপত্নী নির্ম্মলার স্বহস্ত-নির্ম্মিত মাছের আঁশে তৈরি নানারকম ফুলদানী, ফুলের তোড়ায় শোভিত; তাহা ছাড়া সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ, রাণী মেরী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, তরুণ বয়সে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি

বিখ্যাত লোকের কয়েকখানি বড় বড় ছবিও রহিয়াছে; মাঝখানিতে খানকয়েক চেয়ারে ঘেরা একখানি টেবিলও রহিয়াছে, মাঝে মাঝে রাত্রিতে বন্ধু-বান্ধবদের যখন আর আসিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তখন পত্নীর সঙ্গে এই খানে বসিয়া, সুরেন্দ্রনাথ আনন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়না-দীঘির সৌন্দর্য্যের পানে তাকাইয়া, পত্নীর মৃদু গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে সময় কাটাইয়া দেন।

কিন্তু সহসা এ সকলের অতি অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। মাস দুই আগে কোন মহাল হইতে প্রত্যা-বর্ত্তনের সময় সুরেন্দ্রনাথ এখানে আর একলা ফিরিলেন না, সঙ্গে তাঁহার দশ বারো জন শিষ্যসহ স্বামী মুক্তানন্দ আসিয়া এই গৃহটিতে বাস আরম্ভ করিলেন। মুণ্ডিত মস্তক, নবনীত কোমল অপূর্ব্ব সুন্দর গৌরবর্ণ দেহ, জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু দুটির কেমন একটা প্রবল আকর্ষণী শক্তি,—গ্রামবাসীরা তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল, তারপর দেখিতে দেখিতে, শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের প্রেমে যেমন 'নদে শান্তিপুর' ভাসিয়া গিয়াছিল, তেমনি করিয়া আরও দুই তিনটি গ্রামের সহিত এই গ্রাম-বাসীরা মুক্তানন্দের প্রেমে ভাসিয়া চলিল।

স্বামীজীর সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রথম দিন যখন অন্দরে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার পানে তাকাইয়া নির্ম্মলা চমকিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। চেহারার এমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তৈলহীন কেশ, পরিধেয় বস্ত্রাদি অসম্ভব রকম ময়লা, চক্ষুদুটি কেমন এক ভাবের রসে সজল হইয়াই আছে। ঘরে আসিতেই নির্ম্মলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেন্দ্র গায়ের চাদরটি তুলিয়া পত্নীর হাতে দিলেন, নির্ম্মলা একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, এত ময়লা হয়ে গিয়েছে, বাক্স ভরা এত চাদর কাপড় সঙ্গে দিয়েছি, বদলাও নি কেন? মধু, গোপাল, রমেশ সবগুলো চাকরই কি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল?

—থাক থাক, তাতে আর হয়েছে কি?

—নাই বা হবে কেন? এত ময়লা কাপড় জামা কোন্ কালে তুমি পরেছ? আগের দিন পরে' পরের দিন ফেলে রাখতে, আর আজ এই কুলীর মতন চেহারা হয়েছে; বলছ, থাক্ থাক্,—কেন? হয়েছে কি? চাকরগুলো ছিল কি করতে?

অতি নম্র এবং নিম্ন স্বরে সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, জামা-কাপড়গুলো ওদের সব দিতে হ'ল, স্বামীজীর শিষ্যদের, তাতেও কুলোল কই, আরও কিছু আছে নাকি? না থাকে ত' আজই দেওয়ানজীকে বল, তাড়াতাড়ি করে কিছু করে পাঠিয়ে দিতে, আজই কলকাতায় অর্ডার পাঠিয়ে দিন,—

নির্ম্মলা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন, 'ওঃ তাই? ওই গেরুয়াপরা ওই ভণ্ডটাই বুঝি হল স্বামীজী? আর ওই সাঙ্গপাঙ্গগুলো সব হল তার চেলা? তোমায়ও ভুলিয়েছে ভণ্ডটা তাহলে? কি সর্ব্বনাশ, আমি ত' ভাবতেও পারি নি কখনো, এমন হতে পারে বলে? তুমি নিজেই না এই সব ভণ্ডদের কত নিন্দে করতে। আর এখন—

সুরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়া কহিলেন, চুপ, চুপ, কাকে কি বলছ? উনি সে রকম নন, তুমি দেখনি তাই—কত বি-এ পাস, এম-এ পাস, শিক্ষিত লোক, কত ডেপুটী মুন্সেফ এঁর পায়ের নীচে এসে পড়ে' থাকে একটু উপদেশ পাবার জন্য—একবার গিয়ে দেখো, তখন ব'লো। নির্ম্মলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, থাকুক গে পড়ে, ইচ্ছে হয় তুমিও থাকগে, গোটাকয়েক জামা কেন শুধু, সম্পত্তিটাই গুরুদেবকে দান করে ফেল না, আমার বলবার কি দরকার, আমি দেখতেও চাইনে।

নির্ম্মলা রাগ করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, সুরেন্দ্রনাথ কতকটা বিপন্নের মত সেখানে বসিয়া রহিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বেলা গড়াইয়া দুপুরের দিকে চলিয়াছে—নির্ম্মলা পাশের একটি কক্ষ হইতে খানিকক্ষণ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া, আবার আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এত বেলা হইয়াছে, অনাহারী স্বামীর এই অদ্ভুত বেশ অপূর্ব্ব চেহারা, বহুক্ষণ আর তাঁহাকে দূরে থাকিতে দিল না; কাছে আসিয়া মুখখানাকে অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া কহিলেন, বেশ বল কি করতে হবে ওদের জন্য, করিয়ে দিচ্ছি। তুমিও উঠে স্নান করে খাও।

কৃতজ্ঞ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, দাও তবে, একটু তাড়াতাড়ি করেই করিয়ে দাও সব, আর কাপড়চোপড়-গুলো পাঠিয়ে দিয়ে তাঁদের রান্নার ব্যবস্থা করিয়ে দাও, আমি আর এখন খাই কি করে, ওই এক সঙ্গেই খাবো'খন।

সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, নির্ম্মলা হতবুদ্ধি হইয়া খানিকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, রাগে দুঃখে তাঁহার কান্না আসিতেছিল, কিন্তু ভাবিবার আর সময় নাই, আর ভাবিয়াই বা কি হইবে! স্বামীকে তিনি ভাল করিয়াই চিনেন। ওদের আহারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি খাইবেন না, সুতরাং সেই কাজেই আগে যাওয়া দরকার।

এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামখানি যখন স্বামীজীর প্রেমের বন্যায় হাবুডুবু খাইতেছে, তখনই একদিন, পান্নালাল ও দেওয়ান মশাইকে লইয়া, বাড়ীর গাড়ী আসিয়া বৈঠকখানা ঘরের দুয়ারে থামিল।

কতদিন পরে, ক-ত দিন পরে এই রাস্তা বাড়ীঘর বাগান এই পুকুর ঘাট—মলিন স্মৃতির সঙ্গে মিলাইয়া, গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া গভীর বিস্ময় এবং কেমন একটা স্নেহের সঙ্গে পানু সব দেখিতে লাগিল।

গাড়ী থামিতেই পানু নিজেই দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। স্বামীজীর কথা ষ্টেশনে নামিয়াই পানু দেওয়ানজীর মুখে শুনিয়াছিল। শেষ রাত্রে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, দ্বিপ্রহরের আগে থামিবে না, তাহার আগে আর পিতার সঙ্গে তাহার দেখা হইবার উপায় নাই, কিন্তু কাল রাত্রি হইতে এবং আজিও কীর্ত্তনে বসিবার আগে কতবার করিয়া যে দেওয়ান মশাইকে ষ্টেশনে সময় মত গাড়ী লইয়া আসিতে বলিয়া গিয়াছেন, সে কথা দুই তিনবার শুনিতে শুনিতে পানুর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

ঘরের ভিতর কীর্ত্তন হইতেছে, সেখানে তিলধারণের স্থানও আর নাই, বারাণ্ডাটিরও সেই অবস্থা, যাতায়াতের রাস্তাটুকু কেবল আছে মাত্র, পানু পিতাকে দেখিবার জন্য বারাণ্ডায় উঠিয়া ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইল, এ-পাশে ও-পাশে চাহিতে চাহিতে একটা কোণের দিকে চোখ পড়িতেই দেখিতে পাইল, দেয়ালের গায় হেলান দিয়া পিতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন; মুদিত চক্ষু দুটির ভিতর হইতে অবিরাম জলের ধারা বুক ভিজাইয়া চলিয়াছে। তিনি কীর্ত্তনে যোগ দেন নাই, এবং এমন ভাবে বসিয়া আছেন, যে, মনে হইতেছে, কোন জ্ঞান বা চৈতন্যই তাঁহার নাই। পিতার সেই ধ্যান-সুন্দর মূর্ত্তিখানির পানে পানু খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল। ঘরখানির ওপাশের ছোট ঘরটিতে মেয়েদের বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, তাহারই পরদার এ-পাশে বসিয়া আছেন গেরুয়া-বেশধারী স্বামীজী, কীর্ত্তনে তিনিও যোগ দেন নাই, কিন্তু মুদিত চক্ষু দুটি খুলিয়া, মাঝে মাঝে ঘরের সর্ব্বত্র চক্ষু বুলাইয়া বোধ হয় ভক্তদের ভক্তির পরখ করিয়া লইতেছেন। পানু তাকাইয়া দেখিয়া, খানিকক্ষণের জন্য আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না,—এ কে? কে এ? স্বর্গ হইতে ভগবান নামিয়া আসিয়াছেন কি? এত অপূর্ব্ব সুন্দর কোন মানুষকে সে দেখে নাই! চক্ষু দুটির দৃষ্টি একবার আসিয়া দৃষ্টির সঙ্গে মিশিলে, সে চোখ আর ফেরানো যায় না, মনকে কেবল টানিতেই থাকে, কিন্তু তথাপি পানুর মনে কেমন একটা ঘা লাগিল, গৃহস্থিত অন্যান্য সকলে যেখানে ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে, সেখানে স্বামীজীর মধ্যে কিছুমাত্র আকুলতাও ত' নাই। এ যেন ভক্তকে পরীক্ষা করিবার জন্যই ভগবান তাঁহার আসনে স্থির হইয়া বসিয়া সকলকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

দেওয়ানজীর আহ্বানে সচকিত হইয়া পানু বারাণ্ডা হইতে নামিয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের দিকে চলিল, বাগানের পাশেই সুন্দর সুন্দর চারি পাঁচটি ছেলে মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল, বড় মেয়েটি কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

পানু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, ইহারা যে তাহার ভাই বোন, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু কে কোন্ জন চিনিতে না পারিয়া বিপদে পড়িয়া গেল। দেওয়ানজী তাহার বিপদ বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া কহিলেন, ওরে আশা, এগিয়ে আয় না, বিনু, বিনুরাণী, দাদাকে পেন্নাম করবি না? এগিয়ে আয়, দেখ ত' পানু, তোমার এই ভাই দুটির কোনটি হবে বেশী পালোয়ান? দিনরাত ত' এদের সার্কাস আর কুস্তি লেগেই আছে। পানু হাসিয়া ছোট ছেলেদুটিকে কাছে টানিয়া লইল, বড় বোন উষাই আগে আসিয়া দাদাকে প্রণাম করিয়াছিল, হাসি হাসি সরল সুন্দর মুখখানি, মেজ বোন আশা একটু আস্তে আস্তে, একটু গম্ভীর ভাবে আসিয়া দাদাকে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, এবং সহসা চট্ করিয়া ছোট বোন রাণীর গালে সজোরে একটা চড় মারিয়া কহিল, অসভ্য মেয়ে, অত লাফালাফি কি? শান্ত হ'য়ে দাঁড়াতে পার না একটু? রাণী এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না,

কোঁকড়া চুলে ঘেরা, ফোলা ফোলা সুন্দর গোলাপী মুখখানি একটু কাঁপিয়া কাঁপিয়া হঠাৎ ঠোঁট দুটি ফাঁক হইবার উপক্রম হইতেই, দেওয়ান মশাই দ্রুত সরিয়া আসিয়া, দুইহাতে লুফিয়া লইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। একটু আদর করিয়া, মেয়েটির মুখখানি নিজের কোলে চাপিয়া রাখিয়া, হাসিয়া পানুকে কহিলেন, ঐ যে মেয়েটি, জান পানু, ও হচ্ছে বাড়ীর ঠাকুরমা, দিনরাত গুরুগম্ভীর ভাবে সবাইকে কেবল হিতোপদেশ দিতেই ব্যস্ত, তুমিও থাক না দুদিন, কত হিতোপদেশ পাবে, দেখো তখন। আশা রাগে গরগর করিতে করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

উষা কহিল, রাগিয়ে দিলেন জ্যাঠামশায়, আজকে আর কারুর সঙ্গে ও কথা কইবে না।

পানু একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, উষার গলার সহজ সুর শুনিয়া, একটু হাসিয়া কহিল, বড্ডো ছেলেমানুষ।

দেওয়ানজী কহিলেন, না হে না, ছেলেমানুষ যদি বলতে চাও, তবে আমার এই মা'টিই তাই,—বলিয়া আঙুল দিয়া উষাকে দেখাইয়া দিলেন, তারপর হাসিয়া কহিলেন, আর আমার আশা মাসীমাটি চিরকালই একটু ঐ রকমের—তা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ত' দেখি, কথাবার্ত্তা সব ফুরিয়ে এল, ওরে উষা, যা না তোর দাদাকে নিয়ে ঘরে যা না।

নির্ম্মলা যেখানে কতকগুলি জামা কাপড় লইয়া সেলাই করিতেছিলেন, ছোট ভাইবোনগুলি দাদাকে লইয়া কোলাহল করিতে করিতে সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মলা মাথা তুলিয়া পরম বিস্ময়ে কহিলেন, ওমা, কত বড় হয়ে গেছিস পানু, আয় আয়—বোস এখানে, থাক, থাক প্রণাম আর করতে হবে না, বেঁচে থাক বাবা, হ্যাঁরে পানু, এতকাল ত' ক'লকাতায় কাটিয়ে এলি, বাড়ীর কথা বুঝি মনেটনে পড়ত না কক্ষনো?

পানু মুখখানি নত করিয়া, লজ্জিতভাবে একটু একটু হাসিতে হাসিতে কেবলি রুমালে মুখ ঘসিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহরে পিতার সহিত সাক্ষাত হইলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যখন দাঁড়াইল, তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আদর করিয়া পিতা কহিলেন, এসেছিস খোকন? রাস্তায় কষ্ট হয়নি ত কিছু? ওরে উষা, দাদাকে চা'টা সব দিয়েছিলি ত' ঠিক সময়? পাশের ঘর হইতে নির্ম্মলা উচ্চৈস্বরে কহিলেন, না দেয় নি, উপোস করিয়ে রেখেছে, এত যদি ভাবনা, তবে ধ্যানে বসে ছিলে কি করে? এসে নিজে সব করে দিলেই পারতে! পিতা আর কথা কহিলেন না, স্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

যাহা হউক এমনি করিয়া পানুর ছুটির দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। পিতার সঙ্গে কম সময়ই দেখা হয়, বেশীর ভাগ সময়ই তিনি স্বামীজীর কাছেই বসিয়া থাকেন।

বিমাতা আদর না করুন, অনাদরও কিছু করেন না, আশা মেয়েটি যার স্বভাবই পাইয়াছে, একটু কিছু হইলেই, রাগিয়া চটিয়া অস্থির হইয়া উঠে, পানুকে সে বৈমাত্রেয় ভাই বলিয়াই মনে করে, কিন্তু উষা মেয়েটি চমৎকার!

স্বামীজীর সঙ্গে পানুর দু' একদিন অল্পক্ষণের জন্য দেখা হইয়াছে, পিতা কিছু বলেন নাই, স্বামীজীই তাঁহার কোন ভক্তকে পাঠাইয়া বার বার তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন। পানু গিয়াছে, কিন্তু কে জানে কেন বেশীক্ষণ সেখানে থাকিতে পারে নাই, স্কুলের মাষ্টার বা গৃহের শিক্ষক, কাহাকেও সে কোন দিনই তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু ছাড়া, অতিরিক্ত ভক্তি দান করিতে পারে নাই, এখানেও সে স্বামীজীর একটা কঠোর রকমের প্রভুত্ব কিছুতেই সহিতে পারিল না।

কে কোন্ জজ, ডেপুটী বা মুন্সেফ শিষ্যরা, স্বামীজীর সেবার জন্য কবে কত টাকা পাঠাইতেছেন, এই দারুণ গ্রীষ্মে কোন্ উকিল শিষ্য স্বামীজীর পরিধানের জন্য সিল্কের মোলায়েম গেরুয়া পোষাক পাঠাইয়াছেন, টেবিলে তাহারই একটি লিষ্ট রহিয়াছে, পানু গেলেই স্বামীজী কহিতেন, পড় ত' পান্নালাল এগুলো, শুনি কে কি পাঠালে? তখন ধ্যানে বসেছিলুম, শুনিও নি, দেখিও নি কিছু! আর কেনই বা এসব পাঠায় এরা! সন্ন্যাসী মানুষের এসবের দরকারই বা কি! যার একটা কাঁচকলা দিয়ে ভাত আর একটা কৌপীন হলেই চলে যায়! যাক্, পাঠিয়েছে থাক্, পাঠিয়ে তৃপ্তি পায় সব। শিবনাথ কাল এগুলো কলকাতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিস বাবা, রোজগেরে মানুষ ভগবানের ডাকে আর থাকতে পারলুম না ঘরে, সব ফেলে ফুলে চলে এসেছি, তাই সেই নিরাশ্রয় হতভাগ্যদের ভার ভগবানই নিয়েছেন, এই সব শিষ্যের উপলক্ষ্য করে তিনিই ওদের খাওয়াচ্ছেন,—বলিয়া পরম ভক্তিভরে, সজল চোখ দুটি বন্ধ করিয়া বুকের উপর বদ্ধ হাত দুটি রাখিয়া কতক্ষণের জন্য

স্থির হইয়া থাকিলেন। তাঁহার ধ্যানস্থ ভাবের মধ্যেই পানু উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিত।

মেয়ে শিষ্যদের মধ্যে ভদ্রলোকদের বাড়ীর ত'চারজন ছাড়া, বেশির ভাগই ছিল, গ্রামের অন্য জাতের মেয়েরা। জমিদার-বাড়ীতেই যে ভোগ রান্না হইত, ইহারা সকলেই তাহার প্রসাদ পাইত। তাহারা যে দিকে থাকিত, অন্য পুরুষদের সেদিকে যাইবার অধিকার ছিল না, কেবল সেইদিকে স্বামীজী একটি কক্ষে গিয়া বসিয়া ইহাদের উপদেশ দিতেন। মেয়েদের স্বভাবতঃই ধর্ম্মপরায়ণ কোমল মন,—গুরুজীর উপদেশে একেবারে পাগল হইয়া গেল, সংসার স্বামী পুত্র কন্যা, এমন কি নিজেদের অস্তিত্বও ভুলিয়া গিয়া কেবল মাত্র স্বামীজীই ইহাদের ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিলেন।

একদিন উষা আসিয়া পানুকে কহিল, দাদা দেখবে চল, ঐ যে মেয়েরা সব এসেছে, তাদের একটি ছোট ছেলের কি ভয়ানক অসুখ করেছে, তবু তার মা একবারও আসছে না, ওর চেয়ে বড় ওর একটি দিদি কতবার মাকে ডাকতে যাচ্ছে, কিন্তু মা আসছে না বলে, কি রকম কাঁদছে বেচারী!

পানু উত্তেজিত হইয়া কহিল, ওর মা কি কচ্ছে?

উষা কহিল, মেয়েটি বলছে ওর মা স্বামীজীর সেবা করছ এখন, এখন আসতে পারবে না।

পানু কহিল, চল ত' দেখি।

উভয়ে গিয়া দেখিল, মায়েদের ঘরের বারান্দায় ছোট ছোট মাদুর বিছাইয়া শিশুগুলিকে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ বা কাঁদিতে কাঁদিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কি সে এক করুণ দৃশ্য, আর এক পাশে সেই রুগ্ন শিশুটি রোগযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে এবং তার আট বছর বয়সের দিদিটি ছোট ভাইটিকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে,—সহজেই উত্তেজিত পানুর রক্ত সহসা গরম হইয়া উঠিল, এ কি সর্ব্বনাশা গুরুভক্তি! যে ভক্তিতে মেয়েমানুষ রুগ্ন সন্তানকেও দূরে ফেলিয়া রাখে! উষাকে আহ্বান করিয়া পানু দ্রুতপদে বারান্দা পার হইয়া গিয়া, সেই গৃহের দ্বারে দাঁড়াইল, সেবাপরায়ণা মেয়েদের কাহারও এমন স্বাভাবিক জ্ঞান নাই, যাহাতে তাহারা দ্বারপ্রান্তে আগন্তুকের পানে ফিরিয়া তাকাইতেও পারে। কিন্তু যাহার জ্ঞান ছিল, সেই স্বামীজী কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, কি চাই তোমার? এখানে সব পর্দ্দানশীন কুলবধূরা রয়েছেন, এখানে আসা নিষেধ, —তা জান না?

পানুও তেমনই কঠোর স্বরেই কহিল, ছেলের কাছে মায়েদের কোন পর্দ্দা নেই, এখানে আসায় আমার কোন দোষ নেই, আমি তা জানি, যাও ত' উষা, কে ঐ খোকার মা, তাঁকে ডেকে আনো,—আপনি এখন ওঁকে ছুটি দিন, ওঁর ছেলে বাইরে এখনই হয়ত মারা যাবে, আপনার চেয়েও ঐ ছেলেটির, ওঁকে দরকার এখন বেশি!

স্বামীজী ক্রুদ্ধ হাসি হাসিয়া কহিলেন, মূর্খ, সংসারে কে ছেলে, কে মেয়ে, কে আপন, কে পর! সবাই ভগবানেরই এক এক রকম রূপ এবং এই সব বিপদের ছলনা করেই ত' ভগবান তাঁর ভক্তদের ভক্তির পরীক্ষা করেন, ওকি রাধারাণী কোথায় যাচ্ছ? কে তোমার ছেলে? কার অসুখ? এসব পরীক্ষায় জয়ী হতে হবে, বোস তুমি, এটা তোমার পরীক্ষা এবার,—ভগবান নিজে এসে তোমার কাছে হার স্বীকার করে' যাবেন মা, বোস।

মেয়েটি মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বামীজীর পায়ের তলায় আবার বসিয়া পড়িল।

হতাশ হইয়া পানু ফিরিয়া আসিল। সেই দিনই রাত্রে অমাবস্যার অন্ধকারে যখন ঘর বাড়ী বাগান পুকুর গভীর ভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, সেই ব্যথাকাতর নিদ্রাহীন হতভাগা শিশু তখন তাহার সকল যন্ত্রণার শেষে তাহার ছোট্ট চোখ দুটি বুঁজিল। রাত্রিশেষে পানু একবার ছেলেটিকে দেখিতে আসিয়া দেখিল—মৃত ভাইটিকে ঘুমন্ত মনে করিয়া, তাহার আট বছরের দিদিটি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ঘুমাইয়া আছে। পানু পিতাকে বলিয়া সেই দিন সারাদিনই কিছু ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল,—কিন্তু অভাগা শিশু সে সব কিছু গ্রহণ করিল না, এক ফোঁটা মাতৃস্তন্যের জন্য শুধু অনবরত মুখখানি এ-পাশে ও-পাশে ঘুরাইয়া মাকেই বার বার খুঁজিয়া খুঁজিয়া চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ

শম্ভুনাথ পণ্ডিত

—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা

এই সময়ে ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-সচিব ও শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি পুণ্যশ্লোক জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বদেশ-হিতৈষিগণের সহযোগে নিজ ব্যয়ে একটি বালিকা বিদ্যালয় (এক্ষণে বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠিত করেন। শম্ভুনাথ চিরদিন স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং এই বিদ্যালয়ে তাঁহার কন্যা মালতীকে সর্ব্বপ্রথমে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এই সূত্রে বেথুনের সহিত শম্ভুনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। শম্ভুনাথকে লিখিত বেথুনের কয়েকখানি পত্রের অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইতে পারে।

[১]

চৌরঙ্গী

৯ই জুলাই ১৮৪৯

......কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি আপনার কন্যার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মিসেস রিড্‌সডেলকে যে পত্রোত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন তিনি তাহা আমাকে দেখাইয়াছিলেন এবং তাহা পাঠ করিয়া আপনার সম্বন্ধে আমার এমত উচ্চ ধারণা হইয়াছিল যে আমি সংকল্প করিয়াছিলাম যে আপনাকে লিখিয়া জানাইব যে আমি আপনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিতে অভিলাষী। আমার ইচ্ছামত তদ্দণ্ডেই আপনাকে লিখি নাই ইহা ভালই হইয়াছে, কারণ আমার মনে হয় যে এই পত্র আপনি আরও সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন যেহেতু এক্ষণে আমার স্কুলে আপনার কন্যাদ্বারা প্রস্তুত এক জোড়া জুতা এতৎসহ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলাম। যদি উহা আমার নামে তাহাকে উপহার দেন তাহা হইলে আমি পরম আনন্দিত হইব। আমি মিসেস রিড্‌সডেলের নিকট শুনিলাম সে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠা ছা[ত্রী] এবং তিনি তাহার পাঠে উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত।

শনিবার বা রবিবার ব্যতীত যে কোন দিন প্রাতে মদীয় ভবনে আপনি অবসরমত সাক্ষাৎ করিলে আমি সুখী হইব। আপনি আপনার পত্রে যে সকল মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আপনার উন্নত হৃদয়ের পরিচায়ক এবং ঐরূপ সারবান মত পোষণ করেন এবং সৎসাহসের সহিত দৃঢ়ভাবে তাহা অবলম্বন করিয়া থাকেন এইরূপ ব্যক্তি যত অধিক হয় ততই বাঞ্ছনীয়।......

৫ই নভেম্বর ১৮৪৯

......আমি আপনাকে পত্রে যেরূপ বলিয়াছি তাঁহাকেও সেইরূপই কহিয়াছি এবং যিনি জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাকেই আমি আনন্দের সহিত জানাইব

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

যে আমি আপনার বিষয়ে অতি উচ্চ মত পোষণ করি—কি প্রতিভা সম্বন্ধে কি চরিত্র সম্বন্ধে; এবং আপনার যদি কোন উপকারে আসে আমি সানন্দে যথাসাধ্য করিব। যাঁহাদিগকে আমি বিশ্বাস করি তাঁহাদিগকে আমি সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করি।

আপনার বিশ্বস্ত

জে-ই-ডি বেথুন।

পুনশ্চ। আমি অদ্য প্রাতে আপনার বাটী হইতে আপনার কন্যার প্রস্তুত একজোড়া স্লিপার জুতা লইয়া আসিয়াছি। উহা আমাকে প্রদত্ত হয় সে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে আমি ও সে উভয়ে মিলিয়া উহা আপনাকে উপহার দিই কিন্তু তাহার প্রথম

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন।

অভিপ্রায় হইতে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে না পারায় আমি ভাবিলাম আমার পক্ষে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হইবে।

পিয়ার্সনের 'বাক্যাবলি'

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল বেথুন নিম্নলিখিত পত্রে শম্ভুনাথকে অনুরোধ করেন যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত পিয়ার্সন সাহেবের বাক্যাবলি'র নূতন সংস্করণে আইনঘটিত বাঙ্গালা শব্দ ও তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দের একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিয়া গ্রন্থটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দিন :---

[৩]

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী শীঘ্রই পিয়ার্সনের বাক্যাবলি পুনর্মুদ্রিত করিবেন—উহা ইংরাজী ও বাঙ্গালা শব্দের অভিধান। এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে যে কতকগুলি পৃষ্ঠায় আইনঘটিত ও বিচারালয়ে ব্যবহৃত শব্দের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইলে উহা অধিকতর উপকারে আসিবে। যদি আপনার এই কার্য্যের অবসর থাকে তাহা হইলে উহার ভার গ্রহণ করিতে আপনাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ আছেন বলিয়া আমি অবগত নই। যদি আপনি এই ভার গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে সোসাইটীর সম্পাদক মিষ্টার সাইক্‌সকে জানাইলে তিনি আপনাকে একখণ্ড পুস্তক পাঠাইয়া দিবেন। কি করিতে হইবে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

জে-ই-ডি বেথুন

শম্ভুনাথ সানন্দে এই কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সম্পাদনায় গ্রন্থখানির মূল্য বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা প্রকাশের পূর্ব্বেই মহাত্মা বেথুন ইহলোক হইতে অবসৃত হন এবং শম্ভুনাথ তাঁহার একজন অকৃত্রিম ও হিতৈষী বন্ধুর বিয়োগ বেদনায় ব্যথিত হন।

বেথুন সোসাইটী

মহাত্মা বেথুনের পরলোক গমনের পরে তাঁহার য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অনুরাগী বন্ধুগণ 'বেথুন সোসাইটী' নামক এক সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করেন। শম্ভুনাথ এই সভার অন্যতম উৎসাহশীল ও হিতৈষী সভ্য ছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উহার তদানীন্তন সভাপতি শিক্ষাসুহৃদ্ ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্ ভারতবর্ষ পরিত্যাগের উদ্যোগ করিলে বেথুন সভার সভ্যগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটি বিদায়-অভিনন্দন-পত্র প্রদানার্থ পাইকপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্রতাপ-চন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন আহুত করেন। শম্ভুনাথ এই সভার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া একটি হৃদয়-গ্রাহিনী বক্তৃতা করেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলে শম্ভুনাথ বেথুন সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। শম্ভুনাথ এই সভার কিরূপ

নবাব নাজিম ফেরাদুন জা।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত সভার সভাপতি স্তর জন্ বাড্ ফিয়ার সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে শোকসহকারে বিবৃত করেন। তাঁহার উক্তি উক্ত সভার কার্য্য-বিবরণীতে মুদ্রিত আছে, বাহুল্যভয়ে উহা এস্থানে উদ্ধৃত হইল না।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক প্রসিদ্ধ রাজনীতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। শম্ভুনাথ উহার সভ্য এবং প্রথম কয়েক বৎসর উহার কার্য্য-নির্ব্বাহিকা-সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

জুনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মার্চ্চ শম্ভুনাথ জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার নিযুক্ত হন। তিনি এই পদ প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু মিষ্টার জে আর কলভিন (পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর) তাঁহার সাধুতা, আইনের জ্ঞান এবং বাগ্মিতায় এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে শম্ভুনাথকে এই কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য বিবেচনা করিয়া এই পদে নিযুক্ত করেন।

এই পদে নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই একটি প্রসিদ্ধ মোকদ্দমা পরিচালনের জন্য শম্ভুনাথকে মুর্শিদাবাদে যাইতে হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম ফেরাদুন জার প্রাসাদ হইতে কতকগুলি জহরত চুরি যায়। নাজিমের কয়েকজন কর্ম্মচারী অপহরণকারীদিগকে ধৃত করিয়া এরূপ প্রহার করে যে তাহারা প্রাণত্যাগ করে। নবাব নাজিমের প্রধান খোজা আমান আলি খাঁ বাহাদুর এবং অপর কয়েকজন খোজা ধৃত হইয়া বিচারার্থ আনীত হয়। আসামী পক্ষে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ক্লাক এবং মণ্টিগু ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট পক্ষে মিষ্টার ট্রেভর ও শম্ভুনাথ ছিলেন। শম্ভুনাথের প্রচুর আইনজ্ঞান ও পক্ষপাতহীন আচরণ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ব্যবহার শাস্ত্রের অধ্যাপনা

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে থিওবোল্ড নামক একজন বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অল্প দিন পরেই স্বাস্থ্য প্রতিলাভার্থ ইংলণ্ডে গমন করিলে তৎস্থলে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের প্রশ্ন উঠে। শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ১১ই জানুয়ারি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ তারিখ সম্বলিত এক পত্রে উক্ত পদ স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন :—

রমাপ্রসাদ রায়।

"শিক্ষাপরিষদের আদেশক্রমে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে প্রেসিডেন্সী কলেজের নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে একজন ব্যবহারশাস্ত্রের অধ্যাপকের

প্রয়োজন হইবে। এই অধ্যাপকের রেগুলেশন আইন এবং মফঃস্বলস্থ বিচারালয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ সম্মানজনক ও পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন না, যদি অবশ্য আপনি ঐ পদগ্রহণ করিতে স্বীকার করেন।

লর্ড ক্যানিং।

শিক্ষা-পরিষদের কেবল সুপারিশ করিবারই ক্ষমতা আছে, নিয়োগের ক্ষমতা নাই। অতএব প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-অধ্যাপকের পদের জন্য আপনাকে মনোনীত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

শম্ভুনাথ এই পদ গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিলে ৪০০৲ টাকা মাসিক বেতনে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি দুই বৎসর কাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তন্মধ্যে তিনি তাঁহার আইন বিষয়ক বক্তৃতাগুলির কিছু কিছু মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই বক্তৃতাগুলি তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে বিনা-মূল্যে বিতরিত হয়।

"হিন্দু পেট্রিয়ট"-এর লেখক

এই সময় হইতে শম্ভুনাথ গিরিশচন্দ্র

উচ্চপদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিতে অগ্রসর হইয়া পরিষৎ দেখিতেছেন যে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর কোন ব্যক্তিকে তাঁহারা উক্ত ও পরে হরিশচন্দ্র সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আইনসংক্রান্ত সন্দর্ভাদি প্রকাশিত করিতে থাকেন। তাঁহার রচনাগুলি আইনজ্ঞানের গভীরতা

ও প্রকাশ-ভঙ্গীর সরলতার জন্য সুধিসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

প্রধান সরকারী উকীল

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় রমাপ্রসাদ রায় বাহাদুর পীড়িত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং শম্ভুনাথ তৎস্থলে অভিষিক্ত হন। কিন্তু বেশীদিন তাঁহাকে এই পদে থাকিতে হয় নাই, শীঘ্রই উচ্চতর পদ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি

পূর্ব্বে এদেশে সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট নামক দুইটি সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় ছিল। সদর আদালত বা "কোম্পানী"র আদালতে মফঃস্বল আদালতের মোকদ্দমার আপীল শুনা হইত। এই আদালতের বিচারপতিদিগের পক্ষে দেশের আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন বলিয়া জিলার বিচারকগণের মধ্য হইতে ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইতেন। সুপ্রিমকোর্টের বা মহারাজ্ঞীর আদালতের বিচারপতিগণ বিলাত হইতে আসিতেন। এই দুই আদালতের বিচারপতিগণের মধ্যে অনেক সময়ে মতানৈক্য ও মনোমালিন্য ঘটিত। কিছুকাল হইতে উভয় বিচারালয় সম্মিলিত করিয়া একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার জল্পনা চলিতেছিল। অবশেষে প্রস্তাবিত বিচারালয়ের নিয়মাদির এক খসড়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং এর নিকট প্রেরিত হয়। উহাতে দেশীয় ব্যক্তিগণকে বিচারপতিরূপে নিযুক্ত করিবার কোনও কথা ছিল না। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্রে ইংরাজ ও দেশীয়গণের তুল্য অধিকার ঘোষিত হইয়াছিল। উহার উপর নির্ভর করিয়া, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন পার্লিয়ামেণ্টের নিকট দেশীয় বিচারপতি নিয়োগের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আবেদন করেন। লর্ড ক্যানিংও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে সুশিক্ষিত দেশীয় বিচারপতিগণ হাইকোর্টে ইংরাজ বিচারপতিগণের পার্শ্বে উপবেশন করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য। ফলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হইবামাত্র একজন দেশীয় ব্যক্তি—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়—মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, যখন নিয়োগপত্র আসিল, তখন রমাপ্রসাদ মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি এখন উচ্চতর বিচারালয়ের সম্মুখে যাইতেছি। নিয়োগপত্র লইয়া আমি কি করিব?" রমাপ্রসাদের মৃত্যুতে দেশবাসীর মনে সংশয় উপস্থিত হইল, হয়ত দেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে দেশবাসী আর বিচারপতির আসন অধিকার করিতে পাইবে না। কিন্তু হাইকোর্টের প্রথম ও প্রধান বিচারপতি জ্যানিষ্ঠ স্যর বার্ণস পিকক শম্ভুনাথের প্রতিভায় ও ন্যায়পরতায় বিমুগ্ধ ছিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহাকে রমাপ্রসাদের স্থানে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। শম্ভুনাথ এই পদ গ্রহণে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; কারণ ওকালতীতে এই সময়ে তাঁহার মাসিক আয় দশ সহস্র মুদ্রায় কম ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী স্যর অ্যাশলি ইডেনের পরামর্শে, এবং দেশবাসীর এবম্প্রকার উচ্চ পদ প্রাপ্তির পথ সুগম করিবার জন্য তিনি এই পদ গ্রহণে স্বীকার করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন যথাসময়ে তাঁহার নিয়োগ সমর্থন করিলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর ভারতবর্ষের তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট স্যর চার্লস উড নিয়োক্ত পত্রসহ মহারাজ্ঞীর নিয়োগপত্র শম্ভুনাথকে পাঠাইয়া দেন।

স্যর অ্যাশলি ইডেন।

ইণ্ডিয়া অফিস, ১৮ই নভেম্বর ১৮৬২

মহাশয়,

আমি মহারাজ্ঞীর নিকট অতীব আনন্দ সহকারে আপনাকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আপনি যেরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাতে আপনি উক্ত পদের সম্পূর্ণ যোগ্য এইরূপ ধারণা আছে, এবং ইহা অত্যন্ত সন্তোষের বিষয় যে তাঁহার দেশের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে আমি একজন ভারতবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইলাম যিনি তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার সহিত সম্পাদিত করিবেন আমার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

আপনার অনুগত ভৃত্য—

চার্লস উড।

শম্ভুনাথের নিয়োগে সকলেই সবিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রবীণতর উকীলদিগের মধ্য হইতে কাহাকেও নির্বাচিত না করিয়া ৪২ বৎসর বয়স্ক শম্ভুনাথকে বিচারপতিপদে বরণ করার সাধারণ দেশবাসী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কোনও "ভারত হিতৈষী" ইঙ্গ-ভারতীয়-সংবাদপত্র-সম্পাদক এইরূপ প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। হাইকোর্টের অন্যতম সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার ভবনে একটি মহাভোজ দিয়াছিলেন এবং তথায় কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ উকীলগণ আন্তরিক আনন্দের সহিত শম্ভুনাথকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। কারণ শম্ভুনাথ প্রতিভায় যেমন সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সৌজন্যে, শিষ্টাচারে, ও বিনয়নম্র আচরণে তাঁহার বন্ধুগণের সমধিক প্রীতিও আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

লর্ড এল্‌গিন্‌।

সুরাপান-নিবারণী সভা

হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি যে ন্যায়পরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, বিশেষজ্ঞগণ তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে তাহার পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। বিচারপতির শ্রমসাধ্য কার্য্যের উপর শম্ভুনাথ দেশবাসীর উন্নতির জন্য নানা প্রকার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। দানে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন এবং কত অনাথ বালক ও দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে রীতিমত সাহায্য পাইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'বাঙ্গালার আর্ণল্ড' শিক্ষককুলতিলক প্যারীচরণ সরকার মহোদয়, রেভারেণ্ড সি-এইচ-এড্‌ল্‌, 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সহযোগিতায় সুরাপান-নিবারণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। শম্ভুনাথ উহার কার্য্য-নির্ব্বাহিকা-সমিতির একজন উৎসাহশীল সদস্য ছিলেন এবং উক্ত সভার কার্য্য-বিবরণীতে তাঁহার সুচিন্তিত মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ দেখা যায়। সেখানে অধিকাংশ শিক্ষিত 'বড়লোকের' মধ্যে পানদোষ অতি প্রবল ছিল। শম্ভুনাথের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ব্যক্তিগণ দেশবাসীর সমক্ষে এক উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদিগের অধিকার প্রদান

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মনোমোহন ঘোষ ও পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারাই প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার নহেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র 'ব্রাহ্মণ খৃষ্টান' জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সর্ব্বপ্রথম ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন কিন্তু তিনি কখনও এদেশে ব্যারিষ্টারী করেন নাই। 'চাপকান-পরিহিত' ব্যারিষ্টার মনোমোহন ও মাইকেল মধুসূদন উভয়েই এখানে ব্যারিষ্টারী করিতে আসিয়া প্রথমে বাধা পাইয়াছিলেন। প্রধানতঃ শম্ভুনাথের সাহায্যে ইঁহারা ইঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করিতে পাইয়াছিলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত

নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় তদীয় "মধু-স্মৃতি"তে এই প্রসঙ্গে হাইকোর্টের যে সকল কাগজ-পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, কৌতূহলী পাঠকগণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিলেই যথেষ্ট হইবে।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

স্বর্গারোহণ

সুখ্যাতির সহিত প্রায় পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়া শম্ভুনাথ অবশেষে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সামান্য জ্বর ও একটি বিস্ফোটক হইল। পরে উহা দুরারোগ্য কার্ব্বাঙ্কলে পরিণত হইল। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ তাঁহাদিগের যথাসাধ্য করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন তিনি বুঝিলেন, অন্তিমকাল আগতপ্রায়, তিনি তাঁহার উইল বা চরমপত্র প্রস্তুত করাইলেন। রাত্রিকালে স্ত্রী পুত্রগণকে শয্যাপার্শ্বে আনাইয়া ব্রহ্মোপাসনা করত শ্রীভগবানের হস্তে পরিবারের ভার অর্পণ করিয়া শান্তচিত্তে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ওঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে বৃহস্পতিবার ৬ই জুন ১৮৬৭ (২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ বঙ্গাব্দ) প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকার সময় তিনি সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিলেন।

শোক প্রকাশ

শম্ভুনাথের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স শোকে অভিভূত হন এবং সরকারী গেজেটে শোকসূচক ব্ল্যাক বর্ডার-সহ নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :—

১০ই জুন ১৮৬৭

'সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেল ফোর্ট উইলিয়মে অবস্থিত মহারাজ্ঞীর প্রধানতম ধর্ম্মাধিকরণের অন্যতম বিচারপতি মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু-সংবাদ আন্তরিক শোকের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন।

এই সংবাদ প্রেরণকালে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহাশয় লিখিয়াছেন "বিচারপতি শম্ভুনাথের কার্য্য স্মরণ করিলে বলা যাইতে পারে যে হাইকোর্টে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় ভারতবাসী সাফল্য লাভ করিয়াছে। ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার অনন্যসাধারণ স্থান ছিল এবং দেশবাসীদিগের সহিত তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয় ছিল। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার ন্যায়পরতা সাধুতা ও স্বাধীনচিত্ততা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছি এবং আমার বিশ্বাস তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহাকে সম্মান ও বিশ্বাস করিতেন।"

মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের উপরিধৃত মন্তব্যের সহিত সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সম্পূর্ণ একমত এবং দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণে একজন দেশবাসীকে নিয়োগ করিবার পরীক্ষা ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে যেরূপ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেল তাঁহাদের অভিমত সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন।'

বাস্তবিক বিচারপতিপদে শম্ভুনাথের সাফল্য ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্ভবপর করিয়াছিল এবং বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ চৌধুরী,

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সারদাচরণ মিত্র, স্যর বিপিনবিহারী ঘোষ, স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বহু বাঙ্গালীর প্রতিভালোকে উক্ত ধর্ম্মাধিকরণ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে ও হইতেছে।

তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র দেশব্যাপী হাহাকার উঠিল। সেই দিনই হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যর বার্ণেস পিকক এডভোকেট জেনারেলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

প্যারীচরণ সরকার।

"এই বিচারালয়ের অন্যতম সুবিজ্ঞ বিচারপতি, জষ্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু-সংবাদ ব্যবহারাজীবসম্প্রদায় ও সাধারণের নিকট ঘোষণা করা আজ আমার শোকাবহ কর্ত্তব্য। অদ্য প্রাতে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনিই প্রথম—বলিতে গেলে একমাত্র—ভারতবাসী যিনি হাইকোর্টে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে আমাকে যথার্থ বলিতে হইবে, এবং বোধ হয় ইহাতে কেবল আমার নহে, আমার সুপণ্ডিত সহযোগিগণের মত ব্যক্ত করা হইতেছে যে জষ্টিস শম্ভুনাথের তিরোধানে আমরা একজন অমূল্য বহুগুণান্বিত বন্ধু ও সহকর্ম্মী হারাইয়াছি এবং জনসাধারণ ও এই বিচারালয় একজন ন্যায়পরায়ণ সুপণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা বিচারপতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।"

আপীল বিভাগেও বিচারপতি জ্যাকসন শম্ভুনাথের মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশ করিয়া বলেন, "অদ্যকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যিনি ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের পরলোকগত সহযোগীর সহিত এই বিচারালয়ের ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে অনেকেরই আমাদের অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘকালের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অত্যন্ত সত্য এবং আমার বিশ্বাস এই বিচারালয়ের অন্যান্য বিভাগেও আমার সহযোগীরা ইহার সমর্থন করিবেন যে, আমরা একজন বহু গুণান্বিত মহামান্য সহযোগী ও বন্ধু হইতে বঞ্চিত হইয়াছি এবং সাধারণ একজন ন্যায়বান সুপণ্ডিত সুদক্ষ এবং সত্যনিষ্ঠ বিচারপতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। যখন এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে একজনকে এই বিচারালয়ের বিচারপতির পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের যোগ্যতা, সাধুতা ও বহুদর্শিতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ তাঁহাকেই তখন ঐ পদের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাঁহার নিয়োগের পর তাঁহার সরলতা, সহৃদয়তা ও সৌজন্যের গুণে তিনি যেমন তাঁহার সহযোগিগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, সেইরূপ ঐ সকল গুণে তাঁহার অন্যবিধ যোগ্যতারও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল।"

অন্যান্য বিভাগের বিচারপতিগণ, জষ্টিস লক, কেম্প, বেলি, এবং সীটন কার ঐ মর্ম্মে শোকপ্রকাশ করিয়া আদালত বন্ধ করেন। জষ্টিস বেলি বক্তৃতাকালে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

আদালত বন্ধ হইবার পর হাইকোর্টের উকীল, মোক্তার এবং শম্ভুনাথের প্রতিভানুরাগী ভক্ত ও বন্ধুগণ সিনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার কৃষ্ণকিশোর ঘোষের নেতৃত্বে শবানুগমন করেন।

স্মৃতিরক্ষা

শম্ভুনাথের অসংখ্য বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্থাপনার্থ একটি প্রকাশ্য সভারও আয়োজন করেন। ২২শে জুলাই (১৮৬৭)

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

আপীল আদালত গৃহে একটি বিরাট শোকসভার অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি লক এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি

মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় অন্যান্য যোগ্যতর ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে ঐ পদে বৃত হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে তিনি সদর কোর্টের (এক্ষণে হাইকোর্ট) প্রাচীনতম বিচারপতি এবং শম্ভুনাথকে উক্ত আদালতে উকীল

রাজা দিগম্বর মিত্র।

অবস্থাতে দেখিয়াছেন এবং তখন হইতে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত নবাব নাজিমের কতিপয় কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে উকীল নিযুক্ত হইয়া শম্ভুনাথ বহরমপুরে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হন এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সদর কোর্টের বিচারপতি হইয়া আসেন, তখন শম্ভুনাথকে প্রত্যহ দেখিয়াছেন এবং দিন দিন তাঁহার শ্রদ্ধা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। তিনি উৎসাহশীল এবং পরিশ্রমী ছিলেন এবং সত্যনির্ণয়ের জন্য তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করিতেন এবং প্রকৃত তথ্য সযত্নে বিচারপতির গোচরে আনিতেন। বিচারপতিরূপে তিনি এইরূপ অধ্যবসায়, সাধুতা ও স্বাধীনচিন্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক (মহারাজ স্যর) যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর মহাশয়ের ও বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ডব্লিউ এ-মন্টিউ মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুইটি শোকসূচক ও সহানুভূতিপূর্ণ পত্র পাঠ করেন।

ইহার পর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার ডয়েন এক দীর্ঘ ওজস্বিনী বক্তৃতায় শম্ভুনাথের গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে স্বর্গীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের বিবিধ সদ্গুণাবলি স্মৃতিপটে চির দেদীপ্যমান রাখিবার জন্য একটি সাধারণ স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত হউক ও চাঁদা সংগৃহীত হউক। বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইবা মাত্র মৃত বিচারপতির একটি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া বিচারালয়ে স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হউক। অনুকূলচন্দ্র সুদীর্ঘ বক্তৃতায় মৃত বন্ধুর প্রশংসা কীর্ত্তন করেন এবং বলেন যে যদিও তিনি সরকারী উকীলরূপে আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন তথাপি তিনি "আসামীর উকীল" বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কারণ কোথাও কিছু সন্দেহের অবকাশ থাকিলে তিনি তাহা পরিষ্কারভাবে বিচারপতিকে দেখাইয়া দিতেন এবং সন্দেহজনক বলিয়া আসামীকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহা বিচারপতিকে বিবেচনা করিতে স্পষ্ট ভাষায় অনুরোধ করিতেন। আসামীর উকিল তাঁহার সাধু ও নিরপেক্ষ ব্যবহারে সর্ব্বদাই বিস্মিত হইতেন।

মৌলবী (পরে নবাব বাহাদুর) আবদুল লতিফ খাঁ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন যে শম্ভুনাথ মুসলমানদিগের জীবনযাত্রা প্রণালী ও আচার-ব্যবহারাদি উত্তমরূপে জানিতেন এবং যেরূপ সমপক্ষপাতিত্ব সহকারে তিনি বিচার করিতেন তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস ও প্রকৃষ্টরূপে শ্রদ্ধা করিতেন।

বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় শম্ভুনাথের বিবিধ গুণগ্রামের সুখ্যাতি করিয়া তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে চিত্র প্রতিষ্ঠাদির ব্যয়ভার বহন করিয়া স্মৃতি-ভাণ্ডারে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে তাহা কোনও জনহিতকর উদ্দেশ্যে স্বর্গীয় বিচারপতির নামে উৎসৃষ্ট হইবে। যে স্মৃতি-রক্ষা-সমিতি গঠিত হইতেছে সেই সমিতি স্থির করিবেন কিরূপে উহা

শম্ভুনাথ পণ্ডিত।
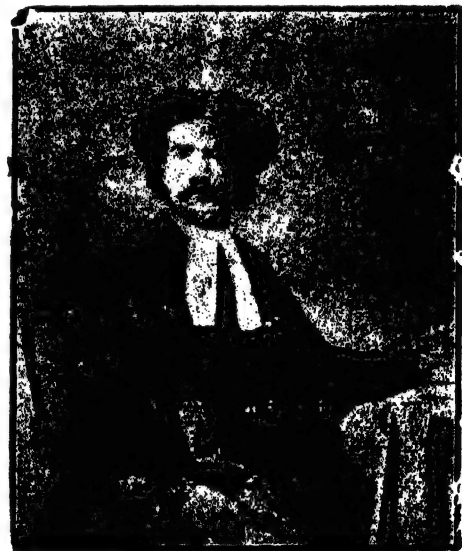
ব্যয়িত হইবে। বাবু মহেন্দ্রলাল সোম এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন, তিনি শম্ভুনাথের ছাত্র ছিলেন এবং তিনি বিস্মিত হইতেন যে ব্যবহারা-জীবের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া শম্ভুনাথ কিরূপে ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপনা

করিতেন। তিনি অধ্যাপক হিসাবে যে বেতন পাইতেন তাহার অধিক অর্থ তিনি ছাত্রদিগের জন্য বক্তৃতা-মুদ্রণ ও বিতরণাদি দ্বারা ব্যয় করিতেন। অতঃপর আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে সদস্যসংখ্যা বৰ্দ্ধিত করিবার ক্ষমতাযুক্ত নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি স্মৃতি-রক্ষণ সমিতি গঠিত হউক :

মাননীয় বিচারপতি এইচ-ভি-বেলি, মাননীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, মুন্সী আমীর আলি খাঁ বাহাদুর, বাবু দিগম্বর মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক, বাবু ভোলানাথ মল্লিক, বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ, মিষ্টার মানকজী রস্তমজী। মিষ্টার আর, টি এ্যালান ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় অবৈতনিক সম্পাদক। মিষ্টার আর টি অ্যালান এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এই স্মৃতি-সমিতির চেষ্টায় হাইকোর্টে শম্ভুনাথের একটি সুন্দর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালও তাঁহার স্মৃতি কলিকাতাবাসীর মনে জাগরূক রাখিয়াছে। শম্ভুনাথের পুত্র প্রাণনাথও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে এম-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের উকীল হইয়াছিলেন। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৃত্তিভোগী আইন-অধ্যাপক রূপে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় যে সকল সারগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং জাতীয় মহাসভায় উৎসাহশীল কৰ্ম্মীরূপে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মৃতি বহুকাল উজ্জ্বল রাখিবে। অকালে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে ইনি যে পিতার ন্যায় যশস্বী হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস

শম্ভুনাথ সরল, অমায়িক, মিষ্টভাষী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার অতিথিবাৎসল্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে আহার করাইতে ভালবাসিতেন। শৈশবের বন্ধুগণ, যে অবস্থাতেই তাঁহারা থাকুন না, শম্ভুনাথের অকৃত্রিম প্রীতি হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই। তিনি প্রতি বৎসর সকল বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন। গিরিশচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন যে তাঁহার সহপাঠিগণকে কিরূপে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া একত্র সম্মিলিত করিতেন তাহা ভাবিলে সময়ে সময়ে সন্দেহ হইত যে তিনি বুঝি স্কুলের পুরাতন 'হাজিরি কেতাব' খানি চুরি করিয়া রাখিয়াছেন। শম্ভুনাথ দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার আয়ের অধিকাংশ পরোপকারে ব্যয়িত হইত।

মৎস্যাহরণে শম্ভুনাথের বিশেষ আনন্দ ছিল। তিনি অবসর পাইলেই মৎস্যাহরণে যাইতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি পুষ্করিণীসমন্বিত উদ্যান ক্রয় করিয়াছিলেন। ভ্রমণেও তিনি আনন্দ বোধ করিতেন। তিনি প্রায় প্রতি বৎসরেই দীর্ঘ অবকাশের সময় লক্ষ্ণৌ নগরীতে মাতুলকে দেখিতে যাইতেন।

শম্ভুনাথ একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কিছুকাল ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় আচার ব্যবহারাদি বর্জনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

দেশহিতকর সকল সৎকার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। পরোপকার তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কাশ্মীর প্রদেশবাসী হইলেও শম্ভুনাথের জন্মস্থান কলিকাতায়, তাঁহার প্রতিভার লীলাক্ষেত্র বাঙ্গালায়। তিনি বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন, সর্ব্ব বিষয়ে বাঙ্গালী ছিলেন এবং মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের উদার ঘোষণাপত্রানুসারে অত্যুচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতবাসীর যোগ্যতা তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রমাণিত করিয়াছিলেন, এজন্য বঙ্গবাসী চিরদিন গর্ব্ব অনুভব করিবে এবং বাঙ্গালীর স্মৃতিপটে তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি চিরদিন অপরিম্লান থাকিবে।

ধনোৎপাদন

...ধন কি? অতীত শ্রমের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, যেখানে ধন আছে—তাহার মূলে শ্রম এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আবার ইহাও দেখা যায়, ধনের মধ্যে শ্রম যেন অপরিস্ফুট ভাবে আবদ্ধ হইয়া আছে। আতসবাজী যথা তুবড়ীর মধ্যে বারুদ আবদ্ধ থাকে, কেবল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা করে, বিন্দুমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংযোজিত হইলেই আত্মবিকাশ করিয়া থাকে, তদনুরূপ ধন কিঞ্চিন্মাত্র শ্রম দ্বারা বিচলিত হইলেই ধনের অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্রম প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাই ধন ও শ্রমের সম্বন্ধ।

এডুকেশন গেজেট—প্রবোধচন্দ্র দে

কংফুট্জে বা কন্ফিউসিয়াস

—শ্রীশরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ইংরাজ জাতি যেখানে যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই সেখানকার স্থানীয় ভাষার খানিকটা ওলট্‌পালট্ করিয়াছে। কেন জানি না, এরা এমন করিয়া অপর ভাষার "শ্রাদ্ধ" করিয়া এক নূতন "খিচুড়ী" তৈয়ার করে! কলিকাতাকে করিয়াছে "ক্যাল্‌কাটা"—বারাণসীকে বলে "বেনারস্"—নাপোলিকে বলে "নেপল্‌স্"—এই রকম আরও কত কি! শুধু তাই নয়, আমাদের বন্দোপাধ্যায়কে বলে "ব্যানার্জ্জী", ঠাকুরকে বলে "টাগোর", এমন কি প্রাতঃস্মরণীয় বুদ্ধদেবকে বলে "বুড়্ঢা"। এই ভাবে, চীনের স্বনামধন্য পুরুষ কংফুট্জেকে ইংরাজী ভাষায় বলে "কন্ফিউসিয়াস"।

যাহা হউক, ইংরাজী ভাষা যত পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টাই করুক না কেন, কংফুট্জের উদার নীতির মূল্য কখনও কমিবে না। সারা চীনদেশ তাঁর উপদেশ মাথা পাতিয়া লইবে। এঁর মত বড়, এঁর মত উদার, এঁর মত ভাবুক বোধহয় চীনে আর কখনও জন্মায় নাই। যদিও চীন জাতি বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তবু সে উদার ধর্ম্মকে তারা প্রথমতঃ ঠিক বুঝিতে পারে নাই। বুঝিয়াছিল তখনই, যখন কং তাঁর উদার নীতি তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। অনেক চীনবাসী তাই কংকে বুদ্ধের সমান আসন দিয়া থাকেন। বুদ্ধকে মনে করেন ধর্ম্মনেতা কংকে ভাবেন সমাজ ও নৈতিক নেতা। সুন্দর যোগ—অভূতপূর্ব্ব মিশ্রণ - যেমন সোণায় সোহাগা।

কংফুট্জের জন্ম হয় খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫১ সালে—লু নামক স্থানে, (বর্ত্তমানে ইহা শাংটুং প্রদেশের, Shan-Tung Province অন্তর্গত)। সে আজ অনেক কালের কথা। তবু কংএর নৈতিক আধিপত্য আজও পর্য্যন্ত চীনবাসীদের উপর পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। শোনা যায় যে, তাঁর বংশধরেরা এখনও সেই একই যায়গায় বাস করিতেছেন। একই বাস্তুভিটায় ৭৬ পুরুষের বাস! সত্যমিথ্যার দায়িত্বভার আমি লইতেছি না—তবে জনপ্রবাদ যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে একথা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে।

চেষ্টা বোধহয় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য নৈতিক নেতা কংএর বেলায়ও এ চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। শুধু যে কং নিজে একজন মহাপুরুষ, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল না—তিনি যে বড়ঘরের ছেলে—তাঁর পূর্ব্বপুরুষরাও যে বড় ছিলেন, তাও বলা চাই। তাঁকে শুধু বড় করা নয়—এমন কি তাঁকে বিখ্যাত রাজবংশের ছেলে পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। সে আবার যে সে রাজবংশ নয়, একেবারে চীনের পৌরাণিক রাজবংশ। সে বংশের নাম ছিল হ্যাংটি (Hang-ti)। এ নাম অতি পুরাতন চীনের পুরাণে দেখা যায়। অন্য সূত্রে আবার জানা যায় যে, কংএর পিতা ছিলেন সামান্য একজন সৈনিক পুরুষ। কং সু লিয়াং হে (Kung Shuh Liang Heh), অর্থাৎ কংফুট্জের বাবা (বাবার নাম দেখিয়া কে বলিবে যে ইহার ছেলে হইলেন কংফুট্জে!) চাও নামক স্থানের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। কোন্ কথাটি বিশ্বাসযোগ্য তাহার বিচারের ভার পাঠকের উপর দিলাম।

অবশ্য বলা বাহুল্য যে, সে সময়ে চীনের শাসন-প্রণালী বর্ত্তমান প্রণালীর মত ছিল না। কারও কারও মতে "জোর যার মুল্লুক তার" প্রথা তখন সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে শুধু চীনকে দোষ দিলেই বা চলিবে কেন? ইউরোপের অবস্থা এর চেয়ে কিছু অন্য রকমের ছিল না। বরং ইতিহাস বিশ্বাস করিতে হইলে মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ও চীনে তখন অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত শাসন-প্রণালী ও সভ্যতা বজায় ছিল। প্রমাণের অভাবও নাই। রামায়ণ মহাভারতের যুগ বাদ দিলেও বুদ্ধ ও অশোকের সময় ভারতে যে সভ্যতা ছিল ইউরোপের কোথাও তা তখন ছিল না। তখন কেন, তার বহু পরেও দেখা যায় নাই।

কংফুট্জের বাবা "হে" তাঁর ৭০ বৎসর বয়সে এক যুবতীকে বিবাহ করেন। এর ফলে এর এক বৎসর পরেই চীনের ভবিষ্যৎ নৈতিক নেতা, কংএর জন্ম হয়। ৭০ বৎসরকে যদিও অতি-বার্দ্ধক্য বলা যায় না—তবু ৭০ বৎসর কিছু কম

পাওয়া যায় না) কং-এর মাত্র ৩ বৎসর বয়সেই তাঁর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হয়। শিশুর লালনপালনের ভার পড়িল বিধবার উপর। আর্থিক অবস্থা ছিল নিতান্ত অসচ্ছল, কেননা বৃদ্ধ হে তাঁর "বংশমর্য্যাদা" ছাড়া আর বিশেষ কিছুই রাখিয়া যান নাই। কিন্তু এ সম্পত্তি নিতান্ত তুচ্ছ করার জিনিষও নয়, প্রকৃতপক্ষে এই বংশ-মর্য্যাদা ভবিষ্যতে বালক কংকে অনেক সময় সজাগ রাখিয়াছিল। সে যাহা হউক, শুধু বংশমর্য্যাদায় কখনও কেহ বড় হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ভিতরে আরও কিছু থাকা চাই। বালক কংএর অতি শৈশব হইতে শিক্ষার দিকে বড় ঝোঁক ছিল। পড়াশুনা করার ও যে কোনও উপায়ে নূতন জ্ঞানলাভের পিপাসা তাঁর অদমনীয়। ইতিহাসে এসব ঘটনার পরিচয় বিস্তৃতভাবে কিছু পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু আমরা জানিতে পারি যে, যুবক কং মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তাঁর বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, নতুবা ঐ বয়সে তিনি কখনও "লু"র বিখ্যাত ধনকুবেরের প্রভূত জমিদারীর ম্যানেজার হইতে পারিতেন না। এর দুই বৎসর পরেই যে কং একটি বিবাহ করেন সে বিষয়ে ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়।

ধর্ম্ম-গুরুরা কেন যে বিবাহ করেন, তা আমরা সহজে বুঝি না। বুদ্ধদেব করিয়াছিলেন—কিন্তু যশোধরার দুঃখের কাহিনী হৃদয়বিদারক! রামকৃষ্ণ করিয়াছিলেন—অথচ স্ত্রীকে কখনও স্ত্রী ভাবিতে কাঁপিয়া উঠিতেন! এমন কি বাংলা দেশের আধুনিক স্বনামধন্য অরবিন্দ ঘোষ—যাঁকে ধর্ম্মগুরু না বলিলেও ধর্ম্ম-পাগল বলা যায়, তিনিও বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁর স্বর্গগতা স্ত্রী হতভাগিনী মৃণালিনীর কথা ভাবিলে আমাদের দুঃখ হয়। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য ধর্ম্মগুরু কংও বিবাহ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁর একটি পুত্র এবং দুইটি মেয়েও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবন চার বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই। তাতেই মনে হয়, মহাত্মারা কেন যে বিবাহ করেন এবং শেষে দু দিন না যাইতে তাঁদের জীবনে পরিবর্ত্তন আসে, তাহা আমাদের পক্ষে বলা সহজ নয়! বর্ত্তমান সমাজের বিবাহিত জীবনের সঙ্গে এই মহাত্মাদের জীবনে যে অনেক পার্থক্য ছিল, সে কথা আমরা কখনও ভুলি নাই। বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ, কংফুটজে সকলেই স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের স্ত্রীরা সকলেই স্বামীর এ-ত্যাগে শেষে গর্ব্বিতা হইয়াছেন। সকলেই তাঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া জীবনকে উন্নততর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর বর্ত্তমান সমাজের স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ এর তুলনায় সম্পূর্ণ অন্য রকম। কারও কারও মতে বিবাহিত জীবন ধর্ম্ম বা তত্ত্ব-অনুসন্ধানে বড় বাধা দেয়। অনেকের জীবনে তা দেখাও যায়। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করা হয় ত নিতান্ত অন্যায় না হইতে পারে যে, যদি বিবাহিত জীবন ধর্ম্মানুসন্ধানের অন্তরায়, তবে বিবাহ না করিলেই ত' হয়। শুধু শুধু অপর একটি নিরীহ প্রাণীকে কষ্ট দেওয়ার দরকার কি? এ বিষয়ে যীশুখৃষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক কংফুটজের জীবনে এ কথার প্রমাণ পাই তখনই, যখন আমরা ইতিহাসে দেখি যে, তাঁর জীবনের যা কিছু বড় কাজ সবই ২২ বৎসরের পর আরম্ভ। এর পর তিনি প্রায় ৫১ বৎসর পর্য্যন্ত নিজেকে অহরহ ব্যস্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন, নীতি শিখাইয়াছিলেন, প্রকৃত কর্ম্মযোগ শিখাইয়াছিলেন—সবই করিয়াছিলেন একাকী। একাকীই বা কেন বলি, সমস্ত চীনদেশ লইয়া, সমস্ত চীনদেশের জন্য, চীন জাতির জন্য এবং একটু ধীর চিত্তে দেখিলে হয়ত মনে হইবে যে সমস্ত মানব জাতির জন্য। তাঁর নূতন মত প্রচারের জন্য তিনি বেশী দিন কোথায়ও এক ভাবে থাকিতে পারিতেন না। আজ এখানে কাল আর কোথায়ও—আবার দুদিন পরে স্থানান্তরে।

কং-এর জীবনে পরিবর্ত্তন আনার একটি বিশেষ কারণ আমরা দেখিতে পাই তাঁর মাতৃবিয়োগ। এমন আঘাত বোধ হয় আর কিছুতেই তাঁকে দেয় নাই। এত বড় অভাব বোধ হয় আর কিছুতেই হইতে পারে না। জগতে কত ঐশ্বর্য্য আছে, কত সৌন্দর্য্য আছে—আরও কত স্নেহ ভালবাসা আছে, কিন্তু কংফুটজের কাছে এর সবগুলি মিশিয়াও তাঁর মায়ের অভাব পূরণ করিতে পারিল না। প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ত্যাগ, মায়া, দয়া সবই যেন তাঁর মায়ে পূর্ণ অবস্থায় ছিল, সেই মায়ের মৃত্যুতে কং-এর কাছে সবই যেন শূন্য বলিয়া মনে হইল।

তখনকার দিনে চীনে মৃতদেহ কবরে দেওয়া হইত। কংএর মায়ের সৎকারও সেই নিয়মে করা হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য মৃত্যুতে কেউ বেশী দিন মৃতকে মনে রাখিত না, গোর

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির গর্ভে চাপা পড়িত। কিন্তু কং-এর প্রাণে তাঁর মায়ের তিরোধান এমন গুরুতর ভাবে লাগিয়াছিল যে, তিনি কখনও তাহা নিজে মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তিনি মায়ের সমাধির উপর এক প্রকাণ্ড স্তূপ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। এতেই তিনি তাঁর স্মৃতি অহরহ মনে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর দুই বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত কং বাইরের জগতের কিছুই দেখেন নাই। নিজেকে বদ্ধ কুটিরে রাখিয়া মায়ের স্মৃতি মনে পুষিয়াছিলেন। এজন্য তাঁকে অনেকে হয়ত পাগল বলিতে পারে—কিন্তু এই নির্জ্জন বাস সম্পূর্ণ বৃথা হয় নাই। এর পরে তাঁর এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা যায়। তাঁর কথা, তাঁর ব্যবহার, তাঁর উপদেশ সম্পূর্ণ এক নূতন রকমের হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁর কয়েকটি চেলা জুটিয়া যায়। অথচ গুরু কং-এর বয়স মাত্র তখন ৩০ বৎসর—কিন্তু তাঁর মুখের উপদেশ-বাণী শুনিলে মনে হইত যেন তিনি কোনও অতি বৃদ্ধ, অতি দুরদর্শী, অতি জ্ঞানী গুরু।

এই সময়ে চীনে অপর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখা যায়। এঁর নাম "লাও ত্‌সজ" (Lao Tsz') ইনি ছিলেন চীনের তাওইজমের (Taoism) প্রবর্ত্তক। বিদ্যা, বুদ্ধি, ও বিচক্ষণতায় ইনিও একজন কম নেতা নন। খৃঃ পূর্ব্ব ৫১৭ সালে কং এই মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা করিতে লো-ইয়াং(Lo-yang) নামক সহরে যান। দেখাও হয়, কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হইল না। এর বিশেষ কারণ বোধহয় এই যে, একজন ছিলেন ধর্ম্মনেতা, অপর জন নৈতিক নেতা। প্রকৃতপক্ষে কংকে ধর্ম্মনেতা বলা চলে না, তিনি প্রচার করিতেছিলেন যে, "তোমরা মানুষ হও, ধর্ম্ম চুলোয় যাক্‌।" তিনি নিজে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন কিনা তাও খুব জোর গলায় বলা যায় না। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলিতেন, "দেবতাদের খাতির কর, ভক্তি কর, পূজা দাও, তবে তাদের সঙ্গে যত কম সম্ভব মেশামিশি করিও" ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন কং হয়ত বা নাস্তিক ছিলেন। দেবতার উপর বিশ্বাস ছিল না বটে, তবে বাপ মাকে দেবতার স্থান দিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। এ জগতে মা বাবাই সাক্ষাৎ দেবতা—একথা তিনি নিজে যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাঁর শিষ্যদেরও তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখনকার লোকে অজানা ভগবানকে পূজা দিত, তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিত, তাঁদের নামে প্রাণ বলি পর্য্যন্ত দিতে পারিত। কিন্তু কং বলিতেন "ও সব বাজে কাজ", ওর কিছু মাত্র দরকার নাই। তোমরা প্রথমে মানুষ হও, তা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষের ব্যবহার যদি ভাল হয়—অর্থাৎ মানুষের মত হয়, তবে সংসার ভাল হবে ; সংসারগুলি যদি ভাল হয়, তবে দেশ ভাল হবে ; দেশ যদি ভাল হয়, তবে দেশের আর দুর্গতি কোথায় ? রাজা যদি প্রজার মঙ্গল না দেখেন তবে সে রাজাকে মেনে কাজ নাই এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেখানে ভাল লোককে বসাতে কোনও দোষ নাই।" কং-এর এই উপদেশ চীনে বহুবার লোকে নিয়েছিল ও বহুবার অকর্ম্মণ্য রাজাকে বদলাইয়া নূতন রাজাকে সিংহাসন দিয়াছে।

প্রাচীন চীনের উপর দিয়া অনেক ঝড়-ঝাপটা গিয়াছে। সামাজিক, নৈতিক ও দৈবিক নানা রকমের ধাক্কা চীনা জাতিকে সহ্য করিতে হইয়াছে, জাতি অতি পুরাতন হইলে তাহাতে অনেক রকমের জঞ্জাল আসিয়া জোটে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। চীনের বেলায়ও একথা সত্য হইয়াছিল, নবীন চীনের নেতারা ঐ সব জঞ্জাল সংস্কার করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। চীনের লম্বা টিকির কথা আমরা এখনও ভুলি নাই, চীনের আফিং খাওয়ার কথা আমরা বেশ জানি, চীনের গৃহ-বিদ্বেষের দুর্ঘটনায় এখনও আমরা শিহরিয়া উঠি। নবীন চীন, সেই পুরাতন নেতা কং-এর আদর্শ দেখাইয়া চীনের সংস্কার করিতে ব্যস্ত, বুদ্ধের ধর্ম্ম ও কং-এর নীতি আজ নবীন চীনকে নূতন পথ দেখাইতেছে। বুদ্ধের ধর্ম্ম খুব বেশী কাজ করুক না করুক, নবীন চীন তার নৈতিক নেতা কংকে আজ খুব বড় করিয়া চিনিয়াছে। তাঁর উপদেশ, তাঁর আদর্শ, তাঁর নীতি আবার তারা নূতন করিয়া শিখিতেছে ও শিখাইতেছে। আজ চীনের সর্ব্বত্র শোনা যায় সেই পুরাতন কংএর পুরাতন উপদেশ, "আবার তোরা মানুষ হ"। শুধু চীনে নয়, একথা সব দেশে, সব সময়ে ও সকল রকম লোকের পক্ষে প্রয়োগ করা যায়, তাই মনে হয় কং শুধু চীনের নেতা নয়—তিনি জগতের নৈতিক নেতা।
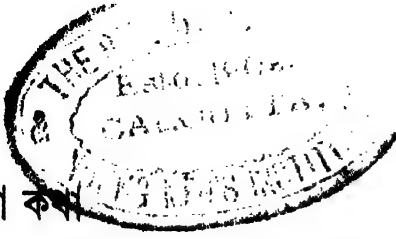
শোনা কথা

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পরের মুখের কথা। শোনা কথার কতটুকু বিশ্বাস, কতটুকু অবিশ্বাস করিব, সে সম্বন্ধে কোনো বিধি নাই। কাছারি-আদালতে শোনা কথার দাম নাই, জানি; কিন্তু কাছারির বাহিরে যে বিশাল বিশ্ব, সে বিশ্বে শোনা কথা অচল নয়!

কথাটা যার মুখে শুনিয়াছি—সে ছিল এ বিচিত্র-নাটকের নায়ক। সে আত্মজীবনী লিখিতেছে বলিয়া মনে হয় না; এবং তেমন সঙ্কল্প থাকিলেও আমাকে ডাকিয়া এ কাহিনী শুনাইবার হেতু ছিল না। আমি বাঙ্গালা বইয়ের ব্যবসা করি না। কাহিনীটিতেও যেন একটু···

কিন্তু সে ইঙ্গিত গোড়ায় দিয়া কাহারো মনকে দ্বিধাতুর করা উচিত নয়।

সহসা আমাকে দেখিয়া এ কাহিনী বলিবার বাসনা তার কেন হইল, জানি না। কাহিনীটুকু মনে আছে; আর সেই সঙ্গে মনে আছে—আষাঢ়ের নবীন মেঘে তখন আকাশের আপ্রান্ত ঢাকিয়া গিয়াছে—সামনে নদীর জল গাঢ় ঘোলাটে মূর্ত্তি ধরিয়া নিকষ-কালো আকাশের পানে চাহিয়া আছে অচঞ্চল দৃষ্টিতে—যেন কিসের প্রতীক্ষায়।

নলিন কহিল—সেক্‌স্‌পীয়রের মত পণ্ডিত লোক আর দেখলুম না। এত কেতাব ঘাঁটলুম···অমন দামী কথাও কেউ লিখতে পারল না! সেই যে কথা—There are more things···

গায়ে রোমাঞ্চ জাগিল। কথাটাকে পাঁচজনে এমন হেলার বস্তু করিয়া তুলিয়াছে···

নলিন কহিল—আমার নিজের জীবনের কথা শুনলেই বুঝতে পারবে, আমাদের জ্ঞান কত সঙ্কীর্ণ। না-দেখা কত কি যে পৃথিবীতে আছে, আমরা তার কোন হদিশ রাখি না।

হাতে কাজ ছিল না। নলিনের পানে চাহিয়া ছিলাম। চোখে বোধ হয় কৌতূহল জাগিয়াছিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া কোনো ভূমিকা না ফাঁদিয়া নলিন একেবারে কাহিনী সুরু

এম-এ পড়ি। কলিকাতার হোষ্টেলে বাস। মন কিন্তু পড়িয়া থাকিত হুগলীতে। কারণ ছিল।

হুগলীতে থাকিতেন ব্রজকিশোর বাবু। পিতার তিনি বন্ধু। গঙ্গার তীরে মস্ত বাড়ী, সঙ্গে বাগান। ব্রজকিশোর বাবুর স্নেহের আতিথ্য! নদীর বুকে নৌকায় চড়িয়া বেড়ানো। নীল নির্ম্মল আকাশে চাঁদ উঠিত—চাঁদের জ্যোৎস্নায় বাড়ী ও বাগান সাজিত যেন স্বপ্ন-পুরী! পুকুরে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা—বাগানে ফুল তোলো—গাছের ছায়ায় চুপ্‌চাপ্ বসিয়া থাকা! আরামের অন্ত ছিল না। সব চেয়ে সেরা আরাম কিন্তু—নীরা!

নীরা কিশোরী। নীরা কুমারী। নীরা ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। নীরা চমৎকার গান গায়। সব চেয়ে চমৎকার তার চোখের চাহনি! অর্থাৎ নীরাকে হৃদয়-মন সঁপিয়া বসিয়া ছিলাম। এ-কথা কেহ জানিত না। নীরাও না।

নীরা ব্রজকিশোর বাবুর ভগ্নীর কন্যা। তার মা নাই, বাপ নাই। ব্রজকিশোর বাবু বিবাহ করেন নাই। সারা জীবন দেশ-উদ্ধারের হুজুগে মাতামাতি করিয়া বেড়াইতে-ছেন। ঘরে যদি অঢেল পয়সা থাকে, তাহা হইলে দেশ-উদ্ধারের এ খেয়াল সাজে। দেশের কথা ভাবিবার সময়ও মানুষের থাকে। সে-সময় ব্রজবাবুর ছিল প্রচুর।

কথায় কথায় নীরার ভবিষ্যতের কথা উঠিত। ব্রজকিশোর বাবু বলিতেন—দেশের কাজে নিজেকে তুই সঁপে দে মা। কাজ কি বিয়ে করে' সংসারের ছোট্ট গণ্ডীতে ঢোকা? সে তো সকলে করছে! তাতে হচ্ছে ছাই! আমি বলি, তুই একেবারে···

তাঁর মুখের কথায় জোয়ান্ অফ আর্ক যেন ফরাসী ইতি-হাসের পাতা ছাড়িয়া হুগলীর বাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে থাকিত। ভবিষ্যতের কি ছবি যে দেখিতেন। ব্রজকিশোর বাবুর দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।

নীরা গম্ভীরে বলিত—হাঁ মামা, আমি তাই করবো।

অর্থাৎ নীরাকে বুঝিবার উপায় ছিল না। কখনো দেখিতাম, ফুলে-ভরা গুলঞ্চ গাছের তলায় বসিয়া আছে উন্মনা—দুই চোখে রাজ্যের স্বপ্ন! কখনো দেখিতাম, হাস্যোচ্ছ্বাসে যেন বন্যা বহাইয়া দিয়াছে। মাসিক-পত্রগুলাকে সে বয়কট করে নাই—পড়ে। যখন মাসিক-পত্র পড়ে, তখন তার কবিতাগল্পও বাদ দেয় না নিশ্চয়! এই যে কিশোর বয়সে মনের রঙীন স্বপ্ন.. সে বোঝে না? কে জানে! আমি বুঝিতাম না। তাকে পাওয়ার জন্য আমার মন খুব বেশী অধীর হইত।

ছুটী পাইলে আমি ছুটিতাম হুগলীতে। ব্রজকিশোর বাবু আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—মা-বাপের কাছ থেকে দূরে পড়ে থেকে মনটা পাথর বনে যাবে, বাবা। যখন সময় পাবে, এখানে আসবে।

মা-বাপ থাকেন পেশোয়ারে। ব্রজকিশোর বাবুর কথা পরম নিষ্ঠায় আমি পালন করিতেছিলাম।

সেবারে গুড-ফ্রাইডের ছুটীতে হুগলীতে আসিলে ব্রজকিশোর বাবু বলিলেন,—ভালো হয়েছে। আমি যাচ্ছি পাঁশকুড়ায়। কনফারেন্স আছে। আমি তার সভাপতি। একবার ভেবেছিলুম, নীরাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। তারপর ভাবলুম, না। আমরা সেখানে হৈ-হৈ করে বেড়াবো—ও বেচারী আড়ষ্ট হয়ে থাকবে। তার উপর এবারে যে রকম দলাদলির গন্ধ পাচ্ছি, কি জানি, একটা কুরুক্ষেত্র ঘটা বিচিত্র নয়। কাজেই···তা তুমি এখানে থাক বাড়ীর চার্জ্জে। আমি নিশ্চিন্ত মনে কন্‌ফারেন্স করে আসি।

বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনো মতে কহিলাম—বেশ!

ভাবিয়াছিলাম, নীরার সঙ্গে মাঝে মাঝে ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চা তো করি—এবারে সেই ফাঁকে কোনোমতে হৃদয়-বৃত্তির কথা পাড়িয়া দেখিব। কিশোরী কুমারী—সত্যই কি বুকখানা পাথরে রচা? সে পাথরে নীরা শুধু হেঁয়ালির দাগ টানিয়া চলিয়াছে?

বৃহস্পতিবার রাত্রে ব্রজকিশোর বাবু পাঁশকুড়া যাত্রা করিলেন। শুক্রবার রাত্রি নটা পর্য্যন্ত নীরা আমার সঙ্গে অনেক কথা কহিল; গান গাহিয়া শুনাইল। হৃদয়-তত্ত্বের কথা পাড়িবার জন্য বহুবার আমি রুখিয়া উঠিলাম; কিন্তু নীরার হাবে-ভাবে-ভঙ্গীতে এমন সহজ সারল্য যে আমার মনের কথা মনের কোণে পড়িয়া ধুঁকিতে লাগিল—তার ঝুঁটি ধরিয়াও তাকে মনের বাহিরে আনিতে পারিলাম না।

রাত্রি প্রায় বারোটা। বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছি; চোখে ঘুম আর আসে না। বাহিরে এক-আকাশ জ্যোৎস্না। আমার মনেই শুধু রাজ্যের অন্ধকার জমিয়া আছে।

পাশে স্বর শুনিলাম,—ব্রজবাবু কবে ফিরবেন, জান?

চমকিয়া উঠিলাম। এত রাত্রে···দোতলার ঘরে কে কোন্ অপরিচিত···?

ফিরিয়া চাহিলাম। দেখি, দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া···

মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ ছমছম্ করিয়া উঠিল। এ যেন ব্রজ-কিশোর বাবু···মূর্ত্তি খুব স্পষ্ট নয়। যেন খানিকটা কুয়াশার অন্তরালে প্রাণপণে আপনাকে গোপন রাখিয়াছে।

অমঙ্গল-আশঙ্কায় সারা দেহে রোমাঞ্চ! তবে কি···

এমন হয়, শুনিয়াছি। প্রিয়জন দূর-বিদেশে অন্তিম-বিদায় লইয়া গেলে গৃহে ছায়া-শরীরে আসিয়া দেখা দেন। এ বিষয়ে চাক্ষুষ কখনো কিছু দেখি নাই। গল্প শুনিয়াছি।

মূর্ত্তি কহিল,—বল না বাপু।

কহিলাম—তাঁর ফিরতে তিন-চার-দিন দেরী হবে।

মূর্ত্তি নিশ্বাস ফেলিল। আরামের নিশ্বাস! কহিল—বাঁচলুম! আড়াই বৎসর এ বাড়ীতে আছি। ভদ্র-লোককে কখনো দেখলুম না, রাত্রে বাইরে গিয়ে বাস করলেন। তুমি বুঝবে না, আড়াই বৎসর কি কষ্টে আছি! আজ প্রথম একটু আরাম বোধ করলুম।

কথার সঙ্গে সঙ্গে একখানা চেয়ার টানিয়া মূর্ত্তি তাহাতে চাপিয়া বসিল। বুঝিলাম, খানিকটা বকিবে। আমাকেও উঠিয়া বসিতে হইল।

আমি কহিলাম—আড়াই বৎসর এখানে বাস করছেন! কথাটা বুঝলুম না।

সে কহিল—তোমাকে জানি। এ বাড়ীতে দেখেছি অনেক বার। আরো জানি, এখানে তোমার আসার আসল উদ্দেশ্য!

হৃদ্‌পিণ্ডটা বিষম বেগে দুলিয়া উঠিল। দেহের সমস্ত রক্ত ছলাৎ করিয়া নাচিয়া একেবারে গিয়া যেন মাথায় চড়িয়া বসিল।

সে হাসিল, হাসিয়া কহিল—ইংরাজিতে কথা আছে, জান তো—None but the brave…অত কাঁচুমাচু হয়ে চিন্তা করলে সুন্দরী-লাভ হয় না। সাহস করে বলে ফেল—নীরা, তোমাকে আমি ভালবাসি! তুমি আমার…

সঙ্গে সঙ্গে হাসি! শিহরিয়া উঠিলাম।

হাসি বন্ধ করিয়া মূর্ত্তি আবার কহিল—ভয় হচ্ছে? কি করে তোমার মনের কথা আমি জানলুম? জানবার হেতু আছে। তার মানে, আমাদের শক্তি তোমাদের চেয়ে বেশী। তোমরা দেখ শুধু বর্ত্তমান আর অতীত। আমরা সেই সঙ্গে দেখি ভবিষ্যৎ! তোমরা দেখ বাহিরের স্থূল ব্যাপার। আমরা দেখি মনের ভিতরে অতি যে সূক্ষ্ম ভাব জাগে, তাই। জীবিত আর মৃত—এ দুয়ে শক্তির ভেদ আছে। তোমাদের বিলাতী বিজ্ঞানও আজ এ-কথা মানতে বাধ্য হয়েছে।

ভয়ে রক্ত হিম হইয়া গেল। প্রাণটা দেহে কোন মতে টি঳কিয়া আছে—স্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম। বাকী সব কোথায় কোন্ বাষ্পলোকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মূর্ত্তি কহিল,—যা ভাবছো—তাই। ভূত! তোমরা বিশ্বাস কর না! না কর, তবু আমি ভূত এবং আমি আছি।

ভূত চুপ করিল। দু' চার মিনিট চুপ করিয়া রহিল; তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কি দুর্দ্দশায় বাস করছি—শুনলে তোমার চোখে জল আসবে। শোন…বলি…খুব আশ্চর্য্য কাহিনী! বিশ্বাস করবার মত নয়।

নিরুপায় বসিয়া রহিলাম। খুব ভয় হইতেছিল। কোন দিন ভূত মানি নাই; কাজেই এ দিকটায় ভয়ের লেশ মনে কখনো জাগে নাই। আজ…এই নিশীথ রাত্রি…ঘরে আমি একা…

কিন্তু নিরীহ ভূত! ভদ্রলোক! তার উপর দুঃখের কথা বলিতে আসিয়াছে·

ভূত-ভদ্রলোক কহিল,—তোমাদের এই পৃথিবীতে বেকার সমস্যা খুব প্রবল হয়েছে—সেজন্য তোমাদের দুর্ভাবনার অন্ত আমাদের ভূত-লোকেও ঠিক এই দশা! অর্থাৎ এমনি বাতাস হয়ে আমরা থাকতে পারি না। থাকবার জন্য আমাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন। সে আশ্রয় হওয়া চাই জীবন্ত …সে মস্ত তত্ত্ব-কথা। এদিকে খানিকটা জ্ঞান না থাকলে সে কথা বুঝবে না। আমার কথা খুলে বলি। মানুষ মারা গেলে ভূত হয়—তোমাদের মনে এমনি ধারণা আছে। নয় কি? এ-ধারণা ঠিক নয়। তা যদি হতো, তাহলে যত মানুষ মরছে, তাদের প্রেতাত্মায় ভরে বাতাস আজ ভারী হয়ে থাকত! নিশ্বাস ফেলতে তোমরা বাতাস পেতে না! এ থেকে বুঝবে, ব্যাপার আসলে তা নয়। মানুষ, পশু, পাখীর মত ভূত বা প্রেত বলে' এক শ্রেণীর ছায়া-দেহী জীব আছে। মানুষ মারা গেলে তার দেহ-হীন আত্মায় ভর করে এই প্রেতের দল; এই ভর করায় তাদের আশ্রয় মেলে। তখন তাদের জীবন হয় সহজ।…আশ্রয়ের জন্য আমি আত্মা পাচ্ছিলুম না। ভূতের বংশ বেড়ে উঠেছে অসম্ভব! আড়াই বৎসর পূর্ব্বে মরা মানুষের দেহের জন্য আমি যখন হা—হা করে বেড়াচ্ছি, তখন এই ব্রজ-কিশোর বাবুর খুব বেশী-রকম অসুখ হয়। দীর্ঘ কাল রোগ-ভোগের পর ডাক্তাররা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে ভিজিটের টাকা নিয়ে পকেট ভরে চলে যান। ওঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল, সেই ফাঁকে আমি এসে ওঁর আত্মায় আশ্রয় নিই! তারপরে ঘটলো বিপদ! অর্থাৎ ওঁর কে আত্মীয়—ডাক্তার—সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন—তিনি কি একটা ওষুধ ইন্‌জেক্ট করলেন। তার ফলে ব্রজবাবু উঠলেন বেঁচে। ওঁর বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে হলো আমার দুর্দ্দশার সূত্রপাত! আমি নড়তে পারছি না। এখন আমাকে আশ্রয় নিতে হবে অপঘাতে মরা কারো দেহে! অপঘাত নিত্য ঘটছে—মোটর গাড়ীর বেশে যমরাজ এসে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছেন—সঙ্গে যত চর—তারা লাইসেন্স নিয়ে ড্রাইভারী করছে। হলে কি হবে? যে সব ছোকরা ভূত আছে, তারা ভারী ত্বরিৎকর্ম্মা। তারা মোটরের সঙ্গে সঙ্গে, এরোপ্লেনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেমন চোট হওয়া—অমনি শকুনির মত নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে তারা জখমী দেহে ভর করে বসে। মোটরের চোট খেয়ে বহু লোক যে মরছে, তার একটা কারণ, এই সব ছোকরা ভূতদের কামড়াকামড়ির গুঁতোয়! আমি এখানে

বন্দী হয়ে আছি ব্রজবাবুর দেহে। উনি বেঁচে আছেন বলেই আমার শক্তি নিস্তেজ। শুধু হুজুগের দিকে ব্রজবাবুকে মাতিয়ে নাচিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছু করবার শক্তি আমার নেই। ভাব একবার বিপদ!

কোনোমতে দরদ জানাইবার অভিপ্রায়ে কহিলাম—তাই তো! ব্রজবাবু কোন অত্যাচার করেন আপনার উপর?

—তা করেন না। কিন্তু আমি যে হাত-পা বাঁধা বন্দী!

একটা কথা মনে জাগিল। কহিলাম—গয়ায় আপনার পিণ্ড দিলে কোনো ফল হয় না?

ভূত-ভদ্রলোক কহিল,—পিণ্ড দিতে হলে সে পিণ্ড দিতে হবে ব্রজবাবুর উদ্দেশে! আমার তাতে লাভ? তাছাড়া ব্রজবাবু বেঁচে আছেন। জ্যান্ত লোককে কে আর কবে পিণ্ড দিয়েছে? সে নিয়ম নেই।

কোনো জবাব মাথায় আসিল না। ভূত ভদ্রলোক বিমর্ষ মলিন মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কহিলাম,—এঁর দেহ ছেড়ে আর কোনো দেহে আশ্রয় নিলে পারেন!

ভূত কহিল,—অন্য দেহে আশ্রয় করব, তার সন্ধান নেওয়া চাই! এ দেহ ছেড়ে বেরুবার উপায় নেই। ছুটী মেলে শুধু দিনের বেলায়। রাত্রে এইখানে আমায় ফিরতে হয়। ব্রজবাবুর যে রকম শরীর, তাতে উনি চট্ করে মারা যাবেন, এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

আমি কহিলাম—নাই বা অন্য আশ্রয়ে গেলেন। ব্রজবাবু তো জানেন না, আপনি তাঁকে ভর করে আছেন! আপনার কোন অনিষ্ট হবার ভয়ও নেই!

ভূত-ভদ্রলোক কহিল,—আমি ভর করে আছি বলেই ওঁর এই বক্তৃতার বাতিক বেড়েছে! তা ছাড়া অনেক সময় অনেকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যে, আমি ওঁকে ভর করে না থাকলে তা করতেন না! তার প্রমাণ, ওঁর এই ভাগ্নী! ভাগ্নীটি ডাগর হয়েছে। তার বিয়ে দেবেন, সে কথা মনে জাগে না। বলেন, বিয়ে দেবেন না—ভাগ্নী ভারত উদ্ধার করে বেড়াবে! তোমার মত এমন পাত্র সামনে রয়েছে—ভাগ্নীর প্রেমে তুমি আকুল! তবু এ কথা ওঁর মনে জাগে না—তোমার হাতে বিয়ে দেওয়া চলে অনায়াসে। তুমিও তাই চাও। তোমার তাতে মঙ্গল—তাঁরো মঙ্গল। এ কথা যে তাঁর মনে জাগে না—শুধু এই আমি-ভূত ওঁকে পেয়ে আছি বলেই না? ভূতে না পেলে সহজ মানুষ কি এমন কথা চিন্তা করে?

আমার সর্বাঙ্গ বহিয়া একটা চমক! আমি নিশ্বাস ফেলিলাম।

ভূত-ভদ্রলোক কহিল—তাছাড়া সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে আমাকে থাকতে হয়। বল কি, জ্যান্ত মানুষের দেহ! এ তো ধাপ্পা। তোমাদের আইনে যাকে বলে ট্রেশপাশ!

কহিলাম,—জ্যান্ত মানুষকেই ভূতে পায়, শুনি।

ম্লান মৃদু হাস্যে ভদ্রলোক কহিল—পায়, কিন্তু পাবার আগে তাকে কায়েমি ভাবে ভূত হতে হয়! অর্থাৎ মরা মানুষকে আশ্রয় করেই তার ভূত-ত্ব! আমার যে গোড়ায় গলদ! আমি না ভূত, না কিছু! এ কথা ভূত-লোকে রাষ্ট্র হলে আমার কি সাজা হবে—'ইন্টার্নমেণ্ট' কি 'এক্সটার্নমেণ্ট' তাই ভেবে আমি একেবারে শিউরে রয়েছি সারাক্ষণ। বাইরে কোথাও ঘুরতে যেতে পারি না—আর একটা ভূতের সঙ্গে দেখা হলে ধরা পড়ে যাব। বুঝছ না?

কহিলাম,—বুঝেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি কি-বা করতে পারি—বলুন।

ভূত-ভদ্রলোক কহিল,—ভূত-লোকে বেকারের সংখ্যা নেই! মানুষ খুব মরছে, জানি। কিন্তু মরতে না মরতে এত ভূত আশেপাশে তাকে ঘিরে থাকে যে ফস্ করে কাকেও আশ্রয় করব, সে উপায় থাকে না।

আমি কহিলাম—, আপনাদের ভূতলোকে 'রেকমেণ্ডেশন' নেই? আত্মীয় স্বজনকে 'পুশ' করবার চেষ্টা? এই যে কাল্‌কাটা কর্পোরেশন—কর্পোরেশনের মত পার্টি-ফিলিং নেই?

—না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। একজন অজানা ভূতকে পাশে লইয়া রাত্রি-যাপন! কাজটা নিরাপদ নয় বুঝিয়া কহিলাম,—আমার কাছে এ-সব কথা বলছেন যে—আপনি কি চান?

ভূত কহিল,—আমি বাসা বদলাতে চাই। অর্থাৎ একটি মরা লোক পেলে…

চমকিয়া আমি কহিলাম,—আমাকে আত্মহত্যা করতে বলেন ?

—না—না। তা নয়।

ভূত-ভদ্রলোক হাসিল। হাসিতে খনিকটা বাষ্পের আভাস! কহিল,—অবশ্য জানি, তোমাদের জীবলোকে তরুণীর প্রেমে বিভোর তরুণ প্রেমিক নিরাশ হয়ে আত্মহত্যা করে। —তুমি তেমন কাজ করবে বলে মনে হয় না। তবে অল্পবয়সী প্রেমিক আর কোনো তরুণের সন্ধান আমায় দিতে পারেন না? তোমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কারো মন এমন নেই যে জীবনের ভার নামিয়ে দিতে চায়—কিম্বা আরো নানা-কারণে জীবনে যার রুচি নেই? দয়া করে একটু যদি সন্ধান রাখ, তোমার কাছে আমি ঋণী থাকব এবং এমন ব্যবস্থা করব, যাতে তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হয়।

—কি করে?

—আমি দেখেছি, ব্রজবাবুর ভাগ্নীর সঙ্গে যখন তুমি কথাবার্ত্তা কও, তখন কি কথা বলবার জন্ম তোমার মন উশখুশ করতে থাকে···অথচ লজ্জায় সে কথা বলতে পার না। তাতে কি ব্যথাই তুমি পাও! এ দুঃখ কেন সও? আমার কথা শোন—ওঁকে নিয়ে তুমি 'ইলোপ' কর। There is nothing unfair in love and war···হাঃ হাঃ হাঃ।

মনে যেন কে আগুন জ্বালিয়া দিল! কহিলাম,—আমি মানুষ—ভূত নই! এতবড় কথা আপনি···

বাধা দিয়া ভূত-ভদ্রলোক কহিল,—আমি সে-কথা বলিনি।···তবে, তুমি যদি আমার কথা মনে রাখ, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।···

দেখিতে দেখিতে চকিতে সে-মূর্ত্তি ছায়ায় মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি শুইয়া চক্ষু মুদিলাম।···

দিনের আলোয় নীরার সঙ্গে দেখা। অনেক বার মনে হইল, রাত্রের সে অপরূপ কাহিনী নীরাকে প্রকাশ করিয়া বলিব না কি?

বলিতে পারিলাম না। কি জানি, এ-কথা শুনিলে হয়তো ভাবিবে, আমি দারুণ মিথ্যাবাদী! এ যুগে জন্মিয়া এ বয়সে তাকে আষাঢ়ে গল্প শুনাইতে আসিয়াছি!

এ কাহিনীর অন্তরালে আছে আমার গূঢ় অভিসন্ধি! তাছাড়া রাত্রের ব্যাপারটা আমার নিজেরি যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল।

বলা হইল না···তবে সারাদিন ধরিয়া মন আকুল হইয়া রহিল—রাত্রে যদি আবার ভূত-ভদ্রলোক আসিয়া দেখা দেয়!

রাত্রি তখন আটটা। দোতলার বারান্দায় বসিয়া নীরার সঙ্গে ইংরাজী নাটক লইয়া আলোচনা হইতেছিল। কথায় কথায় 'টেম্পেষ্ট' নাটকের কথা আসিয়া পড়িল। মিরান্দার প্রেম···অপরূপ কল্পনা! লোকালয়ের বাহিরে বিজন দ্বীপে থাকে মিরান্দা···সে দ্বীপে আসিল তরুণ ফার্দ্দিনান্দ···

নীরা কহিল,—আচ্ছা, ভালবাসা জিনিষটা কি? যে বই খুলি, তাতেই দেখি এই ভালবাসা!

সারা বুক জুড়িয়া নিশ্বাস এমন ভারী হইয়া উঠিল যে ভয় হইল, বুঝি, বুকপাঁজর সে বাষ্প-ভরে ফাঁসিয়া চুর হইয়া যাইবে! ভাবিতেছিলাম, মস্ত সুযোগ! এই সুযোগে যদি নিজের মনের কথা...

বরাত ঠুকিয়া ডাকিলাম,—নীরা—

নীরা কহিল,—কি?

অজস্র জ্যোৎস্না নীরার অঙ্গে ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে। তাকে দেখাইতেছিল,···দুটি চোখে আশার প্রদীপ!

বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল, কাঁপুক! সে কথা বলিব! চারিদিকে চাহিলাম। দেখিলাম, টবের গাছে একরাশ রজনীগন্ধা বাতাসের দোলায় মাথা নাড়িতেছে। মনে হইল, তারা যেন দাঁত মেলিয়া অট্টহাসির তুফান তুলিয়া দিয়াছে!

সহসা দেখি, সর্ব্বনাশ! বারান্দার রেলিঙে বসিয়া রাতের—সেই ভূত! তারো মুখে হাসি।

বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আসিবার আর সময় পাইল না? কহিলাম,- জ্বালাতন!

নীরা সে স্বরে চমকিয়া উঠিল। কহিল,—কিসে জ্বালাতন হলেন?

সর্ব্বনাশ! তাড়াতাড়ি কহিলাম,—না, না। মানে, একখানা চিঠি লেখবার দরকার ছিল!—

সঙ্গে সঙ্গে ভূত-ভদ্রলোকের স্বর কাণে শুনিলাম—ভয় নেই। উনি আমায় দেখতে পাচ্ছেন না। আমার কথাও

শুনতে পাচ্ছেন না। তার কারণ, যাকে ডেকে আমরা কথা কই, তারাই শুধু আমাদের কথা শোনে—অপরে শুনতে পায় না।

সতর্ক দৃষ্টিতে নীরার পানে চাহিলাম। কি ভাবিতেছে নীরা?

ভূতের কথায় আমি কহিলাম,—আপনি কি বলতে চান?

নীরা কহিল,—আপনি বলছেন কাকে?

তাইতো! এ যে মস্ত সমস্যা! উপায়? বিমূঢ়ের মত চুপ করিয়া রহিলাম।

নীরা কহিল,—যতীশ বাবুকে জানেন? এখানকার কলেজে প্রফেসর। মামাবাবুর কাছে প্রায় আসেন। তিনি বলেন, এই ভালবাসার সম্বন্ধে যা কিছু কথা বলবার আছে, সেক্সপীয়র তার সব বলে গেছেন। এই ভালবাসা মানুষকে দেবতা করে, ভূত করে, দানব করে! যতীশ বাবু চমৎকার লোক। এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন। মামাবাবু বলেন, যতীশ বাবুর মত লোক তিনি আর দেখেন নি।

আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। যতীশবাবুর উপর এমন ভক্তি! এতখানি সম্ভ্রম! কে জানে!

আমি কহিলাম,—বটে!

নীরা চুপ করিল। কি ভাবিতেছিল। আমার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কি ভাবিতেছে? যতীশবাবুর কথা? সেক্সপীয়রকে ধরিয়া নীরার হৃদয়ে আসন পাতিল না কি? ফার্দিনান্দের মত নীরার হৃদয়-দ্বীপে! চোখের সামনে 'টেম্পেষ্টের' সেই ঝড়ে ফোঁসা ঢেউয়ে দোলা অকূল সাগর যেন প্রমত্ত তাণ্ডবে নাচিয়া চলিল।

ভূত-ভদ্রলোক কহিল,—কি ভাবছ?—ঐ যতীশ বাবুর নাম শুনলে তো? অবস্থা সঙ্গীন। লজ্জা করে নীরব থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এখন ব্রজবাবু নেই—ওঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানাও—ওঁর প্রেমে তুমি বিভোর, জর-জর। না হলে কোন্ দিন ঐ যতীশবাবু সেক্সপীয়রের ফাঁদ পেতে তোমার নীরা রুইমাছটিকে গ্রাস করে বসবে! তাঁর দিকে ব্রজবাবুর একটু ঝোঁক আছে—শুনলে তো?

আমি কহিলাম—যতীশবাবু? সে একটা হাম্‌বাগ!

উত্তেজনার ঝোঁকে কি বলিলাম, খেয়াল ছিল না। খেয়াল হইল নীরার কথায়। নীরা কহিল—এ কি ত্রিদিববাবু! হঠাৎ একজন ভদ্রলোককে হামবাগ বলে' উঠলেন যে! তাঁর অপরাধ?

মাটীতে মিশিয়া গেলাম। নীরার যে-চোখে শুধু জ্যোৎস্না দেখিয়াছি, সে চোখে যেন রৌদ্রের তীব্র শিখা! তার আঁচ গায়ে বিঁধিল। তাড়াতাড়ি বলিলাম,—আপনি যতীশ সেনের কথা বলছেন তো? হুগলি কলেজে ফিজিক্সের প্রফেসর? আমি তাকে চিনি।

নীরা কহিল,—না, যতীশ চাটুয্যে। ইংলিশের প্রফেসর!

কহিলাম—ও! মাপ করবেন! যতীশ চাটুয্যে রিটায়ার করছেন না?

নীরা কহিল,—রিটায়ার করবেন কি! এই তো বছর-খানেক হলো, এম-এ পাশ করে প্রফেসারি নিয়েছেন।

কহিলাম,—বটে! তাঁকে জানি না। আমি বলছিলুম, ম্যাথ্‌মেটিক্‌সের প্রফেসার যতীশ হালদারের কথা। ভারী অভদ্র ইতর লোক। আমাদের হোষ্টেলে কিছুদিন ছিল, একজন ফ্রেণ্ডের বই চুরি করে পালায়। আমি তাকে 'মিন' করেছিলুম!

কথাটা নীরা বিশ্বাস করিল না, বুঝিলাম। সে হাসিল। কথাও কহিল! কিন্তু আগেকার কথায় যে সুর ছিল, এ কথায় সে সুরের লেশও নাই!

ভূত কহিল—একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। তুমি অত 'এক্সাইটেড' হলে কেন?···

কেন! সে কথা তুমি ভূত, তুমি কি বুঝিবে?

ভদ্রলোক কহিল—আমার জন্য সন্ধান নিতে বলেছিলুম। সন্ধান নিয়েছ?

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল। বেশ ছিলাম। কোথা হইতে ভূত আসিয়া জুটিল! জুটিয়া···

কহিলাম—না মশায়। সন্ধান নিতে পারি নি। পারব না সন্ধান নিতে। আমি মরছি নিজের জ্বালায়···

ভদ্রলোক কহিল—বেশ, তুমি নিজের কাজ কর। আমি বিরক্ত করব না। তবে গুছিয়ে কথাবার্ত্তা করো। কোনো বাঙলা উপন্যাস নাটক পড়ে নি? তরুণীর চিত্তজয়ে

প্রচণ্ড সাধনার কাহিনী? মনে রেখ, None but the brave···

ভাবিলাম, মন্দ কি! একবার সাহস করিয়া দেখা যাক।

নীরা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। ডাকিলাম,—নীরা···

যেন কোন সুদূর মায়ালোক হইতে নীরা উত্তর দিল—কি?

নীরা আমার পানে চাহিল; আমি তার পানে চাহিয়াছিলাম। সে নিশ্চয় প্রফেসার যতীশ বাবুর কথা ভাবিতেছিল। হায় রে, কি যে করিয়া বসিলাম! তবু মনকে চাঙ্গা করিয়া কহিলাম,—রাগ করেছ?

হাসিয়া নীরা কহিল—না, না। রাগ করব কেন? তবে আপনাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখছি। কি ভাবছেন?

তার পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া কহিলাম—কি ভাবছি—শুনবে?

—বলুন···

কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল। ভূত-ভদ্রলোক কহিল—শুধু একটু সাহস—ব্যস্—now or never,

কহিলাম,—রবিবাবুর সেই কবিতাটা মনে পড়ছে।

নীরা কহিল—কোন্‌টা?

কহিলাম,—সেই যে

> নিত্য তোমার চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি—
> বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি।
> তুমি আছ মোর জীবন-মরণ হরণ করি।

কবিতা শুনিয়া নীরা যে দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল, তাহাতে আমার বুকের মধ্যকার সব কথা জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল।

নীরা কোনো কথা কহিল না; উঠিয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়···

ভূত-ভদ্রলোক কহিল,—হাল ছেড় না! রবিবাবুর কবিতা নয়, বাপু। নিজের ভাষায় নিজের মনের কথা বল··· ওর মনে গিয়ে সে কথা বিঁধবে as straight as an arrow!

আমি কহিলাম—আপনি যান মশায়। আপনার কথায় কি যে করে বসলুম! নীরা কি ভাবলে···

ভূত-ভদ্রলোক কহিল—এ বয়সেও কবিতা মন্দ লাগে না। তবে অমন indirect কথায় কাজ হবে না। কাজ পেতে গেলে কথা direct হওয়া চাই। যে কালের যেমন ষ্টাইল। সেকালে ছিল লক্ষ্যভেদ—মাছের চোখ গাঁথতে হতো তীর ছুঁড়ে। একালে মন গাঁথা চাই তীক্ষ্ণ বচনে।

কহিলাম—আপনি এখান থেকে যান তো।

ভূত-ভদ্রলোক চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কেবল মনে হইতে লাগিল, কি করিলাম! নীরা একা আছে—আমার চার্জ্জে···ব্রজবাবু এখানে নাই! সে সুযোগ গ্রহণ করিয়া···ছি ছি···

আমাকে ভূতে পাইয়াছে নিশ্চয়, ভূতে—ভূতে!

সে রাত্রে ভূত-ভদ্রলোক আসিয়া দেখা দিল না···তবু ঘুমাইতে পারিলাম না। গ্লানি, লজ্জা···মনের উপর যেন তাণ্ডব বাধাইয়া দিল!

পরের দিন চা পান করিলাম ঘরে বসিয়া; নীরা আসিল না। আমিও ঘর হইতে বাহির হইলাম না।

মধ্যাহ্ন-ভোজ। নীরা আসিয়া কাছে বসিল। তার মুখে হাসি নাই, কথা নাই। আমিও নির্ব্বাক···

আহার শেষ করিয়া নীরার পানে মুখ না তুলিয়া কহিলাম—যদি কোনো অন্যায় করে থাকি, আমায় ক্ষমা ক'রো নীরা!···

নীরা কোন কথা কহিল না। আমিও সরিয়া পড়িলাম।

বৈকালের দিকে বারান্দায় আসিতে দেখি, মাঝের লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া নীরা কি একখানা বই দেখিতেছে।

আমার গতি মন্থর হইল। পা দুটাকে যেন কে চাপিয়া ধরিয়া আমাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া দিল!

বইয়ের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া নীরা আমার পানে চাহিল। আমি কহিলাম,—মামাবাবু কবে ফিরবেন, জান?

নীরা কি যেন হিসাব করিল, করিয়া কহিল,—আজ রবিবার। মামাবাবু আসবেন মঙ্গলবার সকালে।

আমি কহিলাম,—তিনি এলেই আমি চলে যাব।

নীরা কহিল,—কেন? আপনি যে বলেছিলেন, এবারে দশ-বারো দিন থাকবেন!

কোনো মতে নিশ্বাস চাপিয়া কহিলাম,—থাকবার ইচ্ছা ছিল। এখানে কি আনন্দ পাই, তা আমিই জানি!

তীব বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথা বাধিয়া গেল।

নীরা আমার পানে চাহিয়াছিল—তার চোখে তীব বিস্ময়!

বিস্ময়-ভরা স্বরে সে কহিল—তবে?

আমি কহিলাম,—এখানে বাস করবার যোগ্য আমি নই!

নীরা তেমনি বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল। আমিও তার পানে চাহিয়া ছিলাম।

নীরা কহিল,—কি হ'লো ত্রিদিব বাবু?

কোনোমতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া বলিলাম,—কাল যে ব্যবহার করেছি—

সবিস্ময়ে নীরা কহিল,—কি ব্যবহার?

আমি কহিলাম—আপনার মনে আঘাত দিয়েছি! আপনার অপমান করেছি।

—আঘাত! অপমান!

আমি কহিলাম—যতীশ বাবুকে আপনি শ্রদ্ধা করেন···

—করি।

আমি কহিলাম—আমার মন ইতর—আমি সে শ্রদ্ধা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে রূঢ় কথায় অপমান করেছি।

নীরা কহিল,—কিন্তু সে তো আপনি 'মীন' করেছিলেন, বললেন, ফিজিক্সের প্রফেসার যতীশ বাবুকে।

ঠিক! মনে ছিল না। নিজেকে সম্বরণ করিলাম। কহিলাম—তা হলেও যে ভাষা ব্যবহার করেছি, তাতে আপনাকে অপমান করা হয়েছে।

নীরা হাসিল, হাসিয়া কহিল—আপনি দেখছি পাগল হয়েছেন!

আমি কহিলাম—তারপর ঐ রবিবাবুর কবিতা···

নীরা কহিল—সে কবিতায় দোষের কি আছে? One of his finest lyrics. সেই কবিতাই আমি খুঁজে বার করে পড়ছিলুম। আগাগোড়া পড়লুম। আমার মুখস্ত হয়ে গেছে।

কহিলাম—ও!

নিশ্বাস ফেলিয়া বারান্দায় চলিয়া আসিলাম। নীরা তেমনি বসিয়া রহিল।

মাথায় কত চিন্তার উদ্‌ভ্রান্ত চলিয়াছিল। সুধা তার মধ্যে কখন সরিয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্নার মৃদু আলোয় চারি দিক মায়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দু'চারিটা পাখীর কূজন··· বাতাসের স্নিগ্ধ চামর-দোলা···

মনের মধ্যটা দুলিয়া উঠিল।

সহসা দেখি, অদূরে নীরা আসিয়া চেয়ারে বসিয়াছে। কখন আসিয়াছে, জানিতে পারি নাই।

নীরা আমার পানে চাহিয়াছিল; আমাকে তার পানে চাহিতে দেখিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল—ফিরলেন মর্ত্তালোকে?

কোন কথা বলিলাম না। নীরা কহিল—ভাব-রাজ্যে বিচরণ করছেন—এসে দেখলুম। তাই বিরক্ত করিনি।

কহিলাম,—দরকার আছে?

—ছিল। ভাবছিলুম, আপনার সঙ্গে মাঠের দিকে একটু বেড়াতে যাব। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে। বাইরে না যেতে চান, অন্ততঃ নিজেদের বাগানে বেড়ান।

—বেশ। চলুন

দুজনে বাগানে আসিলাম। কথায় গল্পে আবার সেই সুর জাগিল।

সহসা সামনে দেখি, ভূত!

রাগ হইল। ভদ্রলোক বলিল—কাল সকালে ব্রজ বাবু আসছেন, মিটিং ভণ্ডুল হয়ে গেছে সেখানে। দুটো দল হয়েছিল। দুদলে বকাবকি মারামারি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। কনফারেন্স গেছে ভেঙ্গে! ব্রজ বাবুর পা ভেঙ্গে গেছে। এক-জন চেয়ার ছুঁড়েছিল, সেই চেয়ার লেগে। আমি এসেছিলুম বলতে এই শেষ সুযোগ। রবিবাবুর কবিতা ছেড়ে নিজের গদ্য-ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করে বলে ফেল! কোনো কবিতাই গদ্যে paraphrase করে···বুঝলে, শুভস্য শীঘ্রং। আমি আর আসতে পারব না। আশ্রয় পেয়েছি! কলকাতার এক কবি কবিতা লিখে বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে illicit loveএর আয়োজন করেছিল—ধরা পড়ে। নায়িকা নিজে তাকে পিটে দিয়েছে নাগরায়, পিঠে দাকড়া-দাকড়া দাগ! তারপর বাড়ীর সকলে মারতে মারতে তাকে পুলিসে দেয়। হাজত-ঘরে গলায় কোঁচার বাঁধন কষে সে আত্মহত্যা করেছে।

তার দেহে আমি আশ্রয় নিয়েছি! আমার মুক্তি! এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যাবার আগে বলতে এসেছি, হেঁয়ালি নয়। স্পষ্ট ভাষায় বলে ফেল!

মাথার মধ্যে রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি বলব?

নীরা কহিল—কিসের কি—ত্রিদিব বাবু?

চমকিয়া চুপ করিলাম। তাইতো! ইঃ!

ভদ্রলোক কহিল—বল, তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তোমার তাতে মত আছে?

বিমূঢ়ের মত বলিলাম,—আমি ভালবাসি—বলবো?

নীরা কহিল,—কি ভালবাসেন ত্রিদিব বাবু?

ভূতের পানে চাহিলাম। তার চোখে ইঙ্গিত! সে বলিল,—জবাব দাও। কথা কও।

দুনিয়া প্রবল বেগে ঘুরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা···

আমি কহিলাম—ভালবাসি। বিয়ের কথা বলব?

নীরা কহিল—ত্রিদিব বাবু···

মাথার মধ্যে যে কি হইতেছিল! পা কাঁপিল। সারা অঙ্গ টল্‌মল করিয়া উঠিল। পড়িয়া যাইতেছিলাম···

নীরা ধরিয়া ফেলিল। চোখের সামনে জ্যোৎস্না যেন উবিয়া গেল! ..

চোখ মেলিয়া দেখি, বাগানে তৃণ-শয়নে শুইয়া আছি। ললাটে দুটি কোমল হাতের পরশ।

নীরা কহিল,—কি বলছিলেন? কাকে ভালোবাসেন? কি ভালবাসেন?

আমার ঘোর তখনো কাটে নাই। তন্দ্রা-জড়িত স্বরে কহিলাম,—তোমায়!

নীরা কোনো কথা কহিল না। তার দুই চোখে দেখিলাম, যেন দুখানি চাঁদ! রাজ্যের আলো সে দুই চোখে!

নীরার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিলাম। কহিলাম,—আমায় বিয়ে করতে আপত্তি আছে?

নিঃশব্দে হাত সরাইয়া নীরা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—মামাবাবুকে সে কথা বলবেন।

নীরা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

চারি দিকে পাখীর কূজন। অন্ধকার নাই। জ্যোৎস্না-ধারা আরো প্রসারিত হইয়া চারিদিক আলোয় আলো করিয়া দিয়াছে!

সে ভূত-ভদ্রলোক?

নাই।...বাগানে কেহ নাই। নীরা আর আমি!

উঠিয়া বসিলাম। সত্যই আমায় ভূতে পাইয়াছিল!

নীরা আজ আমার স্ত্রী। নীরাকে ভূতের কথা বলিয়াছি। হাসিয়া নীরা জবাব দিল—ও কিছু নয়। ভূত নাকি আবার আছে! ও তোমার প্রেমের ব্যাধি। প্রেমে পড়ায়, আর ভূতে পাওয়ায় তফাৎ আছে না কি?

ভারতীয় সভ্যতা

···ভারতীয় বেদের মন্ত্র এবং দর্শন ও ব্যাকরণের সূত্রগুলির যে অর্থ প্রচলিত, তাহা হইতে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার বিকৃতি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। সেই সকলের প্রকৃত ভাষা উদ্ধার করিতে পারিলে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতা যে কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করা যাইবে। প্রচলিত মন্ত্রার্থ ও সূত্রার্থ হইতে ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতা কথঞ্চিৎ পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারিলেও বর্তমানে মানুষ বিজ্ঞানের নামে বিপর্যস্ত জ্ঞানের প্রচার করিয়া স্বীয় পরমায়ু ও কার্য্যক্ষমতার হ্রাস সাধন করিতেছে, বর্তমান বিজ্ঞানের অকৃত্রিম সেবকও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য।······

ইয়োরোপের একটি পল্লী

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামসমূহের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় অনেকেরই আছে। ধানগাছের গুঁড়ি হইতে কোঠা-ঘরের কড়িকাঠ তৈয়ার হয় এমন ধারণা যে কাহারো কাহারো নাই, তাহা নহে; তবে যে-কারণেই হউক, এখন লোকে পল্লীগ্রামের সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করে; পল্লীর লোকের সুখ-দুঃখের খবর খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় পড়িতেও তাহাদের অরুচি হয় না। ইয়োরোপের পল্লীগ্রামের খবর আমরা অনেকেই জানি না; ইয়োরোপের নামজাদা শহরগুলির কথা যদি বা সাময়িক পত্রের মারফতে জানিতে পারা যায়, পল্লী-গ্রামের খবর একেবারেই অজ্ঞাত। আমাদের দেশের অনেক ইয়োরোপ-প্রত্যাগত লেখক-লেখিকা ইয়োরোপের প্রধান প্রধান নগরসমূহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু পল্লী-কথায় তাঁহারা নীরব। ইয়োরোপ পরিভ্রমণকালে বিলাস-ব্যসনমত্ত, চাকচিক্যময় নগরসমূহ দর্শন করিয়া পল্লীভ্রমণ করিতে—হয় তাঁহাদের বাসনা জন্মে না, না-হয় পল্লীবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না।

আমরা আজ ইয়োরোপের একটি গণ্ডগ্রামের ইতিবৃত্ত বলিব। গ্রামটির নাম মেজোকোভেস্‌ড্ (Mezokovesd); হাঙ্গেরীর অন্তর্ভুক্ত ছোট একটি গ্রাম। ছোট হইলেও গ্রাম-খানিতে কুড়ি হাজার লোকের বাস। আমাদের দেশের যে কোন পল্লীগ্রামের জনসংখ্যার তুলনায় ইয়োরোপের এই গণ্ড-গ্রামটির জনসংখ্যা অন্ততঃ সহস্র গুণ অধিক নয় কি?

এই গ্রামে সংবাদপত্রের চলন নাই। বাহির হইতেও আসে না, গ্রামেও ছাপা হয় না। সংবাদলোলুপ ইয়োরোপের এই বিশ সহস্র লোক পৃথিবীর সংবাদের কোন তোয়াক্কাই রাখে না। বোধ হয় আমাদের দেশের পল্লীগ্রামেও এরূপ সংবাদ-ঔদাসীন্য কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। জগতের সংবাদের প্রতি সেখানকার লোকের অনাগ্রহ থাকিলেও, স্বগ্রামের সংবাদ

মেজোকোভেস্‌ড্ : ঢুলী গ্রামের সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছে।

সম্বন্ধে প্রতি রবিবারে তাহারা ততটা উদাসীন নয়। তাই ব্যবস্থা করিয়াছে, গ্রামের কোন একটি স্থানে দাঁড়াইয়া একজন 'ঢুলী' সপ্তাহের গ্রাম্য-সংবাদ সমূহ পাঠ করিয়া যাইবে। সে সকল সংবাদ এইরূপ:

অমুকের গাভীটি হারাইয়াছে। অমুকের একটি ঝি চাই। খাদ্যমধ্যে আলু, গাজর, মটরশুঁটী, পরিধেয় বস্ত্র ও মাসিক

রবিবারের বৈকালিক পোষাকে সজ্জিত গ্রামের তিনটি 'বাবু'।

অমুকের বলদ মারা গিয়াছে, চাষবাস বন্ধ। যাহা অতিরিক্ত বলদ আছে, লাঙ্গলের কাজে সে কি অমুককে বলা কর্জ্জ দিতে পারিবে?

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গ্রামের মধ্যস্থলে একটি গীর্জ্জা আছে। রবিবার সকলেই গীর্জ্জায় যায়। গীর্জ্জায় উপাসনা শেষ হইলে, লোক যখন দলে দলে বাহির হইয়া আসে, তথনই এই 'ভ্রাম্যমাণ সংবাদপত্র সংবাদগুলি পাঠ করিতে থাকে।

সংবাদ শ্রবণান্তর যে যাহার ঘরে চলিয়া যায়। তাহার পরই, গ্রামের রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য। গ্রামের সকলেই চাষী, সকাল বেলাই নরনারী মাঠে চলিয়া যায়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামে ফিরে না। কেবল অতি-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর অতি-শিশুরাই গ্রামে থাকে; তাহারা ঘরের বাহির বড় হয় না।

ইয়োরোপের গ্রাম—অথচ একটি হোটেল, রেস্তোরাঁ, কিছুই নাই। হঠাৎ যদি কোন লোক গ্রামে বেড়াইতে আসে, তাহাকে অভুক্ত থাকিতেই হইবে। একবার ইয়োরোপের একদল পর্য্যটক মেজোকোভেস্‌ডে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। অপরিচিত লোকের আগমনে গ্রামমধ্যে অসাধারণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তাহার অনেক কারণ, আগন্তুকদের ভাষা কেহ বুঝে না; আগন্তুকরা যাহা দেখে, তাহাতেই অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। গ্রামের প্রান্তে একটি পান্থশালায় যখন তাহারা শীতল পানীয়ের সন্ধানে ঢুকিল, তখন পান্থশালাটি লোকের ভিড়ে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল।

সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে গ্রামের নরনারী উদয়াস্ত মাঠের কাজেই ব্যস্ত থাকে; কেবল রবিবার দিনটা তাহারা নিজদিগকে ছুটী দেয়। বিশেষ ঠেকা না থাকিলে রবিবার দিনটিতে কেহ মাঠে যায় না, কাদা মাটী মাখে না। রবিবারের সকালে

মা ও মেয়ে: গলাভরণ কণ্ঠী লক্ষণীয়

গীর্জ্জায় উপাসনা, তারপর সংবাদ শ্রবণ, পরে গৃহে গি আহার ও বিশ্রাম। রবিবারের অপরাহ্ণটিতে উৎসব লাগি যায়। যাহার যা ভাল পোষাক আছে, সেইটি পরিধা

করিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা রাস্তায় বাহির হইবে। মার্জ্জারী রে নাম্নী এক পর্যটক ইহার বেশ একটি বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

বরদানের শয্যাদ্রব্যের ঘটা : তোষক-গদীর উপর নববধূর নাম সেলায়ের হরফে লেখা।

এ যেন একটা পুষ্পোদ্যান। রৌদ্রের তেজ কমিয়া আসিল, মৃদু পবন বহিল আর হঠাৎ একসঙ্গে যেন সহস্র সহস্র পুষ্পতরু পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

ইহাদের 'জামা-কাপড়ে' বর্ণ-বাহুল্য থাকে বলিয়া পুষ্পিত উদ্যানের সহিত তাহার তুলনা অশোভন হয় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দেখা যায় (আমাদের দেশেও খুব), মহিলাদের সাজসজ্জা কাপড়চোপড়েই যত বেশী জাঁকজমক ; এখানে কিন্তু তা' নয়। এখানে মহিলাদের সাজপোষাকে যত আড়ম্বর, পুরুষদেরও তত ! যেন, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। পুরুষেরা সাধারণতঃ ভেল-ভেটের পা-জামা অশ্বারোহীদের ধাঁজে পরে ; কোটগুলি মেয়েদের জ্যাকেটের ফ্যাসানে তৈরী, ঝুল অল্প। কেহ কেহ স্নেহশালিনী জননী বা প্রিয়তমা প্রণয়িনীর হাতে তোলা ফুল-কাটা বক্ষ-বাস জড়াইয়াও বাহির হইয়া থাকে। মাথায় গোল উঁচু নীল রঙের টুপি, তাহাতে আবার ছোট-বড় পালক গোঁজা। এই বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া তাহারা ভাবী প্রণয়িনীর (অবশ্য যাহাদের প্রণয়িনীর অভাব আছে) মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকে। কুমারী মেয়েরা সাজসজ্জা করিয়া শিকার অন্বেষণে বাহির হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ; তবে কুমারীদের মা, মা না থাকিলে ঠাকুরমা, বড় দিদি, কাকিমা মাসিমা অর্থাৎ অভিভাবক জাতীয়া কেহ না কেহ সঙ্গে থাকিবেনই। কুমারী মেয়েদের একেলা ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা এখানে নাই। সে বিষয়ে গার্জ্জেনরা খুবই সচেতন। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সেই সুরক্ষিত অবস্থাতেও পুষ্পধন্বা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পশ্চাদপদ হন্ না।

রবিবারের অপরাহ্ণটিতে কিন্তু এ-রকমের কোন কাজ হয় না। কারণ রবিবার খৃষ্ট দিবস, এদিন মেয়েরা আলাদা, পুরুষরা আলাদা বাহির হইয়া থাকে। এমন কি বিবাহিত নরনারীরাও এক সঙ্গে বেড়ায় না। ইহাতে নবদম্পতীদের মনোদুঃখ হইতে পারে, কিন্তু উপায় কি ?

তাই বলিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, রবিবারের অপরাহ্ণ-কালে নলিনীনয়নগুলি কটাক্ষবিহীন হইয়া পড়ে, অধরে বঙ্কিম হাসির রেখা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, ক্ষুদ্র ধনুশরের দেবতাটি খৃষ্ট-নাম স্মরণপূর্ব্বক অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। সমুদ্র বারিহীন কল্পনা করাও সহজ, আকাশ নীলিমাহীনও হইতে পারে কিন্তু নলিনীনয়ন কটাক্ষবিহীন হইতে পারে না। চলিতে চলিতে অপাঙ্গআহত কোন যুবক যদি কোন কুমারীর বসনাঞ্চলে অসাক্ষাতে হস্তস্পর্শ করে, তাহা নিবারণ করিবে কে ?

ইহাদের দেখিয়া কে বলিবে যে ইহারা মাত্র কৃষাণ-বালক !

কে কুমারী আর কাহার পাণি পীড়িত, তাহা মাথার দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝিতে পারা যায়। কুমারী মেয়েরা মাথায়

'কাপড়' দেয় না (আমাদের দেশেরই মত), বিবাহের পর তাহারা বেণী চর্চ্চা করে, মাথায় রঙীন সাজ পরিধান করে

বিবাহবেশে সজ্জিত বর ও বধূ।

এদেশে গৌরীদানের ব্যবস্থা নাই বটে; তবে বড় বয়সের কুমারী ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। অষ্টাদশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায়। ষোল, সতেরো বৎসর বয়সে কোন মেয়ের বর জুটে নাই শুনিলে বর্ষিয়সীরা গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়েন! ধাড়ী মেয়ের বাপ-মার মুখে 'অন্ন রুচিতেছে' কেমন করিয়া, ভাবিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

নাচের মজলিসেই প্রজাপতি মহাশয় দৌত্যকার্য্য করিয়া থাকেন। কোন যুবক কোন তরুণীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে বুঝিলে, যুবক তরুণীর পিতার দ্বারস্থ হয়। পিতার সম্মতিলাভ ঘটিলে, পাত্র তাহার দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ক'নের কাছে পাণি-প্রার্থনা করিতে পাঠায়। ক'নে যদি লজ্জায় লাল হইয়া, আড়ষ্ট ভাষায় সম্মতি জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে, তখনই বিবাহ পাকা হইয়া যায়।

রবিবারের রাত্রে যে নাচের মজলিস বসে, বিবাহ তাহাতেই সঙ্ঘটিত হয়। ক'নের ঘর সাজাইয়া দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। কিছু টাকা, একটি গাভী—ইহাও যৌতুকের অংশ। আর একটা জিনিষ যৌতুক দিতে হয়—বালিশ-বিছানা। এই বালিশ বিছানাগুলি সদাসর্ব্বদা ব্যবহার না হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত মধুর পরিণয়ের মধুর স্মৃতি জাগাইয়া রাখে। প্রায় সকল বাড়ীতেই দেখা যায়, একটা ঘরে রাশীকৃত বালিশ-বিছানা কড়িকাঠ স্পর্শ করিয়া আছে। বাপের আছে, ছেলের আছে, ঠাকুর্দ্দার আছে—কত পুরুষের বিছানা যে জমা আছে, তা বলা যায় না।

বিবাহ ত হইয়া গেল, তাহার পর নবদম্পতী কি করিবে অনুমান করুন দেখি! আপনারা হয়ত বলিবেন, তাহারা হনিমুন বা মধুচন্দ্র যাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে। না মহাশয়, আদৌ না। পরিব্রাজকের নিকট নববিবাহিতারা সহাস্যমুখেই বলিয়াছে, কয়দিন ঘর-সংসারের কাজকর্ম্ম, বাসন-কোসন দেখিয়া, বুঝিয়া লইবে, তারপরই তাহারা কর্ত্তাদের সঙ্গে ক্ষেতে-খামারে কাজ করিতে যাইবে।

পরিব্রাজক মহোদয়া তাহাদের ঘর-সংসারের একটি চিত্র দিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন, "ঘরদ্বার ঝক্ ঝক্ করিতেছে, বাসন-কোসন চক্‌চকে, আসবাব-পত্রে একটু ধূলা নাই, বাড়ীর আশে-পাশে কোথায় একটু জঙ্গলও নাই। এমন সুন্দর করিয়াই তাহারা ঘর-সংসার করে। চাকর-ঝি খুব কম লোকেই রাখিতে পারে; ধাত্রী নাই বলিলেই হয়। ঘর সংসারের কাজ, ছেলেমেয়ে মানুষ, ক্ষেত-খামারের কাজ নিজেরাই সব করে এবং পরিষ্কার করিয়াই করে।"

বিবাহের বাজকর দল: বড় বেহালাটির উপর টুপীটা রাখা হইয়াছে।

এইবার গ্রাম্য-মেয়েদের সামাজিক জীবনের একটু আভাস দিতেছি। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ

পরিচয় আছে, তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার পুকুরঘাটের পরিচয় থাকাই স্বাভাবিক। এই পুকুরঘাটে না-হয় কি? হরির মা, পরীর পিসি, হাঁদার ঠানদি, রামের শাশুড়ী, শ্যামের দিদি-শাশুড়ী, যদুর ঠাকুমা, মাধবের বৌদি মিলিত হইয়া যে বারোয়ারী বৈঠক সৃষ্টি করেন, তাহাতে কত সংসারে কত অনল যে প্রজ্বলিত হয়, তাহা না জানেন কে? হাঙ্গেরীর এই পল্লীগ্রামে একটি বড় ইঁদারা আছে, সেই ইঁদারায় সে দেশের হরির মা, গোপীর দিদিরা জল তুলিতে আসিয়া গ্রাম্য রাজনীতির চূড়ান্ত করিয়া ছাড়েন। এই ইঁদারা-বৈঠকের শাসনে সারা পল্লী শাসিত হইয়া থাকে।

রবিবারে সন্ধ্যায় আবার গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজে, আবার দলে দলে নরনারী গীর্জ্জায় সমবেত হয়। গীর্জ্জার পুরোহিত গ্রামের নরনারীদের পূজা পাইয়া থাকেন, তাঁহারাও গ্রামের নৈতিক চরিত্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে সমাজ-জীবন শৃঙ্খলিত ও কলুষমুক্ত হয় তদনুরূপ উপদেশাদি দিয়া থাকেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, এখানকার মেয়েরা তাহাদের পুরুষদের পা'জামার কাপড় ঘরে তাঁতেই বুনিয়া দেয়। যাহাদের স্ত্রীরা তাহা পারে না বা আলস্যবশে করে না, গ্রাম্য-আভিজাত্যে তাহাদের স্বামীরা অপাঙক্তেয় হইয়া পড়ে। স্বামীর সে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে কে চায়!

এত কথাই বলিলাম, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথাটিই বলা হয় নাই। গ্রামটি কৃষিপ্রধান এবং অধিকাংশ লোক কৃষি-জীবী তাহা আগে বলিয়াছি। এই গ্রামে কৃষক ছাড়া, অন্য কোন লোক নাই তাহা নহে। ধর্ম্মযাজক আছে, কৃষি-জীবি-দেরও ধর্ম্মপিপাসা আছে, তাহা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ধর্ম্মোপদেষ্টার প্রয়োজন। ঢুলি আছে, তাহাও দেখা গিয়াছে। গ্রামের লোকদিগকে সংবাদাদি দিবার জন্য ঢুলির দরকার। দর্জ্জি আছে, পোষাক-আসাক প্রস্তুত করাইতে হয়। মোট কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই গ্রামের বিশ হাজার

বাড়ীর তাঁত: প্রতি বাড়ীতেই পুরুষদের কাপড়-চোপড় এইরূপে স্ত্রীলোক-দ্বারা তৈয়ারী হয়।

অধিবাসী যাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কৃষিজীবী—তাহাদের কাজে এবং তাহাদের কৃষির কাজে লাগিতে পারে এমন সকল বিত্তের লোকই গ্রামে আছে। গ্রামের অভাব যাহাতে গ্রামেই পূর্ণ হয়, মেজোকোভেসডের লোক গ্রামখানিকে এমন ভাবেই গঠন করিয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষের গ্রামসমূহ অতীতকালে একদিন এমনই সম্পূর্ণ ছিল। সেদিন ভারতের যে সমৃদ্ধি ছিল, এখন আর তাহা নাই। জানি না ভারত আবার কখনও সে সমৃদ্ধি পুনঃপ্রাপ্ত হইবে কি না! এই পরনির্ভরশীল, অন্নাভাবে আকুল জগতে মেজোকোভেসডের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ একখানি গ্রামের চিত্র পাঠক পাঠিকাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে ভাবিয়া "বিচিত্র-জগতে" অঙ্কিত করিলাম।

বাঙ্গালার কৃষি

বাংলার জনবাহুল্য সর্ব্ববাদীসম্মত। পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বেলজিয়াম ব্যতীত এইরূপ জনবহুল দেশ আর নাই, বেলজিয়ামের জনসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৬৫৪ এবং বাংলা দেশে উহা ৫৭৯।…বাঙ্গলা শিল্পপ্রধান দেশ হইলে এই বর্দ্ধিত জনসংখ্যার উপায় সহজ হইত। কিন্তু বাঙ্গালা একে কৃষিপ্রধান দেশ, তাহার উপর কর্ষিত জমির পরিমাণ কম—অথচ লোকসংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালার ৩০টি জেলার রায়তী স্বত্বের গড় হইতেছে ১·৭৪ একর। বাঙ্গালার প্রধান ফসল ধান ২·৪ কোটি একরের মধ্যে ২·১ একরে উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ধান এবং বাঙ্গালার অন্যান্য শস্যের জন্য বিস্তৃত আয়তনের ক্ষেত্র প্রয়োজন—অথচ কৃষকগণ তাহা পায় না। এদিকে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই উত্তরাধিকারসূত্রের বিধি ব্যবস্থার ফলে জমি ক্রমাগত ভাগ হইয়া যাইতেছে…

—ব্যবসা ও বাণিজ্য

হিত্যের ইতিহাস

—শ্রীসুকুমার সেন

[৭৩]
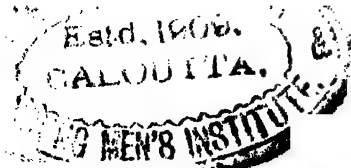
কবিশেখরের গোপালবিজয় অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হইতে কিছু স্বতন্ত্র। গোপালবিজয় মূলতঃ বর্ণনামূলক কাব্য, অপরাপর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মত গীতিমূলক কাব্য নহে। গোপালবিজয়ের সুদীর্ঘ পদগুলি অধিকাংশই পয়ারছন্দে বিরচিত, ক্বচিৎ ত্রিপদীতে। বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতের সাদৃশ্যে গোপালবিজয়কে কৃষ্ণায়ণ বলা যাইতে পারে।

গোপালবিজয় কাব্যের খণ্ডাংশের পুঁথিই বেশী পাওয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ পুঁথি খুবই দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত ৯৬৩ সংখ্যক পুঁথিটি সম্পূর্ণ পুঁথি হইতে পারে। ইহাতে কৃষ্ণের বৃন্দাবনত্যাগ পর্য্যন্ত লীলাকাহিনীর বর্ণনা আছে। ইহার পরও কৃষ্ণচরিত বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেন না তাহা হইলে কবি স্বীয় কাব্যের 'গোপাল'-বিজয় নামকরণ করিতেন না। যাহা হউক অন্য পুঁথি পাওয়া না গেলে এই অনুমানের মীমাংসা হইবে না।

[৭৪]

কাব্যটিতে কবি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কবির পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতা হরাবতী, জন্ম 'সিংহ বংশে'। কবির প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন, লোকে বলিত কবিশেখর। গোপালবিজয় কবির চতুর্থ রচনা। প্রথমে রচনা করেন গোপালচরিত মহাকাব্য, তাহার পর 'গোপালের কীর্ত্তনামৃত'—ইহা সম্ভবতঃ ব্রজলীলাবিষয়ক পদসমষ্টি বুঝাইতেছে,—তাহার পর গোপীনাথবিজয় নাটক, সর্ব্বশেষে গোপালবিজয়। গোপালচরিত মহাকাব্য এবং গোপীনাথবিজয় নাটক সংস্কৃতে রচিত, সন্দেহ নাই।

তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত। তবে কৈল গোপালের কীর্ত্তনামৃত॥
গোপীনাথ বিজয় নাটক কৈল আর। তবু গোপবেশে মন না পুরে আমার॥
অতেই পাঁচালি করি গোপালবিজয়ে। বৈষ্ণবজনের রেণু করিয়া হৃদয়ে॥
সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন। শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন॥
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হরাবতী। কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি॥[১]

কাব্যের রচনাকালের উল্লেখ নাই। কাব্যমধ্যে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরদিগের কোন উল্লেখ না থাকিলেও কবির বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ হইতে এবং অন্যান্য উক্তি হইতে কবি যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সপ্তদশ শতকের শেষার্দ্ধে রচিত রামগোপাল দাসের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীতে গোপালবিজয় কাব্য হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।[২]

গোপালবিজয় কাব্যের ভণিতায় অধিকাংশ স্থলেই কবিশেখর নাম পাই, ক্বচিৎ দুই এক স্থলে 'শেখর' এবং 'রায় শেখর' পাওয়া যায়।[৩] সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা কবিশেখর রায় বা রায়শেখর শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন।[৪] এই কবি আর গোপালবিজয় কাব্যের কবি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু গোপালবিজয়ে শ্রীরঘুনন্দনের নাম নাই। তবে কি শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই কাব্যটি রচিত হইয়াছিল?

[৭৫]

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রায় সব কাহিনীই গোপালবিজয়ে বর্ণিত হইয়াছে, উপরন্তু দানলীলা ও নৌকাবিলাসের বর্ণনাও আছে। দানলীলা বর্ণনাটি গোপালবিজয়ের অন্যতম মুখ্য কাহিনী। 'বংশীখণ্ড'

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি, পত্রাঙ্ক ২থ। ২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১১৩।

৩। শেখরে সে কহে গোপাল বিজয়ে
শুনিতে অতি রসাল।
সব বেদসারে বুঝাহ সংসারে
তব সুখে কলিকাল॥
মন্দস্বর্গে কভু ঘোড় নাহি রহে।
রায় শেখর তাহে দেখিল কথা কহে॥

৪। রামগোপাল দাস রচিত শাখানির্ণয়, পৃঃ ১৫; পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২১৮৯।

শীর্ষকে যে লীলাকাহিনীর উল্লেখ আছে তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশীখণ্ড কাহিনীর অথবা শ্রীরূপ-গোস্বামীপ্রোক্ত 'বংশীচোর্য' কাহিনীর কোন মিল নাই। রাসলীলার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ যে বংশীধ্বনি করিয়া গোপীদিগকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন সেই ব্যাপারই গোপালবিজয়ে 'বংশীখণ্ড' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাসের বর্ণনার পর অক্রূরের আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা।

গোপালবিজয়ের প্রারম্ভে দুইটি বা তিনটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। আলোচ্য পুঁথিতে শ্লোক দুইটি এরূপ দুষ্ট যে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসম্ভব। প্রথম শ্লোকের শেষ পদ হইতেছে—"স ভক্তজনজীবনো জয়তি দৈবকীনন্দনঃ॥" দ্বিতীয় শ্লোকটি বা শ্লোক দুইটির পাঠ এইরূপ—"সজ্জনচরণরজোঽলঙ্করণঃ গঙ্গাজলনির্ম্মলান্তকরণঃ সৎকারপণ্ডিতচিত্তহরণঃ। লিখিতং শ্রীকবিশেখরেণ[১] এতাং প্রতিপদসময়ং পদসমুপেতাং নিরবধি-মধুরে প্রকৃতরসিকালীং শ্রীগোপালবিজয়পঞ্চালীং?" এখানে সম্ভবতঃ লিপিকার দুইটি শ্লোক গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি যে স্বীয় কাব্যকে "গোপালবিজয় পঞ্চালী" বলিয়াছেন ইহা লক্ষণীয়।

[৭৬]

কাব্যের মুখবন্ধ এইরূপ—

গৌরী রাগ।

জয় জয় গোপাল গোবিন্দ ॥ ধ্রু ॥

একে একে দেবতার কত নিব নাম। নারায়ণ চরণে আমার পরণাম ॥
এক সুবর্ণে যেন নানা অলঙ্কার। তেন নারায়ণ সব দেব অবতার ॥
প্রসঙ্গে কহিব বেদপুরাণের সার। পণ্ডিত মুরুখে সব বুঝিহ বিচার ॥
ব্রহ্মা আদি তৃণ অন্ত যত কিছু দেখ। নারায়ণময় সব যেন পরতেখ ॥
যেন সব নদনদী সমুদ্রকে যায়। তেন সব দেব পূজা নারায়ণে পায় ॥
আচার বিচারে বেদ বেদান্তে না পাই। অনুভবে ভাবিতে আছয়ে সব ঠাঞি ॥
সেই নারায়ণ চিদানন্দ নন্দসুতে। শুনিতে শুনিতে মনে বাসি অদ-ভুতে ॥
কি কহিব আর যত অংশ অবতারে। দুষ্ট মারি সৃষ্টি রাখিল বারেবারে ॥
সে সব প্রভুর যদি অবতার হয়। তা সব বর্ণিতে তনুমন নাহি লয় ॥
এক গোপরূপে যত করিল বিলাস। তাহাই কহিতে মনে অধিক উল্লাস ॥
ভাল মন্দ হউ কিছু না লব বিচার। যে কিছু বর্ণিয়া দিব নন্দের কুমার ॥
পুরুবে আছয়ে বেদ পুরাণ ভাগবতে। কবি বর্ণিআছে যত যার যেবা মতে ॥
পণ্ডিতেই তা সব শুনিঞা পায় সুখে। শাস্ত্রের মরম কত জানিব মুরুখে ॥
মুরুখের ঠাঞি সব শ্লোক বিফল। বানরের হাথে যেন ঝুনা নারিকেল ॥
জ্ঞান না থাকিলে সব বুঝএ পাষণ্ড। বিনি দন্তে কি করিব সেই ইক্ষু দণ্ড ॥
সহজেই কলিকালে মুরুখ অপার। পণ্ডিত জনের হব বিরল প্রচার ॥
কলিতে বিদ্যায় দুহু বাঢ়য়ে অহঙ্কার। পুথিতে অভ্যাস করে ধন আর্জ্জিবার ॥
সব পর ভাবিয়া আপন নাম করে। নানা পরকারে পোষে[২] নিজ পরিবারে ॥
হেন মত কলিকালে পণ্ডিতের ব্যবহারে[৩]। নরদেহ ধরি যেন বুলে অহঙ্কারে ॥
লোক রঞ্জিবারে করে আচার বিচার। মনশুদ্ধি নাহিক আটোপ মাত্র সার ॥
কলিকালে লোকের বুঝিতে নারি চিত্ত। কিবা সে মুরুখ আর কিবা সে পণ্ডিত।
কেহ কেহ অভ্যাসে দড়াতে বাট বহে। কেহ কেহ অভ্যাসে অশেষ শাস্ত্র কহে।
অভ্যাস করিলে যদি পণ্ডিত বোলাই। কেবা নহে পণ্ডিত আনহ মোর ঠাঞি।
সেই সে পণ্ডিত যে বন্ধন[৪] মোক্ষ জানে। ইহা বই মুরুখ বুঝহ অনুমানে ॥
একেতে অধিকার নাহি ভাষার[৫] বিচার। বুঝিয়া মরম অর্থ করি ব্যবহার ॥
লৌকিক বলিয়া না করিহ উপহাসে। লৌকিক মন্ত্রে কি সাপের বিষ নাশে ॥
তেন কলিবিষ নাশে লৌকিক কীর্ত্তনে। নামদেব কবির নিকট পরণামে ॥
পণ্ডিত সব যত পড়ে ভাগবত পুরাণে। কেবা না বুঝয়ে লোক লৌকিক আখ্যানে।
সে অর্থ বুঝিতে ফল পাই বা না পাই। সেই সব বিচার বুঝহ তার ঠাঞি ॥
যে জন পণ্ডিত বলি ধরে অহঙ্কারে। পুরাণ ভাগবত তবে আছে তারে তারে
যে জনার অধিক নাহিক ব্যুৎপত্তি[৬]। গোপাল চরণে তার থাকুক ভকতি ॥
ভাষা দোষ না বাছে ভাবনা মাত্র জানে। রসের বচন দুই রহিয়া বাখানে ॥
কিবা মোর হেন যারা আছে গুণবন্ধে। তার লাগি কবিত্ব পাঁচালি পরবন্ধে ॥
ভাবকের পরায়ণ যোগীর সরবস। রসিকজনের যেন মূর্ত্তিমান রস ॥
ইহলোকে পরলোকে হিত উপদেশ। গোপাল দেবের কেলি কৌতুক বিশেষ ॥
বিষয়ীর প্রাণধন বৈরাগীর ফল। বৈষ্ণব জনের ভাণ্ড সবার সকল ॥
পদ দুই শুনিলে মরম নাহি পাই। কি রস চিনির কণা[৭] জিজ্ঞাসয়ে গোসাঞি ॥
রসিক জনেই জানে রসের চাতুরী। জিহ্বা বিনে কোন অঙ্গ না লয়ে মাধুরী ॥
যাকে যার অভিরুচি সে কি তারে ভায়ে। পল্লব ছাড়িয়া উষ্ট্র কণ্টক চিবায়ে ॥
সব কালে সম্পদে কোপাও নাহি যায়ে। সকল মধুর কেহ কিছু নাহি পায়ে ॥
সব ভাল ফুলে মালা নাহি গাথে মালী। সর্ব্বক্ষণ মধুরে না কুহলে[৮] কোইলী ॥
সকল মধুরে এক ঠাঞি নাহি বিধি। অমৃত উগারি বিষ উগরে পয়োধি ॥
হেন মতে দোষ গুণ দেখিয়া সংসারে। দোস আচ্ছাদিয়া গুণ করিবে প্রচারে ॥
আর একখানি দোষ না লবে আমার। পুরাণের অতিরেক লেখিব আপার ॥
অবিচারে আপাত না দিহ দোষ ভার। সপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমার ॥[৯]

ইহার পর আত্মপরিচয়, এবং তাহার পরে মথুরাপুরীর বিস্তৃত বর্ণনা। তাহার পর কংসভয়ে দেবতাদিগের নারায়ণের শরণগ্রহণ বর্ণনা করিয়া কথাবস্তুর পত্তন হইয়াছে।

১। 'শ্রীকবিশেখর'।

২। 'পোষে'। ৩। 'ব্যবহার'। ৪। 'বান্ধব'। ৫। 'ভাষায়'। ৬। 'বিৎপত্তি'। ৭। 'কোনা'। ৮। 'কুহলে'। ৯। পত্রাঙ্ক ১-২ খ।

সখিগণ সমভিব্যাহারে রাধা মদনপূজায় চলিয়াছেন। সঙ্গে অভিভাবিকা হইয়া চলিয়াছে বড়াই, মূর্ত্তিমতী হাস্যরসের বেশে। সুদূর অতীতের বাঙ্গালা দেশে পল্লীগ্রামের অতিবৃদ্ধা সধবা নারীর বর্ণনা হিসাবে চমৎকার।

না বলিতে সব আগু চলিল বড়াই। তার রূপ গুণের কি কব বড়াঞি ॥
ধবল কেশের মাঝে সিন্দুর উজলে। ফুটিল কাশীর বন জলন্ত অনলে ॥
পরম যতনে যদি সর্ব্বাঙ্গ নেহালী। কথায়[১] না দেখি কাঁচ লোম এক পাড়ি ॥
কোঠরের পেঁচা যেন চঞ্চল নয়নে। ধবার[২] উনান যেন নাকের পাতনে ॥
পুরাণ[৩] গড়ূই যেন শ্যামল[৪] অধরে। বহুনের গোঁজা[৫] যেন দশন শিখরে ॥
সদাই সে মুখানিতে বন্দী আছে হাসি। ছুতা হাঁড়ী মুখে যেন চুন যাএ ভাসি ॥
আকার দেখিয়া লোক ঠাড়জব (?) করে। কথা[৭] মরিল কাম জি আবারে পারে ॥
বৃদ্ধ বানরী সম নামু পাত্র ধরে। উঠ সম মাঝা খিন চলন সুন্দরে ॥
তাহে নীল পাট সাড়ি পরে বেড়া দিয়া। যেন অন্ধকারে রহে পিশাচী বেড়িয়া ॥
চলিতে সর্ব্বাঙ্গ দুলে ঠাই ঠাই কাসি। তা দেখি চিতার মড়াএ উঠে হাসি ॥
হেন রূপে আগু যাএ প্রাণের বড়াই। যেন মূর্ত্তিমান হাস্য ভুমিতে বেড়াই ॥[৬]

কৃষ্ণ রাধাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি এক গোপ-নারীকে পাকড়াইলেন রাধাকে মিলাইয়া দিবার জন্য। গোপী বলিলেন রাধার মাতামহী বড়াইকে ধরিতে।

আছএ বড়াই নামে তার[৭] বৃদ্ধমাতা। সে যে করে তা খণ্ডিতে নারে যে বিধাতা ॥
তারে মানাইতে যবে পার কোন পাকে সফল করহ যে তোমার মনে থাকে
আশয় তাহার বুঝি রাধিকার ঠাণ। কহিয়া তোমার গুণ জানিব হিয়াএ ॥[৮]
যবে তার কিছু বুঝি সরস বেভার। তবে মো মাগিয়া লব সব মোর ভার ॥[৯]

কৃষ্ণ বলিলেন, বড়াইকে তিনি চিনেন না। তখন গোপী দূর হইতে বড়াইকে দেখাইয়া ভয়ে আড়ালে লুকাইলেন। দলবল সহ বড়াই আসিলে কৃষ্ণ রাধার পরিচয় বড়াইকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বড়াই বলিল—

আইহন বীরের নারী রাধিকা সুন্দরী। কাম পুজিবারে যাত্র সব সখী মেলি ॥[১০]

বড়াইয়ের পরামর্শে কৃষ্ণ দানছলে রাধাকে আটকাইলেন। নিম্নে দানখণ্ড হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।[১১]

এত বলি সব গোপী গেলা কৃষ্ণ পাশে। তা দেখি কানাঞি মুখে হাত দিয়া হাসে ॥
কি মিছা যুগতি কর গোয়ালার নারী[১২]। বোধ না পাইলে লাগ না ছাড়ে মুরারী[১৩] ॥
যবে দান দিতে নার এক বোল ধর। রাধা এড়ি বিকে যাহ মথুরা নগর ॥
প্রতীত নিমিত্ত রাধা থাকু[১৪] মোর কাছে। বোল দিয়া রাধা লৈয়া ঘর যাবে পাছে ॥
এ বোল শুনিঞা দূরে হাসিল বড়াই। ছুতা হাণ্ডি[১৫] মুখে যেন চুন বাহিরা এ ॥
ভালই যুগতি বৈলে উদার কানাঞি। ভালে তোর বাপের মুখেতে লাজ লাঞি ॥
রাহুর নিকটে চাঁদ রহে কতক্ষণে। সিংহের সমুখে কেবা সমর্পে হরিণে ॥
মত্ত হাথি হাথে কেবা থাপে ফুলমালে। ঘৃত কে আবুধ রাখে জ্বলন্ত আনলে ॥
ত্রিভুবনে নির্ব্বুদ্ধি হেন কেবা আছে। রাধিকা এড়িঞা যাব কানাঞির কাছে ॥
চোর চাহে আন্ধার ধাউর চাহে গোলে। ছিনার চাহে নিভৃতে আছে বেদ বোলে ১৬।
প্রতীত নিমিত্ত যদি[১৭] বল বনমালী। আমি তোর ঠাঞি থাকি যাউক গোআলী ॥[১৮]
এ বোল শুনিঞা তবে হাসে দামোদর। রুষিয়া রাধিকা কিছু কহিল উত্তর ॥
পাগল বড়াই কিবা বলিব তোমাএ। ভালে সে বএস গেলে দোষ না পালাএ ॥
এক বোল ভাল নাহি বলে বনমালী। আরে তুমি না বুঝিয়া পাতহ ঢামালী ॥
যে যাবে সে যাউ বিকে মোর নাহি সাধে। পসরা যে নিবে নের ঘর যাও রাধে ॥[১৯]
এত বলি রাধা যবে গেলা কথো দূরে। বুড়ি আদি সভাকারে রাখি তরুমূলে
পাত্র বেড়ি কিবা দিঞা মণ্ডলীর মাঝে। সব গোপী রাখিয়া চলিল দেবরাজে
কহে কবিশেখর রাধার চতুরালী। যা শুনিলে সুখী হএ দেব বনমালী ॥
যাবৎ রাধিকা নাহি হয় আঁখি আড়ে। তাবৎ কানাঞি যে ধৈরজ নাহি ছাড়ে।
লাঁফ দুএ আগুলিল রাধিকা তরুণী। সিংহ আগুলিল যেন বনের হরিণী ॥
কাতর নয়নে রাই চাহে চারি পানে। সমুখে দেখিএ একা নন্দের নন্দনে ২০ ॥
কৃষ্ণ দেখি রাধিকা কাঁপএ থরহরি। মলয় পবনে যেন কলার বালুড়ি ॥
কৃষ্ণ বলে আল বাই না চিন আপনা। আমা নহে করি যাহ কাহার সামনা ॥

১। কোথাও। ২। 'ধরার'। ৩। 'পুরন'। ৪। 'সামল'। ৫। 'গন্না'। ৬। পত্রাঙ্ক ৫৫ ক। ৭। 'তোর'। ৮। 'হৃদএ'। ৯। পত্রাঙ্ক ৫৭ ক। ১০। পত্রাঙ্ক ৫৮ ক। ১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথিশালার ৩১২ সংখ্যক পুঁথি অবলম্বন করা হইয়াছে। পরিষদের পুঁথিটি খণ্ডিত এবং সুপ্রাচীন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুঁথিশালার সংগৃহীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ১০৮-১০৯ দ্রষ্টব্য।

১২। 'গোয়ালাসুন্দরী' ক। ১৩। 'বোধ নাহি পালো আমি ছাড়িতে না পারি' ব। ১৪। 'থাক' ক-; 'থাকুক' ব। ১৫। 'হাঁড়ি' ক-।
১৬। 'চোর চাহে আন্ধার ধাকড় চাহে গোল।
মুকুতার গ্রাহি সুত চাহে বেদবোল ॥' ব
ব-। ১৭। 'অপ্রতীত লাগি জবে' ব-। ১৮। 'জাউ সব নারি' ক-। ১৯। পসরা যে নিবেক নেউগ কাজ নাহি বাদে' ব-। ২০। 'চারি দিগে কেহ নাহি সমুখে নারায়ণে' ব-।

রাখিল তোমারে হের যমুনার তীরে। দেখি কি করিতে পারে আইহন১ বীরে ॥
ধরিল আঁচল হের ছাড়িয়া না দিব। উচিত যে দান হএ এইখানে নিব ॥
এতেক উত্তর যবে বৈল শ্রীহরি২। বলিতে লাগিল কিছু রাধিকা গোআলী ॥
না ধর আঁচল হের নিলজ্জ কানাঞি। নাহিক অধর্ম্ম ভয় লোক ভয় নাঞি ॥
আপনার কুবুদ্ধি ছাড়হ নাহি মোরে। আন লোক দেখিলে কি বলিব তোমারে ॥
যে তোমার দেখিএ নিলজ্জ ব্যবহার। হাসিতে হাসিতে মোর করিলে খাঁথার ॥
মদনে আঁধল আর বোল নাহি শুন। আপাত মধুর দেখি পাছু নাহি গুণ ॥
অবলা এ বল কত করহ কানাঞি। ভাগ্য পুণ্যে নাহি পড় মানুষের ঠাঞি ॥
কংস নাম শুনিলে পালাহ সাত বাড়ি। গো আলার বধূ দেখি পাতহ চামালি ৩ ॥
ছাড়হ ছাড়হ কানু কেহ জানি দেখে। কাঁচলি না ধর পাছে৪ লাগে নখরেখে।
সম্ভ্রমে না ধর কানু টুটে জানি হার। বলে না পারিলে ভয় হেন কি বেভার ॥
যশোদা দোহাই যবে আর মোরে ছোহ। মোর গাএ কত আর নখ চিহ্ন দেহ৫ ॥
আমি কুলবতী নারী তাথে একাকিনী। তুমি যত বড় ভাল সব লোকে জানি ॥
নিকটে যমুনাবন আতি গোরতর। লোক গতাগতি নাহি আতি তেপান্তর ॥
দিন অবসান হৈল ঘর অতি দূর। ঘরে সে বিষম বড় শাশুড়ী শ্বশুর ॥
সঙ্গে সখীগণ যত সব হৈব বৈরী। ছাড়হ কানাঞি প্রাণ রাখ এক বেরি ॥
তোরে কি বলিব মোরে বিধি নিদারুণা৬। বড়ায়ির সঙ্গে আসি পাইলু আপনা ॥
ইবে সে৭ কোথারে গেলি পুড়িলি বড়াই। খড়ে অগ্নি জড় করি রত৮ আন ঠাঞি ॥
যবে পুন এবার উবরি৯ ঘর যাই। বলিতে১০ জানিব যত কহিল বড়াই ॥
এত অপসরে ওথা চতুর১১ বড়াই। সব সখী এড়িয়া আপনে আস্তে ঠাই ॥
সর্ব্বকাল জানিএ কানাঞি আছি ধর। রাধা আনিবারে বুড়ি গেল তেপান্তর ॥
বিলম্ব দেখিয়া বুঝি ভাল নহে কাজে। গোকুল ভরিয়া পাছে১২ রহি যায় লাজে ॥
এতেক বুঝিয়া বুড়ি চলিল সত্বরে। রাধা কৃষ্ণ দেখি আর কদম্বের তলে ॥
বুড়িকে দেখিয়া রাধা দ্বিগুণ পাইল বলে। তভু কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে নেতের আঁচলে ॥
ভুজ যুগ চাপি ধরে দুই পয়োধরে। সঙ্কোচ হইয়া রাধা রহে কথো দূরে ॥
বড়াই দেখিয়া রাধা কাতর বচনে। গদ গদ স্বরে কিছু কহে ঘনে ঘনে ॥
দেখ হের বড়ায়ি তুমি কানুর ব্যবহারে। আঁচলে ধরিয়া পথে রহা এ আমারে ॥

১। 'সেই আগ্যান' ব-। ২। 'এত বলি কৃষ্ণ পাতে অশেষ চামালি' ব-। ৩। 'বাগাড়ি' ক-। ৪। 'জানি' ক। ৫। 'গোর গাএন থরেখ জানি মোর খেহ' ক। ৬। 'তুমি কি করিবে মোরে বিধি নিকরুণা' ব-। ৭। 'এখনে সে' ক-। ৮। 'রহিলি' ব-। ৯। 'নেউটী' ক-। ১০। 'কহিতে' ব-। ১১, 'কানাঞির চতুরালি দেখিয়া' ক-। ১২। 'জানি'।

আর সব গোপীজনে কিছু নাহি বলে। সভা এড়ি কানু আসি মোরে ধরে বলে ॥
একখানি কথা কানু কহিআ না দেই। দান বলি রাখে পুন দান নাহি নেই ॥
বুঝহ বুঝহ বড়ায়ি কানুর গেয়ান। কাহার নারীর হেন করি অপমান ॥
এ বোল বলিয়া রাই কান্দে ঝর ঝরে। তা দেখি দয়াএ কানু ছাড়িল আঁচলে ॥
গোপাল বিজয় নব শুন একমনে। কহে কবিশেখর অমৃত-বরিষণে ॥১৩

[৭৭]

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত যাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনি উপরি উদ্ধৃত গোপালবিজয়ের অংশে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাবসাম্য ও রচনারীতির ঐক্য অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণের মত কবিশেখরের কৃষ্ণ ও রাধিকার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। গোপালবিজয়েও যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অংশে দৃষ্ট হইবে।

রাধার বচন শুনি রসিক গোপালে। দুঃসহ মদনবাণে করিল পাগলে ॥
রাধার বচন কানু ভাবে মনে মনে। বিন্ধাইল কাম্ভে যেন ঝুমিল হরিণে ॥
কবে কৃষ্ণ বড়াইবে আনিল হাথ সানে। কহিল মরম কথা বিবিধ বিধানে ॥
কি লাগি বড়াই রাধা মনে দুঃখ মানে। সুখে বিকে যাঙ আমি নাহি চাহি দানে ॥
পুরুষ বচন রাখু দেউ জৌউদান। হাসি দেউ কানুরে অধর মধু পান ॥
দান ছলে যত কিছু বৈল কোপবানী। তা সব নাগরমান দাস হেন মানি ॥
চল যাই বড়াই বুঝাহ চন্দ্রাবলী। আশ দিয়া দাস বলি রাখু বনমালী ॥১৪

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত গোপালবিজয়েও যশোদা কৃষ্ণের ব্যবহার জানিতে পারিয়া কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেন।

কথোদিন যশোদা জানিল বেবহারে। কানাঞিকে ভরছিল নানা পরকারে ॥
দেখিল শুনিল বোল লঅাইল নহে। আখিএ১৫ দেখিলে সাখী সমুখে না কহে ॥১৬

ব্রজলীলার এবং কাব্যেরও উপসংহার ভাগ এইরূপ—

অক্রুর সাক্ষাতে গোপী জোড় করি হাথ। সভারে লইয়া যাহ রাখি প্রাণনাথ ॥
মোর প্রভু দিয়া যাহ নন্দ আদি লঞা ॥ অনাথী গোপীরে কিন গলে দড়ি দিঞা ॥
বিনয় বেভারে যদি নাহি শুন বোল। কার প্রাণ নিবেক নেউক প্রভু মোর।
রথের চাকাতে গোপী রহিল পড়িয়া। কে চালাবে চালাউ রথ গোপিনী বধিয়া ॥
এত বলি গোপী যবে গায় অতি রাগে। তখন করুণাময় ডাকে কর-আগে ॥
হের শুন রাধা আদি পরম বল্লভা। আমি কত দিনকে জাইব কংস সভা ॥

১৩। ক-, পত্রাঙ্ক ৭০খ—৭১ক ; ব-, পত্রাঙ্ক ৪৮-৪৯। ১৪। ক-, পত্রাঙ্ক ৭২ ক। ১৫। 'আসিএ'। ১৬। ক-, পত্রাঙ্ক ৮৪ ক।

দিনেক লাগিয়া কেনে কর অমঙ্গলে। হাসিয়া বিদায় কর আসি এ কুশলে ॥
এত শুনি সব গোপী গলবন্ধে কান্দে। পরাণ ফাটিতে চাহে বুক নাহি বান্ধে ॥
তথন রসিক গুরু ছিণ্ডি বনমালা। একে একে ফুল দিয়া তুসে ব্রজবালা ॥
রস বুঝি পায় যবে চালাইল রথে। তথন রাধিকা কিছু কহে পথে পথে ॥
আমা ছাড়ি কোথা যাহ প্রাণের কানাঞি। তোমা লাগি ঘর [ঘার] সকল হারাই ॥
তুমি যে এমন হবে তাহা না জানিল। ইকুল উকুল দুই কুল হারাইল ॥
তোমা লাগি এদিগে ছাড়িলা সব জনে। তুমি বা ছাড়িবে যদি জিব বা কেমনে ॥
দেখিনে নিমিষ যে বিপিন করি জানি। বিরহের মাঝে পেলা৷ গেলে চক্রপাণি ॥
সে জন কেমনে জিব দূর পরবাসে। কোন ছার জিউ রাখি দরশন আসে ॥
এত বলি গোপী যবে গেল কথো দূরে। তথন হাসিয়া কহে নাগরশেখরে ॥
আর কত দূর বা আইস অনুসরে। ননীকে অধিক তনু রৌদ্রে জানি গলে ॥
অনুসরি রৌদ্রে যবে এত দুঃখ মান। লেউটিতে বিরহ আনল নাহি জান১ ॥
রবির কিরণ যবে না সহে শরীরে। তাহাক পেলিয়া যাহ বিরহ-আনলে ॥
এত শুনি নিশ্বাস ছাড়িয়া কৃষ্ণ যাএ। সব পুরজন মেলি গোপীরে রহাএ২ ॥
এথা কৃষ্ণ রথে চড়ি মথুরা নগরে। দেখিয়া সকল লোক আনন্দ অন্তরে ॥
বৃন্দাবন ভরি সব রসের বাদলে।৩ তাহে প্রেম তরঙ্গেতে অধিক উথলে ॥
কৃষ্ণ নব জলধর রসে পরিপূর। সকল গোপীর হিয়াশোষ হৈল দূর ॥
ভকত ঔষধ দানে পাই জিউদান। ভবতাপে জুড়াইল জগত পরাণ ॥
হেন সুখবাদলে থাউক সবকাল। অশেষ ধরমশাস্ত্র বাড়ুক সকাল৪ ॥
তপস্বীর তপ কৃষ্ণ ফলু ভাল মতে। পুণ্যের৫ দুর্ভিক্ষ নহ সুখে রহ সব্বে৬ ॥
ভাবকময়ূর ইথি নাচুপাক৭ ফিরি। কাল সাপে খাউ আর দুর্জ্জন পাউরি ॥
গোপালবিজয় কথা কহিল আলাপে। অনুসারে জানিবে পুরাণ আলাপে ॥
কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি। হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাষা বলি।৮

১। 'মান'। ২। 'বোহা এ'। ৩। তুলনীয়—বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর কবিশেখর ইহ রস গায় ॥ কীর্ত্তনানন্দ, পৃঃ ২৬১। ৪। 'শবকাল'। ৫। 'পুণ্যের'। ৬। 'বহ সর্ব্বে'। ৭। 'নাছ পাক'। ৮। ক-, পত্রাঙ্ক ৯৭খ-৯৮।

[৭৮]

কবিশেখর যে অসামান্য কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন তাহা উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলে সংশয়ের হেতু থাকিবে না। ভাষা যেমন সরল, পয়ার ছন্দও তেমনি সাবলীল, যতিভঙ্গ (যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে) অথবা অক্ষরাধিক্য একেবারেই নাই। উপমা প্রভৃতি পাণ্ডিত্যবর্জ্জিত অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি—

যাকে যার অভিরুচি সে সি তাকে ভায়ে। পল্লব ছাড়িয়া উষ্ট্র কণ্টক চিবায়ে ॥
রাহুর নিকটে চাঁদ রহে কতক্ষণে। সিংহের সমুখে কেবা সমর্পে হরিণে ॥
মত্ত হাথি হাথে কেবা পাপে ফুলমালে। ঘৃত কে আবুধ রাখে জ্বলন্ত আনলে ॥
ইবে সে কোথারে গেলি পুড়িশি বড়াই। পড়ে অগ্নি জড় করি রহ আন ঠাঞি ॥
প্রেমের অধীন কৃষ্ণ পরশিল প্রেম। কষ্টি পাথরে যেন কষি নিল হেম ॥
গোপাল বিজয়ে মাঝে এই বোল দড়। বিনি দরবিলে৯ ধাতু নাহি হয় যোড় ॥
ইত্যাদি।

[৭৯]

অর্ব্বাচীন পুঁথির মধ্যেও গোপালবিজয়ের ভাষার প্রাচীনত্ব অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের পূর্ব্বে নহে। তথাপি ইহাতে পাইতেছি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত আদ্য অকারের স্থলে আ-কার। যথা—আবুধ, আনল, আপার, আতি, আপমান ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত ইহাতে 'আইহন'ই পাওয়া যাইতেছে। ভাষায় প্রাচীনত্বের অপর কিছু চিহ্ন দেখাইতেছি।

'যেন সব নদ নদী স মু দ্র কে যায়।' 'কথায় না দেখি 'কাঁ চ' লোম এক পাড়ি ॥
'ছাড়হ ছাড়হ কানু কেহ 'জা নি' দেখে। কাঁচলি না ধর 'পা ছে' লাগে নখরেখে ॥'
'বিষাইল কাণ্ডে যেন ঝুমিল হরিণে।' 'দেখিল শুনিল বোল ল আইল নহে ॥'
'ন নী কে' অধিক তনু রৌদ্রে জানি গলে ॥'
ইত্যাদি।

৯। 'বিনি না দ্রবিলে'।

স্বাধীনতা

বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রীয় হিসাবে অনেক স্বাধীন জাতি দেখিতে পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্পন্ন কোন জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না। জ্ঞানে বিজ্ঞানে, যুদ্ধনৈপুণ্যে সমস্ত জাতি নিজ নিজ প্রাধান্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেও নিজ নিজ অন্নসংস্থানের জন্য প্রত্যেক জাতিকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিলেও এখন পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নারী-শিক্ষা

—শ্রীশরৎকুমার রায়

মৎসদৃশ অযোগ্য ও অকিঞ্চিৎকর জনকে এই সভার অধ্যক্ষতার ভার অর্পণ করিয়া আপনারা আমাকে অনুগৃহীত করিলেও আমাকে এই নিমিত্ত বিশেষ কুণ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছেন। আমা অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির উপর এই ভার ন্যস্ত করিলে বোধ হয় ভাল হইত। তবে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব এই জেলাবাসী নারীগণের শিক্ষাকল্পে যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহা স্মরণ করিয়াই অদ্য আপনারা আমাকে এরূপ ভাবে সম্মানিত করিয়াছেন।

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব যে যুগে সেই নারী-শিক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, অদ্য আমি সেই যুগে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া অস্মদ্দেশে স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য তাহার সূচনা করিব। আমি ৺মনোমোহন বসু প্রণীত 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটকের কথা কহিতেছি। আমি নিম্নে উক্ত নাটকের প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক হইতে দুইটি মহিলার, ননদ ভাইজের কথোপকথনের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম :—

সুশীলা। (সরলা রচিত একটি কবিতা পাঠান্তে) ছোট বৌ! তুমিই সার্থক লিখাপড়া শিখেছিলে। আমাদের মিছে শেখা।

সরলা। কেন ঠাকুঝি?

সুশীলা। কেন আর কি—আমরা কি বিয়ে কর্ম্মের জন্য শিখি? এমন ক'রে কবিতা রচতে না পার্লে আর মেয়ে মানুষের লেখাপড়া শেখা কি?

সর। এমন কথা ব'লো না ভাই। সকলেই কি কবিতা লিখবে? বিদ্যা শিক্ষার ফল যেটা, সেইটা হলেই হল; ভাল মন্দ বুঝবে, উচিত অনুচিত জানবে, জেনে তার মতন কাজ কর্ব্বে।

সুশীল। তার দৃষ্টান্ত?

সর। কেন, দ্বেষ হিংসা ভুলবে; কোঁদল কচকচি ছাড়বে, পরের ভালোতে থাকবে, মন্দ ক'র্বে না; পরের যশ গাবে, নিন্দে কর্বে না; ঘরকন্না কিসে ভাল হয় দেখবে, যদি ছেলে মেয়ে থাকে তাদের মানুষ কর্ব্বে—সুনীত শেখাবে; গুরু লোকের সেবা ভক্তি কর্বে; আর যিনি প্রাণের প্রাণ, তিনি যাতে সুখে থাকেন, একান্ত মনে তার চেষ্টা পাবে এই সব কর্ত্তে পার্লেই মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শেখা সার্থক হয়।

সুশীল। তাতো বটেই, কিন্তু আবার যে যুবতী এমন ক'রে বিধাতার কাছে মনের গুপ্ত ভাবটা প্রকাশ কর্ত্তে পারে, তার গৌরব ত রাখবার স্থান নাই!...

সন ১২৭৬ সালে এই নাটক লিখিত হয়, সুতরাং আজ ৬৪ বৎসর অতীত হইল, বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তখনকার চিন্তাশীল বাঙ্গালীর—অন্ততঃ এই গ্রন্থকারের, মনে যে আদর্শ বিদ্যমান ছিল, এখনও অনেক পরিমাণে তাহাই রহিয়াছে, এ কথা বোধ হয় স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। একালেও এই সাবিত্রী শিক্ষালয়টি * অন্ততঃ সেই আদর্শেই পরিচালিত হইতেছে দেখা যাইতেছে।

মনোমোহন বাবু তাঁহার নাটকের নায়িকা সরলার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "সকলেই কি কবিতা লিখবে? বিদ্যা শিক্ষার ফল যেটা সেইটা হলেই হল; ভাল মন্দ বুঝবে, উচিত অনুচিত জানবে, জেনে তার মত কাজ কর্ব্বে"—বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, মনুষ্যমাত্রের মনে বিচারশক্তি জন্মান। ভাল মন্দ, উচিৎ অনুচিৎ বুঝিয়া জানিয়া তার মত কার্য্য করিতে পারিলেই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য যে নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যাশিক্ষার যে ফলশ্রুতি আছে তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তাহা এই :—

---

* এই প্রবন্ধটি রাজসাহী সাগরপাড়া সাবিত্রী শিক্ষালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভার সভাপতির অভিভাষণ।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততো সুখম্॥

অর্থাৎ, বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য পাত্রত্ব বা যোগ্যতা লাভ। ইহা আরও ব্যাপক হইলেও বস্তুতঃ মনোমোহন বাবুর নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সহিত ইহার কোনও বিরোধ নাই। কেন না যোগ্যতা লাভ না ঘটিলে কাহারও বিচারশক্তিলাভও ঘটে না।

বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক বটে, যোগ্যতা লাভ না ঘটিলে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবেই ব্যর্থ হইবে। ধনার্জ্জন করিতে হইলেও যোগ্যতার্জ্জনের বিশেষ প্রয়োজন আছে—পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি। বস্তুতঃ অপাত্র ধনার্জ্জনে অক্ষম। যে ধনার্জ্জনে অক্ষম তাহার পক্ষে বিবাহ করা বিড়ম্বনা। আমাদের দেশে বিবাহের বরকে 'পাত্র' এবং কন্যাকে 'পাত্রী' কহিয়া থাকে। অর্থাৎ পুরুষ বা স্ত্রীকে বিবাহের যোগ্য হইতে হইলে তাহাদিগকে তৎপূর্ব্বে পাত্রতা লাভ করিতে হইবে, নচেৎ বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য যাহা, অর্থাৎ সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন, তাহা সম্যক্ করিতে তাহারা অসমর্থ হইবে। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের জীবন সুখময় হইবে না। ধনার্জ্জন করিতে পারিলে তবে ধর্ম্মলাভ এবং ধর্ম্মাচরণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে সুখলাভ ঘটিয়া থাকে। ইহাই আমাদের শাস্ত্রের উক্তি। সে ধর্ম্ম সংসারধর্ম্মই হউক, অথবা অন্যবিধ ধর্ম্মই হউক।

সংসারধর্ম্ম অথবা অন্যবিধ ধর্ম্ম আচরণের নিমিত্ত পুরুষের পক্ষে যে প্রকারের যোগ্যতার প্রয়োজন আছে, নারীর পক্ষে ঠিক তদনুরূপ প্রয়োজন না থাকিলেও অনেকখানি রহিয়াছে। বিবাহের পাত্রী হইতে হইলে কন্যাকেও 'পাত্রত্ব' লাভ করিতে হইবে। ইহা এদেশেরই আদর্শ; অপিচ যখন 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ', তখন বিবাহিতাকে তৎযোগ্যা হইতেই হইবে। তবে অস্মদ্দেশে বহুকালাবধি বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় এবং এখনও তৎপ্রথা বলবৎ থাকায় এই পাত্র বা পাত্রী আখ্যা কেবল কথার কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমরা 'যোগ্য' পাত্র পাত্রীরই সন্ধান করিয়া থাকি। যদিও সে যোগ্যতার পরিমাপ অধিকাংশক্ষেত্রে পাত্রপক্ষে পিতৃসঞ্চিত অর্থের তারতম্যে করা হইয়া থাকে, এবং পাত্রীপক্ষে কেবল মাত্র বর্ণ, নাসিকা, মুখ, চোখ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচার বিশ্লেষণই করা হয়, পাত্র-পাত্রীর প্রকৃত যোগ্যতার বিচারের উপর তাদৃশ নির্ভর করে না। যদি কোনও গতিকে পূর্ব্ব-পুরুষত্যক্ত ধন বিনষ্ট হয়, তবে ঐ তথাকথিত পাত্রপাত্রীর আর ক্লেশের পরিসীমা থাকে না।

এই নিমিত্ত পাত্র-পাত্রীর যোগ্যতার যে আবশ্যকতা আছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ৬৪ বৎসর পূর্ব্বেও 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটককার যে ইহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। কলিকাতা হইতে সুদূরবর্ত্তী এই রাজসাহী জেলাবাসী আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরও ঐ সময়েই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার স্বগ্রামে—দিঘাপতিয়ায় এবং এই রাজসাহী সহরে নর-নারী উভয়েরই বালিকা বিদ্যালয় এবং উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপনপূর্ব্বক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালে এই শিক্ষার প্রয়োজন যে আরও অধিক অনুভূত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং নর-নারী উভয়েরই সুশিক্ষার ব্যবস্থা যতই প্রসার প্রাপ্ত হইবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল হইবে। আজি আপনারাও সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই সাবিত্রী শিক্ষালয়টি স্থাপন করিয়াছেন এবং আমাদের এই বাল্যবিবাহ প্রথার পক্ষপাতী দেশে সেই শিক্ষা যাহাতে যথাসম্ভব অল্পকালের মধ্যে নিষ্পন্ন হইতে পারে তন্নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এইক্ষণে কথা হইতেছে, কি প্রকারে এবং কোন্ প্রকারের শিক্ষা দিলে এই পাত্রতা বা যোগ্যতা শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনী-গণ সম্যক্ লাভ করিতে পারে। এই প্রশ্ন উঠিলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠিবে, পাত্রতা বা যোগ্যতা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তর সরলার মুখে 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটক-কারই দিয়াছেন। ইহার প্রথম অংশটুকু স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয় অংশটুকু নারীগণের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অপিচ তিনি সুশীলার মুখে আরও বলিয়াছেন, 'মনের ভাবটি যে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে পারে তাহার গৌরব ত' রাখিবার স্থান নাই।' আজিকালি-কার মেয়েদের নিকট সরলার ঐ দ্বিতীয় উক্তিটি গ্রাহ্য হইবে কি না জানি না, তবে বোধ হয় সুশীলার এই উক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা ভিন্নমত নাও হইতে পারেন।

আধুনিক মনোভাবাপন্ন নারীগণের নিকট নারীশিক্ষার ঐ আদর্শ প্রাগৈতিহাসিক বা antiquated বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, বাঙ্গালীর সংসারধর্ম্মের আদর্শের যখন এই ৬৪ বৎসরে গভীর পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তখন শিক্ষার ঐ আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়া নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে যে ঘোরতর অন্যায় কাজ করা হইবে ইহা আমি মনে করি না। পরন্তু উহাতেই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে আদর্শ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যে সময়ে যে সমাজের পক্ষে যে আদর্শ অধিক অনুকূল তাহাই গ্রহণ করা সমীচীন। একটা মনঃকল্পিত অনাচরিত (untried) আদর্শ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে সমাজের বা শিক্ষার সংস্কার সাধন করিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। তাহাতে অনিষ্ট ব্যতীত কদাপি ইষ্ট হইবে না। কেন না সমাজ-দেহের যাহা অনুকূল নহে, তাহার আরোপ সমাজদেহের উপর বিষপ্রয়োগের তুল্য ক্রিয়া করিতে পারে। উহার দ্বারা তাহার কোন উপকার ত' সাধিত হইবেই না, পরন্তু জীবদেহে বিষ-প্রয়োগের তুল্য উহার দ্বারা সমাজদেহের ধ্বংসসাধনও হইতে পারে। পক্ষান্তরে সমাজকে যথাযোগ্য বিধানে পরিবর্ত্তিত ও উন্নত করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে জড়-ভরতে পরিণত করাও ঘোরতর পাপ। অতএব যাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণপ্রদ ও তদুন্নতি সাধনক্ষম, যাহার সহিত তাহার 'নাড়ীর সম্বন্ধ' আছে, বিচারপূর্ব্বক এমনতর সংস্কারসকল সাবধানে প্রবর্ত্তন করাই সমীচীন। বরং জড়ভরতে পরিণত হইয়াও সমাজ জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু বিষ প্রয়োগ করিলে তাহার ধ্বংস নিশ্চিত। কিরূপ আদর্শে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হইতে পারে, আমি পরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

এক্ষণে দেখা যাউক, 'পাত্রতা' বলিলে কি বুঝিতে হইবে। উপরোদ্ধৃত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং'। এই 'বিনয়' মানে কি? অভিধানে বিনয় অর্থে সুশীলতা, শিক্ষা, দমন অর্থাৎ আত্মসংযম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং 'শীল' কথার আভিধানিক অর্থ, চরিত্র বা সচ্চরিত্র। অতএব দেখা যাইতেছে, শিক্ষার synonym বা প্রতিশব্দ হইতেছে, আত্মসংযম, সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি। বস্তুতঃ বিদ্যার্জ্জনের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে, আত্মসংযম অভ্যাস এবং তদুপায়ে চরিত্র গঠন করা। চরিত্র গঠিত না হইলে মনুষ্য মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না; তাহার ভালমন্দ বিচারশক্তিও জন্মাইতে পারে না; এবং চরিত্রবল লাভের প্রধান উপায় হইতেছে সংযমাভ্যাস। সুতরাং সংযমাভ্যাস গোড়া হইতেই সুরু করা প্রয়োজন। যে সকল শিক্ষালয়ে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে শৈশব হইতেই বালক বালিকারা যাহাতে সংযমাভ্যাস করিতে পারে তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। প্রতি স্কুল, কলেজেই discipline-এর ব্যবস্থা আছে, উহা সংযম অভ্যাসের একতম উপায় বটে।

আমার জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, যথোচিত চরিত্রবলের অভাবে বাঙ্গালী জাতি বিবিধ মহদনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াও পুনঃ পুনঃ সাফল্যলাভে অকৃতকার্য্য হইয়াছে ও হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ, বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠিত জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীগুলি দেখান যাইতে পারে। এগুলির failure এর বা ব্যর্থতার প্রধান কারণ ইহাই বলিয়া আমার অনুমান হয়। রাগ, দ্বেষ, লোভ, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ভয়, ক্রোধ, শ্রমকাতরতা, আলস্য প্রভৃতি চরিত্র-দোষগুলি আমরা ত্যাগ করিতে পারি না বলিয়া আমরা একতাবদ্ধ হইয়া কোন মহৎ কাজই করিতে পারিতেছি না। অথচ ষড়রিপু দমন এবং ষড়দোষ ত্যাগ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমাদের শাস্ত্র এবং হিতোপদেশাদির উপদেশ!

ষড়্ দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধঃ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥

'প্রণয় পরীক্ষা' নাটককারও তাঁহার দ্বিতীয় দফার উক্তির আরম্ভে এই প্রকারের আদর্শেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদিগের সম্মুখে এই সকল মহৎ আদর্শ নিয়ত বিদ্যমান থাকিলেও আমরা তাহা সর্ব্বথা মান্য করিয়া চলিতে পারি নাই। ফলে আমাদের দুর্দ্দশারও অবধি নাই। আহ্নিক পূজাপরায়ণ নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে আত্মসংযমাভ্যাস বিশেষ ভাবে প্রচলিত থাকিলেও তাহার কঠোরতা এত অধিক এবং উহার উদ্দেশ্য এত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ যে, তাহা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে আবশ্যকানুরূপ উন্নত করিতে পারে নাই। তথাপি আমরা তাহার দ্বারা যেটুকু লাভবান হইয়াছিলাম, বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষার ফলে সেটুকুও হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমি এই নিমিত্ত ইংরাজী শিক্ষার দোষ

দিতেছি না। কিন্তু যে প্রণালীতে অধুনা আমরা স্কুল, কলেজ প্রভৃতিতে এই শিক্ষালাভ করিতেছি আমি তাহারই দোষ দিতেছি। ইংরাজ পক্ষান্তরে তাহাদের নিজেদের শিক্ষা-প্রণালীর এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে, যাহাতে তাহারা জাতি হিসাবে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া চরিত্রবলে অতিশয় বলীয়ান হইয়াছে। অথচ আমরা তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছি। অপিচ আমাদের নিজের যেটুকু ছিল তাহাও হারাইয়া ফেলিয়াছি। ইহার কারণ কি তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমার মনে হয়, অধুনা স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক্ পরিমার্জ্জিত হইতেছে না, যথোচিত সংযম শিক্ষা হইতেছে না এবং আমাদের ভাল-মন্দ বিচার করিবার শক্তিও জন্মিতেছে না।

এইবারে আমি বলিব, কি প্রণালীতে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে আমাদের পাত্রত্বলাভ ঘটিতে পারে। আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ না করিলে আমাদের বিচার-শক্তি জন্মিবে না। এই নিমিত্ত আমি মনে করি, বালক-বালিকাদিগকে পাঠ্যপুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে শিখাইতে হইবে, কি উপায়ে object এবং phenomenon, অর্থাৎ বস্তু এবং বাস্তব ঘটনাবলীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় এবং পরীক্ষা দ্বারা ঘটনানিচয়ের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয় এবং পরিশেষে শিখাইতে হইবে, কিরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাফলে লব্ধ evidence বা প্রমাণগুলিকে weigh বা তৌল করিয়া ন্যায্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। এই প্রণালীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনিগণ শুধু যে ভাষাজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে তাহা নহে, তাহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইবে, মেধা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, তাহারা ধৈর্য্যশীল ও পরিশ্রমী হইতে পারিবে, অপিচ তাহাদের বিচারশক্তি জন্মিতে থাকিবে এবং তদুপরি তাহারা সত্য আবিষ্কার করিয়াও ধন্য হইতে পারিবে।

পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে হইলে অটল ধৈর্য্যের আবশ্যক এবং আত্মসংযমে অভ্যস্ত না হইলে কাহারও বিচার-শক্তিও জন্মে না। যে ধৈর্য্যে অভ্যস্ত হয় সংযমও তাহার আয়ত্ত হইতে পারে, এবং বিচারশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত-বিচারের শক্তিও জন্মাইয়া থাকে। অতএব এই উপায়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিলে সকল দিক দিয়াই পাত্রত্বলাভের উপায় হইতে পারে। সত্যানুসন্ধান ও তদাবিষ্কারের দ্বারা জীবনযাত্রাকে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা যখন মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য, তখন এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে তদ্বিষয়েও চরিতার্থতা লাভ ঘটিবে।

উপরিউক্ত বিজ্ঞানসম্মত রীতি অনুযায়ী সত্যানুসন্ধান এবং তদাবিষ্কারের পূর্ব্বেই যদ্যপি আমরা একটা মনঃকল্পিত আদর্শকে—যাহার কোনও ভিত্তি নাই, সত্য বলিয়া খাড়া করিয়া তদনুসারে আমাদিগের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করি, তবে আমরা যে ঠকিব তাহা বলাই বাহুল্য। আক্ষেপের বিষয় পল্লবগ্রাহী হইলেও আধুনিক মনোভাবাপন্ন বহু নর-নারীর মনে এই প্রকারের ভিত্তিহীন মনঃকল্পিত আদর্শকে সত্য বলিয়া খাড়া করিয়া তদনুযায়ী জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অহেতুকী tendency বা আগ্রহ জন্মিয়াছে। অবৈজ্ঞানিক এলোমেলো চিন্তা অর্থাৎ unscientific loose thinking এবং insufficiently supported affirmation-এর দ্বারা influenced বা প্রভাবিত হইয়া ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা ঐ সকল আদর্শকে পাশ্চাত্য রীতিসম্মত আবার কেহ প্রাচ্য রীতি অনুমোদিত—আজিকালি যাহাকে oriental আখ্যায় অভিহিত করা একটা fashion হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, উক্ত আদর্শগুলিকে উপযুক্ত শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক বিজ্ঞানসম্মত রীতি অনুযায়ী পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা তাহাদের যথার্থতা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেছেন কিনা সন্দেহ। তৎপর ঐগুলি আদৌ আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী হইবে কি না তাহাও তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিতেছেন কিনা সন্দেহ। এতটা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া কোনও সংস্কার প্রবর্ত্তন করিলে তবে আমাদের ইষ্ট হইতে পারে, নচেৎ নির্ব্বিচারে কোনও সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিলে কেবল ঘোরতর অনিষ্টই ঘটিবার সম্ভাবনা। এই নিমিত্ত আমাদের প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহ।"

এই হিসাবে 'প্রণয় পরীক্ষা'-কার কর্ত্তৃক উপদিষ্ট স্ত্রী-শিক্ষার দ্বিতীয় আদর্শটির শেষাংশটুকুও কদাপি অগ্রাহ্য নহে। এবং উহাকে সেকেলেই বা কি প্রকারে বলা যায়? আমাদে

দেশের অধিকাংশ মেয়েদের যখন স্বামীর ঘর-করণা এবং সন্তানের জননী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তখন শিক্ষার আদর্শ তদনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হওয়াই ত' আবশ্যক। পাত্রত্ব অবশ্য স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই তুল্যরূপে লাভ করিতে হইবে, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে উভয়ের যখন কর্ত্তব্য পৃথক্, তখন উভয়ের শিক্ষার আদর্শেরও তদনুসারে তারতম্য হওয়াই প্রয়োজন। অপিচ নারীগণ যাহাতে পরুষ পুরুষ-ভাবাপন্না না হইয়া সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি প্রসাদগুণে মণ্ডিত হইয়া, স্বামী ও সংসারের উপর তৎপ্রভাব বিস্তার দ্বারা তাহাদিগকে সুখী করিতে পারেন তৎপ্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাঁহারা এই বিবাহিত জীবনের আদর্শের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের পক্ষেও 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটকাকারের এই আদর্শ এককালে বর্জ্জনীয় নহে। তাঁহারা যদি জীবনটাকে চিত্রিত প্রজাপতির ন্যায় কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা (spooning এবং fooling) করিয়া কাটাইয়া দিতে না চাহেন, তবে সুগৃহিণী না হইলেও তাঁহাদিগকে সুদক্ষা নারী ত' (capable woman) হইতেই হইবে।

এক্ষণে আমি নারীগণের অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে কিছু বলিব। সুশীলার মুখে "প্রণয় পরীক্ষা" নাটককার যদিও বলিয়াছেন, "আমরা কি বিষয়কর্ম্মের জন্য শিখি?" তথাপি বাঙ্গালীর এই ঘোর দুর্দ্দিনে, তাহাদের এই অন্নচিন্তা চমৎকারের যুগে, যখন তাহাদের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত, তখন তাহাদিগকে এবিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে বই কি। বাঙ্গালী এক্ষণে একরূপ চাকরীগত প্রাণে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ বুঝিতেছি সে চাকরীও তাহার পক্ষে ক্রমে সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। অতএব অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবকই আর সহসা বিবাহ করিতে সাহসী হইবে না, কেন না বিবাহ করিলে পরিবার প্রতিপালনে তাহারা সক্ষম হইবে না। সুতরাং অনেক মেয়েকেই অন্ততঃ অনেককাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হইবে। তাহাদের পিতামাতা বা ভ্রাতাগণ ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পোষণ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ, কেন না তাঁহারাও অধিকাংশ স্থলে তাদৃশ ধনশালী নহেন। অতএব বাঙ্গালীর মেয়েকে বাধ্য হইয়াই ধনার্জ্জনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। সুতরাং তাহাদিগকে তন্নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। অতএব শিক্ষা দ্বারা পাত্রত্ব লাভ করিয়া নারীগণও যাহাতে যথোচিত উপার্জ্জনক্ষম হন, তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিগণ, নবাভ্যুত্থিত তুর্কী, প্রাচ্য চীন জাপান এবং আমেরিকানগণ কি কি উপায়ে তাহাদের নারীগণকে অর্থকরী বিদ্যায় শিক্ষিতা করিয়া তুলিতেছেন তাহার সন্ধান লইতে হইবে এবং লইয়া তাহা আলোচনা করিয়া অর্থাৎ তাহাতে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, বিচারপূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া যাহা যাহা আমাদের দেশের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে, অপিচ প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে আমাদিগকে হঠিয়া যাইতে না হয়, এরূপ ধরণের অর্থকরী শিক্ষাগুলি আমাদের নারী-শিক্ষালয়গুলিতে introduce বা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এই দরিদ্র দেশে ধনাঢ্য দেশের আদর্শে শিক্ষা দেওয়া অবশ্য দুষ্কর। কিন্তু উপায় কি? যে রূপেই হউক, উপযুক্ত অর্থকরী বিদ্যা আমাদের নরনারীগণ মধ্যে introduce বা প্রচলন করিতেই হইবে, নচেৎ গত্যন্তর দেখি না। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যথোপযুক্ত পাত্রত্ব না জন্মিলে কোন অর্থকরী বিদ্যাই আমাদের পক্ষে কার্য্যকরী হইবে না।

আপনারা এই সাবিত্রী শিক্ষালয়ে মেয়েদের সেলাই শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাল কথা। কিন্তু শুধু ঐ টুকুতেই হইবে না, আরও অনেক চাহি। কি চাহি তাহা অপরাপর দেশের এতৎ প্রকারের শিক্ষারীতি নিচয় আলোচনাপূর্ব্বক বুঝিয়া-সুঝিয়া স্থির করিয়া লইবেন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। শারীরিক বল না জন্মিলে মানসিক বল জন্মে না ও পাত্রত্ব লাভপক্ষে বিঘ্ন ঘটে ইহা বোধ হয় কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে। অতএব মেয়েদের উপযুক্ত ব্যায়াম শিক্ষা দিবার ও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। স্ত্রী বা পুরুষকে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে fit বা কর্ম্মক্ষম রাখিতে হইবে, একথা যেন কেহ বিস্মৃত না হন। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে অঙ্গচালনা করিলে অঙ্গসৌষ্ঠবেরও বৃদ্ধি হইবে, অপিচ আত্মরক্ষা করিতেও নারীগণ পারদর্শিনী হইবে।

বড় ও ছোট

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

সান্ধ্য আকাশে দিবসের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। বরানগরের গঙ্গাতীরস্থ এক ধনীর বৃহৎ অট্টালিকার এক প্রান্তে পূজার মণ্ডপে গোপালের আরতি শেষ হইয়াছে; বাড়ীর বড় বৌ কাদম্বিনী পূজা ও আরতি শেষ হইবার পর হাত জোড় করিয়া "মেরে দীন দয়াল গোপাল হরি" এই গীতটি শুনিতেছেন। গীতও সমাপ্ত হইল, পূজার স্থানের আলোও ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল। কাদম্বিনী পূজার প্রসাদ হস্তে ঝিকে সঙ্গে লইয়া বাটীর দিকে চলিলেন। কাদম্বিনী সুন্দরী, অতি শান্ত পবিত্র তাঁহার মুখশ্রী। বয়স ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে; কিন্তু স্বাস্থ্যের ঐশ্বর্য্য পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান থাকায় বয়স কুড়ি বাইশের বেশী মনে হয় না। পরণে একটি লাল পেড়ে গরদের শাড়ী, সীমন্তে সিন্দুর শোভা পাইতেছে। মাতৃত্বের জাগ্রত প্রতিমা। কাদম্বিনী স্বামীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাসিয়া বলিলেন, "প্রসাদ নাও"। বলিয়া শিশিরের হাতে দুটি প্রসাদী সন্দেশ দিলেন।

শিশির বারান্দা হইতে চাঁদের আলোতে তাহার বাটীর নিকটেই একটি সামান্য দ্বিতল বাটীর দিকে চাহিয়াছিল। এই বাটী তাহার এক মাত্র কনিষ্ঠ সহোদর পরিমলের। পরিমল তাহার পিতার মতের বিরুদ্ধে লাবণ্যকে বিবাহ করে। লাবণ্য অনার্সে বি-এ পাশ করিয়াছে। পরিমল পিতার সঞ্চিত অর্থ বা সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত। সে ওকালতী করিয়া কোন রকমে তাহার ক্ষুদ্র সংসার চালায়।

তাহাদের একমাত্র পুত্র গোপাল, তাহারও যত্ন ভাল করিয়া হয় না।

লাবণ্যকে শিশির একটু স্নেহের ও বিস্ময়ের চক্ষে দেখিত। শিশির নিজে তিন বার বি-এ ফেল করিয়া পিতার মাসিক তিন শত টাকা ব্যয় করাইয়া তিনটি অধ্যাপক বাড়ীতে নিযুক্ত করার পর চতুর্থ বারে অনেক কষ্টে গ্রাজুয়েট হইয়াছিল। সেই কারণে সে যে বি-এতে অনার্স পাওয়া ভ্রাতৃবধূকে একটু বিস্ময় ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

লাবণ্যের সর্ব্ব অঙ্গে শিক্ষার একটা ছাপ, কেমন স্বচ্ছন্দ গতি,—তাহার সুন্দর গায়ের রংএ কি কি রংএর শাড়ী মানায়, সে বিষয়ে কি চমৎকার জ্ঞান, তর্কে-বিতর্কে, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক আলোচনায় তাহার বাক্‌পটুতা—এই সব বিভিন্ন গুণাবলী শিশিরকে লাবণ্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে।

লাবণ্যের সঙ্গে কাদম্বিনীর অনেক পার্থক্য। ঠাকুরসেবা, ঠাকুর-ঘরের পরিচর্য্যা করিয়া যেটুকু সময় মিলিত, একমাত্র কন্যা গৌরীর তত্ত্বাবধান করিতেই কাদম্বিনীর তাহা কাটিয়া যাইত। শিশির চাহিত মোটরের হুড নামাইয়া কাদম্বিনীকে লইয়া কলিকাতার পথে, মাঠে, লেকে, গঙ্গার ধারে বেড়াইতে। সে সময় বা সুযোগ একটি দিনের জন্যও কাদম্বিনী তাহাকে দিত না।

কিন্তু লাবণ্য?—শিশির প্রায়ই তাহার কথা ভাবে। আজও ভাবিতেছিল।

এই সময়ে "দাদা কোথায়, দিদি?" এই শব্দ রমণীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল। তখন কাদম্বিনী গৌরীকে ধরিয়াছেন ও দাসী দ্রুতপদে চলিয়াছে নিধি বেয়ারাকে বকিতে, সে কেন গৌরীকে জল ঘাঁটিতে বাধা দেয় নাই। তিনি লাবণ্যকে বলিলেন, "দেখ, বোধ হয় বারান্দায় আছেন—খোকা কেমন আছে?—কাল যখন বাড়ী পাঠিয়ে দি, তখন গাটা' গরম দেখে-ছিলাম, মনে হয়েছিল।" লাবণ্য বিরক্তির স্বরে বলিল, "সে বেশ ভালই আছে। তোমার ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করছে।"

শিশির ভ্রাতৃবধুকে দেখিয়া কহিল, "এস এস লাবণ্য, কি খবর?"

লাবণ্য সোৎসাহে বলিল, "দাদা, কাউন্‌সিলে কি স্পিচই দিয়েছেন আপনি—মিঃ বসু বললেন যে আপনার মত দেশ-প্রেমিক না হলে কি কাউন্‌সিলের কাজ হয়!" শিশির প্রীত হইয়া বলিল, "বোস্‌ এই কথা বললে?"

লাবণ্য হাসিয়া বলিল, "আরও বললেন যে আপনার মত লোক যদি কাউন্‌সিলে থাকেন, দেশের দুঃস্থ চাষীর অবস্থা ভাল

হবেই। পল্লী-সংগঠনের প্রস্তাব নিয়ে খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে দাদা।"

শিশির বলিল, "বল কি লাবণ্য—আমার স্পিচের এত সুখ্যাতি হয়েছে? কোন কোন কাগজ সুখ্যাতি করেছে বটে,—কিন্তু...।" লাবণ্য উত্তর দিল, "দেশে নিরপেক্ষ কাগজের সংখ্যা খুবই কম।" এই সময়ে কাদম্বিনী তাহার পঞ্চম বর্ষীয়া একমাত্র কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ওগো আমি ত' আর পারি না এই মেয়েকে নিয়ে।" শিশির বলিল, "কি হয়েছে?"

কাদম্বিনী বলিলেন, "দেখ না, যেই আমি পূজোর যায়গায় গিয়েছি, সেই ও পালিয়ে ছিল, ঝি তো টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে এল, মেয়ে জল ঘাঁটছিলেন, গা বেশ গরম হয়েছে, চোখও ছল ছল করছে। একটা ওষুধ দেওয়ার দরকার।"

শিশির গৌরীকে ডাকিয়া গা দেখিয়া বলিল, "একটু গা গরম হয়েছে বটে, ও কিছু নয়, একটু ফেরাম ফস ও ক্যালি মিউর এক ঘণ্টা অন্তর দিও, সেরে যাবে।"

কাদম্বিনী চটিয়া বলিল, "রেখে দাও তোমার ফেরাম ফস্ আর ক্যালি মিউর। আমায় সেদিন দিলে, কোন উপকার হয় নি--অবিনাশ কাকাকে ডাকাও।" শিশির বলিল, "আচ্ছা ডেকে পাঠাচ্ছি।" কাদম্বিনী লাবণ্যের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

[২]

পরিমল এক সন্ধ্যায় কাছারী হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের সময় খুব ভাল সন্দেশ কিনিয়াছে। বাস্ হইতে নামিয়া বাজার হইতে একটি রোহিৎ মৎস্যও ক্রয় করিল। সেদিন তাহার জেরার গুণে এক বিশেষ খারাপ মামলায় জিৎ হওয়ার দরুণ মক্কেল খুসী হইয়া কিছু বেশী টাকা দিয়াছিল। পরিমল ঠাকুরকে বলিল "ওরে, এই রুই মাছটা ভাল ক'রে কোট্—বড় মাছ, কোর্ম্মা হবে ভাল। কি বলিস!" পাচক খুব সোৎসাহে বলিল "এজ্ঞে।" পরিমল স্ত্রীর সংবাদ লইল—গৃহিণী বেলা তিনটার সময় পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এখনও বাড়ী ফেরেন নাই। খোকা ঠাকুরের নিকট হইতে খাবার খাইয়া পাড়ার ছেলেদের সহিত বরানগরের বাঁধানো ঘাটের কাছে মার্ব্বেল খেলিতেছিল, এখনও ফিরিয়া আসে নাই কেন, তাহা সে জানে না। লাবণ্য তাহার পুত্রের খবর লইতে সময় পায় না। সময়ে সময়ে পরিমল পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরে, পুত্রের কষ্টের জন্য যে সে কতখানি দায়ী তাহা চিন্তা করিয়া, তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসে। আজ পুত্রের বাটী ফিরিতে দেরী হইতেছে লক্ষ্য করিয়া সে বিশেষ চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। খোঁজে বাহির হইবে, এমন সময় গোপাল কাঁদ কাঁদ সুরে "বাবা" বলিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পরিমল পুত্রকে জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বাবা?" পুত্র জানাইল, সে মার্ব্বেল খেলা করিতেছিল, পাড়ার দুইটি বালক তাহার মার্ব্বেল কাড়িয়া লইয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছে। জ্যেঠা মহাশয়ের দ্বারোয়ান দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে, তবুও সেই বালকদের কিছু বলে নাই। জ্যেঠাইমা বাড়ীতে ছিলেন না, থাকিলে গোপাল সব ছেলেদের মজা দেখাইত।

পুত্রকে কাছে টানিয়া পরিমল বলিল, "তুই আর রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে মার্ব্বেল খেলতে যাস্‌নে। কতদিন ত' মানা করেছি। যা একটা গামছা নিয়ে আয়—মুখটা মুছিয়ে দি।" গোপাল পিতার ঘরে গামছা খুঁজিয়া পাইল না। মাতার ঘরে তিনটি তোয়ালে, দুইটি বড় গামছা আলনায় থাকা সত্ত্বেও সে মাতার ঘরে প্রবেশ করিল না।

পরিমল পুত্রের বিলম্ব দেখিয়া নিজেই গামছা আনিয়া পুত্রের মুখ মুছাইয়া দিলেন। সন্দেশের চুবড়ী হইতে দুইটি সন্দেশ হাতে দিয়া পুত্রকে পড়ার ঘরে যাইতে বলিলেন। পুত্র পাঠ আরম্ভ করিলে পরিমল নিজে ঘরে যাইয়া ল্যাম্পের আলো কমাইয়া দিল। একটি চেয়ারে বসিয়া দূরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীর তটে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীতট যেন তাহার হৃদয়ের অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

তাহার মাতার স্নেহের কথাই সে ভাবিতেছিল। একদিন তাহার স্কুল হইতে আসিতে দেরী হইলে তাহার পিতা ঘনশ্যাম বাবুর মোটরগাড়ী ছুটাছুটি করিত—দ্বারোয়ান চাকর দিকে দিকে অন্বেষণে বাহির হইত। মাতা কাঁদ-কাঁদ মুখে উপরের ঘরে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পুত্রের জন্য কত কত চিন্তা-উদ্বেগ! আর গোপালের মাতা—?

লাবণ্য গাড়ী হইতে নামিয়া সামনেই দেখিল, গোপাল। তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়া হাসিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা

করিল যে, পরিমল আসিয়াছে কিনা—যখন শুনিল যে, পরিমল বহুক্ষণ আসিয়াছে, প্রচুর সন্দেশ ও রোহিত মৎস্য আনিয়াছে, তখন হাসি মুখে স্বামীর কাছে গেল।

পরিমল তখন লণ্ঠনের আলো বাড়াইয়া একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা করিতেছিল। লাবণ্য আসিয়া বলিল, "সন্দেশ এনেছ, বেশ করেছ—কিন্তু অত বড় কই মাছ আনতে গেলে কেন আবার, অত মাছ রাত্তিরে রাঁধতে কত দেরী হবে—আর এত মাছ খাবে কে—যত সব বাজে খরচ—"

পরিমল হাসিয়া বলিল, "খাবার লোকের অভাব কি? আমাদের বুড়ো মালীটা আছে, আমার সেই ছেলে বেলার খেলার সাথী নিধি বেয়ারা আছে—তারা অনেক দিনই বাজার থেকে আমাকে জিনিষ আনতে দেখে আর বলে, ছোট বাবু একি কথা, চলুন বাজার বাড়ী রেখে আসি—"

লাবণ্য বলিল, "রাত্তির এগারটার সময় যত মালী উড়ে বেয়ারা খাবে—জালাতন!"

পরিমল বলিল, "এতে জ্বালাতন হবার কি আছে? দাদা সে দিন বলেছিলেন যে, দুঃস্থ পল্লীবাসীদের নিয়ে কাউন্সিলে যে স্পিচ দিয়েছেন, তা নাকি তুমি খুব এ্যাপ্রীসিয়েট (তারিফ) করেছ—অন্য অনেকেও সুখ্যাতি করেছে। সুতরাং দু'চারজন গরীব দুঃখী খাবে, এতে তোমার আলাতন হওয়ার চেয়ে এই কাজে সহানুভূতি করাই উচিত—গরীব বেয়ারা মালী—"

লাবণ্য বলিল, "সহানুভূতি আমার আছে—তবে সব জিনিষের একটা সীমা থাকা দরকার—সহ্য করবারও একটা সীমা আছে"।

পরিমল বলিল, "সেটা উভয়তঃ!" কি কথায় কি কথা। বুঝিয়া উভয়েই মনে মনে চমকাইয়া উঠিয়া চুপ রহিল।

[৩]

আজ শিশিরের একমাত্র কন্যা গৌরীর জন্মদিন। শিশিরের বাড়ীতে আজ বিরাট জন-সমাগম। অনেক মোটর গাড়ী কলিকাতা ও এদিক-ওদিক হইতে আসিয়াছে। শিশিরের এক বৃদ্ধা মাসশাশুড়ী ও শ্যালক আসিয়াছেন। মহিলাদের মধ্যে কাদম্বিনীর জন্মদিনের কথা চলিতেছিল—কোন্ মহারাজা হাতী করিয়া তাঁহার ভগ্নীর বাড়ীতে কাদম্বিনীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কোন্ জমীদারের মাতা সেই রাত্রে কাদম্বিনীর মাতার নিকটে ছিলেন, কোন্ দেশপূজ্য ব্যক্তি কন্যার জন্মদিনে রায়পুরের জমীদারকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। শিশিরের শ্যালকও পুরুষমহলে, রায়পুরের জমীদারের কোন্ সুদূর পূর্ব্বপুরুষকে শা সুজা কি সম্মান দিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইতেন না, যদি সুযোগ ঘটিত—কিন্তু সুযোগ ঘটে নাই।

কাদম্বিনী গৌরীকে কোলে করিয়া ও গোপালের হাত ধরিয়া বসিয়া ছিলেন। গোপালের মত সুকুমারকান্তি সুন্দর বালক প্রায়ই দেখা যায় না। যেমন ধবধবে রং, তেমনি সুন্দর গঠন, মুখ চোখ নাক সব নিখুঁৎ। নারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই গৌরীকে যেরূপ আদর করিতেছেন, গোপালকেও সেইরূপ আদর করিতেছিলেন। কাদম্বিনীও গোপালকে পুনঃপুনঃ চুমা খাইতেছেন। লাবণ্য এই দৃশ্যে একটু বিস্মিত হইয়াছে। তাহার একবার চুমা না খাওয়াটা বড়ই বিসদৃশ হয় এই চিন্তা করিয়া গোপালকে নিকটে ডাকিয়া একটি চুমা দিল। চুম্বন পাইয়া গোপাল আনন্দিত না হইয়া অপ্রস্তুত হইল, পরে রাগ করিয়া বলিল, "তুমি আমায় বাড়ীতে একবারও চুমা খাও না, জ্যেঠাইমা রোজ চুমা খায়।"

কাদম্বিনী গোপালকে জড়াইয়া আবার চুমা খাইলেন। গোপালের মার সম্বন্ধে উক্তিটি মহিলাদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি করিল। সকলেই বিস্মিত হইয়া লাবণ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। লাবণ্য বিরক্তির সহিত কি একটা কাজের অজুহাতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

শিশিরের গৃহে অনেক আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব গুণগ্রাহী ভক্তের সমাগম হইয়াছে—কেবল পরিমল আসে নাই।

কাদম্বিনী স্বামীকে ডাকিয়া অন্তরালে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগো ঠাকুরপো এল না যে।"

শিশির বলিল, "কি জানি কেন এল না।"

—"বলা হয়েছিল ত?"

—"হাঁ বলেছিলাম বৈ কি। সেদিন ঐদিক দিয়ে যাবার সময় গাড়ী থেকে—"

কাদম্বিনী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ওঃ, কষ্ট করে তুমি গাড়ী থেকে নামতে পার নি!"

শিশির কোন উত্তর দিল না। বোধ হয় উত্তর দিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। এই সংসার, এই সমাজ! গরীবরা ধনী আত্মীয়ের কাছে এই রকম ভাবেই উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

পরিমল যে এ উৎসবে আসে নাই, সে জন্য এক কাদম্বিনী ব্যতীত কেহই তাহার অভাব অনুভব করিতেছে না। পরিমলের জীবনসঙ্গিনী লাবণ্যও নহে। লাবণ্যই এই জন্মদিন উপলক্ষে উৎসবের স্রষ্টা।

লাবণ্য গৌরীর জন্মদিনে তাহাকে প্রায় ত্রিশ টাকার কাপড় খেলনা ইত্যাদি দিয়াছে, অথচ তাহার নিজের একমাত্র পুত্র গোপালের কাপড়-চোপড়ের পানে চাহিলে লজ্জা হয়।

লাবণ্যের বৃদ্ধা মাতা অর্থকষ্টের জন্য বার বার পত্র লিখিয়াও সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত পান নাই। তাহার ভ্রাতা সামান্য কাজ করে, বৃদ্ধা বিধবা মাতাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে না।

কিন্তু গৌরীর জন্মদিনে মিসেস বসু, মিসেস কারফর্মা, মিসেস গুপ্ত যে সব উপহার গৌরীকে দিয়াছেন, তাহা হইতে তাহার উপহারের সামগ্রীর মূল্য কম হইলেও যে ওজনে বেশী, সে তাহা প্রমাণ না করিয়া সমাজে কি করিয়া বাস করিতে পারে?

পরিমলকে যেদিন গোপাল আসিয়া বলিয়াছে যে, তাহার জ্যেঠামহাশয়ের দ্বারোয়ান উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সে পাড়ার বালকদের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছে, সেই দিন হইতে সে তাহার ভ্রাতার সহিত বিশেষ বাক্যালাপ করে না। তবে গোপালকে কাদম্বিনী বড়ই স্নেহ করেন। পূজা সাঙ্গ করিয়া অনেকদিন তিনি সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার ঠাকুরপোর সহিত গল্প করিতেন।

কেবল কাদম্বিনীর জন্যই পরিমল গোপালকে দাদার বাটীতে যাইতে দেয়।

কাদম্বিনীর একটি মাত্র কন্যা বিবাহের অনেকদিন পরে হইয়াছিল। কাদম্বিনী পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিতা। তাই গোপাল তাঁহার বিশেষ প্রিয়।

শিশিরের পিতা যে সময়ে পরিমলকে তাহার পিতৃস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করেন, সে সময়ে কাদম্বিনীই পরিমলের হইয়া শ্বশুরের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন। শিশির যে ভ্রাতার হইয়া কিছু বলিয়াছিলেন এইরূপ জানা নাই। যাহাই হউক পরিমলের অভাবে গৌরীর জন্মদিনের উৎসব ম্লান হয় নাই। কলিকাতার বিখ্যাত গায়কগণ সঙ্গীতের আসর জমাইয়াছিলেন।

কাদম্বিনী মাস দুই হইল পিত্রালয়ে গিয়াছেন, শীঘ্রই আসিবেন, গৌরীও সঙ্গে গিয়াছে।

শিশির কাউন্সিল অধিবেশন লইয়া এই দুই মাস ব্যস্ত ছিল। হোয়াইট পেপার, কম্উন্যাল প্রব্লেম ইত্যাদি লইয়া তর্কবিতর্ক হয়, ভিলেজ রিঅর্গানিজেসন লইয়া সে বিশেষ ব্যস্ত; পল্লীতে ইলেক্‌ট্রিকের স্থান কিরূপ হইবে তাহার জন্য চিন্তা করিতেছে। এই সব আলোচনায় লাবণ্য খুবই যোগ দেয়—অনেক সময় তর্কবিতর্কও করে। শিশির লাবণ্যকে খুব পছন্দ করে এবং প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই তাহার মতামত মূল্যবান বিবেচনা করে। লাবণ্যও তাহাতে নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করে। স্বামীর কাছে তাহার মতের যে কোন মূল্য আছে তাহা সে বুঝিতে পারে না। শিশিরের বাড়ীর কোন্ স্থানে কি পরিবর্ত্তন হইবে, যে ঘরে যে রং সেই ঘরে সেই রংএর কুশান ঠিক হইল কি না, কোন ঘরে পাখা ঠিক চলিতেছে কি না, এই সব তত্ত্বাবধান করিয়া লাবণ্যের একমুহূর্ত্ত সময় নাই। শিশিরের সহিত লাবণ্যের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিয়াছে।

পরিমল লাবণ্যের কোন কার্য্যে বিশেষ বাধা দেয় না। যাহা লাবণ্য দয়া করিয়া জানায় তাহাই পরিমল জানিতে পারে। তবে সে অনেক বিষয় জানিয়াও জানে না, দেখিয়াও দেখে না।

পরিমলের প্রাণ ঐ গোপাল। সে গোপালকে লইয়া খেলা করে, গোপালকে লইয়া বেড়াইতে যায়। গোপালের লেখা দেখে, গোপালময় তাহার জীবন।

একদিন লাবণ্য বেশ সাজসজ্জা করিয়া শিশিরের সহিত বাহির হইতেছে—পরিমলের সহিত দেখা হইল। লাবণ্য বলিল, "দাদার সঙ্গে একবার কলকাতায় যাচ্ছি। তিনি বলছেন যে আমাদের পাখার দরকার—বড় গরম পড়েছে। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক ইন্‌ষ্টলেশন না করলে চলছে না। গোটা দুই পাখা ও টেবিল-ফ্যান কিনে দেবেন বলছেন—"

পরিমল বলিল, "যখন সব ব্যবস্থা হয়েছিল তখন এ সব কথা জানবার হয়তো প্রয়োজন ছিল—এখন না জানালেই বা কি ক্ষতি হত ?"

লাবণ্য একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, "আমি যে সংসারের জন্য কত ভাবি তা একবার তোমার মনেও আসে না।" তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া মোটরে উঠিয়া শিশিরের বাড়ী গেল।

পরিমলের বন্ধু উকীল রমেশ বাবুর পুত্রকন্যাদের সঙ্গে গোপাল বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছে।

পরিমল আজ একাকী। সে একদিন ভাল গান গাহিতে পারিত। তাহার পিতা তাহার গান কত দিন শুনিতে শুনিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তাহাকে আদর করিয়া একটি বক্স-হারমনিয়াম কিনিয়া দিয়াছিলেন।

এই সঙ্গীত-জ্ঞানই তাহার জীবনকে হঠাৎ অন্য পথে অগ্রসর করিয়াছিল। এই গান শেখানর সূচনায় লাবণ্যের সহিত পরিচয়—পরে প্রেম বা লাভ-ম্যারেজ, পিতার অমতে।

সে যেদিন দুঃখ হইতে মুক্তি পাইতে চাহে, তখন এই হারমোনিয়াম লইয়া গান গাহিতে বসে।

গান বন্ধ করিয়া তাহার হাত-বাক্স হইতে সে পিতার শেষ পত্র পাঠ করিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিল—তাহার পিতা লিখিয়াছিলেন, "বিবাহ ভগবানের বিধানে সংঘটিত হয়। তাহা শুধু এই জন্মের বন্ধন নহে, জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। বিবাহের সময় পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের মতেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

"বিবাহিত পুরুষ ও নারীর মধ্যে, নারীর অন্ততঃ আট বা দশ বৎসরের বয়োকনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন।

"তুমি বৃদ্ধ পিতার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে—এই বিবাহ কখনো করিবে না। এই আধুনিক ভালবাসার মোহে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করিবে না। তোমার কর্ত্তব্য বৃদ্ধ পিতার অনুরোধ রক্ষা করা। তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য পালন না কর, পিতা তোমার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে যে বাধ্য, তাহা আমি বিবেচনা করি না—আমার কথামত কার্য্য না করিলে তোমাকে পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে তুমি আমার পুত্র, একেবারে নিরাশ হও তাহা আমার ইচ্ছা নাই—মাসে ৫০ টাকা করিয়া পাইবে ও তোমার মাতার ইচ্ছা অনুসারে ঐ ছোট বাড়ী তোমার—এর বেশী কিছু প্রত্যাশা করিও না। বৃদ্ধ বয়সে এই আঘাত বড় লাগিয়াছে—এ বিবাহে তুমি সুখী হইবে না।"

পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যেদিন সে বিবাহ করিয়াছিল তাহার মনে কতই আশা ছিল। লাবণ্য কতই উৎসাহ দিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল যে, তাহার এই বিবাহ জীবনে অনেক সুখ আনিবে, যাহা তাহার পিতা বা পূর্ব্বপুরুষদের অজ্ঞাত।

কিন্তু আজ সে দেখিতেছে, সে নিজে তাহার অভাব ও দারিদ্র্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেও তাহার স্ত্রী এই কঠোর বাস্তব ঘটনাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না।

এদিকে শিশিরের সহিত মেলামেশায় যে নানান্ কথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যে মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে, এ কথা লাবণ্যের মনে আদৌ স্থান পায় না।

পরিমল মহা বিপদে পড়িয়াছে। সে অবশ্য লাবণ্যকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অশান্তির তীব্রতা তাহাতে বাড়িবে বৈ কমিবে না, তাই ভাবিয়া চুপ করিয়া আছে।

[৫]

লাবণ্য ইহার মধ্যে তাহার বাড়ীর রূপ বদলাইয়া ফেলিয়াছে। ঘর বাড়ী সব বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোতে সজ্জিত। লাবণ্য যদিও ভাবিতেছে যে, বাড়ীর এই সুন্দর ব্যবস্থার জন্য সমগ্র কৃতিত্ব তাহারই, কিন্তু পরিমল জানে যে এত দামী পাখা তাহার দাদা প্রাণ থাকিতে তাহাকে দিতে পারিত না। লাবণ্য যাহাই বলুক, এই বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থার জন্য কাদম্বিনীর কৃতিত্বই সর্ব্বাধিক।

একদিন সে আইনের পুস্তক লইয়া মোকদ্দমার বিষয়, নজীর ইত্যাদি ঠিক করিতেছে—এই সময়ে কাদম্বিনী পূজা সাঙ্গ করিয়া পরিমলের বাটীতে আসিলেন।

"ঠাকুরপো" ডাক শুনিয়া পরিমল উঠিয়া আসিল। এই স্নেহময় ডাক পরিমলের নিকটে বড় মধুর। যখন কাদম্বিনীর বিবাহ হয়, তখন পরিমলের বয়স বার কি

তের। পরিমল তখন সবে মাতৃহারা হইয়াছে। দুই জনে প্রায় একই বয়সের। বৌদি তার খেলার সাথী বা সঙ্গিনী ছিলেন। সেই কৈশোর কালের মান অভিমান কলহ তাহার স্মৃতিতে প্রবল ভাবে বর্ত্তমান। মাতৃহারা বালক স্নেহময়ী ভগ্নীর সান্নিধ্যে আসিয়া কতই সান্ত্বনা পাইয়াছিল।

কাদম্বিনী তাহার নিকটে আসিতে পরিমল বলিল, "এস বৌদি।

কাদম্বিনী বলিলেন, "বাড়ীটা এখন ভদ্রস্থ হয়েছে। ছোট বৌ তোমার দাদার পয়সা বাঁচাবার জন্যে কতকগুলো পুরাণ পাখা কিনিয়েছিল—"

পরিমল হাসিয়া বলিল, "তারপর?"

কাদম্বিনী বলিলেন, "তারপর আবার কি—খুব বকে দিলাম—তখন সব নূতন এল। সে তো হ'ল কিন্তু ঠাকুরপো, ছোট বৌ বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। তোমার দাদাকে বললে তিনি বলেন যে, ছোট বৌ বি-এ, এম-এ পাস, ওদের ঐ রকমই করা অভ্যেস—এ ব্যাপারে লোকে একটু নিন্দা বান্দা না করছে তা নয়। কিন্তু আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন—"

পরিমল বলিল, "আমার পক্ষেও সহজ নয় বৌদি।"

কাদম্বিনী কহিলেন, "কি উপায় ঠাকুরপো—"

পরিমল বলিল, "উপায় তোমার হাতেই আছে।"

কাদম্বিনী সোৎসাহে কহিলেন, "কি, বল।"

পরিমল কহিল, "তুমি দিন কতক পূজো অর্চ্চনা একটু কমিয়ে দিয়ে দাদার সঙ্গে বেড়াও—লাবণ্য থাকে সঙ্গে থাক।"

কাদম্বিনী কহিলেন, "এ আর শক্ত কথা কি? পূজোটা সকালেই সেরে নেব—দু বেলা না হয় বন্ধ থাক্, ঠাকুর মশায় আরতি করবেন।"

পরিমল কহিল, "স্বামীকে সুখী করা, এই তো তোমার কাছে দেবতার পূজা। না হয় লাবণ্যের কাছে না হ'তে পারে।"

কিছুক্ষণ পরে গোপাল আসিয়া পড়িল। সে জ্যেঠাই-মাকে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া জ্যেঠাইমাকে জড়াইয়া ধরিল; জ্যেঠাইমা তাহাকে জড়াইয়া চুমায় চুমায় গাল ভরিয়া দিলেন।

[৬]

প্রায় দুই মাস অতীত হইয়াছে, পরিমলের পরামর্শ অনুসারে কাদম্বিনী লাবণ্যকে লইয়া শিশিরের সহিত বেড়াইতে যায়। লাবণ্য মনে মনে কাদম্বিনীর সঙ্গ পছন্দ না করিলেও যখন দেখিল শিশির তাহা অপছন্দ করে না, তখন অগত্যা এই রূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছে।

পরিমল পিতার অমতে লাবণ্যকে বিবাহ করিয়া পিতৃ অর্থ হইতে বঞ্চিত—এই কারণে স্থানীয় অনেকেই পরিমল ও লাবণ্যকে একটু কৃপার চক্ষে দেখিত।

পরিমল তাহা গ্রাহ্য করিত না। সে যে ওকালতীতে একদিন বেশ পশার করিবে তাহা জানিত এবং সে বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নহে, তাহার প্রমাণ ইহারই মধ্যে সে দিয়াছে।

পারিবারিক অশান্তি না থাকিলে হয়ত তাহার পক্ষে ব্যবসার ক্ষেত্রে আরো অধিক অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু লাবণ্য পাড়াপ্রতিবেশীর এই তাচ্ছিল্য, করুণা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। সে ধনীসমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র। তাহার স্বামী গরীব হইলেও সে যে ধনঞ্জয় রায়ের পুত্র ও লাবণ্যও যে তাঁহার পুত্রবধূ, তাহা সে মনে মনে ভাবিত। তবে তাহার এই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে প্রথমে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহা প্রশংসার্হ নহে। কিন্তু জগতে মানুষের শিক্ষা ও ধারণা অনুসারে কার্য্যের ক্ষেত্রে উপায়ের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়—লাবণ্যের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল এবং তাহার কার্য্য অনেক কুৎসা রটনার সাহায্য করিয়াছিল।

কিন্তু কাদম্বিনী এই ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়াতে, শিশিরের সহিত লাবণ্যের ঘনিষ্ঠতা লোকসমক্ষে নূতন রূপ লইল। শিশির পূর্ব্বে পরিমলের বাটী যাইত না। এখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বাধ্য হইয়া যাইতে হয় ও কাউন্সিলের কার্য্য সম্বন্ধে পরিমলের মত লইতে হয়। সে যাহা মতামত দিয়া থাকে তাহাতে শিশির নিজেকে বিশেষ উপকৃত মনে করে।

আজ পরিমলের বাড়ীতে শিশির, শশধর দা, যতীন অনেকেই উপস্থিত আছেন। শিশির কাউন্সিলে পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করিবে এবং তাহাতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা পল্লীতে করা উচিত এইরূপ মতামত প্রকাশ করিবে।

এই বৈদ্যুতিক আলোক পল্লীতে দেওয়া উচিত কিনা এই লইয়া ঘোর তর্ক উপস্থিত হইয়াছে।

শশধর দা পুরাকালে কাউন্‌সিলের মেম্বার ছিলেন, এখন আর রাজনীতিতে বড় যোগ দেন না। শশধর বলিলেন, "দেখ শিশির, এই যে পল্লীসংগঠন পল্লীসংগঠন ক'রে তোমরা ঘোর কলরব উপস্থিত করেছ, আমার মনে হয় পল্লীর লোক চাষী যাতে খেতে পরতে পেয়ে সুস্থ শরীরে পল্লীতে থাকতে পায়,—তাদের খাদ্যের অভাব, অনাহার থেকে বাঁচবার জন্য পল্লী শূন্য ক'রে নগরে না যেতে হয়, তার প্রথম ব্যবস্থা করা দরকার, "ভাই বেশী দিন না, ত্রিশ বৎসরের কথাই ধর না এর মধ্যে এই চাষী, যারা পল্লীর প্রাণ, দেশের সম্পদ, তাদের কি অবস্থা হয়েছে একবার ভাব দেখি? আগে তারা বসে থেকে তাস পাশা খেলেও খেতে পেত—তারপর অবস্থা হ'ল—অর্দ্ধেক লোক পল্লীতে খেতে পায়, আর অর্দ্ধেককে সহরে গিয়ে টাকা রোজগার করে খেতে হয়, আর সংসার চালাতে হয়। তারপর অবস্থা এল, পল্লী ছেড়ে সকলকেই সহরে এসে খাবার যোগাড় করতে হয়। তারপর এখন অবস্থা হয়েছে, তারা পল্লী ছেড়ে সহরে এসেও কাজ পাচ্ছে না, খেতেও পারছে না। এই ভীষণ অবস্থা যদি দূর করতে না পার তবে পল্লীসংগঠন হবে কি করে? যাদের নিয়ে পল্লী তারা যদি সব মরেই গেল, তবে সংগঠনের কাধা হবে কি করে! ইলেকট্রিক আলো ও হাওয়া খেয়ে কি তারা বাঁচবে?"

আমাদের একটা কথা বলা হয় নাই। ইতিমধ্যে ঘনশ্যাম বাবুর উইল লইয়া কাদম্বিনীর সহিত শিশিরের অনেক কলহ হইয়া গিয়াছে। ঘনশ্যাম বাবু প্রথমে যে উইল করেন, তাহাতে পূর্ব্বে বর্ণিত যা ব্যবস্থা তাহাই হইয়াছিল এবং সে উইলটি রেজিষ্ট্রি করা হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আর একটি উইল করেন—তাহাতে লিখিত হয়, যদি পরিমলের পুত্র হয়, সেই পুত্র তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, টাকাকড়ি, যা কিছু তাহার অর্দ্ধ ভাগের অধিকারী হইবে। যাঁহারা প্রথম উইলে সাক্ষী ছিলেন, তাঁহারা এই উইলেও সাক্ষী ছিলেন ও শিশিরও এক জন সাক্ষী ছিল। কিন্তু কাছারীর ছুটী থাকাতে উইল রেজিষ্ট্রি হয় নাই। ইহার তিনদিন পরেই হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে ঘনশ্যাম বাবু মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কাদম্বিনীর এই দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টাতে উইল রেজিষ্ট্রি না হইলেও সেই দ্বিতীয় উইল অনুসারে শিশির সম্পত্তি বিভাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

[৭]

লাবণ্য আজকাল বাড়ীতে বেশী থাকে। সে পরিমলকে সুখী করিয়া একটা মোটর গাড়ী কিনিবার সুযোগে ঘুরিতে-ছিল। কিন্তু পরিমল মোটর গাড়ী কিনিতে সম্মত হইতেছে না। বলিয়াছে, যতদিন নিজে রোজগার করিয়া সে মোটর গাড়ী কিনিতে না পারিবে, গোপালের টাকা লইয়া সে গাড়ী কিনিবে না। তাহার বাস্‌ই ভাল। সে প্রায়ই বলিত, "লাবণ্য এটা সর্ব্বদা মনে রেখ যে এই টাকাকড়ি, সম্পত্তি যা কিছু সব গোপালের—তোমার বা আমার এতে এক পয়সারও অধিকার নেই।"

এই কথাতে লাবণ্য যে বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নাই, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শীতকাল। লাবণ্যের অসুখ করিয়াছে। জ্বর ও কাসি হইয়াছে। ইদানীং গোপালকে লাবণ্য মাঝে মাঝে কাছে ডাকে। গোপালের শিশুকাল হইতে মাতা বলিতে একটা ভয় ছিল, তাহা যেন আজও বর্ত্তমান। সে আজ খেলিতে যায় নাই। কিন্তু প্যান্টে ধুলা মাখাইতে পাঁচ মিনিটও দেরী হয় নাই—সে সেই প্যান্ট লইয়াই মাতার ঘরের সমুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছে। লাবণ্য পাশ ফিরিতেই গোপালকে দেখিয়া ডাকিল, "খোকা, আয় ঘরে আয়।" গোপাল ভীত হইয়া বলিল, "মা, প্যান্টে ধুলো লেগেছে।" লাবণ্য হাসিয়া বলিল, "তুই বড় দুষ্টু—ধুলো ঝেড়ে আয়।" গোপাল দৌড়িয়া প্যান্টের ধুলা ঝাড়িয়া মাতার নিকটে গেল। আস্তে আস্তে বলিল, "মা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিই?"—লাবণ্য পুত্রকে কোলের কাছে টানিয়া লইল। লাবণ্য বলিল, "তোর কষ্ট হবে।" গোপাল বলিল, "না মা কষ্ট হবে না—বাবার মাথা কত দিন টিপে দিই।" লাবণ্য কহিল, "তুই তোর বাবাকে ভালবাসিস আর আমায়......" গোপাল বলিল, "তোমাকেও ভালবাসি মা।" এই কথা বলিয়া মা'র মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। লাবণ্যের মনে আজ কত কথাই জাগিতেছিল। সে ভাবিল, গোপালের অসুখের

সময় রাত্রির পর রাত্রি তাহার স্বামী কি কষ্টই করিয়াছেন—আর সে মাতা হইয়া সন্তানপালনে কতই অবহেলা করিয়াছে। লাবণ্য গোপালকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। গোপাল ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সেও কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বড় কষ্ট হচ্ছে?—জ্যাঠাইমাকে ডেকে পাঠাই?" লাবণ্য বলিল, "না খোকা, তোকে আমি বড় মেরেছি—তোকে কত কষ্ট দিয়েছি—খোকা—খোকা।" গোপাল বলিল, "বাবাও ত' সেদিন রাস্তায় গুলি খেলতে দেরী করেছিলাম বলে মেরেছিলেন—তুমি কেঁদ না মা।"

কাদম্বিনীর ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু শিশির শুনিল না। সে তাহাদের পারিবারিক চিকিৎসক অবিনাশ কাকাকে লইয়া আসিল। অবিনাশ বাবু রোগিণীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কাদম্বিনীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বড় মার ওষুধ পড়েছে ত'?"

কাদম্বিনী নতমস্তকে কহিল, "হাঁ কাকা, সকালে মকরধ্বজ দিয়েছি; বিকালেও দেবার কথা আছে। তবে আপনি যদি বলেন,—"

অবিনাশ ডাক্তার লোক, মনে খুসী হউন আর নাই হউন, মুখে বলিলেন, "মকরধ্বজ ত' ভাল জিনিষ মা, তাই চলুক।"

কথা কহিতে কহিতে সকলে বাহির হইয়া গেলেন।

পরিমল ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, লাবণ্য চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে, গোপাল কচি দুটি হাতে মা'র গলাটি জড়াইয়া চুপটি করিয়া শুইয়া। পরিমল আস্তে আস্তে ডাকিল, "খোকা, উঠে এস বাবা। ওঁর অসুখ করেছে, ওঁকে জ্বালাতন ক'র না।"

লাবণ্য জাগিয়াই ছিল, চক্ষু মেলিয়া স্নেহনিষিক্ত স্বরে বলিল, "না না, ও কিছু জ্বালাতন করে নি, চুপ করে শুয়ে আছে, থাক্।"

পরিমল বলিল, "কিন্তু—"

"না, না, কিন্তু নয়; ও থাক্। কোনও দিন মা'র আদর পায় নি, অসুখে পড়ে মা'র চৈতন্য হয়েছে—" বলিতে বলিতে লাবণ্য কাঁদিয়া ফেলিল।

পরিমল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, লাবণ্যের এমন আকুল কণ্ঠস্বর, এমন ব্যাকুলতা, তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। "আচ্ছা খোকা থাক্" বলিয়া পরিমল বাহির হইয়া যাইতেছিল, লাবণ্য ডাকিল, "তুমি একটু ব'স না আমার কাছে।"

পরিমল আরও বিস্মিত হইল, লাবণ্যের দুই চক্ষুর কোণ হইতে দুইটি জলধারা গণ্ড বাহিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে।

লাবণ্য বলিল, "এস।"

পরিমল কাছে আসিতে লাবণ্য শীর্ণ হাতখানি দিয়া পরিমলের একটি হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমায় আমি অনেক জ্বালাতন করেছি, পদে পদে বিরক্ত করেছি। এখন বুঝেছি আমারই ভুল। তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

গোপাল মাতার গলা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, লাবণ্য তাহাকে ধরিয়া বলিল, "যাস্‌নে বাবা।" স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আমাদের এই একটি ছেলে। মা'র অসুখ, ও বাইরে বাইরে মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়ায়, মা'র ঘরে ঢোকে না, ঢুকতে সাহস করে না। ভাবে মা তার নতুন শাড়ী, নতুন জ্যাকেট, নতুন ফ্যাসান নিয়ে ব্যস্ত আছে। ডাকলেও আসে না, বলে জামায় ধুলো। অসুখে যত কষ্ট পেয়েছি, একবার ওকে বুকে ধরে সব কষ্ট মুছে গেছে; বুঝেছি ভুল করেছি। সোনা ফেলে গিল্‌টীতে মন ভরিয়েছিলুম। আজ ভুল ভেঙ্গেছে, তুমি আমায় ক্ষমা কর; বল, সব অপরাধ ভুলে যাবে?"

"লাবণ্য!"

"বল, ক্ষমা করেছ?"

"চাইবার আগেই ক্ষমা করেছি লাবণ্য! তুমি সেরে ওঠ, আমরা নতুন করে সংসার পাতি।" পরিমল আদর করিয়া স্ত্রীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

লাবণ্য চক্ষু মুদিল। কিন্তু দুই চক্ষু দিয়া যে প্লাবন বহিল তাহা চাপা রহিল না, পরিমল বার বার বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিতে লাগিল।

কাদম্বিনী গৌরীকে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কেমন আছ ছোট বৌ?"

"ভাল আছি দিদি।"

"কিন্তু চোখে জল কেন ভাই?"

পরিমল হাসিয়া বিছানা ছাড়িয়া অন্যত্র বসিল।

কাদম্বিনী গোপাল ও গৌরীকে খেলা করিতে পাঠাইয়া দিয়া লাবণ্যর পার্শ্বে বসিলেন।

কাদম্বিনী বলিলেন, "কতদিন তোমার গান শুনি নি ঠাকুরপো, তুমি সেই গানটা গাও—যে গান তুমি বাবাকে ব'লে ঠাকুরের মণ্ডপে রোজ গাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলে।"

পরিমল হাসিয়া বলিল, "গাচ্ছি, কিন্তু—"

কাদম্বিনী হাসিয়া বলিলেন, "না—না।"

পরিমল বৌদিকে কাছে বসাইয়া বলিল, "উঁ, তোমাকেও আমার সঙ্গে ঐ গানটা গাইতে হবে, যেমন বাবার কাছে একদিন আমরা দু'জনে গাইতাম—আর বাবা এক মনে চোখ বুঁজে শুনতেন—"

কাদম্বিনী সেই অতীতের স্মৃতিবিজড়িত সেই মধুর আহ্বান উপেক্ষা করিতে সক্ষম নহে। তাহার গান গাওয়া বহুদিন অভ্যাস ছিল না—মুখ লাল হইয়া গেল ও সুরও কাঁপিতে লাগিল। কোন রকমে দেবরের সঙ্গে গীতে যোগ দিলেন। পরিমল তন্ময় হইয়া গঙ্গাতট প্রতিধ্বনিত করিয়া উদাত্ত মধুর কণ্ঠ স্বরে গাহিল—

"মেরে দীন দয়াল গোপাল হরি "

লাবণ্য কাদম্বিনীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ভারতের যাহা নিজস্ব যাহা অন্য দেশের নারীর মধ্যে বড়ই দুষ্প্রাপ্য, সেই সলজ্জকোমল মধুর জননীজায়াভগ্নীর পবিত্র রূপ কাদম্বিনীর আননে প্রতিভাত।

সে মনে মনে ভাবিল, কে বড় কে ছোট—সে, না তাহার জা—ভারতীয় বৈশিষ্ট্য না আপাতমধুর পাশ্চাত্যের লালায়িত লাস্য? লাবণ্য ভাবিতেছে, আমরাও চিন্তা করি।

ঝরাফুল

— শ্রীকল্যাণী দেবী

বিখ্যাত রঙ্গালয়ের একটী কোণে সে বসিয়া ছিল একাকী! নগরের ভূতপূর্ব্বা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ও গায়িকা।

উৎসুক অধীর দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি ছিল রঙ্গমঞ্চের উপর; কখন যবনিকা অপসৃত হইয়া তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে একটী সদ্য প্রস্ফুটিত রক্ত শতদল! যাহার অতুলনীয় শোভা দর্শনাশায় আজ তাহারা আকুল ও ব্যাকুল।

সে বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল। যে উজ্জ্বল কুসংতার চক্ষু দেখিয়া একদিন তাহার প্রিয় বন্ধুবর্গ, স্তাবকগণ উজ্জ্বল নক্ষত্রের সহিত তুলনা করিত, তাহা হইয়াছে এখন নিষ্প্রভ, কঠিন, চঞ্চলতাবিহীন। যে সুকোমল গণ্ডের লালিমা দেখিয়া সদ্যোপ্রস্ফুটিত রক্ত-গোলাপ ভাবিত, "আমার লালিমা উহাতে প্রতিবিম্বিত হইল কিরূপে!' সে ধরিয়াছে এখন পাণ্ডুর ম্লানবর্ণ। ফুল শুকাইয়া গিয়াছে।

[২]

সুমধুর বাদ্যের সহিত ড্রপ উঠিয়া "অতীতা"র নিকট প্রকাশিত হইল অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী মনমোহিনী এক প্রতিমা। মুগ্ধ জনতা অতৃপ্ত নয়নে সে রূপধারা পান করিল, তরুণ সূর্য্যের স্নিগ্ধ রশ্মির ন্যায় তারুণ্য তাহার ছড়াইয়া পড়িতেছিল, মুগ্ধ দর্শকের নয়নে, বয়ানে, সর্ব্বদেহে। তাহার নীল নলিনীর ন্যায় ঢল ঢল নয়ন দুটীর চারিপাশে অনেকের লুব্ধ মন ভ্রমর গুঞ্জন তুলিতেছিল। তাহার তানলয়মানযুক্ত মধুর স্বরলহরীতে দর্শকের হৃদয় বীণায় অপূর্ব্ব ঝঙ্কার ধ্বনিতেছিল। সমগ্র রঙ্গালয় আজ বিস্মিত, নিথর, উৎকণ্ঠ।

[৩]

বিগতযৌবনা প্রৌঢ়া অভিনেত্রী অনিমেষ বিস্ফারিত লোচনে তাহাই অবলোকন করিতেছিল। ম্লান, আবেশহীন নয়ন দুটী একবার মাত্র জ্বলিয়া উঠিয়া অবসাদে ভাঙ্গিয়া-পড়া মন তাহার ডুবিয়া গেল অন্তরের তলদেশের মণিকোঠায়। মুহূর্ত্তে এই "রঙ্গালয়" "রঙ্গমঞ্চ" "নবীনা অভিনেত্রী" "দর্শক বৃন্দ" সকল অপসারিত হইয়া তাহার মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিল, বহুকালবিস্মৃত বহু স্মৃতিবিজড়িত উৎসব-আলোকোজ্জ্বল এক রজনী!

তখন বিষাদের সুর না বাজিয়া হৃদয়ে বাজিত মিলন রাগিণী! তখন চতুর্দ্দিকের আলোকমালাকে ম্লান করিয়া দিত তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য-দীপ-শিখা, সকলের আননে প্রতিফলিত হইত তাহার হৃদয়ের অনাবিল মধুরতা। ভক্তজনের গভীর প্রেমে ও বিশ্বাসে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রাণ-শতদল।

ঐ তো! সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছে দর্শকের শ্রদ্ধাপূর্ণ অধীর দৃষ্টি! ঐ তো শুনিতে পাইতেছে সে, তাহার শেষ গানের শেষ সুররেখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া যাইবামাত্র প্রশংসা ও করতালির সে কি অত্যুচ্চ নিনাদ। ঐ তো ঐ, দর্শকের শ্রদ্ধাঞ্জলি—ফুলে ফুলে ভরিয়া গেল রঙ্গমঞ্চ! ফুলের রাণী সে—নতমস্তকে লজ্জার আবীর সর্ব্ব দেহ মনে মাখিয়া কম্পিত হস্তে প্রশংসার মালা কুড়াইয়া গাঁথিয়া লইল তাহার মেঘের ন্যায় কৃষ্ণ ও নিবিড়, রেশমের ন্যায় সুচিক্কণ এলায়িত কেশে।

[৪]

স্বপ্ন, স্বপ্ন, সবই স্বপ্ন। ছায়াবাজীর ন্যায় মিলাইয়া গেল সব আকাশের গায়ে।

[৫]

শেষ ঐক্যতান, সঘন করতালি ও যবনিকা-পতনের গভীর শব্দে তাহার ভাবে ভরা মন আবার ফিরিয়া আসিল বাস্তব জগতে। প্রেক্ষা-গৃহের অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা, ফুলের রাশি, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, বিদ্রূপের হাসি, তরুণী অভিনেত্রীর প্রত্যভিনন্দন, সব মিলিত হইয়া নীরব ভাষায় যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিল—

"ওরে, তোর জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের পর যবনিকা পাত হইয়াছে, আর কেন এ তুচ্ছ হাসি কান্নার ব্যর্থ অভিনয়? যাহারা ছিল তোর প্রিয় বন্ধু, তোর অন্ধ স্তাবক, তাহারা পাইয়াছে আজ নূতনের সঙ্গ! অর্ঘ্যের থালা অর্পণ করিতেছে নবীনার পাদমূলে! যেখানে তুই ছিলি সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজেশ্বরী, সেখানে আসিয়াছিস আজ শ্রীহীনা রিক্তা ভিখারিণী"। যে ফুলের কুঁড়িটি বহু দিবসের চেষ্টায় ও সাধনায় ফোট-ফোট করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল সকল দিক গন্ধে মাতাইয়া, বর্ণে আলোকিত করিয়াছিল, সে আজ রূপান্তরিত ঝরা ফুল।"

[৬]

ঐক্যতান থামিয়া গেল, দীপমালা নিভিয়া আসিল—চমকাইয়া উঠিয়া নিজের বেদনাতুর বক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া "অতীতা" ধীরে ধীরে কোলাহলপূর্ণ জনতার পাশ কাটাইয়া পথের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রাখিয়া গেল—সুখশান্তির স্মৃতিভরা অতীতের উদ্দেশ্যে দুফোটা তপ্ত অশ্রুর তর্পণ।

নানা দেশের পুরাণ

§ কাফ্রী জাতের সৃষ্টিকাহিনী

—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই স্মৃতির ভাণ্ডারে নানা রকম পুরাণ-কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। জাতির শৈশবাবস্থায় সৃষ্টির কঠিন রহস্য ব্যাখ্যা করবার প্রেরণায় এসব কাহিনী গড়ে উঠেছিল। এ সমস্ত পুরাণ-কাহিনীর মাধুর্য, সজীবতা ও সারল্য অপূর্ব্ব। এ মাধুর্য্য, সজীবতা ও সারল্য বর্ত্তমান কালের মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও তার গল্পে আরোপ করতে পারে না। চেতনার প্রথম উন্মেষের যে অসীম বিস্ময় ফিরে পাওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়।

শুধু এই কারণেই নয়, এই পুরাণ-কাহিনীগুলি অন্য অনেক দিক দিয়েও মূল্যবান। কাহিনীগুলির ভিতর দিয়ে জাতির হৃদয়ের পরিচয় আমরা পাই। যে সমস্ত প্রভাব ও আবেষ্টন তার মনকে গড়ে তুলেছে, তার সুস্পষ্ট ছাপ জাতির এই শৈশব-রচনার ভিতর দেখা যায়। বাইরের বিশদ বিবরণে যা না জানা যায়, বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধে তার চেয়ে অনেক বেশী আমরা এই গল্পগুলির ভিতর থেকে জানতে পারি। কাহিনীগুলি একদিকে যেমন মানুষের নানা জাতি ও গোষ্ঠির অসীম বৈচিত্র্য প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত মানুষের মূলগত ঐক্যের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেয়। দেখা যায় যে, সমুদ্র, পর্ব্বত ও অরণ্যের দুস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও সভ্য অসভ্য পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষই মনের পরিচয়ের দিক দিয়ে পরস্পরের আত্মীয়।

এখানে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের আরণ্য কাফ্রীজাতির একটি উপাখ্যান দেওয়া হল। এই সরল অনাড়ম্বর গল্পটিতে আফ্রিকার গহন অরণ্যের ছায়া পড়েছে, সুস্পষ্ট পরিচয় আছে তাদের আরণ্য সরলতার।

কেমন করে সৃষ্টি হল ঃ

দেবতাদেরও দেবতা হলেন ওডুমাকুমা। তাঁর বড় আর কেউ নেই।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে আরণ্য কাফ্রী।

কিছুই যখন ছিল না, তখন ওডুমাকুমা বসে বসে খালি ভাবতেন আর ভাবতেন। ভেবে ভেবে তিনি ঠিক করলেন, পৃথিবীতে মানুষ দরকার আর দরকার জানোয়ার। নইলে যেন মানাচ্ছে না।

তিনি তখন ডাক দিলেন মবুসুকে। মবুসু হ'ল দেবতাদের সব চেয়ে বড় কারিকর। কিন্তু ওস্তাদ কারিকর হলে কি হয়, মবুসু কুঁড়ের বাদসা। জানে শুধু ঘুমোতে।

মবুসু ঘুম থেকে ঢুলতে ঢুলতে উঠে এল। ওডুমাকুমা তাকে বললেন, "মবুসু, তুমি পৃথিবীতে গিয়ে মানুষ বানাও দেখি, ছয় গণ্ডা মানুষ আর তিন গণ্ডা জানোয়ার!"

মবুস্থ "যে আজ্ঞে" বলে পৃথিবীতে গেল চলে, কিন্তু সেই যে গেল, আর তার কোন খবর নেই।

ওতুমাকুমা অনেক কাল ধরে তার অপেক্ষা করলেন, কিন্তু কোথায় মবুস্থ!

শেষকালে আর থাকতে না পেরে ওতুমাকুমা তলব করলেন তাঁর বাঁদর-দূত ইফুকে। ইফুর রঙটি কালো, অন্ধকারের মত, কিন্তু সে ভারী ফূর্তিবাজ, রাতদিন মজার বাঁদরামি নিয়েই আছে।

ওতুমাকুমার হুকুমে ইফু চলল পৃথিবীতে। মবুস্থর মানুষ আর জানোয়ার গড়তে এত দেরী হচ্ছে কেন জেনে এসে তাকে খবর দিতে হবে।

আরণ্য জাতির নৃত্য।

যাবার সময় ইফুর উৎসাহ দেখে কে! লম্ফঝম্প দেখে মনে হল, বুঝি খবর সে এনে ফেললে বলে। কিন্তু হাজার হোক বাঁদর ত! পথে যেতে যেতে খেলায় মেতে সে সব গেল ভুলে। সে খেলা করে আর লড়াইএর নাচ নাচে। সে নাচে তার এমন মজা লাগল যে, সে না গেল মবুস্থর সন্ধানে, না এল ওতুমাকুমার কাছে ফিরে।

অনেক দিন তাদের আশায় থেকে শেষে ওতুমাকুমা নিজেই বেরোলেন ব্যাপার কি জানতে। পথে যেতে ইফুর সঙ্গে দেখা।

ইফুর মুখ ভয়ে লজ্জায় তখন শুকিয়ে গেছে। নাচ থামিয়ে সে লেজ গুটিয়ে চুপটি করে এসে ওতুমাকুমার পায়ের কাছে বসল। মুখে তার আর রা নেই।

ওতুমাকুমার কাছে বকুনি খেয়ে সে কেঁদে-কেটে অনেক মিনতি করে ক্ষমা চাইলে।

ওতুমাকুমা ক্ষমা করে তাকে এবার সঙ্গে নিলেন। কিন্তু বেহায়ার স্বভাব যাবে কোথায়! খানিক বাদেই সে বায়না ধরলে, মবুস্থকে খুঁজে পেলে তাকে একটা পুরস্কার দিতে হবে।

"কি পুরস্কার চাই বাপু!"

"আমার বাঁদর নামের কলঙ্ক ঘোচাতে হবে।"

ওতুমাকুমার তখন তাড়াতাড়ি। বলে ফেললেন,"তথাস্তু।"

অনেক খুঁজে পেতে তারপর মবুস্থর সন্ধান পাওয়া গেল। ওতুমাকুমাকে দেখে মবুস্থর তোয়াজের ঘটা কি! কিন্তু তাতে কি আসল কথা ভোলান যায়!

ওতুমাকুমা বললেন, "দেখি মবুস্থ, এতদিনে কি করেছ"

মবুস্থ অগত্যা তার কাজের সব নমুনা এনে হাজির করলে।

দেখেই ত' ওতুমাকুমার চক্ষুস্থির! "করেছ কি মবুস্থ!"

আর কি করেছে! কুঁড়ের বাদসা মবুস্থ প্রথমে এসে ত' ঘুমিয়েই অনেক দিন কাটিয়েছে, তারপর যখন টনক্ তার নড়ল তখন সময় আর নেই। ওতুমাকুমার হুকুম পালন না করলে নয়। তাই মবুস্থ তাড়াতাড়ি ফাঁকিতে কাজ সেরেছে। মানুষ গড়তে যা সময় লাগে তাতে দুটো জানোয়ার গড়া যায়। মবুস্থ তাই ছয় গণ্ডা মানুষ আর তিন গণ্ডা জানোয়ারের বদলে মাত্র তিন গণ্ডা মানুষ আর ছয় গণ্ডা জানোয়ার গড়ে রেখেছে।

এখন উপায়! এদিকে ওতুমাকুমার চোখের দৃষ্টি পড়বা মাত্র মবুস্থর তৈরী মানুষ আর জানোয়ারের মূর্তিগুলি প্রাণ পেয়ে জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। যত মানুষ, জানোয়ার তার দ্বিগুণ।

মবুস্থ ওতুমাকুমার পা জড়িয়ে ধরল ভয়ে।

"কি হবে!"

ওতুমাকুমা বললেন, "শীগগির যে কটা পার জানোয়ার ধরে নিয়ে এস।"

কিন্তু ছাড়া পাওয়া জানোয়ার ধরা কি সহজ! অনেক কষ্টে গণ্ডা দু'য়েকের বেশী ধরা পড়ল না।

কি আর করেন! ওতুমাকুমা মন্ত্র পড়ে তাদেরই দিলেন মানুষ করে। তারা আর সব মানুষ আর জানোয়ারের সঙ্গে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল।

এমনি করে সৃষ্টি হল পৃথিবীর সব জাতের মানুষের আর সব জানোয়ারের।

মবুম্বুর কুড়েমির জন্যেই পৃথিবীতে জানোয়ার এত বেশী আর মানুষের এত কষ্ট। আবার জানোয়াররা মানুষ হয়েছিল বলেই সব জাতের মানুষের মধ্যে অনেক পশুপ্রকৃতির বদলোক দেখা যায়।

ওভুমাকুমা সৃষ্টির কাজ সেরে ত' উঠলেন। তখন ইফু এসে সামনে দাঁড়াল, "আমার কি করলেন!"

"তোমার আবার কি?" বলতে বলতেই ওভুমাকুমার মনে পড়ল তিনি কথা দিয়ে ফেলেছেন তার কলঙ্ক দূর করবার।

অনেক ভেবে চিন্তে ওভুমাকুমা বললেন,—"সব মানুষের নামের সঙ্গে তোমার নাম থাকবে জড়িত আজ থেকে।"

সেই জন্যেই কাফ্রী ভাষায় সব জাতের নামের পিছনে বাঁদর ইফুর নাম থাকে—তাদের নিজেদের নাম 'এবিথিফু' সাহেবদের নাম 'আবোফু', ইত্যাদি।

যম ও নচিকেতা

—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

পরম দয়ালু ছিলেন বলিয়া যেমন স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামই হইয়া গিয়াছিল "দয়ার সাগর", তেমনি ঋষি-ঠাকুর আজীবন দীন-দুঃখীকে, কাঙ্গালকে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিতেন বলিয়া তাঁহার নামই হইয়াছিল বাজশ্রবা। সংস্কৃত ভাষায় বাজ শব্দের অর্থ 'অন্ন', আর শ্রবস্ শব্দের অর্থ 'খ্যাতি'। অন্নদাতা বাজশ্রবা-ঋষির পুত্র বাজশ্রবস। তিনিও ছিলেন পিতার মতই দয়ালু; বিশ্বের মানুষের উপকার করাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য।

ঋষি বাজশ্রবস পিতার অপেক্ষাও এক বড় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি এমন এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন—যে যজ্ঞের ফলে সমস্ত বিশ্বে দুঃখ-কষ্ট থাকিবে না, কাহারও কখনও শোক-তাপ, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, সংসারে আর কাহারও চোখের জল ফেলিতে হইবে না—সুখ-শান্তিতে সকলেরই মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়া থাকিবে, এই সংসার সুখের আগার হইবে। এই মহাযজ্ঞের নাম বিশ্বজিৎ যজ্ঞ।

এমনি ছিলেন সে যুগের মুনি-ঋষিরা। ইহ-সংসারে তাঁহাদের নিজেদের জন্য প্রার্থনীয় কিছুই ছিল না। তাঁহারা পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেন, রাজা ও ভক্তগণ শ্রদ্ধার সহিত যাহা দান করিতেন তাহাতেই তাঁহাদের দিন চলিয়া যাইত। ধর্ম্মই ছিল তাঁহাদের পরম সম্পদ; আর কিসে মানুষের কল্যাণ হয় ইহাই ছিল দিন-রাত্রি তাঁহাদের চিন্তা। এই জন্যই ত' বড় বড় দিগ্‌বিজয়ী রাজারা পর্য্যন্ত তাঁহাদের চরণে মাথা লুটাইয়া ধন্য হইতেন।

বাজশ্রবস-ঋষির বিশ্বজিৎ যজ্ঞে ভারতবর্ষের সমস্ত বড় বড় পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ঋষিগণ নিমন্ত্রিত হইলেন। এই মহাযজ্ঞ যাহাতে নিখুঁৎ ভাবে সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য সমস্ত মুনি-ঋষিরা পরমানন্দে যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ-দান করিলেন; তাঁহাদেরও সকলেরই ত' রাজশ্রবসের ন্যায়, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—দেশের ও সমাজের কল্যাণ-সাধন। যে যজ্ঞের ফলে জগতের সর্ব্ব জীবের মঙ্গল হইবে, সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদানের ন্যায় প্রিয় কার্য্য ঋষিদের পক্ষে আর কি হইতে পারে?

যজ্ঞের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান দক্ষিণাদান। দক্ষিণাদান না করিলে পূজা, অর্চ্চনা, ব্রহ্মচর্য্য, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কোনও অনুষ্ঠানই পূর্ণাঙ্গ হয় না—কোনও অনুষ্ঠানই সফল হয় না। বিশ্বজিৎ যজ্ঞ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে বাজশ্রবস-মুনি দক্ষিণা দিবার জন্য যজ্ঞ-স্থলে লইয়া আসিলেন প্রকাণ্ড এক পাল গাভী। এই গাভীগুলি ভাগ করিয়া লইয়া পুরোহিতগণ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন এবং যজ্ঞ যাহাতে সফল হয় তজ্জন্য আশীর্ব্বাদ করিবেন ও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

ঋষির আশ্রমে সকলের মুখেই হাসি—আশা ও উৎসাহে সকলের বদনমণ্ডলই প্রদীপ্ত; আনন্দ-কোলাহলে আশ্রম মুখরিত। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও বাজশ্রবসের কিশোর পুত্র নচিকেতা বিমর্ষ, আনন্দোৎসবে যোগদান না করিয়া তিনি এক কোণে বিষন্ন বদনে বসিয়া আছেন। এই পরমানন্দের দিনে এই পরম শুভক্ষণে বালক নচিকেতা এমন বিষাদ-মলিন কেন? কোন্ দুঃখে, কোন্ ক্ষোভে, কোন্ অমঙ্গলের

আশঙ্কায় আজ তাঁহার সুন্দর মুখ আষাঢ়ের কৃষ্ণমেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িল?

বাজশ্রবস-ঋষি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের এই বিরাট আয়োজন করিয়াও একটি গুরুতর ক্রটী রাখিয়া দিয়াছিলেন। পুরোহিত-দিগকে দক্ষিণাদানের জন্য তিনি যে গাভীগুলি আনিয়াছিলেন সে গুলি অতি বৃদ্ধ—অস্থিচর্ম্মসার। আর কিছুদিন পরেই গাভীগুলি মরিয়া যাইবে—দুধ দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। বালক হইলেও নচিকেতা ঋষিকুমার; দক্ষিণার আয়োজন দেখিয়াই তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "বাবা এটা করিলেন কি? এমন বিরাট যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতদিগকে দিতেছেন কিনা এই অস্থিচর্ম্মসার অতি বৃদ্ধ গরুগুলি! দান করিতে হয় নিজের কোন প্রিয় বস্তু—যে বস্তু পাইলে দান-গ্রহীতার মনও প্রসন্ন হইবে। কিন্তু এই বৃদ্ধ গাভীগুলি লইয়া ত' পুরোহিতেরা কিছুতেই প্রসন্ন হইবেন না। সুতরাং পিতার এই যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যর্থ হইবে—তিনি কিছুতেই তাঁহার অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবেন না।"

এত বড় যজ্ঞ বৃথা যাইবে—ইহাতে সংসারে কোনও মঙ্গলই হইবে না, বরং হয় ত' পিতার কোনও গুরুতর অমঙ্গল হইবে—ভাবিয়াই নচিকেতার কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে—তাই এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যেও তিনি নির্ব্বাক বিষণ্ণ।

বহু চিন্তার পর নচিকেতা অমঙ্গল-নিবারণের এক পন্থা আবিষ্কার করিলেন। তিনি বুঝিলেন, পিতার নিকট পুত্রই এই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সুতরাং তিনি যদি যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ তাঁহাকে দান করিতে পিতাকে সম্মত করিতে পারেন, তবেই অমঙ্গল নিবারিত হইবে—তবেই যজ্ঞ আর নিষ্ফল হইবে না—তবেই পিতার এবং সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে।

এই ভাবিয়া নচিকেতা যজ্ঞস্থলে গিয়া বাজশ্রবসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা, যজ্ঞ শেষ হইয়া আসিল, আপনার সর্ব্বস্ব দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন, কিন্তু আমাকে দিলেন কাহাকে?"

ঋষিঠাকুর তখন মহাব্যস্ত, নচিকেতার প্রশ্ন তাঁহার কাণেই গেল না, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না।

নচিকেতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা, আমাকে দান করিলেন কাহাকে?"

এবারও ঋষি কোনও উত্তর করিলেন না।

নচিকেতা আবার পিতাকে ঐ প্রশ্ন করিলেন। ঋষি এবার ভারি বিরক্ত হইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাকে দিলাম যমকে।"

পিতার উত্তর শুনিয়াই নচিকেতার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! পুত্রকে যমের মুখে তুলিয়া দিবার কোনও অভিপ্রায় অবশ্যই ঋষির ছিল না—পুত্র বিরক্ত করিতেছে বলিয়াই তিনি ক্রোধভরে আনমনে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ঋষিবাক্য ত' কিছুতেই মিথ্যা হইবে না—নচিকেতাকে নিশ্চয় যমালয়ে যাইতে হইবে। ঋষিপুত্র মরিতে ভয় পায় না—মৃত্যু তাহার নিকট ছেলে-খেলার মত। কিন্তু পিতামাতার জন্য নচিকেতার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি মারা গেলে তাহার পিতামাতা কি নিদারুণ শোক পাইবেন, তাহা ভাবিয়াই নচিকেতা অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাকে ভুল বুঝিয়া আপনি এ কি দারুণ কথা বলিলেন? আমি বৃথাই আপনাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাই নাই। আপনি কতকগুলি বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য গাভী দান করিয়াছেন—সুতরাং আপনার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ ব্যর্থ হইবে ভাবিয়াই আমি আপনাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, পিতার নিকট যখন পুত্র অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই, তখন আপনি আমাকে দান করিলেই এই বিরাট যজ্ঞ সফল হইবে। কিন্তু আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া এক বিপরীত কথা বলিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক, আপনি ঋষি, আপনার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইয়াছে তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না। অনুমতি করুন পিতা, আমি যমলোকে যাই।"

নচিকেতার কথা শুনিয়া সমাগত মুনি-ঋষিরা বিস্মিত হইলেন; বাজশ্রবস-ঋষির মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সত্যই ত'! না বুঝিয়া তিনি এ কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছেন। হায় হায়! তাঁহার জীবন অন্ধকার করিয়া প্রাণের পুত্র এই কিশোর বয়সে যমালয়ে যাইবে। তিনি বলিলেন, "নচিকেতা, পিতা হইয়া আমি সত্যই কি তোমায় যমের মুখে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছি! একটা কথা মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গিয়াছে—সেই তুচ্ছ কথাটার উপরই এমন জোর দিতেছ

কেন? আরে বাপু, মৃত্যু ত' একদিন আসিবেই। তার জন্য এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

কিন্তু নচিকেতা অটল। তিনি বলিলেন, "না বাবা, তাহা হয় না। আপনার কথার খেলাপ হইবে—পুত্র হইয়া কিছুতেই আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। জগৎ দেখুক, ঋষিরা ভ্রমেও অসত্য কহেন না। তাঁহারা সত্যবাক্, তাঁহারা যাহা বলেন তাহাই সত্য হয়। বাবা, এই সংসারে সমস্তই অনিত্য, আপনার স্নেহের এই নচিকেতাও একদিন থাকিবে না। আপনি আজ যে কথা বলিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইলেও যখন একদিন আমাকে মরিতেই হইবে তখন কেন আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া মরিতে যাই? ঋষিবাক্য সত্যই হউক, সত্যের প্রতিষ্ঠা হউক, আপনি অনুমতি করুন আমি যমলোকে যাত্রা করি।"

পুত্রের এই কথার উপর বাজশ্রবস আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। তিনি শোকে বুক বাঁধিয়া অনুমতি দিলেন। ঋষির যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল; পিতৃভক্তি ও সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নচিকেতা যমপুরী যাত্রা করিলেন।

[২]

নচিকেতা যমপুরে। এই সেই যমপুর, যেখানে ধর্ম্মরাজ যম জগতের সমস্ত মানুষের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া পুণ্যাত্মাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার আর পাপাত্মাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দেন। যমের নাম শুনিলেই মানুষের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে বটে, কিন্তু তিনি নিষ্ঠুর জল্লাদ নহেন; তিনি সূক্ষ্ম ন্যায়বিচারক। তাঁহার দয়ামায়া অপর কোনও দেবদেবী অপেক্ষা কম নহে, তবে দুরাত্মাদের উপর কঠোর না হইলে সংসারে নিরীহ সাধুলোকদের বাস অসম্ভব হইয়া পড়িবে—এই জন্যই তিনি দুর্ব্বৃত্তদের কঠোর শাস্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু পুণ্যাত্মাদের প্রতি তিনি পরম স্নেহশীল।

নচিকেতা যখন যমপুরীতে গেলেন, তখন যম গৃহে ছিলেন না। তিনি কখন ফিরিয়া আসিবেন সেই আশায় নচিকেতা যমপুরীর দুয়ারে বসিয়া রহিলেন। ক্রমাগত তিন দিন নচিকেতা বসিয়াই রহিলেন—যম আর আসেন না। ধর্ম্মরাজের পত্নী এবং মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি সকলেই দেখিলেন, পুরীর দরজায় এক ব্রাহ্মণকুমার বসিয়া—কুমারের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন এক দিব্যজ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। তিনি কে, কোথা হইতে কি উদ্দেশ্যে যমপুরীতে আসিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিবার বা তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য ও আহার্য্য দিয়া অভ্যর্থনা করিবার সাহস কাহারও হইল না। চারি দিনের দিন যম ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা বলিলেন, "দুয়ারে এক অতিথি অপেক্ষা করিতেছেন।"

ব্যস্ত হইয়া যম জিজ্ঞাসা করিলেন, "অতিথির যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করা হইয়াছে ত'?"

"না, আমরা তাঁহার নিকট যাইতেই সাহস পাই নাই। তাঁহার জ্যোতির্ময় দিব্যকান্তি দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন না। এই তিন দিন আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে বসিয়া আছেন।"

সেকালে অতিথি-সেবা পরম পুণ্য বলিয়া লোকে মনে করিত, অতিথির যথাযোগ্য সেবা না করা ঘোর পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। অতিথি অভুক্ত আছেন শুনিয়া ধর্ম্মরাজ ব্যস্তেবাস্তে গিয়া দেখেন, অতিথি এক জ্যোতির্ম্ময় বালক। বালক হইলেও গৃহস্থের নিকট অতিথি দেবতা; যমরাজ অতিথি নচিকেতার পা ধুইবার জল দিয়া, বসিবার আসন দিলেন; তারপর বলিলেন, "অতিথিদেব, আজ তিন দিন আমার বাড়ীতে অস্নাত অভুক্ত বসিয়া আছ! যদিও আমি বাড়ী ছিলাম না, তথাপি আমি নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছি। আমি তোমাকে তিনটি বর দিতেছি, যে কোনও বর লইয়া তুমি আমাকে আমার অজানিত অপরাধ হইতে মুক্ত কর।"

কি বিনয়, কি কোমল হৃদয় যমের! নচিকেতা মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু কি বর তিনি চাহিবেন?

প্রথমেই তাঁহার পিতার কথা মনে পড়িল। তিনি সকালে পিতার আশ্রম অন্ধকার করিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার শোকে পিতা অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। পিতার শোক-শান্তিই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিলেন। তিনি বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, যদি বর দাও, তবে প্রথমে এই বর দাও, যেন আমি এই মৃত্যুলোক ছাড়িয়া পিতার কোলে ফিরিয়া যাইতে পারি। আমার অবর্ত্তমানে পিতা যে শোকভোগ করিতেছেন, তাহা মনে হইলেই আমার বুক ফাটিয়া যায়!"

যম বলিলেন, "তথাস্তু; আমি বর দিতেছি তুমি আবার তোমার স্নেহময় পিতার কোলে ফিরিয়া যাইবে। পিতৃভক্ত কুমার, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।'

তারপর যম নচিকেতাকে দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলে নচিকেতা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না —তিনি কি বর চাহিবেন। তাহার নিজের জন্য প্রার্থনীয় কিছুই নাই; পিতার শোক তাহার বুকে শেলের মত বিঁধিতেছিল, তাই তিনি প্রথম বরে পিতার শোকশান্তির উপায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সংসারে নিস্পৃহ ঋষিকুমার তিনি—আর কি তিনি প্রার্থনা করিবেন?

ঠিক—ঠিক—ঠিক! অকস্মাৎ নচিকেতার মনে পড়িয়া গেল তিনি কি বর চাহিবেন। নচিকেতা বর চাহিলেন— 'জগতের কল্যাণ।'

ধন্য! আত্মত্যাগী নির্লোভ নচিকেতা, তুমিই ধন্য!

নচিকেতা যমরাজকে বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, জগৎ দুঃখের আগার। কিন্তু শুনিয়াছি স্বর্গরাজ্যে শোক, দুঃখ, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা কিছুই নাই। স্বর্গরাজ্যে নিরন্তর পরিপূর্ণ আনন্দ। এই স্বর্গরাজ্যের সন্ধান পাইতে হইলে অগ্নির আরাধনা করিয়া যে ভাবে যজ্ঞ করিতে হয়, আপনি আমাকে তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন। আমি জগতে ফিরিয়া গিয়া জগদ্বাসীকে তাহা শিখাইব—জগতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিব।"

নচিকেতার নিঃস্বার্থতায় ও জীবপ্রেমে যমরাজ পরম প্রীত হইলেন। তিনি বলিলেন, "নচিকেতা! তোমার পরার্থ-পরতায় আমি যারপরনাই সুখী হইয়াছি। ভাল, তোমার এই প্রার্থনাও আমি পূরণ করিব।"

এই বলিয়া যম নচিকেতাকে অগ্নির আরাধনা এবং জগতের কল্যাণকর যজ্ঞের সমস্ত তত্ত্ব ও উহার সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর সমস্ত জটিল বিষয়টি তিনি বুঝিয়াছেন কিনা—সমস্ত তাহার মনে আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য যমের মুখে তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে অবিকল বর্ণনা করিয়া গেলেন। নচিকেতার আগ্রহ এবং মেধা দেখিয়া যমরাজ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন; তিনি নচিকেতাকে এক ছড়া বড় হার উপহার দিয়া বলিলেন, "কুমার, পরোপকারে তোমার আগ্রহের পুরস্কার স্বরূপ এই হার তোমাকে উপহার দিতেছি। এই খানা গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য কর। যে অগ্নি-আরাধনার কৌশল তুমি শিক্ষা করিলে, তাহা জগতে তোমার নামেই পরিচিত হইবে। এইবার তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা আবার এক মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। এবার তিনি কি বর চাহিবেন? তাঁহার অভাবে পিতা যে শোক পাইতেছেন, তিনি পিতার সেই শোকশান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংসারের শোক, তাপ, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু দূর করিবার কৌশলও জানিয়া লইয়াছেন; ইহার পর আবার কি কাম্য থাকিতে পারে?

তিনি আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। নচিকেতা ঋষিকুমার, পিতার আশ্রমে তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্ম, জগতের হিত, ঈশ্বর, আত্মা, পরব্রহ্ম ইত্যাদির আলোচনাই শুনিয়াছেন —সংসারের কুটীলতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ঋষির আশ্রম কলুষিত করে না। তাই নচিকেতা ঋষিকুমারজনোচিত ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন।—"আমার যাহা কিছু প্রার্থনীয় যমরাজের দুই বরে তাহার সবই ত' পাইয়াছি। কিন্তু আমি কে, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাইব? পিতার আশ্রমে ঋষিদের আলোচনায় 'আত্মা' নামে একটা কথা শুনিয়াছি, কিন্তু আত্মা কি তাহা ত' জানি না। এই আত্মার কি মানুষের মতই জন্ম-মৃত্যু আছে?"

এই সকল গুরু তত্ত্ব-চিন্তা করিতে করিতে নচিকেতা যমরাজকে বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আমার আর কিছু প্রার্থনীয় নাই—আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন, আমি কে? আত্মা কি? কেহ বলে মৃত্যুর পর আত্মা থাকে না, আবার কেহ বলে থাকে। আমি ত এসব বিষয়ে কিছুই জানি না— আপনি আমাকে শিখাইয়া দিন্।"

যমরাজার চক্ষু স্থির। কি আশ্চর্য্য! যে কঠিন বিষয় মুনি-ঋষিরাও জানেন না, অনেক দেবতাও জানেন না, আমিও যাহা ঠিক মত জানি না, এই কিশোর বালক সেই বিষয়টা জানিবার জন্যই ব্যাকুল। তিনি নচিকেতাকে বলিলেন, "বাছা, তুমি ছেলে মানুষ, এই বয়সে ছেলেরা খেলাধূলা লইয়াই থাকে। যদি বা তাহারা ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে, তবে বড় জোর ভাবে যে তাহারা ধনী হইবে—জগতের সমস্ত সুখ-ভোগ করিবে। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া এই জটিল

বিষয় জানিতে চাহিতেছ কেন? তুমি অন্য বর চাও—ধন-দৌলত, পৃথিবীর রাজত্ব, চিরযৌবন, পুত্র-পৌত্র যাহা চাও সবই আমি তোমাকে দিতে প্রস্তুত। মহাজ্ঞানী মুনি-ঋষিরা বহুকাল তপস্যা করিয়াও যাহা জানিতে পারেন না, যাহা জানিলে ইহকালের কোন সুখভোগ হয় না, কেবল পরকালের সুখভোগ হয়—বালক, তাহা জানিয়া তোমার কি লাভ হইবে?"

কিন্তু নচিকেতা অটল। তিনি বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আপনি আমাকে জগতের সুখভোগের লোভ দেখাইতেছেন? ঐ সুখের জন্য আমার আদৌ আকাঙ্ক্ষা নাই। কারণ ধন-দৌলত, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য—এসব ত' আর চিরস্থায়ী নয়, এসব এক দিন ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আপনি ধর্ম্মরাজ—আপনার নিকট যদি বর লইতে হয় তবে নশ্বর জিনিষ চাহিব কেন?"

যমরাজ প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন, "ভাল, তুমি যে বর চাহিয়াছ সেই বরই আমি তোমাকে দিব। আইস আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হও। তোমার মত নিস্পৃহ ব্রহ্মচারীকে এমন বর দেওয়া একটা পরম সৌভাগ্য বটে।"

এই বলিয়া যম নচিকেতাকে আত্মজ্ঞান দিতে লাগিলেন। নচিকেতা তিনদিনের উপবাসী। তিনি হাত পা ধুইয়া আসন গ্রহণ করামাত্রই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন পর্যন্ত তাঁহার আহারাদি হয় নাই। কিন্তু পরম পবিত্র ধর্ম্মকথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল, তিনি এক মনে যমরাজের উপদেশ শুনিতে লাগিলেন।

এইরূপে যমের নিকট তৃতীয় বর লাভ করিয়া নচিকেতা যমলোক হইতে পিতার আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। বাজশ্রবস-ঋষি পুত্রবিয়োগে জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পুনরায় পুত্রকে পাইয়া তিনি নূতন জীবন পাইলেন। তারপর নচিকেতা জগদ্বাসীকে দুঃখ-কষ্ট-শোক তাপ ইত্যাদি দূর করিবার উপায় শিক্ষা দিয়া জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং যথাসময়ে জন্মমৃত্যুর অতীত চির আনন্দময় স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। (কঠ উপনিষদ্)

অগ্নিবীণা

— শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নূতন যুগের সূর্য্য তিমিরে ডুবে গেছে অভিমানে
নৃত্য করিছে কাল,
বন্ধুর পথে দাঁড়ায়ে বন্ধু হের আজ সব খানে
শত শত কঙ্কাল।
ঝঞ্ঝার বেগে সংহাররূপী ছুটে আসে নটরাজ,
ত্রিশূলে তাহার দামিনীর দ্যুতি ঝলকে ভুবনমাঝ।

মাথার উপরে ঝঞ্ঝা-তড়িৎ কাঁপায় পৃথ্বী শুধু
কালবোশেখীর ডাকে,
সর্ব্বনাশের রুদ্র-রাগেই শিহরিছে দিগ্‌বধূ
ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে,
স্বপন-বিলাস স্বর্গ-সুষমা অন্তরে আজ নাই,
জন-অরণ্যে ক্রন্দন-ধ্বনি নিশিদিন ধরে পাই।

মানব-মনের কামনা-শেফালী ঝরেছে নয়ন-লোরে
দিকে দিকে হাহাকার
সবুজ শোভার পাগল শিশু যে কোথায় পালালো ওরে
কাঁদে প্রাণ সবাকার।
বনের বিহগ নীড়হারা হয়ে ঘুরে মরে এক সাথে,
মাধবীকুঞ্জে আসে না ভ্রমর কবিতার মালা হাতে।

পাপের পঙ্কে ডুবেছে মানব, পুণ্য গিয়াছে ঘুচে
দগ্ধ জীবন-তট।
শিবের দেউলে শিবার হায়, পূজারী পাই না খুঁজে
নাহি মঙ্গল-ঘট।
কেদার-বাহিনী মন্দাকিনীর নাহি আর কলনাদ,
তাহারি বক্ষে গড়িয়া উঠেছে পাপের পাষাণ-বাঁধ।

তাই তো ঈশান শুনায় বিষাণ শঙ্খ। জাগায় যত
মেঘের মাদল বাজে
প্রলয়-নিশান বিশ্বে উড়ায় নিখিল বেদনাহত
শঙ্কর ওই নাচে।
সৃষ্টির সাথে তার অভিমান ভস্ম মাখিয়া দেহে,
শ্মশান-কালীর করাল মুরতি ফুটায় সকল গেহে।

দীর্ণ বুকের রক্ত-প্রদীপ রাত্রি দিবস জ্বলে
মহাশ্মশানের কোলে,
ভয়াল মূর্ত্তি সম্মুখে একি! হাড়ের মালাটী গলে
নৃত্য-তালেই দোলে।
ভীম-ভৈরব এসেছে এবার আর্ত্তনাদের সনে,
অগ্নি-বীণায় উঠিছে রাগিণী ব্যথার আলিঙ্গনে।

প্লাবন

—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইন্দু ও ক্ষণা বাহিরের ঘরে আসিল। পিতা আরাম কেদারাটায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, দু'জনকে হাত বাড়াইয়া কাছে লইয়া কেদারার দুই হাতলে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইন্দুর ম্লান মুখের পানে চাহিয়া, হঠাৎ কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছিল না। অথচ সংবাদের জন্য তাঁহার অন্তরটা, জলকষ্টপ্রপীড়িত চাতকের মত খাঁ খাঁ করিতেছিল। ইন্দু নিজে হইতে কোন কথা বলিবে না, সে স্বভাবই তাহার নয়। কি ভাবে কথাটা পাড়িলে সহজ, সরল ও পরিষ্কার হয় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, তিনি ক্ষণাকে বলিলেন, ক্ষণা, ঠাকুরকে বল্‌ ত একটু চা আনুক; অমনি লছমনকে তামাক দিতে বলিস্‌।

—শুধু চা, বাবা?

—হ্যাঁ, শুধু চা।

ক্ষণা চলিয়া গেলে, হেরম্ব যেন অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করিলেন। ইন্দুর গৌর-সুন্দর বাহুখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রণয় এসেছিলেন?

ইন্দু বলিল, হ্যাঁ।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর?

ইন্দু বলিল, আমি কিছু জানি নে বাবা। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি।

হেরম্বনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। যাক্‌, দেখা হয় নাই!

সব কথার শেষ যেন ঐ খানেই হইয়া গেল। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া দ্বারের পানে চাহিয়া চা ও তামাকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কতকগুলি লোক আছে তাহারা দূরের পানে চাহিতে চায় না। আপাতসুখে তাহাদের সন্তোষ; সম্মুখ-বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেই তাহারা নির্ভীক। হেরম্বনাথ এই দলের লোক। প্রণয় আসিয়াছিল, সে সংবাদ তিনি দ্বারবানের কাছেই পাইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহিণী, প্রণয়, ইন্দু, পুরোহিত ঠাকুর প্রভৃতি মিলিয়া যে ঘটনা ঘটিবার কথা আজ ছিল, তাহা ঘটে নাই শুনিয়া আজিকার দিনের মত তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন।

ইন্দু এই সুযোগে পিতার কাছে অনেক কথাই বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু কি ভাবে আরম্ভ করা যায়, সেও যেন তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার প্রতি পিতার আদরের অপ্রাচুর্য্য ছিল না। যে ভাবেই কথা বলুক না কেন, পিতার নিকট তাহার কথা অপ্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা যেমন আদৌ নাই, পিতার অপ্রিয় হইবার আশঙ্কাও তাহার তেমনি নাই। তবুও কেন যে কথা যুগায় না, তাই সে ভাবিতেছিল।

অকস্মাৎ যেন কথার সূত্রটি খুঁজিয়া পাইয়া হেরম্ব অতিমাত্র প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, কাল কেমন থিয়েটার দেখলি বল্‌?

ইন্দু বলিল, আগেও আর একদিন দেখেছিলুম, বাবা, বেশ প্লে।

হেরম্ব বলিলেন, ঐ একই বই দু' দিন?

—হাঁ, সে দিন খুব ভাল লেগেছিল। কাল—

হেরম্ব হাসিয়া বলিলেন, কাল ভাল লাগল না?

ইন্দু বলিল, না।

—এক বই একবারের বেশী ভাল লাগে না।

তাই কি! ইন্দু ভাবিতেছিল, তাই কি!

না—না—না।

মুখটি নীচু করিয়া বলিল, কাল ছায়াকে দেখলুম বাবা।

—ছায়া কে রে?

যে মেয়েটিকে পড়ান্‌। কাল দেখা হয়েছিল।—বলিয়া ইন্দু মুখ নমিত করিল।

হেরম্বনাথ বলিলেন, বিমলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কি বললে?

ইন্দু বলিল, ছায়াদের সঙ্গে এসেছিলেন; আমার সঙ্গে কথা হয় নি।—মা পছন্দ করেন না।

হেরম্বনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি বলিলেন, হাঁ মা ইন্দু, প্রণয় বাবুর সঙ্গে তোর ভাব হয়েছে?

ইন্দু বলিল, তিনি মার আবৃদি'র দেওর।

—তোর সঙ্গে ভাব হয়েছে ?

—ভাব তুমি কা'কে বল বাবা ?

কথাবার্ত্তা বাঁকা পথ ধরিতেছে বুঝিয়া হেরম্ব অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি আর কোন কথা বলিতে সাহস পাইতেছিলেন না।

কিন্তু ইন্দু সেইখানেই নিবৃত্ত হইল না। সে বলিল, রোজ একবার করে আমাদের এখানে আসেন; একদিন আমাকে আর ক্ষণাকে নিয়ে বেড়াতে গেছলেন; কাল তাঁদের বাড়ীতে আমাদের খাইয়েছিলেন!

—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। না ?

—তাই ত' শুনেছি।

চা আসিল, পরক্ষণে তামাকও আসিল। হেরম্বনাথ চা পানান্তে তামাকে মনঃসংযোগ করিলেন।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না। আলবোলার শব্দ ছাড়া কক্ষ নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে ইন্দু বলিল, বাবা তুমি জজ সাহেবের বাড়ী জান ?

—কে জজ সাহেব ?

ইন্দু সে পরিচয় দিতে পারিল না। সে কথাটা জানিয়া লওয়া হয় নাই। জজ সাহেব যে একাধিক থাকিতে পারেন তাহা সে জানিত না; জানিলে এবং সুবিধা হইলে, সবিশেষ পরিচয় জানিয়া লইত।

পিতা পুনরপি বলিলেন, কোন্ জজ সাহেব ?

ইন্দু বলিল, জজ সাহেবের মেয়েকে পড়ান।

—বিমল পড়ায় ?

—হ্যাঁ। তাঁর নাম ছায়া। আমাকে কাল ছায়া অনেক করে বলেছিলেন, একদিন তাঁদের বাড়ী যেতে। তাই বলছিলুম, তুমি যদি জানতে, তা হলে আজ একবার তোমাতে আমাতে যেতুম। ছায়া খুব সুন্দর মেয়ে।

- কোথাকার জজ সাহেব ? হাইকোর্টের ? বাঙ্গালী জজ ?

ইন্দু বলিল, তবে এক কাজ করা যেতে পারে। জ্যেঠাইমাদের বাড়ীতে গিয়ে জজ সাহেবের ঠিকানা জেনে নিলে হয়।

ইন্দুর মুখখানি ক্ষণেকের জন্য উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; পর মুহূর্ত্তেই দীপ্তিটুকু মুছিয়া গেল। বলিল, কিন্তু তা কি ক'রে হবে ? তিনি ত' এই সময় জজ সাহেবের বাড়ীতেই থাকেন।

হেরম্বনাথ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, তা বটে!

ইন্দু সোৎসাহে বলিল, হয় ত' জ্যেঠাইমা ছায়াদের বাড়ীর ঠিকানা জানতে পারেন!

ইন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, যাবে, বাবা ? কতদিন জ্যেঠাইমাকে দেখি নি: যাবে ?

—তা যেতে পারি।

—তবে চল বাবা, এই বেলা ঘুরে আসি।

—ক্ষণা যাবে ?

—ক্ষণা থাক। চল-না আমরা দু'জনে বেড়িয়ে আসি।

খবর লইয়া জানা গেল গৃহিণী ঘরের বাতি নিবাইয়া শুইয়া আছেন, সম্ভবতঃ নিদ্রিত। ক্ষণা উপরের ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে। পিতা-পুত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

ইন্দুর অনুমান সত্য, বিমল জজ সাহেবের কন্যাকে পড়াইতে গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই—ফিরিতে তাহার দশটা বাজে। বহুকাল পরে হেরম্বনাথকে দেখিয়া বিমলের মা'র পতিশোক উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এক হাতে চক্ষু মুছিলেন, অন্য হাতে ঠাকুরপো'র সামনে যৎসামান্য মিষ্টান্ন ধরিয়া দিলেন। তারপর ইন্দুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিতরের ঘরে চলিয়া গেলেন।

এই মেয়েটিকে কাছে পাইবামাত্র এই ধূলিমলিন, প্রায়ান্ধকার কক্ষের মানসিক চিত্রটি যেন নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যেন অন্ধকার আকাশে চন্দ্রোদয় হইল—ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো পড়িয়া ঘর হাসিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, এই সব ভাঙ্গাচোরা আসবাব নাই, এই মলিন শয্যা আর নাই, হৃতশ্রী তৈজসপত্র নাই। এই মেয়েটির শুভাগমনে, তাহার কোমল করস্পর্শে সমস্তই রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। অনুপস্থিত পুত্রের বাম পার্শ্বে এই কৃশাঙ্গী কিশোরীকে বসাইয়া মা চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ইন্দুকে তিনি প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে চাহেন, পারেন না, চোখের জল কণ্ঠ রোধ করে। যতবার কিছু বলিতে যান, বাষ্পোচ্ছ্বাসে শব্দ অবলুপ্ত হয়, কথা বাহির হয় না।

অবশেষে মেয়েটিকে বুকে চাপিয়া বাহিরে আসিয়া বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, ঠাকুরপো, ইন্দুকে তুমি আমায় দাও।

হেরম্বনাথ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি আবার বলিলেন, তাঁর ছেলেটিকে দিয়ে তোমার মেয়েটিকে নেবার বড় সাধ তাঁর ছিল। তিনি নেই, ঠাকুরপো, তুমি আছ। তাঁর ইচ্ছা যাতে পূর্ণ হয়, তাই কর। ইন্দুকে আমায় দাও।

হেরম্বনাথ বলিতে গেলেন, সে ত' নিশানাথ দা'—

বৃদ্ধা আবেগাতিশয্যে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, আমি কোন কথা শুনব না ভাই। আমার বিমলকে তুমি নাও, ইন্দুকে আমায় দিয়ে যাও। সেই শেষদিনে এই কথাটিই তিনি বলতে চেয়েছিলেন—

হেরম্বনাথের মনে সেদিনের স্মৃতি জাগ্রত ছিল, বলিলেন, ইন্দু ত' আপনারই বৌদি!

—কথা দিচ্ছ ঠাকুরপো, মনে থাকে যেন!

—মনে থাকবে বৈ কি!

বৃদ্ধা এইবার পরম আত্মীয়ার মত ইন্দুকে বুকে চাপিয়া এক হাতে তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, গরীবের ভাঙা ঘরে কি মন উঠবে না মা?

ইন্দুর চোখ দিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইতেছিল, জ্যেঠাইমার কাঁধের উপরে মাথা রাখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

বিমলের মা বলিলেন, ভগবান তোমায় আজ এখানে এনে দিয়েছেন ঠাকুরপো। তুমি না এলে আমাকেই তোমার কাছে যেতে হত। সব কথা ছেলে ত' খুলে বলে না ভাই, তবে কথার ভাবে বুঝলুম তোমরা কোন্ এক হাকিমের সঙ্গে ইন্দুর সম্বন্ধ করছ। ছেলে আমার আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছে ভাই! তোমাদের কথা উঠলে বাছার আমার দু'টি চক্ষে সহস্র ধারা বইতে থাকে। আমি যত বলি, তোর কাকাবাবু কি তাঁর বন্ধুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারেন? ছেলে তত বলে, অপদার্থ গরীবের ভাঙ্গা ঘরে রাজরানীকে পাঠাতে কোন্ বাপ মা প্রাণ ধরে পারে মা?

ইন্দুর বুকের ভিতরটা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হায়! সে'ও কেন গরীব হইল না! যে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, যে চোখে পলক নাই, যে চোখে শুধুই ধারা, সেই দুটি চক্ষু তুলিয়া ইন্দু বাপের পানে চাহিয়া রহিল।

পিতা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে জ্যেঠাইমা বলিলেন, বিমল গরীব সত্যি, কিন্তু তুমি ত' ভাই গরীব নও। ভগবানের ইচ্ছেয় তোমার রাজার ভাণ্ডার। কণা, ইন্দু—দুটো খুদ-কুঁড়ো তোমার। তোমার যা কিছু সবই ত' ওদের, ঠাকুরপো। তুমি মনে করলে—

হেরম্বনাথ হাসিয়া বলিলেন, সেই ত' হয়েছে মুস্কিল বৌদি। যেমন পাগল বিমল, তেমনই পাগল আমার এই মেয়েটা! বলে কি-না, আমার পয়সা নেবে না!

জ্যেঠাইমা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, ওমা! এমন অনাসৃষ্টি কথা ত' কখনও শুনি নি মা!

হেরম্বনাথ বলিলেন, তবে আর বলছি কি!

এ সময়ে এখানে কথা কওয়া উচিত নয়, ভাল দেখায় না, বরং বাচালতাই প্রকাশ পায়—ইন্দু সবই জানিত; তবুও কথা না বলিয়া পারিল না; অতি ধীর কণ্ঠে, শুধু জ্যেঠাইমাই শুনিতে পান, এমন ভাবে বলিল, কেন জ্যোঠাই মা, তিনি যখন রোজগার করবেন, তখনই আমায়—কথাটা বাধিয়া গেল; পরমুহূর্ত্তেই বলিল, তখনই হবে।

—ততদিন কি বিমল কেঁদে কেঁদে ভেসে ভেসে বেড়াবে মা?—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, ওসব কোন কাজের কথা নয় ঠাকুরপো। তুমি শীগগির শীগগির যাতে দু'হাত এক হয় তাই কর ভাই!

—আমার ত তাই ইচ্ছে! আপনি একবার বিমলকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন—আপিসেই যায় যেন!

ইন্দুকে কাছছাড়া করিতে বুড়ীর প্রাণ যেন চায় না। কোন এক অদূর দিনেই ইন্দুকে নিজস্ব, একান্ত নিজস্ব করিয়া পাইবেন, মনকে পুনঃ পুনঃ এই প্রবোধ দিয়া, তাহার মুখে, মাথায়, দুটি হাতে অজস্র আশীর্ব্বাদ ও অনেকগুলা চুম্বন ঢালিয়া দিয়া তবে তিনি ইহাদের বিদায় দিতে পারিলেন।

হেরম্বনাথ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, ইন্দুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, মনে থাকে যেন ঠাকুরপো।

হেরম্বনাথ বলিলেন, মনে থাকবে বৈকি বৌদি।

মোড় ফিরিতেই বাড়ীখানা অদৃশ্য হইয়া গেল, ইন্দুর মন বলিতেছিল, সে যেন নিজের গৃহ হইতে অন্য কোথায় যাইতেছে! মনে অপ্রসন্নতার লেশমাত্র ছিল না। সারা

পথ বাপের সঙ্গে বাজে-বাজে কথা কহিতে কহিতে চলিল, মস্ত একটা বোঝা আজ নামিয়া গিয়াছে। বাবা আজ যে কথা দিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিতে পারিবেন না, ভুলো প্রকৃতির বাপের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস তাহার ছিল।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পিতা বলিলেন, ঐ যা, জজ সাহেবের ঠিকানাটা ত' জানা হল না।

কন্যা কহিল, সে তখন আর একদিন হবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের হাকিম সাহেব প্রণয়কুমার কোথায়? আমরা গল্প-লেখকগণ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই বলিতে পারিতেছি, প্রণয়কুমারকে বড়ই মনস্তাপ পাইতে হইতেছে। মনস্তাপের অনেক কারণ। আমরা সকল কথা এখনই বলিতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত। একটা কথা এই যে, ইন্দুদের বাড়ীতে তাঁহাকে বড়ই দাগা পাইতে হইয়াছে। কলিকাতা শহরের সভ্য সমাজে এমন একটা অদ্ভুত পরিবারের অবস্থিতি প্রণয়কুমার কল্পনাতে আনয়ন করিতে পারেন নাই। দুই দশ দিন কোন বাড়ীতে গিয়া বয়স্কা তরুণীদের সঙ্গে মিশিলেই বিবাহ-প্রস্তাব দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আজকালকার দিনে অতীব বিরল, ইহাই তিনি জানিতেন। শুধু তিনি কেন? শতকরা নিরানব্বইটি তরুণ-তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলেও জানা যাইবে যে ইহার অপেক্ষা আজগুবি ব্যাপার হইতেই পারে না। অত্যন্ত প্রাচীন ও বর্ব্বরযুগের প্রথাসমূহ যে সভ্যতালোকোদ্ভাসিত কলিকাতা শহরেও বর্ত্তমান, ইহা মনে করিতে প্রবৃত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রণয়কুমার সেই যে ইন্দুদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, সে পথ আর মাড়ান নাই; কোন দিন মাড়াইবেন এমন ভরসাও নাই। সভ্য সমাজে যাহারা মিশিতে জানে না, তাহাদের সঙ্গে মিশিবার মত প্রবৃত্তি ও পর্য্যাপ্ত অবসর তাঁহার নাই। তিনি ছায়াদের গৃহে আসিয়া উদয় হইলেন।

মিসেস্ ঘোষ মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, ছায়া যাহাতে বাজে কথায় ও গল্পে সময়ক্ষেপ না করিয়া পড়া-শুনায় মনোযোগী হয়, তৎপ্রতি তাঁহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেই হইবে। রাত্রিটুকু ছাড়া সকল সময়ই মা মেয়ের সঙ্গে ছায়ার মত রহিয়াছেন। চেনা-শুনা-জানা যত মেয়ে তিনি দেখিয়াছেন, বা দেখিতেছেন, ম্যাট্রিক্ পাস করে নাই এমন একটি মেয়েও তাঁহার চোখে পড়ে নাই। বিমলের সেই ছাত্রীটি—ইন্দু যাহার নাম—বয়সে কত ছোট, সেও পাস করিয়াছে, করে নাই কেবল তাঁহার কন্যা। বিমল বলিয়াছে, মনোযোগ দিলে সেও পারিবে—যাহাতে মনোযোগ দেয় তাহাই করিতে হইবে। অন্যমনস্ক হইয়া যাহাতে ছায়া লেখাপড়ায় অবহেলা না করে, তাহাই দেখিতে হইবে।

মিসেস ঘোষের এই যখন মনোভাব, সেই সময়ে তরণীহীন বিভ্রান্ত নাবিকের মত প্রণয়কুমারের আবির্ভাব। মিসেস ঘোষ তাহাকে বসাইয়া গল্প করিলেন, চা খাওয়াইলেন, অভিনয়ের, রচনার অজস্র প্রশংসা করিলেন, কেবল ছায়াকে ডাকিলেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইলেও ছায়ার দর্শন মিলিল না দেখিয়া, প্রণয় বলিলেন, ছায়াকে দেখছি নে যে!

—ছায়া পড়ছে। এইটুকু বলিয়াই মিসেস ঘোষ প্রসঙ্গান্তর সুরু করিয়া দিলেন।

এইরূপে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে রজনীর প্রথম যামও অতীত হইল। প্রণয়কুমার সেখান হইতেও উঠিলেন এবং আর আসিবেন না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই গেলেন। কিন্তু সঙ্কল্প অটল রহিল না। পরদিন আদালত হইতে সোজা ছায়াদের গৃহে হাজির হইয়া দেখিলেন, ছায়া একাকিনী বসিয়া এস্রাজের তার বাঁধিতেছে।

খবর পাওয়া গেল, মা আদালত হইতে বাবাকে তুলিয়া লইয়া বালিগঞ্জে মল্লিক সাহেবের গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। ফিরিতে রাত্রি আটটা হইতে পারে।

প্রণয় বলিলেন, এমন বিকেলটা ঘরে বসে কাটাবে ছায়া?

ছায়া মৃদু হাসিয়া বলিল, কি আর করি বল!

চল না একটু বেড়িয়ে আসি। সারাদিন আজ মেঘ করেছিল, এখন মেঘ কেটে গেছে, রৌদ্র উঠেছে, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে বাইরেটা।

ছায়া ম্লান হাস্যে কহিল, কোথায় আর মেঘ কাটল প্রণয় মামা?

... above the sunless sky
Big with clouds, hangs heavily
And behind the tempest fleet
Hurries on with lightning feet,

Driving sail, and cord, and plank
Till the ship has almost drank
Death from the over-brimming deep :...

প্রণয় মুগ্ধের মত কহিলেন, শেলীর কবিতা এমন সুন্দর করে আবৃত্তি করতে ক'জন বাঙ্গালীর মেয়ে পারে!

ছায়া কহিল, তা জানিনে, তবে অনেক মেয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছে তা দেখতে পাই।

প্রণয় বলিলেন, ড্যাম ম্যাট্রিক। চল ছায়া, খানিক ঘুরে আসি। এমন সুন্দর বিকেলটা বসে বসে কাটাতে কি ভাল লাগে?

—কিছুই ভাল লাগে না প্রণয় মামা। মনটা ভীতু সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে গেছে, আর সে কুণ্ডলী ছেড়ে বার হবে না।

প্রণয় বলিলেন, বাঁশীর ধ্বনি শুনলেই সাপ ফণা ধরবে।

ছায়া হাসিল, কথা কহিল না। কিন্তু তাহার মন বলিল, বাঁশী! বাঁশীই কি আর বাজবে?

প্রণয়কুমার ছায়ার ক্রোড় হইতে এস্রাজটি সরাইয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন, তারপর ছায়ার একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, চল না ছায়া।

—মাপ কর প্রণয় মামা। আমার ভাল লাগে না, মাও পছন্দ করেন না।

মা কি পছন্দ করেন না সে কথা ছায়া স্পষ্ট করিয়া বলিল না; প্রণয়ও কথাটা খোলসা করিয়া লইতে সাহস পাইলেন না। মুখখানি অপ্রসন্ন করিয়া বসিয়া রহিলেন। মুখ দেখিয়া ছায়া তাঁহার দুঃখ বুঝিল, বুঝিয়াই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, বারে আমি! প্রণয় মামা তখন থেকে বসে আছেন, চাও দিতে বললাম না, কিছু না! ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, কিছু মনে ক'র না প্রণয় মামা, আমি এখনই আনাচ্ছি। কি দেবে, চা?

প্রণয় বিরসমুখে কহিলেন, না। আমি চা খেতে আসি নি।

ছায়া উচ্ছ্বসিত হাস্যের সহিত বলিল, তবে?—বলিয়াই সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া জানালাটার দিকে চাহিয়া কহিল, মিঃ রায় আজ এখনও এলেন না কেন?—বলিয়া উঠিয়া গিয়া পাতলা পর্দ্দাটা সরাইয়া বাগানের হাতাটা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

প্রণয়কুমার বলিলেন, তুমি কি আজকাল বার হও না ছায়া? না, আমার সঙ্গে বার হতে আপত্তি?

ছায়া হাসিয়া কহিল, তোমার কি মনে হয়?

প্রণয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমার মনে হওয়ার মূল্য কি বল? মিঃ রায়টি কে? নিউ এ্যাচিভমেণ্ট (নূতন লাভ)?

—মাই গড! প্রণয় মামা তুমি যেন কি! মিঃ রায়ের কাছে আমি পড়ি যে! কেন, তোমার সঙ্গে ত' তাঁর আলাপ আছে।

—আই সি! (ও তাই!)—তাঁর আসবার সময় হয়েছে বুঝি?

—হাঁ এই সময়ই ত' আসেন।

—কতক্ষণ পড়?

—পড়ি ত' মাথা আর মুণ্ড! তবে বই নিয়ে বসে থাকতে হয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত।

বয় পর্দ্দার বাহির হইতে মাষ্টার সাহেবের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিল।

ছায়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মিটি মিটি হাসিতে হাসিতে কহিল, প্রণয় মামা কি করবে? বসবে? তা বেশ ত' বস না, মার সঙ্গে গল্প করোগন।

—থ্যাঙ্কস্! তোমার মা'র সঙ্গে গল্প করা ছাড়া আমার অন্য কাজ থাক্‌তে পারে।

ছায়া প্রণয়ের জন্য পর্দ্দাটা সরাইয়া ধরিয়া বলিল, ভেরী সরি টু ডিসাপয়েণ্ট। (তোমাকে নিরাশ করার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।)

—থ্যাঙ্কস্ এগেন!—বলিয়া কোন দিকে না চাহিয়া প্রণয় বাহির হইয়া গেলেন। দ্বারপার্শ্বে হ্যাট-র‍্যাকে রক্ষিত টুপি ও ছড়ি তুলিয়া লইয়া ক্ষুদ্র একটি গুড্ নাইট বলিয়া বিদায় লইলেন।

ছায়া বলিল, গুড নাইট।

গাড়ী ফটকের বাহির হইয়া গেলেও ছায়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎপরে গভীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে পড়ার ঘরে চলিয়া গেল।

হতাশা মানুষকে পীড়া দেয় সত্য; কিন্তু কতখানি পীড়া দেয়, তাহা কি কেহ অনুমান করিতেও পারে? প্রণয়কুমারের

কোন আত্মীয়বিয়োগ হয় নাই, আমার পাঠক-পাঠিকারা তাহা জ্ঞাত আছেন; তাঁহার চাকুরীলোপও হয় নাই; মাহিনাও কমে নাই; যে ব্যাঙ্কে তাঁহার অর্থ গচ্ছিত, সে ব্যাঙ্কও লাল বাতি জ্বালে নাই। অথচ তিনি যখন জজ সাহেবের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গড়ের মাঠের স্বল্লালোকিত পথে লক্ষ্যহীন পথিকের মত মোটর চালনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে তাঁহার অতিবড় আত্মীয়বর্গও চমকিয়া উঠিত। মুখে যেন কে এক পোঁচ কালী মাখাইয়া দিয়াছে; চক্ষু দু'টি যেন সেই লজ্জায় লুকাইতে পারিলে বাঁচে। আপনারা বলিতে পারেন, এতখানি কি হয়? কিসে কি হয় তাহা আমি কি জানি। যাহা হইয়াছিল তাহাই আমি বলিলাম।

ইডেন গার্ডেনে অসাধারণ জনসমাগম; ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধসন্নিকটে স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড়, স্ট্র্যাণ্ডে মোটরের ছড়াছড়ি, চৌরঙ্গীতে চলা দায়। কোন রাস্তাই প্রণয়কুমারের ভাল লাগিল না। লেখকের এক মদ্যপ বন্ধু ছিলেন। জন্মদিনে, স্ত্রীর নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মদ্যপান করিবেন না। দুই তিন দিন শুষ্কাবস্থায় কাটিল। তারপর হাই উঠিতে লাগিল। তাঁহার যে সকল বন্ধু পেগ্ টানে, তাহাদের বাড়ী যাইতে ইচ্ছা হইল। মনকে বুঝাইলেন, খাইবেন না, দেখিবেন। প্রথম দিন সত্যই দেখিলেন, দ্বিতীয় দিন তদতিরিক্ত কিছু না করিয়া পারিলেন না। তরুণী-সঙ্গ-সুখে দারুণ অনিচ্ছা লইয়া প্রণয়কুমার দুই তিন ঘণ্টা মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে 'শুধু দেখিব' ভাবিয়া এক মিসেস্ সরকারের গৃহের উদ্দেশে ছুটিলেন।

মিসেস সরকারের অন্য পরিচয় অজ্ঞাত। শহরের সৌখীন লোক শুধু ইহাই শুনিয়াছে যে তিনি নৃত্যগীতনিপুণা; অনেক বড় ঘরের মেয়েদের লইয়া তিনি একটি গানের ক্লাস খুলিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার ছাত্রীরা এম্পায়ার মঞ্চে "রাস পূর্ণিমা" নামে একখানি গীতিনাটক অভিনয় করিয়াছিল। প্রণয় সে-অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন; অভিনয়ান্তে কতকগুলি ফুলের তোড়া, পদক প্রভৃতি উপহার দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয়ও দিয়াছিলেন। সেই সূত্রে মিসেস্ সরকারের সহিত প্রথমে আলাপ, পরে সৌহার্দ্দ্য ঘটিয়াছিল। মাঝে কয়দিন ইন্দুদের ওখানে যাতায়াতে ব্যস্ত থাকায় মিসেস্ সরকারের ক্লাসে হাজিরা দিতে পারেন নাই। না যাওয়ার আরও কারণ ছিল। মিসেস্ সরকার সম্ভ্রান্তবংশীয়া ভদ্র মহিলা, মুখ ফুটিয়া তিনি কখনও কিছু চাহেন নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার ছাত্রীদের আব্দারের অন্ত ছিল না। প্রণয় আসিয়া বসিলেই ইলেকট্রিক পাখার অভাবটা তাহাদের এতই তীব্র হইয়া উঠিত যে, সে অভাব মোচন না করিলে প্রণয়ের লজ্জার যেন সীমা থাকিত না। দোলনায় দুলিবার বয়স তাহাদের বহুকাল অতীত হইয়া গেলেও, একটা বিলাতী দোলনার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাহারা এতই মশগুল হইয়া উঠিয়াছিল যে, স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ না দিয়া প্রণয় পারিলেন না। একদিন দুটি ছাত্রী প্রণয়ের সঙ্গে ড্রাইভে বাহির হইয়া, হগ সাহেবের বাজার দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। সেই এক-সন্ধ্যায় হাকিম সাহেবের মাহিনার অর্দ্ধেক টাকা বাহির হইয়া যাওয়ার পরও নিষ্কৃতি লাভ ঘটে নাই। মেয়ে দুটিকে ক্লাসে নামাইয়া দিয়া, মিসেস্ সরকারের নিকট বিদায় লইতে গিয়া দ্বিগুণ বিপদ। মিসেস্ সরকার প্রণয়কে ড্রয়িং রুমে বসাইয়া এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাইতে দিয়া, গভীর দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, এই হতশ্রী, সেটি-সোফা-কৌচ-শূন্য ড্রয়িং রুমে প্রণয়কুমারের মত বিশিষ্ট অতিথিকে বসাইতে তাঁহার মাথা কাটা যায়। যে-মেয়েটি সদ্য ড্রাইভিং শিখিয়াছে, সে প্রণয়কে বলিল, আমাদের একটা ড্রয়িংরুম সুট্ হ'লে বেশ হয়! বলা বাহুল্য, বেশ হইল।

অনেকদিন পরে প্রণয়কুমারকে পাইয়া ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী সকলেই হাতে স্বর্গ পাইলেন। ড্রাইভিং শিখিতে-শিখিতে-শেখা-হয়-নাই-যাহার, সেই মেয়েটি নিদারুণ অভিমানভরে কহিল, যান্, আপনার সঙ্গে আড়ি।

এমন করিয়া আড়ি দিতে যে পারে, তাহার সঙ্গে ভাব করিবার আগ্রহ কাহার না হয়? প্রণয়কুমার বলিলেন, চল, অনিলা, আজ তোমার ড্রাইভিং শেখা শেষ করে দোব।

মেয়েটি প্রায় কাণের কাছে মুখ আনিয়া পরম আত্মীয়ার মত বলিল, চল। তারপর সকলকে শুনাইয়া বলিল, চলুন।

প্রণয়কুমার চুপে চুপে বলিলেন, আবার কাউকে জোটাবে না ত'?

—আমি নাকি জোটাই?—বলিয়া মেয়েটি রাগ প্রকাশ করিল। কাণে কাণে বলিল, তুমি বল মিসেস্ সরকারকে।

মিসেস্ সরকার অমত করিবেন কেন? প্রণয়ের মত শিক্ষিত, পদস্থ ও সম্মানার্হ ব্যক্তি যে অনিলাকে ড্রাইভিং

শিখাইতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার যথেষ্ট উদারতারই পরিচয়। তিনি অনিলাকে পিয়ানোর স্বরলিপির বইখানি বাহির করিয়া দিতে বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন। দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া অনিলা নিম্নকণ্ঠে বলিল, চল।

অন্য মেয়েদের চোখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহা আর যাহাই হউক, প্রীতি প্রকাশ করিল না। তাহাদের রাগ অনিলার উপর নহে; প্রণয়কুমারের মত একচোখো লোকের উপর তাহারা কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে?

জনবিরল, আলোকশূন্য ডায়মণ্ড হারবার রোডে বহুক্ষণ ড্রাইভ করার পর অনিলা বলিল, এইবার ত' ফিরতে হয়।

প্রণয়কুমার হাত-ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, আটটা পঁচিশ। এখনই ফিরবে?

—হ্যাঁ। নটায় ক্লাস শেষ হয়, বাস্ নটার পরই মেয়েদের নিয়ে যায়।

—বাসের দরকার কি! আমি তোমায় পৌঁছে দোব।

অনিলা ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না। মেয়েদের সঙ্গে বাসে না ফিরলে বাড়ীতে কি মনে করবে!

সুতরাং ফিরিতে হইল। ফিরিবার পথে অনিলা বলিল, আজ একবার মার্কেটে যাবার দরকার ছিল, তা আর হল না।

প্রণয়কুমার বলিলেন, আগে বল নি কেন? বিশেষ দরকার?

অনিলা বলিল, তা—একরকম—তা থাক্—না হয় আর একদিনই হবে।

—বিশেষ দরকার হয় ত, চল মার্কেট ঘুরেই যাওয়া যাক্।

—কিন্তু বাস্ চলে যাবে যে! একটু ভাবিয়া আবার বলিল, তবে একটা উপায় আছে। মিসেস্ সরকার যদি ট্যাক্সি করে আমায় বাড়ী পৌঁছে দেন, তাহলে নিশ্চিন্ত।

—তাই হবে'খন, বলিয়া প্রণয়কুমার গড়ের মাঠের পাশ দিয়া চৌরঙ্গীর দিকে গাড়ী ছুটাইলেন।

অনিলার এক বন্ধুর জন্মদিন আগত, তাহাকে একটা কিছু উপহার দিতে হইবে। উপহার-সামগ্রী কেনা হইল, তাহা ছাড়া টুকিটাকি সৌখীন দ্রব্যাদিও কিছু কেনা হইল। গাড়ীতে উঠিয়া অনিলা বলিল, ভাগ্যিস্ মেয়েরা ক্লাসে থাকবে না তাই, নইলে এত জিনিষপত্তর দেখলে সব হিংসেয় ফেটে মরত।

প্রণয় তৃপ্তির হাসি হাসিলেন।

একটু পরে অনিলা মুখখানি মলিন, কণ্ঠস্বর ম্লান করিয়া বলিল, আর ক'দিনই বা আপনার সঙ্গে বেড়াতে পারব?

প্রণয় উৎকণ্ঠার সহিত কহিলেন, কেন?

অনিলা বলিল, আর ত' সুবিধে হবে না। আমাদের গানের ক্লাস যে উঠে যাচ্ছে।

—উঠে যাচ্ছে? কেন?

—মেয়ে অনেক কমে গেছে কি না! দু'মাসের বাড়ী ভাড়া পড়ে গেছে; মিসেস্ সরকার তাই ক্লাস তুলে দিচ্ছেন।

একটু থামিয়া, অত্যন্ত দুঃখপূর্ণকণ্ঠে অনিলা বলিল, আজই হয়ত আমাদের শেষ বেড়ান; ৩১শে মে ক্লাস বন্ধ হবে।

—৩১শে মে! সে ত পর্শু।

—হ্যাঁ।

—কত করে' ভাড়া, জান?

—ঠিক জানিনে, তবে সত্তর কি পঁচাত্তর এই রকম।—অনিলার গলায় যেন জল জমিয়া উঠিয়াছিল। সে প্রণয়ের কাঁধের উপর মাথাটা এলাইয়া দিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রণয় বলিলেন, অনিলা, তুমি মিসেস্ সরকারকে বল, একমাসের ভাড়া আমি কালই দিয়ে দোব।

অনিলা সোল্লাসে বলিল, দেবেন?

—দোব। ফিরে গিয়ে মিসেস্ সরকারকে আমিই বলব'খন।

অনিলা সোহাগভরে কহিল, না, আমি বলব।

—বেশ, তাই।

গাড়ী হইতে নামিয়া অনিলা মিসেস সরকারকে টানিতে টানিতে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া কি বলিল। ফিরিয়া আসিয়া মিসেস সরকার প্রণয়কে বলিলেন, আপনাকে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব তা আমি ভেবেই পাচ্ছি না। এবার আমাদের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউসনে আপনাকে প্রেসিডেণ্ট হতে হবে।

অনিলাকে বলিলেন, বাস্ এখনি ফিরে আসবে, তোমার জন্যেই আবার আসতে বলে দিয়েছি। ততক্ষণ বসবে চল।

আপনারও ত তাড়া নেই প্রণয়বাবু, আপনিও আসুন না, একটু বসবেন। একটু চা খাবেন?

—তা খাই।

মিসেস সরকার চা করিতে গেলেন। প্রণয় ও অনিলা কৌচ-সেটি-সোফা-সজ্জিত ড্রয়িং রুমে বসিলেন। চা প্রস্তুত হইতে অনেক বিলম্ব হইল। অবশ্য তাহাতে এই দুই জনের কেহ অসুখী হইলেন না।

এই পরিচ্ছেদের শেষাংশ না লিখিলেও পারিতাম, কিন্তু প্রগতির যুগে, পিতামাতার অজ্ঞাতে যাহা নিত্য ঘটিতেছে, তাহার একটি অবিকৃত চিত্র দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাই ধরি-মাছ না-ছুঁই-পানি করিয়া চিত্রটি আঁকিলাম। অনিলা সংসারে একটি নয়, মিসেস্ সরকারও সমাজে একাধিক আছেন; আর প্রণয়? প্রগতির নদীতে প্রণয়-প্লাবন ত লাগিয়াই আছে!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যে সন্ধ্যায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই প্রণয় চলিয়া যায়, সেই রাত্রির পর হইতে ইন্দুর মাতা যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখিলে, আশ্চর্য্য হইতে হয়। কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহেন না বটে, তবে তিনি যে কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন বা অসন্তুষ্ট, তাহাও মনে হয় না। সংসার যথানিয়মে চলিয়া যাইতেছে, কর্ত্তার তাস-পাশার আড্ডা পুরাদমে চলিতেছে, মেয়েরাও কখন হাসিতেছে, কখন গাহিতেছে, কখন গল্প করিতেছে, এ-সবেরও কোন ব্যতিক্রম নাই। বাগানে তেমনই ভারে ভারে ফুল ফুটিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, ভ্রমরাগমনে কখন সঙ্কুচিত, কখন উৎফুল্ল হইতেছে। সামনের রাস্তায় লোক চলাচলের বিরাম নাই, ফেরিওয়ালার চীৎকার সমান আছে। রান্নাঘরে উড়ে বামুন ও বাঁকুড়ার ঝিয়ের কলহ-কলরব, মান-অভিমান, ক্রন্দন-সান্ত্বনা-অভিনয় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মোটর ড্রাইভার যথারীতি পেট্রোল-মবিলাদি চুরীর চেষ্টা করিতেছে। বাগানের মালী প্রভুর অজ্ঞাতসারে ডাব-নারিকেল-ফুল-পাতা বেচিয়া দিতেছে। ভিখারী-ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে আসিয়া ছেঁড়া কাপড় জামার জন্য উমেদারী করিতেছে। আগে গৃহিণীর সকল কিছুতেই দৃষ্টি ছিল, মনোযোগ ছিল, এ কয়দিন তাহারই শুধু অভাব দেখা যাইতেছে। রাত্রে তাস-পাশা শেষ করিয়া কর্ত্তা যখন খাইতে বসেন, তখনও গৃহিণীর দর্শন মিলে না; শয়ন-কক্ষে আসিয়াও তাঁহাকে জাগ্রত দেখিতে পান না। আমরা জানি, গৃহিণী বিনিদ্র রজনী অতিবাহন করিলেও, কর্ত্তাকে তাহা জানিতে দেন না।

হেরম্বনাথ আসিয়া শুইয়া পড়েন। ঘণ্টা পাঁচেক নাক ডাকাইয়া, ভোর হইতেই নীচে নামিয়া গড়গড়ার নল মুখে দিয়া, হয় পাশায় মহেন্দ্রকে হারাইবার ফন্দী-ফিকির, না হয় অকল্যাণ্ড, বাকল্যাণ্ড জুটের সেয়ারের উত্থান-পতনের কারণ নির্ণয় করিতে বসিয়া পড়েন। অসীম বিশ্ব তাঁহার নিকট যে কত সসীম তাহা তাঁহার আত্মীয়পরিজন সবাই বুঝিতে পারে।

মাতার এই তুষ্ণীভাব ইন্দুকে ভিতরে ভিতরে বড়ই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রণয়ের শুভাগমন হয় না, ইহাতে সে বাঁচিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহার না আসার সঙ্গে মাতার এই অসাধারণ গাম্ভীর্য্যের সম্পর্ক যে নিকট তাহা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হয় নাই। মাতা কি ভাবিয়া, কোন্ আশায় প্রণয়কুমারকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন, তাহাও যেমন ইন্দুর অজ্ঞাত ছিল না, তাহার দিক দিয়াই মাতাকে যে নিদারুণ মনস্তাপ পাইতে হইবে তাহাও না ভাবিয়া সে পারিত না। মধ্য পথে কোন্ দেবতা প্রসন্ন হইয়া কি যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন, তাহা ভাবিয়া না পাইলেও, মনে মনে ইন্দু কখনও কখনও যে স্বস্তি অনুভব না করিত, তাহা নহে।

মাতার এই তুষ্ণীভাব দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইল না। কয়েক দিন পরে একদা মধ্যাহ্নে আবুদির শুভাগমন হইল, দুই ভগ্নীতে কক্ষ-দ্বার বন্ধ করিয়া গল্প করিতে বসিলেন।

লাবুর দোষেই যে সব পণ্ড হইতে বসিয়াছে, একবার নয়, আবু বার বার করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিলেন। আজকালকার দিনে, যুবক যুবতীর মনে অনুরাগ সঞ্চার হইতে না হইতে বিবাহের কথা পাড়িলে কুফলই ফলিয়া থাকে। প্রণয় ঠাকুর-পোর মনটি ইন্দুর দিকে পড়িয়া আসিতেছিল, আবুদি তাহা বুঝিতেছিলেন, আর কিছুদিন উভয়ের মেলামেশার উত্তম সুযোগ দেওয়াই যে সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত ও সমীচীন ছিল, ইহা না বুঝিয়া, তাড়াতাড়ি জাল টানিতে গিয়া কাৎলা মাছটিকে

জাল ছিন্ন করিয়া পলায়নে উৎসাহিত করা হইয়াছে বলিয়া আবুদি মনমরা হইয়া বসিলেন। লাবুর জরুরী পত্র পাইয়াও তিনি যে এই কয়দিন আসেন নাই, তাহার একমাত্র কারণ, তিনি ঠাকুরপোর মন বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 'গত কয়দিনই প্রণয় ঠাকুরপো অনেক রাত্রি করিয়া ফিরিতেছে, আবার সকাল হইতেই আদালতের কাগজ লইয়া বসিয়া পড়ে, কথা কহিবার সুযোগই মিলে না। আজ সকালে একটু ফুরসৎ ছিল, কথা পাড়িয়া শুনিলাম, অনেক দিন সে তোমাদের বাড়ীতে আসে নাই। টেবিলের উপর একটি মেয়ের ফটো, সই করা—অনিলা সেন, কালকের তারিখ। অনিলা কে, জিজ্ঞাসা করায় প্রণয় ঠাকুরপো হাসিল। পরে সব বলিয়াছে, অনিলা মিসেস্ সরকারের স্কুল অফ ওরিয়েন্ট্যাল মিউজিকের ছাত্রী। গানে, নাচে মেয়েটি খুব ওস্তাদ।'

আবুদি বলিলেন, আজকালকার ছেলেরা এই সবই খোঁজে ভাই।

লাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সব ?

আবুদি বলিলেন, এই সব,—গান, বাজনা, নাচ, মেলামেশা, পিকনিক, পার্টি। দেখছি ত ঘরে ঘরে। মিশতে মিশতে কারু সঙ্গে কারু ভালবাসা হয়ে যায়, তখন ছেলেরাই নিজে থেকে প্রোপোজ করে।

লাবু বলিলেন, প্রোপোজ কি ?

আবুদি বলিলেন, প্রোপোজ মানে প্রস্তাব করা। ছেলেরাই তখন মেয়ের বাপ মার কাছে এসে বিয়ের প্রস্তাব করে।

লাবু সাশ্চর্য্যে বলিলেন, বল কি আবুদি। বাঙালীর ঘরেও এই সব হয়েছে ?

আবুদি তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, হয়েছেই ত! কলকাতার ঘরে ঘরে হচ্ছে। আমাদের পাড়ায় এক দত্ত আছেন, তাঁর দু'টি মেয়ের প্রায় দু' বছর এনগেজমেণ্ট হয়ে রয়েছে—মেয়ে দু'টি রোজ ছেলে দুটির সঙ্গে বেড়াতে যায়, কত রাত্রি ক'রে ফেরে -

বল কি! এ সব ত সাহেবদেরই হত ভাই; শুনিছি ব্রাহ্মদেরও হয়।

এখন সবাই সাহেব ; সবাই ব্রাহ্ম। আমি দত্ত-গিন্নীকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, মেয়েদের বিয়ে হবে কবে ? বল্লেন, তারা যবে বলবে তবে হবে।

—দু' বছর পরে তারা যদি বলে, বিয়ে হবে না, তখন ?

—তখন আর কি !—হবে না।

—ছিঃ ছিঃ, সে যে বড় বিশ্রী।

আবুদি বলিলেন, তুমি বলছ বিশ্রী, তারা বলে না।

লাবু বলিলেন, তোমার বিশ্রী বলে মনে হয় না ?

আবুদি বলিলেন, আমার মনে হলেই বা কি ! না হলেই বা কি ! ভগবান রক্ষে করেছেন, ভাই, আমার মেয়ে নেই।

লাবু হাসিলেন, বলিলেন, হতে কতক্ষণ ?

এত দুঃখের মধ্যেও হাসির কথায় উভয়েই হাসিলেন। আবুদি কৃত্রিম দুঃখের সহিত বলিলেন, আর হয়েছে !

ইহার পর দুই অন্তরঙ্গ সখীর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইল, লেখকের তাহা জানা থাকিলেও তাহা তিনি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেন না। পুরুষদের গোপন কথা প্রায় অপ্রকাশ-যোগ্য নহে ; কিন্তু যে কোন বয়সের দুই বা ততোধিক নারীর গোপন কথা লোক-সমাজে প্রকাশ করা চলে না।

শেষাশেষি আবার প্রণয়কুমারের কথাতেই ইঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, লাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, অনিলার ফটো ত দেখেছ, দেখতে কেমন ?

আবুদি বলিলেন, রঙটঙ কেমন তা কে জানে ! এমনি চেহারাটা মন্দ নয়। লম্বা একহারা গড়ন, খুব লম্বা বলেই মনে হ'ল। গাল দু'টো চড়ানে—কেমন যেন চুয়াড়ে চুয়াড়ে ভাব। ঐ-ই নাকি এখনকার ফ্যাসান ; আমেরিকান বিউটি না কি বলে, ভাই।

—কি জাত ? কায়স্থ ?

ফটোয় ত জাত লেখা থাকে না ভাই।

লাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

আবুদি বলিলেন, আজকাল মেয়েরাও হয়েছে সব ধিঙ্গী। নইলে নিজে থেকে ফটো তুলিয়ে সই ক'রে প্রেজেণ্ট করে কেউ কখনও !

লাবু এখনও কথা কহিলেন না।

আবুদি তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, তুমিই ত সব মাটি করলে ভাই, এখন যদি পাত্তর হাতছাড়া হয়ে যায়, সে দোষ তোমার। আমি তোমায় বলে অবধি দিলুম যে,

সময় মত আমিই কথা পাড়ব, তুমি কেন ভাই হান্‌চান্‌ করে কাজটি পণ্ড করলে ?

যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার ত কোন উপায়ই নাই, এখন কি করিলে আবার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসে তাহাই চিন্তনীয়। লাবণ্য তাহাই বলিলেন।

আবুদি বলিলেন, দেখি চেষ্টা করে। রবিবারে ওর ছুটী থাকে, যদি পারি, সঙ্গে করে ওকে নিয়ে আসব'খন। বাড়ীর মধ্যে আমাকে একটু মান্য টান্য করে, আমার কথা বড় ঠেলে না।

লাবু সকাতরে বলিলেন, তাই কর ভাই। রবিবারে আনা চাই।

ইহাই স্থির রহিল। কালস্য কুটিলা গতি! ইন্দুর মাতা আর কি করিবেন? কালধর্ম্ম যাহা চাহে, তাহা করিতেই হইবে। তাঁহাদের কালে এ সব ছিল না। গৃহে বিবাহ-যোগ্য পুত্র বা বয়স্কা কন্যা থাকিলে ঘটক ঘটকী বাড়ী চষিয়া ফেলিত। লক্ষ কথা না হইলে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইত না বটে, কিন্তু এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটিত না। যুবক যুবতী যতদিন খুশী অবাধে মেলামেশা করিবে, যত্র তত্র ভ্রমণ করিবে, যদি ইচ্ছা হইল, বিবাহ করিবে, মর্জ্জি না হইলে হাত ধুইয়া ফেলিবে।—এই নোংরা কাজে কোন্ পিতামাতা সম্মতি দিতে পারেন? কিন্তু আবুদি বলিয়াছে, ইহাই আধুনিক রীতি ও নীতি, পালন করিতেই হইবে। স্রোতের বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া বিরাটকায় ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, তুমি আমি ত ছার!

বিদায় কালে আবুদি বলিলেন, লাবু, এইবেলা তোমার ছোট মেয়েকে নাচের স্কুলে ভর্ত্তি করে দাও ভাই। দু'পাঁচ বছর পরে নাচ দেখে লোকে বউ পছন্দ করবে।

মা গো! কালে কালে কতই হল!

—আরও কত হবে। তোমার মেয়েরা কৈ? তাদের যে বড় দেখছি না?

—শুয়েছে বোধ হয়। যে গরম, দুপুরবেলা ঘুমোয়।

গলাটা একটু খাটো করিয়া আবুদি জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ ভাই, প্রণয় যে আসে না, ইন্দু কিছু বলে টলে?

আসল কথা অপ্রকাশ রাখিয়া, লাবু বলিলেন, কৈ তা ত কিছু বলে না।

—কোথায় সে?

পাশের ঘরে ঢুকিতে দেখা গেল, ইন্দু বিছানায় শুইয়া, একখানি বাঙলা মাসিকপত্র পাঠ করিতেছে। আবু মাসীকে দেখিয়া উঠিয়া প্রণাম করিল আবুদি তাহার মুখে-চোখে হতাশার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, মেয়েটি বড় চাপা।

মেয়ের মা অনেক দিনের গাম্ভীর্য্য পরিহার করিয়া, স্নেহ-স্বরে কহিলেন, ইন্দুর কেবল পড়া আর পড়া! বই পেয়েছে কি অমনি পড়তে বসেছে। দুপুরবেলা গরমের দিনে একটু ঘুমোলে হয়, তা নয়, বই আর বই!—বলিয়া স্নেহময়ী জননী হাস্য করিলেন।

ইন্দু হাসিয়া পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া দিল।

ক্ষণা অঘোরে ঘুমাইতেছিল।

[ক্রমশঃ

বুলগেরিয়ার ৬০০০,০০০ জন অধিবাসীর মধ্যে ১৭২ জন শতায়ু ব্যক্তির বিবরণ সরকারী ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জনসংখ্যার অনুপাতে পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা এই সংখ্যা উচ্চতর।

বুলগেরিয়ার শতবর্ষজীবিগণ সকলেই কৃষক। তাহাদের মধ্যে একজনও সহরবাসী নাই এবং তাহাদের অধিকাংশই পার্ব্বত্য অঞ্চলের মেষপালক। তাহারা প্রায় সকলেই অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিল এবং সকলেরই বহু সন্তান সন্ততি আছে। তাহাদের মধ্যে দশজন ছাড়া সকলেই নিরামিষাহারী বা খুব সামান্য মাংস আহার করে এবং প্রায় সকলেই মদ্য পান করে। কিন্তু তাহাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাত্র ধূমপান করে।

উপরিউক্ত ১৭২ জন শতায়ু ব্যক্তির মধ্যে ৮০ জন স্ত্রীলোক, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি পুরুষ। সে একজন মেষপালক। তাহার নাম কোষ্টা ডিমিট্রক এবং তাহার বয়স ১২১ বৎসর।

—স্বাস্থ্য

বিজ্ঞান জগৎ

প্রজননশক্তি রোধ

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ব্বলমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা যাহাতে বংশবৃদ্ধি করিতে না পারে সে জন্য তাহাদের প্রজননশক্তি রোধ করিবার চেষ্টা পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন হইতে চলিতেছে। সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা মনে করেন যে, এই প্রস্তাব খুবই সমীচীন কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে ততদূর নিশ্চিত নহেন, বরং অনেকেই মনে করেন যে, ইহাতে সুফল অপেক্ষা কুফল অধিক।

এই সকল রোগ বা দোষগুলি হয় অর্জ্জিত অথবা বংশানুক্রমিক। বৈজ্ঞানিকদের মতে, অর্জ্জিত রোগ বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয় না, সুতরাং অর্জ্জিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রজননশক্তি রোধ করিবার কোনই অর্থ হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, একই বংশে কোন বিশেষ রোগের প্রভাব—যাহা অর্জ্জিত বলা যাইতে পারে, যথা যক্ষ্মা—অধিক। কিন্তু এ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, প্রথম দৃষ্টিতে বংশানুক্রমিক মনে হইলেও ইহা অনেক ক্ষেত্রেই আকস্মিক অথবা পারিপার্শ্বিকসাপেক্ষ। আপাতদৃষ্টিতে সন্তানসন্ততি পিতামাতার অনুরূপ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু ইহার মূলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণ হইতে নিম্ন স্তরের ব্যক্তিদের প্রজননশক্তি রোধ করিলে জগতের অনেক বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের জন্ম হইত না।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার এলিজাবেথ টাট্‌হিল এড্‌ওয়ার্ডসের বংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাপকর্ম্ম ও উন্মাদরোগ ছিল তাহার মজ্জাগত ও বংশগত। এলিজাবেথের এক ভগ্নী আপন পুত্রকে হত্যা করে এবং এলিজাবেথের এক ভ্রাতা অপর এক ভগ্নীকে হত্যা করে। প্রথমে এলিজাবেথের রিচার্ড এডওয়ার্ডসের সঙ্গে বিবাহ হয়, কিন্তু স্ত্রীর ব্যভিচার ও অত্যধিক অশ্লীলতার জন্য সে বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়। আধুনিক সুপ্রজননবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা এলিজাবেথের পুনর্ব্বার বিবাহে নিশ্চয়ই মত দিতেন না, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরবর্ত্তী কালে তাহার বংশে বহু বিখ্যাত ও মনীষাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রিচার্ড এডওয়ার্ডসের বংশধরগণ কেহই অসাধারণত্ব অর্জ্জন করেন নাই। এলিজাবেথের উত্তর-পুরুষের মধ্যে ১২ জন কলেজের অধ্যক্ষ, ২৬৫ জন গ্রাজুয়েট, ৬৫ জন অধ্যাপক, ৬০ জন চিকিৎসক, ১০০ জন ধর্ম্মযাজক, ৭৫ জন সৈনিক কর্ম্মচারী ৬০ জন নামকরা লেখক, ১০০ জন আইনজীবী, ৩০ জন বিচারক, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও পৌরপতি (Mayor) প্রভৃতি লইয়া ৮০ জন বড় সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারী, ৩ জন কংগ্রেসের সভ্য, ২ জন সিনেটের সভ্য, আমেরিকার ১জন উপরাষ্ট্রপতি (Vice President), য়েল (Yale) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা টিমথী এডওয়ার্ডস, থিয়োডোর রুজভেল্টের পত্নী, গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড, ইউ, এস, গ্র্যাণ্ট, ইংলণ্ডের মারশনেস উইন্‌স্টন চার্চ্চিল, আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি আর, ওয়েট (R. Waite), রকফেলার ফাউণ্ডেশনের (Rockfeller Foundation) অধ্যক্ষ জর্জ্জ ভিনসেণ্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বংশানুসারী রোগের সংখ্যা বৈজ্ঞানিকদের মতে অল্প এবং তাহা প্রধানতঃ মানসিক রোগ এবং তাহাও দুই বা তিন, কচিৎ চার পুরুষ পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। বংশটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করে, নতুবা লোপ পায়। প্রকৃত পক্ষে মানসিক রোগ (mental diseases) ও স্বল্পমস্তিষ্কতার (mental deficiency) কারণ আজও নির্দ্দিষ্ট ভাবে নির্ণীত হয় নাই, এবং বহু ক্ষেত্রে ইহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর করে এবং এরূপ ক্ষেত্রে সেই সমস্ত কারণ দূরীভূত করাই সঙ্গততর।

অনেকের ধারণা আছে যে, স্বল্পমস্তিষ্ক বা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রজননশক্তি অত্যধিক, কিন্তু ইহারও কোন ভিত্তি নাই। মাঝে মাঝে পুলিস কোর্টের বিবরণীতে এই প্রকার লোকের বহু সন্তানের সংবাদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বৃটিশ সরকারদের একটি রিপোর্ট অনুসারে ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তাহা ছাড়া এই জাতীয় ব্যক্তিদের অনেকেই মানসিক চিকিৎসার নানা প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ থাকে এবং তাহাদের প্রজননশক্তি রোধ করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিদের সন্তানদের মধ্যে বহু অসুস্থমস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাওয়া যায় এবং ইহাদের জন্ম তাহাদের মাতাপিতার প্রজননশক্তি রোধ করিয়া নিবারণ করা অসম্ভব। ফলে সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বোধে, এই সকল ব্যক্তিদের প্রজননশক্তি লোপ করিলেও সেই প্রকার লোকের জন্মরোধ করা সম্ভব হইবে না। যে হারে অপ্রয়োজনীয় লোকের প্রজননশক্তি রোধ করা হইতেছে, যদি সুস্থ লোকের সন্তানদের মধ্যে সেই হারে অসুস্থমস্তিষ্ক লোকের জন্ম হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রয়োজনে জননশক্তি রোধ করা নিতান্ত অর্থহীন হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, অসুস্থমস্তিষ্ক সন্তান হইতে পারে, আমেরিকায় এরূপ স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা এক কোটী, সুতরাং এ বিষয়ে ও দেশের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

হেলিকপ্টার ও অটোজিরো

বিভিন্ন ধরণের এরোপ্লেন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব সুস্পষ্ট নয় এবং উহাদের বাংলা প্রতিশব্দেরও অভাব আছে। বিমান, ব্যোমযান,
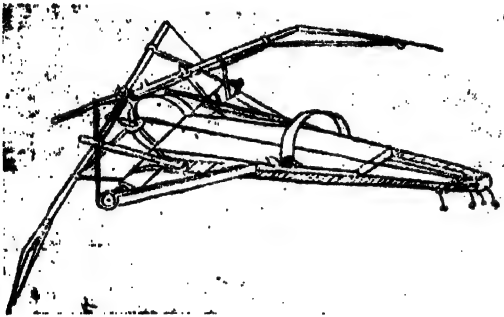
দা ভিঞ্চির পরিকল্পিত বিমান।

খপোত, উড়ো জাহাজ প্রভৃতি শব্দের কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজিতে 'এরোপ্লেন' বা সংক্ষেপে 'প্লেন' দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়;—প্রথম, ব্যাপকভাবে সকল প্রকার এরোপ্লেন বুঝাইতে; এবং দ্বিতীয়, কেবলমাত্র মাটি হইতে উঠিতে পারে ও মাটিতে নামিতে পারে এরূপ যন্ত্র বুঝাইতে। যে সকল এরোপ্লেন জল হইতে উঠে ও জলের উপর নামে সেগুলিকে 'সিপ্লেন' বলা হয়, কিন্তু ঐ জাতীয় এরোপ্লেনের আকার (অর্থাৎ fuselageএর আকার) নৌকার মত হইলে 'ফ্লাইং বোট' বা উড়ো নৌকা বলা হয়। ফ্লাইং বোট অনেকটা ডানাওয়ালা তিমি মাছের মত দেখিতে হয়। জলে ও জমিতে ব্যবহার করা যায় এরূপ উভচর প্লেনেরও অভাব নাই—এগুলিকে 'অ্যাম্ফিবিয়ান' বলা হয়।

সাধারণ এরোপ্লেনের উঠিবার ও নামিবার জন্য অনেকখানি জমির প্রয়োজন হয় এবং ফলে সহরের মধ্যে বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণ করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আরও দুই প্রকার এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হইয়াছে—'অটোজিরো' ও 'হেলিকপ্টার'। যে সকল এরোপ্লেন সোজা উপরে উঠিতে পারে, সোজা নীচে নামিতে পারে ও শূন্যে একস্থানে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিতে পারে সেগুলিকে হেলিকপ্টার

ডানাযুক্ত সাধারণ অটোজিরো।

বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য হেলিকপ্টার আজও নির্ম্মিত হয় নাই, যদিও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা ও পরীক্ষা চলিতেছে। এই চেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয় সেজন্য বৃটিশ সরকার ও মার্কিন সরকার যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন। য়ুরোপের অন্য দেশগুলিও এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট নহে।

বিলাতে অসকার আজবোট (Oskar Asboth) নামে অষ্ট্রিয়ার সরকারী গবেষণাগারের জনৈক ভূতপূর্ব অধ্যক্ষের পরিকল্পনায় নির্ম্মিত একটি ছোট হেলিকপ্টার লইয়া গোপনে বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি ঐরূপ একটি বিরাট হেলিকপ্টার নির্ম্মিত হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই যন্ত্রটি সোজাসুজি দশ হাজার ফুট উপরে উঠিতে পারিবে এবং ইহার সাধারণ বেগ হইবে ঘণ্টায় ১১০ মাইল।

নূতন ডানাবিহীন অটোজিরো।

বিপরীতভাবে ঘূর্ণায়মান দুইটি ঊর্দ্ধমুখ পাখা ইহাকে উপরে তুলিবে এবং সম্মুখ দিকে চলিবার জন্য সাধারণ এরোপ্লেনের মত প্রপেলার থাকিবে।

এইরূপ একটি হেলিকপ্‌টার অষ্ট্রিয়াতেও নির্ম্মিত হইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

লা খিয়েভ্রা (La Cievra) নামে জনৈক স্পেনবাসী ভদ্রলোক অটোজিরোর আবিষ্কর্ত্তা। ইনি প্রথমে স্পেন দেশে কার্য্য আরম্ভ করেন, পরে বিলাতে আসেন। বৃটিশ সরকার ইঁহার কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন। অটোজিরোর আকার সাধারণ এরোপ্লেনের ন্যায়, কেবলমাত্র এই প্রভেদ যে ইহাতে একটি, চারটি বা তিনটি ব্লেডওয়ালা উর্দ্ধমুখ 'রোটর' বা পাখা থাকে। অটোজিরো প্রপেলারের সাহায্যে চলে এবং চলিতে থাকিলে পাখাটি বাতাসের চাপে আপনিই ঘুরিতে পারে এবং এই কারণেই ইহাকে 'অটোজিরো' (autogiro) বলা হয়। অটোজিরোর রোটরের আকৃতি অনেকটা উইণ্ডমিলের (windmill) পাখার মত দেখিতে বলিয়া ইহাকে উইণ্ডমিল প্লেনও (windmill plane) বলা হইয়া থাকে। সাধারণ এরোপ্লেন কয়েকশত গজ না দৌড়াইলে উপরে উঠিতে পারে না, কিন্তু অটোজিরো মাত্র ত্রিশ গজ দৌড়াইয়াই উপরে উঠিতে পারে। নামিবার সময় অটোজিরো প্রায় সোজাসুজিভাবে নামিতে পারে।
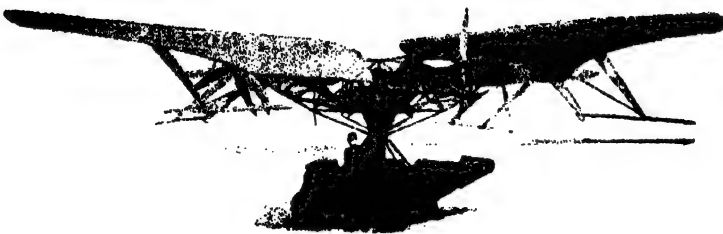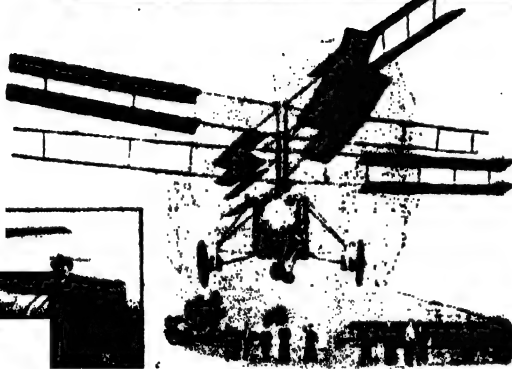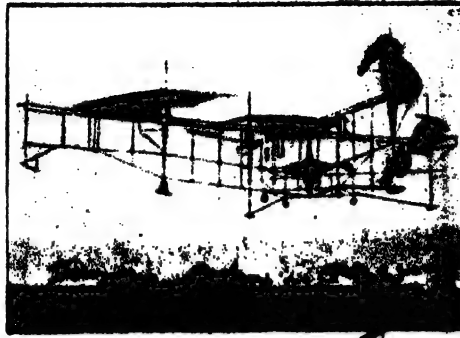
১। ফরাসী বৈমানিক এতিয়েন ওমিশঁর হেলিকপ্‌টার। ২। মারকুইস্ দে পেস্কারার হেলিকপ্‌টার। ৩। এমিল বের্লিনারের হেলিকপ্‌টার। ৪। কার্টিস-ব্লিকার হেলিকপ্‌টার।

সম্প্রতি নূতন ধরনের দুইটি অটোজিরো নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে এরোপ্লেনের ডানা বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার রোটরে তিনটি ব্লেড আছে; রোটরটির দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া যন্ত্রটি যদৃচ্ছভাবে চালনা করা যায় এবং ফলে হাইল এবং পুরাতন অটোজিরোর আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক অংশ নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার নিম্নতম বেগ ঘণ্টায় ১৭ মাইল এবং উচ্চতম বেগ ঘণ্টায় ১০৫ মাইল। মাত্র ২৫ মাইল বেগ হইলেই ইহা উঠিতে পারে। এক কথায় এই নূতন ডানাবিহীন অটোজিরো প্রায় হেলিকপ্‌টারের পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

হেলিকপ্‌টারের বিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci) প্রথম হেলিকপ্‌টারের কল্পনা করেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে দা ভিঞ্চির মৃত্যুর পর তাঁহার কাগজপত্রের সঙ্গে তাঁহার কল্পিত বিমানের এক খসড়া পাওয়া যায়। তিনি যন্ত্রটি আকাশে উঠাইবার জন্য উর্দ্ধাধঃ অক্ষের উপর ঘূর্ণমান পাখার অর্থাৎ বর্ত্তমান রোটরের কল্পনা করেন।

দা ভিঞ্চির মৃত্যুর তিন শতাব্দী পরে পোসৃত (Poceton) নামে জনৈক ফরাসী দুইটি পাখাওয়ালা বিমানের পরিকল্পনা করেন—একটি পাখা যন্ত্রটিকে আকাশে তুলিয়া রাখিবার জন্য ও অপরটি ইচ্ছামত চালাইবার জন্য। নূতন ডানাবিহীন অটোজিরোর সহিত এই পরিকল্পনার সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। পোসৃতর পরিকল্পনার সাহায্য লইয়া তাঁহার দুই জন স্বদেশবাসী লোনোয়া (Launoy) ও বিয়ঁভেন্যু (Bienvenu) একটি বৈজ্ঞানিক খেলনা প্রস্তুত করেন। ইহাতে চারটি করিয়া পালকে নির্ম্মিত দুইটি পাখা ছিল। পাখা দুইটি পাকানো রবারের সূতা দ্বারা বিপরীত দিকে আবর্ত্তিত হইত এবং ফলে উপরে উঠিতে পারিত। এখনও খেলার এরোপ্লেনে রবারের সূতা দ্বারা প্রপেলার ঘুরানো হয়।

ইহার পরে এনরিকো ফোর্লানিনি (Enrico Forlanini) নামে জনৈক ইতালিয়ান একটি হেলিকপ্টারের আদর্শ তৈয়ারী করেন এবং

ডি বোথেজার হেলিকপ্টার।

রোটরগুলি ঘুরাইবার জন্য একটি ছোট বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহার করেন। ফোর্লানিনির যন্ত্রটি আকাশে উঠিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া এই খানেই ক্ষান্ত হ'ন।

এডিসান্, কপার হেউইট্, লুই ব্রেনান, এ'মিল বেলিনার প্রভৃতি বিখ্যাত আবিষ্কারকগণ হেলিকপ্টারের উন্নতিবিধানের জন্য প্রভূত চেষ্টা করেন। এডিসনের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, হেলিকপ্টারের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

প্রথমে হাল্কা অথচ শক্তিশালী ইঞ্জিনের অভাবে হেলিকপ্টার তথা অন্য যে কোন প্রকার বিমান-নির্ম্মাণের কাজ যথোপযুক্তভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মোটরগাড়ীর ইঞ্জিন যথেষ্ট উন্নতিলাভ করায় পল কর্ণু (Poul Cornu) ও লুই ব্রগে (Louis Breguet) হেলিকপ্টার নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা করেন। ইহাঁদের যন্ত্রগুলি বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইগোর সিকোরস্কী (Igor Sikorsky) নামে জনৈক রাশিয়ান মস্কোর নিকটে একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। যন্ত্রটির ইঞ্জিন যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ায় সিকোরস্কীর প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হয়। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ইঞ্জিন সাহায্যে তিনি আর একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন এবং আংশিক ভাবে সাফল্যও লাভ করেন, কিন্তু তিনি এই সম্বন্ধে অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া সাধারণ এরোপ্লেনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি এখন একজন জগৎ বিখ্যাত এরোপ্লেন-ডিজাইনার।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে হেলিকপ্টার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আবার সাড়া পড়িয়া যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মারকুইস্ দে পেসকারা (Marquis de Pescara) নামে একজন ইতালিয়ান বংশোদ্ভূত আরজেন্টাইন স্পেনদেশে বারসেলোনায় তাঁহার হেলিকপ্টারের উড্ডয়নক্ষমতা প্রদর্শন করেন। দুই বৎসর পরে ফ্রান্সে ইসিলে-মুলিনো (Issiles-Moulineaux) নামক স্থানে প্রায় আধ মাইল চক্রাকারে ঘুরিয়া রেকর্ড স্থাপন করেন। ইহার আগে কেহই হেলিকপ্টার সাহায্যে চক্রাকারে ঘুরিতে সক্ষম হ'ন নাই। তাঁহার যন্ত্রের আকার রেসিং মোটর গাড়ীর মত ছিল। একই অক্ষের উপর ঘূর্ণায়মান দুইটি রোটর এবং রোটরের ব্লেড একক না হইয়া যুগ্ম—ইহাই ছিল তাঁহার যন্ত্রের বিশেষত্ব।

এই সময়ে ফ্রান্সে এতিয়েন ওমিশঁ (Etienne Oehmichen) ও আমেরিকার ডক্টর জর্জ্জ ডি বোথেজা (Dr George de Bothezat) হেলিকপ্টার নির্ম্মাণে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। ওমিশঁ তাঁহার হেলিকপ্টারে চারটি পাখা এবং কয়েকটি প্রপেলার ব্যবহার করেন। ইনি চক্রাকারে প্রায় এক মাইল ঘুরিয়া মার কুইস্ দে পেস্কারার রেকর্ড ভঙ্গ করেন এবং ৯০,০০০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার পা'ন।

আমেরিকার সেনাবিভাগের অর্থসাহায্যে ডি বোথেজা তাঁহার বিরাট হেলিকপ্টার নির্ম্মাণ করেন। যন্ত্রটির আকৃতি ছিল একটি বিরাট মাল্টা দেশীয় ক্রুশের (Maltese Cross) ন্যায়। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দৈর্ঘ্য ছিল ৬৫ ফুট। ক্রুশটির চারটি প্রান্তে চারটি ছয়-ব্লেডওয়ালা পাখা ছিল। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার হেলিকপ্টার নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ডি বোথেজার যন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কিন্তু ইহাও এলোমেলো বাতাসের মধ্যে কোনদিন উড়ে নাই। তাঁহার যন্ত্রের ইঞ্জিন বিকল হইলে নিরাপদে নামা সম্ভব হইবে কিনা সে সম্বন্ধে কোন পরীক্ষা করা হয় নাই।

নির্ভরযোগ্য হেলিকপ্টার নির্ম্মাণে উৎসাহ দিবার জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার কোন হেলিকপ্টার চারটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ৫০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। পরীক্ষাগুলি এই :—

একাধারে বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র। [পরপৃষ্ঠা

১। যন্ত্রটি সোজাসুজি দুই হাজার ফুট উপরে উঠিবে এবং নিরাপদে নামিবে।

২। ২০০০ ফুট উপরে উঠিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর প্রায় স্থির-ভাবে শূন্যে থাকিবে।

আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে ব্যবহৃত ২৪ চাকাযুক্ত ভারবাহী মোটর

৩। ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে মাইল স্থান ২০০০ ফুট উঁচু দিয়া যাইতে হইবে।

৪। ৫০০ ফুট উঁচু হইতে ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া নিরাপদে ২০০ ফুট বৃত্তের মধ্যে নামিতে হইবে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেহই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরাজ আবিষ্কারক লুই ব্রেনান সম্পূর্ণ নূতন ধরণের হেলিকপ্‌টার নির্ম্মাণের জন্য সরকার কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হন। শুনা যায় যে ব্রেনানের নির্ম্মিত যন্ত্র ১০০০ পাউণ্ড ভার তুলিতে এবং ১৫ মিনিট কাল একস্থানে স্থির থাকিতে সক্ষম হইয়াছিল।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বিমান-বিভাগের নির্দ্দেশে একটি যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। ইহার রোটরের ব্লেডে একটি করিয়া প্রোপেলার দেওয়া হয় যাহাতে প্রোপেলারের সাহায্যে রোটরটি ঘুরিতে পারে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমেরিকায় নির্ম্মিত কার্টিস-ব্লিকার (Curtiss-Bleecker) হেলিকপ্‌টারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

ইতালিতে দাস্‌কানিও (D'ascanio) ও বেলজিয়ামে ফ্লোরিয়া (Florian) হেলিকপ্‌টার নির্ম্মাণে কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ হেলিকপ্‌টার নির্ম্মিত হইলে বিমান পরিচালনের ধারা অনেক পরিবর্ত্তিত হইবে এবং সেই কারণে বৃটিশ কারখানায় যে হেলিকপ্‌টার নির্ম্মিত হইতেছে তাহার সংবাদের জন্য জগতের সমস্ত বৈমানিক, আবিষ্কর্ত্তা ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতেছেন।

অভিনব বেতার-যন্ত্র

রোমাঞ্চকর উপন্যাসে বেতার-যন্ত্র সাহায্যে কথোপকথন করিবার কথা পড়া যায়, কিন্তু একই যন্ত্র গ্রাহক (receiver) ও প্রেরক (transmitter) হিসাবে ব্যবহার করিবার কোন ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে এই একাধারে গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র বা transceiver নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে। যন্ত্রটি অতি ক্ষুদ্র—মাত্র ৬½ × ৫ × ৪ ইঞ্চি। ইহাতে মাত্র দুইটি "টিউব" আছে এবং আকাশতারের পরিবর্ত্তে চার ফুট লম্বা পিতল বা অ্যালুমিনিয়ামের নল ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনীয় ব্যাটারীগুলি পকেটে লওয়া চলে। সাধারণতঃ দশ হইতে পনের মাইল দূর পর্য্যন্ত এই যন্ত্র সাহায্যে কথোপকথন করা যায়।

২৪ চাকাযুক্ত ভারবাহী মোটর

আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগে ব্যবহারের জন্য বিলাতের লিল্যাণ্ড মোটরস লিমিটেড একপ্রকার ২৪ চাকাযুক্ত বিচিত্রদর্শন মোটর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি ট্রাক্‌টর ও দুইটি ট্রেলার এই তিনটি অংশে গাড়ীটি নির্ম্মিত। প্রত্যেক অংশে ৮টি করিয়া চাকা আছে। এই মোটরটি ১৫ টন মাল বহন করিতে পারে। ইহাতে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ২৪টি চাকা থাকা সত্ত্বেও ইংরাজি U আকারের বাঁক সহজেই ঘুরিতে পারে। প্রথম গাড়ীটিতে

নূতন বিমানের পরিকল্পনা। [পরপৃষ্ঠা

সিলিণ্ডার যুক্ত পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। ইহার কাজ এতদূর সন্তোষজনক হয় যে লিল্যাণ্ড কোম্পানী আরও একটি গাড়ী তৈয়ারী করিবার

অর্ডার পান। কিন্তু দ্বিতীয় গাড়ীটিতে পেট্রোল ইঞ্জিনের পরিবর্ত্তে তৈলচালিত ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। প্রথমটিতে প্রতি টন প্রতি মাইল খরচ পড়ে প্রায় পাঁচ আনা এবং দ্বিতীয়টিতে পড়ে প্রায় চার আনা।

এই অভিনব যানটি একাধারে এরোপ্লেন ও মোটরগাড়ী।

নূতন ধরনের এরোপ্লেনের পরিকল্পনা

জনৈক আমেরিকান সাধারণ এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার ও অটোজিরোর সমবায়ে এক নূতন ধরণের এরোপ্লেন নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে পেটেন্ট লইয়াছেন। সাধারণ এরোপ্লেনের মত ইহার দুইটি ডানা থাকিবে। ডানার দুই প্রান্তে একই অক্ষের উপর বিপরীত ভাবে ঘূর্ণমান দুইটি করিয়া রোটর থাকিবে। এরোপ্লেনের বডি গোলাকার হইবে এবং চালকের আসন থাকিবে একটি ছোট টাওয়ারের মধ্যে। টাওয়ারের দুই পাশে দুইটি প্রপেলার থাকিবে। উপরে উঠিবার সময় প্রপেলার দুইটি ঊর্দ্ধমুখ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে। এইরূপ এরোপ্লেন খুব অল্প পরিসর স্থান হইতে উঠিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়।

এরোপ্লেন মোটর গাড়ী

সম্প্রতি প্যারীর রাস্তায় এই বিচিত্র যান দেখা গিয়াছিল। ইহার আকার সাধারণ এরোপ্লেনের ন্যায়, মোটর হিসাবে ব্যবহার করিবার সময় ডানা দুইটি পাশে মোড়া থাকে এবং লেজের দিকে একটি চাকা বাহির হয়। ইচ্ছামত একই সময়ে চাকাটি ভিতরে টানিয়া লওয়া যায় এবং ডানা দুইটি খুলিয়া ফেলা যায় এবং ফলে মোটর গাড়ী এরোপ্লেনে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ এরোপ্লেনের মত ইহার ইঞ্জিন সামনে না বসাইয়া পিছনে বসান হইয়াছে।

নূতন পেরেক

সম্প্রতি এক প্রকার নূতন ধরণের পেরেক বাহির হইয়াছে। পেরেকের মুখ তীরের ফলার আকারের হওয়ায় এই পেরেক একবার লাগাইলে খোলা অসম্ভব।

নূতন ধরণের পেরেক।

সাদা কাক

অবিশ্বাস্য বোধ হইলেও গ্যালিপোলিস, ওহায়ো হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে সেখানকার জনৈক শীকারী একটি সাদা কাক মারিয়াছেন। সাদা কাকটি একদল কাল কাকের ঝাঁকের সহিত উড়িয়া যাইবার সময় শীকারীর হাতে মারা পড়ে।

সর্ব্বপ্রকারে স্বাবলম্বী-ভারতবর্ষ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে,—

ইটালীতে কয়লা ও লোহা নাই ; ফ্রান্সে তেল নাই ; ইংলণ্ডকে ৯০ দিনের খোরাক বাদে সারা বৎসরের খাদ্য অন্য দেশ হইতে আনিতে হয় ; টীন, রেশম, নিকেল, রবার এবং অন্যান্য দ্রব্যের জন্য আমেরিকাকে অন্য দেশের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হয় ; ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে আমেরিকার মোটর টায়ারের রবার যাইয়া থাকে। কানাডা হইতে কাগজের উপকরণ আসিলে তবে আমেরিকা কাগজ তৈয়ারী করিতে পারে। আমেরিকা টেলিফোনের রিসিভার এবং ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ তৈয়ারী করিতে পারে না, অন্যান্য দেশ হইতেই আনিতে হয়। আমেরিকা ব্যবহার উপযোগী ৫০ রকমের দ্রব্য ৫০টি বিভিন্ন দেশ হইতে লইয়া থাকে। কানাডা হইতে নিকেল, পেরুর এণ্ডিজ পর্ব্বত হইতে গাড়ীর সরঞ্জাম, ককেসাস হইতে লৌহ সম্বন্ধীয় দ্রব্য, নিউ ক্যেলেডিনিয়া হইতে ক্রোম আসিয়া থাকে।

একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া, আর সকল দেশকে ভিন্ন দেশের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে খাদ্যদ্রব্য, উন্নত লৌহদ্রব্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, অভ্র, কয়লা, তৈল এবং অন্যান্য ধাতু এবং মানুষের ব্যবহার উপযোগী সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়।

অন্যান্য দেশে—যদি ইটালীতে কয়লা এবং ফরাসী দেশে যদি অন্য দেশের তেল না যায় ফরাসী দেশেও বৈজ্ঞানিক উন্নতি বন্ধ হইয়া যায়, ইংলণ্ড যদি অন্য দেশ হইতে খাবার দ্রব্য না পায়, তাহা হইলে সেখানে দুর্ভিক্ষে লোককে মরিতে হইবে। কেবল ভারতবর্ষ অন্য দেশ ও জাতির সাহায্য ব্যতীত বাঁচিতে পারে।

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

"দি নেটিভ্ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন"
(The Native Medical Institution)
ও
ইহার কার্য্য-প্রণালী

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, ১০ই এপ্রিল তারিখে 'মেডিক্যাল-বোর্ড' (Medical Board) ডাক্তার বুটন-সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন, "কিরূপ প্রণালীতে 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনের' কার্য্য চলিতেছে, তাহা সবিস্তর লিখিয়া 'মেডিক্যাল-বোর্ডকে' শীঘ্রই জানাইবেন।" তদনুসারে ডাক্তার জন বুটন (Dr. John Broton) সাহেব আনুপূর্ব্বিক লিখিলেন :—

প্রাচীন সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের বাড়ী।

১। সমগ্র বাঙ্গালা-দেশে নেটিভ ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে, ২১শে জুন (১২১৯ বঙ্গাব্দে, ৮ই আষাঢ়, শুক্রবার) দিবসে গভর্ণমেণ্ট একটী চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার নাম 'দি স্কুল ফর্ নেটিভ্ ডক্টার্স্' (The School for Native Doctors). ডাক্তার জেমিসন্ সাহেব (Dr. Jameson) ইহার প্রধান শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) ছিলেন।(১) 'মেডিক্যাল-বোর্ডের' সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি কার্য্য করিতেন। তিনিই একাকী সমস্ত বিষয়েরই অধ্যাপনা করিতেন।

২। বিদ্যার্থি-গণকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাদিগকে স্কুলে ভর্ত্তি করা হইত। যে সকল ছাত্রের পিতা বা অভিভাবক 'নেটিভ্ ডাক্তার' ছিলেন, তাহাদিগকেই সাদরে গ্রহণ করা হইত। গভর্ণমেণ্ট যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, ছাত্রগণ সেই সকল নিয়মের অনুবর্ত্তী হইলেই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিত। সুপারিন্‌টেণ্ডিং সার্জ্জন-গণ (Superintending surgeons) তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিতেন।

৩। ছাত্রগণ মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট জেমিসন সাহেব প্রথমতঃ তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেন। তাহারা নাগরী ও পারসী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে পারে কি না, ইহাই প্রথমতঃ দেখা হইত। তাহাদের পরীক্ষার ফল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব গোপনে 'মেডিক্যাল বোর্ডে' পাঠাইয়া দিতেন। 'মেডিক্যাল বোর্ড', যাহাদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক মনে করিতেন, তাহাদিগকে সেক্রেটারীর নিকটে প্রেরণ

(১) বর্ত্তমান গোলদীঘির দক্ষিণ-দিকে হেয়ার-সাহেবের কবর বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কবরের ঠিক দক্ষিণ-দিকে রাস্তার পার্শ্বেই বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার সহাধ্যায়ী বন্ধুবর শ্রীযুত কালিদাস মল্লিক এম্-এ মহাশয়ের বাড়ী। তাঁহার বাড়ীর দক্ষিণ-ভাগে স্বর্গত গোলোকচন্দ্র কর্ম্মকারের বসতি-বাটী। কালিদাস বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি পিতা ও পিতামহের মুখে শুনিয়াছি, গোলদীঘির উত্তর ও পশ্চিম পাড় হেয়ার সাহেবের অধিকার-ভুক্ত ছিল। তৎকালে সাহেবেরা নিজ নামে কলিকাতায় ভূমি-সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিতেন না। এই হেতু, হেয়ার সাহেব উক্ত ভূমি ক্রয় করিয়া স্বীয় দেওয়ান গোলোক কর্ম্মকারের নামে লেখাপড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন।

করিতেন। সেক্রেটারী মহাশয়, তাহাদিগকে ভবানীপুরে জেনারল হাসপাতালে'(২) কাজ শিখিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিতেন।

৪। প্রত্যেক ছাত্রকেই গভর্ণমেণ্ট মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকেন। প্রত্যেক ছাত্রই প্রথম দুই বৎসর ১০৲ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপরে যতদিন এই স্কুলে অধ্যয়ন করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে মাসিক ১২৲ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের বাড়ীতে বাস করে। গভর্ণমেণ্ট এই বাড়ীর মাসিক ভাড়া ২৫০৲ টাকা করিয়া দিয়া থাকেন। এই বাড়ীতে স্কুল বসে ও অফিস আছে। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব, মুন্সী, পণ্ডিত, কেরাণী ও হরকরার বেতন লইয়া যে টাকা খরচ হয়, তাহা সমস্তই গভর্ণমেণ্ট বহন করেন। ছাত্রগণকে 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনে' যেরূপ সুন্দর শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তদ্দ্বারা দেশের যেরূপ প্রভূত মঙ্গল ও উপকার সাধিত হয়, তাহার তুলনায় গভর্ণমেণ্ট-দত্ত টাকা অতি তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়।

৫। ছাত্রগণকে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিম্ন-লিখিত স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, যথা, জেনারল হাসপাতাল (General Hospital), ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর ডিস্‌পেন্‌সারী (The Honourable Company's Dispensary), রাজার হাসপাতাল (King's Hospital) এবং নেটিভ্ হাসপাতাল (Native Hospital)

৬। বিশেষ বিশেষ রোগের অবস্থা ও অস্ত্র-চিকিৎসা-শিক্ষা বুঝাইবার সময় হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করা হয়। 'জেনারল হাসপাতাল' ও 'নেটিভ হাসপাতালে' যখন মড়া চেরা হয়, তখন ছাত্রগণ সেস্থানে উপস্থিত থাকিয়া অনেকটা জ্ঞানলাভ করে। 'কম্‌প্যারেটিভ্ এনাটমী' (Comparative Anatomy) সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তৃতা করা হয়, তাহা সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের গৃহেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দী-ভাষায় যে বক্তৃতা করা হয়, তাহার ভাবার্থ মুন্সী ও পণ্ডিত দ্বারা যথাক্রমে পারসী ও নাগরী অক্ষরে লিখিত হয়। এবিষয়ে আমার নিজ পারসী ও নাগরী লেখক পণ্ডিত-গণ সাহায্য করিয়া থাকেন। তৎপরে ছাত্রগণের সুবিধার নিমিত্ত লিথোগ্রাফ করা হয়। এই লিথোগ্রাফ-পুস্তকের সাহায্যে নেটিভ্ ডাক্তার-গণও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

৭। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও রবিবারে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করা হয়। সাল্‌ফেট্ অফ্ সোডা (Sulphate of Soda), ম্যাগ্‌নেসিয়া (Magnesia), মিউরিয়াটিক্ ও নাইট্রিক্ এসিড্ (Muriatic and Nitric acid), ক্যালোমেল (Calomel), চাউল ও গুড় হইতে স্পিরিট্ অফ্ ওয়াইন্ (Spirit of wine),—ইত্যাদি বস্তু কিরূপে

হেয়ার সাহেব, গোলদীঘির উত্তর-পাড় হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের নিমিত্ত দান করেন। পশ্চিম পাড় তিনি বিক্রয় করিয়াছিলেন। যে বৎসর 'স্কুল ফর্ নেটিভ ডক্টার্স্ (School for Native Doctors) স্থাপিত হয়, সেই বৎসরেই (১৮২২ খৃষ্টাব্দে) গোলদীঘি খনন করা হইয়াছিল। তখন এই অঞ্চলে ভাল পুষ্করিণী না থাকায় লোকের নিতান্ত জলকষ্ট ছিল। বিশেষতঃ এই মেডিক্যাল-স্কুলের ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে বলিয়া গোলদীঘি খনন করা হইয়াছিল। হোরেস্ হেম্যান উইলসন, রামকমল সেন ও মতিলাল, শীলের বিশেষ চেষ্টায় এই দীঘির সৃষ্টি হইয়াছিল।" এখন দেখিতেছি কালিদাস বাবুর কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। রামকমল সেনের বাটীতে (পুরাতন এলবার্ট-কলেজের গৃহে) এই স্কুলটী সর্ব্ব-প্রথম বসিয়াছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দেই গোলদীঘি খনন করা হইয়াছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে, ৩০ মার্চ্চ তারিখের 'সমাচার-দর্পণে' এইরূপ লিখিত আছে:—"নূতন জলাশয়। মোকাম কলিকাতার পটোলডাঙ্গায় রাস্তার ধারে যে নূতন জলাশয় হইতেছে তাহার সাড়ে দশ হস্ত মৃত্তিকার নীচে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে সকল কাষ্ঠ মৃত্তিকাভুক্ত হইয়া মৃত্তিকাতুল্য অসার হইয়াছে এত মৃত্তিকার নীচে এমন বৃক্ষ সম্ভব আশ্চর্য্য।" লেখক

(২) এই হাসপাতালের নাম 'প্রেসিডেন্সী জেনারল হাসপাতাল' (Presidency General Hospital). ইহাই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান হাসপাতাল। ভবানীপুরে বিজ্ঞিতলার গির্জ্জার দক্ষিণ-দিকে যে বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহারও দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটী রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নাম 'লোয়ার সারকিউলার রোড' (Lower Circular Road) ইহারই দক্ষিণ-দিকে 'জেনারল হাসপাতাল' অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানকে পূর্ব্বে 'ধুলন্দ' বলিত। এখনও এই স্থানে একখানি বাড়ীর সম্মুখে 'Doland House' এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত বিপ্রদাস-কৃত 'মনসা-মঙ্গলে' 'ধুলন্দ'-গ্রামের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর নিমিত্ত এই বাড়ীখানি কিয়ারন্সান্ডার (Mr. Kiernander) সাহেবের নিকটে ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তর ইতিহাস পরে লিখিত হইবে।—লেখক

প্রস্তুত করিতে হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা স্কুলে পারদ প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী শিক্ষা দিয়া থাকি। বিলাতী পারদ অপেক্ষা ইহা তত শুভ্রবর্ণ না হইলেও ইহা দ্বারা রোগীদিগের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। এই সকল বস্তু প্রস্তুত করিতে শারীরিক পরিশ্রমের বিশেষ প্রয়োজন। আমার শরীর তত শ্রম-সহিষ্ণু নহে বলিয়া আমায় ছাত্রগণ আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

৮। যখন উক্ত ঔষধ সকল প্রস্তুত করিতে না হয়, তখন ছাত্রগণ ফার্মাকোপিয়া (Pharmacopœia) ও র‍্যামসে-কৃত মেটিরিয়া মেডিকা (Ramsay's Materia Medica) আমার নিকটে বুঝাইয়া লয়।

৯। প্রত্যেক সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছাত্রগণকে লিথোগ্রাফে মুদ্রিত পুস্তক গুলির দুর্বোধ্য অংশগুলি বুঝাইয়া দিতে হয়। আমি আরও জানাইতেছি, গভর্ণমেণ্ট আমাকে যে ৪জন সহকারী দিয়াছেন, তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা সাহায্য না করিলে আমার যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হইত।

১০। যেদিন হইতে আমি 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইনষ্টি-টিউসনে' ভর্ত্তি হইয়া সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিতেছি, সেই দিন হইতেই ছাত্রগণের উন্নতির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। একদিনের জন্যও আলস্যের বশীভূত হই নাই। আমি কোরণ্ড (Hydrocele) সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়া ইহা প্রেসে ছাপাইতে দিয়াছি। আমি 'গো-বীজের টীকা' দেওয়া সম্বন্ধে যে একখানি ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহারও বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখন কলিকাতায় যে 'জঙ্গল জ্বর' (Jungle fever) ও আমাশয় (Dysentery) হইতেছে, তাহার সম্বন্ধেও আমি একখানি পুস্তক লিখিয়া ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেছি।

১১। আমার নিকটে যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে, তাহাদের সাহায্যে ছাত্রগণকে 'এয়ার পাম্প' ও 'বৈদ্যুতিক ব্যাপার' (Air pump and Electricity) সম্বন্ধে বহু বিষয় বুঝাইয়া দিয়া থাকি। ইহা দেখিয়া ছাত্রগণ নিতান্ত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

১২। ছাত্রগণকে যখন 'শারীর-স্থান-বিদ্যা' (Ana-tomy) বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। ইহা দ্বারা বোধ হয়, তাহারা একদিন কৃতবিদ্য ও কৃতকর্ম্মা হইয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিবে।

১৩। ছাত্রগণ ৩ বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা যে পরিমাণে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহা অতি সন্তোষ-জনক। বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণ ইংলণ্ডে থাকিয়া যে পরিমাণে 'এনাটমী ও মেডিসিন্' (Anatomy and Medicine) শিক্ষা করিয়া থাকে, আমার ছাত্রগণও সেই পরিমাণে শিক্ষালাভ করে। ইংলণ্ডের ছাত্রগণ হাসপাতালে গিয়া শিক্ষা করিবার সুবিধা পায় না, কিন্তু আমার ছাত্রগণ হাসপাতালে গিয়া প্রচুর-পরিমাণে এই সুবিধা পাইয়া থাকে।

১৪। 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনের' (Native Medical Institution এর) ছাত্রগণ কত বৎসর ধরিয়া এই স্কুলে পড়িবে, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে স্থির করা হয় নাই। যদি তাহারা চারি বৎসর ধরিয়া এই স্কুলে পড়িতে পারে, তবে তাহারা উত্তম 'নেটিভ্ ডাক্তার' (Native Doctor) হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইবে।

১৫। সমগ্র হিন্দুস্থানের লোকদিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই এই 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনের' (Native Medical Institution এর) সর্ব্ব-প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান-গণ 'নেটিভ্ ডাক্তার' (Native Doctor) হইয়া সাধারণ ও সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিতে পারে, তাহাই এই স্কুলের অন্যতর উদ্দেশ্য।

১৬। আমার ৮ জন ছাত্র সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিয়াছে। ৪ জন সর্ব্বোত্তম ছাত্র এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক হইয়াছে। ৪ জন 'নেটিভ্ ডাক্তার' (Native Doctor) হইয়া চিকিৎসা করিতেছে। আশা করি যে, আমি অতি অল্পকালের মধ্যেই এমন অনেকগুলি ছাত্রকে কৃতবিদ্য করিয়া 'মেডিক্যাল বোর্ডে' (Medical Board এ) পাঠাইয়া দিব যে, তাহারা কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

১৭। ভারতবর্ষের ন্যায় সুবৃহৎ দেশে 'মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনের' (Medical Institution এর) ন্যায় একটী স্কুল থাকার বিশেষ প্রয়োজন। এই স্কুলটী জীবিত থাকিলে কি

গভর্ণমেণ্ট, কি সাধারণ লোক, সকলেই পরম উপকৃত হইবেন।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে 'মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনে' (Medical Institution এ) উল্লেখ-যোগ্য কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। এই বৎসর জুলাই-মাসে একটী ছাত্র স্বেচ্ছাক্রমে স্কুল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বৃটন সাহেব 'মেডিক্যাল বোর্ডে' (Medical Board এ) লিখিলেন, "আমরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিয়া থাকি; কিন্তু তাহারা যদি বিনা কারণে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব, আমি এই প্রস্তাব করি, ভর্ত্তি হইবার সময়ে ছাত্রগণ যেন প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা বিনা সন্তোষ-জনক কারণে কখনই স্কুল ত্যাগ করিয়া যাইব না।" 'মেডিক্যাল বোর্ড' এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলে গভর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিয়া লইলেন।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে 'কোর্ট অফ্ ডিরেক্টর্স্' (Court of Directors) গভর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী কর্ণেল কেস্মেণ্ট (Colonel Casement) তাহার কিয়দংশ 'মেডিক্যাল বোর্ডে' (Medical Board এ) পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্থির হইল যে, 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসন' (Native Medical Institution) যেরূপ ছিল, সেইরূপই থাকিবে, এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বৃটন সাহেব যে মাসিক বেতন ও ভাতা পাইতেছেন, তাহাও তিনি রীতিমত পাইবেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জুন-মাসে বৃটন সাহেব 'মেডিক্যাল বোর্ডে' (Medical Board এ) পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, আমার একটি ছাত্র চুরির অপরাধে ও আর একটি ছাত্র অবাধ্যতার জন্য এবং অন্য একটি ছাত্র বিনা কারণে স্কুল ত্যাগ করায় 'কোর্ট-মার্শালে' (Court Martial এ তাহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের অর্থাভাব হওয়ায় প্রথমতঃ স্থির হইয়াছিল যে, 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসন' (Native Medical Institution) তুলিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু তাহা আর তুলিয়া দেওয়া হয় নাই। তবে ছাত্রগণকে পূর্ব্বে যে হারে বৃত্তি দেওয়া হইত, তাহা কিছু কম করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল;—অর্থাৎ প্রথম-বার্ষিক ছাত্রগণকে ৮৲ টাকা, দ্বিতীয়-বার্ষিক ছাত্রগণকে ১০৲ টাকা এবং তৃতীয়-বার্ষিক ছাত্রগণকে ১২৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করা হইল। প্রত্যেক নেটিভ্ ডাক্তারকে শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের ১০০০৲ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। এখন হইতেই স্কুলে গো-বীজের টীকা (Vaccination) দিবার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইল।

ডাক্তার জন বৃটন (Dr. John Breton) সাহেব ইংরাজী, পারসী ও হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ছাত্রগণকে সুশিক্ষিত

ডাক্তার টাইটলার।

করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেন। তিনি শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত স্কুলে অনন্ত পরিশ্রম করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। বাটীতেও তাঁহার পরিশ্রমের সীমা ছিল না। তিনি ছাত্রগণের উপকারের নিমিত্ত ইংরাজীতে গ্রন্থ লিখিয়া পারসী ও হিন্দী ভাষায় তাহার অনুবাদ করিতেন। এই অসীম মানসিক পরিশ্রমের জন্য ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে ৪৪ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।(১)

---

(১) দক্ষিণ-পার্ক-ষ্ট্রীট সিমেটারীতে (South Park Street Cemetery তে) তাঁহার কবরের উপরিভাগে এইরূপ লিখিত আছে:—

Sacred to the Memory of John Breton who departed this life on the 10th of September, 1828, aged 44 years.

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে, ১৯ নভেম্বর তারিখে 'মেডিক্যাল বোর্ড' (Medical Board) গভর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, ডাক্তার জন বৃটনের (Dr. John Breton এর) মৃত্যু হইয়াছে। তখন গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার জন টাইট্‌লারকে (Dr. John Tytler কে) তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার টাইট্‌লারের মাসিক বেতন ১২০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। এতদ্ভিন্ন তিনি ডাক্তার বৃটনের ন্যায় বাড়ী-ভাড়াও পাইতে লাগিলেন। ডাক্তার জেমিসন (Dr. Jameson) ও ডাক্তার বৃটনের (Dr. Breton এর) ন্যায় ডাক্তার টাইট্‌লার একাকীই চিকিৎসা-বিদ্যা-সম্পর্কীয় সমস্ত শাস্ত্রই পড়াইতেন।

ডাক্তার বৃটন যে প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতেন, ডাক্তার টাইট্‌লারও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। বৃটন কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছিলেন; টাইট্‌লারও আর কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া তাহার সংখ্যাবৃদ্ধি করিলেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'নেটিভ্ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন্' (Native Medical Institution) হইতে যতজন নেটিভ্ ডাক্তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১৮২৫	৮ জন
১৮২৬	৪ "
১৮২৭	৭ "
১৮২৮	২২ "
১৮২৯	১০ "
১৮৩০	১০ "
১৮৩১	২০ "
১৮৩২	১৯ "
১৮৩৩	১৫ "
১৮৩৪	৩২ "
১৮৩৫	১৯ "
১৮৩৬	২৫ "
১৮৩৭	১৩ "
	২০৪ জন

'জেনারল কমিটী অফ্ পাবলিক্ ইন্‌ষ্ট্রাক্সন' (General Committee of Public Instruction) ডাক্তার টাইট্‌লারকে পত্র লিখিলেন, "আপনার স্কুলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ-বার্ষিক ছাত্রগণ কি কি পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে, এবং আপনি কিভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেন, তাহা সবিস্তর লিখিয়া পাঠাইবেন।" তদনুসারে ডাক্তার টাইট্‌লার লিখিলেন:—

"ছাত্রগণ ৩ বৎসর মাত্র স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। এই অল্প সময়ের মধ্যে কোন্ বৎসর কোন্ গ্রন্থ পড়িবে, তাহা নিরূপণ করিয়া দেওয়া অসম্ভব। 'মেডিক্যাল বোর্ড' (Medical Board) ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিবার সময় যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, আমি সেই সকল প্রশ্নেরই উত্তর শিখাইয়া দিই। ছাত্রগণও তাহা যত্ন-পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিয়া থাকি। যথাযোগ্য যন্ত্রাদি না থাকায় আমাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। চতুর্থ শ্রেণীর অর্থাৎ সর্ব্ব-নিম্ন ক্লাসের ছাত্রগণ প্রথমতঃ শারীর-স্থান-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থগুলি (Anatomical books) পাঠ করিতে শিখে এবং এই সকল গ্রন্থের কোথায় কি আছে, তাহাও মোটামুটি বলিয়া দিই। আমি স্বয়ং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'এনাটমিক্যাল পুস্তক' (Anatomical books) লিখিয়া রাখিয়াছি। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই সকল পুস্তকেরও সারাংশ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিই। ভেড়ার দেহে খুব মোটা মোটা মাসল্‌স্ (Muscles) আছে বলিয়া তাহা চিরিয়া ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিয়া থাকি। ল্যাটিন-ভাষায় লিখিত 'লণ্ডন ফার্‌মাকোপিয়ার' (London Pharmacopœia র) যে হিন্দী-ভাষায় অনুবাদ আছে, তাহা আমি তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণকে পড়াইয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন ঔষধ-শিক্ষা সম্বন্ধে ডাক্তার র‍্যাম্‌সে (Dr. Ramsay)-রচিত যে গ্রন্থ আছে, তাহাও ছাত্রগণ আমার নিকটে পাঠ করিয়া থাকে। আমি রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) সম্বন্ধে যে একখানি গ্রন্থ স্বয়ং লিখিয়া রাখিয়াছি, তাহারও সারাংশ দ্বিতীয়-বার্ষিক ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিয়া থাকি। ঔষধ-শিক্ষা সম্বন্ধে যে কয়েকখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাও তাহারা আমার নিকটে পড়িয়া থাকে। প্রথম-

বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণকে অস্ত্রবিদ্যা (Surgery) শিক্ষা দিই। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ যে যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছে, সেই সেই বিষয়ে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি। 'মেডিক্যাল বোর্ড' (Medical Board) যে সকল প্রশ্ন দেন, আমি প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহার উত্তর বলিয়া দিই। চতুর্থ-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ ধর্ম্মতলায় 'নেটিভ হাসপাতালে' (Native Hospital এ) গিয়া শিক্ষালাভ করে। তৃতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ 'কোম্পানীর ডিস্‌পেন্‌সারীতে' (The Honourable Company's Dispensary তে) গিয়া অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া আসে। দ্বিতীয়-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ কলিঙ্গা ও গরাণহাটার ডিস্‌পেন্‌সারীতে গিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। প্রথম-বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ ভবানীপুরে 'জেনারল হাসপাতালে' (General Hospital এ) চক্ষুরোগ-চিকিৎসালয়ে (Eye Infirmary তে) এবং টীকা দিবার বাটীতে (Vaccination House এ) গিয়া নানা বিষয়ে কৃতবিদ্য হইয়া আসে।"

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এ দেশীয় লোকদিগের চিকিৎসার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল, তাহা নিম্ন-লিখিত অংশটুকু পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে, ৪ জুন তারিখের "সমাচার-দর্পণে" ও তাৎকালিক "সমাচার-চন্দ্রিকায়" লিখিত হইয়াছে :—

"নেটিভ্ হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয়। এ বিস্তৃত মহানগর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গালিটোলায় হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান নাই এই মহানগর মধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়া হইতে মুক্ত হইবার কোন সাধারণ স্থান নাই। ঐ সকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্য উপায় অভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং বিষয় সত্ত্বেও অনেক লোক ঔষধ পায় না। চাঁদনি চকে যে হাসপাতাল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালিটোলা হইতে অনেক দূর আর যে প্রকার শহরের ও লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে একটী হাসপাতালে সুন্দররূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হওয়া ভার।

এই বিবেচনা পুরঃসরে কতকগুলিন মহানুভব মহাশয়েরা আর দুইটা নেটিভ হাসপাতাল ও এক ঔষধের দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা কলুটোলায় সুরতীর বাগানে সংস্থাপিত হইবেক দ্বিতীয় শোভাবাজারে স্থাপিত করিবেন সেইং স্থানে দেশি ও বিলাতি নানাপ্রকার বহুবিধ রোগের ঔষধ পাওয়া যাইবেক রোগি ব্যক্তিরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবেক।"

১৮২৬ সালের "সমাচার-চন্দ্রিকায়" দেখিতে পাওয়া যায় :—

"চিকিৎসালয়। আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নেটিভ হাসপাতালের অর্থাৎ চিকিৎসালয়ের কর্ত্তারা গভর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় দীন দুঃখি পীড়িত লোকেদের চিকিৎসার্থে দুই চিকিৎসালয় নিরূপিত করিয়াছেন বিশেষতঃ কলিকাতার গরাণহাটার নং ৩২৭ বাটীতে এক ও চৌরঙ্গির পার্ক ষ্ট্রীটে নং ১০ বাটীতে এক। এই নিরূপিত স্থানেতে ১ আশ্বিন তারিখ অবধি পীড়িত লোক গতমাত্র ঔষধ পাইবেক।"

চুঁচুড়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার (১) মহাশয় তৎকালে রোগগ্রস্ত দরিদ্রদিগের অশেষ দুর্গতি দেখিয়া বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের "সমাচার চন্দ্রিকায়" লিখিত হইয়াছিল :—

"ঔষধ দান। শুনিলাম শহর চুঁচুড়া নিবাসি দিগ্বিজয়ীভাগি শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় বহুতর ধন ব্যয় পূর্ব্বক নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দীন দরিদ্র দ্রবিণহীন রোগিদিগকে ঐ ভেষজ দান দ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন বিশেষ শুনিলাম ধনবান অর্থাৎ যাহারা ধন ব্যয় দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে দেন না কিন্তু কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায় তাবৎকেই দিয়া থাকেন ইহাতে অবারিতদ্বার এই সংবাদ শ্রবণে আমরা আনন্দমনে প্রকাশ করিতেছি যেহেতুক ইহাতে পাঠকবর্গের অবশ্যই সন্তোষ জন্মিবেক এবং সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে দুঃখিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের মহোপকার হইবেক হালদার বাবু ধন ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন রোগি ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইতেছে আরোগির ইহাতে কোন লজ্জা নাই। কিন্তু এমনি সৎকর্ম্মের ধর্ম্ম এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন। আর অসৎ কর্ম্মের এমনি জানিবেন যে করে তাহার পাপভোগী সেই হয় তাহারি ধনক্ষয় হয় তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই তাবতেই কহে নরাধম অধঃপাতে যাউক অতএব প্রার্থনা পরমেশ্বর সকলকেই সৎকর্ম্মে মতি দিউন।" (২)

(১) প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় সেকালের একজন প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ও মুক্তহস্ত লোক ছিলেন। কোন বিশেষ অপরাধে তাঁহাকে দ্বীপান্তর বাস করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান হুগলী কলেজের বৃহৎ বাড়ীখানি তাঁহার নাচ ঘর ছিল। দ্বীপান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা-বাগবাজারে কিছুদিন বাস করিয়া দেহত্যাগ করেন। এখনও বাগবাজারে তাঁহার দুইটী সাক্ষাৎ বংশধর বিদ্যমান রহিয়াছেন।—লেখক

(২) শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা উক্ত নমুনা হইতেই পাঠক-মহাশয়-গণ বুঝিয়া লউন।—লেখক

"সংস্কৃত-কলেজে মেডিক্যাল ক্লাস"
(Medical Class in the Sanskrit College)

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, ১ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার (১২৩০ বঙ্গাব্দে, ১৮ পৌষ) দিবসে "কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজ" সংস্থাপিত হয়। তৎকালে সংস্কৃত-কলেজের বাটী নির্ম্মিত না হওয়ায় বৌবাজারের চৌরাস্তার বামপার্শ্বে ৬৬নং বাড়ী ভাড়া করা হয়, এবং এই বাড়ীতেই "সংস্কৃত-কলেজ" বসে। কলেজ স্থাপিত হইবার কিঞ্চিৎ পরেই অর্থাৎ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, ২৫ফেব্রুয়ারি, বুধবার (১২৩০ বঙ্গাব্দে, ১৪ ফাল্গুন) তারিখে বর্ত্তমান "সংস্কৃত-কলেজের" বাড়ীর ভিত্তি-স্থাপন করা হয়। বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইতে প্রায় দুই বৎসর দুই মাস লাগিয়াছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, ১মে, সোমবার (১২৩৩ বঙ্গাব্দে, ২০ বৈশাখ) দিবসে "সংস্কৃত-কলেজ" বৌবাজার হইতে পটোলডাঙ্গার বর্ত্তমান বাড়ীতে উঠিয়া আসে। ঠিক এই দিনেই হিন্দু-কলেজ টিরেটা-বাজার হইতে সংস্কৃত-কলেজের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছিল।(১) "সংস্কৃত-কলেজ কমিটী" (Sanskrit College Committee)-নামক একটী সভা গঠিত হইল। কাপ্তেন প্রাইস (Captain Price)-নামক একজন সৈনিক পুরুষ এই কলেজের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট (Superintendent) হইলেন। ডাক্তার হোরেস হেম্যান্ ইউলসন (Dr. Horace Hayman Wilson) এই সভার সভাপতি হইলেন। আরও কয়েকজন সাহেব ইহার সদস্য রহিলেন। রামকমল সেন খাতাঞ্চী হইলেন। প্রথমতঃ ৫০ জন ব্রাহ্মণ-ছাত্র ভর্ত্তি হইয়া বাসা-খরচ স্বরূপ ৫৲ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি পাইতে লাগিলেন।(২) এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ব্রাহ্মণ-ছাত্র ভর্ত্তি হইতে আসিলেন। তাঁহারা বৃত্তি না পাইয়া বিনা বেতনেই পড়িতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে ব্রাহ্মণ-গণের দেখাদেখি অনেকগুলি বৈদ্য-ছাত্রও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও মাসিক বৃত্তি না পাইয়া বিনা বেতনেই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তখনও কায়স্থ বা অন্য জাতীয় ছাত্রকে সংস্কৃত-কলেজে ভর্ত্তি করা হয় নাই।

বৈদ্য-ছাত্রগণ, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে 'জেনারল কমিটী অফ্ পাব-

(১) যে দিন সংস্কৃত-কলেজ বৌবাজার হইতে বর্ত্তমান পটোলডাঙ্গার বাড়ীতে উঠিয়া আসে, ঠিক সেই দিনেই হিন্দু-কলেজ টিরেটা (ট্রেটি) বাজার হইতে উঠিয়া আসিয়া সংস্কৃত-কলেজের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হয়। এখন যেখানে 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী' আছে, সেই খানেই গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ী ছিল। প্রথমতঃ এই স্থানেই হিন্দু কলেজ বসে। দ্বিতীয়তঃ ইহা চিৎপুর-রোডের পার্শ্বস্থিত রূপচাঁদ রায়ের বাটীতে অবস্থিত হয়। তৃতীয়তঃ, ইহা ফিরিঙ্গী কমল বোসের বাটীতে গিয়া আশ্রয় লয়। চতুর্থতঃ, বৌবাজারে কোন এক গৃহস্থের বাটীতে ইহার অধিষ্ঠান হয়। পঞ্চমতঃ টিরেটা (ট্রেটি) বাজারে একখানি বাটীতেও ইহাকে কিছুদিন আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। ষষ্ঠতঃ ইহা সেখান হইতে সংস্কৃত-কলেজের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হয়। অদ্যাবধি ইহা এই বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে, মে-মাসের প্রথম ভাগে ডিরোজিও সাহেব হিন্দু-কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার শিক্ষাদানের ফলে অনেক হিন্দু যুবক-ছাত্র কুখাদ্য-ভক্ষণ, নিষ্ঠাচার-বর্জ্জন ও সুরাপান দোষে লিপ্ত হওয়ায় সংস্কৃত-কলেজের কাব্যাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় নিম্ন-লিখিত শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা আমাকে দিয়াছিলেন :—

দক্ষিণারঞ্জনো রামো রসিকঃ কৃষ্ণমোহনঃ।
তারাচাঁদো রাধানাথো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ।
হরচন্দ্রো রামতনুঃ শিবচন্দ্রশ্চ মাধবঃ।
মহেশোঽমৃতলালশ্চ প্যারীচাঁদো মধুব্রতাঃ।
ফিরিঙ্গী-পুঙ্গব-শ্রীমদ্-ডিরোজিও-কুশেশয়ে।
মধুপানরতাঃ সম্যগ্ দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানবর্জ্জিতাঃ।

(জয়গোপাল তর্কালঙ্কারস্য)

ভাবার্থ। নিম্ন-লিখিত সদল-প্রধান ১৫ জন ছাত্র, ডিরোজিও রূপ পদ্ম-পুষ্পের মধুপান (মদ্যপান) করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন,—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, চন্দ্রশেখর দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র। নিষ্ঠাচার-বর্জ্জিত হইলেও ইহারা এক একটী রত্ন-স্বরূপ ছিলেন।—লেখক

(২) সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'জেনারল কমিটী অফ্ পাবলিক্ ইন্‌ষ্ট্রাক্সনের' (General Committee of Public Instruction এর) সভাপতি ছিলেন। তিনি 'সংস্কৃত-কলেজের মেডিক্যাল ক্লাসে' মাসিক বৃত্তি দেওয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"বৃত্তিদান সম্বন্ধে আমি সম্মত আছি। কেবল যে সম্মত আছি, তাহা নহে। যাহাতে বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করিব। আমার মত এই যে, অন্যান্য বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মত সংস্কৃত-কলেজে বৈদ্য-ছাত্রগণেরও বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া উচিত। যদি কেহ তাহাদের বৃত্তিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কমিটীতে কোন কিছু প্রস্তাব করে, তাহা হইলে আমি সেই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে জানাইব।" [Book H, Page 24]

লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন' (General Committee of Public Instruction) এর সভাপতি ডাক্তার হোরেস হেম্যান্ উইলসন (Dr. Horace Hayman Wilson) সাহেবের নিকটে এই মর্ম্মে দরখাস্ত করিলেন :—

"আমরা বৈদ্য-জাতি। আমাদের ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার তত প্রয়োজন নাই। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অতি প্রাচীন। ইহাতে অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে। এই সকল লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিতে পারিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হয়, এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতিরও গৌরব রক্ষা করা হয়। অতএব সংস্কৃত-কলেজে বৈদ্য-জাতির জন্য একটী 'আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষা-বিভাগ' স্থাপন করা হউক।"

ডাক্তার উইলসন্ সাহেব সংস্কৃত-ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন, বৈদ্য ছাত্রগণের আবেদন-পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যুক্তি-সঙ্গত। ডাক্তার টাইট্‌লার মহাশয়ও এদেশীয় আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসার নিরতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। উইলসন ও টাইট্‌লার উভয়ে মিলিয়া উক্ত কমিটীর অন্যান্য মেম্বরগণকে আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়া গভর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিলেন। গভর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মত হইলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত-কলেজে একটী 'আয়ুর্ব্বেদ-বিভাগ' খোলা হইল। ইহার নাম হইল, 'সংস্কৃত কলেজে মেডিক্যাল ক্লাস' (Medical class in the Sanskrit College). বাঙ্গালীর মধ্যে মহাত্মা রামকমল সেন, রাজা রাধাকান্ত দেব ও মতিলাল শীল মহাশয় উক্ত মতের পোষকতা করায় ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল।

মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার সাহেব বাঙ্গালী-গণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে 'বাঙ্গালী' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনিও আসিয়া এই দলে মিলিত হইলেন।

ক্ষুদিরাম বিশারদ(১) নামক একজন মহাপণ্ডিত কবিরাজ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকগুলি বৈদ্য-ছাত্র ভর্ত্তি হইল। তন্মধ্যে নবকৃষ্ণ গুপ্ত ও মধুসূদন গুপ্ত(২) মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। অবশিষ্ট ছাত্রগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দুইটী ছাত্রই অতীব বুদ্ধিমান্ ও সংস্কৃত-ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই নিরতিশয় মনোযোগ দিয়া ক্ষুদিরাম বিশারদের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরেই তাঁহারা চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। উভয়েই তুল্যমূল্য ছিলেন। নবকৃষ্ণের রচিত কোন গ্রন্থ আমরা পাই নাই। মধুসূদনের রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।(৩) ইহাতে বোধ হয়, মধুসূদন নবকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিদ্য ছিলেন। হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন (Horace Hayman Wilson) সাহেব ক্ষুদিরাম বিশারদকে প্রভূত সম্মান করিতেন, এবং নবকৃষ্ণ ও মধুসূদনকে নিরতিশয় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি এই ৩ জনের প্রশংসা করিয়া নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত শ্লোক দুইটী(৪) লিখিয়াছিলেন :

'আয়ুর্ব্বেদমহাব্ধিঃ শ্রীক্ষুদিরামবিশারদঃ।
গুপ্তশ্রীনবকৃষ্ণশ্চ গুপ্তশ্রীমধুসূদনঃ॥
এতৌ যৌ দৃঢ়মন্থানৌ সন্মন্দেন প্রযত্নতঃ।
প্রলভ্যাং মথ্যীতস্তং চরকাদিসুধারসম্॥
(হোরেস হেম্যান্ উইলসনস্য)

ক্ষুদিরাম বিশারদ খ্যাত ভূমণ্ডলে,
আয়ুর্ব্বেদ-মহাসিন্ধু সবে গাঁরে বলে।
নবকৃষ্ণ গুপ্ত, গুপ্ত শ্রীমধুসূদন
এ দুই মন্থন-দণ্ড দৃঢ় বিলক্ষণ
করিয়া অসীম শ্রম লভে অবশেষে
চরকাদি-সুধারস মনের হরষে।
(উদ্ভটসাগরস্য)

[ক্রমশঃ]

(১) ক্ষুদিরাম বিশারদের বিশেষ কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোথায় তাঁহার নিবাস ছিল, বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহা জানিতে পারি নাই। তবে পুরাতন কাগজ-পত্রে এই টুকু জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি যোড়াসাঁকোর "বৈদ্য-সমাজ"-নামক একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার সভাপতি হইয়া কার্য্য করিতেন।—লেখক

(২) নবকৃষ্ণ গুপ্তের কোনরূপ পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাই নাই। মধুসূদন গুপ্ত অতি পণ্ডিত, সুকবি ও বিখ্যাত লোক ছিলেন। বৈদ্যবাটী তাঁহার জন্মস্থান। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে ১৮নং বাড়ীখানি তাঁহারই অধিকার-ভুক্ত ছিল। 'মেডিকাল কলেজের' ইতিহাস লিখিবার সময় তাঁহার জীবন-চরিত দিবার সংকল্প রহিল।—লেখক

(৩) বন্ধুবর সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ মহাশয়ের নিকটে মধুসূদনের স্বহস্ত-লিখিত বিস্তর পুঁথি দেখিয়াছি।—লেখক

(৪) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে 'সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা' সংগ্রহ করিতে যাইতাম। সেই উপলক্ষে তিনি আমাকে উক্ত দুইটী সংস্কৃত শ্লোক দিয়াছিলেন। আমি ইহাদের পদ্যানুবাদ করিয়া দিলাম।—লেখক

ঢাউশ সম্পাদক

—শ্রীঅনর্গল রায়

ট্রামের জন্ম গোলদীঘির ধারে দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ দেখা জনার্দ্দনের সঙ্গে। স্কুলে এক ক্লাশে পড়িতাম, বহুকালের বন্ধু। তারপর জীবনের ঘূর্ণীচক্রে কে কোথায় ছিটকাইয়া সরিয়া পড়িয়াছি!

প্রথম বিস্ময়ের ভাব কাটিলে প্রশ্ন করিলাম—কি কাজ-কর্ম্ম করছ?

হাসি-মুখে জনার্দ্দন কহিল—কবিতা লিখি।

প্রশ্ন করিলাম,—তাতে পয়সা মেলে?

হাসিয়া জনার্দ্দন বলিল—কৌশল চাই, বুদ্ধি চাই।

আবার প্রশ্ন করিলাম—কোথায় চলেছ এখন?

জনার্দ্দন বলিল,—ঢাউশ-অফিসে।

—ঢাউশ! জনার্দ্দন কহিল,—মাসিক-পত্র। নতুন বেরিয়েছে। কবিতা লিখেছি। নিয়ে যাচ্ছি। ছাপতে দেব।

চট্ করিয়া মনে হইল, জনার্দ্দনকে ধরিয়া সম্পাদক-দর্শনে গেলে হয়।

আমি কহিলাম,—সম্পাদকটি খুব পণ্ডিত?

জনার্দ্দন কহিল—পণ্ডিত না হলে কি কেউ সম্পাদক হতে পারে? সর্ব্ব-বিদ্যায় বিশারদ না হলে সম্পাদকী করা চলে না! কত রকমের লেখা আসে…

আমি কহিলাম—তার বাছ-বিচার সত্যি চলে? আমি জানি, সম্পাদক কিম্বা কাগজের সম্পর্কিত কারো সঙ্গে আলাপ থাকলে যে-কোনো লেখা ছাপানো চলে।

জনার্দ্দন বলিল—ঢাউশ কাগজ ভয়ঙ্কর আরিষ্টোক্রেটিক। কোনো লেখা ছাপবার সময় এঁরা দুটো জিনিষে লক্ষ্য রাখেন। প্রথমে দেখেন লেখকের উপাধি; তারপর, লেখকের সঙ্গে পরিচয়-কুটুম্বিতা আছে কি না! এস না;—আলাপ করিয়ে দেব। খুব clever ভদ্রলোক।

কহিলাম—চল।

জনার্দ্দনের সঙ্গ গ্রহণ করিলাম। বালিগঞ্জের ওদিকে নতুন কলোনি গড়িয়া উঠিয়াছে—সেই দিকে। ডাহিনে বাঁয়ে অনেকগুলা মোড় ঘুরিয়া ছোট একখানি বাড়ী—সদ্য তৈয়ার হইয়াছে।

জনার্দ্দন কহিল—পৈত্রিক অর্থের কতকটা ভেঙ্গে বাড়ী করেছেন। আর বাকী টাকায় ঢাউশ-কাগজ বার করছেন। বলেন, একখানি কাগজ বার করতে পারলে দুনিয়ার বহু লোককে বশীভূত করা যায়।

আমি কহিলাম—নিজে লেখেন?

জনার্দ্দন বলিল—না। নিজে ভয়ঙ্কর পণ্ডিত লোক। বলেন,—ওঁর লেখা বোঝবার মত পাঠক বাঙলা দেশে নেই—তাই নিজে না লিখে পরের লেখা পড়ে কাটাকুটি করেন।

ঘরের মেঝেয় শতরঞ্চ পাতা। দেওয়ালের গায়ে সাঁটা একটা সেল্‌ফ। সেল্‌ফে মোটা-রোগা নানা সাইজের বাঁধানো কতকগুলা বই। শতরঞ্চের কোণে দেওয়াল ঘেঁষিয়া যেন ইটের পাঁজা; কাপিস্ত ডাঁই! বুঝিলাম, বাঙলা দেশের যত লেখক-লেখিকার মাথার ঘী কবিতা-প্রবন্ধ-গল্পের রূপে জমিয়া জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া আছে।

জনার্দ্দনকে দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় কহিলেন—এস। তারপর আমার পানে চাহিবামাত্র তাঁর দুই চোখ বিস্ময়ে কৌতূহলে একেবারে গোল!

প্রশ্ন করিলেন,—ইনি?

জনার্দ্দন কহিল—আমার বন্ধু। আপনার সঙ্গে interview করতে এসেছেন।

সম্পাদক কহিলেন—কিন্তু আমার কাগজেই সে interview ছাপানো চাই।

সবিনয়ে আমি জানাইলাম—নিশ্চয়। তার উপর আপনার স্তুতি অন্য কাগজে ছাপবে কেন?

সম্পাদক কহিলেন—বসুন।

বলিয়া নড়িয়া একটু জায়গা করিয়া দিলেন; জনার্দ্দন-সহ সতরঞ্চের একধারে আমি বসিলাম।

সম্পাদক কহিলেন—কি কথা কইতে চান্? কি সম্বন্ধে?

কহিলাম—আপনার 'ঢাউশ'-পত্রখানি মাসের পয়লা তারিখেই বাহির হয় তো? ঘড়ির কাঁটার মত চলে?

সম্পাদক কহিলেন—হ্যাঁ।

—এত লেখা নিজেই দেখে বেছে নেন? না, আপনার সহঃ-সম্পাদক আছেন?

সম্পাদক কহিলেন—আমি একাই একশো জনের মহড়া নি। আমার সহঃ বা দুঃসহ কোনো রকম সম্পাদকই নেই।

বিস্মিত হইলাম। কাগজখানি সার্থক-নামা। আকারে ঢাউশই! সে সংবাদ বাঙালী কাহারো অবিদিত নাই।

কহিলাম—প্রতিমাসে যে এই সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি—নানা বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হয়, এ সব আপনারই লেখা তো?

—নিশ্চয়।

বিস্ময়ে আমার বাক্য স্তম্ভিত, রুদ্ধ হইল। সম্পাদক আমার পানে চাহিলেন, কহিলেন—কি ভাবছেন?

কহিলাম,—এত জ্ঞান, এমন পাণ্ডিত্য, এ সব একজন্মেই আপনি আয়ত্ত করেছেন?

সম্পাদক হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—পড়াশুনা আমার ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্য্যন্ত। টেষ্টে গোলোযোগ বাধল। আমি টাকা জমা দিয়ে এগজামিন দিতে যাব, হেডমাষ্টার বললে, না, তোমায় যেতে দেব না। আমার রাগ হ'ল। এ কি জুলুম!—দিলুম স্কুল ছেড়ে। তখনি বুঝলুম, আমার mission আছে, higher mission. শেখা নয়, লোককে শেখানো! Edification of a nation.

প্রশ্ন করিলাম,—নিজে আগে লিখতেন? গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা?

সম্পাদক কহিলেন—না। বাবার একটা দোকান ছিল। কয়লার দোকান। বাবা সেই দোকানে আমায় বসালেন। ভালো লাগল না। কালো কয়লা ঘাঁটব জীবনে? তার চেয়ে কালো কালি আছে, সে কি দোষ করেছে! এমনি যখন মনের ভাব, বাবা মারা গেলেন—আমি কয়লার দোকান বেচে 'ঢাউশ' কাগজ বার করলুম।

জনার্দ্দন কহিল,—From Log Cabin to White House!

হাসিয়া সম্পাদক কহিলেন,—তাই। মানে, আমার সম্পাদকীর প্রথম training কয়লার দোকানে। যত খদ্দের, দালাল, মুটে, গাড়োয়ান নিয়ে ছিল কারবার।

আমি কহিলাম,—সম্পাদকীর কর্ত্তব্যের সব-চেয়ে ভারী কাজ হ'ল এই প্রবন্ধ, কবিতার নির্ব্বাচন। যা-তা লেখা কত আসে, সব তো পড়তে হয়?

সম্পাদক কহিবেন—পাগল! অত পড়ে সম্পাদকী করতে গেলে কাগজের গ্রাহক জুটবে না। আমার প্রিন্সিপল্ হলো, যার লেখা হাতের কাছে পাব, তার লেখা ছাপিয়ে কাগজ ভরাট করব। তবে হ্যাঁ, দলের লোক হওয়া চাই।

সবিস্ময়ে কহিলাম,—বলেন কি? এই স্বার্থের যুগে এমন পরার্থপরতা!

সম্পাদক কহিলেন—পরার্থপরতা!

জবাব দিলাম,—নয়? মনে করুন, মনসা চক্রবর্ত্তী গা-খুশী তাই লেখে এবং ধরুন, সে মন্দ লেখে না! আমি একখানা কাগজের সম্পাদকতা করি; আমার কাগজে তার লেখা ছাপিয়ে তার নাম কেন আমি রটাব? সে জন্য সে আমায় আমায় কি দাম দেবে? তাই আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়, লেখকের দল লেখা ছাপাবার জন্য কোন্ মুখে পয়সা চায়? চাইলে বেকুব সম্পাদকের দল সে পয়সা তাদের কেন দেয়? তাদের লেখা ছাপলে তারাই কৃতার্থ হবে—সম্পাদক কৃতার্থ হবে না।

সম্পাদক কহিলেন—ও বাঁদরামিতে আমি নেই কোন দিন। যদি বল, যাদের লেখা ভাল, যাদের লেখা আগ্রহ করে পাঠক পড়তে চায়, তাদের লেখার জন্য দাম না দিলে তারা লেখা দেবে না; আমার কাগজ গ্রাহকের অভাবে চলবে না—তাহলে আমার জবাব···

সাগ্রহে কহিলাম,—বলুন তো কি তার জবাব?

সম্পাদক কহিলেন—জবাব,—গ্রাহক হয়ো না। সত্যি যদি তেমন সমঝদার গ্রাহক থাকে তো তার সংখ্যা কত? হাজারে একটা! হুঁঃ, ও আমার ঢের দেখা আছে! এ জগতে হাজার-করা একজন শুধু বুদ্ধিমান আর বাকী ৯৯৯ জন ঢেঁকিকুমড়ো গোবর গণেশ! এই ৯৯৯ জন লোক ছাপার অক্ষরে যা দেখে, তাই পরম পদার্থ বলে বুকে ধরে, মাথায় তোলে! না হলে আজগুবি বাজে লেখা লিখে

তোমাদের কাণাকড়ি বাবু, তোমাদের ঐ স্তুঁড়েশ নাট্যকার, ঐ শ্রীমতী জগদম্বা দেবী এত পয়সা করতে পারত না! যে মাসিক কাগজ যা-তা লেখায় মাসে-মাসে কাগজ ভর্ত্তি করতে পারে, সেই মাসিক কাগজের গ্রাহক হয় হাজার-হাজার! বোকা চামুণ্ডীদের নিয়েই মাসিকের কারবার!* তার উপর এতে লাভ আছে। সে লাভঃ—ধরুন, বিরূপাক্ষ সান্যাল যা-তা লিখে আমার কাগজে পাঠালো তা ছাপাবার জন্য; সে লেখা যদি আমি ছাপি, তাহলে বিরূপাক্ষ সান্যাল প্রেম-প্রীতি-কৃতজ্ঞতা-বশে আমার কাগজের গ্রাহক হবেন, নিশ্চয়। তার উপর তার শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কীয় এবং অন্য আত্মীয়-বন্ধুদের ধরে কম্‌সে-কম্ বিশ-বাইশটা গ্রাহক করে দেবে! এবং বিচক্ষণতা জানিয়ে যদি বেছে লেখা ছাপি, তাহলে বিরূপাক্ষ হবে এক-নম্বর দুশমন—নিজে কস্মিনকালে আমার কাগজের গ্রাহক হবে না; তার উপর তার জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়-বন্ধুর কাণে আমাদের নিন্দা করে করে আমার কাগজের গ্রাহক হতে দেবে না। গ্রাহক থাকলে সে-তালিকা থেকে তাঁদের নাম খারিজ করাবার ব্রত গ্রহণ করবে! অতএব কাজ কি শত্রু সৃষ্টি করে? দুটো পয়সা রোজগার করা নিয়ে আমার কাজ! সে কাজে কেন বাদ সাধি?

সাগ্রহে সোৎসাহে আমি কহিলাম,—সাহিত্য?

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া সম্পাদক কহিলেন,—সাহিত্য না ছাইভস্ম! কার কলমের খোঁচায় সাহিত্য কবে স্বর্গে উঠেছে হাউইয়ের মত? না, মাটীর নীচে নেমেছে কেঁচোর মত? এ-সবের সন্ধানে আমার লাভ! ও-সব বেকুবিতে পয়সা হয় না, বাপু! মাসিক কাগজ বার করা কিসের জন্য? দুটো পয়সা রোজগার করতে চাই! সেই সঙ্গে সমাজে খাতির হয়, ইজ্জৎ বাড়ে, ব্যস! সাহিত্য? সাহিত্যের উন্নতি, সাহিত্য-সাধনা এই যে কথাগুলো শোনো, ও হচ্ছে ধাপ্পা! সাহিত্য স্রেফ বেসাতির বস্তু! ঘী, ময়দা, তেল, কয়লা, কাঠের মত!

নব-তত্ত্ব-কথায় শুধু চমৎকৃত নয়—বিস্ময়ে বিমূঢ় হইলাম।

সবিনয়ে জনাৰ্দ্দন কহিল,—আমি কবিতা এনেছি।

সম্পাদক কহিলেন—ছাপাখানা থেকে কাপি নেবার জন্য লোক আসবার কথা আছে। বস। সে এলে তার হাতে দিয়ো।

আমার মুখে আবার কথা জোগাইল। কহিলাম,—কি কবিতা—পড়ে দেখবেন না?

সম্পাদক কহিলেন—প্রয়োজন নেই। মাসিক কাগজ বার করতে গেলে যা-যা জিনিষের দরকার, কবিতা তার অন্যতম! অতএব কবিতা চাই! তাছাড়া কবিতার আবার ভালো-মন্দ আছে না কি? সে খোঁজ কে রাখে? কোনো মতে একটু দোলো-দোলো ভাব! নয়তো রুদ্রাক্ষ-মূর্ত্তি হলেই হলো—শুধু ছাপবার সময় দুদিকে মার্জ্জিন বাদ রাখার দরকার! এই যে এ-মাসের কাগজে একটা কবিতা ছাপা হয়েছে,—

এই অবধি বলিয়া পাশ হইতে একখানা ঢাউশ তুলিয়া সম্পাদক তার পাতা খুলিয়া পড়িলেন,—

চাল্‌তা তলায় তল্‌তা বাঁশে বাধবো ঘর,
পল্‌তা পাতায় ছাইবো মাথা ততঃপর!
আল্‌তা-রাঙা আল্‌তো পায়ে আসবে সই—
বাঁখারি চিরে মাথার কিরে গড়বো মই!

—দেখে ছাপাই নি; তবু পাঠক-মহলে ধন্য-ধন্য রব পড়ে গেছে।

কুণ্ঠিত স্বরে কহিলাম,—একটা কিছু মানে থাকা চাইতো!

সম্পাদক বলিলেন—মানে? মানে থাকে ফার্ষ্ট বুকের; মানে থাকে বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরীর। মাসিকপত্রের কবিতার আবার মানে কি? দাম তো দেবে আট আনা মাত্র—তার বদলে গন্ধমাদনের মত বিরাট কাগজ নিয়ে যাবে। ওজন কত? পাল্লা ধরে কখনো দেখেছ?

জনার্দ্দন বলিল—তাছাড়া কবিতার এখন ঢের উন্নতি হয়েছে। ছন্দ মিল এগুলোয় আর কবিতার আসন নয়, প্রাণ নয়। ওগুলো বর্জ্জন করলে কবিতার কোনো অঙ্গ-হানি হয় না। কবিতার প্রাণ হলো প্রাণের অকপট প্রকাশ। অর্থাৎ আমি যদি লিখি—

ইচ্ছা হচ্ছে খাই আমি গরম কাটলেট্—
পাবো কোথায়? কাজেই হায় খেলেম চানাচুর।

তাহলে এ লেখা হবে কবিতা! কেন না, এতে অন্তরের সত্য সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে।

---

* সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকা যেন এ কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। এ-মত আমাদের মত নয়; ঢাউশ সম্পাদকের। এ মতের সমর্থন আমরা আদৌ করি না।—বঙ্গশ্রী-সম্পাদক।

সম্পাদক বলিলেন—এই কবিতা তুমি এ-মাসে ছাপতে দিচ্ছ?

জনার্দন কহিল—আজ্ঞে না। এবারে লিখেছি…এই দেখুন না।

জনার্দন কবিতা পড়িল—

'মস্তিষ্ক উৎক্ষাটিয়া নির্গতিয়া আসে যথা অশ্ব—
ধরণী হিরণ্যদ্যুতি হলো হতে প্রলয়-জলধি-ভাসা মৎস্য!

বাধা দিয়া আমি কহিলাম—এর মানে কি?

সম্পাদক কহিলেন—স্কুলপাঠ্য কবিতা-গ্রন্থেই কবিতার মানের দরকার হয়। যে সব কবিতায় higher thoughts, তার মানে দরকার নেই। সে-সব কবিতা শুধু চক্ষু মুদে বুঝতে হয়। এই কবিতাটি পড়ে চক্ষু মুদে বসে শুধু উপলব্ধি কর অকপট প্রাণের প্রকাশ! কথাগুলো কাণে ঝঙ্কার দিয়ে গেল—ব্যস, তাতেই ওর জ্ঞান!

আমি অবাক! জনার্দন বলিল,—তারপরে শোন,

ট্রেণ চলে চলে…চলে চলে—
বাস যায়…ট্রাম যায়…যায় যায়;
তাতে যায় শীর্ণা তম্বী শ্যামা কিশোরিকা;
তাতে যাই আমি—নাহি চেনাশোনা—
হয়তো নামিবে কেহ দূরে, কেহ কাছে;
চোখে চোখে দেখা—তবু প্রাণ খুশী হয়—
কাছে আছে, পাশে আছে ভেবে!

—পড়তে পড়তে মন উদাস হয়ে ওঠে। মনে হয়, আহা! আহা! ট্রেন, বাস, ট্রামগুলো যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি! তাতে রাশ-রাশ কিশোরিকা বোঝাই হয়ে চলেছে।

আমি কহিলাম—'কিশোরী' কথাই জানি। তাতে 'কা' জুড়ে 'কিশোরিকা' করেছ কেন?

জনার্দন কহিল—মিষ্টি হয়। তাছাড়া মামুলি হবে না। নূতনত্বই প্রাণ!…এই নূতন নূতন কথা হ'ল এ যুগের কবিতার ট্রেড-মার্ক। আগাগোড়া suggestion চলবে। এই গুলোতেই বুঝতে হবে, এ কবি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন—ইনি গতানুগতিক চালে চলেন না! বহু কসরতিতে এ রীতি অভ্যাস করতে হয়েছে। এইখানেই এ যুগের মৌলিকতা! এগুলো মানে, মানে—

জনার্দনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে এক ছোকরা-চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, একজন লোক আসিয়াছে—দেখা করিতে চায়।

সম্পাদক কহিলেন,—ভদ্রলোক? না, লেখক?

আমি বিস্মিত হইলাম। লেখক কি ভদ্রলোকের categoryর বাহিরে?

সম্পাদক আমার অন্তরের কথা বুঝিলেন, বুঝিয়া কহিলেন,—আমাদের কাছে অপরিচিত ব্যক্তিমাত্রই দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর লোক হ'ল ভদ্র; আর বাকী ঐ লেখক!

কহিলাম—পাওনাদাররা?

সম্পাদক কহিলেন—তারা চামার। এ দুটো ক্লাসের বাইরে তাদের স্থান। তারা ছোটলোক, ইতর, চামার!

আমি কহিলাম—কিন্তু ইতর চামারকে এখন জাতে তোলবার চেষ্টা চলেছে!

খুব রসিকতা করিয়াছি ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া হাসিলাম।

সম্পাদক কহিলেন—তারা হরিজন। পাওনাদার ছোট-লোকদের জাতে তোলবার প্রস্তাব মহাত্মাও আজ পর্য্যন্ত তোলেন নি! তুললে তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে কথা যাক!

তিনি চাকরের দিকে চাহিলেন, কহিলেন,—কি মনে হয়? কি রকম লোক?

চাকর কহিল—ভদ্দর নোক নয়—ঐ নিখিয়ে নোক। হাতে কাগজের বাণ্ডিল আছে।

আদেশ হইল—আচ্ছা, নিয়ে আয়।

উদ্‌গ্রীব রহিলাম। আগন্তুকের প্রবেশ ঘটিল—যেন থিয়েটারের সেই সাজা জরা-মূর্ত্তি!

সম্পাদক কহিলেন—কি চাই?

সভয়ে সঙ্কোচে লোকটি কহিল—একটা গল্প এনেছি।

সম্পাদক কহিলেন—ক'পাতা গল্প?

—আজ্ঞে, কুড়িখানা শ্লিপ আছে।

সম্পাদক কহিলেন—গল্পের মধ্যে পরের স্ত্রীকে নিয়ে নাচন-মাতন আছে? গবেট-গোবেচারা স্বামী আছে?

সে কহিল—আছে।

সম্পাদক কহিল—তুমি চাউশের গ্রাহক?

সে কহিল—হাঁ।

সম্পাদক কহিলেন—বেশ! দেখি।

কাগজের তাড়া সে সম্পাদকের হাতে দিল। সম্পাদক ফ্যাঁশ করিয়া মাঝখানকার প্রায় ষোলখানা পাতা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কহিলেন—এটা এই মাসে যাবে।

সে কহিল,—কিন্তু ওর সবটাই যে বাদ গেল!

সম্পাদক কহিলেন—গোড়াটুকু আর শেষটুকু থাকলেই হ'ল। মাঝখানে যেই হারানো? বুঝা যাবে না? হুঁঃ, এইটেই হ'ল আজকালকার লেখার ষ্টাইল। তা ছাড়া এত বড় লেখায় বেশী জায়গা জোড়া—সে ভারী bad policy. বহু লেখা ছাপাতে পারলে বহুকে তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব।

লেখকটির পানে সম্পাদক চাহিলেন, কহিলেন,—গল্পটির কি নাম দিয়েছেন?

লেখক কহিল,—'পদ্মকাঁটা।'

সম্পাদক কহিলেন—ও-নাম চলবে না। ও নাম কেটে নাম দিন, 'যাচ্ছেতাই!'

আমি হাসিলাম, হাসিয়া কহিলাম,—ত্রিকালজ্ঞ না হলে সম্পাদক হওয়া যায় না, দেখছি।

সম্পাদক কহিলেন,—তা নয়। সম্পাদক হলে ত্রিকালজ্ঞতা আপনা হতে জন্মায়।

বটে!

আমি প্রশ্ন করিলাম,—মাসিক কাগজ বার করেছেন—আচ্ছা, ঐ যে কতকগুলো গবেষণাত্মক প্রবন্ধ ছাপেন—সে-গুলো ছাপবার উদ্দেশ্য?

সম্পাদক কহিলেন—মাসিক কাগজ মানে পাঁচ ফুলের সাজি! সব চাই। সাড়ে বত্রিশভাজার চাহিদা শতকরা ৯৯ জনের। এ-সব গবেষণাত্মক প্রবন্ধ না দিলে কাগজের গাম্ভীর্য্য থাকে না, dignity থাকে না।

আমি কহিলাম—কিন্তু কিছু বুঝতে পারা যায় না। বাঙলা কথা, বাঙলা ভাষা—অথচ এমন দুর্ব্বোধ!

সম্পাদক কহিলেন—ঐ দুর্ব্বোধ্যতাতেই ওদের দাম। লেখা যেটা যত বুঝা যাবে না, বুঝবে, সে লেখা তত উঁচু ধরণের! আমার প্রিন্সিপ্‌ল্ হচ্ছে—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা সহজ আর সুবোধ্য হলে ছাপব না। সহজ লেখা যে পড়তে চায়, সে পড়ুক কথামালা, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ; আমি ছাপি সেই লেখা—যে-লেখায় লেখক নিজেকে শুধু জাহির করেন। এই জাহিরী লেখাই সেরা লেখা—শুধু 'আমি' আর 'আমি'! সেক্সপীয়রের নাম কর, ওয়েল্‌সের নাম কর, ফ্রয়েডের নাম কর, আলডুশ হাক্স্‌লির নাম কর, জোলার নাম কর—এ সব নামের মধ্যে মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ো শুধু 'আমি' আর 'আমি'! এ লেখা হ'ল একেবারে ফরাশী-চারী ষ্টাইল—super excellent. এ-সব হ'ল higher studies. Intellectual masters যাঁরা, তাঁদের চিন্তা, তাঁদের ভাবধারা ঝুনো নারকোলের খোলের মত হবে। তাতে কামড় বসাবার সাধ্য কারো থাকবে না!

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া সবিনয়ে আবার কহিলাম—সাহিত্যে যাঁরা রথী, মহা-রথী—তাঁদের লেখা ছাপেন না কেন?

সম্পাদক কহিলেন—একটা গল্প বলি, শোন। বিশ বৎসর বয়সে এক বড়লোক জমীদার-নন্দন গ্রাম ছেড়ে এল কলকাতা সহরে! এসে শুনতে পেলে, বনেদী বড়মানুষীর সর্ব্বপ্রথম পরিচয়—গণিকা-পালন! সে এসে শুনল, গণিকা-কুলে মতিবাই সবার সেরা। মতিবাইয়ের বয়স তখন পচাশী বৎসর। জমীদার-নন্দন মাসিক হাজার টাকা ভাতায় মতিবাইকে পালন করতে লাগলেন! বয়সে মতিবাই তার পিতামহী-তস্য-পিতামহী-তুল্যা হওয়া সত্ত্বেও! কারণ, ঐ মতিবাইয়ের দৌলতে লোকে তাকে চিনতে পারবে!

সম্পাদক হাসিতে লাগিলেন।

জনার্দ্দন বলিল—গল্পের মর্ম্মটুকু যদি আর একটু খোলশা করে বুঝিয়ে দেন...

সম্পাদক কহিলেন—বুঝলে না?...মানে, রথী, মহারথী-দের রচনার জন্য পাঁচশো, সাতশো, হাজার টাকা দাম দিতে হবে। তাঁদের খাই বিশ্ব-খাকী! এ দাম দিয়ে লেখা ছাপলুম—লোকে বললে, ওঃ, মহারথীকে অনেক টাকা দিয়ে আটকে ফেলেছে! কিন্তু জিনিষ যা পাবে, তা সেই মামুলি গোছ! লোকে মামুলি কোনো-কিছু চায় না মামুলি বস্তু মাত্রই বিশ্রী একঘেয়ে! মামুলি ঘর-বাড়ী, স্ত্রী, গাড়ী-ঘোড়া, খাদ্য—কোনটাই রুচিকর নয়। নিত্য মুখ বদলানোর দিকেই মানুষের স্বাভাবিক টান।

কথাটা জলের মত সাফ হইয়া গেল।

আবার প্রশ্ন তুলিলাম,—আপনি তো বহু সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব করে বেড়ান। সাহিত্য-সভা, নাট্য-পরিষদ,

লাইব্রেরী, ক্রিকেট ক্লাব,—সর্ব্বঘটে আপনাকে বিরাজমান দেখি। বক্তৃতার এত কথা আপনি পান কোথা থেকে? তাতে রীতিমত পরিশ্রম আছে।

হাসিয়া সম্পাদক কহিলেন—মোটে নয়! ওর বাঁধি গৎ আছে। প্রথমেই বলি—'আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে আজ সভাপতিত্বে ডেকেছেন। আমি অযোগ্য হলেও আপনাদের স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা আমায় গৌরবান্বিত করেছে!' এই কথা নিয়ে খানিকটা খচ-খচ করি। তারপর ক্লাবের সকলকে অজস্র সুখ্যাতি করি; বলি—"এঁরা দেশের গৌরব, এঁরা দেশের মুকুটমণি।" বাস! তাতে তারা জব হয়ে যায়! তারপর দু-চারটে ভূমা, সং বৈ, সহজিয়া, বেদান্ত, শ্রীদ্যুতি কথার ঘন-ঘটা বাধিয়ে তুলি। সে সব কথার মানে তারা যত বুঝে না, তত মুখ ব্যাদান করে থাকে! অর্থাৎ সম্পাদকী বল, সভাপতিত্ব বল, পাণ্ডাগিরি বল—এ-সবের সেরা মন্ত্র হচ্ছে—দুনিয়াকে হাঁদা বুঝে স-জোরে সদর্পে যা খুশী বলে যাওয়া মহাবিজ্ঞের ভঙ্গীতে! ভাষা কিছু নয়, ভাব কিছু নয়, মানে কিছু নয়—চাই শুধু বড় বড় কথা! সেই সঙ্গে একটু খেটে যদি দু-চারটে সংস্কৃত কিম্বা ইংরিজি কোটেশন্ দিতে পার—এ যুগে আবার ফ্রেঞ্চ জার্ম্মাণ চাই—তা যদি পার, মহাবিজ্ঞ বলে তোমার নাম রটে যাবে! একবার নাম রটে গেলে তোমার সে নাম ধূলায় টেনে ফেলবার সাধ্য কারো থাকবে না!

সম্পাদকের কথার মধ্যে কুলি-গোছ একটা লোক আসিয়া দেখা দিল। তার হাতে দাঁড়ি-পাল্লা।

সম্পাদক কহিলেন—ছাপাখানা থেকে আসছো?

সে কহিল, হাঁ।

সম্পাদক কহিলেন—কাপি চাই?

সে কহিল, হাঁ।

সম্পাদক কহিলেন,—কত?

সে কহিল—সাড়ে সাত সের।

—বটে! বলিয়া সম্পাদক একরাশ কাপি তার সম্মুখে ঢালিয়া দিলেন। লোকটা দাঁড়ি-পাল্লা ধরিয়া একদিককার পাল্লায় বাটখারা চাপাইল, অপর দিকে চাপাইল লেখা কাপি।

সম্পাদক কহিলেন—তোমাদের কবিতা আর গল্প ঐ পাল্লায় চাপাও হে। ওজনে চলে যাবে।

জনার্দ্দন তার কবিতা চাপাইয়া দিল; লেখকের গল্পও পাল্লায় চাপিল।

আমি কহিলাম—ওজন দরে কাপি ছাড়েন?

সম্পাদক কহিলেন—যারা গ্রাহক, পয়সার ওজন তারা পাল্লায় মেপে নেবে না?

ও!

খাসা ব্যবসা তো এই মাসিক পত্রের!

সম্পাদক কুলিকে instructions দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

মানুষের জীবন

...মানুষ অল্পায়ু কেন হয়? সার নিউম্যান মানুষের এই অল্পায়ুতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছেন, ৫০।৬০ বছর বয়সে মানুষ মরিবে কেন? মানুষ স্বভাবতঃই ১০০ বছর বা তাহারও বেশী বাঁচিবে না কেন? বৈজ্ঞানিকেরা এক বাক্যে বলেন যে, মানুষ যদি তাহার শরীর হইতে দেহক্ষয়কারী জিনিস ও রোগের কারণ বাহির করিয়া ফেলিতে পারে, তবে সে শত বৎসর অপেক্ষাও দৈহিক ও মানসিক শক্তি লইয়া বাঁচিতে পারে। শিরা, প্রশিরা ও গ্রন্থিগুলির মধ্যে চুণ জাতীয় জিনিষ জমিয়া মানুষকে বৃদ্ধ করিয়া দেয়। ক্রমে দেহ কার্য্যের অনুপযুক্ত হয় ও পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ক্ষয়কারী জিনিস দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলে বিজ্ঞান মতে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। সেই ক্ষয়কারী জিনিষ অনেক আছে—তন্মধ্যে প্রধান; দধি, ঘোল ও আপেল। এই দধি, ঘোল ও আপেলের মধ্যে এমন জিনিষ আছে, যাহাতে দেহের জমাট চুণ বাহির করিয়া দিতে পারে। এইরূপ কথিত আছে যে, আদিম জনক জননী যে জীবন-তরুর ফল খাইয়াছিলেন তাহা এই আপেল গাছ। অনেকে জানেন এই আর্য্য যোগীঋষিরা এই বন ফল খাইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন।...

—এডুকেশন গেজেট
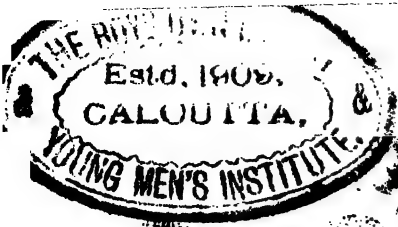
শিক্ষা

ভারতীয় স্থাপত্য

ভারতীয় স্থাপত্যের প্রসার ও প্রচারকল্পে কলিকাতায় একটি ভারতীয় স্থাপত্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। উদ্যোক্তারা শিক্ষালয় নির্মাণের খসড়া করিয়াছেন। যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের স্থাপত্য বিষয়ে নানাদেশীয় স্থাপত্যের ভেজাল মিশিত না হয়, স্থাপত্য-ছাত্রগণকে তদনুরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করাই এই স্কীমের উদ্দেশ্য। ভারতের বড়লাট, বাঙ্গালার লাট, ভূতপূর্ব ভারতসচিব ও ভারতের বহু রাজন্য এই স্কুল-প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। ভারতের স্থাপত্য-শিল্পে যে বিশিষ্ট ধারা ছিল, পুরাতন গৃহ ও স্তম্ভাদিতে যাহার নিদর্শন আজও পাওয়া যায়, তাহাই পুনরুদ্ধার করিবার শিক্ষা ছাত্রবৃন্দকে দেওয়া হইবে। শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠায় এক লক্ষ টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমান হয়। এই শিক্ষালয় ভারতবর্ষের শহর ও গ্রামসমূহ গঠনে স্থপতিগণকে ভারতীয়-শিল্পের নিজস্ব ধারা রক্ষা বিষয়ে পরামর্শাদি দান করিবে। স্থাপত্য-শিল্পের সঙ্গে, কাঠ, ধাতু, প্রস্তর-শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ক্রমশঃ হইবে।

বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন প্রবাদানুসারে শিক্ষার উপায় দুইটী—(১) ঠেকিয়া শেখা, এবং (২) দেখিয়া শেখা। "ঠেকিয়া শেখা" বর্ত্তমান যুগের Deductive Methodএর অনুরূপ, আর "দেখিয়া শেখা" Inductive Methodএর সদৃশ। "ঠেকিয়া" শিখিতে হইলে প্রত্যেক বস্তুর প্রয়োগের প্রয়োজন। প্রয়োগ করিয়া কিছু শিখিতে হইলে বস্তুতত্ত্ব জানা আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানের যে অবস্থা, তাহাতে "ঠেকিয়া শিখি"তে হইলে মানুষকে বেশীর ভাগ সময় ঠকিতে হয়। এই অবস্থায় "দেখিয়া শেখার" ব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন। কোন বিষয় দেখিয়া শিখিতে হইলে তাহার কোন্ প্রয়োগে কখন্ কি অবস্থা সাধিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। ইহারই নাম ইতিহাস জানা। কেবল প্রাচীন কালে কি ছিল, তাহার কতকগুলি নাম এবং প্রয়োগ জানিলেই ইতিহাস জানা সার্থক হয় না। ইতিহাসের জ্ঞান সার্থক করিতে হইলে কোন্ প্রবৃত্তির ফলে মানুষ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল এবং কি ব্যবস্থায় কোন্ সময় কোন্ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়।

যাঁহারা ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসের আলোচনা করেন তাঁহারা যে জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এযাবৎ প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য বলিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে যাহা ধরা হইয়াছে, তাহা উন্নতিশীল ভারতের অথবা পতনশীল ভারতের, তাহা এখনও স্থির করিবার কোনই চেষ্টা হয় নাই। পতনশীল জাতির কার্য্য কখনও মানুষের ইষ্টপ্রদ হয় না। পরন্তু তাহা জাতির কলঙ্কের পরিচয়। তাহার রক্ষা ত' দূরের কথা, যাহাতে তাহার বিলোপ সাধন হয় তদনুরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মনে রাখিতে হইবে, পৃথিবীর ইতিহাস দুই তিন সহস্র বৎসরে সীমাবদ্ধ নহে। পৃথিবী কতদিনের, তাহা বর্ত্তমানে মানুষের জানা নাই বটে, কিন্তু ইহা যে লক্ষ লক্ষ বৎসরেরও হইতে পারে, তাহা মনে করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেশ। তাহার প্রমাণ, হিমালয়ের উচ্চতা। জমি যত প্রাচীন হইতে থাকে তত উচ্চ হয়। এই হিসাবে ভারতের ইতিহাস সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী। জগতের অন্যান্য দেশ হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী দেশগুলির তুলনায় আধুনিক, তাহাদের ইতিহাসও আধুনিক। আধুনিক

দেশগুলির প্রারম্ভ কোন্ দিন হইতে এবং কখন্ তাহাদের অধিবাসিগণ বন্যাবস্থা হইতে মনুষ্য নামযোগ্য হইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ ও চীনের প্রারম্ভের ইতিহাস ত' দূরের কথা, তাহাদের পতন কবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাও নিদ্ধারণ করা সুকঠিন। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান সময়ের অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের ক্রমিক অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং এই তিন হাজার বৎসরের অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীর অনুকরণযোগ্য একটা উন্নতির অবস্থা ছিল।

ভারতীয় স্থাপত্যের যদি কিছু রক্ষা করিতে হয় অথবা অনুকরণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, ভারতীয় উন্নতির যুগ কবে ছিল এবং তখন তাহার স্থাপত্যের ধারাই বা কি ছিল।

ভারতীয় স্থাপত্য বলিয়া কতকগুলি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানুষ যদি কখনও আবার ভারতীয় উন্নতির ধারা যথাযথ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে দেখিবে যে, এখন যাহা ভারতীয় স্থাপত্য বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে প্রশংসনীয় কিছু কিছু থাকিলেও, তাহা উন্নত ভারতের উন্নত স্থাপত্য নহে, পরন্তু অবনত ভারতের অবনত স্থাপত্যের নিদর্শন। যদি আমাদের জাতীয় সম্মানবোধ থাকে, তাহা হইলে এই স্থাপত্য কোনক্রমেই রক্ষিত হওয়া সঙ্গত নহে, পরন্তু সর্ব্বথা ইহার বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন একটা জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার নিজস্ব বলিয়া কিছু রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি থাকে না এবং রক্ষা করে না। যাহা মানুষের ইষ্টপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা সে লাভ করিতে পারিলেই প্রতিবেশী জাতিগুলিকে বিতরণ করে। কারণ প্রকৃত উন্নতিশীল জাতি জানে যে, প্রতিবেশী জাতিগুলির উন্নতি সাধিত না হইলে, স্বীয় উন্নতি সম্যক্ এবং সর্ব্বাঙ্গীন হয় না। ফলে প্রকৃত উন্নতির যুগে সারা পৃথিবীতে সমস্ত জাতির ভিতর সকল রকম বিধিব্যবস্থার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই হিসাবে, ভারতের উন্নতির যুগে সকল রকমের শিল্পের আদর্শের অস্তিত্ব ছিল, তাহা অনুমান করা খুবই সঙ্গত বটে, কিন্তু কোনও শিল্পের ধারা উন্নত ভারতীয়গণ অন্যান্য জাতিকে না শিখাইয়া এবং অনুকরণ করিবার সুযোগ না দিয়া, নিজস্ব বলিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, এইরূপ মনে করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহার কর্ম্মচারিগণ যে ভারতীয় "নিজস্ব" শিল্পধারার সাক্ষ্য রাখিতে প্রযত্নশীল, তাহা স্বীকার করিতে হয়। ভারতের প্রকৃত উন্নতির যুগের ধারা নিদ্ধারণ করিতে হইলে, অবনত যুগের ধারাও জানিবার প্রয়োজন হয়। সেই হিসাবে, গবেষণার্থ অবনত ভারতের কার্য্যের নিদর্শন মিউজিয়মে রক্ষিত হওয়া খুবই সঙ্গত বটে এবং তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের ধন্যবাদযোগ্যও বটে, কিন্তু ভারতের কলঙ্কের বহুল প্রচারের সহায়তা করা গভর্ণমেণ্টের অদূরদর্শিতার পরিচয়। যশঃপ্রয়াসী অনভিজ্ঞ কতকগুলি দেশীয় লোকের প্ররোচনায় মোহমুগ্ধ দেশের জনসাধারণ আজ ইহাকে শুভকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে বটে, কিন্তু ভারতে যে হাওয়া উঠিয়াছে, তাহাতে দেশের জনসাধারণের মোহ অচিরে বিদূরিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং তখন ঐ জনসাধারণ এই জাতীয় কার্য্য যে, দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকের সহায়তাপ্রসূত, তাহা ভুলিয়া যাইবে এবং গভর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করিয়া দুইটী জাতির মনোমালিন্যের প্রসারতা বাড়াইয়া তুলিবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সভা

আগামী বর্ষে, জুলাই মাসে, ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ শহরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যান্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ত্রৈবার্ষিক সভাধিবেশন হইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নবনির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার মিষ্টার ষ্টানলী বল্ডুইন এই অধিবেশনের অধিনায়কত্ব করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ও স্যার ডবলু, ই, গ্রীভস্ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ও হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ) এই চারি ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

শিক্ষা ব্যাপারের এই জাতীয় মিলন-সভা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালকগণের জ্ঞানপিপাসার ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাবোধের পরিচয়। এই জাতীয় সভায় কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ হইলে আরও বুঝিতে হয় যে, ভারতবাসীর

যাহাতে শিক্ষার উন্নতি হয় তাহার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আছে। যে দেশে প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি হয়, সেই দেশে মানুষের কোনরূপ অভাব অথবা তাহার জন্য কোনরূপ দুঃখ থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ মানুষ অভাবমোচনের জন্যই শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। কর্তৃপক্ষের জ্ঞানপিপাসা, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বোধ, সাধারণের যাহাতে শিক্ষা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি ইত্যাদি থাকা সত্বেও, ভারতের তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, মানুষের ভিতর নানা রকম অভাবের অভিযোগ হয় কেন, তাহা জনসাধারণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

ভারতবর্ষে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদেরই অধিকাংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের অভিযোগ—ইহাই বা কেন?

আমাদের মনে হয় ইহার কারণ চারিটী –

(১) বর্ত্তমান জগতের ভাষাবিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানগুলি প্রায়শঃ বিপর্য্যয়গ্রস্ত।

(২) ছাত্র-জীবনে কোন্ কোন্ বিষয় কতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষা করা প্রয়োজন এবং সম্ভব, তদ্বিষয়ে শিক্ষা-পরিচালকগণের অজ্ঞতা।

(৩) শিক্ষার কি কি প্রণালী এবং কোন্ প্রণালী বালকের কোন্ বয়সে প্রযুজ্য তৎসম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের নেতৃবৃন্দের অজ্ঞতা।

(৪) শিক্ষার নামে কুশিক্ষার বিতরণ। মানুষ কুশিক্ষার ফলে যত কষ্ট পাইয়া থাকে, অশিক্ষায় কষ্ট পায় না।

পাব্‌লিক স্কুল

বিলাতে যে আদর্শে সাধারণ স্কুল পরিচালিত, সেই আদর্শের অনুকরণে, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে একটি পাব্‌লিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্কুলটি দেরাদুনের চাঁদবাগ অঞ্চলে খোলা হইবে। মিষ্টার এ. ই. ফুট স্কুলের প্রথম হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের পাব্‌লিক স্কুলগুলির আদর্শকে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবেন, মিঃ ফুট এমন ভরসা দিতে পারেন। প্রথমে স্কুলটিতে ৭০টি ছাত্র লওয়া হইবে; ফেব্রুয়ারী মাসে আরও ১১০জন ছাত্র লইবার আশা আছে। ১৮০ জনের অনেক বেশী ছাত্র ভর্ত্তি হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে।

স্কুলটি দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রথম ভাগে, একাদশ হইতে চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক বালকগণকে, দ্বিতীয় ভাগে, আটবর্ষ বয়স্ক বালকগণকে লওয়া হইবে। পরে, দ্বিতীয় ভাগেও একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকগণকে লওয়া হইবে না। আঠার বৎসর বয়সে ছাত্রগণকে স্কুল ত্যাগ করিতে হইবে।

বিলাতের পাব্‌লিক স্কুল-সমূহের পাঠ্যতালিকার অনুসরণ করা হইবে; কেবল গ্রীক ও লাটিনের পরিবর্ত্তে পার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে। অধিকন্তু, ছাত্রগণ যাহাতে তাহাদের মাতৃ-ভাষায় কৃতবিদ্য হইতে পারে, সে চেষ্টাও করা হইবে। যাহাতে এখানকার ছাত্রগণ ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও মধ্য-পরীক্ষার অনুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এই স্কুলের ইহাই উদ্দেশ্য।

ভারতের মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হন, ছেলেরাও বিলাতীভাবাপন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতে থাকে। যাঁহারা ছেলেদের বিলাতে পাঠাইতে পারেন না এবং এখানকার স্কুলেই শিক্ষার্থ পাঠাইয়া থাকেন, তাহাদের ছেলেদের শিক্ষার উচ্চতা সম্বন্ধে কোন আনন্দ জন্মে না; তাহারা জীবনযুদ্ধে সদাই শ্রান্ত, ক্লান্ত ও বিমর্ষ হইয়া পড়ে। সম্ভাবিত স্কুলে শিক্ষার ফলে ভারতীয় ছাত্রগণ স্বদেশে থাকিয়াও বিলাতী শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষা পাইতে পারিবে, এই স্কুলের ইহাই লক্ষ্য।

যতদিন পর্য্যন্ত দেশের জনসাধারণের বিলাতী শিক্ষার অনুকরণে ছেলে ও মেয়েদিগকে শিক্ষিত করিবার আগ্রহ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যদি কেহ তাহার সহায়তা করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আমরা সহায়কগণকে সহায়তার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোন রূপ নিন্দা করিতে পারি না। কিন্তু জনসাধারণকে আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা বিলাতী শিক্ষার অনুকরণ করিতে এত উৎসুক কেন?

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে স্বাবলম্বী করা। বিলাতে যদি এই উদ্দেশ্যসাধক শিক্ষা থাকিত, তাহা হইলে বিলাত নিজে স্বাবলম্বী হইতে পারিত। কিন্তু বিলাত অন্য দেশের উপর নির্ভর না করিয়া কয় দিন খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমাদের দেশীয় জনসাধারণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, শৃঙ্খলিত স্বাবলম্বন আর স্বাবলম্বনের নামে উচ্ছৃঙ্খলা এক বস্তু নহে।

চীন ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষা

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অধ্যাপকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে চীন ও তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা

দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আগামী বৎসরের হিসাব-খাতে ঐ দুই ভাষায় শিক্ষা পরিচালিত করিবার জন্য ৪২০০ টাকা বরাদ্দ করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট মন্ত্রণা-সভা সুপারিশ করিয়াছেন।

আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষার বিস্তার সর্ব্বদা প্রশংসনীয়। কিন্তু শিক্ষার নামে নিষ্প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং কুশিক্ষা কখনও দেশের ইষ্টসাধক নহে।

বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের এখন যে অবস্থা, তাহাতে চীন ও তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় ত বটেই, পরন্তু ইহা দ্বারা কুশিক্ষার প্রচারও সম্ভব হইতে পারে।

ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন দুইটী; যথা—(১) বিষয় অথবা বস্তুতত্ত্ব শিক্ষা, এবং (২) ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা। বিষয় শিক্ষা অথবা বস্তুতত্ত্ব শিক্ষা বলিতে বুঝিতে হয় এমন কিছু শিক্ষা করা, যদ্দ্বারা মানুষ তাহার নিজ জীবন, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য এবং মৃত্যু কি তাহা বুঝিতে পারে এবং কোন্ বস্তু কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিলে তাহার জীবন ও স্বাস্থ্য অটুট থাকিতে পারে এবং মৃত্যু দূরে অপসারিত হয় তাহা জানিতে পারে। প্রত্যেক মানুষ জন্মাবধি কোন না কোন ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। এই ভাষাকে তাহার প্রাকৃত ভাষা অথবা মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে। আপন মাতৃভাষায় অথবা প্রাকৃত ভাষায় বস্তুতত্ত্ব বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞানের ব্যবস্থা থাকিলে মানুষের আর তাহার জন্য অন্য কোন ভাষা শিখিবার প্রয়োজন হয় না। যদি আপন মাতৃভাষায় বস্তুতত্ত্ব বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে যে ভাষায় উহা আছে তাহা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়।

ভাষাতত্ত্ব বলিতে বুঝিতে হয় জীবের ভাষার আদি, অন্তর এবং বাহিরকে বুঝা। যাঁহারা ভাষাতত্ত্ববিদ্ তাঁহারা অনায়াসেই ভাষার আদি, অন্তর এবং বাহির কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভাষাতত্ত্বের কিছু চর্চ্চা না করিলে, ভাষার আদি, অন্তর ও বাহির কি বস্তু, তাহা অল্প কথায় বুঝান সম্ভব নহে। ভাষাতত্ত্ব জানিলে এবং ভাষাতত্ত্বানুসারে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিলে, অপরের বক্তব্য নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত করা যায়। ভাষাতত্ত্বানুসারে কাহারও মনোভাব প্রকাশিত হইলে, ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে তাহার অর্থ লইয়া মতদ্বৈধ হয় না। যখন কোন বক্তব্যের অর্থ লইয়া মতপার্থক্য উপস্থিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, হয় ঐ বক্তব্য ভাষাতত্ত্বানুসারে প্রকাশিত হয় নাই, অথবা পাঠকগণ ভাষাতত্ত্ববিদ্ নহেন, না হয় পাঠক এবং লেখক দুইয়ের কেহই ভাষাতত্ত্ববিদ্ নহেন। ইংরাজীতে লিখিত আইনগুলি বিভিন্ন ব্যবহারজীবিগণের দ্বারা বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। ইহা হইতে কি ইহাই অনুমিত হয় না যে, ইংরাজী ভাষা ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে?

যে ভাষা ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথবা যে ভাষায় ভাষাতত্ত্ব লিখিত, তাহা শিক্ষা করিলে মানুষ ভাষাতত্ত্ব শিখিতে পারে এবং তখন শুধু মানুষের ভাষা কেন, সমস্ত জীবের ভাষা পর্য্যন্ত বুঝা সম্ভব হয়।

চীন এবং তিব্বতীয় ভাষায় কোনও বস্তুতত্ত্ব অথবা ভাষা-তত্ত্ব আছে, তাহা অনুমান করিবার বিশেষ কোন কারণ আছে কি? কাজেই আমাদের মতে, এই দুইটী ভাষা শিক্ষার আয়োজন অর্থহীন এবং নিষ্প্রয়োজন।

অর্থহীন এবং নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করিলে মানুষের শিক্ষা বিষয়ে বৃথা অভিমান উপস্থিত হয় এবং অভিমান উপস্থিত হইলে মানুষ ধ্বংসাভিমুখী হয়। কাজেই এই জাতির শিক্ষার বিস্তারকে কুশিক্ষার বিস্তার বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে যে অবস্থা, তাহাতে অনতিবিলম্বে যাহাতে যুবকদিগের বস্তুতত্ত্ব শিখিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার একান্ত প্রয়োজন, ইহা বলাই বাহুল্য। যে বস্তুতত্ত্ব শিখিলে মানুষ সন্তুষ্টি, সততা, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে, তাহা ভারতের দর্শন ও বেদেই আছে। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, যে ভাষায় ভারতীয় দর্শনের সূত্র ও বেদের মন্ত্র লিখিত, সেই ভাষা আজ আমরা বিস্মৃত। তাহা পুনরুদ্ধার করা খুব কষ্ট এবং সাধনাসাপেক্ষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অসম্ভব নহে। যে ভাষায় বেদের মন্ত্র ও দর্শনের সূত্র লিখিত, তাহার তত্ত্ব অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি ও ঋগ্বেদে আছে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। পাণিনির লিখিত ঐ তত্ত্ব মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি দেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের অনবগতির জন্য পতঞ্জলি দেবের ব্যাখ্যাও ভ্রমপূর্ণ অর্থে প্রচলিত।

বাঙ্গালার অবস্থা দেখিলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরি-চালনায় মানুষের প্রকৃত মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ ব্যবহার আছে, তাহা মনে করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শিক্ষার বিস্তার হইতেছে বলিয়া হৈ হৈ রব উঠিবে, আর চাকুরী

পাইলে জীবিকার ব্যবস্থা হইবে না এবং শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে ফৌজদারী অপরাধের প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠিবে—ইহা দেখিয়াও যদি বলা হয় যে, শিক্ষার বিস্তার হইতেছে এবং ইহা উচ্চৈস্বরে প্রচার করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে চিন্তাহীনতার পরিচয় বলিলে কি অসঙ্গত হইবে?

যদি বাস্তবিক পক্ষে কাহারও লোক-দেখান শিক্ষা-বিস্তারের পরিবর্ত্তে প্রকৃত ভাষাশিক্ষা বিস্তার করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মহা-ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিবার চেষ্টা। অবশ্য, অনায়াসে মহাভাষ্যকারের প্রকৃত ব্যাখ্যা উদ্ধার করা চেষ্টা করিলেও সম্ভব হইবে না। তাহাতে পুরুষানুক্রমিক সংযত, অভিমানহীন, অভিনিবিষ্ট মস্তিষ্কের প্রয়োজন। সাধারণতঃ যাহা দেখা যায়, তাহাতে এই জাতীয় মস্তিষ্কেরই অত্যন্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে এই জাতীয় মস্তিষ্ক গড়িয়া উঠিতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করিলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের—বাস্তবিকপক্ষে শুধু বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের কেন, সমস্ত জগতের একটা প্রকাণ্ড হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বুঝিবেন কি?

শিক্ষক-শিক্ষা

শিক্ষকদিগকে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষক-শিক্ষা-বিভাগ খুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। মাধ্যমিক-শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষক শিক্ষকতার কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষাদানের উপযোগী করিয়া তোলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিয়োজিত যে কমিটি এই প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সমিতি নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সমিতি বলিয়াছেন এই শিক্ষাবিভাগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।

প্রথম ভাগে, যে সকল ব্যক্তি বি. টি (Bachelor of Training) পরীক্ষায় জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদের লওয়া হইবে। দ্বিতীয় ভাগে, বি. টি পরীক্ষার মত ব্যাপক ও বিস্তৃততর পাঠের ব্যবস্থা না থাকিলেও, শিক্ষা-কার্য্যের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হইবে।

শিক্ষক-শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা সত্য। কিন্তু কোন্ বিষয় ছাত্রকে শিখাইলে ছাত্র স্বাবলম্বী হইতে পারে, কি প্রণালীতে কোন্ বয়সে ছাত্রকে তাহার কতখানি শিখান সম্ভব, তাহা স্থির করিয়া না লইয়া, শুধু শিক্ষকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কুশিক্ষার বিস্তার ছাড়া আর কি হইতে পারে?

সরকারের শিক্ষা-বিবরণী

বোম্বাই সরকার বোম্বাই প্রদেশের ১৯৩৩—৩৪ সালের শিক্ষা-বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষার প্রসার সুনিয়মিতভাবেই বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষালয়ের সামান্য সংখ্যা হ্রাস ঘটিলেও ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শিক্ষার বর্ত্তমান মাপকাঠি যে প্রকৃত শিক্ষার পরিমাপক নহে, তাহা আমাদের সরকার কবে বুঝিবেন?

প্রাথমিক শিক্ষা

পাটনা (বিহার উড়িষ্যা) ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের শাসন-বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১৯৩৩—৩৪ সালে এই জেলাবোর্ড পল্লীসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারকল্পে ১,৬৮,৮৫৪ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরে ১,৬৬,৪৫০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

১৯৩৩-৩৪ সালে জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল, ১৭০; বর্ত্তমানে ১৭৭টি বিদ্যালয় হইয়াছে। জেলা বোর্ডের সাহায্য ও বৃত্তিপ্রাপ্ত পূর্ব্ব বৎসরে বালক বিদ্যালয় ১৩১৭ ও আলোচ্য বর্ষে ১৩১১ এবং ২৪১টি বালিকা বিদ্যালয় আছে।

মধ্য-প্রাথমিক বিদ্যালয় বাবদে জেলাবোর্ড পূর্ব্ব বৎসরে ২২,৮৭৭ টাকা ও আলোচ্য বর্ষে ২৯,৩৭২ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের পরিচালনাধীনে ২০টি মধ্য-ইংরাজী স্কুল আছে; আরও ১০টি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে জেলাবোর্ড অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

কতকগুলি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে কর্ম্ম-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই সকল স্কুলের ছাত্রগণকে সাবান তৈরী, কার্পেট বুনন, বই বাঁধা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্য-প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্য-ইংরাজী শিক্ষা, সাবান তৈয়ারী প্রভৃতি কর্ম্মশিক্ষা—সর্ব্ববিধ শিক্ষার যদি বাস্তবিক পক্ষে প্রসারই হইয়া থাকে, তাহা হইলে মানুষের অন্নোপার্জ্জনের ক্লেশ এত বাড়িয়া যাইতেছে কেন, তাহা আমাদের সরকার ও শিক্ষা-পরিচালকগণ একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? শিক্ষায় যদি অন্নোপার্জ্জনের ক্লেশেরই হ্রাস না হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষার প্রসারের সার্থকতা কি?

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

আসামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। আসাম ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে সেই প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে। রেভারেণ্ড জে. জে. এম্ নিকলস রায় কাউন্সিল অধিবেশনে প্রস্তাব করেন যে, আসাম-প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের একটি খসড়া অবিলম্বে প্রস্তুত করিয়া কাউন্সিলে পেশ করা

হউক। মিষ্টার জি, ই, পেনার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় গঠন ও পালনের জন্য যে টাকার দরকার, সর্বাগ্রে তাহার কথাই বিবেচনা করা উচিত।

আসামের শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আসাম সরকার তাড়াতাড়ি একটা কিছু করিতে চাহেন না। লাট সাহেব বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের যৌক্তিকতা ও অন্যান্য তথ্যসমূহ নির্দ্ধারণ জন্য একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইবেন; তারপর একটি বিশিষ্ট কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, গবর্ণমেন্ট আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খসড়া প্রস্তুত করিবেন এবং যথাসময়ে তাহা কাউন্সিলে পেশ করাও হইবে।

শিক্ষা-মন্ত্রীর এই কথাই ব্যবস্থাপক সভাধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষালয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই ভাল। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা কিনা এবং বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা শিক্ষা দিবার যথাযথ প্রণালী কিনা, ইহা বিশেষ চিন্তাসাপেক্ষ।

আসামে শিক্ষাবিস্তারের প্রযত্ন উৎসাহযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙ্গালা এবং অন্যান্য প্রদেশে যে ভ্রম সাধিত হইয়াছে, সেই জাতীয় ভ্রম যাহাতে আসামে না হয়, তদ্বিষয়ে আসামবাসীর পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইবার আগে, শিক্ষা কোন্ প্রণালীতে ছাত্রদিগকে দিলে, ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ জীবনে অন্নোপার্জ্জনে ক্লেশ দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই বিবেচিত হওয়া সর্ব্বাগ্রে সঙ্গত নহে কি?

কৃষি

সরকারী কৃষি-বিবরণী

যুক্ত প্রদেশের সরকারী কৃষি-বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, ১৯৩৩-৩৪ সালে উক্ত প্রদেশে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ৩,৫৩,৮১,২৭৭ একর; ১৯৩২-৩৩ সালে কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল, ৩,৫০,৪১,৬৮৫ একর। এই হিসাব মত দেখা যায় যে, এক বৎসরে শতকরা এক একর অধিক জমি কৃষি-যোগ্য হইয়াছে।

প্রতি একরে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই কৃষির উন্নতি হইতেছে, ইহা বলা চলে না। কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াও উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে কৃষির অবনতি হইতেছে বুঝিতে হইবে।

ফলের চাষ

বিহার উড়িষ্যার সরকারী কৃষি-বিভাগ ফল-চাষ সম্পর্কে গবেষণায় অবহিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে সাবুবে ফলের উৎকর্ষ সাধন ও ফল হইতে নানাবিধ বস্তু উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। ফলের সিরাপ, মোরব্বা, চাট্‌নী প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য এই প্রদেশের নানা কৃষি-গবেষণাগারে চেষ্টা চলিবে। ফল-বিক্রয়ের সুব্যবস্থা, নানাবিধ ফল উৎপাদন-প্রচেষ্টা এবং আনুষঙ্গিক সমস্যা-সম্বন্ধে সরকারী কৃষি-বিভাগ বর্দ্ধিতোৎসাহে কার্য্য করিতেছেন।

ফল জিনিসটী খাইতে যত সুস্বাদু, কৃষকের দুঃখ দূরীকরণে তত উপযোগী কি না, তাহা এখনও দেখিবার বিষয়। আমাদের মনে হয় কৃষির প্রকৃত উন্নতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার ফলেই এই সব রকম-বেরকমের পরীক্ষা-কার্য্য চলিতেছে।

পল্লীর সমৃদ্ধি

পল্লীর সমৃদ্ধি সম্পর্কে, যুক্ত প্রদেশের সরকারের প্রচার-বিভাগের কর্ত্তা এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে—

কেবলমাত্র উত্তম ও উন্নত শ্রেণীর বীজ হইলেই যে অধিকতর পরিমাণে শস্য জন্মে ইহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। উন্নত ও সংস্কৃত উপায়ে ভূমি কর্ষণাদি করিয়া, উন্নত ধরণের সার ও রীতিমত জল প্রদানের ব্যবস্থা করিলে, তবে উত্তম বীজের আশানুরূপ ফললাভ হইতে পারে।

বর্ত্তমানে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধিতে এবং ফসলের উৎকর্ষ সাধনে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইক্ষু-চাষের কথা বলা যায়। কিঞ্চিদধিক দশ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হইত, এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক শ্রেণীর ইক্ষু পাওয়া যাইতে পারে। যুক্ত প্রদেশের শতকরা আশীভাগ ইক্ষুচাষের জমিতে চাষীরা উন্নততর ইক্ষু চাষ করিতেছে। যব, ধান, তুলা, ছোলা প্রভৃতির সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর নিশ্চয় করিয়া এই কথা বলা যায়।

সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৮০টি বীজ-ভাণ্ডার আছে। এই সকল ভাণ্ডার হইতে উৎকৃষ্টতর বীজ পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল ভাণ্ডারে রাশি রাশি বীজ আসা যাওয়া করে, কিন্তু উত্তম বীজের এখনও অভাব আছে। যে বীজে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অধিক, যাহার ফলন দেখিয়া চাষী আকৃষ্ট হইতে পারে, তদ্রূপ বীজের পরিমাণ খুবই কম।

গবর্ণমেন্ট চাষীকে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেছেন। জমিদারগণও এ-বিষয়ে উৎসাহ দেখাইতেছেন।

সমবায় প্রথায় বীজ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিলে অধিকতর উপকারের সম্ভাবনা।

উন্নত বীজের ব্যবস্থাই হউক আর উন্নত কর্ষণ, সার ও জল-প্রদানের ব্যবস্থাই হউক, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় নদীগুলির উৎপত্তি-স্থান হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যাহাতে সেগুলি সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের স্বাস্থ্যপ্রদ শস্যের উৎপত্তি ও তাহার পরিমাণের বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও অন্তর্ব্বাণিজ্যে আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা না হইলে কৃষকের দুরবস্থা ঘুচিবে না। কোন্ শুভক্ষণে আমাদের সরকার নদীগুলির সংস্কার সাধন করিয়া তাহাদিগকে সারা বৎসর জলপূর্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং অন্তর্ব্বাণিজ্যের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা করিবেন তাহা ভগবান জানেন!

কৃষি-প্রদর্শনী

মান্দ্রাজ-প্রদেশের নীলগিরিতে কৃষি-উদ্ভিজ্জ-সমিতির বার্ষিক প্রদর্শনীতে নানাবিধ ফুল-ফল প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সরকারী বাগানের ফুল ও নানাবিধ তরীতরকারী একটি সুন্দর তাঁবুর মধ্যে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। ননজানাদের একটি কৃষিশালা প্রায় ত্রিশ রকমের আলু প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিল। কল্লার নামক স্থান হইতে বহুবিধ ফল প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে গো-মহিষাদি এবং নানাবিধ উদ্ভিদও রক্ষিত ছিল।

বিলাতের পাকা অনুকরণ বটে! আসল উদ্দেশ্য সফল হইবে কি?

ভারতের জমির দোষ

১৮২৮ সালে, অর্থাৎ প্রায় একশত সাত বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় কৃষি কমিশন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের জমির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দোষ যে, জমিতে যবক্ষারজানের অত্যন্তাভাব (insufficiency of nitrogenous compounds)। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলরতন ধর ও তাঁহার সতীর্থগণ গত সাত বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা তাঁহাদের নির্দ্ধারণ দিয়াছেন। এ দেশের ও বিলাতের বহু কৃষি-বিজ্ঞানবিদ্ তাঁহাদের মন্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক ধর গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন, ভারতের জমির যবক্ষারজানের অভাব চিনির কলের ঝড়তি-পড়তি যে গুড়, তাহা দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে। যে সকল জমিতে এমোনিয়াম সলফেট (ammonium sulphate) সাররূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে গুড় দিলে যবক্ষারজানের অভাব আদৌ থাকিবে না। যবের জমিতে একর-পিছু ৩০ হইতে ৫০ পাউণ্ড যবক্ষারজানের দরকার। অধ্যাপক ধরের বর্ণিত সারের ব্যবহারে জমির ফসলের পরিমাণ আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

অধ্যাপক ধর যে শুধু নাইট্রোজেন কম্পাউণ্ডের অভাবের কারণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি এই অভাবের গতিরোধ করিতেও সক্ষম হইয়াছেন।

অধ্যাপক ধর যে সকল গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাহা চালাইতে হইলে আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য ৩৬,৫০০ টাকার প্রয়োজন। ইম্পীরিয়াল কাউন্সিল অফ্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চকে এই টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

১৯৩৬ সালে রোম নগরীতে জমির রাসায়নিক সার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে যে আন্তর্জ্জাতিক সভাধিবেশন হইবে, অধ্যাপক ধর তথায় ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

কৃষিশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ও রাসায়নিকগণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা সাধারণ লোকদিগের বুঝিয়া উঠা সুকঠিন ব্যাপার। ভারতের জমিতে যবক্ষারজানের অভাব আছে অথবা প্রাচুর্য্য আছে, তাহা আমরা জানি না, তবে ভারতবর্ষের জমিতে যত রকম ও পরিমাণের ফসল জন্মে, জগতের অন্য কোন জমিতে যে তাহা হয় না, তাহা সরকারী কাগজ-পত্র দেখিলেই বুঝা যায়। বিলাতের কৃষি-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের মাত্রা যে কতখানি তাহা বিলাতী ফসলের পরিমাণ ও রকম হইতেই বুঝা যায়। যদি বিলাতে খুব বড় একটা কৃষিবিজ্ঞানই থাকিত, তাহা হইলে সেখানকার জমিগুলির এমন অবস্থা কেন? বিলাতের কৃষি-বিজ্ঞানবিদগণ কৃষি-বিজ্ঞান শিখিলেন কোথায় এবং তাঁহাদের বিজ্ঞানের সাফল্যের পরিচয়ই বা কোথায়? মানুষের সময় যখন ভাল হয়, তখন যে না পড়িয়াও পণ্ডিত হইতে পারা যায়—"বিলাতের কৃষিবিজ্ঞান" এবং "কৃষিবিজ্ঞানবিদ্" তাহারই পরিচয়।

কৃষির বাজার

ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ার্থ একটি বাজার-সঙ্ঘ গঠনের চেষ্টা ভারত সরকার করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে একটি খসড়াও প্রস্তুত হইয়াছে। এই খসড়ায় যে সকল প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

(১) প্রত্যেক প্রদেশে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ও তাঁহার কয়েকজন সহকারী নিয়োজিত হইবেন।

(২) তাঁহারা ভারত সরকারের বাজার-বিভাগ-বিশেষজ্ঞের নিকট তাঁহাদের নির্দ্ধারণ পেশ করিবেন ; বিশেষজ্ঞ নিজ মন্তব্যসহ তাহা ভারত সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) প্রথমে যে সকল বস্তু সারা ভারতবর্ষে চলে, যথা—চাল, যব, বাদাম, তামাক, চামড়া প্রভৃতি, তৎসম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে ; পরে অন্যান্য বস্তু সম্পর্কেও তদন্ত হইবে।

(৪) ভারত সরকার স্বীকার করিয়াছেন, যদি ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ টাকা-মঞ্জুরীতে বাধা না দেন, তাহা হইলে বাজার বোর্ডের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানা ইত্যাদি বাবদ পাঁচ বৎসরের খরচ সরকার বহন করিবেন। আগামী বর্ষের বাজেটে এই বাবদে টাকা বরাদ্দ করিবার ইচ্ছা ভারত সরকারের আছে।

(৫) প্রাদেশিক কর্ম্মচারীদের জন্য বৎসরে ২ লক্ষ টাকার বরাদ্দ হইয়াছে। ইম্পারিয়্যাল কাউন্সিল অফ্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের হাতে এই টাকা দেওয়া হইবে।

ভারত সরকার মনে করেন, এই স্কীম অনুযায়ী কাযা হইলে, ক্রেতা তাঁহার আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সুলভ মূল্যে পাইবেন এবং উৎপাদকও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্য পাইতে পারিবেন। অর্থাৎ উৎপাদকের প্রাপ্য মূল্যের উপর ফড়িয়ার দালালী (middleman's profit) না চাপিলে ক্রেতা ও উৎপন্নকারী উভয়ের পক্ষেই সুবিধা হইতে পারিবে। ভারত সরকার মনে করেন, ইহার ফলে দেশের কৃষক ও সাধারণ লোকের অর্থ-নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সজ্ঘটিত হইবে।

ভারতবর্ষীয় কৃষি-কমিশনের নির্দ্দেশানুসারে, ভারত গবর্ণমেণ্ট একজন বাজার-বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা-সমিতি সংশ্লিষ্ট বাজার-বোর্ডের সভাপতিপদ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার আফিস হইয়াছে, দিল্লীতে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলিতেও প্রাদেশিক বাজার-বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে; ভারতের প্রধান প্রধান করদ-রাজ্যেও অনুরূপ বোর্ড খোলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতের পণ্য বিক্রয় করাই এই বাজার-বোর্ডের লক্ষ্য।

বর্ত্তমান অর্থবিজ্ঞানবিদ্‌গণের নীতি অনুসারে বাজার-দর বাড়াইতে না পারিলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। বাজার বিশেষজ্ঞের নিয়োগ সম্ভবতঃ ঐ নীতিপ্রসূত। কর্ত্তব্য-বোধেই হউক অথবা চক্ষুলজ্জাবশতঃই হউক, ভারত গভর্ণমেণ্ট যে ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর সম্পদের বৃদ্ধি কামনা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহারই পরিচয়। শুধু ভারতবর্ষের কেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই ইংরাজ জাতি অর্থসম্পদ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা যে করিয়া থাকেন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই যে অর্থাভাবের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে—ইহাকে অবিশ্বাস অথবা উপেক্ষা করা যায় না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া কি বলিতে হয় না যে বর্ত্তমান অর্থবিজ্ঞানের গোড়ায় কোন না কোন গলদ আছে ?

জিনিষের দর বাড়াইবার নীতি এই গলদ। জাপান ও জার্ম্মানী পরোক্ষভাবে জিনিষের দর কমাইয়া বাজারের প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতেছেন এবং যখন যে জিনিষে হস্তক্ষেপ করিতেছেন সেই জিনিষের বাজার কাড়িয়া লইতেছেন, অথচ ব্রিটিশ অর্থবিজ্ঞানবিদগণ জিনিষের দর বাড়াইয়া সাম্রাজ্যের অভাবমোচনে যত্নশীল—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি ?

ভারতের অভাব মোচন করিতে হইলে অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আন্তর্জ্জাতিক প্রাধান্য বজায় রাখিতে হইলে—প্রথমে এই অর্থবিজ্ঞানের সংশোধন করিতে হইবে।

কৃষির হিসাব

বোম্বাই সরকারের কৃষি-বিভাগের হিসাব মত, সিন্ধু ছাড়া এই প্রদেশে (ভারতীয় করদ রাজ্যগুলি এই হিসাব তালিকার অন্তর্ভুক্ত) গত দশ বৎসরের অপেক্ষা, বর্ত্তমান বৎসরে গমের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

যেমন গর্জ্জে তেমন বর্ষায় না—এই যা দুঃখ।

নলকূপের জল

যুক্ত প্রদেশের সেচ-বিভাগের সেক্রেটারী ও চীফ ইঞ্জিনীয়ার স্যার উইলিয়ম ষ্ট্যাম্প কাণপুরের বণিক সমিতির নিকট লিখিত পত্রে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত, বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচা ও আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এক কোটী পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় করিলে ১৩০৩টি সরকারী নলকূপ খনন করা যায়। এই নলকূপের জলে বৎসরে ১৫০,০০০ একর ইক্ষু জমি ও ৩১০,০০০ গমের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইতে পারে। ফলে ৯.২৫ লক্ষ টাকা আয় হওয়ার সম্ভাবনা।

সর্ব্বত্র নলকূপের জলে ভাল ফসল হয় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে কি ? পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্র নলকূপের জল সর্ব্ববিধ কৃষির সহায়ক নহে। তাহা ছাড়া নলকূপের দ্বারা কৃষিতে জল দিবার ব্যবস্থাই হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ জমির সরসতা রক্ষা অথবা জলনিকাশের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। অন্য পক্ষে সারা দেশে যে কয়টী নদী আছে তাহা গভীর করিয়া কাটিয়া যাহাতে সারা

বৎসর তাহাতে জল থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, সর্ব্বত্র সরসতা রক্ষার এবং জলনিকাশের ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহাতে জমির উর্ব্বরতা-সাধন সম্ভব হইবে এবং সমস্ত দেশও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুষ্ট রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। নলকূপ খনন করিবার জন্য হয়ত ক্রোড় ক্রোড় টাকা খরচের ব্যবস্থা হইবে, অথচ তাহাতে আশাপ্রদ ফল হইবে কিনা তদ্বিষয়ে কোন চিন্তার উদয় হইবে না—ইহাই বর্ত্তমান বিশেষ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

পাটের চাষ

বাঙ্গালার যে সকল জেলায় পাট উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত জেলা হইতে যে সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে বুঝা যায় যে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর শতকরা ২০ ভাগ কম পাট চাষ হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়হেতু পাটের অবস্থাও গত বৎসর অপেক্ষা খারাপ।

পাটের চাষ যখন কম হইয়াছে, তখন বাজার-দর নিশ্চয়ই বাড়িবে এবং পাটের বাজার দর বাড়িলেই বাঙ্গালার চাষীর অবস্থার উন্নতি হইবে—ইহাই অর্থবিজ্ঞানবিদগণ আমাদিগকে এতাবৎ শিখাইয়াছেন। তদনুসারে আগামী বৎসর বাঙ্গালার চাষীর অবস্থার উন্নতি আশা করা যাইতে পারে। কার্য্যতঃ তাহা হইবে কি?

শিল্প

শিল্প-উন্নয়ন

ভারত সরকার ভারতবর্ষের শিল্প-উন্নয়নকল্পে প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, আমাদের পাঠকগণ তাহা জ্ঞাত আছেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট সেই টাকায় বোম্বাই প্রদেশের তাঁত-শিল্পের উন্নতির জন্য একটি স্কীম পাস করিয়াছেন। এই স্কীমে প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া শিল্পসহায়ক সমিতি গঠিত হইবে। সমিতি নিম্নবর্ণিত কার্য্য করিবেন :—

(১) তাঁত-শিল্পের জন্য উন্নত ও সংস্কৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহ।

(২) যথাসম্ভব অল্প মূল্যে কাঁচা মাল সরবরাহ।

(৩) তাঁতিদের সম্পূর্ণ আধুনিক ও সহজে বিক্রেয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণে পরামর্শ দান।

(৪) তাঁতিদের দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাদির রঙ ও চাকচিক্য সাধন।

(৫) তাঁতিদের নিকট হইতে জিনিস কিনিয়া লইয়া বেচিবার চেষ্টা।

এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য জেলার প্রধান সহরে একটি করিয়া দোকান খোলা হইবে।

জেলার শিল্প-সহায়ক সমিতিগুলির উপর বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগের কর্ত্তা ও কো-অপারেটিভ সমিতির রেজিষ্ট্রারের কর্তৃত্ব থাকিবে। একটি পরামর্শ-সভা গঠিত হইবে, সেই সভায়—

শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টার,

কো-অপারেটিভ সমিতির রেজিষ্ট্রার,

বোম্বাই প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত তাঁতশিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞ দুই জন বেসরকারী সদস্য থাকিবেন।

বাজার অফিসার এই সমিতির সম্পাদকের কার্য্য করিবেন।

বোম্বাই সরকার তাঁত-শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য, শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় ও জেলা সমিতি গঠন ও পরিদর্শনজন্য শীঘ্রই একজন বাজার অফিসার নিয়োগ করিবেন।

ভারত সরকারের শিল্প-উন্নয়নের নীতি এবং বোম্বাই সরকারের তাহা কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা যে তাঁহাদের প্রজার হিতসাধনেচ্ছাপ্রসূত, তদ্বিষয়ে জনসাধারণের সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সরকার বরাবরই প্রজার হিতসাধন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, অথচ প্রজার মনে একটা অবিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তির যে উদ্ভব হইয়াছে, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ করা যায় না। গভর্ণমেণ্টের প্রতি দেশব্যাপীর এই যে অবিশ্বাস তাহার কারণ, সরকারের এই জাতীয় চেষ্টাগুলির অসাফল্য এবং প্রজার আর্থিক অবস্থার ক্রমিক অবনতি। কেন যে লোকহিতকর কার্য্যগুলি অসফল হয় তাহা সাধারণতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হয় না। ইহাই গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্রুটী। এই ত্রুটীর জন্য দায়ী সরকারের বিশেষজ্ঞগণ, অথচ জনসাধারণের অসন্তুষ্টি সাধারণতঃ শাসন-বিভাগের উপর। শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বর্ত্তমান সভ্যতার নিয়মানুসারে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য অর্থশিক্ষা প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্ অথবা বিশেষজ্ঞগণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থা ও মন্তব্য মানিয়া লইতে বাধ্য হন।

অথচ সরকারের শাসনের নিয়মানুসারে শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে সর্ব্বদা জনসাধারণের সম্মুখীন হইতে হয়। জনসাধারণ "সরকার" বলিতে প্রায়শঃ শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকেই বুঝিয়া থাকে এবং তাহাদের জীবনযাত্রায় কোনরূপ অসুবিধা হইলে এই বিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, সরকারের প্রতি এই অসন্তুষ্টির মূলে সরকারের ত্রুটী দুইটী :—

(১) বিশেষজ্ঞগণের কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতা।

(২) শাসনব্যাপারে শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের বিশেষজ্ঞগণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অপ্রচুর ক্ষমতা অথবা শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণের বিশেষজ্ঞগণের বিদ্যার প্রতি অনুচিত শ্রদ্ধা।

বিশেষজ্ঞগণ যাহাতে জনসাধারণের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হন এবং তাঁহাদের কার্য্য অসফল হইলে যাহাতে তাঁহাদের গুরুতর শাস্তি হয়, যতদিন পর্য্যন্ত তদ্রূপ ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সরকার যতই শুভেচ্ছাপ্রসূত কার্য্য করুন না কেন, জনসাধারণের অসন্তুষ্টি দূরীভূত হইবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

শিল্পের উন্নয়নকল্পে যে সমস্ত আয়োজন হইতেছে, সেই সমস্ত আয়োজন দ্বারা যতদিন পর্য্যন্ত কাঁচামালের মূল্য, শারীরিক ও মানসিক মজুরীর হার এবং শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের হার কমাইবার চেষ্টা না হইবে, ততদিন শিল্প-উন্নয়ন-কার্য্য সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে না।

দেশে কি পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার কতখানি অংশ উদ্বৃত্ত কাঁচামালের বিনিময়ের জন্য বাহির হইতে আমদানী করিবার প্রয়োজন এবং কতখানি অংশ দেশের ভিতর প্রস্তুত হওয়া সঙ্গত, তাহারও একটা সঠিক নির্দ্ধারণের প্রয়োজন আছে। নতুবা জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োজনাতিরিক্ত শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপন্ন হইলে—শিল্পিগণকে বিপন্ন হইতে হইবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান সঙ্কট-সময়ে যে হিসাব এবং সতর্কতার প্রয়োজন, সেই হিসাব ও সতর্কতা ভারত সরকার ত দূরের কথা, ইংলণ্ডের সরকার পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইবার পন্থা আবিষ্কারের দায়িত্ব শাসন-বিভাগের প্রাচীনবয়স্ক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণের দ্বারা আরও দৃঢ়তা, ধীরতা এবং বিচক্ষণতার সহিত গৃহীত না হইয়া তথাকথিত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানবিদ্ বিশেষজ্ঞগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে আপাতদৃষ্টিতে রক্ষার একটা উপায় আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ গলদ থাকিয়াই যাইবে। কাজেই শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি লইয়া এত মাতামাতির পোষকতার কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না।

কুটীর-শিল্প

হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকার রাজ্যের কুটীর-শিল্প পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টিত হইয়াছেন। এক সময়ে হায়দ্রাবাদের কুটীর-শিল্পের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ছিল, বর্ত্তমানে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিজাম সরকার কুটীর-শিল্প শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ও আধুনিক উন্নত উপায়সমূহ প্রবর্ত্তনের দ্বারা হায়দ্রাবাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে যত্নবান হইয়াছেন।

এক সময়ে হায়দ্রাবাদে—

হাতে তৈরী কাগজ-শিল্প,
কাপড়ের রঙ ও ছাপ-শিল্প,
জরি শিল্প,
তুলা ও পশম-শিল্প,
পশম কার্পেট-শিল্প,
তসর শিল্প,
ধাতু শিল্প,
অস্ত্রশস্ত্র শিল্প,

বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

নিদ্রিত থাকা অপেক্ষা কোন একটা কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকা অথবা জাগরণের চেষ্টা করা সর্ব্বদা প্রশংসনীয়। সেই হিসাবে নিজাম সরকারের কুটীর-শিল্প পুনর্জ্জীবিত করিবার প্রযত্ন হায়দ্রাবাদ জনসাধারণের ধন্যবাদযোগ্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কার্য্য যথাযথ বিধিসম্মত না হইলে মানুষের ক্ষতি এবং অভাবের কারণ হইতে পারে।

নিখিল ভারত পল্লী-শিল্প

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নিখিল ভারত পল্লী-শিল্প সমিতির পক্ষ হইতে বাঙ্গালার কার্য্যতালিকা সম্পর্কে যে ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে—

(১) বাঙ্গালার পল্লীসমূহের বাজারে যে সকল ছাঁটাই করা চাল পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় আকাঁড়া (ছাঁটাই না করা) চাল স্বাস্থ্য ও উপকারী কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে।

(২) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে

(ক) বাঙ্গালাদেশে, বিশেষতঃ বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান জেলায় অসংখ্য তাল গাছ আছে। তালের রস হইতে গুড় উৎপন্ন হইতে পারে;

কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাদের রসকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা হয় নাই।

(খ) পাট হইতে চট, থলিয়া নির্ম্মাণ ও বিক্রয়।

(গ) তুলোট কাগজ শিল্পের উন্নতি সাধন।

(ঘ) চামড়া তৈরী।

তাঁহার মতে এই সকল কার্য্যের দ্বারা বঙ্গদেশবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র দেশের জন্য সন্ন্যাসী। নিখিল ভার. পল্লী-শিল্প সমিতির পরিচালক স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। তিনিও দেশের জন্য সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসিগণ আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের নিজের জন্য কিছুই করেন না। তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই লোক-হিতার্থ। তাঁহারা নিজের জন্য কোন কার্য্য না করিয়া সাধারণের হিতার্থ কার্য্য করেন বলিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করা বিপজ্জনক। কিন্তু দেশের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সকলের কার্য্যই পরীক্ষিত না হইলে দেশ নাবিকহীন জাহাজের মত পরিচালক-বিহীন থাকিয়াই যাইবে; এবং কোনকালেই গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসরে যে বহু সন্ন্যাসীর জন্ম হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। এই সন্ন্যাসিগণের প্রত্যেকেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া শুনা যায় এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই জনসাধারণের অল্পাধিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া নিজ নিজ মতানুসারক এক একটী সম্প্রদায় গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেশ কিন্তু এই তিন হাজার বৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ পতিত হইয়া আসিতেছে। কোন সন্ন্যাসীই তাহার পতনের গতি কিঞ্চিন্মাত্র অবরোধ করিতেও সমর্থ হন নাই। এই তিন হাজার বৎসরের প্রথমাংশে দেশের পরিচালনা দেশী লোকের হস্তে ছিল এবং দেশবাসীর প্রায় সকলেরই সন্তুষ্টি, সততা, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা, দীর্ঘায়ু, অন্নের অভাবশূন্যতা এবং অন্নোপার্জ্জনের ক্লেশহীনতা বিদ্যমান ছিল। প্রায় এক হাজার বৎসর হইতে দেশের পরিচালনা বৈদেশিকের হাতে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও দেশে অন্নাভাবের আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। দেড়শত বৎসর আগেও দেশের লোকের মোটা ভাত মোটা কাপড় উপার্জ্জন করিতে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইত না। বরং দিবসের কিয়দংশ পরিশ্রম করিলেই মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা হইত এবং বাকী সারাদিন এবং সারারাত্রি জ্ঞানালোচনা করিবার অবসর জুটিত। তখনও দেশময় সন্তুষ্টি, সততা, স্বাবলম্বন, স্বাস্থ্য ও কার্য্যক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ু পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমানে মানুষের যাহা কিছু আরাধ্য তাহার সমস্তই অন্তর্দ্ধান হইতে বসিয়াছে। এখন মানুষ জ্ঞানালোচনার অবসর ত' দূরের কথা, সমস্ত দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও পূরা পেট ভরিয়া খাইবার মত মোটা ভাত অর্জ্জন করিতে পারে না, বিভিন্ন ঋতুর প্রভাব হইতে রক্ষা পাইবার মত মোটা কাপড় পুরাপুরি সংগ্রহ করিতে পারে না। প্রায় সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার চিহ্ন প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্রই মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলচাতুরীর আধিক্য বাড়িয়া যাইতেছে; কেহই আর চাকুরী না পাইলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া অন্নসংস্থানের চেষ্টা করিতে ভরসা পান না, চল্লিশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই প্রায় সকলেই একটা না একটা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন, পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স্ক লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

দেশের অভাব পুরাপুরি মোচন করিতে হইলে যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতার প্রয়োজন, তদ্রূপ গুণসম্পন্ন কোন লোক যদি এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কি ভারতবর্ষের এতখানি পতন সম্ভব হইত?

এই তিন হাজার বৎসরের অবস্থার দিকে তাকাইলে, ভারতে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন উপযুক্ত জ্ঞান, বুদ্ধি ও কার্য্যক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। অথচ জনশ্রুতি রহিয়াছে যে, এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন; তাহাও অবশ্য অবিশ্বাস করা যায় না। এই সন্ন্যাসিগণের কোন কোন বিষয়ে অলৌকিক শক্তি ছিল তাহা খুব সম্ভব সত্য। কিন্তু যে জ্ঞান থাকিলে দেশের আত্মাকে পুরাপুরি উপলব্ধি করা যায়, অথবা যে বুদ্ধি থাকিলে দেশের আত্মাকে উপলব্ধি করিবার মত জ্ঞানের উদ্ভব হয়, সেই জ্ঞান এবং বুদ্ধি তাঁহাদের ছিল না। যদি থাকিত, তাহা হইলে দেশের পতন নিশ্চয়ই বহুদিন আগে অবরুদ্ধ হইত এবং দেশ বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না।

বস্তুতঃ, সন্ন্যাসিগণ গৃহাশ্রম ছাড়িয়া দিয়া ত্যাগীর জীবন গ্রহণ করায় গৃহীর কি অভাব, গৃহস্থের কি প্রয়োজন ও সামর্থ্য তাহা সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার সুযোগ পাইতেন না। ফলে তাঁহাদের বুদ্ধি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত এবং দেশের আত্মার* বৃহদংশ তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। তাঁহারা জীবের দুঃখমোচনার্থ সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিলেও, ঐ বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভাবের ফলে জীবের দুঃখের কোনরূপ হ্রাস সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই।

অথচ তাঁহাদের ত্যাগের ফলে কোন কোন বিষয়ে অসাধারণ শক্তি অর্জ্জিত হইত এবং তদ্বারা "একদেশদর্শী" অনুবর্ত্তি-লোক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন। তাহাতেই দেশের ভিতর নূতন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া দেশ খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়াছে এবং ফলতঃ তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের ত্যাগ সত্ত্বেও দেশের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী সাধিত হইয়াছে।

দেশের ও দশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে, যে সমস্ত কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন, এই সমস্ত সন্ন্যাসী তাহা না করায়, প্রকৃত 'বুদ্ধিপ্রবণ' হইতে পারেন নাই এবং তাঁহারা ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে কতকগুলি অর্থহীন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত 'বুদ্ধিপ্রবণ' হইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের কার্য্যে জিদের বশবর্ত্তিতা এবং সাম্প্রদায়িকতা পরিলক্ষিত হয়। 'ইন্দ্রিয়প্রবণ' অথবা 'মনঃপ্রবণ' না হইলে মানুষ কখনও জিদের বশবর্ত্তী অথবা সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না। 'ইন্দ্রিয়-প্রবণতা' এবং 'মনঃ-প্রবণতা'র নিত্য সহচর অভিমান। ইন্দ্রিয়-প্রবণ এবং মনঃপ্রবণ মানুষ আপাতদৃষ্টিতে লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইলেও বস্তুতঃ তাঁহারা নিজের জিদ রক্ষার কার্য্যই করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সন্ন্যাস কর্ত্তব্য-সাধনায় ব্যবহৃত না হইয়া অভিমানের বস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার ভক্ত অনুচরগণ, যাঁহারা বর্ত্তমানে দেশের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও বিশেষ সতর্ক না হইলে ভারতবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ন্যাসিগণের মতই দেশের উপকার অপেক্ষা বেশীর ভাগ অপকার সাধন করিবেন বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়।

জনসাধারণ মহাত্মাকে সমস্ত দেশবাসীর হিতসাধনায় ব্রতী বলিয়া জানিত। দেশোদ্ধারের কার্য্যে তিনি তাঁহার মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই দেশের যুবকগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার নির্দ্দেশে অনেক রকমের দৈহিক যাতনা সহ্য করিয়াছে। তাঁহারই নির্দ্দেশে আইন-ভঙ্গের জন্য পুলিশের আঘাতের ফলে দর দর বিগলিত রক্তের ধারা বহন করিতে করিতেও তাহারা তাঁহারই উদ্দেশে 'বন্দে-মাতরং' উচ্চারণ করিয়াছে। সহস্র সহস্র অনিন্দ্য দেবোপম চরিত্রের যুবক—তাঁহারই নির্দ্দেশের ফলে, কেহ কেহ বা যৌবনের প্রভাতে, কেহ বা মধ্যাহ্নে, কেহ দ্বীপান্তরিত হইয়া, কেহ বা দেশের মধ্যেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ম্মভূমি হইতে অপসারিত হইয়াছে। আজ মহাত্মাজী তাঁহারই প্রবর্ত্তিত পথ পরিত্যাগ করিয়া, পল্লী-শিল্প সাধনায় মননিবেশ করিয়াছেন।

তিনি কি বুঝিয়া কি করিতেছেন তাহা আমরা সম্যক বুঝি না, সত্য। তাঁহার আভ্যন্তরীণ ডাক (Inner Call) সাধারণের অপরিজ্ঞাত তাহাও সত্য, কিন্তু শিল্পসাধনায় যে সমস্ত দেশবাসীর হিতসাধন হয় না তাহাও সত্য। শুধু চাল, গুড়, পাট, তুলোট কাগজ এবং চামড়া কেন, সমস্ত ভারতবাসীর যত কিছু শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার সকলের একচেটিয়া সরবরাহ মহাত্মার হস্তগত হইলেও, সমগ্র ভারতবাসীর তুলনায় কত সামান্য অংশের অন্নসংস্থান হইতে পারে, তাহা মহাত্মা ও তাঁহার ভক্ত অনুচরগণ একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

ভারতবর্ষে কৃষকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা না হইলে, কৃষকের মুখে হাসি ফুটাইতে না পারিলে, কাহারও অন্নের সংস্থান অথবা দুঃখ ও অভাব মোচন হওয়া সম্ভব নহে—ইহা বুঝা কি খুবই শক্ত কথা ? যদি শক্তই না হয়, তাহা হইলে ডাঃ ঘোষ প্রমুখ মহাত্মার অনুচরবর্গ কৃষকের অন্ন সংস্থান ও তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি না অথবা করিতে চাহেন কি না তাহা আমাদিগকে জানাইবেন কি ?

* দেশের আত্মা বলিতে বুঝিতে হয়—জমী, জীব ও জলহাওয়া এবং এই তিনটীর প্রত্যেকটীর আদি, অন্তর এবং বাহির লইয়া যে পূর্ণাবয়ব, সেই পূর্ণাবয়ব।

আমরা ডাঃ ঘোষের ইস্তাহারের মূল কথা চিন্তা করিতে গিয়া মনের বেদনায় এতগুলি কথা বলিলাম। আমাদের বিশ্বাস, মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার অনুচরগণ ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা জানি, এখনও তাঁহাদের অপেক্ষা দেশের মধ্যে দেশের জন্য অধিকতর ত্যাগী পুরুষ আর কেহ নাই। তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া প্রকৃত পন্থা অবলম্বন না করিলে, আপাততঃ দেশবাসীকে নিরাশার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেই হইবে।

৭০

ব্যবসা-বাণিজ্য

দেশের অবস্থা

১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসের বহির্বাণিজ্যের হিসাবদৃষ্টে দেখা যায়—ঐ মাসে, আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ৯·০৮ কোটী টাকা। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসের আমদানি ও রপ্তানীর পরিমাণ অপেক্ষা এই বৎসরের হিসাব ৪·০৮ কোটী টাকা কম; ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসের আমদানী ও রপ্তানীর তুলনায় ২·৫৮ কোটী টাকা কম।

ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রার সংখ্যার দ্বারা দেশের অবস্থা নির্ণয় করিবার চেষ্টা ভ্রান্ত অর্থবিজ্ঞানের নীতি। আমদানী ও রপ্তানীর টাকার পরিমাণ দেখাইয়া দেশের সম্পদ তৌল করিবার প্রবৃত্তি কবে অপসারিত হইবে?

সোভিয়েট ও ভারতবর্ষ

শুনা যাইতেছে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করিয়া চাইনিজ-তুর্কীস্থানে সেই সমস্ত দ্রব্য রপ্তানী করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। এই কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন রেল লাইন খুলিবারও সঙ্কল্প করিয়াছেন। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষের যে সমস্ত ব্যবসায়ী রাসিয়ায় মাল-চালানের কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অন্নে হাত পড়িবে।

এই সংবাদ সত্য হইলে ইহার মূলে কি নীতি আছে তাহা ভারত সরকারের প্রণিধানযোগ্য। যে নীতির দ্বারা সোভিয়েট রুশিয়ার এবম্বিধ সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়া সম্ভব হইতে পারে, সেই নীতি ভারত সরকার পুরাপুরি বুঝিতে পারিলে এবং তাহা পূর্ণ ভাবে অবলম্বিত হইলে, ভারতের আর্থিক অভাব অনতিবিলম্বে দূরীভূত হইতে পারে।

ব্যবসায়ের হিসাব

	১৯৩১-৩২	১৯৩৪-৩৫
বৃটেন—		
আমদানী	৮৫	
রপ্তানী	৬২	৪৮ কোটী টাকা
সাম্রাজ্য—		
আমদানী	৭৬	৬৫
রপ্তানী	৮৯	৬৮ কোটী টাক

১ ৩৫ সালের এপ্রিল মাসের কলিকাতার বহির্বাণিজ্যে বিবরণ :—

প্রধান আমদানী	লক্ষ টাকা
সূতি দ্রব্য	৭০
কল-কব্জা	৪৫
লৌহ ইস্পাত	২৩
রসায়ণিক দ্রব্যাদি (সার ও ঔষধ ব্যতীত)	১১
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	১০
লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি	১০
তেল ও খনিজ পদার্থ	৯
	১৭৮ লক্ষ টাকা

প্রধান রপ্তানী	লক্ষ টাকা
পাটের দ্রব্যাদি	
পাট (কাঁচা)	
চামড়া	
গালা	১২
মটর, ময়দা প্রভৃতি	১১
চা	৮
পিগ আয়রণ	
পশম দ্রব্য	
তৈলবীজ	
ম্যাঙ্গানিজ	
	২৯৬ লক্ষ টাকা

বর্ত্তমান অর্থবিজ্ঞানানুসারে দেশের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর আধিক্য দেশের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। তদনুসারে উপরোক্ত বহির্বাণিজ্যের বিবরণী হইতে বাঙ্গালার অবস্থা উন্নত হইতেছে বলিতে হইবে। অথচ বাঙ্গালার প্রত্যেক ঘরে ঘরে বেকারের সংখ্যা এবং অভাবের মাত্রা বাড়িয়াই যাইতেছে। ইহা কি বর্ত্তমান অর্থবিজ্ঞানের ভ্রমের পরিচায়ক নহে?

রাজ্য-পরিচালনা

রাজবন্দী দিবস

রাজনৈতিক কারণে রাজাদেশে বহু বাঙ্গালী যুবক বন্দিভাবে নানাস্থানে অবস্থান করিতেছেন। বিনা বিচারে আটক আসামীদের 'ডেটেন্যু' বলা হয়। বিনা বিচারে আটকাবস্থার প্রতিবাদকল্পে, একটি "রাজবন্দী দিবস" পালন করিবার কথা হইয়াছিল। বাঙ্গালা সরকার এক ইস্তাহার জারী করিয়া রাজবন্দি-দিবস সংক্রান্ত কোন সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষেধ করিয়া দেন ইস্তাহারে কৈফিয়ৎ স্বরূপ বাঙ্গালা সরকার বলেন—

"বাঙ্গালাদেশের সন্ত্রাসবাদ সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহাদের উপর শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার ভার ন্যস্ত, তাঁহাদের প্রাণপাত চেষ্টাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। সামান্য অবহেলা ও ঔদাসীন্য দেখাইলেও বিপদাশঙ্কা প্রকাশ পায়, অতীতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

"রাজনৈতিক উপদ্রব ও সন্ত্রাসবাদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে বলিয়াই রাজবন্দীদিগকে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে।"

"পাছে "রাজবন্দী দিবস" সংক্রান্ত সংবাদ সমূহ পাঠে লোকের মনে অশান্তি ও সন্ত্রাসবাদের প্রতি সহানুভূতি জাগরিত হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই জন্যই রাজবন্দি-দিবস সম্পর্কিত সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ বাঞ্ছনীয় মনে করেন না।"

কলিকাতার দেশীয়-পরিচালিত সমস্ত দৈনিক পত্র মঙ্গলবার ২১এ মে তারিখে, গবর্ণমেণ্টের উক্ত আদেশের প্রতিবাদ স্বরূপ বন্ধ ছিল।

ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক প্রতিনিধি অথবা দেশীয় প্রতিনিধি হিসাবে যিনি যাহা বলিয়া থাকেন অথবা করিয়া থাকেন, তাহার সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য সংবাদপত্রের সৃষ্টি। এই জাতীয় সংবাদ প্রকাশিত হইলে দেশের সর্ব্বসাধারণের দেশের ও দশের কথা জানিবার সুযোগ হয়, গভর্ণমেণ্টের শাসনের স্বপক্ষে অথবা বিরুদ্ধে কাহার কি বলিবার আছে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও তাহা জানিবার সহায়তা হয়। সংবাদপত্রে সংবাদ বাহির করিতে নিষেধ করা আর তাহাদের কর্ত্তব্য সাধনে বাধা দেওয়া একই কথা। দেশের লোকের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট। অবশ্য, কোন গভর্ণমেণ্টই সকলের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণে সমর্থ হয় না। যুক্তিপূর্ণ অভাব-অভিযোগ দূর করা যেমন গভর্ণমেণ্টের কার্য্য, সেইরূপ অযৌক্তিক অভাব-অভিযোগের অযৌক্তিকতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

কোন সংবাদপত্রে কোনরূপ অযৌক্তিক অভিযোগের সংবাদ বাহির হইলে, গভর্ণমেণ্ট অতি সহজেই তাহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারেন।

তাহা না করিয়া সংবাদপত্রে কোন সংবাদ-বিশেষ যাহাতে প্রচারিত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলে, ঐ সংবাদ-বিশেষে হয় ত গভর্ণমেণ্টের কোন অযৌক্তিক কার্য্য আছে, এইরূপ সন্দেহ করা জনসাধারণের পক্ষে অযৌক্তিক নহে।

আমাদের কি বুঝিতে হইবে যে "ডেটেন্যু" সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ভিতর অযৌক্তিক কার্য্যও কিছু কিছু আছে এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইলে গভর্ণমেণ্ট স্বীয় কার্য্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে পারেন না? তাহারই জন্য কি রাজবন্দি-দিবস সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল?

সরকারী কাগজপত্রে যাহা প্রকাশ তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, গভর্ণমেণ্ট—রাজবন্দিগণ সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ অবিচার না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। তৎসংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা কোন অদূরদর্শী চিন্তাশক্তিহীন কর্ম্মচারী বিশেষের খামখেয়াল প্রসূত বলিয়া যদি কেহ মনে করে, তবে তাহা অন্যায় হইবে কি?

আয়কর

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দিল্লীর অধিবেশনে ভারত সরকারের রাজস্ব সচিবের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতবর্ষের আয়-কর (income tax) সম্বন্ধে তদন্ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে। লণ্ডনের দুইজন আয়কর-বিশেষজ্ঞ এ কাজে গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতেছেন। যাহাতে অন্যান্য দেশের আয়কর নিয়মের সঙ্গে ভারতের আয়করের সমতা রক্ষিত হয়, আয়কর নির্দ্ধারণে যে সমস্ত ত্রুটী আছে তাহা বিদূরিত হইয়া, সম্পূর্ণ আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম ধার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা হইতেছে।

কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ, গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য কি হইতে পারে তাহা চিন্তা করিতে বসিলে, আয়করের কোনরূপ যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গভর্ণমেণ্টের অর্থাভাব পূরণের জন্য প্রজার অতিরিক্ত আয়ের উপর কর

ধার্য্য করা শাসনকার্য্যে পারদর্শিতার অভাবের পরিচায়ক। কারণ, যে ব্যাপারের মূলেই এতবড় একটা অবিজ্ঞান রহিয়াছে তাহার আবার কি 'বিজ্ঞান' হইতে পারে ইহা বুঝা কঠিন। আমাদের মনে হয়, আয়করের বিজ্ঞান জাতীয় কথা "বিজ্ঞান" শব্দের অপব্যবহার।

ব্যক্তিগত

লর্ড আরস্কিন্

মাদ্রাজের ইঙ্গ মেন্স খৃশ্চিয়ান্ এসোসিয়েসনের বার্ষিক সভাধিবেশনের সভাপতি মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা লর্ড আরস্কিনের অভিভাষণ নানাদিক দিয়া প্রণিধানযোগ্য। দেশের বেকার-সমস্যা সম্পর্কে লর্ড আরস্কিন যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এইরূপ :—

"বেকার সমস্যা কেবল ভারতবর্ষেরই সমস্যা না হইলেও এখানকার সমস্যা অতীব জটিল। কারণ এখানে শিক্ষিত বেকারই অধিক এবং শিক্ষিত বেকারের সমস্যা কঠিনতর সমস্যা। ভবিষ্যতে ভারত সাম্রাজ্যে সকল সমাজ ও সকল স্তরের লোকের কাজ করিবার সুযোগ মিলিবে বলিয়া আশা হয়।"

লাটসাহেব স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম :—

"গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করা খুব সহজ ; কিন্তু শাসন-ভার হাতে আসিলে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করা যে খুব শক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। শাসন-ভার যাহার হাতেই থাকুক না কেন, লোকের নিকট তাহাকে অপ্রিয় হইতেই হইবে—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহা দেখা যায়। ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইতেছে। গণতান্ত্রিক সরকারের উচ্চাদর্শ হইতেছে, জনসেবা। এই জনসেবার উদ্দেশ্য লইয়া নানা প্রতিষ্ঠান কার্য্য করে। জগতের কোন জনসেবা-প্রতিষ্ঠান সর্ব্বোচ্চ আদর্শানুযায়ী কাজ করিতে পারে নাই সত্য ; তবে চেষ্টা করিলে এই সকল প্রতিষ্ঠান যে জনসেবা করিতে পারে, গণতান্ত্রিক সরকার সেই সুযোগই জনসাধারণকে দিয়া থাকেন।"

ওয়াই, এম্, সি-এর লক্ষ্য সম্বন্ধে লর্ড আরস্কিন্ বলিয়াছেন :—

"এই সমিতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষের যুবকদিগকে সেবার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করাই সমিতির লক্ষ্য। যদি কোন দিন তাহার সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়, তাহা হইলে আশাতীত ফল লাভ হইবে। আজ আমি এইখানে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষের তরুণগণকে এই কথাই বলিতে চাহি যে আত্মসেবা নহে—জনসেবার প্রবৃত্তি যদি আপন আপন অন্তরে উদ্বুদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উচ্চাদর্শের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিবেই।"

ভারতবর্ষের বেকার সম্বন্ধে লর্ড আরস্কিন যাহা বলিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলা চলে না কারণ তিনি এদেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এদেশে জন্মগ্রহণ না করিলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংগঠন কিরূপ ছিল এবং কিরূপ ভাবে দেশের লোক অন্নোপার্জ্জন করিত তাহা বুঝা যায় না। যদি তিনি এদেশে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বলিতাম যে ভারতবর্ষের বেকারের সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। এখানে বেকারের সংখ্যা, ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। ত্রিশ বৎসর আগে এখানে অনেক লোক ঘরে বসিয়া থাকিয়া অন্নোপার্জ্জন করিত। চাকরী না করিলে যদি লোক বেকার হয় তাহা হইলে তখন ঐ সমস্ত লোকই বেকার ছিল। এখন সেই তুলনায় অনেকে চাকুরী করিতেছে। কাজেই বেকারের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। পার্থক্য এই যে, তখন বেকার থাকিলেও লোকে খাইতে পাইত ; আর এখন চাকুরী করিয়া সর্ব্বদা আধাপেট খাইয়া থাকিতে হয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা বেকার নয়—সমস্যা "অন্নের।"

শাসনভার যাঁহার হাতে থাকে, বর্ত্তমান জগতে তাহারা লোকের অপ্রিয় হয় ইহা খুব সত্য কথা। কিন্তু একদিকে গণতান্ত্রিকতা আর একদিকে জনসাধারণের অপ্রিয়তা ইহা কি খাপ খায়? বর্ত্তমান শাসকগণ গণতান্ত্রিক হইতে চেষ্টা করিলে যে কাষ্যতঃ লোকের অপ্রিয় হইয়া পড়েন ইহাতে কি বুঝায় না যে বর্ত্তমান শাসন বিজ্ঞানে কোন না কোন ভ্রম রহিয়াছে?

রেওয়ার মহারাজ

শিক্ষিত যুবকগণকে কৃষি-কার্য্যে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে মধ্যভারতের করদ রাজ্য রেওয়া ষ্টেটের মহারাজা এক অভিনব পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহারাজার নির্দ্দেশ এইরূপ :—

সাধারণ চাষীদের নিকট হইতে যে হারে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হয়, শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাষের কাজে লাগিলে, তাহাদের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প রাজস্ব লওয়া যাইবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা যাহার যত অধিক, ভূমি-রাজস্ব তাহার তত কম হইবে।

যখন লেখাপড়া না করিয়াই কৃষিকার্য্য করা যায় তখন অবশেষে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে আর লেখাপড়ার প্রয়োজন কি?

বোম্বায়ের লাট

করাচীতে ধর্ম্মান্ধ ও ক্ষিপ্ত মুসলমান জনতাকে শান্ত করিতে না পারায় সরকারকে গুলি চালাইতে হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত

আছেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এক ব্যক্তির শবদেহ সম্পর্কে যে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তাহার ফলে পুলিশ গুলি চালায়—অনেক লোক হত ও আহত হয়। হতাহতের সাহায্যকল্পে একটি অর্থভাণ্ডার খোলা হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড ব্রাবুর্ণ স্বয়ং পাঁচ হাজার টাকা ঐ ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

লর্ড ব্রাবুর্ণ সকলের ধন্যবাদার্হ।

মালব্যজী

বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড-নির্দ্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নেতৃত্বে বিলাতে যে ডেপুটেশন পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, সম্প্রতি সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। মালব্যজী বিলাত যাইবার সঙ্কল্পও পরিহার করিয়াছেন।

আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি মালব্যজীর যেন আর কখন হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধীয় কোন কথা কহিবার প্রবৃত্তি না জাগে। ভারতে একমাত্র ভারতবাসী আছে এই ভাব না জাগিলে ভারতীয় জাতিগঠন সম্পূর্ণ হইবে না। যতদিন পর্য্যন্ত "হিন্দু মুসলমান" এই সমস্ত কথার বেশী চলন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় জাতি সম্পূর্ণরূপে গঠিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। কাজেই যতশীঘ্র ঐ সব কথার বিলোপ হয় ততই মঙ্গল।

স্যর মাইকেল কীন

আসাম ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন উপলক্ষে গত ২৭এ মে, আসামের গবর্ণর স্যার মাইকেল কীন যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আসাম প্রদেশের প্রতি আর্থিক ব্যাপারে যথোচিত সুবিচার করা হয় নাই, একথা এতকাল পরে আজ সকলেই স্বীকার করিতেছেন। অতীতের অবিচারের প্রতিকারস্বরূপ এবং আসাম প্রদেশকে স্বাবলম্বী হইবার সুযোগ দেওয়ার অভিপ্রায়ে ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কিরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন এখন তাহাই দেখা যাউক।

আসামের ভূমি-রাজস্ব, অন্যান্য সম্পদ এবং ইহার ভাবী প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য আসাম গভর্ণমেণ্ট বিস্তৃততর তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"আসামে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে কিন্তু আসাম গভর্ণমেণ্ট নিজের স্কন্ধে দায়িত্ব লইয়াই ব্যবস্থাপক সভায় উহা উত্থাপনের অনুমতি দিতে অসম্মত হইয়াছেন। আসাম প্রদেশকে একরূপ দেউলিয়া প্রদেশ বলা যাইতে পারে। আসাম প্রদেশের রাজস্বের উপর আর অধিক চাপ দেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

"আসামে প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নের জন্য গভর্ণমেণ্ট একটী বিল আনয়ন করিয়াছেন। সিলেক্ট কমিটি বিলে অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। ঐ বিলটিকে কাউন্সিলের সম্মতিক্রমে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হইবে।

লাট সাহেবের বক্তৃতা কয়েকটী জ্ঞাতব্য সংবাদে পরিপূর্ণ। আসামের আর্থিক স্বাচ্ছল্যের জন্য তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বজন-বিদিত।

বিবিধ

বীমা-ব্যবসায়

ভারতবর্ষীয় বীমা কোম্পানী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন বোম্বাই শহরে হইয়া গিয়াছে। মিঃ জে. সি শীতলবাদ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এইরূপ :—

"ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকা ও কানাডা প্রভৃতি যে সকল দেশ বীমার কাজে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে, ঐ সকল দেশেও বিদেশী কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে আইনের কঠোর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। ঐ সকল দেশে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির কাজে নামিতে হইলে প্রথমেই বহু টাকা জমা রাখিতে হয় এবং অর্জ্জিত প্রিমিয়মের মোটা অংশ ঐ দেশেই খাটাইতে হয়। আমাদের দেশে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির সহিত বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি প্রবল প্রতিযোগিতা করিতেছে, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ব্বিবাদে ভারতে ব্যবসা করিতে পারে। ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতীয় কোম্পানী অপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা দেয় এবং কাজ যোগাড় করিবার জন্য এত অধিক অর্থ ব্যয় করে যে কোনও ভারতীয় কোম্পানী সেরূপ করিতে পারে না। জাপানে এইরূপ আইন আছে যে যদি কোনও বিদেশী কোম্পানী জাপানি কোম্পানীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বীমার ব্যবসা চালায়, তাহা হইলে সেই বিদেশী কোম্পানীর লাইসেন্স অবিলম্বে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

"এদেশের গভর্ণমেণ্ট যে এসব কথা জানেন না তাহা নহে। ভারতীয় বীমা-কোম্পানী-সমিতি নানা সময়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল আবেদন নিবেদন পেশ করিয়াছেন তাহাতেও এই সকল অভিযোগের কথা বলা হইয়াছে। নানাদিক দিয়াই ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। গভর্ণমেণ্ট এখনও যদি অবহিত না হন, তাহা হইলে পরে প্রতিকারের আশা সুদূর-পরাহত হইবে।"

"কিন্তু শুধু গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন করিলেই চলিবে না। দেশের জনসাধারণকেও কেবলমাত্র ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে।

বিদেশীয় বীমা কোম্পানিগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় যে দেশীয় বীমা কোম্পানিগুলির কতকটা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা খুবই সত্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতিত্ব দোষদুষ্ট না হইলে কি করিয়া ঐ অসুবিধা দূর করিতে পারেন তাহা বুঝা শক্ত। ব্যবসাবাণিজ্যক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের কোন জাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা যুক্তিসঙ্গত কি?

কোন জাতির ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে বিশেষ কোন বিধির প্রবর্ত্তন করিলে ঐ ব্যবসায়িগণকে মূল্য বৃদ্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া হয় না কি? তাহাতে দেশীয় জনসাধারণের প্রতি অবিচার হয় না কি? কোন দেশে তদ্দেশজাতদ্রব্যব্যবসায়িগণের সুবিধাকল্পে ঐ জাতীয় দমাত্মক বিধির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, অতএব আমাদের দেশেও উহা অবলম্বন করা উচিত এই জাতীয় যুক্তি সমীচীন কি? শিল্পী হউন, বণিক হউন, সকলকেই বাঁচিতে হইবে দেশীয় জনসাধারণের জন্য। যাহাতে দেশীয় জনসাধারণের অল্প প্রীমিয়ামে (Premium) অধিক লাভ পাইবার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয় বীমা কোম্পানীর পরিচালনায় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, দেশীয় জনসাধারণের সহৃদয়তা পাওয়া যায় না কি?

গত কয়েক বৎসরের দেশীয় বীমাকোম্পানিগুলির কার্য্যের পরিমাণ লক্ষ্য করিলে ভারতবর্ষে শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে দেশপ্রাণতার উদ্ভব হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিদেশীয় প্রতিযোগিতা দেশীয় বীমাকোম্পানিগুলির খুব ক্ষতি না করিলেও ভারতীয় বীমাকার্য্যের সম্মুখে বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা সত্য। ভারতীয় পূর্ণবয়স্ক লোকদিগের মৃত্যুর হারের বৃদ্ধি এই আশঙ্কার কারণ। দেশের লোক যাহাতে নিজ নিজ খাদ্য ও ব্যবহার্য্য উপার্জ্জন করিয়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা বীমাকোম্পানীর প্রধান স্বার্থ এবং ঐ কার্য্যে প্রত্যেক বীমাকোম্পানীর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। মিঃ শীতলভদের বক্তৃতায় এই কথাগুলি প্রচারিত হইলে আমরা আনন্দ অনুভব করিতে পারিতাম।

ভারতীয় ছাত্রীগণের ইয়োরোপ ভ্রমণ

মিসেস এস্. কে দত্ত নাম্নী এক মহিলা ১৯ জন ভারতীয় ছাত্রী লইয়া ২৮শে মে তারিখে বোম্বাই হইতে ইয়ুরোপ যাত্রা করিয়াছেন। এই ছাত্রীদল সর্ব্বপ্রথমে ভিয়েনা গমন করিবেন। সেখান হইতে চেকোস্লোভাকিয়া, প্রাগ, ড্রিসডেন, বার্লিন, প্যারি, ভেনিস, বেলজিয়ম, অক্সফোর্ড, লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, স্কটল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিবেন।

জুলাই মাসে হল্যাণ্ডে যে ছাত্র (Student) সম্মিলন হইবে, এই ভারতীয় ছাত্রীদল তাহাতে যোগদান করিবেন। জুন মাসে লণ্ডনের জাতীয় শান্তিবৈঠকেও ইঁহারা উপস্থিত থাকিতে পারেন।

মিসেস এস, কে, দত্ত বলেন—তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তিতে বিশ্বাসী। বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ব্যক্তিগত মেলামেশা প্রভৃতির দ্বারা একটা সাধারণ সহানুভূতির ভাব জাগিতে পারে, প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা ইয়ুরোপ যাত্রা করিতেছেন। অবশ্য ইয়ুরোপের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পরিদর্শন করিবার ইচ্ছাও সেই সঙ্গে তাঁহাদের আছে।

প্রত্যেক বস্তুর তিনটী ভাব আছে, যথা—তাহার আদি, অন্তর ও বাহির। প্রকৃতির নিয়ম দেখিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে বস্তুর আদি ও অন্তর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্ত্রীলোকের, আর বাহির সংরক্ষণ এবং বাহির দেখিয়া অন্তর ও আদির সংরক্ষণের উপায় নির্দ্ধারণের ভার, পুরুষের। এই হিসাবে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেশীয় পুরুষগণের। পুরুষের কার্য্য যে মিসেস এস, কে, দত্ত ও তাঁহার সহযোগিনীগণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে যে ভারতবর্ষ পুরুষশূন্য হইয়া পড়িয়াছে? পুরুষের কার্য্য স্ত্রীলোকের দ্বারা এবং স্ত্রীলোকের পুরুষের দ্বারা হওয়া কখনও সম্ভব হইয়াছে কি? আমাদের মা লক্ষ্মীগণ যাঁহাদের অনুকরণে এই জাতীয় পুরুষোচিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই ইউরোপীয়গণের পারিবারিক জীবন সর্ব্বতোভাবে সুখের কিনা তাহা তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি?

লক্ষ্ণৌ পল্লী-উন্নয়ন

ভারত সরকারের নির্দ্দেশানুযায়ী যুক্তপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ সহরে একটি জেলা সমিতি গঠিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌর ডেপুটী কমিশনার মিষ্টার মনরো সমিতির সভাপতি ও নিবৃত্তি (আবগারী) ইন্সপেক্টর খাঁ সাহেব আজিমুদ্দীন খাঁ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।